শ্রাবণ—১৩৭৪

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—১ম সংখ্যা

ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কলিকাতার বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলন

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বানুবৃত্তি

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তৃপক্ষের উদ্যোগে কলিকাতায় যে বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, ঐ সম্মেলনে যাঁহারা সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন ধর্ম্ম সম্মেলনের সভাপতি হইবার উপযুক্ত কি না, ঐ সম্মেলনে যে সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছিল ঐ সমস্ত বক্তৃতা কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভায় শোভনীয় কি না, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ আরম্ভ করা হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখান হইয়াছে যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে প্রথমতঃ কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য কোন্ কোন্ বিদ্যা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা জানা আবশ্যকীয়। ইহা ছাড়া আরও দেখান হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার উপযুক্ত কি না, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, একদিকে যেরূপ কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার জন্য কোন্ কোন্ বিদ্যা একান্ত আবশ্যকীয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিদ্যা একান্ত আবশ্যকীয় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে "ধর্ম্ম" কাহাকে বলে, "ধর্ম্ম-জ্ঞান" লাভ করিবার উপায় কি, "ধর্ম্ম-জ্ঞান" লাভ করিবার প্রয়োজনীয়তা কোথায়—এবংবিধ তত্ত্বসমূহের সন্ধান করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

"ধর্ম্ম কাহাকে বলে" এবং "ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি," এই দুইটি তত্ত্বের আলোচনা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে করিয়াছি। ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তৎসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিয়াই আমরা দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে একদিকে যেরূপ "ধর্ম্ম" ও "ধর্ম্মজ্ঞান" কাহাকে বলে, তাহা সম্যক্ ভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে সেইরূপ "লৌকিক প্রয়োজনীয়তা" বলিতে কি বুঝায়, তাহাও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। "লৌকিক প্রয়োজনীয়তা" বলিতে কি বুঝায়, তাহার আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, যদি কোন বস্তু অথবা কর্ম্ম হইতে মানুষের মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু অথবা কর্ম্ম লৌকিক প্রয়োজনীয় বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। লৌকিক প্রয়ো-

জনায়ত্তার উপরোক্ত সংজ্ঞানুসারে, যদি দেখা যায় যে, ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে অথবা ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যে যে অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, সেই সেই অভ্যাসের ফলে মানুষের পক্ষে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিবার যে লৌকিক প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে। ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে য অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, সেই সেই অভ্যাসের ফলে মানুষের পক্ষে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব কি না, তাহা জানিতে হইলে একদিকে যেরূপ ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কোন্ কোন্ অভ্যাসের প্রয়োজন হয়, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা আবশ্যকীয়, অন্যদিকে আবার ঐ ঐ অভ্যাসের ফলে মানসিক শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে "মন" কাহাকে বলে, "শান্তি" কাহাকে বলে, "শরীর" কাহাকে বলে, "স্বাস্থ্য" কাহাকে বলে, "অর্থ" কাহাকে বলে এবং "স্বচ্ছলতা" কাহাকে বলে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। "মন" কাহাকে বলে, তাহার আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় করিয়াছি। বর্ত্তমান সংখ্যায় "শান্তি" কাহাকে বলে, তাহাই প্রথমতঃ আলোচ্য।

ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা

শান্তির সংজ্ঞা

মনের "শান্তি" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "শান্তি" ও "অশান্তি" নামক মনের দুইটি অবস্থা বিদ্যমান আছে এবং একটি অপরটির বিরুদ্ধ। কোন্ অবস্থাটিকে মনের শান্তির অবস্থা, আর কোন্ অবস্থাটিকে মনের অশান্তির অবস্থা বলিতে হয়, কেন কখনও বা মানুষের মনে শান্তির উদ্ভব হয়, আবার কখনও বা অশান্তির উদ্ভব হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের "মন" কাহাকে বলে, তাহা আমাদিগকে আর একবার স্মরণ করিতে হইবে। মানুষের "মন" কাহাকে বলে, পূর্ব্বসংখ্যায় তাহার আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, যে-ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ হয় অজড় হইতে জড় অবস্থায় উপনীত হইবার পর, যে ক্রিয়াশক্তির পরিণতি হয় অগ্নি, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যে-ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি হয় মানুষের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশক্তির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সেই ক্রিয়াশক্তির নাম "মন"।

কাহাকে যে "মন" বলা হইতেছে, তাহা উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে সঠিকভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব না হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের একটি ক্রিয়া অথবা কার্য্যশক্তিকে যে "মন" বলা হইয়া থাকে এবং জড় অবস্থায় উপনীত হইবার পর যে ঐ কার্য্যশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে নিঃসন্দেহে জানা যাইতে পারে।

মানুষের কোন্ কার্য্যশক্তিটিকে "মন" বলা হইয়া থাকে, তাহা সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের সর্ব্বসমেত কয়টি প্রধান প্রধান কার্য্যশক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে এবং মানুষের সর্ব্বসমেত কয়টি প্রধান প্রধান কার্য্য-শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে কি কি লইয়া মানুষের অবয়বের সম্পূর্ণতা, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কি কি লইয়া মানুষের অবয়বের সম্পূর্ণতা, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, একটি বায়বীয় দ্রব্য মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। আরও দেখা যাইবে যে, ঐ বায়বীয় দ্রব্যটি মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু কখনও বা উহা সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, আবার কখনও বা উহা সর্ব্বাঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থানে মাত্র বিদ্যমান থাকে।

একটি বায়বীয় দ্রব্য যে মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং উহা যে কখনও কখনও সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, আর কখন কখনও বা যে উহা কেবলমাত্র সর্ব্বাঙ্গের বিশেষ বিশেষ স্থানে বিদ্যমান, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যখন ঐ বায়বীয় দ্রব্যটি মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং মানুষ

তাহার সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বত্র তাহা অনুভব করিতে পারে এবং [illegible] মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান্ হইয়া থাকে। ঐ বায়বীয় দ্রব্যটির বিদ্যমানতা মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে যত কম স্থানে সংঘটিত হইতে থাকে, মানুষের স্বাস্থ্য, সবলতা ও বুদ্ধিমত্তা ততই হ্রাস পাইতে থাকে। উহার বিদ্যমানতা যখন মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গের কেবল মাত্র উপরিভাগে সংঘটিত হয়, তখন মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিজ অবয়বের মধ্যে যাঁহারা বায়বীয় দ্রব্যটি প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন যে, উহার কোন অবয়ব নাই বলিয়া, উহা মূলতঃ কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। পরন্তু উহার উপলব্ধি এবং শীতলত্ব ও উষ্ণতার বোধ আছে বলিয়া এবং উহা হইতে রস ও তেজের উদ্ভব হয় বলিয়া ঐ বায়বীয় দ্রব্যটিকে বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়।

কি কি লইয়া মানুষের অবয়বের সম্পূর্ণতা, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা যাঁহারা করিবেন, তাঁহারা একদিকে যেরূপ নিজেদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গে উপরোক্ত বায়বীয় দ্রব্যটির বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সেইরূপ অন্যদিকে আবার ঐ বায়বীয় দ্রব্যটি হইতে যে মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বদা একটি রস ও তেজ মিশ্রিত আবরণের উদ্ভব হইতেছে এবং কখনও কখনও ঐ রস ও তেজ মিশ্রিত আবরণের উৎপত্তি মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বত্র, আর কখনও উহার উৎপত্তি যে মনুষ্যাবয়বের সর্ব্বাঙ্গের স্থানে স্থানে হইতেছে, তাহা অনুভব করা যাইবে।

এই রস ও তেজ-মিশ্রিত আবরণটি অত্যন্ত সূক্ষ্মতা সম্পন্ন বলিয়া উহা কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু উহাকে শরীরাভ্যন্তরস্থ মনের দ্বারা অনুভব করা যায়। উহাকে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না, অথচ শরীরাভ্যন্তরস্থ মনের দ্বারা অনুভব করা যায় বলিয়া রস ও তেজ-মিশ্রিত ঐ আবরণটিকে সংস্কৃত ভাষায় "অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য" বলা হইয়া থাকে। নিজ নিজ জিহ্বার নিম্নভাগে এবং নিম্নস্থ চোয়ালের উপরিভাগে যে চর্ম্মবিশেষের সূক্ষ্মতম পাতলা পর্দ্দা বিদ্যমান আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুভব করিতে পারিলেও অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু যে কি, তাহার কথঞ্চিৎ ধারণা করা সম্ভব হইবে।

এইরূপ [illegible] নিজ [illegible] বুদ্ধিগ্রাহ্য [illegible] বায়বীয় দ্রব্যটি [illegible] অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবরণটির [illegible] হইবে যে, বুদ্ধিগ্রাহ্য [illegible] গ্রাহ্য উপরোক্ত দ্রব্য দুইটি [illegible] আছে বলিয়া [illegible] একদিকে যেরূপ অনুভবশক্তি, প্রবৃত্তি এবং [illegible] অন্যদিকে [illegible] সেইরূপ [illegible], অস্থি, মাংস, [illegible] ও চর্ম্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহ [illegible] অনুভবশক্তি, প্রবৃত্তি ও [illegible] ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, অস্থি প্রভৃতি [illegible] মানুষের [illegible] হইতে [illegible] মানুষ [illegible] উৎপন্ন [illegible] প্রভৃতি [illegible] সম্পন্ন হইতে পারিতেছে।

[illegible] মানুষের অবয়ব [illegible] মানুষের [illegible] হইয়া থাকে [illegible] অনুভবশক্তি [illegible] বুদ্ধিগ্রাহ্য [illegible] একটি [illegible] একটি [illegible] ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অস্থি, মাংস, রক্ত, [illegible] ও চর্ম্ম, এই [illegible] অনুভবশক্তি, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, এই [illegible] কার্য্যশক্তি লইয়া মানুষের [illegible] সম্পূর্ণ।

মানুষের [illegible] প্রধান [illegible] বিদ্যমান আছে, [illegible] হইবে যে, অনুভবশক্তি, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ কার্য্যশক্তি হইতে মানুষের সমস্ত শক্তির উদ্ভব হইতেছে।

মানুষের কোন্ বস্তু বা কার্য্যশক্তিটির [illegible] বলা হইয়া থাকে, তাহা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে মানুষের অবয়ব যে উপরোক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই ত্রিবিধ বস্তু এবং অনুভবশক্তি, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ কার্য্যশক্তি লইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এই কথাটি যেরূপ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, সেইরূপ আবার এই ত্রিবিধ বস্তু ও ত্রিবিধ কার্য্যশক্তির মধ্যে কোন্‌টি কোন্‌টির পর উদ্ভব হইতেছে এবং কখনই বা [illegible]শক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

যে যে বস্তু ও কার্য্যশক্তি লইয়া মানুষের সম্পূর্ণতা, তাহার কোন্‌টি কোন্‌টির পর উদ্ভব হইতেছে এবং কখনই বা মননশক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে নিজ নিজ অবয়ব-মধ্যে উপরোক্ত ত্রিবিধ বস্তু ও কার্য্যশক্তি প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং কিরূপ ভাবে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার নিজের অবয়বে নূতন নূতন অবস্থার ও নূতন নূতন কার্য্যশক্তির উৎপত্তি হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।
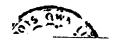
উপরোক্ত ত্রিবিধ বস্তু এবং ত্রিবিধ কর্ম্মশক্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, তাহার সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের মূল উৎস প্রথমোক্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি বায়বীয় দ্রব্য। সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া ঐ বায়বীয় দ্রব্যটি বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার নাম ব্যোম। 'ব্যোম' সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় যেমন মূল বস্তুটিকে 'ব্যোম' বলা হয়, সেইরূপ যে স্থানে 'ব্যোম' বিদ্যমান থাকে, সেই স্থানটিকেও ব্যোম বলা হইয়া থাকে। মূল বস্তুটিকে যদিও বাঙ্গালা ভাষায় "দ্রব্য" বলা হইতেছে, তথাপি উহা জড়পদার্থ নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলে কোন পদার্থকে 'জড়' বলা যায় না। "ব্যোম" (মূল বস্তুটি) সর্ব্বদা এমন কি ত্বকের অনুভবের অযোগ্য বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া উহাকে কোন ক্রমেই "জড়" বলা যায় না। পরন্তু উহাকে অজড় বলিতে হয়। যে-স্থানে ব্যোম বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই স্থানার্থে যখন ব্যোম ব্যবহৃত হয়, তখন তাহাকে জড় পদার্থ বলিলেও বলা যাইতে পারে।

ব্যোমের (মূল বস্তুটির) অন্তরে চলচ্ছক্তি, রস এবং তেজের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমের অন্তরে চলচ্ছক্তির বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া আপনা হইতেই উহা প্রথমতঃ চলচ্ছক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ব্যোম যখন চলচ্ছক্তিযুক্ত হয়, তখন উহাকে সংস্কৃত ভাষায় বায়ু বলা হইয়া থাকে। আধুনিক পণ্ডিতগণ "বায়ু" ও "মরুৎ" একই বস্তু মনে করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বায়ুকে "জড়" পদার্থ বলিয়া আখ্যাত করেন। কিন্তু, স্ফোটবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জানা যাইবে যে, "বায়ু" ও "মরুৎ" একার্থক নহে এবং "বায়ু"কে কোন ক্রমেই জড় পদা[র্থ] বলা চলে না, কারণ প্রকৃত বায়ু কখনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ[য়] নহে। উহা কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং ঋষিগণ উহাকে "অজড়" বস্তু বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

পরিদৃশ্যমান বায়ুমণ্ডল হইতে যে-বায়ু আমরা স্প[র্শ] করিয়া থাকি উহা খাঁটী বায়ু নহে। বায়ুর মধ্যে বা[য়ু] ছাড়া আর যে সমস্ত ভেজাল বায়বীয় দ্রব্য বিদ্যমান থাকে তাহাই আমাদের ত্বকের গ্রাহ্য হয় এবং আমরা ভুল করিয়া উহাকে "বায়ু" মনে করি এবং "জড়" পদার্থ বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকি।

"ব্যোম" যখন চলচ্ছক্তিযুক্ত হইয়া "বায়ু"র অবস্থা[য়] পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন উহার অন্তর্নিহিত রস ও তেজে[র] বীজাণুর বিদ্যমানতা বশতঃ উহা প্রথমতঃ শীতল স্পর্শযু[ক্ত] হইতে আরম্ভ করে এবং তাহার পর উষ্ণ স্পর্শযুক্ত হয়।

ব্যোম যখন শীতল স্পর্শ-যুক্ত হয়, তখনও উহা বায়বী[য়] অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তখন সংস্কৃত ভাষায় উহার না[ম] হয় "অপ্"। এ অপ্‌ও কোনও ইন্দ্রিয়, এমন কি ত্বকে[র] পর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় না। উহা একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য এব[ং] উহাও অজড়। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ ক[েহ] "অম্বু" ও "অপ্"কে একার্থক মনে করিয়া "অম্বু"কে জ[ড়] পদার্থ বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। স্ফোটবাদে[র] উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পিতামহ ও পিতার মধ্যে যতখা[নি] পার্থক্য, অম্বু ও অপের মধ্যেও ততখানি পার্থক্য বিদ্যমা[ন] রহিয়াছে।

ব্যোম যখন প্রথমতঃ শীতল স্পর্শযুক্ত হয়, তখন উহা যেমন বায়বীয় অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ উহা আবার যখন যুগপৎ উষ্ণ-স্পর্শযুক্ত হইতে আরম্ভ করে তখনও উহা বায়বীয় অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকিয়া যায়। একই বস্তু যুগপৎ শীতল ও উষ্ণ স্পর্শযুক্ত কিরূপে হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত জীবের "চক্ষু"। মানুষের চক্ষে যেরূপ শীতলতা বিদ্যমান আছে, সেইরূপ উহাতে যে আবা[র] উষ্ণতাও বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা মানুষের চক্ষের জল এবং অগ্নিবর্ণের রূপ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ব্যোম যখন উষ্ণ-স্পর্শযুক্ত হয়, তখন সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম হয় বহ্নি। ঐ বহ্নিও কোন ইন্দ্রিয়—এমন কি ত্বকের পর্য্যন্ত গ্রাহ্য হয় না। উহা একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং উহাও অজড়। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ "বহ্নি" ও "তেজ"কে একার্থক মনে করিয়া বহ্নিকে জড় পদার্থ বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন। ধাতু-বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে যেমন "অপ্" ও "অপে"র মধ্যের পার্থক্য বুঝিতে পারা সম্ভব হয়, সেইরূপ "বহ্নি" ও "তেজে"র মধ্যের পার্থক্যও বুঝিতে পারা যায়।

ব্যোম, অথবা বায়ু, অথবা অপ্, অথবা বহ্নি, এই চারিটি বস্তুর কোনটিই পরিদৃশ্যমান জগতে অথবা বায়ুমণ্ডলে, অথবা জীবশরীরে পৃথক রূপে এককভাবে দেখা যায় না। ঐ চারিটি বস্তু সর্ব্বদাই পরস্পরের মিশ্রিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ চারিটি বস্তুকে যে শুধু পৃথক রূপে একক-ভাবে দেখা যায় না তাহা নহে, কেবলমাত্র ঐ চারিটি বস্তুই মিলিত কোন অবস্থাতেও উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ চারিটি বস্তু সর্ব্বদাই পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া অপরাপর বস্তুর পরিদৃষ্ট হয়। ঐ চারিটি বস্তুর অপরাপর বস্তুর সংমিশ্রণে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু যে অবস্থায় কেবলমাত্র ঐ চারিটি বস্তুর সংমিশ্রণই বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থাটি কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না এবং ঐ অবস্থাটি কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে। কাজেই, যে অবস্থা কেবলমাত্র ব্যোম, বায়ু ও বহ্নির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সেই অবস্থাটিকে অজড় অবস্থাই বলিতে হইবে। যে অবস্থা কেবলমাত্র ব্যোম, বায়ু, অপ্ ও বহ্নির সংমিশ্রণে উদ্ভূত হইয়া থাকে, সংস্কৃত ভাষায় সেই অবস্থার নাম "ব্রহ্ম"।

কি কি লইয়া মানুষের অবয়বের সম্পূর্ণতা, তাহার আলোচনা-কালে আমরা যে মূল বায়বীয় দ্রব্যটির উল্লেখ করিয়াছি, অজড় ব্যোম, অজড় বায়ু, অজড় অপ্ ও অজড় বহ্নির মিশ্রণে যে অজড় ব্রহ্মের উদ্ভব হয়, সেই অজড় ব্রহ্মই ঐ মূল বায়বীয় দ্রব্য। এই অজড় ব্রহ্মই মানুষের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের মূল উৎস। ব্রহ্ম হইতে জীবের সত্তার উৎপত্তি হয় বলিয়া, উহাকে ভারতীয় ঋষিগণ "সৎ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

মননশক্তির উদ্ভব কখন হইয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে উপরোক্তভাবে জীবের সত্তা কোথা হইতে আসিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পর কিরূপ ভাবে জীব সত্তাবিশিষ্ট হইয়াছে এবং তাহার অবয়বে কোন্‌টির পর কোন্ বস্তুটি, অথবা কোন্ শক্তিটির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

পিতার শুক্র ও মাতার আর্ত্তবের সহিত, অথবা মানব-শরীরস্থ রস ও তেজের সহিত যখন ঐ অজড় ব্রহ্মের সংমিশ্রণের ফলে বহ্নি প্রকটিত হইতে থাকে, তখন রস ও তেজ-মিশ্রিত একটি অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবরণের উদ্ভব হয়, অথবা মানবশরীরস্থ ঐ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য আবরণের পরিবর্দ্ধন হইতে আরম্ভ করে। রস ও তেজ-মিশ্রিত ঐ অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আবরণের উদ্ভব হইবার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেরূপ জীবের সত্তার উদ্ভব হইয়া থাকে, অন্যদিকে আবার যুগপৎ তাহার অনুভবশক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। এই অনুভব-শক্তিকে জীবের 'চিৎ' বলা হইয়া থাকে। "অনুভব" অথবা "চিৎ"শক্তি হইতেই জীবের মননশক্তির উদ্ভব হয়। অনুভব অথবা "চিৎ"শক্তিকে সংস্কৃত ভাষায় "মনন শক্তি" বলা হইয়া থাকে। "চিৎ"শক্তিকে সময় সময় "চিত্ত"শক্তিও বলা হয়। ব্যোম, বায়ু, অপ্ ও বহ্নির মিশ্রণে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্রহ্ম, অর্থাৎ "সৎ" হইতে রস ও তেজ-মিশ্রিত অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আবরণের উদ্ভব হইবার পর যখন বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্রহ্ম এবং রস ও তেজ-মিশ্রিত অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আবরণের সংমিশ্রণের ফলে জীবের অনুভবশক্তি (অর্থাৎ "চিৎ"শক্তি)র উৎপত্তি হয়, তখন যুগপৎ জীবের শরীরে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের উন্মেষ হইতে থাকে। যখন ব্রহ্ম (অর্থাৎ চিৎ) এবং অনুভবশক্তি (অর্থাৎ চিত্তির) সংমিশ্রণে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত এবং চর্ম্মের উন্মেষ হয়, তখনই যুগপৎ চিত্ত, অথবা প্রবৃত্তি, অথবা ইন্দ্রিয়শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। এই ইন্দ্রিয়শক্তির উন্মেষ হইবার পর স্বভাবতঃই জীব আনন্দ-প্রয়াসী হইয়া পড়ে।

"সৎ" (অর্থাৎ বস্তু) লইয়া জীবের সৃষ্টি, "চিৎ" (অর্থাৎ অনুভবশক্তি অথবা মননশক্তি) লইয়া তাহার স্থিতি এবং "চিত্ত" অথবা "প্রবৃত্তি" অথবা "আনন্দ" লইয়া তাহার পরিবর্ত্তন অথবা বিনাশ হইয়া থাকে। ইহারই জন্য জীবকে ভারতীয় ঋষি সচ্চিদানন্দময় বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তন অথবা বিনাশ কোন্ কারণে এবং কি প্রকারে সাধিত হইতেছে, তাহা নিজ শরীরে এবং জীবনে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইলে আগে দেখা যাইবে যে, মানুষ যখন আনন্দ প্রয়াসী হইয়া চিত্ত, অথবা প্রবৃত্তির (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের) বশীভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহার রাগ ও দ্বেষের উদ্ভব হয় এবং তখন তাহার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী আনন্দ পাওয়া অসম্ভব হয়। আনন্দের এতাদৃশ ক্ষণ-স্থায়িত্ব সত্ত্বেও যখন রাগ ও দ্বেষ, অথবা আনন্দের প্রয়াস মানুষ ছাড়িয়া দিতে অক্ষম হয়, তখন তিল তিল করিয়া মানুষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। আর, যখন আনন্দের উপরোক্ত ক্ষণ স্থায়িত্ব বশতঃ কেন কখনও বা আনন্দ ক্ষণ স্থায়ী, কখনও বা দীর্ঘস্থায়ী হয়, "আনন্দ" নামক অবস্থাটি কাহাকে বলে এবং কোন্ অবস্থায়ই বা আনন্দের অভাব হয়, এবংবিধ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে, তখন মানুষের বিনাশ না হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করে।

আনন্দের প্রয়াস, অথবা রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহার অনুসন্ধানে মানুষ যখন ব্যাপৃত হয় এবং কেন কখনও বা আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, আর কখনও বা উহা দীর্ঘস্থায়ী হয়, এবংবিধ প্রশ্নের উত্তরের প্রয়াস যখন তাহার অন্যতম কার্য্য হইয়া পড়ে, তখন মানুষের "চৈতন্যের" (অর্থাৎ বুদ্ধির) উদয় হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। চৈতন্যের উদয় হইলে, জীবনধারণের জন্য আহার-বিহার প্রভৃতি যাহা কিছু মানুষ করিয়া থাকে, তাহা কেন পরিত্যাগ না করিয়া, অথবা অন্য কোন ভাবে না করিয়া, তাদৃশ ভাবে করিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধে মানুষের মনে প্রশ্নের উদয় হয়। মানুষ কেন তাহার জীবনধারণের জন্য আহার-বিহারে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হয়, এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানুষের কেন অনুভূতির (অর্থাৎ চিত্তির) অথবা মননের উদয় হয়, তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, চিত্ত* অথবা প্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য মানুষের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ। ঐ চিত্ত অথবা প্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যখন বুদ্ধি অথবা চৈতন্যের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বাধীন ভাবে চলিতে থাকে, তখন তাহার পরিণাম হয় বিপর্য্যয় অর্থাৎ কেবল ভ্রমাত্মক চাল চলন, বিকল্প অর্থাৎ কেবল ভ্রমাত্মক জ্ঞান এবং নিদ্রা অর্থাৎ স্মরণশক্তির লোপ, আলস্য ইত্যাদি। এই অবস্থায় তিল তিল করিয়া মানুষ সর্ব্বনাশের সম্মুখীন হইতে থাকে। আর, ঐ চিত্ত যখন চৈতন্য অথবা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে, তখন তাহার পরিণাম হয় "প্রমাণ" অর্থাৎ নূতন নূতন জ্ঞান লাভ এবং স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণশক্তির বৃদ্ধি। কাজেই বলিতে পারা যায় যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিণাম হয় তিল তিল করিয়া সর্ব্বনাশ, নতুবা উন্নতির দিক পরিবর্ত্তন। পাতঞ্জল দর্শনের প্রারম্ভে "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তির কেন উদ্ভব হয়, তাহা কার্য্যতঃ উপলব্ধি করিবার নাম "যোগ"), "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ" (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি পাঁচ প্রকারে কখনও ক্লেশের উৎপাদন করে, আবার ক্লেশের অপনোদন করে), "প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঐ পাঁচ প্রকার-বৃত্তির নাম প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি। এই তিনটি সূত্র যাঁহারা যথাযথ অর্থে চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদের উপরোক্ত কথার তাৎপর্য্য সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া পড়িলে আরও বুঝা যাইবে যে, অবস্থাবিশেষে ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের ফলে বুদ্ধি-শক্তির উদয় হয়। বুদ্ধিশক্তির ফলে মানুষের সৃষ্টি কেন

* আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ "মন"কে "চিত্ত" বলিয়া থাকেন। কোটবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে, "চিত্ত" বলিতে একমাত্র প্রবৃত্তি অথবা ইন্দ্রিয়কেই বুঝিতে হইবে। "চিত্ত" শব্দের অর্থ "মন" কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। শুধু যে মন ও বুদ্ধিকে প্রকাশ করিবার জন্যই ঐ আবরণটিকে সম্যক্ ভাবে অনুভব করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, মানুষের শরীর যাহাতে সহজে রুগ্ন না হইতে পারে, তাহা করিবার জন্যও ঐ আবরণটিকে অনুভব করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা লইয়াই যে মানুষের সুস্থতা, তাহা কোন্ অবস্থায় মানুষ সুস্থ থাকে আর কোন্ অবস্থায় অসুস্থ হইয়া পড়ে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে। বায়ু, পিত্ত ও কফের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে, তাহা যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা রস হইতে যে কফের উৎপত্তি হয় এবং তেজ হইতে যে পিত্তের উৎপত্তি হয় এবং পরস্পর ভারতম্য রস ও তেজের সমতার যে বায়ুর সমতার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা বিদিত আছেন। কাজেই যখন দেখা যাইতেছে যে, মানুষের সর্ব্বশরীরব্যাপী রস ও তেজ-মিশ্রিত অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই আবরণটি মানুষের সর্ব্বশরীরব্যাপী রস ও তেজের উদয়, তখন ঐ আবরণটিকে সর্ব্বতোভাবে অনুভব করিতে পারিলে যে শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফের সমতা রক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে, ইহা সহজেই অনুমানের যোগ্য। ইহারই জন্য কোন্ কোন্ উপায়ে মানুষের পক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে অনুভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার যথেষ্ট অনুসন্ধান ভারতীয় ঋষিগণ করিয়াছেন।

ঐ অনুসন্ধান যে ভারতীয় ঋষিগণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের বিভিন্নবিষয়ক গ্রন্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে প্রতীয়মান হইবে। সমগ্র মানবজাতির ঐকান্তিক আরাধনার যোগ্য ঐ ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত বেদে সর্ব্বশরীরব্যাপী অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐ আবরণের নাম দিয়াছেন "স্বঃ" (গায়ত্রীর তৃতীয় মন্ত্র)। তন্ত্রের প্রকরণে উহার নাম হইয়াছে বটু-কায। মীমাংসায় উহার নাম হইয়াছে মায়া। আর, পুরাণে উহার নাম হইয়াছে মহা-মায়া। উহা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং দর্শন যোগ্য নহে বলিয়া ষড়্‌দর্শনের কোন দর্শনে উহার আলোচনা লিপিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহারা বেদ, তন্ত্র, মীমাংসা এবং পুরাণ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা "স্বঃ", অথবা "বটু-কায", অথবা "মায়া", অথবা "মহা-মায়া"র আলোচনায় যে কত চিন্তা ও অনুভূতির খাদ্য মানবসমাজকে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং তৎসাহায্যে উহা প্রত্যক্ষ করা যে কত সহজসাধ্য হইতে পারে, ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

সর্ব্বশরীরব্যাপী অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস ও তেজ-মিশ্রিত ঐ আবরণ, অথবা "স্বঃ" অথবা বটু কায, অথবা মায়া, অথবা মহামায়া যে কি বস্তু, কিরূপে উহার উৎপত্তি হইতেছে এবং কোন্ কোন্ কারণে যে উহা সহজে মানুষের অনুভব-যোগ্য হয় না তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিশদভাবে ও সহজবোধ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে "মার্কণ্ডেয় পুরাণে"। যে যে কারণে উহা অনায়াসে মানবের অনুভব যোগ্য হয় না, সেই সেই কারণ কি করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারে, তাহার বিশদ আলোচনা রহিয়াছে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত 'চণ্ডী'তে। ইহারই জন্য বিধি-বদ্ধভাবে চণ্ডী-পাঠ ব্রাহ্মণ সন্তানের এত আদরণীয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্য অদৃষ্টের এতই পরিহাস যে, এখনও সেই চণ্ডী বিদ্যমান রহিয়াছে, চণ্ডী পাঠের রীতিও বর্তমান রহিয়াছে, কোন কোন মানুষের প্রাণে চণ্ডী পাঠের সফলতার জন্য অভিমানেরও উদ্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু কেহই আর চণ্ডীর মধ্যে যে অত প্রয়োজনীয় জিনিষ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আদৌ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। ভাষা বুঝিবার যে পদ্ধতিতে অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা বুদ্ধি-গ্রাহ্যবিষয়ক ভাষা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়, সেই পদ্ধতি ইহারা অবগত নহেন বলিয়া ইহাঁরা পুরাণকে লৌকিক ভাষা বুঝিবার পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করিয়া ঐ মহামূল্য গ্রন্থগুলিকে একদিকে যেরূপ অসত্য আজগুবি গল্পের ভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার তৎপ্রণেতা সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকে পরোক্ষভাবে অসত্যবাদী বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। ফলে, ইহাঁদিগকে প্রায়শঃ নির্ব্বংশ ও হতশ্রী হইতে হইয়াছে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, সমগ্র মনুষ্য সমাজের আরাধনার যোগ্য ঋষিগণকে পর্য্যন্ত যাহারা পরোক্ষভাবে সন্দেহের ও অবজ্ঞার যোগ্য করিয়া তুলিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাহারা পর্য্যন্ত পণ্ডিত বলিয়া অভিহিত হইতে পারে এবং তাহারাও ভুক্ত বলিয়া সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র

এবং তাহাতে অনভ্যস্ততা। মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ আবরণটি অতীব পাতলা। উহা সামান্য উত্তেজনায় অথবা শরীরমধ্যস্থ বায়ুর সামান্য কম্পনে কম্পিত হইয়া অসমান হইয়া পড়ে এবং তখন প্রত্যক্ষের অযোগ্য হয়। যাঁহারা সামান্য ভাবেও কামক্রোধাদির দাস, তাঁহাদের পক্ষে উহাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে।

(৪) বায়ুমণ্ডলের বায়ুর অবিশুদ্ধতা। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের স্বীয় উত্তেজনাবশতঃ যেমন শরীরমধ্যস্থ বায়ুর অসমতা সংঘটিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার বায়ুমণ্ডলের বায়ুর সহিত কোন অবিশুদ্ধ বস্তু অত্যধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইলেও শরীরস্থ বায়ু অসমতা লাভ করিয়া, ঐ আবরণটিকে প্রকম্পিত করিতে পারে এবং তখন উহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইয়া থাকে।

কাযেই বলিতে হইবে যে, মানুষ যাহাতে অশান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সর্ব্বদা শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন, অন্যদিকে আবার বায়ুমণ্ডল যাহাতে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত থাকে, সঙ্ঘগত তদনুরূপ সংগঠনেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ব্যক্তিগত কোন্ শিক্ষায় অশান্তি দূর করিয়া সর্ব্বদা শান্তি বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কি কি বস্তু ও কার্য্যশক্তি লইয়া মনুষ্যাবয়বের সম্পূর্ণতা, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি উহার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়

মানুষ কি করিয়া অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে শান্তি লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ অতীব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ আলোচনা যেরূপ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ উহা আবার প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষায়ও লিপিবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। উহার বিস্মৃতি-নিবন্ধন সমস্ত কথা এই প্রবন্ধে প্রকাশ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

শরীরের সংজ্ঞা

মানুষ যে "সচ্চিদানন্দময়", বুদ্ধিগ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এই ত্রিবিধ বস্তু এবং চিৎ (মন), চিত্ (ইন্দ্রিয়) ও চৈতন্য (বুদ্ধি), এই ত্রিবিধ কার্য্য-শক্তি লইয়া যে মানুষের অবয়বের সম্পূর্ণতা, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের অবয়বের কতখানি যে তাহার শরীর, তাহা বুঝা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। স্ফোটের বিধি অনুসারে, অবয়বের যে-অংশের উৎপত্তি হয় মানুষের সত্তা হইতে এবং যে-অংশের বিদ্যমানতা বশতঃ অবয়বান্তর্ভুক্ত বস্তু ও তেজের হ্রাস-বৃদ্ধি সর্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে, অবয়বের সেই অংশের নাম মানুষের শরীর।

সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, মানুষের অবয়বে যে জড় বস্তু, এবং অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'স্ব', অথবা বটু-কায়, অথবা মায়া, অপর, মত-মায়া বিদ্যমান আছে এবং সময় সময় যে "চৈতন্য"শক্তির অনুভব হয়, তাহা বাদ দিলে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্ম বিদ্যমান থাকে এবং যে যে অবস্থায় মানুষের চিৎ ও চিত্তশক্তির প্রকটতা বিদ্যমান থাকে, অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষের অবয়বস্থ মেদাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর চৈতন্য-বিলুপ্তি হইয়া কেবলমাত্র চিৎ ও চিত্তশক্তিই বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থায় ঐ মেদাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকে শরীর বলা হইয়া থাকে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ "শরীর" "দেহ", "অবয়ব"—এই তিনটি শব্দকে একার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ফোট-বাদ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ঐ তিনটি শব্দের সর্ব্বতোভাবে একার্থক হওয়া তো দূরের কথা, উহার কোন দুইটি শব্দও যে সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে, তাহা বুঝা যাইবে।

মানুষের অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিতে কি কি বুঝায় অবয়বের কতখানি তাহার "দেহ"এবং কতখানিই বা তাহার "শরীর", তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে অথর্ব্ববেদে অনেক স্থলের আলোচনা করিতে হইবে। ঐ আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু উহা অতীব বিস্তৃত। অথচ

অথবা তাহার কোনটিতে কোনরূপ যন্ত্রণা পরিলক্ষিত না ও হইতে পারে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, মেদ, অস্থি প্রভৃতি শরীরের অংশগুলির কোনটি না কোনটির কখনও বা বিকৃত চাল চলন, কখনও বা বিকৃত রূপ, কখনও বা বিকৃত যন্ত্রণা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যখন শরীরস্থ দোষ শরীরাভ্যন্তরে এতাদৃশ ভাবে লুক্কায়িত থাকে যে, মেদ, অস্থি প্রভৃতির কোনটিতেই কোনরূপ বিকৃত চাল-চলন, অথবা বিকৃত রূপ, অথবা কোনরূপ যন্ত্রণার অনুভূতি পরিলক্ষিত হয় না, তখন ঐ দোষ সাম্যভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে এবং এই অবস্থাকে স্বাস্থ্যের অবস্থা, অথবা আরোগ্যতা বলা হইয়া থাকে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই অবস্থা শরীরের স্বাস্থ্যের, অথবা আরোগ্যের অবস্থা বটে, কিন্তু মনের শান্তির অবস্থা না হইয়া অশান্তির অথবা অস্বাস্থ্যের অবস্থা হইলেও হইতে পারে।

যখন শরীরস্থ দোষ শরীরাভ্যন্তরে লুক্কায়িত না থাকিয়া মেদ, অস্থি প্রভৃতির কোনটি না কোনটিতে, হয় বিকৃত চাল-চলন, অথবা বিকৃত রূপ, অথবা কোনরূপ যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতির উদ্ভব করে, তখন ঐ দোষ বৈষম্যভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে এবং শরীরের ঐ অবস্থাকে অস্বাস্থ্য, অথবা রোগের অবস্থা বলিতে হইবে।

কি উপায়ে মানুষ তাহার শারীরিক অস্বাস্থ্যের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সর্ব্বদা স্বাস্থ্যোপভোগ করিতে সক্ষম হইতে পারে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্যও যাহাতে মানুষের সর্ব্বশরীরব্যাপী অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য রস ও তেজ দ্বারা আবরণটি সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ-যোগ্য হয়, তাহার সাধন করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কাজেই বলিতে হইবে যে, শরীর যাহাতে অসুস্থ না হইয়া সর্ব্বদা স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলেও আত্মতত্ত্বের জ্ঞান এবং আত্মোপলব্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়।

আগামী সংখ্যায় অর্থ ও অর্থের স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

ব্রাহ্মণ

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

ছিল একদিন—
ঊর্দ্ধে তুমি, অতি ঊর্দ্ধে ছিলে সমাসীন
হে ব্রাহ্মণ! হে সমাজ-পতি!
মানুষের মঙ্গলের লাগি' সহিয়াছ কত নির্যাতন
মাথা পাতি' লইয়াছ ক্ষতি;
—তুশ্চর তপস্যা ব্রতী, তোমার দুয়ারে
বারে বারে,
মানুষ এনেছে পূজা, রাখিয়াছে সম্ভ্রমের নতি।
তুমি কিন্তু সে শ্রদ্ধার লক্ষ্য হ'তে দূরে
আপন প্রাচ্ছন্ন পুরে,
নিষ্কাম বৈরাগ্যপূত হোমশিখা জ্বালি'
আপনারে নিবেদিয়া ব্রহ্মপদে ঢালি'
বসেছ নিশ্চল হ'য়ে আপনার মনে—
মৃত্যুশীল অনিত্যের গৃহের প্রাঙ্গণে
দিনে দিনে অমৃতেরে জেনেছ গোপনে,
অমৃতের পুত্র বলি' ডাকিয়াছ সকল মানবে—
এক মন্ত্রে বাঁধিয়াছ যুধ্যমান দেবতা-দানবে—,

সংসারের জড়ীভূত জটিলতামাঝে
যত তার ভাল-মন্দ দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে,
প্রাত্যহিক অশোভন আলোড়ন যত,
[illegible] ক্লেশ কণ্টকের ক্ষত
অমৃতে গরলে, আর শান্তি কোলাহলে,
সর্ব্বকাজে সকলের থাকি' মধ্যস্থলে,
স্থির লক্ষ্য মানব মঙ্গলে,
করেছ মধুর সব—তবু আজীবন
কিছুতে হওনি লিপ্ত,—পদ্মপত্রে সলিল যেমন।
সর্ব্বমাঝে বিস্তারিয়া আপনার প্রাণ
সবার অলক্ষ্য হ'তে অনুক্ষণ খুঁজেছ নির্ব্বাণ।

এ মর্ত্ত্যের পুঞ্জীভূত ধূলিস্তূপ হ'তে
অতি উচ্চে, অতি দূরে অনন্তের পথে
রচিয়াছ আপন আলয়,
তথাপি এ ধরণীর ধূলা হ'তে ভিন্ন তাহা নয়
ভিত্তি তার মৃত্তিকায় কোনকালে হয় নাই ক্ষয়
মাটিতেই আনিয়াছ স্বরগের সত্য পরিচয়।
যুগে যুগে এ মাটির বুকে
দুঃখে সুখে,
সমভাবে মানুষের সাধিয়াছ ভাল
প্রেমের প্রদীপ্ত আলো
জ্বালায়ে তুলেছ ধরি' জ্ঞান-বর্ত্তিকায়
নির্ব্বিলাস শুচিতার অকলপ্রচ্ছায়
ধরণীর দিকে দিকে প্রোজ্জ্বল শিখায়

সৃষ্টিতলে অতুলন তোমার উপস্থাপন
অনির্ব্বাণ জ্ঞান।

* * * * *

আজি আর নাই তুমি
বহুশত শতাব্দীর পরে
কালের নিশ্বাস করে—
হারায়ে গিয়াছে তব প্রাণ;
মৃত্যুঞ্জয়ী সে তোমার মহা সামগান
নীরব হইয়া গেছে যুগসন্ধি-তলে।
অতি ক্ষীণ ধ্বনিটুকু শুধু
একেলা কাঁদিয়া ফিরে শুষ্ক অশ্রুজলে
গীতশেষ ঝঙ্কারের প্রায়;
বেদনার দীর্ঘশ্বাসে ব্যথা তার কাঁদে হায়, হায়!—
নাই 'বেদ,' নাহি সে 'ব্রাহ্মণ', নাই 'শ্রুতি' 'স্মৃতি',
মহর্ষি 'বশিষ্ঠ' নাই, 'বিশ্বামিত্র' নাই আজ, নাই সে 'অদিতি'।
জগতের আদি বাণী যাঁর পুণ্য মুখরন্ধ্র হ'তে
সহসা বিমুক্ত-বাধা উচ্ছ্বসিত নির্ঝরের প্রায়,
করুণায় গলিত ধারায়,
আবেগ-চঞ্চল স্রোতে
বাহিরিয়া এসেছিল সৌম্যতম প্রশান্ত ভাষায়
অনুষ্টুভ ছন্দের গাঁথায়,—
সে মহা-তাপস কবি অমর 'বাল্মীকি'
ঋষিশ্রেষ্ঠ 'যাজ্ঞবল্ক', 'পরাশর' আর,
জ্ঞান-শ্রেষ্ঠ 'ব্যাসদেব,' ব্রহ্মতেজা ভৃগুর তনয়, —
—একবিংশ বার যিনি নিক্ষত্রিয় করিলা সংসার
লুপ্ত করি' দানবের আসুরিক শক্তির বিকার,
—সবই আজি পাইয়াছে লয়।
কোথায় 'দধীচি' আজ? আপনার সুমহান্ আত্মদান মাঝে—
নিত্য যার পুণ্যস্মৃতি সত্য হ'য়ে আছে
মৃত্যুতেও চিরজীব যে দেহ-কঙ্কালে
অসুর-দলন লাগি প্রলয়ের বজ্রশিখা জ্বালে,
স্বর্গের পতনকালে
দেবতার করধৃত মশালে মশালে
লেলিহান্ যে বহ্নির রক্তশিখা দিকচক্রবালে
প্রচ্ছন্ন ধ্বংসের বেশে ভস্মের শ্মশানে
সর্ব্ববিঘ্ন অপগত চিরশান্তি আনে,
কোথা সেই আত্মাহুতি?—কে দিবে উত্তর?
জীর্ণ কলেবর,
ছিন্নপত্র, অবজ্ঞাত পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থ মাঝে
ততোধিক ছিন্ন তার
বিলুপ্ত স্মৃতির ভার
অপাঠ্যের পংক্তি মাঝে প্রচ্ছন্ন বিরাজে।

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাকামী চির শুভঙ্কর,
মহাজ্ঞানী আরও কত দেবতুল্য নর,
ভারতের প্রতি তীর্থে, প্রতি ধূলিকণা তলে
আজিও উজলে
যাঁর পুণ্য নাম,
যাঁহাদের মহাবাণী নিষ্কাম মহান্
সিন্ধু হ'তে কুমারিকা আসমুদ্রহিমাচল স্থান
প্রকম্পিয়া একদিন উঠেছিল হায়
বজ্ররবে দীপ্তকণ্ঠে স্বধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়—
আজিও পর্ব্বতশীর্ষে, শৈলপাদপীঠে
হিমাদ্রির অগম্য গুহায়
অরণ্যে কন্দরে
কত দেব-মানবের পুণ্যময় নাম
ধ্বনিতেছে শত শত তীর্থের অন্তরে
নাই তারা, কেহ নাই—কেহ নাই আর—
তাহাদের পূত যজ্ঞস্থলে—
শিবাদল করিছে চীৎকার,
তাদের অতুল সৃষ্টি, অতুলন জ্ঞানের সম্ভার,
কালের মৃত্তিকাতলে লভিয়াছে সমাধি অপার।

—আজিকার ব্রাহ্মণের দল
যোগভ্রষ্ট, ক্ষীণ, নিঃসম্বল
নির্ব্বাণ-বিমুখ,—আর
ঊর্দ্ধশিখা, উপবীত-সার;
অধম, কুটিল, হীন আচারের স্তূপে
বন্দী তারা নিমজ্জিত নরকের অন্ধতম কূপে।

———

প্রলয়-পয়োধিজলে

—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধ

স্পেনে ধ্বংসলীলা

গত ছ'মাসের মধ্যে স্পেনে যে ধ্বংসলীলা চলেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য,—আলমারা ও গুয়ের্নিকা ধ্বংস এবং বিলবাও দখল।

রুশ জাপান মোলাকাৎ (সাউথ ওয়েলস্ একো। কার্ডিফ)।

মে মাসের শেষাশেষি স্পেনের সরকারী বিমান বাহিনী যখন ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বেলিয়ারিক নৌ-কেন্দ্র পালমার উপর বোমা ফেলতে যাচ্ছিল, তখন জার্মান অফিসাররা বলেন যে, বিমান-বাহিনী এত নীচুতে এবং আশঙ্কাজনকভাবে চক্র দিয়ে জার্মান রণতরীর উপর দিয়ে গেছে যে, ভবিষ্যতে এ-রকম করলে তারা শাস্তি পাবে। পরের বার স্পেন-বাহিনী আবার যখন ওই ভাবে যায়, তখন জার্মান ছোট রণতরী ডয়েচ্‌লাণ্ড গুলি ছোঁড়ে। এর উত্তরে স্পেন পক্ষ থেকেও কয়েকটি বোমা ফেলা হয়। তাতে ডয়েচ্‌লাণ্ডের ২৩ জন নাবিক নিহত ও ৮৩ জন আহত হয়।

খবরটা বেতারে পৌছুনো মাত্র হের হিটলার পাঁচ ঘণ্টাকাল জার্মানীর সমরনেতাদের নিয়ে পরামর্শের পর ভ্যালেন্সিয়া সরকারের এই 'criminal act'-এর প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলেন। জার্মান ক্রুজার থেকে এডমিরাল শিয়ারের নেতৃত্বে আধঘণ্টাকাল গুলিবর্ষণ হয়েছিল। তার ফলে আলমীরা ধ্বংস হয়ে গেল, আর হতাহতের সংখ্যা রইল না।

গুয়ের্নিকা ও বিলবাও

গুয়ের্নিকা [illegible] বাস্ক সাধারণতন্ত্রের রাজধানী বিলবাও অঞ্চলের প্রধান নগর। বাস্ক স্পেনের একটা প্রদেশ। যদিও এদের দেশ স্পেনেরই অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, এমন কি ভাষাতেও স্পেনীয়দের সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিল নেই। শুধু স্পেনীয় নয়, ইউরোপের সব জাতি থেকেই এরা স্বতন্ত্র। এদের স্বাধীনতা প্রীতি আমাদের

আগামী যুগের বিদ্যালয়: শিক্ষক (ছাত্রের উদ্দেশে) "ওহে ছোকরা, গ্যাস-মাস্কের ভিতর দিয়েও বুঝি। আবার মুখ ভেংচাবে তো ঠেঙানি খাবে।" (নকেল্‌ন্ পাস্টের, বার্লিন্)।

প্রাচীন রাজপুত জাতির স্বাধীনতা প্রীতির ন্যায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ। গত অক্টোবর মাসে এরা স্পেন থেকে বিচ্ছিন্ন হ

বাস্ক-প্রদেশকে স্বায়ত্ত-শাসনশীল ব'লে ঘোষণা করে। এবং অন্যান্য দুর্ব্বল জাতির ন্যায় সেই অপরাধেরই বুঝি প্রায়শ্চিত্ত করলে। বিলবাও-এর লৌহ-বেষ্টনী (Iron Ring) এ যাবৎ অজেয় ব'লেই পরিচিত ছিল। ফাসিষ্ট-জার্ম্মানীর পৃষ্ঠপোষিত বিদ্রোহী-বাহিনীর হাতে সে গৌরবেরও অবসান হ'ল। ধূলিসাৎ হ'ল গুয়েণিকা, বিলবাও হ'ল শ্মশান।

আক্রমণের পদ্ধতি

ভ্যালাডোলিড ক্যাথিড্রালের ডীন ফাদার এলবার্ট ওনেনডিয়া গুয়েণিকা ধ্বংস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন :

স্পেন—অবশ্য দেখছেন, আপনার তো অভিজ্ঞতা আছে, পরাবর্ণ ... আবিসিনিয়ার সম্রাট টিঁকে থাকুন, যতক্ষণ না পালাবার সুযোগ পান—[ইল্ কোর টৌরেন্টি (ফ্লোরেন্স)]।

"আক্রমণের পদ্ধতি সর্ব্বত্র এক রকম। প্রথমে মেশিন গান, তারপরে বোমা, সর্ব্বশেষ অগ্নিকাণ্ড। এরোপ্লেন অত্যন্ত নীচে নেমে এসে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করে, ধোঁয়ায় সমস্ত অন্ধকার হয়ে যায়। সারা শহর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আর সেই পরিব্যাপ্ত অগ্নিরাশির মধ্যে স্ত্রীলোক, শিশু এবং বৃদ্ধ জড়াজড়ি ক'রে পুড়ে মরে। তাদের করুণ আর্ত্তনাদে নৈশ গগন পরিপূর্ণ হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে ভয়ভীত নরনারী দুই হাত আকাশে তুলে বুঝি বা ভগবানের করুণা ভিক্ষা করে।"

'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে'র ক্যানন লিখেছেন :

"গুয়েণিকায় যে-কাণ্ডের অনুষ্ঠান হ'ল, ইউরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, প্রত্যেক বড় শহরেই অনুরূপ কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হবে। আমি হয় তো দেখে যেতে পারব, ম্যাঞ্চেষ্টার দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। ভয়ভীত জনতা সেন্ট্রাল ও লণ্ডন রোড ষ্টেশনে ছুটে পালাচ্ছে। আর সেই পলায়নপর জনতার মাথার উপরে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি হচ্ছে। গুয়েণিকায় আমরা শুধু ভাবী মহাযুদ্ধের একটা অগ্রিম নমুনা পেলাম।"

কথাটা ভেবে দেখবার।

বিশেষ ভাবে জানা গেছে, গুয়েণিকা ও বিলবাও ধ্বংসে ১০০ খানি জার্ম্মান এরোপ্লেন ব্যবহৃত হয়েছে। আর বিদ্রোহী-বাহিনীর সঙ্গেও ৯০ হাজার জার্ম্মান 'স্বেচ্ছাসেবক' ছিল। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এর কোনো প্রতিবাদ করেনি।

বৃটেনের কাছে আবেদন

দুর্ব্বল এবং প্রায় নিরস্ত্র বাস্ক জাতি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তথাপি শেষ পর্য্যন্ত লড়েছে। প্রায় ২০ হাজার বাস্ক-শিশু, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বিভিন্ন দেশে স্থানান্তরিত করা হয়। ৫ হাজারের উপর বাস্ক বিদ্রোহী-বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। অবশেষে প্রায় পক্ষকাল পরে বিলবাও বিদ্রোহীর করতল-গত হয়।

যুদ্ধকালে বিলবাও-এর মন্ত্রিসভা বৃটেন ও ফ্রান্সকে শুধু এই অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, আবালবৃদ্ধ-বনিতা-নির্ব্বিশেষে 'civil', অসামরিক নাগরিকের উপর লোমহর্ষণ প্রচলিত রণ-নীতি নয়, শুধু এদের নির্ব্বিঘ্নে বিলবাও-ত্যাগের সুযোগ দেওয়া হোক। এই আবেদন মিঃ ইডেনের মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল কি না জানি না। কিন্তু গত ২৫শে জুন প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন কমন্স সভায় বলেছেন :—

"ইউরোপের শান্তিরক্ষার জন্য সকলে যেন সাবধানতা, ধৈর্য্য ও সংযম অবলম্বন করেন। অবস্থা গুরুতর হলেও নিরাশ হবার কারণ নেই। বিভিন্ন দেশ স্পেনের কোন না কোন পক্ষের জয়লাভ দেখতে চান সত্য, কিন্তু কেউই আর একটা মহাযুদ্ধ চান না। বর্ত্তমান যুদ্ধ স্পেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ইউরোপের শান্তি রক্ষা করাই বৃটিশ সরকারের একমাত্র নীতি।"

ঐ সভাতেই পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ এন্টনী ইডেন বলেছেন—

"নিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করলে অস্ত্র-শস্ত্রের পরিমাণ ও সৈন্যসংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। তার ফলে, বাইরের শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হবে।"

প্রতিবাদ জানাতে লজ্জা বোধ করছে। যে লয়েড জর্জ বারুদের স্তূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রতিবাদ জানিয়েছেন, আয়র্লণ্ডে তাঁরই মন্ত্রিত্বকালীন কার্য্য-কলাপের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে তদন্ত কমিশনকে বলতে হয়েছিল :

"We were filled with shame, that in the name of law and order servants of the British Government should be guilty of besmirching in the eyes of Ireland the honesty of the British people."

বাল্ডুইন : "পিছনে ওরা ইটালীয়ান বুঝি ?"
চেম্বারলেন : "কা জানে।" [ডেলি হেরাল্ড (লণ্ডন)]

অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের কর্ম্মচারিগণ আইন ও শৃঙ্খলার নামে আয়র্লণ্ডের কাছে বৃটিশ জাতির সাধুতায় যে কলঙ্ক-লেপন করেছে, তাতে আমরা বিশেষ লজ্জা অনুভব করছি।

নিরপেক্ষ-নীতি

আশ্চর্য্য এই যে, দুর্ব্বল শক্তিপুঞ্জের চোখের উপর অত বড় একটা পৈশাচিক কাণ্ডের অনুষ্ঠানের পরেও নিরপেক্ষ-কমিটীর 'scraps of paper' (নথি-পত্র) ভূমধ্যসাগরের জলে ভেসে গেল না ! এর পরেও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কথা চালাবার প্রয়াস যে কত বড় ক্লৈব্যের পরিচয়, তাও কেউ ভেবে দেখলেন না। শুধু নিরপেক্ষতারই নয়, অস্ত্র-সঙ্কোচের কথাও উঠেছে। উত্তরে জার্ম্মানীর ভাগ্য-বিধাতা হের হিটলারের বক্তৃতার একাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"Germany has been asked why she does not disarm. The answer is Germany has become distrustful In the past the other nations could have had the blessings of disarmament when Germany was disarmed They ignored it and only recognised this blessing when Germany re-armed."

অর্থাৎ, আজ অস্ত্রসঙ্কোচের কথা বলছ, কিন্তু জার্ম্মানীর আর তোমাদের উপর বিশ্বাস নেই। জার্ম্মানী যখন নিরস্ত্র ছিল, তখন ত' কই অস্ত্রসঙ্কোচ করতে পার নি ? এখন তাকে সুসজ্জিত দেখে অস্ত্রসঙ্কোচের কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে না ?

অস্ত্রসঙ্কোচ এবং শান্তিনীতি সম্বন্ধে হের হিটলারের মতামত তাঁর স্বরচিত *Mein Kampf*-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে। তাতে আছে :

"The pacifist humane idea may be quite good, after the most superior persons have conquered the world in such a measure as makes them its exclusive master. Any one who really from his heart desires victory of the pacifist idea in this world should support by every means the conquest of the world by the Germans."

এর চেয়ে স্পষ্ট মত আর হতে পারে না। আগে জার্ম্মানী সমগ্র পৃথিবী জয় করুক, তাতে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করুক, তারপরে শান্তির কথা উঠবে। এ কথা যে বিশ্বাস না করে, বুঝতে হবে সে মনে-প্রাণে শান্তি চায় না। একেই বলে, 'war for peace', আর এ কথা জেনেও মিঃ এণ্টনী ইডেন একবার ছুটছেন হিটলারের কাছে, একবার মুসোলিনির কাছে, —যাদের কাছে 'A handful of force is better than a sackful of justice'

স্পেনের উপকূল-নিয়ন্ত্রণ

অনেক কষ্টে স্পেনের উপকূল-নিয়ন্ত্রণ-সমস্যার যদি বা একটা সমাধান হ'ল, জার্ম্মান ক্রুজার 'লাইপজিগে'র উপর টর্পেডো মারার ফলে আবার নতুন সমস্যার উদ্ভব হ'ল। স্পেনের উপকূল-রক্ষায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও ইটালীর মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক নৌ-শাসন (International Naval

এইখানে জার্মান সরকারী ইস্তাহারের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"Henceforth Germany will protect the interests of its vessels against Bolshevik incendiaries in Valencia and will adopt those means, which are alone suited to deter criminals and notes with satisfaction that its views are shared by Italy."

জয় প্রণাম [ইউনাইটেড ফিচার সিণ্ডিকেট]।

সম্প্রতি টাঞ্জিয়ারে একটা জার্মান ট্যাঙ্ক দেখা যাচ্ছে। একদিকে স্পেনের উপকূল থেকে রণতরী সরিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে টাঞ্জিয়ারে নৌ-কেন্দ্র-স্থাপনের আয়োজন কেমন যেন সন্দেহজনক।

আয়ার্ল্যাণ্ডের বিক্ষোভ

লণ্ডনে যে সাম্রাজ্য-সম্মেলন হয়ে গেল, আয়ার্ল্যাণ্ড তাতে যোগ দেয় নি। মিঃ ডি. ভ্যালেরা তার কারণ প্রদর্শন ক'রে বলেছেন, বৃটেনের সঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের যে-বিরোধ আছে, তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সাম্রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিতে অক্ষম।

তাঁদের প্রথম কথা, আয়ার্ল্যাণ্ডকে খণ্ডিত করা হয়েছে সম্পূর্ণ অকারণে। দেশে শতকরা ৭৫জন রোমান ক্যাথলিক, ২৫জন অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত। ইউনিয়নিষ্টদের সংখ্যা আরও কম। আয়ার্ল্যাণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করায় ইংরাজের যুক্তি এই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠদের রাজনৈতিক মত যখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের থেকে পৃথক্, তখন তাদের বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার আছে। মিঃ ডি. ভ্যালেরা বলছেন, "আয়ার্ল্যাণ্ডের শাসনভার যতদিন বর্তমান সরকারের হাতে থাকবে, ততদিন বার্ষিক ভূমি-রাজস্ব বাবদ এক পয়সাও স্বেচ্ছায় বৃটেনকে দেওয়া হ'বে না।"

দ্বিতীয় অভিযোগ, আইরিশ বন্দরগুলির অধিকার আয়ার্ল্যাণ্ডের হাতেই থাকা উচিত। দেশরক্ষার ব্যাপারেও তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেছেন। তাঁরা আসন্ন যুদ্ধে যোগ দিতেও অসম্মতি জানিয়েছেন। মিঃ ডি ভ্যালেরা বলেছেন, "এ দেশে যাতে অন্য কোন বৈদেশিক শক্তি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখায় বৃটেনের স্বার্থ আছে। আমাদের তেমনি বৃটেনের সাহায্য নেওয়ার স্বার্থ আছে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট ক'রে জানান দরকার যে, যদি কোন বিদেশী এসে আক্রমণ করলেই দেশ-রক্ষার জন্য পরস্পর সাহায্যের আদান প্রদান হবে।"

এই সকল বিষয়ে বিরোধের মীমাংসা না হ'লে উভয় দেশের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কোনো আশা নেই। এ বিষয়ে ডি, ভ্যালেরা অনমনীয়। এই বিক্ষোভের জন্যেই রাজা ষষ্ঠ জর্জের অভিষেকোৎসবের সময়ও কোন আইরিশ প্রতিনিধি লণ্ডনে যান নি।

আবিসিনিয়ায় নূতন চাল

আবিসিনিয়ার যুবরাজ এখন জেরুজালেমে রয়েছেন। সেখানকার ইটালীয় রাজদূত, কার ইঙ্গিতে প্রকাশ নেই, তিন মাস থেকে তাঁকে আবিসিনিয়ার রাজা হবার জন্য লোভ দেখাচ্ছেন। লোভ দেখানোর কারণ এই যে, যে সব ইটালীয় কর্মচারী আবিসিনিয়ার শাসনকার্য্য পরিচালনা করছেন, হাবসী জন সাধারণের প্রতিকূলতায় তাঁদের অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে। এ সময় যদি হাবসী যুবরাজ এঁদের হাতের পুতুল হয়ে সিংহাসনে বসেন, এঁরা নির্বিঘ্নে আবিসিনিয়ায় রাজত্ব করতে পারবেন।

ক্ষুধা ও দুষ্ট-সরস্বতীর খেলাঘর

রুশিয়া ও জাপান

অত্যুগ্র সাম্রাজ্যনীতির ফলে রুশিয়াকেও জাপান শত্রু করেছে। সে যখন মাঞ্চুরিয়া নিয়ে ব্যস্ত, রুশিয়া সেই অবসরে সাইবেরিয়া সুদৃঢ় করে ফেলেছে। অমিত-শক্তি সঞ্চার করেছে ভ্লাডিভষ্টকের বিমান কেন্দ্রে। সেখান থেকে টোকিও বেশী দূর নয়। রুশিয়া চীনে ও জাপানে এবং আর্কটিকের জলপথে আমেরিকায় বিমানপোতের চলাচলের চেষ্টা করছে।

অনেকে অনুমান করেন, দুইদিক থেকে রুশিয়াকে পিষে মারবার জন্য সম্প্রতি জার্ম্মানীর সঙ্গে জাপানের যে সন্ধি হয়েছে, জাপান নতুন শাসন সংস্কারের অভ্যুত্থানে অঙ্কুরেই তার পরিসমাপ্তি হল। এর পরে ইউরোপে যদি মহাযুদ্ধ বাধে, জাপান ইটালী ও জার্ম্মানীর সঙ্গে যোগ দেবে না, এ-অনুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমন কি এরই মধ্যে একটা প্রবল গুজব উঠেছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরে শান্তি স্থাপনের জন্য ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে জাপান আলোচনা আরম্ভ করবেন। প্রশান্ত মহাসাগরে চীন, জাপান, ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স এবং হলাণ্ডের স্বার্থ আছে।

এই সকল নানাদিক বিবেচনা করলে মনে হয়, জাপানের নতুন সরকার পুরাতন পথ ত্যাগ করবেন। তার ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হবে। মোট কথা, জাপানের যদি এই বিশ্বাস হয়ে থাকে যে, সাম্রাজ্য-বিস্তারের চেষ্টা করার ফলে সে লাভবান্ হয় নি, বরং বাণিজ্যের দিক্ দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা হলে ইটালী ও জার্ম্মানীর কাঁধে কাঁধ মেলাবার আকর্ষণ অনেকখানি হ্রাস পাবে, রুশিয়ার সঙ্গে শত্রুতাসাধনেরও কারণ থাকবে না। চীনের হাত থেকে মাঞ্চুরিয়া কেড়ে নেওয়ার ফলে সেই বিরাট দেশে তার বাণিজ্যের যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতি পূরণ করবার জন্য চীনের মিত্রতালাভের চেষ্টা করাই জাপানের পক্ষে স্বাভাবিক।

সুইডেনের লোহার খনি

সুইডেনের সব চেয়ে বড় লোহার খনির নাম গ্র্যাঙ্গেসবার্গ এ বি। দেশের নব্বই ভাগ লোহার প্রয়োজন এই খনি মেটায়। এতদিন পর্য্যন্ত এই খনির লোহা প্রধানতঃ জার্ম্মানীতেই চালান যেত। সম্প্রতি খনির কর্ম্মকর্ত্তারা জার্ম্মানীতে লোহা-রপ্তানী কমিয়ে, গ্রেটব্রিটেনে রপ্তানী করতে সক্ষম করেছেন। সুইডেনের পররাষ্ট্র-সচিব রিচার্ড স্যাণ্ডলার কিছুকাল আগে লণ্ডনে গিয়ে এই ব্যবস্থা করে এসেছেন।

ব্রিটেন সম্প্রতি দেশরক্ষার যে বিরাট ব্যবস্থা করেছেন, সুইডেন হতে লোহা না পেলে তা করা সম্ভব হত না। এর আগে স্পেন হতে বছরে কয়েক লক্ষ টন করে খনিজ লোহা ব্রিটেনে আসত। বিদ্রোহী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর কৃপায় তা এখন জার্ম্মানী ও ইটালীতে চালান যাচ্ছে

এই বছরের শেষে গ্র্যাঙ্গেসবার্গের সঙ্গে সমস্ত চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে। পরবর্ত্তী দশ বছর এখানকার সমস্ত পরিমাণ খনিজ লোহা বৃটেনে রপ্তানী করবে।

জার্ম্মানীর সঙ্গে লোহার বাঁধন ছেঁড়ায় হয় তো সেখানে ভয়ানক বিক্ষোভের সৃষ্টি হবে। সেই জন্য সুইডেনের রাজা গুস্তাভ বিমান ও নৌ-বাহিনী বাড়াবার আদেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে অন্ততঃ পাঁচ শো প্রথম শ্রেণীর এরোপ্লেন সুইডেন রক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রিত থাকবে। যাতে সুইডেনের উপর দিয়ে "ভূত"-এরোপ্লেন যেতে না পারে, সেদিকেও নজর রাখবে। যে-সব জার্ম্মান ও রুশ-এরোপ্লেন বিনা অনুমতিতে অনেক উঁচুতে বেড়ায়, সেই গুলোকেই "ভূত"-এরোপ্লেন বলে।

ভারত শাসনে ইংরাজের ভুল

…ভারত শাসনে ইংরাজের ভুল কোথায় এই প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই বলিতে হইবে যে, ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থাতেই ইংরাজের সর্ব্বপ্রধান ভুল রহিয়াছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজের প্রধান ভুল রহিয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষে যাঁহারা আধুনিক শিক্ষায় যত অধিক শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বেশীর ভাগ মানুষ ইংরাজের সহিত তত অধিক কলহে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং ভারতীয় সমাজকে ওলট-পালট করিয়া ভারতবাসী জনসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিবার পথ কণ্টকিত করিতেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতে শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় গুলির সাহায্যে যে কুব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে তাহাকেই ভারত শাসনে ইংরাজের সর্ব্বপ্রধান ভুল বলিতে হইবে।…

এমন শপথ আমরা করিতে পারি না, বোধ করি কবিরও সে সাহস ছিল না।

মাইকেলের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে নানা মত আছে। তিনি যে পরবর্ত্তী কালে খৃষ্ট ধর্ম্মে অবিশ্বাস করিতেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে এ কথা ঠিক, দীক্ষার সময়ে খৃষ্ট ধর্ম্মে না ছিলেন তিনি অনুরক্ত, না জানিতেন সে বিষয়ে বিশেষ কিছু। তিনি কি অবাঞ্ছনীয় বিবাহ সম্বন্ধ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্যই এ কাজ করিয়াছিলেন? তিনি কি বহুবাঞ্ছিত ইংলণ্ড-গমনের জন্য এই চাল দিয়াছিলেন? দুইটাই সম্ভব। কিন্তু আরও একটা কারণ থাকা অসম্ভব নয়। জাহাজ দেখিলে যাহার ইংলণ্ডের কথা মনে পড়ে, সমুদ্র যাহার কানে ইংলণ্ডের ঘ্রাণ আনিয়া দেয়, বাস্তব অপেক্ষা কল্পনা যাহার কাছে বড়, তমলুক গিয়া যিনি মনে করেন ইংলণ্ডের কাছে আসিয়াছেন, মাদ্রাজ পলায়নের মধ্যে যাহার ইংলণ্ডের পথে এক ধাপ অগ্রসর হইয়া থাকিবার উদ্দেশ্য, তিনি দান্তে, টাসো, বায়রণ, বিশেষ মিল্টনের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত খানিকটা একাত্মকতা অনুভব করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। তাঁহার খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের অনেকগুলি কারণের মধ্যে ইহা একতম নয়, তাহা জোর করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

মাইকেলের এই দুইটি আকাঙ্ক্ষার মধ্যে একটি এ দেশে থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাকাব্য লিখিতে তাঁহাকে ইংলণ্ডে যাইতে হয় নাই। যে-ইংলণ্ডের জন্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তাহা আটলান্টিকের পারে নয়, মানস সরোবরের তীরে। সেই 'land of heart's desire' জগতেই। মিল্টনের স্পর্শ এদেশে বসিয়াই তিনি পাইয়াছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রচনা, তাহা বিলাত-গমনের পূর্ব্বে, কেবল সনেটগুলি বিলাত গমনের পরে লিখিত। অপর আকাঙ্ক্ষাটি, যাহাকে আমরা সমুদ্রের প্রতি টান বলিতে পারি, তাহার কাব্যকে আশ্রয় করিয়াছে। 'ক্যাপটিভ্ লেডী'র কাহিনী ভারতীয়, ভাষা ইংরাজি। মেঘনাদবধের ভাষা ভারতীয়—প্লট বিদেশীয়। এই দ্বিত্ব তাঁহার কাব্য ও জীবনের প্রায় সর্ব্বত্র। এই দ্বিত অস্থিরতার মুদ্রা তাঁহার জীবনসন্ধ্যাতে ধ্বনিত হইয়াছে—মহাকাব্য কত দূর। ইংলণ্ড কত দূর।

নগরে ঊষা

—শ্রীকালিদাস রায়

এখনো নগরী সুপ্ত, ঘরে ঘরে দ্বার বাতায়ন
রুদ্ধ সব,—হট্টশালা কর্মশালা সুপ্তি-নিমগন।
ছুটিতেছে নির্বাপক, মই ঘাড়ে করে কাজ তার
নিভায় পথের আলো। পথ ঝাঁট দেয় ঝাড়ুদার
স্বভাষায় গেয়ে গান। আবর্জনা জঞ্জালের গাড়ী
পথেরে পীড়ন করি কাঁদাইয়া চলে সারি সারি।
দলন মর্দন করে আস্তাবলে জাগিয়া সহিস
সশব্দে ঘোড়ার পিঠে। গোয়ালারা দোয়ায় মহিষ
আনাজের ঝুড়ি শিরে ছুটিতেছে পশারিণী দল।
গাড়ীর চাকার পরে যান-ভৃত্য ঢালিতেছে জল।

পূর্বাকাশ পরিচ্ছন্ন, স্নিগ্ধ বায়ু বহে ঝিরিঝিরি,
ধূলিধূমহীন পথে ঊষা সতী নামে ধীরি ধীরি,
মেঘ যবনিকাখানি সরাইয়া দিগন্তের কোলে
সীমন্তে সিন্দূরচ্ছটা, কেশে তার শুকতারা দোলে
কে তারে বরণ করে? ঋষিকণ্ঠে কোথা সামগান,
কবিকণ্ঠে কোথা স্তব, শিশুকণ্ঠে কোথা কলতান?
এ যে বিংশ শতাব্দীর সৌধময় বিলাস নগর,
ঊষারে বরণ করে ঝাড়ুদার মজুর মেথর।
অর্থ দিয়া সর্বকর্মে এই যুগে অনুকল্প বিধি,
ঊষা-পুরোহিত এরা গৃহীদের যোগ্য প্রতিনিধি।

আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী

— শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

উপক্রমণিকা

ম্যাক্সমুলার, এমিল সেনার্ট, ডাক্তার হর্ট প্রভৃতি বিদেশীয় মনীষিগণ এবং ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুধীবৃন্দ যাঁহাকে বেদবিৎ আচার্য্যগণের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মনে করিতেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর গৌরবের আধার আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের মধুর ও পবিত্র জীবন কাহিনী, [illegible] ও আড়ম্বরহীন, অথচ অক্লান্ত অধ্যবসায় সহকারে অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর পরিচয় বোধ হয় আজি অনেকেরই নিকট অপরিজ্ঞাত। বাঙ্গালা দেশে বেদশিক্ষার বিশেষ অসুবিধা ছিল। কাশীধামে যে সকল উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসী বেদবিদ্গণের নিকট বাঙ্গালী বেদশিক্ষা করিতে যাইতেন, তাঁহারা প্রায়ই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিতকে এবং পরে বর্দ্ধমানাধিপতি কয়েকজন বাঙ্গালীকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে কাশীর গৌড়স্বামী প্রভৃতি বৈদিকেরা বাঙ্গালী বলিয়া বেদশিক্ষা দান করেন নাই। তাঁহাদিগকে [illegible] শিক্ষা করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বেদশিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং তিনি আজীবন এই দেশে বেদের অধ্যাপনা, বৈদিক সাহিত্যের গবেষণা এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রচারে নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

জন্ম ও বংশবিবরণ

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে দিবসে পাটনা নগরীতে আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কালনা নগরের নিকটবর্ত্তী ধাত্রীগ্রাম-নিবাসী রাঢ়ী শ্রেণী ফুলিয়া মেলের আবসথ গঙ্গানন্দী সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের [illegible] পাটনা [illegible]

আচার্য সত্যব্রত সামশ্রমী।

রামদাস বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাঙ্গালায় বেদচর্চা সেরূপ নাই এবং কাশীধামে অনেক বঙ্গবাসী বেদশিক্ষার জন্য আগমন করিয়াও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী বেদবিদ্গণের নিকট সফলমনোরথ হইতে পারিতেন না দেখিয়া তিনি তাঁহার পুত্রকে বেদবিৎ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং ধনার্জ্জনস্পৃহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম হইতে অবসর-গ্রহণপূর্ব্বক কাশীধামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন।

শিক্ষা

বাল্যকাল হইতে সত্যব্রত অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল—"কালিদাস"। একদিন যখন তৃতীয় সর্বভিন্যাহারে পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালক কালিদাস উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, তখন তিনি বালকোচিত চাপল্য প্রণোদিত হইয়া তাঁহার পিতার অতি প্রিয় একটি গোলাপ আহরণ করেন। পরে রামদাস যখন তাঁহার ভৃত্যকে দোষী মনে করিয়া ভৎর্সনা করিতেছিলেন, তখন পুত্র নিজ দোষ স্বীকার করেন। তাঁহার সত্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া পিতা তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নাম দিলেন—সত্যব্রত। আচার্য্য সত্যব্রত আজীবন তাঁহার নামের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সত্যব্রতের বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথম তিন বৎসরকাল তিনি গৃহনিযুক্ত শিক্ষকগণের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। ৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার পিতা কর্তৃক কাশীধামে নীত হন এবং যথারীতি উপনীত হইয়া তৎকালীন সর্বপ্রধান সাঙ্গবেদবিৎ দণ্ডী এবং "সরস্বতী মঠের" গুরু গৌড়স্বামীর নিকট ব্রহ্মচারীরূপে গৃহীত হন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ সামবেদী ৺নন্দরাম ত্রিবেদী তাঁহার বেদশিক্ষার ভার লন। গৌড়-স্বামীর নিকট সত্যব্রত ব্রহ্মচারীর ন্যায় ছাত্রজীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং গুরুগৃহে পুরি, ফলমূলাদি ও মিষ্টান্ন খাইয়া থাকিতেন। সেইজন্য তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীর প্রধান আহার অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন নাই, রুটী, লুচি, ফল, দুগ্ধ ও মিষ্টান্নই তাঁহার আহার্য্য ছিল।

সত্যব্রত অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে বিদ্যাভ্যাস করেন। তিনি ২।৩ ঘণ্টা মাত্র নিদ্রা যাইতেন। অতি অল্পকাল মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদি শিক্ষা করিয়া দ্বাদশবর্ষ মাত্র সময়ের মধ্যে সমগ্র অঙ্গ সহিত চতুর্ব্বেদে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বর্ষ মাত্র বয়সে তিনি বুন্দী রাজ-সভায় সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, দর্শন প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গের সহিত চতুর্ব্বেদের পক্ষকাল-ব্যাপী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বুন্দীরাজ কর্তৃক 'সামশ্রমী' উপাধিতে ভূষিত হন।

দেশভ্রমণ

অতঃপর তিনি জ্ঞান ও যশের বিস্তারলাভার্থে পিতৃদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া অযোধ্যা, কান্যকুব্জ, কম্পিলা, জয়পুর, হরিদ্বার, সপ্তস্রোত, ব্রহ্মাসংগম, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা, কাশ্মীর, গুজরাট প্রভৃতি বহুস্থানে দুই বৎসরকাল পরিভ্রমণ করিয়া বহু পণ্ডিতসভায় বিচারে জয়ী হইয়া গৌরব অর্জ্জন করেন। জয়পুরের সভাপণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র মহারাজের দক্ষিণ দিকে রৌপ্যাসিংহাসনে উপবেশন করিতেন এবং রাজসভার উপরে স্থাপিত একটি ফলকায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ছিল যে, যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রকে বিচারে পরাজিত করিতে পারিবেন, তিনি দক্ষিণদিকের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। সত্যব্রত সপ্তাহব্যাপী বিচারে হরিশ্চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং হরিশ্চন্দ্রের গর্ব্ব-সূচক রাজদণ্ড ভগ্ন করেন। ইহাতে হরিশ্চন্দ্র ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া সত্যব্রতের আশ্রয়গৃহে অগ্নি প্রদান করেন এবং সত্যব্রত প্রাণভয়ে জয়পুর হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

বিবাহ

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সত্যব্রত কাশীধামে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। এই সময় নবদ্বীপবাসী সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের কাশীতে এক সভায় সত্য-ব্রতের সহিত বিচার হয় এবং বিদ্যারত্ন পরাজিত হন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ক্ষুব্ধ হইয়া রামদাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার ক্ষোভ নিবৃত্ত হইতে পারে, যদি তাঁহার পৌত্রীর (৺মথুরানাথ পদরত্নের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত) সত্য-ব্রতের বিবাহ দেন। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রামদাস এই প্রস্তাবে সম্মত হন।

দয়ানন্দের সহিত বিচার

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে কাশী মহারাজের সভায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত অন্যান্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের বিচার হয়। বিচারের বিষয় ছিল—"বেদের মধ্যে পৌত্তলি-কতা আছে কি না?" এই বিচারে আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মধ্যস্থ হইয়াছিলেন।

আচার্য্য সত্যব্রতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কর্ণগোচর হওয়ায়

ভাষ্য, অনুবাদ ও টীকাসহ সামবেদসংহিতা প্রকাশ করিয়া সামশ্রমী মহাশয় অতুলনীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে তিনি সভাষ্য সামবেদ সংহিতা, নিরুক্ত, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণ প্রকাশ দ্বারা বিদ্বৎ সভায় অপূর্ব্ব যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধ, ও জৈন ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদিও বাঙ্গালা অনুবাদসহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঋতুমতী হইবার পরে আর্য্যকন্যাগণের বিবাহকাল, অভক্ষ্য ভক্ষণ ও নিষিদ্ধ আচরণ না করিলে সমুদ্রযাত্রায় দোষ নাই, স্ত্রীলোকগণের বেদে অধিকার ছিল, তাহা স্ত্রীগণ পূর্ব্বে ছত্র ও উপানৎ ব্যবহার করিতেন, মাধ্যাকর্ষণ তথ্য বৈদিক যুগে অজ্ঞাত ছিল না, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে, ইত্যাদি বহু তথ্য সামশ্রমী মহাশয় বৈদিক সাহিত্য হইতে প্রমাণিত করিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'উষা' নাম্নী একখানা বৈদিক সাহিত্যসংক্রান্ত পত্রিকা সম্পাদিত করিতে আরম্ভ করেন। সামশ্রমী মহাশয়ের রচিত গ্রন্থ ও প্রস্তাবাদির নিম্নোক্ত অসম্পূর্ণ তালিকা হইতে পাঠকগণ তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের আভাস পাইবেন :—

(ক) সাময়িক পত্র

১। প্রত্নকম্রনন্দিনী ১৭৮৯ ১৭৯৬ শক। ২। উষা ১৮১১ শক।

(খ) প্রধান বৈদিক গ্রন্থাবলী

১। যজুর্ব্বেদ সংহিতা, মহীধরের ভাষ্য, অনুবাদ ও টীকা সহ ১৭৯৬ ১৮০১ শক। ২। সামবেদ সংহিতা, সায়ণের ভাষ্য, অনুবাদ ও টীকা সহ ১৮০৩-১৮১০ শক।

(গ) বিবিধ বৈদিক প্রস্তাব

১। আগ্নেয় ও ঐন্দ্র পর্ব্ব (ভাষ্য অনুবাদাদি সহ) ১৭৯২ শক। ২। সাম বিধান ব্রাহ্মণ (বাঙ্গালা টীকা সমেত) ১৭৯৩ শক। ৩। সাম সূচী প্রথম খণ্ড ১৭৯৩ শক। ৪। আরণ্য সংহিতা (সায়ণভাষ্য অনুবাদাদি সহ) ১৭৯৪ শক। ৫। মন্ত্র ব্রাহ্মণ (ভাষ্য অনুবাদাদি সহ) ১৭৯৪ শক। ৬। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ (মূল) ১৭৯৫ শক। ৭। দেবতাধ্যায় ব্রাহ্মণ (সায়ণের ভাষ্য অনুবাদাদিসহ) ১৭৯৫ শক। ৮। ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণ (সায়ণ ভাষ্য সহ) ১৭৯৬ শক। ৯। ভারণ্ড সাম (মূল) ১৭৯৬ শক। ১০। সাম বিধান ব্রাহ্মণ (সায়ণ ভাষ্য সহ) ১৭৯৬ শক। ১১ আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (মূল) ১৭৯৬ শক। ১২। বংশ ব্রাহ্মণ (মূল) ১৭৯৬ শক। ১৩। সংহিতোপনিষদ ব্রাহ্মণ (মূল) ১৭৯৬ শক। ১৪। সাম সূচী ২য় খণ্ড ১৭৯৬ শক। ১৫। গোভিল গৃহ্য সূত্র (সটীক অনুবাদ) ১৮০৭ শক। ১৬। অক্ষর তন্ত্র (সটীক) ১৮১১ শক। ১৭। অষ্ট বিকৃতি-বিবৃতি (সটীক) ১৮১১ শক। ১৮। স্নানবিধি ও স্নানমন্ত্র (সানুবাদ) ১৮১১ শক। ১৯। বিকৃতি বল্লী (সটীক) ১৮১১ শক। ২০। নারদীয়-শিক্ষা (মূল) ১৮১২ শক। ২১। মন্ত্র ব্রাহ্মণ (ভাষ্যান্তর ও অনুবাদাদিসহ) ১৮১২ শক। ২২। সাম প্রাতিশাখ্য (মূল) ১৮১২ শক। ২৩। আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (সায়ণ ভাষ্য সহ) ১৮১৩। ২৪। যজ্ঞ পরিভাষা সূত্র (টীকা, অনুবাদাদি সহ) ১৮১৩ শক। ২৫। গৃহ্য সংগ্রহ (মূল) ১৮১৩ শক। ২৬। সাম-পদ সংহিতা ১৮১৩ শক। ২৭। যজুর্ব্বেদ সংহিতা (মূল বঙ্গাক্ষরে) ১৮১৩ শক। ২৮। উপগ্রন্থ সূত্র (মূল) ১৮১৩ শক। ২৯। সপ্তদশ মহাসামাদি ১৮১৪ শক ৩০। সংহিতা সপ্তকম্ ৮১৪ শক। ৩১। পঞ্চ যজ্ঞ পাঠ ১৮১৪ শক। ৩২। সত্য সাম ১৮১৭ শক। ৩৩। আশীরসামাদি ১৮১৪ শক। ৩৪। বহিষ্পবমান সামাদি ১৮১৪ শক। ৩৫। অগ্নিষ্টোম সামাদি ১৮১৪ শক। ৩৬। শান্তি পাঠ (সটীক) ১৮১৪ শক। ৩৭। অরিষ্ট বর্গ ১৮১৫ শক। ৩৮। ঋতুমঙ্গলাদি (সানুবাদ) ১৮১৫ শক। ৩৯। বংশ ব্রাহ্মণ (সায়ণ ভাষ্য ও অনুবাদ সহ) ১৮১৫ শক। ৪০। শব্দগীতি (মূল) ১৮১৬ শক ৪১। সাম প্রকাশিকা ১৮১৬ শক। ৪২। উপলেখ-সূত্র (সটীক) ১৮১৬ শক। ৪৩। শব্দরূপ (সটীক) ১৮১৬ শক। ৪৪। ত্রয়ী সংগ্রহ ১৮১৭ শক। ৪৫। ত্রয়ী পরিচয় (সংস্কৃত) (ঐ ভূমিকা) ১৮১৭ শক। ৪৬ ত্রয়ী টীকা (ঐ টীকা) ১৮১৭ শক। ৪৭। ত্রয়ী ভাষা (ঐ বঙ্গানুবাদ) ১৮১৭ শক।

(ঘ) দর্শন

১। মীমাংসা দর্শন (ভাষ্য সহ ১৭৯২ শক। ২ পূর্ণ প্রজ্ঞাদর্শন (মাধব ভাষ্য সহ) ১৭৯৪ শক। ৩। কারণ্ডব্যূহ (বৌদ্ধ গ্রন্থ) ১৭৯৫ শক। ৪। বৌদ্ধ দর্শন (ঐ অনুবাদ) ১৭৯৪ শক। ৫। সাংখ্যদর্শন প্রথম খণ্ড ১৭৯৫ শক। ৬। অর্থসংগ্রহ (মীমাংসা) ১৭৯৫ শক। ৭ মীমাংসা পরিভাষা ১৭৯৫ শক।

(ঙ) ধর্ম্ম

১। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম তাৎপর্য্য (সংস্কৃত) ১৭৯২ শক। ২। বহুবিবাহ বিচার সমালোচনা ১৭৯৩ শক। ৩। দেবতা তত্ত্ব প্রথম খণ্ড ১৭৯৫ শক।

(চ) সাহিত্য ও অলঙ্কার

১। ভাষা সার (অসম্পূর্ণ) ১৭৮৯ শক। ২। কবি কল্পলতা (অলঙ্কার) ভাষ্য সহ ১৭৯২ শক। ৩। বিদগ্ধ তরঙ্গিনী। ৪। মাধব চম্পু। ৫। বিদ্যাল ভঞ্জিকা। ৬। চন্দ্রশেখর চম্পু ১৭৯৫ শক ৭। কুবলয়ানন্দ (অলঙ্কার)। ৮। ধূর্ত্ত সমাগম (প্রহসন) ১৭৯৬ শক ৯। স্মারাবলী ১৭৯৬ শক। ১০। বহুগণি ধাতুরূপ ১৭৯৬ শক ১১। বিবেক বিলাস (জৈন ধর্ম্ম গ্রন্থ) ১৭৯৬ শক। ১২। লিঙ্গবৃত্তি ১৭৯৭ শক।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণও আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়ের অপূর্ব্ব গবেষণামূলক প্রস্তাবাদি পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। মোক্ষমূলর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১৫ জুন তারিখের "একাডেমী" পত্রে লিখিয়াছিলেন :—

Discovery of the Sixth Brahmana of the Samaveda

Oxford, June 2, 1890

I shall be glad if you will allow me to call the attention of Sanskrit scholars to a

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।
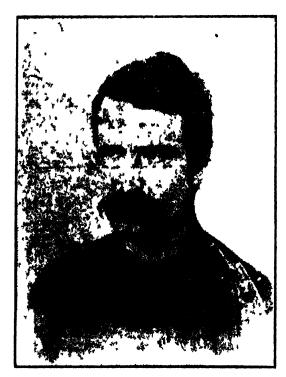
curious discovery lately made by Pandit Satyabrata Samasrami × ×

Thanks to the researches of a well known student of the Samaveda, Satyabrata Samasrami, to whom we owe a useful edition of the Samaveda Samhita, we know now that the Chandogya consisted really of two parts, and that the two books hitherto missing are the two books of the Mantra-brahmana × ×

সহবাসসম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যে মহা আন্দোলন হয়, তৎপ্রসঙ্গে সেই সময়ে সামশ্রমী মহাশয় "ঊষা" নাম্নী পত্রিকায় যে আলোচনা করেন, তাহা পাঠ করিয়া আচার্য্য মাক্ষমূলর তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

7 Norham Gardens, Oxford,
July, 24, 91

Dear Sir,

I have read your article on Kanyavivahakala. It is most excellent and has pleased me so much that I have asked my Secretary to translate it into English × ×

Believe me,
Yours very truly
F. Max Muller

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর যখন হিন্দুমতে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন করেন, তখন সামশ্রমী মহাশয়ের লিখিত দুইটি প্রস্তাব 'ঊষা'তে প্রকাশিত হয় এবং তাঁহার অভিমত সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—

২৪ ৮ ১৮৯১

সনমস্কার নিবেদনমিদং

× × সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া বিশেষ বাধিত হইলাম। × ×

বিনত শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা

দেশবিখ্যাত পণ্ডিতগণ কোন প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। "আচার প্রবন্ধ" রচনাকালে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্রের অংশবিশেষ এ স্থলে উদ্ধৃত হইতে পারে :—

সনমস্কার নিবেদনমিদং

মহাশয়, অস্মদ্দেশে বৈদিক পদবাচ্য পণ্ডিত এবং বৈদিক বিষয় পরিজ্ঞাতা আপনি ভিন্ন আর নাই।

তিনি সে কার্য্যে উৎসাহিত হইলেন। আহ্লাদের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং কয়েকজন স্বধর্ম্মপ্রিয় বন্ধুর মত লইবার প্রস্তাব করিলেন।

কয়েকদিন পরে তাঁহার গৃহে ঐরূপ কয়েকজন পণ্ডিত সমবেত হইলেন। প্রস্তাবিত কার্য্যে সকলেই মত দিলেন। স্থির হইল যে যিনি যে শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী তিনিই তাহার সার সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন। বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় বেদ অংশের সঙ্কলনে প্রতিশ্রুত

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত।

হইলেন এবং আমি তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলাম। উৎসাহী বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মহাভারত ও ভগবদ্গীতা অংশের সঙ্কলনের ভার লইলেন। ... ..."

সামশ্রমী মহাশয় এই গ্রন্থের দুরূহ অংশ যেভাবে সম্পাদিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কৃতিত্বের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। রমেশচন্দ্র সামশ্রমী মহাশয়কে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশগুলি হইতে প্রতীয়মান হইবে।

(১)

২০ বীডন ষ্ট্রীট
১২ শ্রাবণ।

মহাশয়

.. ... আমি ইচ্ছা করি আমার ঋগ্বেদের অনুবাদের কতক অংশ আপনার নিকট পাঠাইয়া দিই, আপনি যদি মূলের সহিত তুলনা করিয়া একটি মত দেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইবে। সাধারণের নিকট আপনার মত বিশেষ আদরণীয় হইবে।

আপনার বশম্বদ
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

(২)

৮ই মার্চ্চ।

মহাশয়,

আপনার সস্নেহ ও প্রশংসাসূচক পত্রখানি পাইয়া আমি যে কতদূর তুষ্ট হইলাম বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। আপনার ন্যায় লোকের প্রশংসাই প্রকৃত প্রশংসা—অতি সাদরে ও সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সে প্রশংসাগুলি গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

সকলের সকল মতে ঐক্য হয় না,—আপনার মতে ও আমার মতে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্নতা থাকিবে তাহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। কিন্তু সে বিভিন্নতা সত্ত্বেও আপনার প্রতি যে আমার প্রকৃত ভক্তি আছে, তাহা কখনই তিরোহিত হইবার নহে।

আপনার বশম্বদ
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

(৩)

৩৭নং পার্ক ষ্ট্রীট
৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩

শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্বর শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয়,

আমি আগামী রবিবার অনুমান ৮টার সময় বঙ্গদেশে বৈদিক শাস্ত্রের একমাত্র নিকেতন স্বরূপ আপনার

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বনমালা

[৬]

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। হাতে কাজ নাই, বনমালা একা কুটীরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছে। দর্পনারায়ণ নাই, সে ও আলিবদ্দি বজরাখানি লইয়া দুবরঙ্গী পাবনা সহরে গিয়াছে। এ রকম তাহারা মাসে মাসে যায়, কখনো কখনো বনমালা সঙ্গে যায়, আজ যায় নাই। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিবার জন্য পাবনা যাইবার আবশ্যক হয়, ক্ষুদ্র গ্রামে সব জিনিষ পাওয়া যায় না।

বনমালা একা, তারা গৃহকাজে নিরত। বনমালার খুব গরম লাগিতেছিল—সে উঠানে পায়চারী করিতে লাগিল। একটুও বাতাস নাই, বিকাল বেলা যেটুকু বাতাস ছিল তাহাও কমিয়া গেল—বনমালার খুব অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে সে হঠাৎ আকাশের পানে তাকাইয়া দেখিল, ঈশান কোণে একখানা মেঘ উঠিয়াছে—যমের মহিষের মত কালো তার রঙ। বনমালা খুসী হইল—ভাবিল, বাতাস উঠিবে। বাতাসই উঠিল বটে, কিন্তু বনমালার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী।

বনমালা কিছুক্ষণ নদীর দিকে তাকাইয়া ছিল, আবার যখন ঈশান কোণে ফিরিল—দেখিল, কে যেন মেঘখানাকে নীচে হইতে ঠেলিয়া উপরের দিকে তুলিয়া দিয়াছে—আকাশের অৰ্দ্ধেক ভাগ মেঘখানা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, মেঘের মধ্যে টানা-পোড়েন বিদ্যুতের রেশমী সূতার বয়ন আরম্ভ হইয়াছে; আকাশে বায়ুর লেশমাত্র নাই, গাছের একটি পাতাও নড়িতেছে না—সমস্ত প্রকৃতি চিত্রাপিতবৎ।

কালো মেঘ আকাশখানাকে গ্রাস করিতে লাগিল—কপিল বিদ্যুৎ তলোয়ার খেলিতে আরম্ভ করিল—শাদা ডানার তরঙ্গ তুলিয়া বকের দল গ্রামের দিকে ছুটিতেছে, মেঘের ছায়ায় পৃথিবী কটা হইল, নদীর জল কালো হইল।

হঠাৎ একটা বিকট বিদ্যুৎ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চিরিয়া গেলিল—সঙ্গে সঙ্গে—এক মুহূর্ত্ত পরে একটা শব্দ তার অট্টগর্জ্জনে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল। বনমালা চকিত হইয়া দেখিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ভীত হইয়া শুনিল, দূরে আকাশের পারে ঈশান কোণে বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার জলের মত একটা অস্পষ্ট অথচ ভীষণ শব্দ। ঝড় উঠিয়াছে। উৎকট কালবৈশাখী।

বনমালা কুটীরের মধ্যে আসিতে না আসিতে ঝড় আসিয়া ঘরের উপরে পড়িল। ঘরখানার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া দমকা চলিয়া গেল—আবার নিস্তব্ধ, যেন কিছুই হয় নাই। একটু সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আবার একটা দমকা, তারপর আর একটা, তারপর আবার। কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতের তুলনা চলে। একটা দমকার আক্রমণের হাত এড়াইতে না এড়াইতে আর একটা আসিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে।

ঘরের চাল মচ্ মচ্ করিতে লাগিল—বেড়া নড়িতে লাগিল—দরজা, জানলার খিল ও কপাট খর খর করিতে লাগিল—আর ঘরের মধ্যে তারা ও বনমালা শীতে ও ভয়ে কাঁপিতে থাকিল।

একবার জানলা দিয়া বনমালা নদীর দিকে তাকাইল, আকাশে মেঘ ও বিদ্যুতে প্রলয় কাণ্ড করিতেছে, মেঘের কালো ডানা মেলা প্রকাণ্ড গরুড়টার সঙ্গে বিদ্যুতের সহস্র-ফণা নাগিনীর সে কি যুদ্ধ। পাখীটার নখে সাপটা আর্ত্ত চেষ্টা করিতেছে, পাখীর চঞ্চুতে তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত; আর সাপটার ছোবলে অগ্নি উদ্গার হইতেছে—দুইজনে বায়ুপথে কি বিষম দ্বন্দ্ব। বিদ্যুৎ চমকিতেছে, মেঘ ডাকিতেছে।

ঝড়ের বেগে নদীতীরের গাছপালা ঝটপট করিতেছে, এক একবার দমকা আসে—গাছগুলা ভূমিশায়ী হইয়া পড়ে, বড় আম গাছটার পল্লবজাল একদিকে উল্টিয়া যায়, শাখাপ্রশাখার শাদা রেখাগুলি শ্যাম পত্রান্তরাল ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া ওঠে। বাতাসের ঝাপটে আশ্রয়চ্যুত কাকের

পাবনা গেলে ফিরিতে পরের দিন হইয়া যায়। দর্পনারায়ণ ফিরিল না দেখিয়া বৃদ্ধ একাকী আহারে বসিল।

বৃদ্ধ আহারে বসিয়া তারাকে জিজ্ঞাসা করিল—কই তোমাদের বাবু তো এখনো ফিরলেন না?

আহারের স্থানে বনমালা ও তারা দুইজনেই উপস্থিত ছিল, তারা উত্তর করিল—বোধ হয় ঝড় বাদলের জন্য রওনা হ'তে পারেন নি, এমন মাঝে মাঝে হয়।

বৃদ্ধ বলিল, তা হ'লে তো বড় বিপদ হ'ল, আমি তাঁর অতিথি হলাম, কাল সকালেই ফিরতে হবে, তার সঙ্গে দেখা না করে গেলে বড় অন্যায় হবে।

বনমালা বলিল—কাল সকালেই বা ফিরবেন কেন? দুদিন না হয় থেকেই গেলেন।

বৃদ্ধ বলিল—সে হয় না মা, একটা কাজে বেরিয়েছি—এখানে বসে থাকলে চলে কি করে।

বনমালা হাসিয়া বলিল কাজ তো আপনার খাজনা আদায় করা। দুদিনে তা তামাদি হ'য়ে যাবে না। বিশেষ, আজকার ঝড় বাদলে আপনার শরীর খারাপ হ'য়ে পড়েছে।

শরীরের উল্লেখে বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল—বুড়া বয়সে আবার শরীর। তবে চোখে আজকাল একটু কম দেখি, এই যা।

বনমালা বলিল—এই বয়সে আপনি কেন খাজনা-পত্র আদায় করতে বের হন, ছেলেদের পাঠালেই পারেন।

—ছেলে আর কই। ছিল এক নাতি—এই পর্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধের যেন কি মনে পড়িল—সে সাবধান হইয়া গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া আহারে দ্বিগুণ ভাবে মন দিল।

সকলে কিছুক্ষণ নীরব। হঠাৎ বৃদ্ধ তারাকে প্রশ্ন করিল, তোমার দাদাবাবু কি করেন?

তারা উত্তর করিল—কি আর করবেন! সামান্য জোত জমি আছে তা-ই দেখা শোনা করেন।

বৃদ্ধ বলিল—তোমাদের এ গ্রামে বাস কত দিন?

তারা অসতর্ক ভাবে বলিয়া ফেলিল—অল্পদিন।

—তার আগে ছিল কোথায়?

তারা প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পায় না দেখিয়া বনমালা বলিল, মুর্শিদাবাদ জেলায়।

অনেক সময় সত্য-গোপনের শ্রেষ্ঠ উপায় সত্যকথা বলা।

বৃদ্ধ বলিল—তা এ, গাঁয়ে কেন আছ? ভদ্রলোক নেই এ গাঁয়ে, আমাদের গাঁয়ে চল না।

তারা জিজ্ঞাসা করিল—কোন গাঁয়ে বাড়ী আপনার?

বৃদ্ধ বলিল—বাকুলপুর।

বনমালার মনে পড়িল কিছুক্ষণ আগে বৃদ্ধ তাহার নিবাস গ্রামের নাম বলিয়াছিল, কৈবর্ত্তডাঙা। বনমালা বুঝিল, সে সত্য গোপন করিতেছে।

তারা জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা আপনি তো ঘুরে বেড়ান—জোড়াদীঘি কতদূর?

বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল।—বলিল, জোড়াদীঘি—অনেক দূর। তোমরা কি করে জানলে?

তারা হাসিয়া বলিল—বলেন কি? সেখানকার জমিদারদের নাম কে না জানে?

বৃদ্ধের মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল—তা বটে।

বৃদ্ধের আহার শেষ হইল। তারা বাহিরের ঘরে তাহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল। বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত হইয়াছিল—শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষ রাত্রে দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দ্দি ফিরিল। বনমালা দর্পনারায়ণকে বৃদ্ধ অতিথির কথা বলিল, তাহার যথোচিত সংকার হইয়াছে শুনিয়া দর্পনারায়ণ খুসী হইল।

বনমালা বলিল—বুড়োর কথা শুনে মনে হ'ল সে নিজের আত্ম পরিচয় গোপন করেছে।

দর্পনারায়ণ বলিল—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ... আমরা ই কি আর কারো কাছে সত্য পরিচয় দিচ্ছি। দু'জনে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে রাত্রি ভোর হইয়া আসিল। এমন সময়ে বৃদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল—সে বাহির হইয়া আসিল। দর্পনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বাহিরে গেল, বনমালা খানিকটা পিছনে চলিল।

বাহিরে আসিতেই বৃদ্ধ ও দর্পনারায়ণ মুখোমুখি দেখা হইল। এক মুহূর্ত্ত দুজনেই নীরব—বিস্ময়াহত; বৃদ্ধ দেখিল—সম্মুখে তাহার পৌত্র দর্পনারায়ণ, দর্পনারায়ণ দেখিল সম্মুখেই উদয়নারায়ণ।

একমুহূর্ত্ত মাত্র! দর্পনারায়ণ কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময়ে উদয়নারায়ণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল—তবে রে হতভাগা তুই ভবঘুরের মত ঘুরে মরবি—মর! এই চাষাদের মধ্যে এসে

চাষাদের মত থাকবি থাক্—তা বলে আমার নাতবৌকে গরীবের মত রাখার তোর কি অধিকার ?

সারারাত্রির পরিশ্রমের পরে আলিবক্সির কেবল একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। সে অপ্রত্যাশিত ভাবে কর্তার কণ্ঠস্বর শুনিয়া একলাফে শয্যা, গৃহ, বাড়ী ত্যাগ করিয়া মাঠের মধ্যে গিয়া এক খেজুর গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল।

৮

আলিবক্সি যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা ই বটে। উদয়নারায়ণ পৌত্রের অনুসন্ধান করিতে করিতে এখানে আসিয়া তাহার দেখা পাইয়াছে।

সে আজ দুইমাস হইল বজরা করিয়া বাহির হইয়াছে — নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছে, কোথাও সন্ধান পাইয়াছে, কোথাও পায় নাই, কখনো কখনো এতই নিরাশ হইয়াছে যে, ফিরিয়া যাইবার কথাও মনে উঠিয়াছে। কাল যদি অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝড়টা না উঠিত — তবে হয় তো এত শীঘ্র সাক্ষাৎ ঘটিত না।

নবদম্পতীকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার পরে কিছুদিন উদয়নারায়ণ পৌত্রের নাম সহ্য করিতে পারিত না। কতজন পৌত্রের জন্য ওকালতি করিতে গিয়া তাড়া খাইয়াছে, কর্মচারী চাকরী হারাইয়াছে, দ্রবময়ী তো দিবারাত্রি চোখের জলে অন্ধকার দেখিয়াছে।

শেষে কেহ আর দর্পনারায়ণের নাম বৃদ্ধের কাছে তুলিত না। উদয়নারায়ণ একাকী গুম হইয়া বসিয়া থাকিত। প্রথমে তাহার আশা ছিল দর্পনারায়ণ অনুতপ্ত হইয়া চিঠি লিখিবে—মাস গেল, দুই মাস গেল চিঠি আসিল না। তার পরে সে ভাবিত দর্পনারায়ণ ফিরিয়া আসিবে—কেহ ফিরিল না। বৃদ্ধ দিবারাত্রি উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিত। পাছে সে আসিয়া ফিরিয়া যায়, তাই রাত্রিতে পর্যন্ত দেউড়ি বন্ধ করিবার হুকুম ছিল না। শীত গেল—বসন্ত আসিল—তবু নবদম্পতী ফিরিল না।

অবশেষে বৃদ্ধের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল—সে পৌত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইল। মুখে অবশ্য সে কথা বলিল না; সবাই বুঝিল—কিন্তু কেহ তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। উদয়নারায়ণ বলিল — সে জমিদারি পরিদর্শন করিতে যাইতেছে, গ্রামের সকলে বুঝিল পৌত্রের খোঁজে চলিয়াছে — তবু সকলেই মুখে বলিল — কর্তা জমিদারি দেখিতে চলিয়াছেন। একদিন ফাল্গুনের প্রভাতে বজরা সাজাইয়া বৃদ্ধ জমিদারি দেখিতে যাত্রা করিল।

এক সন্ধান পাইয়াছিল দর্পনারায়ণ চলন বিলের দিকে গিয়াছে — সেই দিকে তাহার বজরা চলিল। গ্রামে গ্রামে হাটে হাটে ও বড় নদীর নানা প্রশাখায় সন্তর্পণে সন্ধান করিয়া চলিতে তাহার সময় লাগিল। এই রকমে দুইমাস কাটিয়াছে। তাহার অনুসন্ধানের ইহাই ইতিহাস।

* * * *

উদয়নারায়ণ গর্জন করিয়া বলিয়াছে—হতচ্ছাড়া, হনুমান, তোর যেখানে খুসী যা। আমি তোর মুখ দেখতে চাইনে, তোকে বাড়ীতে ঢুকতেও দেব না। কিন্তু আমার নাতবৌকে, জোড়াদীঘির নাতবৌকে চাষার মধ্যে চাষার মত করে রেখেছিস। আমি আজই তাকে নিয়ে যাব। দেখি কে আটকায়।

সে নিশ্চয় জানিত কেহ তাহাকে বাধা দিবে না—বরঞ্চ বাঁচিতে পারিলেই এখন সবদিক রক্ষা হয় - ইহা উদয়নারায়ণও জানে—এই ভাবে কথা বলাই তাহার স্বভাব। এমন সময়ে আলিবক্সিকে তাহার চোখে পড়িয়া গেল - অমনি সে পুনরায় গর্জন করিয়া উঠিল—ওই বেটাই সর্বনাশের গোড়া, বেটা বজ্জাত, বেটা হারামজাদা। আলিবক্সি এতদিন কর্তার বহু-পরিচিত তর্জনা শোনে নাই, আজ শুনিয়া মনে ভারি স্বস্তি পাইয়া মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল।

উদয়নারায়ণ কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত নীচু করিয়া বনমালাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—দিদি, আমি আজই তোমাকে নিয়ে রওনা হই। শীগ্গির তৈরী হয়ে নাও।

তারা বলিল—আজকার দিনটা সময় না পেলে কি করে' গুছিয়ে নেওয়া যায় !

উদয়নারায়ণ তাচ্ছিল্য ও ঠাট্টার মাঝামাঝি সুরে বলিল — ওঃ আবার গুছিয়ে নেওয়া ! কত জমিদারি এখানে আছে ! আবার গুছিয়ে নেওয়া ! নাও, নাও ওঠ ! এখনি রওনা হ'তে হবে—এমনি অনেক দেরি হয়ে গেছে !

যাত্রার আয়োজন আরম্ভ হইল। কেহ কোন প্রকার বাধা দিতেছিল না, দিবার কল্পনাও করিতেছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ সকলের কথায়, মুখের ভাবে বাধা দেখিয়া যেন ক্ষেপিয়া উঠিতে লাগিল। আসল কথা বৃদ্ধ একটা বাধা জয় করিতে চাহে যে বাধা বাস্তবে নাই—তাহাকে সে কল্পনায় সৃষ্টি করিয়া জয় করিবার অনুমান করিতেছিল।

বজরা দুইখানি সজ্জিত হইল, যাত্রার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এমন সময়ে খবর পাইয়া গফুর নোটন পায়রাটি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

বনমালা বলিল—গফুর, তুই আমাদের সঙ্গে চল।

গফুর বলিল—আমার কি কোথাও যাওয়ার উপায় আছে? আমি যে পাহারা দিয়ে আছি।

বনমালা বিস্মিত হইয়া বলিল—পাহারা আবার কা'কে দিচ্ছিস্?

গফুর—দেখনি। ও: দেখবে কি করে'? তোমরা দেখ দিনের বেলা—মনে হয় এটা একটা বিল। রাতের বেলা যদি দেখতে!

বনমালা—রাতের বেলা আবার কি দেখব?

গফুর—দেখবে—একটা ডাইনি, উল্কামুখী ডাইনি মাঠের মধ্যে ঘু'রে বেড়াচ্ছে!

বনমালা ভীত হইয়া বলিল—বলিস কি রে?

গফুর বলিল, বলব আবার কি? হয় ও আমাকে নেবে, নয় আমি ওকে নেব! ও নিয়েছে আমার বউ, ছেলে, মেয়ে সব! আর আমি নিয়েছি—দেখনি আমার ক্ষেত খামার! হাঃ হাঃ···। খানিকটা হাসিয়া লইয়া আবার সে বলিতে লাগিল, তোমরা ভাব আমি চাষ করি, ফসলের দরকার! আমার একটা পেট, ফসলে আমার কি দরকার! ভিক্ষা করলেই তো চলে! তা নয়, তা নয়; আমি লাঙল দিয়ে বিলকে বশ করছি! একবার যেখানে লাঙলের আঁচড় পড়ে সে জায়গা থেকে ও ডাইনি চির কালের মত পালায়, সে জায়গায় আর ও কক্ষনো ঢুকতে পারে না!—এই পর্যান্ত বলিয়া একটু থামিয়া আবার সে আরম্ভ করিল, দেখনি রাতের বেলায় সারা মাঠ ওই উল্কামুখী ডাইনি ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু আমার ক্ষেতে আসতে পারে না। আমি যতদিন বাঁচব, কেবলি লাঙল দিয়ে যাব—ফসলে আমার কোন দরকার। বুঝলে না মা।

বনমালা বুঝিল কি না জানি না—বুঝিল বলিয়া বোধ হইল না। গফুর বলিল—আমি যেতে পারলাম না মা। তুমি এই পায়রা টা নিয়ে যাও। পাখীটা আমার বড় ভালবাসার ছিল—যখনই এটার কথা মনে হবে—তখনি তোমাকে মনে পড়বে। এই বলিয়া সে পাখীটি বনমালার হাতে দিল। পায়রা বনমালার পোষ মানিয়াছিল—সে-টা তাহার হাতে গিয়া বসিল।

তখন গফুর তাহার গ্রামাস্বরে গ্রাম্য ভাষায় অবোধ্য এক গান গাহিতে গাহিতে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিলের দিকে রওনা হইয়া কিছুক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পরে বনমালা, দর্পনারায়ণ, আলিবর্দ্দি ও তারা উদয়নারায়ণের সঙ্গে বামুন-ডাঙ্গা ত্যাগ করিয়া জোড়া-দীঘি যাত্রা করিল।

জোড়াদীঘি বনাম রক্তদহ

[১]

সংসারে সুখ সুলভ না হইলেও দুর্লভ নয়, দুঃখ তো পদে পদে, কিন্তু আনন্দ। আনন্দ সুলভও নয়, দুর্লভও নয়, একেবারে অপ্রাপ্য। অন্তত সংসারের বর্ত্তমানের গণ্ডীর মধ্যে তাহার সন্ধান মেলে না; কিন্তু পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইলে অতীতের কুহেলিকার ধূসরতার মধ্যে আনন্দ একেবারে দুর্লভ নয়। শুধু তাই নহে, আনন্দের প্রকৃতি অদ্ভুত, যেখানে তাহাকে কখনো আশা করা যায় না, হঠাৎ সেখানেই সে দেখা দেয়। আজ যাহাকে দুঃখ বলিয়া মনে করিতেছ, কিছু দিন পরে ফিরিয়া তাকাইও, দেখিবে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে আর দুঃখ নয়, সে যেন আনন্দের মতই। আজ যাহা অশ্রু, কাল তাহাতে মুক্তাকণার উজ্জ্বলতা! আজ যাহা দুঃখের দীর্ঘনিঃশ্বাস, কাল তাহা দুরাগত বসন্তের দক্ষিণ সমীরণ। তাই বলিতেছিলাম, আনন্দের প্রকৃতি অদ্ভুত, তাহা সুখও নয়, দুঃখও নয়, তাহা দুঃখ-সুখের রোমন্থন—তাহা স্মৃতিসাগর। দুঃখের স্মৃতি আর দুঃখদায়ক নয়, সুখের

স্মৃতিও সুখ নয়, তাহার আনন্দ! স্মৃতির স্বাতী নক্ষত্রের প্রভাবে দুঃখের অশ্রুবিন্দু মুক্তাফলের অনবদ্যতা লাভ করে।

ইন্দ্রাণী জীবনে কখনো সুখ পায় নাই, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে সে পথে চলিতেছিল; পিতৃহীন জীবনের দুঃখ, দর্পনারায়ণের সঙ্গে বিবাহ-বিভ্রাটের দুঃখ, পবরূপের সঙ্গে ঘটনাচক্রের বিবাহের দুঃখ—একটার পরে আর একটা। আজ বিবাহের পরে এই দুঃখের শোভাযাত্রা যখন শেষ হইল সে একবার পিছনে ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু এ কি! সে বিস্মিত হইয়া গেল। দুঃখের সে শবযাত্রা গেল কোথায়। আর্ত হাহাকারের সে বুক-ফাটা করুণ ধ্বনি তো আর তেমন মর্মন্তুদ নয়। তাহার মনে হইল, সৃষ্টির মধ্যে কোথায় কে যেন একজন বসিয়া আছেন, যিনি সুখ দুঃখের পরিমাণ স্মৃতিকে সযত্নে যোগ করিয়া আনন্দের [illegible] দান করিতেছেন। তাঁহার নিপুণ কৌশলে সুখ দুঃখের শোভাযাত্রা সৃষ্টির শোভাযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। সীতা দেবী যেদিন মোহনবিলাসকক্ষে অরণ্যকালের দুঃখের ঘটনা আলেখ্য চিত্ররূপে দেখিয়াছিলেন—সেদিন কি তিনি অবিমিশ্র দুঃখ পাইয়াছিলেন? তাঁহার সেদিনকার অশ্রুবিসর্জনের মধ্যে ব্যথা ছাড়াও আর একটি ভাব ছিল—তাহা আনন্দ। দুঃখের স্মৃতি যদি দুঃখের মতই বিস্বাদ হইত তবে মানুষ বাঁচিত না। মানুষের দুঃখ স্মৃতি একটি অতীতে নিবদ্ধ, কোনো আনন্দ, অস্পষ্ট ভবিষ্যতে নিবদ্ধ, যেখানে আশা। বর্তমানটা মানুষে অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলে, যাহাকে সুখ মনে করে তাহা সুখ, যাহাকে দুঃখ মনে করে তাহা দুঃখ নয়।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইয়া ভাবিল—এ কি! পিতৃমাতৃহীনতা তেমন দুঃখদায়ক কই। দর্পনারায়ণের অপমানের প্রান্তেও আনন্দের ভাস্বরতার একটা আভাস। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সেখানের দিক্‌মণ্ডল মুক্তার রসে ভিজিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে—আশার নক্ষত্রোদয়ের পূর্বরাগে! ইন্দ্রাণী জীবনকে গভীর ভাবে বুঝিতে পারিয়াছে; জীবনকে বুঝিবার কোন বাঁধা বয়স নাই; দুঃখের অভিজ্ঞতার চাপ যাহার উপরে যত বেশী পড়ে, সে জীবনকে তত বেশী বোঝে, তত শীঘ্র বোঝে: মৃৎস্তরের চাপ যেখানে লঘু সেখানে আদিম অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ কয়লারূপেই থাকে, যেখানে প্রবল—সেখানে বনস্পতিস্তূপ হীরক হইয়া ওঠে।

ঊর্ণনাভ জাল পাতিয়া নিশ্চল সংকল্পে মাঝখানে অপেক্ষা করিয়া থাকে, হতভাগ্য শিকার জালে পড়িলে সে নীরব সকৌতুকে দেখে, তখনই তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে না; শিকার ক্রমে জালে জড়াইতে থাকে, ঊর্ণনাভ কেবল দেখিয়া যায়, অবশেষে এক সময়ে ক্লান্ত শিকারের উপরে গিয়া পড়িয়া তাহাকে আত্মসাৎ করে। চাপা ঠাকুরাণী সেই ঊর্ণনাভ। ইন্দ্রাণীর অলককে লইয়া সে যে জাল বুনিয়া তুলিয়াছিল—ইন্দ্রাণী তাহাতে শিকার, সে দেখিল, দেখিয়া পরম প্রীত হইল—তাহার কাছে ইন্দ্রাণী ও পবরূপ উভয়েই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সে বুঝিল, এখনো শিকারের উপরে পড়িবার সময় হয় নাই, তবে সময় আসন্ন সে দিন আসিতেছে।

পবরূপ ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া পাইলোমের পথের প্রথম ভয়ঙ্কর বাধাটা অতিক্রম করিয়াছে। ইহাতেই তাহার যাহা আনন্দ, ইন্দ্রাণীকে সে বোঝে না—বুঝিতে চেষ্টাও করে না। বোধ করি তাহাকে বুঝিবার শক্তিও তাহার নাই। তবে বাহিরের দিক হইতে সে লাভই আছে। ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিয়া তাহার দাবিদার দল হইয়াছে, এখন সে ধনী জমিদার, দেশে তাহার কিছু নিষ্কর সম্পত্তি ছিল যাহা বিক্রয় করিয়া কোনরূপ দেনা পরিশোধ করিল, পবরূপ রায় এখন আর [illegible] জমিদার নয়, [illegible] মালিক, ধনী জমিদার।

ইন্দ্রাণী ও পবরূপ দর্পনারায়ণের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। চাপাও অপেক্ষা করিতে লাগিল—কোন ব্যক্তির নয়, শিকারের লগ্নের, শিকারের পথ পাকা শিকারী-ই জানে: অন্যের পক্ষে তাহা বোঝা সম্ভব নয়।

[২]

একদিন প্রাতে জোড়াদীঘির লোকে দেখিল দুইখানা বড় বজরা গ্রামের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। কর্তা নামিল, দর্পনারায়ণ নামিল, আর্দালি নামিল; চৌধুরী-বাড়ী হইতে পাল্কী আসিল—সবশেষে নূতন বধূ পাল্কীতে করিয়া নামিল। চৌধুরী-বাড়ী অনেকদিন পরে কর্তার হাঁক-ডাকে ও অট্টহাসিতে মুখর হইয়া উঠিল।

প্রথম কিছুক্ষণ আলাপ-পরিচয়ের পালাতে কাটিল। আত্মীয় স্বজনেরা আসিল—গ্রামের ভদ্রলোকেরা আসিল—

চাকর-বাকর, পাইক-বরকন্দাজ, আমলা, গোমস্তার দল আসিল। সকলে এক বাক্যে দর্পনারায়ণকে জানাইয়া দিল, এতদিন তাহারা তাঁহার অভাবে বিনিদ্র হইয়া কালযাপন করিতেছিল, এক্ষণে কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিতেছে।

ইন্দ্রাণীর জন্য যে নূতন মহল তৈরী হইয়াছিল, এতদিন তাহা শূন্য পড়িয়াছিল—বনমালা তাহা পূর্ণ করিয়া বসিল। সে সব ঘর নূতন করিয়া চুণকাম করা হইল—সেখানে নূতন দাস দাসী নিযুক্ত হইল—আর তেতালার প্রশস্ত কক্ষে মকর-মুখো হাতীর দাঁতের কাজ করা পালঙ্কে বনমালার প্রতিষ্ঠা হইল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব যে বনমালাকে দেখিল, তাহার ব্যবহারে ও রূপে মুগ্ধ হইল। সকলেই বলিল—হাঁ চৌধুরী-বাড়ীর যোগ্য বউ বটে। উদয়নারায়ণ ইন্দ্রাণীকে বলিতেন, রক্তদহের রক্তকমল, এখন বনমালার নাম দিলেন—ভাগীরথীর শ্বেতপদ্ম।

সত্য কথা বলিতে কি, ইন্দ্রাণী এ বাড়ীতে বধূরূপে আসিলে সকলে এমন খুশী হইত না, কারণ তাহার রূপ এমন সর্ববাদী-সম্মত নয়; সে-রূপ বিরাট সৌন্দর্য্যময়, তাহা পোকুতজনের চোখে হঠাৎ ধরা পড়ে না—তাহা দেখিতে হইলে অভ্যস্ত চক্ষু আবশ্যক। বনমালার রূপ মুগ্ধ সৌন্দর্য্যময়, তাহা একান্ত ভাবে লৌকিক—দেখিবামাত্র ভাল লাগে।

উদয়নারায়ণ অনেকদিন পরে বৈঠকখানায় বসিলেন, দেওয়ানজীর ডাক পড়িল। দেওয়ানজী আসিলে উদয়নারায়ণ বলিলেন, বুঝলে হে, তোমরা ভাবছ আমি গিয়ে দর্পনারাণকে সেধে নিয়ে এসেছি—এ কথা মোটেই সত্যি নয়। এই বলিয়া তিনি দেওয়ানের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

দেওয়ানজী সবই বুঝিতে পারে, কাজেই বলিল—আজ্ঞে এ কথা আর যেই বিশ্বাস করুক, আমি তো বিশ্বাস করি না।

উদয়নারায়ণের তবু যেন সন্দেহ গেল না, জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে কি বিশ্বাস কর?

দেওয়ানজী দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল—দাদাবাবুই আপনার কাছে কেঁদে পড়েছিলেন।

উদয়নারায়ণ ঋজু হইয়া বসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—নাঃ তোমার বুদ্ধি আছে! তুমি ঠিক ধরেছ। কিন্তু বোধ হয় সবাই এ কথা বিশ্বাস করে না; তাদের ধারণা আমিই গিয়ে ওদের সেধে এনেছি।

আসল কথা উদয়নারায়ণের বিশ্বাস সকলেই ব্যাপারখানা বুঝিয়াছে, কাজেই তিনি প্রত্যেকের মুখেই নিজের দুর্ব্বলতার ইতিহাসের চিহ্ন যেন দেখিতে পাইতেছেন।

উদয়নারায়ণ স্বর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কি বলে বেড়াচ্ছে? বলছে আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি।

দেওয়ানজী কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—আরে রাম। এমন কথা বলবেন দাদা বাবু।

উদয়নারায়ণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—যাক্ তবু ধর্ম্ম আছে। তার পরে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, রামজয় (দেওয়ানের নাম রামজয় লাহিড়ী, কর্ত্তা যখন মন খুলিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলেন তখন নাম ধরিয়া ডাকেন) আমি তো বুড়ো হয়ে পড়েছি—

কথাটা কি ভাবে লইতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া দেওয়ানজী কোন কথা বলিলেন না—

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বল রামজয়? রামজয় সত্যটাকে যতদূর সম্ভব হাল্কা করিয়া বলিলেন—তা হল বই কি?

কর্ত্তা বলিলেন—তবেই দেখ। আজ একটা পরামর্শ করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। এই বলিয়া তিনি দেওয়ানজীর কাছে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হইল এবং দুজনের মুখ দেখিয়া মনে হইল আলোচ্য বিষয়ে উভয়ে একমত।

সেদিন বিকালে চৌধুরী-বাড়ীর লোক টোলে গিয়া ভট্টাচার্য্যকে জানাইল, কর্ত্তা তাহাকে ডাকিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের দ্বিপ্রহরিক নিদ্রা সবে ভাঙিয়াছে, কাজেই তিনি নিজে না গিয়া ডাকিলেন—বাণীবিজয় ও বাণী; আছ না কি?

বাণীবিজয় পাশের ঘরেই ছিল। সে মিথ্যা কথা অবশ্য বলে না, তাই বলিয়া সত্য গোপন করিতে বাধা নাই। সে যতক্ষণ পারিল চুপ করিয়া থাকিল, কিন্তু যখন বুঝিল এবার উত্তর না দিলে ভট্টাচার্য্য স্বয়ং আসিবেন, তখন সে বলিল—আজ্ঞে, এইখানেই আছি।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বটে! এত মনঃসংযোগ করে কি করছ?

বাণীবিজয় বলিল—আজ্ঞে কালিদাস-কৃত কুমারসম্ভব চর্চ্চা করছিলাম—

ভট্টাচার্য্য—চিরদিন কুমারসম্ভবই করলে—'রঘু'খানা দেখলে না—

বাণীবিজয় উত্তর করিল—আজ্ঞে অগ্রে কুমার তৎপর তো বংশ!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—সে কথা ঠিক।

কিন্তু বাণীবিজয় যে-অর্থে বলিল—ভট্টাচার্য্য সে অর্থ ধরিতে পারিলেন না। পারিবার কথাও নয়, কারণ ভট্টাচার্য্য জানিতেন না যে, বাণীবিজয়ের ঘরে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পুঁটি নাম্নী গোপ-যুবতী অবস্থান করিতেছিল।

বাণীবিজয় ভট্টাচার্য্যের কাছে আসিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাণী, চৌধুরী-কর্ত্তা ডেকে পাঠিয়েছেন—একবার গিয়ে শুনে এস তো ব্যাপার কি!

বাণীবিজয় চৌধুরী-কর্ত্তাকে মনে মনে ভয় করে, বিশেষ দর্পনারায়ণের বিবাহের পৌরোহিত্য করিবার পরে সে আর চৌধুরীদের দেউড়ি পার হয় নাই—কাজেই মনে মনে বিতর্ক করিয়া বলিল—আজ্ঞে যেখানে মহাশয়ের আহ্বান সেখানে কি আমার—

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, অকালে তাঁহার আলস্য ভঙ্গ হয়, কাজেই বলিলেন—শিষ্য গুরুর প্রতিভূস্বরূপ, যাও তুমি গেলেই কাজ হবে।

গত্যন্তর নাই দেখিয়া বাণীবিজয় চৌধুরী-বাড়ী রওনা হইল।

চৌধুরী-কর্ত্তা তখন সুবৃহৎ আলবোলায় ধূমপান করিতে-ছিলেন; বাণীবিজয় গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইল। কর্ত্তা বলিলেন—এই যে বাণী, ব'স, ব'স; তার পরে ভট্টাচার্য্য কই? বাণীবিজয় ভট্টাচার্য্যের অনুপস্থিতির একটা কারণ বলিল।

কর্ত্তা বলিলেন—সে না হলে হবে না। তুমিও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু সে হচ্ছে বয়োবৃদ্ধ, তাকে চাই। তুমি যাও গিয়ে তাকে নিয়ে এস। অবশ্য, তুমিও সঙ্গে এস।

বাণীবিজয় পুনরায় একটি প্রণাম করিয়া ভট্টাচার্য্যকে আনিতে টোলে রওনা হইল।

সন্ধ্যাবেলা ভট্টাচার্য্য আসিলে বৈঠকখানায় মন্ত্রণা-সভা বসিল। ফরাসের উপরে গালিচায় চৌধুরী-কর্ত্তা—গালিচা হইতে একটু দূরে দেওয়ানজী ও ভট্টাচার্য্য—ভট্টাচার্য্যের পশ্চাতে যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া বাণীবিজয় আসীন।

চৌধুরী-কর্ত্তা বলিলেন—কি বল ভট্টাচার্য্য, আমার তো বয়স হল।

ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার বয়স হইবার অনিবার্য্য অপরাধটা তুরন্ত কালের উপর চাপাইয়া বলিলেন—তা তো হলই, কারণ কালস্য কুটিলা গতিঃ—

কর্ত্তা বাক্যকোব শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা পাইয়া খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত হইলেন; বলিলেন—তবেই দেখ, এ বয়সে কি আর আমার জমিদারী দেখা সম্ভব, না উচিত?

সকলে নীরবে এই যুক্তির সত্যতা যেন স্বীকার করিল।

কর্ত্তা আবার আরম্ভ করিলেন—বুঝলে ভট্টাচার্য্য, দেওয়ানজী বলছিল, এখন দর্পনারায়ণকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দিলেই ভাল হয়।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—এর চেয়ে আর উত্তম পন্থার কি হ'তে পারে—

কর্ত্তা বলিলেন—তা হলে তোমার আপত্তি নাই? আমি ভাবছিলাম কি জান—বিষয় সম্পত্তি, জমিদারী যা আছে, ওর নামে এখন সব করে দেব, নিজের ঘাড়ে জোয়াল না নিলে কি দায়িত্ব জ্ঞান আসে। কি বল ভট্টাচার্য্য?

ভট্টাচার্য্য আর কি বলিবেন—কর্ত্তার উপর কথা বলিবার সাহস কাহারও নাই।

—তাই বলছিলাম কি জান—কর্ত্তা আবার শুরু করিলেন, একটা ভাল দিন দেখে, দেবতা, গুরু-পুরোহিতকে স্মরণ করে শুভ কাজটা আরম্ভ করা যাক।

কর্ত্তা থামিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন—এ তো আপনার ন্যায় কথাই বটে। এত বড় একটা কাজ দেব-দ্বিজকে সন্তুষ্ট না করে আরম্ভ করা উচিত নয়।

কর্ত্তা বলিলেন—এ দিকের সব কাজ দেওয়ানজী ঠিক করবে; প্রজাদের খবর দেওয়া—নূতন করে নাম জারি করা সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি এক কাজ কর; একটা ভাল দিন দেখে দাও খুব শীগ্‌গীর। আর এই উপলক্ষ্যে পূজার জন্যে কি কি উপকরণ তোমার চাই, ধুতি, শাড়ি, তৈজসাদি—তার একটা ফর্দ [illegible]।

ভট্টাচার্য্যের আজ সুপ্রভাত বটে! একেবারে অসম্ভব রকম কিছু নয়, তবে বছরের এ সময়টায় অপ্রত্যাশিত বটে। প্রত্যেক বছর পূজার সময় চৌধুরী-বাড়ী হইতে ধুতি, শাড়ি, তৈজসাদি, ঘৃত, তণ্ডুল যাহা সে পায়, তাহাতে তাহার সারা বছরের খরচ চলিয়া যায়। কিংবা ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে বলা চলে, আর বলিলেই বোধ হয় যথার্থ হয়। সারা বছরের তাহার যাহা সাংসারিক প্রয়োজন, সেই অনুসারে সে পূজোপকরণের ফর্দ্দ করিয়া দেয়। কিন্তু বর্ত্তমান উপলক্ষটা নূতন—কাজেই হঠাৎ আয়টাও একেবারে উপরি পাওনা।

ভট্টাচার্য্য তখনি একটা মনগড়া ফর্দ্দ দিতে প্রস্তুত হইতেছিল, কিন্তু পিছন হইতে বাণীবিজয় বাধা দিয়া মৃদু স্বরে বলিল, মহাশয়, এ রকম বৃহৎ ব্যাপারে বস্ত্রাদি সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু বলা ভাল নয়, পণ্ডিতদেরও ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। ভট্টাচার্য্য বাণীবিজয়ের ইঙ্গিত বুঝিয়া কর্ত্তাকে বলিল, কর্ত্তা আমার এই ছাত্রটি বেশ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠেছে। (শাস্ত্রজ্ঞ অপেক্ষা বস্তুজ্ঞ বলিলেই সত্য বলা হইত।)

কর্ত্তা স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, সে আমি দেখেছি। বাণীবিজয় বেশ লায়েক হ'য়ে উঠেছে। দেওয়ানজী, বাণীবিজয়ের বিদায়ের ব্যবস্থা যেন উপযুক্তরূপে করা হয়।

কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, বাণীবিজয়ের মনোভাব ভট্টাচার্য্য খানিকটা বুঝিলেও সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কয় দিন হইতে তাহার মনে বড় অশান্তি চলিতেছে; শ্রীমতী পুঁটি তাহাকে একখানা প্যাটেন শাড়ির জন্য মাসাধিক কাল হইতে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে; বাণীবিজয় দিব-দিচ্ছি করিয়া অনেক দিন কাটাইয়াছে, কিন্তু তাহার বদান্যতার উপরে পুঁটির বিশ্বাস ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—সে বাণীবিজয়ের কাছে আসা ও তাহার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। আজ বিকালে যখন সে কুমারসম্ভব আলোচনা করিতেছিল লিয়াছিল, তখন সে একেবারে মিথ্যা কথা বলে নাই। কল বসনে উমাকে কেমন মানাইয়াছিল, সেই নজীর দেখাইয়া সে পট্ট-বসনলুব্ধা পুঁটিকে ধৈর্য্য ধারণ করিতে নির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিল।

এখন হঠাৎ এই সুযোগে সে হাতে যেন স্বর্গ পাইল—বাণীবিজয়ের স্বর্গ মানে পুঁটি)। কিন্তু পাছে ভট্টাচার্য্যের ...এমন পট্ট-সুযোগ ফস্কাইয়া যায়, তাই সে তাড়াতাড়ি ভট্টাচার্য্যকে হঠকারিতা করিতে নিষেধ করিল।

কর্ত্তা বলিলেন—সে কথা ঠিক—হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়, ভট্টাচার্য্য। বিশেষ এত ত্বরাও নেই। তুমি যাও, ভেবে-চিন্তে পাঁজি-পুঁথি ঘেঁটে আমাকে দু'চার দিন পরে জানিও। তখন ভট্টাচার্য্য তাহার লায়েক ছাত্র কর্ত্তার নিকট হইতে বিদায় লইলে সেদিনকার মত মন্ত্রণাসভা ভঙ্গ হইল।

[৩]

একদিন সকাল বেলা ইন্দ্রাণী শুনিতে পাইল দর্পনারায়ণ সস্ত্রীক জোড়াদীঘিতে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমে খবরটা সে বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু ক্রমে নানা লোকের মুখে একই সংবাদ শুনিয়া শুনিয়া আর অবিশ্বাসের স্থান রহিল না। দর্পনারায়ণ যে শুধু ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা নহে—স্বয়ং চৌধুরী-কর্ত্তা গিয়া অনুরোধ করিয়া তাহাদের ফিরাইয়া আনিয়াছেন; লোকের মুখে সে শুনিল, পৌত্রবধূর মুখ দেখিয়া তিনি পৌত্রের অপরাধ ও ইন্দ্রাণীর কথা ভুলিয়াছেন।

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ইন্দ্রাণী অধর দংশন করিয়া তেতালার ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল।

বিধাতাপুরুষ রসিক বটেন! মানুষে দুঃখের কথা প্রায় যখন ভুলিয়াছে, তখন হঠাৎ তিনি অতি তুচ্ছ একটি ঘটনার দ্বারা বিস্মৃত দুঃখকে স্মরণ করাইয়া দেন; শান্তি তো দূরের কথা, স্বস্তি দিতেও তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা।

ক্ষণকালিক বিস্মৃতির পরে দ্বিগুণ তীব্রভাবে দর্পনারায়ণের কথা ইন্দ্রাণীকে ব্যথিত করিয়া তুলিল—সে কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া একাকী বসিয়া জীবন-সমুদ্রে বারংবার চিন্তা-জাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং প্রতিবারই রত্নের পরিবর্ত্তে বীভৎস সব জল জন্তু, ভগ্ন তরণীর হাল, নঙ্গর উঠিতে লাগিল। রত্নাকর নাম কেবলমাত্র আংশিক ভাবে সত্য।

ইন্দ্রাণী বনমালার কথা ভাবিতে লাগিল। দর্পনারায়ণের উপর তাহার যে রাগ ছিল, তাহার অনেকখানিই বনমালার উপরে পড়িল। ইন্দ্রাণী ভাবিতে লাগিল, বনমালা দেখিতে কেমন? সে কি এতই সুন্দরী, ইন্দ্রাণীর অপেক্ষাও, যে দর্পনারায়ণকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া লইল।

ভারতে বৈদেশিক মূলধন

—শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী

আমাদের দেশে যথেষ্টসংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইলে যে প্রচুর মূলধন আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই মূলধন দুই ভাবে সংগৃহীত হইতে পারে। যদি আমরা সকলেই দ্বিধা ও সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মূলধন প্রয়োগে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে দেশীয় মূলধনের সাহায্যেই শিল্পের দ্রুত প্রসার সম্ভব। মহাযুদ্ধের পর হইতে এই বিষয়ে আমরা অনেকটা উৎসাহী হইয়াছি সন্দেহ নাই। তথাপি যথেষ্ট মূলধন এই উদ্দেশ্যে দেশবাসিগণ সরবরাহ করিতেছে না এবং এই জন্যই এ দেশের শিল্পের বহুলাংশ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে। তাই বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বিদেশী মূলধনের সাহায্য লইতে হয়। মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মূলধন এ দেশে প্রবেশলাভ করিতেছে এবং ইহার সাহায্যে নানা প্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং হইতেছে। এই ভাবে কোটি কোটি টাকার মূলধন এখানে ব্যবহৃত অবস্থায় রহিয়াছে এবং ইহা বলা ভুল হইবে না যে, বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যেই ভারতে শিল্পযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছে।

কিন্তু এই প্রকারে বিদেশী মূলধনকে অবাধে এ দেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত কি না—এই প্রশ্নটি রক্ষণ-শুল্ক-নীতি (policy of protection) অবলম্বিত হইবার পর হইতেই বিশেষ ভাবে বিবেচ্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, যদি দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোন দেশ বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণ করে, তাহা হইলে বিদেশী উৎপাদনকারী সেই দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া শুল্কভার লাঘব করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া উঠে। অবাধ-বাণিজ্য-নীতির (policy of free trade) আমলেই বিদেশী মূলধনের সহায়তায় এ দেশে নানাপ্রকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আবার রক্ষণ-শুল্ক-নীতি অবলম্বিত হওয়ার নিমিত্ত এ দেশে বৈদেশিক মূলধনের প্রবেশলাভের প্রবৃত্তি আরও প্রবল হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সব বিবেচনা করিয়া অনেকে বলেন যে, এই নূতন [illegible] বিজাতীয় মূলধনকে অবাধে প্রবেশ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রক্ষণ-শুল্ক-নীতির মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং এক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্য-শিল্পের প্রকৃত উন্নতি এবং দ্রুত প্রসার সহজ হইবে না। কারণ, বিদেশী পণ্য-প্রস্তুতকারিগণ দূরদেশ হইতে ভারতীয় পণ্য-উৎপাদনকারীদের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া ভারতেই শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবে এবং শুল্ক-প্রাচীরের (tariff wall) সম্পূর্ণ সুযোগ লইয়া ভারতীয় শিল্পের উন্নতির ও প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। এক কথায়, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, রক্ষণ-শুল্ক-নীতি এবং বিদেশী মূলধনের এ দেশে প্রবেশ-লাভ বিষয়ে অবাধ-বাণিজ্য নীতি—এক প্রকার বিপরীতবাদী বলিয়াই চলে। অর্থাৎ দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের নিমিত্ত রক্ষণ-শুল্ক-নীতি অবলম্বন করিয়া আর বিদেশী মূলধনকে অবাধে এ দেশে প্রবেশ লাভ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। তাই তাঁহারা বলেন যে, এই প্রকার মূলধনের উপর কয়েকটি স[illegible] ধার্য্য করা অতি প্রয়োজনীয়।

কারণ, বিজাতীয় মূলধনের সাহায্যে আমাদের দেশে শি[illegible] প্রতিষ্ঠিত হওয়া নানা দিক্ হইতেই বাঞ্ছনীয় নহে। প্রথমতঃ, এই প্রকার শিল্পের অধিকাংশ লাভ বিদেশী বণিকের প্রাপ্য এবং যদি এই ভাবে শিল্পের লভ্যাংশ বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক উন্নতি বহুলাংশে বাধাপ্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। আবার বিদেশী মূলধনে পরিচালিত শিল্পে[illegible] উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ সকলেই বিদেশী। তাই এ দেশের লোকেরা এই সব শিল্পের উন্নতি, প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ে নৈপুণ্য লাভ করিবার সুযোগ পায় না। রাজনৈতিক কারণেও বিদেশী মূলধনের আগমন আনন্দের বিষয় নহে। বিদেশী বণিক এবং ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক মহলে খুব প্রভাব প্রতিপত্তি আছে এবং তাঁহাদের এই প্রতিপত্তি ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থিক প্রগতির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

কিন্তু তাই বলিয়া বিজাতীয় মূলধন ভারতের আর্থিক উন্নতির কোন প্রকার সহায়তা করিতেছে না—এই কথাটাও

ঠিক নহে। আমাদের দেশে নানা প্রকার লাভজনক শিল্পের প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়াছে। কিন্তু শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হইতেছে যথেষ্ট মূলধনের অভাব। সুতরাং দেশীয় এবং বিদেশীয় মূলধনীরা যদি একযোগে এই অভাব মিটাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হন, তাহা হইলে এ দেশে শিল্পের দ্রুত প্রসার হইবে। এই ভাবে যদি অধিকসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক দুর্দশা অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে। আবার যে যে পণ্যের উপর শুল্ক নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেই সব পণ্যের মূল্য এ দেশে বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। ইহার ফলে দেশের জনসাধারণকে কিছু কাল কতকটা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু দেশীয় শিল্প স্বাবলম্বী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিলে তাহারা আবার স্বল্প মূল্যে পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। এখন বিদেশী মূলধনীর সহায়তায় যদি শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়, তাহা হইলে দরিদ্র জনসাধারণ শুল্কভার (burden of protection) হইতে শীঘ্র অব্যাহতি পাইতে পারে। আবার বিদেশী উৎপাদনকারী দ্বারা পরিচালিত শিল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করিয়া যে, দেশীয় উৎপাদনকারী অনেক পরিমাণে শিল্পনৈপুণ্য লাভ করিবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উৎসাহী হইবে, তাহাও আমরা অস্বীকার করা যায় না। চতুর্থতঃ, ইহাও বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী পণ্য প্রস্তুতকারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এ দেশে লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং তাহাদের ভাগ্য বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া কোন্ শিল্পের প্রসার সম্ভব এবং কোন্ শিল্প অলাভজনক, সেই সম্বন্ধে একটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী মূলধন ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এক দিক্ দিয়া আমরা লাভবান হইতেছি। কিন্তু অনেকে বলেন যে, বিদেশী মূলধনী রক্ষণশুল্কের সম্পূর্ণ সুবিধা ভোগ করে। তাই তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, ভারতের মূল স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বিজাতীয় মূলধনীকে কয়েকটা সর্তাধীনে এ দেশে পণ্য প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেওয়া যুক্তিযুক্ত। এই প্রশ্নটা বিচার করিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, কী কী ভাবে বিদেশী মূলধন এ দেশে প্রবেশ লাভ করে। প্রথমতঃ, আমরা বিদেশী মহাজনের নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে মূলধন ধার করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। এই স্থলে বিদেশী মহাজনদের শিল্পের উপর কোন কর্তৃত্ব থাকে না এবং যদি ভারতের পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে অল্প সুদে টাকা ধার করা যায় তাহা হইলে এই প্রকারে loan capital সংগ্রহ করা কোন ক্রমেই অনিষ্টকর নহে। আমেরিকা এবং জাপানের শিল্পের এত দ্রুত প্রসার loan capital এর সাহায্যেই সম্ভব হইয়াছে।

কিন্তু সাধারণতঃ বিদেশী মূলধনীগণ আমদানী শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত শুল্ক প্রাচীর অতিক্রম করিয়া এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং বিনা বাধায় নবজাত দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। বিদেশী মূলধন ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি আমরা আলোচনা করিয়াছি, সেইগুলি এই প্রকার মূলধনের (investment capital) ব্যাপারেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এবং অনেকে মনে করেন যে, এই সব অবস্থায় বিদেশী মূলধনীকে বিনা সর্ত্তে এ দেশে শিল্প স্থাপন করিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না।

এই প্রকার মূলধনীর উপর যে কয়েকটা প্রধান সর্ত্ত প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে, সেইগুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত এবং সম্ভবপর, সেই কথা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রথম প্রস্তাবটা হইতেছে এই যে, বিদেশী মূলধনীকে ভারতেই শিল্প সংগঠন করিতে হইবে এবং শেয়ারের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় সাধারণে ধার্য্য করিতে হইবে। তাহা হইলে এদেশের মূলধনীরাও ইচ্ছা করিলে এই সব শিল্পের অংশীদার হইবার সুযোগ পাইবেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করা খুব সহজ নহে। যে সব শিল্প ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে-সব শিল্পের মূলধন শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগৃহীত হয় না, সেই সব শিল্প এই সর্ত্তের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা দাবী করা হইয়াছে যে, এই সব কোম্পানীর নির্দ্দিষ্টসংখ্যক শেয়ার ভারতীয় মূলধনীদের নিকট বিক্রয় করিতেই হইবে। এই প্রস্তাবটি কার্য্যকরী করিতে হইলে ভারতীয় অংশীদারদের শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ভারতীয় মূলধনীদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহার ফলে তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। তৃতীয় দাবী হইতেছে এই যে, ডিরেক্টরদের মধ্যে

নির্দ্দিষ্ট কয়েকজন ভারতীয় হইবেন। ভারতীয় অংশীদারদের সংখ্যা যাহাই হউক, যদি বলা হয় যে, এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ ডিরেক্টর ভারতীয় হইতেই হইবেন, তাহা হইলে বিদেশী মূলধন নিশ্চয়ই এদেশে আকৃষ্ট হইবে না। কারণ মূলধনীদের যাহাদের উপর আস্থা আছে, এমন লোককেই ডিরেক্টর নিযুক্ত করিতে তাঁহারা সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত। অন্যদিক হইতে বিবেচনা করিলেও প্রস্তাবটি অর্থশূন্য মনে হয়। ভারতীয় অংশীদারেরা ইচ্ছা করিলেই ভারতীয় ডিরেক্টর নিযুক্ত করিতে পারেন। এইজন্য কোন আইন প্রণয়নের আবশ্যকতা নাই। এবং ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই প্রকারের সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন তোলা কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহাও বিচার্য্য। সর্ব্বশেষে এই দাবী করা হয় যে, বিদেশী শিল্পের পরিচালকগণকে ভারতীয় শ্রমিকদিগকে শিল্পনৈপুণ্য আয়ত্ত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা দিতে হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারেও আইন দ্বারা ভাল ফল লাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। পরিচালকগণকে অনিচ্ছায় বাধ্য হইতে হইলে তাঁহারা যে শিক্ষা দান করিবেন, তাহা কতদূর কার্য্যকরী হইবে বলা যায় না। আবার ইহাও মনে রাখা উচিত যে, বিদেশ হইতে অধিকসংখ্যক দক্ষ শ্রমিক আমদানী করিয়া শিল্প পরিচালনা করা এত ব্যয়সাধ্য যে, বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে এ দেশের সুদক্ষ শ্রমিকের সাহায্য লইতে হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী মূলধনীর উপর উল্লিখিত সর্ত্তগুলি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে। আবার বিজাতীয় মূলধনীদের পক্ষে নানা প্রকারে এই সর্ত্তগুলি এড়াইয়া চলা একেবারে অসম্ভব নহে বলিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এই প্রকার সর্ত্ত প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যে বিদেশী মূলধনীরা পূর্ব্বের ন্যায় প্রচুর মূলধন এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করিতে থাকিবেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না। তাই অনেকে আশঙ্কা করেন যে, এই প্রকার কঠোর বাধা প্রদানের ফলে হয় তো ভারতে বিদেশী মূলধনের আমদানী এবং ভারতে শিল্পের প্রসার বহুলাংশে বাধা প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু অন্য একভাবেও বিদেশী মূলধন এ দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। ভারত সরকার বিজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারীকে কোন শিল্প ‘একচেটিয়া’ ভাবে স্থাপন করিবার অনুমতি দান করিতে পারেন, অথবা তাঁহাকে শিল্পস্থাপন বিষয়ে আর্থিক সাহায্য করিতে পারেন। এই প্রকার সুস্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট সুবিধা পাইবার জন্য তাঁহাকে সরকারের দ্বারস্থ হইতে হইবে এবং এই প্রকার সুবিধার বিনিময়ে সরকার ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সহজেই তাঁহার উপর কয়েকটা সর্ত্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এবং তাহা করাই উচিত। কারণ এই অবস্থায় বিদেশী মহাজন ভারতে বিশেষ সুবিধা ভোগ করিবেন।

যদি ভারতীয় মহাজনগণ এই প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে উৎসাহী না হন, তাহা হইলে বিদেশী মূলধনের উপর কয়েকটি সর্ত্ত প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক এবং সকলেই স্বীকার করেন যে, ঐ সব কোম্পানী ভারতে সংগঠিত করা, কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতীয় হওয়া এবং ভারতীয়দিগকে শিল্পনৈপুণ্য শিক্ষা দিবার সুযোগ দিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া খুবই যুক্তিযুক্ত এবং অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু শেয়ারের কিয়দংশ ভারতীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। অবশ্য কর্ম্মকর্ত্তা মনোনয়ন ব্যাপারেও অংশীদারদিগকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়াই প্রশস্ত। কিন্তু এই সব কোম্পানীর ব্যাপারে এই কয়েকটি সর্ত্ত প্রয়োগ না করিলে ভারতের মূল স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব হইবে না।

সর্ব্বশেষে ইহা মনে রাখা দরকার যে, ভারতে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে কালক্রমে তাহা ভারতীয়দেরই সম্পদ্ হইবে। ভারতের এই আর্থিক নব নব পরিকল্পনার মুহূর্ত্তে আমরা যদি কোন প্রকার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া বিদেশী মূলধনের আমদানী বন্ধ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠি, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক উন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এবং ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, এই সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান হইতেছে ভারতীয় মূলধন প্রচুরতর পরিমাণে শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য নিয়োগ করা এবং ভারতে বিবিধ ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর করা।

অমাবস্যার রাত্রে বা কার্ত্তিক-শুক্ল প্রতিপদে অর্থাৎ দীপান্বিতার রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সমস্ত রাত্রিব্যাপী নানাবিধ দ্যূতক্রীড়া ও নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে। দীপান্বিতা উৎসবে অগ্নিক্রীড়া ও গৃহ-সকল আলোক-বর্ত্তিকায় সজ্জিত করার প্রথা বোধ হয় প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। এই উৎসবের অপর নাম দ্যূতপ্রতিপদ।

(২) কৌমুদীজাগর—অর্থাৎ কোজাগরী পূর্ণিমা আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এক প্রকার মদনোৎসব, এই সময়ে প্রণয়িগণ প্রণয়িনীদিগের সহিত দোলাক্রীড়া ও দ্যূতক্রীড়া করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন এবং পুরুষগণও নিজেদের মধ্যে দ্যূতক্রীড়া করিত। এই উৎসবের অপর নাম 'দ্যূতপূর্ণিমা'। যক্ষরাত্রি ও কৌমুদীজাগর উৎসব আজিও সমগ্র উত্তর-ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(৩) সুবসন্তক—মাঘ-শুক্লাপঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীপঞ্চমী বা সরস্বতী পূজার দিন রাত্রে নৃত্যগীত ও নানাবিধ ক্রীড়া অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইহা এক প্রকার মদনোৎসব, তাই অদ্যাপি গণিকালয়সমূহেও সরস্বতী পূজার এত আদর।

এই তিনটিকে ক্রীড়া না বলিয়া উৎসব বলা উচিত। এগুলি কোন বিশেষ ক্রীড়ার নাম নহে।

(৪) সহকারভঞ্জিকা—ইহাকে চূতভঞ্জিকা বা আম ভঞ্জিকাও বলিয়া থাকে। যে দেশে আমফল প্রচুর উৎপন্ন হয়, ইহা সেই দেশের ক্রীড়া। যশোধর ইহাকে "সহকারফলানাং ভঞ্জনং যত্র ক্রীড়ায়াং" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু কন্দর্প-চূড়ামণির রচয়িতা নৃপতি বীরভদ্রসেন লিখিয়াছেন—"মদনার্থিতা আম্রকুসুমৈবরতংসে চামভঞ্জিকা প্রোক্তা"।

আমাদের মনে হয়, ইহা কচি আম পাড়িয়া ভক্ষণ করার একটি উৎসব। আজিও পল্লীগ্রামে বালকগণ ছোট ছুরিকা বা ঝিনুকের খোলা হাতে করিয়া আমের বাগানে কচি আম পাড়িয়া খায় ও খেলা করিয়া থাকে।

(৫) অভ্যূষখাদিকা—যশোধর লিখিয়াছেন, "চণকাদি ফলানাং বিটপস্থানামগ্নৌ প্লোষিতানাং খাদনং", অর্থাৎ ঈষৎ পক্কছোলা, মটর, ভুট্টা প্রভৃতি গাছশুদ্ধ দগ্ধ করিয়া ভোজন করার একটি উৎসব। ইহা অদ্যাপি নানা স্থানে প্রচলিত আছে। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অঞ্চলে এই উৎসবের নাম "হোড়াপোড়া"।

(৬) বিসখাদিকা—জল হইতে পদ্মের মৃণাল তুলি ভক্ষণ এই ক্রীড়ার অঙ্গ। যে দেশে সরোবরে পদ্ম ফুটি থাকে, সেই সকল দেশে এই ক্রীড়া হইত।

(৭) নবপত্রিকা—যশোধর লিখিয়াছেন, "প্রথমবর্ষে... প্ররূঢ়নবপত্রাসু বনস্থলীষু যা ক্রীড়া সা" অর্থাৎ প্রথম বৃষ্টি পর বৃক্ষে নবপল্লবের সঞ্চার হইতে বনস্থলীতে যে ক্রী করা যায়। এই ক্রীড়ায় বৃক্ষের বিবাহ দেওয়া হয়*। প্রা বনস্থলের সমীপবর্ত্তী ব্যক্তিগণ এই ক্রীড়া করিয়া থাকে।

(৮) উদকক্ষ্বেড়িকা—ক্ষ্বেড়া শব্দের অর্থ বাঁশের চোঙ** যশোধর বলেন "উদকপূর্ণা ক্ষ্বেড়া যস্যাং ক্রীড়ায়াং সা ম[illegible] দেশানাম্ বংশঃ শৃঙ্গকাড়েতি প্রসিদ্ধিঃ"। অর্থাৎ পিচ্‌কা সাহায্যে পরস্পরের প্রতি জলক্ষেপণ করা। পূর্ব্বে [illegible] ক্রীড়া গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হইত, অধুনা ইহা হোলি-খেল[illegible] অঙ্গীভূত হইয়াছে। এই ক্রীড়া এখন সমস্ত ভারতে প্রচলি[illegible] তন্মে বংশনালীর পরিবর্ত্তে টিন অথবা পিত্তলের পিচ্‌কা ব্যবহার করা হয়। কচিৎ পল্লীগ্রামে বাঁশের পিচকা[illegible] দেখা যায়। ভাগবতে এই ক্ষ্বেড়া শব্দের পরিবর্ত্তে সে[illegible] শব্দ পাই ("সিচ্যমানোঽচ্যুতস্তাভির্হসন্তীভিঃ স্ম রেচকৈঃ।"

(৯) পাঞ্চালানুযান—যশোধর বলেন, "ভিন্নালাপচেষ্টা[illegible] পাঞ্চালক্রীড়া যথা মিথিলায়াম্", অর্থাৎ নানা প্রকার [illegible] বা স্বর ও ভাবভঙ্গী দেখাইয়া হবোলা বা ভাঁড়ের ন্যায় ক্র[illegible] করা। ইহা মিথিলায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু কন্দর্পচূ[illegible] মণিতে ইহাকে "কৃত্রিমপুত্রকলীলা" অর্থাৎ পুতুল [illegible] বলা হইয়াছে, কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত নাগরকগণ বালক-বালি[illegible] ন্যায় পুতুল খেলা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। ইহার [illegible] আধুনিক পুতুলনাচও হইতে পারে।

(১০) একশাল্মলী—যশোধর বলিয়াছেন, একটি কুসুম[illegible] বিশাল শাল্মলী বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া তজ্জাত কুসু[illegible] আভরণ দ্বারা অঙ্গ ভূষিত করিয়া এই ক্রীড়া করা হই[illegible] ইহা বিদর্ভ দেশে প্রচলিত।

---

* কামসূত্রটীকা বারাণসী সংস্করণ ও কন্দর্পচূড়ামণি—"কৃত্রিমবিবা[illegible] লীলা কথিতা নবপত্রিকা তজ্ঞৈঃ।"

** "বংশনাড়ীকৃত্রাক্ষেড়া সিংহনাদশ্চ কথ্যতে"

বালির মধ্যে মণি লুকাইয়া ক্রীড়া কুমারীগণের একটি প্রিয় ক্রীড়া। শব্দার্ণবে লিখিত আছে, "এত্যাদিভির্বালুকাদৌ গুপ্তৈ ক্রীড়াকর্মভিঃ কুমারীভিঃ কৃতা ক্রীড়া নাম্না গুপ্তমণিঃ স্মৃতা। রাসক্রীড়া গুপ্তমণিগুপ্তকেলিস্তলায়নম্। পিণ্ডকন্দুকক্রীড়েঃ স্মৃতা দৈশিককেলয়ঃ॥

কন্দুকক্রীড়া—যুবতীরমণীগণের ক্রীড়াসকলের মধ্যে কন্দুক ক্রীড়ার কথা আমরা সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে প্রচুর বর্ণনা পাই। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও পরবর্ত্তী কাব্যসমূহে কন্দুকক্রীড়ার বহু উল্লেখ আছে। দণ্ডীর দশকুমার চরিতের উত্তর পীঠিকায় ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসে রাজকন্যা কন্দুকাবতীর কন্দুকক্রীড়া অতি সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

দোলাক্রীড়া—বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নাগরকবৃত্ত প্রকরণে বৃক্ষবাটিকায় প্রেঙ্খাদোলা নির্ম্মাণ করার উপদেশ আছে। চক্রদোলাদি বহুবিধ দোলা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। এই দোলাক্রীড়ার বর্ণনা আমরা বহু কাব্যে পাইয়া থাকি। শ্রীকণ্ঠচরিত কাব্যে সমস্ত সপ্তম সর্গে দোলাক্রীড়ার বর্ণনা আছে। বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে বিহ্লন অতি সুললিত ভাষায় দোলাক্রীড়ার বর্ণনা করিয়াছেন। এই ক্রীড়া কামিনীগণের অত্যন্ত প্রিয়। অধুনা পল্লীর সর্ব্বত্র ইহা তরুণীসমাজে সমাদৃত হইয়া থাকে।

জলক্রীড়া—পূর্ব্বকালে যুবক যুবতীগণের অথবা নৃপতিগণের রমণী লইয়া জলক্রীড়া বা জলবিহার করার বহু উল্লেখ ও বর্ণনা আমরা পুরাণ ও কাব্যাদিতে পাইয়া থাকি। মাঘ, ভারবি প্রমুখ কবিগণ ইহার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন।

রাসক্রীড়ার বর্ণনা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে ও ভাসের বালচরিত নাটকে পাইয়াছি।

এই সকল ক্রীড়ায় যুবক যুবতী একত্রে ক্রীড়া করিত।

ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে তাসখেলা প্রচলিত ছিল কিনা তাহা ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ কামসূত্রে উল্লিখিত 'পট্টিকা'-ক্রীড়াকে পত্রিকা ক্রীড়া ধরিয়া তাসখেলার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই ক্রীড়া মুসলমান যুগ হইতে ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। "ক্রীড়াকৌশল্য" নামক বোম্বাইয়ে প্রকাশিত অতি আধুনিক এক পুস্তকে গঞ্জিফা বা তাসক্রীড়াকে প্রাচীন ক্রীড়া বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। 'গঞ্জিফা' নামই ইহার আধুনিকত্বের প্রমাণ।

উপরে আমরা যে সকল প্রাচীন ক্রীড়ার কথা উল্লেখ করিলাম, তাহার অধিকাংশই দেশ, কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচলিত ছিল। এই সকল ক্রীড়াপ্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে তরুণতাদির সহিত মানব মনঃপ্রকৃতির বিকাশ করিত। আমরা দেখাইয়াছি, এই সকল প্রাচীন ক্রীড়ার অনেকগুলি এখনও ভারতবর্ষের পল্লীসমাজে বর্ত্তমান। শত সহস্র বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে, তবু ভারতের বহু অনুষ্ঠান এখনও পূর্ব্বের ন্যায় অবিকৃত রহিয়াছে।

আমরা অধুনা ইউরোপীয় ক্রীড়ার পক্ষপাতী হইয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের জাতীয় ক্রীড়াদি ভুলিয়া যাইতেছি, ফুটবল প্রভৃতি বহুব্যায়ামসাধ্য ক্রীড়ার অচিরে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি ও ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি বহু ব্যয়সাধ্য ক্রীড়ায় অযথা অর্থব্যয় করিতেছি। এইরূপে আমরা আমাদের সংস্কৃতির অবসান ঘটাইয়া পাশ্চাত্ত্যের ব্যর্থ অনুকরণে প্রীতি পাইতেছি। ভারতের পুনরভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সরল আমোদ-প্রমোদ আবার ফিরিয়া আসিবে কি? পল্লীতে পল্লীতে আবার সেই সুন্দর ক্রীড়ানিরত পল্লীবালকগণকে কি দেখিতে পাইব?

কৃষির অবস্থা

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার অন্ততঃপক্ষে গত পাঁচশত বৎসর হইতে জগতের স্থানে স্থানে কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য করা হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং যে কৃষক একদিন জগতের সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য দেশে সেই কৃষকগণ প্রায়শঃ ধনিকগণের অধীনে চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।...

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি

...জেন্টলমেন প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে আমাদিগকে জার্মান ফরাসী ও অপরাপর বিদেশী মনীষিগণের গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিতে হইবে বিদেশে গিয়া উহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করিতে হইবে— ভারতবর্ষে বসিয়া থাকিলে চলিবে না জেন্টলমেন ...

তাঁহার পদচ্যুতির কিছু পরেই জার্ম্মান রাইখস্‌ট্যাগে শান্তিস্থাপনের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা বাহুল্য যে, ইহাতে সমাজতন্ত্রীদের বিলক্ষণ হাত ছিল। কিন্তু এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেও উহা বিশেষ ফলপ্রদ হইল না। ইতিপূর্ব্বে প্রেসিডেন্ট উইলসন যে শান্তির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই মত নিষ্ফল হইল। তাহার পরে পোপ পঞ্চদশ বেনিডিক্ট (Benedict XV) নিরপেক্ষ ব্যক্তিরূপে আবার শান্তি আনয়নের প্রয়াস করিলেন, কিন্তু তাহাও প্রেসিডেন্ট উইলসনের প্রস্তাবের মত মহাযুদ্ধের গতিকে বাধা দিতে পারিল না। এদিকে জার্ম্মানির শক্তি নানাদিক হইতে ক্রমে ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুধ্যমান জাতিদের মধ্যে অষ্ট্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বলক্ষয় হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে ১৯১৬ সালের শেষভাগে বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর নূতন সম্রাট সিংহাসনে বসিয়া জার্ম্মানীকে বাদ দিয়া গোপনে শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিত্রশক্তিরা অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে পৃথক্‌ সন্ধি করিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহাদের ভয় হইল যে, জার্ম্মানী টের পাইলে বলপূর্ব্বক অষ্ট্রিয়াকে নিজ হাতে আনিয়া আরও বলশালী হইয়া যুদ্ধ করিবে।

কিন্তু পুনঃ পুনঃ শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও এই বিষয়ে নূতনতর প্রচেষ্টা হইবার কোন বাধা ছিল না। যেই ব্যাপারে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এবং রাষ্ট্রনায়কদের [illegible] অকৃতকার্য্য হইলেন, সেই ব্যাপারে শ্রমিক নেতাগণ হাত দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল কি না, এ কথা পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, মোটামুটিভাবে য়ুরোপের ট্রেড য়ুনিয়ন-পন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদীরা শান্তির সর্ত্তাদির বিষয়ে অভিজাত সম্প্রদায়, ব্যবসায়ীকুল, পেশাদার রাজনীতিক এবং পার্লামেন্টের মেম্বরগণ অপেক্ষা অধিকতর একমত ছিলেন, রুশ-বিপ্লবের সংঘটন দেখিয়া তাহারা ভাবিলেন যে, হয় রুশিয়া বা আমেরিকার চেষ্টায়, অথবা সাধারণ এক য়ুরোপীয় বিপ্লবের দ্বারা শান্তি আনীত হইবে। বিটিশ শ্রমজীবী সম্প্রদায় 'লীগ অব নেশন্‌স' এবং 'আত্ম প্রতিষ্ঠা' (self determination)-মূলক নূতন সীমানা নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করিয়া এক শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্য্যসূচী উপস্থাপিত করিল।

ঐ সূচীকে ভিত্তি করিয়া ১৯১৭ সালে ষ্টকহল্‌ম শহরে শ্রমিক মহাসভা আহ্বানের চেষ্টা হইল, কিন্তু বিটিশ মিত্রপক্ষে কর্ত্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের প্রতিনিধি তাহাতে যোগদান না করায় তাহা সফল হইল না। জার্ম্মান সমাজতন্ত্রীরা এদিকে বিভিন্ন দলে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছিলেন। তাঁহাদের বড়দল এবার্ট (Ebert) ও শাইডেমান-এর (Scheidemann) এবং অপরাপর দলের ন্যায় রাষ্ট্রনীতিকগণের নেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইবার টাকা মঞ্জুরের পক্ষে ভোট দিলেন এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বের সীমানা বজায় করিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসে [illegible] করিলেন। স্বাধীন সমাজতন্ত্রীরা ইহাকে সাম্রাজ্য-লোলুপতা বলিয়া নিন্দা করিলেন এবং মধ্য য়োরোপের এবং বলকানসমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসমূহের আত্ম প্রতিষ্ঠার নীতিতে শান্তির দাবী করিলেন।

বিটিশ প্রধান মন্ত্রীও শান্তির প্রস্তাবে নিজ রাষ্ট্রের মত স্পষ্টভাবে জানাইলেন, কিন্তু তাহার [illegible] ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উইলসন তাঁহার বিখ্যাত চৌদ্দ দফা সর্ত্তের সন্ধিপত্র প্রকাশ করিলেন।

যখন এই সন্ধি প্রস্তাব চলিতেছিল, তখন যুধ্যমান উভয় পক্ষই ১৯১৮ সালের বসন্তকালে যুদ্ধ শেষ হইবে, এরূপ আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।

১৯১৭ সালে রুশিয়া পিছাইয়া পড়িল। তখন এক সম্ভাবনা নিশ্চিত ভাবে দেখা দিল যে, যুদ্ধের একটা শেষ মীমাংসা অচিরে না হইলে ১৯১৮ সালে অষ্ট্রিয়াও রুশিয়ার পদাঙ্কানুসরণ করিবে। ঠিক এই সময় ইটালীর শক্তি কাপোরেত্তোর (Caporetto) পরাজয়ে মন্দীভূত হইয়াছিল। কাজেই জার্ম্মানী এবার যুদ্ধজয়ের জন্য শেষ এক প্রচণ্ড চেষ্টা করিল। হিণ্ডেনবর্গ ও লুডেনডর্ফ এক নূতন কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে বিটিশপক্ষ পরাজিত ও পশ্চাদপদ হইতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাদের ৯০ হাজার সৈন্য বন্দী হইল। কিন্তু তাহাতে ব্রিটিশপক্ষের বিশেষ ক্ষতি হইল না। তবে জার্ম্মানদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাহারা প্রচণ্ড উদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

এমন সময়ে আমেরিকা এক বৎসর আয়োজনের পর বহু সৈন্য ও রণসম্ভার লইয়া য়ুরোপের যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা দিল এবং জার্ম্মানীর পরাজয় সুরু হইল।

দেখা গেল মিউনিকে। বিরাট জনতা স্বাধীন সমাজতন্ত্রী কোন নেতার হাত দিয়া এক আবেদনপত্র বাভেরিয়ার সরকারের নিকট পেশ করিল। তাহাতে শান্তিভাবের দল তাদের দাবী ছাড়া আর মারাত্মক কিছু ছিল না। সৈন্যদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার প্রার্থনা ছিল। এ আবেদনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় কথা। বরং ঐ আবেদনের শেষের দিকে এ কথা ছিল যে যদি স্বীকার করা না হয় তবে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে।

মিউনিকের আন্দোলনের মধ্যে মারাত্মক ছিল ঐ আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের উগ্রমেজাজ। জনতা শ্রেণীবদ্ধভাবে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রহরীদিগকে নিরস্ত্র করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "সাধারণতন্ত্রের জয় হউক" (Hoch die Republik !) এবং তাহার পরে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাহারা সৈন্যদের ব্যারাকগুলিতে হানা দিল, সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করিল এবং পার্লামেন্ট-ভবন দখল করিল। পরে সেখানে একটি সভা করিল। এ-সকল ব্যাপার ঘটিতে ঘটিতে রাত্রি আসিল, পরদিন সকালে মিউনিকের দেওয়ালে দেওয়ালে বাভেরিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়া এক ঘোষণা-পত্র দেখা দিল এবং তাহাতে স্বাক্ষর কর্ট আইসনের (Kurt Eisner), বাভেরিয়ার শ্রমিক, সৈন্য ও কৃষকদের সোভিয়েটের প্রেসিডেন্ট। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বাভেরিয়ার রাজ-পরিবার গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মান কাইজার এবং ক্রাউন প্রিন্সও পলায়ন করিলেন। অবশ্য ইহার কিছুদিন আগে হইতেই সমাজতন্ত্রী দল কাইজারের সিংহাসন-ত্যাগ দাবী করিতেছিলেন। এবং কাইজারও প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতায় সিংহাসন ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু বার্লিনের জনতা এত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিল যে, তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী যুদ্ধক্ষেত্রে আবার টেলিফোন করিলেন এবং তাহার পরে জবাব আসিল—"কাইজার সিংহাসনত্যাগে রাজী। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে দস্তুরমত ঘোষণা পাওয়া যাইবে।"

পরবর্তী ৯ই নবেম্বর তারিখে কাইজার জার্মানী ছাড়িয়া হল্যান্ডের প্রান্তে পৌঁছিলেন। ক্রাউন প্রিন্সও হল্যান্ডে পৌঁছিলেন।

এই সব গুরুতর ঘটনা ঘটিতে থাকিলেও সমাজতন্ত্রীরা অপ্রত্যাশিত ভাবেই বিপ্লবের সম্মুখীন হইলেন। সব ব্যবস্থা হইয়াছিল অপেক্ষাকৃত উগ্র দলের লোকদের দ্বারা কিন্তু তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত নায়কের অভাব ছিল, তাই সমাজতন্ত্রীদিগকে বাধ্য হইয়া নায়কত্ব গ্রহণ করিতে হয়। জার্মান সাধারণতন্ত্রের মৌলিক দুর্বলতাই হইল এইখানে। সে যাহাই হৌক, সামরিক লোকেরা তখনও বিপ্লবের গুরুত্ব সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। তাই জনৈক জেনারেল তাঁর দলের সাহায্যে বিদ্রোহ থামাইবার আদেশ বাহির করিলে, তখন শেইডেমান বলিলেন, ঐরূপ করা ভুল হইবে, আমরাই ঐ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিব, নতুবা উহা বিশৃঙ্খল পর্যবসিত হইবে।

কিন্তু শাইডেমানের এই উক্তি সত্ত্বেও বিপ্লবের রূপ দেখিতে যতটা দিন, বাস্তবিক পক্ষে তাহা ছিল না। স্বাধীন সমাজতন্ত্রীরা যেমন অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত ছিল না কমিউনিষ্টরা লিবনেক্ট (Liebknecht) প্রমুখ বার্লিনে কোন প্রাসাদ বা স্থান দাঁড়াইয়া জার্মানীর স্বাধীন সমাজতন্ত্র ঘোষণা করিয়া রুশীয় আদর্শে দেশকে গড়িয়া তুলি ইচ্ছা বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমগ্র দেশময় কোন ইচ্ছা বা চেষ্টার সূত্রপাত তখনও হয় নাই। তবু ঐরূপ অবস্থা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার কারণ মুষ্টিমেয় আন্দোলনকারীর উৎসাহ, কিন্তু তাহা সংগঠন-ক্ষমতা অপেক্ষা উৎসাহই বেশী ছিল। এতৎ সত্ত্বেও যে বিপ্লব ক্রমশঃ ঘোরতর আকার ধারণ করিতেছিল, তাহার কারণ বার্লিনের সৈন্যদল ও পুলিশ বড়কর্তারা অমূলক আশঙ্কায় 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি অনুসরণ করিয়া সরিয়া পড়িতেছিলেন। এই অবস্থায় বিপ্লবের অগ্রগতি বাধা দিতে পারিতেন নিয়মতন্ত্র পক্ষপাতী সমাজতন্ত্রীদের বড়দল, যাহাদের নেতা ছিলেন এবার্ট ও শাইডেমান প্রমুখ ব্যক্তিগণ। কেন না যে শ্রমিক দলকে খেপাইয়া বিপ্লবপন্থীরা কাজ হাঁসিল করিবার করিয়াছিল, তাঁহাদের প্রতিপত্তি সেই শ্রমিকদলের

সর্ব্বেশ্বরের সংসার

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধ

বৈঠকখানার লাগাও পামশাটার বারান্দায় সর্বেশ্বর একখানা ভাঙা চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া অন্যমনে বিড়ি টানিতেছিল। আসন্ন সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে চারিদিক ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। খানিক আগে একবার আকস্মিক কাল-বৈশাখীর ঝড়-জল হইয়া গিয়াছে, উঠানের ওপারে বেড়ার গায়ে তেঁতুল গাছ হইতে এখনও জল ঝরিয়া পড়িতেছে।

ঘরের মধ্যে নিখিল উসখুস করিতেছিল। তাকে বসাইয়া রাখিয়া পূর্ণ সেই যে বাড়ীর ভিতরে গিয়াছে, ফিরিবার আর নাম করে না। পূর্ণর বন্ধু জানিয়া সর্বেশ্বর কেবল বলিয়াছিল "ওঃ, তা বেশ, বস গিয়ে ঘরে—" তারপর আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। না একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, না একবার এদিকে চাহিল। নিখিলের তক্তপোষের উপর একখানা জীর্ণ, ধূলাভর্ত্তি অতি মলিন সতরঞ্চি পাতা, ছেঁড়ার মাঝে মাঝে তক্তপোষের কাঠ বাহির হইয়া আছে। ঘরের এককোণে একরাশ চুন গাদা করিয়া রাখা, একদিকের দেয়ালে বাঁশের হুড়কো দিয়া দরমার ঝাঁপ আটকান, বোধ হয় জানালা ছিল ঐখানে, ছাদের একস্থানে টালি খসিয়া গিয়া চতুষ্কোণ ফাঁক, নীচে মেঝেয় জল পড়িয়া জমিয়া আছে। বাহিরে ছাদের উপর গাছ গজাইয়া থাকিবে, ঘরের দেওয়ালের বাঁধুনি আলগা হইয়া যাওয়ায় ইঁটের ফাঁকে ফাঁকে তার শিকড় আঁকড়িয়া রহিয়াছে সাপের মত। বৈঠকখানার পরেই ভিতরের দিককার ঘরে আলোর প্রাচুর্য্য দেখিয়া আনন্দ হয়, হয়ত ছাদ নাই ঘরটার। শহরের ছেলে নিখিল প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে একা একা দারুণ অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। দুই একবার সর্বেশ্বরের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াও কোন ফল পাইল না।

কতক্ষণ পরে পূর্ণ আসিয়া বলিল, "চল বেড়িয়ে আসি, ঘরের মধ্যে বসে থেকে কি লাভ?"

নিখিল বর্তাইয়া গেল। বাহিরে আসিয়া পূর্ণ সর্বেশ্বরকে বলিল, "গ্রাম দেখিয়ে নিয়ে আসি মামা এক[illegible] নিখিলকে, কি বলেন?"

সর্বেশ্বর পূর্ণর মুখের উপর ক্ষণকাল ভাবশূন্য [illegible] রাখিয়া বলিল, "এঁ্যা, ওঃ তা বেশ, যাও। দেখা ক[illegible] তোমার মামার সাথে?"

পূর্ণ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল দেখা করিয়াছে।

"ওকে একলা ফেলে গিছলে বুঝি বাইরে [illegible] যেমন বাও। তা বেশ এস ঘুরে। তবে [illegible] সাপ খোপের ভয় এ সময়টা—এই যা—'

নিখিল পূর্ণর গা টিপিয়া বলিল, "সাপ-টাপ আ[illegible]ন কি পথে?"

'না থাক, টর্চ আছে আমার কাছে। আয়—' [illegible] পূর্ণ নিখিলকে জোর করিয়া টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল।

মিনিট পাঁচেক পরে জয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াই[illegible] সর্বেশ্বর ঘাড় ফিরাইয়া নির্বাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মে[illegible] মুখের দিকে চাহিল।

মৃদু কণ্ঠে জয়া বলিল, "মা একবার ডাকছে তোমা[illegible] বাবা।"

"কেন?"

"কি জানি, তোমাকে আসতে বললে বাড়ীর মধ্যে।"

"জিগ্যেস করে এস কেন।"

জিজ্ঞাসা করিবার দরকার নাই, জয়া জানে [illegible] হৈমবতী সর্ব্বেশ্বরকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। তার মা[illegible] বাক্সের চাবি ত' জয়ার কাছেই থাকে। চার পাঁচ দি[illegible] আগে সর্ব্বেশ্বর যে টাকাটা আনিয়া দিয়াছিল, তার এক আধলাও আর অবশিষ্ট নাই, সব খরচ হইয়া গিয়াছে। এদিকে বাড়ীতে আসিয়া যারা উপস্থিত হইয়াছে, ব্যব[illegible] ত' একটা করিতেই হইবে তাদের জন্য।

ব্যাপারটা সর্ব্বেশ্বরও আঁচ করিয়াছে, না করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে আর সংসারের নিং

"তাই তো! আচ্ছা মামী, নলিনী কি করছে এখন? কাজকর্ম করছে না কিছু?"

উত্তরে হৈমবতী মিনিটখানেক চুপ করিয়া রহিল, তারপর নিজের কপালে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, "সবই এই বাবা! কত পাপ করেছিলাম আর জন্মে, এ জন্মে তার ফল ভোগ করছি! একেবারে রত্নগর্ভা তোর মামী, পুত্র, আসল রত্নগর্ভা! তোরাও ত' ছেলে, লেখাপড়া করিছিস, আর দেখ দিকিনি আমার ছেলে! ক' কেলাস নীচে পড়ত তোর, দু' কেলাস না? কবে শেষ করেছিস তোরা পড়া-শোনা, আর তাঁর এ্যাদ্দিনেও হল না! না জানি কোন্ লাটের গদি তৈরী হচ্ছে তার জন্যে, এত বিদ্যে নইলে ধরবে কোথায়?"

পূর্ণ অবাক হইয়া বলিল, "ল' তার শেষ হয় নি? তবে এখন কি পড়ছে?"

"সেই জানে আর তার কপাল জানে! বাপে আর টাকা পাঠাতে পারবে না বলেছিল বলে, আজ তিন বছর আর বাড়ী আসে নি ছেলে। টাকা উপায় করতে পারে তো আবার বাড়ী আসবে, নইলে বলে গেছে, এই পর্য্যন্ত। সেবার গিছলো তোমার মামা খুঁজে খুঁজে, তা' সে গুণধর ছেলে দেখা করে নি। কার হাত দিয়ে যেন পাঁচটা টাকা দিয়েছিল বাপের পথ-খরচ। উনি আর নামও করেন না ছেলের! বিষয় বিক্রি করে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ভাল ছেলে, উপযুক্ত ছেলে—কি বলব বল? ঐ আমাকে চিঠি দেয় কালে ভদ্রে, তাইতে খবর পাই বেঁচে আছে। থাক্, যেখানে থাকে সুখে থাক্—"

হৈমবতী চুপ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নিজের কথাতেই আমি পাঁচ কাহন! এলি এদ্দিন পরে, কোথায় তোর খোঁজ-খবর নেব আমি, তা না—"

"কি জানতে চাও বল।"

"কথা শোন ছেলের! তা চিরকাল কি এমনি জেলে জেলেই কাটাবি? আমি বলি কি, ওসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এইবার থিতু হ সংসারে—"

এই সময় ফিরিয়া আসিয়া বাহির-বাড়ী হইতে নিখিল পূর্ণকে ডাক দিল। পূর্ণ উঠিয়া যাইতেছিল, হৈমব- বলিল, "এই খানেই ডাক না—"

নিখিল ঘরে ঢুকিয়া একটু ইতস্তত করিল। ঘ- প্রান্তে ধরজোড়া খাটে বিছানা পাতা, মেঝেয় ঘ-- মাঝামাঝি হৈমবতীর শয্যা, রাতদিন বিছানই থা- দরজা দিয়া ঢুকিতেই ডানদিকে একটা প্রকাণ্ড -- কাঠের বাক্স, বাঁ দিকে একটা আলমারি। হৈমবতী পু- পাশে বিছানার একাংশ হাত দিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করি- নিখিলকে ডাকিল—"এস বাবা, বস। বুড়ো মানুষ- আবার লজ্জা।"

"না, না, লজ্জা কি?"—ঐ বিছানায় বসিতে নিখি- বাধিতেছিল, কিন্তু অন্য জায়গার অভাবে অগত্যা নি- স্থানে গিয়া বসিতে হইল।

হৈমবতী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও কি বাবা পূ- দলে?"

হাসিয়া নিখিল বলিল, "না মামীমা, পূর্ণটা ত' এক- জেল-ফেরত কয়েদী, ভদ্রলোকে ওর দলের হয়?"

রৌদবর্জ্জিত পুরাতন কোঠার সোঁদা গন্ধ ঘরের ভি-- আলমারিটার নীচে এক কাঁড়ি বাসন-কোসন, খাটের -- মেটে জালায় করিয়া খই-এর ধান তুলিয়া রাখা। - ধরিয়া ঝুলিয়া পড়া ররপর কয়েকটা কড়িকাঠ দেও- বরাবর বাঁশের খুঁটির ঠেকনা দিয়া আটকান। পাশ- পাশি ঘরের মাঝখানের দরজায় একটা আলো রা- দুই ঘরের কাজ চলিতেছে।

তখন রাত্রি প্রায় এগারটা, হৈমবতীর সম্মুখের - সকলে খাইতে বসিয়াছে। জেলের বাহিরে আ- পূর্ণ এখন মুখ খুলিয়া বাঁচিতেছে, অনবরত বক- করিয়া চলিয়াছে। হৈমবতী উঠিয়া চলাফেরা করি- পারে না, তবু বসিয়া বসিয়াই আগাইয়া আসিয়াছে দ- পর্য্যন্ত। একটা তেপায়ার উপর কেরোসিনের আ- জ্বলিতেছে, আর একপাল বিড়াল লেজ উঁচু করিয়া ডাকি ডাকিতে পাতের চারি পাশে ঘুরিতেছে। সর্ব্বেশ্বর - গুঁজিয়া বসিয়া খাইতেছে।

হৈমবতী অনুযোগ করিয়া পূর্ণকে বলিল, "আসিস- তো আর আজকাল, যদিও বা এলি, এমনি বরাত, না এ-

জানালার তাকের উপর হইতে কাসুন্দি পাড়িতে গিয়া জয়া এক অংশ উল্টাইয়া বসিল। উপরে উপরে মই সাজান, ডিঙি মারিয়া হাত বাড়াইয়া জয় ঠিক হাতড় করিতে পারিল না, একটা পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া চুরমার হইল। দেখিয়া হরেশ্বর বিরক্তিপূর্ণ গ্রাম্য কণ্ঠে বলিল, "একটু সাবধান হয়ে কাজ করতে পারিস না?" হৈমবতী যথেষ্ট তিরস্কার করিল, বলিল, "ষোল বছরের ধাড়ী, ধাড়ীর যদি কোন যোগাড় থাকে। কপাল, সবই কপালে করে।" স্বামী-পুত্র-কন্যা কাকে রাখিয়া কার কথা ধরিবে হৈমবতী? ষোল কলায় একেবারে যে পরিপূর্ণ! অন্যায় হইয়াছে হৈমবতীর জয়াকে কিছু করিতে বলা!

জয়া হেঁট মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

শুইয়া শুইয়া ঘুম আসিতেছিল না নিখিলের। ভিতরের দিককার যে ঘরে তাদের শোয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেটা অন্যগুলির মতই প্রাচীন ও জীর্ণ, হরেক রকম অকেজো জিনিসপত্রে ঠাসা এবং তার পিছনেই বাগান, বেতবন আর বাঁশ, বাঁশ-বনের পার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অন্ধকারময় আম কাঁঠালের বাগান। বোধ হয় আর কিছুক্ষণ পরে চাঁদ উঠিবে, গাছের মাথার উপর আকাশের কোলে অন্ধকার ফিকা। ঝোপের মধ্যে কি একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল, নিখিল তার নাম জানে না।

পূর্ণ অকাতরে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। কিন্তু নূতন জায়গায় জঙ্গলে ভরা নিস্তব্ধ পাড়াগাঁয়ে, গাছপালার মধ্যে পুরাণ ভগ্নপ্রায় কোঠায় সহরের ছেলে নিখিল ঘুমাইতে পারিতেছে না। আর তেমনই গরম পড়িয়াছে আজ, একদম বাতাস নাই। মশারির মধ্যে জাগিয়া শুইয়া থাকা অসম্ভব। একবার ঘুমন্ত পূর্ণর দিকে কৃপা-মেশান দৃষ্টিতে চাহিয়া নিখিল উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

নিখিল একা নয়, পাশের ঘরেও কারা জাগিয়া আছে। উৎকর্ণ নিখিল শুনিল কে যেন কাহাকে শুইয়া পড়িতে সাধিতেছে, একবার, দুইবার, তিনবার—অপর পক্ষের কোন সাড় পাওয়া গেল না। মিনিটখানেক পরে ঘা[illegible] হইতে কেহ নামিতেছে বোঝা গেল। নিখিলের জানালার কাছেই বোধ হয় অন্য ঘরটিরও জানালা। একজন বলিল, "তুই কাঁদছিস জয়া?" ফুঁপাইয়া চাপাকান্নার শব্দ এবার স্পষ্ট শুনিল নিখিল—"তুই ত আচ্ছা বোকা মেয়ে। মা-বাপে অমন কত বকে, বকে না—তুইই বল তাই বলে কি কেউ এমন করে কাঁদে না কি, এ্যাঁ?

কান্নায় জড়ান অপর কণ্ঠ বলিল, "না, কাঁদে না সকলের সামনে শুধু শুধু বকুনি খেলে বুকতে। আ[illegible] হয়েছি যার যত আপদ বালাই। মরে যাইতে ভা[illegible] হয়।"

"আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। রাতদুপুরে, চ শুবি চল।"

"যাচ্ছি, তুমি শাও গে।"

"না, চল।"

তার পর সব চুপচাপ।

আকাশে চাঁদ উঠিয়া অন্ধকার প্রায় কাটিয়া গিয়া[illegible] কত রাত হইয়াছে কে জানে। ঘুমন্ত পূর্ণ পাশ ফি[illegible] শুইল। কাল সকালে উঠিয়া আবার কত পথ হাঁটি[illegible] হইবে, পূর্ণর সঙ্গে দেশ দেখিতে বাহির হওয়া ঠিক [illegible] নাই। চোখে কিন্তু ঘুম আসিবার লক্ষণও নাই নিখিলের সারা রাত কি তার জাগিয়াই কাটিবে? কালকের দি[illegible] এখানে থাকিয়া গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু পূর্ণ তো থাকি[illegible] পারিবে না। আর হয়ত, হয়ত কেন, আর কোনদি[illegible] এখানে আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই নিখিলের—সে দেশোদ্ধার-ব্রতী, ঘর-গৃহস্থালীর এই আবেষ্টনীতে সে বিদেশী, সহরে গিয়েই এই বিদেশের কথা সে যে ভু[illegible] যাইবে! এতকাল তো ভুলিয়াই ছিল।

জানালার গরাদে ধরিয়া বিনিদ্র নিখিল বহুক্ষণ ঐভা[illegible] দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্ত্রিত্বগ্রহণের পূর্ব্বে

মন্ত্রিত্বগ্রহণ-সমস্যা সম্বন্ধে কংগ্রেসে তিন প্রকার মতভেদ দেখা দিয়াছিল। এক দল কোন সর্ত্ত ব্যতিরেকেই মন্ত্রিত্বগ্রহণের স্বপক্ষে, দ্বিতীয় দল মন্ত্রিত্বগ্রহণের বিরোধী, তৃতীয় দল গবর্ণরের প্রতিশ্রুতির কথা উঠাইয়াছিলেন

জোরেই লরি চালিয়ে দিলে পিছনে ধূলোর স্তূপীকৃত পাহাড় সৃষ্টি করে। এরা মোটর চালায় সম্পূর্ণ মরীয়া ভাবে – ওদিক থেকে যে লরি এদিকে আসছে, তাদের বেগ আরও ভয়ানক। কাজেই যখন বাজারে শুনলাম যে, পূর্ব্বদিন একখানা লোক-বোঝাই বাস পাহাড়ের ওপরে মোড় ঘুরবার সময় একেবারে নীচে পড়ে গিয়ে যাত্রীসমেত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে—তখন আমি খুব বিস্মিত হইনি।

১০৪ মাইল দূরবর্ত্তী টাঙ্গিয়াং প্রথম দিনেই পৌছানো গেল।

ছোট্ট সহর, চারিধারে সবুজ মাঠ, চুণাপাথরের অনুচ্চ

দক্ষিণ শান-রাজ্যের একটি গ্রামে 'রেঙ্গোয়া'।

শৈলমালায় ঘেরা। দৃশ্য ও আবহাওয়া বেশ ভাল। পরদিন বৈকাল নাগাৎ বাকী ৬০ মাইল গিয়ে আমরা মোটর-রাস্তার শেষ প্রান্তে পৌছে গেলাম। এবার মেটে রাস্তা আছে আর ১২০ মাইল, তাতে মোটর চলে না, গরুর গাড়ী চলে। তবে শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে লরি চলতে পারে।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, সুতরাং মেটে-রাস্তা দিয়ে একশো মাইল লরি চালিয়ে তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে আমরা যেখানে পৌছে গেলাম—সেখান থেকে স্যালউইন নদীর উপত্যকার দিকে রাস্তা গিয়েছে নেমে। লরি এখানে এসেই থামল।

দলে দলে চীনা অশ্বতর খেয়ার ওপারে নীত হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে নদীতে জল বেশী না থাকায় পার হওয়া আদৌ কঠিন নয়। বর্ষাকালে স্যালউইন ৮০ ফুট স্ফীত হয়ে ওঠে তখন পার হতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যায়। অনেক সময় খেয়ার ভেলাগুলো খরস্রোতে ভেসে যাওয়ার ভয় থাকে মাঝনদীতে এ রকম ব্যাপার ঘটা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কাঁচা রাস্তা স্যালউইনের খেয়া-ঘাটেই শেষ হয়ে গেল ওপারে একটা সংকীর্ণ অশ্বতর যাতায়াত করার পথ কে... পর্য্যন্ত গিয়েছে।

এখানে কিন্তু শোনা গেল যে, কেউ কেউ কেংটুং পর্য্যন্ত লরি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

আমার কাছে এই মোটর যাওয়ার উত্তেজনাটুকু কাম্য ... মনে হল—বিশেষ করে পথে ... ছ'হাজার ফুট উঁচু দু'তটো গি... বর্ত্ম অতিক্রম করতে হবে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা খবর ... যে, টাঙ্গিয়াং থেকে কেংটুং পর্য্যন্ত একখানি লরি যাচ্ছে। পর... সকাল বেলাতেই লরিখানা ... ঘাটে এসে পৌছে গেল ... আমি তারই সঙ্গে যাবার ব... বস্ত ঠিক করে ফেলে সে... বৈকালেই রওনা হলাম।

রাস্তা প্রথম একটা পার্ব... নদীর সমান্তরালভাবে গিয়ে... নদীটি স্যালউইন নদীর একটা শাখা। চতুর্থ মাইলে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। এঞ্জি... সমস্ত শক্তি আবশ্যক হল এই দুর্গম পথে উঠতে। অর্দ্ধেক এঞ্জিন গেল বন্ধ হয়ে এবং গাড়ী সেই দুর্গম ঢালু বেয়ে ... বায়টি না করে দিব্যি পিছু দিকে গড়াতে সুরু করলে। আ... তাড়াতাড়ি ব্রেক্ কসে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে চাকার ... কাঠ ফেলে তার গতি বন্ধ করে দিলাম।

এর পরে কত কষ্ট, কত রকম চেষ্টা করা গেল, পুন... এঞ্জিন চালিয়েও গাড়ী কিছুতেই ওপরের দিকে উঠ... না। হঠাৎ পার্ব্বত্য-নদীর বিপুল গর্জ্জন ছাপিয়েও ...

সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘোর বিপদ ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে একটুখানির জন্যে রক্ষা পেয়ে গেলাম।

একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে ড্রাইভার দেখল, সে রকম সংকীর্ণ জায়গায় সে ঘুরতে পারবে না—আমরা পর্বতশৃঙ্গের একেবারে ধারে এসে পড়েছি। গাড়ী তখনই থামানো হল। রাস্তার যে অংশে সামনের চাকা ছিল, গাড়ীর ভারে সেখানটা ভেঙে ঝর ঝর করে পাথরের টুকরো আর ধুলো খসে পড়তে লাগল।

প্রাবাং-রমণী।

একটু পরে দেখা গেল, একখানা সামনের চাকা শূন্যে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন আমরা গাড়ী থেকে আবার জিনিষপত্র নামিয়ে আস্তে আস্তে লরিখানা পিছু হটিয়ে নিরাপদ স্থানে এনে দাঁড় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। অবশেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বহু কষ্টে নিম্নের উপত্যকাস্থিত ক্ষুদ্র গ্রামে পৌঁছুই।

এই বিপদের পরে পথে তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু ঘটে নি। পরদিন আমরা ত্রিশ মাইল পথ সহজেই উত্তীর্ণ হলাম। মোড় ঘুরবার সময় এ বার আমরা খুব সাবধানে দু' একবার পিছু হঠে আস্তে আস্তে এঞ্জিন চালিয়ে মোড় ঘুরছিলাম। মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে পথের ধারের নালা থেকে জল নিয়ে এঞ্জিনে দিতে হচ্ছিল। গাড়ীর হর্ণের আওয়াজে কখনও কখনও স্থানীয় জংলী লোকেরা গাছপালায় ঘেরা তাদের ক্ষুদ্র গ্রাম ছেড়ে দৌড়ে পথের ধারে এসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল।

আমাদের চারিপাশের বন এক জাতীয় বন্যপুষ্পে অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে, ফুলটার বৈজ্ঞানিক নাম Bauhini[illegible] purpurea, ফুটলে মনে হয় যেন চারিদিকে শুভ্র তুষারপা[illegible] হয়েছে। অথচ নিদারুণ গ্রীষ্মে বনের বৃক্ষ এমন নিষ্পত্র সেই সব পত্রহীন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা থেকে ডেনড্রোবিয়া-জাতীয় অর্কিডের ফুল ঝুলছে।

তৃতীয় দিনে শেষ গিরিবর্ত্মটা অতিক্রম করে আমরা নীচে[illegible] সমতল ভূমিতে নামলাম, যদিও সেখানকার রাস্তাটা কম বিপজ্জনক নয়—পাহাড়ী ঝরণার জলের ধারায় পথের মাঝে মা[illegible] বড় বড় নালার সৃষ্টি করেছে। আমরা অবশেষে কে[illegible]টুং পৌঁছে গেলাম—মান্দালে থেকে এর দূরত্ব ৪০০ মাইল।

কেংটুং সহর ঐ নামধেয় শান-রাজ্যের রাজধানী[illegible] যতগুলি ছোট বড় রাজ্য নিয়ে সংযুক্ত-শান-রাজ্য গঠি[illegible] তার মধ্যে কেংটুং সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। গাছপালার আড়া[illegible] অনেকগুলি প্রাচীন কালীন মন্দির চোখে পড়ল। স্থান[illegible] রাজার উপাধি সউবা। রাজপ্রাসাদ দেখে মনে হল যেন একটি পিক্‌চার-প্যালেস্। রাজপ্রাসাদের পাশেই বাজার। বাজারটি দেখবার জিনিস, কারণ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সকল পাহাড়ী জা[illegible] তাদের বিচিত্রবর্ণের জাতীয় পোষাকে এখানে বাজার কর[illegible] নামে।

একদিন সউবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সউ[illegible] বয়েস হয়েছে অনেক, সর্ব্বদা পান খাবার অভ্যাস [illegible] পানের পিচ ফেলবার জন্যে কাছেই একটা সোনার [illegible] করা পিক্‌দানী। সউবার ছেলে অল্প-বিস্তর ইংরিজী জা[illegible] তিনিই দোভাষীর কাজ করলেন। রাজপ্রাসাদের বা[illegible] দিকে দুটো খুব বড় বড় হল, হলে অন্য কোনো আসবা[illegible]

চড়াইএর পথে উঠবার সময় তারা মনের আনন্দে গান ধরে দিত। তাদের সুরের মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বুঝতাম না, আমার মনে হত, এ যেন কারা নিজেদের মধ্যে পাল্লা দিয়ে চলেছে, কে কত চেঁচাতে পারে।

কম বালক বালিকাদের পোষাক বেশ সুন্দর। নানা রঙের কড়ি ও পাথর দিয়ে পোষাকের প্রান্তভাগ সাজানো। শানদের পোষাকের মত এদের পোষাক ঢলঢলে নয়, বেশ গায়ের সঙ্গে লেগে আছে। শান জাতির পুরুষ মানুষেরা সাধারণতঃ অত্যন্ত অলস, বাড়ীতে ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা যায় মাঠে কাজ করতে। কমদের মধ্যে কিন্তু এ প্রথা প্রচলিত নেই।

ব্রহ্মদেশের মধ্য অঞ্চলের জঙ্গলে সভ্যতার পতাকাবাহী ব্রিজ।

যত ছোট গ্রামই হোক, প্রত্যেক গ্রামে একটা করে মঠ ও একটা স্কুল থাকবেই।

সাধারণতঃ মঠেই স্কুল বসে এবং দশ বারোটি বালক জাফরাণী রংয়ের পোষাক পরে সকালে বিকেলে সুর করে স্তোত্র আবৃত্তি করে। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রেরা জল তোলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাড়ে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনে।

শান-জাতির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে মনে হয় না। এরা ইউনান, ব্রহ্মদেশ ও আসামে সাম্রাজ্য পত্তন করেছে, কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে সাম্রাজ্য ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এ রকম ঘটেছে কয়েকবার। যুদ্ধ করবার ক্ষমতা তারা কোন দিনই হারায়নি, এই যুদ্ধ করবার ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষা ও দল গঠন করবার ক্ষমতা যুক্ত হলে চীন সামান্তে শান-জাতির রাজনৈতিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

এপ্রিল মাসের শেষ দিনে মেকং নদীতে খেয়া পার হয়ে আমি অপর পারের ফরাসী রাজ্যে গিয়ে পৌছুলাম।

খেয়া নৌকার অবস্থা দেখেই বোঝা গেল, উভয় রাজ্যের মধ্যে ব্যবসায়গত সম্বন্ধ নেই বললেই হয়। আমার দলের বারোটি অশ্বতর ও জিনিসপত্র পারাপার করতে অন্ত• পাঁচবার নদী পারাপারের প্রয়োজন হল।

মেকং নদীর মূর্ত্তি এখানে প্র শান্ত। কিন্তু নদীগর্ভে পাথ ছড়ানো থাকায় নৌকা চলা এখানে খুব নিরাপদ নয়।

নদী পার হয়ে পথ ঢুকে গ গভীর অরণ্যের ভিতর। বড় লতা ঝুলছে গাছের ডাল থেকে নানা জাতীয় অর্কিড, যে দি চোখ তাকানো যায় সেদিকেই এমন অনেক গাছের ফুল ফু বনের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলেছে দুদিন এই বনের মধ্যে দিয়ে যা পরে আমরা হেই সাই পৌছুলাম। তার পরেই মং এর সমতল-ভূমি।

স্থানীয় ফরাসী শাসনকর্তা আমার আগমনের স অবগত ছিলেন না, কিন্তু জনৈক আনামী সিপাই আমায় বি দেখে সন্দেহ করে আমার পিছু নিলে। তার ধরণ দেখে মনে হল যে, সে যেন নিউইয়র্ক বন্দরের ইমিগে অফিসার। তার ওপর মুস্কিল, আমি যে ভাষাতেই কথা সে কিছু বুঝতে পারে না। চীনা ও ফরাসী ভাষায় বলে দেখলাম, সে ঘাড় নেড়ে জানালে ও ভাষা সে শেখে আমার সঙ্গে বন্দুক দেখে সে অস্বাভাবিক ধরণে গম্ভীর গেল। কার অনুমতিতে ফরাসী সীমানা পার হয়ে বন্দুক হাতে এসে ফরাসী রাজ্যে ঢুকেছি ?

এক জোড়া স্যাণ্ডাল

—শ্রীভোলানাথ ঘোষ

[১]

না, জুতা তিনি খুকীকে কোন মতেই দিতে পারেন না।

মেয়েছেলের পায়ে জুতা, দুই চক্ষুর বিষ। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গ্রামের বধূ, একটু সেকেলেরকম মিত বাকী। তথাপি জুতার দ্বিগুণ দামেও খুকীকে তিনি আলতা ও শাড়ী কিনিয়া দিতে রাজী, কিন্তু জুতা কিছুতেই নহে। কোথায় পরিপাটি করিয়া আলতা পরা 'রাঙা'পদের মত পা বেড়িয়া 'রাঙা'পাড়ের শাড়ী, আর কোথায় শুয়ারের, না গরুর চামড়ার শ্যাটর-ম্যাটর জুতা।—বেটাছেলের কথা ছাড়িয়া দাও, তাহারা স্বভাবতই 'ম্লেচ্ছ।' তাই বলিয়া জুতা পরিয়া মেয়েছেলেদের মদ্দানি আর খেষ্টানি? ঝাঁটাইয়া তিনি মেয়ের বিষ ঝাড়িয়া দিবেন না!

খুকীর বয়স, নয় কি দশ। সে রাঢ় অঞ্চলের পাণ্ডব-বর্জ্জিত এক অপ্যাত পল্লী হইতে মায়ের সঙ্গে জীবনে এই প্রথম কলিকাতায় বেড়াইতে আসিয়াছে। তাহাদের ছোট্ট গ্রামখানির তুলনায় এই মহানগরীর ঐশ্বর্য্য তাহার নিকটে যেমন বেয়াড়া রকমের অদ্ভুত, তেমনি, তাহাদের খেজুর ও বাঁশ বনে ঘেরা ছোট্ট ঘরখানির তুলনায় সে যে বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইয়াছে, সে বাড়ীর ঐশ্বর্য্যও তাহার নিকট ঠিক সেই অনুপাতেই বেয়াড়া আর অদ্ভুত। তেতালা বাড়ী; দরজায় জানালায় সব ফুলছাপা চাদর ঝুলিতেছে। দেওয়ালের গায়ে কল, টিপিলেই দপ্ করিয়া ঘরের চালে 'লাইট' জ্বলিয়া ওঠে। নীচের তলায় 'গোয়াল' থেকে দুইটা মোটর-গাড়ী ভরভর ভরভর করিয়া যখন তখন কোথায় যেন যাওয়া আসা করে—সারাদিন।

বড়লোক মাসীর বাড়ীতে সে আরও অনেক কিছু দেখিল, যাহা সে ইহার আগে আর কখনও দেখে নাই। মস্ত বড় টেবিলের মত হারমোনিয়ম, ডালা তুলিয়া চাবিতে হাত দিলেই ঝং ঝং করিয়া বাজিয়া ওঠে—'বেলো' করিতেও হয় না। বড় বড় মেয়েরা বাঁ পায়ের উপর ডান পা তুলিয়া, গা বাঁকাইয়া হাত বাঁকাইয়া, কত রকম ভঙ্গী করিয়া নাচে, ছেলেরা বাজনা বাজায়। দুইবেলা খাইবার সময় হইলেই রান্নাঘর থেকে ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজে।

দেখিল সে অনেক কিছুই। এবং যাহা সে দেখিল তাহার সবই প্রায় অদ্ভুতপূর্ব্ব ও আশ্চর্য্য; ঘাগরার মত শাড়ী, কানের বালা, বিস্কুট, চকোলেট, কত রকম খাবার এবং ফলফলারির ছড়াছড়ি! কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ সবের কিছুই তাহাকে অভিভূত করিতে পারিল না; করিল এক জোড়া স্যাণ্ডাল। তাহারই সমবয়সী একটি মেয়ের পায়ে এক জোড়া স্যাণ্ডাল দেখিয়া সে এতই প্রমুগ্ধ হইয়া গেল যে, আর কোন কিছুতেই সে মন দিতে পারিল না। এক সময় মায়ের আঁচল ধরিয়া একান্তে বায়না করিতে গেলে মা তাহার গালে ঠোনা মারিয়া কহিলেন, "মুয়ে আগুন মেয়ের! পোড়া শকুনির ভাগাড়েই দিষ্টি!"

তাহার পরও, মেয়েছেলেদের জুতা-পরার বিরুদ্ধে মিঠে-কড়া ভাষায় তিনি আরও যে-সকল মন্তব্য করিতে লাগিলেন, তাহার মর্ম্ম আমরা গল্পের আরম্ভেই সংকলিত করিয়াছি।

খুকী কিন্তু আদর্শচ্যুত হইল না। মুখে সে আর কিছু বলিল না বটে, কিন্তু মুখ ভার করিয়া, ভ্রূ কুঁচ্কাইয়া, চাল চলনে একটা বিচারের ভাব ফুটাইয়া সকলের মধ্যে থাকিয়াও সারাক্ষণ এমনই একটু আলগোছে রহিয়া গেল যে, এতটুকু মেয়ের এই ভারী ভারী ভাব দেখিয়া গৃহিণী ছাড়া আর সকলেই মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মাসীমা অবসরমত এক সময় আদর করিতে আসিলেন, খুকী কথা কহিল না। শাড়ী পরিয়া, খোঁপা করিয়া, পিঠে রুটা চাবির রিং ঝুলাইয়া কচি মেয়ের গিন্নী সাজিয়া-থাকা দেখিতে পারেন না বলিয়া মাসীমা তার বস্ত্র মোচন করিলেন, ফ্রক পরাইয়া নোলক খুলিয়া লইলেন, আদর করিয়া কত-কি জিজ্ঞাসা করিলেন, আশ্চর্য্য, খুকীর কোনই ভাবান্তর ঘটিল না। শেষে যখন এক জোড়া ভাল শু-জুতো লইয়া মাসীমা তাহার পায়ের গোড়ায় বসিতে গেলেন, তখন খুকী

আধখানা ঠোঁটে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "অমনধারা নয়, আমি ইলার মতন স্যানডেল পরব।"

"বুড়ো ধ্যাংরা পরাব তোমায়!"—ঝড়ের মত বেগে লতিকা আসিয়া ঘরে ঢুকিল—"আর যা কর, কর দিদি, কিন্তু আমার মাথা খাও, জুতো ওকে পরিও নি। জুতো দেখলেই আমার গা ঘিন্‌ঘিন্ করে।"

সে কথা মিথ্যা নয়, জুতা দেখিলেই লতিকার গা ঘিন্ ঘিন করে। জুতা ঠিক নয়, জুতার হাঁ দেখিলে করে। জীবনে আজ পর্যন্ত এমন এক জোড়াও জুতা তাঁহার চোখে পড়ে নাই, যাহা কি না, হাঁ না করিয়া আছে। কি বিশ্রী হাঁ। ভোজে, উৎসবে, যেখানেই পুরুষেরা জুতা খুলিয়া জড় হয়, সেখানে তো চোখ পাতিবার জো নাই। রাশি রাশি জুতা 'সংগো মত্তো' হাঁ করিয়া, চিৎ হইয়া, পাশ ফিরিয়া, উপুড় হইয়া গড়াগড়ি পড়িয়া আছে। সে কত রকমের হাঁ! কেহ ডান দিকে চোয়াল বাঁকাইয়া আছে, কেহ বাঁ দিকে চোয়াল বাঁকাইয়া আছে। তাহার উপর যদি সে জুতা আবার তালি দেওয়া হয়, তো নাকের উপর বসন্ত! ঠিক যেন মনে হয়, হাঁ করা মুখের একজোড়া গোঁফ। ছি! জুতা মেয়েদের কোন মতেই পরিতে দেওয়া চলে না।

তা, চটি জুতার কথা যদি বল, তো সে আরও বিশ্রী। চটি দেখিলেই মনে হয়, যেন হাঁ-করা জুতাটার চোয়ালখানাই কে কামড় দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

আর জীবন্ত মানুষের পা গিলিয়া যে জুতারা রাস্তায় চলাফেরা করে, তাহাদের দেখিলে তো গায়ে কাঁটা দেয় লতিকার। কে জানে যে পা দুইটা আবার জুতার ভিতর থেকে আস্ত অবস্থায় আসিতে পারিবে কোন দিন। রাম রাম, যত সব 'রাক্ষুসে' কাণ্ড!

লতিকা কোন মতেই খুকীকে জুতা পরিতে দিলেন না। রমাও পীড়াপীড়ি করিলেন না। খুকী মাসীর হাত ছাড়াইয়া খালি পায়েই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

[২]

খুকীর মুখের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে আর সূর্যোদয় হইল না। মাঝে মাঝে দু-এক পসলা বর্ষণও হইল। কিন্তু সে-বর্ষণে লতিকার মনোভূমির আলগা মাটি ভাসিয়া গেল না, বরং বেশ করিয়া জমিয়া বসিয়া কঠিন হইয়া গেল।

দেশে ফিরিবার দিন দিদির প্রকাণ্ড মোটরে চড়িয়া লতিকা সকালবেলা কালীঘাটে পূজা দিতে গেলেন। মায়ের সঙ্গে খুকীও নাচিতে নাচিতে গিয়া গাড়ীতে উঠিল। কালীঘাটে পৌঁছিয়া আদিগঙ্গার কর্দমাক্ত নোংরা জলে গঙ্গা গঙ্গা বলিয়া ডুব দিয়া লতিকা আধ্যাত্মিক মালিন্য মোচন করিলেন, খুকী নিঃশব্দে পাড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। পট্টবাস পরিধানান্তে গলায় জবাফুলের মালা পরিয়া লতিকা তীর্থক্ষেত্র সারিয়া ঘুরিতে লাগিলেন, খুকী ক্রুদ্ধ নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া মন্ত্রচালিতের মত মায়ের পিছনে পিছনে চলাফিরা করিতে লাগিল—মুখটি পর্যন্ত খুলিল না।

কিন্তু, হঠাৎ ভাব পরিবর্তিত হইল বাড়ী ফিরিবার সময়।

মন্দিরের ভিতর গললগ্নীকৃতবাসে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া লতিকা দাঁড়াইয়া আছেন, খুকীও মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় এক সদ্যোনিহত রক্তাক্ত ছাগমুণ্ডকে সবাই করিয়া মা-কালীর সম্মুখে উপস্থিত করিতেই দেখা গেল খুকী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন কিছুর বাধা কিছু না, পায় সঙ্গে সঙ্গেই সে হনহন করিয়া মন্দির পরিত্যাগপূর্বক গাড়ীতে উঠিয়া পাপোষের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল।

মা আসিয়া বলিলেন, "মরণ! পাঁঠা খাবার যম, আবার মায়াকান্না!—দেখে বাঁচি নি!—নে ওঠ্, উঠে বস।"

খুকীর কোনরূপ অবস্থান্তর ঘটিল না।

লতিকা বুঝিলেন ব্যাপার গুরুতর। বলিলেন, "বায়না হচ্ছে না কি আবার?— মুয়ে আগুন মেয়ের! বিয়ে দিলে আজ্জিনে সাত ছেলের মা হতেন, পা ছড়িয়ে ব'সে আবার পোঁ ধরা দেখ না! লজ্জা করে না দেখে? নে ওঠ্।"

বায়নাই বটে। তাহার এক জোড়া স্যাণ্ডাল চাই-ই।

লতিকা তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। মেয়ের এই স্যাণ্ডাল-প্রীতির অহৈতুক প্রাবল্যকে ঘোরতর সন্দেহের চোখে দেখিয়া অনেক অপ্রিয় মন্তব্য করিলেন। বলিলেন, কলিকাতার কলের জল তাহার রোমকূপে ঢুকিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ঢুকিয়াছে, 'ভাবন্!' শহুরে মেয়েদের মত জুতা পরিয়া বেড়াইবার সখ তিনি তিন 'রাত্তি'তে যদি না মেয়ের ভাঙিয়া দিতে পারেন, তো তাঁহার নাম লতিকাই নয়।

ক্রোধে, অতিপ্রায়ের আকস্মিকতায় তাহার কণ্ঠস্বর বিলম্বিত এবং প্রায় অনুনাসিক হইয়া উঠিল, কিন্তু খুকী পাপোষ ছাড়িয়া উঠিল না। লতিকাও থামিল না, খুকীর স্যাণ্ডাল-প্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া, খুকীর মাথার ঝিঙ্গী-মেয়েদের বেহায়াপনাকে ব্যাপাঙ্ক করিয়া মেয়েছেলের জুতা-পরার বিরুদ্ধে তাঁহার সহজাত এবং দৃঢ়মূল বিরাগ কণ্ঠের পথে অগ্নিস্রাবের মত বাহিরে আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বৃত্ত রচনা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে, বড় রাস্তার দিকে মুখ ফিরাইবার জন্য গাড়ীটি একটি ছোট গলির মধ্যে পিছন ফিরিয়া ঢুকিতেই, স্থান-কাল-পাত্র ভুলিয়া লতিকা চীৎকার করিয়া হঠাৎ ড্রাইভারকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। একটি দোকানে কতকগুলি খেলনা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

খুকীর হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তিনি দোকানের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

"আহা, কি সুন্দর খেল্‌নাগুলো! দেখি বাছা, দাও তো এদিকে—আহা, ঠিক যেন সত্যিকারের!—ওটা কি গামলা না কি গো? ওমা কি সুন্দর!—নে খুকপুড়ী, আঁচল পাত্। পাল্‌কি নিবি? ওই 'বাঁগা' বাল্‌তিটা?—"

খুকীর আঁচল নাই, খুকী ফ্রক পরিয়া আছে। আজ খুকীর কানও নাই, সে মায়ের কথা শুনিতে পাইল না।

লতিকা আত্মগত ভাবেই বলিতে লাগিলেন, "হাতা, খুন্তি, গামলা, ঘটি, মায় পানের বাটাটি পর্য্যন্ত হুবহু ঠিক!—ওটা কি বল দেখি বাছা, জাঁতি না কি? ও মা, কি ছোট্ট! কি লো ভাবুনী, আঁচল পাতলি নি যে?"

"আমি চা-ই-নি খেলনা—নে ব-নি—"

"তোর ঘাড় নেবে শতেকখোয়ারী! নেঁ-ব-নি! আমরা বলে, বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত কালীতলার খেল্‌নার জন্য হা-পিত্যেশ জো-পিত্যেশ্ ক'রে মরতাম, আর মেম্‌সায়েব বলেন কি না, 'নে-ব নি'!"

খুকীর আঁচল পাওয়া গেল না। তিনি নিজেরই আঁচলে হাঁড়ি-কুঁড়ি, হাতা-বেড়ি প্রভৃতি মেলাই কতকগুলি খেলনা বোঝাই করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া আবার খুকী ধপ্ করিয়া পাপোষের উপর বসিয়া পড়িল। এইবার লতিকা সংযম রাখিতে পারিলেন না, গুম্ গুম্ করিয়া মেয়ের পিঠে বেশ ঘা-কতক উত্তম-মধ্যম কিল বসাইয়া দিলেন।

"মর পোড়ারমুখী, মর! হাড়ে আমার বাতাস ঢুকুক্। মা-কালীর কাছে বলিদান দিয়ে হাড়া-হাত-পা হয়ে যাই!—যে যে-ন কাঁথায় আগুন! জুতো নেবেন! মু-যে তোমার জুতো গুঁজে দেব নি।"

খুকী স্বর ধরিল না; দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া অনড় হইয়া গেল।

*

এদিকে, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিতেই সম্মুখে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। এক ভিখারিণী সামনে দাঁড়াইয়া অতিশয় করুণ কণ্ঠে কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করিয়াছে।

"দুটো পয়সা দিয়ে যাও মা—রাজরাজেশ্বরী মা—ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হও মা—জন্ম জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে বেঁচে থাক মা—হেঁই মা!—"

তাহাকে বারবার পথ ছাড়িতে বলা হইল, সে দৃক্ষেপ করিল না। গাড়ীর পথরোধ করিয়া মাগী কি জোর করিয়া পয়সা আদায় করিবে না কি? 'আস্পর্দ্ধা' তো কম নয়! লতিকা ভয়ানক চটিয়া গেলেন—এমন হারামজাদা 'নেই-আঁকড়ে' 'ভিকিরী'কে তিনি কিছুতেই ভিক্ষা দিবেন না। গাড়ী ভিখারিণীকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইল। ভিখারিণী দমিল না, কিছুক্ষণ গাড়ীর পাশেপাশেই ছুটিয়া চলিল। মুখে সেই বাঁধা বুলি,—"হেঁই মা—মা গো! বড় দুঃখী মা আমি! হেঁই মা, দুটি পয়সা মা।"

বলিতে বলিতেই সে গাড়ীর পিছনে গিয়া পড়িল।

"হাত বাড়িয়ে ফেলে দাও মা, কুড়িয়ে নেব মা আমি—দীন দুঃখীকে দয়া করলে না মা? তোমার মুখে আগুন মা! তোমার মেয়েটিকে কেওড়াতলায় রেখে যাও মা—শুনচ মা? কোল খালি ক'রে—"

ভিখারিণীর কথা আর কানে আসিল না। লতিকার মুখ এক মুহূর্ত্তেই ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল—মনে মনে শিহরিয়া তিনি ইষ্টনাম স্মরণ করিলেন। ষাট্ ষাট্ বলিয়া খুকীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বারবার তাহার মাথার ঘ্রাণ লইলেন।

ভিখারিণীর অভিশাপের কল্যাণেই খুকী ইষ্ট-প্রাপ্ত হইল—বড় রাস্তার একটা দোকানে গাড়ী থামাইয়া লতিকা তাহাকে একজোড়া স্যাণ্ডাল কিনিয়া দিলেন।

খুকীর স্যাণ্ডাল পরা সম্বন্ধে মায়ের মুখে আর কেহ উচ্চবাচ্য শুনিতে পাইল না।

তিনি লিখিয়াছেন—

"These apparent discrepancies are satisfactorily explained when we learn that Gonda is only a subdivision of Uttar-Kosala and that the ruins of Sravasti have actually been discovered in the district of Gonda, which is the Gonda of the Maps."

কানিংহাম সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই কূর্ম্মপুরাণ এবং মৎস্য-পুরাণের বচনের সঙ্গতি সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে। বঙ্গে শ্রাবস্তি নামে কোন জনপদ বা নগরী থাকিলে তাহার অন্ততঃ একটা জনশ্রুতিও পাওয়া যাইত। বসাক মহাশয় শিলালিপির "সকটী ব্যবধানবান্" কথাটিকে সমস্তপদ ধরিয়া লইয়াই এই গোলে পতিত হইয়াছেন। বালগ্রাম এবং শ্রাবস্তির মধ্যে একটা সকটী কল্পনাই তাঁহার ভ্রমের কারণ।

কামরূপের নৃপতি ধর্ম্মপালের প্রদত্ত তাম্রশাসন 'শুভঙ্কর পাটকলিপি', যাহা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদীয় কামরূপশাসনাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণের পরিচয় সম্পর্কে লিখিত আছে—

'গ্রামঃ ক্রোসঞ্জনামাস্তি শ্রাবস্ত্যাং যত্র যজ্বনাং।
হোমধূমাঙ্কুরাক্রান্তং নাবিশৎ কলিকল্মষং॥
তৎসজ্জনানাং প্রবরো দ্বিজানামুনারধীঃ কৌথুমশাখমুখ্যঃ।
ব্যযোগময়ঃ সার্ব্ববিদ্যামণ্ডঃ শাণ্ডিল্যগোত্রোহজনি রামদেবঃ॥" ইত্যাদি।

ইহাতেও দেখা যায়, শাসনপ্রাপক ব্রাহ্মণ হিমাঙ্গের পূর্ব্বপুরুষ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহারা শ্রাবস্তির ক্রোসঞ্জ-নামক গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই শ্রাবস্তির সঙ্গতি করিতে গিয়া কামরূপে একটা শ্রাবস্তির কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে বরেন্দ্রীমণ্ডল—বালগ্রামের অনতিদূরে কামরূপ রাজ্যের পশ্চিমভাগে শ্রাবস্তি নামে একটি জনপদ ছিল এবং উহাই সিলিমপুর শিলালিপি ও শুভঙ্কর পাটকলিপিতে কথিত শ্রাবস্তি। তিনি এই কথাও অনুমান করিয়াছেন যে, উত্তর-কোশলের প্রসিদ্ধ শ্রাবস্তি হইতে একদল ব্রাহ্মণ আসিয়া কামরূপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাসভূমির নাম জন্মস্থানের নামানুসারে শ্রাবস্তি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু, আমাদের কোন ঐতিহাসিক ইতঃপূর্ব্বে কখনও কামরূপে কোন শ্রাবস্তির দাবী করেন নাই, এমন কি জনশ্রুতিও এই বিষয়ে নীরব। অবশেষে পদ্মনাথ বাবুও ১৩৪১ বাঙ্গলার পৌষমাসের 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"শ্রাবস্তি খোদ কামরূপের না হইলেও তৎসংলগ্ন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়ভূমিতে অবস্থিত ছিল।" এখানে তাঁহার যুক্তি এই যে, "শ্রাবস্তি সিলিমপুর শিলালিপিতে উক্ত বালগ্রাম হইতে মাত্র সকটী (গ্রাম) দ্বারা অন্তরিত।"

বালগ্রাম পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সীমান্তস্থিত গ্রাম। উহা কামরূপরাজ্যের প্রান্তভাগে অবস্থিত। ঐ গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া এবং শ্রাবস্তি ও বালগ্রামের মধ্যে সকটী নামে আর একটি গ্রাম কল্পনা করিয়া অধ্যাপক বসাক মহাশয় বঙ্গের দিকে এবং অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কামরূপের দিকে একটা শ্রাবস্তি অবস্থান ধরিয়া লইয়াছেন। কারণ তাঁহারা উভয়েই সিলিমপুর শিলালিপি-উক্ত বালগ্রামের বিশেষণ "সকটী ব্যবধানবান্" পদ দুইটিকে সমস্তপদ ম[ানিয়া] লইয়া অর্থ করিয়াছেন—'সকটী দ্বারা অন্তরিত'। কাজেই বালগ্রামের অনতিদূরে একটা শ্রাবস্তি না পাইলে তাঁহাদের চলিতেছে না।

আমরা মনে করি, ঐ 'সকটী' এবং 'ব্যবধানবান্' ভিন্নপদ। সকটী (শকটবান্) ব্যবধানবান্ (প্রাচীর-পরিখাদিবিশিষ্ট) ঐ উভয় পদই বালগ্রামের বিশেষণ। যদিও শিলালিপিতে 'সকটী (দন্ত্য স)' লিখা আছে, তথাপি উহা 'শকটী' শব্দের পরিবর্ত্তে লিখিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। প্রায় সকল তাম্রশাসনেই এই শ্রেণীর ভুল দৃষ্ট হয়, শিলালিপিতে যিনি অক্ষর উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অধিকার না থাকারই কথা। কাজেই তালব্য শকারের স্থলে দন্ত্য সকার লিখা নিতান্ত স্বাভাবিক। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন যে, 'সকটী' শব্দটী 'শকটী'র প্রাকৃত রূপান্তর। (কামরূপশাসনাবলী, ১৬৬ পৃষ্ঠা পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

অতএব দেখা যাইতেছে আমরা বালগ্রামের তিনটী বিশেষণ পাইতেছি (১) বরেন্দ্রীমণ্ডনঃ (২) শকটী (৩) ব্যবধানবান্। বরেন্দ্রীমণ্ডন বলিবার কারণ এই যে, দেশের সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রাম সর্ব্বদাই কামরূপের আক্রমণে বাধা দিয়া বরেন্দ্রভূমের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছিল। সীমান্তস্থিত ঐ গ্রামে সেকালের যুদ্ধোপযোগী সৈন্য-শকটাদি অবশ্যই রাখা হইত, সুতরাং উহা শকটী (শকটবান্) ছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সৈন্য-শকটাদি সুরক্ষিত করিবার জন্য গ্রামটিকে প্রাচীরাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইয়াছিল, কাজেই উহা 'ব্যবধানবান্' ছিল। বালগ্রাম নামেও প্রতীত হয় যে, উহা সৈন্য-সামন্তদের থাকিবার স্থান ছিল। 'বল' শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে সৈন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

যথা—"পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্" ইত্যাদি।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

অদ্যাপি যে গ্রাম 'বোলগাঁও' নামে পরিচিত, তাহার পূর্ব্ব নাম বলগ্রাম হওয়াও বিচিত্র নহে। লিপিকর প্রমাদেও 'আ'কারটি অতিরিক্ত যোজিত হইতে পারে। বিশেষতঃ যদি 'সকটী' শব্দটি 'ব্যবধানবান্' পদের সহিত সমস্ত হইত, তাহা হইলে ঈ-কারটি লুপ্ত হইত। দীর্ঘ ঈকারান্ত 'সকটী' শব্দ প্রথমা বিভক্তিযুক্ত পদ এবং উহা বালগ্রামের স্বতন্ত্র বিশেষণ ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আমার এই ব্যাখ্যা বিদ্বৎ-সমাজ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে শ্রাবস্তি এবং বালগ্রামের মধ্যে সকটী নামে একটা গ্রাম বা নদী কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। ব্রাহ্মণেরা যে শ্রাবস্তির বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া বালগ্রামে এবং কামরূপে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই শ্রাবস্তি উত্তর-কোশলের গোণ্ডা জিলায় হইলেও কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না।

বস্তুতঃ, সিলিমপুর শিলালিপির প্রহাস এবং শুভঙ্কর পাটকলিপির হিমাঙ্গের পূর্ব্বপুরুষেরা যে উত্তর কোশলের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ শ্রাবস্তি হইতেই এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে। ইঁহারা ছাড়া

যে আরও অনেক ব্রাহ্মণ সেই অঞ্চল হইতে বঙ্গে ও কামরূপে আসিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। কারণ প্রত্যেক ব্রাহ্মণের উপরই তাম্রশাসনাদিতে থাকা সম্ভব নহে। সকলেই রাজদরবারে গিয়া ভূমিদান গ্রহণ করেন নাই। অথচ, সেই রেল-জাহাজ বিরহিত দিনে অতিদূরবর্ত্তী শ্রাবস্তি হইতে একাকী কাহারও বঙ্গে বা কামরূপে আসা সম্ভব নহে। অবশ্যই একদল ব্রাহ্মণ স্ব স্ব বন্ধুবান্ধব সহ একত্রভাবে আসিয়াছিলেন। ঐ শ্রাবস্তি হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরাই বঙ্গদেশে কানৌজ-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ তাঁহারা যে সময়ে (বেদবাণাঙ্ক শক, ৭০২ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে উত্তর-ভারতে কান্যকুব্জই রাজধানী ছিল। উত্তর-কোশল তখন কান্যকুব্জের সম্রাটেরই শাসনাধীন ছিল। কাজেই যাঁহারা শ্রাবস্তি হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজধানীর নামেই এদেশে পরিচিত হইয়াছিলেন। যেমন আজকাল ঢাকা, চট্টগ্রাম বা শ্রীহট্ট হইতে কোন ব্যক্তি চীন, জাপান বা ইংলণ্ডে গেলে কলিকাতার লোক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা আসামে গেলে কলিকাতার লোক বলিয়া পরিচিত হয়। তাঁহাদের জন্মস্থান কলিকাতা হইতে কি ২০০।৩০০ মাইল দূরে তাহার খবর কেহ রাখে না। এবং দূরদেশে গেলে রাজধানীর নামেই পরিচিত হইতে হয়। মফঃস্বলের গ্রামের নামে কাহারও পরিচয় সম্ভব হয় না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে (রেল-জাহাজ-বিরহিত দিনে) কান্যকুব্জ এবং বঙ্গের দূরত্বজ্ঞান আজকালকার হিসাবে চীন-জাপানের মতই ছিল। কারণ অধুনা ভারতবর্ষ হইতে চীনে, জাপানে বা ইংলণ্ডে যাইতে যত সময় লাগে, অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জ বা শ্রাবস্তি হইতে বঙ্গদেশে আসিতে তদপেক্ষা অধিকদিন লাগিত। সুতরাং যাঁহারা শ্রাবস্তির বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন, বঙ্গদেশে তাঁহারা স্বভাবতঃই কানৌজ-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

শ্রাবস্তির বিভিন্ন গ্রাম হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কান্যকুব্জাধিপতির রাজ্য হইতে আসিয়াছিলেন এবং সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই কথা [illegible] শিলালিপি এবং কুলজ্ঞের পঞ্জিকাদিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। অতএব কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ-আমদানী ব্যাপারটা কোন প্রকারেই অমূলক হইবার কথা নহে এবং উহা আজগুবি ইতিহাসও নহে। যাঁহারা একমাত্র তাম্রশাসন এবং শিলালিপিকেই ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে স্বীকার করেন তাঁহারাও সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের কান্যকুব্জ রাজ্য হইতে বঙ্গদেশে আগমন অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে তাঁহারা কি কারণে এদেশে আসিয়াছিলেন, আদিশূর নামক কোন নৃপতির যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন কি না, এই সম্পর্কে কোন তাম্রশাসন বা শিলালিপি অদ্যাপি পাওয়া যাইতেছে না। কারণ প্রবল পরাক্রান্ত শশাঙ্ক নৃপতির মৃত্যুর পর হইতে পালরাজগণের অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্য্যন্ত (এক শতাব্দীরও অধিক কাল) বাঙ্গলার কি অবস্থা ছিল, কে কে রাজা হইয়াছিলেন সেই বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা অন্ধকারে আছেন। অথচ ঐ সময়টাই সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের বঙ্গদেশে আগমনের কাল। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বঙ্গের সিংহাসনে কোন্ কোন্ নৃপতি আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার একটা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার আদিশূরকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব

রথযাত্রা

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনায়ে আসিছে পল্লীর পথে পথে
যাত্রী সকলে ফিরিয়া চলেছে এসেছিল যারা রথে।
বাঁশী, ঝুম্ ঝুমী, কাঠের পুতুল, মাটির ঘোড়া বা হাতী—
খোকার জন্য কেহ কিনিয়াছে রং-করা চুষিকাঠি,
পাতার ঠোঙায় মিঠাই লয়েছে কেহ বা ছেলের তরে
পল্লীর পথ মুখরিত করে চলিয়াছে সবে ঘরে।

একধারে চলে জীর্ণ বসনে ভিখারিনী এক নারী
মিঠাইয়ের তরে ছেলেটি তাহার কোঁক লইয়াছে ভারি।
বলে,—ভাখ্ ও মা ওদের রয়েছে কত খেলা, কত বাঁশী—
মণ্ডা মেঠাই রহিয়াছে কত আমি যাহা ভালবাসি।
মাতা বলে— বাছা লক্ষ্মী আমার সোনাছেলে যাদুধন!
ঘরে চল দিব,—জানে না জননী কেমনে পূরাবে পণ।

অনেকে শুনিল তাহাদের কথা উপহাসি কেহ বলে,—
—ভিখারী-ছেলের আব্দার শোন—হাসে আর পথ চলে।
সন্ধ্যা-তারাটি উঠেছে গগনে কুলায়ে ফিরেছে পাখী
ভিখারী নারীর ফুরায়েছে পথ নাই আর বেশী বাকী।
মনে মনে ভাবে কি দিয়ে বুঝাবে অবুঝ তনয়ে তার
পথ হ'তে এক নারী ডেকে কয়,—শুনে যাও একবার।

—দুটি বাঁশী আমি কিনিয়াছি ভাই আমার ছেলের তরে
একটি তোমার ছেলেটিকে দিয়ে নিয়ে যাও তারে ঘরে।
আর এই ছুটো—বলি নারী তারে মিঠাই দিলেন হাতে—
জোছনা তখন মিশা'য়ে দিয়েছে ধরণী আকাশ সাথে।

বিজ্ঞান-জগৎ

কৃত্রিম নক্ষত্র

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

পরিষ্কার রাত্রে আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি আপাতদৃষ্টিতে ক্ষীণ জ্যোতিষ্ক বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যসদৃশ অগ্নিময় পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ, সূর্য্য কিছু বৃহৎ নক্ষত্র নহে, এরূপ অনেক নক্ষত্র আছে যাহা সূর্য্য অপেক্ষা বহু লক্ষগুণ বৃহত্তর। আমরা যে সূর্য্যকে এরূপ উজ্জ্বল দেখি তাহার কারণ সূর্য্য আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী নক্ষত্র। নক্ষত্রের দূরত্ব সাধারণতঃ মাইল হিসাবে ধরা হয় না, কারণ তাহা হইলে পরিমাণ প্রকাশ করিবার সংখ্যাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়ে। নক্ষত্রের দূরত্ব মাপিবার মাপকাঠি "আলোক-বর্ষ"। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১ ৮৬ ০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। সুতরাং ১ বৎসরে ১ ৮৬ ০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ — ৬০ ৪৫ ৬৯ ৬০ ০০ ০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে প্রায় ৮ মিনিট মাত্র সময় লাগে। ইহার পরবর্ত্তী পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে সময় লাগে প্রায় ৪ বৎসর। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহাকাশে এরূপ দূরবর্ত্তী নীহারিকা আছে যে, তাহা হইতে আলোক আসিতে সময় লাগে ১৫ কোটী বৎসর।

বামে: ডক্টর কিং-এর যন্ত্রসজ্জার একাংশ

মধ্যে: সৌরকলঙ্কের প্রচণ্ড অগ্নিশিখা, ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের সহিত তুলনীয়,

নিম্নে দক্ষিণে ক্ষুদ্র শ্বেত বিন্দুটি পৃথিবীর আয়তন নির্দেশ করিতেছে।

দক্ষিণে: ডক্টর কিং এবং সৌরকলঙ্কের চৌম্বক প্রাবল্য নির্ণয় করিবার বৈদ্যুত চুম্বক

আকাশের নক্ষত্রসন্নিবেশ দেখিলে বোধ হয় যে, নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি নক্ষত্র হইতে অপর নক্ষত্রের ব্যবধান অতিশয় বৃহৎ। বৈজ্ঞানিকরা মনে করিয়া থাকেন যে, সকল নক্ষত্র মূলতঃ একই প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। পৃথিবী বা সূর্য্যের অবয়বে যে সমস্ত দ্রব্যের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, সেই জাতীয় দ্রব্যসকল অন্যান্য নক্ষত্রেরও উপাদান। নক্ষত্রগুলি এরূপ দূরে অবস্থিত যে, উহাদের সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ সম্ভব নহে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিরূপে বৈজ্ঞানিকরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা আলোচিত হইতেছে।

বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তিনকোণ কাচের কলম বা 'প্রিজম্'এর ভিতর দিয়া সূর্য্যালোক যাইলে তাহা কতকগুলি রঙীন আলোকে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। অনেক দর্পণের ধারগুলি তির্য্যক্‌ভাবে কাটা থাকে, এইরূপ

দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যালোক দেওয়ালে ফেলিলে দেখা যায় যে, প্রান্ত হইতে প্রতিফলিত আলো আর শ্বেত থাকে না, সেখানে নানা বর্ণের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। রামধনুও এইরূপে বৃষ্টি-কণিকা দ্বারা বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোকের ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা এক বর্ণের আলোক বলিয়া বোধ হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া বিভিন্নবর্ণের যে সমাবেশ পাওয়া যায় তাহাকে বর্ণচ্ছত্র বা 'স্পেকট্রাম' (spectrum) বলা হইয়া থাকে। যে যন্ত্রদ্বারা বর্ণচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ এবং বর্ণচ্ছত্রের বিভিন্ন অংশের অবস্থান পরিমাপ করা যায় তাহাকে 'স্পেকট্রোমিটার' বলা হয়। স্পেকট্রোমিটারে প্রধানতঃ একটি প্রিজম্ এবং দুইটি দূরবীণ থাকে, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রিজম্ না ব্যবহার করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'গ্রেটিং' (diffraction grating) ব্যবহৃত হইতেছে। একটি পালিশ করা ধাতুখণ্ডে অনেকগুলি সমান্তর রেখা টানা হইলেই গ্রেটিং প্রস্তুত হয়। রেখাগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে বহু সহস্র রেখা আঁকা থাকে। গ্রেটিং প্রস্তুত করা অত্যন্ত ব্যয়-সময়-এবং পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। একটি গ্রামোফোনের রেকর্ড হইতে গ্রেটিং'এর ক্রিয়া বুঝা যাইতে পারে। একখানি রেকর্ড লইয়া চোখের প্রায় সমসূত্রে জমির সমান্তর ভাবে ধরিয়া আলোকের দিকে তাকাইলে রঙীন বর্ণসমাবেশ দেখা যাইবে। গ্রেটিংএ এইরূপে বর্ণচ্ছত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের বর্ণচ্ছত্রে বহুসংখ্যক রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই রেখাগুলির অবস্থান কোন বস্তুর স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। এক ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপ যেরূপ অপর কোন ব্যক্তির আঙ্গুলের ছাপের সহিত মিলে না, সেইরূপ একটি দ্রব্যের বর্ণচ্ছত্র অপর কোন বস্তুর বর্ণচ্ছত্রের সহিত মিলে না। বিভিন্ন দ্রব্যের বর্ণচ্ছত্রের সহিত কোন নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্র মিলাইলে নক্ষত্রটিতে কি কি দ্রব্য বর্ত্তমান আছে তাহা অনায়াসেই নির্ণয় করা যাইতে পারে।

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, কোন বস্তুর উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহার বর্ণচ্ছত্রের রেখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। উত্তাপ কম থাকিলে বর্ণচ্ছত্রের কেবল মাত্র লাল অংশ পাওয়া যায়, ক্রমশঃ উত্তাপ বাড়িলে পর পর কমলা, পীত, সবুজ, নীল, নীল-ভায়লেট এবং ভায়লেট রংএর বিকাশ হইয়া থাকে। দৃশ্য আলোক ছাড়া লালের আগে 'ইন্‌ফ্রা-রেড' এবং ভায়লেটের পরে 'আলট্রা ভায়লেট' অংশেও বর্ণচ্ছত্র বিস্তৃত থাকে; ফটোগ্রাফের সাহায্যে এইগুলির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

পৃথিবীর বৃহত্তম মানমন্দির আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন নামক স্থানে। মানমন্দিরের কার্য্যের সহায়তার জন্য সেখানে কয়েকটি বিশেষ গবেষণাগার আছে। একটি গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপযুক্ত নক্ষত্রের উত্তাপ ও প্রকৃতি নির্ণীত হইয়া থাকে। এই গবেষণাগারের পরীক্ষাপ্রণালী বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়।

কৃত্রিম উপায়ে কোন নক্ষত্রের অনুকরণ বিশেষ কঠিন নহে। একটি 'গ্র্যাফাইট'এর (পেন্সিলের সীসের প্রধান উপকরণ গ্র্যাফাইট বা কৃষ্ণসীসক) নলের মধ্যে নক্ষত্রের সাধারণ উপাদানসমূহ রাখা হয় এবং নলটি একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির মধ্যে রাখা হয়। বৈদ্যুতিক চুল্লির মধ্যে এক হাজার হইতে দুই হাজার অ্যাম্পিয়ার বৈদ্যুতিক প্রবাহ দেওয়া হইলে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় এবং দ্রব্যগুলি হইতে আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে। বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া দ্রব্যগুলির বর্ণচ্ছত্র কোন নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রের সহিত মিলান হয়। এখন দুইটি বর্ণচ্ছত্র যখন এক, তখন নক্ষত্রের বহিরাংশ সর্ব্বাংশে গ্র্যাফাইট-নলস্থিত দ্রব্যগুলির অবস্থার অনুরূপ।

নক্ষত্রসমূহের বহিরাংশের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম, ভিতরের উত্তাপ বহু লক্ষ ডিগ্রি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর কিং তাঁহার যন্ত্রে প্রায় ৩৫০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত উত্তাপের সৃষ্টি করিতে পারেন। নক্ষত্রের উত্তাপের তুলনায় ৩৫০০ ডিগ্রি উত্তাপ কিছু অধিক নহে, সূর্য্য দেহের আনুমানিক উত্তাপ মাত্র ৬০০০ ডিগ্রি। কিন্তু জাগতিক মাপকাঠিতে ৩৫০০ ডিগ্রী উত্তাপ যথেষ্ট বেশী। এই উত্তাপে কোন বস্তুই কঠিন অবস্থায় থাকিতে পারে না, সমস্তই তরল অথবা বাষ্প হইয়া যায়।

কোন সাধারণ তাপমান বা 'থার্মোমিটার' দ্বারা এইরূপ উত্তাপ নির্ণয় করা সম্ভব নহে। বৈদ্যুতিক চুল্লির উত্তাপ নির্ণয় করিবার জন্য বৈদ্যুতিক বাতি-সংযুক্ত একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ক্রমশঃ বৈদ্যুতিক প্রবাহ বাড়াইয়া বাতির বৈদ্যুতিক তারের বর্ণ চুল্লির আলোকের বর্ণের সহিত মিলান হয়। দুইটি বর্ণ এক করিতে হইলে বৈদ্যুতিক বাতিতে যত পরিমাণ প্রবাহ দেওয়া হইল তাহা হইতে উত্তাপ হিসাব করিয়া বাহির করা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর যন্ত্রকে 'অপ্‌টিক্যাল পাইরোমিটার' বলা বলা হয়।

বর্ণিত যন্ত্র সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপের নক্ষত্রের অবস্থা অনুকরণ করা যায় কিন্তু উষ্ণতর নক্ষত্রের অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রগুলিতে, বস্তু পরমাণু হইতে ইলেকট্রন খসিয়া গিয়া এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত হইতেছে। এই অবস্থার অনুকরণের জন্য অত্যন্ত প্রবল চাপের বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। প্রবল চাপযুক্ত বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সংঘাতে কোন বস্তু হইতে ইলেকট্রন খসিয়া যায় এবং উত্তপ্ত নক্ষত্রের অবস্থার প্রতিরূপ পাওয়া যায়।

ডক্টর কিং'এর পরীক্ষার ফলে অনেকগুলি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রে এরূপ কয়েকটি রেখা পাওয়া গেল যে, তাহার অনুরূপ রেখা কোন জ্ঞাত বস্তুর বর্ণচ্ছত্রে পাওয়া গেল না। ডক্টর কিং অনেক গবেষণার পর দেখাইলেন যে, রেখাগুলি 'সায়ানোজেন' নামক অতি তীব্র বিষাক্ত গ্যাসের।

সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত। ডক্টর কিং-এর কয়েকটি পরীক্ষার ফলে উহাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু সঠিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সৌরকলঙ্ক সম্বন্ধে পূর্ব্বে এই পত্রিকায় আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বহুদিন হইতে বৈজ্ঞানিকরা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না যে, সৌরকলঙ্ক সূর্য্যের দেহ অপেক্ষা উত্তপ্ততর অথবা শীতলতর। এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য ডক্টর কিং পৃথক ভাবে সৌরকলঙ্ক ও সূর্য্যের অন্য অংশের বর্ণচ্ছত্রের ফটোগ্রাফ তুলিলেন। ফটোগ্রাফে দেখা গেল যে, সৌরকলঙ্কের বর্ণচ্ছত্রের রেখাগুলি অপেক্ষাকৃত প্রবল। সূর্য্যদেহে যে সকল দ্রব্যের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে সেগুলির বর্ণচ্ছত্র গ্রহণ করা হইল এবং উত্তাপ পরিবর্তন করিয়া দুই প্রকার বর্ণচ্ছত্রের সহিত মিলান হইল। পরীক্ষায় দেখা গেল যে অপেক্ষাকৃত অল্প উত্তাপেই রেখাগুলি অধিকতর প্রবল দেখা যায়, সুতরাং ইহা হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, সৌরকলঙ্কের উত্তাপ সৌর দেহের উত্তাপ অপেক্ষা অল্প।

সৌরকলঙ্কের সহিত চুম্বকত্বের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সৌরকলঙ্কের বর্ণচ্ছত্রের অনেক রেখা পুনরায় ভাঙ্গিয়া দুইটি বা তিনটি রেখায় পরিণত হইতে দেখা যায়. সৌরকলঙ্কের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্যের উপর তাহা নির্ভর করে। ডক্টর কিং একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বৈদ্যুত চুম্বক লইয়া চুম্বকের দুইটি মেরুর মধ্যে তাঁহার পরীক্ষার গ্র্যাফাইট নলটি রাখিলেন এবং বৈদ্যুত চুম্বকের বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিবর্তন করিয়া বর্ণচ্ছত্রের রেখাগুলির অনুরূপ রেখা পাইলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বকের প্রাবল্য সহজেই পরিমাপ করা চলে, সুতরাং সূর্য্যদেহের উপরিভাগে অবস্থিত সৌরকলঙ্কের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের পরিমাণও নির্ণীত হইল।

অধিকাংশ নক্ষত্রেই অঙ্গার বর্ত্তমান, সুতরাং সকল নক্ষত্রের বর্ণচ্ছত্রে অঙ্গারের বিশিষ্ট ছত্র পাওয়া যাইবে। অঙ্গারের বর্ণচ্ছত্র রেখাময় নহে, অবিচ্ছিন্ন। ডক্টর কিং দেখিলেন যে, অধিকাংশ নক্ষত্রে সাধারণ অঙ্গারের বর্ণচ্ছত্র ব্যতীত আরও একটি অবিচ্ছিন্ন ছত্র পাওয়া যাইতেছে। এই নূতন ছত্রটির প্রকৃতি হইতে ইহাকে অঙ্গারের বলিয়াই তাঁহার বোধ হইল, কিন্তু পৃথিবীতে তিনি ইহার অনুরূপ কোন দ্রব্যের সন্ধান প্রথমে পাইলেন না। অপর এক বৈজ্ঞানিকের সহযোগিতায় কিছুদিন গবেষণার পর তিনি প্রমাণ করিলেন যে, এই নূতন বর্ণচ্ছত্রটি অঙ্গারের একটি 'আইসোটোপ'এর। তখন পৃথিবীতে এই অঙ্গারের সন্ধান চলিল এবং কিছুদিন চেষ্টার পর দেখা গেল ইহা সাধারণ অঙ্গারের সহিত অল্প পরিমাণে—শতকরা প্রায় ০·৫ ভাগ—প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছে।

ডক্টর কিং-এর পরীক্ষায় আরও একটি বিস্ময়কর ব্যাপারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে পৃথিবী-

মন্ত্রিত্বগ্রহণের পরে

...গাড্ডি ভি মিল গিয়া, লাইসেন ভি মিলা, লেকিন চালানে মে বহুৎ দিগদারি মালুম হোতা

সাম্রানতার যূপ-কাষ্ঠ

রণ-দেবতা—একে একে

বহির্ভূত একমাত্র দ্রব্য উল্কা। উল্কা প্রধানতঃ দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়; প্রথম শ্রেণীর উল্কাগুলি ভঙ্গপ্রবণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উল্কাগুলি নিকেল ও লৌহের অত্যন্ত দৃঢ় ও ঘাতসহ ধাতুসঙ্করে নির্ম্মিত। অনেক সময় দেখা যায় যে, একটি উল্কাপিণ্ডের কতকাংশ প্রথম শ্রেণীর এবং অবশিষ্টাংশ দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহার কারণ প্রথমে কেহই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। পাঠকপাঠিকারা বোধ হয় জানেন যে, রেডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্য স্বতঃই ভাঙ্গিয়া গিয়া অন্য পদার্থে পরিণত হইতেছে। পূর্ব্বে কৃত্রিম উপায়ে এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয় নাই কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীময় বহু গবেষণাগারে এক দ্রব্যের পরমাণু ভাঙ্গিয়া অন্য দ্রব্যে পরিণত করা হইতেছে। অত্যন্ত প্রচণ্ড বেগে ধাবিত ভারী হাইড্রোজেনপ্রবাহ দ্বারা কোন দ্রব্য ভাঙ্গিয়া প্রধানতঃ এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়াছে। ডক্টর কিং দেখিলেন যে, নিকেল ও লৌহ প্রভৃতি দ্রব্য—যে গুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর উল্কাপিণ্ডে পাওয়া যায়, সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে ভাঙ্গিলে যে সকল দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহার সকল গুলিই প্রথম শ্রেণীর উল্কাপিণ্ডে পাওয়া যায়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রবাজির মধ্যে এরূপ বহু নক্ষত্র রহিয়াছে, যাহার অভ্যন্তরে নিরন্তর এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

আগ্নেয়গিরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ

হাওয়াই দ্বীপ পৃথিবীর দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম। হাওয়াই'এর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি মাউনা লোয়া এই দ্বীপে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরে যত আগ্নেয়গিরি আছে, মাউনা লোয়া তাহাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে; সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ১৩ ৬৭৫ ফুট।

আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য হাওয়াই দ্বীপে একটি বীক্ষণাগার আছে। এই বীক্ষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর টমাস এ. জ্যাগার গত বিশ বৎসর ধরিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ডক্টর জ্যাগার একটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি কিলাউইয়া'র 'নিকা'পি' গহ্বরের মধ্যে বাস করেন। গত বিশ বৎসর ধরিয়া আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বহু তথ্য প্রত্যহ সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আগ্নেয়গিরির সহিত ভূমিকম্পের ও 'টাইডাল ওয়েভ'এর (tidal

এরোপ্লেন হইতে লাভা-স্রোতের উপর বোমা নিক্ষেপ করা হইতেছে।

wave) অত্যন্ত নিকট যোগ আছে। ডক্টর জ্যাগার তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে দেখিয়াছেন যে, গড়পড়তা হিসাবে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর অন্তর মাউনা লোয়া সক্রিয় হইয়া উঠে। মাউনা লোয়ার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে ডক্টর জ্যাগারের এইরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে,

তিনি গত দুইটি অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক নির্দ্দেশ পূর্ব্ব হইতেই দিতে সমর্থ হন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মাউনা লোয়া প্রায় ১৬ মাস ব্যাপী সময় সক্রিয় ছিল। এই সময়ে এত প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয় যে, হাওয়াইয়ের প্রধান শহর হিলোর প্রায় পাঁচ মাইল নিকটে পর্য্যন্ত লাভাস্রোত আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হিলো শহরের 'ফেডারল বিল্ডিং'এর প্রায় ১ মাইল পর্য্যন্ত লাভাস্রোত আসিয়াছিল। এই দুইটি ঘটনা হইতে মাউনা লোয়ার সক্রিয়তা বুঝা যাইবে। লাভাস্রোতের উত্তাপ সময়ে সময়ে ২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্য্যন্ত উঠে। অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ হইবার ১ বৎসর পরে পর্য্যন্ত পাহাড়ের ধারে জমা লাভার উত্তাপে রন্ধন করা সম্ভব।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ২১শে তারিখে সন্ধ্যার সময় সমস্ত হাওয়াই দ্বীপ ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠে এবং দুই ঘণ্টা পরে একটি টাইডাল ওয়েভ দেখিতে পাওয়া যায়। টাইডাল ওয়েভের সংঘাতে ২৫ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চে জল উঠিতে দেখা যায়। পরদিন প্রাতঃকাল হইতে মাউনা লোয়া হইতে অগ্নিময় গলিত লাভা নির্গত হইতে থাকে। কোন কোন স্থানে এই লাভার বেগ ঘণ্টায় ১৫ মাইল পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। স্থানে স্থানে উচ্চ হইতে নীচে পড়িবার সময় জলন্ত লাভা অগ্নিপ্রপাতের সৃষ্টি করে। বনের মধ্য দিয়া যখন লাভা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন বনের গাছপালার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ প্রচণ্ড তাপে এত সহসা বাষ্পীভূত হইতে থাকে যে, সমস্ত গাছপালা কামানের মত শব্দ করিয়া বিস্ফোরিত হইতে থাকে। সমস্ত আকাশ ধূমে ও গ্যাসে পূর্ণ হইয়া যায়। অগ্নিস্রাবী মাউনা লোয়া এরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, ১৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াহু দ্বীপ হইতে অগ্নির আভা দেখিতে পাওয়া যায়।

কয়েকদিন ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকে এবং লাভাস্রোত ক্রমশঃ হাওয়াই দ্বীপের প্রধান শহর হিলো অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ডক্টর জ্যাগার এরোপ্লেনে উঠিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, প্রধান লাভাস্রোত প্রায় ১ মাইল চওড়া এবং ইহা হইতে প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা নির্গত হইয়াছে।

প্রায় ১ মাস কাটিয়া গেল, কিন্তু লাভাস্রোতের থামিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বড়দিন কাটিয়া গেল এবং তখনও প্রতিদিনে ২ মাইল করিয়া লাভাস্রোত শহর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পরদিন দেখা গেল যে, লাভাস্রোত প্রায় ওয়াইলুকু নদীর নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদী হইতে হিলোর জল সরবরাহ করা হইয়া থাকে। ডক্টর জ্যাগার লাভাস্রোত বন্ধ করিবার বহু উপায় চিন্তা করিয়া দেখিলেন এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যদি কোন উপায়ে লাভাস্রোত এরূপ ভাবে ছড়াইয়া দেওয়া সম্ভব হয় যে, তাহাতে ভিতরের গলিত লাভা শীঘ্র শীতল হইয়া যায়, তাহা হইলেই উহার গতি রোধ করা যাইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনযোগে মার্কিন বিমানঘাটিতে খবর দিলেন এবং সেই রাত্রেই ১২ খানি বোমানিক্ষেপকারী এরোপ্লেন লাভার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল।

এরোপ্লেনগুলি হইতে ২০টি বোমা লাভাস্রোতের উপর নিক্ষেপ করা হয়; প্রত্যেক বোমায় ৬০০ পাউণ্ড করিয়া ট্রাই-নাইট্রো টোলুইন নামক অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক ছিল। বিস্ফোরণের ফলে লাভাস্রোতের অভ্যন্তরস্থ লাভা বাহিরে আসিয়া পড়িল এবং ছড়াইয়া পড়ার জন্য শীঘ্র শীতল হইয়া গেল। লাভা শীতল হইলেই তাহা কঠিন হইয়া যায় এবং তখন তাহা আর তরল পদার্থের মত প্রবাহিত হইতে পারে না। ডক্টর জ্যাগারের এই পরীক্ষা বিশেষভাবে সফল হইল, লাভাস্রোত আর অগ্রসর হইল না, কঠিন হইয়া জমিয়া গেল।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অগ্ন্যুৎপাতে ডক্টর জ্যাগার লক্ষ্য করেন যে, লাভাস্রোতের তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত কোন বাধায় প্রতিহত হইলে, লাভাস্রোত অন্য পথ অনুসরণ করে, পূর্ব্বের দিক্ অভিমুখে আর ধাবিত হয় না। এই অভিজ্ঞতার ফল হইতে ডক্টর জ্যাগার, মাউনা লোয়ার ভবিষ্যৎ অগ্ন্যুৎপাতে যাহাতে হিলো শহরের কোন ক্ষতি হইতে না পারে, সেই জন্য পর্ব্বতগাত্রে কয়েকটি প্রাচীর গাঁথিবার সংকল্প করিয়াছেন। প্রথমটি হইবে সমুদ্র হইতে ১০০০০ ফুট উচ্চে, দ্বিতীয়টি ৭০০০ ফুট উচ্চে এবং তৃতীয়টি ২৫০০ ফুট উচ্চে। প্রাচীরগুলি এইরূপ স্থানে

এবং এইরূপ ভাবে স্থাপন করা হইবে যে, লাভাস্রোত শহরের দিকে অগ্রসর হইতে না পারিয়া হাওয়াই দ্বীপের জনশূন্য স্থান দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িবে।

দেওয়ালগুলি প্রধানতঃ কংক্রিট ও তাপসহ আগ্নেয় প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইবে। প্রথম দেওয়ালটি ১২ ফুট

উপরে: হাওয়াই দ্বীপের মানচিত্র — তীর চিহ্ন দিয়া লাভাস্রোতের দিক্ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

নীচে: তৃতীয় প্রাচীরের উপর এবং প্রাচীর ভেদ করিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে — প্রয়োজন হইলে প্রকাণ্ড দরজা দিয়া নীচের পথ রোধ করা যাইবে।

উঁচু এবং পাঁচ মাইল দীর্ঘ হইবে। এই দেওয়ালটি লাভাস্রোতকে পশ্চিমাভিমুখী করিবে। দ্বিতীয় দেওয়ালটি দুইতলা বাড়ীর মত উঁচু হইবে এবং ইহার দৈর্ঘ্য হইবে [illegible] মাইল। দ্বিতীয় দেওয়ালটি মাউনা লোয়া ও মাউনা কিয়া এই দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকা রক্ষা করিবে। সাধারণ হিসাবে প্রথম দুইটি বাধাই লাভাস্রোত প্রতিরোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট কিন্তু যদি কখনও এরূপ প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয় যে, এই দুইটি বাধা ছাপাইয়া লাভাস্রোত পূর্ব্বাভিমুখী হয়, তাহা হইলে শহর প্রতিরোধ করিবার জন্য আরও একটি দেওয়াল নির্ম্মিত হইবে। তৃতীয় দেওয়ালটি আকৃতিতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং হিলো শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত। এই দেওয়ালটি দৈর্ঘ্যে হইবে ৭ মাইল এবং উচ্চতা হইবে ১৮ ফুট। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৬০০ ফুট উঁচু হইতে আরম্ভ হইয়া এই দেওয়ালটি সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। রেলপথ, নদী এবং রাস্তা এই প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইবে। প্রাচীরটির এই সকল অবকাশগুলি প্রয়োজন হইলে বন্ধ করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দরজা

থাকিবে। দেওয়ালগুলি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় ২॥০ কোটি টাকা খরচ পড়িবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে, কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ ১৫ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিতে কিছুদিন সময় লাগিবে। ইহারই মধ্যে প্রথম দেওয়াল যেখানে নির্ম্মিত হইবে সেইস্থানে পৌছিবার জন্য প্রায় ১০ মাইল রাস্তা তৈয়ারী করা হইয়া গিয়াছে। রাস্তা সম্পূর্ণ না হইলে অবশ্য দেওয়াল নির্ম্মাণ করিবার কাজ আরম্ভ করা চলিবে না।

বর্ত্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৬০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। ডক্টর জ্যাগার আশা করেন যে, প্রত্যেক আগ্নেয়গিরির সহিত সংশ্লিষ্ট একটি করিয়া বীক্ষণাগার থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলে অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক নির্দ্দেশ পূর্ব্ব হইতে পাওয়া সম্ভব হইবে এবং ফলে বহু প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে। আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গবেষণা বিশেষ কোথাও বর্ত্তমানে হইতেছে না, সুতরাং ডক্টর জ্যাগারের আশা কতদূর ফলবতী হইবে তাহা এখন বলা কঠিন।

নূতন ধরণের টেলিভিশন যন্ত্র; এই যন্ত্র প্রদর্শিত ছবি স্বাভাবিক বর্ণে দেখা যাইবে; বামে—গ্রাহক-যন্ত্র, দক্ষিণে ঘূর্ণ্যমান রঙীন চাকা এবং মধ্যে প্রেরক-যন্ত্রের একাংশ

টেলিভিশনে রঙীন ছবি

এতকাল পর্য্যন্ত টেলিভিশনের ছবি পুরাতন বায়োস্কোপের ছবির মত একরঙা দেখা যাইত। সংপ্রতি জনৈক আমেরিকান উদ্ভাবক রঙীন টেলিভিশন দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। উদ্ভাবিত পদ্ধতিটি রঙীন ছবি ছাপিবার পদ্ধতির অনুরূপ। রঙীন ছবিতে যেরূপ মাত্র তিনটি রঙের সমাবেশে যে কোন বর্ণের সৃষ্টি করা যায় বর্ণিত যন্ত্রেও তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। টেলিভিশন ক্যামেরার লেন্সের সম্মুখে একটি চাকা আছে। চাকাটি স্বচ্ছ পদার্থে নির্ম্মিত এবং তিনটি অংশে বিভক্ত; তিনটি অংশের বর্ণ যথাক্রমে লাল, সবুজ ও নীলাভ ভায়লেট। টেলিভিশন ক্যামেরার লেন্সের সম্মুখে এই চাকাটিকে একটি বৈদ্যুতিক মোটর দ্বারা ঘুরান হয়। ইহাতে একটি প্রতিরূপ না হইয়া তিনটি রঙের তিনটি বিভিন্ন প্রতিরূপ সৃষ্ট হয়। গ্রাহক-যন্ত্রের লেন্সের সম্মুখে বর্ণিত চাকার অনুরূপ দ্বিতীয় আর একটি চাকা ঘুরান হয়। দ্বিতীয় চাকাটি স্বতঃনিয়ন্ত্রক মোটরের সাহায্যে প্রথমটির সহিত ঠিক একই বেগে ঘুরান হয়। এই যন্ত্রসজ্জায় তিনটি করিয়া পৃথক প্রতিরূপ পাওয়া যাইলেও এত তাড়াতাড়ি বিভিন্ন বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় যে, দর্শকের চোখে তাহা মিলিয়া এক হইয়া যায় এবং তিনটি তিনরঙা প্রতিচ্ছবি না দেখিয়া একটি স্বাভাবিক বর্ণের প্রতিচ্ছবি চোখে পড়ে।

পরমাণু ভাঙ্গিবার নূতন যন্ত্র

বর্ত্তমানে পরমাণু ভাঙ্গিয়া এক দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে পরিণত করিবার জন্য বিপুল ও ব্যাপকভাবে চেষ্টা চলিতেছে। পরমাণু ভাঙ্গিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, প্যারীর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে একটি যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে। সেই যন্ত্রের সাহায্যে নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয় ইরেন ক্যুরি ও পিয়ের ক্যুরি-জলিও তাঁহাদের পরমাণু ভাঙ্গার গবেষণা চালাইবেন। সংপ্রতি আমেরিকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় অপর একটি বিরাট পরমাণু ভাঙ্গিবার যন্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা ডিম্বাকৃতি হইবে। উচ্চে প্রায় চারতলা সমান এই যন্ত্রটির ব্যাস হইবে ৩০ ফুট। যন্ত্রটির ভিতরে আরও একটি ছোট গোলক থাকিবে, বাহিরের আবরণী ও এই গোলকটি বৈদ্যুতিক সংগ্রাহক বা 'কনডেনসার'এর কাজ করিবে। যন্ত্রটির অভ্যন্তরে সবেগে ঘূর্ণিত বেল্টের সাহায্যে বিরাট বিদ্যুতাবেশের সৃষ্টি করা হইবে

...তিক চাপের পরিমাণ হইবে ৫০ লক্ষ ভোল্ট। ...কাতা শহরে ২২০ ভোল্ট চাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা ..., সুতরাং এই যন্ত্রটির বৈদ্যুতিক চাপ ইহার প্রায় ... গুণ অধিক হইবে। যে নলের ভিতর দিয়া বেল্ট ... হইবে, তাহা হইতে একটি পাম্প দ্বারা বাতাস ... লওয়া হইবে। বিদ্যুৎ প্রতিরোধ যাহাতে ভাল ... হওয়ার জন্য দুইটি গোলকের মধ্যবর্তী স্থানের বাতাস ... একটি পাম্প সাহায্যে সংকুচিত করিয়া রাখা হইবে। ... বায়ুচাপ হইবে প্রতি বর্গ-ইঞ্চে ১২০ ইঞ্চি ... সাধারণ বায়ুচাপের প্রায় ৮ গুণ। যন্ত্রটির বহিরা-... অ্যালুমিনিয়াম রঙ্ দ্বারা আবৃত হইবে, যাহাতে ... উত্তাপ ভিতরের বাতাসকে উত্তপ্ত করিতে না ..., ... অ্যালুমিনিয়াম উত্তাপের অতি উত্তম প্রতি-... । ...টির বহির্দেশে একটি জানালা থাকিবে; এই ... হইতে ভিতরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করা চলিবে।

...র্ণসন্ধানী বৃক্ষ

...নৈক চেকোস্লোভাকিয়ান বৈজ্ঞানিক এক প্রকার ... গাছ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া ...ছে। স্বর্ণ অধিকাংশ সময় ধাতব অবস্থায় পাওয়া ... স্বর্ণের কোন যৌগিক আকর পাওয়া যায় ... স্বর্ণময় স্থানের মাটিতে গাছ পুঁতিলে জমি ... স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারে, এরূপ কোন বৃক্ষের সংবাদ ... ছিল না। আবিষ্কৃত বৃক্ষ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া ...গিয়াছে যে, উহা পুড়াইলে প্রতি টন ভস্মে ২০ ... পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়, অথচ যে জমিতে গাছগুলি ...ছিল, সে জমিতে স্বর্ণের পরিমাণ প্রতি হাজার ...টনেরও কম। গাছগুলির মূলকাণ্ডে ও বীজে ...: স্বর্ণ ঘনীভূত হইয়া থাকে। ইহাতে যে-পরিমাণ ...ওয়া যায়, তাহাতে প্রচলিত পদ্ধতিতে স্বর্ণ নিষ্কাশন ...রিয়া এই গাছের চাষ করিলে চলিতে পারে বলিয়া ...।

...য়াজ ও রশুনের গুণ

...য়াজ ও রশুন কাটিবার সময়ে উহাদের যে উপা-... জন্য চক্ষে জল আসে, সেই উপাদানটির রোগ-...বীজাণু আক্রমণ করিবার ক্ষমতা আছে। ... বাসের বিষ এই দ্রব্য নিষ্ট হয়। আমাদের দেশে বহু পূর্ব্ব হইতেই রশুন ও পেঁয়াজের এই গুণের কথা জানা ছিল। পশ্চিমে 'লু' লাগিবার প্রতিষেধক রূপে প্রচুর পরিমাণে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হয়। শুনা যায় যে, সঙ্গে পেঁয়াজ রাখিলেও 'লু' লাগিবার সম্ভাবনা কম। রশুনের বীজাণুনাশক ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক, যক্ষারোগে ... বিশেষ উপকারী।

পরমাণু ভাঙিবার পরিকল্পিত যন্ত্রের চিত্র : এই যন্ত্রে ৫০ লক্ষ ভোল্ট চাপে বিদ্যুৎ সৃষ্ট হইবে।

সংপ্রতি দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পেঁয়াজ ও রশুনের বীজাণুনাশক ক্ষমতা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। পেঁয়াজ ও রশুনের অশ্রুনিষেককারী রাসায়নিক নিষ্কাশন করিয়া তাহা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা চলিতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে তাঁহারা গবেষণা করিতেছেন।

কৃত্রিম রক্ত

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, রুশ বৈজ্ঞানিকেরা রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চারিত করিবার জন্য

এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, প্রতিবার রক্ত-সঞ্চারণের সময় রক্ত দান করিবার জন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে না। মানুষের রক্ত মোটামুটি চার শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর রক্তের সহিত অন্য শ্রেণীর রক্ত মিশাইলে সুফল না হইয়া কুফল হইতেই দেখা যায়। রুশ বৈজ্ঞানিকেরা এককালে রক্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা ব্যবহারোপযোগী রাখিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বেচ্ছায় দত্ত রক্তের উপরই তাঁহাদের নির্ভর করিতে হইত। সংপ্রতি ভিয়েনা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জনৈক অষ্ট্রিয়ান বৈজ্ঞানিক রক্তের পরিবর্ত্তে ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার তরল পদার্থ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিকটির নাম ডক্টর ফ্রিড্রিশ্ গেটেনডেংকার।

কয়লার অপব্যয় নিবারণ

আমাদের দেশে যে ভাবে কয়লা জ্বালান হয়, তাহাতে কয়লার অত্যন্ত অপব্যয় ঘটে। গৃহস্থালীর কার্য্যে এবং ধাতুনিষ্কাশনে কাঁচা কয়লা ব্যবহৃত হয় না, কোক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাঁচা কয়লা জ্বালাইলে তাহা হইতে কোক্, গ্যাস ও আলকাতরা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কোক-প্রস্তুতের সাধারণ প্রণালী এই: খোলা জায়গায় কিছু কয়লা সাজাইয়া তাহাতে আগুন ধরান হয়; কিছু কাল আগুন জ্বলিলে কয়লা হইতে গ্যাস ও আলকাতরা নির্গত হইয়া যায় এবং তখন জ্বলন্ত কয়লার উপর জল ঢালিয়া তাহা শীতল করা হয়। কয়লা পুড়াইবার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য কোক। এই পদ্ধতিতে কয়লার মূল্যবান্ অংশ যে আলকাতরা ও গ্যাস, তাহা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ভারতবর্ষে কোকের চাহিদা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু কয়লার পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। এখন হইতেই কয়লার দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে বলিলে চলে। ৫০ বৎসর পরে কয়লা-সমস্যা ভারতের একটি বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে কয়লা আমাদের দেশের মত নষ্ট করা হয় না। কয়লাকে কোকে রূপান্তরিত করিবার সময় তাহা সমস্ত গ্যাস ও আলকাতরা পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। জ্বালানী হিসাবে এবং আলো দিবার জন্য গ্যাস ব্যবহৃত হয়। আলকাতরা হইতে এত বহু সহস্র জিনিষ পাশ্চাত্য দেশে প্রস্তুত হইতেছে যে, তাহার পরিচয় এই অল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নহে। নানা প্রকার ঔষধ, রাসায়নিক, নিঃসংক্রামক রং, এবং গন্ধ প্রভৃতি আলকাতরা হইতে তৈয়ারী করা হইতেছে। এমন কি কয়লা হইতে মোটর গাড়ী চালাইবার পেট্রল পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে তৈয়ারী করা হইতেছে।

রাঁচীর 'ল্যাক্ রিসার্চ ইনস্টিট্যুট'এর অধ্যক্ষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়নের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডক্টর হেমেন্দ্রকুমার সেন এই বিষয়ে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন সম্বন্ধে বহুদিন হইতে সাধারণকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার ও তাঁহার ছাত্রদের চেষ্টায় উদ্ভাবিত 'একাধারে রাঁধিবার উনান ও কোক প্রস্তুতের যন্ত্র' সম্বন্ধে ১৩৪২ সালের ভাদ্র সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে-যন্ত্রের আলোচনা করা হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ গৃহস্থের ব্যবহারোপযোগী। সংপ্রতি ডক্টর সেন ও শ্রীযুক্ত কানাইলাল রায় এই বিষয়ে অপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবসায় হিসাবে কোক প্রস্তুত করা চলে, এরূপ যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই যন্ত্রের সহিত "বঙ্গশ্রী"তে বর্ণিত যন্ত্রের কোন মূলগত পার্থক্য নাই। রাঁচীতে 'ল্যাক্ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটে' কিছু দিন হইল এইরূপ একটি যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি টন কয়লার দাম ১০্ টাকা করিয়া ধরিলে ১০০০ ঘনফুট গ্যাস তৈয়ার করিতে প্রায় ১্ টাকা খরচ পড়িবে। কিন্তু কয়লার খনির নিকটবর্ত্তী স্থানে, যে সকল স্থানে খোলা জায়গায় কয়লা জ্বালাইয়া কোক প্রস্তুত করা হয়, সেখানে গ্যাস প্রস্তুতের খরচ কিছুই নাই বলিলে চলে, কারণ এই পদ্ধতিতে কাঁচা কয়লার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ নষ্ট হইয়া যাইত। উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে এই অংশটি আলকাতরা ও গ্যাস হিসাবে পাওয়া যাইবে। রাঁচীতে স্থাপিত যন্ত্রে প্রতি টন কয়লা হইতে প্রায় ১২ গ্যালন উৎকৃষ্ট আলকাতরা এবং ৫,০০০ হইতে ৬,০০০ ঘন-ফুট গ্যাস পাওয়া যায়। এই যন্ত্রটিতে কয়লার শতকরা ২০-[illegible] ভাগ আলকাতরা ও গ্যাসে পরিণত হয় কিন্তু ঠিকমত [illegible] ব্যবহার করিলে শতকরা ২৫-২৮ ভাগ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে। বাজার হইতে ক্রীত সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা হইতে এই সকল ফল পাওয়া গিয়াছে।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বাড়ীর আত্মীয়েরা সংবাদ পাইয়াছে কেবল জহরের [illegible] কীর্ত্তির। কারও লাগিয়াছে চমক, কেউ হইয়াছে [illegible], কারও লাগিয়াছে মজা, কেউ করিয়াছে আপসোষ। [illegible] অনুমান করিতে পারিয়াছে সকলেই। পরীক্ষা [illegible] হওয়ার প্রতিক্রিয়া। লজ্জা ঠিক নয়,—লজ্জার জন্য [illegible] নিজের পরীক্ষা দিয়া জহর এ কাজ করিত না, [illegible] আর কেউ জানে না সে কেমন পরীক্ষা দিয়াছে। [illegible] স্বজনকে মুখ না দেখানোর জন্য হইলে জহর জেলে [illegible] সকালের মত বাহির হইতে,—তার এখনও অনেক [illegible]। এ কাজের প্রেরণা জহরকে দিয়াছে, দুঃখ, গ্লানি, [illegible]—"ফ্রাসট্রেসন"। কিন্তু জহরের মত ছেলে এমন [illegible] করিল কেন? এত যে ফিটফাট থাকা তার [illegible], অসংখ্য ছোট বড় আরাম ছাড়া যে তার দিন চলে [illegible] সে এসব পাইবে কোথায়? আহা, বড় কষ্ট [illegible] ছেলেটার।

[illegible] মা একটু কাঁদিলেন, নীরেশ্বরকে বলিলেন, '[illegible] জন্যে তো নয়, জেলে ওকে চা খেতে দেবে [illegible]?'

[illegible] বলিলেন, 'উঃ! কি আশ্চর্য্য মানুষ। [illegible] পড়তে পড়তে আমায় বলত, একজামিন শেষ হলে [illegible] করে সিনেমায় যাবে, আর যেই [illegible] শেষ হওয়া, পিকেটিং করে বাবু গেলেন জেলে। [illegible] বৌ, মানুষের মন কি রকম্ আশ্চর্য্য জিনিষ? [illegible] সিনেমা দেখার, সাধ মেটাল জেলে গিয়ে।'

[illegible], জহরের কীর্ত্তিতে সব চেয়ে বিচলিত হইয়া- [illegible] রামলাল।

[illegible] রামলালের দোষ নাই। সেদিন সন্ধ্যায় রামলালও [illegible] হোটেলে ছিলেন—প্রায়ই থাকেন।

[illegible] ছেলেকে তিনি হোটেলে ঢুকিতেও দেখিয়াছিলেন, [illegible] টানিতেও দেখিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বাপের পক্ষে [illegible] বিচলিত হওয়াই স্বাভাবিক।

রামলালের অনুভূতি বড় [illegible]। মানুষটা তিনি [illegible] নির্ব্বিকার। এত বেশী নির্ব্বিকার যে, মদে তাঁর নেশা হয় না, না জাগে বিকার। কেবল সাধারণ অবস্থায় তাঁর কিছু ভালও না লাগে আর কিছু খারাপও না লাগায় অস্বাভাবিক স্বার্থী সম্বন্ধের মধ্যে [illegible] ভাল না লাগাটা মদের প্রভাবে স্বাভাবিক হয়। [illegible], তিনি মনে করেন, তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট বৈচিত্র্য, পরম [illegible]। জীবনে তাঁর কোন স্বাদ নাই, জীবনটা তাই সাধারণ ভাবে বিস্বাদ করিয়াই তিনি কৃতার্থ,—সকলের জীবন যতটুকু বিস্বাদ। এ বিষয়ে তিনি নিরুপায়। চামড়া তাঁর এত মোটা যে, জীবন-দেবতার গায়ে হাত-বুলান আদর টেরও পান না, প্রহার ছাড়া তাঁর চলিবে কেন?

কিন্তু ছেলে মদ টানিতেছে, এ প্রহার নয়।

কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া থাকিয়া সেদিন তিনি হোটেল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। যে উপায়ে নিয়মিত ভাবে জীবনটা তিনি যতটুকু বিস্বাদ করেন, [illegible] রূপে সেদিন তার চেয়ে বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল,—কটু এবং ঝাঁঝাল। কতকাল পরে যে এ রকম কটু ও ঝাঁঝাল কষ্ট পাইলেন, রামলালের মনেও ছিল না। জহর তাঁকে দেখিতে পাইয়াছে কি না এ বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহ ছিল, জহরের জেলে যাওয়ার খবরে এ সন্দেহ মিটিয়া গেল। একটু খুসীও তিনি হইলেন, তাঁকে দেখিয়াছিল বলিয়া নিজের অপকীর্ত্তির লজ্জা এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল জহরের যে, জেলে না গিয়া সে থাকিতে পারে নাই—এ যেন একটা সান্ত্বনা, এ যেন একটা প্রমাণ যে জহর বেশী "বিগড়াইয়া" যায় নাই, এ যেন জহরের পরোক্ষ ঘোষণা যে, আর কখনও এমন কাজ সে করিবে না।

কিন্তু এ সান্ত্বনা, প্রমাণ বা পরোক্ষ ঘোষণা রামলালের কাজে লাগিল না, এতকালের ভোঁতা অনুভূতি হঠাৎ বিদ্রোহ করিয়া তাঁকে অনভ্যস্ত কষ্ট দিতে লাগিল। এ কাজ

অজস্র সন্দেহ আছে যে, সে কারও প্রিয় নয়, কিন্তু একটা সন্দেহ সে গ্রহণও করে না, গ্রাহ্যও করে না। মনের জোর কি সাধারণ তরঙ্গের!

দেখা গেল, জহরলালও যেন তরঙ্গকে আর পছন্দ করিতেছে না।

প্রেমে যেন ভাঁটা পড়িয়া গিয়াছে জহরলালের, জোয়ার আসিয়াছে পড়িবার নেশার। আকাশে চাঁদ থাকে, বাড়ীর কোন একটা ঘরে তরঙ্গ থাকে, অথচ জহরের ঘরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বলে আলো। কিছুই করে না জহর,—চিরকাল যা করিয়া আসিয়াছে তার অতিরিক্ত কিছু। খায় দায় ঘুমায়, আর রাত জাগিয়া পড়ে।

দেখিয়া রামলাল স্বস্তি পান, নিশ্চিন্ত মনে আবার এখানে ওখানে পিপাসা নিবারণ করিয়া গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিবার পুরাতন প্রথাটা ফিরাইয়া আনেন, কিন্তু জহরলালকে আর আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িতে বলেন না।

হয়ত ভাবেন যে, তাঁর হুকুমে সাধ মিটাইয়া রাত জাগিতে পারিত না বলিয়াই জহর কেবল হোটেলে গিয়া 'পেগ' টানিয়াছিল। জাগুক, হোটেলে যাওয়ার বদলে যত খুসী রাত জাগুক।

তরঙ্গ বলে, 'এখন আবার এত পড়া কেন?'

জহর বলে, 'পড়ার আবার এখন তখন আছে না কি?'

'পরীক্ষা তো নেই।'

'আমি পরীক্ষার জন্য পড়ি না।'

তরঙ্গ মৃদু হাসিয়া বলে, 'সব সময় আত্ম-প্রবঞ্চনা নিয়ে থাকবেন, আপনাদের নিয়ে আমি কি যে করি!'

'আমাদের নিয়ে তোমার কিছু করতে হবে না।'—বলিয়া জহর এমন ভাবে স্থান ত্যাগ করে যে, অন্য মেয়ে হইলে রীতিমত অপমান বোধ করিত। জটিল বোধ-শক্তি লইয়া তরঙ্গ যা বোধ করে, তার কোন সংজ্ঞা নাই।

তবে অনুপম আসিলে এবং চলিয়া গেলে তরঙ্গ যা অনুভব করে, তার মধ্যে অস্পষ্টতা থাকে না। অনুপমকে দেখিলে তার আনন্দ হয়, অনুপম চলিয়া গেলে হয় কষ্ট। রাত্রে এখন আর অনুপমের ঘরে আলো নিভাইবার উপায় নাই, নিজের ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিবার সময় বোধ হয় সেই জন্যই তরঙ্গের মনে হয়, অনুপমের আসিয়া চলিয়া যাওয়াটা কোন এক দিক দিয়া যেন ঘরের আলোটা জ্বালিয়া নিভাইয়া দিবার সামিল।

অনুপমের জন্য চোখে অন্ধকার দেখে বলিয়া অবশ্য এ কথা মনে হয় না তরঙ্গের,—সে ভাবে চোখে অন্ধকার দেখিবার একটা সুবিধা আছে, আসল ব্যাপারটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনুপমের আসা-যাওয়ার সঙ্গে নিজের এ রকম স্পষ্ট আনন্দ ও নিরানন্দ বোধ করিবার সম্পর্কটা বুঝিবার জন্য তরঙ্গকে নিজের মনের অন্ধকার হাতড়াইতে হয়।

সেজন্য অনুপমের কথাটা তরঙ্গ অনেক সময় ভাবে। প্রায় সর্ব্বদাই।

অনুপমের কথা সব সময় ভাবিতে সাধ হয় বলিয়া ভাবে না। ছি, ওসব ছেলেমানুষী তরঙ্গের নাই। সে কি আর দশটা সাধারণ মেয়ের মত যে কিছুদিন একটা কলেজে পড়া সিগারেট টানা আধা কবি ছোকরার সঙ্গে প্রণয় করিয়াছিল বলিয়া, রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুমানর বদলে সেই ছোকরার স্বপ্ন দেখিবে? অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে বলিয়া, কেন অনুপমের জন্য মনটা একটু কেমন করে, শুধু এইটুকু বুঝিবার জন্য সে অনুপমের কথা ভাবে। আর কোন কারণ নাই।

এ বাড়ীতে লোক অনেক। অনুপম আসিলে তার সঙ্গে একা কথা বলার সুযোগ বড় কম। সেজন্য তরঙ্গের রাগ হয়।

কেন রাগ হয় সেটা বুঝিবার জন্যও তরঙ্গ অনুপমের কথা ভাবে। নিজেকে না বুঝিলে তার চলিবে কেন? জীবনের স্তরে স্তরে নিজের সাধনালব্ধ অসীম শক্তিকে সঞ্চারিত করিয়া সৃষ্টি-বিপর্য্যয়ের অস্থায়ী কল্যাণকর বিপ্লব আনিয়া বৃহত্তর মহত্তর জীবনের স্তরসৃষ্টি যার জীবনের উদ্দেশ্য, জীবনে কাল-বৈশাখীর মত ভ্রান্ত ঝড়ঝাপটা আসিলেও হৃদয়-মনকে নিস্তরঙ্গ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন যার দিবারাত্রির তপস্যা, একজনের সঙ্গে নির্জ্জনে আলাপ করার সুযোগ না পাওয়ায় রাগ যদি তার হয়, সে রাগের কারণ খুঁজিয়া বাহির না করিলে তার চলিবে কেন? আর

নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া তরঙ্গ শুইয়া পড়ে বিছানায়। রাগের মাথায় দুম দুম পা ফেলিয়া নিজের ঘরে আসিতে তার যে বিশেষ কিছু পরিশ্রম হইয়াছে তা নয়, তবু হাঁপানোর মত সে জোরে জোরে নিশ্বাস টানে। উত্তেজনা শান্ত হইয়া আসিবার সঙ্গে ভিতরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে—এ বাড়ীতে চলিয়া আসিবার আগের দিন সাধনার বাড়ীতে সে যে আত্মগ্লানি অনুভব করিয়াছিল তার চেয়ে প্রবল এবং কড়া আত্মগ্লানি।

সেদিন রাতে খাইতে বসিলে সাধনা অনুপমকে বলিলেন, 'জহরদের বাড়ীতে বেশী আসা-যাওয়া করিস না অনু।'

'কেন ?'

সাধনা কৈফিয়ৎ না দিয়া শুধু বলিলেন, 'কি দরকার ?'

অনুপম বলিল, 'জহরদের বাড়ী যাবার দরকার কিছু নেই তা বুঝলাম, তবু যেতে যখন বারণ করছ, কারণ তো আছে ?'

সাধনা একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ী বেশী না যাওয়াই তো ভাল।'

অনুপম খাওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটেছে, আমার কাছে চেপে যাচ্ছ। খুলে বল তো, শুনি কি হয়েছে ? আমার কাছে গোপন না করলেও চলবে।'

সাধনা বিব্রত হইয়া বলিলেন, 'কি আবার হবে ? কিছুই হয় নি।'

'শীগগির বল মা, যতক্ষণ না বলবে হাত গুটিয়ে বসে থাকব, খাব না।'

সাধনা একটু ভাবিলেন, বলিলেন, 'বিশেষ কিছু নয়, আজ গিয়েছিলাম তো জহরদের বাড়ী—ওদের কথাবার্তা শুনে ভাবভঙ্গী দেখে কেমন মনে হল, আমরা ও বাড়ীতে যাই, এটা ওরা পছন্দ করে না।'

'তার মানে ওরা তোমায় অপমান করেছে ?'

'অপমান আবার কে করবে ? ওদের চালচলন দেখে কথাটা আমার মনে হল, এইমাত্র।'

'এমনি ও কথা মনে হবে কেন ? নিশ্চয় তোমাকে অপমান করেছে মা, তুমি লুকোচ্ছ।'

বিপন্ন সাধনা এবার বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'বাবারে বাবা, তোর সঙ্গে আর পারি না অনু, একটা কথা বললে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত। অপমান করেছে তো বেশ করেছে, তোর কি ? তুই আর ওদের বাড়ী যাস না, তাহলেই হবে। বক বক না করে খা' তো এখন।'

সুতরাং পরদিন সকালেই অনুপম জহরদের বাড়ী গেল। কারও সঙ্গে কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে সতুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তরঙ্গ কোথায় রে, সতু ?'

সংবাদ দিতে সতু তেমন পটু নয়। তবু অনুপম বুঝিতে পারিল যে, কাল বিকালে এক সময় তরঙ্গ নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়াছিল, এখন পর্যন্ত দরজা খুলিয়া বাহিরে আসে নাই, হাজার ডাকাডাকিতেও না।

অনুপমকে বেশী ডাকিতে হইল না, তরঙ্গ দরজা খুলিয়া দিল। মুখখানা শুকাইয়া গিয়াছে তরঙ্গের, দেখিলে মনে হয় সারারাত ঘরের মধ্যে কাটানো বদলে সে যেন এই রোদে কড়া রোদে টো টো টহল দিয়া আসিল।

তবু একটু হাসিতে ছাড়িল না তরঙ্গ।

'কি খবর অনুদা।'

অনুপম বলিল, 'তোমার কাছেই খবর জানতে এসেছি। মাকে না কি কাল এবাড়ীতে অপমান করেছে ?'

'অপমান করেছে ? কে অপমান করেছে ? আমি তো কিছু জানি না! —ও, হাঁ, মনে পড়েছে। আমি অপমান করেছি।'

'তুমি ?'

'অবাক্ হয়ে গেলে দেখছি, আমি কি কাউকে অপমান করতে পারি না অনুদা ?' কাল কি হল জান, আমি খুড়িমাকে জিজ্ঞেস করলাম, অনুদা আসে না কেন খুড়িমা ? খুড়িমা বললেন, কাজের ভিড়ে সময় পায় না। শুনেই আমি রেগে গেলাম।'

'কেন ? ও কথায় রাগের কি আছে ?'

'সেই তো মজা, আমিও কাল সারারাত তাই ভেবেছি। ভেবে কি আবিষ্কার করেছি, সেটা আজ আর তোমার শুনে কাজ নেই, তারপর কি হল শোন। খুড়িমার কথা শুনে

চতুষ্পাঠী

ছায়াছবির জন্মকথা

—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বায়োস্কোপের ছবি আমরা সকলেই দেখিয়াছি, কিন্তু কেমন করিয়া ছবিগুলি পর্দার উপর জীবন্ত হইয়া ওঠে, কেনই-বা তাহারা নড়িয়া চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রশ্ন করিলে তাহার জবাব বোধ হয় অনেকে দিতে পারিব না।

১৮৯৯ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম বার্ট রেমণ্ড লণ্ডনে রিজেন্ট স্ট্রীটের 'পলিটেক্নিকে' প্রোজেক্টর'-এর ব্যবহার দেখান।

আবার অনেকে হয় তো বলিব—নিতান্ত সহজ। সিনেমা-ক্যামেরা আজকাল্ বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, সেই ক্যামেরা দিয়া চলন্ত জিনিষের ছবি তুলুন, যে-ফিল্মের উপর ছবি তোলা হইল, সেই ফিল্মটি ডেভেলপ্ (develop) করুন, প্রিন্ট (print) করুন, তাহার পর প্রোজেক্টার (projector) দিয়া পর্দার উপর তাহার ছবি দেখুন, দেখিবেন ক্যামেরা দিয়া ঠিক যেমনটি তুলিয়াছেন, পর্দার উপর ছবিগুলি ঠিক তেমনি ভাবেই নড়িয়া চড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আজকালকার দিনে ব্যাপারটা ঠিক এম্নি ধারা সহজ হইয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু বেশি দিনের কথা নয়, চল্লিশ বৎসর আগে কেহ ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

চেষ্টা অবশ্য চলিতেছিল বহু বৎসর ধরিয়া। পরীক্ষা চলিতেছিল কেমন করিয়া চলমান জীবন্ত জিনিসের ছবি তোলা সম্ভব হইতে পারে।

পিকাডিলিতে ডব্লিউ. ফ্রিজ্ গ্রীণ নামে একজন ইংরাজের একটি দোকান ছিল। দোকানে তিনি ফটো তুলিবার সরঞ্জাম বিক্রি করিতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই লইয়া মাথা ঘামাইতে থাকেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি পেটেন্ট গ্রহণ করেন। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের কথা ধরিতে গেলে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রিজেন্ট ষ্ট্রীটের 'পলিটেক্নিকে' অদ্ভুত যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, তাহারই কথা বলিতে হয়।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল একেবারে অকস্মাৎ। আগে হইতে কাহাকেও কিছু জানান হয় নাই, অথচ লুই লুমিয়ার নামে এক ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন ঘোষণা করিলেন, ২০শে ফেব্রুয়ারী আটটার সময় 'পলিটেক্নিকে' জীবন্ত ছবি দেখান হইবে। এই ছবি যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিতে চান, কিঞ্চিৎ দর্শনীর বিনিময়ে অবিলম্বে তাঁহারা প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ করুন।

টিকিট কিনিবার জন্য এত বেশি জন-সমাগম হইল যে, লুই লুমিয়ার ভাবিয়া পাইলেন না, কেমন করিয়া পলিটেক্নিকের প্রাঙ্গণে এতগুলি লোকের বসিবার স্থান সংকুলান হইবে।

শেষ পর্য্যন্ত অনেককে তিনি ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

গ্রেট ব্রিটেনে ইহাই হইল চলচ্চিত্রের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য প্রদর্শনী।

কিন্তু সত্য বলিতে গেলে কে এই চলন্ত ছবির আবিষ্কর্ত্তা? কখনই বা তিনি তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন?

উইলফ্রেড্ ই. এল. ডে নামে এক ভদ্রলোক সারা জীবন ধরিয়া ইহারই অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন—এই ছায়াকে ধরিয়া রাখিবার জন্ম পচিশ হাজার বৎসর ধরিয়া মানুষ সাধনা করিয়েছে। তিনি বলেন, ৭০ বৎসর পূর্ব্বে (খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ ৫০০০) ইহার সর্ব্বপ্রথম পদ্ধতি চলিতে থাকে জাভা দ্বীপে। সেখানকার অধিবাসীরা মহিষের চামড়া কাটিয়া নানারকমের আকৃতি তৈরি করিত, তাহার পর বাঁশের উপর সেগুলিকে বসাইয়া এক অদ্ভুত উপায়ে দেওয়ালের গায়ে তাহাদের ছায়াগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করিত। তাহাদের এই ছায়া ধরিবার একমাত্র অবলম্বন ছিল সূর্য্য-রশ্মি। সুতরাং ছায়াছবির সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তির সূত্র যদি খুঁজিতে হয় ত' ইহাকেই মানুষের প্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে।

মানুষের সর্ব্বপ্রথম সমস্তা ছিল—মানুষ, ঘরবাড়ী, জীব-জন্তু, গাছপালা—এই সবের হুবহু প্রতিকৃতি কেমন করিয়া চিরদিনের জন্ম ধরিয়া রাখা যায়। Daguerre, ডাগের নামে এক ভদ্রলোক প্রথমে ইহাই আবিষ্কার করেন। একটি ছবি তুলিতে তাহার সময় লাগিত ছ' ঘণ্টা। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার ছবি তুলিবার প্রণালী ও কৌশল জনসাধারণকে জানাইয়া যান এবং সেই সঙ্গে সকলকে অনুরোধ করেন যে, আপনারা এইবার আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করুন—এই ছ' ঘণ্টাকে কেমন করিয়া ছয় সেকেণ্ডে টানিয়া আনিতে পারা যায়।

পরে তাহাও সম্ভব হইয়াছে। ছয় সেকেণ্ড ত' দূরের কথা, এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে এখন ছবি তোলা চলে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সার পিটার মার্ক রোজেট্ নামে একজন লোক "Thesaurus" নাম দিয়া এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। রয়েল সোসাইটিতে তিনি একটি প্রবন্ধ পড়িলেন এবং জনসাধারণকে সর্ব্বপ্রথম জানাইলেন যে, মানুষের চোখ একটি জিনিষকে দেখিতে দেখিতে এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, জিনিষটি যখন নাও থাকে, তখনও সে তাহার চোখের সম্মুখে সেই জিনিষটি দেখিতে পায়। এক স্কয়ার-ইঞ্চির মত ছোট ছোট অনেকগুলি ছবিকে যদি তাড়াতাড়ি একটি একটি করিয়া চোখের সমুখে পট্ পট্ করিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া যায় ত' মানুষের মনে হইবে ছবিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার পরেই আসিলেন সার জন্ হার্শেল। তিনি আবিষ্কারের নাম দিলেন—"Thaumatrope." এই যন্ত্রের একটি ফুটার মধ্যে চোখ দিয়া দেখিতে হয়, নীচে থাকে কতকগুলি ছোট ছোট তাসের মত কাগজের উপর আঁকা ছবি। একটি সুতা দিয়া এমন ভাবে সেগুলি গাঁথা যে, সুতাটি টানিলেই কাগজের টুকরাগুলি অত্যন্ত ক্ষতগতিতে একটির পর একটি গিয়া পড়িতে থাকে। পর পর শেয়াল ও কুকুরের ছবি—

লুই লুমিয়ার (প্রথম বায়োস্কোপ দেখাইয়া টাকা রোজগার করেন)।

দেখিয়া মনে হয়, একটি কুকুর যেন ছুটিয়া গিয়া একটি শেয়ালের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল!

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে আসিলেন ডক্টর প্লেটো। তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রটি অন্ত রকম। যন্ত্রের নাম দিলেন—"Phenakistoscope." গ্রামোফোন-রেকর্ডের মত ধাতুনির্ম্মিত দুইটি চাকা পিঠে পিঠে বসানো। একটি চাকায় দেখিবার জন্ত ছোট একটি গোলাকার ছিদ্র, আর একটিতে পরের পর ছবি আঁকা। নীচের ডিসটি অনবরত চোখের সুমুখে ঘুরিতে থাকে, আর উপরের ডিসের ফুটা দিয়া দেখা যায়—ছবিগুলি চলিতেছে।

তাহার চার বৎসর পরে, উইলিয়াম্ জর্জ্জ হর্ণার এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া নাম দিলেন, "Daedalum" or Wheel of the Devil"

তাহার পর যে ব্রিজ।

তাহার পর ফ্রিজ গ্রীণ্‌।

ফ্রিজ গ্রীণের পর আসিলেন বিজ্ঞানজগতের মহাপুরুষ বধির এডিসন। এডিসন অল্পে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি চাহিলেন লম্বা ফিতার মত সেলুলয়েডের উপর চলন্ত ছবির সঙ্গে কথা ও শব্দ ধরিতে। সেলুলয়েডের ফিল্ম তিনি আবিষ্কার করিলেন, ছবিও তুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নবকৃত ফটোগ্রাফ তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু ঠোঁট নাড়া ও কথা একসঙ্গে কিছুতেই মিলিল না। কথাগুলাও মনে হইতে লাগিল যেন অন্য যায়গা হইতে আসিতেছে।

সে সময় (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) Elster ও Geitel নামে দুই বন্ধু "ফটো-ইলেক্‌ট্রিক্ সেল" দিয়া সবাক্ চিত্রের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

'প্রাক্সিনোস্কোপ' নামক যন্ত্র।

ইহার পর আবিষ্কারের পর আবিষ্কার চলিতে লাগিল। কেহ-বা এ-পথ পরিত্যাগ করিলেন, কেহ-বা অন্যের হাতে নিজের কৃতিত্বটুকু অর্পণ করিয়া নিজে অন্য কাজ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

শেষ পর্য্যন্ত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লুই লুমিয়ার পেটেন্ট গ্রহণ করিলেন।

আজকালকার দিনে দশ বার হাজার ফুটের বড় বড় ছবির তুলনায় তখনকার দিনের সেই সব ছবির কথা ভাবিলে হাসি পায়। তখন সব চেয়ে বড় ছবি ছিল লম্বায় চল্লিশ ফুট।

ছবির বিষয়বস্তু যেরূপ ছিল তাহাতে আজকাল অনেকের হাসি পাইবে।

১। ভূমধ্যসাগরে স্নান ও সাঁতারের দৃশ্য।
২। গ্রাম্য একটি রেল-ষ্টেশনে চলন্ত ট্রেনের দৃশ্য।
৩। "টুপির নীচে"।
৪। একটি দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।
৫। ছেলেদের খেলা।
৬। ফুটবল খেলার দৃশ্য।
৭। রাশিয়ার মনোরম চিত্রাবলী।
৮। লণ্ডনের রাস্তায় গায়কের দল।
৯। ঘোড়দৌড়ের দৃশ্য।
১০। জলের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটিয়েছে।
১১। বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িল।
১২। সার্কাসের খেলা।
১৩। রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ।
১৪। দুপুরে হাইড পার্কের দৃশ্য।
১৫। স্পেনের জীবনযাত্রা প্রণালী।
১৬। কামারশাল—হাপরটানা ও লোহা পেটানো।
১৭। মধ্যাহ্ন-ভোজন।
১৮। চিত্রশিল্পীর কাজ।
১৯। "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"
২০। "কেমন মজা।"
২১। প্যারিসের রাস্তা।
২২। "বাগানের মালীকে বিরক্ত করিও না।"

বায়োস্কোপের এমনি-সব চলন্ত ছবি লুই লুমিয়ার সর্ব্বত্রই দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নানা জায়গা হইতে তাঁহার ডাক আসিতে লাগিল।

তাহার পরেই আর. ডব্লিউ পল্‌ আবিষ্কার করিলেন, থিয়েট্রোগ্রাফ্। সেও কতকটা ঠিক এমনই। তিনিই চলন্ত ছবিতে প্রথম ডার্বির ঘোড়দৌড় দেখাইয়া দিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আর একজন আবিষ্কারকের সন্ধান মিলিল। সিসিল্‌ হেপ্‌ওয়ার্থ তাঁহার নাম। "হেপ্‌ওয়ার্থ পিক্‌চার প্লেজ্‌ লিমিটেড" নাম দিয়া তিনি এক কোম্পানী খুলিয়া বসিলেন এবং নিজের তৈরি যন্ত্রপাতি দিয়া টাইটেল জুড়িয়া অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় করাইয়া ছোট ছোট নাটকের ছবি তুলিতে আরম্ভ করিলেন।

লুমিয়ারের আবিষ্কারের পর হইতে চলচ্চিত্রের ইতিহাস লিখিতে হইলে অসংখ্য লোকের নাম করিতে হয়, যাঁহারা এই চলচ্চিত্রের ব্যাপারে কিছু না কিছু করিয়াছেন। এমনি করিয়া আবিষ্কারের পর আবিষ্কারের দ্বারা সমৃদ্ধ হইতে হইতে চলচ্চিত্র-শিল্প এখন এই চল্লিশটি মাত্র বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীর বাণিজ্যক্ষেত্রে এমন একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, যাহা বুঝাইবার জন্য একটি মাত্র কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

পৃথিবীর কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু যদি আমেরিকার কথাই ধরা যায় ত' দেখিতে পাওয়া যাইবে—মাত্র একটি বৎসরের মধ্যে যুক্ত-প্রদেশের ৯৫৭ লক্ষ লোক শুধু বায়োস্কোপের ছবি দেখিবার জন্য খরচ করিয়াছে—৪০ কোটি ৯ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড!

[শিল্পী—শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত

রাজনীতি ও অর্থনীতির জ্ঞানে গান্ধীজীর ভ্রমাত্মকতার দৃষ্টান্ত

আমাদের মতে, গান্ধীজী প্রকৃত বুদ্ধিমান্ না হইলেও চতুর লোক এবং যে যে সাধনায় নিমগ্ন থাকিলে মানুষকে প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক বলা যায়, অথবা যে যে সাধনার ফলে মানুষ দেশের ও দশের প্রকৃত হিতসাধনের ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারে, সেই সাধনায় নিপুণতা, অথবা সেই সাধনার পন্থা পরিজ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য গান্ধীজী লাভ করিতে না পারিলেও, রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার মত দেশসেবকের পাঠ সুন্দর ভাবেই অভিনয় করিবার বিদ্যা তিনি অভ্যাস করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তদ্দ্বারা তিনি দেশের অপরিপক্ক বুদ্ধির মানুষগুলির অনুবর্ত্তিতা পাইয়া থাকেন। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শ্রুতিমধুর হইলেই যেরূপ অপরিণত বুদ্ধির বালক, যুবক ও বৃদ্ধগণ মাতিয়া উঠিয়া মুহুর্মুহুঃ করতালি প্রদান করিতে আরম্ভ করেন এবং তাহাতেই মত্ত হইয়া পড়েন, অথচ তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না অথবা বুঝিয়াও বুঝেন না যে, ঐ অভিনয়ে অভিনেতার কোন সহৃদয়তা অথবা অকৃত্রিমতা বিদ্যমান নাই এবং উহা কেবল শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য কতকগুলি ঠোঁটের কথা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভঙ্গীর সমষ্টি মাত্র, সেইরূপ গান্ধীজীর দেশপ্রেমিকের অভিনয় আমাদের অপরিণত বুদ্ধির বালক, যুবক ও প্রৌঢ়গণকে মাতাইয়া তুলিয়াছে এবং ঐ অভিনয়ের ফলে দেশের ও দশের অবস্থা যে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে এবং কোথায় চলিয়াছে, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখেন না এবং বুঝিয়াও বুঝেন না।

যাঁহারা রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে অত্যন্ত মত্ত হইয়া পড়েন, তাঁহারা যেমন ক্রমশঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগী হইয়া স্বীয় ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলেন, সেইরূপ গান্ধীজীর অসহযোগ, আইন অমান্য প্রভৃতির অভিনয়ে যাঁহারা মত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা একদিকে যেরূপ কারাবরণ প্রভৃতিতে বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব ভবিষ্যৎকে কুজ্ঝটিকাপূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যদিকে আবার ঐ মত্ততার ফলে দেশের সমস্যাগুলি উত্তরোত্তর অধিকতর জটিলতা পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে ও হতাশা-পীড়িত আত্মহত্যা এবং অনশন ও অর্দ্ধাশন ক্লিষ্ট তিল-তিল করিয়া মৃতের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

গান্ধীজী যদি প্রকৃত পক্ষেই বুদ্ধিমান হইতেন, অথবা যে যে সাধনায় দেশ ও দশের ক্রমিক পতনের অদ্ভুত দ্রুতগতি অবরুদ্ধ হইতে পারে, সেই সাধনার পন্থা কি, তাহা যদি তাঁহার জানা থাকিত, অথবা প্রকৃত পক্ষে সেই সাধনায় যদি ঠিকই অভ্যস্ত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে যে-দেশে পঞ্চাশ বৎসর আগেও শতকরা ৯০ জন লোক অন্নাভাব কাহাকে বলে, তাহা জানিত না এবং অন্নের জন্য চাকুরী অথবা নকরগিরিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, সেই দেশে শতকরা ৮০ জন লোকের অন্নাভাবের উদ্ভব হইত না ও তাহার পূরণের জন্য প্রায় সকলকেই নকরগিরির জন্য লোলুপ হইতে বাধ্য হইতে হইত না।

একটা সমগ্র দেশের নেতাগিরির দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে যে বিদ্যা ও সক্ষমতা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা যদি গান্ধীজী অর্জ্জন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে-দেশের প্রায় প্রত্যেক মানুষটি একদিন অজাত-

অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহাও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সেইরূপ আবার যথাযথ ভাবে অর্থনীতির জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, একদিকে যেরূপ তাহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, অন্যদিকে কোন্ কোন্ নীতি অথবা কার্য্য অবলম্বিত হইলে সমগ্র দেশ প্রকৃত পক্ষে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে পারে, তাহাও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

অতএব যদি দেখা যায় যে "হরিজন" নামক পত্রিকায় গান্ধীজী মন্ত্রিগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, উহাতে শাসননীতি, শাসনকার্য্য, দেশবাসীকে সমৃদ্ধ করিবার নীতি ও তাহার কার্য্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর উপরোক্ত উভয়বিধ জ্ঞানেরই পরিচয় আছে, তাহা হইলে তিনি যে, প্রকৃত পক্ষে রাজনীতি ও অর্থনীতির জ্ঞানসম্পন্ন এবং নেতৃত্বের প্রকৃত পূজা পাইবার উপযুক্ত, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

অন্যদিকে আবার যদি দেখা যায় যে, রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে তিনি উপরোক্ত উভয়বিধ ভাবেই মূঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি যে দেশবাসীর ধিক্কারের উপযুক্ত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

কাজেই কেহ ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে কোন্ নীতিতে ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে এবং কোন্ নীতিতেই বা সমগ্র ভারতবাসীকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য তত্রত্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং ঐ সম্বন্ধে জনসাধারণের কর্ত্তব্য কি, সর্ব্বাগ্রে তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

ভারতের শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য ও ভারতবাসীকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সন্ধান করিতে হইলে যে, ১৯৩৫ সালের গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের মূল উদ্দেশ্য কি, তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের মতে গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের শাসননীতি সম্বন্ধে মূল উদ্দেশ্য তিনটি।

প্রথমতঃ, ভারতবাসিগণ যাহাতে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের, অথবা ব্রিটিশ সম্রাটের অধীনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ, স্বায়ত্তশাসন পাইয়া ভারতবাসিগণ যাহাতে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, অথবা ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত সম্বন্ধ-সূত্র কোন ক্রমেই ছিন্ন করিতে সক্ষম না হন, তাহার ব্যবস্থা করা।

তৃতীয়তঃ, স্বায়ত্তশাসন পাইয়া ভারতবাসিগণ যদি নিজেদের মধ্যে প্রদেশগত, অথবা সম্প্রদায়গত অথবা অন্য কোনরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও যাহাতে পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবাসীর এবং ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের ঐক্যসূত্র বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা।

উপরোক্ত প্রথম উদ্দেশ্যটি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক প্রদেশে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি-স্বরূপ প্রাদেশিক গভর্ণরগণের তত্ত্বাবধানে দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছে এবং ঐ দেশীয় মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে মোটামুটীভাবে সর্ব্ববিধ কার্য্যের ক্ষমতাও ন্যস্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ প্রত্যেক কার্য্যেরই যেমন ভাল ও মন্দ দুইটি দিক্ আছে, সেইরূপ এই ব্যবস্থারও দুইটি দিক্ রহিয়াছে। এতাদৃশ ব্যবস্থার ফলে ভারতবাসী নেতৃবর্গ যদি সম্পূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপযুক্ততা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে যেরূপ ভারতবর্ষের প্রত্যেক সমস্যাটির সমাধান করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার অন্যদিকে তাঁহাদের ঐ উপযুক্ততা না থাকার দরুণ তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে অধিকতর বিবাদ ও বিসংবাদের উদ্ভব হইয়া প্রকৃত সমস্যাগুলির আরও জটিল হইবার আশঙ্কা হইয়াছে এবং তজ্জন্য যাহাতে যুক্তিসঙ্গতভাবে গভর্ণরগণের স্কন্ধে কোনরূপ দায়িত্ব স্থাপন করা না যায়, তাহারও সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি, অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন পাওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসিগণের পক্ষে যাহাতে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, অথবা

মেণ্টের দ্বারা ঐ ঐ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিতে পারে, অন্যদিকে আবার দেশবাসিগণ যদি ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে ঐ অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটিতে পারে। কোন্ নীতিতে ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূর করিবার কার্য্য, অথবা ভারতবাসিগণকে সমৃদ্ধিশালী করিবার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, অর্থাৎ এক কথায় ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, কুটীর-শিল্প যাহাতে একসঙ্গে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করে, তাহা উপরোক্ত অর্থনীতির মূলে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোন দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দূর করিয়া ঐ দেশের সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে যে, উপরোক্ত কৃষি প্রভৃতির প্রসার একান্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। কাযেই গভর্ণমেণ্টের অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় কার্য্য যে আপাতদৃষ্টিতে ভ্রমপ্রমাদ-পরিশূন্য, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতে হয়

দেশবাসীর আর্থিক দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য, গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে তাহাতে হস্তক্ষেপ করা সত্বেও দেশবাসীর আর্থিক অনটন কোনরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রে যেরূপ সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করা সত্বেও ঐবিষয়ক একটি প্রকাণ্ড অধ্যায় অনবগত থাকায় দেশের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ অর্থনীতি-ক্ষেত্রেও একটি প্রকাণ্ড অধ্যায় বর্ত্তমান মানবসমাজে অপরিজ্ঞাত থাকায়, প্রত্যেক দেশেই মানুষের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বত্রই হাহাকার-রব ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে।

অর্থনীতির ঐ অপরিজ্ঞাত অধ্যায়টি এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সম্ভব হইবে না।

গভর্ণমেণ্টের এবংবিধ চেষ্টা সত্বেও মানুষের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, মানুষের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, এই তিনটির প্রসার সাধন করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত, যাহাতে কৃষি কৃষকের পক্ষে (জমীদার অথবা ধনিকের পক্ষে নহে) লাভবান্ হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হয়, অথবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষি কৃষকের পক্ষে লোকসানজনক থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিল্প ও বাণিজ্য ঈপ্সিত পরিমাণে প্রসার লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আমাদের এই কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমরা গত প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে আবার তাহা প্রতিপন্ন করিব।

বর্ত্তমানে কোন দেশেই কৃষি আর কৃষকের পক্ষে লাভজনক নহে এবং যে যে ব্যবস্থায় এরবিধ অবস্থাতে উহা কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে, সেই ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত হইতেছে না। ইহারই ফলে গভর্ণমেণ্টের নানাবিধ চেষ্টা সত্বেও সর্ব্বত্রই মানুষের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য ও ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূর করিবার কার্য্য কোন্ নীতিতে পরিচালিত হইতেছে এবং উহা কোন্ নীতিতে পরিচালিত হইলে ভারতবর্ষের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এবং ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য অপসারিত হইতে পারে, তাহা উপরোক্তভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া গান্ধীজীর কথাগুলি রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির সম্বন্ধে সুবিজ্ঞতার অথবা অবিজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা আমরা পাঠকদিগকে নিদ্ধারিত করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমাদের মতে গান্ধীজী যে কেবলমাত্র অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক-খ সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত তাহা নহে, তিনি পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য কুজ্ঞান ও কুবিজ্ঞানের মোহমুগ্ধ, সম্পূর্ণভাবে উহা দ্বারা বিজিত ও ভাবসঙ্কর মানুষ। তিনি বস্তুতঃ পক্ষে খাঁটী ভারতবাসী নহেন, অথচ নিজকে ভারতবাসী বলিয়া প্রচারিত করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে প্রতারিত করিতেছেন। তাই তাঁহার অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নেতৃত্বসত্বেও একদিকে যেরূপ ভারতবর্ষের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক ভারতবাসীর দারিদ্র্যও বৃদ্ধি পাইতেছে।

তিনি অথবা তাঁহার অনুচরবর্গ যতদিন ভারতবাসীর

মনের উপর বিন্দুমাত্রও আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকিলেও যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর মিলন সম্ভব হইতে পারে, তাদৃশ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভবযোগ্য না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোন সমস্যারই সমাধান কখনও সম্ভব হইবে না, এই অপ্রিয় সত্যটি ভারতবাসী কবে বুঝিতে পারিবে?

যিনি ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয়, অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন দাম্ভিক লোকের আধিপত্য হইতে মনুষ্যকে যুগে যুগে রক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি বুদ্ধরূপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, আমরা তাঁহার নিকট কাকুতি জানাইতেছি।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সঙ্কল্প ও তাহার পরিণাম

কংগ্রেসপন্থিগণ মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষে স্বীকৃত হওয়ায় সামান্য কয়েকজন সোশ্যালিষ্ট ছাড়া প্রায় সকলেই [illegible] আনন্দ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভারতের নূতন সংগঠন আইন যাহাতে অসাফল্য লাভ করে তাহার চেষ্টা করা অপেক্ষা মন্ত্রিত্বগ্রহণ যে প্রশংসনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, কংগ্রেসপন্থিগণের বর্তমান সময়ে মন্ত্রিত্বগ্রহণই সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়, অথবা আর কিছু করিয়া তাঁহারা জনসাধারণের অধিকতর প্রশংসার যোগ্য হইতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। এতদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, ভারতবর্ষের ও তাহার প্রত্যেক প্রদেশের বর্তমান সমস্যা প্রধানতঃ কি কি এবং ঐ সমস্যাসমূহ পূরণের উপায় বা কি কি, প্রথমতঃ আমাদিগকে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, কংগ্রেসপন্থিগণ মন্ত্রিত্বগ্রহণ করিলে উপরোক্ত সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব হইবে, তাহা হইলে তাঁহাদের মন্ত্রিত্বগ্রহণ যে সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি দেখা যায় যে, মন্ত্রিত্বগ্রহণ না করিয়া তাঁহারা যদি আর কিছু করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমস্যাসমূহ-সমাধানের রাস্তা পরিগৃহীত হইত, কিন্তু মন্ত্রিত্বগ্রহণের ফলে সমস্যাসমূহ-সমাধানের রাস্তা পরিগৃহীত হওয়া তো দূরের কথা, কংগ্রেসপন্থিগণ সম্পূর্ণভাবে বিপরীতদিগভিমুখী হইয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে ধিক্কারের যোগ্য, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না।

ভারতবর্ষের মূল সমস্যা কি কি ও তাহা পূরণের উপায়ই বা কি কি, তদ্বিষয়ক আলোচনা আমরা অতি বিশদভাবে মাসিক বঙ্গশ্রীতে ইতিপূর্বে প্রকাশিত "ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। আমরা যে যে সমস্যার কথা বলিয়াছি, এবং ঐ ঐ সমস্যা-সমাধানের উপায় সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, মূলতঃ তাহাই যে সমস্যা এবং তাহাই যে পূরণের উপায়, তাহাও আমরা যুক্তি দ্বারা ঐ প্রবন্ধে সপ্রমাণিত করিয়াছি।

ভারতবর্ষের মূল সমস্যা কি কি, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে ভারতবর্ষের মূল সমস্যা চারিটি যথা :--

(১) শিক্ষিত যুবকগণের বেকার অবস্থা।

(২) সমগ্র কৃষিজীবী ও কুটীরশিল্পজীবিগণের দারিদ্র্য, অন্নাভাব এবং বেকার অবস্থা।

(৩) আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসা ব্যবসায়ী প্রভৃতি সর্ববিধ ব্যবসায় (profession) অবলম্বিগণের প্রায়শঃ অর্থাভাব এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' বশতঃ প্রায়শঃ চরিত্রাভাব।

(৪) সমগ্র অধিবাসীর স্বাস্থ্যহীনতা ও শান্তিহীনতা।

ঐ চারিটি মূল সমস্যা সম্যক্‌ভাবে সমাধান করিতে হইলে সর্বসমেত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্তিত করিতে হইবে। ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার কথা আমরা পূর্বোক্ত "ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"-শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।

ঐ আলোচনা এত বিস্তৃত যে, তাহা এই সন্দর্ভে উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে। একে তো উহার বিস্তৃতির জন্য এখানে উহা উদ্ধৃত করা সহজসাধ্য নহে, তাহার পর আবার একবার যখন ঐ আলোচনা করা হইয়াছে, তখন পুনরায় উহা উদ্ধৃত করিবার খুব বেশী প্রয়োজন দেখা যায় না।

কোন উপায়ে ভারতবর্ষের উপরোক্ত চারিটি মূল সমস্যার সমাধান সাধিত হইতে পারে, তাহা সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ঐ চারিটি মূল সমস্যার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম সমস্যা অন্ন সমস্যা। অনেকে মনে করেন যে, বেকার-সমস্যাই সর্ব্বপ্রধান সমস্যা এবং যাহাতে সকলে চাকরী পায় তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই ঐ সমস্যার সমাধান সাধিত হইবে তখন অনায়াসেই অন্ন-সমস্যাও দূরীভূত হইবে। আমাদের মতে উহা সত্য নহে।

কয়েকজন কায়স্থ অথবা শূদ্র ব্যতীত ভারতবাসী আর কেহ কোন দিন প্রায়শঃ চাকুরী অথবা নফরাগিরী করিত না। অথচ চল্লিশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের শতকরা নব্বইজনের মধ্যে অন্নবস্ত্রের অভাব থাকা তো দূরের কথা, প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে বার মাসে তের পার্ব্বণের উৎসব প্রবাহিত হইত। এক কথায়, ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন এখানকার অধিকাংশ মানুষই বেকার থাকিয়া জীবনাতিবাহিত করিত এবং মোটামুটীভাবে দুঃখ তাহাদের অবিদিত ছিল। কাযেই বলিতে হইবে যে, অবস্থাবিশেষে এখানে বেকার থাকিলেও মানুষের অন্নাভাবগ্রস্ত হইতে হয় না, এবং বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে কয়েকটি চাকুরী অথবা নফরগিরির সৃষ্টি হইলেই শূদ্রোচিত বুদ্ধির পক্ষে ভারতের সমস্যার সমাধান করা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সমস্যার সমাধান সাধিত হইবে না।

শুধু ভারতবর্ষে কেন, সারা জগতে অন্নসমস্যাই যে সর্ব্ব-প্রধান ও সর্ব্বপ্রথম সমস্যা, তাহা যদি একবার বর্ত্তমান জগতের চাকুরীজীবী ও অন্যান্য চাটুকারিতাজীবিগণের* নফরোচিত মস্তিষ্কে প্রবেশ লাভ করিতে পারে তাহা হইলে মানুষ দেখিতে পাইবে যে, ঐ সমস্যা সমাধানের উপায় মাত্র একটি এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত দুইটি ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে :—

(১) যাহাতে কোন কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিলেও প্রত্যেক দশবিঘা জমী হইতে অন্ততঃপক্ষে ১২০ মণ ধান্য অথবা গম উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে সমগ্র জগতের সমগ্র মানবসংখ্যার প্রত্যেকে মাথাপিছু দৈনিক গড়ে অন্ততঃপক্ষে অর্দ্ধসের চাউল অথবা আটা পাইতে পারে, তাদৃশ পরিমাণের আবাদযোগ্য জমি বৃদ্ধি পাইয়া মোট ধান্য ও গম উৎপন্ন হয় তাহার ব্যবস্থা।

(২) মানুষের জীবনধারণের জন্য ন্যূনকল্পে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা যাহাতে প্রত্যেক মানুষটি—অন্ধই হউক আর খঞ্জই হউক, বালকই হউক আর বৃদ্ধই হউক—পাইতে পারে এবং প্রকৃত জ্ঞান ও কার্য্যক্ষমতার তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত প্রথম ব্যবস্থাটিকে প্রচুর উৎপন্নের ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থাটিকে বিতরণের ব্যবস্থা বলা যাইতে পারে এবং আমরা ঐ ব্যবস্থা দুইটিকে উপরোক্ত নামে আখ্যাত করিব।

আমরা আধুনিক জগতে বাস্তবতঃ যাহা দেখিতেছি তাহাতে বলিতে হয় যে, আধুনিক জগতের চাকুরীয়া অথবা, শূদ্রগণের এবং চাটুকারিতাজীবিগণের মস্তিষ্ক নফরোচিত (slave-like) বলিয়া প্রচুর উৎপন্নের ব্যবস্থা (অর্থাৎ কৃষিকার্য্য) যে, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না এবং ঐ ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করিয়াও শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিতরণের ব্যবস্থা যাহাতে উন্নতিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া তাহার আলোচনা করিয়া থাকেন।

* মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা কর্ত্তব্য বিবেচনা না করিয়া একমাত্র কর্ত্তব্য সম্মুখে না রাখিয়া কিসে উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণ সন্তুষ্ট থাকিবে, কিসে তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় হইবে তাহা বিবেচনা না করিয়া কি উপায়ে তাহাদের প্রিয় হওয়া যাইবে, তাহা মনে রাখিয়া সংবাদপত্র পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহারাও চাটুকারিতাজীবী এবং তাঁহাদিগের মস্তিষ্ককেও নফরোচিত (slave-like) বলা যাইতে পারে।

অন্নসমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রচুর উৎপন্নের ব্যবস্থা যে সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহা যখন মানুষ বুঝিতে পারিবে, তখন দেখিতে পাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত যাহাতে প্রত্যেক দেশের নদ, নদী ও খালগুলি সর্বত্র সারা বৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ শুধু সাগরে সন্তরণই করুক, আর হাতীর মত বৃহৎ ষাঁড় লইয়া বোলপুরের শান্তি নৃত্যাগার হইতে সিমলার রাস্তায় ওয়ার্ধার বিদূষকগণের মন্ত্রণাগার পর্য্যন্ত দৌড়াদৌড়িই করুক, জমিদারগণকে কূপকাৎ করিয়া প্রজাগণের দেহি-দেহি বংচারী নৃত্যের ব্যবস্থাই হউক, আর ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যাহাতে সারা বৎসর প্রজাগণের মধ্যে বাস করিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার [illegible] জমি প্লাবিত করেন, তাহার ব্যবস্থাই সাধিত হউক - অন্য কোন উপায়ে প্রচুর উৎপাদনের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে না।

উপরোক্ত বিতরণের ব্যবস্থানামক দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি যে অন্নসমস্যার সমাধানের জন্য অন্যতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, তাহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ যখন তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবে, তখন দেখিতে পাইবে যে, দুইশত বৎসর আগে মনুষ্যসমাজে কারেন্সী নামক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব, অর্থাৎ কাগজনির্ম্মিত নোটের এবং ধাতুনির্ম্মিত টাকা পয়সার এতাদৃশ প্রচলন প্রায়শঃ জগতের কোথায়ও বিদ্যমান ছিল না এবং তখন এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে 'রসগোল্লার ছাল ছিঁড়িয়া রসগোল্লা খাওয়া' ও অন্য এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ক্ষুধার তাড়নায় নর্দ্দমায় নিক্ষিপ্ত ভক্ষিতাবশেষগুলির জন্য লোলুপ হওয়া সম্ভব হইত না। তখন প্রায় সকলেই ক্ষুধার যাতনা নিবৃত্তি করিতে পারিত, ক্ষুধার যাতনা উপস্থিত হইলে প্রায় সকলকেই তাহাতে অল্লাধিক অস্থির হইতে হইত এবং তন্নিবন্ধন যাহাতে মনুষ্যসমাজে কাহারও ক্ষুধার যাতনা উপস্থিত না হয়, তজ্জন্যই সকলে মিলিয়া উদ্যোগী হইত। মানবের প্রাচীনতম সাহিত্যে পণ্ডিত ও মূর্খ, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ভোগী ও ত্যাগী, তাপস ও উচ্ছৃঙ্খল, যতি ও অ-যতি, রাজা ও প্রজা, গুরু ও শিষ্য, অধ্যাপক ও ছাত্র, দাতা ও গ্রহীতা, এবংবিধ ছোট-ত্ব ও বড়-ত্বের নিদর্শন পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু একদিকে ক্রোড়পতি ও লক্ষপতি প্রভৃতি কথার অস্তিত্ব যেরূপ দেখা যাইবে না, সেরূপ আবার সমাজের কোন শ্রেণীর লোক যে [illegible] উঠিতে পারিত, আর কোন শ্রেণীর লোক যে অন্নাভাবে অস্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া তিল তিল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারিত, তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। কেন ও কখন হইতে মানবসমাজে এতাদৃশ বৈষম্যের উদ্ভব হইল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, যেদিন হইতে জগতে অন্নাভাবের উদ্ভব হইয়াছে, সেদিন হইতে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কারেন্সি প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং তখন হইতেই এতাদৃশ বৈষম্যের উদ্ভব হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান অবস্থায় ঐ কারেন্সির প্রক্রিয়ার যে প্রয়োজন আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, তথাপি চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বৈজ্ঞানিক শিল্প বা বৈজ্ঞানিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স প্রভৃতি ধন বিতরণের যত-কিছু নব্য উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা যেরূপ ভাবেই পরিচালিত হউক না কেন, যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের কারেন্সি প্রক্রিয়ার প্রচলন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত মানবসমাজে ধনের অসমান বিতরণ অবশ্যম্ভাবী হইবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত অলৌকিক ধনবত্তা ও অযৌক্তিক দারিদ্র্য বিদ্যমান থাকিবেই থাকিবে।

কি করিলে মানবসমাজে পুনরায় প্রচুর উৎপন্নের ব্যবস্থা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বিতরণের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে দেশের প্রত্যেক নদীটির উৎপত্তি-স্থান হইতে সাগর সঙ্গম-স্থান অবধি নিয়মিত বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা হয়, তাহার চেষ্টা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় এবং উহা করিতে হইলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে, সেই পরিমাণ অর্থের অনটন যাহাতে না হয়, তজ্জন্য প্রথমতঃ প্রচুর পরিমাণে কারেন্সি-প্রক্রিয়ার সহায়তা লইতে হইবে বটে, কিন্তু নদীর পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য সমাপ্ত হইবার পর মানবসমাজ হইতে অসমান বিতরণ যাহাতে সম্যক্ ভাবে তিরোহিত হয়, তাহা করিবার জন্য অবশেষে ঐ বৈজ্ঞানিক কারেন্সি-প্রক্রিয়ার অন্ত্যেষ্টি-কার্য্য সাধিত করিতে হইবে। প্রত্যেক নদীটির উপরোক্ত পঙ্কোদ্ধার-কার্য্য, ঐ পঙ্কোদ্ধারের জন্য অর্থ-ব্যবস্থার কার্য্য এবং

কারেন্সি পরিক্রমার অক্টোফিকাশা কি প্রকারে সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ নদীর উৎপত্তি ও প্রাকৃতিক গতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার মানবসমাজের অধিকাংশ মানুষ যাহাতে জাতি (ইংরাজ, বাঙ্গালী, ভারতীয় ইত্যাদি), ধর্ম (হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি) এবং বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা আইন-ব্যবসায়ী, ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক, বণিক ইত্যাদি)-নির্বিশেষে মিলিত হয়, তদ্বিষয়ক ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।

যখন দেখা যাইতেছে যে, মানবসমাজের অন্নসমস্যা দূরীভূত করিবার এতাদৃশ প্রকৃষ্ট উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও কেন মানবসমাজ ঐ উপায় গ্রহণ করিতেছে না এবং অধিকাংশ মানুষ দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার কারণ তিনটি, যথা,—

(১) পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা ও অসম্পূর্ণতা।

(২) পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে ভ্রমাত্মক ও অসম্পূর্ণ এবং তদনুসারে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকও যে মস্তিষ্ক হীন, তৎসম্বন্ধে ঐ বৈজ্ঞানিকগণের এবং তাঁহাদের অনুচরবর্গের অজ্ঞতা, অথবা এক কথায়, পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকের দাম্ভিকতা।

(৩) কি করিলে মানুষের অন্নসমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি, অথবা রাষ্ট্রনীতি করিতে সক্ষম হয় নাই এবং তদনুসারে বিটিশ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌গণ যে তদ্বিষয়ে অজ্ঞ তৎসম্বন্ধেও ব্রিটিশ ষ্টেট্‌স্‌-ম্যান্‌গণের ও তাঁহাদের অনুসরণকারী টীয়াপাখীগণের জ্ঞানের অভাব।

এতাদৃশ অবস্থায় কি উপায়ে মানবসমাজের অন্ন-সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, এই উপায় যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতিতে বিদ্যমান নাই, তাহা যেমন বিটিশ রাজপুরুষগণ ও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুচরবর্গ যাহাতে বুঝিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, সেইরূপ আবার ঐ বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া তাঁহারা যাহাতে জন-সাধারণের হাস্যাস্পদ না হন এবং জনসাধারণ যাহাতে আইন ও শৃঙ্খলার বিঘ্নকারী না হয়, তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র ভারতবাসী, তথা সমগ্র মানব-সমাজের অধিকসংখ্যক যাহাতে জাতি, ধর্ম, ও বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, উপরোক্ত যে দুইটি কার্য্য-বিধি অবলম্বিত হইলে ভারতবর্ষের, তথা সমগ্র মানব-সমাজের-অন্নসমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় কংগ্রেসপন্থিগণের দ্বারা দেশের শাসনভার গৃহীত হইলে ঐ দুইটি কার্য্যবিধি অবলম্বিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে কি না।

ভারতবর্ষের, তথা সমগ্র মানবসমাজের অন্ন-সমস্যার সমাধান করিবার জন্য যে যে ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা যে পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতি অথবা রাষ্ট্রনীতিতে সম্যক্ অভ্রান্তভাবে আলোচিত হয় নাই এবং তজ্জন্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগণের কেহ যে ঐ অন্ন সমস্যা সমাধান করিতে অক্ষম, তাহা যাহাতে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ ও তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুচরবর্গ সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারেন এবং অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করেন, তাহা করিতে হইলে ঐ ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ ও তাঁহাদের অনুচরবর্গের হস্তে শাসন-কার্য্যের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কংগ্রেস-পন্থি-গণের হস্তে ঐ শাসনভার অর্পিত হইলে, অন্ন-সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব তখন আর ব্রিটিশ রাজপুরুষগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে না এবং তাঁহারা যে ঐ সমস্যা-সমাধানের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, তাহা একদিকে যেরূপ পরিষ্কারভাবে প্রতিপন্ন করা কষ্টসাধ্য হইবে, অন্যদিকে আবার ঐ ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ যে ঐ বিষয়ে অক্ষমতাসম্পন্ন, তাহা তাঁহারা

অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিতেও সমর্থ হইবেন না। ফলে, ঐ সমস্যা সমাধান করিতে হইলে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিরোধী যে সমস্ত ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা প্রবর্তিত হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

এইরূপে কংগ্রেসপন্থিগণের হস্তে শাসনভার অর্পিত হইলে, একে তো ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ অন্ন সমস্যা-সমাধানের জন্য যে সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, কার্য্যতঃ তৎসম্বন্ধে হয় উদাসীন নতুবা বিরুদ্ধতা অবলম্বন করিবেন আশঙ্কা করা যাইতে পারে, অন্যদিকে আবার দেশবাসিগণের পক্ষেও সর্বতোভাবে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ-নির্বিশেষে মিলিত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে, কারণ, কংগ্রেসপন্থিগণ মন্ত্রিত্বভার গ্রহণ করিলে, একদিকে যেরূপ তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদিগণ তাঁহাদের বিরোধিতা করিবেন বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে, অন্যদিকে আবার মন্ত্রিত্বের সম্মানলাভ লইয়া কংগ্রেসপন্থিগণের নিজেদের মধ্যেই মনোমালিন্যের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, কংগ্রেসপন্থিগণের মন্ত্রিত্বগ্রহণের ফলে ভারতবাসিগণের সমস্যাসমূহের সমাধানের আশা সুদূরপরাহত হইয়া যাইবে।

অন্যদিকে, কোন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিয়া, প্রত্যেক প্রদেশে যাঁহারা যাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব যাহাতে বজায় থাকে তাহার প্রতিশ্রুতি দিয়া কংগ্রেসপন্থিগণ যদি প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রিমণ্ডলকে ঐ ঐ প্রদেশের গভর্ণরের নিকট অন্ন-সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনার জন্য যাচ্ঞা করিবার অনুরোধ করিতেন তাহা হইলে একদিকে যেরূপ কংগ্রেসপন্থিগণ মন্ত্রিমণ্ডল, তথা দেশের অপরাপর সকলের সহিত ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার সুযোগ পাইতেন, অন্যদিকে আবার প্রাদেশিক গবর্ণরগণ যে অন্ন সমস্যা-সমাধানের প্রকৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে অক্ষমতা সম্পন্ন, তাহাও প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ ঘটিত। অধিকন্তু, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা কোন রূপে প্রতিহত না করিয়া উপরোক্ত সমস্ত কার্য্য সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইত। দেশের অপরাপর সমস্ত লোকের সহিত ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া যে পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি হইতে যে মানবজাতির অন্নসমস্যা সমাধান করিবার কোন রূপ সম্ভাবনা নাই, তাহা ব্রিটিশ রাজপুরুষগণকে ও তাঁহাদের ভাবাপন্ন অনুচরবর্গকে সম্যক্ ভাবে বুঝাইয়া দিয়া, ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ মানুষ হিসাবে অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল হইলেও জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতায় যে এখনও অত্যন্ত পশ্চাৎপদ, তাহা তাঁহারা যাহাতে অকৃত্রিমভাবে (sincerely) বুঝিতে পারেন, তাহার সুযোগ তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়া, তাহার পর কংগ্রেসপন্থিগণ যদি দেশের শাসনভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা যে ভারতবাসীর সকল সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে?

কাজেই বলিতে হইবে যে, এতাদৃশ সময়ে কংগ্রেসের উপর মন্ত্রিত্বভার চাপাইবার ব্যবস্থা যাঁহারা করিয়াছেন, গান্ধীজী প্রভৃতি সেই নেতৃবর্গ বিদূষক সদৃশ (clown-like) ভাবসঙ্কর (puzzled with borrowed ideas) এবং তাঁহারা দেশবাসীর ধিক্কারযোগ্য।

এখনও সতর্ক না হইলে, ইহার পরিণাম জনসাধারণ ও গভর্ণমেণ্ট উভয়ের পক্ষে আশঙ্কাজনক হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

অন্যভাবে যে আত্মহত্যা, যে প্রবঞ্চনা, যে-শঠতা, যে-চৌর্য্য, যে লুণ্ঠন এখনও অপ্রকাশ্য ও লুক্কায়িতভাবে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা যে প্রকাশ্যভাবে ভীষণতার রূপ ধারণ না করিয়া এখনও অবগুণ্ঠিত ভাবে সাধিত হইতেছে, তাহার পশ্চাতে যে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অতর্কিত ভাবে দেশীয় কংগ্রেসের মুখের পানে চাহিবার প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বুঝা কি এতই কঠিন? কিন্তু, জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের নেতা গান্ধীজী-প্রমুখ ভাবসঙ্কর মানুষের পরিচালিত কংগ্রেসের মুখের পানে চাহিয়া থাকা সম্পূর্ণ নিরর্থক, তখন যে সঙ্গে সঙ্গেই ঐ অবগুণ্ঠিত দুষ্প্রবৃত্তিগুলি প্রকাশ্য ভাবে ভীষণতা ধারণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে, তাহা মনে করা কি অলীক?

ব্রিটেনের সমৃদ্ধিপন্থা

গত ৮ই জুলাই লণ্ডন সহরের অ্যালবার্ট হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী ব্রিটেনের অবস্থা সম্বন্ধে একটি নাতিবৃহৎ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতার নিম্নলিখিত তিনটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনে যে রকম দুরবস্থা দেখা গিয়াছিল, পুনরায় ঐ রকম দুরবস্থা দেখিবার আশঙ্কা খুবই কম, ইহা মনে করিবার কতকগুলি কারণ আছে।

(There are a number of reasons why it is extremely unlikely that we will ever experience a repetition of such a depression as that of 1931.)

(২) কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটেনের পূর্ব্বতন ক্রেতাগণের মধ্যে কাহারও কাহারও ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। শিল্পদ্রব্যের উৎপত্তির কার্য্যে নিপুণতা এবং সৎরুচির পরিচয় দিতে পারিলে ব্রিটেন অনেক বৎসর ধরিয়া প্রচুর কার্য্য পাইতে পারিবে।

(The rising prices of primary commodities are increasing the purchasing power of some of our former best customers. If we use ingenuity and taste to keep up the quality of our goods, we shall have plenty of works for many years)

(২) অধুনা ব্রিটেনের বেকারগণের অনেকেই যে পুনরায় কর্ম্মনিয়োগ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ সমর-সজ্জার পরিকল্পনা, ইহা কোন ক্রমেই বলা যায় না।

(The present high record of employment in Britain was in no wise entirely due to their rearmament policy)

প্রধান মন্ত্রীর উপরোক্ত তিনটি কথার কোনটিই যে যুক্তিসঙ্গত নহে তাহা প্রতিপন্ন করা আমাদের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। আমাদের মতে ইংলণ্ডের আধুনিক ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ যে সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং ব্রিটেনের দারিদ্র্য নিবারণ করিবার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা প্রায়শঃ সসাগরা অর্দ্ধ পৃথিবী-ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণের প্রয়োজনীয় রাজনীতি জ্ঞানের উপযোগী নহে বটে এবং ঐ কর্ণধারগণের হীনবুদ্ধির ফলে ব্রিটেন যে আর কোন ক্রমেই ভিক্টোরিয়া যুগের সমৃদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন না, তাহাও সত্য বটে, কিন্তু তথাপি ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ যে সর্ব্বদা প্রকৃত দেশপ্রেমিকের মত ব্রিটেন যাহাতে তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

"১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটেনে যাদৃশ দুরবস্থা দেখা গিয়াছিল, তাদৃশ দুরবস্থা আর কখনও ব্রিটেনে দেখা যাইবার আশঙ্কা খুবই কম"—প্রধান মন্ত্রীর এবম্বিধ ভবিষ্যদ্বাণী যুক্তিসঙ্গত কিনা তাহার পরীক্ষা (বিচার) করিতে হইলে একদিকে যেরূপ প্রকৃত সমৃদ্ধি কাহাকে বলে এবং দেশের প্রকৃত সমৃদ্ধিজ্ঞাপক চিহ্ন কি কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, অন্যদিকে আবার ব্রিটেনের আর্থিক অবস্থার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া কখন কখন ব্রিটেনে প্রকৃত সমৃদ্ধিজ্ঞাপক চিহ্ন এবং কখনই বা দুরবস্থার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আজকালকার মানুষ সাধারণতঃ পাশ্চাত্ত্য জাতিগণকে জ্ঞান বিজ্ঞানে খুব উন্নত বলিয়া মনে করিয়া থাকে বটে এবং পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে একটি প্রাচীন ইতিহাস আছে, তাহা সপ্রমাণিত করিবার জন্য সচেষ্টও হইয়াছেন বটে, কিন্তু যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের গর্ব্বিত পদচালনায় সমগ্র পৃথিবী প্রায়শঃ কম্পিত হইয়া থাকে সেই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ মানুষের প্রকৃত সমৃদ্ধি (wealth) কাহাকে বলে, তাহার আলোচনায় কোন্ কাল হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আডাম্ স্মিথের "Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations"-নামক গ্রন্থ বাহির হইবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্ত্য দেশের জাতিগুলির

মধ্যে ঐসম্বন্ধীয় কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা যে বিদ্যমান ছিল, তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না। ঐ ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দাবধি ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং ইউনাইটেড ষ্টেটসের অনেক ধুরন্ধর, সমৃদ্ধি কাহাকে বলে তাহার অনেক রকম ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কে যে কি বলিয়াছেন তাহা প্রায়শঃ তাঁহারা নিজেরাই বিদিত নহেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। আমাদের মতে, কি উপায়ে যে প্রকৃত সমৃদ্ধির বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তাহার পন্থা পরিজ্ঞাত হওয়া তো দূরের কথা, প্রকৃত জাতীয় সমৃদ্ধি যে কাহাকে বলে, তাহার সন্ধান পর্য্যন্ত ঐ পাশ্চাত্ত্য অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণ অদ্যাবধি লাভ করিতে সক্ষম হন নাই।

উঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে, দেশে দেশীয় লোকের এবং গবর্ণমেণ্টের যে-পরিমাণ "buildings' (অট্টালিকাদি), land (ভূমি), farmer's capital (কৃষকের মূলধন), business profits and interest (কারবারের লাভ এবং সুদ), furniture and movable property (অস্থাবর সম্পত্তি) বিদ্যমান থাকে, তাহার মূল্যই জাতীয় সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

ইংলণ্ডে সম্প্রতি দুইবার—একবার ১৯১৪ সালে, আর একবার ১৯২০ সালে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় সমৃদ্ধির পরিমাণ কত (Estimates of the National wealth of Great Britain), তাহা স্থির করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৯২০ সালের সংশোধিত এষ্টিমেট (Revised Estimate) সাধিত হইয়াছে স্যর জসুয়া ষ্ট্যাম্পের দ্বারা। ঐ এষ্টিমেটে জাতীয় সমৃদ্ধির পরিমাপ করিবার জন্য স্যর জসুয়া ষ্ট্যাম্প কোন্ কোন্ বিষয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলেই পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ সমৃদ্ধি বলিতে কোন্ কোন্ বস্তু কার্য্যতঃ বুঝিয়া থাকেন, তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইবে এবং উহা হইতে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত অট্টালিকা ও ভূমি প্রভৃতির মূল্যই অথবা কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাই পাশ্চাত্ত্য ধুরন্ধরগণের মতে সমৃদ্ধির (wealth এর) পরিচায়ক।

কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাকে কোন মস্তিষ্কবান্ মানুষের পক্ষে সমৃদ্ধির পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কি এবং কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা ঐ প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। সমৃদ্ধির (wealth) প্রয়োজনীয়তা কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে প্রত্যেক মানুষ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া তাহার নিজের, স্বীয় পরিবারের, স্বীয় আত্মীয়স্বজনের এবং স্বদেশবাসীর, কখনও কখনও সমগ্র মনুষ্যসমাজের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে এবং সন্তুষ্টচিত্তে সুস্থ শরীরে, শান্তির সহিত দীর্ঘ জীবন যাপন করিতে পারে, তাহার জন্য সমৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। কাজেই বলিতে হইবে যে, মানুষের সমৃদ্ধির প্রয়োজন ছয়টি, যথা :—

(১) আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য, (২) স্বাবলম্বন, (৩) মানসিক শান্তি, (৪) সন্তুষ্টি, (৫) দীর্ঘ যৌবন, (৬) দীর্ঘ জীবন। কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা ঐ প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়া সম্ভব কি না, তাহার সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, যখন জগতের সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার উপযুক্ত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রস্তুত করিবার দ্রব্যের উৎপত্তি প্রচুর পরিমাণে হইতে থাকে, তখন কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা প্রত্যেকের পক্ষে স্ব স্ব প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য ক্রয় করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু যখন কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অপ্রচুর হয়, তখন একদিকে যেমন মানুষের পক্ষে ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করা সম্ভব না-ও হইতে পারে, অন্যদিকে আবার যখন ঐ কৃষিজাত দ্রব্য প্রচুর থাকে, তখনও ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টের আয়ত্তাধীন থাকায় একে তো উহা সর্ব্বদা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া প্রয়োজনানুরূপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, তাহার পর আবার ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে অযৌক্তিকভাবে কখনও কখনও মানুষের পক্ষে ধনী, কখনও কখনও বা অকারণ দরিদ্র থাকিতে বাধ্য হইতে হয় বলিয়া মানুষের মধ্যে অশান্তি ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। উপরোক্ত সত্যগুলি চিন্তা করিলে একদিকে যেরূপ দেখা যাইবে যে, কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা

সমৃদ্ধির প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সর্ব্বতোভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব হয় না, অন্যদিকে আবার কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাকে জাতীয় সমৃদ্ধির চিহ্ন বলিয়া ধরিয়া লইলে, কোন জাতি ধনী, আর কোন জাতি দরিদ্র ইহা বলা চলে না, কারণ সমস্ত স্বাধীন জাতির পক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সমান পরিমাণেই কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা প্রস্তুত করা সম্ভবযোগ্য। আমাদের দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রের টীয়াপাখীগণ হয় ত' আমাদের উপরোক্ত কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু কোন্ দেশে কোন সালে স্বর্ণের পরিমাণ কত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কত পরিমাণের ধাতু ও কাগজ নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে আমাদের কথা যে সত্য, আর আমাদের দেশের অর্থনীতি-ক্ষেত্রের ঐ টীয়াপাখীগণ, যতই উচ্চ রকমের উপাধিতে বিভূষিত হউন না কেন, তাঁহারা প্রায়শঃ যে বাস্তবিক-পক্ষে পক্ষীসদৃশ তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, কাগজ ও ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা মানুষের সমৃদ্ধির প্রকৃত প্রয়োজন সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সাধিত করা যায় না, তখন কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গতভাবে ঐ কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণকে কোন ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় সমৃদ্ধির পরিমাপক বলিয়া স্থির করা যায় না। যাঁহারা এই প্রাথমিক সত্যটিকে না বুঝিতে পারিয়া কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাকে মানবসমাজের সমৃদ্ধির মানদণ্ড বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং উহা দ্বারাই মানবসমাজের বিবিধ সমস্যার পূরণের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এখনও মানবসমাজের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছেন বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে যে, মানবসমাজ ঐ অদূরদর্শী অর্থনৈতিকগণকে অতীব অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিবে, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য প্রভৃতি যে ছয়টি বস্তু লইয়া মানবসমাজের প্রকৃত সমৃদ্ধি, সেই ছয়টি বস্তু কি উপায়ে মানবসমাজের প্রত্যেকে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে পাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা পাইবার উপায় প্রধানতঃ তিনটি, যথা—(১) জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির (natural fertility) বৃদ্ধি ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রচুর উৎপত্তি, (২) যাহাতে দেশের উপার্জ্জনক্ষম লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক মানুষ নিযুক্ত হইতে পারে, এতাদৃশ কুটীরশিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার, (৩) যাহাতে দেশের প্রত্যেক মানুষের প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, এতাদৃশ শিক্ষার প্রসার।

একমাত্র এই তিনটি বস্তুই যে প্রকৃত জাতীয় ও ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির পরিমাপক, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা আরও বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।

বৃটেন প্রকৃতপক্ষে কখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা তাহার ইতিহাস হইতে অনুসন্ধান করিতে হইলে দেখা যাইবে যে, গ্রেটবৃটেনের আধুনিক ধুরন্ধরগণ, যখন বৃটেনের প্রায় প্রত্যেক অধিবাসী তাহার সারা বৎসরের আহার্য্যের জন্য হল্যাণ্ড, অথবা কানাডা, অথবা অষ্ট্রেলিয়ার মুখাপেক্ষী, যখন বৃটেনের শতকরা প্রায় ৯৫জন লোক স্ব স্ব জীবিকার জন্য চাকুরী অথবা লক্ষরিতীন মুখাপেক্ষী, যখন বিটেনে দলাদলির অশান্তি প্রায় সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত, যখন বিটেনের গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, যখন বিটেনের অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে, সেই বিংশ শতাব্দীকে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধির সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যখন বৃটেনবাসিগণের অনেককেই উদরান্নের জন্য স্বদেশ ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া সারাজীবন বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়, যে সময় পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু তাহার অধিবাসিগণকে উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে, সেই সময় তাহার সমৃদ্ধির সময় নহে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ব্রিটেনের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তখন ব্রিটেনের অধিবাসিগণের শতকরা ৯৫জন চাকুরীর জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কৃষিকার্য্যে ও কুটীর-শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, তখন ব্রিটেনবাসিগণের মধ্যে

দেশবাসিগণের অন্নের জন্য, তাঁহাদের শিল্প ও বাণিজ্যের কাঁচামালের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য হন। ইহা কি সমৃদ্ধির চিহ্ন?

কার্য্য-কারণের সঙ্গতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ইতিহাস কি হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক ব্রিটেনবাসিগণের পিতৃপুরুষের যে পুণ্যফলে ভারতবর্ষের রাজত্ব তাঁহারা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ব্রিটনগণ প্রায়শঃ ঐ পুণ্যকীর্ত্তি বজায় রাখিতে পারেন নাই এবং প্রায়শঃ তাঁহারা ভগবানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ঐ পিতৃপুরুষগণের পুণ্যের ফলে তাঁহারা এখনও জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের নামে যে কু-জ্ঞান ও কু-বিজ্ঞানের মোহে তাঁহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে না পারিলে, তাঁহাদিগকে যে অপর কোন জাতি অদূর-ভবিষ্যতে বশ্যতাপন্ন করিতে পারিবে, তাহা মনে করা যায় না বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের উপর নির্ভরশীল জাতিগুলিকে প্রায়শঃ যে অন্নাভাবগ্রস্ত হইয়া অন্তর্বিদ্রোহে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রিটেনের খাঁটী সন্তানগণ তাঁহাদের পুণ্যবান্ পিতৃপুরুষের রক্ত এখনও তাঁহাদের শিরায় শিরায় বহন করিতেছেন বলিয়া, এখনও তাঁহাদের দ্বারাই সর্ব্বনিয়ন্তা মানবজাতিকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাই এখনও ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া কি উপায়ে মানবজাতি তাহার আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা পাইবে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু, ঐ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত বিপথগামী অর্থনীতি-নামক বিজ্ঞানের মোহে পতিত হইয়া ঐ রাজপুরুষগণ প্রধানতঃ বৎসরের পর বৎসর অপ্রতিহতগতিতে কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণের বৃদ্ধি সাধন করিতেছেন এবং তাহা যাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে পৌঁছিতে পারে, নানা অজুহাতে তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা সরকারী বিবরণী ও রাজপুরুষগণের উক্তি হইতে প্রমাণিত করিব। কুজ্ঞানের মোহে এতই তাঁহারা আচ্ছন্ন যে, যখন জগতে তাহার সমগ্র অধিবাসীর উপযুক্ত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে থাকে, তখন ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা তাহা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু যখন জগতের মা-টি (অর্থাৎ জমি) শুষ্ক হইয়া যায় এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপত্তির পরিমাণ অপ্রচুর হয়, তখন কাগজ অথবা ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা যে উহা ক্রয় করা সম্ভব হয় না, তখন কোনক্রমেই যে ঐ মুদ্রার দ্বারা মনুষ্যের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হয় না, তখন কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা উদরস্থ করিয়া যে মানুষ বাঁচিতে পারে না—এই সহজ ও সরল সত্যটুকু পর্য্যন্ত আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাগণ বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

সমগ্র ইয়োরোপীয় অধিবাসিগণের সক্ষমভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য ও বস্ত্রাদি ব্যবহার্য্যের জন্য যে-পরিমাণ কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, ইয়োরোপে তাহার অভাব বস্তুতপক্ষে একাদশ শতাব্দী হইতেই যে দেখা দিয়াছে, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। একাদশ শতাব্দী হইতেই ইয়োরোপের মা-টী (অর্থাৎ জমী) শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই, তখন হইতেই ইয়োরোপীয়গণের আহার্য্য ও কাঁচামালের অনটন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহারই জন্য তখন হইতেই তাঁহারা স্বদেশ ও আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহারা এসিয়াখণ্ডের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই এবং তখনও এসিয়াখণ্ডে তাহার সমগ্র অধিবাসীর প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়াও খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল কিছু উদ্বৃত্ত হইতে পারিত বলিয়াই ইয়োরোপীয়গণ তখনকার মত এসিয়ার সাহায্যে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু, এখন আর সে দিন নাই। এসিয়াখণ্ডে, এমন কি যে ভারত একলাই জগতের সমগ্র মানবজাতির প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে প্রসব করিতে সক্ষম, যে ভারতের মাটী সমুদ্রের সহিত সামান্য

মাত্র ব্যবধান রক্ষা করিয়া সর্ব্বোচ্চ হিমাচল হইতে একদিন পঞ্চনদ ও গঙ্গা প্রভৃতি নদীর সর্ব্বাপেক্ষা গভীরতা ও সততা অধিষ্ঠ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরতা-সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই ভারতের মাটী (অর্থাৎ জমি) পর্য্যন্ত আজ শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইউরোপীয়গণের পক্ষে এসিয়ার উদ্বৃত্ত দ্বারা স্ব স্ব অভাব পূরণ করা তো দূরের কথা, এসিয়ার উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল এসিয়াবাসিগণের পক্ষেই অপ্রচুর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র এসিয়াবাসিগণের ক্রয়শক্তি এখন প্রায়শঃ বিদ্যমান থাকে না বলিয়া এসিয়ার উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের পরিমাণ যে এত কমিয়া গিয়াছে, তাহা মানুষ আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে পারে না। সমগ্র জগতে কত মানুষ আছে, প্রত্যেক মানুষকে খাদ্যশস্য গড়ে প্রতিদিন অদ্ধসের পরিমাণ এবং কাঁচামাল সংবৎসরে সাতসের পরিমাণে প্রদান করিলে সারা বৎসরে সমগ্র মানবজাতির কত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল লাগিতে পারে এবং মোট কত খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল জগতে প্রতি বৎসর উৎপন্ন হইতেছে তাহার হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ১৯৩৫ সালেই মোট প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের প্রায় সাত আনা ঘাটতি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ সমগ্র জগতের চৌদ্দ আনা লোককে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অর্দ্ধাশনে ও অদ্ধবসনে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। ১৯০৬ সালে মোট প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের উৎপত্তি কিরূপ ছিল, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তখনও কেবলমাত্র তিন আনার ঘাটতি আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ তখনও ছয় আনা লোকের অর্দ্ধাশনে ও অদ্ধবসনে কাটাইতে হইত।

উপরোক্ত হিসাব তলাইয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, জগতের সর্ব্বত্রই জমী ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে বলিয়া প্রতি-বিঘা জমীর উৎপন্নের পরিমাণ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, প্রতি বিঘা জমীর উৎপন্নের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে বলিয়াই জগতের সমগ্র কৃষকগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হওয়া উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে এবং একাদৃশ ভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের ঘাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষকগণের পক্ষে স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া লাভবান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র চাকুরী, অথবা লক্ষ্মীছাড়ার অন্বেষণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্র বেকারের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অবস্থার অন্যথা সম্পাদন করা সম্ভব না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সাবাজ্যবাদ কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলেও মানুষের অভাবের সর্ব্বতোভাবে দূর করা, অথবা বেকার অবস্থার সম্পূর্ণ লোপ করা কোন ক্রমেই যে সম্ভব হইবে না এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের হাহাকার যে বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

জগতের মাটীর শুষ্কতা যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে না পারে, জগতের সর্ব্বত্র মাটীতে সর্ব্বদা রস ও তেজ যাহাতে বিদ্যমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত না হয় ততদিন পর্য্যন্ত মানুষ তাহার বিপদ্ হইতে আংশিক ভাবে রক্ষা পাইতে পারিয়াছে, এমন কোন উক্তি যুক্তি-সঙ্গত ভাবে করা যায় কি না, এবং কোন সাধুপুরুষ যদি এতাদৃশ অবস্থায় তাদৃশ কোন বাণী প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি যত উচ্চপদাধিষ্ঠিত হউন না কেন, তাঁহাকে অর্ব্বাচীন বলিতে হইবে কি না তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন।

কি করিলে জগতের মাটীর শুষ্কতা সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইতে পারে এবং বিটিশগণের স্বার্থই বা তাহা কি করিয়া সাধিত হইতে পারে, তাহা আমরা প্রয়োজন হইলে বারান্তরে নিবেদন করিব।

শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য

ইংরাজ জাতি যে, ভারতবর্ষে একদিন জনপ্রিয় (popular) হইতে পারিয়াছিলেন, ইহা যেমন ঐতিহাসিক সত্য, সেইরূপ তাঁহাদের জনপ্রিয়তা যে প্রায়শঃ অতীতের গল্পের কথা হইয়া পড়িয়াছে, তাহাও বাস্তব সত্য।

"সাহেব ভূত"দিগের সঙ্গে মেলামেশা না করিতে পারিলে জীবনের উন্নতি হয় না, মহারাণীর রাজত্ব মগের মুল্লুক নহে, এতাদৃশ কথা প্রায়ই জনসাধারণের মধ্যে একদিন শোনা যাইত। তখন এ দেশের মানুষের কাছে যদি সাহেবগণ প্রিয় না হইতেন, তাহা হইলে "সাহেব ভূত" (অর্থাৎ সাহেবগণ মঙ্গলময়), এতাদৃশ কথা জনপ্রবাদের মত প্রচলিত হইতে পারিত না।

আজকাল ঐ সাহেবগণ যে ভারতবর্ষে প্রায়শঃ অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলে দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবগণ যদি প্রায়শঃ জনসাধারণের অপ্রিয় না হইতেন তাহা হইলে যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধী, তাঁহারা প্রায়শঃ জয়ী, আর যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের সমর্থনকারী, তাঁহারা প্রায়শঃ পরাজিত হইতেন না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণ সাধারণতঃ ইংরাজগণকে ভারতের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া বিবেচনা করে এবং "গবর্ণমেণ্ট" বলিতে প্রায়শঃ তাহারা ইংরাজ জাতিকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

যে ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে একদিন এতাদৃশ জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন সেই ইংরাজ জাতির জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা তাঁহারাও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং উহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়াই যে জনপ্রিয় হইবার জন্য নানাবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

যাঁহারা একদিন এত জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁহাদিগের উপর জনসাধারণের বিদ্বেষ এত বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে, জনসাধারণের সহিত তাঁহাদের প্রধান সম্বন্ধ কোথায়, তাহা সন্ধান করিবার প্রয়োজন হয়।

জনসাধারণ যে প্রায়শঃ ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট বলিতে ইংরাজ জাতিকেই পরোক্ষভাবে বুঝিয়া থাকে, তাহার সত্যতা মানিয়া লইলে ইংরাজ জাতির সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ কি লইয়া, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে জনসাধারণের সহিত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ কোথায়, তাহা সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

জনসাধারণের সহিত গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ যে প্রধানতঃ কি লইয়া, তৎসম্বন্ধে আধুনিক ভাবুকগণের মধ্যে অনেক মতপার্থক্য আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, দেশের একমাত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিলেই ঐ দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য সাধিত হইতেছে, ইহা বুঝিতে হইবে—আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, যাহাতে দেশের প্রত্যেকে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে মুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য। ইঁহাদিগের মতে জনসাধারণের কেহ একক ভাবে তাঁহাদিগের সমস্ত প্রয়োজন নির্বাহ করিতে সক্ষম হন না এবং একক ভাবে তাঁহাদের সমস্ত প্রয়োজন নির্বাহ করিতে সক্ষম হন না বলিয়া তাঁহাদের একটি সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঐ সঙ্ঘবদ্ধ জীবনকে কখনও গবর্ণমেণ্ট, কখনও সমাজ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। জনসাধারণ অর্থাভাব, স্বাস্থ্য ও শান্তির অভাব হইতে যাহাতে মুক্ত হয়, তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা সম্পাদিত না করিতে পারিলে, সময় সময় বাহ্যতঃ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণের মনের মধ্যে যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বীজ রোপিত হয়, তাহা কখনও বিনষ্ট হয় না।

কাজেই উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাবুকদিগের মতে যাহাতে দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব তিরোহিত হয়, তাহা করাই গবর্ণমেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ কর্ত্তব্য নির্বাহ করিবার জন্য সময় সময় বাহ্যিক শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার দিকে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইবার আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে নির্বাহ না করা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যে তাঁহার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, ইহা কোন ক্রমেই বলা চলে না।

উপরোক্ত ভাবে দেখিলে গবর্ণমেণ্টের সহিত দেশের জনসাধারণের সম্বন্ধ কোথায়, তাহা লইয়া মত-বাদের অল্পাধিক বিভিন্নতা বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু কি কি উদ্দেশ্য লইয়া কি পদ্ধতিতে দেশ শাসিত হইলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে, তাহা স্থির করার দায়িত্ব

এবং দেশ যাহাতে উপরোক্ত উদ্দেশ্য লইয়া উপরোক্ত পদ্ধতিতে শাসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব যে গবর্ণমেণ্টের, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

কি কি উদ্দেশ্য লইয়া কি পদ্ধতিতে দেশ শাসিত হইলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকিতে পারে, তাহা স্থির করার নাম "শাসন-নীতি" (principles and objects of administration) স্থির করা।

দেশ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে শাসন-নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া শাসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করার নাম "শাসন-কার্য্য" (execution of administration) পরিচালনা করা।

কাজেই বলিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্টের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ প্রধানতঃ শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য লইয়া এবং যখন দেখা যায় যে, কোন গবর্ণমেণ্ট জনপ্রিয় হইতে পারিয়াছে ও ঐ জন-প্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য সময়োপযোগী হইয়াছে; যখন দেখা যাইবে যে, গবর্ণমেণ্ট জনপ্রিয় না হইয়া জনসাধারণের বিরক্তিভাজন হইয়াছে এবং ঐ বিরক্তিভাজনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে, হয় শাসন-নীতি, নতুবা শাসন-কার্য্য, অথবা উভয়ই নিন্দনীয় হইয়াছে।

এতদনুসারে যে ইংরাজ জাতি একদিন ভারতবর্ষে লোক-প্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন, সেই ইংরাজ জাতি উত্তরোত্তর জনসাধারণের বিদ্বেষভাজন কেন হইতেছেন; তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, হয় ভারতে নিন্দনীয় শাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নতুবা শাসন-কার্য্যে অনাচার ঘটিতেছে, অথবা শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য উভয়ই দুষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজের শাসন-কার্য্যে অনাচার ঘটিতেছে, অথবা নিন্দনীয় শাসন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, অথবা শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য উভয়ই দুষ্ট হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য ভারতের শাসন-কার্য্যে কোন দোষ আছে কি না, আমরা সর্ব্বপ্রথমে তাহার অনুসন্ধান করিব। শাসন-কার্য্য কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে আগেই বলিয়াছি যে, দেশ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে শাসন-নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া শাসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করার নাম শাসন-কার্য্য—(administration)।

অতএব, ভারতের শাসন-কার্য্য দোষযুক্ত অথবা দোষমুক্ত, তাহা স্থির করিতে হইলে ভারতের শাসন-নীতি কি, অর্থাৎ ভারতীয় জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিবার জন্য কোন্ কোন্ উদ্দেশ্যে, কি কি পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, প্রথমতঃ, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে

ঐ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন:—

(১) শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কার্য্য।
(২) বিচারের কার্য্য।
(৩) বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিষেধক কার্য্য।
(৪) শিক্ষার কার্য্য।
(৫) স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য।
(৬) কৃষির উন্নতির কার্য্য।
(৭) শিল্পোন্নতির কার্য্য।
(৮) বাণিজ্যবিভাগের কার্য্য, ইত্যাদি।

ইহা ছাড়া আরও জানা যাইবে যে, উপরোক্ত বিষয়ক নীতি-নির্দ্ধারণের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে বড়লাট, প্রাদেশিক লাট এবং তাঁহাদের মন্ত্রিমণ্ডলের হস্তে, ঐ ঐ বিষয়ক বিধি (অর্থাৎ আইন) প্রণয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের হস্তে, আর শাসন-কার্য্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে বিভিন্ন বিভাগীয় বিভিন্ন কর্ম্মচারিগণের হস্তে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিতে হইলে শাসন-নীতি, শাসন-বিধি ও শাসন-কার্য্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য যাহাতে বিদ্যমান থাকে, শাসন-বিধি যাহাতে শাসন-নীতির অনুরূপ হয় এবং শাসন-কার্য্য যাহাতে শাসন-বিধির অনুরূপ হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করা একান্ত আবশ্যক এবং প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট তাহা সাধারণতঃ লক্ষ্য করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শাসন-কার্য্য যদি শাসন-বিধির অনুরূপ ভাবে সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গত

ভাবে শাসন-কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের প্রতি কোন-রূপ দোষারোপ করা যায় না। কিন্তু, যদি দেখা যায় যে, শাসন-বিধির অনুরূপ ভাবে শাসন কার্য্যের পরিচালনা সত্ত্বেও শাসকগণ জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া পড়িতেছেন, তাহা হইলে শাসন বিধি ও শাসন নীতি যে দুষ্ট, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ জনসাধারণের হিতার্থে যে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন, তাহার পরিচালনার দায়িত্ব যে-সমস্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে তাঁহারা তাঁহাদের বিভিন্ন দায়িত্ব বিভিন্ন শাসন-বিধির অনুরূপ ভাবে সম্পাদিত করিতেছেন কি না, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কোন স্থানেই নিন্দনীয় কিছুই নাই তাহা বলা যায় না বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অধিকাংশ কর্ম্মচারিগণই যে তাঁহাদের শাসন কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে শাসন বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া সম্পাদিত করিতেছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ভার প্রধানতঃ যে পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, স্থানে স্থানে তাঁহাদের মধ্যে অনাচারের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ঐ অনাচারী পুলিশ কর্ম্মচারিগণ শাস্তির হাত সম্পূর্ণ ভাবে যে এড়াইতে পারিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। একে ত ঐ অনাচারী পুলিশ কর্ম্মচারিগণ যাহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হন, তাহার যেরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার উপর আবার কিছুদিন হইতে দেশের যাদৃশ অবস্থায় যেরূপ ভাবে পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া আসিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের কার্য্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। অথচ, ঐ অনিন্দনীয় পুলিশ-কর্ম্মচারিগণ যে প্রায়শঃ জনসাধারণের বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কার্য্যে পুলিশ-কর্ম্মচারিগণের প্রশংসার যোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে যেরূপ প্রায়শঃ জনসাধারণের অবজ্ঞাভাজন হইতে হয়, সেইরূপ আবার অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, বিচার-বিভাগের কার্য্যও নানারকম ভাবে প্রশংসনীয় হইলেও উহা প্রায়শঃ জনসাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনাভাজন হইয়া থাকে এবং এমন কি স্থানে স্থানে বিচারকগণ পর্য্যন্ত অযথা-ভাবে দেশের লোকের নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, শুধু পুলিশ ও বিচারক কেন, সমর-বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগ প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব আইন (অর্থাৎ শাসন-বিধির) অনুযায়ী অনিন্দিত ভাবে কার্য্য করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রায়শঃ জনসাধারণের নিন্দাভাজন হইতেছেন।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের শাসন-কার্য্যে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন দোষ আরোপ করা যায় না বটে, কিন্তু তাহার শাসন নীতি ও শাসন-বিধি যে দোষযুক্ত, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ আছে। অপর ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য-পরিচালনার ভার যে সমস্ত বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের হস্তে অর্পিত হয়, তাঁহারা প্রায়শঃ প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু ভারত-সচিব, বড়লাট, প্রাদেশিক লাট, মন্ত্রিমণ্ডল ও ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তি ও অনুষ্ঠানের হস্তে শাসন নীতি ও শাসন-বিধি-গঠনের ভার অর্পিত হইতেছে, তাঁহারা প্রায়শঃ নিজ নিজ দায়িত্ব-নির্ব্বাহের অনুপযুক্ত এবং তাঁহারা একদিকে যেরূপ ইংরাজ ও ভারতবাসী বে-সরকারী মানুষগুলির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, অন্যদিকে আবার যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্যসাধনের জন্য আত্মত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পর্য্যন্ত অযথা নিন্দাভাজন করিতেছেন।

ভারতবর্ষের আধুনিক শাসন-নীতির দুষ্টতার জন্যই যে, যে-ইংরাজ একদিন এখানে উত্তরোত্তর লোকপ্রিয় হইতে-ছিলেন, সেই ইংরাজকে ক্রমশঃ জনসাধারণের অবজ্ঞা-ভাজন হইতে হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভা-গের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিলেও প্রতীয়মান হইবে।

এতদ্ব্যতীত আমরা সর্ব্বপ্রথমে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কার্য্য-বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিব। ঐ বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিতে হইলে কেন কেন জনসাধারণের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় এবং তাহা নিবারণার্থ কি কি বিধি ও নিষেধ প্রতিপালিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, তাহার পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় কেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ চারিটি, যথা :—

(১) মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত অমিলন, দ্বন্দ্ব ও কলহ এবং এই ব্যক্তিগত অমিলনের মূলে থাকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য।

(২) মানুষে মানুষে সম্প্রদায়, ধর্ম্ম এবং জাতিগত অমিলন, দ্বন্দ্ব ও কলহ এবং এই অমিলনাদির মূলে থাকে মানুষ যে মানুষ, মানুষে মানুষে যতই পার্থক্য থাক না কেন ঐ পার্থক্যের তুলনায় সমতাই যে অধিক, তদ্বিষয়ক শিক্ষার অভাব।

(৩) চৌর্য্য, ডাকাতি, প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি। ইহার মূলে প্রধানতঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় আহার্য্য ও অন্যান্য দ্রব্যের অপ্রাচুর্য্য ও অসুলভতা বিদ্যমান থাকে।

(৪) পরস্ত্রী-উপভোগের লালসা। ইহার মূলে থাকে আত্মানুভূতির ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাব এবং পরস্ত্রী-উপভোগে যে বুদ্ধিশক্তির মলিনতা ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়া থাকে, তদ্বিষয়ক শিক্ষার অভাব।

মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়, ধর্ম্ম এবং জাতিগত অমিলন যাহাতে না হয়, মানুষের চৌর্য্য, ডাকাতি ও প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি অথবা পরস্ত্রী-উপভোগের লালসা যাহাতে না হয়, তাহা করিতে পারিলে যে দেশ হইতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ সমূলে বিনষ্ট হইতে পারে এবং অনায়াসেই গবর্ণমেণ্টের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ইহা বোধ হয় সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যে যে চারিটি কারণে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়, যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঐ চারিটি কারণের উৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার কোন ব্যবস্থা করা সম্ভবযোগ্য কি না। যদি দেখা যায় যে, যে যে কারণে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়া থাকে সেই সেই কারণের উৎপত্তি যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্ভবযোগ্য, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট অশান্তির কারণ দূর করিবার ব্যবস্থাদি অন্ততঃপক্ষে আংশিক পরিমাণেও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন কি না। যদি দেখা যায় যে, ঐ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া তো দূরের কথা, যে যে কারণে দেশের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়া থাকে, গবর্ণমেণ্টের শাসন-বিষয়ক নীতিতে ঐ ঐ কারণের প্রসার সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার নীতি যে দুষ্ট, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, যে যে চারিটি কারণে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা সমূলে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণভাবে দূর করা কখনও সম্ভবযোগ্য নহে।

জগতের গত দুইশত বৎসরের ঐতিহাসিকগণ যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও যে উপরোক্ত মতবাদেরই পরিপোষকতা সাধন করিবে, তাহাও সত্য। কিন্তু, যে ইতিহাস উপরোক্ত মতবাদের সমর্থন করিয়া থাকে, সেই, ইতিহাস যে নানাবিধ অবাস্তব কথায় পরিপূর্ণ এবং তদনুসারে উহা যে অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা যাঁহারা প্রকৃতির বিধান (Nature's Laws) যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। প্রকৃতির বিধান ও কার্য্য-কারণের সামঞ্জস্যের দিক দিয়া দেখিলে ইতিহাস যেরূপভাবে প্রতীয়মান হয় তদনুসারে বলিতে হইবে যে, আপাতদৃষ্টিতে, যে চারিটি কারণে জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়, তাহা সমূলে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণভাবে দূর করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু মানবজাতি যে একদিন উহা পারিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য এবং তাহা

পারিয়াছিল বলিয়াই মুসলমান ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের উদ্ভব হইবার আগে এমন একটি দিনের নিদর্শন অনুমান করা যায়, যখন সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে একমাত্র 'মানবধর্ম্ম' বিদ্যমান ছিল। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ একদিন মনুষ্যজাতি সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই প্রাচীন জগতে আধুনিক জগতের মত কোন ভয়াবহ আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রথম কারণ, মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত অমিলন, দ্বন্দ্ব এবং কলহ। যে যে স্থলে ব্যক্তিগত অমিলন প্রভৃতি দেখা যায়, সেই সেই স্থানে কি কারণে উহা ঘটিয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্রই উহার মূলে হয় কাম, নতুবা ক্রোধ, নতুবা লোভ, নতুবা মোহ, নতুবা মদ, নতুবা মাৎসর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত অমিলন, দ্বন্দ্ব এবং কলহের উদ্ভব না হয় তাহা করিতে হইলে যাহাতে মানুষের কাম প্রভৃতির উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। কি কি ব্যবস্থা করিলে মানুষের কাম প্রভৃতির উদ্ভবের সম্ভাবনার হ্রাস সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের প্রকৃতি কি ও মানুষের বিকৃতিই বা কি, তাহা যাহাতে মানুষ তাহার নিজের শরীরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার শিক্ষা ও ব্যবস্থা সাধিত হইলে অনায়াসেই ঐ কামাদির উপর মানুষের প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, মানুষের প্রকৃতি ও বিকৃতি কি, এবং তাহা কি করিয়া নিজের শরীরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হয় এবং কি উপায়ে বিকৃতির উদ্ভব বিদূরিত করিয়া প্রকৃতিকে প্রকট রাখিতে হয়, তাহা যেমন সংস্কৃত ভাষায় বেদে, পূর্ব্বমীমাংসায় এবং বৈশেষিক দর্শনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ আবার উহা প্রাচীন হিব্রু-ভাষায় বাইবেলে ও প্রাচীন আরবী ভাষায় কোরাণে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

কাজেই বলিতে হইবে যে, ধর্ম্মের অনুশাসন যাহাতে যথাযথভাবে মানুষ জানিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে মানুষের পক্ষে তাহার কাম ক্রোধের উপর প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে এবং তখন জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের অমিলন, দ্বন্দ্ব এবং কলহ বিদূরিত হইতে পারে।

চিন্তা করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে, মানুষের স্ব স্ব কাম ক্রোধাদির উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে হইলে একদিকে যেরূপ ধর্ম্মানুশাসন পরিজ্ঞাত হওয়া এবং তাহাতে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার যে যে মানুষের অথবা যে যে গ্রন্থের অথবা যে যে অনুষ্ঠানের সংযোগে কামাদি প্রবৃত্তির উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, সেই সেই মানুষ অথবা সেই সেই গ্রন্থ অথবা সেই সেই অনুষ্ঠান যাহাতে ব্যাপকতা লাভ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

আজকালকার ধর্ম্মযাজকগণ যে সাধারণ মানুষের তুলনায় কামাদি প্রবৃত্তির উপর প্রভুত্বশালী, তাহা প্রায়শঃ বলা যায় না বটে, কিন্তু সাড়ে বার শত বৎসর পূর্ব্বে নবী-মহম্মদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে যে মুসলমান ধর্ম্মযাজকগণের অবস্থা এবং সাড়ে সপ্তদশ শত বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরে যে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরূপ ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

উপরোক্তভাবে যাহাতে কাম-ক্রোধাদির উপর মানুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা করিতে পারিলে জনসাধারণের পরস্পরের অমিলন, দ্বন্দ্ব এবং কলহের কারণ দূরীভূত হইতে পারে বটে এবং তাহাতেই অনায়াসেই জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার সহায়তা সম্পাদিত হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতেছে না।

জনসাধারণ যাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মানুশাসন যথাযথভাবে জানিতে পারে এবং যাহাতে উহার অভ্যাসের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া তো দূরের কথা, যে সমস্ত মানুষের অথবা গ্রন্থের অথবা অনুষ্ঠানের সংসর্গে জনসাধারণের কামাদি প্রবৃত্তির উত্তেজনা সাধিত হয়, প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাহারাই প্রসিদ্ধিলাভ করিতেছে। আধুনিক কাব্য ও সাহিত্যের লেখক,

আধুনিক কাব্য ও সাহিত্যের গ্রন্থ, সিনেমা, সহ-শিক্ষা প্রভৃতি আমাদের উপরোক্ত উক্তির সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

জনসাধারণের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রধান কারণ যে ব্যক্তিগত অমিলন তাহা দূর করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে যেমন স্থানে স্থানে ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্টের মনোযোগের অভাব পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ আবার মানুষের সম্প্রদায়, ধর্ম্ম এবং জাতিগত অমিলন দূর করিতে হইলে যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তদ্বিষয়েও অযৌক্তিকতার নিদর্শনও গবর্ণমেন্টের কার্য্যে পরিলক্ষিত হইবে।

কি করিলে জনসাধারণের সম্প্রদায়, ধর্ম্ম এবং জাতিগত অমিলন দূরীভূত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষ যে মানুষ এবং মানুষে মানুষে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, ঐ পার্থক্যের তুলনায় সমতাই যে অধিক তদ্বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার অন্যদিকে যাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রদায়, ধর্ম্ম এবং জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে কঠোর শাস্তি প্রাপ্ত হন, যে সব কার্য্যে ঐ সম্প্রদায় অথবা ধর্ম্ম অথবা জাতিগত বিদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে, সেই সব কার্য্য যাহাতে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহার ব্যবস্থারও প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সমতা-বিষয়ক কোন শিক্ষার ব্যবস্থা তো দূরের কথা, যে সমস্ত সংবাদপত্র প্রতিদিন ইংরাজ-বিদ্বেষ, মুসলমান-বিদ্বেষ ও খৃষ্টান-বিদ্বেষের হলাহল ছড়াইতেছে, অথবা হিন্দু-সভা, মুসলিম লীগ, ইয়োরোপীয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে যে সমস্ত অনুষ্ঠান পরোক্ষভাবে ঐ বিদ্বেষের বীজ রোপিত করিতেছে, তাহাদিগের প্রতি যাদৃশ কঠোর দৃষ্টির প্রয়োজন, তাদৃশ কঠোর দৃষ্টি রক্ষা করা ত' দূরের কথা, গবর্ণমেন্টের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন ও কর্ম্ম-নিয়োগের পদ্ধতিদ্বারা দেশের জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম, সম্প্রদায় ও জাতিগত বিদ্বেষের বরং বৃদ্ধির সহায়তা সাধিত হইতেছে।

জনসাধারণের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ যে চৌর্য্য, ডাকাতি ও প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি তাহা যাহাতে বৃদ্ধি না পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট কি করিতেছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইবে যে, যাহাতে মানুষের চৌর্য্যাদি প্রবৃত্তির উদ্ভব না হইতে পারে, তাহা করা তো দূরের কথা, গবর্ণমেন্ট যাহা করিতেছেন, তাহাতে সময় সময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনসাধারণের মধ্যে চৌর্য্যাদি প্রবৃত্তির সহায়তা পর্য্যন্ত সাধিত হইতেছে।

কি করিলে জনসাধারণের চৌর্য্য, প্রবঞ্চনা ও ডাকাতির প্রবৃত্তি দূরীভূত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অধিকাংশ স্থলেই 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' [illegible], তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। কাজেই মানুষের চৌর্য্যাদি প্রবৃত্তি যাহাতে দূরীভূত হয়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ যাহাতে মানুষের প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুর প্রাচুর্য্য ও সুলভতা সম্পাদিত হয়, তাহা করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে, অন্যদিকে আবার যাহারা যেকোনরূপ ভাবে চৌর্য্য, দস্যুতা, প্রবঞ্চনাদি কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহারা যাহাতে শাস্তিপ্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যসমাজের অবজ্ঞাভাজন হন, তাহার ব্যবস্থাও নিতান্ত আবশ্যক হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে গবর্ণমেন্ট এতদ্বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে -

প্রথমতঃ, যাহাতে মানুষের প্রত্যেক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তু সমগ্র মনুষ্যসংখ্যার প্রয়োজনানুরূপ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, কোন্ ব্যবস্থায় যে ঐ প্রচুর উৎপত্তি সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার গবেষণা পর্য্যন্ত করিবার কোন প্রয়োজন যে গবর্ণমেন্ট অন্তরঙ্গে মনে মনে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য যাহাতে সুলভ হয়, তাহার আয়োজন করা তো দূরের কথা, ভ্রান্ত অর্থনীতির বশবর্ত্তী হইয়া ঐ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি পায়, গভর্ণমেন্ট প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিতেছেন।

তৃতীয়তঃ, চৌর্য্য, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদির কার্য্যে যাঁহারা লিপ্ত থাকেন তাঁহাদিগকে সময় সময় গবর্ণমেণ্ট শাস্তি প্রদান করেন বটে এবং ঐ শাস্তির ফলে উঁহারা সমাজের অবজ্ঞাভাজনও হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীর সাজা দেওয়া, অথবা তাহারা যাহাতে সমাজের অবজ্ঞাভাজন হয়, তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় মনে করেন না। আদালতের এক শ্রেণীর ব্যবহারজীবিগণ আমাদের উপরোক্ত উক্তির উদাহরণ। যে ব্যবহারজীবিগণ নরহন্তার অথবা প্রবঞ্চকের অথবা দায়গ্রস্ত অধমর্ণের পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মিথ্যার সহায়তা লইয়া থাকেন, তাহা অস্বীকার করা যায় কি ? অথচ, তাঁহাদের শাস্তির ব্যবস্থা থাকা তো দূরের কথা তাঁহারা একটি সম্মানজনক ব্যবসায়ের (dignified profession) সভ্য বলিয়া যাহাতে সমাজে আদরপ্রাপ্ত হন, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে

জনসাধারণের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার চতুর্থ কারণ যে, পরস্ত্রী-উপভোগের লালসা, তৎসম্বন্ধেও ভাবুকগণ যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারিবেন না।

কি করিলে মানুষ পরস্ত্রী-উপভোগের লালসা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ যাহাতে আত্মানুভূতি ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের স্পৃহা ব্যাপক ভাবে জাগ্রত হয়, তাহার আয়োজনের প্রয়োজন হইয়া থাকে, অন্যদিকে আবার যাহারা পরস্ত্রী-উপভোগের লালসায় মত্ত হন, তাঁহারা যাহাতে সমাজে সর্ব্বতোভাবে অবজ্ঞার পাত্র হন তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে কি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে আত্মানুভূতি ও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের স্পৃহা ব্যাপকভাবে জাগ্রত হয়, তাহার আয়োজন করা তো দূরের কথা, যাঁহারা পরস্ত্রী-উপভোগের লালসায় মত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সমাজের অবজ্ঞাভাজন হন, তাহার ব্যবস্থাও সময় সময় সম্পাদিত হয় না। পরন্তু, পরস্ত্রী-উপভোগের জন্য যাঁহারা প্রকাশ্য আদালতে দণ্ডিত হইয়াছেন, অথবা যাঁহাদের ঐ বিষয়ে চরিত্র সম্বন্ধে বিচারক পর্য্যন্ত কটাক্ষ করিবার প্রয়োজনানুভব করিয়াছেন, তাঁহারাও সময় সময় সম্মানযোগ্য পদে অধিরূঢ় হইতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

উপরে, জনসাধারণের শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার কারাবিভাগের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা ও তদ্বিষয়ক গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা যাহা বলা হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে, ঐবিষয়ক গবর্ণমেণ্টের নীতি যে সম্পূর্ণ দুষ্ট, তাহা অস্বীকার করা যায় কি ?

শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার কার্য্যে যেরূপ গবর্ণমেণ্টের নীতির ভ্রমাত্মকতা পরিদৃষ্ট হয়, বিশদভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগীয় শাসন-নীতিও সর্ব্বতোভাবে ভ্রমে পরিপূর্ণ।

ঐ ঐ বিভাগের শাসন-নীতিও যে ভ্রমে পরিপূর্ণ, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা ভবিষ্যতে প্রমাণিত করিব

গবর্ণমেণ্ট শুধু যে ভূতপূর্ব্ব সংগঠনের আমলেই ভ্রান্ত নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছেন তাহা নহে, বর্ত্তমান ১৯৩৫ সালের সংগঠনের আমলেও যে নীতি অবলম্বিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়, তাহাতেও একদিকে যেরূপ জনসাধারণের আর্থিক অভাব, শারীরিক অথবা মানসিক অশান্তি অপনয়ন করিবার কোন সহায়তা করা তো দূরের কথা, প্রত্যেক অভাবটি বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যায়, অন্যদিকে আবার উহাতে যে ইংরাজগণের প্রতি ভারতবাসীর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইবে তাহাও আশঙ্কা করিবার কারণ আছে।

ইংরাজ জাতি এতাবৎ ভারতবর্ষের জন্য যাহা করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রতি ভারতবাসিগণের অকৃত্রিম ভাবে কৃতজ্ঞতা পোষণ করিবার কারণ আছে বলিয়া আমাদের অভিমত। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে তাহার আগত দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করা একমাত্র ভারতবাসী ও ইংরাজগণের অকৃত্রিম মিলনের দ্বারা সম্ভবযোগ্য।

অন্যদিকে ভারতবাসী ও ইংরাজগণের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্বের উদ্ভব হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতি যে অধিকতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

কয়েকজন ইংরাজ রাজপুরুষের কাপুরুষতার জন্য কয়েকটি চরিত্রহীন ভারতবাসী মানুষ ভারতবর্ষে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের শাসনকার্য্যে স্থান পাইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকে যে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিতে চলিয়াছেন, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা ভবিষ্যতে প্রতিপন্ন করিব।

যাহাতে সমগ্র ভারতবাসীর প্রত্যেক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য দেশীয় উৎপন্নের দ্বারা সাধিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিবার ইচ্ছা সম্পূর্ণ জাগ্রত রাখিয়া বড়লাট ও লাটগণকে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে সমগ্র ভারতবাসীর প্রত্যেক আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য সাধিত হয়, এবং যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট [illegible] বর্দ্ধিত হয় তাহা করিতে পারিলে, তবে যাহার কথা [illegible] ভারতবর্ষের সমগ্র মনুষ্য সমাজে যে বিপদের আশঙ্কা আছে, সে আশঙ্কা দূরীভূত করা সম্ভব হইবে।

[illegible] পারিবে?

গবর্ণমেন্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতার দৃষ্টান্ত (১)

প্রধানতঃ শাসন-নীতি এবং শাসন কার্য্য লইয়া যে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ, তাহা আমরা শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ঐ প্রবন্ধে আরও দেখান হইয়াছে যে, নানাবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষে রাজকর্ম্মচারিগণ সময় সময় জন-সাধারণের অপ্রিয় হইয়া থাকেন, তাহার জন্য গবর্ণমেন্টের শাসন কার্য্যকে দায়ী করা যায় না। শাসন-কার্য্যের বিবিধ বিভাগের রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য প্রতিপালন-সত্ত্বেও তাঁহারা যে সময় সময় জন-সাধারণের অপ্রিয় হইতে বাধ্য হন, তাহার প্রধান কারণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতা।

ভারতবর্ষের আধুনিক শাসন-নীতির দুষ্টতার জন্য যে, যে-ইংরাজ একদিন এখানে উত্তরোত্তর লোকপ্রিয় হইতে ছিলেন, সেই ইংরাজকে ক্রমশঃ জন-সাধারণের অবজ্ঞাভাজন হইতে হইতেছে, এবং তাহা যে গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিলে প্রতীয়মান হইতে পারে, ইহাও আমরা গত সপ্তাহে দেখাইয়াছি।

গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিলে যেরূপ উহার দুষ্টতা প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার যাঁহারা গবর্ণমেন্টের নীতি-সংগঠনের জন্য দায়ী, তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্য-পরিকল্পনা পরীক্ষা করিলেও যে গবর্ণমেন্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, ইহা দেখান আমাদের বর্ত্তমান সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে গবর্ণমেন্টের শাসন নীতির দুষ্টতার জন্য রাজপুরুষগণকে প্রায়শঃ জন সাধারণের অপ্রিয় হইতে হয়, যদিও ঐ শাসন নীতির দুষ্টতাই পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব উদ্ভব করিতেছে এবং ঐ শাসন নীতির দুষ্টতার দায়িত্ব যাঁহারা উহার সংগঠনের কর্ত্তা, সাধারণতঃ সেই প্রধান রাজপুরুষগণের স্কন্ধে আরোপিত করিতে হয়, তথাপি তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শাসন-নীতির দুষ্টতার প্রধান কারণ, বর্ত্তমান মানব সমাজের বিকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

দুষ্ট শাসন-নীতি একমাত্র ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, অথবা জগতের অন্যান্য দেশের গবর্ণমেন্টের শাসন নীতিতেও দুষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, ভারতবর্ষের রাজপুরুষগণই একমাত্র জন সাধারণের অপ্রিয়, অথবা জগতের অন্য কোন দেশের রাজপুরুষগণও ঐরূপ ভাবে অপ্রিয় হইয়া থাকেন, ভারতবর্ষেই জনসাধারণের মধ্যে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব বিদ্যমান আছে, অথবা জগতের অন্যত্রও জনসাধারণের মধ্যে ঐ অর্থাভাবাদি পরিদৃষ্ট হয়, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, শুধু ভারতবর্ষে নহে, জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই শাসন-নীতিতে বরং অধিকতর দুষ্টতা, রাজপুরুষগণের প্রতি জনসাধারণের অত্যধিক বিদ্বেষ, জনসাধারণের অবস্থায় অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইবে।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের শাসন নীতিসংগঠনের কর্ত্তা, একমাত্র সেই রাজপুরুষগণেরই কোন কটবুদ্ধি যদি ঐ দুষ্ট-শাসন-নীতির জন্ত দায়ী হইত, তাহা হইলে জগতের প্রত্যেক দেশেই একই শ্রেণীর ভ্রমাত্মক শাসন নীতির প্রবর্ত্তন পরিদৃষ্ট হইত না।

দেশের শাসন নীতি কিরূপ হইলে জনসাধারণের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যাদৃশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞান এখন আর মানব-সমাজে বিদ্যমান নাই বলিয়া একদিকে যেরূপ প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতিতে দুষ্টতা পরিলক্ষিত হইবে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আন্দোলন চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নীতিতেও নানাবিধ ভ্রমাত্মকতার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। এইরূপ ভাবে দেখা যাইবে যে, ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুষ্টতার জন্তই জগতের সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্ববিধ নেতৃবর্গের প্রায় সমস্ত কার্য্য-নীতিতে দুষ্টতা সংক্রামিত হইয়াছে এবং সকল দেশেই একদিকে যেমন জনসাধারণের আর্থিক অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এবং শান্তির অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ আবার যদিও প্রত্যেক দেশেই চাকুরীজীবী পরমুখাপেক্ষী মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে এবং প্রত্যেক দেশেই অন্নের জন্ত পরামুখাপেক্ষিতাও সংক্রামক হইয়া পড়িতেছে, তথাপি যুবকবৃন্দের মধ্যে একটা ভুয়া স্বাধীনতার হৈচৈ-এরও বৃদ্ধি সংঘটিত হইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিলে যেরূপ উহার দুষ্টতা প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নীতি-সংগঠনের জন্ত দায়ী, তাঁহাদের উক্তি ও কার্য্য-পরিকল্পনা পরীক্ষা করিলেও যে গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নীতি-সংগঠনের জন্ত দায়ী, তাঁহাদের কে কোথায় কি বলিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্তে আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে ভারত-সচিব, অথবা ভারতের বড়লাট, প্রাদেশিক লাটগণ এবং তাঁহাদের মন্ত্রিমণ্ডল যে সমস্ত বক্তৃতা অথবা মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিব :—

(১) অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কনসারভেটিভ এসোসিয়েশন-(Oxford University Conservative Association)-এ ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডের ১১ই জুন তারিখের বক্তৃতা। যে যে প্রদেশে কংগ্রেসপন্থিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, সেই সেই প্রদেশে তাঁহারা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রতিশ্রুতির দাবী না করিয়া এখনও মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে সম্মত হন, তাহার প্রযত্ন করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্ত বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে।

(২) ম্যাকক্লাসকিগঞ্জে বিহারের প্রাদেশিক গবর্ণর স্যর মরিস হ্যালেটের বক্তৃতা (১৩ই জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত)। কেবল মাত্র চাকুরীর জন্ত চেষ্টা না করিয়া, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ যাহাতে কৃষিজীবী হইবার চেষ্টা করেন, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণের সাহায্যার্থে যাহাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট তৎপর হন, তাহার চেষ্টা করাই স্যর মরিস্ হ্যালেটের এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

(৩) ১৪ই জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত দার্জ্জিলিং-এ বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মিঃ হকের বক্তৃতা। সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের জন্ত সাধারণতঃ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের উপর যে দায়িত্ব আরোপিত হইয়া থাকে, তাহা যে যথাযথ নহে, পরন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ যে জনসাধারণের মিলনের চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং সংস্কৃত নূতন আইনানুসারে যে রাজ্য-পরিচালনার অনেক বিষয়ের ভার এ্যাসেম্ব্লি-সমূহের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহা প্রচার করা এই বক্তৃতার উদ্দেশ্ত।

(৪) ১৪ই জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাঁচী মুসলমান এ্যাসোসিয়েশনের সভায় বিহারের প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা। গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণ যে হিন্দু-মুসলমানগণকে সমান ভাবে দেখিয়া থাকেন

এবং ধর্ম্ম ও জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগের যে উহাই করা উচিত, তাহা প্রচার করাই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

(৫) ১৫ই জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিহারের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি। যে যে প্রদেশে কংগ্রেসপন্থিগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিয়াও মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেই সেই প্রদেশের গবর্ণরগণ যে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা যে অস্থায়ী এবং তাহা যে যে-কোন মুহূর্ত্তে স্থগিত হইতে পারে তাহা প্রচার করাই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

(৬) ১৫ই এবং ১৬ই জুনের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় মি. ল্যান্সবারী ও লর্ড ষ্ট্যানলীর বাদানুবাদ। কংগ্রেসের দাবীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন মানুষ যে এমন কি পার্লামেণ্টের সভ্য বৃটিশ জাতির মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান আছে, তাহা প্রচার করা প্রধানতঃ মিঃ ল্যান্সবারীর উক্তিসমূহের উদ্দেশ্য। আর, বৃটিশ মন্ত্রিসমাজ যে সর্ব্বদাই ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষ যাহাতে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে তাহার জন্য আগ্রহান্বিত, তাহা প্রচার করাই লর্ড ষ্ট্যানলির প্রত্যুত্তরসমূহের উদ্দেশ্য।

(৭) ১৬ই জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাঙ্গালার অন্যতম মন্ত্রী ঢাকার নবাবের বিবৃতি। সংস্কৃত আইনের আমলে দেশের শাসন-ব্যাপার ও অন্ন-সমস্যাসমূহের সমাধানের সংগঠন-কার্য্য যে প্রকৃতপক্ষে দেশীয় মন্ত্রিগণের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং দেশীয় মন্ত্রিগণ যে এতাদৃশ স্বায়ত্ত শাসনের সহায়তায় স্বাধীন দেশসমূহের মত দেশীয় জনসাধারণের প্রকৃত প্রিয় (popular) কার্য্যগুলিতে হস্তক্ষেপ করিতে চলিয়াছেন, প্রধানতঃ তাহা প্রচার করাই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় গবেষণা (research), বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্যের (subsidy) যোগাড় করা, কুটীর শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য ছোট ছোট শিল্পে গবর্ণমেণ্টের সর্ব্ববিধ উৎসাহদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে মন্ত্রিমণ্ডল সজাগ তাহা প্রচার করাও এই বিবৃতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৮) আসামের [illegible] উক্তি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের অর্থসচিবদ্বয়ের বিবৃতি। নূতন শাসন প্রবর্ত্তনের নৈপুণ্য, বিষয়াদির বণ্টন প্রভৃতি প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির স্বাতন্ত্র্যের ফলে যে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের অশান্তি দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে এবং একারণ প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলের কোন রকম সংঘর্ষের হেতু যে [illegible] জন্য সম্পূর্ণ বিফল না হইতে পারে, তাহা প্রচার করাই এই বিবৃতিদ্বয়ের উদ্দেশ্য।

(৯) ১৯শে জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত বগুড়ায় বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মি. ফজলুল হকের বক্তৃতা। নূতন আইনের ফলে দেশবাসিগণ যে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারিয়াছে এবং যে যে বিষয়ে দেশের কৃষক-সম্প্রদায় এতাবৎ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহার প্রতীকার হওয়ার সম্ভাবনা যে আছে, ইহা প্রচার করাই এই বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। যাহারা কৃষক প্রজাগণের প্রতিনিধিরূপে এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মতে বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দূরীভূত হইলে, সম্ভব হইলে জমিদারগণের স্বত্ব তিরোহিত করিতে পারিলে, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইলে কৃষকগণের দুর্দ্দশা তিরোহিত হইতে পারে। মন্ত্রিগণেরও যে অল্পাধিক পরিমাণে ঐ বিশ্বাস আছে এবং তাঁহারাও যে বিশ্বাসানুসারে সাধ্যমত কার্য্য করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাও এই সভায় প্রচারিত হইয়াছে।

(১০) ২০শে জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত বগুড়ায় বাঙ্গালার অর্থসচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের বক্তৃতা। নূতন শাসন-নীতির ফলে দেশবাসী যে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে পারি

যাছে এবং তাহাতে যে দরিদ্র জনসাধারণের অর্থ সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, ইহা প্রচার করাই এই বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া সমাজতন্ত্রবাদের অযৌক্তিকতা এবং বর্তমান কংগ্রেস নীতির অসামঞ্জস্য প্রধানতঃ কোথায়, তাহাও এই বক্তৃতায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

(১১) ২২শে জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত বড়লাট সাহেবের বিবৃতি। ভারতবর্ষে যে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন সর্বতোভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ঐ স্বায়ত্ত শাসনের দ্বারা যে দেশের জন সাধারণের সর্ববিধ সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব, তাহা প্রতিপন্ন করাই এই বিবৃতির প্রধান উদ্দেশ্য।

(১২) ২৫শে জুন তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রচারিত মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি। বড়লাটের বিবৃতি যে সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং কেবলমাত্র কংগ্রেসপন্থিগণের হঠকারিতার জন্যই যে ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের সুফল হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, ইহা প্রচার করাই এই বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত দ্বাদশটি বক্তৃতা ও বিবৃতি একসঙ্গে অধ্যয়ন করিলে গবর্ণমেণ্টের বর্তমান কার্য্যনীতি সম্বন্ধে যাহা যাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনানুসারে যে ব্রিটিশগণ ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিয়াছেন তাহা যাহাতে ভারতবাসী জনসাধারণ পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করা।

(২) ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনানুসারে ব্রিটিশগণ ভারতবাসীদিগকে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিয়াছেন বটে এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষে দরিদ্র জনসাধারণের সর্ব্ববিধ সমস্যা সমাধান করাও সম্ভবযোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু এক কংগ্রেসপন্থিগণের দুর্নীতির ফলেই যে দেশবাসিগণের ঐ স্বায়ত্ত শাসনের সুফল হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহা যাহাতে ভারতবাসিগণ জানিতে পারে, তাহার প্রচারের চেষ্টা।

(৩) এতদিন যে সমস্ত প্রদেশের বাজেটে ঘাট্‌তি পড়িয়া আসিতেছিল, সেই সমস্ত প্রদেশে যে উদ্বৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা দেখাইয়া নূতন শাসনতন্ত্র যে দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলপ্রদ হইয়াছে, তাহা প্রমাণিত করা এবং এখন আর যে কোন সংগঠন-পরিকল্পনা অর্থাভাব-প্রযুক্ত বিফল না-ও হইতে পারে, তাহা প্রচার করা।

(৪) কোন কোন গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের মতে দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার উপায় প্রধানতঃ শিল্পোন্নতি সাধিত করা এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে, দেশের জনসাধারণও ঐ মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন। কাজেই ঐ গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা দেশের মধ্যে বিবিধ শিল্পোন্নতি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা প্রচারিত হইলেই উঁহারা জনপ্রিয় হইতে পারিবেন। এতদুদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট যে শিল্পোন্নতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবারাছেন, তাহা প্রচারের চেষ্টা।

(৫) বাঙ্গালা দেশের এক সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দূরীভূত হইলে, জমীদারগণের জমীদারী-স্বত্ব দূরীভূত হইলে, কৃষকগণের খাজনার হারের হ্রাস সাধন করিতে পারিলে, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে, গ্রামে গ্রামে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইলে, রাস্তা-ঘাটের উন্নতি ও প্রসার সাধিত হইলে কৃষকগণের দুর্দ্দশা তিরোহিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের কোন কোন কর্ম্মচারী মনে করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা প্রচার করিতে পারিলেই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লোকপ্রিয় হওয়া সম্ভব হয়। এই মনোবৃত্তি অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যে উপরোক্ত ব্যবস্থাসমূহে হস্তক্ষেপ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে চলিয়াছেন, তাহা প্রচারের চেষ্টা।

(৬) গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগাইতেছেন বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে কেহ কেহ যে আন্দোলন চালাইয়া থাকেন, উহা যে ভিত্তিহীন, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণের হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমদর্শিতা-প্রচারের চেষ্টা।

ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত ছয়টি কার্য্যনীতিকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষে জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যাহা পাইলে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা, তাহাই যে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহা প্রচার করিয়া গবর্ণমেণ্ট জন-প্রিয় হইবার জন্য প্রবৃত্তিশীল হইয়াছেন।

যাহা পাইলে জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা, তাহা বাস্তবিক পক্ষে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাঙ্গঃকরণে জনসাধারণকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, অথবা ঐ সমস্ত ব্যবস্থা করিবার একটা কৃত্রিম অভিনয়ে মাত্র হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমাদের আলোচ্য নহে।

যে যে ব্যবস্থায় জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা, সেই সেই ব্যবস্থা বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের কাম্য কি না, অথবা ঐ ঐ ব্যবস্থা সংঘটিত হইলে জনসাধারণের প্রকৃত কোন হিত সংঘটিত হইতে পারে কি না কেবলমাত্র তাহার আলোচনায় আমরা হস্তক্ষেপ করিব।

যদি দেখা যায় যে, যে যে ব্যবস্থায় জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা, ঐ ঐ ব্যবস্থাই বাস্তবিক পক্ষে জনসাধারণের অধিকাংশের কাম্য এবং উহা সংঘটিত হইলে, জনসাধারণের অনেকেরই দুঃখদারিদ্র্য দূর হইবে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যে নির্ভুল রাস্তায় চলিতেছেন এবং ঐ ঐ কার্য্যের ফলে গবর্ণমেণ্টের জনপ্রিয়তা (popularity) যে বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতেই হইবে

অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে, যে যে ব্যবস্থায় জনসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারে বলিয়া রাজপুরুষগণের ধারণা, ঐ ঐ ব্যবস্থা একদিকে যেরূপ অধিকাংশ মানুষের কাম্য নহে, অন্য দিকে আবার ঐ ঐ ব্যবস্থায় অধিকাংশ মানুষের কোনরূপ হিত হওয়া তো দূরের কথা, উহা দ্বারা অনেকেরই অহিত সংঘটিত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-নীতি যে দোষযুক্ত এবং তাহার ফলে গবর্ণমেণ্টের লোকপ্রিয় হওয়া তো দূরের কথা, প্রায়শঃ জনসাধারণের অধিকতর বিদ্বেষ-ভাজন হইতে হইবে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্য নীতি সম্বন্ধে যে ছয়টি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমরা উপরে দেখাইয়াছি, তাহার পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও রাজপুরুষগণ মনে করেন যে, উহা জনসাধারণের অনেকেরই কাম্য এবং ঐ ঐ ব্যবস্থাসমূহের দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধিত হইতে পারে, তথাপি প্রকৃত পক্ষে উহা প্রায়শঃ একদিকে যেরূপ জনসাধারণের অধিকাংশেরই কাম্য নহে, অন্যদিকে আবার উহা প্রায়শঃ অনেকেরই অহিতকারী।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় স্বায়ত্তশাসন অথবা স্বাধীনতা জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে, অথবা অমঙ্গলজনক হইবে, উহা ভারতবাসী মোট জনসংখ্যার অধিকাংশের (majority-র) কাম্য, অথবা অল্পাংশের (minority র) কাম্য, তৎসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে-স্বায়ত্তশাসন ১৯৩৫ সালের সংশোধিত আইনানুসারে ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে, অথবা স্বাধীনতা নামক যে 'সোনার পাথরের বাটি' গান্ধীজী এণ্ড কোম্পানী চাহিয়া থাকেন, তাহার কোনটিই ভারতবাসী জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে কিছুমাত্র মঙ্গলজনক নহে এবং ভারতবাসী মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই ঐ সম্বন্ধে উদাসীন।

কোন দেশের শাসন কাহার দ্বারা পরিচালিত হইলে দেশের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলজনক হইতে পারে, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে 'দেশের মানুষ,' যাঁহারা 'মানুষ' ও 'মনুষ্যত্ব'কে খুঁটিনাটি করিয়া বুঝিবার জন্য এবং প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব' লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রযত্নশীল, যাঁহারা মানুষকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা বাঙ্গালী, বেহারী, ভারতবাসী, ইংরেজ বলিয়া দেখিতে অসম্মত হইয়া সর্ব্বদা মানুষকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, যাঁহারা নিজের জীবিকার জন্য ভিক্ষার দ্বারা হউক, অথবা প্রতিগ্রহের দ্বারা (অর্থাৎ গুরুকে যে উপহার দেওয়া হয় তাদৃশ উপহার দ্বারা) হউক, অথবা ঋণের দ্বারা হউক অথবা পিতা প্রভৃতি অপর কাহারও উপার্জ্জনের

দ্বারা হউক, কোন রকমে অপরের প্রতি বিন্দুমাত্রও নির্ভরশীল না হইয়া সম্পূর্ণভাবে স্বোপার্জ্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, যাঁহারা স্ব স্ব রাগ ও দ্বেষকে সম্পূর্ণভাবে স্বীয় প্রভুত্বাধীন রাখিয়া সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য সম্যক্ ভাবে নির্ব্বাচন করিতে শিখিয়াছেন, এবংবিধ মানুষ যখন কোন দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন সেই দেশে কাহারও কোনরূপ দুঃখ থাকা সম্ভব নহে।

শাসন-কর্ত্তারূপে যাদৃশ মানুষের চিত্র আমরা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাদৃশ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে আকাশ-কুসুমবৎ অপ্রাপ্য বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ যখন বর্ত্তমান ঐতিহাসিকের অলিখিত কালের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইবার সুযোগ পাইবে, তখন দেখিতে পাইবে যে, জগতের প্রত্যেক দেশে একদিন ঐরূপ মানুষ বিরাজিত ছিল এবং প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণ সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল।

যখন কোন দেশে উপরোক্ত গুণসম্পন্ন মানুষ পাওয়া অসম্ভব হয়, তখন বরং অন্য দেশে ঐরূপ খাঁটি মানুষ বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার দ্বারা যাহাতে দেশ শাসিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তথাপি দেশের কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিশ্লেষণ-প্রযত্নহীন, অনুকরণ-প্রয়াসী, ঋণ-গ্রহণে অকুণ্ঠিত, জীবিকার জন্য পরমুখাপেক্ষী এবং রাগ-দ্বেষযুক্ত মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত মানুষের দ্বারা দেশের শাসন-ব্যবস্থা হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। যিনি কোন দেশে খাঁটিভাবে ঐ ঐ দেশের মানুষ হইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অনুকরণ-প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্বাধীন ভাবে চিন্তায় নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইতে হয় এবং উত্তরোত্তর তাঁহার বুদ্ধি ঔজ্জ্বল্য লাভ করে। যিনি প্রকৃত বুদ্ধির সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণভাবে লাভ করিতে সক্ষম হন তাঁহার দ্বারা কোন মানুষের কোনরূপ অনিষ্ট সাধিত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ তিনি বুঝিতে পারেন যে, কোন মানুষকে সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে হইলে প্রত্যেক মানুষ যাহাতে দুঃখ-মুক্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

অন্যদিকে যাঁহারা কোন বস্তু অথবা ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে আমূল বিশ্লেষণ করিতে অক্ষম, অনুকরণ-প্রিয়তায় যাহারা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তাঁহাদের বুদ্ধির পরিমার্জ্জনা কখনও সম্ভব হয় না। তাঁহারা একম-বেরকমের ভাষায় অভ্যস্ত হইয়া নিজদিগকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধি যে কি বস্তু, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে অন্ধকারে নিমগ্ন থাকেন। এতাদৃশ মানুষের দ্বারা অপর কোন মানুষেরউপকার হওয়া তো দূরের কথা, ইঁহারা নিজদিগকেই সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষিতার হাত হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হইতে পারেন না।

উপরোক্তভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, স্বায়ত্ত-শাসন সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় কামনার যোগ্য বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বাবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে হিতজনক নহে। অধিকন্তু, কোন পরাধীন দেশ যাহাতে স্বায়ত্তশাসনশীল হইতে পারে, তাহার আয়োজন করিতে হইলে দেশের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ-পরায়ণতার উদ্ভব হইয়া অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তা যাহাতে সম্যক্ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। যাহাতে দেশের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বিশ্লেষণ-পরায়ণতার উদ্ভব হইয়া অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তার বিলুপ্তি সাধিত হয়, তাহা করিতে হইলে স্বাধীন চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত কাল, পাত্র এবং অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। যে পরাধীন দেশ এতাদৃশ স্বাধীন চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত কাল, পাত্র এবং অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাটুকু পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে সম্যক্ ভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার প্রয়াস একটি প্রহসন-মাত্র।

পাঠক, ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক উপযুক্ততা লাভ করিয়াছে কি না, তাহা আপনারা এক্ষণে চিন্তা করিয়া দেখুন। ভারতীয় যুবকবৃন্দ, তোমাদিগকে তোমাদের নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসনের জন্য উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছেন বটে, "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে" ইহা তোমাদের কবি তোমাদিগকে শুনাইয়াছেন বটে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা তোমাদিগকে শুনাইতে যাওয়া বিপজ্জনক বটে, কিন্তু প্রাণোপম ভাইগণ ও প্রাণাধিক সন্তানগণ, একবার ভাবিয়া দেখ, স্বদেশে স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে হইলে খাঁটী "স্বদেশী" মানুষের প্রয়োজন আছে কি না এবং ভারতবর্ষে আজকাল কোন খাঁটী "স্বদেশী" মানুষ পাওয়া যায় কি না।

সন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, গান্ধীজী অথবা জওহরলালজী, যাঁহারা কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাঁহারা কেহই বিশ্লেষণ-ক্ষম খাঁটী "স্বদেশী" মানুষ নহেন। ইঁহারা মুখে দেশের কথা কহিয়া থাকেন বটে, ভারতবর্ষে ইঁহারা জন্মও লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের ভাবনৈপুণ্য সম্পূর্ণ বিদেশী অনুকরণে প্রস্তুত হইয়াছে। দেশীয় মাতার গর্ভে এবং বিদেশী পিতার ঔরসে, অথবা বিদেশীয় মাতার গর্ভে এবং দেশীয় পিতার ঔরসে যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, সেই সন্তানকে যেরূপ কোন দেশের খাঁটী সন্তান না বলিয়া Eurasian অথবা বর্ণসঙ্কর বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ যে মানুষগুলি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতীয় ঋষির শিক্ষা-দীক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইবার চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণভাবে বিদেশ-জাত শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাদিগকে কি খাঁটী "স্বদেশী" মানুষ বলা চলে?

যখন দেখা যাইতেছে যে, ভারতের সমগ্র তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলির মধ্যে খাঁটী "স্বদেশী" মানুষ পাওয়া একরূপ অসম্ভব, তখন কি যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতে হয় না যে, এতাদৃশ সময়ে খাঁটী স্বায়ত্তশাসন অথবা তথাকথিত খাঁটী স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব?

কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার প্রাথমিক উপযোগিতা পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ লাভ করিতে পারে নাই। পরন্তু, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ভারতীয় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ এবং ভারতীয় কবি ও সাহিত্যিক, অর্থাৎ যাঁহারা ভারতীয় নেতা বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এতাদৃশ অমানুষ হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব পরভাবাপন্ন করিয়া অথবা আহার বিহার প্রভৃতিতে সর্ব্বতোভাবে পরাধীন হইয়া অবশেষের অবশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে পর্য্যন্ত ছাপাখানার সহায়তার স্বহস্তে পরভাবাপন্ন ও পরাধীন করিয়া তুলিতে চলিয়াছেন।

যে সব গুণ অথবা সক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে এক অবস্থা হইতে অন্যাবস্থায় উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়, সেই সমস্ত গুণ ও সক্ষমতা লাভ না করিতে পারিলে যেরূপ অবস্থান্তরে উন্নীত হওয়া সর্ব্বদা সম্ভব হয় না এবং উন্নয়নের চেষ্টাও সময়ে সময়ে বিপজ্জনক হইয়া থাকে, সেইরূপ ভারতবর্ষের এতাদৃশ অবস্থায় একদিকে যেরূপ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে, সেইরূপ আবার উহার চেষ্টায় সময় সময় বিশৃঙ্খলাও অবশ্যম্ভাবী। কার্য্যতঃও কি তাহাই হইতেছে না?

ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অবস্থা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে অকপটভাবে কোন মন্তব্য করিতে হইলে যেরূপ বলিতে হয় যে, ভারতবাসী এখনও যাহাতে স্বায়ত্তশাসনের প্রাথমিক উপযোগিতা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষের জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, সেইরূপ আবার উহা জনসাধারণের অধিকাংশের অথবা অল্পাংশের কাম্য হইয়াছে, এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, উহার জন্য কেবলমাত্র কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবসঙ্কর মানুষ, যাহারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের অথবা অপর কাহারও কোন রকমের নকরগিরি অথবা পিতৃপুরুষ প্রদত্ত অর্থ অথবা ভিক্ষা এবং প্রবঞ্চনা লব্ধ অর্থ না হইলে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, যাঁহারা নিজেদের সন্তান সন্ততিগণের সুশাসন পর্য্যন্ত সাধনে অক্ষম হইয়াও নিজেদের অক্ষমতা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারা লালায়িত হইয়াছেন বটে, কিন্তু যাঁহারা কোনরূপ শাসন কার্য্যের অভিজ্ঞতা এবং উপযুক্ততা লাভ করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা কাহারও নকরগিরি না করিয়াও কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা স্বায়ত্তশাসন যে প্রত্যেক দেশের উপাস্য, তদ্বিষয়ে জাগ্রত হইয়াছেন বটে, কিন্তু দেশের এতাদৃশ অবস্থায় ইংরাজ বাদ দিয়া ঐ স্বায়ত্তশাসন যে বিপজ্জনক, তাহা প্রায়শঃ স্বীকার করিয়া থাকেন।

মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষে যাঁহারা স্বায়ত্তশাসন অথবা তথাকথিত স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়। ঐ শিক্ষিত সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনজন মাত্র, বাকী ৯৭ জন ঐ সম্বন্ধে প্রায়শঃ উদাসীন। শুধু স্বায়ত্তশাসন কেন, ভারতবর্ষে ঐ ৯৭ জন এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্ববিধ বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া আসিতেছিল। কারণ, তাহারা বৎসরের মধ্যে চারি পাঁচ মাস তাহাদের মাঠে পরিশ্রম করিয়া অনায়াসে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। ঐ ৯৭ জনের প্রায় সমগ্রাংশ অন্নাভাবে জর্জ্জরিত হইতে চলিয়াছে। যে চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে দেশের মধ্যে তাহাদের অন্ন-সংস্থান যাহাতে হয়,

তাহা অনতিবিলম্বে না করিতে পারিলে তাহাদের কোন বিষয়ে ঔদাসীন্য তো দূরের কথা, তাহারা সর্ব্বগ্রাসী হইতে বাধ্য হইবে।

কাযেই যে কার্য্যনীতিতে ঐ ৯৭ জনের অন্নসংস্থানের প্রকৃত সহায়ক কোন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না, তাহাকে কোন ক্রমেই সুশাসন-নীতি বলা চলে না।

গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতার দৃষ্টান্ত (২)

যে ইংরাজ ভারতবর্ষে একদিন এতাদৃশ লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন যে, জনসাধারণের মধ্যে "সাহেব শুভ", "মহারাণীর রাজ্য মগের মলুক নহে", এবংবিধ প্রবাদবাক্যের রটনা হইতে পারিয়াছিল, সেই ইংরাজের উপর জনসাধারণের বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে আমরা "শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য" শীর্ষক প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে ইংরাজের সহিত জনসাধারণের সম্বন্ধ প্রধানতঃ শাসন-নীতি ও শাসন-কার্য্য লইয়া। ইহা ছাড়া আরও দেখান হইয়াছে যে, শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে যে বিভাগে বিভক্ত তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ প্রায়শঃ এতাদৃশ ভাবে তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগীয় দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন যে, শাসন-কার্য্যের উপর কোন দোষারোপ করা তো দূরের কথা, ভারতবর্ষে ইংরাজের শাসন-কার্য্য যে প্রায়শঃ অনিন্দিত ভাবে সাধিত হইতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। তথাপি ইংরাজের উপর জনসাধারণের বিদ্বেষ যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ, গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতির ভ্রান্তি। গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতিতে যে ভ্রান্তি আছে, তাহা একদিকে যেরূপ বিভিন্ন বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিলে প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার গবর্ণমেণ্টের যে যে কর্ম্মচারী শাসন-নীতিসংগঠনের জন্য দায়ী, তাঁহারা লোকসমক্ষে যে যে উক্তি প্রচার করিয়া থাকেন, সেই সেই উক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের যে যে কার্য্য-নীতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়, সেই সেই কার্য্য-নীতি হইতেও শাসন-নীতির ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের শাসন-নীতি পরীক্ষা করিলে যে উহার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা আমরা উপরোক্ত "শাসন-নীতি ও শাসন কার্য্য"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি।

গবর্ণমেণ্টের যে কর্ম্মচারিসমূহ শাসন-নীতিসংগঠনের জন্য দায়ী, তাঁহাদের উক্তিতে যে যে কার্য্যনীতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে মূল নীতির ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইতে পারে—ইহা দেখাইবার জন্য সম্প্রতি ভারতসচিব, বড়লাট, প্রাদেশিক লাট ও প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত বক্তৃতা হইতে কোন্ কোন্ কার্য্য-নীতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান আমরা 'গভর্ণমেণ্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতার দৃষ্টান্ত' (১)-শীর্ষক সন্দর্ভে করিয়াছি। উহাতে দেখা গিয়াছে যে, ভারতসচিব ও বড়লাট প্রভৃতি গত কিছু দিন যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহাদের নিম্নলিখিত কার্য্য-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়:—

(১) ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনানুসারে ব্রিটিশগণ যে ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা যাহাতে ভারতবাসী জন-সাধারণ পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহার প্রচার করা।

(২) একমাত্র কংগ্রেস-পন্থিগণের দুর্নীতির জন্যই যে উপরোক্ত স্বায়ত্তশাসনের সুফল হইতে ভারতবাসিগণের বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা যাহাতে ভারতবাসিগণ জানিতে পারে তাহার প্রচার করা।

(৩) উপরোক্ত স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা যে ভারতবাসিগণের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান সম্পাদিত হইতে পারে এবং

আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহ এবং কাঁচামাল উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং ঐ শ্রমজীবিগণের উপর নির্ভর করিয়া মধ্যবিত্ত ও ধনিকগণ কখনও ব্যবহারজীবী, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়ী রূপে, কখনও বণিক্ রূপে, কখনও দৈনিক সংবাদপত্রের চালক প্রভৃতি জয়ঢাক রূপে, কখনও শিল্পী রূপে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের উপরোক্ত ঐ শতকরা ৯৭ জনের অবস্থায় এতাদৃশ পরিমাণে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবের উদ্ভব হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যবহারজীবী, ডাক্তার, বণিক্ প্রভৃতি মধ্যবিত্তগণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অত্যধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই এবং যে দিন হইতে ঐ শ্রমজীবিগণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেইদিন হইতেই তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও শৃঙ্খলিত কর্ম্ম-জ্ঞানহীন এক শ্রেণীর লোক অপরিণতবয়স্ক যুবকদিগের সহায়তায় স্বায়ত্তশাসনের চেঁচামেচির প্রাবল্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাঁহারাই জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মগত, জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত বিদ্বেষানলের ছড়াছড়ি সম্পাদিত করিতেছেন।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টে ইংরাজদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিয়া কোন স্বায়ত্তশাসন অথবা তথাকথিত স্বাধীনতার প্রয়াসী হইলে, ইংরাজ ও ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐকান্তিক মিলনস্পৃহার খর্ব্বতা সাধিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কি করিলে সমস্ত ভারতবাসীর অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং যাহাতে ইংরাজ ও ভারতবাসিগণের অধিকাংশ অকৃত্রিম ভাবে কায়মনোবাক্যে মিলিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, উপরোক্ত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থা * কোন ক্রমেই ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব নহে। কাযেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলিতে পারা যায় যে, একদিকে যেরূপ ভারতবর্ষের শতকরা ৯৭ জন লোক স্বায়ত্তশাসন এবং তথাকথিত স্বাধীনতা সম্বন্ধে উদাসীন, সেইরূপ আবার ইংরাজকে বাদ দিয়া কোন স্বাধীনতা অথবা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবার চেষ্টা করিলে ভারতবাসিগণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর হওয়াও অসম্ভব।

ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিয়া তথাকথিত স্বাধীনতার চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন, অথবা যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের ইংরাজগণের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিয়া স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য লোলুপ হইয়াছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ সমগ্র ভারতবাসীর শতকরা ৩ জনের মধ্যে মধ্যবিত্ত তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের তথাকথিত এই শিক্ষিত সম্প্রদায় জন্মতঃ ভারতবাসী বটে, কিন্তু ভাবতঃ উঁহারা প্রায়শঃ পাশ্চাত্ত্য অথবা বিদেশী। ভাবতঃ উঁহারা পাশ্চাত্ত্য অথবা বিদেশী বলিয়াই বিদেশ হইতে আমদানী সোস্যালিজ্‌ম্, কমিউনিজম্, female franchise (নারীর ভোটাধিকার) প্রভৃতির কথা ইঁহারা অহরহ বলিয়া থাকেন এবং যে liberty (স্বাধীনতা) পাইয়া ইংরাজ, জার্ম্মানী ও মার্কিণ প্রভৃতি দেশের শতকরা ৯৫ জনকে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অপরের চাকুরী অথবা নকরগিরি করিতে বাধ্য হইতে হয়, অথবা তাঁহারা স্বাধীনতার বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হইয়া থাকেন, সেই liberty-র জন্য ইঁহারা নিধিরাম সর্দ্দারের দল প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদা ক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন।

বিদেশীয় মাতার গর্ভে ও স্বদেশীয় পিতার ঔরসে, অথবা স্বদেশীয় মাতার গর্ভে ও বিদেশীয় পিতার ঔরসে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যেরূপ কোন দেশের খাঁটি "স্বদেশী" বলা চলে না, পরন্তু Eurasian, অথবা বর্ণসঙ্কর জাতির মানুষ বলিতে হয়, সেইরূপ যাঁহারা জন্মতঃ ভারতবাসী ও ভাবতঃ পাশ্চাত্ত্য, তাঁহাদিগকেও খাঁটী ভারতবাসী মানুষ বলা চলে না, পরন্তু যুক্তিসঙ্গত ভাবে ভাবসঙ্কর মানুষ বলিতে হয়, তাহাও আমরা দেখাইয়াছি।

ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন বলিতে উপরোক্ত তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অথবা ভাবসঙ্কর মানুষের রাজত্ব বুঝিতে হইবে; কারণ, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হউক, অথবা তথাকথিত স্বাধীনতাই প্রবর্ত্তিত হউক, জনসাধারণের

* কোন্ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থায় ভারতবাসী জন-সাধারণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইবে, তাহার আলোচনা আমরা "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধে (১৩৪১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে সূচিত) করিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে আমরা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মধ্যে যাঁহারা তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নামে অশন, বসন ও ব্যবহারে ধর্ম্মবুদ্ধি, যুক্তিবত্তা ও সততাকে অন্ততঃপক্ষে আংশিক ভাবেও জলাঞ্জলি দিতে পারেন নাই এবং যাঁহারা খাঁটী ভারতবর্ষপ্রসূত প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ রাজত্বে যোগদান করা সম্ভব হইবে না। এতাদৃশ ভাবসঙ্কর মানুষের রাজত্ব জনসাধারণের পক্ষে কোনরূপ মঙ্গলপ্রদ হইবে কি না, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, Eurasian অথবা বর্ণ-সঙ্কর মানুষ যেরূপ কখনও কোনরূপ বুদ্ধিসাধ্য পরিচালনার কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নিপুণতাসম্পন্ন হয় না, সেইরূপ এই এই ভাবসঙ্কর মানুষগুলি কখনও কোনরূপ বুদ্ধিসাধ্য পরিচালনার কার্য্যে সর্ব্বোচ্চ নিপুণতাসম্পন্ন হইতে পারে না এবং তাহাদের প্রভুত্ব কখনও সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, খাঁটী বিদেশী মানুষের রাজত্ব বরং কোন কোন বিষয়ে মঙ্গলপ্রদ হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু বর্ণসঙ্কর মানুষের রাজত্ব যেরূপ কখনও কোনক্রমে মঙ্গলপ্রদ হয় না—সেইরূপ অন্ধ অনুকরণপ্রিয়, স্বদেশের বৈশিষ্ট্যানুসন্ধানে অক্ষম, ভাবসঙ্কর মানুষগুলির প্রভুত্ব কখনও জনসাধারণের হিতকর হইতে পারে না।

আমাদের উপরোক্ত কথা যে সত্য, তাহা কলিকাতা কর্পোরেশন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভাবসঙ্কর মানুষগুলির প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। আমরা জানি যে, আমাদের শিক্ষিত যুবক বন্ধুগণের নিকট প্রায়শঃ আমাদের উপরোক্ত সত্য কথা অত্যন্ত তিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু ঐ যুবক বন্ধুগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় নেতা গান্ধীজী অথবা জওহরলালজী অথবা তদনুচরগণের নিকট লম্বা লম্বা অর্থহীন আশার বাণী শুনা যাইবে বটে, কিন্তু স্ব স্ব মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া কাকুতি জানাইলেও, কোন্ উপায়ে শিক্ষিত যুবকদিগের বেকার-সমস্যা, অথবা কৃষকের কৃষি-সমস্যা, অথবা বণিকের বাণিজ্য-সমস্যা, অথবা সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য ও শান্তি-সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের কোন প্রকৃত জবাব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কারণ, ঐ নেতৃবর্গের মস্তিষ্ক ঐ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ফাঁকা। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা অন্ধভাবে গান্ধীজী, জওহরলালজী এবং তদনুচরবর্গকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ গান্ধীজী অথবা জওহরলালজী এবং তদনুচরবর্গ নিজেদের পরামর্শ ও জিদকে যে পরিমাণে মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করেন, যুবক সম্প্রদায় অথবা জনসাধারণের পক্ষে সমস্যাসমূহের সমাধানকে তাহার সামান্য অংশ পরিমাণেও মূল্যবান মনে করেন না। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে গান্ধীজীর এই অষ্টাদশবর্ষব্যাপী নেতৃত্বকালে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর প্রত্যেক সমস্যাটি উত্তরোত্তর এত অধিক জটিল হইয়া পড়িতে পারিত না এবং তাহা হইলে যুবকগণের মধ্যে আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশঃ এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।

অন্ধ বিশ্বাস ও অন্ধ শ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া বস্তু ও অবস্থার প্রকৃত স্বরূপাদেশ হইলে যুবকগণ দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবর্ষের যে মানুষগুলিকে তাঁহারা বর্ত্তমানকালে রাজনৈতিক নেতা, অথবা কবি, অথবা সাহিত্যিক, অথবা অধ্যাপক বলিয়া সম্মান দেখাইয়া থাকেন, সেই মানুষগুলি প্রায়শঃ অজ্ঞানী, চরিত্রহীন, অন্ধভাবে অনুকরণপ্রয়াসী ও বিশ্লেষণ-নিপুণতাশূন্য এবং যুবকগণ যে তাঁহাদের তথাকথিত আদর্শ লাভ করিবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নানাবিধ দুঃখে হাবুডুবু খাইয়া থাকেন, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহাদের ঐ রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, কবি, সাহিত্যিক এবং অধ্যাপক এবং সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কু-পরিচালনা।

স্বায়ত্ত-শাসন দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে হিতকারী কি না, ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী হইয়াছে কি না, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছে কি না, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলে তাঁহাদের অর্থ-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা ও শান্তি-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কি না, এতদ্বিষয়ে যে সমস্ত পর্য্যালোচনা লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, একে তো ভারতবাসিগণ এখনও প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী হইতে পারে নাই এবং তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৭ জন ঐ সম্বন্ধে উদাসীন, তাহার পর আবার বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে রাজস্ব-পরি-

চালনার কার্য্যে ইংরাজদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া ভারতবাসী তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত করিলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অর্থ সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যা উত্তরোত্তর জটিলতা লাভ করিবে। ইহা ছাড়া আরও দেখা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ স্বায়ত্ত শাসন অথবা স্বাধীনতা সম্বন্ধে এখনও উদাসীন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে তাহাদের অর্থ সমস্যা অথবা স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না, তৎসম্বন্ধে তাহারা বিন্দুমাত্রও উদাসীন নহে।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ব্রিটিশারগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিলেই অথবা ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইলেই ভারতবর্ষে তাঁহারা জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারিবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত এবং তাঁহাদের শাসন নীতিও ভ্রান্ত। বস্তুতপক্ষে যাহাতে ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান উত্তরোত্তর সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা না করিতে পারিলে, তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, ইহা আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরোধিতা করিয়া দেশসেবার কার্য্য পরিচালিত করিবার মনস্থ করিয়াছেন, সেই কংগ্রেস পন্থিগণই হউন, অথবা যাঁহারা ১৯৩৫ সালের অ্যাক্ট অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মন্ত্রিমণ্ডলই হউন, যতদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা ইংরাজের অথবা ইংলণ্ডের অথবা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্ধ অনুকরণ-প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত সাধকের মত ভারতের ও ভারতবাসীর ও ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহার অনুসন্ধানে তৎপর না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত, ইঁহারা মুখে ইংরাজের বন্ধুই হউন অথবা শত্রুই হউন, কার্য্যতঃ যে ইঁহারা প্রত্যেকে ভারতবর্ষে ইংরাজের অনিষ্ট সাধন করিবেন, তাহা আশঙ্কা করা যাইতে পারে, কারণ, প্রকৃত সাধকের মত ভারতের ও ভারতবাসীর ও ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত না হইলে এবং ঐ বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে, যে যে ব্যবস্থায় ভারতের জনসাধারণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূরীভূত হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া কখনও সম্ভব হইবে না এবং ঐ ঐ ব্যবস্থা অদূরভবিষ্যতে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে সমগ্র জনসাধারণের অসন্তুষ্টি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও মানবসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে টলটলায়মান হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কোন্ কোন্ নীতি অবলম্বিত হইলে, উহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান থাকিবে না, তাহার উত্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিতে হইবে :—

(১) যে শিক্ষা পাইলে ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বায়ত্ত শাসনের প্রাথমিক উপযোগিতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, সেই শিক্ষা যাহাতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত হয় তাহার ব্যবস্থা অর্থাৎ তথাকথিত শিক্ষিত মানুষগুলি যাহাতে কতকগুলি পক্ষীর ন্যায় ঘৃণিত, পরমুখাপেক্ষী ও সর্ব্বতোভাবে অন্ধ অনুকরণপ্রিয় ভাবসঙ্করের মানুষ না হইয়া প্রকৃত স্বাধীনচেতা, প্রকৃত স্বাধীন বুদ্ধি-সম্পন্ন, স্বদেশের বৈশিষ্ট্যানুসন্ধানপ্রয়াসী, প্রত্যেক মানুষ যে মানুষ এবং প্রত্যেক স্ত্রীলোক যে স্ত্রীলোক, তদ্বিষয়কবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(২) দেশ, কাল ও পাত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে শিক্ষায় ভারতবাসিগণের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সবল হইয়া গঠিত হইতে পারে, সেই শিক্ষা কোন্ শ্রেণীর তাহা যিনি কোন বিদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে সাধনা করিয়া স্থির করিতে অক্ষম, তিনি যাহাতে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন-রূপ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত না হন তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা।

(৩) ১৯৩৫ সালের সংগঠনবিধি অনুসারে ভারতবাসিগণ সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু প্রকৃতভাবে শিক্ষিত হইলে ভারতবাসিগণ যাহাতে অনতিবিলম্বে স্বায়ত্ত শাসন পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা, এবং যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে প্রকৃত

স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগিতা লাভ করা যায়, সেই শিক্ষা যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ব্যবস্থা যে ঐ ১৯৩৫ সালের সংগঠনবিধি অনুসারে করা যাইতে পারে, তাহা যাহাতে জনসাধারণ পরিজ্ঞাত হয়, তদ্বিষয়ক প্রচারের ব্যবস্থা।

(৪) ভারতবাসী ও ইংরাজগণ প্রায়শঃ পরস্পর অকৃত্রিম ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ না হইলে যে, ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন সেই সেই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না এবং গান্ধীজী ও জওহরলালজীর নীতি যে ঐ ঐক্যবন্ধনের একান্ত পরিপন্থী, ঐ গান্ধীজী, জওহরলালজী ও তাঁহাদের অনুচরবর্গ যে খাঁটী "স্বদেশী" মানুষ নহেন, পরন্তু তাঁহাদিগকে যে অদ্ভুত রকমের স্বার্থপরায়ণ বলা যাইতে পারে, তাহা যাহাতে সমগ্র ভারতবাসী পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারে, তদ্বিষয়ক প্রচারের ব্যবস্থা।

(৫) দেশে যতক্ষণ পর্য্যন্ত খাঁটী "স্বদেশী" নেতার উদ্ভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বায়ত্ত-শাসনের, অথবা স্বাধীনতার নামে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, অথবা তাঁহাদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিয়া দেশের গবর্ণমেণ্ট, দেশীয় কোন মানুষ, অথবা সঙ্ঘের হাতে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করিলে দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব রকমের বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হওয়া, বেকার যুবকবৃন্দের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অনশন ও অর্দ্ধাশনের মাত্রা বৃদ্ধি হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা যাহাতে জনসাধারণ পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারে, তদ্বিষয়ক প্রচারকার্য্যের ব্যবস্থা।

(৬) যাদৃশ প্রচারকার্য্যে বিন্দুমাত্রও মিথ্যার সান্নিধ্য আরোপিত হইতে পারে, তাদৃশ প্রচারকার্য্য যাহাতে গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে চালান না হয়, তদ্বিষয়ক সতর্কতা অবলম্বন করা।

ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন-বিষয়ক নীতি উপরোক্তভাবে গঠিত হইলে যে, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কাহারও কোন যুক্তিসঙ্গত অভিযোগের কারণ বিদ্যমান থাকে না এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে, উত্তরোত্তর লোকপ্রিয় হওয়া সম্ভব হয়, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা বিস্তৃতভাবে প্রমাণিত করিব।

কংগ্রেসপন্থিগণের দুর্নীতি এবং তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতির পরিণাম

একমাত্র কংগ্রেসপন্থিগণের দুর্নীতির জন্যই স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব হইতে ভারতবাসিগণের বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা আছে, ইহা যাহাতে ভারতবাসী জনসাধারণ জানিতে পারেন, তদুদ্দেশ্যে প্রচারকার্য্য চালান যে, রাজপুরুষগণের একটি প্রধান কার্য্যের অঙ্গ, তাহা আমরা সম্পাদকীয় প্রথমাংশে দেখাইয়াছি।

কংগ্রেসপন্থিগণের দুর্নীতি যে, আমাদের জনসাধারণের এবং শিক্ষিত যুবকগণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং তাহা আমরা একাধিক বার প্রমাণিত করিয়াছি। কিন্তু, তাই বলিয়া গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারও সমর্থন করা যায় না। ঐ নীতি গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের পক্ষে কল্যাণজনক কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে।

জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের অর্থ-সমস্যা ও স্বাস্থ্যসমস্যা হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা একদিকে যেরূপ জনসাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণপ্রদ, অন্যদিকে আবার ঐ ব্যবস্থা সাধিত না হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃতভাবে জনপ্রিয় হইবার আর কোন পন্থা নাই, এই সত্য মানিয়া লইলে এবং কোন কোন ব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যে-যে ব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব আমলভাবে বিদূরিত হইতে পারে, সেই সেই ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও প্রদেশ নির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসী মিলিত হইয়া ইংরাজের সহিত অকৃত্রিম সখ্যভাব স্থাপন করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হইবে না।

কংগ্রেসপন্থিগণের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কার্য্যনীতি কি কি, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ নীতিসমূহের মধ্যে দুইটি বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, কংগ্রেসপন্থিগণ যে যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ

করিতে পারিয়াছেন, সেই সেই প্রদেশে তাঁহারা যাহাতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, রাজপুরুষগণ তাহার চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা যদ্যপি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসপন্থিগণের জন্যই ভারতবর্ষে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপন করা সম্ভব হইতেছে না, তাহার প্রচারের চেষ্টা চলিতেছে।

যদি দেখা যায় যে, গভর্ণমেণ্টের উপরোক্ত উভয়বিধ কার্য্য-নীতির ফলে ভারতবাসিগণের পক্ষে ধর্ম্ম ও প্রদেশ-নির্ব্বিশেষে মিলিত হইয়া ইংরাজের সহিত অকৃত্রিম সখ্যভাব স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের নীতির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু, যদি দেখা যায় যে, গভর্ণমেণ্টের উপরোক্ত দ্বিবিধ কার্য্যনীতির ফলে ইংরাজের ও ভারতবাসিগণের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইবার সম্ভাবনার বৃদ্ধি হওয়া তো দূরের কথা, এমন কি, ভারতবাসিগণের নিজেদের পরস্পরের মধ্যেই অমিলনের আশঙ্কাই বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনীতি যে অত্যন্ত ভ্রমাত্মক এবং তাহা যে গভর্ণমেণ্টেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না।

যদি কোন প্রদেশে কংগ্রেসপন্থিগণ মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যে জনসাধারণের অধিকতর অপ্রিয় হইতে হইবে এবং তাঁহাদিগের নিজেদের মধ্যেও যে মনো-মালিন্য বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কংগ্রেসপন্থিগণের পক্ষে যে জন-সাধারণের অর্থ-সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান করা কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা আমরা এই সন্দর্ভের প্রথম ভাগে দেখাইয়াছি। এবংবিধ অবস্থায় তাঁহারা মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিলে তাঁহাদিগকে যে জনসাধারণের অবজ্ঞাভাজন হইয়া পড়িতে হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয় নহে কি?

কাজেই বলিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রতি যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, উহার ফলে কংগ্রেসকে জনসাধারণের চক্ষে অবজ্ঞাভাজন হইতে হইবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি পাইবে; যে যে ব্যবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ-সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব, সেই সেই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে; এবং অবশেষে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি টলটলায়মান হইবার আশঙ্কা উপস্থিত হইবে।

কংগ্রেস-পন্থিগণের প্রতি কোন্ নীতি অবলম্বিত হইলে কাহারও পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করা অসম্ভব হইতে পারে, তদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথমতঃ, **প্রকৃত কংগ্রেস** যে দেশের জন-সাধারণের দলাদলি মিটাইবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যে কোন প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কংগ্রেসের নামে একটা দল-বিশেষ মাত্র গঠিত করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে ভারতবর্ষের দলাদলি এবং অর্থ-সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃতীয়তঃ, প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত করিতে হইলে যে, হয় বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মনোভাব যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, নতুবা তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হন তাহার চেষ্টা জনসাধা-রণকে করিতে হইবে, চতুর্থতঃ, প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে, কংগ্রেস-পন্থিগণের গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে—এই চারিটি সত্য যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থায় যদি মন্ত্রি-মণ্ডল অথবা রাজপুরুষগণ হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-নীতির উপর ন্যায়তঃ কোন দোষারোপ করা সম্ভব হইবে না। আমাদের এই কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা ভবিষ্যতে প্রতিপন্ন করিব।

"প্রাদেশিক বাজেটে উদ্বৃত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছে" প্রভৃতি অপর যে চারিটি প্রচারকার্য্যে রাজপুরুষগণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বাণী ও বিবৃতি হইতে সাক্ষ্য পাওয়া যাইতেছে, তাহার পরিণামই বা কি, তৎসম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ভারত-শাসনকার্য্যের মূলে যে সমস্ত নীতি বিদ্যমান রহি-য়াছে, তাহার প্রত্যেকটি যে অল্পাধিক ভ্রান্ত এবং তদনুসারে যাঁহারা ভারতবর্ষের শাসননীতি-সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া-ছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ যে স্ব স্ব কার্য্যের অনুপযুক্ত, এবং ঐ রাজপুরুষগণের এতাদৃশ অনুপযুক্ততার জন্যই যে, ভারতবর্ষে অশান্তির অগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা সহজেই

প্রমাণিত হইতে পারে। যাঁহারা অবাধে অন্দরম্ব স্ত্রীলোককে লইয়া প্রকাশ্যভাবে নর্ত্তন-কুর্দ্দনে সঙ্কোচ বোধ করেন না, যাঁহারা মদ্যপান ও পরস্ত্রীর সহিত অবাধে মেলামেশাকে অন্যতম সাংস্কৃতিক নীতির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন, যাঁহারা প্রকাশ্য সভায় জন্মনিরোধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষে যে প্রকৃত বুদ্ধিমান হইয়া শাসনকার্য্যে প্রকৃত জনহিতকর নীতি গঠন করা একরূপ অসম্ভব, তাহা মানুষ কবে বুঝিবে?

গবর্ণমেণ্টের শাসন-নীতির ভ্রমাত্মকতার দৃষ্টান্ত (৩)

গবর্ণমেণ্টের শাসননীতি ভ্রমাত্মক অথবা ভ্রমহীন, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, রাজপুরুষগণের মধ্যে কে কে শাসননীতি গঠন করিবার জন্য দায়ী এবং তাঁহাদের বক্তৃতা ও বিবৃতিতে কোন্ কোন্ কার্য্য-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, উহা যে লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টের শাসননীতি গঠন করিবার দায়িত্ব প্রধানতঃ ভারত-সচিব, বড়লাট, প্রাদেশিক লাটগণ, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল সমূহের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। যাঁহারা ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্টের শাসননীতি গঠন করিবার জন্য দায়ী, তাঁহাদের চালচলন হইতে যে কোন্ কোন্ কার্য্য-পরিকল্পনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

উহা হইতে গভর্ণমেণ্টের নিম্নলিখিত কার্য্য-পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়:—

(১) ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনানুসারে বৃটিশগণ যে, ভারতবাসীকে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়াছেন, তাহা যাহাতে ভারতবাসী জনসাধারণ পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তাহার প্রচার করা।

(২) একমাত্র কংগ্রেস-পন্থিগণের দুর্নীতির জন্যই যে, উপরোক্ত স্বায়ত্ত-শাসনের সুফল হইতে ভারতবাসিগণের বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা আছে, তাহা যাহাতে ভারতবাসিগণ জানিতে পারে, তাহার প্রচার করা।

(৩) উপরোক্ত স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা যে, ভারতবাসিগণের সর্ব্ববিধ সমস্যার সমাধান সম্পাদিত হইতে পারে এবং বাজেটের ঘাটতির স্থলে যে বাজেটের উদ্বৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারে, তাহার প্রচার করা।

(৪) মন্ত্রিমণ্ডল যে অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি-কল্পে অদ্ভুতপূর্ব্ব রকমের সহায়তা প্রদান করিবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত রহিয়াছেন, তাহা যাহাতে জনসাধারণ জানিতে পারে, তাহার প্রচার করা।

(৫) বাঙ্গালা দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমীদারগণের জমীদারি স্বত্ব, প্রজার খাজানার হারের আধিক্য, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রসার, রাস্তাঘাটের উন্নতি প্রভৃতি যে, মন্ত্রিমণ্ডলের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করা।

(৬) গভর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগাইতেছেন বলিয়া যে, তাঁহার উপর দোষারোপ করা হইয়া থাকে, উহা যে ভিত্তিহীন, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করা।

উপরোক্ত কার্য্য-পরিকল্পনার প্রথম ও দ্বিতীয়টি যে ভ্রমাত্মক, তাহা আগেই দেখান হইয়াছে।

বাজেটের ঘাটতি ও উদ্বৃত্তি এবং তাহার পরিণাম

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই, এবং এমন কি, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এবং কোন কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সময়-সময় বাজেটে ঘাটতি হইতেছিল বলিয়া প্রচারিত হইতেছিল। বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই বাজেটে উদ্বৃত্তি হইবে বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে।

বাজেটে উদ্বৃত্তি সাধারণতঃ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পরিচায়ক এবং প্রায়শঃ অর্থসচিবগণের সম্যক্ কার্য্যনিপুণতা না থাকিলে বাজেটের উদ্বৃত্তি সম্ভব হয় না, ইহা মনে হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্টের বাজেটে উদ্বৃত্তি হইতেছে শুনিলেই আপাতদৃষ্টিতে বুঝিতে হয় যে, দেশে জনসাধারণের হিতকর সংগঠন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা হইয়াছে এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন প্রকাণ্ড ধুরন্ধর অর্থসচিবের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়তঃই জনসাধারণের আহ্লাদের বিষয় হইয়া থাকে এবং জনসাধারণ উৎফুল্ল দৃষ্টিতে অপেক্ষাকৃত সুদিনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই হিসাবে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই জনসাধারণের অপেক্ষাকৃত অধিকতর আর্থিক স্বচ্ছলতার আশা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে, আজকালকার দিনে অর্থ যেরূপভাবে প্রস্তুত হয়, তাহাতে গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অভাব অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা বলিয়া অবস্থার কোন জীবন্ত তারতম্য বিদ্যমান নাই, অর্থাৎ বাজেটে ঘাটতি পড়িলেও সাধারণ লোকের মত অর্থের জন্য গভর্ণমেণ্টের অপর কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, প্রকৃতপক্ষে কোন আয়ের টাকা হস্তগত না হইলেও কেবলমাত্র আয়ের সম্ভাবনা আছে, এই অজুহাতেই অর্থ-সচিবগণ বাজেটে আয়ের বৃদ্ধি ও হ্রাস দেখাইতে পারেন, প্রকৃত পক্ষে কোন বৎসর কোন খরচের টাকা হস্তচ্যুত হইলেও প্রয়োজন হইলে ঐ বৎসর ঐ টাকা সম্পূর্ণ পরিমাণে খরচ হইয়াছে বলিয়া না দেখাইয়া আংশিক পরিমাণে খরচ হইয়াছে বলিয়া বাজেটে দেখান যাইতে পারে, একদিকে বাজেটে উদ্বৃত্তি হইলেও যেমন জনহিতকর সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে, সেইরূপ ঘাটতি হইলেও ঐ সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা অসম্ভব হয় না, অন্যদিকে বাজেটে উদ্বৃত্তি না হইলেও যেমন জনহিতকর সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা যাইতে পারে, সেইরূপ বাজেটে উদ্বৃত্তি হইলেও জনহিতকর সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করা অসম্ভব হয় না, তাহা হইলে বাজেটের উদ্বৃত্তি হইলেই যে, অর্থ-সংরক্ষণ সম্বন্ধে অর্থ-সচিবের কেরামতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ আবার ঐ উদ্বৃত্তির ফলে যে, কোন প্রকৃত জনহিতকর সংগঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইবে, তাহাও আশা করা যায় না।

গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অভাব, অথবা আর্থিক স্বচ্ছলতা বলিয়া অবস্থার কোন জীবন্ত তারতম্য বিদ্যমান আছে কি না, অর্থাৎ বাজেটে ঘাটতি পড়িলে সাধারণ মানুষের মত অর্থের জন্য গভর্ণমেণ্টের অপর কাহারও দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন হয় কি না, তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, প্রথমতঃ, গভর্ণমেণ্টের অর্থ কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ অর্থের আদান-প্রদানই বা কিরূপ ভাবে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

গভর্ণমেণ্টের অর্থ কিরূপ ভাবে প্রস্তুত হয়, অথবা ঐ অর্থের আদান-প্রদানই বা কিরূপ ভাবে সাধিত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ মিণ্টের সহায়তায় কারেন্সি-বিভাগের দ্বারা অর্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা ঐ অর্থের আদান-প্রদান সাধিত হয়। ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, যে-পরিমাণ অর্থ গভর্ণমেণ্টের বিবিধ খরচার জন্য প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেই পরিমাণ কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত টাকা, আধুলি, সিকি, দু-আনি, আনি, এবং পয়সা মিণ্টের সহায়তায় প্রস্তুত করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন ক্রমেই দুঃসাধ্য নহে। অর্থনীতির কেতাবানুসারে মনে হয় বটে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের স্বর্ণ, অথবা অন্য কোন ধাতু গভর্ণমেণ্টের সঞ্চয়-গৃহে (store room) রক্ষিত না হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী পরিমাণে নোট প্রভৃতি উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না, কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, গভর্ণমেণ্টের ইস্তাহারানুসারেই মোট উৎপন্ন নোট প্রভৃতির পরিমাণ কখনও বা সঞ্চিত ধাতু-পরিমাণের শতকরা কম-বেশ ৬০ ভাগ, আবার কখনও বা শতকরা কম-বেশ ১৫ ভাগ, অধিকন্তু ঐ ধাতু-পরিমাণের হ্রাস ও বৃদ্ধি সাধন করাও কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য নহে, তখন ঐ সঞ্চিত ধাতু-পরিমাণের নির্দ্দিষ্টতাকে বাস্তব না বলিয়া একটি কাল্পনিক ব্যবস্থা মাত্র বলা চলে না কি?

উপরোক্ত ভাবে তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত আধুনিক অর্থ-প্রস্তুত-পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যেমন কোন গভর্ণমেণ্টের বাস্তব অর্থাভাব উপস্থিত হইতে পারে না, সেইরূপ আবার মূলতঃ যে ব্যাঙ্কের হস্তে গভর্ণমেণ্টের অর্থের আদান-প্রদান করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে, সেই ব্যাঙ্কেরও কখনও অর্থাভাব ঘটিতে পারে না। কাজেই কোন অবস্থাতেই সাধারণ লোকের ও গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অর্থাভাবে অপর কাহারও দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন হয় না।

যে সমস্ত ধুরন্ধর মনে করেন যে, কোন গভর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইতে চলিয়াছেন, অথবা কোন গভর্ণমেণ্টকে দেউলিয়া করিয়া জব্দ করা সম্ভব হইবে, তাঁহারা যতই নাম-করা হউন্ না কেন, বস্তুতপক্ষে আধুনিক অর্থনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, ইহা বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা গভীর ভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বাজেটের ঘাট্‌তি ও উদ্বৃত্তি দ্বারা গভর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা নিখুঁতভাবে সম্যক্ রূপে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে এবং অর্থ-সচিবগণের পক্ষে ইচ্ছানুরূপ বাজেটে যেরূপ ঘাট্‌তি দেখান সম্ভব হয়, সেইরূপ আবার উহার উদ্বৃত্তি দেখানও সম্ভব হইতে পারে। কাজেই বাজেটের ঘাট্‌তি ও উদ্বৃত্তির কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই এবং উহা গভর্ণমেণ্টের একটি নীতি মাত্র, ইহা বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে যেমন বাজেটে ঘাট্‌তি হইয়াছে বলিয়া প্রচার করিতে পারেন, সেইরূপ আবার উহাতে উদ্বৃত্তি হইয়াছে বলিয়াও প্রচার করা সম্ভব হয়।

আপাতদৃষ্টিতে বাজেটের ঘাট্‌তি ও উদ্বৃত্তির সহিত প্রকৃত জনহিতকর সংগঠন-কার্য্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন্ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের হিত সাধিত হইতে পারে, তাহা যদি সুনিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে যতদিন পর্য্যন্ত কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত সংগঠনের কার্য্যের নির্ব্বাহার্থ টাকার অনটন হইতে পারে না। জাপানী ও জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের সংগঠন কার্য্যের ব্যয় কিরূপভাবে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহার সন্ধান করিলে আমাদের এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

ঐ ঐ গভর্ণমেণ্টের তুলনায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে, এতাবৎ অধিকতর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। কিরূপ সংগঠনের দ্বারা জনসাধারণের প্রকৃত হিত হইতে পারে, তাহা মানবজাতির অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়াই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতাবৎ বাজেটের ঘাট্‌তির অজুহাতে বিস্তৃত ভাবে কোন সংগঠনের কার্য্য হইতে দূরে থাকিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু, একবার যদি বাজেটে উদ্বৃত্তি হইয়াছে, ইহা দেখান হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন না কোন সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া পারা সম্ভব হইবে কি?

যখন বাজেটে উদ্বৃত্তি হইয়াছে বলিয়া দেখান হইয়াছে, তখন একদিকে যেরূপ জনহিতকর সংগঠনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলে জনসাধারণের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে, অন্যদিকে আবার ঐ সংগঠনের কার্য্যে যদি প্রকৃত পক্ষে জনসাধারণের আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের অসন্তুষ্টি আরও বৃদ্ধি পাইবে, এবম্বিধ আশঙ্কা করা অলীক হইবে কি?

কাজেই এতাদৃশ অবস্থায় বাজেটে উদ্বৃত্তি-দেখান যে, অর্থ-সচিবগণের অর্থনীতি সম্বন্ধে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, ইহা বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হইবে কি?

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও আধুনিক পাণ্ডিত্যের নমুনা (২)

শাস্ত্রী মহাশয়ের "গৌড়পাদ" নামক প্রবন্ধের যাহা যাহা উল্লেখযোগ্য বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি, তাহা ছ-অংশের ২য় ও ৩য় কথায় তিনি বলিয়াছেন :—

(২) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকেরা বলেন, পৃথিবী প্রভৃতি ধর্ম্মী আর কাঠিন্য প্রভৃতি তাহার ধর্ম্ম, উভয়ই পরস্পর স্বতন্ত্র।

(৩) সাংখ্যদর্শনে গুণ ও গুণী অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, অথবা ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, তাহা সুপ্রসিদ্ধ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের উপরোক্ত দুইটি কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, গুণ ও ধর্ম একার্থক এবং গুণ ও গুণীর অথবা গুণ ও দ্রব্যের, অথবা ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ঐ বিষয়ে ন্যায়, বৈশেষিক ও সাংখ্য দর্শনের অভিমত কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতাদ্বয় ঐ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা ঠিক তাহার বিপরীত কথা প্রচার করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার পাঠকবর্গকে দ্রব্য ও গুণের অথবা ধর্ম ও "ধর্মী"র মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ে যাহা যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শনের মতে দ্রব্য ও গুণ অথবা ধর্ম ও ধর্মী সর্বদাই স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পৃথক ভাবে অবস্থিত, আর সাংখ্যদর্শনের মতে ঐ দুইটি বস্তু সর্বদাই অভিন্ন, অর্থাৎ অপৃথক ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে দ্রব্য ও গুণ অথবা ধর্ম ও ধর্মী যে পরস্পর স্বতন্ত্র তাহা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৈশেষিক অথবা ন্যায়দর্শনের কোন্ সূত্র হইতে যে উপরোক্ত মতবাদ পাওয়া যায়, তাহার কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই।

সাংখ্যদর্শনের মতে দ্রব্য ও গুণ অথবা ধর্ম ও ধর্মী যে সর্বদা অভিন্ন, অর্থাৎ অপৃথক্ ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি দুইটি সূত্র এবং একটি কারিকার উল্লেখ করিয়াছেন।

সূত্র দুইটির মধ্যে একটি "গুণ-দ্রব্যয়োস্তাদাত্ম্যম্", আর, অপরটি "ধর্ম-ধর্মিণোরভেদঃ"।

তাঁহার উদ্ধৃত কারিকাটি—

> গুণিনো হি গুণানাং চ ব্যতিরেকো ন বিদ্যতে
> রূপোষ্ণাভ্যাং বিরহিতো ন হ্যগ্নিরুপলভ্যতে।

উপরোক্ত কারিকাটি যে, অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধ-চরিত হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ শাস্ত্রী মহাশয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত সূত্র দুইটি যে কোন্ গ্রন্থের, তাহার কোন উল্লেখ তিনি করেন নাই এবং ঐ দুইটি সূত্র ও কারিকাটি হইতে যে, তাঁহার মতবাদের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য উহাদের অর্থ যে কি তাহার ব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। আমাদের যতদূর মনে পড়ে, ঐ দুইটি সূত্রের একটিও কপিলমুনি-প্রণীত মূল সাংখ্যদর্শনে পাওয়া যায় না। যে সূত্র মূল সাংখ্য-দর্শনে পাওয়া যায় না, অথবা যে কারিকা বুদ্ধ-চরিতের, তাহা সাংখ্যদর্শনের কোন মতবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য যে কেন প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

এইরূপ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, সাংখ্যদর্শনের কোন মতবাদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য উপরোক্ত দুইটি সূত্র ও কারিকাটির উল্লেখ করিবার যে কি প্রয়োজন, একদিকে তাহা বুঝিতে পারা যেরূপ কষ্টসাধ্য, অন্যদিকে আবার ঐ দুইটি সূত্র এবং কারিকাটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে, উহার দ্বারা দ্রব্য ও গুণ, অথবা ধর্ম ও ধর্মী যে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় অভিন্ন, তাহা যে কি করিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহাও বুঝিয়া উঠা সুকঠিন।

"গুণদ্রব্যয়োস্তাদাত্ম্যম্"—এই সূত্রটির মধ্যে "গুণ-দ্রব্যয়োঃ", এই দ্বিবচনান্ত সম্বন্ধের পর একবচনান্ত "তৎ" শব্দের ব্যবহার হইল কেন এবং পদস্ফোটানুসারে অব্যক্ত বস্তু প্রকাশক "আত্ম্যম" পদেরই বা অর্থ কি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সূত্রটি অনুবাদ করিতে হইলে বলিতে হয়:—

যদিও "গুণ" এবং "দ্রব্য" দুইটি পৃথক শব্দ এবং যদিও তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যের রূপ ও পরিণতি পৃথক পৃথক, তথাপি "গুণ" "দ্রব্য"কে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না এবং উহা সর্বদাই দ্রব্যের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে।

পাঠক, অতটুকু সূত্রটি হইতে এতগুলি কথা কিরূপে আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া আপনারা আশ্চর্য্য হইতেছেন? স্ফোটবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখিবেন যে, ইহাই ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যদি কখনও কাহারও ভাগ্যে ঐ ভাষা যথাযথ ভাবে জানিবার সৌভাগ্য হয় তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান বলিয়া যাহা

হইয়া অবস্থান করে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই।

কাযেই দেখা যাইতেছে, "গুণদ্রব্যয়োস্তাদাত্ম্যম্" এই সূত্রের দ্বারা সাঙ্খ্যদর্শনের মতে গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই, এবংবিধ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় যে চেষ্টা করিয়াছেন, ঐ চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে এবং উহা হইতে বুঝিতে হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় যদিও বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলরের পরিচালিত সিণ্ডিকেটের অনুগ্রহভাজন হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, তথাপি তিনি যে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বত্র যথাযথভাবে বুঝিতে সক্ষম, তাহার পরিচয় নাই।

সাঙ্খ্যদর্শনের মতে গুণ ও দ্রব্যের মধ্যে কোন ভেদ নাই—এবংবিধ কথা যেরূপ "গুণদ্রব্যয়োস্তাদাত্ম্যম্", এই সূত্রের দ্বারা প্রতিপন্ন করা যায় না, সেইরূপ আবার ঐ দর্শনের মতে ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, তাহাও 'ধর্ম-ধর্মিণোরভেদঃ,' এই সূত্রের দ্বারা সপ্রমাণিত করা সম্ভব নহে।

"ধর্ম-ধর্মিণোরভেদঃ',এই সূত্রের মুখ্য বক্তব্য, তন্মধ্যস্থিত কোন্ বর্ণে নিহিত রহিয়াছে, তাহা পাণিনীয়-শিক্ষানুসারে নির্দ্ধারিত করিয়া সূত্রটির মধ্যে কোন কর্ত্তৃকারকের সন্নিবেশ না হইয়া, দ্বিবচনান্ত সম্বন্ধের সন্নিবেশ সাধিত হইয়া, তৎসহ কৃদন্ত পদের সমাবেশ হইল কেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সূত্রটির অনুবাদ করিতে হইলে বলিতে হয়—

"ধর্ম এই কার্য্যটি এবং উহার কারক ধর্মী, কার্য্যবিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথক্ বটে, কিন্তু অবস্থান-বিষয়ে উহারা সর্ব্বদা অভিন্ন"।

উপরোক্ত কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, ধর্ম ও ধর্মী সর্ব্বদাই অভিন্ন ভাবে অবস্থান করে বটে, অর্থাৎ একটি আর একটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু ধর্মীর কার্য্য ও ধর্মের কার্য্য এবং উভয়ের কার্য্যের পরিণতি পৃথক্ পৃথক্।

কাযেই পূর্ব্বে যেরূপ গুণ ও দ্রব্যের সম্বন্ধ কি, তদ্বিষয়ে "গুণ-দ্রব্যয়োস্তাদাত্ম্যম্", এই সূত্রে দেখা গিয়াছে যে, গুণ ও দ্রব্য যদিও অবস্থান-বিষয়ে সর্ব্বদা অভিন্ন, তথাপি উভয়ের কার্য্য এবং তাহার পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক্, সেইরূপ আবার ধর্ম ও ধর্মীর সম্বন্ধ কি, তদ্বিষয়েও দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম ও ধর্মী যদিও অবস্থান-বিষয়ে সর্ব্বদা অভিন্ন, অর্থাৎ একটি অপরটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তথাপি উভয়ের কার্য্য ও তাহার পরিণতি সম্পূর্ণ পৃথক।

দ্রব্য ও গুণের, অথবা ধর্ম ও ধর্মীর স্ব স্ব কার্য্যবিষয়ে পৃথক্ত্বের দিকে নজর করিলে অবস্থান বিষয়ে অভিন্নত্ব থাকিলেও উপরোক্ত সূত্র দুইটি হইতে তাহাদের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, তাহা কোনরূপ যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় না, সেইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত—'গুণিনো হি গুণানাং চ' ইত্যাদি শ্লোকটির অর্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিলে ঐ শ্লোকে যে গুণ এবং গুণীর মধ্যে কোন ভেদ নাই বলা, এবংবিধ কোন কথা বলা হইয়াছে, তাহা মনে করা চলে না।

ঐ শ্লোকটিকে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলে বলিতে হইবে যে,—

অগ্নির রূপ এবং উষ্ণতার দিকে লক্ষ্য না করিলে অগ্নি যে অগ্নি, তাহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ গুণী যে গুণী তাহাও তাহার গুণের দিকে লক্ষ্য না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

গুণ না থাকিলে কেহ যে গুণী হইতে পারে না, অর্থাৎ গুণী গুণব্যতিরেকে পৃথক ভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে না, ইহা এই শ্লোকে বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু গুণী ও গুণ, এই দুইটি বস্তুর কার্য্য সর্ব্বতোভাবে এক অথবা বিভিন্ন এবং তদনুসারে এই দুইটি বস্তুর মধ্যে কোন ভেদ আছে অথবা নাই, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই ঐ শ্লোকটিতে বলা হয় নাই।

কাযেই দেখা যাইতেছে, "সাঙ্খ্যদর্শনে গুণ ও গুণী অর্থাৎ দ্রব্যের মধ্যে যে কোন ভেদ নাই, অথবা ধর্ম-ধর্মীর মধ্যে যে কোন ভেদ নাই," তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় যে দুইটি সূত্র ও একটি শ্লোক তাঁহার "গৌড়-পাদ"-নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ দুইটি সূত্র ও শ্লোক হইতে দ্রব্য ও গুণের অথবা ধর্ম ও ধর্মীর অবস্থান-বিষয়ে অভিন্নতা, অর্থাৎ একটি আর একটিকে ছাড়িয়া অবস্থান করিতে পারে না, এবংবিধ কথা প্রতিপন্ন হয় বটে,

তাহা তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, দ্রব্য যখন গুণ-যুক্ত হয়, তখন উহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ব্যক্ত হয়, আর উহা যখন গুণ-হীন অবস্থায় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইয়া) কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে, তখন দ্রব্য অব্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে, ইহা বুঝিতে হয়। শরীরের প্রত্যেক অংশ যে মূলতঃ গুণহীন বুদ্ধিগ্রাহ্য অব্যক্ত অবস্থা হইতে গুণযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তাহা মানুষ তাহার যে-অবস্থার সাহায্যে বুঝিতে পারে, সেই অবস্থার নাম জ্ঞ-অবস্থা। এই জ্ঞ-অবস্থাও অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণহীন অবস্থা।

বস্তুর ব্যক্ত অবস্থা, অব্যক্ত অবস্থা এবং জ্ঞ অবস্থা-সম্বন্ধে সাংখ্যদর্শনে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, দ্রব্যের যে গুণযুক্ত এবং গুণহীন, এই দুই অবস্থাই বিদ্যমান আছে এবং তদনুসারে উহা যে ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা পরিষ্কার ভাবে ঐ দর্শনে বলা হইয়াছে।

এক্ষণে পাঠকগণ, আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, যদি কোন দর্শনে বলা হয় যে, দ্রব্যের গুণহীন ও গুণ-যুক্ত, এই দুই অবস্থাই বিদ্যমান আছে, তাহা হইলে ঐ দর্শনানুসারে দ্রব্যের ও গুণের মধ্যে কোন ভেদ নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে কি ?

গুণ ও দ্রব্যের সম্বন্ধ-বিষয়ে এতাবৎ আমরা যে-সমস্ত কথার পর্য্যালোচনা করিলাম, তাহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, একদিকে যেরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্ধৃত দুইটি সূত্র, অথবা শ্লোক, অথবা মূল সাংখ্য দর্শন হইতে ইহা প্রমাণ করা যায় না যে, সাংখ্যদর্শনানুসারে দ্রব্য ও গুণের মধ্যে কোন ভেদ নাই, অন্যদিকে আবার উহার প্রত্যেকটি হইতে প্রতিপন্ন করা যায় যে, সংখ্যদর্শনে দ্রব্য ও গুণের অথবা ধর্ম্ম ও ধর্মীর অবস্থান-বিষয়ে সময় সময় অভিন্নতা আছে, অর্থাৎ গুণ দ্রব্যকে ছাড়িয়া এবং ধর্ম ধর্মীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু দ্রব্য যে গুণকে ছাড়িয়া, অথবা ধর্মী যে ধর্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, অথবা স্ব স্ব কার্য্য-বিষয়ে উহারা পরস্পর যে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ নহে, তাহা কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং, সাংখ্যদর্শনে যে শাস্ত্রী মহাশয় আদৌ প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না।

এইরূপ ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের ছ-অংশের সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধীয় তৃতীয় কথা যেরূপ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার ঐ ছ-অংশের বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় কথাও যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহাও সহজেই সপ্রমাণিত হইতে পারে।

“গুণ ও দ্রব্য, অথবা ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে **কোন** ভেদ নাই”, ইহা যেরূপ সাংখ্যদর্শনের কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না, সেইরূপ আবার “কাঠিন্য প্রভৃতি যে পৃথিবীর ধর্ম”, অথবা ধর্ম ও ধর্মী এবং গুণ ও দ্রব্য যে পরস্পর স্বতন্ত্র, তাহা যাঁহারা মূল বৈশেষিক অথবা ন্যায়দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কিছুতেই বলিতে পারিবেন না।

কাঠিন্য প্রভৃতি পৃথিবীর ধর্ম অথবা গুণ, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কি বৈশেষিক দর্শন অথবা কি ন্যায় দর্শন, এই দুইটি দর্শনের কোন দর্শনানুসারেই “কাঠিন্য”কে কাহারও “ধর্ম্ম” বলা চলে না।

কোন্‌টি “ধর্ম্ম” এবং কোন্‌টি “গুণ”, তাহা বুঝিতে হইলে একদিকে যেরূপ “ধর্ম্ম” কাহাকে বলে, তাহা জানিবার প্রয়োজন, অন্যদিকে আবার “গুণ” কাহাকে বলে, তাহাও জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বৈশেষিক দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ২য় সূত্রেতেই “ধর্ম্ম” কাহাকে বলে এবং ৬ষ্ঠ সূত্রেতে “গুণ” কাহাকে বলে, তাহা বুঝান হইয়াছে।

ঐ দুইটি সূত্রের মূলভাগে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে কাঠিন্যকে যে কোনক্রমেই কাহারও ‘ধর্ম্ম’ বলা যায় না, পরন্তু ‘গুণ’ বলিতে হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

বৈশেষিক দর্শনানুসারে ‘কাঠিন্য’কে যেরূপ সর্ব্বত্রই দ্রব্যের গুণ বলিতে হয়, সেইরূপ ন্যায়দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ১৪শ সূত্র হইতে যাঁহারা গুণের সংজ্ঞা যথাযথভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়দর্শনানুসারেও “কাঠিন্য” যে গুণ, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

আমাদের মনে হয়, গুণ কাহাকে বলে এবং ধর্ম্মই বা কাহাকে বলে, ষড়্দর্শনের প্রত্যেক দর্শনানুসারে "গুণ" ও "ধর্ম্ম"কে যে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরা হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের জানা নাই বলিয়াই তিনি "কাঠিন্য"কে "ধর্ম্ম" বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পাঠকদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, গুণ ও ধর্ম্মের বিভিন্নতা কোথায়, কোন্‌টিকে গুণ ও কোন্‌টিকে ধর্ম্ম বলিতে হয়, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা ভারতীয় দর্শনের প্রাথমিক কথা এবং যাঁহারা তৎসম্বন্ধেই ভুল করেন, তাঁহারা যে ভারতীয় দর্শনে বিন্দুমাত্রও প্রবিষ্ট হইতে পারেন নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এতাদৃশ শাস্ত্রী মহাশয়কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা-বিষয়ে যে প্রবঞ্চনা ও চাটুকারিতার খেলাও চলিয়া থাকে তাহা বলা চলে না কি?

বৈশেষিক দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ১৫শ ও ১৬শ সূত্রে এবং ন্যায়দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ১২শ, ১৩শ এবং ১৪শ সূত্রে যথাযথভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে, ঐ দুইটি দর্শনানুসারে যে দ্রব্য ও গুণ, অথবা ধর্ম্মী ও ধর্ম্ম যে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র নহে, পরন্তু সাংখ্যদর্শনেও যেরূপ অবস্থান-বিষয়ে গুণকে দ্রব্যের অভিন্ন এবং কার্য্য বিষয়ে উহাদিগকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে, সেইরূপ বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনেও যে একই কথা বলা হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে।

বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনেও যে অবস্থান-বিষয়ে গুণকে দ্রব্যের অভিন্ন এবং কার্য্যবিষয়ে উহাদিগকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলা হইয়াছে, তাহা বিশদ-ভাবে বুঝাইতে হইলে ঐ দুইটী দর্শনের অনেক কথা বলিতে হইবে এবং তাহাতে প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কাযেই তাহা সম্ভব নহে। এতদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে আমাদের কথা যে যথার্থ, তাহা ভবিষ্যতে প্রমাণ করা যাইবে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ কি, তাহা যেরূপ বৈশেষিক দর্শনের অন্যতম মুখ্য আলোচ্য, ন্যায়দর্শনের মুখ্য আলোচ্য তাহা নহে। কাযেই, দ্রব্য ও গুণের সম্বন্ধ কি, কি করিয়া বিভিন্ন দ্রব্যের ও বিভিন্ন গুণের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার সম্পূর্ণ বিশদ আলোচনা সাক্ষাৎ ভাবে বৈশেষিক দর্শনে পাওয়া যাইবে, ন্যায়দর্শনে তাহা পাওয়া যাইবে না। সাক্ষাৎ ভাবে ঐ আলোচনা ন্যায়দর্শনে পাওয়া যাইবে না বটে, কিন্তু পরোক্ষ ভাবে ঐ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শন-প্রণেতার যে-অভিমতের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা ন্যায়দর্শনের ঐবিষয়ক অভিমত যে সম্পূর্ণভাবে সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনের অনুরূপ, তাহা সপ্রমাণিত হইতে পারিবে।

শুধু সাংখ্য, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন কেন, ঋষিপ্রণীত সমগ্র ষড়্দর্শন, বেদ,পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ যে একই ভাবের কথায় পরিপূর্ণ এবং উহাদের পরস্পরের মধ্যে যে কুত্রাপি বিন্দুমাত্র বিরোধিতা নাই, তাহা প্রয়োজন হইলে প্রমাণিত হইতে পারে।

মনে রাখিতে হইবে, সত্যদর্শী না হইলে কেহ ঋষি বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না, সত্য সর্ব্বদাই এক, এবং দুইটি সত্যের মধ্যে মূলতঃ কোন বিভিন্নতা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। ঋষিগণ যেরূপ সত্যদর্শী, সেইরূপ তাঁহারা আবার 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'-সম্পন্ন। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিও এক। ("ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ"...ইত্যাদি —গীতা, ২য় অধ্যায়)।

কাযেই, কোন বিষয়ে দুইটি প্রকৃত ঋষির অভিমত অথবা মতবাদ কখনও দুই রকম হইতে পারে না। ইহা সত্ত্বেও যাঁহারা বিভিন্ন ঋষিদিগের মতবাদে বিভিন্নতা আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নির্ব্বোধ, অব্যবসায়ী এবং ঋষিদিগের মতবাদ বুঝিতে অক্ষম, ইহা বুঝিতে হইবে (বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্—গীতা, ২য় অধ্যায়)। এই অব্যবসায়িগণই কখনও বা পণ্ডিত, কখনও বা সন্ন্যাসী নাম ধারণ করিয়া সাময়িক ভাবে মানবসমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন। ইহারই জন্য আজ মানবসমাজ হইতে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং মানুষ যেমন বাই-নাচ, বল-নাচ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খলতা-পরিপূর্ণ নর্ত্তন-কুর্দ্দন, পান-ভোজন ও খেলা-ধূলাকে প্রকৃত আনন্দের পন্থা মনে করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইয়া উত্তরোত্তর অন্তঃসারশূন্য হয়, সেইরূপ কতক-

গুলি কুজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিয়া অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত হইতেছে।

মোটের উপর, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের খ-অংশ হইতে ছ-অংশ পর্য্যন্ত সমালোচনায় এতাবৎ যাহা দেখান হইল, তাঁহাতে দর্শনের প্রকৃত জ্ঞান থাকা তো দূরের কথা, প্রকৃত সংস্কৃত ভাষা কিরূপ ভাবে বুঝিতে হয়, সংস্কৃত ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার কি সম্বন্ধ, শব্দের সহিত অর্থের কি সম্বন্ধ, অর্থের সহিত বানানের কি সম্বন্ধ, তাহা যথাযথভাবে তাঁহার জানা নাই বলিয়াই, যথেচ্ছভাবে বাঙ্গালা পদের বানান করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন না এবং যাঁহারা ভাষার শৃঙ্খলা কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে আমূল জ্ঞান তো দূরের কথা, কথঞ্চিৎ জ্ঞানেরও কোন সাক্ষ্য তাঁহাদের সমগ্র জীবনের কখনও দিতে পারেন নাই, যাঁহারা ভাষার বিবিধ প্রয়োগ-বিষয়ে সর্ব্বদা উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াছেন, যাঁহারা আজ কবিসম্রাট, অথবা সাহিত্যসম্রাট বলিয়া আখ্যাত হইলেও আমাদের যুবক ও যুবতীগণের পরোক্ষভাবে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন বলিয়া অদূরভবিষ্যতে মনুষ্যসমাজে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণার যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাঁহাদের মত তাদৃশ মানুষের পদানুসরণ করিতে লজ্জিত হন না।

এতাদৃশ মানুষ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চপদাধিষ্ঠিত হইতে পারেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয় কি নিন্দার যোগ্য নহে?

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধের ক-অংশ আমরা আগামী বারে সমালোচনা করিব।

সংবাদ ও মন্তব্য

তরবারির শাসন

বোম্বাই এর ১৭ই জুলাই এর সংবাদ,—'হরিজন' পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কে স্বেচ্ছাকৃত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া গান্ধীজী এই সপ্তাহে 'হরিজন' এ 'কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—সর্ব্ব সাধারণ ভারতবাসী একবাক্যে বলিয়াছে যে, ইণ্ডিয়া এক্ট চালু করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু উহাকে তরবারির শাসনের পরিবর্ত্তে সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টা হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গান্ধীজীর এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য 'সম্পাদকীয়'তে দ্রষ্টব্য। এখানে ইহার যে কয়েকটি মন্তব্য বিষয়ে আমাদের ধোঁকা লাগিয়াছে, তাহাই উপস্থিত করিব। 'সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন' যে 'তরবারির শাসন' নহে, ইহা গান্ধীজীর বক্তব্য হইতে ধরা যাইতে পারে। কিন্তু যে-স্বাধীনতা এই এক্ট অনুযায়ী ভারতবাসী লাভ করিতে পারে নাই, সর্ব্বসাধারণ ভারতবাসী একবাক্যে ইহা বলিতেছেন বলিয়া সত্যাগ্রহী গান্ধীজী বলিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা যে 'তরবারির শাসন' ব্যতিরেকে আর কিছু, তাহা ইউরোপের স্বাধীন দেশসমূহের দিকে চাহিয়া কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সুতরাং বাস্তব অবস্থা বিচার করিলে বলিতে হয় যে, স্বাধীনতা লাভ করিলে আবার ভারতবাসীকে 'তরবারির শাসনে'ই ফিরিয়া যাইতে হইবে।—ইহাই কি যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে?

শিক্ষাবিভাগের ব্যয় ও আবগারী বিভাগ

ঐ প্রবন্ধেই গান্ধীজী বলিতেছেন:—কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আবগারী আয় হইতে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় না মিটাইয়া শিক্ষাবিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে এবং অবিলম্বে মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করিতে পারেন। আমার এই প্রস্তাব অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহাকে সম্পূর্ণ সহজ-সাধ্য মনে করি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

*

তা তিনি করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের জিজ্ঞাস্য কেবল এই যে, তাহা হইলে সংখ্যা-গরিষ্ঠদের শাসনের আমল বলিতে তিনি কি বুঝেন? সে কি তিনি যাহা একাকী সহজসাধ্য ও যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তাহাই, না আর কিছু? সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন, অর্থাৎ rule of majority—যাহাকে গণতন্ত্র বলা হয়, সেই democracy যে despotism (তা সে যতই benevolent হউক) নহে, ইতিহাস তাহাই বলে। আমরা অবশ্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নহি—এবং স্বৈরতন্ত্রেতো নিশ্চয়ই নহি।

জেল ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

ঐ প্রবন্ধেই তিনি অতঃপর বলিয়াছেন:—জেলগুলিকে সংশোধনা-গার ও কারখানায় পরিণতি করিতে পারা যায়। বর্ত্তমানে জেলগুলি শাস্তিদানের আগার এবং এইগুলি হইতে কোনও আয় হয় না, বরং কারাগারগুলির জন্য বহু অর্থব্যয় হয় কিন্তু কারাগারগুলির আয় দ্বারাই উহাদের ব্যয় মিটান এবং ঐ গুলিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

*

এতদিন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি 'কারাগার' ছিল (রবীন্দ্র নাথ এই কথা বলেন), সুতরাং এইবারে কারাগারগুলি যথাবিধি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে পারে। তবে ইহাতে একটা মুস্কিলের কথা এই যে, কারাগারগুলির হাজার দোষ থাকিলেও দুই বেলা 'লপ্‌সী' সেখানে পাওয়া যায়। সেগুলি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইলে মুস্কিলটা কোথায় দাঁড়াইবে, তাহা বোধ হয় বুঝা যাইতেছে। আমরা

ঢাকা বনাম কলিকাতা

গত ১৩ই জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন সভায় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতায় বলিয়াছেন: যুবকগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন যুগে বিশ্ববিদ্যালয়কে যুবকদের চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করা হয় নাই।

*

এমন ভাবে উচ্চৈঃস্বরে ডক্টর মজুমদারের শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করিবার চেষ্টা কি সঙ্গত হইয়াছে? কেন না কিছুদিন আগেই কি শ্যামাপ্রসাদ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি employment bureau অর্থাৎ চাকুরীসংগ্রহ বিভাগ খোলেন নাই?

'ইণ্টেলেকচুয়াল কালচার'

ঐ বক্তৃতাতেই ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন:—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং আদর্শ হইতেছে সংকোচ ও সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ইণ্টেলেকচুয়াল কালচারের বিস্তার।

*

এই 'ইণ্টেলেকচুয়াল কালচার'-এর সর্ব্বাপেক্ষা বড় পরিচয় কি? রাশি রাশি বই পড়িয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া পরীক্ষা পাশ করা এবং অতঃপর না খাইতে পাইয়া কাশিয়া কাশিয়া জীবনত্যাগ? তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে যে, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ও সর্ব্বাধিক ভাবে ইণ্টেলেকচুয়াল কালচারের ব্যবস্থা আছে।

শীর্ষস্থান

গত ১৩ই জুলাই পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের বাৎসরিক উপাধি-বিতরণ সভায় বাঙ্গালার গবর্ণর স্যার জন আণ্ডারসন বক্তৃতায় বলিয়াছেন এই সমাজের পণ্ডিতগণ যে দর্শন, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং অগণিত শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সমৃদ্ধির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিল।

*

এই কথাটা শুনিয়া শুনিয়া আমরা এমনই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি যে, ইহার সম্যক অর্থের উপলব্ধি আমাদের আর হয় না। যে-ভাষা, যে দর্শন ও যে-ধর্ম্ম একাদিক্রমে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধির এমন স্থান অধিকার করিবার সামর্থ্য দিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী কালে তাহাই 'পৃথিবীর সোনাঘর' হিসাবে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নিকট ভারতবর্ষের পরিচয় বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই ভাষা, ধর্ম্ম ও দর্শন কি সত্যই ধোঁয়া-ধোঁয়া, অস্পষ্ট কয়েকটি 'আধ্যাত্মিক' তত্ত্বের আধার, না, তাহার 'বস্তুতান্ত্রিকতা'ও আধুনিক বস্তুতান্ত্রিকতাকে হার মানাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া খুব কঠিন নহে।

ওরিয়েণ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

আমরা কিছুদিন পূর্ব্বে সমালোচনার্থ উক্ত কোম্পানীর ১৯৩৬ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট পাইয়াছিলাম। সংপ্রতি ১৯৩৪-৩৬ সালের একবিংশ ত্রৈবার্ষিক রিপোর্ট পাইয়াছি।

১৯৩৬ সনে কোম্পানী ১০ কোটী ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৪ শত ৯৬ টাকা মূল্যের ৫৩ হাজার ২ শত ৯৬ খানি নূতন বীমাপত্র বিক্রয় করিয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এই বর্ষে ৭ হাজার ৪ শত ৩৮টি বেশী বীমাপত্র বিক্রয় হইয়াছে। নূতন বীমার পরিমাণও এ বৎসরে গত বৎসর অপেক্ষা ১ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকার অধিক। এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর মোট চলতি বীমার পরিমাণ ৬৫ কোটী ৫০ লক্ষ ১ হাজার ২ শত ৭৮ টাকা এবং বীমাপত্রের সংখ্যা ৩ লক্ষ ০৭ হাজার ১ শত ১০।

আলোচ্য বৎসরে মোট চাঁদা আদা আদায় হইয়াছিল ২ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯ হাজার টাকার উপর, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ৩২ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকারও অধিক।

আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুজনিত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দরুন কোম্পানী মোট ১ কোটী ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার উপর দাবী পরিশোধ করিয়াছেন।

কোম্পানীর আয় ৪ কোটী ৪৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকার উপর হয়, ব্যয় হয় প্রায় ২ কোটী ১৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা এবং উদ্বৃত্ত থাকে ২ কোটী ৩৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকার উপর। কোম্পানীর ব্যয়ের অনুপাত মাত্র শতকরা ২২.৯। গত বৎসর অপেক্ষা এই সংখ্যা সামান্য কিছু বেশী, (শতকরা ৫) কিন্তু ইহার কারণ, এই বৎসরে নূতন কাজের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন কমিশন বেশী দিতে হইয়াছে।

বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ২২ কোটী ৬৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, ইহার মধ্যে মোট ফাণ্ড ১৯ কোটী টাকার কিছু অধিক, অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা প্রায় ২। কোটী টাকার অধিক। কোম্পানীর ফাণ্ড কোম্পানীর কাগজ, মুনিসিপালিটি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতির ডিবেঞ্চার এবং প্রথম শ্রেণীর ডিবেঞ্চারে দাদন দেওয়া রহিয়াছে সুতরাং নিরাপত্তার দিক্ দিয়া কিছুই বলিবার নাই।

ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, আগামী ৩ বৎসরের জন্য এনডাউমেণ্ট বীমায় প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ২২।০ টাকা এবং আজীবন বীমায় প্রতি বৎসর প্রতি হাজারে ১৮৲ টাকা হারে বোনাস্ ঘোষণা করা হইয়াছে। বোনাসের হার কিছু কমিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার কারণ এই যে গত তিন বৎসরে লগ্নীটাকার সুদের হার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে, সুতরাং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বোনাসের হার কিছু কমান সমীচীন হইয়াছে, বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমান বৎসরে সুদের হার পাওয়া গিয়াছিল শতকরা ৪.৭, কিন্তু ভ্যালুয়েশনে মাত্র শতকরা ৩.০ হিসাবে সুদ ধরা হইয়াছে।

ওরিয়েণ্টাল সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন; এই কোম্পানী যে ভারতের বীমাপ্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা উপরোক্ত হিসাব না বুঝিলেও সকলে জানেন। নূতন কাজের পরিমাণে কোম্পানী এই বৎসর নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। আমরা কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ভাদ্র ১৩৫৫

৫ম বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

ধর্ম্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা এবং কলিকাতার বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলন

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিবার লৌকিক প্রয়োজনীয়তা

অর্থের সংজ্ঞা

যাহার দ্বারা মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিতে সক্ষম হয়, সেই বস্তুকে সাধারণতঃ বর্ত্তমান যুগে অর্থ বলা হইয়া থাকে। বিবিধ ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ মুদ্রা এবং কাগজনির্ম্মিত নোট যে মানুষের অর্থরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার কারণ ঐ সমস্ত মুদ্রা এবং ঐ সমস্ত নোটের দ্বারা মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। যদি ঐ মুদ্রা ও নোটের দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব না হইত, তাহা হইলে যে উহাকে বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে অর্থ বলা চলিত না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অর্থের উপরোক্ত সংজ্ঞানুসারে মানুষের যাহা কিছু অপ্রয়োজনীয় তাহা ক্রয় করিবার জন্য মানুষ যে বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই বস্তুকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে "অর্থ" বলা চলে না। পরন্তু তাহাকে "অনর্থ" বলিতে হয়। কারণ, মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি যেরূপ তাহার জীবনধারণের ও জীবনের উন্নতিসাধনের সহায়তা করিয়া থাকে, সেইরূপ আবার অপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি তিল তিল করিয়া জীবননাশের ও জীবনের অবনতি সাধন করিবার কারণ হইয়া থাকে। আহার ও বিহারের জন্য মানুষ যে সমস্ত আসবাব ব্যবহার করিয়া থাকে, তন্মধ্যে যে দ্রব্যগুলি মানুষের দেহ ও মনের স্বাস্থ্য সাধন না করিয়া উহার স্বাস্থ্য অপচয় [illegible] বলিয়া প্রত্যক্ষ মানুষের জ্ঞানে নিশ্চিত হইয়াছে, সেই দ্রব্যগুলিকে অপ্রয়োজনীয় জিনিষের অন্তর্ভুক্ত ধরিলে আমাদের উপরোক্ত কথার সার্থকতা বুঝা যাইবে।

প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিষের কয়েক কথা লইয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে অর্থ এবং অনর্থের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, সেই পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিয়া আধুনিক কোন অর্থ-নৈতিক ধুরন্ধর অর্থের সংজ্ঞা স্থির করেন নাই। অধুনা প্রত্যেক দেশেই অর্থ যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, অর্থ-ব্যবহারে যে উপরোক্ত অর্থ ও অনর্থের মধ্যে পার্থক্যের কথা স্মরণ রাখিবার আবশ্যকতা আছে, তদ্বিষয়ে মনোযোগেরও কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। যদিও আধুনিক কোন কোন কেতাবে দেখা যায় যে, যাহার দ্বারা মানুষ তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ ক্রয় করিতে সক্ষম হয়, কেবল মাত্র সেই বস্তুর নামই অর্থ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আধুনিক জগতের

ছুতার ও কর্মকার-বংশোদ্ভব সাহায্যে নিম্নপ্রদত্ত অর্থের দ্বারা আহার ও বিহারের অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার উপকরণসমূহ পর্য্যন্ত ক্রয় করা সম্ভব হইয়া থাকে। আজকালকার প্রত্যেক দেশের মানুষ প্রায়শঃ অর্থোপার্জ্জন না করিলে যেরূপ ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকে, অর্থোপার্জ্জন করিলেও যে তদতোধিক ঋণভারে জর্জ্জরিত হন, তাহার অন্যতম কারণ, অর্থের সংজ্ঞার ও তাহার ব্যবহারের এতাদৃশ বিকৃতি। তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক জগতে অর্থের সংজ্ঞা ও তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে এতাদৃশ বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক দেশেই দারিদ্র্যের মাত্রা ও দরিদ্রের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং মানুষের পক্ষে একদিকে যেরূপ কোনরূপ প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন না করিয়াও সময় সময় ধনবান্ হওয়া সম্ভব হয়, অন্য দিকে আবার প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিয়াও মানুষ সময় সময় দরিদ্র থাকিতে বাধ্য হয়।

যেরূপ ভাবে অর্থ ব্যবহার করিলে মানুষের জীবনের কোনরূপ অনিষ্ট অথবা অবনতি না ঘটিয়া উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আধুনিক অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণের কোন প্রশংসার যোগ্য চেষ্টার সাক্ষ্য পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু চিরদিন মনুষ্য-সমাজে এতাদৃশ অবস্থা বিদ্যমান ছিল না।

যাঁহারা বেদাঙ্গোক্ত শব্দের স্ফোটবাদ অথবা শব্দানুশাসন অথবা মহেশ্বরসূত্র প্রত্যক্ষ করিয়া "অর্থ" শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা অথর্ব্ববেদের নবম অধ্যায়-প্রোক্ত "অর্থের প্রয়োজনীয়তা কোথায়", তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, শরীরবিধানের কোন্ কোন্ অঙ্গ ও কোন্ কোন্ কার্য্যের জন্য যে অর্থ মানুষের অপরিহার্য্য নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে, তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, ইহা যাঁহারা কল্পশিল্প হইতে পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীকুমারের শিল্পশাস্ত্রে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, মনুষ্য-সমাজে এমন একদিন বিদ্যমান ছিল, যখন অর্থ-ব্যবহারের সূত্র স্থির করিবার জন্য মানুষের হৃদয়ে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারিটি চিন্তা স্থান পাইয়াছিল:—

(১) স্বভাবতঃ বহু কর্ম্মসক্ষম অজ্ঞ মানুষ ইচ্ছা করিয়াও যাহাতে অপ্রয়োজনীয় জিনিষ (নিষিদ্ধ পান ভোজন ও বিহারাদি) ব্যবহার করিতে না পারে এবং দুর্নিবন্ধন তাহার যাহাতে অস্বাস্থ্য না হয়, তজ্জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত,

(২) স্বভাবতঃ বহু কর্ম্মক্ষম অজ্ঞ মানুষের অপ্রয়োজনীয় জিনিষ (নিষিদ্ধ পান ভোজন ও বিহারাদি) ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি যাহাতে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য অর্থ-ব্যবহারে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত;

(৩) মানুষ অজ্ঞই হউক আর জ্ঞানী হউক, ধনীই হউক আর কাঙ্গালই হউক, কর্ম্মক্ষমই হউক আর কর্ম্মক্ষমতাহীনই হউক, সুস্থই হউক আর অসুস্থই হউক, চরিত্রবান্ই হউক আর চরিত্রহীনই হউক—যাহাতে প্রত্যেক মানুষ জীবন-ধারণের জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি উপার্জ্জন করিতে পারে এবং জ্ঞান, চরিত্র ও কর্ম্মক্ষমতার তারতম্যানুসারে যাহাতে ঐ উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তাহা করিতে হইলে অর্থ-ব্যবহারে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত;

(৪) যাঁহারা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাঁহাদের হৃদয়ে যাহাতে অপ্রয়োজনীয় জিনিষ ব্যবহারের প্রবৃত্তির কোন ক্রমেই উদ্ভব না হয়, তজ্জন্য অর্থ-ব্যবহারে কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের প্রণীত অর্থ-শাস্ত্র ও শিল্প-শাস্ত্র যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহাদের প্রাণে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে সমাজের রক্ষা ও উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপরোক্ত চারিটি চিন্তা স্থান পাইয়াছিল, তাঁহারাই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চারিটি বস্তুকে এক সঙ্গে স্থান দিয়াছেন। এখন আর মানুষ ধর্ম্মের সহিত অর্থের কি সম্বন্ধ, অথবা অর্থের সহিত কামের কি সম্বন্ধ,

আহার, নিদ্রা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইবার পর জীব যখন উপরোক্ত ভাবে আহার্য্যের, অথবা শয্যার দ্রব্যের তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া আহার্য্যের রসে, অথবা শয্যার রূপ ও স্পর্শবিশেষের জন্য আকৃষ্ট হয়, তখনই মানুষের আহার ও নিদ্রার জন্য অনুভূতি "শুক্র" অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হয়।

মানুষের আহার, নিদ্রা প্রভৃতির জন্য অনুভূতি যখন শুক্র-অবস্থায় উপনীত হয়, তখন মানুষ "কামার্থী" হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে।

মনে রাখিতে হইবে যে, যে খাদ্য অথবা যে শয্যা প্রভৃতি পাইলে কিরূপ ভাবে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কার্য্য শক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়, প্রকৃত অর্থার্থী মানুষগণ কেবলমাত্র সেই খাদ্য ও সেই শয্যারই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁহারা খাদ্যের রস, অথবা শয্যার কোমলতা, অথবা কাঠিন্যের দিকে দৃকপাত করেন না।

যাঁহারা কামার্থী, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত হইতে হইলে যে কি রূপে স্বীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও কার্য্য-শক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা অনুভব করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না এবং সর্ব্বদাই খাদ্যের রস ও শয্যা প্রভৃতির কোমলতা ও কাঠিন্য প্রভৃতি লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন।

অর্থার্থী ও কামার্থীর উপরোক্ত দুইটি সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অর্থার্থী মানুষ সাধারণতঃ বুদ্ধিপ্রবণ ও কামার্থী মানুষ সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-প্রবণ হয়। অর্থার্থী মানুষ প্রকৃত মনুষ্য নামের যোগ্য, আর কামার্থী মানুষ পশুবৎ মস্তিষ্কসম্পন্ন হইয়া প্রকৃত মনুষ্য নামের অযোগ্য হইয়া থাকে। অর্থার্থী মানুষের প্রয়োজন নিতান্ত অল্প এবং অতি সহজেই তাহার অভাব দূরীভূত হইতে পারে। কামার্থী মানুষের প্রয়োজন বহু এবং তাহার অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয় না। অর্থার্থী মানুষ কেবল প্রয়োজনীয় জিনিষই চাহিয়া থাকে, আর কামার্থী মানুষ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জিনিষ উভয়েরই জন্য লালায়িত হয়।

অর্থার্থী ও কামার্থীর উপরোক্ত সংজ্ঞা দুইটি তলাইয়া চিন্তা করিতে পারিলে আরও দেখা যাইবে যে, মানব-সমাজে যখন অর্থার্থী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন মানব-সমাজ প্রকৃত বুদ্ধিমান্ মানুষবহুল হইতে পারিয়াছে, ইহা বুঝিতে হয় এবং তখন সমাজের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হয়। আর, যখন কামার্থী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন সমাজ বুদ্ধিহীন পশু-স্বভাবসম্পন্ন মানুষ-বহুল হইয়া পড়িয়াছে এবং তখন সমাজের পতন অনিবার্য্য, ইহা বুঝিতে হয়।

আজকাল মানবসমাজের কেন এত পতন হইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক এই পতনের অন্যতম কারণ, কামার্থী মানুষের বৃদ্ধি এবং অর্থার্থী মানুষের হ্রাস। সারা জগতে যাঁহারা বিভিন্ন বিভাগের নেতৃত্ব করিতেছেন, অথবা বিশেষজ্ঞ নামে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে, উহাঁরা প্রধানতঃ কামার্থী। জগতের কোন দেশে আধুনা একটিও প্রকৃত অর্থার্থী মানুষ বিদ্যমান আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিদ্যমান আছে। কোন দেশে যদিও বা দুই একটি প্রকৃত অর্থার্থী মানুষ বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন নেতার দলে নাম লেখাইতে পারেন নাই, পরন্তু নিভৃতে, আজকালকার 'ইন্টেলেক্চুয়াল' (অবশ্য বুদ্ধিমান্ নয়) মানুষগুলির জ্ঞান-বুদ্ধির অগোচরে কার্য্য করিতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমাদের ভারতবর্ষে গান্ধীজী, জওহরলালজী-শ্রেণীর মানুষগণ কোন্ চরিত্রের, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আজকালকার 'ইন্টেলেকচুয়াল' মানুষগণের মধ্যে কেহ কেহ ইঁহাদিগকে একটা কিছু বৃহৎ শ্রেণীর মনে করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইঁহারা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কামার্থী। যদি ইঁহারা কামার্থী না হইতেন, তাহা হইলে পানাহার প্রভৃতির জন্য ছাগদুগ্ধ, বিশেষ শ্রেণীর ফল অথবা তনয়ার শিক্ষার জন্য সাগরপারের কৃষ্টির প্রতি অপরিহার্য্য লোলুপতা দেখা যাইত না। আজ মানব-সমাজ নিতান্ত মোহমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাই যাহাদের চরিত্রের প্রায় প্রত্যেক পদবিক্ষেপে দানবতার উজ্জ্বল সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে, তাহারাও দেবতার নামে বিকাইয়া

পর কামার্থীর কাম্যবস্তু ও অর্থার্থীর প্রয়োজনীয় বস্তুর আদান-প্রদান যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে সাধিত হইতে পারে, অর্থশাস্ত্রের সহায়তায় তাহার ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হয়, কারণ মনস্তত্ত্বের নিয়মানুসারে যে দ্রব্য দুর্ল্লভ, তাহার প্রতি কামার্থিগণের যে আকৃষ্টতা থাকে, সুলভ দ্রব্যের প্রতি তাদৃশ আকৃষ্টতা থাকে না। এইরূপে বদ্ধ কামার্থিগণের কামার্থিতা যাহাতে বৃদ্ধি না পাইয়া অপেক্ষাকৃত সংযত থাকে এবং উহা উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ তাহাদের কাম্যবস্তুসমূহ যে উপায়ে অপেক্ষাকৃত কম অনিষ্টজনক এবং সুলভ হইতে পারে, দ্রব্যপ্রস্তুত-প্রকরণের ও অর্থব্যবহারের তাদৃশ ব্যবস্থায় মনোযোগী হইবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার যে শিক্ষায় ও যে প্রচারকার্য্যে ঐ কাম্য বস্তুগুলি যে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টজনক, তাহা মানুষে বুঝিতে পারে, সেই শিক্ষা ও সেই প্রচারকার্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সামাজিক ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দ্রব্যপ্রস্তুত-প্রকরণ, অর্থ ব্যবহার, শিক্ষা ও প্রচারকার্য্যের প্রত্যেক ব্যবস্থাটি একদিন ভারতে বিদ্যমান ছিল এবং এখনও সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের বদ্ধ-কামার্থী ভারতবর্ষের অগণিত মানুষগণ যেরূপ সংযত ও শৃঙ্খলিত, সেইরূপ সংযম ও শৃঙ্খলা ঐ স্তরের মানুষের মধ্যে জগতের আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

যাঁহারা উন্নতিশীল কামার্থী, তাঁহারা যাহাতে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তাহা করিতে হইলে বদ্ধ-কামার্থিগণের এবং অর্থার্থিগণের সংরক্ষণ ও উন্নতির জন্য যে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, সেই উভয়বিধ ব্যবস্থাই পর্য্যায়ক্রমে অবলম্বন করা আবশ্যকীয় হইয়া থাকে।

কোন কোন্ উপায়ে মানবসমাজের কামার্থিতা নির্ম্মূলতা অথবা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অর্থার্থিতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার আলোচনায় উপরে যাহা যাহা দেখান হইল, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে অর্থ কাহাকে বলে, দেহাভ্যন্তরস্থ কোন্ অনুভূতির জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হয়, অর্থার্থিতা কি করিয়া কামার্থিতায় পরিণত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার এবং প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, অর্থ কাহাকে বলে, দেহাভ্যন্তরস্থ কোন্ অনুভূতির জন্য অর্থের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হয়, অর্থার্থিতা কি করিয়া কামার্থিতায় পরিণত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কামার্থীর কাম্য বস্তু এবং অর্থার্থিগণের প্রয়োজনীয় বস্তু যাহাতে সুলভ হয়, তাহা করিতে পারিলে যে, সমাজের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কামার্থীর আর্থিক অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা যে সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে না, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি, অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে হইলে প্রকৃত অর্থার্থী হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে—ইহাও আগেই দেখান হইয়াছে। কাজেই এতদনুসারে বলিতে হয় যে, আর্থিক স্বচ্ছলতা সাধিত করিতে হইলে, মানুষ যাহাতে কামার্থী হইয়া অর্থার্থী হয়, তাদৃশ শিক্ষা ও প্রচারকার্য্য একান্ত আবশ্যকীয়।

চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পাদনের উপরোক্ত উভয়বিধ পন্থাতেই আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় অভ্যাসসমূহে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আধুনিক জগতের রাজা, ভিখারী, তথাকথিত ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি প্রত্যেকেই যে অর্থাভাবে অল্লাধিক পরিমাণে জর্জ্জরিত, তাহা সহজেই সপ্রমাণিত হইতে পারে। এতাদৃশ সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক আর্থিক অভাবের একমাত্র কারণ, উপরোক্ত অর্থশাস্ত্রের আলোচনার অভাব।

ধর্ম্ম-জ্ঞান যে লৌকিক উন্নতির জন্যও প্রয়োজনীয় তাহার সাক্ষ্য

মনের শান্তি, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে যাহা যাহা এই প্রবন্ধে এতাবৎ আলোচিত হইয়াছে,

সংজ্ঞা যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া, অথবা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে।

ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শরীরের কোন্ কোন্ অঙ্গ অবশ্য প্রয়োজনীয়, কোন্ কোন্ অঙ্গের মূলতঃ কীদৃশ পার্থক্য লইয়া স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য সংঘটিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে যে অনুভূতির সহায়তায় ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়, সেই সেই অনুভূতি পাইতে হইলে, মুখ্যতঃ যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অভাববশতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা প্রত্যক্ষ করা, অথবা প্রকৃত ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

কাযেই ধর্ম্ম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিতে হইলে কোন্ কোন্ বিধি ও নিষেধ অবশ্যপালনীয়, তাহার উত্তরে নিম্নলিখিত চারিটি সূত্র লিপিবদ্ধ করিতে হইবে :—

(১) কেবলমাত্র পুরুষগণই ধর্ম্ম সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার উপযুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।

(২) কোন স্ত্রীলোক কখনও কোন প্রকৃত ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার উপযোগিনী হইতে পারেন না।

(৩) পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত, অথবা প্রাচীন হিব্রু, অথবা প্রাচীন আরবী শিক্ষা করিয়া ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা নিজ শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবার উপযুক্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

(৪) পুরুষগণের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত, অথবা প্রাচীন হিব্রু, অথবা প্রাচীন আরবী শিক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই এবং ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা নিজ শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে অথবা ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন ধর্ম্ম-সম্মেলনের সভাপতিত্বে আহৃত হইতে পারেন না।

কলিকাতার বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলন সম্বন্ধে মন্তব্য

প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্মেলনে অবশ্যপালনীয় বিধি ও নিষেধ সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইল, তাহা স্মরণ রাখিয়া কলিকাতার বিশ্বধর্ম্ম-সম্মেলনে কে কে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একদিকে যেরূপ স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অন্যদিকে আবার পুরুষের মধ্যে যাঁহাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা, অথবা প্রাচীন হিব্রু ভাষা, অথবা প্রাচীন আরবী ভাষা সম্বন্ধে কোন পরিচয় পাওয়া যাইবে না, তাঁহারা পর্য্যন্ত সভাপতিরূপে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। ফলে, ঐ বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মেলনে ধর্ম্ম অথবা ধর্ম্ম-জ্ঞান কাহাকে বলে এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভ করিবার উপায়ই বা কি, একমাত্র তৎসম্বন্ধীয় কথা ছাড়া আবোল-তাবোল অন্য কথা অনেকই শুনা গিয়াছে। আধুনিক জগতে ধর্ম্মালোচনা কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার যথাযথ বিচারের ভার পাঠকবর্গের উপর ন্যস্ত হইল।

মনুষ্যধর্ম্ম

যে-কার্য্যের দ্বারা কোন্ কার্য্যটি কর্ত্তব্য, আর কোন্ কার্য্যটি অকর্ত্তব্য, কোন্‌টি ভ্রমহীন, আর কোন্‌টি ভ্রমপূর্ণ, ইহা বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম "ধর্ম্ম"-কার্য্য—এতাদৃশ ধর্ম্মের সংজ্ঞা যতদিন মানবসমাজে বিদ্যমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধর্ম্মের কথার উদ্ভব হইতে পারে না। পরন্তু সকল মানুষের একই ধর্ম্ম ইহা বুঝিতে হয়।

কার্য্যতঃও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের উদ্ভব হইবার আগে সারা জগতে এমন একদিন ছিল, যখন সর্ব্বত্র মানুষ একই রকম ধর্ম্মের উপাসনা করিত। তখন খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের, অথবা তৎসংলগ্ন কোন সম্প্রদায়েরই উদ্ভব হয় নাই।...

হ্যালো! হ্যালো!! হ্যালো!!!

রাষ্ট্রসভার প্রাইভেট সেক্রেটারী।—হ্যালো—কে?...স্পেন? কি খবর?—আবার কে? চীন?...জাপান—'ক্রস কনেকশন' হয়েছে বুঝি—কে? আবিসিনিয়া, জার্মানী, ইটালী?—এক সঙ্গে পাঁচটা কনেকশন দিয়েছে একেবারে—হ্যালো...হ্যালো...

বহির্জ্জগৎ

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

চীন-জাপান

অবশেষে চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল। যদিও কোন পক্ষই সরকারী ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি, কিন্তু উত্তর-চীনে সংগ্রাম যে আরম্ভ হয়েছে, তার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহে পোনেরো হাজারের অধিক

অস্ত্রসজ্জার চাপে প্রত্যেকেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত। সকলেই সকলকে থামিতে বলিতেছেন, কিন্তু কে প্রথমে থামিবে? জাপান, ইটালী, জার্ম্মানী, ব্রিটেন প্রত্যেকেরই এই সমস্যা।

[ইউনাইটেড ফিচার সিণ্ডিকেট

চীনা নিহত হয়েছে। পেইপিং-এর জেনারেল সু চে ইউ-য়ানের বাহিনী পরাজিত এবং স্বয়ং জেনারেল সুং পলাতক। এরোপ্লেন থেকে বোমা নিক্ষেপের ফলে বহু চীনা সহর বিধ্বস্ত। এরই মধ্যে উত্তর-চীনের অনেকখানি অংশ জাপানের হাতে এসেছে।

এই যুদ্ধের ফলাফল এখনও নিশ্চয় করে বলা যায় না। একটা কথা চলিত আছে, চীনারা ছাতা মাথায় দিয়ে যুদ্ধ করে। এক সময় চীনা সৈন্যদের সম্বন্ধে এই রকম উপহাসই করা হ'ত। অবশ্য এখন আর সমর-বিজ্ঞানে তাদের ততখানি অনভিজ্ঞ বলা চলে না। কিন্তু তাদের সমর-সজ্জা এখনও পর্য্যাপ্ত নয়। এরোপ্লেনের কলকব্জাও এত পুরোনো যে তা দিয়ে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে না। সুবিধার মধ্যে এই যে, তাদের সৈন্যবাহিনী বিপুল। তার একটা মূল্য আছে।

চীন পাছে গরিলা-যুদ্ধ আরম্ভ করে, এই ভয়ে ইতি-মধ্যেই জাপানকে মাঞ্চুকুওর পাঁচটি বাহিনীই নিযুক্ত করতে হয়েছে। চীন আরও বিস্তৃত ভাবে আক্রমণ করলে জাপানকে আরও সৈন্য জাপান থেকে আমদানী করতে হবে।

চীন কি প্রণালীতে যুদ্ধ করবে, এখনও তা জানা যায় নি। কিন্তু সে যদি আবিসিনিয়ার মত খণ্ড খণ্ড ভাবে গরিলা-রণনীতি অবলম্বন করে, তা হলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক রণকৌশলের সম্মুখে তার পরাজয় অনিবার্য্য। আবার জাপানও যদি জয়গর্ব্বে উন্মত্ত হয়ে একেবারে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তা হলে মস্কো দখলের পর নেপোলিয়ান যে ভাবে বিপন্ন হয়েছিলেন, তেমনি ভাবে তাকেও বিপন্ন হতে হবে। জাপানের বিমানবাহিনী অন্যান্য দেশের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিমান নয়, কিন্তু তার নৌ-বাহিনী অজেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। সম্ভবতঃ সে চীনের সমস্ত বন্দরগুলি অবরোধ করে বাইরে থেকে তার অস্ত্রসাহায্য পাওয়ার পথ বন্ধ করে দেবে। সে ক্ষেত্রে গরিলা-যুদ্ধ করা ছাড়া চীনের উপায়ও থাকবে না।

জাপানের সৈন্যবল সম্বন্ধেও সকলেরই ধারণা একটু অতিরঞ্জিত। বহুকাল পূর্ব্বে রুশিয়াকে পরাজিত করার পর জাপানের সামরিক শক্তি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, জারের আমলে রুশিয়ার সামরিক শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। তার উপর যুদ্ধস্থল রুশিয়ার রাজধানী থেকে এত দূরে এবং জাপানের

রাজধানী থেকে এত কাছে যে, এই জয়ের কৃতিত্ব ঢাক পিটাবার মত নয়।

জাপানের দাবী

জাপানের পররাষ্ট্র-সচিব ঘোষণা করেছেন, তাঁরা যুদ্ধ চান না, রাজ্যও চান না। কিন্তু দাবী করেছেন,—

(১) হোপেই-এর উত্তরাংশ এবং চাহার ছেড়ে দিতে হবে। হোপেই-এর দক্ষিণাংশ স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হবে। আর তার রাজধানী হবে টিয়েণ্টসিন্;

(২) টিয়েণ্টসিনের সন্নিকট টাংকুতে জাপানের নৌ-কেন্দ্র স্থাপিত হবে;

(৩) পেইপিং অঞ্চল থেকে চীনা সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিতে হবে;

(৪) কিন্তু জাপানীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে জাপানী সৈন্য থাকবে; এবং

(৫) জাপানী সৈন্যের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য একটি নূতন রাজ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

এই দাবীর অর্থ কি? হোপেইকে জাপান মাঞ্চুরিয়ার মত "স্বাধীন রাজ্যে" পরিণত করতে চায়, আর টাংকুতে জাপান একবার নৌ-কেন্দ্র স্থাপন করতে পারলে, একদিকে যেমন প্রয়োজন মত চীনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার সুযোগের অভাব হবে না, অন্যদিকে তেমনই চীন দখলেরও যথেষ্ট সুবিধা হবে। মোট কথা, জাপান কোন না কোন ছুতায় ধীরে ধীরে চীন গ্রাস করতে চায়।

এই পর্য্যন্ত বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, জাপানের সিভিলিয়ান সরকার চীনের সঙ্গে বড় রকমের সংগ্রাম (major war) চান না। চীনের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে বাণিজ্য-বিস্তারই তাঁরা লাভজনক মনে করেন। কিন্তু জাপানে সমরপন্থী দলের প্রভাব এখনও যথেষ্ট। উত্তর-চীনের সম্পদ জাপানকে প্রলুব্ধ করেছে। সে লোভ সংবরণ করা কঠিন। মাঞ্চুরিয়া দখল করে অর্থের দিক্ দিয়ে জাপান ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। শস্য-সম্পদশালী উত্তর-চীন অধিকার করে তারা সেই ক্ষতি পূরণ করে নিতে চায়।

উত্তর-চীনের উপর জাপানের লোভ বহুকালের। চীনে যখন গণতান্ত্রিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জাপানেরই প্ররোচনায় হোপেই-চাহার-পলিটিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি হিসাবে জেনারেল সুং চে-ইউয়েন তার বিরোধিতা করেছিলেন। সাত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-চীনে নানকিং সরকারের প্রভাব নষ্ট করার জন্য জেনারেল সুং নানকিং সরকারের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করতেও দ্বিধা করেননি। কিন্তু মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। পরিশেষে জাপানের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে মার্শাল চিয়াং উত্তর চীনের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) স্বীকার

ভাই ভাই। [ফ্রিৎস আইখেনবার্গ কর্তৃক এচিং হইতে

করতে বাধ্য হন। আজ অদৃষ্টের চক্রান্তে জেনারেল সুং-এর বিরুদ্ধে জাপান বেঁকে দাঁড়িয়েছে, আর মার্শাল চিয়াং চীনের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে তাঁর সাহায্যে অগ্রসর হয়েছেন।

জাপানের ভয়

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, জাপানের অভ্যন্তরীণ আর্থিক অবস্থাও ভাল নয়। এমন অবস্থায় যুদ্ধে নামলে তার বহির্বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি হবে। যারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তারা এই সুযোগে প্রশান্ত মহাসাগরকূলে বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করবে।

কিছুকাল পূর্ব্বে পৃথিবীর নয়টি প্রধান শক্তি এই মর্ম্মে এক চুক্তি করেছিল যে, চীনের সার্ব্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র-শাসনের পরিপূর্ণ ক্ষমতা অব্যাহত রাখা হবে। তথাপি আবিসিনিয়া ও স্পেনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, এ যুদ্ধে সাক্ষাৎভাবে কেউই দুর্ব্বল চীনের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হবে

মার্শাল চিয়াং কাই-শেক।

না। ইতিপূর্ব্বে জাপান যখন জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশে অগ্রাহ্য করে চীন আক্রমণ করেছিল, তখনও এরা কেউই কিছু করেনি, অথবা করতে সাহস করেনি।

এক রুশিয়া। তবে রুশিয়া এখনও নিজের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। তার উপর ভয় আছে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে [illegible] দিয়ে জার্ম্মানী তাকে আক্রমণ করতে পারে। এই সব বি[illegible] করে মনে হয়, রুশিয়ার পক্ষে জাপান-আক্রমণের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু জাপান তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারে না অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেই তো একটা যুদ্ধ বাধতে বাধতে বাধ না। আবার বাধতে কতক্ষণ? রুশিয়ার বিমানবাহিনী শক্তি জাপানের অজ্ঞাত নয়। জাপানের সহরগুলিও বিমা আক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট সুরক্ষিত নয়। ভ্লাডিভষ্টক্ থেকে কোনো মুহূর্ত্তে এরোপ্লেন এসে জাপানের নগরগুলি ধ্বংস ক দিয়ে যেতে পারে। চীনের সঙ্গে বড় যুদ্ধ বাধলে জাপা দুর্ব্বলও হবে। সম্ভবতঃ সেই ভয়ে জাপানের সিভিলিয়া সরকারের বড় যুদ্ধে আপত্তি। চীন জয় এখন আর আগে মত সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে জাপানের ব্যবহারের ফ চীনে জাপানের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে, তা বাণিজ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এবং এত বড় চীন দেশ দীর্ঘকা বিজিত রাখাও দুরূহ ব্যাপার। খুব সম্ভব সেই জন্যই জাপানের সিভিলিয়ান সরকার সহজে চীনকে অবনত করতে পারলে আর যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করতে চাইবে না।

চীনের জেদ

কিন্তু চীন এবার সহজে অবনত হতে সম্মত নয়। মার্শাল চিয়াং কাই-শেক বুঝেছেন, গরজে পড়ে জাপান এবার যদিও সন্ধি করে, অদূরভবিষ্যতে উত্তর চীন নিয়ে আবার একটা যুদ্ধ বাধবেই। তার চেয়ে জয়-পরাজয় যাই হোক্, এই যুদ্ধেই চীনের ভাগ্য পরীক্ষা হয়ে যাক্। তিনি জাপানের দাবী প্রত্যাখান করেছেন এবং জানিয়েছেন, চীনের সার্ব্ব-ভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোন সর্ত্তে তাঁরা জাপানের সঙ্গে আপোষ করতে প্রস্তুত নন। গৃহদ্বারে শত্রুকে সমাগত দেখে চীন আজ একতাবদ্ধ হয়েছে। মহাচীনের একতা সম্পাদনের এত বড় সুযোগ মার্শাল চিয়াং ছাড়েন নি। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধের উপর চীনের জাতীয় অস্তিত্ব নির্ভর করছে।

ফিলিপাইনের স্বাধীনতা

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট মিঃ ম্যানুয়েল কুইজোন সম্প্রতি দাবী করেছেন, ফিলিপাইনের স্বাধীনতার দিন ১৯৪৬ থেকে ১৯৩৮ কিংবা ১৯৩৯ সাল করা হোক্। এই দাবীর ফলে আমেরিকায় কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেছে। এ বিষয়ে বাধা দেবার কোন

সমস্ত অধিকার আমেরিকার নেই। বাধা তাঁরা দিতেও চান না। কিন্তু বলছেন, এত তাড়াতাড়ি ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিলে তারা অন্যান্য শক্তিপুঞ্জের, বিশেষ করে জাপানের বিরুদ্ধে কি করে আত্মরক্ষা করবে? মার্কিনের নৌ বহর এবং সৈন্য-বাহিনী এখনও ফিলিপাইন রক্ষা করছে। ম্যানিলা এবং অন্যান্য স্থানে চার হাজার মার্কিন সৈন্য আছে। আর আছে ছ-হাজার ফিলিপাইন স্কাউট্। ম্যানিলা সাগরকূলে রয়েছে আমেরিকান এসিয়াটিক স্কোয়াড্রন। ফিলিপাইনে কমন-ওয়েলথ্ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাত্র দেড় বৎসর। যদি ১৯৩৮ কিংবা ১৯৩৯ সালে ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সেখানে আর মার্কিন সৈন্য থাকতে পারবে না। আমেরিকার সাহায্যে দেশরক্ষার সুবিধা যাবে ফুরিয়ে।

কিন্তু তার জন্যে ফিলিপিনোরা যে খুব বিচলিত হয়ে উঠেছে, এমন মনে হয় না। মাত্র আঠার মাসে দেশ শাসন ও দেশ রক্ষা সম্বন্ধে যে কৃতিত্ব তারা দেখাচ্ছে, তার উপর হয়ত নির্ভর করা চলে না সত্য। কিন্তু নিজের শক্তির উপর তাদের অখণ্ড বিশ্বাস আছে। তারা মনে প্রাণে জাতিগঠনের কাজে লেগেছে।

তাদের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতি কি রূপ নেবে, তা নিয়ে আলোচনা এখনও শেষ হয়নি। একদল দৃঢ় ব্যক্তিগত শাসনের পক্ষপাতী। একদল সমর-সম্ভারবৃদ্ধির পক্ষপাতী। আর এক দল জাতির সামাজিক ও অন্যান্য কল্যাণকর কার্যে আত্মনিয়োগ করার পক্ষপাতী। প্রেসিডেন্ট কুইজোন দৃঢ় ব্যক্তিগত শাসনের পক্ষে। ইনি একজন সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী আইন ব্যবসায়ী। প্রতিপক্ষকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করতে সিদ্ধহস্ত। এখানকার শাসন-পদ্ধতি গণতান্ত্রিক হলেও কুইজোন ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারের মতই ব্যবহার করেন। শাসন-ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা মুসোলিনীর চেয়েও বেশী। ইনি সমর-সম্ভারবৃদ্ধির পক্ষপাতী এবং দেশে প্রভূত পরিমাণে সামরিক শিক্ষার প্রচলন করেছেন। সুতরাং দেশরক্ষার ব্যাপারে ইনি যে মার্কিনের মুখাপেক্ষী নন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

ম্যাক্‌আর্থার প্ল্যান

যুক্তরাষ্ট্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল ডগলাস ম্যাক্‌আর্থার এখন প্রেসিডেন্ট কুইজোনের সামরিক পরামর্শদাতা। তিনি এখন ফিলিপাইন বাহিনীর ফিল্ড-মার্শেল। তিনি প্ল্যান করেছেন যে, দেশরক্ষার জন্য স্থায়ী-ভাবে উনিশ হাজার সৈন্য থাকবে। কিন্তু বৎসরে চল্লিশ হাজার লোককে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হবে। প্রয়োজন হলে এরাও লড়াই করতে পারবে। সামরিক

ম্যানুয়েল কুইজোন: ফিলিপাইন কমনওয়েলথের সভাপতি। মুসোলিনীর ইটালীয়দের উপর যে প্রভাব, ফিলিপিনোদের উপর কুইজোনের তদপেক্ষা অধিক প্রভাব। ওয়াশিংটনে আসিয়া কুইজোন যে-ভাবে সাংবাদিকগণের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, তাহাই এই চিত্রে দেখানো হইয়াছে।

বিভাগের ব্যয় নির্বাহের জন্য বৎসরে এক কোটি ষাট লক্ষ 'পেসস' বরাদ্দ হয়েছে।

ফিলিপাইনের একটা সুবিধা এই যে, বিস্তৃত তটভূমির মধ্যে মাত্র দুটি ছাড়া এমন বন্দর নেই, যেখানে শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজ এসে নোঙর ফেলতে পারে। দেশটি চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত। এ সব যথেষ্ট সুবিধা সন্দেহ নেই,

কিন্তু জাপানের হাতে ঐ জঙ্গল কতক্ষণ পর্য্যন্ত জঙ্গল থাকবে সন্দেহ আছে। ফিলিপাইনের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্বে জাপানের অধীনস্থ দ্বীপপুঞ্জ। সেখান থেকে জলপথে এবং বিমানপথে তারা যে কোন মুহূর্ত্তেই ফিলিপাইন আক্রমণ করতে পারে।

জাপান সম্বন্ধে একটা ভয় ফিলিপাইনের আছে। পেড্রো গেভারা নামে এক ব্যক্তি এর আগে ওয়াশিংটনে ফিলিপাইনের কমিশনার ছিলেন। রাজনীতি থেকে অবসর নেওয়ার ফলে তিনি ফিলিপাইনের সম্পর্কে যে কথা স্পষ্ট করে এখন বলতে পারেন, তা অন্য কেউ পারবে না। তিনি বলেছেন,—"জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করার পর থেকে ফিলিপাইনের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা নেওয়া কতখানি বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ এসেছে। ফিলিপাইনের সম্পদ্ এবং তার ভৌগোলিক অবস্থানের লোভে জাপান যে ফিলি-পাইনে প্রভুত্ব করতে চায়, এ কথা সকলেই জানে। তারা প্রথমে আসবে বাণিজ্য করতে, তার পরে রাজনীতিক ক্ষমতা হস্তগত করবে।"

এই উক্তির মধ্যে কতখানি মার্কিনের প্রচারকার্য্য বলা শক্ত। ফিলিপাইনে প্রায় বিশ হাজার জাপানী বাস করে। তারা প্রায় দেড় লক্ষ একর জমি চাষ করে। ফিলিপাইন কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জাপানী চাষীদের আর নূতন জমী লীজ দিচ্ছে না। ফিলিপাইনের বাজারও জাপানী বস্ত্রে ছেয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চীনা ব্যবসায়ীরাও পারছে না। মাছের ব্যবসাও বেশীর ভাগ জাপানীদের হাতে। মিঃ আটস্থুসী কিমুরা এক বক্তৃতায় আশা করেছেন, এর পর থেকে এখানে মার্কিনের ব্যবসা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। তখন জাপানই একমাত্র দেশ, যারা সস্তায় মাল যোগাতে পারে।

কিন্তু এ রকম কথা জাপানের মধ্যে খুব কম লোকেই বলে। এমন কি দেখা গেছে, জঙ্গলের মধ্যে বুনোদের হাতে মাঝে মাঝে যে সকল জাপানী নিহত হয়,তাদের সম্বন্ধে জাপান সরকার একটাও প্রতিবাদ জানায় নি।

স্বর্ণরপ্তানী

বস্তুত পক্ষে ফিলিপাইনের ভাগ্য আমেরিকার সঙ্গে স্বর্ণ-সূত্রে গ্রথিত। সমস্ত দেশে প্রায় সাড়ে তিনশত সোনার খনি আছে। এই সমস্ত খনি থেকে ১৯৩২ সালে ২,৪৪,২৯২ আউন্স সোনা উঠেছিল। তার দাম প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার। ১৯৩৫ সালে উঠেছিল ৪,৪৯,০৮৬ আউন্স। ১৯৩৬ সালে যে পরিমাণ সোনা উঠেছিল, তার মূল্য প্রায় সওয়া দু'কোটি ডলার। আসছে দশ বৎসরে এর দ্বিগুণ পরিমাণ সোনা উঠবে বলে আশা করা যায়। এই সমস্ত সোনা আমেরিকায় চালান যায়। এ ছাড়া বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টন লোহাও ওঠে, তার সমস্তটাই জাপানে চালান যায়।

একটা কথা সত্যি যে, মার্কিনের বাজারটা পাওয়ায় ফিলিপাইনের বহির্ব্বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এই যুক্তি দেখিয়ে তার স্বাধীনতার পথ বন্ধ করা চলে না।

ইরাণের ভবিষ্যৎ

বছর দুই হল পারস্যের নাম বদলে ইরাণ রাখা হয়েছে। ১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ইরাণ কাজার বংশের শাসনাধীন ছিল। সেই বৎসরই ইরাণের ব্যবস্থা-পরিষদ মজলিশের বিধানে কাজার বংশের শেষ শাহ সুলতান আহম্মদ সিংহাসনচ্যুত হন এবং সমর-সচিব রেজা পহলবী শাহ নির্ব্বাচিত হন। ১৯২৬ সালের ২৫শে এপ্রিল রেজা শাহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

এই সময় পর্য্যন্ত ইরাণ ইংলণ্ডের অভিভাবকত্বে ছিল। ইরাণের শাসনকার্য্য চালাবার জন্যে ইংলণ্ড পাঠাত বিশেষজ্ঞ, ইরাণের সৈন্যবাহিনী সুশিক্ষিত করার ভার ছিল ইংরেজের ওপর; রাস্তা এবং রেলপথ তৈরী করত ইংরেজ, দিত টাকা ধার; তার বদলে ইরাণের শুল্ক-বিভাগ, টেলিগ্রাফ, তেলের খনি এবং নোট তৈরীর ভারও ছিল ইংরেজেরই উপর। কিন্তু এই একটি লোকের আবির্ভাবে চাকা একেবারে ঘুরে গেল।

১৯৩২ সালের ২৭শে নভেম্বর ইরাণের নূতন সরকার ঘোষণা করলেন, পূর্ব্বতন শাহের আমলে ইংলণ্ড যে সকল সুবিধা চাপ দিয়ে আদায় করেছেন, নূতন নিয়মতান্ত্রিক শাসনে সে-সব সুবিধা তাঁরা পেতে পারবেন না। ফলে আর সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিয়ে ইংলণ্ড কেবল তেলের খনির বন্দোবস্ত-

টুকু কোন প্রকারে বজায় রাখে। তাও এই সর্ত্তে, এই সমস্ত খনির জন্য ইংলণ্ড ইরাণকে বছরে সাড়ে সাত লক্ষ পাউণ্ড 'রয়ালটি' দেবে। ইরাণ ইচ্ছা করলে অন্যান্য খনি যে কোন কোম্পানীকে দিতে পারবে।

সোভিয়েট বাণিজ্য

ইরাণের উপর যখন ইংলণ্ডের প্রভাব কমতে লাগল, তখন স্বভাবতঃই রুশের প্রভাব বেড়ে যেতে লাগল। উত্তর-ইরাণেই রুশের প্রভাব সবচেয়ে বেশী বাড়ল। বছরে এক কোটি কুড়ি লক্ষ ডলারের রুশীয় মাল ইরাণে আমদানী হতে লাগল। ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত এই রকম চলল। সেই সময় দেখা গেল, রুশের প্রভুত্ব ইরাণ খুশী মনে নেয়নি। ১৯১১ সালে সোভিয়েট তেল ইরাণে আমদানী হয়েছিল ৮৫৭২৬ টন। ১৯২৫ সালে মাত্র ১২৮০১ টন।

১৯৩৫ সালের আগষ্ট মাসে সোভিয়েটের সঙ্গে ইরাণের একটা বাণিজ্যচুক্তি হল, যাতে সোভিয়েট ইরাণের রপ্তানী মালের শতকরা ৪০ ভাগ নিতে রাজী হল। আর স্থির হল, ইরাণের কাছ থেকে রুশিয়া তুলা, মেওয়া ফল, চাল, পশম ও চামড়া নিয়ে তার বদলে যন্ত্রপাতি ও ফ্যাক্টরীর অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিষ সরবরাহ করবে।

এ পর্য্যন্ত রুশিয়া ইরাণে সুতার কাপড়, চিনি, তেল এবং দিয়াশলাই রপ্তানী করে এসেছে। কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় ইরাণে কল-কারখানার যত উন্নতি হতে লাগল, রুশিয়া থেকে রপ্তানীও তত কমতে লাগল। ফলে সোভিয়েট এখন যে সব জিনিষ রপ্তানী করে, তার মধ্যে লোহা ও ইস্পাত, চাষের সরঞ্জাম এবং এই ধরণের জিনিষই বেশী।

রুশের বাণিজ্যবিস্তৃতি দেখে অনেকে আশঙ্কা করেছিল, তারা একদিন ইরাণ গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু রেজা শাহের আমলে রুশিয়ার সঙ্গে যে-সকল সন্ধিপত্র ও পর্য্যায় হয়েছে, তাতে মনে হয় এই আশঙ্কার অনুরূপ সম্ভাবনাও নেই।

ইরাণে জার্ম্মান

গত কয় বৎসরে ইরাণে জার্ম্মানের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত ইরাণে প্রায় ১২০০ জার্ম্মান নানা স্থানে দোকান খুলে বসেছে। সিল্ক, চামড়ার কল, কাচ, টালি ও কার্পেটের ব্যবসায়ের অনেকগুলি জার্ম্মান কর্ম্মচারীর পরিচালনায় চালিত হচ্ছে। ট্রান্স ইরাণিয়ান রেলপথের কতক গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় ঠিকার কাজ এবং যুদ্ধের লরী, কামান প্রভৃতির সরবরাহ কতকগুলি জার্ম্মান কোম্পানী পেয়েছে। গত জানুয়ারীতে ডাঃ শাখট তেহারাণ এসেছিলেন। সেখান থেকে তিনি আঙ্গোরা যান। এঁর নানা জনে নানা অনুমান করছে। এই সব অনুমানের কোন ভিত্তি আছে কি না কে বলবে? তবে ক্ষুধার্ত্ত জার্ম্মানী খাদ্যের জন্য চারিদিকে যে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্রহিসাবে পৃথিবীব্যাপী সমর-সজ্জা যুদ্ধগ্রহকে ক্রমাগতই পৃথিবীর নিকটতর করিয়া তুলিতেছে। [বাল্টিমোর সেজেট

রেজা শাহ ইরাণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। যতদিন ইরাণ শিল্প বাণিজ্যে অনুন্নত থাকবে, ততদিন বৈদেশিক প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হবে না। তিনি দেশের কৃষির উন্নতির দিকে সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের কাজও ইরাণে আরম্ভ হয়েছে।

শিল্প ও বাণিজ্য

ইরাণ থেকে বিদেশী প্রভাব নির্ম্মূল করবার জন্য একটা

নূতন রেলপথ তৈরি হচ্ছে,—ট্রান্স-ইরাণিয়ান রেলওয়ে। এই রেলপথ পারস্য উপসাগর থেকে কাস্পিয়ান সাগর পর্য্যন্ত প্রায় হাজার মাইল দীর্ঘ। পারস্য উপসাগর কূলের বেন্দিসাপুর থেকে রেলপথ আরম্ভ হয়েছে, শেষ হয়েছে বন্দরইশাহে। আশা করা যাচ্ছে, ১৯৩৯ সালে নির্ম্মাণকাজ শেষ হবে। ইরাণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয়। সে জন্য কাজ যথেষ্ট দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না। আর একটি রেলপথ তৈরি হবে তুর্ক-ইরাণ সীমান্ত থেকে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত। চাবুসে একটি নূতন বন্দরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়েছে। এই সব কাজ শেষ হলে ইরাণের সঙ্গে বাহিরের জগতের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হবে। ইরাণের মাল সহজে বিদেশের বাজারে স্থান পেতে পারবে। ফলে বিদেশী প্রভুত্ব অনেকখানি হ্রাস পাবে। ট্রান্স-ইরাণিয়ান রেলপথ শেষ হলে উত্তর-ইরাণে রুশিয়ার রপ্তানী কমে যাবে। কারণ তারা ঢের সস্তায় তাদের দেশের পণ্যই পেতে পারবে।

ইরাণ সামরিক শক্তিতে বলশালী নয়। তার সৈন্যবল প্রায় আশী হাজার। পারস্য উপসাগরে একটি ছোট নৌবহরও আছে এবং বিমানকেন্দ্রের সূচনাও দেখা যাচ্ছে। তা দিয়ে মাত্র দেশশাসনের কাজই চলতে পারে। তার বেশী কিছু করার প্রয়োজনও এখনও ঘটেনি। রেজা শাহ পহলভী একদিকে আফগানিস্থান অন্যদিকে তুরস্কের সঙ্গে মৈত্রীসম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তিনি নিজে আঙ্গোরা গেছেন এবং আফগানিস্থানের আমীর তেহারান এসেছিলেন। মনে হচ্ছে, এই তিনটি দেশের সমবেত চেষ্টায় পূর্ব্ব-এসিয়ায় পাশ্চাত্যের প্রভাব লুপ্ত হবে।

প্যালেষ্টাইন

প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদী অধিবাসীদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে হানাহানি চলছিল, তাদের অভিভাবক ইংরেজ সরকার স্থির করলেন, প্যালেষ্টাইন দ্বিখণ্ডিত করা ছাড়া এই হানাহানির আর কোন প্রতিকার নেই। সেই অনুসারে একটা কমিশন বসল। কমিশন প্যালেষ্টাইনকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগ দিলেন ইহুদীদের, এক ভাগ আরবীয়দের। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অ[illegible] তথাপি মিটল না। রিপোর্ট প্রকাশিত করার পূর্ব্বে[illegible] ইহুদী সম্প্রদায়কে গোপনে দেখান হল। সেই সঙ্গে ট্রান্সজর্ডানের আমীর আব্দুল্লাকেও দেখান হল।

ইহুদীদের এতে আপত্তির কারণ ছিল না। কারণ দেশের উত্তর-দক্ষিণ অংশ তাদের ভাগেই পড়েছে। আপত্তি করেছিলেন আমীর আব্দুল্লা। কিন্তু তাঁকে গোপনে ভরসা দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে এ রাজ্য তাঁর হাতেই এসে যাবে। এই ভাবে কিছু কালের জন্য আপত্তি বন্ধ হল। বন্ধ হল হানাহানি, বন্ধ হল রক্তপাত। কিন্তু জুলাই-এর মাঝামাঝি ইহুদীরা আবার বেঁকে বসল। তারা ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী মিঃ অর্মসবি গোরের কাছে আরও কতকগুলি নূতন দাবী উপস্থিত করলে। সঙ্গে সঙ্গে আরবের জাতীয় দলও আপত্তি জানাতে লাগল।

আরবীয়দের দাবী

আরবীয়দের প্রধান আপত্তির কারণ হচ্ছে, দক্ষিণ-প্যালেষ্টাইনের বীরসেবা জায়গাটা নিয়ে, এককালে এই অংশ ইজরাইলের অধীনে ছিল। প্যালেষ্টাইনের সব চেয়ে বড় বন্দর হাইফা এই অংশেরই মধ্যে।

বীরসেবা বা প্রাচীন নেজেব থেকে মিশর বেশী দূর নয়। আরবীয়েরা এই অংশের অধিকার পেলে কখন যে মুসোলিনী তাদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেয়, তার স্থিরতা নেই। কারণ "ইসলামের মুক্তিদাতা" হওয়ার ইচ্ছা মুসোলিনী এখনও ত্যাগ করেন নি। আমীর আব্দুল্লা এ সব কথা ভাল করেই জানেন। কিন্তু ইংরেজ বিশেষজ্ঞগণ যতই এই অংশ ছেড়ে দিতে বাধা দিচ্ছেন, আমীরেরও এই অংশ পাওয়ার জেদ তত বেড়ে যাচ্ছে।

তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্যালেষ্টাইনের প্রাগুমুফতী, বড় মুফতী হজ আমীন অল হুসেনী এবং তাঁর ভাই জামাল হুসেন।

কমিশনের রিপোর্টে হতাশা প্রকাশ করে জামাল সংপ্রতি লণ্ডনের এক সভায় বলেছেন :—

"গ্রেটব্রিটেন প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্যালেষ্টাইনকেই ইহুদীদের জাতীয় আবাসে পরিণত করা হবে, এমন কথা ছিল না।

একই ব্যক্তি ও একই সমস্যা

দশ বৎসর পূর্ব্বেও যে-সমস্যা ছিল, দশ বৎসর পরেও সেই সমস্যা—সংসার চলে না। তখন বেকার ছিলেন, এখন 'বড়া সাব' হইয়াছেন—তফাৎ এই।

তোমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, কি করে যে কি হল, আমি ভাল বুঝতে পারছি না। কেবল এটুকু বুঝতে পারছি, অনেক যত্নে যে তাসের ঘর রচনা করেছিলাম, আমার নিজের নিশ্বাসে হুড়মুড় করে সে সব ভেঙ্গে গিয়েছে। আমি এমন সৃষ্টিছাড়া কাল-নাগিণী যে, নিজের লেজ কামড়ে নিজের মাথার বিষে নিজেই আমি মরে গেলাম। বিষটা মাথায় থাকলে হয় ত বাঁচতাম, অমন অনেকেই বেঁচে আছে, বিষটা তাদের কাছে অমৃতের সমান, কারণ, ওই বিষ দিয়ে অপরকে মেরে ফেলা যায়—এই হিংসার যুগে এতবড় পরিতৃপ্তি যা দিতে পারে সে বিষ অমৃত বৈ কি! কিন্তু আমার মাথাটা খারাপ কি না, নিজের বিষদাঁত তাই নিজের উপরেই ব্যবহার করে নূতন একস্‌পেরিমেণ্ট করতে গেলাম।

তুমি জান, আমার জীবনটা কি রকম খাপছাড়া। আমি নিজে খাপছাড়া মানুষ বলে আমার জীবনটা খাপ-ছাড়া হয়েছে অথবা আমার জীবনটা খাপছাড়া বলে আমি খাপছাড়া হয়েছি, এ সব ধাঁধাঁ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এ সব হল আমার নিজস্ব ধাঁধাঁ। আমার ধাঁধাঁ আমারই থাক, সময়মত দড়ির ফাঁসে আচ্ছা করে বাঁধব। তোমার প্রেম ছাড়া আমার গলায় দড়ি দেওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে—এ ধাঁধাঁটা তোমার। তোমার ধাঁধাঁটার জবাব শুধু আমি দিয়ে যাব।

আমি জবাব দিয়ে না গেলে তুমি নিজে নিজে যে জবাবটা ঠিক করে নেবে, মরে গেলেও আমার তা সহ্য হবে না অনুপম।

বাবা মোটা মোটা বই পড়তেন, মোটা মোটা কথা বলতেন। বইয়ের কথা কলেজের ছেলেদের বলার জন্য পারিশ্রমিকও পেতেন মোটা। মেজাজটাও বাবার ছিল তাই গরম। চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে বাবা যখন হাই-স্পিডে সমাজ, ধর্ম্ম, সভ্যতা, জীবন, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের তত্ত্ব-কথা আমার ভবিষ্যৎ স্বামীকে শোনাতে শোনাতে রেগে আগুন হয়ে উঠতেন, আর আমার ভবিষ্যৎ স্বামী ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, জীবন, [illegible] আমাকে শোনাতে শোনাতে ক্ষেপে যেতেন, তখন দু'জনকে দেখেই আমি হয়ে যেতাম মুগ্ধা। বাবার জন্য অনুভব করতাম গভীর শ্রদ্ধা, ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্য অনুভব করতাম গভীর প্রেম। না, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেম নয়। আমার বাবা অথবা আমার ভবিষ্যৎ স্বামী দুজনের একজনও, প্রেম বলতে তুমি যা বোঝ, সে প্রেমে বিশ্বাস করতেন না। প্রেম সম্বন্ধে বাবার মত ছিল, সাতজন জার্ম্মান প্রেম-বিশেষজ্ঞের মত বাছিল-করা নূতন একটা মত, আর স্বামীর মত ছিল ঐ সাতজন জার্ম্মান ভদ্রলোকের মতকে স্বদেশী ছাঁচে ঢেলে নিলে যা দাঁড়ায়, তাই। অর্থাৎ অনুবাদ নয়, মর্ম্মানুবাদ। এইজন্য ভবিষ্যৎ স্বামীর মতটাই আমার বেশী ভাল লাগত।

কেবল প্রেম নয়, সব বিষয়েই আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর এ রকম মর্ম্মানুবাদের আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। আসলে, এই জন্যই সে মহাত্মাকে আমি আমার স্বামী হবার অধিকার দিয়েছিলাম।

নতুবা তরঙ্গ হেন মেয়ে, জগতে আর জোড়া নেই, পৃথিবীর আর সব মেয়ে বক হলে যাকে কেবল হংসী নয়, রাজহংসী বলা ছাড়া উপায় থাকে না, সেই তরঙ্গের স্বামী কি যে-কেউ হতে পারে, ও রকম মহাপুরুষ ছাড়া?

হে সিগারেটপায়ী অভিমানী বালক অনুপম, কোথায় লাগ তুমি আমার সেই স্বামীর কাছে! তার তুলনায় তুমি কীটানুকীট। তুমি হলে খবরের কাগজে নিউজ ট্র্যান-স্লেটরের ইংরাজী খবরের ট্র্যানশ্লেসন, আমার তিনি ছিলেন গল্পে কবিতায় সাহিত্যিকের ইংরাজী সাহিত্যের মর্ম্মানু-বাদ। রূপকটা বুঝতে পারলে? আর একটু পরিষ্কার করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। তখন আমি খাঁটি ভারতীয় প্রথায় খাঁটি বিলাতী ফিল্মের ষ্টারদের মত হাসতে পারতাম বলে তিনি আমার প্রেমে পড়েছিলেন, আর তুমি আমার প্রেমে পড়লে আমি যখন খাঁটি বিলাতী প্রথায় দেশী ফিলমের ষ্টারদের মত হাসতে শিখছি।

বাড়িয়ে বলিনি। ভবিষ্যৎ স্বামীর জন্মদিনে ভবিষ্যৎ স্বামী আমায় বললেন, জন্মদিনে একটা প্রেজেণ্ট চাই তরঙ্গ।

আমি বললাম, কি চাই ? মোটে তো বেজেছে নটা, আমি নিজে গিয়ে কিনে নিয়ে আসব।

তিনি বললেন, ওসব প্রেজেন্ট নয়। আমার সঙ্গে একা সিনেমায় যেতে হবে।

আমি বললাম, চলুন।

তিনি বললেন, তোমার বাবাকে বল ?

আমি মুচকে হেসে বললাম, বাবাকে আবার কি বলব ? আমার তেমন বাবা নন্ যে, খারাপ লোকের সঙ্গে [illegible] নটার পরে সিনেমায় গিয়ে নিজের ভালমন্দ বজায় রাখতে পারব না ভেবে ছটফট করবেন। জানেন, আমি [illegible] হাতের মানুষ করা [illegible] ?

সিনেমা দেখিয়ে মাঠে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রোপোজ করলেন। বললেন, আমার হাসি অমুকের মত, দাঁত অমুকের মত, চোখ অমুকের মত, মুখ অমুকের মত, কথা অমুকের মত, চলন অমুকের মত। অমুকরা সবাই সিনেমা স্টার নয় বলে রাগ করলাম না।

তারপর তুমি। তুমি কবে আমার কাছে প্রথম বিহ্বল হয়েছিলে মনে আছে ? আমাকে দেশী ফিল্ম [illegible] সেদিন বাড়ী ফিরতে চাওনি, সহরতলীতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলে। তুমিও সেদিন গদগদ হয়ে বলেছিলে, আমি না কি অনেকটা অমুকের মত।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার অনুকৃতির দর কত করে ?

তাতে কি গভীর আঘাতই তোমার লেগেছিল !

একবার গঙ্গার ঘাটে ছোট একটা ছেলে জলে ডুবে মরবার আবদার ধরায় তার মাকে তার গালে চড় মারতে দেখেছিলাম। ছেলেটা যে ভাবে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠবার উপক্রম করেও কাঁদেনি, ভাবপ্রবণতায় ডুবে মরতে গিয়ে আমার কথায় ঘা খেয়ে তুমিও সেদিন তেমনি মুখভঙ্গি করেছিলে।

আজ আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি গলায় দড়ি দিয়েছি শুনে তুমি নিশ্চয়ই সেই রকম মুখভঙ্গি করবে।

যদি একবার দেখতে পেতাম !

মনে ক'র না যে, দেখতে পেলেও কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আমার আর কোন লাভ হত। রোমান্টিসিজ্‌ম-এর মিথ্যা মাংস সরোবরের [illegible] ফুল [illegible] মধ্যা উপকার সাধন করা হবে, সে ফুল [illegible] গেছে। [illegible] ফুলে [illegible] সঙ্গে [illegible] কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে ঠুকে মরার উপায় আছে, কিন্তু [illegible] হাস্যকর। আমার গলায় দড়ি দেয়া মরা আর তুমি [illegible] তোমার টি. বি. হলে [illegible] মধ্যে [illegible] — অথচ দুটোই [illegible] অকস্মাৎ। আমি [illegible] দড়ি দিয়েছি [illegible] তুমি [illegible] একটা [illegible] পারে, যে আমাদের [illegible] কল্পনার জগৎ থেকে তুমি অন্ততঃ কিছুদিন [illegible] মাটির পৃথিবীতে নেমে আসবে। আমার এ কথাটা খাঁটি সত্য জানি, চড় খাওয়া ছেলের মত তোমার মুখভঙ্গি [illegible], আমার লাভ হ'ত এই যে, মনে মনে [illegible] অন্ততঃ একজনের একটু কাজে লেগেছি, [illegible] আগাগোড়া ব্যর্থ জীবন আমার নয়।

কিন্তু আজ আমি বুঝতে পারছি, ও ভাবে তোমাকে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনবার কোন দাম নেই, আনবার অধিকারও আমার নেই। তোমাকে [illegible] পথ আমি দেখাতে পারব না। [illegible] পথ জানি না। আমি নিজে চোরাবালির অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছি, তোমাকে আমি কি করে বলব ওই কাব্যের কল্পনাময় ফুল-বিছানো পথ ধরে যেও না, এই কার্য্যের বালুকাময় বন্ধুর পথ ধরে এস, এই পথে জীবনের সার্থকতা ? কোনটা কাব্যের আকাশ, কোনটা কার্য্যের কোলাহল, কোনটা ফুল, কোনটা পাথর, কোনটা পথ, কোনটা বিপথ, কোনটা জীবনের সার্থকতা, কোনটা ব্যর্থতা, এ সব আমার কাছে গোলমাল হয়ে গেছে, —মানুষ কি, মানুষ মানুষ কেন, জীবনে মানুষ কি চায়, আর কেন চায়, কি পায় আর কেন পায়, কি চাওয়া উচিত আর কেন চাওয়া উচিত, এ সব এমন উদ্ভট সমস্যায় পরিণত হয়ে গেছে যে, আমি বুঝতেও পারছি না, এগুলি সত্যই সমস্যা না আমার মাথার মধ্যে এমন কোন পাগলামী বাসা বেঁধেছে, যার জন্য সহজ সোজা কথাগুলিকে বিকৃত করে দেখছি। অথচ কিছুদিন আগেও আমি ভাবতাম, জীবনের অনেকগুলি সমস্যার জবাব আবিষ্কার করেছি, আর কিছুদিন চেষ্টা করলে বাকীগুলিও আবিষ্কার করে

ফেলতে পারব। কিছুদিন আগে আমার মনে যখন আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে, তখনও কি রকম অদ্ভুত কথা সব ভাবতাম শোন। ভাবতাম, জীবনকে ধাঁধাঁ না জেনে, ধাঁধাঁগুলি সত্যই জীবনের না পুরস্কার প্রতিযোগিতার ধাঁধাঁ সে হিসাব না করে, ধাঁধাঁর জবাব আবিষ্কার করার মত এই বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়েই কি আমি জন্মেছি? আমার রক্তের মধ্যেই কি এই অসাধারণ ক্ষমতা মিশে ছিল? অথবা, আমি জন্মে থেকে যে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে মানুষ হয়েছি, তাই আমাকে এমন অসম্ভব রকমের ক্ষণজন্মা নারীতে পরিণত করেছে?

আজ কিন্তু নিজেকে হাজার বার প্রশ্ন করে একটা অতি সহজ ধাঁধাঁরও জবাব পাই না অনুপম। কিছুকাল ধরে একটা জিজ্ঞাসা আমার মনকে লাঙ্গলের মত চষে বেড়াচ্ছে। অথচ কারও কাছে এ জিজ্ঞাসার জবাব পাবার ভরসা আমার নেই। আমি কি ভাবছি জান? ভাবছি, যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যে-রকম শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে আমি বড় হয়েছি, সে সব তো সৃষ্টিছাড়া নয়, অনেকেই ও রকম অবস্থায় ও রকমভাবে মানুষ হয়, তবে কেবল আমার বেলাতেই এ-রকম অঘটন ঘটল কেন? আমি কেন এমন সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলাম আমার যা আয়ত্তের বাইরে, বুদ্ধির অগম্য, সাধ্যের অতীত? কেন আজ আমার মানসিক অবস্থার এমন বিপর্য্যয় ঘটল যে, পৃথিবীতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিজেকে আমার মেরে ফেলতে হচ্ছে?

অনুপম, তোমাকে এই কথাগুলি লিখতে লিখতে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। সত্যই কি আমি এ-রকম হয়েছি? খানিক আগে নিজেকে আমি যে খাপছাড়া বলেছি, সত্যই কি আমি তাই?

যে সব কারণ আমাকে এ রকম করেছে, হয়ত আরও অনেককে সেই সব কারণই আমার মত করে তুলেছে? তাদের সঙ্গে আমার পার্থক্য হয়ত কেবল তুচ্ছ খুঁটিনাটির— সমস্ত মানুষের মূর্ত্তি একরকম হলেও প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের চেহারার যেমন সর্ব্বাঙ্গীন পার্থক্য থাকে, সেই রকম একটা স্বাতন্ত্র্য? অনুপম, কে জানে হয়ত [illegible] গলায় দড়ি [illegible] আসল কারণ যা, আজ পর্য্যন্ত আরও অনেকের গলায় দড়ি দেবার কারণও তাই ছিল? হয়ত যে শক্তি আমাকে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দিয়েছে, সেই শক্তি তাদেরও আত্মহত্যার প্রেরণা জুগিয়েছিল,—আমরাই কেবল ধরতে পারছি না, সেই শক্তিটার স্বরূপ কি এবং কি ভাবে, কখন, কোথায়, কিসের ছদ্মবেশে সেটা কাজ করে?

আমি তোমাদের বাড়ীতে থাকবার সময় পাড়ার ভূদেব বাবুদের বাড়ীতে একটা ছেলে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মরেছিল। তুমি আমায় এসে বলেছিলে, ছেলেটার কুৎসিত রোগ হয়েছিল বলে স্যুইসাইড করেছে তবঙ্গ। ভালই করেছে। ও রকম ছেলের মরাই ভাল।

আমি মুচকে হেসে বলেছিলাম, হয়তো তা নয় অনুদা, হয়তো ক'বছর ধরে পরের অন্নজল পেটে দিয়ে দিয়ে আর ভাল না লাগায় মুখ বদলাতে স্বর্গে গেছে। কুৎসিৎ রোগ আবার কিসের? দেখতে, উপার্জ্জনের উপায় থাকলে কুৎসিৎ রোগ নিয়েই বিয়ে থা' করে ছোঁড়া দিব্যি সংসার করত।

আরও কি যেন সব তোমায় বলেছিলাম। অনুপম, হয়ত সেই ছেলেটা যে জন্য আত্মহত্যা করেছিল আমিও সেই জন্যই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছি? আমার কুৎসিত রোগ নেই, পরের অন্নজল আমায় পেটে দিতে হয় না, কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, সংসারে আমি তো একা নই, দশজনের মধ্যে আমার বাস, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব আর দশজনের মধ্যে যে ভাবে কাজ করে, আমার মধ্যেও তেমনি ভাবে কাজ করে। এ হিসাবে ধরলে জগতের সমস্ত মানুষের ভাগ্য পরস্পরের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত; জগতের কোথাও একটিমাত্র মানুষ যদি খেতে না পেয়ে আত্মহত্যা করে, সেটাকে আমরা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারি না, তার আত্ম-হত্যার কারণ সমগ্র জগতে নানা রকম রূপ নিয়ে ছড়িয়ে থাকবেই থাকবে। তাই যদি হয় অনুপম, তা হলে হয়ত ভূদেব বাবুর বাড়ীর ওই বেকার ছেলেটার জীবনে তার জন্ম থেকে,—হয়ত তার জন্মের অনেক যুগ আগে থেকেই, যে সব কার্য্য-কারণের সমাবেশ শেষ পর্য্যন্ত তার আত্মহত্যায় পরিণতি লাভ করেছিল,—আমার জীবনেও

সেই কার্য্যকারণগুলির সমাবেশ আমাকেও আত্মঘাতিনী করাতে চলেছে? কিন্তু কোথায় এই যোগসূত্র? সেই ছেলেটার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সমস্ত পৃথিবীর নরনারী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বৃক্ষলতা জলবায়ু মাটি,—এমন কি, হয়ত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও,—মধ্যস্থতায় প্রকৃতির নিয়মে স্থাপিত হয়ে আছে, কি তার স্বরূপ? আমি তো তা জানি না অনুপম! তোমাকে এই কথা কটা লিখতে গিয়েই আমার মাথা ঝিম ঝিম করছে। আমার সে বুদ্ধি কই যা দিয়ে আমি এই যোগসূত্রের মূল তত্ত্ব জানব? জানি না বলেই মনটা আমার খুঁত খুঁত করছে যে, হয়ত যা ভেবে আমি গলায় দড়ি দিতে চলেছি, তাও ভুল—কি যে ভুল নয় আমার তা বুঝবারও ক্ষমতা নেই। আছে?

তবে কি জান অনুপম, বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, এইটুকু সান্ত্বনা আমার আছে। যে সব কারণে গলায় দড়ি দেওয়া আমি উচিত মনে করেছি, তার সবগুলি ভুল হলেও, এ কথাটা সত্য যে তোমাদের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে বেঁচে থাকার মত শিক্ষা আমাকে কেউ দেয় নি, আমাকে মরতেই হবে।

এতদিন সংস্কারের ও সংশোধনের কল্পনা নিয়ে চারিদিকে তাকাতাম, তাই যা দেখতাম তা সহ্য হত, সাময়িক বলে অনেক কিছু স্বীকার করে নিতাম, ভাবতাম আমি যেটুকু দেখছি, সংসারে তার চেয়ে খুব বেশী শ্রী ও সামঞ্জস্যের অভাব থাকা সম্ভব নয়, মানুষ আসলে মানুষই আছে, বাঁচবার নিয়মও মানুষ মোটামুটি জানে, কেবল নিজের বোকামির দোষে মানুষ কিছু মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে কিছু পাশবিকতা, আর বাঁচবার কয়েকটা নিয়ম পালন করতে ভুল করে জীবনে এনেছে কিছু গণ্ডগোল।

ও মা, শেষে দেখলাম ভুলটা আমারই!

সকলের জীবনেই আজ অন্যায় বেশী, অভাব বেশী, অপরাধ বেশী, অনাচার বেশী, বিশৃঙ্খলতা বেশী। মানুষ যদি সজ্ঞানে জীবনে এ সব সঞ্চয় করত, তারও একটা মানে বোঝা যেত, না জেনে না বুঝে মানুষ নিজের জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, মহা আড়ম্বরের সঙ্গে করছে নিজের সর্ব্বনাশ। অন্ধ পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে অন্ধকে। যারা এ রকম করছে তারাই আবার দশজনকে উপদেশ দিচ্ছে, এই কর, ওই কর, তাই কর। কি অবস্থায় আজ আমরা এসে পড়েছি জান অনুপম? জীবনকে যে সুন্দর করতে চায়, নিখুঁত করতে চায়, পরিপূর্ণ করতে চায়, তার সমস্ত চেষ্টা পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে,—জীবনে সার্থকতা লাভের ঠিক পথটিও সে খুঁজে পাচ্ছে না, তার নিজের ভিতরের আর বাইরের অসংখ্য বিরুদ্ধ-শক্তি তাড়া করে তাকে বিপথে ঠেলে নিয়ে গেলে বাধাও সে দিতে পারছে না।

যেমন আমি।

কি শিক্ষাই আমার বাবা আর আমার স্বামী আমাকে দিলেন! জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল আলেয়ার মত, না লাগল সে আলো জগতের কারও কাজে, না লাগল আমার নিজের কোন উপকারে। বিপথে বিপথে ঘুরিয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই টেনে নিয়ে চলল অপমৃত্যুর দিকে।

[ক্রমশঃ

শান্তি ও শৃঙ্খলা

…কোন দেশ সুশাসিত হইতেছে বলিয়া প্রচার করিতে হইলে, ঐ দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলার বিদ্যমানতা যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ সমগ্র প্রজামণ্ডলীর সন্তুষ্টিও একান্ত প্রয়োজনীয়; কারণ, দেশের যে শান্তি ও শৃঙ্খলা অধিকাংশ প্রজার সন্তুষ্টি বিধান করিতে অক্ষম, সেই শান্তি ও শৃঙ্খলাকে শান্তি ও শৃঙ্খলা বলিয়া অভিহিত করিলে ঐ দুইটির অপমান করা হয়। দেশে প্রত্যক্ষতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান আছে, অথচ ঐ দেশের মানুষের মনে প্রকৃতপক্ষে সন্তুষ্টি নাই, এতাদৃশ বাক্য সোনার পাথরের বাটির অনুরূপ। শৃঙ্খলা, শান্তি ও সন্তুষ্টি তিনটি যমজ ভগ্নী। একটি থাকিলে অপর দুইটিও থাকিবেই। একটি না থাকিলে অপর দুইটিও নাই, ইহা বুঝিতে হইবে।…

স্থান-বিনিময়

উপরে মোটরকার, নীচে বেকার

আছে তাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হইলেই বলিতেন, "আমাকে একটু অমুক জায়গায় পৌছাইয়া দাও।" ইউনিভার্সিটির সান্টা ক্লস উৎসবে তিনি উপহার পাইলেন, অনেক কাগজে জড়ান একটা খেলনার মোটরগাড়ী, যে ছাত্রটি সাদার ক্রিসমাস্ সাজিয়াছিল, সে রেক্টার মহাশয়ের কানে ধরিয়া বলিল, "দেখ্ বাছা, জীবনটা লেখাপড়ার চর্চ্চা করিয়াই বৃথা কাটাইলি, আমোদ প্রমোদ কিছুই করিলি না! গাড়ীচড়ার সখ তোর আছে, নে এই গাড়ী, কিন্তু খবরদার অন্যের গাড়ীতে লোভ করিস্ না।" মেয়ে বোর্ডিং-এ আমি যে সব উপহার পাইলাম, তাহার মধ্যে ছিল চীনামাটির একটা বড় খেলনা, একটা গাছের উপর একটা কাল বেড়াল ও নীচে একটা সাদা কুকুর ফুঁসিয়া দাঁত বাহির করিয়া ঝগড়া করিতেছে, তলায় কাড লাগান "Europe greets India!"

বৃটিশ লেগেশনে দুটো চা পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল। এখানকার বৃটিশ মিনিষ্টার বদলী হইয়া অন্যত্র গেলেন, তাই এখানকার বৃটিশ কলোনীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পার্টিটি রাজার অভিষেক উপলক্ষে। শিক্ষিত অনেক ইংরাজের সঙ্গে আলাপ হইল। এখানকার বৃটিশ লেগেশনের শার্জে দাফেয়ার (charge d'affaires) পূর্ব্বে ভারতে উচ্চপদস্থ মিলিটারি অফিসার ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তিনি অনেক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করায় ভারত সম্বন্ধে ইদানীং কাগজে খুব খবর বাহির হইয়াছে, এমন কি "টাইম্‌সে"ও। কংগ্রেসের জোর এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন। আমব্যাসাডর বা মিনিষ্টার পদস্থ বৃটিশ ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভ্জিসের যে কয়জন কর্ম্মচারী দেখিলাম, সবারই চেহারাটা যেন এক ছাঁচে ঢালা। দলবদ্ধ হইবার প্রবৃত্তি বৃটিশ চরিত্রে এতই বলবান যে, একদলের সব লোকের চেহারাটাও একই রকম হইয়া দাঁড়ায়! নূতন রাজার অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার বিশাল ছত্রচ্ছায়ায় এমনই মহিমা চারিদিকে ঘোষিত হইতেছে যে, তাঁহার নীচে এম্পায়ারভুক্ত সব বাঘে গরুতে একত্র মিলিত হইয়া একে আর অন্যের প্রতি বড়ই দরদী হইয়া পড়িয়াছেন।

বড়দিনের ছুটিতে গেলাম বুদাপেশ্‌তে। প্রাহা হইতে গাড়ী ছাড়িবার আগে দেখিলাম, আমার কামরার সামনে দিয়া একটি ভারতীয় গেলেন। আগে ভারতীয় দেখিলে উপযাচক হইয়া আলাপ করিতাম, কিন্তু পরে ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়া দুই এক স্থলে এমন অপ্রিয় অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, সেদিকে আর ঘেঁষি না,—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। অনেক ভারতীয় আলাপ করিতে গেলে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন তিনি একটি নবাব-বাদশা, স্বদেশীয়ের সঙ্গে আলাপ না হইলে তাঁর যেন কিছুই যায় আসে না। এ দেশের লোকের দেখি উল্টা ভাব, বিদেশে স্বদেশী দেখিলেই একত্র দলবদ্ধ হয়, বিশেষতঃ ইংরেজেরা। ভারতীয়েরা অন্য লোকের সঙ্গে গা মাখামাখি করিয়া নিজ দেশীদের সম্বন্ধে পরিহাস করিয়া চলেন। পাহা ষ্টেশনের ভারতীয়টি দেখিলাম ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠিলেন। আমার সেকেণ্ড ক্লাস ও তাঁহার ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা একই ক্যারেজে, অল্প পরে তিনি করিডোরে আসিয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। একটু আশ্চর্য্য বোধ হইল, কিন্তু দেখিলাম লোকটি বেশ ভদ্র বংশীয় যুবক, উত্তর ভারতীয় মুসলমান, দেশে বড় চাকরি করেন, এখন ষ্টাডি-লীভে লণ্ডনে পড়িতেছেন। আলাপে-আলাপে তিনি চাকরি বাকরি, নিজের সংসার পরিবার, আশা আকাঙ্ক্ষা কোন কথাই আর বলিতে বাকি রাখিলেন না। ইনিও চলিয়াছেন বুদাপেশ্‌ৎ বেড়াইতে, দেশের চাকুরে বলিয়া ফার্ষ্ট ক্লাসের ফ্রি-টিকিট পাইয়াছেন। সেখানে গিয়া ধরিলেন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দাও, যদিও ভাষা ইংরেজি ছাড়া জানেন না। আমার পরিচিতাদের যে কয়জনের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলাম, ইনি এক এক করিয়া সবারই প্রেমে পড়িয়া গেলেন, মেয়েদের সঙ্গে ঘুরিয়া পয়সাও খরচ করিলেন বিস্তর। একটি পরিবারে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, এঁকেও সঙ্গে লইয়া গেলাম। আহারের পর দুই ঢোক্ ওয়াইন খাইয়াই ইনি বেসামাল হইয়া পড়িলেন, সোৎসাহে খুব বকিতে লাগিলেন, কয়েকটি ধাড়ি ধাড়ি মহিলার গলায় হাত দিয়া পিঠ চাপড়াইয়া অনেক কাণ্ড-কারখানা আরম্ভ করিলেন। ধাড়িরা ইহাতে বেশ আমোদই অনুভব করিলেন, কিন্তু যুবকটি বাড়ী ফিরিয়া নেশা ছুটিয়া গেলে লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এজন্যই কখন ওয়াইন খাই না, একেবারেই সহ্য করিতে পারি না। বলুন, বাস্তবিক অন্যায় কাজ তো কিছু করিয়া ফেলি নাই?" বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ইনি বুদাপেশ্‌ৎ হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া গেলেন, অনেক আপশোষ করিলেন যে, মেয়েদের সঙ্গে তেমন সুবিধা না কি করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তবে আর একবার

জানিয়া দেখিবেন হয় কি না (এবারে মোটরে লণ্ডন হইতে আসিবেন, সেখানে এঁর গাড়ী আছে)।

দানিয়ুব নদীর দুই ধারে বেশ সুন্দর সহর বুদাপেস্ট। একপাশের নাম বুদা, অন্য পাশের নাম পেস্ট। দুই দিকের অংশের এই বিভিন্ন নাম ছাড়া, লোক সমগ্র সহরটাকেই সংক্ষেপে কখন বুদা কখন পেস্ট বলে। সহরটি আজকাল খুব ফ্যাশানেবল্ হইয়া পড়িয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের সিংহাসনভ্রষ্ট রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড মহাশয়ের এখানে থাকিবার ফলে। তাঁহার আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতির কাহিনী এখানে সবাই জানে। নদীর ধারে সহরের প্রধান প্রধান হোটেল ও কাফেগুলি, সহরের লোকের এইখানটা বেড়াইবার জায়গা। এখানকার কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণের জলেরও ভেষজগুণ আছে, সেখানে স্নান প্রভৃতির ব্যবস্থা হইয়াছে। সব চেয়ে বড় হোটেল যেটা, সেটার মধ্যে প্রকাণ্ড একটা স্নানাগার, মাসাজ প্রভৃতির এস্টাব্লিশমেণ্ট আছে, পাশে নীচে বড় মার্বেল পাথরে বাঁধান পুকুরে কৃত্রিম ঢেউ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে, সমস্ত বাড়ীটার মধ্যে। শীতকালে স্নানার্থীরা স্নানের পর বাষ্পের ঘরে স্নানবস্ত্রে হুড়োহুড়ি করিয়া ইলেক্ট্রিক্ আলোর সূর্য্যরশ্মি সেবন করেন বা ব্যালকনির কাফেতে বসিয়া গোষ্ঠি সুখ অনুভব করেন।

বুদাপেস্টে অনেক অভিজাতবংশীয়দের সঙ্গে আলাপ হইল। কেহ বা ব্যারণ, কেহ বা "হিজ এক্সেলেন্সি" উপাধিধারী। এই শ্রেণীর লোকদের চিঠির কাগজে অনেক সময় ক্রাউন আঁকা থাকে, কেহ কেহ ভিজিটিং কার্ডে পর্য্যন্ত ক্রাউন ছাপিয়াছেন দেখিলাম। ইংলণ্ডে কার্ড হয় ছোট ছোট, কণ্টিনেণ্টে আরও বড়, আর ইউরোপের এদিকটায় কার্ডের আকার প্রায় আধখানা পোষ্টকার্ডের মত। ইংলণ্ডের কার্ডগুলিতে সংক্ষেপে ব্যক্তির নাম ও রাজদত্ত উপাধি প্রভৃতির উল্লেখ থাকে, পশ্চিম ও উত্তর কণ্টিনেণ্টে অ্যাকাডেমিক ডিগ্রিও যোজনা করিবার নিয়ম, আর হাঙ্গেরিয়ান কার্ডে অনেকের দেখিলাম যেন জীবনচরিত লেখা, উপাধি-পদবী তো আছেই, তা'ছাড়া তিনি কোন্ কোন্ সমিতির মেম্বার প্রভৃতি সে সবও লেখা থাকে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ইউরোপীয় লোকগুলি বেশীর ভাগই অপদার্থ ও মেরুদণ্ডহীন, খুব মিষ্ট-বচনপটু কিন্তু কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ! ভিতরে ছুঁচোর কীর্ত্তন বেশী বলিয়া বাহিরে কোঁচার পত্তনও খুব লম্বা করিয়া করিতে হয়।

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব বিজ্ঞান অধ্যাপক প্রোফেসার গের্মানুসের (Germanus) সঙ্গে দেখা হইল। ভারতে ইঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। শান্তিনিকেতনে শুনিয়াছিলাম, ইনি বড়ই ভারতভক্ত ছিলেন। এখানে আমাকে খুব খাতির করিয়া দেখাইলেন, বলিলেন, প্রথম ইউরোপ হইতে ভারতে গিয়া তিনি ভারতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই, সবই ইউরোপীয় চোখে দেখিয়া বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেন, এখন কিন্তু আবার ইউরোপে ফিরিয়া তাঁহার চোখ খুলিয়াছে, এখন তিনি মনে করেন ভারতেরই সব ভাল, ইউরোপের সব খারাপ, আমরা সহীনাহ করিতাম ভালই করিতাম, শুধু বিধবা কেন ইউরোপের সব স্ত্রীলোকগুলাকে পুড়াইয়া মারা উচিত, ইত্যাদি। এরূপ কথাবার্ত্তা ইনি অনেক বলিলেন, পরিচিত মহলে এঁর ক্যারাক্টার সম্বন্ধে বদনাম আছে। অন্য পদস্থ লোকদের সঙ্গে বাড়ীতে, কাফেতে বা আপিসে গিয়া দেখা করিবার আমন্ত্রণ পাইতাম, কিন্তু প্রোফেসর গের্মানুস নিজেই আমার বাসায় আসিয়া দেখা করিলেন, লোকে বলিল, ইউনিভার্সিটির প্রোফেসর পদস্থ লোকের পক্ষে এ দেশে এটা সাধারণ নয়। শান্তিনিকেতন ও গের্মানুস পরস্পরকে সুনজরে দেখেন নাই, তাই কি প্রোফেসর আমার সঙ্গে আগে হইতেই মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন? এখানে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ বলিয়া ইঁহার খুব নাম, হয়ত বা তাঁহার ভয় ছিল, আমি তাঁহার বিরুদ্ধতা করিলে তাঁহার অপমান হইবে। ডাঃ বাকটায় এরভিন (Baktay Ervin—হাঙ্গারিতে লোকে নাম লেখে, প্রথমে surname পরে Christian name) নামক আর একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল, ইনি ভারত সম্বন্ধে অনেক বই লিখিয়াছেন ও ভারতে অনেক দিন বাসও করিয়াছেন। ইঁহার ফ্ল্যাটের সাজসজ্জা সব ভারতীয়। Zaiti নামক একজন বুড়া চিত্রকরের সঙ্গে আলাপ হইল, ইনিও ভারতে ছিলেন। ঘরে দেখিলাম তাঁহার আঁকা যে সব তৈলচিত্র রহিয়াছে, সবেরই আখ্যান বস্তু ভারতীয়,—রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির গল্পের নায়ক-নায়িকা। এখানকার গ্রন্থকার ও আর্টিষ্টদের একটা বড় ক্লাব আছে, গের্মানুস আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন ও স্থানীয় অনেক লেখক ও কলাচার্য্যদের সঙ্গে আলাপ

হইল। এখানকার লোকে ভারত সম্বন্ধে খুব সমস্ত রোমান্টিক ধারণা পোষণ করে, একদল লোকের বিশ্বাস হাঙ্গেরিয়ানদের পূর্ব্বপুরুষরা ভারত হইতে এ দেশে আসিয়াছিলেন। লেখক ও ইতিহাসচর্চ্চাকারীরা সকলেই এ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন ও অনেক গভীর আলোচনা করিলেন। পোলিটি-ক্যাল ভাব এখানে ফ্যাশিষ্ট মতের। পুরাতন রাজপ্রাসাদে সেকেলে ধরণের শাস্ত্রীবদল অনুষ্ঠানটি দেখিলাম, যেন মধ্যযুগের একটি ছবি।

বুদাপেশ্‌ৎ হইতে প্রাহা ফিরিয়াই নিমন্ত্রণ পাইলাম, বুদাপেশ্‌ৎ ও ভিয়েনায় বক্তৃতা দিবার। আবার জানুয়ারীর শেষে যাওয়া গেল বুদাতে। যে সমিতিতে বক্তৃতা দিবার কথা, তাহার মহিলা সভাপতির বাসায় অতিথি হইলাম। ইনি ডেণ্টিষ্ট, সঙ্গে তাঁর বড় বোনটিও থাকেন, তিনি ভাস্কর্য্য চর্চ্চা করেন। বক্তৃতার আগের রাত্রে ইনি বাড়ীতে একটি পার্টি দিলেন, জনকয়েক লেখক লেখিকা, সাংবাদিক, আর্টিষ্ট, অধ্যা-পক, ব্যারণ প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল। তারপর দিন সকালে স্ত্রীপুরুষ সাংবাদিকরা ইন্টারভিউ করিতে আসিলেন, বিভিন্ন কাগজের ফটোগ্রাফাররাও উপস্থিত হইলেন। সেদিন সন্ধ্যার কাগজগুলিতে অনেক রিপোর্ট ও ছবি বাহির হইল। বক্তৃতার সময়েও ফ্ল্যাশলাইটবাহী প্রেস ফটোগ্রাফাররা মধ্যে মধ্যে চমক লাগাইলেন। ভারতীয় ইঁহারা কমই দেখিয়াছেন, তাই এত সমারোহ। ইন্টারভিউকারিণী একটি সাংবাদিকা শেষটা বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন "ভারত সম্বন্ধে আমাদের এমনই অদ্ভুত ধারণা যে, আপনাকে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে দেওয়ালের মধ্য দিয়া এঘর ওঘর যাতায়াত করিতে দেখিতে পাইব এমন আশাও করিয়াছিলাম!" বক্তৃতার পর সব জায়গাতেই বহুবিধ প্রশ্ন করে, মঞ্চে দাঁড়াইয়াই তাহার জবাব দিতে হয়। সভাভঙ্গের পর আবার ভীড় করিয়া ঘিরিয়া নানা প্রশ্ন, নানা আলাপের চেষ্টা করে। একজোড়া বুড়াবুড়ী জানাইলেন যে, তাঁহাদের মেয়ে বা ঐ রকম একটি আত্মীয়ার সঙ্গে একটি কলিকাতাবাসী ভদ্রলোকের বিবাহ হইতেছে। একটি তরুণী জানাইলেন, একটি গুজরাটি যুবকের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের কথা ছিল, কিন্তু যুবকটি এখানেই মারা যায়।

একজন মহিলা সাইকো-অ্যানালিষ্ট নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আর একজন সাইকো-অ্যানালিষ্টের স্ত্রীও আসিয়াছিলেন। আমি জানাইলাম, মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বে আমার আগ্রহ আছে বটে, তবে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এবিষয়ে আলাপ করিবার আমার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা তবু ছাড়িলেন না, বলিলেন, তাঁহাদের অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। ভয় হইল, হয়ত বা ইঁহারা আমার মগ্নচৈতন্য হাতড়াইয়া কি সাপ-ব্যাং বাহির করিয়া বসেন। যাই হোক, শেষটা ইঁহারা চর্চ্চা করিলেন আমাদের দেশের শিশু-পালন রীতি সম্বন্ধে।

প্রথম মহিলাটি মনোবিশ্লেষণ ধারায় বালকবালিকাদের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ফ্রয়েড, ইয়ুং, আড্‌লার প্রভৃতির নানা মতের চর্চ্চা হইল। ফ্রয়েড আজকাল একটু পুরাণ হইয়া পড়িয়াছেন, সেক্সকে তিনি যতটা প্রাধান্য দিয়াছিলেন, ততটা আর নবীন মনোবিদরা দিতে প্রস্তুত নন। শৈশবের প্রথম পাচ ছয় বৎসরের ঘটনাসংঘাত পরিণত বয়সের মনে অনেক complex-এর সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে শিশু পালন খুব কড়া কি না ইঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মনে পড়িল চাণক্যনীতির কথা "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ"; বলিলাম যে, শিশুকে কোমলভাবে পালন করাই আমাদের প্রথা, শাসনটা পাঁচ বৎসরের পরে আরম্ভ হয়। এ প্রথার বৈজ্ঞানিকতা মহিলারা তাঁহাদের শাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিলেন। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শিশুদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করা হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, পরিচ্ছন্নতার ধারণা শিশুর থাকে না, শিশু ইচ্ছামত ধূলাকাদা মাখে, আবার তাহাকে ধোয়াইয়া মোছাইয়া দেওয়া হয়। ইঁহারা বলিলেন, "পরিচ্ছন্ন" কথাটা ইঁহারা একটা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করিতেছেন, সাধারণ অর্থে নয়। প্রথমটা বুঝিতে পারিলাম না, পরে তাঁহারা বলিলেন, মলমূত্র ত্যাগ সম্বন্ধে কথাটা প্রযোজ্য, অস্থানে বা অসময়ে এ ক্রিয়া করিলে আমরা শিশুকে শাস্তি দিই কি না? শিশুকে এ বিষয়ে শাস্তি বা শাসন করিলে পরে তাহার গোঁয়ার্ত্তুমি রোগ প্রকাশ পায়, ইউরোপীয় অনেক লোকের একগুঁয়েমি ও যাহা বলা যায়, তাহার উল্টা করিবার প্রবৃত্তি না কি শৈশবে এই স্বভাববেগের জন্য শাস্তি পাওয়ার ফলে জাত মানসিক complex।

একটি বড় পাবলিশিং হাউসের কর্ত্তাদের সঙ্গে আলাপ হইল। ইউরোপে এতদিন আছি, সবই দেখিয়াছি কি না, ইঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, অনেকই দেখিয়াছি

হোটেলের ওয়েটার প্রভৃতি। হাউস-কীপার বুড়ীর আমার প্রতি বড় মমতা হইল। অ্যাড্‌ভোকেট্‌ সকালে সাড়ে আটটার সময় আপিসে বাহির হইয়া যাইতেন, আমাকে বলিলেন, "আপনার যদি সকালে সহরে দরকার থাকে, আমার সঙ্গে বাহির হইবেন, আমি আমার গাড়ীতে আপনাকে সহরে পৌঁছাইয়া দিব।" আমি বলিলাম, "ভিয়েনার সবই আমার দেখা আছে, এই ঘোর শীতে অত সকালে উঠিয়া কেন কষ্ট করিব? যা কাজ আছে ধীরে সুস্থে বৈকালের দিকে করিব।" সকালে ব্রেকফাষ্ট ঘরে আনিয়া হাউস-কীপার চুল্লীতে আগুন ধরাইত, তা ছাড়া একটা পেট্রোলিয়াম ষ্টোভও ঘরে দিয়া যাইত। বিছানায় ব্রেকফাষ্ট করিতে করিতে ঘর বেশ গরম হইয়া উঠিলে হাউস-কীপার ষ্টোভটা স্নানের ঘরে দিয়া আসিত। জামা কাপড় রোজ সকালে লইয়া গিয়া ইস্ত্রি করিয়া দিত। কি খাইব লইয়া অনেক পীড়াপীড়ি করিত। প্রথম শুক্রবার দিন দেখি, না বলিতেই কালো পোষাকটা ও সার্ট-কলার প্রভৃতি নিজে হইতেই ইস্ত্রি করিয়া রাখিয়াছে। অ্যাড্‌ভোকেটকে বলিলাম, "আপনার বাড়ীতে আমি যেমন spoiled হইতেছি তাহাতে বোধ হয় আর ভিয়েনা ছাড়িয়া যাইব না এবং পরে কখনও ভিয়েনা আসিলেই আপনার বাড়ীতে উঠিব!" কর্ত্তা বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে! আমি খুসীই হইব।" শকুনিতত্ত্ব, জ্যোতিষ প্রভৃতি গুহ্য বিষয়ের প্রতি বুড়ী হাউস-কীপারের ঝোঁক ছিল, এ বিষয়ক বই কাগজ প্রভৃতি আমার কাছে আনিয়া অনেক প্রশ্ন করিত। একদিন বলিল, "কর্ত্তার বুড়ী মাও এ বাড়ীতে থাকেন, তিনি একদিন তাঁর মহলে আপনাকে চা খাইতে ডাকিয়াছেন, কিন্তু আপনার যাইয়া কাজ নাই।" খোঁজে জানিলাম, মা'র মাথাটা না কি একটু খারাপ। একদিন বাহির হইবার সময়ে হলঘরে বুড়ী মা পাকড়াও করিলেন, দেখিলাম তাঁর ভীমরতির অবস্থা, হাউস-কীপার সংকেতে পলাইয়া যাইবার উপদেশ দিল, কোনও গতিকে পলাইয়া বাঁচিলাম। [ক্রমশঃ

বোধিসত্ত্বের প্রার্থনা

—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

ক্ষণেক দাঁড়াও নির্বাণকামী বুদ্ধদেবতাগণ,
ওই শোন জাগে চরণ ঘিরিয়া নিখিলের ক্রন্দন!
মুক্তি নিও না চিত্তজয়ি গো, লভিও না নির্বাণ,
চরণনিম্নে বেদনা-আতুর কাঁদে অসহায় প্রাণ।
দুঃখ-শোকের তপ্ত-অনলে জাগিছে লক্ষ শিখা,
অগণিত অভিশপ্ত জীবনে শুধু জাগে মরীচিকা।
জরা-জর্জর ভীরু দুর্ব্বল মোহের পঙ্কে লীন,—
[illegible] দাঁড়ায়ে করাল মৃত্যু নিষ্ঠুর সুকঠিন!

বড়ই দৈন্য—বড় যে বেদনা—বড় যে ক্লেশের ভার,
তপ্ত মরুর বুকজোড়া শুধু অনন্ত হাহাকার!
কোথা সান্ত্বনা—? কোথা নির্ভর? কোথা তৃষ্ণার বারি?
তোমাদের পানে চাহিয়া রয়েছে অগণিত নরনারী;—
হে সবুদ্ধ,—তোমরাও যদি লহ বরি' নির্বাণ,
শূন্যে মিলাবে মহামানবের বেদনা-করুণ গান!
যে দিকে যে আছ তত্ত্ববুদ্ধ মোরে দেহ এই বর,
পুঞ্জিত হোক বিশ্বের ব্যথা আমার বুকের 'পর,—

একটিও প্রাণী যতদিন ধরি' কাঁদিবে বাঁধন-ডোরে
ততদিন ধরে' হে দেবতাগণ,—মুক্তি দিও না মোরে।

পৌঁছান। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই অভিযানেই আলাস্কা আবিষ্কৃত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইংলণ্ড আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নূতন স্থান আবিষ্কারের জন্য অভিযান আরম্ভ করে। এই সম্পর্কে ভ্যাঙ্কুবার, ম্যাকেঞ্জি ও কুকের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। যে সমস্ত বিদেশী ব্যবসায়ীদল আলাস্কা বা আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইত, তাহারা আদিম অধিবাসীদের উপর অকথ্য অনাচার ও অত্যাচার চালাইতে থাকে। তাহার প্রতিকারের জন্য রাশিয়ানরা ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান-আমেরিকা কোম্পানী নামে এক আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে এই অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন-নিয়ন্ত্রণের ভার কুড়ি বৎসরের জন্য অর্পণ করেন। পরে এই অধিকার আরও দুইবারে ৪০ বৎসরের জন্য প্রদত্ত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আলাস্কা খরিদ করিবার জন্য ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার সদস্য মিঃ গিউইন আমেরিকার কংগ্রেসে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। কিন্তু তাহার পরও কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায় এবং অতঃপর ১৮৬৭ সালে উহা ক্রীত হয়।

আলাস্কা: পুষ্পিত প্রান্তর।

ইহার পর হইতে ক্রমশঃ আলাস্কা উন্নতির পথে চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে (উহার পার্লিয়ামেণ্ট) আলাস্কার প্রতিনিধি ছিল না। আলাস্কার অধিবাসীরা সে জন্য আন্দোলন চালাইতে থাকে; ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে আলাস্কাকে একজন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার প্রদান করা হয়। ইহার পূর্ব্বে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আলাস্কাকে মিউনিসিপ্যালিটি গঠনের অনুমতি দেওয়া হয় এবং এই আইনের বলে ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত ১৮টি মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে আলাস্কাকে স্বতন্ত্র টেরিটোরিয়্যাল শাসন তন্ত্র (territorial government) গঠনের অনুমতি দিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এক আইন পাশ হয়। ইহার পর বৎসর ৩রা মার্চ্চ তারিখে রাজধানী জুনোতে প্রথম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে প্রথম আইনেই স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়। তাহার পর শিক্ষা, ব্যাঙ্ক, খনি, শ্রমজীবীদের পরিশ্রমের সময় নির্দ্দেশ ও অন্যান্য সম্পর্কে বহুবিধ আইন পাশ হইয়াছে।

আলাস্কার সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চল অপেক্ষা দেশাভ্যন্তরস্থ অনেক স্থান খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য কারণে অধিক মূল্যবান। কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ক্লনডাইক স্বর্ণখনি আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই সব স্থান সম্বন্ধে কাহারও কোন আগ্রহ জাগে নাই। যাহা হউক, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আমেরিকার ভূতত্ত্ব-সমিতি, সামরিক বিভাগ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় আলাস্কা সম্বন্ধে প্রচুর সঠিক ভৌগোলিক তথ্য, ইহার খনিজ সম্পদ ও অন্যান্য বিষয়ে বহু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

আলাস্কা পৃথিবীর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। এই দেশ তাহার আবহাওয়ার বৈচিত্র্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। ইহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উদীচ্য-বৃত্ত বা হিম-মণ্ডলে অবস্থিত এবং ইহার তিন দিক সমুদ্র-বেষ্টিত। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশ হিম-মণ্ডলে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আবহাওয়ায় অবস্থিত হওয়ায় অংশবিশেষে তাপ ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের অত্যন্ত তারতম্য হইয়া থাকে। এলুইসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা উহার সন্নিহিত অঞ্চলে তাপ খুব বেশী নয় এবং শীতও খুব বেশী নয়। এই সব স্থানের তাপমান যন্ত্রের পারদ শীতকালে কদাচিৎ শূন্য ডিগ্রীর নীচে নামে এবং গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ ৮০ ডিগ্রীর উপরে উঠে না। দক্ষিণ বা দক্ষিণ

হরিণ প্রতিপালনই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বল্গাহরিণ প্রথমে সাইবেরিয়া হইতে আমদানী করা হয় এবং শীঘ্রই ইহাদের সংখ্যা অসম্ভব রকম বাড়িয়া অন্যান্য গৃহপালিত পশুদের সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়। ইহার প্রতিপালনে ব্যয় আদৌ নাই, কারণ শীতকালে ইহাদিগকে গো-মেষাদির ন্যায় আচ্ছাদিত স্থানে নিরাপদে রাখিবার সুব্যবস্থা করিতে হয় না এবং ইহা স্বাচ্ছন্দ্য-জাত শাক-সব্জী খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ইহার মাংস গো-মাংসের মত ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া ব্যবসায়ের দিক হইতে ইহা বিশেষ লাভজনক। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে আলাস্কায়

ইউকন নদীর তীরে বল্গাহরিণের দল।

সাড়ে তিন লক্ষ বল্গাহরিণ ছিল এবং উহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আলাস্কায় হরিণ প্রতিপালনের উপযুক্ত বার কোটী একর জমি আছে এবং সেখানে প্রায় চল্লিশ লক্ষ হরিণ প্রতিপালিত হইতে পারে। যে অনুপাতে উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে আলাস্কা যে একটি প্রধান মাংস-রপ্তানীকারী দেশে পরিণত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আলাস্কার জমি উর্ব্বর। কথিত আছে, যুক্তরাষ্ট্র ও আলাস্কার সমপরিমাণ জমিতে আলাস্কায় যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বেশী ফসল উৎপন্ন হয় এবং উহা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে হইয়া থাকে। হয়ত এই কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে সহজে আলাস্কার উর্ব্বরতার নিঃসন্দেহ পরিচয় পাওয়া যাইবে। সমগ্র আলাস্কার জমি ফসল উৎপাদনের উপযোগী নহে সত্য। কিন্তু উহার অংশবিশেষ যে বিশেষ উর্ব্বর তাহাতে সন্দেহ নাই। মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ সময় ধরিয়া সূর্য্যকিরণ পড়িতে থাকায়, ফসলের বিশেষ সুবিধা হয়। গম, ওট, বার্লি, রাই এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের উপযোগী অন্যান্য ফসল এখানে উৎপন্ন হয়। বিষুবরেখা হইতে প্রায় ৬৫ ডিগ্রী উত্তরে এবং গ্রীনীচ হইতে ১৪৬-৪৭ ডিগ্রী পশ্চিমে ফেয়ারব্যাঙ্কস্ নামে একটি স্থান আছে; এই স্থান ও উহার সন্নিহিত অঞ্চল কৃষির জন্য বিশেষ বিখ্যাত। কয়েক বৎসর আগে এখানে একটি ময়দার কলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলাস্কার যান-বাহন ও যাতায়াতের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে দুই একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বর্ণ-ব্যবসায়ের প্রথম যুগে, অর্থাৎ ১৮৯৮ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ঘন ঘন এইসব অঞ্চলে নিয়মিতভাবে ষ্টীমার যাতায়াত করিয়াছে। তাহার পর মহাযুদ্ধের সময় বা পরে, স্বর্ণ-ব্যবসায়ে মন্দা উপস্থিত হওয়ায়, ষ্টীমারের সংখ্যা কমিয়া যায়। পরে আবার যখন ব্যবসায়ে উন্নতি আরম্ভ হইল, তখন সরকারী রেলপথ নির্ম্মিত হওয়ায় এবং তাহাতেই ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা হওয়ায় ইয়ুকন বা তাহার উপনদী-সমূহে ষ্টীমারের যাতায়াত কমিয়া গেল।

শীতকালে আলাস্কার প্রধান প্রধান স্থানসমূহে যাইবার জন্য রেলওয়ে ট্রেন ব্যবহৃত হয় এবং যেখানে রেল-লাইন নাই, সেখানে কুকুর বা বল্গাহরিণ-বাহিত স্লেজই একমাত্র যান। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ জলপথে যাতায়াত চলিয়া থাকে। আলাস্কার উত্তর তীরে, পয়েণ্ট ব্যারোর পূর্ব্বে,

জুলায়ের শেষ হইতে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত জাহাজ চলাচল করিতে পারে। পয়েন্ট ব্যারো হইতে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত স্থানে আরও প্রায় দুইমাস বেশী জাহাজ চলিতে পারে। আরও একটু দক্ষিণে বেরিং সাগরের তীরে নোম নামে একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এই স্থান হইতে রেল-লাইন দেশের অভ্যন্তরে গিয়াছে এবং দেশের বহু খনিজদ্রব্য এই পথ দিয়া বাহিরে চালান যায়। বৎসরে মাত্র পাঁচমাস এইস্থানে জাহাজে যাওয়া যায়, অন্য সময় উহা বরফাবৃত থাকে। দক্ষিণ আলাস্কার সমস্ত বন্দর ও এলুইসিয়ান দ্বীপে বৎসরের সমস্ত সময়ই জাহাজ চলাচল করিতে পারে।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ক্রমে ক্রমে যাতায়াতের সুবিধা হইতেছে। ইয়ুকন নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত সহরে টেলিগ্রাফ, বেতার ও ডাক যাতায়াতের সুব্যবস্থা আছে। উত্তর-পশ্চিমে নোম যদিও অনেক দূরে অবস্থিত, তবুও নোমে এই সকল সুব্যবস্থা আছে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বিমানপথ ও বিমানঘাটি (aerodrome) স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের সরকারী বিবরণে দেখা যায়, আলাস্কায় ৬৮টি বিমানঘাটি ও ছয়টি স্বতন্ত্র কোম্পানী দেশের সর্ব্বত্র বিমানপথের সুব্যবস্থা করিয়াছে। বিমানপথ ও রেলপথের উন্নতির চেষ্টা অবিরত চলিতেছে এবং পর পর উহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে।

আলাস্কার সহরগুলি যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য স্থানের সহরের মতই সুন্দর ও সুব্যবস্থিত। সহরের রাস্তায় বিজলী বাতি আছে এবং আবশ্যক অনুসারে গৃহের অভ্যন্তর বাষ্পের দ্বারা উত্তপ্ত রাখিবার ব্যবস্থা আছে। তবে সব সহরগুলিই ক্ষুদ্র। আলাস্কার রাজধানী ইয়ুনের লোকসংখ্যা ১৯৩০ খৃঃ অব্দে মাত্র চার হাজার ছিল; অন্যান্য সহরের লোকসংখ্যা আরও কম।

আলাস্কার জলবায়ু ও স্বাস্থ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও, উহা যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখানকার নর নারী স্বাস্থ্যবান এবং তাহারা হঠাৎ রোগগ্রস্ত হয় না। আধুনিক সভ্যজগতের আশ্চর্য্য ও বিচিত্র রোগ সকল এখনও এখানে প্রবেশ লাভ করে নাই।

আলাস্কা পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত তুষারময় ক্ষুদ্র দেশ। এই দেশের অধিবাসীর সংখ্যা অসম্ভব রকম কম। তাহা হইলেও, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য এবং ইহার খনিজ সম্পদ ও মৎস্য ব্যবসায়ের জন্য বিদেশীরা এখানে বসবাস করিতেছে। এই সব শ্বেতজাতীয় অধিবাসীর প্রচেষ্টায় এই বিরল-বসতি তুষারময় অনগ্রসর দেশ দিনে দিনে আধুনিক হইয়া উঠিতেছে। তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রবন্ধে প্রদান করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি

...যে দিন হইতে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইয়া আসিতেছে, সেই দিন হইতে খাদ্যশস্যের ও কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দিন হইতে খাদ্যদ্রব্যের ও কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে আর মানুষের পক্ষে উহাদের পরস্পরের বিনিময় নামমাত্র কড়ির মূল্যে সম্পাদিত করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং কড়ির পরিবর্ত্তে বিনিময়ের জন্য অতর্কিত ভাবে নোট ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার উদ্ভব হইয়াছে। যে দিন হইতে কড়ির পরিবর্ত্তে বিনিময়ের জন্য নোট ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার উদ্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল দুর্ল্লভ ও মহার্ঘ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং মানুষকে জীবিকার জন্য কখনও বা দেশ-বিজয়ের নামে, কখনও বা দস্যুতার নামে, কখনও বা চৌর্য্যের নামে, কখনও বা পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়িতে হইয়াছে। যে দিন হইতে উপরোক্ত দস্যুতা প্রভৃতি প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যথাযথভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি ও পরিশ্রমশীল না হইয়া মানুষের পক্ষে আংশিকভাবে ধনবান্ হওয়া সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জনশীল হওয়া, অর্থাৎ যুগপৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরমায়ু কত?

—শ্রীবংশীধর বসুরায়

পুরাকালের লোকেদের অতি দীর্ঘ পরমায়ুর কথা আমরা শিশুকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। দীর্ঘ জীবনের দিনগুলি তাহাদের কোনও রকমে অসুখ-বিসুখের মধ্য দিয়া কাটিয়া গিয়া পরমায়ুর খাতায় সংখ্যা বৃদ্ধি করিত না—জীবনকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিবার মত তাহাদের ছিল অটুট স্বাস্থ্য। রোগভোগ তাহাদের কমই হইত। কিন্তু সে দিন আজ আর নাই—মানুষের পরমায়ু ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। পুরাকালের পুরুপুরুষদের পরমায়ুর সঙ্গে আজকালকার আমাদের পরমায়ুর তুলনা করিলে হাসি পায়। উপরন্তু আমাদের দেশের লোকেদের ত আরও কম পরমায়ু। দুই-বেলা যাহাদের পেটভরা খাবার জোটে না, অসুখ-বিসুখ যাহাদের লাগিয়াই আছে—কি করিয়াই বা তাহারা বেশী দিন বাঁচিবে? কিন্তু তবুও তাহাদের বাঁচিতে সাধ যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই আরও বাঁচিবার ইচ্ছাটা মানুষের মজ্জাগত। অনেক তপস্যা এবং সাধ্য সাধনা করিয়া দৈহিক অমরত্ব লাভের চেষ্টা সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে হইয়াছে ও হইতেছে। আমাদের দেশের পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলিতে দুর্লভ অমৃতের উল্লেখ আছে। পৃথিবীর মানুষের মনে অমৃতত্বের স্পৃহা চিরদিনই সমভাবে বিরাজমান আছে। অমৃতের উৎস অনুসন্ধানে মানুষ তাই বিরত হইতে পারে না। দুর্লভকে লাভ করাই মানুষের কাম্য—অজ্ঞানাকে জানিবার জন্য তাহার উৎসাহ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিরজাগ্রত থাকে। তাই এতদিনের নৈরাশ্যের অন্ধকারেও মানুষ হতাশ হয় নাই। আরও বেশী বাঁচিবার ইচ্ছা মানুষের মন হইতে এখনও একেবারে লোপ পায় নাই—এমন কিছু যে একটা জিনিষ আছে, যাহা মানুষের আয়ু বাড়াইয়া দিতে পারে—এই অনিশ্চিত ধারণা মানুষ অনেক যত্নে হৃদয়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। অনেক রকম চেষ্টা অনেক ভাবে করা হইয়াছে। কিন্তু সেই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তবুও মায়াবিনী আশার কুহকজাল মানুষকে মুক্তি দেয় নাই—হয়ত কোনও অনাগত দিনে কেহ এই কাম্য জিনিষটি আবিষ্কার করিবে, এই ধারণা সকলেরই মনে রহিয়া গিয়াছে।

বৎসরের পর বৎসর গত হইয়াছে, কিন্তু মানুষ তাহার আশা ত্যাগ করে নাই। কেহ কেহ বলিবেন—এখনকার এই বৈজ্ঞানিক যুগে এরূপ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু তাহাই কি অভ্রান্ত সত্য? নিঃসংশয়ে আমরা তাহা মানিয়া লইতে পারি না। এমন কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, যাহা মানুষের আয়ুকে আরও বাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, সেই "এমন কিছু"টি এখনও পর্য্যন্ত অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে। মধ্যযুগের রাসায়নিকেরা কল্পনায় একরূপ সঞ্জীবনী-সুধার স্বপ্ন দেখিতেন। তাহা লইয়া তাঁহাদের গবেষণার অন্ত ছিল না। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক যুগে বাস্তবের নির্ম্মম আঘাতে তাঁহাদের সেই কল্পলোকের সৌধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে সমস্ত বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করিয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের আশা, যদি কোনও শুভমুহূর্ত্তে সেই রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারেন, যাহা মানুষের পরমায়ু আরও বাড়াইয়া দিতে পারে—কয়েক বৎসরই হউক অথবা কয়েক মাসই হউক।

মানুষের জীবনকে প্রদীপের সঙ্গে তুলনা করা হয়। জ্বলিয়া জ্বলিয়া তৈল ফুরাইয়া প্রদীপ আপনিই নিভিয়া যায়, মানুষের জীবনীশক্তিও যখন নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখনই জীবনপ্রদীপও নির্ব্বাপিত হয়। প্রদীপের মত তাহা তৈলসত্বে বাতাসের বেগে নিভিয়া যাইতে পারে—ইহাকে আকস্মিক মৃত্যু বলা হয়। একজন লোকের যদি ব্যাঘ্রকবলিত হইয়া মৃত্যু ঘটে এবং আর একজন যদি টাইফয়েড্ রোগে মারা যায়, তাহা হইলে এই দুই ক্ষেত্রেই আমরা আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিব। ব্যাঘ্র প্রথমোক্ত মৃত্যুর কারণ এবং bacillus typhosus বা একটি আণুবীক্ষণিক জীবাণু শেষোক্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী। সুতরাং এইভাবের মৃত্যুকে আমরা আকস্মিক মৃত্যুই বলিব। ইহা জীবাণু আক্রমণে বা অন্য কোন কারণে ঘটিতে পারে।

দেহভাগের কোন অংশের সহিত বহির্জ্জগতের প্রত্যক্ষভাবে সংস্রব আছে এবং কোন অংশের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্রব নাই। ফুসফুস, শ্বাসনালী, উদর, অন্ত্র ইত্যাদি অংশের সহিত বহির্জ্জগতের সংস্পর্শ আছে। এই সকল দেহাংশের পক্ষে রোগাক্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। হৃৎপিণ্ড, ধমনী প্রভৃতি দেহাংশ বহির্জ্জগতের সংস্রববর্জ্জিত। এই সকল অংশের পক্ষে রোগাক্রান্ত হওয়া অধিক সময়সাপেক্ষ। জনস্ হপকিন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ পার্ল এই বিষয়ে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, বিশ হইতে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক লোকদের মৃত্যুর জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহির্জ্জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট দেহভাগের রোগ দায়ী এবং বার্দ্ধক্যে যে মৃত্যু ঘটে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড, ধমনী প্রভৃতি বহির্জ্জগতের সংস্পর্শহীন দেহভাগের রোগেই ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে মনে হয় যে, মানুষ যত বৃদ্ধ হয়, ততই সে জীবাণুঘটিত রোগের অজেয় হইয়া উঠে। সুতরাং রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধের কম থাকে। কিন্তু দেহযন্ত্র চলিয়া চলিয়া অবশেষে বার্দ্ধক্যে বিকল হইয়া যায়। তখন কোন উপায়েই তাহার প্রতীকার করা যায় না। বাহিরের সকল আপদ-বিপদে রক্ষা পাইলেও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সঞ্চয় চিরস্থায়ী থাকে না। এই সঞ্চিত শক্তির অবসানেই মানুষের ইহলীলা সাঙ্গ হয়।

আকস্মিক মৃত্যুকে রোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া আমরা বার্দ্ধক্যে যে মৃত্যু ঘটে, তাহার সম্বন্ধেই

আলোচনা করিব। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বার্দ্ধক্যে দেহযন্ত্রের বিকলতার কোন প্রতীকার আছে কি না তাহা লইয়া বহুবিধ গবেষণা করিতেছেন। বার্দ্ধক্য মৃত্যুর সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মত থাকা সম্ভব। একমতে বলা হইবে যে জীবন প্রদীপের তৈল সমস্ত জীবনে ব্যবহৃত হইয়া বার্দ্ধক্যে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়। তৈলবিহীন প্রদীপকে যেমন কোন মতেই জ্বালাইয়া রাখা যায় না, তেমনই মানুষের জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া গেলে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা অসম্ভব হয়। অন্যমতে বলা যাইতে পারে যে, বার্দ্ধক্যে এই যে জীবনের পূর্ণচ্ছেদ—ইহাও একটি আকস্মিক ঘটনা—যাহার কারণ আমরা এখনও জানি না। হয়ত মানুষের শরীরযন্ত্রের মধ্যে কোন অনাবশ্যক দ্রব্যের সঞ্চয়ের ফলে দেহযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে, অথবা সময়ে জীর্ণ সংস্কারের অভাব ক্রমে ক্রমে দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই অনুমান দুইটি পরস্পর বিরোধী। যদি শেষোক্ত অনুমান সত্য হয়, তবে মানুষের আয়ুক দীর্ঘতর করিবার সম্ভাবনা আছে এবং যদি প্রথমোক্ত অনুমান সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য হইবে যাহাতে জীবনীশক্তি অযথা নষ্ট না হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা। এই বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। কিন্তু মানুষকে লইয়া বৈজ্ঞানিকের ইচ্ছামত নানাপ্রকার পরীক্ষা করা কিরূপে সম্ভব তাহা আজিও পাশ্চাত্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকের অজ্ঞাত বলিয়া কীট পতঙ্গ ও জীবজন্তু লইয়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করিতেছেন।

পরমায়ু দীর্ঘতর করা যায় কি করিয়া, এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে কতকগুলি পরিবারের উপর যাহারা বংশগত ভাবে দীর্ঘায়ু। অন্যান্য বিষয়ের মত আয়ুর দৈর্ঘ্যও মানুষ প্রায়ই বংশপরম্পরাগত ভাবে লাভ করে। ডাঃ পার্ল একপ্রকার ফলের পোকা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই ধারণা সত্য—অবশ্য যদি অন্যান্য অবস্থা সব সমান থাকে। এই গবেষণা তিনি প্রথমে দুইটি পোকা লইয়া আরম্ভ করেন। পরে ক্রমশঃ তিনি তাহাদের সন্তান-সন্ততি আলাদা করিয়া দিতেন। উপযুক্ত খাদ্য, আবহাওয়া প্রভৃতি সকল সময়েই একই প্রকার রাখা হইত। এইরূপ হাজার হাজার পোকার জীবনী তিনি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বিভিন্ন প্রকারের স্ত্রী ও পুরুষ পোকা লইয়া পরীক্ষার ফলে দেখিয়াছেন যে, তাহাদের সন্তান সন্ততির আয়ুও তাহাদের আয়ু অনুযায়ী হয়। দৈহিক তারতম্যের মত পিতামাতার আয়ুও সন্তান সন্ততি লাভ করিয়া থাকে।

জীবনের দৈর্ঘ্যের উপর উত্তাপের তারতম্যের প্রভাবও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন যে উত্তাপ যত কম হইবে, এই ফলের পোকাও ততই দীর্ঘায়ু হইবে। ডাঃ লোয়েব এইরূপ পোকার বিভিন্ন দল বিভিন্ন প্রকার উত্তাপের মধ্যে রাখিয়া দেখিয়াছেন যে ৩০° ডিগ্রী উত্তাপে এই পোকা গড়ে ২১ দিন বাঁচিয়াছে, ২০° ডিগ্রী উত্তাপে গড়ে ৫৪ দিন এবং ১০° ডিগ্রীতে গড়ে ১৭৭ দিন। উত্তাপের সাহায্যে অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্রুত হইয়া থাকে। মনে হয়, উত্তাপের জন্য দেহের ভিতরে নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়াও দ্রুত হইয়া যায়। মানুষের দেহ একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগার এবং মানুষের জীবন বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষার ক্রিয়া। এইরূপ গবেষণার ফলে ডাঃ লোয়েব মনে করেন যে যদি মানুষের রক্তের উত্তাপ সাধারণ ৯৮॥০° ডিগ্রী হইতে কমাইয়া ৭॥০ ডিগ্রী করিতে পারা যায়, তাহা হইলে নিয়মানুসারে মানুষের আয়ুও প্রায় ২০ হইতে ২৫ গুণ দীর্ঘতর হইবে। কিন্তু তাহা হইলে মানুষকে জড় ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে হইবে কারণ কাজ করিলেই দেহযন্ত্রের গতিবেগের সহিত উত্তাপও বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য যদি রক্তের উত্তাপ কমান সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই উত্তাপবৃদ্ধির জন্য কোন ক্ষতি হইবে না, কারণ দেহের এই উত্তাপের সহিত বাহিরের উত্তাপের তারতম্যের কোনও সম্পর্ক নাই। বাহিরের উত্তাপ যাহাই হউক না কেন, দেহের উত্তাপ সাধারণ অবস্থায় প্রায় সকল সময়েই ৯৮॥০° ডিগ্রী থাকে। এই বিষয়ে আরও পরীক্ষার ফলে কেহ কেহ মনে করেন যে, যদি সাময়িক ভাবে উত্তাপ কমাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে দেহযন্ত্রের গতির বেগও কমাইয়া দিয়া মানুষকে ইচ্ছামত নিষ্কর্ম্মা ও জড়ভাবে রাখা যায় এবং প্রয়োজন মত সাধারণ অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়, তাহা হইলে এইভাবে মানুষের অনেকদিন বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর।

কিন্তু উত্তাপ ব্যতীত অন্য অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তনেও আয়ুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্ত্তন হয়। একই উত্তাপে রাখিয়া এবং একই প্রকার খাদ্য দিয়া ডাঃ লোয়েব দেখিয়াছেন যে অত্যধিক ভীড়ে মৃত্যু শীঘ্র শীঘ্র ঘটিয়া থাকে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে আয়ুর দৈর্ঘ্য কিছু পরিমাণে দেহের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। দেহবৃদ্ধির গতি অনুযায়ী আয়ুর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক প্রাণী পিতামাতা হইতে যে জীবনীশক্তি লাভ করে, তাহা যত শীঘ্র নিঃশেষ হইয়া যায় তাহার পরমায়ুও তত সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। একপ্রকার চারাগাছ লইয়া এই বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়াছিল। বাহির হইতে তাহাদের কোন কিছুই পাইবার উপায় ছিল না। বীজ হইতে যটুকু শক্তি পাওয়া যায় তাহাতে তাহারা কতদিন বাঁচিতে পারে, তাহা দেখাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল। দেখা গেল, চারাগুলি প্রথমে কিছুদিন ধরিয়া বাড়িল তাহার পর কিছুদিন সমভাবে যেন চুপচাপ করিয়া রহিল তাহার পর ক্রমে শুকাইয়া গেল। কিন্তু ইহার মধ্যে যে গাছগুলি কমদিন বাড়ন্ত অবস্থায় ছিল, তাহারা অন্য চারাগুলির অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়াছিল। তাহাদের জীবন লক্ষ্য করিলে মনে হয়, তাহারা যেন সঞ্চিত অর্থের পরিমিত ব্যবহারের মত সঞ্চিত খাদ্য পরিমিত ভাবে গ্রহণ করিয়া অধিকদিন বাঁচিয়াছিল।

আয়ুর দৈর্ঘ্য খাদ্যের উপরও নির্ভর করে। ইংরাজ পণ্ডিত ফ্রান্সিস্ বেকন বলিয়াছেন যে, রোগাদির জন্য সাময়িক ভাবে ঔষধের আবশ্যক কিন্তু দীর্ঘায়ু লাভের জন্য পরিমিত ও নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনীয়। কিরূপ খাদ্য আবশ্যক ও কিরূপ খাদ্যে জীবনীশক্তি বৃদ্ধিলাভ করে, তাহার বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে বিবিধ পরীক্ষা করা হইয়াছে। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্য সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা হইয়াছে এবং হইতেছে। তাহা হইতে আমরা খাদ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারি। সেখানে একপ্রকার নদীর মাছ লইয়া পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ভিটামিন 'H' নামক একটি দ্রব্য খাদ্যে না থাকিলে এই মাছদের আয়ু দীর্ঘ হয় না। এই মাছকে নানাপ্রকার খাদ্য

দিয়া দেখা হইয়াছিল যে, খাদ্যে ভিটামিন 'B' না থাকিলে ইহাদের অকাল-মৃত্যু নিশ্চিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিষজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ লইয়াও পরীক্ষা হইয়াছিল। একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্বেতকায় মুষিকদলকে বিভিন্ন পরিমাণে আমিষ খাদ্য (protein) দিয়া দেখা গিয়াছে যে, অতিরিক্ত পরিমাণ আমিষ খাদ্য দীর্ঘজীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সংযত পরিমাণ খাদ্য দীর্ঘ-জীবনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু এই পরীক্ষায় আরও দেখা গিয়াছে যে, খাদ্যের মধ্যে শতকরা ১৪ ভাগ আমিষজাতীয় দ্রব্য (protein) না থাকিলে বৃদ্ধিলাভ অসম্ভব। দেহের মধ্যে প্রোটিন যে পরিমাণে নষ্ট হয়, তাহার ক্ষতিপূরণ এবং দেহবৃদ্ধির জন্য যে অতিরিক্ত প্রোটিন আবশ্যক, তাহা না পাইলে জীবনধারণ কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত কম কার্য্য করে বলিয়াই বোধহয় স্ত্রীজাতীয় জীব দীর্ঘায়ু হয়।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটীতেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করা হই-য়াছে। ডাঃ শারম্যান নানারকম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নানাবিধ খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। শ্বেতকায় মুষিকের বিষয়ে দেখা গিয়াছে যে, পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে দুগ্ধ দিলে উহাদের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়, দেহবৃদ্ধিও ভাল হয় এবং তাহারা দীর্ঘায়ু হয়। উপযুক্ত খাদ্য দেহ-বৃদ্ধির সহায়তা করে; তাহাতে জীবনে অতিরিক্ত শক্তিসঞ্চার হয় এবং আয়ুও দীর্ঘ হয়। কি কি খাদ্য বিশেষ আবশ্যক, তাহা জানিবার জন্য ডাঃ শারম্যান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। দুগ্ধের মধ্যে অনেক কিছু আছে। তাহার মধ্যে ক্যালসিয়াম্, ভিটামিন্ 'A' ও 'C' এই তিনটি দ্রব্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি দুগ্ধের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া সেই পরিমাণে ক্যালসিয়াম্ এবং ভিটামিন্ 'A' ও 'C' দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধে যেরূপ আয়ু বৃদ্ধি হয়—এইরূপ খাদ্যেও সেইরূপ হইবে। ইহা হইতে ডাঃ শারম্যান স্থির করিয়াছেন যে, মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ দুগ্ধ হওয়া উচিত এবং এক-পঞ্চমাংশ টাটকা ফলমূল, সজী এবং অবশিষ্ট অংশ সাধারণ খাদ্য (যাহা আমরা খাই) হওয়া উচিত। এইরূপ খাদ্যে জীবন আরও প্রায় ৫ বা ৭ বৎসর বেশী স্থায়ী হইবে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। তাঁহার এই গবেষণা সম্পূর্ণ না হইলেও এই বিষয়ে তিনি এত নিশ্চিত হইয়াছেন যে, তিনি এই পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন।

বিভিন্ন পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে আলোচনার পর এখন দেখা যাউক যে, বার্দ্ধক্যের জন্য যে মৃত্যু তাহা কেন হয়। দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাণীই বৃদ্ধ বয়সে মরিয়া যায়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, জীবাণু কখনও বার্দ্ধক্যের জন্য মরে না। আকস্মিক মৃত্যু কোন কারণে তাহাদের হইতে পারে, কিন্তু কেবল বৃদ্ধ হওয়ার জন্যই জীবাণুর কখনও মৃত্যু হয় না। জীবাণু অমরপ্রাণ—ইহারা মাত্র এক একটি ক্ষুদ্র কোষের (cell) মধ্যেই নিবদ্ধ। তাহাদের দেহযন্ত্রের সব কিছুই এই একটি কোষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু মানুষ ত কেবল একটি কোষ মাত্র নহে। কত শত বিভিন্ন কোষের সমষ্টি লইয়া দেহযন্ত্রের এক একটি অংশ গঠিত এবং এই সমস্ত অংশ লইয়া মানবদেহ। সুতরাং ইহা অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। এই জটিলতাই আমাদের দীর্ঘায়ু হইবার পথে বিশেষ বাধা। কারণ দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের যদি কোনটি বিকল হইয়া যায়, তাহা হইলে দেহও বিকল হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বলিতে হয় যে, বার্দ্ধক্যে যে মৃত্যু ঘটে, তাহার কারণ বার্দ্ধক্য নহে, পরন্তু এই পরস্পরনির্ভরশীল কোন দেহভাগের বিকলতাই ইহার কারণ। হয়ত সময়োপযোগী কোন গ্রন্থিরস নিঃসরণ হইল না; এই রস রক্তের মধ্য দিয়া দেহের অন্য ভাগে সঞ্চালিত হইল না—সেজন্য তাহার কার্য্য স্থগিত রহিল—এই ভাবেই মানুষের দেহযন্ত্র বিকল হইয়া যায়। অথবা যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন arterio-sclerosis,—এই অবস্থায় ধমনীর গাত্র শক্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ইহাতে যে মৃত্যু ঘটিবে, তাহা অস্বাভাবিক নহে। এই arterio-sclerosis লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন,কারণ বার্দ্ধক্যে হৃৎপিণ্ড,ধমনী প্রভৃতি এই arterio-sclerosis-এর জন্যই বিকল হইয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় ধমনীর সহিত রবার-নির্ম্মিত নলের তুলনা করা যায় এবং arterio-sclerosis হইলে উহার সহিত সীসকের নলের তুলনা করা যায়। অবশ্য ইহা তুলনা মাত্র। ধমনীগাত্র কখনও সীসকের মত অত শক্ত হয় না।

নানারূপ পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, ধমনীগাত্রে—যাহাকে cholesterol বলা হয়, উহা সঞ্চয়ের ফলেই arterio-sclerosis হয়। এই cholesterol সঞ্চয়ই বার্দ্ধক্যের চিহ্ন। কারণ দেখা যায়, অল্পবয়সে সাধারণতঃ এরূপ ঘটে না। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সেই বা এরূপ হয় কেন? সাধারণ অবস্থায় রক্তের মধ্যে cholesterol থাকে, কিন্তু অল্পবয়সে যে উহার এরূপ সঞ্চয় হয় না, তাহার কারণ কি হইতে পারে? বোধহয় এই ক্ষতিকর সঞ্চয় হইতে রক্ষা পাইবার কোন ব্যবস্থা আছে। হয়ত দেহমধ্যস্থ কোন নালীহীন গ্রন্থিরস নিঃসৃত হইয়া এরূপ সঞ্চয় নষ্ট করিয়া দেয়। এই রস বোধহয় অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে আর পূর্ব্ববৎ নিঃসৃত হয় না এবং সেইজন্যই এই arterio-sclerosis হয়। সাধারণ অবস্থায় কি প্রকারে ও কিসের দ্বারা এই cholesterol বিনষ্ট হয়, তাহা জানিবার জন্য অনেক চেষ্টা চলিতেছে। কৃত্রিম উপায়ে ইচ্ছামত জীবজন্তুর ধমনীগাত্রে cholesterol সঞ্চয় করা সম্ভব হইয়াছে। এক্ষণে ঐ সঞ্চয় বিনষ্ট করিবার উপায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইতেছে। যদি ইহা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে arterio-sclerosis-এর সম্ভাবনা হইলেই এই পদার্থ দ্বারা উহা বিনষ্ট করা যাইবে।

এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং ফলাফল এখন অনিশ্চিত। কিন্তু যদি এই cholesterol নামক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হইলে যে ভাবে মূত্রদোষে (diabetes) ইনসুলিন (insulin) দিয়া ঐ রোগ আরোগ্য করা যায়—সেইভাবেই arterio-sclerosisও আরোগ্য করা সম্ভব হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেছেন। মূত্র-দোষে একপ্রকার গ্রন্থিরসের অর্থাৎ ইনসুলিনের (insulin) অভাব হয়। তাহার ব্যবস্থা করা এখন সম্ভবপর হইয়াছে। হয়ত arterio-sclerosisএও

কোন প্রন্থিরসের অভাব হয়। সেই অভাব পূরণ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিকের আশা কিয়দংশভাবে পূর্ণ হইবে মনে করা যাইতে পারে।

এইরূপ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সমস্যা বহুবিধ, পরীক্ষার পদ্ধতিও নানাবিধ—কিন্তু সকলের লক্ষ্যই এক। যাহা কখনও জানা যায় নাই, তাহা যে কখনও জানা যাইবে না, এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। অচিন্তানীয়ের চিন্তায় মানুষ আনন্দ পায়। মানব-বুদ্ধির অগম্য অজ্ঞাতকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার আগ্রহ মানুষের পক্ষে তাই স্বাভাবিক। কোন কিছু চিরদিনই অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে, এ কথা মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না। তাই দৈহিক অমরত্ব লাভের উপায় কোন না কোনদিন মানুষ নিশ্চয়ই জানিতে পারিবে—এই আশা লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা ও গবেষণা চলিয়াছে ও চলিতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফল মানুষের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা ধারণা করেন। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে মানুষে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিকভাবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর আয়ু সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে—মানুষের সম্বন্ধেও তাহা অবশ্যই সত্য হইবে।

হয়ত কোন অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে মানুষের এতদিনকার কঠোর পরিশ্রম, তাহার সুচিরসঞ্চিত আশা ও তাহার দিবারাত্রির কামনা সার্থকতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আমরা কল্পনায় দেখিতে পাই—সেই অনাগত দিনের মানুষের পরমায়ু হইবে হাজার হাজার বৎসর। সুস্থ, সবল, কর্মঠ ও সুন্দর হইবে তাহাদের জীবন এবং প্রাণযাত্রার প্রণালী। কিন্তু কল্পলোকের অস্পষ্ট আলোকে আর অধিক অগ্রসর হওয়া যায় না। আমাদের অধস্তন পুরুষের পূর্ণতার ছবি অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

কিন্তু আমাদের এই প্রচেষ্টা একদিন সার্থক হইবে আমাদের পরিশ্রম একদিন সাফল্য লাভ করিবে। প্রাচীন গ্রন্থের 'মেথুসেলা' যে সূত্রে জানিতেন, তাহা জানা আমাদের ভাগ্যে না থাকিলেও আমাদের পরে যাহারা আসিবে—তাহারা কেহ না কেহ একদিন তাহা আবিষ্কার করিতে পারিবে। এ কথা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া বিশ্বাস করেন। সেই দিনই এই বৈজ্ঞানিকদের আত্মা পরিতৃপ্তির সুখনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে।

বাঙ্গালীর শহর

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

শোন ভাই—বলে যাই শহরের গল্প,
কলিকাতা নাম তার আয়তনে স্বল্প।
একখানা বাড়ী নিয়ে থাকা যেথা যায় না
যেখানে মিলিয়া গেছে—লণ্ডন চায়না।
যেখানে বাঁধুনী উড়ে—নেপালীরা দ্বারবান,
পাঞ্জাবী ড্রাইভার, কাঁইয়ারা বেনিয়ান।
বেহারী যোগায় দুধ, ব্রজবাসী বেচে পান,
মাড়োয়ারী ফেরিওলা মার্কিন বেচে যান।
ঘুঁটেউলি যেথানেতে লক্ষ্ণৌ হতে আসে,
কাবুলীরা হিং নিয়ে তেজারতি ভালবাসে।
চীনেম্যানে জুতো দেয়, ভাটিয়ারা গয়না—
যারা ছাড়া বাঙ্গালীর পসন্দ হয় না।
যেখানে রিক্স থেকে বাস্ চলে দৌড়ে
যাহার মালিকগুলি থাকে না ক' গৌড়ে,
কেউ থাকে লুধিয়ানা, কেউ থাকে ধারিয়াল,
কখনো যাহারা এসে দেয় পেশোয়ারী শাল!
গরম পকৌড়ি থেকে জুতা-বুরুষের কাজ
কংগ্রেসী-টংগ্রেসী যতবিধ দম্‌বাজ,
মাদ্রাজী কেরাণী ও কুলী, রাজ-মিস্ত্রী
কল-কারখানা মায় রজকের ইস্ত্রী
চালায় যেখানে...সব মাড়োয়ারী, কচ্ছি,
পারসী, আমেদাবাদী, গুজরাটী, লপচি;
তারই নাম কলকাতা—বাঙালীর গর্ব্ব
যেখানে লেগেই আছে নব নব পর্ব্ব।

পয়সা খরচ করে গাড়ী চাপা পড়ছে
লুটপাট ছুরি হেনে রাহাজানি করছে!
ফ্ল্যাট সিস্‌টেম্ বাড়ী বলিহারি কারবার
ওপরে নীচেতে রোজ হতেছে কেলেঙ্কার।
মাসিকে ও সাপ্তিকে সাহিত্য ফুটছে
কবিরা দু বেলা যেথা ভুঁয়ে মাথা কুটছে
বলিবার নাই কিছু, তবু লেখে এডিটার,
ঘর থেকে টাকা এনে "ষ্টার" হয় এমেচার।
যেখানে মেয়ের দল বাসে চড়ে যায় স্কুল
রেডিওতে গান গায়—সাহিত্যে ধরে ভুল।
তাহাদের দাদা যারা—তারা খুব পণ্ডিত
আই-এ ও বি-এ হয়ে করেছে বাপের হিত।
মুখস্থ বলে যাবে অভিনয় সিনেমার
কোন্ মেয়ে আর্ট বোঝে, কোন্ মেয়ে ভাল্‌গার।
হল বা বেকার তারা—বনিয়াদী বংশ
ট্র্যাডিশন দেখাবেই কুল অবতংস।
পেটে নাই ভাত তবু দুই বেলা ক্ষৌরি,
সিগারেট ঠোঁটে চেপে পথ চলে দৌড়ি,
কথা কয় ফরাসীতে, চিঠি লেখে লাটিনে
বলে—"দূর বাংলার পাত্‌তাড়ি পাতিনে..."
যে সহরে মিলে যাবে এই সব লক্ষণ
জানিও বাঙ্গালী সেথা করে কলা ভক্ষণ।

চিত্র-চরিত্র

মাইকেল মধুসূদন

—শ্রীঅমিত রায়

এত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও মাইকেল বিদেশে গিয়া বড় কোন কাব্য লিখিতে পারিলেন না কেন? অবস্থার প্রতিকূলতা, অস্বাস্থ্য, ঋণ? ইহা আর যাহার পক্ষেই সত্য হউক, মাইকেলের মত দৈত্যশিশু, যাঁহার মন্ত্র "শরীরং বা পাতয়েৎ কার্য্যং বা সাধয়েৎ", তাঁহাব পক্ষে সত্য নয়। তিনি যে শুধু বড় কাব্য লিখিতে পারেন নাই তাহা নয়, অনেকগুলি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তাঁহার জীবনীলেখক বলেন, "সীতা কাব্য ভিন্ন কতকগুলি ইংবাজী খণ্ড-কবিতাও তিনি ইউরোপ-প্রবাসকালে রচনা করিয়াছিলেন,"—ইহার কোনটাই সমাপ্ত হয় নাই।

আমার মনে হয়, তাঁহাব অবস্থা প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হইলেও তিনি আর দীর্ঘ কাব্য রচনা করিতে পারিতেন না। দেশে ফিরিয়া প্রথম দুই বৎসর সাংসারিক অবস্থা বেশ ভালই ছিল, সে রকম স্বচ্ছলতা তাঁহার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা কি? কিছুই নয়। কেন এমন ঘটিল?

উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনার পক্ষে মানসিক একটা সংযম আবশ্যক। নৈতিক সংযমের কথা বলিতেছি না। মনোবৃত্তি, দেহবৃত্তি, সাংসারিক প্রবৃত্তি কায়মনোবাক্যে একটি কেন্দ্রে আসিয়া একীভূত হইলে তবেই বড় কাব্য রচনার অনুকূল অবস্থা ঘটে।

ইহা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে এমন একটি অতিশয় শ্রমসাধ্য ব্যাপার যে,এমন অষ্টগ্রহের সংযোগ কদাচিৎ ঘটে এবং ঘটিলেও দীর্ঘ কাল স্থায়ী হয় না। ইহা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উভয় জীবন সম্বন্ধেই সত্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে এমন একটি গানের গোধূলি-লগ্ন আসিয়াছিল, সেই দেশব্যাপী শুভলগ্নে বাঙ্গালী কবি কথা বলিলেই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিত। এল-ডোরাডোর পথে ছেলেরা সোনার গুলি লইয়া খেলা করে। আর সেদিন বাঙ্গালী কবিরা অজস্রধারে পদাবলীর হরির-লুট দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে কোটালের বন্যা চলিয়া গেল, বাঙ্গালী কবিরা আবার পল্লী-মাতার গোয়ালে ফিরিয়া ছড়া আর জাবনা কাটিতে আরম্ভ করিলেন।

বিদেশের সাহিত্যে ইহার তুল্য উদাহরণ বিরল নহে। মহাকবি গ্যয়টের জীবন দেখা যাক্। বৈজ্ঞানিক গ্যয়টে ও শিল্পী গ্যয়টে—এক দিকে তিনি সভাসদ্ ও মন্ত্রী, অন্যদিকে তিনি কবি ও ঋষি, এই দ্বিত্ব তাঁহার কাব্যকে দ্বিধাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে সৃষ্টির শুভলগ্ন আসিয়াছে, তখন অমর কাব্যের অজস্র বর্ষণ। আবার সেই দ্বিধা—তাঁহাব অনেক অসমাপ্ত কাব্য এই জীবনব্যাপী দ্বিধার চিহ্ন।

মাইকেলের জীবনেও এমন একটি দুর্ল্লভ অবসর আসিয়াছিল, তাঁহার মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ও বিলাত-গমনের পূর্ব্বে। স্বল্পস্থায়ী পাঁচ ছয়টি বৎসর। যে-প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে তিনি শৈশব হইতে আশ্রয় করিয়াছিলেন, শেষে যে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অস্তিত্বের সহিত অবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহার চরম পরিণামে মধুসূদন যেন নিজের অস্তিত্বের পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন। মহাকাব্য রচনার এই আকাঙ্ক্ষার নাম ছিল মধুসূদন, তাহা যখন চরিতার্থতা লাভ করিল, তখন সেই সঙ্গে মধুসূদনেরও নির্ব্বাণলাভ ঘটিল। অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাই প্রেতের মত রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়। এই সময়টাতে মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার তৃপ্ত হইয়াছিল, বাকী যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, ইংলণ্ড গমনের, প্রকৃত প্রস্তাবে যাহার আর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ, মহাকাব্য তিনি দেশে বসিয়াই রচনা করিয়াছিলেন, সেই অতৃপ্ত অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, অবশেষে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে—সুদূরে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, মধুসূদনের কবি-প্রকৃতি বিদেশে গিয়া হতাশ হইয়াছিল। কাব্য রচনার পূর্ব্বে বিদেশে গেলে এমন হতাশ তিনি হইতেন না। সেখানে গিয়া দেখিলেন,

কৃষ্ণ-বিরহিত পার্থের মত গাণ্ডীব তুলিবার শক্তি পর্য্যন্ত তাঁহার নাই।

আমরা বলিয়াছি, মানসিক একটা বিশেষ লগ্ন অতিক্রম করিবার জন্ম মাইকেলের কাব্য-গঠনের শক্তি লুপ্ত হইয়াছিল ; কিন্তু কবিত্বশক্তির অভাব ঘটে নাই। কবিত্বশক্তি এক পদার্থ ; কিন্তু সেই শক্তির সাহায্যে বড় একটা কাব্য গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র ; ইহাকে কাব্যের ভাস্কর্য্য-শিল্প বলা যাইতে পারে। মাইকেল কবি ছিলেন, কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা, তিনি কবি-ভাস্কর ছিলেন। বিলাত গমনের সময়ে মানসিক অরাজকতায় এই শক্তিই তাঁহার নষ্ট হইয়াছিল। কবিত্বশক্তি যে অব্যাহত ছিল, তাহার প্রমাণ চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

অট্টালিকা ও ইঁটের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ঠিক সেই সম্বন্ধ তাঁহার অলিখিত কাব্য ও এই সনেটগুলির মধ্যে। এই ইঁটের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়পিনদ্ধ গঠন দেখিলে দুঃখ হয় যে, ইহাতে অট্টালিকা গঠিত হইলে কি অমর কীর্ত্তিই না নির্ম্মিত হইত!

কিন্তু কারিকরের সেই সমগ্রতার দৃষ্টি, সমগ্রতার বোধ আর ছিল না ; ইঁট গড়িবার শক্তি থাকিলেও তাহাকে অট্টালিকার অখণ্ডতা দানের শক্তি তাঁহার লোপ পাইয়াছিল। মাইকেলের সনেটগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিলে আশা করি আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

মাইকেলের সনেট নিম্নলিখিতরূপে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে। (ক) কবি ও কবিখ্যাতি, (খ) পৌরাণিকী, (গ) দেশের স্মৃতি, (ঘ) বিবিধ।

[ক]

এই বিভাগে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। দেশী, বিদেশী অনেক কবির বিষয়ে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল, বিদেশী যে-সব কবির নিকট তিনি সমূহ ঋণী, সেই হোমর, ভার্জিল, টাসো, ওভিড-এর কোন উল্লেখ নাই।

যে-মিণ্টন তাঁহার কবির আদর্শ, যে-বায়রণের জীবনী পড়িয়া মনে হয়, তিনি বড় কবি হইবেন, ইংলণ্ডে গমন যাঁহাদের দেশে গমনের নামান্তর মাত্র, তাঁহাদের কোন উল্লেখ নাই। বিদেশ হইতে লিখিত চিঠিপত্রে মিণ্টনের কথা দৃষ্ট হয় না।

সাহিত্য জীবন নহে, জীবনের ছায়াও নহে, সাহিত্য না-জীবন। সাহিত্য ও জীবন পরস্পর পরিপূরক।

জীবনে যে আশা সফল হয় না, সাহিত্যের কল্পতরুতে তাহাই ফল প্রসব করে। দেশে থাকিতে এই সব বিদেশী কবিদের স্পর্শ তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সার্থকতায় চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিল। এই সব কবিদের সফলীভূত আকাঙ্ক্ষা আর কাব্যের সামগ্রী ছিল না। কিন্তু কবিখ্যাতির আশা তাঁহার মেটে নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে অনেকগুলি সনেট আছে। অবশ্য দান্তের বিষয়ে একটি সনেট আছে, কিন্তু দান্তের অপেক্ষা ইহা জন্মতিথি-উৎসব উপলক্ষে রচিত বলা উচিত। এই সনেটটিই অনুবাদ করিয়া কবি ইটালীরাজের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই প্রেরণের মধ্যে যেন একটি চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা মধুসূদনের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটি snob বরাবর প্রচ্ছন্ন ছিল। যে মনোবৃত্তিতে তিনি এক মোহর খরচে চুল ছাঁটিয়া গর্ব্ব করিতেন, চল্লিশ হাজার টাকার কমে ভদ্রলোকের চলা উচিত নয়—মনে করিতেন, রাজমোহন দত্তের পুত্র শুনিয়া টাকা দান করেন না বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন, ফরাসী সম্রাট লুই নেপোলিয়ানকে দেখিয়া 'সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন' বলিয়া ফরাসী ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন, সেই মনোবৃত্তিতে তাঁহার এ সনেট প্রেরণ, দান্তের উৎসব উপলক্ষে ইটালীরাজের নিকটে।

এই প্রেরণার মূলে কবি মধুসূদন নহে, snob-মাইকেল, রাজমোহন দত্তের পুত্র। যে-চোরাবাগানের নগণ্যদের তিনি অবজ্ঞা করিতেন, এখানে তিনি তাঁহাদের সগোত্র। জীবিত কবিদের মধ্যে টেনিসন ও ভিক্তর হ্যুগোর বিষয়ে দুইটি সনেট আছে। একজন রাজকবি, অন্যজন তৎকালীন ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত। এ দুটি কবিতা ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল কি না, না জানা পর্য্যন্ত ইহাদের মধ্যেও যে এমন একটি সুদূর ব্যঞ্জনা নাই তাহা বলা যায় না।

দেশীয় কবিদের মধ্যে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, জয়দেব, কৃত্তিবাস আছেন।

মাইকেল দেশে ফিরিয়া বড়দরের কাব্য লিখিবার আধ্যাত্মিক সুযোগ পাইলে কি রকম কাব্য লিখিতেন, কেহ বলিতে পারে না। এই সব অতৃপ্ত-আকাঙ্ক্ষা-কবির নাম দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার কাব্যশিল্প অধিকতর ভাবে ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিত। একদা যেমন তিনি ভারতীয় ভাষায় লিখিবার জন্য ইংরেজী ভাষা ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনই সুযোগ পাইলে কাব্যকে অধিকতর ভারতীয় রূপ দিবার জন্য পূর্ব্বলিখিত কাব্যের পন্থা তিনি খুব সম্ভব পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার যে কাব্য আমরা পাইয়াছি, তাহা শিক্ষা-নবিশী পর্ব্বের রচনা; মাইকেলের প্রকৃত কাব্য অরচিত রহিয়া গিয়াছে।

[খ]

মধুসূদন নবতর উদ্যমে কাব্য-রচনার সুযোগ পাইলে, সে কাব্য যে পৌরাণিক ভিত্তিতে গঠিত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই অসমাপ্ত গীতির খণ্ডিত তান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পৌরাণিক সনেটগুলির সৃষ্টি করিয়াছে।

মধুসূদন অনেকগুলি পৌরাণিক কাব্য অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন; সুভদ্রাহরণ, দ্রৌপদীস্বয়ম্বর, সীতাকাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্যের অসমাপ্ত কয়েকখানি পত্রিকা; ইহা ছাড়া তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের একটি নূতন সংস্করণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। এই সনেটগুলির আবার তিন ভাগ করা চলে।

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, ব্রজবৃত্তান্ত ও বাংলা পুরাণের কথা। রামায়ণ-মহাভারত, অর্থাৎ ভারতীয় পুরাণের কাহিনী লইয়া তিনি অনেক কয়েকখানি সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাব্য রচনা করিয়াছেন। ব্রজবৃত্তান্ত বিষয়ে তাঁহার রচনা ব্রজাঙ্গনা কাব্য। কিন্তু বাংলা পুরাণ লইয়া তিনি কোন কাব্য ইতিপূর্ব্বে রচনা করেন নাই।

কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, ঈশ্বরী পাটনী, শ্রীমন্তের টোপর প্রভৃতি সনেট এবং অসমাপ্ত সিংহল-বিজয় কাব্য তাঁহার মনোজগতে নূতন দিগ্‌দর্শন সূচনা করে। আমরা আগে বলিয়াছি, তাঁহার পক্ষে বড় কাব্য রচনা সম্ভব হইলে তাহা অধিকতর ভাবে ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিত। এখন এই সনেটগুলি দেখিয়া মনে হইতেছে, খুব সম্ভবতঃ, সে কাব্যের বিষয়বস্তু বাংলা পুরাণ হইতে সংগৃহীত হইত।

বাংলা কোন্ পুরাণের ঘটনা অবলম্বনে তিনি কাব্য লিখিতেন? উপরের কবিতাগুলি হইতে তিনটি বিষয়বস্তুর নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, অন্নদামঙ্গল, ধনপতি সদাগরের কাহিনী ও বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয়। মেঘনাদবধ কাব্যেও একবার লঙ্কা বা সিংহল সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, মাইকেলের সিংহলের প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল। ইহা কি একেবারেই অকারণ?

সমুদ্রপারবর্ত্তী ঐশ্বর্য্যময় ক্ষুদ্র সিংহল দ্বীপ কি তাঁহার মগ্নচৈতন্যলোকে সমুদ্রপারবর্ত্তী সম্পদের লীলাভূমি আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের কোন অনুকরণ ধ্বনিত করিত না? কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ তিনি ধনপতি সদাগরের সিংহল-যাত্রা কিংবা বিজয়সিংহের সিংহল-বিজয় বৃত্তান্ত লইয়া কাব্য রচনা করিতেন, এ ক্ষেত্রে সমুদ্র ও সিংহল তাঁহার কবিচিত্তকে আকর্ষণ করিত। অন্নদামঙ্গল কাহিনী লইয়াও কাব্যরচনা অসম্ভব ছিল না। পূর্ব্বগামী বঙ্গীয় কবিদের মধ্যে এক ভারতচন্দ্রকেই তিনি স্বানুরূপ মনে করিতেন। কৃত্তিবাস-কাশীদাস বড়, কিন্তু তাঁহারা ব্যাস-বাল্মীকির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া লোকোত্তর, তাঁহাদের সঙ্গে লৌকিক কবিদের তুলনা চলে না। লৌকিক কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র শ্রেষ্ঠ। লোকেও তাঁহাকে ভারতচন্দ্রের সঙ্গেই তুলনা করিত।

মেঘনাদবধ প্রকাশের পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, তুমি খুব করিয়াছ, কিন্তু ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইতে পারিয়াছ মনে হয় না। যিনি কালিদাসের সমকক্ষ হইবার আশা রাখিতেন, বলা বাহুল্য তাঁহার কাছে এ কথা মুখরোচক হয় নাই। কবির নিজের কল্পনাতেও ভারতচন্দ্রের স্মৃতি বারংবার জাগিয়া উঠিত। একদিন তিনি ও কৃষ্ণনগরের রাজা এক সঙ্গে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন, আমি কল্পনায় দেখিতেছি কৃষ্ণচন্দ্রের পিছনে ভারতচন্দ্র চলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের এই স্মৃতি তাঁহাকে টানিত। সে-টান ঈর্ষ্যার নহে, কারণ মধুসূদন জীবনে ও সাহিত্যে ঈর্ষা কাহাকে বলে জানিতেন না। এই আকর্ষণকে সুস্থ ও অনুরূপ মনের প্রতিযোগিতার আহ্বান বলা যাইতে পারে। এ হেন ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়বস্তু লইয়া তিনিও যে একখানি কাব্য লিখিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের এমন কি আছে?

[গ]

এই পর্য্যায়ের সনেটগুলির মূলে দেশের স্মৃতি। দেশে থাকিতে বিদেশ কিরূপে তাঁহাকে টানিয়াছিল, তাহা দেখিয়াছি। এবারে বিদেশে গিয়া দেশের প্রতি টান। বিদেশে গেলে অনেককেই দেশ টানিয়া থাকে, কিন্তু মাইকেল দেশে থাকিতেও খানিকটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ধর্ম্মমতে তিনি খৃষ্টান, কিন্তু তাঁহার কাব্যবস্তু হিন্দু জীবন ও হিন্দু ঐতিহ্য; এই দুইটির মাঝে একটি বিচ্ছেদের অবকাশ। বিদেশে গিয়া এই বিচ্ছেদ বড় করুণ ভাবে তাঁহার চোখে পড়িয়াছে। এই দ্বিধার দ্বিত্ব, দেশ ও হিন্দুজীবন, তাঁহার অনেকগুলি সনেটকে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। কপোতাক্ষ নদ, নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে শিবমন্দির, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ মন্দির প্রভৃতিতে বিচ্ছিন্ন দেশের স্মৃতি। আবার, শ্রীপঞ্চমী, আশ্বিনমাস, বিজয়া দশমী, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা প্রভৃতি সনেটে বিচ্ছিন্ন হিন্দু জীবনের (যে হিন্দু জীবন তাঁহার কাব্যে উপজীব্য) আকর্ষণ।

মাইকেল খৃষ্টান হইলেও তাঁহার কবিপ্রকৃতি প্রকৃত কাব্যসামগ্রীর দিকে তাঁহাকে সবলে টানিয়া রাখিয়াছে; সেইজন্য নানা বাধা সত্ত্বেও তাঁহাকে কখনও কাব্যসামগ্রীর অভাবে বা ভুলে দ্বিধাগ্রস্ত হইতে দেখা যায় না।

[ঘ]

বিবিধ পর্য্যায়ের সনেটগুলির মধ্যে দুইটি, ভারতভূমি ও আমরা। এ দুইটি দেশপ্রেমের কবিতা। প্রাচীন ভারতের জন্য গৌরব, আধুনিক ভারতের দুর্দ্দশার জন্য দুঃখ, ভারতভূমির দুরবস্থার জন্য আক্ষেপ। অন্য কয়েকটি সনেটে কবির ব্যক্তিগত জীবনের নৈরাশ্য ও ব্যর্থতার বিলাপ। তিনি বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে বায়রণের অনুকরণে 'রেখ মা দাসেরে মনে' বিখ্যাত কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। ইহার প্রারম্ভে বায়রণের "My Native Land, good night" ছত্রটি উদ্ধৃত। মাইকেলের মধ্যে snobbery ও নিষ্ঠা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। না তাহার অপেক্ষা বেশী; কিন্তু তাঁহার আন্তরিক নিষ্ঠা এতই প্রবল যে snobberyতে যে ভাবের জন্ম, নিষ্ঠার প্রভাবে কবির অজ্ঞাতসারে তাহার প্রকাশ অসামান্যতা লাভ করিয়াছে। এই কবিতা ও আত্মবিলাপের যে আক্ষেপের সুর, এই সনেটগুলিতেও তাহাই ধ্বনিত।

'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' শীর্ষক সনেটে তিনি বলিয়াছেন—

'চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে"—

ইচ্ছা করে, এই সনেটটি আধুনিক সরস্বতীর মন্দিরদ্বারে খোদিত করিয়া দিই। কিন্তু বোধ হয় একটু বাধা আছে, আজকালকার সাহিত্যিকরা সেই ভস্ম গায়ে মাখিয়া সগৌরবে সাহিত্যিক-শহীদ হইয়া উঠিবেন।

আর ভস্ম মাখিলে যে চেলার অভাব আমাদের দেশে হয় না, ইহা তো প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। মাইকেলের জীবনে যে অসংযম ছিল, সাহিত্যে তাহার কোনও চিহ্ন নাই। সেই জন্যই তাঁহার কবি-প্রকৃতি এত বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়াও বাড়িতে পারিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক জীবনে snobbery প্রচুর ছিল, কিন্তু যে-অন্তঃপুরে কবিপ্রকৃতি লালিত হয়, সেখানে এ সকলের প্রবেশ ছিল না। কখনও কখনও যে ইহারা দ্বারে আসিয়া অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করে নাই, তাহা নহে, তবে তাহা লক্ষ্মণ ও বিভীষণের মত ছদ্মবেশে আসিয়াছে। সেখানে তাঁহার কবিপ্রকৃতি আহূতযজ্ঞ মেঘনাদের মত অজেয়, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদিগকে সবলে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছে। কাব্যের এই নিয়মশৃঙ্খলা মাইকেলের প্রতি সনেটে দৃষ্ট হয়। নিয়মের এই অমোঘতা পরবর্ত্তী কবিদের হাতে অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোন রকমে চৌদ্দটা ছত্র জোড়া দিলেই আজকাল সনেট হয়। কিন্তু মাইকেল জীবনে যাহাই করুন, সাহিত্যে জোড়াতাড়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। সে হিসাবেও, মাইকেলের কবি-জীবনের শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার হিসাবে, এই সনেটগুলি বিশেষ মূল্যবান্। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহিত্য জীবন বা তাহার ছায়া নহে, সাহিত্য না-জীবন, অর্থাৎ জীবনে যাহা ঘটে না, সাহিত্যে তাহার ঘটনা। মাইকেলের জীবনে যে নিষ্ঠা ও নিয়মচর্য্যাজাত শান্তি কাম্য ছিল, এই অমোঘ শৃঙ্খলিত পরিণত সনেটগুলিতে তাহাই রূপ পাইয়াছে।

বিচিত্র জগৎ

নর্থ ক্যারোলিনার ধীবরদল

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ এপ্‌লারের বিবরণ হইতে :—

রোয়ানোক দ্বীপের শেওলাও ছাতা-ধরা জেটির ধারে পয়লা এপ্রিলের প্রত্যুষের অন্ধকারে ভীষণ ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। প্রাচীন কালের একটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার দর্শকরূপে যেন আমি এখানে উপস্থিত রয়েছি।

রোয়ানোক দ্বীপ : ৮৫ ফুট লম্বা তিমি মাছের হাড়।
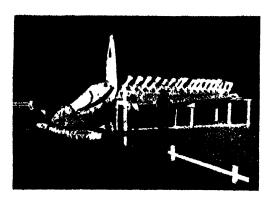
ঝড় ও বৃষ্টি সেই আকাশ ও সেই জলরাশি থেকে আসছে, যা একদিন স্যর ওয়াল্‌টার র‍্যালের ঔপনিবেশিকগণকে অভ্যর্থনা করে সাদরে তীরে আহ্বান করেছিল, যখন তাঁরা এখানে প্রথম ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন করেন, রাণী এলিজাবেথের যুগে।

ঝড়ের মধ্যে ডিভনশায়ার অঞ্চলের উচ্চারণে কে যেন আমাকে জেটির খুঁটিগুলো জোর করে হাত দিয়ে ধরে রাখতে বললে। তার এই উচ্চারণ-রীতি আমায় একবারে ৩৪০ বছর পিছনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে। আমার সঙ্গে কথা বললে মেল বোটের কাপ্তেন এবং যে ভাষায় সে কথা বললে সেটা রাণী এলিজাবেথের যুগের ভাষা।

এখানকার ভাষায় ও আচার-ব্যবহারে প্রথম ঔপনিবেশিকদের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এই তিন শ' বছরেও তার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নি। কেবল সম্প্রতি ভার্জ্জিনিয়া ট্রেল ও রাইট্ সেতু নির্ম্মিত হবার জন্য সভ্য জগতের সঙ্গে রোয়ানোক দ্বীপের যোগ স্থাপিত হয়েছে।

মেল বোট নামে বটে, কাজে সেটা পুরাণ একপাটি জুতোর আকারের ছোট্ট একখানা জাহাজ। তার কেবিনের মধ্যে অস্পষ্ট আলোতে অনেকগুলি যাত্রী বসে ছিল, তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ যক্ষ্মার রোগী, অসুখে ভুগে তার প্রায় শেষ দশা উপস্থিত হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে দূরবর্ত্তী কোন্ এক ডাক্তারের কাছে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। কেবিনের এক কোণে একটা পেরেক দেখতে পেয়ে তাতেই আমার টুপিটা টাঙিয়ে রেখে ডেকে গিয়ে বসলাম। আমার চারিধারে আলুর বস্তা, ঝিনুক-বোঝাই বস্তা এবং আরও নানা মাল-পত্র। এই সব জিনিস-পত্রের মধ্যে নিজের সুটকেস্‌টায় ঠেস্ দিয়ে বসে আমি যে কর্ম্মক্লান্ত জীবনটা পিছনে ফেলে এসেছি, তার কথা প্রায় ভুলেই গেলাম।

একটা ছোট সহরে আমি গত বিশ বছর ডাক্তারি করে আসছি। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে নর্থ ক্যারোলিনার উপকূল থেকে কিছুদূরে হ্যাটেরাস দ্বীপের অধিবাসীদের দ্বারা আহূত হয়ে তাদের সেখানেই যাচ্ছিলাম। প্রায় ২৪০০ ধীবর পরিবার সেখানে বাস করে, তাদের মধ্যে ডাক্তারের বড়ই অভাব। এদের সরল জীবনযাত্রা আমায় অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল, তাই সহরের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে এদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে কৃতসঙ্কল্প হই।

বর্ত্তমান সভ্যতার সংঘর্ষ থেকে বহুদূরে জীবনের অনেক সুন্দর দিক্ দেখতে পাওয়া যায়। রোয়ানোক্ দ্বীপের

অধিবাসীদের সরল চালচলন, আচার-ব্যবহার ও আতিথেয়তা আমাকে মানুষের চরিত্রের সেই সুন্দর দিক-

৩০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে স্যর ওয়াল্টার র‍্যালের প্রেরিত অভিযানকারীরা এই আঙ্গুর-লতাটি রোয়ানোক দ্বীপে আনিয়াছিলেন। লতাটি প্রায় তিন বিঘারও কিছু বেশী জমি আবৃত করিয়া আছে।

গুলি দেখিয়েছিল। প্রাচীন আমলের ইংলণ্ডের ভিভন-শায়ারকে এখানে এনে কে যেন স্থাপন করেছে। এলিজাবেথের যুগের ডিভন এই সুদূর দ্বীপে এখনও বেঁচে আছে।

১৫৮৪ সালে স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে অনুমতি-পত্র পেয়ে আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করবার জন্য জাহাজ রওনা করেন। ঐ সালের জুলাই মাসে ঔপনিবেশিক দলের কর্ত্তা আমাডাস্ ও বার্লো রোয়ানোক্ দ্বীপ আবিষ্কার করে এখানেই প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করবার মত করেন।

রোয়ানোক দ্বীপ তখন তরুলতায়, ফলপুষ্পে সমৃদ্ধ। তারা জায়গাটাকে এত পছন্দ করল যে, দু'জন স্থানীয় ইণ্ডিয়ান অধিবাসী সঙ্গে করে নিয়ে ইংলণ্ডে এই দ্বীপ আবিষ্কারের কাহিনী প্রচার করতে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল দ্বীপে উৎপন্ন নানাবিধ দ্রব্য—তামাক, ভুট্টা, কুমড়ো, আঙ্গুর, স্কোয়াশ এবং অন্যান্য ফলমূল।

এদের গল্পে ইংলণ্ডে খুব একটা সাড়া পড়ে গেল। পর বৎসর র‍্যালে আর একদল লোক পাঠালেন, এখানে স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করতে ও চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করতে,—এ দলে ছিল ১০৮ জন লোক, স্যর রিচার্ড গ্র্যানভিল ছিলেন এদের নেতা।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট এরা রোয়ানোক দ্বীপে অবতরণ করে। প্রথমে এরা একটা কাঠের দুর্গ তৈরী করল এবং তার নাম দিল ফোর্ট র‍্যালে। কিন্তু স্থানীয় ইণ্ডিয়ান অধিবাসীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে বেশীদিন এখানে বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র দলটি স্যর ফ্রান্সিস্ ড্রেকের সঙ্গে আবার জাহাজে ইংলণ্ডে ফিরল। এর দুই সপ্তাহ মাত্র পরে ঔপনিবেশিকদের সাহায্যার্থ যে সৈন্যদল পাঠান হয়েছিল, তারা রোয়ানোক দ্বীপে উপস্থিত হয়ে দেখল কাঠের দুর্গে লোকজন কেউ নেই। পনেরজন মাত্র দুর্গে রেখে বাকী সৈন্য ইংলণ্ডে ফিরে এল।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে র‍্যালে আর একটি দল পাঠালেন। তারা এসে দেখল, দুর্গের বা সেই পনেরজন লোকের চিহ্নমাত্র নেই—কেবল একজন লোকের হাড়গোড় পাওয়া গেল। স্থানীয় অসভ্য জাতিরা নিশ্চয়ই বাকী সকলকে মেরে ফেলেছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে দলের কর্ত্তা জন হোয়াইট ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করবার চেষ্টা করলেন। তাদের একজন নেতাকে এরা লর্ড অব রোয়ানোক উপাধি দিলে, এবং সে খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করল।

ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারের খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করার পাঁচদিন পরে জন হোয়াইটের এক পৌত্রী জন্মগ্রহণ করে, এর নাম ভার্জ্জিনিয়া ডেয়ার—এই মেয়েটি প্রথম ব্রিটিশ শিশু, যে

রোয়ানোক দ্বীপের গরুর গাড়ী। মোটরগাড়ীর আমদানী হওয়ায় এই ধরণের যান-বাহন ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

আমেরিকার মাটীতে ভূমিষ্ঠ হল। এই মেয়েটিই নূতন উপনিবেশের সর্ব্বপ্রথম নাগরিক (২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু এই পরিবারের পরবর্ত্তী ইতিহাস বড় করুণ।

ভার্জ্জিনিয়া ডেয়ারের পিতামাতা এবং আরও প্রায় একশজন নরনারীকে রোয়ানোক দ্বীপে রেখে জন হোয়াইট ইংলণ্ডে ফিরে গিয়েছিল, তিন বৎসর পরে ফিরে এসে দেখল দ্বীপে তাদের একজনও নেই। কেবল একটা গাছে 'C R O' অক্ষর ক'টি খোদাই করা আছে। সকলে ভাবলে হঠাৎ শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে ওরা বোধ হয় সেই

রোয়ানোক : প্রবল ঝড়ে ওক গাছ দুমড়াইয়া গিয়াছে। শাখা-প্রশাখা একদিন জলদস্যুকে আশ্রয় দিত।

খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ইণ্ডিয়ান সর্দ্দারের বাড়ী আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

এটা বোঝা গেল, তারা তাড়াতাড়ি কোথাও চলে গিয়েছে—বাড়ীর চারিধারে অগ্নিদগ্ধ সিন্দুক, আসবাবপত্র, বহু মরচেপড়া লোহার যন্ত্রপাতির চিহ্ন পাওয়া গেল। স্যর ওয়াল্টার র‍্যালে এদের সন্ধানার্থ অভিযানের পর অভিযান পাঠালেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হতভাগ্যদের কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

এই সব ঔপনিবেশিক আমেরিকার এই নিভৃত স্থানে প্রথম ইউরোপীয় সভ্যতার আমদানী করে। এলিজাবেথের যুগের ইংলণ্ডের ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, এরাই প্রথম এখানে নিয়ে আসে।

জাহাজের দোলানির মধ্যে ডেকে বসে এই সব পুরাতন কথা ভাবছি, এমন সময় কেবিনের মধ্যে গোলমালের শব্দে আমার মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হল। বৃদ্ধ যক্ষ্মারোগীটি অতিরিক্ত রক্তবমনের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

আমদের জাহাজ হ্যাটেরাস্ দ্বীপের খাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটা ছোট বোটে আমরা নেমে গেলাম। বৃদ্ধের মৃতদেহ নিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনেরা আর একখানা বোটে করে তীরের দিকে চলল।

দ্বীপে নেমে আমি যেখানে আশ্রয় নিলাম, একজন বৃদ্ধা ধাত্রী ও নার্স সে বাড়ীর মালিক। সমুদ্রের খাড়ির ধারে বাড়ীটিতে সে একাই বাস করে। আমায় সে বললে—আমি তোমার নাইবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তোমার জন্যে রুটী তৈরী হয়েছে, নারকেল দিয়ে তোমার জন্যে কেকও তৈরী করেছি।

বৃদ্ধার নাম 'মিস্ বার্নি'—সে অনেকদিন হল বিধবা হয়েছে, তার স্বামী উপকূল-রক্ষকের চাকুরী করত।

বৃদ্ধার ঘরের ফায়ার-প্লেস্‌টা অনেক দিনের প্রাচীন। বহু পুরাণ আমলের ইটের কাজ হিসেবে ফায়ার-প্লেস্‌টা অমূল্য। রোয়ানোক্ দ্বীপে আর একটি ছাড়া এত পুরাণ ফায়ার-প্লেস্ আর নেই শুনলাম। আর একটা যে আছে, সেটা আবার মিস্ বার্নির চেয়েও পুরাণ। তার চিমনিটা হার্ড-উডের তৈরী, অদাহ্য করবার জন্য লবণজলে সেটাকে মাঝে মাঝে ধোয়া হয়।

খাওয়া শেষ করে আমি একটা কাঠের দোলনায় শুয়ে বিশ্রাম করলাম। এই দোলনায় বৃদ্ধার দু'টি শিশু সন্তান দোল খেয়ে মানুষ হয়েছিল।
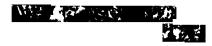
রোয়ানোক : মিস্ বাশি সাবান প্রস্তুত করিতেছেন।

বৃদ্ধা ধাত্রীর গল্প আমায় বড় আকৃষ্ট করল। তার গল্প শুনে মনে হল চিকিৎসা-বিদ্যার ইতিহাসে বৃদ্ধার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা উচিত ছিল। বৃদ্ধা খুব ক্ষিপ্র-গতিতে চলাফেরা করতে পারে এবং তার মুখশ্রী দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক।

ছেলেবেলায় সে মাত্র পাঁচ সপ্তাহ স্কুলে গিয়েছিল। পড়তে সে শেখেনি, ঘরের কাজকর্ম্ম, বাইরের কিছু কিছু কাজ এবং চরকায় সূতা কাটা শিখেছিল। ষোল বছরে তার বিবাহ হয়, একুশ বছর বয়সে জনৈক উপকূল-রক্ষীর কুটীরে সে প্রথম প্রসূতি খালাস করবার জন্য আহূত হয়।

বৃদ্ধা বললে—ডাক্তার,আমি তখন কাজ কিছুই জানতাম না। মেহালি আমায় একখানা ডাক্তারী বই পড়ে শুনিয়েছিল, কারণ আমি নিজে পড়তে পারি না। শিশু ভূমিষ্ঠ হবে শুক্লপক্ষে, তাই দেখে আমি ঠিক করলাম এ শিশু নিশ্চয়ই মিতব্যয়ী হবে।

সমুদ্রের ধারে পাইন বনের মধ্যে বৃদ্ধা তার বাড়ীতে যখন ছিল, সেখানে তার রুগ্ন মাতা ওরই আশ্রয়ে থাকতেন, নিজের ছেলেমেয়েদের তো দেখতে হতই, তার ভাইয়ের ছেলেপুলেদেরও দেখাশুনা করতে হত। তা ছাড়া ছিল গরু, শূকর এবং বাসন মাজার কাজ। সংসারের এই সব দায়িত্বপূর্ণ কঠিন কর্ত্তব্য থাকা সত্ত্বেও সে গত ৪৫ বছর ধরে এই অঞ্চলের সর্ব্বপ্রকার রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করে আসছে—ডাক্তার এ সব জায়গায় কচিৎ কখনও আসে। তার নেপোলিয়ন নামে ঘোড়াটা দু' চাকার গাড়ীখানা করে তাকে টেনে নিয়ে যেত রোগীদের বাড়ী, বন-জঙ্গল ও বালির চড়া কিছু না মেনে, শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে। সে ঘোড়া চড়তে পারত খুব ভাল এবং লম্বা লম্বা পা ফেলে বেশ হাঁটতেও পারত। পায়ে হেঁটে বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কতবার সে রোগী দেখেছে।

বৃদ্ধা তার নিজের মতে কতকগুলি ওষুধ তৈরী করে-ছিল, অসুখ-বিসুখে ওষুধগুলো বেশ কাজ দিত।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি করে দিব্যি রুগী সারাও ?

কেপ হ্যাটেরাস : বাতিঘর। এই বাতিঘর হইতে ৮০,০০০ ক্যাণ্ডল্ শক্তি-বিশিষ্ট আলোক-রশ্মি ২০ মাইল দূরবর্ত্তী জাহাজকে সতর্ক করিয়া দেয়।
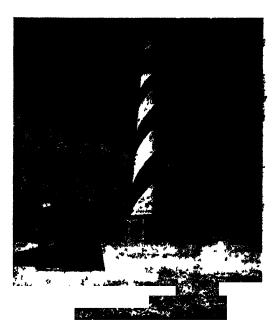
বৃদ্ধা বললে—দেখুন ডাক্তার, কাজ করবার ইচ্ছা থাকলেই শেখা যায়। শেখার ইচ্ছার অভাব আমার কোনদিনই

হয় নি। ভাল ডাক্তারের উপদেশ মাঝে মাঝে মন দিয়ে শুনতাম, এর সঙ্গে নিজের বুদ্ধিতে যা কুলোয় তা যোগ করি।

বৃদ্ধা মাতা ও শিশুর সেবার জন্য ফি নেয় আড়াই ডলার—আজকাল বাড়িয়ে তিন ডলার করেছে।

বৃদ্ধা বললে—আমার চতুর্থ সন্তানটি আপনা আপনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল—যখন সে হয়, তখন কাছে কেউ ছিল না।
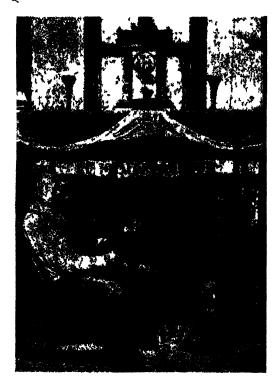
বহুকালের পুরাতন 'ফায়ার-প্লেস'—রোয়ানোক দ্বীপে এরূপ প্রাচীন 'ফায়ার প্লেস' অল্পই আছে।

বৃদ্ধার ভাষা ও উচ্চারণ-রীতি এলিজাবেথের যুগের উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের মত। এই ভাষা এ দ্বীপে বহুকাল ধরে চলে আসছে। স্যর ওয়াল্টার র্যালে প্রেরিত লোকজন কর্তৃক এ ভাষা এই দ্বীপে আনীত হয়েছিল।

এই সব পুরানো আমলের ভাষা ও তার উচ্চারণ-রীতির নিজস্ব একটা সৌন্দর্য্য আছে। যেমন heerd, disremember, disencourage প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং 'g'এর উচ্চারণ-বর্জ্জিত aimin, goin, singin প্রভৃতির অষ্টাদশ শতকের শব্দপ্রয়োগ, যে সময়ে 'g'এর উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ ঔদাসীন্য পরিলক্ষিত হ'ত। এইসব শব্দ এখনও ভিতরের পল্লীগ্রামে ব্যবহৃত হয়।

মিস বার্শির গল্প শেষ হবার পূর্ব্বেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ উঠল।

বৃদ্ধা বললেন—খিলটা খুলে ভেতরে এস।

একজন সবল সুস্থকায় ধীবর প্রবেশ করে বললে—বনের উত্তর দিকে যে বাছুরটা চরছে সেটা তোমার নয় মিস বার্শি, মিস উইলি অ্যানের চিহ্ন তার গায়ে দেগে দেওয়া রয়েছে। আর একটা কথা, মিঃ জিয়ন আর মিস হোপির শরীর খারাপ। তাঁরা এই মেয়ে ডাক্তারটিকে ডেকেছেন।

বৃদ্ধা উত্তর দিলে—আমার কোন দোষ ধ'রো না, কিন্তু ডাক্তার এখন বড়ই ক্লান্ত। কাল সকালে ভিন্ন ডাক্তার যেতে পারবেন না।

তারপর বৃদ্ধা আমার দিকে ফিরে একটা পুরানো দিনের পাঁচন তৈরী করবার ছড়া বলে গেলেন। খুব ভাল ওষুধ না কি সেটা। সেবার মিস হোপির অসুখের সময় এই পাঁচনটা দিয়ে চমৎকার ফল দেখা গিয়েছিল। কাটি কিংসির ছেলে যখন নর্থ ক্যারোলিনা থেকে বাড়ীতে অসুখ হয়ে আসে, তখন এতে তাকে একেবারে সারিয়ে তোলে।

বাতিঘরের গোরস্থান থেকে আনতে হবে শাদা শেওলা
সবুজ ও কচি পলিবডি আঙুরের পাতা তার সঙ্গে
অমাবস্যার দিন তুলতে হবে
সব মিশিয়ে দুধের সঙ্গে সিদ্ধ করে
এক পিণ্ট থাকতে নামাও—

এ পাঁচনটা হল রক্তাল্পতার মহৌষধ। গায়ের চামড়ার হলদে ভাব ও চোখের হলদে রং না কি সঙ্গে সঙ্গে সেরে যাবে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই বাইরে গলার আওয়াজ পেলাম।

—আরস্কিন, ডাক্তার এখনও যাবার জন্যে মোটেই তৈরী নন। তবে তুমি যখন এসেছ তখন আমি গিয়ে বলছি।

মিস বার্শি আমায় এসে জানালেন—ডাক্তার, মিস পুলভ্যানির দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আপনাকে যেতে হবে বোধ হয়।

আমিও বুঝলাম না গিয়ে উপায় নেই।

রোয়ানোক দ্বীপের রাস্তায় এখনও গরুর গাড়ী চলে। তবে আমার জন্যে যা এসেছিল তা গরুর গাড়ী না হলেও একে ঘোড়ায় টানা গরুর গাড়ী বলা যায়। সেই বড় বড় চাকা, সেই ধরণের বসবার জায়গা। অতি কষ্টে গাড়ীতে চেপে বসা গেল।

রাস্তা নেই। সমুদ্রের উপকূলের বালির উপর দিয়ে সাত ঘণ্টা গাড়ীতে যেতে হবে। একদিকে তার সদাসর্ব্বদা সমুদ্রের ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়ছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে মনিং বার্ডের শব্দ মিশছে, ঝড়ে বাঁকা বড় বড় গাছ পথের দু'ধারে। ওক, পাইন ও হোলি গাছের গুঁড়ির অর্দ্ধেকটা বালির স্তূপে চাপা পড়ছে, সমুদ্রের জোয়ার নেমে গিয়েছে চড়া থেকে।

মনের মধ্যে একটা গভীর শান্তি। কাছেই একটা বালির স্তূপে দীর্ঘগ্রীব এক বক জাতীয় পাখী বসে আছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের অবিচ্ছিন্ন গম্ভীর ধ্বনির মধ্যে উপকূলের অদূরে জেলে-ডিঙ্গির আশে পাশে জলের উপর সিন্ধু-শকুনের দল উড়ছে। ক্রমে লাল টকটকে সূর্য্য উঠে কুয়াসার আবরণ অপসারিত করে দিল। চারিদিক পরিষ্কার হয়ে উঠল।

আমার গাড়ী-চালকটি বধির, সে বেশ একমনে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে, সে নিজেই একটা মানব-দ্বীপ—বাহিরের জগতের সঙ্গে কোন সংস্রবে না এসেও সে বেশ কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

উপকূলের দূর প্রান্তে পুরানো আমলের হ্যাটেরাস্ অন্তরীপের বাতিঘর ঘুরানো সিঁড়ির আকারে কাল ও শাদা রং করা। ১৮৬০-৭০ সালে যখন বাতিঘরটা প্রথম তৈরী হয়, তখন সমুদ্র থেকে ওর দূরত্ব ছিল প্রায় এক মাইল—এখন এসে একেবারে সমুদ্রের প্রান্তে দাঁড়িয়েছে। প্রতি ছ' সেকেণ্ড অন্তর ওর ৮০,০০০ হাজার ক্যাণ্ডলপাওয়ারের আলো দূর সমুদ্রে ২০ মাইল দীর্ঘ একটা আলোক-রশ্মি পাঠিয়ে দিচ্ছে (১৯৯ পৃষ্ঠা)।

খুব ঝড়ের সময় আলোর রশ্মিটা ৯ ইঞ্চি পরিমাণ স্থান নিয়ে দোলে। অর্থাৎ একবার উত্তরে এবং একবার দক্ষিণে বেঁকে যায়—ঐ ৯ ইঞ্চির মধ্যেই। আটলাণ্টিক মহাসাগরের এই উপকূলে ঝড়ে দুর্ঘটনার পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, ১২৫ গজের মধ্যে এখানে ১৫টি ভগ্ন জাহাজের কঙ্কাল বালি রাশিতে অর্দ্ধপ্রোথিত হয়ে রয়েছে। এই ভগ্ন পোতের সমাধিস্থানে ফরাসী, পর্টুগীজ, স্পেনিশ, ব্রিটিশ ও গ্রীক—সব জাতির জাহাজ আছে।

হ্যাটেরাস্ দ্বীপের বাতি-ঘরের উপকারিতা এ থেকে বোঝা যাবে।

রোয়ানোক দ্বীপে ভার্জিনিয়া ডেয়ারের জন্মস্থান। আমেরিকার শ্বেত ঔপনিবেশিকদের প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তান।

নরওয়ে দেশের একটা জাহাজের কঙ্কাল দেখিয়ে আমার গাড়োয়ান বললে—এই জাহাজখানা উদ্ধার করতে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। ভয়ানক ঝড় বইছিল, আমরা দুবার চেষ্টা করে কিছুই করতে পারলাম না—শেষে সাত জন সেই সমুদ্রে দাঁড় বেয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে ছাব্বিশ জনকে উদ্ধার করে আনি। আমাদের দলের চারজন এবং ওদের পাঁচজন আহত হল। সেই ধাক্কায় আমার হাত গেল ভেঙে।

গাড়োয়ান দেখলাম বর্ত্তমান দিনের উপকূল-রক্ষীদের ওপর খুব চটা। তখনকার দিনের লোকেরা দাঁড় বেয়ে সমুদ্রে যেতে ভয় পেত না, খাটতও খুব, ফাঁকিবাজ ছিল না। এখন এরা শুধু বসে থাকে আর মোটরে হাওয়া খেয়ে বেড়ায়।

সমুদ্রের বালির মধ্যে এক জায়গায় ৮০ ফুট লম্বা একটা তিমি মাছের কঙ্কাল পড়ে আছে (১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেটা
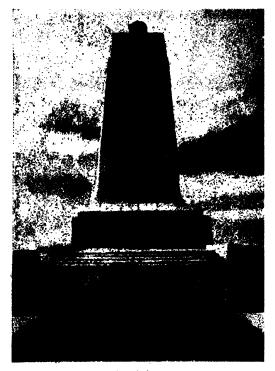
রাইট্ মেমোরিয়াল। কিলডেভিল্ পাহাড়ের উপরে নর্থ-ক্যারোলিনার শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত ১৫১ ফুট উচ্চ এই স্মৃতি-চিহ্নটি বায়ু অপেক্ষা ভারী যন্ত্রদ্বারা আকাশে উড়িবার স্মৃতি অমর করিবার উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ভিতরে রাইট্ ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তি ও প্রথম পঁচিশ বৎসরের প্রসিদ্ধ বিমানপোত-ভ্রমণের ম্যাপ আছে। মেমোরিয়ালের উপরে বিমানপোত-সমূহের জন্য আলোক-ব্যবস্থা আছে।

দেখিয়ে গাড়োয়ান বললে—এই রকম কঙ্কাল আর একটু আগে আর একটা আছে। সেটার হাড় বাড়ী নিয়ে গিয়ে আমি চেয়ার বানিয়েছি।

—বাইবেলে যেমন থাকতে বলেছে, তেমন ভাবে চলে আসছি জীবনে। মেয়েদের কখন প্রশ্রয় দিই না বা তাদের দিকে কখনও ঘেঁসি না। তাদের আমি বলি, সকল মানুষের সেবা কর, যেমন বাইবেলে সেণ্ট পল করতে বলেছেন। ভগবান আমায় তেরটি সন্তান দিয়েছেন।

ওর বাড়ীর কাছে সমাধিস্থানে কতকগুল কবরের ওপর পড়লাম :—

মোজেলা মিজেট্—২৮।
মেহালি মিজেট্—২৯।
আলসে মিজেট্—৩০।

সব আমাদের গাড়োয়ান আরস্কিন্ মিজেটের মৃত সন্তানের সমাধি। অনেকগুলি শিশু-সন্তানের সমাধিও আছে। অধিকাংশই থাইসিসে মারা গিয়েছে।

যেতে যেতে দেখি অনেকগুলি লোক জড় হয়ে দূর থেকে হাত-পা নেড়ে চীৎকার করে কি বলতে চেষ্টা করছে। তাদের কাছে যেতেই বললে—মিস্ ভিয়েনারের অবস্থা খুব খারাপ, সেখানে একবার যেতে হবে।

রোগীর বাড়ী গিয়ে রোগীর অবস্থা দেখে বুঝলাম একে হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে। উপকূল-রক্ষীদলের ষ্টেশন থেকে টেলিফোনে এমারজেন্সি এরোপ্লেন সার্ভিসের এরোপ্লেন আনিয়ে তাতেই রোগীকে ন'ফোক্ হাঁসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলাম।

আমার সঙ্গী গাড়োয়ান বললে—ডাক্তার ঐ যে ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, ও হল মিস ভিয়েনারের বোন্‌পো। যে রাত্রে ও-জন্মায়, ওর মা একটা ভূত দেখেছিল—এবং বেশীদিন বাঁচেনি। মিস ভিয়েনারও কাল রাত্রে একটা ভূত দেখেছে।

আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম। গাড়োয়ানের এ কথায় কোন উত্তর দিলাম না।

আমার দ্বিতীয় রোগিণী অল্পের মধ্যে সেরে উঠল।

একদিন দুপুর রাত্রে আমি সবে আলো নিবিয়ে শুয়েছি, চারজন লোক মিঃ নেভাডাকে নিয়ে এল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে সমুদ্রে মাছ ধরবার সময়ে ষ্টিংরে নামে দুর্দ্দান্ত হিংস্র মাছে তার পায়ে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে।

ষ্টিংরে মাছের কাঁটা লেজের আগায় থাকে—পাথরের

মত শক্ত ছুঁচাল সরু জিনিষ। ইঞ্চি দুই পায়ের মাংসের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, ইঞ্চি তিনেক বার হয়ে আছে।

ওদের মধ্যে একজন বললে—মাছটা নেভাডাকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, সেই জন্য আমরা তোমার কাছে ওকে আনলাম। ষ্টিংরে মাছ মিঃ ড্যানিয়েল্সকে মেরে ফেলেছিল এবং ক্রিষ্টোফারের পা কেটে ফেলতে হয় ওই মাছের কাঁটার দরুণ।

মিঃ নেভাডা আমায় বললেন—আমি তো মরবার জন্য তৈরী হয়ে আছি ডাক্তার। যখন বয়েস আমার ত্রিশ পেরিয়ে গিয়েছে, তখনই আমার যা কিছু পাপপুণ্য সব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছি।

একটা মস্ত সুবিধা দেখলাম, গ্রাম্যলোকেরা তাদের যা তা টোট্‌কা ঔষুধ নিয়ে ক্ষতস্থান ঘাঁটাঘাঁটি করে নি। আমি তাদের এ কথা বললাম। ক্ষতস্থানে মাছের যে লেজের কাঁটা ঢুকেছে তাও পরিষ্কার, সমুদ্রের জল যা ঢুকেছে তাও পরিষ্কার, এমন অবস্থায় পা কাটতে হবে কেন? মিস বাশির রান্নাঘরের টেবিলে মিঃ নেভাডাকে শুইয়ে ফেলে আরও দুজন লোক ও বৃদ্ধা ধাত্রীর সাহায্যে সেই সাংঘাতিক কাঁটাটি উঠিয়ে দিলাম। ক্রমে রোগী সুস্থ হয়ে উঠল।

এই রোগীকে সুস্থ করার পুরস্কার স্বরূপ আমি একটা বাড়ী অল্পদামে কিনতে পেলাম। এ দ্বীপের নিয়ম, এখানে কেউ ভদ্রাসন বাড়ী ভাড়া দেয় না বা বাইরের লোককে বেচে না। সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট বাড়ী দেখে কতবার কিনবার চেষ্টা করেছি, কোন ফল হয় নি। আজ মিঃ নেভাডা নিজে থেকেই বললেন—ডাক্তার, মিস্‌সির যে বাড়ীটা তুমি কিনতে যাচ্ছিলে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যাতে তোমার কাছে ওরা বেচে।

সমুদ্রের একটা ছোট খালের ধারে বাড়ীটা। পুরাতন আমলের তৈরী। জাহাজ-ডুবির দরুণ কাঠ সংগ্রহ করে সেই কাঠ দিয়ে গড়া। একদিকে খাল, অন্যদিকে বালির তীরে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জ্জনধ্বনি। সরু রাস্তার দুপাশে বড় বড় ওক, হোলি ও মার্টল গাছের সারি। ইউনিমাস্ বলে আর একটা গাছ ঠিক কমলালেবুর গাছের মত দেখতে। নিকটতম প্রতিবেশীও এক প্রকার দূরেই বাস করে।

বাড়ীটা কিনে নিলাম, পরের বাড়ীতে বেশীদিন থাকা চলে না। মিস্ত্রী আনিয়ে কিছু অংশ নতুন করে তৈরী করে নিতেও হয়েছে।

স্থানীয় জেলেরা বলে—আমাদের এখানে সমুদ্রের ধারে এমন সাজান বাড়ী আর নেই।
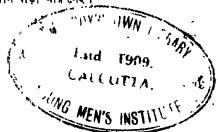
ধন-বিতরণ ও যন্ত্রশিল্প

…যে দিন হইতে যথাযথভাবে বিদ্যা-বুদ্ধি ও পরিশ্রমশীল না হইয়াও আংশিকভাবে ধনবান্ হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতে মনুষ্য-সমাজে ধনের অসমান বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন হইতে ধনের অসমান বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে সোস্যালিজ্‌ম্, কম্যুনিজ্‌ম্ প্রভৃতি 'ইজ্‌ম্'াখ্য অসন্তোষ-চিহ্নের উদ্ভব হইয়াছে।

যে দিন হইতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি কমিয়া আসিয়াছে, সেই দিন হইতে কৃষিকে লাভবান্ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যে দিন হইতে কৃষিকে লাভবান্ করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে খাদ্য-শস্যের অপ্রাচুর্য্য ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মানুষের পক্ষে কুটীরশিল্পে যথোপযুক্তভাবে মনোযোগী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যেই দিন হইতে যে দেশে কুটীর-শিল্পে যথোপযুক্তভাবে মনোযোগী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে সেই দেশে যন্ত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটিয়াছে।…

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

তালের পিঠে

ভাদ্রমাস শেষ হয়।

অনেক দিন ভুগিয়া সুরুচি রোগমুক্ত হইয়াছেন। এবার তালের পিঠে খাওয়া হয় নাই—ছেলেরা রোজ তাগাদা দেয়। সেদিন বাজার থেকে কমল তাল কিনিয়া আনিল।

দিনটা ছিল রবিবার। গোটা দুইয়ের সময় বিশ্বকর্ম্মাকে ধড়াচুড়া পরিতে দেখিয়া সুরুচি বলিলেন, "কোথায় যাও?"

"একটা টি-পার্টি আছে।"

"এই ঠিক দুপুরে কি টি-পার্টি?"

"সাহেবের কাছে কাজ আছে। সেখান থেকে দ্বিজেনের ওখানে যাব—অনেক দিন যাওয়া হয় না। তাকে নিয়ে পার্টিতে আসব।"

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গরম পড়িয়াছে অত্যন্ত। দুপুর বেলা বাদ দিয়া বৈকালিক কাজকর্ম্ম সারিয়া বারান্দার এক কোণে তোলা-উনানে সুরুচি পিঠে ভাজিতে বসিলেন। ছেলেরা ঘিরিয়া বসিল।

জলন্ত আঁচে বার বার কড়া নামাইতে উঠাইতে হয়—না হইলে পিঠে পুড়িয়া যায়। সুরুচির শ্রান্ত দুর্ব্বল হাত। কমল সাঁড়াশী ধরিল।

কয়েক খোলা ভাজা হইলে ছেলেদের দিয়া সুরুচি বলিলেন, "আমি একটু জিরিয়ে নি।"

ছেলেরা বলিল, "কিছুই হ'লো না—"

সুরুচি বলিলেন, "সব ভাজা হোক—একবারে বেশী করে খাবি।"

সুরুচি আবার ভাজিতে আরম্ভ করিলেন।

এমন সময় বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব।

প্রশ্ন, "ও কি হচ্ছে?"

"তালের পিঠে করছি।"

"এখন?"—সুরুচির পিছনে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কোন কাজের ধরণ যদি তোমার থাকে! সন্ধ্যা বেলা অগ্নিকুণ্ড জেলে বসেছ কেন?"

সুরুচি বলিলেন, "দিনে বড্ড গরম, পেরে উঠিনি।"

"কি দরকার ছিল এ সবের?" বিশ্বকর্ম্মা ঘরে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া টাই খুলিলেন, কোট-শার্ট খুলিলেন। বলিলেন, "এই জন্যে ঘর এত গরম হয়েছে, তিষ্ঠোনো যাচ্ছে না। এই দারুণ গরমে বারান্দায় আগুন জ্বালালে কখনও থাকতে পারা যায়?"

সুশান্ত চুপি চুপি বলিল, "এক কোণে উনান রয়েছে, এ আঁচ ঘরে লাগবে কেন?"

ক্ষণকাল পাদচারণা করিয়া বিশ্বকর্ম্মা আবার বারান্দায় উঁকি দিলেন, বলিলেন, "এখন বন্ধ করে ফেল।"

সুরুচি প্রমাদ গণিলেন। এখনও যে সবই বাকী। বলিলেন, "বেশী দেরি হবে না—তুমি বাইরের বারান্দায় বস গে না।"

বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কেন সন্ধ্যাবেলায় এ অকর্ম্ম করতে বসেছ? তোমাদের যন্ত্রণায় পাগল হয়ে বনে যেতে হবে আমাকে।"

বলিয়া ঘরে গিয়া চেয়ারে বসিলেন। নিশি জুতা-মোজা খুলিয়া লইল।

সুরুচি অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "পিঠে ভাজলে যে লোকে পাগল হয়ে বনে যায়—তা জানতাম না।"

প্যান্টালুন ছাড়িয়া লুঙ্গি পরিয়া বিশ্বকর্ম্মা আবার বারান্দায় দেখা দিলেন। অহি তাঁহাকে দেখিয়াই উঠিয়া গেল।

মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "এখনও বন্ধ কর নি? ভাল চাও তো আগুন নেভাও, নইলে আমি লাথি মেরে সব ফেলে দেব। নিশ্চয় দেব। শীগ্‌গির বন্ধ কর। বাড়ীতে লোক শান্তির জন্য আসে—আমার জন্যে যত অশান্তি জমা হয়ে থাকে।"

সুশান্ত পলায়ন করিল। সুরুচি ধপ্‌ করিয়া কড়াটা নামাইয়া ফেলিলেন।

"এমন অদৃষ্ট যে যখনই বাড়ীতে আসব একটা না একটা যন্ত্রণা হবেই। পোড়া কপাল, কোন দিন সুখ হ'ল না আর—"

রাগিতে রাগিতে বকিতে বকিতে বিশ্বকর্ম্মা বাথ-রুমে প্রবেশ করিলেন।

এই অবসরে সুরুচি গামলাভরা খামিরটা দিয়া খুব বড় বড় করিয়া কতকগুলি পিঠা ভাজিয়া ফেলিলেন। কমল বলিল, "থাক্ খুড়ীমা উনি দেখলে আবার অনর্থ করবেন।"

"করলে আর কি করব"—সুরুচি উনান ঝাড়িয়া আগুন নিভাইয়া দিলেন।

ধৌত গেঞ্জি ও ধুতি পরিয়া সীঁথি করিয়া পাউডার ও স্নো মাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা ডাকিলেন, "ঠাকুর খেতে দাও—"

বিশ্বকর্ম্মা আহারে বসিলেন। অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে, সুরুচি একটা বড় প্লেটে পিঠে ও ক্ষীর পাতের কাছে রাখিয়া গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা বক্রকটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন।

খাওয়া দেখিবার জন্য সুরুচি বারান্দায় জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বকর্ম্মা খাওয়া শেষ করিয়া থালাটা ঠেলিয়া সরাইয়া ডিশটা টানিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে প্লেটটা খালি করিলেন—দু' একবার দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তারপর জল পান করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

সকলের খাওয়া হইল। সুরুচি পানের ডিবে লইয়া বাহিরের বারান্দার সিঁড়িতে গিয়া বসিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা বিছানায় বসিয়া সিগারেট ধ্বংস করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উঠিয়া ভিতরের দিকে কোন সাড়া না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—সুরুচি একা অন্ধকারে বসিয়া আছেন।

কাছে আসিয়া বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত নম্র স্বরে বলিলেন, "ঘরে এস, ঠাণ্ডা লাগবে, এখনকার শিশির ভাল নয়—"

সুরুচি কথা বলিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন, "জ্বর থেকে—"

কথা শেষ হইল না। সুরুচি এক ঝটকায় বিশ্বকর্ম্মার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া একটু সরিয়া বসিলেন।

"—বাবা! কি রাগ—সাক্ষাৎ নাগিনী!"—বিশ্বকর্ম্মা হাতের সিগারেটটুকু ফেলিয়া দিয়া সুরুচির হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।

সুরুচি সরোষে বলিলেন, "তোমার যন্ত্রণায় কোথাও স্থির হবার যো নেই। একে তো যা ইচ্ছে বলবে—তাও যে একটু নিরালা থাকব—সেও দেবে না! কি তোমার মনের ইচ্ছে স্পষ্ট করে বল না? সবাইকে তাড়িয়ে দিয়ে একা রাজ্যি করবে? বেশ—তাই কর। ছেলেদের নিয়ে কালই আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি।"

"তুমি এই কথা বললে? হ্যাঁ গিন্নী, তুমি এই কথা বললে? আমি তাই মনে করি? এত বড় কথা তুমি বললে? '—ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী যথারণ্য তথা গৃহম্'—এমন বাক্য-যন্ত্রণা শোনবার চেয়ে মরণ ভাল। আমার বনগমনই শ্রেয়।"

"—আহা আর বলতে হবে না। তোমার মত মানুষ দুনিয়ায় আর নেই। কি কাণ্ডটা করলে বল দেখি?"

"—কাণ্ড তো তোমার। দুপুর বেলা গেছি, গরমে সিদ্ধ হয়ে সারাদিন পরে বাড়ী এলাম—তুমি কাছে বসবে—কি দুটো কথা বলবে—তা নয় অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে বসেছ! দেখেই রাগ ধরে গেল।"

"রাগ তোমার ধরেই থাকে—এ আর বেশী কি? ভাগ্যি ভাগ্যি যে তোমার মত মানুষ একটি সৃষ্টি করেই ভগবান্ ভুল বুঝতে পেরেছিলেন,—আর গড়েন নি।"

সদর-গমন

বিশ্বকর্ম্মা সদর কোর্টে যাইবেন।

জরুরি কেস্। রাত্রি থাকিতে উঠিলেন। সুরুচিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো ওঠ। আমায় আজ ভোরে যেতে হবে।"

সুরুচি বলিলেন, "ছটার গাড়ীতে?"

"না—তার পরেরটায়।"

আটটায় একটা ট্রেণ আছে। সুরুচি উঠিয়া কাজে লাগিলেন।

আটটার গাড়ীতে যেদিন যান, ছটার সময় সেদিন খাইতে বসেন। সাতটা বাজিল—তথাপি বিশ্বকর্ম্মাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া সুরুচি বলিলেন, "তুমি যাবে না?"

"যাব না কে বললে?"

"সাতটা বাজে যে?"

"যাব গোটা আটেকের সময়। একটু কাজ আছে—সেরে নি।"

"আটটায় বেরিয়ে আটটার গাড়ী ধরতে পারবে?"

"আটটায় গাড়ী নয়—ন'টায়।"

"ন'টায় তো কোন গাড়ী নেই ?"

"আছে গো আছে। মাঝে মাঝে যাই যে ? ভুলে গেলে ?"

সুরুচি বলিলেন, "দশটা দু' মিনিটের গাড়ী ? তাই বল ? তবে ভোর রাত্রে ডেকে তুলেছিলে কেন ? তোমার সব অনাসৃষ্টি ! ভাত জুড়িয়ে গেছে, আবার রাঁধতে বলি। এখনও তো ঢের সময় আছে।"

বিশ্বকর্ম্মা কমলকে বলিলেন, "আমার ঘড়ীটা ঠিক আছে তো ?"

কমল বলিল,"আমি ষ্টেশন থেকে মিলিয়ে নিয়ে আসছি।"

আটটায় বিশ্বকর্ম্মা স্নানে গেলেন। সুরুচি চমকিয়া বলিলেন, "এখনি স্নান করবে ?"

"বেরুতে হবে আগেই, ট্রেন ফেল করলে সর্ব্বনাশ।"

ঠাকুর সবে দ্বিতীয়বার ভাত চাপাইয়াছে। উনানে বাতাস দেওয়া হইতেছে। স্নান করিয়া বিশ্বকর্ম্মা এক সেকেণ্ড দেরী করিতে পারেন না। খান অতি অল্প, কিন্তু চাহিবামাত্র চাই। নচেৎ মেজাজ আগুন হইয়া যায়। এটি চিরকালের স্বভাব। কোন দিন কোন কারণেই ইহার ব্যতিক্রম হয় না। তবে স্নানের পর কেশবিন্যাস করিবার সময়টুকুতে একটা ব্যঞ্জন নামিয়া যায়। কিন্তু আজ চট করিয়া সব শেষ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর !"

বিশ্বকর্ম্মা আহারে বসিলেন। সুরুচি উত্তপ্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আলাদা পাত্রে করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া প্লেটে দিতে লাগিলেন।

কিন্তু আহার নাম মাত্র। প্রতি গ্রাস মুখে তুলিবার সময় বলিতেছেন, "ওরে ঘড়ীটা দেখ,—দেখ।"

"এখনও ঢের সময় আছে।"

"না না, তুমি ঘড়ী দেখ, ট্রেন ফেল করব যে ?"

ঘরের ভিতর হইতে কমল বলিল, "সাড়ে আটটা।"

"সাড়ে আটটা ? নিশ্চয় বেশী। ঘড়ী বন্ধ ছিল বোধ হয় ?"

"ষ্টেশন থেকে মিলিয়ে আনলাম।"

"গিয়েছিলি ষ্টেশনে ? কখন গেলি ? যাসনি।"

"গিয়েছিলাম, মিলিয়ে এনেছি।"

"স্লো নয় ?"

"না।"

"সাড়ে আটটা ? ঠিক তো ? ভুল হয় নি ? আন দেখি।"

"এই দেখুন"—কমল সামনে ঘড়ী ধরিল।

বিশ্বকর্ম্মা একটু ক্ষীণদৃষ্টি। চক্ষের অতি নিকটে, ঈষৎ দূরে, বেশী দূরে নানা প্রকারে ঘড়ীটিকে ধরিয়া বার বার দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইলেন—সাড়ে আটটাই বটে।

সুরুচি বলিলেন, "এখন নিশ্চিন্ত হয়ে খাও।"

"নিশ্চিন্ত হয়ে ও বেলা এসে খাব।"

"ও কি ? উঠ্‌লে যে, সব যে পড়ে রইল।"

"না গো না, এখন কিছু সাধ্য নেই।" বিশ্বকর্ম্মা মুখ ধুইতে গেলেন।

বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া সুরুচি বলিলেন, "যা খুসী কর, তোমার সঙ্গে কে পারবে। সেই ভোর থেকে এত যোগাড় করলাম—সব আমার অসার্থক—"

হাত ধুইয়া টেবিলে পান রাখিয়া সুরুচি রান্নাঘরে গিয়া কুটনায় বসিলেন। আর এদিকে আসিলেন না।

বিশ্বকর্ম্মা অফিসের বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। চেয়ারে, টেবিলে, শয্যায়, খাটের রেলিংএ, টিপায়ে সদ্য ধোপদস্ত পাটভাঙ্গা সব পোষাক, ইচ্ছামত বাছিয়া পরিতেছেন, এক একটা তুলিয়া আবার রাখিতেছেন। একটা অর্দ্ধেক পরিয়া আবার খুলিয়া রাখিলেন, অন্য একটা হাতে করিয়া দেখিতেছেন, সেটা পরিবেন কি না।

ঘরে ইত্যাকার কাণ্ড হইতেছে। বারান্দায় কমল ঘড়ী হাতে দাঁড়াইয়া। গিরি জুতা হাতে, নিশি হ্যাট লইয়া গেটের কাছে।

বিশ্বকর্ম্মা প্যাণ্ট পরিয়া জুতা-মোজা পরিলেন। তার পর নেকটাই বাঁধা,—বাঁধিতে বাঁধিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া গেলেন তবু বাঁধা হয় না।

সশব্দে একখানা ট্রেন চলিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "সর্ব্বনাশ, ট্রেন বুঝি এল।"

কমল বলিল, "এটা মালগাড়ী, এক ঘণ্টা পরে আপনার ট্রেন।"

"ঠিক—ঠিক তো ? দেখেছিস ?"

"হাঁ, অনেক দেরী আছে।"

বিশ্বকর্ম্মা আবার টাই বাঁধিতে লাগিলেন।

"কটা বাজল ?"

কমল বলিল, "নটা বাজতে পাঁচ মিনিট।"

বিশ্বকর্ম্মা ডাকিলেন, "ওগো, শোন শোন।"

সুরুচি আসিয়া বলিল, "সেই থেকে টাই বাঁধছ ?"

"দেখ না গ্রহ আর কি ? রোজ টপ করে বাঁধা হয়ে যায় আর আজ তাড়াতাড়ি, আজ যেন ভূতে পেয়েছে! এ সব দিন বুঝে হয়।"

বিস্তর চেষ্টায় টাই বাঁধা হইল। অন্যদিনের মত পরিপাটী নিখুঁত হইল না। বিরক্ত হইয়া 'থাক্ গে' বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা কোট গায়ে চড়াইলেন। সুরুচি বলিলেন, "পান খাওনি এখনও ?"

বিশ্বকর্ম্মার মন সহরে—অফিসে। দেহ এখানে। বলিলেন, "পান—কই পান ? দিয়েছ না কি ?"

"এই যে সামনে, দেখনি না কি ? এই নাও।"

বিশ্বকর্ম্মা একেবারে দুইটা পান মুখে ফেলিয়া বলিলেন, "চুণ কই ? চুণ দাও।"

পান না চিবাইয়াই চুণ খাইলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠিলেন, "উঃ হুঃ হুঃ—মুখটা একেবারে পুড়ে গেল।"

সুরুচি বলিলেন, "তোমার কাণ্ড-কারখানা দেখলে কি যে মনে হয়—কি বলব! চুণ লাগবে কি না বুঝে তো খেতে হয় ? আর একটা শুধু পান দি এনে—"

"থাক্ গে থাক। টাকা—টাকা দিয়েছ ?"

"দিয়েছি। এই মণিব্যাগ।"

বিশ্বকর্ম্মার সাজা শেষ হইল আয়নায় দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "ঘড়ী—কত হ'লো ?"

কমল বলিল, "নটা বেজে দশ মিনিট —"

"থাক্—সময় আছে। ঘড়ী দে।" ঘড়ী হাতে বাঁধিয়া সিগারেট ধরাইলেন। তারপর ফাউন্টেন পেন, চশমা, মণিব্যাগ, সিগার কেস, রুমাল, দেশলাই এবং নোট্‌বুক পুরিয়া কোট ও প্যান্টের পকেটগুলি বোঝাই করিয়া ফেলিলেন

এখন যাত্রা করিবেন স্বরজ্ঞানানুসারে। যথা নিয়মে সে সব ঠিক করিয়া বলিলেন, "আজ কোথায় পা দিয়ে যেতে হয় ?"

সুরুচি বলিলেন, "আমার মাথায়।"

বিশ্বকর্ম্মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "বল—বল, শীগগির বল!—আর সময় নেই দেখছ ? ট্রেণ ফেল করব যে। ওগো বল না ?"

সুরুচি বলিলেন, "পা নয় হাত। আজ কি বার ?—'কর্ণোপরি'—কানে হাত দিয়ে যাত্রা করতে হবে।"

বিশ্বকর্ম্মা ইষ্ট স্মরণ ও কর্ণ ধারণ করিয়া বাহির হইলেন। সম্মুখে পূর্ণকুম্ভ। হ্যাট মাথায় দিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া গাড়ী থামিল। বিশ্বকর্ম্মা শশব্যস্তে বলিলেন, "কাগজ—কাগজ, টাইপ-করা খানকয়েক পিনে গাঁথা কাগজ টেবিলে রয়েছে,—যাঃ আসল জিনিসই ফেলে যাচ্ছিলাম—"

আরদালীরা 'পড়ি-কি-মরি' করিয়া ছুটিয়া আসিল, টেবিলের উপর কাগজ নাই। বসিবার ঘরের টেবিলে, শোবার ঘরের গোল, চৌকো কোন টেবিলেই কাগজ নাই। বিশ্বকর্ম্মা অধীর হইয়া ডাক দিলেন, "কই ?"

কাগজ পাওয়া গেল। পরিত্যক্ত শার্টের (সকালে যেটা পরা ছিল) বুক-পকেটে।

খানিক দূর গিয়া আবার গাড়ী থামিল। এবার ড্রাইভার বীরেন ছুটিয়া আসিল, দূর হইতেই রক্ত মুখে বলিয়া উঠিল, "বাবুর আংটী—"

মুহূর্মুহূ নূতন আদেশের অপেক্ষায় সকলেই ঘরে বারান্দায় সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া আছে। আবার বাথরুম হইতে সমস্ত ঘর তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আংটী পাওয়া গেল বারান্দার জানালার উপর।

অতঃপর আর কোন বিঘ্ন হইল না। বিশ্বকর্ম্মা সদর গমন করিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্যা

—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সুদূর অতীতে গান কি রকম ছিল তার পরিচয় পাই প্রাচীন পুঁথিতে। কিন্তু কথা দিয়ে সঙ্গীতের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, বোঝবার পক্ষে তা পর্য্যাপ্ত নয়। যদি গ্রামোফোনের মত কোন যন্ত্রে পরিবর্ত্তমান সঙ্গীতকে ধরে রাখা যেত, তা হলে অনেক সুবিধা হত সন্দেহ নেই, কিন্তু অভাবিত ও অসৃষ্ট উপকরণের অভাব নিয়ে ক্ষোভ করে কোন লাভ নেই। ইউরোপে প্রাচীন অস্পষ্ট স্বরলিপির ও গ্রন্থের সাহায্যে আজকাল কখনও কখনও গত দুই হাজার বৎসরের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত তৈরি করার চেষ্টা হয়, কিন্তু তা যে বেশীর ভাগ কাল্পনিক, সে তাঁরা বেশ বোঝেন। কারণ যাঁরা তৈরী করেন, তাঁরা সকলেই বর্ত্তমানের লোক, অতীত বলে যা ভাবতে চেষ্টা করা হয়েছে, তা বহুপরিমাণে বর্ত্তমান মনোভাব দিয়ে গড়া।

কিন্তু এ প্রকার চেষ্টা ইউরোপে আর এক কারণে কঠিন হয়েছে। প্রাচীন ইউরোপীয় সঙ্গীতের ধরণ ছিল খানিকটা অপরিণত প্রাচ্য সঙ্গীতের মত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত এক বিভিন্ন ধারা গ্রহণ করে, যার প্রচলিত নাম হার্ম্মনি-সঙ্গীত (কয়েকটি স্বরের এককালীন ব্যবহার দ্বারা যে সঙ্গীত সৃষ্ট হয়, ভারতীয় সঙ্গীতে স্বরগুলি একের পর আর একটি ব্যবহৃত হয়)। কাজেই তাঁদের অতীতে ফিরে যাওয়া দুষ্কর হয়েছে। কিন্তু আমাদের এ সমস্যার উদ্ভব হয় নি। আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীতের সঙ্গে প্রাচীন সঙ্গীতের যথেষ্ট মিল আছে। আমাদের সঙ্গীতে যে সব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয়, প্রায় সমস্তই প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায় এবং অর্থ প্রায় একই। আর একটি সুবিধা যে, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দু'হাজার বৎসরের সংস্কৃত পুঁথি আছে। সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিকতা পুস্তকের ও রীতির দিক্ দিয়ে ক্ষুণ্ণ হয় নি, এ কথা বলা যেতে পারে।

সর্ব্বপ্রথম যে সঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা বৈদিক যুগের। 'প্রাতিশাখ্য' ও 'শিক্ষা'গুলিতে তার যা বর্ণনা রয়েছে, তা যে সবই সুবোধ্য এমন নয়। এখনকার সামগান শুনে দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে গীত বৈদিক সঙ্গীতের ধারণা করা কঠিন। বর্ত্তমান কালে আবার আর এক বিপ্লব উপস্থিত হয়েছে যে, প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার পরিচয় পেতে উত্তর-ভারতে সন্ধান নিষ্ফল, তার জন্য দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতায় আর্য্য সংস্কৃতির কি কি নিদর্শন অটুট আছে, তাই দেখতে যেতে হবে। কিন্তু এত পরিশ্রমের পরও যা পাওয়া যায়, তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কারণ ভাষা কিছু পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, কিন্তু সুর দুই হাজার বৎসর এক রকম রাখা দুরূহ। চেষ্টা করলেও অজ্ঞাতসারে তা বদলে যায়।

স্বরগুলির ঠিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও বৈদিক সঙ্গীত সম্বন্ধে যে কিছু জানা যায় না, এমন নয়। আমাদের এখনকার সঙ্গীতে সাতটা স্বরের ব্যবহার হয় এবং তার প্রধান স্বরটা প্রথমে, অর্থাৎ 'স-রি-গ-ম-প ধ-নি-'র মধ্যে 'স' হল প্রধান স্বর এবং তারই নির্দ্দেশে অন্য স্বরগুলি চালিত হয়। কিন্তু যতদূর জানা যায়, বৈদিক স্বরগুলির (ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার) প্রধান স্বর ছিল মাঝখানে। বৈদিক সঙ্গীত ও পরবর্ত্তী হিন্দু সঙ্গীতের মধ্যে সময়ের কিছু ব্যবধান আছে এবং এককালে যে দুইটি সঙ্গীতের তুলনা হয়েছিল, তার প্রমাণ সমসাময়িক সঙ্গীতশাস্ত্রে রয়েছে। এইখানে একটা কথা উঠতে পারে যে, পরবর্ত্তী সঙ্গীত বৈদিক সঙ্গীতের পরিণতি কি না। সঙ্গীতের দিক্ দিয়ে বিচার করলে এ বিষয়ে সন্দেহ হওয়া অন্যায় নয় এবং পরবর্ত্তী সঙ্গীত অপর কোন সভ্যতার সৃষ্টও হতে পারে। তবে সে সভ্যতা অনার্য্যের কি অন্য কোন আর্য্যশাখার, তা বলা কঠিন।

নাট্যশাস্ত্রের যুগ মোটামুটি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ধরা যেতে পারে। নাট্যশাস্ত্রে অভিনয় ছাড়া সঙ্গীতের কিছু কথা আছে। আমাদের রাগ-সঙ্গীতের বড় একটা উল্লেখ নেই, কিন্তু 'জাতি' বলে রাগ-সঙ্গীতের তুল্যার্থক আর একটি সাঙ্গীতিক শব্দ পাওয়া যায়। 'জাতি' গাইতে নানাবিধ নিয়ম রক্ষা করতে হত। যে স্বর থেকে আরম্ভ করা হবে,

তার নাম দেওয়া হল 'গ্রহ', যাতে শেষ হবে তার নাম হল 'ন্যাস'। চড়া পর্দ্দায় কতটা যাবে এবং খাদে কতটা নামবে তাও বেঁধে দেওয়া হল। কোন্ কোন্ স্বর বেশী বা কম ব্যবহৃত হবে, তাও ঠিক থাকত। এমনি আরও সব নিয়ম ছিল *। আমাদের এখন এই সমস্ত নিয়মের অনেকগুলি অনাবশ্যক মনে হয় আর আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, এতগুলি নিয়ম বহন করে মানুষ কি করে আনন্দে গান গাইত। কিন্তু প্রতি যুগে তার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অনেক নিয়ম নিরর্থক মনে হয় এবং পঞ্চাশ বছর পরে যে সব নিয়মের শুদ্ধতা নিয়ে বর্ত্তমান সঙ্গীতে আমরা তুমুল আন্দোলন করি, তার অনেক কিছুই এমনি অর্থ-শূন্য হয়ে পড়বে। প্রাচীনকে পরিহাস করবার পূর্ব্বে ভবিষ্যতের কথা যদি স্মরণে রাখা যায়, সমালোচনায় অনেক বাদ-বিসংবাদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব নয়। যা হোক, তিন চারশ বৎসর পরে লোকের 'জাতি'র প্রতি কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য আসায় তাঁরা রাগ-সঙ্গীতে মনোযোগ দেন। রাগের মুখ্য পরিচয় ছিল তার মনোরঞ্জনের মধ্যে। রাজা, স্ত্রীলোক, বালক ও রাখালেরা বিভিন্ন দেশে মনের আনন্দে যা গান করেন, মতঙ্গ (প্রায় চতুর্থ শতাব্দীতে) তাকে বললেন 'ধ্বনি' (এর সঙ্গে হিন্দী 'ধুণ' শব্দের সম্বন্ধ আছে) এবং এই 'ধ্বনি' সুসংস্কৃত হয়ে রূপান্তরিত হল রাগে। মতঙ্গের কথাটা ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে দামী, কারণ, অনেকের ধারণা যে, দেড় হাজার দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে মুনিরা যে সব রাগ তৈরী করে গিয়েছেন, আমরা বর্ত্তমানে কেবল তার পুনরাবৃত্তি করে চলেছি। অথচ বর্ত্তমান সঙ্গীত একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, রাগ প্রতিদিনই তৈরী হয়ে চলেছে—তবে কোন কোন রাগের ক্রম-পরিণতির জন্য তিন চারশ' বৎসরের প্রয়োজন হয়েছে।

রাগ 'জাতি' থেকে কিছু নিয়ম গ্রহণ করল, কিন্তু তা সত্ত্বেও রঞ্জকতা পরিহার করেনি। রাগ-গঠনের মূলসূত্র যা কিছু উদ্ভাবিত হয়েছে, তা সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এইখানে শার্ঙ্গদেবের উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীর থেকে দক্ষিণ-ভারতে উপস্থিত হয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক হলেও হিন্দু যুগের শেষ লেখক বলে অভিহিত হতে পারেন। তিনি সঙ্গীত যে বিশেষ বুঝতেন এমন নয়, তবে তাঁর সময়ে যে সঙ্গীতশাস্ত্র প্রচলিত ছিল তা যথেষ্ট পরিশ্রম ও অভিনিবেশ সহকারে তিনি 'সঙ্গীত-রত্নাকরে' সুসম্বদ্ধ করবার চেষ্টা করেন এবং এই কারণে পরবর্ত্তী লেখকেরা তাদের পুস্তকের অধিকাংশ গ্রহণ করেছেন 'সঙ্গীত-রত্নাকর' থেকে।

শার্ঙ্গদেবের পরবর্ত্তী উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ গ্রন্থকারেরা তাঁদের পুস্তকে প্রাচীন গ্রন্থের অনেক কিছু বর্জন করলেন। দুঃখের বিষয় বিভিন্ন রাগেতে কি কি স্বর ব্যবহৃত হয়, তাই তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল, সঙ্গীতের মূলসূত্র নিয়ে তাঁরা কোন বিশেষ আলোচনা করেন নি। তবে যা কিছু লিখতেন, তা সুবোধ্য ও সম্বদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁদের গ্রন্থগুলি সুপাঠ্য।

একাদশ শতাব্দী কিংবা তারও পূর্ব্ব থেকে মুসলমান প্রভাব এসে হিন্দু সঙ্গীতে পড়ে এবং সংস্কৃত লেখকেরা কিছু পারস্য দেশীয় রাগ তাঁদের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন। হিন্দু সভ্যতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন সভ্যতা স্বীকরণে। রাগ তৈরি করার প্রধান উপাদান ছিল অন্য প্রদেশ, সমাজ, সভ্যতা থেকে সংগৃহীত সুর এবং আমরা যাকে হিন্দু-সঙ্গীত বলি, তা এমনি বিভিন্ন সঙ্গীতের সংমিশ্রণে তৈরী ও পুষ্ট। কিন্তু গ্রহীতার স্বপক্ষে বলবার ছিল তাঁরা গ্রহণে মাত্র অনুকরণ করতেন না, পুনর্গঠন ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী ছিল এবং সৃষ্ট জিনিষ ব্যবহারে ভারতীয়ের কোন দ্বিধা উপস্থিত হত না।

আর নিজেদের মধ্যে সহজে আদান প্রদানের পক্ষে ছিল সমগ্র প্রাচ্যের সাধারণ সংস্কৃতি। যেমন মিশরের কিছু ছবির সঙ্গে অজন্তার চিত্রের মিল পাওয়া যায়, তেমনি মিশরীয়, পারসীক সঙ্গীতের ভারতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল এবং সে-হেতু মুসলমান প্রভাব এত সহজে ও বিনা বাধায় ভারতীয় সঙ্গীতে স্বীকৃত হয়। ভারতীয় ব্যাকরণ তেমনি রইল, তবে গাইবার পদ্ধতি যে কিছু পরিবর্ত্তিত হল, এ বলা বাহুল্য।

নবাব-বাদশার রাজসভায় বিলাসে ঐশ্বর্য্যে পালিত সঙ্গীতকে ব্রিটিশ রাজত্বের সূচনায় যখন দেখা গেল, তখন নানা কারণে তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। বাদশাহের রাজকোষে অর্থ নেই, গায়কেরা ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন

* পারিভাষিক শব্দের মধ্য দিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের ধারার পরিচয় সংপ্রতি প্রকাশিত বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখকের Problems of Hindustani Music পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বঃ সঃ।

ছোটখাট সমৃদ্ধ নবাব, জমিদারদের আশ্রয়ে এবং অনেককে বাধ্য হয়ে জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করতে হল। সঙ্গীত-শাস্ত্রের চর্চ্চা রইল স্থগিত এবং গায়ক-বাদকের প্রধান উপ-জীবিকা হ'ল সাধারণের মনোরঞ্জন করা।

রাজা-বাদশারা রাজ-সভায় গুণীর আদর করতেন নানা কারণে। রাজারা উচ্চসঙ্গীত সর্ব্বদা না বুঝতে পারলেও আভিজাত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল এবং সভাগায়ক-বাদকের নৈপুণ্যের খ্যাতি রাজৈশ্বর্য্যের প্রমাণ ও বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচারিত হত। কাজেই দরবারী গায়কেরা কঠিন সাধনার মধ্য দিয়ে যেতেন এবং তার পারিশ্রমিকও তাঁরা পেতেন। রাজসভায় চটুল ও চপল সঙ্গীতের স্থান ছিল না তা নয়, কিন্তু মর্য্যাদা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উচ্চসঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীতে অভিজাত সম্প্রদায়ের হাত থেকে সঙ্গীত জনসাধারণের আয়ত্তে আসতে আরম্ভ করে। তাঁরা উচ্চ-সঙ্গীত বুঝতে পারলেন না এবং বিলিতী 'ডিমক্র্যাসী'র অর্থ ভুল বুঝে দাবী করে বসলেন, তাঁরা যা বুঝতে পাবেন তাই প্রামাণ্য ও শ্রোতব্য। পেটের দায়ে এল সস্তা হার্ম্মোনিয়ম-সঙ্গীত, প্রাচ্য সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে বসল। য়ুরোপীয়রা শুধু হার্ম্মোনিয়মের (তাঁদের দেশে অত্যন্ত হেয় যন্ত্র বলে পরিচিত) ব্যবহার থেকে বুঝতে পারলেন, ভারতীয় সঙ্গীতের অধোগতি আরম্ভ হয়েছে এবং বিলিতী কাগজপত্রে হার্ম্মোনিয়ম-সঙ্গীতের সমালোচনা ও পরিহাস আরম্ভ হল। ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাচ্য সঙ্গীতের গৌরব স্বরের শুদ্ধতা এবং স্বরান্তরের সূক্ষ্মতা ('শ্রুতি') কিংবদন্তীতে পর্য্যবসিত হল।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিবাদ আরম্ভ করলেন, কিন্তু তার ক্ষীণস্বর বেশী লোকের কানে পৌঁছল না। তবু প্রতিক্রিয়ার দরুণ বর্ত্তমানে কিছু সুফল হয় নি এমনি নয়। এর অর্থ এই নয় যে, সংসারে সহজ, সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জক গান-বাজনা থাকবে না। বিভিন্ন সঙ্গীতের তার নিজের স্থানে বিশিষ্ট ক্ষেত্রে আদর হোক, তাতে কারুর আপত্তি নেই। য়ুরোপে আমেরিকাতেও সস্তা জনসঙ্গীত আছে। কিন্তু এ ছাড়া উচ্চসঙ্গীতের বোদ্ধা, রসগ্রাহী ও পরিপোষক শ্রোতারও সেখানে অভাব নেই। ভারতে এই শ্রেণীর শ্রোতা এখনও গড়ে ওঠেনি বলে ভারতীয় উচ্চসঙ্গীতের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা আজ এত সুকঠিন ও সমস্যা-বহুল হয়ে উঠেছে।

ভারত ও জগৎ

...কিছুদিন আগেও ভারতবর্ষ জমীতে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলিয়া ভারতবাসিগণ সেদিনও জগতের সমস্ত জাতিকে তাহার কৃষিকার্য্যের দ্বারা খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করিতে পারিয়াছে এবং সে দিনও ভারতবাসী যন্ত্রশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কুটীরশিল্পের দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভাবে সরবরাহ করিতে পারিয়াছে।

এখন ভারতবর্ষের জমীও দ্রুতগতিতে শুষ্কতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া ভারতবাসিগণও যন্ত্রশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পড়িতেছে।

এই যন্ত্রশিল্পের দ্বারা মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নহে। তথাপি, যতদিন পর্য্যন্ত যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত যন্ত্রশিল্প কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপরিহার্য্য। যন্ত্রশিল্পের দ্বারা যে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখা সম্ভব নহে এবং উহা সম্ভব না হইলেও বর্ত্তমান অবস্থায় যে কিছু দিনের জন্য যন্ত্রশিল্প কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপরিহার্য্য, তাহা শ্রমজীবিগণ ও তাহাদের মস্তিষ্কহীন হিংসাপরায়ণ তথাকথিত শিক্ষিত বন্ধুগণ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র অহরহঃ এত ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হইতেছে।...

এগজামিনেসন্

—শ্রীপ্রতিমা গঙ্গোপাধ্যায়

কাল থেকেই বৃষ্টির বিরাম ছিল না, আজ আবার সকাল থেকেই নূতন মেঘ দলে দলে আকাশ ঘিরে ধবল ও ধারাবর্ষণ সুরু হল। অশ্রান্ত বৃষ্টির ধারা ক্রমাগতই ঝরছে, হাওয়ারও যেন বিরাম নাই, এই নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সিক্ত পৃথিবীর বুকে অশান্ত ছেলেটির মতই নেচে-কুঁদে গাছ-গুলোয় দোলা দিয়ে যেন মাতামাতি করে বেড়াচ্ছে।

অসীমা দেখছিল। শ্রাবণের ঘনায়মান মেঘের অন্ধকার যেন ঘরখানাকেও ঢাকতে চায়। একটা জড়তাপূর্ণ শীতলতা ঘরটাতে ক্রমশঃই ব্যাপ্ত হচ্ছে। এমন দিনে যেন আর পড়াশুনা ভাল লাগে না।

অসীমা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসেই রইল, ভুলে গেল যে সে পড়তে এসেছিল। এও ভুলে গেল যে, সামনে পিরিয়ডিক্যাল এগ্‌জামিনেশন্।

মাঝে মাঝে তীব্র বিদ্যুতের লেলিহান শিখা আকাশের বুক চিরে এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত আলো করে চমকে উঠছে।

এমন দিনে, যেদিন পড়াশুনা কিছুই ভাল লাগে না, সেদিন কি করা যায়? অসীমা উদাস দৃষ্টি বাইরে মেলে ভাবতে লাগল। কি করা যায়? অন্যমনে সে পেনটা টেবল থেকে তুলে নিলে। পেনটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল একটা কিছু লিখি।

একখানা খাতা। খাতাখানার জন্য হাত বাড়াতেই টেবল থেকে যেখানা হাতে উঠে এল, সেখানা ফিজিক্স প্র্যাক্‌টিক্যালের।

ধ্যেৎ, ছুড়ে ফেলে দিয়ে অসীমা চুপ করে বসে রইল। ওপাশের র‍্যাকটার উপর অবশ্য কিছু ফুলস্কেপ পেপার আছে, কিন্তু উঠতে গেলে তার নেশা টুটে যাবে।

নেশা অর্থে খারাপ কিছু নয় মোহ, অর্থাৎ লেখার মোহ। অসীমা বসে বসেই ভাবল, সে যদি এখন উঠে যায়, তা হলে? তা হলে এই যে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় একটা নূতনতর অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, এই যে ও মনে মনে ভাবছে যে, একটা মিষ্টি করে ও গল্প লিখবে, এত চমৎকার করে লিখবে বা নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করবে, যা সে কল্পনা করে নিজের মনেই শিউরে উঠছে, ভাব একবার ...সে লেখা কোনও বিখ্যাত পত্রিকায় বার হলে ফার্ষ্ট ইয়ারের একটি মেয়ের লেখা জেনে সবাই বিস্মিত হয়ে যাবে, হয়ত বা দাদা একটা সপ্রশংস চিঠি পাঠাবে। (যা দাদা কোন কালেই করবে না)·· আঃ ভাবতেও আরাম!

অসীমা চোখ বুজে বসে রইল।

এখন যদি ও উঠে যায়, তা হলে এই যে এত ভাবাবেগ, সব নষ্ট।

নাঃ, আমি বসেই থাকব।

হাওয়াটা যেন আরও ভারী, আরও ঘন হয়ে উঠছে। ঠাণ্ডা জলের ছাঁট গায়ে একটু একটু লাগছে, তা লাগুক গে। এখন আমি উঠব না, অসীমা আঁচল দিয়ে পা-টা চাপা দিলে।

আমি ভাবব একটি গল্প, অতি সুন্দর, অতি চমৎকার, অসীমা ভাবছে, তাতে বিচ্ছেদ থাকবে না, বিরহ থাকবে না, ব্যথা নাই, বেদনা নাই, থাকবে শুধু নিবিড় সুখানুভূতিপূর্ণ পরিপূর্ণ এক মিলনের গান। কিন্তু, কিন্তু কাদের নিয়ে প্লটটা হবে? একটি নব-বিবাহিত দম্পতি? না মাতৃপিতৃহারা দুটি ভাইবোন? কিংবা বৃদ্ধা মাতা আর স্বদেশী আন্দোলনে জেল খেটে (এর চেয়ে ভাল ভাষা অসীমা খুঁজে পেলে না) সদ্য ফিরে-আসা একটি যুবক পুত্র?

কিংবা, কিংবা যদি লেখা যায়, বর্ষার একটি সুমধুর বর্ণনা, অপরূপ এবং সুন্দর, তারই মাঝে ফিরে আসবে বিরহ-বিধুর নায়ক তার বিরহবিধুরা নায়িকার কাছে? সুদূর দুর্গম প্রদেশে বিপদসঙ্কুল কর্ম্মের মধ্যে যে নায়িকার চিন্তায় সে সর্ব্বদা বিভোর হয়ে থাকত, সে আজ ফিরে আসবে তার প্রিয়ার কাছে, সব বাধা সব বিপত্তি কাটিয়ে?

বেশ হবে, না?

দূর হ'ক গে, বর্ষার বর্ণনাটাই মনে মনে ভাবা যাক। ধরে নাও, নায়কের ফেরার পথে মধ্যে মস্ত বড় এক বন, আঃ বিশুদ্ধ ভাষায় বিশাল অরণ্য, তারই মাঝে নায়ক আসিয়াছে··· সেই নববর্ষা সমাগমে গিরিপাদমূলে লতা-জটিল প্রাচীন মহারণ্য মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়··· ও মা!

এটা যে রবীন্দ্রনাথের রচনা! বর্ষার কথা ভাবলেই প্রোজ প্যাসেজের (কারণ অসীমার বাংলা বিদ্যার দৌড় ওই পর্য্যন্ত) এইখানটাই অসীমার মনে পড়ে।

মনে মনে অসীমা আবার ভাবল, প্রোজ পাসেজের অত অসংখ্য প্যাসেজের মধ্যে এটাই বেষ্ট।

আচ্ছা থাকগে, অত কবিত্ব করতে গেলে আর বিশুদ্ধতা ভাবতে গেলে ভাব মার্ডার হয়ে যাবে। তার চেয়ে ধরে নাও, পল্লীগ্রামে ছোট একখানি দোতালা বাড়ী সংস্কার অভাবে জীর্ণ। তারই মাঝে বাস করে ছোট একটি বউ।

বয়স কত? এই আঠারো উনিশ হবে। গায়ের রং শ্যামলা, তন্বী তরুণী মেয়েটি। মাথায় একমাথা চুল তুলে এলোখোঁপা বাঁধা। ও তো আর সহরের মেয়ে নয়, নামিয়ে ফ্যাসান করে ক্লীপ্ দিয়ে খোঁপা বাঁধবে।

পরণে একখানি লালপাড় সাদা শাড়ী ও সাদাসিধা সেমিজ গায়ে। পায়ে তরল আলতা পরেছে সদ্য—তারই ছাপ জীর্ণঘরের সর্ব্বত্র, ঘুরে ঘুরে ঘরের মধ্যে কাজ করে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছা একটি ছেলে হয়েছে লিখব কি? অসীমা একবার ভাবল, না, না, তাতে গল্পের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে, শুধু ওরা দুজনেই থাক।

সকাল থেকে ও আজ আশা করে রয়েছে যে, কলকাতা থেকে আজ ওর স্বামী আসবেন। সেই জন্যই ও আজ সব গুছিয়ে গাছিয়ে ভাল করে রাখতে চায়।

রান্নাঘরে ও রান্নার কথা বুঝিয়ে দিলে ঠাকুরকে—না, না··· পাড়াগাঁয়ের গরীব বাড়ী, সেখানে তো ঠাকুর থাকে না। ও নিজেই পরিপাটি করে রাঁধলে। দুপুর শেষ হয়ে যায়,···বিকাল, এখন বউটি বাথরুমে, ও না বাথরুমে তো নয়, পুকুরঘাটে গেল কাপড় কাচতে।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আটটাও বাজল এইবার। স্বামীর আসবার সময় ক্রমশঃই এগিয়ে আসছে তবু, তবু এতক্ষণ কি করা যায়! বউটি অধীর হয়ে উঠছে, সময় যেন আর ফুরোয় না।

আজ আবার তেমনই বর্ষা নেমেছে। বউটি ভাবছে কি করে উনি আসবেন।

চঞ্চলপদে ও এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা, বউটি এখন একটু এসরাজ বাজাবে কি? তা বাজাক না।

খাটের পাশে জানালাটা খুলে দিয়ে ও বসবে, এসরাজটা তুলে নেবে কোলের উপর। তারপর? বাইরের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে ও ভাববে।

সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রান্তর বর্ষার ছোঁয়ায় কোমল তৃণভূষিত শ্যামল মনোহর হয়ে উঠেছে।

উন্মুক্ত নীলিমায় ঘন মেঘের শ্যাম-সমারোহ। সজল মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি মনপ্রাণ উদাস করে তুলছে। সতেজ সুন্দর মহোৎসব দিকে দিকে। বউটির চোখের দৃষ্টিতে স্বপ্নের ছোঁয়া লেগেছে। আস্তে আস্তে অতি ধীরে ছড়টা তারের উপর কখন অজ্ঞাতেই সে বুলোলে।

রিনি ঝিনি ঝঙ্কারে মল্লার মুক্ত হয়ে উঠল।

"বহুত দিন ন পর পিয়া ঘর আবে"··· কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নাই। ও কে? পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এসে ঘরে প্রবেশ করলে?

বউটি এখনও জানে না ওর স্বামী এসেছেন। এসরাজে তখন দেশ বাজছে, সুরের ঝঙ্কারে ঘর পরিপূর্ণ। ধীরে ধীরে পকেট থেকে স্বামী বের করলে একটি বেলফুলের গোড়ে। টাটকা ফুল গাঁথা। হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে কেনা বোধ হয়। গন্ধে ঘরটা ভরে উঠেছে।

সিক্ত ওয়াটারপ্রুফটা ও খুলে ফেললে গা থেকে। পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, সোণার বোতামগুলো ঝক্ ঝক্ করে উঠল। শান্তিপুরে জরীপাড় ধুতির কোঁচাটা পায়ের উপর লুটিয়ে পড়েছে।

পা থেকে ও জুতাটা খুলে দিলে। তারপর? আস্তে আস্তে ও এগিয়ে গেল খাটের দিকে। ফুলের মালাটা সন্তর্পণে দুহাতে ধরা···এইবারে···। ও মা!

অসীমা চমকে উঠল, এ কি সে ভাবছে ? যাঃ, একেবারে সব মাটি।

পাড়াগাঁয়ের শান্ত শিষ্ট অজ্ঞ পল্লীবধূ সে, কোথায় পাবে সে এসরাজ ? কোথায় বা তার খাট ?

গরীব ঘরের বউ, তার শয্যা রচনা করবে তক্তপোষের উপর। যখন তখন ধূলাপায়ে তার উপর সে বসেও না।

গান ? আজ পর্য্যন্ত সে বোষ্টমীদের সাদামাটা গান ছাড়া তেমন গান কখনও শুনেছে কি ?

মল্লার নাম শুনে সেই পল্লীবধূটি হাসবে হয়ত। তার সেই হাসিটির স্বচ্ছতা অসীমাকে লজ্জা দেবে নিশ্চয়।

আর তার গরীব স্বামী, কোথায় পাবে আদ্দির পাঞ্জাবী, জরিপাড় ধুতি ? এত কবিত্ব করবার তার সময়ই বা কোথায় ?

হ্যারিসন রোডের মোড় থেকে কেনা দু' আনার ফুলের গোড়ের বদলে হাতে থাকবে তার মুখে দড়িবাঁধা ইলিশমাছ, গঙ্গার টাটকা ইলিশ। অপর হাতে থাকবে কিছু তরি-তরকারী, সদ্য-কেনা নূতন ঝাড়নে বাঁধা।

আর পকেটে থাকবে উপহার হিসাবে, বড়জোর একটা গন্ধতেল, কিংবা একটা তরল আলতার শিশি। স্নো ? না না, স্নোতো ওরা মাখে না। তারপর ?

তারপর হাতের তরিতরকারীগুলো সামলে ডানহাতে নিয়ে বামহাতে কোঁচার কাপড় ও জুতো দুটো তুলে ধরে রাস্তার প্রচুর কাঁদা বাঁচিয়ে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে গ্রাম্যপথ দিয়ে চলতে থাকবে। মাথার উপর পড়বে অবিশ্রান্ত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ধারা। চোখের সামনে ভাসবে গ্রাম্যবধূটির সরল মুখচ্ছবি।

ওর মাথায় নারীদের সমস্যা, বেকার-সমস্যা, কিংবা ডিপ্রেশড্ ক্লাসদের সমস্যা কোথায় ? নিজেদের ঘরাও সমস্যা ছাড়া সে মাথায় কিছুই স্থান পায় না।

এমন কি ধনী-দরিদ্রের প্রভেদটুকুও কখনও তার মনকে উন্মনা করে নি যে, সে গরীব কেন।

সে তার ওই পঁয়ত্রিশ টাকাতেই খুসী।

আর···আর তার ওই বধূটি থাকবে তুলসীতলায়, প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করবার পর জীর্ণ জানালার সামনে ব্যগ্রদৃষ্টি মেলে পথের পানে, স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায়।

তার ধারণায়ও এই গ্রামটুকু এবং তার সীমাবদ্ধ সমাজটুকু আর তার সংসারের বৃহৎ থেকে তুচ্ছতম কাজটুকু ছাড়া আর কোন কিছুই আসে না।

শাড়ীর সঙ্গে ব্লাউস ম্যাচ করা ? সে কল্পনায় আনে না।

স্নো, রুজ, পাউডার দেখলে ? বিস্ময়ে তাকাবে।

হাইহিল জুতো ? আবার সেই স্বচ্ছ-মধুর অনাবিল হাসি, যে হাসির আঘাতে অসীমা একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠবে।

নাঃ - প্লটটা আবার নূতন করে ভাবতে হবে।

আর পারা যায় না, অসীমা ভাল করে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঝল।

পাশের ঘরে মিনুর মিষ্টিগলার উচ্চকণ্ঠের গান শোনা গেল—

এ ভরা বাদর···
মাহ ভাদর ··

সঙ্গে সঙ্গে দিদির গলা শোনা গেল, চুপ চুপ, ও ঘরে অসী পড়ছে, তার পড়ার ব্যাঘাত হবে, তার আবার এগজামিন সামনে।

দিদির কথা শুনে অসীমা কি লজ্জা পেল ?

ইয়োরোপের উন্নতি

···পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে ইয়োরোপে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে বলিয়াই জগতের মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে ইয়োরোপীয়গণ কুটীরশিল্প পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য স্বাস্থ্যাপহারক হইলেও যন্ত্রশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ইয়োরোপীয় জাতীয় জীবনের উন্নতির পরিচায়ক নহে, অবনতির ইতিহাস।···

আমাদের দেশে শাঁখার ব্যবসায়

শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার

শাঁখাতৈরী শিল্পটি আমাদের ভারতের বহু পুরাতন শিল্প। বহুকাল আগে শাঁখা তৈরী করা সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। ভারতের দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে ভাঙ্গা শাঁখার অনেক টুকরো পাওয়া গেছে। এমন কি, দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি জায়গায় স্তূপাকারে এই শাঁখার অংশবিশেষ পাওয়া গেছে। আগে ভারতের অনেক জায়গায় এই শাঁখা তৈরী হ'ত। কিন্তু এখন এই শাঁখা তৈরী ব্যবসায় ক্রমশঃ কমে এসেছে। এখন কেবল আমাদের এই বাংলা দেশেতেই এই পুরাতন শিল্পের অস্তিত্ব আজও টিঁকে আছে।

বাংলাদেশে শাঁখা তৈরীর প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে ঢাকা। আজ এই ঢাকার শাঁখাই সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করেছে। অবশ্য কলিকাতাতেও আজকাল শাঁখা তৈরী হয়। এই শাঁখা যারা তৈরী করে, তাদের বলা হয় শাঁখারী। এই শাঁখারীদের মধ্যে খুব অল্পই অবস্থাপন্ন। দু'দশজন ছাড়া অধিকাংশ শাঁখারী গরীব। কোনরকমে নিজেদের সংসার চালায়। এই অস্বচ্ছল অবস্থার জন্য অধিকাংশ শাঁখারীই শাঁখা তৈরী করার বন্দোবস্ত ভাল ভাবে করতে পারে না। এ জন্য বেশী লাভও হয় না।

শাঁখা যে শাঁখ (শঙ্খ) থেকেই তৈরী হয়, তা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই শাঁখ সাধারণতঃ ভারী ও সাদা রং'এর হয়। এর গা'টা হয় উজ্জ্বল। সবচেয়ে বড় ধরণের শাঁখ লম্বায় প্রায় ৮ ইঞ্চি হয়। আর শাঁখের গা'টা প্রায় এক-চতুর্থ ইঞ্চি পুরু হয়। ডুবুরীরা এই শাঁখগুলি ভারতের দক্ষিণাংশের ও সিংহলের সমুদ্রোপকূলের বালির ভিতর থেকে বে'র করে। এই শাঁখ জোগাড় করেই তারা তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এই শাঁখ তোলার ব্যাপারে ওখানকার গভর্ণমেণ্ট বেশ মোটা টাকা লাভ করেন। প্রত্যেক বছর প্রায় ২০,০০,০০০ শাঁখের খোল (shell) জোগাড় হয়। এর মধ্যে প্রায় ৭৫,০০০টি হয় খুব ভাল ও বড়। এই শ্রেণীর শাঁখ থেকেই ভাল ভাল শাঁখা তৈরী হয়।

সাধারণতঃ কলিকাতা ও ঢাকার ধনী ব্যবসায়ীরা এই শাঁখগুলি 'হাজার' দরে ক্রয় করে। প্রত্যেক হাজার শাঁখের দাম ১০০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত। শাঁখের এই দামের কমবেশী হয়, শাঁখের গুণানুসারে।

তখন শাঁখারীরা তাদের দরকার মত মহাজনদের কাছ থেকে এই শাঁখ নেয়। এই শাঁখারীর ভেতর আবার দু'শ্রেণী আছে। এক হচ্ছে যারা শুধু শাঁখকে গোল গোল টুকরো করে অন্যের কাছে বিক্রী করে দেয়। আর এক রকম হচ্ছে, যারা শাঁখও কাটে, আবার সেই কাটা শাঁখের উপর 'কারুকার্য্য' করে। আবার অনেক মহাজন আছেন, যাঁরা কারিগর রেখে শাঁখা তৈরী করে নানা জায়গায় এই শাঁখা চালান দেন। তা না হ'লে গ্রামের মধ্যে শাঁখারীরা নিজেরাই তাদের কাজ করে।

এখন এই শাঁখা কি করে তৈরী হয়, তাই অল্পকথায় কিছু কিছু এখানে বলব। শাঁখকে করাত দিয়ে কাটবার আগে এই শাঁখের ভেতর যে মেরুদণ্ড ও অন্যান্য শক্ত জিনিষ থাকে, তা পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। তারপর করাত দিয়ে শাঁখটিকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয়। এই করাতের সাধারণ করাতের মত দাঁত আছে। খুব ধারাল এই করাত। করাতটির আকার ঠিক অর্দ্ধচন্দ্রের মত। এটি খুব শক্ত ইস্পাতের তৈরী। করাতের দু'ধারে হাতল আছে। এই হাতল ধরে শাঁখারীরা কাজ করে। ইস্পাতটি ঠিক মাঝখানে দশ ইঞ্চি চওড়া। শাঁখ কাটবার সময় শাঁখারীরা শাঁখটিকে পায়ে করে চেপে ধরে করাত দিয়ে কাটতে আরম্ভ করে। সাধারণতঃ একটা বড় শাঁখ থেকে প্রায় দশটি গোল গোল টুকরো পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য এই গোল টুকরো দিয়ে সরু সরু 'চুড়ী' শাঁখা তৈরী হয়। আর মোটা শাঁখা বা বালা তৈরী হয় একটা শাঁখা থেকে তিনটে কি চারটে। শাঁখের মাঝখান দিয়ে একবার করাত চালাতে গেলে প্রায় পাঁচ মিনিট সময় যায়। অনেক সময় এর চেয়ে বেশী সময় লাগে। আবার শাঁখা তৈরী করবার সময়, করাতে মাঝে মাঝে ধার দিতে হয়। প্রত্যেক শাঁখারী দিন শাঁখ থেকে ৫০।৬০টির বেশী গোল টুকরো কাটতে পারে না। কারণ সব শাঁখই বেশ ভাল আকৃতির হয় না। অনেক আঁকাবাঁকা থাকে। এই শাঁখ কাটার কাজ ভয়ানক শক্ত। এ'তে খুবই পরিশ্রম করতে হয় ও ধৈর্য্য ধরে থাকতে হয়।

এখন শাঁখ কাটা হয়ে যাবার পর, শাঁখার ভিতর দিকটা মসৃণ করা হয়। এই মসৃণ করবার জন্য, এক রকম লম্বা গোল কাঠের টুকরো ব্যবহার করা হয়। এটি প্রায় ২০ ইঞ্চি লম্বা। এর গায়ে থাকে বালি লাগান। এ জন্য এর চারপাশ খুব খসখসে হয়। শাঁখাটি তখন এর ভেতর গলিয়ে দিয়ে ঘষা হয়। এরপর শাঁখার উপর দিক্ মসৃণ ও পালিশ করা হয়। এবার দরকার মত এর উপর নানারকম "কাজ" করা হয়। এই কারুকাজ করতে নানারকম ছোট ছোট করাত লাগে। এ'ছাড়া আরও ২।১টা লোহার যন্ত্রপাতি লাগে।

বিয়ের সময় যে লাল রং'এর শাঁখা লাগে, তা এই শাঁখা থেকেই তৈরী। কেবল এই সাদা শাঁখার উপর লাল 'রং' লাগান হয়। আর এই রং তৈরী হয় 'গালা' ও সিঁদুর একসঙ্গে গরম করে।

শাঁখা পরার বেশী প্রচলন আমাদের এই বাংলাদেশে। তিব্বতেও এই শাঁখা পরার 'চল' আছে। হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকেরাও শাঁখা ব্যবহার করে। তবু আগের চেয়ে এর প্রচলন কমে এসেছে। তাই দিনের পর দিন আমাদের নিজস্ব যে-সব কুটিরশিল্প-বিশেষজ্ঞ, তাদের অন্নাভাব বাড়ছে। হয় তো বা কোনদিন দেখা যাবে, জার্ম্মানী থেকে বা জাপান থেকে বিসদৃশ কোন বস্তুর শাঁখা আমাদের বাজারে বেরিয়েছে। আর তাই আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা পরম সমাদরে পরছেন। আলতা তো বিদেশ থেকে আমদানী হচ্ছেই।

বিবাহ উচিত কি না ?

—শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

অনেক কারণে আজ ছেলে-মেয়ে অবিবাহিত থাকিতে চায়। তাহার মধ্যে প্রথম, আধুনিক শিক্ষা। ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি* যে, ছেলেরাও লেখাপড়া করিয়া বিবাহে অনিচ্ছুক হয়, ইহা বলা চলে না, বরং বিবাহের জন্য অতি মাত্রায় ইচ্ছুক হইয়াই তাহারা বিবাহ করিতে ভয় পায়। মেয়েরা ঠিক তাহা নহে। মেয়েদের মধ্যে অনেকে আজ লেখাপড়া শিখিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া স্বাধীন জীবন কাটাইবার পক্ষপাতী। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে কয়জন মেয়ে উপার্জ্জন করিতে পারেন? সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মত মেয়ে ও পুরুষে চাকুরী ভাগ হইলেই দেশের দুঃখ বা বেকার সমস্যা কমিবে কি? কোন দেশেই নারীর রোজগার সুনজরে দেখা হয় না। সভ্য দেশ-গুলিতেও প্রায় কোন স্বামীই পছন্দ করে না যে, তাহার স্ত্রী রোজগার করুক। সে-কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার যে, এ দেশে ছেলেদের রোজগার করিবার যত সব বিঘ্ন আছে, মেয়েদের ক্ষেত্রে কি তাহা ততোধিক নহে? বিদেশে স্বল্পবেতনে তুষ্টা নারী-শ্রমিক, পুরুষের কাজ আত্মসাৎ করায় সে স্থানে নারী ও পুরুষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধিয়াছে, অনেক ঘরে ঘরে তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এ দেশেও কি ইহা হইতেছে না বা হইবে না? এ দেশে এম-এ পাশ ছেলে ৩০৲ টাকায় পাওয়া যায়, পাশকরা নারীর ভাগ্যেও কি তাহাই ঘটিবে না?

যদি তাহা নাও হয়, অর্থাৎ যদি সকল নারী রোজগার করিতেও পারেন, তথাপি বলিতে হয়, শতকরা ৬০।৭০ জন স্কুল কলেজে পড়া নারী নানারূপ রোগে ভোগেন। স্বাস্থ্যই শরীর ও মনের কলকাঠি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। শুধু অর্থই সুখ দিতে পারে না। মানুষ মাত্রেই চায় সামাজিক, দাম্পত্য বিষয়ক এবং মনের খোরাক বিষয়ক তুষ্টি। নারী মাত্রেরই প্রায় সন্তানবুভুক্ষা আছে। এই মাতৃত্ব-বৃত্তির বিকাশ হয় না বলিয়াই নারীর মধ্যে জগদ্ব্যাপী অশান্তি, খেদ, বিকৃততা অবসাদ দেখা যায়। বৃথা মরীচিকার ন্যায় যশ, মান, অর্থের পশ্চাতে ছুটিয়া নারী কখনও মনকে তৃপ্ত করিতে পারে না, একমাত্র মাতৃত্ববৃত্তির পরিণতি, বিকাশ ও গভীরতাতেই তাহার জীবন সার্থক হইতে পারে, ইহাই নারীত্বের সার্থকতা বা আত্মবিকাশ (self-expression)। আমরা চক্ষুহীন হইয়া পড়িয়াছি, নচেৎ ঘরে ঘরে দেখিতাম, কিশোরী বয়স হইতে নারী, শরীর ও মনে, কেমন "মা" হইয়া থাকেন, কত বড় আশা, উচ্চ আদর্শ, অসীম মাতৃস্নেহ, সেবা, দরদ দিয়া সকলকে পূর্ণ করিতে চাহেন, কিন্তু বাহিরের সহস্র চাপে এ সব মনের মধ্যেই গুমরিয়া মরে। কেহ দেখুক না দেখুক, ঘরে ঘরে মাতৃত্বের উদ্বোধন, আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পূজা, অর্ঘ্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিদান, উৎসর্গ, আহুতি, ভক্তি, বিশ্বাস, প্রেম, শ্রদ্ধা-নিবেদনও চলিতে থাকে। জগতের প্রকৃত অভ্যুদয়শীল বৃত্তি, পরার্থপরতার আদিজননী এই মাতৃত্বকে আমরা বর্ত্তমানে হতশ্রদ্ধায় পিষিয়া মারিতেছি। কিন্তু নারীর জীবিতকালে তাহার মাতৃত্ব মরিতে পারে না। সুতরাং ঠিক করিতে হইবে, বিবাহ না দিলে আজ কি দিয়া মায়ের জাতিকে তাঁহাদের আত্মরক্ষা করিতে দিব। মাতৃত্ব-হন্তারক suggestion উঠিতে বসিতে দিলেই কি মাতৃত্ব লোপ পাইবে? সর্ব্বপ্রধান কথা এই যে, পূর্ব্বে ৪০ বৎসর বয়সে নারীর সাংঘাতিক বয়স, dangerous age ছিল, এখন তাহা অনেক পিছাইয়া গিয়াছে। অনেক নারী রূপযৌবন গত হইলেই না কি আদিম বৃত্তির তাড়নায় অতিষ্ঠ হন (E. Metchnikoff)। টাকার খনিতে শুইয়াও সন্তানহীনার খেদ যায় না। বিবাহ না করিয়া oldmaid হইয়া থাকার সাংঘাতিক অবস্থা অনেক নভেলে পাওয়া যায়। Oldmaid's insanity নামক ভীষণ ব্যাধি শুধু বুকে সাপটাইয়া ধরিবার একটা সন্তানের অভাবেই হয়। হ্যাভলক এলিস বলিতেছেন, এই ব্যাধি those who are

* গত পৌষ ও মাঘ সংখ্যার 'অন্তঃপুর' দ্রষ্টব্য।

emotionally starved of love, তাহাদেরই হয়। এ সব শুধু বিদেশের কথা নহে। আমাদের দেশেরও। যে দেশে বিদেশীয়দের তুলনায় প্রায় কোন সুখ-সুবিধা নাই, যেখানে গরীব গৃহস্থ শতকরা ৯০ জন, যাহাদের জীবনে ভাবের আদান-প্রদান করিবার ক্ষেত্র আত্মীয়স্বজন ভিন্ন প্রায় নাই, সেখানে কি দিয়া নারী তাহার জীবন সহনীয় করিবে? ধার-করা বিদেশীয় মোহে কি আদর্শে তাহার কতটুকু দুঃখ ঘুচিবে?

আজ বিবাহ-বাজারে—মেয়েদের পাশ, নাচগান, রূপ ও অর্থ চাওয়া হয়। সংসার করিতে গেলে যে সব শিক্ষা আবশ্যক, তাহা আজ এ-বাজারে ঘৃণার ব্যাপার। সকলেই চাহেন I. C. S., I. P. S, নিদেন পক্ষে B. C. S., মুনসেফ, ব্যারিষ্টার বিলেত-ফেরত ডাক্তার পাত্র। কালের ধারায় আজ ১৫০৲ টাকা আয় নহিলে সংসার পাতা যায় না, সুতরাং বিবাহও হয় না। কিন্তু এ দেশে ধনীদের মধ্যেও কয়জনের প্রথমে এই আয় হয়? শতকরা ১½ লোক এ দেশে আয়কর দেয়, তাহার মধ্যে বিবাহযোগ্য হিন্দু উক্ত সব কর্ম্মে নিযুক্ত কয়জন পাওয়া যায়? অথচ বিবাহ যদি ২২।২৪ বৎসরের মধ্যে না ঘটে, তবে মেয়ের বিবাহ হওয়া দুর্ঘট। অবশ্য যুগধর্ম্মে ভালবাসা করিয়া বিবাহ সব সময়েই হইতে পারে। কিন্তু শ্রীহীন বা ধনহীন মেয়ের বাবার ভাগ্যে তাহাও জুটে না। তাই মনে হয়, আপনার ও দেশের প্রকৃত অবস্থার ঠিক ওজন না বুঝিয়া সকলেরই উচ্চাশা পোষণ করার ফলেই আজ মেয়েদের বিবাহের সর্ব্বাপেক্ষা বাধা।

অনেকের ধারণা যে, অবাধ মেলামেশা করিতে দিলে পাশ্চাত্ত্য দেশের ন্যায় প্রণয় ঘটিয়া বিবাহ সহজ হয়। এই ব্যবস্থাটি কিন্তু "শাঁখের করাতের" মত,এ দিকেও কাটে ও দিকেও কাটে। ইহাতে যেমন সান্নিধ্য, অনুকূল অবস্থা ও স্পর্শ-শক্তির যোগে বিবাহ অনেক ক্ষেত্রে গড়ে, তেমনই অনেক বিবাহিত জীবন ভাঙ্গেও। বিবাহিত নর-নারীর মধ্যেও প্রণয় হয়, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব কোথাও নাই। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, এ যুগে বিবাহের দায়িত্ব লইতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, অথচ বিবাহের সুবিধা পূর্ণমাত্রায় লইতে বদ্ধপরিকর, এইরূপ যুবক সমাজমধ্যে এখন বিস্তর। ইহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, প্রকাশ্য গণিকাবৃত্তি অনেক 'সভ্যাতিসভ্য' দেশ হইতে উঠিয়া যাইতেছে। যাঁহারা গণিকাবৃত্তির কারণ বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে, অধুনা নারী অধিক ক্ষেত্রে জীবন উপভোগ করিবার জন্যই এ পথে যাইতেছে। অন্য কারণসমূহ গৌণ, মুখ্য নহে (Ellis)। বাস্তবিক অবিরত যৌন উন্মাদনা সর্ব্বত্র দেওয়ার ফলে তাহা বাঁধ ভাঙ্গিয়া আপনার পথ অনেক বা অধিক ক্ষেত্রে করিয়া লয়। আমাদের দেশেও এই বন্যা দুকূল ভাসাইয়া ক্ষিপ্রগতিতে চলিয়াছে। সুরুচির খাতিরে চক্ষু বুজিয়া থাকিলেই তাহা মিথ্যা হইয়া যায় না।

সুতরাং বিবাহ না দিবার বা না করিবার সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন এই—নর বা নারীর এত রকমের চিত্ত-বিভ্রমকর আবহাওয়ার মধ্যে বিবাহ না করিয়া পবিত্র বা ভদ্রভাবে জীবন কাটান সাধারণতঃ সম্ভব কি না? অনেকের ধারণা এই যে, অবিরত কোন কিছুর সহিত বাস করিলে তাহার তীব্রতা কম হয়, তাহা গাত্রসহ হয়। কিন্তু যৌন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ গাত্রসহ সাধারণতঃ হওয়া অসম্ভব। ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, সাধারণ বিবাহিত জীবনে সর্ব্বদা একত্র বাস করা সত্ত্বেও। অসভ্য নগ্ন জাতির মধ্যেও ইহার ব্যত্যয় ঘটে। সুতরাং 'গাত্রসহ' হইবার বৃত্তি ইহা নহে, তাহা সামান্য চিন্তা করিলেও বুঝা যাইবে। শুধু বিধি অনুকূল হইলেই নিমেষের ভুলেও মানুষ অনেক প্রবৃত্তির কার্য্য করে।

বিবাহ না করিয়া সংযম পালন করার অর্থ—জীবন-ব্যাপী স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করিয়া জীবনকে মরুভূমে পরিণত করা। ইহা কাহারও মনোমত হইতে পারে না।

প্রত্যেকেই জানে, বিবাহ-জীবন অনেক ক্ষেত্রে সুখকর হয় না, ইহার মধ্যেও বিস্তর গলদ আছে এবং আরও ভীষণ গলদসমূহ আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু ইহা কি মন্দের ভাল নয়? ইহা অপেক্ষা সব দিক্ যথাসাধ্য বজায় রাখিয়া উৎকৃষ্টতর পন্থা আর সাধারণতঃ কি আছে? বিবাহ না করিয়া জীবন কাটাইতে অনেককে হয় এবং তাঁহারা কেহ কেহ পবিত্র ভাবেও জীবন কাটাইতে পারেন, সত্য কথা। বিধবাদের পবিত্রভাবে জীবন কাটাইতে

হয় সত্য কথা। কিন্তু বিধবা ও কুমার-কুমারীর কথা একই নহে।

তাহার উপর আজ দুরন্ত প্রলোভন চারিদিকে দিগ্বিজয় যাত্রা করিতেছে দেখা যায় ; তাহাতে মানুষের মন অনেক ক্ষেত্রে জর্জ্জরীভূত হইয়া আছে। কাজেই মানুষ আজ শতমুখে নিজেকে উদ্দাম কামনাস্রোতের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া গৌণ বা মুখ্যভাবে তাহার তৃপ্তি সাধন করিতেছে। নৃত্য-গীত, সিনেমা-থিয়েটার, নভেল, আর্ট ইত্যাদি সকলই আজ এই জাতীয় খোরাক যোগাইতেছে। সুতরাং বয়সের ধর্মে আদিম বৃত্তিকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা শতকরা ৯০-৯৮ জন লোকের নাই। ইহার ফলে অন্য কিছু না ঘটিলেও homosexual, auto erotic বা অন্য প্রকার perversions ঘটে। ১০।১৫ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের মেয়েরা অল্প বয়সে বিবাহিত হইত বলিয়া এবং ঘরের মধ্যে আটক থাকিত বলিয়া এই সব জানিবার শিখিবার বড় একটা সুযোগ পাইত না, কিন্তু আজ ? অথচ কয়জন পিতামাতা ইহা জানিতে পারেন ?

জগতে কোন রাষ্ট্রশক্তি আটক, সাজা ও শাস্তি বন্ধ করিতে পারে না ; কোন সমাজই শাসন ভিন্ন থাকে না ; কোন সংসারই বা কোন প্রতিষ্ঠানই discipline ভিন্ন দুই দিনও চলিতে পারে না ; আইনকানুন সর্ব্বত্রই করিতে এবং কার্য্যে লাগাইতে হয়, নচেৎ উচ্ছৃঙ্খলতা আসে। আমেরিকা বা ইংলণ্ড স্বাধীন দেশ, কিন্তু সেখানেও লোকাচার সমাজ ও বিধি-নিয়মের অধীন ; আমেরিকাতেও উত্তরোত্তর গুপ্ত ব্যভিচার, বিবাহ-বিচ্ছেদ, ভ্রূণহত্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ভিন্ন কমিতেছে না।

আজ আমরা সদ্বংশ, স্বধর্ম, স্বভাব, চরিত্র কিছুই না মানিয়া সকল ছেলেমেয়েদের একত্র মিশিতে দিতেছি। অন্তঃপুরমধ্যে কেউটে সাপের বিষের চেয়ে উগ্রবিষ নভেল-সিনেমা-আর্টের মধ্য দিয়া অবাধে ছড়াইতেছি ; হুজুগ, স্পোর্ট, নৃত্য, ষ্টেজ, মিটিং, পার্টি, সান্ধ্যভ্রমণ প্রভৃতির অজুহাতে মোটরযোগে সহরের বাহিরে দুই এক ঘণ্টার জন্য কার্য্যবিশেষে যাত্রা করিতে শিখিতেছি ; আমরা প্রকাশ্য স্থানে মাত্রাজ্ঞানহীন হইয়া কাজ করি বা কথা বলি ; Balzac, Maupassant, D. H. Lawrence-এর পুস্তকাদি ও Panine জাতীয় পুস্তক পাঠ করা অত্যাবশ্যক মনে করি। আর্টের অজুহাতে বিদেশীয় ভাবসমূহ দেশীয় ছাঁচে ফেলিয়া লালসাকে নগ্ন ও জ্বলন্তভাবে দেখাই ; ধারকরা ভাব-ভাষায় উপন্যাস লিখি ; যে যত স্বার্থপর বেশী, হামবড়া, বেপরওয়া, সংসার বা সমাজ-ধ্বংসকারী চরিত্রহীন, তাহাকেই তত মৌলিক বাহাদুর বলিয়া ভাবিয়া দেই, তাহার কথা ও কার্য্যের অনুকরণ প্রয়োগ হই। যাহার যত বাক্চটক ও গর্ব্ব তাহাকেই বড় বলি। প্রকৃত সংযমী, দরদী, সরল, বিনয়ী, বাহ্যাড়ম্বরশূন্য জীবনে শান্তি ও গভীরতা-প্রয়াসী আন্তরিক লোকদের "মর", "বোর", "জানওয়ার" বলি, অগ্রাহ্য বা ঘৃণা করি। তাহাদের নাম শুনিলেই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলি, সে অনুদার বা ভণ্ড। দরদ ও নীতিধর্ম্মে পদাঘাতকারী ধনী বা "successful" ব্যক্তিদের পদলেহন করি, তাহাদের অনুকরণ করিতে পারি না বলিয়া আক্ষেপের সীমা থাকে না। কাজেই জগৎ দানবীয়ভাবে পুরিয়া গেল, প্রকৃত সাধু লোকালয় ছাড়িয়া পলায়ন করিল। কিন্তু লোক দেখাইয়া যতই কেন না আমরা কেউ-কেটা সাজি, বাহাদুরী করি, "মনের অগোচর পাপ নাই", অন্তরনিবাসী শুভাশুভ জীবন-দেবতার কেহই চক্ষে ধূলা দিতে পারেন না।

এই নিদারুণ সঙ্কটে ছেলেমেয়েদের কাছে যদি কেহ প্রত্যাশা করেন যে, তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে না, অথবা পথভ্রষ্ট হইলেই বা কি এমন ক্ষতি হইল, তবে কি তিনি বাতুল নহেন বা নির্বোধ নহেন ? এই বিরক্তিকর সত্যের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া দূরে সরাইয়া রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু বিষ্ঠা মাখিলেও যমে ছাড়ে না। বিশেষ করিয়া আজ যখন ছেলেরা কোন বাধাই মানিতে চাহে না, তখন তাহাদের সহচরী বা দোসর মেয়েরাই বা মানিবে কেন ?

মনীষীদের মত এই যে, আজ ও দেশে নারীই দাম্পত্য-ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তিনী হইয়াছে, কারণ তাহাদের পণ এই যে, তাহারা কোন বিষয়েই পুরুষের কাছে হার মানিবে না, সুতরাং আজ তাহারা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষকে seduce করিতেছে, পুরুষ ভড়কাইয়া গিয়াছে (Shaw, Ellis, Lindsey)। নারী আজ তাহার উন্নততর পবিত্রতর

নিঃস্বার্থ প্রেমের বেদী হইতেই সাগ্রহে স্বেচ্ছায় নামিয়া আসিয়া, পুরুষের মত ব্যভিচারী হইয়া, পুরুষেরই মত সমাজহস্তে অব্যাহতি পাইতে চায়। নর এবং নারীর যৌনব্যাপারে নৈতিক মাপকাঠি এক করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া (to abolish "double standard" of sex-conduct) নর-কে স্বকীয় উন্নত বেদীতে না উঠাইয়া নিজেই নামিবার জন্য ব্যাকুল। পুরুষের জঘন্যতর ইতরতর ভূমিতে নামিয়া নারী আজ সাম্যবাদের জয়ঘোষণায় পঞ্চমুখ। ইহাই প্রকৃত sex-equality, অর্থোপার্জ্জন, রাজনৈতিক সমতা ইত্যাদি ইহার অনুচর মাত্র (Lindsey)। ইহাতে নারীর কত বড় আদর্শ, কত সার্ব্বজনীন মাতৃত্ব ও প্রেম আজ ধূলার সহিত মিশান হইতেছে, মোহে গর্ব্বে ভুলিয়া আজ কেহ দেখেন না বলিয়াই বুঝেন না।

এইরূপে নারী যখন ছিন্নমস্তার ন্যায় স্বহস্তে আপনার মুণ্ড আপনি কাটিয়া, আপনার শির, মা-কালীর মত, আপনার পায়ে দলিত করিতে উল্লাস ও উৎসাহ দেখাইতে জগদ্ব্যাপী আয়োজন করিতেছে, তখন তাহার শুভকামীগণ কিসের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিবেন? ধর্ম্ম, নীতিজ্ঞান, লোক-ভয় ও সতীত্বের দোহাই দিয়া? না, আপন আপন মনের বল বা বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে দিয়া? আজ প্রৌঢ় বৃদ্ধ পিতামাতাই ধর্ম্ম মানেন না বা ধর্ম্মাচরণ করেন না, ছেলেমেয়েদের ভগবানকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, পূজা, প্রার্থনা করিতে শিখান না। শুধু মুখের কথায় কিছু কাজ হয় না—"আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখায়", "চাপরাশ না থাকিলে কেহ মানে না" ধর্ম্মজীবনে ইহাই সত্য। সুতরাং ছেলেমেয়েরা যদি নাস্তিক হয়, পিতামাতাই তাহার জন্য দায়ী। আবার বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অসংযম, অবিবেচনার কার্য্য করার নমুনাও বিরল নহে, কিন্তু ছেলেমেয়ে বয়সের দোষে অন্যায় করিলে তাহাকেই দোষ দেওয়া হয়। সাধে কি ছেলেমেয়েরা আজ কাহাকেও মানিতে চায় না, সকলকে সুবিধাবাদী বলে? আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার দোষে অথবা আলস্যের জন্য ছেলেমেদের আমরাই নাস্তিক তৈয়ার করিয়া ফেলিতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই পাপের ফলভোগ ছেলেমেয়েরাই করিবে এবং করে। কিন্তু অনেক সময় আমাদের ইহজীবনেই এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যখন এরূপ হয়, তখনও আমরা ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাজি। সাধে কি তাহারা আমাদের প্রতারক বা ভণ্ড মনে করে? এই ত গেল ধর্ম্মের কথা। এখন নীতিজ্ঞান বিষয়ে দেখা যাউক। আজিকার যুক্তি এই যে, নীতিজ্ঞান জগতে কোথাও এক নহে, ইহার সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন হয়, সুতরাং ইহা আপন আপন সুখ-সুবিধামত ধার্য্য হয়। ইহার উপর নির্ভর করা ধর্ম্ম ব্যতীত হয় না—অন্ততঃ সাধারণের পক্ষে। কিন্তু ধর্ম্মই যখন ছেলে-মেয়েরা মানিতে সাধারণতঃ চায় না, তখন নীতির স্থান কোথায়? ইহারই প্রকৃষ্ট ফল আধুনিক তরুণ তরুণী এবং নারীর বিদ্রোহ।

লোকভয় যে আজ নাই, তাহাও এই দুই বিদ্রোহ বুঝিতে গেলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—বাস্তবিক লোকাচার সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্যই এই দুই বিদ্রোহের সৃষ্টি। গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা আজ ঘরে ঘরে, সর্ব্বত্র প্রকাশ্যে ইহার ব্যবহার প্রচার হইতেছে। সুতরাং অবাধে বেপরওয়া ভাবে যৌনক্রিয়া সাধিত হয়। কাজেই বাপ-মা ত' বহু-দূরের কথা, এসব ব্যাপার কাকে-বকেও ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে না। বাকি থাকে লজ্জা-সরম। কিন্তু তাহাও আমরা সহস্র রকমে স্বহস্তে ঘুচাইয়া দিয়াছি, চক্ষু খুলিলেই তাহার অগাধ অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। লজ্জাকে আমরা নির্লজ্জের মত লজ্জা দিয়াই তাড়াইয়াছি। আরও বাকি থাকে মনের বল ও বিবেচনা-বুদ্ধি? Ibsen, Bernard Shaw, Lindsey প্রমুখ লেখকগণ যৌনটানের ব্যাপার বিবেচনা-বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিতে বলিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টভাবে ইহাও দেখাইয়াছেন যে, যৌন বিষয় যতদূর সম্ভব জ্ঞান দিয়া ইহার সমূহ বিপদ ও পরিণাম বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক; নচেৎ বুদ্ধি-বিবেচনা কোন ফল দেয় না। কিন্তু Lindsey এবং Wells স্পষ্ট করিয়া এ কথাও দেখাইয়াছেন যে, যৌন বিষয়ে জ্ঞান ছেলেমেয়েদের দেওয়াও সমূহ বিপজ্জনক, কারণ তরুণ-তরুণী স্বভাবতঃই অনুসন্ধিৎসু, কিশোর-কিশোরী উভয়েরই কিশোরী ও কিশোরের দেহ বিষয়ে অদম্য অনু-সন্ধিৎসা থাকে। মুখে নানাবিধ যৌন বিষয়ে উপদেশ

পাইয়া কার্য্যতঃ তাহা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা উক্ত বয়সে নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং সুপ্ত কুকুরকে জাগান বিপজ্জনক, "let sleeping dogs lie." আবার তরুণ-তরুণীর অভিজ্ঞতা জীবনে কতটুকু? আদিম বৃত্তির মোহ সকল মানুষকেই উন্মত্ত করিতে সক্ষম, যোগাযোগ ঘটিলে ইহাকে কোন বুদ্ধিই প্রায় ঠেকাইতে পারে না। ইতিহাস ও দৈনন্দিন জীবনে ইহা যথেষ্ট দেখা যায়। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করা অর্থে ভগ্ন যষ্টির উপর করা মাত্র নহে কি?

আবার সর্ব্বোপরি ব্যভিচার আজ পাপ বলিয়া গণ্য ত নহেই—ইহা অতি সামান্য ব্যাপার এবং উপহাসের কথা মাত্র। স্বামী-স্ত্রী অথবা অবিবাহিত ক্ষেত্রে বাপ-মা যাহারই বুকে এই ব্যাপারে হাঁড়ী চড়ুক—আধুনিক ন্যায় বিচারে সেইই দোষী ঘৃণ্য অপদার্থ। ব্যভিচারী ব্যক্তি আজ নির্দ্দোষ, অনেকেই তাহাকে তারিফ করে। সতীত্বই আজ "জঘন্য, পচা নক্কারজনক" বৃত্তি, আজ ব্যভিচার সর্ব্ব-দোষ-শূন্য, সর্ব্ব সুখের আকর, পরম রমণীয় পুলকপ্রদ আমোদের চরম দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত মত আজ জোর গলায় শিখান, শোনান, দেখান ও বোঝান হইতেছে। যার কপাল ভাঙ্গে, সেইই সকলের শেষে ব্যাপারটি জানিতে পারে। সুতরাং কিসের জোরে আজ বিবাহ না দিয়া ছেলেমেয়েদের ভদ্রভাবে থাকিতে দিবেন?

আরও সাংঘাতিক কথা এই যে, আত্মীয়-স্বজন, যাহাদের বাস্তবিক রক্ষক হইবার কথা, তাহারাই উত্তরোত্তর অধিকক্ষেত্রে ভক্ষক হইতেছে। চারিদিকে উদ্দাম উত্তেজনার বশে অধিকদিন বিবাহ না করিয়া, ধর্ম্ম ও নীতি জীবন হইতে বিতাড়িত করিয়া, ছাগবৃত্তিবশে আজ অনেক ঘরে এইরূপ পাত্রপাত্রী, স্থান-অস্থান-ভেদলুপ্ত হইয়া সংসার দগ্ধ করিতেছে। ইহার ফল শুধু একটি মাত্র সংসারে আবদ্ধ থাকে না, অনেক সংসারে বিনাদোষেও বিষ সঞ্চার করিতেছে। বাপ-মাও অনেক ক্ষেত্রে গৌণ ভাবে রক্ষক হইয়াও ভক্ষক হইয়া পড়েন। তাঁহারা দুরবস্থার চাপে, লোকলজ্জাভয়ে বা ক্ষমতাহীনতায় স্ব স্ব অপূর্ণ সাধ বা মতাদি ছেলেমেয়েদের মধ্য দিয়া, vicarious satisfaction গৌণ ভাবেই তুষ্ট করিতে চাহেন। তরুণ-তরুণীসুলভ মনোভাব প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার পক্ষে অনেক সময় নিতান্ত বিসদৃশ বা সাংঘাতিক হইতে পারে। অনেক স্থলে ইহা নিজেদের স্বার্থপরতা বা অবস্থার উপর টেক্কা দিবারই নামান্তর মাত্র হয়। ছেলেমেয়েদের উপর দরদ থাকিলে অনেকেই দেখিতেন যে, তাহাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা না করিয়া অসংখ্য সর্ব্বনাশী প্রলোভনের মধ্যে অসম্ভব স্নায়ু-চূর্ণকারী সংঘর্ষের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়াতে আত্মপ্রসাদ লাভ ভিন্ন অন্য কিছু শুভ হয় না। মেয়েরা অধিক স্নেহশীলা, ভাবপ্রবণ, দরদী ও নিঃস্বার্থপর বলিয়াই তাহাদের বিপদ বেশী। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই সব কারণেই নারী অধিক ক্ষেত্রে পুরুষের প্রলোভনে পড়ে (McDougall)।

আজ এই সমস্ত কথা বলাও বিপজ্জনক। কারণ আজ নারী পর্য্যন্ত জোর গলায় বলিতেছেন—ছেলে, মেয়েদের ঠেকিয়া-ঠকিয়া পোড় খাইয়া "মানুষ" হইতে দাও। ইহা অনেক ক্ষেত্রে ভাল কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বাঘের মুখে সারস পাখীর ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া হাড় বাহির করার গল্প সকলেই জানেন। কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, বাঘের মুখের মধ্যে কাঁচা মাথাটা প্রবেশ করাইয়া দিয়া বাঘের দাঁতের জোর পরীক্ষা করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে। সকলের ক্ষমতা বা বুদ্ধি সমান হইতে পারে না। সকলকেই একই উপায়ে "মানুষ" করা যায় না। ঠেকিয়া-ঠকিয়া অর্থাৎ গুঁতা, অপমান অর্থকষ্ট, স্বাস্থ্যহীনতা ইত্যাদিতে প্রতিপদে ঠোক্কর খাইয়াও আমরা "মানুষ" হইতে পারিলাম না এটা মনে থাকে। আমরা প্রত্যেকে জীবনে এমন অনেক কাজ করি, যাহার জন্য বারংবার ঠকি, বারংবার ঠেকি, তবুও সেই কাজ করিতে ছাড়ি না, কাজেই "মানুষ" আমরা হইতে পারিলাম না।

এ যাবৎ যাহা বলা হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসকে ভিত্তি করিয়াই বলা হইল, তথাপি প্রগতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনেকের পছন্দ না হইবার কথা। আমরা বিশ্বাস করি যে, আজ অমৃতবোধে আমরা আকণ্ঠ বিষপান অনেক বিষয়ে করিতেছি। অগতির গতি আমাদের সমস্ত জাতিকে আত্মহত্যা হইতে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা করিয়া পরিসমাপ্তি করিলাম।

অনেক দুঃখেই আজ এই কথা বলিতে হয়। যে দেশে

আদর্শ ছিল দরিদ্রকে নারায়ণ-বোধে সেবা করিতে হইবে, যে দেশে মনে করা হইত, ভিক্ষুকই দাতাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া নারায়ণ-সেবার সুযোগ দেয়, যে দেশে বলা হইত, যে হরিনাম শুনায় তাহার তুল্য দাতা নাই (ভিক্ষুক হরিনাম শুনাইয়াই ভিক্ষা চাহিত), যে দেশে স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণীর আদর্শে গঠিত হইত, সহশায়িনী রূপে নহে; যে দেশে স্বামীকে শুধু একটি আদর্শ বলিয়াই মনে প্রাণে ধারণা করিবার ও করাইবার ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং সখ্য-ভাবের কথা গৌণ ছিল, মুখ্য ভাবে ধরা হইত না; যে দেশে স্বামী-পুত্রের সেবা করার মধ্যে জীবনের আদর্শ বলিয়া নারীজীবন গঠন করা হইত, এখন তাহার পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা ও ব্যবস্থা হইতেছে।

কিন্তু জগতের কোথাও এই নূতন ব্যবস্থায় নারী প্রকৃত সুখী হইতে পারিয়াছে বলিয়া জানা যায় না, কারণ ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, প্রায় সকল নারীরই মনে একটা অতৃপ্ত অসন্তোষ ও গুমরানি আছে, মনের মধ্যে একটা খচ্ খচ্ আজীবন আছে। নারীত্ব বা মাতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ, বিস্তৃতি, পরিণতি ভিন্ন ইহা মিটিতে পারে না, নারীজীবন সার্থক হইতে পারে না, এ কথা আজ পাশ্চাত্য ভাবুকেরাও মানিতেছেন। অথচ আমরা যে মহান্ মাতৃমন্ত্র চিরদিন সার্থক করিতে পারিয়াছি—সে-কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কাজেই অনেক দুঃখেই বলিতে হয়, আজ কোথায় আমরা চলিয়াছি, একবার স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, কত শত প্রকারে আমরা খাল কাটিয়া কুমীর আনিয়া তাহারই উদরে স্থান পাইবার জন্য জয়যাত্রা সুরু করিয়াছি। দুর্ব্বল স্নায়ু, শরীর, মন ও দেহে আত্ম-হত্যার পথে বাজী রাখিয়া দৌড় দিতেছি।

চাতক

—পার্শি ব্যাইশী শেলী

অভি—নন্দি তোমা ওগো—নন্দ প্রাণে,
তুমি—পক্ষী নহ উঠি—স্বর্গপানে
নীচে—দিতেছ ঢারি তব—কল্লঝারি
স্বত :—উচ্ছ্বাসে অবারিত মদির গানে।

উঠ—উর্দ্ধপানে আরও—উর্দ্ধাকাশে
ত্যজি'—মর্ত্ত্যভূমি,— ধূম—অগ্নি ভাসে,—
ঘন—নীলাম্বরে তব—পক্ষ নড়ে
আরও—গান গাহি উঠি যাও উর্দ্ধ আশে।

ঐ—দিবস রাগে ঝলে—স্বর্ণ আলো
থির—জলদে ভাসি তাহা—শোভিছে ভালো
তুমি—উপরে ভাস আর—উছল হাস
যেন—অকায়া আনন্দের ধাবন কাল।

ম্লান—সন্ধ্যাকালে নীল—লোহিত মেলা
মেশে—তোমারি পাশে বায়ু—সাঁতার বেলা,
যেন—স্বর্গতারা জল—দিবাতে হারা,
রহে—দৃষ্টি আড়ালে, শুনি সুরের খেলা।

যেন—রজত বাকা তারই—তীক্ষ্ণ শর,
লাগি—উষার আলো হয়—ক্ষিপ্রতর
মোরা—দেখিতে গেলে প্রায়—অদেখা মেলে
তবু—বুঝি মোরা আছে সে যে গগন' পর।

সারা—মর্ত্ত্য, বায়ু ভরা—তোমার সুরে
ঐ—নিশায় নভ যথা—শূন্য দূরে,
শুধু—মেঘের পাশে চাঁদ—জ্যোছনা হাসে
আর—প্লাবন বহিয়া যায় স্বর্গপুরে।

তোমা—কি রূপে চিনি ওগো—অপরিচিত?
মেঘ—ইন্দ্রধনু হ'তে—অনুপনীত
ঐ—ঝলক ঝল তার—কিরণে ঢল
হেথা—বারির কণাটি, মত তোমার গীত।

যথা—কবি জীবনী থাকে—অপরিচয়ে,
তার—চিন্তা মোহে মধু—গানের জয়ে,
গাহে—উচ্ছ্বসিত গীত—মঞ্জলিত
যাহে—ভুবন প্রবর্ত্তিত করুণাময়ে।

যথা—কিশোরী মেয়ে　　উচ - বংশজাত
রাজ—হর্ম্ম্য' পরে　　গাহে—গহীন রাত,
শুধু—করুণ ধারে　　চিত—প্রণয়ভারে,
　　মধু—প্রেমের গানেতে ভাসে কুঞ্জসাথ।

যথা—খদ্যোতিকা　　বহি—স্বর্ণ পাখা,
বসি'—নীহারকণা　　দেয়—স্বর্গ মাখা
নব　রঙের খেলা　　আঁখি—আড়ালে ফেলা,
　　ঐ—কুসুমেতে কিশলয়ে রয়েছে ঢাকা।

যথা—গোলাপ কুসুম　　কোন—কুঞ্জাবৃত
ধন—সবুজ পাতে　　করি—নিজেরে ধৃত,
ঐ—মলয় বায়ে　　তার—গন্ধ ধায়ে
　　মিলি—গন্ধবহর সাথে তৃপ্তি নীত।

ধ্বনি—মাধবীধাবা　　ঝল—তৃণের' পরে
ফোটা—কুসুমকলি　　ঐ—বৃষ্টি ঝড়ে,
যাহা—মধুর রস　　দেয়—জল পরশ,
　　তব—সঙ্গীত ধ্বনি আরও উচ্চ' পরে।

ওগো—চিত্ত কি বা,　　তুমি—পক্ষী মোরে
মধু—চিন্তাধারা　　দেহ—শিক্ষা ধ'রে,
নর—প্রেমের গীতে,　　কি বা—মদিরা প্রীতে,
　　নাহি—বহিল নন্দ, তব ঐশী ভ'রে।

ঐ—রতির গীতি　　কি বা—বিজয় গান,
এলে—তোমার পাশে　　হবে—ব্যর্থ মান,
তাহে—অভাব রহে—　　তারে—অজানা কহে,
　　শুধু—হৃদয়ে চিন্তি, মোরা জেনেছি জ্ঞান।

ওগো—কিসের তরে　　তব - ঝরণা ঝরে
চিত—নন্দ হতে　　ঐ—গানের স্বরে ?
নগ—উর্ম্মি, ভূমি,　　কি বা—গগনে চুমি,
　　কি বা—আপন প্রেমের মাঝে, দুঃখ হরে ?

তব—স্বচ্ছ গীত　　তারই—স্বচ্ছধারা,
নাহি—ক্লান্তি তাহে　　অব—সন্ন যারা,
কোন'—দুঃখছায়া　　কভু—পাতেনি মায়া,
　　প্রেম—বিষাদ পূর্ণতাতে হওনি সারা।

তুমি—চেতন অচে-　　তনে—মৃত্যু জ্ঞান,
ভাব—গভীর ভাবে　　তারি - সত্য গান,
মোরা—মরত প্রাণী　　তার—কিছু না জানি,
　　মধু—তোমার গানের স্রোতে প্রবহমান।

মোরা—অগ্রে পিছে　　শুধু - দৃষ্টি ধরি,
সীমা—অতীত হ'লে　　তবে—দুঃখ কবি,
ঐ—চিত্ত গান　　তার—করুণ প্রাণ,
　　আর—সুমধুর সঙ্গীতে বেদনা ভরি।

যদি—নিন্দি মোরা　　কভু—গর্ব্ব,ঘৃণা,
যদি—ভয়েরে দূরে　　ফেলি—বাজাই বীণা,
যদি—নয়নবারি　　মোরা—কভু না ঢারি,
　　তবু—মোদের কলগান বহিবে হীনা।

কবি—ছন্দ গীত　　ধ্বনি—ঝঙ্কারিত,
কত—গ্রন্থ মাঝে　　জ্ঞান—সুনিদ্রিত,
ওগো—তাদের চেয়ে　　তব—স্ফুরটি পেয়ে
　　হবে—কবিরা তোমার রসে উচ্ছ্বসিত।

মোরে—শিক্ষা দেহ　　তব—নন্দ আধ,
যাহা—চিত্ত জানে　　মধু—ধ্বনিছে নাদ;
মোর—বদন ফুরে　　ঐ—পাগল সুরে
　　ব'বে—সঙ্গীত মোর, সবে শুনিবে সাধ

অনুবাদক—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-জগৎ

প্রস্তর যুগের মানুষ
ঃ বুশম্যান

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় কালাহারি মরুভূমি এবং ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে-বুশম্যান জাতি বাস করে। বৈজ্ঞানিকদের মতে এই বুশম্যান-জাতি প্রস্তরযুগের মানুষ।

বুশম্যান।
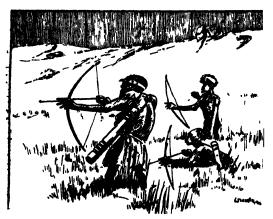
আজ পর্য্যন্ত ইহারা সেই প্রস্তরযুগের অবস্থায় রহিয়াছে, সভ্যতার আলোক ইহাদের কিছুমাত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে নাই, সুতরাং নৃতত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহাদের আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের বিশেষ মূল্য আছে। জনৈক বৈজ্ঞানিক ইহাদের জীবন্ত 'ফসিল' বলিয়াছেন।

বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যতার সংঘাতে ইহারা অত্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু জাতি হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে সমগ্র আফ্রিকায় কয়েক শতের অধিক বুশম্যান পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। পুরাকালে উহারা যে সকল স্থানে শীকার করিয়া জীবন ধারণ করিত, তাহা ক্রমে হুটেন্‌টট জাতির অধিকারে আসে। পরে বাণ্টু এবং বর্ত্তমানে য়ুরোপীয়গণ সেই স্থানে আধিপত্য করিতেছে। ইহার ফলে ইহারা ক্রমশঃ এমন স্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, সেই সকল স্থানে শীকার পাওয়া কঠিন এবং জলের অত্যন্ত অভাব। সুতরাং ইহারা যে বর্ত্তমানে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই; বরং ইহাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

সংপ্রতি ডোনাল্ড বেন নামক জনৈক শীকারী ও আবিষ্কারক ইহাদের নিশ্চিত বিলোপ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুশম্যান জাতি সম্পূর্ণরূপে বন্ধনহীন, ইহাদের কোন দেশ নাই, কোন ধর্ম্মবিশ্বাস নাই এবং ইহাদের রক্ষা করিবার জন্য কোন গভর্ণমেন্টের শিরঃপীড়া নাই। মিঃ বেন কালাহারি মরুভূমিতে একটি 'রিজার্ভ' বা উহাদের জন্য বিশেষ ভাবে রক্ষিত ভূখণ্ড জোগাড় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই খানে বাস করিলে বুশম্যানেরা বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও কেপ প্রদেশের বাণ্টুদের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

তাঁহার পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রথম চেষ্টা স্বরূপ, মিঃ বেন কালাহারির মধ্যভাগে একটি অস্থায়ী শিবির স্থাপন করেন এবং বহু কৌশলে এবং ধৈর্য্যের ফলে প্রায় এক শত বুশম্যানকে এখানে আনিয়া রাখিতে সমর্থ হন। এই দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া হয় শতজীবী এক বুশ-ম্যানকে—এই বৃদ্ধ এখন 'বুড়া আব্রাহাম' নামে পরিচিত। এই শিবিরে শীকারের সুবিধা করিয়া দিয়া এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মিঃ বেন ইহাকে একপ্রকার বুশ-ম্যানের স্বর্গ করিয়া তোলেন, কারণ বুশম্যানেরা সাধারণতঃ অত্যন্ত কষ্টে জীবন যাপন করে, প্রচুর শীকার প্রায়ই

তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া উঠে না। মিঃ বেন ক্রমশঃ বুশম্যানদের অত্যন্ত বিশ্বাসের পাত্র হইয়া উঠেন এবং তখন বুশম্যান সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি উইটওয়াটারস্রাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ করেন।

বুশম্যানদের প্রাথমিক সঙ্কোচ ও ভয় কাটিয়া যাইবার পর, অধ্যাপকরা তাহাদের ফটো লইলেন, মুখের ছাঁচ লইলেন, শরীরের মাপ লইলেন এবং বুশম্যানদের নৃত্য দেখিলেন ও গান শুনিলেন।

বুশম্যানেরা দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে চার ফুট হইয়া থাকে, সম্ভবতঃ ইহারাই পৃথিবীর খর্ব্ব-তম মানুষ। ইহাদের ওজন সাধারণতঃ এক মণের বিশেষ উপরে যায় না। জন্মকাল হইতে রৌদ্রে পুড়িয়া ইহাদের গাত্রচর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া থাকে এবং প্রচণ্ড রৌদ্রে মরু-অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ানর ফলে ইহাদের পায়ের তলায় অত্যন্ত কঠিন কড়া পড়িয়া যায়। ইহারা কখনও এক স্থানে স্থির ভাবে বাস করে না, শীকারের সন্ধানে দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়। অনেক সময়, ভাল শীকার মেলে, এরূপ স্থানে উহারা কিছুদিন থাকিয়া যায় এবং গাছের ডাল ও ঘাস দিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করে। মরুভূমি অঞ্চলে জলের অভাব বলিয়া বুশম্যানেরা উটপাখীর ডিমের খোলায় পানীয় জল ভরিয়া বালির ভিতর পুঁতিয়া রাখে। জলের অভাবে বুশম্যানেরা এতই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা জীবনে কখনও স্নান করে না, প্রচুর শীকার পাইলে সর্ব্বাঙ্গে চর্ব্বি মর্দ্দন করে।

আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহ করা ব্যতীত জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য বুশম্যানদের নাই। এই হিসাবে ইহারা বন্য জন্তু অপেক্ষা উন্নততর নহে। মরুভূমি অঞ্চলে দুই এক প্রকার গাছ হইতে ছোট ছোট ফল এবং এক প্রকার তরমুজ ব্যতীত আর কোন উদ্ভিজ্জাত খাদ্য পাওয়া যায় না। এইগুলি ছাড়া ইহারা প্রধানতঃ হরিণ শীকার করিয়া খায়। বিছা ও নানা প্রকার পোকা, উই ও উইয়ের ডিম এবং পঙ্গপাল উহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। উহারা কখনও দল বাঁধিয়া থাকে না, কারণ একই স্থানে বহু লোকের খাদ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

শীকার করিবার জন্য উহারা তীর ও ধনু ব্যবহার করে। তীরের ফলাগুলি পাথরের এবং তাহাতে কাঁচপোকা
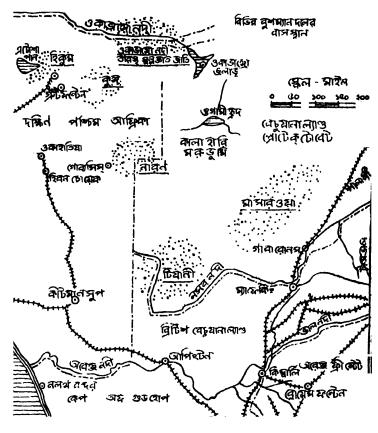
বিভিন্ন বুশম্যান জাতির বাসস্থান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এই মানচিত্রে দেখান হইয়াছে, জাতিগুলির নামের নীচে রেখা টানা আছে।

জাতীয় এক প্রকার পোকা হইতে তৈয়ারী বিষ লাগান থাকে। কোন শীকার দেখিলেই বুশম্যানেরা তাহাকে অনুসরণ করে এবং কাছাকাছি আসিলেই তীর নিক্ষেপ করে। উহাদের ধনুতে অধিক দূর তীর ছোড়া যায় না। তীরের আঘাতেই শীকার মরে না, কারণ বিষের ক্রিয়া অত্যন্ত ধীরে ধীরে হয়। সুতরাং তীর নিক্ষেপ করিবার পর অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শীকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতে হয়। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েরা এবং শিশুরাও চলিতে থাকে। অবশেষে বিষের ক্রিয়ায় শীকার ধরাশায়ী হইলে শীকারী তীরটি ও তীরের সংলগ্ন মাংস কাটিয়া বাদ দেয় এবং তাহার পরে সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ কাঁচা মাংস খাইতে আরম্ভ করিয়া দেয়। খাদ্য সম্বন্ধে ইহাদের কোন বাছ-বিচার নাই; পচা ডিম, সিংহ ও শৃগাল কর্ত্তৃক ভক্ষিত পচা মাংসাবশেষ ইহারা পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়া থাকে।

বুশম্যানদের কোন ধর্ম্ম আছে কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন যে, উহাদের কোন ধর্ম্ম নাই, তবে কুসংস্কার কতকগুলি আছে এবং উহাদের মধ্যে ভূতের গল্প প্রচলিত আছে, সুতরাং উহারা ভূত বিশ্বাস করে। অনেক সময় দেখা যায় যে, উহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলে পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং জীবন্ত ঘাসের উদ্দেশ্যে নাচিয়া থাকে; কেহ কেহ মনে করেন যে, এই প্রকার নৃত্য উহাদের এক প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং উহারা চন্দ্রের উপাসনা করে। নাচের সময় স্ত্রীলোকেরা তাহাদের দেহ এবং মুখ শীকারে মৃত পশুর রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে এবং পুরুষরা মাথায় শৃগালের লেজ এবং পায়ে ঝুমঝুমি বাঁধে। নাচের তাল দিবার জন্য উহারা হাততালি দেয় এবং এক-ঘেয়ে ভাবে কয়েকটি বিশেষ সুরের পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, কখনও কখনও একটি খোঁটায় বাঁধা অথবা ধনুকে বাঁধা তার বাজায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বুশম্যানদের ধর্ম্ম বলিয়া কিছু আছে কি না সন্দেহ, কিন্তু উহাদের দৈনন্দিন জীবনে কয়েকটি পবিত্র হাড় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের দেশে যেমন কোন শুভাশুভ প্রভৃতি দেখিতে হইলে পাঁজির সাহায্য লওয়া হয় এবং পাঁজির সিদ্ধান্ত,—অনেক সময়ই—নির্ভুল বলিযা মানিয়া লওয়া হয়, এই হাড়গুলিও উহাদের সেইরূপ কাজে আসে। এই হাড়গুলির সংখ্যা সাধারণতঃ চারটি, যদিও সময় সময় একসঙ্গে তেরটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কিছু করিবার পূর্ব্বে বুশ-ম্যানেরা পাশার মত এইগুলি ছোড়ে এবং ইহাদের অবস্থান হইতে ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা স্থির করে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বুশম্যানদের সংস্পর্শে বিশেষ আসেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের অনেকের বুশম্যানদের সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা ছিল, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বুশম্যানেরা মোটেই বিশ্বাসঘাতক বা কুটিলপ্রকৃতি নহে, বরং তাহারা অত্যন্ত সরল। তাহাদের মধ্যে আমোদপ্রিয়তা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বালকদের মত তাহারা পরস্পরের সঙ্গে প্রায়ই ফষ্টিনষ্টি করিয়া থাকে। তাহাদের সরলতার সুযোগ লইয়া শহরের লোকেরা সুযোগ পাইলেই তাহাদের ঠকাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে তাহারা বিশেষ ক্ষুব্ধ হয় বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি "সাউথ-ওয়েষ্ট আফ্রিকান কমিশন" বুশম্যানদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "উহারা নিতান্ত অল্প-বুদ্ধি এই মত ভ্রান্ত, উহাদের বুদ্ধিবৃত্তি উহাদের পারি-পার্শ্বিক হিসাবে ভালই বলিতে হইবে। সাধারণের মত এই যে, বুশম্যানরা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাদ্‌পদ মনুষ্য-গোষ্ঠী। কিন্তু এই মত ঠিক নহে, উহাদের শিল্প এবং রূপকথা ভাল স্তরের বলিতে হইবে। ইহা ছাড়া একটি বিষয়ে উহাদের জ্ঞান আছে, যাহা আফ্রিকার অন্য বন্য জাতির জ্ঞান অপেক্ষা সুসংবদ্ধ—এই জ্ঞানটি হইতেছে বিভিন্ন লতাপাতা ও পোকামাকড়ের বিষাক্ততা ও নির্ব্বিষতা সম্বন্ধে।"

পরলোকে মার্কনি

গত ২০শে জুলাই তারিখে জগদ্বিখ্যাত উদ্ভাবক মার্কনির মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল তারিখে ইতালীর বোলোনিয়া শহরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ইতালীয় ব্যবসায়ী, তাঁহার মাতা ছিলেন জাতিতে আইরিশ।

মার্কনির খ্যাতির প্রধান কারণ বেতারের উদ্ভাবক হিসাবে। তাঁহার ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেন। বর্ত্তমান বেতারের

ইতিহাস এবং মার্কনিব জীবনেতিহাস অনেকাংশে পবস্পব জড়িত।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ইংবাজ গণিতবিদ ও পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ জেমস ক্লার্ক ম্যাক্‌স্‌ওয়েল বিদ্যুৎ-তবঙ্গেব গণিতসিদ্ধ প্রমাণ দেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্যুৎ-তবঙ্গেব বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় জার্মান বৈজ্ঞানিক হাৎ‌র্সেব পবীক্ষায়। হাৎর্স ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ কবেন যে, বিদ্যুৎ-তবঙ্গ সাহায্যে 'ইথাবে' কম্পন সৃষ্ট কবা যায়। ইহাব পূর্ব্বে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হিউজ নামে ইংবাজ বৈজ্ঞানিক বিনা তাবে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত অল্প দূরে প্রেরণ কবিতে সমর্থ হন, কিন্তু তাঁহাব পবীক্ষায় তৎকালীন বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশেষ আস্থা স্থাপন কবেন নাই; হিউজও নিরুৎসাহ হইয়া এই বিষযে অধিকদূব অগ্রসব হন নাই।

হাৎর্সেব পবীক্ষাব ফলে বৈদ্যুতিক তবঙ্গ সম্বন্ধে সমগ্র বৈজ্ঞানিক সমাজ কৌতূহলী হন এবং বিভিন্ন দেশে এই সম্বন্ধে পবীক্ষা চলিতে থাকে। যাঁহাবা এই বিষযে গবেষণা কবিতে থাকেন, তাঁহাদেব মধ্যে অলিভাব লজ ও জগদীশচন্দ্র বসু এই দুই জনেব নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

মার্কনি বোলোনিযা বিশ্ববিদ্যালযে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং অল্প বযস হইতেই বিদ্যুৎ তত্ত্ব বিষযে বিশেষ পাব-দর্শিতা দেখান। হাৎর্স ও তাঁহাব অনুবর্ত্তীদেব পবীক্ষা মার্কনিকে বিশেষ প্রভাবিত কবে এবং তিনিও বিনা তাবে সঙ্কেত প্রেবণ কবিবাব চেষ্টা কবিতে থাকেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেব ডিসেম্বব মাসে, লেগহর্ণে ছাত্রাবস্থায থাকিবার সময়ে তিনি বিনা তাবে বৈদ্যুতিক তবঙ্গ সাহায্যে ৩০ ফুট দূবে সঙ্কেত প্রেবণ কবিতে সমর্থ হন। ইহাব অল্প দিন পবেই তিনি ইংলণ্ডে যান এবং ইংলণ্ডেব তদানীন্তন 'পোষ্টমাষ্টাব জেনাবেল' স্তব উইলিযাম প্রিসেব নিকট তাঁহাব উদ্ভাবনা সম্বন্ধে সাহায্য ও উৎসাহ পান।

এ স্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মার্কনিব প্রথম যন্ত্রসজ্জায় তাঁহাব নিজস্ব কোন নূতন আবিষ্কাব ছিল না। বহু বিভিন্ন লোকেব আবিষ্কৃত বিভিন্ন বিষয়ের সাহায্য লইয়া তাঁহাব যন্ত্র-সমাবেশ হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনা বা আবিষ্কার কোন ব্যক্তিবিশেষের উপব সম্পূর্ণ নির্ভব কবে না, পূর্ব্ববর্ত্তীগণেব বহু চেষ্টাব ফলেই নূতন আবিষ্কাব সম্ভব হইযা থাকে। কলিব বিশ্বকর্ম্মা এডিসন বলিযাছিলেন যে, তিনি নূতন কিছু উদ্ভা-বনা কবেন নাই, পুবাতন উদ্ভাবনাগুলি উন্নততব কবিযা-ছেন মাত্র। যে বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং পবীক্ষাসমূহেব উপব মার্কনিব বেতাবযন্ত্র নির্ম্মাণ কবা সম্ভব হইযাছিল, সেগুলি আবিষ্কাবেব দাবী মার্কনি কবিতে পাবেন না বটে,
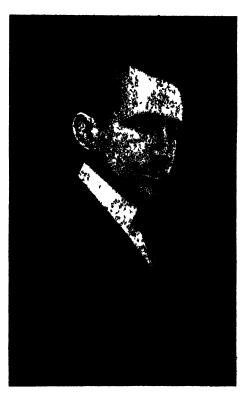
গুলিয়েল্‌মো মার্কনি (১৮৭৪ ১৯৩৭)।

কিন্তু সকলেব সমাবেশ কবিয়া সেগুলি নূতন কাজে নিয়োগ করিবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব মার্কনির এবং এই কৃতিত্ব অল্প মনে করিলে নিতান্ত ভুল করা হইবে।

মার্কনির প্রথম চেষ্টায় বহু সমালোচনা ও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্রমে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর বেতারে প্রথম আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক পার হইতে অপর পারে

সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব হয়। ইহার পর হইতে বেতারের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস।

প্রায় ১৬ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বেতারে টেলিগ্রাফের মত কেবলমাত্র সঙ্কেত প্রেরণ করা যাইত। এই সময় হইতে বিশেষতঃ পি. ডি. ফরেস্‌ট নামক মার্কিন বৈজ্ঞানিকের 'ট্রায়োড ভাল্‌ভ্‌' (triode valve) আবিষ্কারের পর হইতে বেতারযোগে সঙ্গীত এবং শব্দ প্রেরণ করিবার সম্ভাবনা দেখা গেল। বর্ত্তমানে রেডিয়ো অত্যন্ত সাধারণ এবং স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে বোধ হয় বিরক্তি-উৎপাদকও হইয়া পড়িয়াছে।

বর্ত্তমানে বিনা তারে সঙ্কেত, সঙ্গীত ও কথোপকথন ব্যতীত ছবির প্রতিলিপি পর্য্যন্ত প্রেরণ করা সম্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে মাত্র বিশেষ

অবস্থায় পদচালিত গ্লাইডারের একটি দৃশ্য।
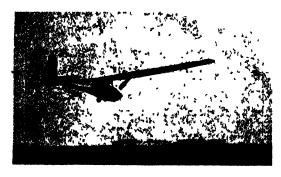
দিকে বেতার-তরঙ্গ নিক্ষেপ করা হইতেছে, ইহাকে beam wireless বলা হইয়া থাকে। এই উপায়ে যে কোন দুইটি বিশেষ দেশের সহিত অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হইয়াছে। বেতার-তরঙ্গ সাহায্যে সমুদ্রে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করা, অন্ধকারে শত্রুপক্ষের জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয় করা, অন্ধকারে নিরাপদে এরোপ্লেন চালান প্রভৃতি বহু বিষয় সম্ভব হইয়াছে। এই সমস্তের মূলে মার্কনির প্রতিভা নিহিত রহিয়াছে।

মার্কনি দেশে ও বিদেশে বহু সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানের জন্য নোবেল পুরস্কার পান এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে 'মার্কেজে' (marchese) অর্থাৎ 'মারকুইস' উপাধি পান।

পদচালিত গ্লাইডার

আকাশে উঠিবার চেষ্টা মানুষ বহুদিন হইতে করিতেছে। আকাশজয়ের প্রাথমিক চেষ্টায় হাতে ও পায়ে ডানা লাগাইয়া পাখীর মত উড়িবার ব্যবস্থা করিবার প্রচেষ্টা হয়। আধুনিক কালে পেট্রল ইঞ্জিনের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশবিহারের চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হইয়াছে, কিন্তু এখনও মানুষ পাখীর মত উড়িবার চেষ্টা ত্যাগ করে নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে, বিশেষতঃ জার্ম্মানীতে ও আমেরিকায় 'গ্লাইডার'-এর বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। গ্লাইডারে কোন ইঞ্জিন নাই, বাতাসের বেগকে কাজে লাগাইয়া গ্লাইডারগুলিকে আকাশে উঠাইয়া রাখা সম্ভব হয়। এই হিসাবে ইহা ঘুড়ির প্রকারান্তর বলা চলিতে পারে। গ্লাইডারের প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহা ইচ্ছামত ঘুরান ফিরান যায় না, বাতাসের বেগ ও দিকের উপর গ্লাইডারের ভ্রমণপথ অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহা সত্ত্বেও গ্লাইডারে প্রায় ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইতালীয় সরকার, কোনরূপ ইঞ্জিনের সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র দৈহিক বলের সাহায্যে যে কেহ ২ কিলোমিটার (সওয়া এক মাইল) পথ অতিক্রম করিতে পারিবে এবং জমি হইতে ১৫ ফুট উচ্চে উঠিতে পারিবে, তাহাকে দেড় হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। জার্ম্মান সরকারও এই বিষয়ে পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন এবং পরীক্ষাগারে কিছু কিছু কাজও এই বিষয়ে হইয়াছে। সংপ্রতি এনেয়া বস্‌সি নামক জনৈক ইতালীয়-আমেরিকান পদচালিত গ্লাইডারে চড়িয়া ইতালীর মিলান শহরে ১ কিলোমিটার (⅝ মাইল) পথ অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ বস্‌সি ইতালী দেশে এরোপ্লেন চালাইবার লাইসেন্স-প্রাপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং বর্ত্তমানে কোন আমেরিকান বিমান কারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট। বিমান-নির্ম্মাণ বিষয়ে মিঃ বস্‌সির বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে।

আলোচ্য গ্লাইডারটিতে দুইটি প্রোপেলার আছে এবং

প্রোপেলারগুলি বাইসাইকেলের মত পেডাল ও চেন দ্বারা ঘুরান হয়। গ্লাইডারটির ডানার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৫১ ফুট লম্বা; ইহার ওজন চালক সমেত ৩৭০ পাউণ্ড। বর্ত্তমানে গ্লাইডারটিকে বৈজ্ঞানিক খেলনা বলাই বোধ হয় সঙ্গত, কিন্তু ইহার উন্নতির ফলে ভবিষ্যতে আকাশ-বিহার হয়ত অত্যন্ত সহজসাধ্য ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হইয়া যাইতে পারে।

রোগীর ব্যবহারোপযোগী শয্যা

আমেরিকার ওহায়ো ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর সি ই শার্প সংপ্রতি এক প্রকার শয্যা উদ্ভাবন করিয়াছেন। যে সকল রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অথবা অন্য কোন কারণে বিছানা হইতে উঠিতে পারে না, ইহা তাহাদের বিশেষ উপকারে আসিবে। এই শয্যার সাহায্যে রোগী ইচ্ছামত উঠিয়া বসিতে অথবা পাশ ফিরিতে পারিবে। রোগীর হাতের কাছে একটি সুইচ থাকিবে। শয্যার নীচে একটি বৈদ্যুতিক মোটর আছে। সুইচ টিপিলে মোটরের সাহায্যে কয়েকটি গিয়ার ও কপিকলের সহায়তায় শয্যাটি বিভিন্ন অবস্থায় রাখা যায়। শয্যাটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে নড়ে, কোনরূপ কম্পন বা শারীরিক অসুবিধা রোগীকে ভোগ করিতে হয় না। ডক্টর শার্প দুই বৎসর চেষ্টা করিয়া শয্যাটি নিখুঁত করিতে পারিয়াছেন।

মনুষ্যদেহ হইতে আলোকসঞ্চার

পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় জনৈকা আলোক-সঞ্চারী স্ত্রীলোকের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সংপ্রতি দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছেন যে, আলোক-সঞ্চারণ সকল মনুষ্যদেহ হইতেই হইয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেক্কারী নামে জনৈক ব্যক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, সম্পূর্ণ অন্ধকারে কিছুক্ষণ থাকিয়া রৌদ্রে হাত বাহির করিয়া কিছুক্ষণ রাখিবার পর পুনরায় অন্ধকারে লইয়া গেলে অন্ধকারে হাতটি দেখা যায়। ইহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোন পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে হোশিজিমা নামে জনৈক জাপানী বৈজ্ঞানিক দেখেন যে মনুষ্যদেহের হাড়, নখ, দাঁত ও উপাস্থি প্রভৃতি কিছুক্ষণ আলোকে রাখিলে ঐগুলি হইতে পুনরায় অন্ধকারে আলোক নিঃসরণ হইয়া থাকে।

তথাকথিত রেডিয়াম ঘটিকাযন্ত্র ঘড়াতে যে স্বয়ংপ্রভ রঙ্ দেওয়া থাকে, এই ক্রিয়া তাহার ক্রিয়ার অনুরূপ। কোন কোন বস্তু সূর্য্যালোক বা কৃত্রিম আল্ট্রা ভায়লেট

রোগীর ব্যবহারোপযোগী শয্যা, মাত্র একটি সুইচ টিপিয়া ইহার অবস্থান ইচ্ছামত করা চলে।

আলোতে রাখিলে ঐ আলো শোষণ করে ও পরে সেই আলো দৃশ্য আলো রূপে বিকীর্ণ করিয়া দেয়। মনুষ্য-দেহের সর্ব্বাংশের যে অনুরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা পূর্ব্বে জানা ছিল না। সংপ্রতি গিসে ও লেটন নামক দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমগ্র মনুষ্যশরীর এইরূপে আলোক বিকীর্ণ করে। তাঁহাদের পরীক্ষায় কৃত্রিম আলোকে ১০ সেকেণ্ড কাল রাখিবার পর দেখা

যায় যে, সমগ্র শরীর হইতে আলোক নিঃসৃত হয়। হাত, দুই হইতে চার সেকেণ্ড এবং নখ, ১০ সেকেণ্ডে অথবা তাহারও অধিক কাল আলোক নিঃবসণ করে। দাঁত নখ অপেক্ষাও অধিক সময় আলোক দিয়া থাকে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্যশরীর ব্যতীত নানাপ্রকার কাঠ, গাছের পাতা, ফুল, বীজ প্রভৃতিও আলোক নিঃসরণ করে।

নিদ্রা ও বিদ্যুৎপ্রবাহ

কয়েক বৎসব হইতে বৈজ্ঞানিকরা বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রয়োগে শরীরের কোন কোন স্নায়ু অবশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে সকল স্নায়ুতে বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়া হয়, সেই স্নায়ুগুলির যন্ত্রণাবোধের ক্ষমতা থাকে না, কিন্তু এই ক্রিয়া যতক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ দেওয়া হয়,ততক্ষণই থাকে। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে আবও গবেষণা করিবার ফলে কালেন্‌ডারভ নামে জনৈক রুশ অধ্যাপক অনিদ্রার প্রতিকার এবং অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি সংজ্ঞালোপকারী ঔষধের প্রয়োগ নিবারণ সম্ভব করিতে পারিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। তাঁহার পদ্ধতিতে নিদ্রাকর্ষণ এবং যন্ত্রণা-বোধের ক্ষমতার অবসান হয় কি না,তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য অধ্যাপক কালেন্‌ডারভ প্রথমে ব্যাঙের উপর বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করেন। একটি ইলেক্‌ট্রোড্‌ মাথায় এবং অপরটি শিরদাঁড়ার অধিষ্ঠানের সহিত সংলগ্ন করিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্‌টি ঘুমাইয়া পড়ে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিবামাত্র ব্যাঙ্‌টি জাগিয়া উঠে এবং উহার কোনরূপ অসুবিধা হইতে দেখা যায় না। পরে অন্যান্য জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক কালেনডারভ কৃত-কার্য্য হন এবং তখন নিজের উপর পরীক্ষা করেন। বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইবামাত্র তিনি জাগিয়া উঠেন; সংজ্ঞা হারাইবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তিনি সামান্য অস্বস্তি অনুভব করেন,কিন্তু জাগিয়া উঠিবার পর তিনি ভালই অনুভব করেন। সংপ্রতি বিভিন্ন রুশ হাসপাতালে এই প্রক্রিয়া পরীক্ষিত হইতেছে।

কৃত্রিম তেজোবিকিরক পদার্থের ব্যবহার

রেডিয়াম ধাতুর আবিষ্কারক মাদাম ক্যুরির নাম সকলেই শুনিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কন্যা ও জামাতা মাদাম ও মঁসিও জলিও কৃত্রিম উপায়ে তেজোবিকিরণের উদ্ভব করিতে সমর্থ হওয়ায় নোবেল-পুরস্কার পাইযাছেন। পূর্ব্বে চিকিৎসার জন্য রেডিয়াম ও রেডিয়াম ইম্যানেশন বা 'র‍্যাডন' ব্যবহৃত হইতেছিল। সংপ্রতি কৃত্রিম তেজোবিকিরক পদার্থগুলি ঐ জন্য ব্যবহার করা যায় কি না, সেই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা জল্পনা করিতেছেন।

জলিও পরিবার পবীক্ষায় (বোরন বোরিক অ্যাসিডেব একটি উপাদান) নামক মৌলিকের উপর আল্‌ফাকণাব সংঘাতে 'বেডিয়ো-নাইট্রোজেন' নামক তেজোবিকিরক পদার্থ পান। রেডিয়াম যেমন স্বতঃই ভাঙ্গিয়া গিয়া অন্য পদার্থে পরিণত হইতেছে,এই রেডিয়ো নাইট্রোজেনও সেইরূপ স্বতঃই ভাঙ্গিযা যায়। ইহা হইতে যে বিকিবণ পাওয়া যায়, তাহা রেডিয়াম হইতে প্রাপ্ত বিকিরণের অনুরূপ, কিন্তু ইহাব অর্দ্ধ-জীবৎকাল (half period বা half life, অর্থাৎ কোন তেজোবিকিরক পদার্থেব অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া গিয়া অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হইতে যে সময় লাগে) মাত্র ১৪ মিনিট, অন্য ক্ষেত্রে রেডিয়ামের অর্দ্ধ-জীবৎকাল বহু সহস্র বৎসর। বর্ত্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে নানা উপায়ে কৃত্রিম তেজোবিকিরণেব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। জলিওদের পরীক্ষায় যেরূপ আল্‌ফা-কণা ব্যবহার করা হইয়াছিল, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণ সেইরূপ নিউট্রন, অথবা ডিউটেরন ব্যবহার করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে নিউট্রন বিদ্যুতাবেশহীন এবং ভারে প্রায় হাইড্রোজেনের সমান; ডিউটেরন বিদ্যুতাবেশযুক্ত ভারী হাইড্রোজেন। বিভিন্ন পন্থায় আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০টি মৌলিক পদার্থকে কৃত্রিম উপায়ে তেজোবিকিরক করা হইয়াছে। এইগুলির অর্দ্ধ-জীবৎকাল কয়েক সেকেণ্ড হইতে ১৪ মিনিট পর্য্যন্ত।

সংপ্রতি ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে 'সাইক্লোট্রন' নামক এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ডিউটেরনের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। একটি বৈদ্যুত চুম্বকের সাহায্যে ডিউটেরনের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া একটি ছিদ্রের ভিতর

দিয়া বাহির হইয়া যায় এবং তাহার পরে ধাতব জানালার ভিতর দিয়া বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। এই পাত্রের মধ্যে সাধারণ লবণ বা অন্য কোন বস্তু রাখা হয়; ডিউটেরনের সংঘাতে লবণের সোডিয়াম ধাতু হইতে 'রেডিয়ো-সোডিয়াম' নামক নূতন তেজোবিকিরক পদার্থের সৃষ্টি হয়। ইহার অর্দ্ধ-জীবৎকাল ১৫॥ ঘণ্টা।

রেডিয়াম প্রভৃতি স্বাভাবিক তেজোবিকিরক পদার্থের ক্ষয় হইতে বহু বৎসর সময় লাগে, কিন্তু কৃত্রিম তেজোবিকিরক পদার্থগুলির ক্ষয় হইতে অল্প সময় লাগে, সুতরাং রোগের চিকিৎসায় শেষোক্তগুলি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিকরা মনে করিতেছেন। তাহা ছাড়া, রেডিয়াম ভাঙ্গিয়া যে সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়, সেগুলি শরীরের ক্ষতি করে, কিন্তু কৃত্রিম তেজোবিকিরক পদার্থগুলির এই অসুবিধা নাই। অধিকন্তু রেডিয়াম প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক এবং সমগ্র পৃথিবীতে মোট রেডিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট তেজোবিকিরক পদার্থের মূল্য বহুগুণ সুলভ হইবে এবং ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণে ইহা সৃষ্টি করা যাইতে পারে। অবশ্য বর্ত্তমান সাইক্লোট্রন যন্ত্রের মূল্য অত্যন্ত বেশী, সুতরাং যেখানে সাইক্লোট্রন যন্ত্র নাই, সেখানে কিছু অসুবিধা আছে, তবে আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এই অসুবিধা দূর হইবে।

কারখানায় প্রস্তুত ভিটামিন

ভিটামিন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সকলেই অত্যন্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। কোন খাদ্যের গুণাগুণ বিচারে উহাতে কোন্ কোন্ ভিটামিন কি কি পরিমাণে আছে, তাহা জানিতে সকলেই বিশেষ উৎসুক। বহু ঔষধে ভিটামিন আছে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং স্বভাবতঃই এগুলি বেশী বিক্রয় হইতেছে। বর্ত্তমান চিকিৎসকদের মত এই যে, খাদ্যে ভিটামিনের অভাব ঘটিলে নানাপ্রকার রোগ জন্মায় এবং কেবলমাত্র সেই ভিটামিনগুলি প্রয়োগ করা ব্যতীত সেই সকল রোগের অন্য কোন চিকিৎসা নাই। সংপ্রতি এখানে যে 'বেরিবেরি' রোগ দেখা দিয়াছিল—যদিও চিকিৎসকরা বলেন যে ঐ রোগ বেরিবেরি নহে—'এপিডেমিক ড্রপসি'—তাহার মূলে ভিটামিনের অভাব। সংপ্রতি জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক ২৭ বৎসর চেষ্টার ফলে কৃত্রিম উপায়ে ভিটামিন

ভিটামিন প্রস্তুত করিবার য । বামে: ভিটামিনের দানার আণুবীক্ষণিক চিত্র।

বি (vitamin B) তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখনও অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন, যাঁহারা ভিটামিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, কারণ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভিটামিন বহুল পরিমাণে এ-পর্য্যন্ত কেহ নিষ্কাশন করিতে পারেন নাই। ভিটামিন বহু খাদ্যদ্রব্যে অত্যন্ত অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে—উহা হইতে নিষ্কাশন করিতে হইলে ভিটামিন অত্যন্ত মহার্ঘ্য হইয়া পড়ে। আলোচ্য পদ্ধতিতে এই দুইটির কোন অসুবিধাই নাই, কারণ ইহা কোন খাদ্যদ্রব্য হইতে নিষ্কাশিত হয় নাই, সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম উপায় সংশ্লিষ্ট হইয়াছে। চিকিৎসকেরা আশা করেন যে, এই

ভিটামিন সাহায্যে বহু রোগ নিবারণ করা সম্ভব হইবে। অবশ্য অনেক চিকিৎসক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, যথেষ্ট ভিটামিন ব্যবহার করিলে উপকার অপেক্ষা অপকার হইবারই সম্ভাবনা অধিক।

ডেবিয়ের পরিকল্পনা

বর্ত্তমান বৎসরে ডক্টর পাউল ডেবিয়ে নামক ডাচ-জার্মান পদার্থবিদ্ নোবেল-পুরস্কার পাইয়াছেন। তিনি সংপ্রতি একটি নূতন পরীক্ষা করিবার পরিকল্পনা করিতেছেন।

এক ঘনফুট অর্থাৎ ১ ফুট লম্বা, ১ ফুট চওড়া ও ১ ফুট গভীর, জলের ওজন প্রায় ৬২৷৷০ পাউণ্ড (প্রায় ৩০ সের), কাঠ প্রভৃতি অনেক জিনিস ইহার অপেক্ষা হাল্কা। ধাতব পদার্থগুলির অধিকাংশ জল অপেক্ষা ভারী। ১ ঘন ফুট অ্যালুমিনিয়াম জল অপেক্ষা ২·৭ গুণ, সীসা ১১·৪ গুণ, সোনা ১৯ গুণ এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভারী দ্রব্য অস্‌মিয়াম (প্ল্যাটিনাম জাতীয় একপ্রকার মূল্যবান্ ধাতু) জল অপেক্ষা মাত্র ২২ গুণ ভারী, অর্থাৎ ১ ঘন ফুট অস্‌মিয়ামের ওজন প্রায় ১৬৷৷০ মণ। বৈজ্ঞানিকদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে অনুমিত হয় যে, বহু নক্ষত্রে এরূপ ভারী দ্রব্য আছে যে, সেগুলি অস্‌মিয়াম অপেক্ষা ৬০ ০০০ হইতে ১,০০,০০০ গুণ ভারী, অর্থাৎ ১ ঘনফুটের ওজন ১০ লক্ষ মণ হইতে ১৫ লক্ষ মণের মধ্যে। আরও একটি ভাল উদাহরণ দেওয়া যাক্—একটি দিয়াশলাইয়ের বাক্সের আয়তন প্রায় ১ ঘন ইঞ্চি, ইহাতে এই ভারী দ্রব্য যে পরিমাণে ধরিবে, তাহার ওজন হইবে প্রায় ৫৫০ হইতে ৮৫০ মণের মধ্যে! যে নক্ষত্রগুলিতে এইরূপ ভারী দ্রব্য আছে, সেগুলিকে শ্বেত-বামন বা white dwarf বলা হয়। এই নক্ষত্রগুলির অভ্যন্তরে এত অধিক উত্তাপ যে, সেই উত্তাপে নক্ষত্রের মধ্যস্থিত দ্রব্যগুলির পরমাণু সকল ভাঙ্গিয়া যায়, কেন্দ্র ও বহিঃস্থিত ইলেকট্রনগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সাধারণতঃ বহিঃস্থিত ইলেকট্রন ও কেন্দ্রের মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান থাকে, কিন্তু শ্বেত-বামন নক্ষত্রগুলিতে এই ব্যবধান থাকে না, ইলেকট্রন ও কেন্দ্রগুলি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া যায়। অবশ্য এই সকল নক্ষত্রে জড়-পদার্থের কি প্রকৃত অবস্থা তাহা বলা যায় না, কারণ পৃথিবীতে এরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। কোন পরমাণুর কেন্দ্র ও ইলেকট্রনগুলি বিপরীত বিদ্যুতাবেশযুক্ত বলিয়া ইহারা পরস্পর হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে। সংপ্রতি ডেবিয়ে সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে এই প্রকার ভারী দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। সাইক্লোট্রন যন্ত্র হইতে প্রবল বেগে ধাবিত নিউট্রনের স্রোত, বরফ জমিবার উত্তাপের ২৭৩° (সেন্টিগ্রেড) কম উত্তাপে রক্ষিত পথের উপর দিয়া যাইতে দেওয়া হইবে। ডেবিয়ে আশা করেন যে, এই শৈত্যে (—২৭৩° সেন্টিগ্রেড উত্তাপকে পরম শূন্য উত্তাপ বলা হয়, বৈজ্ঞানিকদের মতে ইহা অপেক্ষা শৈত্য সম্ভব নহে) নিউট্রনগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যাইবে, কারণ নিউট্রনগুলি বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা নহে। এই পরীক্ষা সফল হইলে শ্বেত-বামন নক্ষত্রের ভিতরে জড়-পদার্থ কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

চোখের যত্ন

চোখের যত্ন লইবার জন্য অনেক সময় চোখকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হইয়া থাকে। সংপ্রতি জনৈক মার্কিন ডাক্তার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখিবার জন্য বই পড়া, সেলাই করা, সিনেমা দেখা প্রভৃতি বর্জ্জন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তিনি বলেন যে, ব্যবহারে চক্ষু নষ্ট হয় না, কোন রোগ না হইলে চক্ষুর ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তির কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু তিনি আরও বলেন যে, পড়িবার সময় বা সেলাই প্রভৃতি কাজের সময় যাহাতে আলোকের স্বল্পতা না ঘটে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাঁহার মতে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি থাকিলেও দুই-এক বৎসর অন্তর চক্ষু-চিকিৎসকের নিকট চক্ষু পরীক্ষা করান কর্ত্তব্য।

মোটরলরী চালাইবার নূতন জ্বালানী

সংপ্রতি জার্মানী ও ইতালী পেট্রল বা পেট্রলের পরিবর্ত্তে ব্যবহারোপযোগী সকল পদার্থ যাহাতে বিদেশ

হইতে আমদানী না করিতে হয়, সে জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে বহু ভারবাহী মোটরগাড়ী পেট্রল ইঞ্জিন দিয়া না চালাইয়া ডিজেল ইঞ্জিন দিয়া চালান হইতেছে; কেরোসিন তৈল বা কেরোসিন ও পেট্রলের মিশ্রণ, বেন্‌জল প্রভৃতিও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। সংপ্রতি বেলিনে যে আন্তর্জ্জাতিক মোটর প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে, সেখানে এমন অনেকগুলি গাড়ী প্রদর্শিত হইয়াছিল, যেগুলি কাঠ হইতে প্রাপ্ত গ্যাস, কয়লার গ্যাস অথবা পেট্রল দিয়া চালান যায়।

জার্মানীতে ও ইতালীতে পেট্রল পাওয়া যায় না, আমদানী করিতে হয়। বহুল পরিমাণে বেন্‌জলও জ্বালানী হিসাবে আমদানী করা হইতেছিল। সংপ্রতি পেট্রল ও বেন্‌জল-চালিত মোটরের পরিবর্ত্তে অধিকতর পরিমাণে ডিজেল ইঞ্জিন ব্যবহৃত হইতেছে। ডিজেল তৈলও বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় বলিয়া বর্ত্তমানে স্বদেশজাত অন্য প্রকার তৈল দ্বারা ডিজেল ইঞ্জিন চালান হইতেছে।

বেলিন শহরের বহু 'বাস' বর্ত্তমানে কয়লার গ্যাস দিয়া চালান হইতেছে। গ্যাস রাখিবার জন্য বাসের চালের উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার স্থাপিত হইয়াছে। বাসের জন্য যে পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন, ইহাতে তাহার অত্যন্ত অল্প অংশ ধরে বলিয়া গ্যাসবাহী দুইখানি লরী রাস্তার বিভিন্ন স্থানে বাসগুলিতে গ্যাস ভর্ত্তি করিয়া দেয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই উপায়ে জার্মানী দৈনিক ৭,৫০,০০০ লিটার (১ লিটার প্রায় ১ সেরের সমান) বেন্‌জল বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছে।

কাঠ হইতে প্রাপ্ত গ্যাসও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। সমগ্র জার্মানীতে প্রায় ২,০০০ বাস কাঠ হইতে প্রাপ্ত গ্যাসে চলিতেছে।

বিদ্যুৎ-চালিত ভারবাহী মোটরগাড়ীর প্রচলনও পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ছাড়া, কৃত্রিম উপায়ে কয়লা হইতে পেট্রল তৈয়ারী হইতেছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প।

জন্মাষ্টমী

—শ্রীবীরেশ্বর পাল

হে পার্থ-সারথি, এস দুঃখভরা মর্ত্ত্যভূমি 'পর
দূর কর দাম্ভিকের দম্ভ-ভরা আত্ম-আস্ফালন,
ধর্ম্মের মুখোস্-পরা অধর্ম্মের তাণ্ডব-নর্ত্তন;
পরিত্রাহি রবে ডাকে তাপিতেরা যুক্ত করি' কর।

এস হে দ্রৌপদী-সখা লাঞ্ছিতার লাঞ্ছনা-বারণ,
মোহান্ধ মানব, তার কাম-ক্রোধ, লোভ-মত্ততায়
ধর্ষিতা ধরণী আজ, লাঞ্ছনার অন্ত তার নাই;
তুমি বিনা কে শাসিবে সে অসুরে অতি-দুঃশাসন!

আজি সে অষ্টমী তিথি, কত যুগ হয়েছে অতীত
এসেছিলে নারায়ণ হরিবারে ধরণীর ভার
কংসের নিধনতরে অজ্ঞানের ভাঙ্গি কারাগার।
বিস্মৃতির অন্তরালে সেই স্মৃতি হয় নি পতিত।

ভক্তির বাঁধনে বন্দী পাণ্ডবের সখারূপ ধরি'
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনায় সহ শত ভাই দুর্য্যোধন
ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তুমি চক্রী করিলা নিধন,
গান্ধারীর অভিশাপ বংশনাশ শিরে নিলে বরি'।

বহুশত বর্ষ পরে আমি কবি ধরাতলবাসী
তব জন্মতিথি অষ্টমীতে করিতেছি তোমারে আহ্বান
দুষ্কৃতের নাশ লাগি' করিবারে সাধু পরিত্রাণ,
গীতার আশ্বাসবাণী উঠে মোর মনোতলে ভাসি।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[৪]

সময় হইয়াছে বুঝিয়া চাঁপা ঠাকুরাণী শিকারের প্রতি শর নিক্ষেপ করিল।

ইন্দ্রাণীর বিবাহে চাঁপার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশী ছিল; বিবাহের পরে কয়েক মাস সে ইন্দ্রাণী ও পরন্তপের সুখ-সুবিধার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে; ক্রমে তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জমিয়াছে, এমন সময়ে চাঁপা ধীরে ধীরে তাহার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণের হাতে অপমানের পর হইতে পরন্তপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত সে নারী ও সুরা স্পর্শ করিবে না। ইন্দ্রাণীকে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য দর্পনারায়ণকে জব্দ করিবার সুযোগ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বিবাহের পরে ক্রমে তাহার প্রতিজ্ঞার জোর কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। রক্তদহের জমিদার রূপে যে সমস্ত সুখ-সুবিধা ও ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পাইল, তাহাতে পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা তাহার কাছে অনেকটা অবাস্তব হইয়া পড়িল, এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে পুনরায় আজীবনের চিহ্নিত পথের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। প্রথমে মদ ধরিল। সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকখানায় একাকী মদ্যপান করিত; বেঙা তাহাকে গোপনে মদ সরবরাহ করিত। ইন্দ্রাণী বুঝিত; কিছু বলিত না; দর্পনারায়ণের অপরাধের কথা সে ভুলিতে পারে নাই। চাঁপা বুঝিত, সময় হয় নাই মনে করিয়া সেও চুপ করিয়া থাকিত।

ক্রমে পরন্তপের মন নারীর জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইন্দ্রাণী! না; ইন্দ্রাণী তৃষ্ণার জল; সে তো নেশার পানীয় নয়! বেঙা গোপনে তাহাকে বাহির-বাড়ীতে মেয়ে সরবরাহ করিত। ইন্দ্রাণী বুঝিত; কিন্তু তাহার মুখের একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হইত না; পাষাণের আবার ভাব-বিপর্য্যয় কি! ইন্দ্রাণী তো পাষাণী! একদিন অনেক রাত্রে পরন্তপ যখন বাহির-বাড়ী হইতে ভিতরে আসিতেছে, এমন সময়ে তাহার চোখে পড়িল, আলোকিত জানালা-পথে চাঁপাকে; পরন্তপ চমকিয়া উঠিল, এত কাছে তবু মনে পড়ে নাই। পরন্তপের মন লালসায় আকুল হইয়া উঠিল।

তারপর হইতে পরন্তপ শত সহস্র রকম ছুতাতে চাঁপাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; চাঁপাও শত সহস্র রকম ছুতাতে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল; দুইজন নিপুণ অসি-চালক যেন বিদ্যুৎঝলিত অস্ত্রের দ্বারা একই সময়ে আত্মরক্ষা ও আততায়ীকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। চাঁপা সারাদিন নানা কাজে, নানা ছুতায় পরন্তপের কাছে আসে, মিষ্ট কথা বলে, চোখের ভাষা চঞ্চল হইয়া ওঠে; যেমনই সন্ধ্যা হয়, সে আর ঘেঁষে না; পরন্তপ তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া দিনের বেলার মানুষ বলিয়া আর চিনিতে পারে না—যেন সে কতদূরে গিয়া পড়িয়াছে। মাঝে মঝে সে অসম্বৃত অঞ্চল সম্বৃত করিবার নামে তাহা শিথিলতর করিয়া উল্কার মত ছুটিয়া পালায়; পরন্তপ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে পরন্তপ হঠাৎ চাঁপার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল; চাঁপা কত সৌভাগ্য মনে করিয়া তাহাকে বসাইল; কত গল্প করিল; পরন্তপ বলিল, তাহার মাথা ব্যথা করিতেছে, চাঁপা মাথা টিপিয়া দিল, পাখার বাতাস করিল; কত সুখ দুঃখের কথা হইল; পরন্তপ ভাবিল, সে চাঁপাকে ভুল বুঝিয়াছে; মেয়েমানুষ একটু জবরদস্তি চায়।

সেদিন রাত্রে চাঁপা পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপের মধ্য দিয়া কি কাজে যাইতেছিল, এমন সময় কোথায় ছিল পরন্তপ, সে আসিয়া চাঁপার হাত ধরিল! আঃ, কি সে নরম হাত; ফুলের স্নিগ্ধতার সঙ্গে বাসর-সজ্জার কোমলতা তাহাতে সম্মিলিত! কিন্তু, পর মুহূর্ত্তেই এক টানে হাত ছাড়াইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল; যাইবার সময়ে এক ঝলক মদিরা তাহার চোখ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল! পরন্তপ অবাক্ হয়ে দাঁড়াইয়া ছিল। সেই দৃষ্টি ও হাতের স্পর্শ তাহার শিরায় শিরায় বাসনার স্পর্শমণি বুলাইয়া দিতে লাগিল। চাঁপা শিকারী বটে!

এমন সময়ে সংবাদ আসিল, দর্পনারায়ণ নূতন বধূ সহ জোড়াদীঘিতে ফিরিয়াছে। চাঁপা বুঝিল, এইবার তাহার শর নিক্ষেপ করিবার সময়।

চাঁপা ইন্দ্রাণীকে আঘাত করিতে চায়—এমন আঘাত যাহা সে জীবনে কখনও ভুলিবে না। বাহির হইতে কেহ বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু অন্তরে সে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইবে—বজ্রাঘাতে যেমন মানুষের দেহটা দাঁড়াইয়া থাকিলেও অস্তিত্বের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এতদিন দর্পনারায়ণ ছিল বিতাড়িত, ইন্দ্রাণীর সেই এক সুখ ছিল, এ সময়ে মারিলে সে আধমরা মাত্র হইত; কিন্তু এখন দর্পনারায়ণ নূতন বধূসহ সগৌরবে ফিরিয়া আসিয়াছে, চাঁপা বুঝিতেছে, ইন্দ্রাণীর তাহাতে কতখানি দুঃখ, এই সময় যদি পরন্তপকে সে আয়ত্ত করিতে পারে তবে—এমন ব্যাপার কল্পনা করিতেই তাহার মন হিংসার উগ্র হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত, এতদিন সে পরন্তপের লালসায় শান দিয়া দিয়া তাহাকে প্রখর করিয়া তুলিয়াছে, এইবার প্রতিহিংসার এই মাহেন্দ্রক্ষণে সে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবে। ইন্দ্রাণী পাষাণী। তা হোক,—পাষাণও ভেদ করিতে পারে ইহা এমন অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।

হঠাৎ সে দিন রাত্রিবেলায় চাঁপা বাহির-বাড়ী হইতে পরন্তপকে ডাকিয়া পাঠাইল। পরন্তপ তাহার কক্ষে আসিলে চাঁপা তাহাকে আদর করিয়া বসাইল। সে দেখিল, বিছানার উপরে একটা বকুলফুলের মালা, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বলি, এ মালা আবার কার জন্যে? চাঁপা একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া দিতে দিতে বলিল, আমার আবার মালা পরাবার লোক কই, নিজেই গাঁথি নিজেই পরি।

পরন্তপ বলিল—বল কি, আমি তো জানতাম, মালারই অভাব গলার নয়!

চাঁপা হাসিতে হাসিতে বলিল—তেমন গলা পাই কোথায়?

—সত্যি? বলিয়া মালাটি লইয়া পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল, পরি?

চাঁপা সহজ ভাবেই বলিল—পরুন না।

পরন্তপ বলিল—ও কি ছিঃ, এত আলাপের পর ওই আপনি, আজ্ঞে ভালো দেখায় না!

চাঁপা বলিল—আমাদের মুখে অত বড় কথা সাজে না।

—বটে? এই বলিয়া হঠাৎ সে হাত দিয়া চাঁপার চিবুক ধরিয়া বলিল, দেখি কি রকম তোমার মুখ।

চাঁপা মুখ সরাইয়া লইল, কিন্তু সরিল না। পরন্তপ বলিল,—দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ব'সনা। চাঁপা বলিল,—আমি আসছি, আপনি বসুন। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

পরন্তপ অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে চাঁপার শয্যায় শুইয়া পড়িল, কিছুক্ষণ শুইবার পরে তাহার ঘুম পাইল, সে ঘুমাইয়া পড়িল। চাঁপা আর ফিরিল না।

এদিকে ইন্দ্রাণী শয়নকক্ষে শুইতে গিয়া দেখিল, রাত্রি অনেক হইয়াছে, পরন্তপ আজকাল বহু রাতে আসে, তাই সে দরজা খোলা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, কিন্তু ঘুমাইবার আগে তাহার একটা অভ্যাস আছে, কুলুঙ্গির উপরে সে দেখে সিন্দুকের চাবি আছে কি না। আজ দেখিল, চাবি নাই। সে ভাবিল, চাঁপা বোধ হয় লইয়া গিয়াছিল, ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছে, চাবি ত' চাঁপা ও সে ছাড়া আর কেহ নাড়ে না। সে তাড়াতাড়ি চাঁপার কক্ষে গেল, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যার কাছে পৌঁছিয়া সে চমকিয়া উঠিল। চাঁপার শয্যায় ফুলের মালা গলায় দিয়া পরন্তপ নিদ্রিত। এক মুহূর্ত মাত্র। তার পরে সে চোরের মত নিঃশ্বাস রোধ করিয়া পা টিপিয়া বাহির হইয়া আসিল—এক দৌড়ে শয়নকক্ষে গিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দ্রাণী বোধ হয় আগাগোড়াই পাষাণী নয়।

এতক্ষণ চাঁপা ঘরের পাশে অন্ধকারে বসিয়া ছিল। সে জানিত, ইন্দ্রাণী চাবি না পাইয়া নিশ্চয়ই তাহার ঘরে একবার আসিবে, চাঁপাই চাবি সরাইয়া রাখিয়াছিল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে ইন্দ্রাণী আসিল—ঘরে প্রবেশ করিল, আবার চোরের মত পালাইয়া গেল—চাঁপা সব লক্ষ্য করিল। ইন্দ্রাণী চলিয়া যাইবার পরে সে হাসির ভারে লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু যে রকম প্রাণ ভরিয়া সে হাসিবে এতদিন কল্পনা করিতেছিল, তেমন করিয়া হাসিতে পারিল না, কোথায় যেন বাধিতে লাগিল।

ইন্দ্রাণী চলিয়া গেলে সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত পরন্তপকে এক প্রকার জোর করিয়া উঠাইল এবং হাত ধরিয়া দরজার কাছে আনিয়া বাহির করিয়া দিবার উপক্রম করিল।

পরন্তপ নেশা ও নিদ্রা জড়িত স্বরে বলিল—এ আবার কি?

—ঘরে যান।

—এই তো বেশ ছিলাম

—না, না, রাত হয়েছে, ঘরে যান—

—তুমি?

—যান, বিরক্ত করবেন না।

পরন্তপ গলায় হাত দিয়া বলিল,—মালা গেল কোথায়? তারপর নিজের মনেই বলিতে লাগিল—স্বপ্ন না কি? চাঁপা আর বিলম্ব না করিয়া তাহাকে বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তখন চাঁপা বিছানায় শুইয়া হাসিতে গিয়া অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিল। চাঁপাও বুঝি আগাগোড়াই মন্দ নয়। মানুষ অবিমিশ্র ভালও নয়, মন্দও নয়; ফকিরের নানারঙের জোড়াতালি পোষাকের মত মানুষ পাঁচমিশালি সৃষ্টি।

পরন্তপ সোজা বৈঠকখানায় গিয়া নিদ্রিত বেঙাকে এক লাথি মারিয়া জাগাইয়া বলিল—এই বেটা মদ নিয়ে আয়। সুপ্তোত্থিত বেঙা বলিয়া উঠিল, না। মোতির মা যে বলেছিল—

পরন্তপ পুনরায় হাঁকিয়া উঠিল—রাখ তোর মোতির মা—নিয়ে আয় মদ।

[৫]

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে ইন্দ্রাণী একদিন বেঙাকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাঁ রে বেঙা, সেদিন যে তুই বললি জোড়া-দীঘির নূতন বৌ-দেখতে কুৎসিত, তুই কি করে' জানলি? তুই কি দেখেছিস্?

বেঙা বলিল—তা এক রকম দেখা বই কি!

—তার মানে তুই নিজের চোখে দেখিস্ নি।

বেঙা বলিল—সে কথা ঠিক মা, নিজের চোখে দেখিনি—তবে কি না মোতির মার চোখে দেখিছি—মোতির মা বলে কি জান—

ইন্দ্রাণী হাসিয়া বলিল—তোর মোতির মার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেলাম, আর পারি না।

—ওই তো মা, মোতির মাকে দেখনি বলেই এমন কথা বলছ!

—কিন্তু তোর মোতির মা নূতন-বৌ সম্বন্ধে কি বলে?

—মোতির মা বলে, নূতন-বৌ দেখতে নিশ্চয়ই কুৎসিত, নইলে জোড়াদীঘির কর্ত্তা তাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না কেন?

বেঙার উত্তর শুনিয়া ইন্দ্রাণী হাসিতে লাগিল, বলিল—তার তো অন্য কারণও থাকতে পারে।

বেঙা বলিল—আচ্ছা মা, এবার আর মোতির মার চোখে নয়, নিজে গিয়ে দেখে আসব।

ইন্দ্রাণী বিস্মিত হইয়া বলিল—সে কি রে? তুই সেখানে কেমন করে যাবি?

বেঙা তাহার পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল—মা তোমার আশীর্ব্বাদে আর—। ইন্দ্রাণী তাহাকে কথা সমাপ্ত করিতে না দিয়া বলিল—আর মোতির মার বুদ্ধিতে,—কি বলিস্?

বেঙা হাসিয়া ফেলিল। ইন্দ্রাণী বলিল—মোতির মার বুদ্ধি তা'তে আর সন্দেহ নেই। কিছুক্ষণ এ দিকে ও দিকে ঘুরে এসে মন-গড়া যা হয় একটা কিছু বলে দিবি এই তো!

ইন্দ্রাণীর কথা শুনিয়া বেঙা জিভ কাটিয়া, দুই হাত কানে ঠেকাইয়া বলিল—বল কি মা। মিথ্যে কথা—বেঙা চৌকিদার আর যাই করুক, ওইটি তার দ্বারা হবে না।

ইন্দ্রাণী হাসিতে লাগিল।

বেঙা বলিল—আচ্ছা মা বিশ্বাস না হয়, আস্ত একটা প্রমাণ আনব। তখন দেখে নিও, বেঙা চৌকিদার সত্যি বলে কি মিথ্যা!

ইন্দ্রাণী হাসিয়া তাহাকে বিদায় দিল।

পরের দিন বেঙা বৈরাগী ভিখারীর সাজে কপালে ফোঁটা কাটিয়া কাঁধে ঝুলি ও হাতে লাঠি লইয়া জোড়াদীঘির অভি-মুখে যাত্রা করিল।

*

বিকাল বেলায় জোড়াদীঘিতে এক বৈরাগী আসিয়া উপস্থিত হইল। একদল ছেলে তাহার পিছনে লাগিয়া গেল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল,

ওগো বৈরাগী ঠাকুর,
তোমার ঝুলি থেকে জল পড়ে টাপুর টুপুর,

আবার কেহ বা তাহার আরও কাছে গিয়া জিজ্ঞাসার সুরে চীৎকার করিতে লাগিল—

ওরে ও বাবাজী
তোমার ঝোলার ভিতর কি ?

কিন্তু বাবাজী তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া সোজা চৌধুরী-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। কাছারীতে দেওয়ানজী কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বাবাজীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, এখানে নয়, অন্যত্র যাও।

এক বৈরাগী আসিয়াছে শুনিয়া বনমালার দাসী তাহাকে ডাকিতে আসিল,—বলিল—ভিতরে চল, বৌ-মা ডাকছেন। বৈরাগীও যেন তাহাই চায়। সে দাসীকে অনুসরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিল।

বেঙা ভিতরে গিয়া দেখিল, আঙিনায় দাস-দাসী, ছেলে বুড়ো অনেকে জড়ো হইয়াছে—কয়েকজন মহিলাও আছে। ইহাদের মধ্যে কে যে বনমালা সে বুঝিতে পারিল না। একজন তাহাকে কিছু চাল ও পয়সা দিতে গেল, বেঙা জিভ কাটিয়া বলিল—গুরুর নিষেধ, বাড়ীর গিন্নী ছাড়া আর কারও হাত থেকে ভিক্ষা নেওয়া বারণ।

যে ভিক্ষা দিতে গিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিল—নাও, বৌ মা তুমি দাও।

বনমালা তাহার হাত হইতে চাল ও পয়সা লইয়া বৈরাগীর ঝুলির মধ্যে ঢালিয়া দিল। বেঙা দেখিল, বাড়ীর গৃহিণী বটে, বোধ হয় ইন্দ্রাণীর চেয়েও বেশী সুন্দর।

বনমালা বলিল—তুমি গান জান ?

বেঙা বলিল—গান না জানলে কি ব্যবসা চলে ?

বনমালা বলিল—তা'হ'লে একটা গান গাও।

বেঙা তখন একতারা বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল—

'এক পাপীর বাড়ীতে ছিল তুলসী বৃন্দাবন,
তুলসী কাটিয়া পাপী লাগাইল বাইগন।'

গান শুনিয়া, বিশেষ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অদ্ভুত মুখ-ভঙ্গী দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। এই গান শেষ হইলে মেয়েদের ফরমাইস মত সে আরও কয়েকটি গান করিল। তখন বনমালা জিজ্ঞাসা করিল—বাবাজী তুমি হাত দেখতে জান ?

বেঙা সকল সময়েই সপ্রতিভ, বলিল—জানি বই কি !

অমনই একসঙ্গে আট দশ জনে বলিয়া উঠিল—আমার হাতখানা, আমার হাত।

বেঙা পুনরায় জিভ কাটিয়া বলিল—গুরুর নিষেধ, মা ঠাকরুণ সব, বাড়ীর গিন্নী ছাড়া আর কারও হাত দেখা বারণ।

মেয়েরা ক্ষুণ্ণ হইল। বলিতে লাগিল, তাহারাও তাহাদের বাড়ীর গৃহিণী। বনমালা তখন নিজের হাত বাড়াইয়া দিল। বেঙা বলিল অন্যের সম্মুখে হাত দেখিলে ফল ফলে না। বনমালার ইঙ্গিতে অন্য সকলে প্রস্থান করিল।

তখন বেঙা খড়ি পাতিয়া, গুনিয়া, কখনও বা তাহার হাতের রেখা বিচার করিয়া অনেক কথা বলিল।

হাত দেখিবার মত সহজ ব্যাপার আর কিছু নাই। যাহারা হাত দেখায় তাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই বসিয়া থাকে—যে কোন কথা বলিলেই, তাহা ভাল হোক, মন্দ হোক, তাহারা বিশ্বাস করিয়া বসে। অতীতের কথা বলাও কঠিন নয়, মানুষের মন এমন এবং জীবন এমন বিচিত্র যে, যাহাই বল না কেন, তাহাই কোন না কোন রূপে জীবনে ঘটিয়া গিয়াছে, কাজেই তাহা সত্য বলিয়া মনে হয়।

বেঙা বলিল—মা ঠাকরুণ, তোমার জীবনের একটা বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে।

বনমালার মনে পড়িল, পলাশীর মাঠের সেই ঘটনা। বাবাজীর প্রতি তাহার বিশ্বাস বাড়িল।

বেঙা জানিত, বিবাহের পরে সে অনেক দিন দর্পনারায়ণের সঙ্গে এদিকে ওদিকে ঘুরিতে বাধ্য হইয়াছে।

বেঙা বলিল—মা, বিয়ের পরে তোমার দেশভ্রমণ লেখা দেখছি।

বনমালা দেখিল বাবাজী একেবারে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। তারপরে বেঙা বনমালার ভাবী পুত্রকন্যার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিল, বনমালা লজ্জিত হইয়া হাত টানিয়া লইল। সে বলিল বাবাজী তুমি ব'সো, আমি আসি। এই বলিয়া সে কিছু পারিতোষিক আনিতে গেল। বেঙা দেখিল, অদূরে একটা খাঁচায় সুন্দর একটি পায়রা আছে। তাহার মনে পড়িল, ইন্দ্রাণীকে বলিয়াছিল প্রমাণ লইয়া যাইবে। সে চট্ করিয়া উঠিয়া খাঁচা খুলিয়া পায়রাটিকে বাহির করিয়া কৌশলে একটা ন্যাকড়ায় জড়াইয়া ঝুলির মধ্যে ফেলিল।

বনমালা ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে একখানা ধুতি বক্‌শিস দিল। বেঙা গৃহিণীর গুণগান করিতে করিতে ও অদূর-ভবিষ্যতে অগণ্য পুত্রকন্যার আবির্ভাবের আশা দিতে দিতে বাহির-বাড়ীতে আসিল। তাহার আর ভিক্ষার প্রয়োজন ছিল না—সে সোজা দেউড়ী পার হইয়া রক্তদহের দিকে প্রস্থান করিল।

*

পরের দিনে সকালে বেঙা ইন্দ্রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভীত পায়রাটিকে বাহির করিয়া বলিল—এই নাও মা প্রমাণ!

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—এ কোথায় পেলি?

বেঙা বলিল—এ পায়রা যে-সে পায়রা নয় মা; একেবারে নোটন-পায়রা; এ ছাড়া পেলেই যেখান থেকে এসেছে, সেখানে উড়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী বলিল—এ পায়রা কার রে?

—একেবারে খোদ জোড়াদীঘির নূতন বৌয়ের। ভাল করে' খাঁচায় বন্ধ করে' রেখে দিও; ছাড়া পেলেই উড়ে যাবে তার কাছে।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল—কেমন দেখলি তাকে?

বেঙা জীবনে এই প্রথম বলিল—বেটি মিথ্যা কথা বলেছে!

—কে রে?

—মোতির মা।

—কেন?

—জোড়াদীঘির নূতন বৌ পরমা সুন্দরী।

ইন্দ্রাণীর মুখে নিজের অজ্ঞাতসারে বিষণ্ণতা ফুটিয়া উঠিল। তাহার এতদিন ধারণা ছিল দর্পনারায়ণের পত্নী সুন্দরী হইলে তাহার দুঃখের তীব্রতা যেন অল্প হইবে। কিন্তু বেঙার মুখে তাহার রূপের খ্যাতি শুনিয়া মোটেই তাহার সে রকম মনে হইল না; বরঞ্চ দুঃখের তীব্রতা অধিক করিয়া অনুভব করিল। মানুষ বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি! [ক্রমশঃ

গণ-দেবতা

—শ্রীচুণীলাল বন্দোপাধ্যায়

জনগণ-অধিপতি গণনাথ গণের বিধাতা
সর্ব্ববিঘ্নহারী তুমি সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বফলদাতা॥
গণের দেবতা তুমি—তাই তব গণপতি নাম।
তব নামে পূর্ণ হয় জীবনের সর্ব্বমনস্কাম॥
তাই না তোমার পূজা হে গণেশ, সকলের আগে।
প্রতি কার্য্যে নরনারী তোমার প্রসাদভিক্ষা মাগে॥
গণ-শক্তি সম্মিলিত যেইখানে অমোঘ সে বল।
তুমি আছ সেইখানে—আছে তব স্বতঃসিদ্ধ ফল॥
সকলের চিত্ত হতে সকল বিরোধ কর দূর।
ভুজে ভুজে শক্তি দাও—বুকে বুকে সাহস প্রচুর॥
সম্মিলিত কর সবে মিলাইয়া সর্ব্ব মতামত।
এক কর্ম্মে এক ধর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মে মিলাও ভারত॥

পশ্চিমেরে মিলাইয়া দাও আজি পূরবের সাথে।
তোমার হাতের রাখী বেঁধে দাও সকলের হাতে॥
গ্লানি হতে লজ্জা হতে মুক্ত কর সকলেরে আজ।
সকল কালিমা মুছে পরাইয়া দাও নব সাজ॥
ঘুচে যেন যায় দেব সকলের সর্ব্ব মনোব্যথা।
সর্ব্ব মিথ্যা ভয় তুমি ভেঙে দাও হে আদি-দেবতা॥
ছুটুক তোমার রথ দেশে দেশে উড়ুক নিশান।
সঘনি উঠুক বাজি ঘরে ঘরে সুতীব্র বিষাণ॥
সম্মিলিত কোটি কণ্ঠে ওঠে যেন তব জয়-জয়।
গণদেব সব চেয়ে মহিমায় বড় যেন হয়॥
সবার পরশকরা গঙ্গাজলে হ'ক তব পূজা।
তোমারে দক্ষিণে করি সত্য হ'ক মাতা দশভুজা॥

স্পেনের বাস্কজাতি

—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত

বাস্ক প্রদেশের নাম বর্ত্তমানে স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের ফলে বাঙ্গালার অনেকের নিকটই পরিচিত হইয়াছে। ফ্রাঙ্কোর দলের বিলবাও আক্রমণ, বিপন্ন নরনারী উদ্ধারের জন্য ইংরাজের প্রচেষ্টা, বিদ্রোহীদের নৌ বহরের বেড়াজাল ভেদ করিয়া খাদ্যবাহী জাহাজ প্রেরণ, এ সমস্ত ঘটনাই একে একে পরদার উপর চলচ্চিত্রের ছবির মত সংবাদপত্র-পাঠকদের মনে গত কয় মাস ধরিয়া ভাসিয়াছে। উপস্থিত বিল্‌বাও দখলের পর যুদ্ধের গতি আবার অন্যদিকে ফিরিয়াছে।

ইহা ছাড়া বাস্কের উপর দৃষ্টির আরও একটি কারণ আছে। বাস্ক প্রদেশবাসীরা অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যকামী এবং রক্ষণশীল। তাহারা কমিউনিষ্ট মতবাদ যেমন অপছন্দ করে, তেমনই ফ্রাঙ্কোর ঐকরাজ্যও তাহাদের অসহ্য। তবে কমিউ-নিষ্টরা তাহাদের প্রাচীন স্বাধীনতায় কোন হস্তক্ষেপ করিবে না, এই আশ্বাস দিয়াছে বলিয়াই আজ বাস্করা কমিউনিষ্ট দল-ভুক্ত। ফলতঃ ফ্রাঙ্কোর বাস্কের বিরুদ্ধে অভিযান কমিউ-নিজম্ এর বিরুদ্ধে ফ্যাসিজ্‌মের অভিযান নহে,—স্বাতন্ত্র্য-কামীর বিরুদ্ধে ঐকরাজ্যের অভিযান। এই স্বাতন্ত্র্যকামী ও রক্ষণশীল বাস্কজাতি ইউরোপের আধুনিক জাতিসমূহের মধ্যে এমনই বেমানান যে, পাঠকের মনে ইহাদের ইতিহাস বিচিত্র রহস্যের অনুভূতি আনয়ন করে।

তিনটি প্রদেশ লইয়া স্পেনীয় বাস্ক—আলাভা, বিস্কে, জিপুথ্‌কোয়া। ফ্রান্স আর স্পেনের মধ্যে পিরিনিজ পর্ব্বতের পশ্চিম ধারে ত্রিকোণাকৃতি এক ভূমিখণ্ড, কোণটি তলায় নামিয়া গিয়াছে; পশ্চিমে এবং দক্ষিণে সান্‌টান্‌ডার, বারগোস এবং লোগ্রোন্‌ ও পূর্ব্বে নাভার এবং উত্তরে বে অব বিস্কে। সমগ্র বাস্ক প্রদেশ আয়তনে মাত্র ২৭৩৯ বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ৮ লক্ষের উপর। স্পেনের মধ্যে বাস্কই সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল। পিরিনিজের অপর পারেও বাস্ক-বসতি আছে। সেখানকার জমী তেমন উর্ব্বর নয়, খনিজ পদার্থ কিছুই নাই। ফরাসী রাষ্ট্রে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যও স্বীকৃত হয় নাই। ইরুনে (Irun) সীমান্ত পার হইলেই স্পেনীয় বাস্কের যে বিশেষত্ব, সেই লৌহখনি দৃষ্টিতে পড়ে। বিলবাও সহর এই লৌহখনির জন্যই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই সুপ্রসিদ্ধ। রোমক যুগে স্পেনীয় ইস্পাতের সহিত দামাস্কাসের ইস্পাতের তুলনা হইত। ঐ খনিজ ঐশ্বর্য্যই স্পেনীয় বাস্কের ভবিষ্যৎ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়াছে এবং আদি যুগ, মধ্য যুগ এবং বর্ত্তমানেও

বাস্ক : ফুয়েন্টেররাবিয়ায় গুডফ্রাইডের মিছিল।
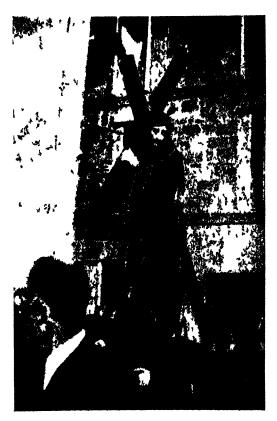
বাস্কের অজস্র লৌহ সভ্যতার যুগোপযোগী উপকরণ নিত্য যোগাইতেছে।

বাস্করা অন্যান্য জাতির সহিত বিশেষভাবে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই—প্রাচীন রক্ত এখনও ইহাদের ধমনীতে বহি-তেছে। সত্য বটে, রোমীয়, গথ, মুসলমান সকলেই এক কালে এ সব প্রদেশে বসবাস করিয়াছে, সকলেরই রক্তে সকলের

রক্ত মিশিয়াছে—জাতিগত বিশেষত্বগুলির প্রখরতা কমিয়াছে, কিন্তু তথাপি আজিও বাস্কদের পুরাতন বৈশিষ্ট্য ইহারই মধ্য হইতে সুস্পষ্টভাবে চিনিতে কষ্ট হয় না। উত্তরবাসী ইউরোপীয়দের মত গায়ের রং ইহাদের ফর্সা নয়, কিন্তু দক্ষিণবাসীদের অপেক্ষা রং ফর্সা। মুখের গড়ন বড় সুন্দর, গমনভঙ্গী ঋজু। মাথা গোলও নয়, লম্বাও নয়, কিন্তু বিশেষত্ব আছে। দক্ষিণ-আমেরিকায় এবং অন্যত্র যে এক লক্ষ বাস্ক বাসিন্দা রহিয়াছে, তাহাদেরও মধ্যে এই বাস্ক-সুলভ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। জাতিতত্ত্ববিদগণের পাণ্ডিত্য ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের জানা নাই।

বাস্ক ভাষাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা পরমাশ্চর্য্য বিষয়। এস্কুয়ারা [Eskuara তাহাদের ভাষার নাম] শব্দের অর্থ ঠিক জানা যায় না। ভাষাবিদ্‌রা অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পান নাই। ইতিহাস বলে, প্রাচীনকালে আইবেরি, কেল্টিবিরি এবং কেল্ট, এই তিন জাতি স্পেনে বসবাস করিত। অনেকে বলেন, আইবেরীয়েরা সহরের নামকরণ বাস্কভাষাতেই করিত, বাস্কভাষা সমস্ত স্পেনেই চলিত এবং এই আইবেরীয়রা বাস্কভাষা, কিংবা এই প্রকার কোন ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিত। বাস্কদের কিন্তু কোন বিশেষ অক্ষর নাই। এখন রোমীয় অক্ষরেই বাস্ক লেখা হয়। প্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, মৃৎপাত্রের চিহ্ন, বৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভে যে আইবেরীয় অক্ষরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পাঠোদ্ধার এখনও হয় হয় নাই। তাহার সহিত ফিনীসীয় অক্ষরের সাদৃশ্য আছে এবং ঐ অক্ষর বোধ হয় ইহারই রূপান্তর।

বাস্কদেশে একটি প্রবাদ আছে—সয়তান সাত বৎসর বাস্কে বাস করিয়া বাস্কভাষার মাত্র দুইটি কথা শিখে—'হ্যাঁ'ও 'না'। সে দুটি কথাও ফরাসী-বাস্ক পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান ভুলিয়া যায়। সেই জন্যই বোধ হয় বাস্কবাসীরা সগর্ব্বে বলিয়া থাকে, এ ভাষা ভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

বাস্ক: প্রাচীন গ্রাম্য নাট্যাভিনয়।

বাস্করা কে, কোথায় তাহাদের জন্ম, ইহার সম্বন্ধে নানা মত আছে। আইবেরীয় ভাষার সহিত বাস্কভাষার সাদৃশ্য দেখিয়া ইহারা আইবেরীয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কেহ বা ইহাদিগকে আফ্রিকাবাসী 'বারবার' জাতির অংশবিশেষ বলিয়াও সন্দেহ করেন। ইউরোপীয় ভাষার সহিত মিল না দেখিতে পাইয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরে লুপ্ত 'আটলাণ্টিস্' মহাদেশের অধিবাসী বলিয়া অনেকে বাস্কদের পরিচয় দেন। অন্যপক্ষে প্রস্তর-যুগ হইতে ইহারা স্পেনের অধিবাসী এবং কোন কালেই স্বদেশ পরিত্যাগ করে নাই, এইরূপ মতবাদও প্রচলিত আছে। যাহাই হউক, এ সমস্তই অনুমান মাত্র, ইহা ভুলিলে চলিবে না।

খ্রীষ্টান হইবার পূর্ব্বে বাস্কবাসীদের ধর্ম্মবিশ্বাস কি ছিল সঠিক জানা যায় না। এই পর্য্যন্ত উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহারা অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায়ই নৈসর্গিক বস্তুসমূহ, যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, শুকতারার উপাসনা করিত এবং দেহ অগ্নিদগ্ধ কিংবা কবরে প্রোথিত না হওয়া পর্য্যন্ত মৃতের আত্মা তাহাতে অবস্থান

করে, এ বিশ্বাস তাহাদের ছিল। জাতীয় গাথাবলী হইতে এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। বর্ত্তমানে বাস্কপ্রদেশবাসী অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রিয়।

বাস্কে সাহিত্য-চর্চ্চার ইতিহাস প্রাচীন নয়। প্রায় চারি শত বৎসর আগে এ দেশে প্রথম পুস্তক মুদ্রিত হয়। অধিকাংশ প্রাচীন পুস্তকই ধর্ম্মবিষয়ক। মাত্র বর্ত্তমান কালে বাস্কে সাহিত্যসৃষ্টির উন্মেষ দেখা দিয়াছে।

ফরাসী অনুকরণে এখানে এক প্রকার গ্রাম্য নাটকের (pastorale) বিশেষ আদর। খোলা মাঠে যাত্রার মত ইহার অভিনয় হয়, ঘন ঘন এ দেশের যাত্রার জুড়ীর গানের মত নাচের সংস্থানই এই বাস্ক-সংস্করণের গ্রাম্য নাটকের বিশেষত্ব। বাস্ক বাসীরা অত্যন্ত নৃত্যপ্রিয়। পৃথিবীর অপরাপর প্রাচীন জাতি-সমূহের মধ্যে যত প্রকার নৃত্য দেখা যায়, বাস্ক প্রদেশে তাহার সকল নিদর্শনই আছে—জন্তুনৃত্য, কৃষিনৃত্য, শিল্পনৃত্য, যুদ্ধনৃত্য, সংস্কার এবং শিষ্টাচার সংশ্লিষ্ট নৃত্য, এই সমস্তই বাস্কে প্রচলিত। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে, মান্য অতিথিকে সংবর্দ্ধনা করিতে স্ত্রী-পুরুষের এক যোগে নৃত্যও বাস্কে দেখা যায়। জাতীয় জীবনের সহিত এই সমস্ত আচারের অঙ্গাঙ্গী সংযোগ রহিয়াছে।

বাস্কবাসীদের আত্মমর্য্যাদাবোধ প্রবল। তাহাদের জাতি-গর্ব্ব ও রক্ষণশীলতা সুপ্রসিদ্ধ। এই শিল্পনিষ্ঠ সভ্যতার যুগে বিরাট লৌহখনির মালিক হইয়াও তাহাদের গ্রামে গ্রামে অতি প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থাগুলি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। চাষবাসের অতি প্রাচীন রীতিও বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। গ্রামই তাহাদের প্রিয়, নির্জ্জনতা তাহারা বড়ই ভালবাসে, প্রত্যেকে তাহার ছোট ক্ষেত লইয়া আলাদা থাকে। এই নির্জ্জনতা প্রিয়তাই তাহাদের উপনিবেশ-স্থাপনে এত উপযোগী করিয়াছে। ব্রেজিলের সমৃদ্ধির মূলে এই বাস্কবাসীরা। কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় তাহারা কাঁহারও অপেক্ষা কম নহে। তাহাদের গুণাবলীর বিশেষ প্রকাশ রক্ষণকার্য্যে। বর্ত্তমান গৃহযুদ্ধেও অবশ্য এ কথা সত্য বলিয়া লইতে দ্বিধা হয় না।

ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রচণ্ড সংগ্রাম বহুকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুদক্ষ নাবিক বলিয়া তাহাদের খ্যাতি বহু প্রাচীন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড এ মৎস্য-শিকারে ইহারাই প্রথম পথ-প্রদর্শক।

স্ত্রীজাতির সম্মানে বাস্কবাসীরা কৃপণ নয়। তাহাদের মধ্যে প্রথমজাত সন্তান কন্যা হইলেও পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। এ প্রথা উচ্চ নীচ সকলের মধ্যেই প্রচলিত। তাহাদের আইনে (fueros) কেহ নারীর অসম্মান বা নারীর সম্মুখে কাহাকেও অসম্মান করিলে তাহার কঠোর শাস্তির বিধান আছে। বাস্কনারী তাই বলিয়া অবলা নয়। তাহারা পুরুষের চেয়েও কর্ম্মঠ। নৌকার মাঝির কাজে, জাহাজ হইতে মাল নামাইবার জন্য কুলী হিসাবে বাস্কে মেয়েদেরও দেখা যায়।

বাস্ক স্থাপত্যরীতি—সহরের একটি বাড়ী।

বাস্কবাসীদের শাসন-প্রতিষ্ঠান দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধ সযত্নে সংরক্ষিত। মিউনিসিপ্যালিটীর সকল পদই নির্ব্বাচনে পূর্ণ হয়, উপরওয়ালার মর্জ্জি অনুসারে পদপূরণের ব্যবস্থা নাই। নির্ব্বাচনের এমন কোন রীতি নাই, বাস্কদের যাহা পরীক্ষা করিতে বাকী আছে। সর্ব্বভাবে তাহাদের চেষ্টা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যেন সামান্য বাধাও না আসে। মিউনিসিপ্যালিটীগুলি প্রত্যেক প্রদেশের জাণ্টা-য়

(junta) বা পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠায়, এই পার্লিয়ামেণ্টের আগে অধিবেশন হইত খোলা জায়গায়—যেমন বিস্কের পার্লিয়ামেণ্ট বসিত গুয়ের্ণিকার প্রসিদ্ধ এক ওকগাছের তলায়। তিন পার্লিয়ামেণ্ট হইতে প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া সমগ্র বাস্ক প্রদেশের সুবিধা-অসুবিধার কথা আলোচনা করিত। আবার কতকগুলি সহর মিলিয়া এক একটি সমিতি গড়িয়া নিজেদের বিশেষ সুবিধা ও অধিকারগুলি যাহাতে লুপ্ত না হয় তাহা দেখিত। এই ভাবে স্বায়ত্ত-শাসন, আইন এবং বিচার-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশের নিজস্ব রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল রীতিই তাহাদের অস্তিত্বও স্বীকৃত হইত। তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার কারণও রহিয়াছে। ভাষাগত পার্থক্য, পার্ব্বত্য-দেশ বলিয়া আক্রমণের অসুবিধা, দারিদ্র্য এবং অনুকূল সমুদ্র বহু শতাব্দীকাল তাহাদের এই আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের বিধি-নিয়মগুলিও এ বিষয়ে যথেষ্ট কার্য্যকরী। বাস্কে কোন পদই বিনা নির্ব্বাচনে পূর্ণ হইত না, ইহা আমরা বলিয়াছি। কেবল স্বদেশ-রক্ষার্থ, নিজেদের লোকের অধিনায়কত্বে যুদ্ধ করিতে তাহারা বাধ্য এবং স্বদেশের বাহিরে যুদ্ধ করিতে হইলে সেনাদের বেতন অগ্রিম দিতে হইত; বিদেশের সহিত অবাধ বাণিজ্য অধিকার। নিজেদের জাণ্টা কোন রাজ-আজ্ঞা অনুমোদন না করিলে তাহা মানিতে তাহারা বাধ্য নয় এবং সকল আবেদন ও অন্যায়ের প্রতীকার না হওয়া পর্য্যন্ত কোন রাজকর ধার্য্য হইত না, দেওয়াও হইত না। ধার্য্য কর সমস্তই একেবারে বাস্কবাসীরা রাজকোষে দিত এবং নিজেদের মধ্যে ইচ্ছা-মত কর ধার্য্য করিত, সে বিষয়ে রাজার কোন হাত থাকিত না। মজার কথা, তাহারা ব্যবহারজীবী এবং ধর্ম্মযাজকদের অবিশ্বাস করিত, ইহারা না কি সর্ব্বদা অত্যাচারীর সহায়। জাণ্টার অধিবেশনে একজন ব্যবহারজীবী থাকিতেন, আইন বিষয়ে পরামর্শ দিতে, কিন্তু তাঁহার কোন 'ভোট' থাকিত না।

একটি বাস্ক গ্রাম : সারে। [ফিলিপে তেরিন অঙ্কিত চিত্র হইতে

প্রচলিত 'ফুয়েরোজ্' fueros বা fors, চাতার-(chater)-এর অবলম্বন। বাস্কের সকল রাজাই তাহাদের এই সকল বিধি-নিয়ম মানিয়া চলিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ—কি কাস্তিল, কি স্পেন, কি নাভার, সকলকেই বাস্কদের এই বিষয়ে স্বাধীনতা দিতে হইয়াছে।

স্পেনের অন্যান্য স্থানে স্বাতন্ত্র্যবাদী অনুষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ চলিলেও বাস্কবাসীদের অধিকারে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। এই সকল বিধি-নিয়মের বলে প্রবল ঐকরাজ্যের রাজত্বকালেও তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল এবং বাস্করা রাজভক্ত ছিল। কেবল তাহাই নহে, তাহাদের আন্তর্জ্জাতিক

ধর্ম্মযাজকদের যে কেবল ভোট দিবার অধিকার ছিল না তাহা নয়, বাস্কবাসীরা কখনও ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় তাহাদের শাসন মানে নাই। ধর্ম্মবিশ্বাস তাহাদের প্রগাঢ়, ইউরোপ-প্রসিদ্ধ জেসুইট-দল-প্রতিষ্ঠাতা ইগ্নেসিয়াস লয়োলা [Ignatius de Loyola (১৪৯১-১৫৫৬)], পাদ্রী জেভিয়ার [Francis Xavier (১৫০৬-৫২)] এই বাস্কবাসী। বহু প্রাচীন খৃষ্টীয় রীতিনীতি এখন পশ্চিম-ইউরোপে কেবল বাস্কেই দেখা যায়। কিন্তু কোন ক্যাথলিক রাজা কোন সময়েই তাহাদের

স্পেনীয় ধর্মযাজকদের প্রভাবে আনিতে সমর্থ হন নাই। ধর্ম-যাজক নিযুক্ত করা হইয়াছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা করিয়া কিংবা ভোটের দ্বারা! ধর্মের নামে খেলা-ধূলা নাচগানে বাধা স্পেনের সর্বত্র পড়িলেও তাহাদের কখনও সে বাধা সহ্য করিতে হয় নাই।

বাস্কদের এই সামান্য পরিচয়ের সহিত তাহাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের কিছু পরিচয় দেওয়া কর্তব্য। বলিতে গেলে স্পেনের ইতিহাসের কথা আসিবে, কিন্তু সে এক মহাভারত। ইউরোপীয় সভ্যতার জন্ম এবং বিস্তারের সাক্ষ্য এই স্পেনেই পাওয়া যায়। রোমক সভ্যতার উত্থান পতন, সমগ্র ইউরোপ বহিয়া উত্তরবাসী বর্বরজাতির বিচিত্র অভিযান; খৃষ্টীয় চার্চ্চ-এর অপ্রতিহত ক্ষমতার সূচনা, পশ্চিম ইউরোপে মুসলমান শক্তির উদয়-অস্ত; আমেরিকা আবিষ্কার এবং উপনিবেশ স্থাপন; ইউরোপীয় সভ্যতার দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে এই পাঁচটি সোপানবিশেষ। প্রত্যেকের সহিত স্পেনের এবং স্পেনীয়দের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়া গিয়াছে।

দুই হাজার বৎসরের ইতিহাসে সুদক্ষ নাবিক, প্রসিদ্ধ যোদ্ধা, উপনিবেশ স্থাপনে সর্বগুণসম্পন্ন, প্রবল আত্মমর্যাদাশালী, স্বাধীনচেতা, স্বায়ত্তশাসনপ্রিয় বাস্কবাসীরা যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরিপূর্ণ ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই। বর্তমান যুগের Unamuno প্রভৃতি মনীষীরা বাস্কবাসী। বহুশতাব্দীর রক্ষণশীলতা বাস্ক প্রতিভা স্তিমিত করে নাই। এই গৃহযুদ্ধেও ফ্রাঙ্কোর হাতে পরাজয় তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিষ্প্রভ করিয়া দিবে এমন নয়। গৃহবিবাদ বহুকাল ধরিয়া স্পেনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাস্কবাসীরা কাস্তিল্ এবং নাভার-এর অধীনেও বহুকাল যাপন করিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৮৭২-৭৮) এক গৃহবিবাদের ফলে তাহার পূর্ববর্ণিত বিশিষ্ট সুবিধাগুলি সকলই প্রায় নষ্ট হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাস্ক প্রদেশগুলিও তাহার পার্লিয়ামেন্ট সংগঠিত করে এবং শাসনকর্তাদের শাসন মানিতে স্বীকৃত হয়। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত কাজ-কর্মে তাহাদের স্বাধীনতা এখনও অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে

বাস্ক মরে নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু বিজেতার অত্যাচার সহ্য করিয়া বাস্ক বাঁচিয়া রহিয়াছে এবং থাকিবেও।

মিথ্যা কভু নহে

শ্রীপূর্ণেন্দু রায়

পৃথিবীর প্রাণপদ্মে এত মধু, এতখানি রূপ!
চন্দ্রবর্ণ-রসায়নে মূর্তিমতী মৃত্তিকার তল—
পরিপূর্ণা প্রিয়তরা কে জানিত কে বুঝিত আগে?
কুসুমিত কল্পলোক—কবি ছিল নিঃসঙ্গ নিশ্চুপ;
শুচিশুভ্রতায় ভরা আঁখিপুট স্থির অচঞ্চল
আফিমের ফুল-জাগা সুষমার ঘন অনুরাগে।
লগ্ন-বেলা বিচ্ছুরিল প্রভাতের প্রভাতীর সনে,
শরতের স্নেহোজ্জ্বলা উচ্ছ্বসিত স্বপনের বাণী
রোমাঞ্চ-শিহর-সুখে মুহূর্তেকে উঠিল সে গাহি',

অনাদিকালের তরে অন্তহীন এত আয়োজনে—
নিঃস্বত্বে নিঃশেষ হ'ল জীবনের শেষ সত্তাখানি:
বিচিত্র আলোক-রসে অকস্মাৎ নিল অবগাহি'।
তোমার আত্মার সাথে ওগো মোর মানস-প্রেয়সি!
প্রাণের প্রাচুর্য্য দিয়া হ'ল মোর চির-পরিচয়
সমগ্র অন্তর দিয়া অপরূপ দিনু উদ্বোধন;
অনাগত বাসন্তিকা জানি আমি উঠিবে বিকশি,'
জীবনের অমানিশা জোছনায় হ'বে স্বপ্নময়,
মরণ-শূন্যতা মোর পূর্ণ হ'বে সুধা-সঞ্জীবন।

দুঃখকষ্ট তো আছেই

— শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

চরণদাস দাওয়ায় বসে ছিল, মেঘের ডাক শুনে আকাশের পানে তাকিয়ে দেখল। কাল মেঘের স্তর সারা আকাশ ঢেকে ফেলেছে। এখনই শেষভাদ্রের প্রবল বর্ষণ সুরু হবে।

হেলান-দেওয়া বাঁশের খুঁটিটায় জোর করে পিঠ বাধিয়ে পরীক্ষা করে দেখল—সেটা এখনও শক্ত আছে। বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নেই।

কিন্তু উপরের চালে নজর পড়তেই চরণদাসের মন চিন্তাকুল হয়ে উঠল। চালের খড় গত বর্ষার অত্যাচারে একেবারেই পচে গেছে। কিন্তু নেহাৎ আলস্যের জন্যই তা মেরামত করা হয়ে ওঠে নি। আর উপরের চালের বাঁধনও তো অনেকগুলিই ছিঁড়ে গিয়েছে।

চরণদাস ভাবল: এই বেলা তাড়াতাড়ি কয়েকটা বেত নিয়ে আসতে পারলেই বৃষ্টির সময় বসে বসে সব ঠিক করে রাখা যাবে। তারপর সময়মত বাঁধনগুলি পরিয়ে দিলেই হবে।

চরণদাস ডাকল: তুলসী—মা—

ভিতর হতে তুলসী জবাব দিল: যাই বাবা।

—একেবারে দা'খানা নিয়ে আসিস্ তো মা।

একখানা দা হাতে দাওয়ায় এসে তুলসী শুধাল: এই অবেলা করে দা দিয়ে কি করবে বাবা?

চরণদাস জবাব দিল: কয়েকটা বেত তুলে নিয়ে আসি। দেখছিস্ না বাঁধনগুলি সব পচে গেছে।

সেখানে দাঁড়িয়েই তুলসী বলল: উঃ আকাশে যে বেজায় মেঘ করেছে বাবা, এর মধ্যে কোথায় যাবে বেত তুলতে?

চরণদাস হেসে বলল: ভয় নেই রে পাগলী, বেশীদূর যাব না, মোহরের ভিটেয়ই তো কত বেত।

তুলসীর মুখখানি মলিন হয়ে উঠল: না বাবা, মোহরের ভিটের তুমি আর যেতে পারবে না। সামান্য দুটি বেতের জন্য মজুমদাররা অনেক কথা রটিয়ে বেড়াবে।

উত্তর দিতে যেয়ে চরণদাস মাথা নামাল। মনে পড়ল, দেনার দায়ে বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত মোহরের ভিটে সে মজুমদারদের নিকট বেচে দিয়েছে। বেচবার আগে ও-পাড়ার বুড়ীমাসী একদিন সন্ধ্যায় চরণদাসকে ডেকে বলেছিল: দেখ চরণ, মোহরের ভিটেটি বিক্রি ক'র না। জান তো ওতেই তোমাদের লক্ষ্মীর আসন বাঁধা আছে।

এ কাহিনী চরণদাস শিশুকাল হতে অনেকদিন শুনেছে। তাদের বংশের কে একজন না কি একদা রাত্রে ঘুমের ঘোরে ওই বেতঝোপের মাঝে মাটি খুঁড়ে এক কলসী মোহর পেয়েছিল। অনেক রাতে গোঙানি শুনে লোকজন যেয়ে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় বেতঝোপ হতে তুলে আনে। প্রলাপের মাঝে সে শুধু বলেছিল বার বার: বংশের লক্ষ্মী এখানে আসন নিয়েছে, এ পীঠস্থান যেন কেউ কোন দিন হাতছাড়া করিস না।

এ মোহর তার ভোগে লাগে নি। এ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সেই পূজারী অনাগত বংশধরদের জন্য অগাধ ঐশ্বর্য্য রেখে কয়েকদিন পরেই প্রাণত্যাগ করল।

সেই হতেই জায়গাটার নাম মোহরের ভিটে, যদিও বেতের বন ছাড়া আর কিছু সেখানে জন্মে না।

এ কাহিনী সত্য হোক আর মিথ্যা হোক, চরণদাস মোহরের ভিটেটি বিক্রি করতে কিছুতেই রাজী ছিল না। ও ভিটে হতে লাভের কোন আশা নেই চরণদাস তা জানে। কিন্তু ওকে কেন্দ্র করে বংশের অতীত সম্পদের যে গর্ব্ব ও সম্মানের আসন চরণদাসের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে সেখানে তার অতিরঞ্জিত বর্ণনায় বর্ত্তমান দারিদ্র্যকে আবরিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করা চরণদাসের অভ্যাস। তাই মোহরের ভিটের পরিবর্ত্তে তার চেয়ে অনেক বেশী উর্ব্বর জমি সে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু মজুমদার-কর্ত্তার মোহরের স্বপ্নে বিভোর

মন তাতে রাজী হল না। তার লোভের গহ্বরে একদিন মোহরের ভিটে তলিয়ে গেল।

চরণদাস বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চুপ করে রইল। আকাশে মেঘ ডেকে উঠল আবার।

বাবার পাশে সদ্য তুলে আনা দুটি কচি শশা দেখে তুলসী আনন্দে বলে উঠল: বাঃ, কেমন বাহারে শশা হয়েছে আমার লাগান গাছে।

চরণদাস কোন জবাব দিল না। তুলসী সস্নেহে শশাদুটি নাড়তে নাড়তে আপন মনেই বলল: দাদা যদি এখন বাড়ী আসত, ত' খুব মজা হত, কচি শশা খেতে দাদা যা ভালবাসে।

অন্তরাল হতে তুলসীর মা এতক্ষণ পরস্পরের আলাপ শুনছিল। এবার দাওয়ায় এসে বলল: হ্যাঁ গা, নারাণকে একবার আসতে লিখে দাও না?

চরণদাস সহসা রূঢ় হয়ে উঠল: বেশ ত, এত গরজ যদি, লিখলেই ত পার। আমাদ্বারা ওসব হবে না।

মায়ের মনে আঘাত লাগল বড়, সে বলল: কি যে তুমি হচ্ছ দিন দিন।

চরণদাস রূঢ়কণ্ঠেই জবাব দিল: আর তোমার ছেলেই বা কোন্ গুণধর বেম্পতি? মাসের আজ সতের দিন কেটে যায়, অথচ একটি পয়সা পাঠাবার নাম নেই। আরে বাপু, এদিকে এতগুলি পেট যে চলে কিসে, সে বিবেচনার মাথা কি একেবারেই খেয়েছিস?

প্রবাসী পুত্রের প্রতি এই কটূক্তিতে তুলসীর মা বিরক্ত হয়ে বলল: নিজেই বা কোন্ জমিদারী দিয়েছ যে, ছেলের উপর যখন তখন তার ঝাল ঝাড়ছ? বলি, সে বেচারী যে সহরে বসে এত কষ্ট সহ্য করছে, সে কি তার নিজের জন্য, না তোমাদেরই ভালর জন্য?

চরণদাস পাল্টা জবাব দিল: ভাল ত বেজায়, গুষ্টিশুদ্ধ উপোস করে মরতে বসেছি। বুড়ো বয়সে কোথায় একটু শান্তি-সোয়াস্তিতে পা ছড়িয়ে কাটাব, তা নয়—এ দেখছি খাই খাই করেই একদিন আমার দম আটকে যাবে।

হতাশভাবে চরণদাস চুপ করল।

তুলসীর মা আবার কথা বলল: কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে, তাতে নারাণই বা কি করবে। সে ত আর চেষ্টার ত্রুটি করছে না। খাটতে খাটতে বাছা আমার কালীবর্ণ হয়ে গেছে। এই ত ওপাড়ার ছোট ঠাকুর সেদিন সহর হতে এসে বলল: তোমাদের নারাণ যা কাহিল হয়ে গেছে বৌঠান, সে আর কি বলব। আর হবেই বা না কেন, যা অমানুষিক খাটুনী। তারপর না আছে পেট ভরে খাবার আর না আছে একটু বিশ্রাম।

চরণদাস বাধা দিয়ে বলল: এত সব শুনেও তাকে আসতে একখানি চিঠি লিখে দিতে পার নি? আমার না হয় নানান্ চিন্তায় মাথার ঠিক নেই, কিন্তু পেটের ছেলের জন্য তোমারও কি একটু পরাণ পোড়ে না? আর সে আহম্মককেও বলি—আরে বাবা, সহরে যখন কোন সুবিধাই হচ্ছে না, তখন একবার বাড়ী এসে স্বাস্থ্যটা একটু বদলেও ত' যেতে পারিস্?

তুলসীর মা এবার রুদ্ধ আক্রোশে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: তোমার জ্বালায় কি আর বাছার বাড়ী আসবার উপায় আছে! এলেই অমনি নানান বকাবকি সুরু করবে, যেখানে যত দেনাপত্তর আছে সব দেবে তার ঘাড়ে চাপিয়ে—

চরণদাস অসহায় ভাবে হাত তুলে বলল: কিন্তু আমিই বা কোন্ পথে চলি? এতবড় সংসার একা আর চালাই কি করে? এই যে এত দেনাপত্তর, বাকী খাজনা, চৌকীদারী ট্যাক্স—এ সব বালাই নিয়ে তো তোমরা মাথা ঘামাবে না, শুধু আমার দোষটাই তোমরা দেখবে। আমি তোমার ছেলেকে দেখতে পারি না, সখ করে তাকে আমি সহরে পাঠিয়েছি দুঃখকষ্ট সইতে—এই তো তোমরা ধারণা করে বসে আছ, কিন্তু সোনার চাঁদ ছেলেকে কোলে করে বসে থাকলে ত আর সংসার চলে না—

চরণদাসের কণ্ঠস্বর ভিজে উঠল। অন্তর ও বাহিরের অবিরাম সংগ্রামে তার মনের ব্যথা বুকের পাঁজর ভেঙে যেন বের হতে চায়।

বাইরে নিবারণ মণ্ডলের গলা শোনা গেল।

চোখে আঁচল দিয়ে তুলসীর মা ভিতরে চলে গেল। চরণদাসও চকিতে চোখ মুছে নিয়ে বাইরে তাকাল।

কাশতে কাশতে নিবারণ এসে উঠানে দাঁড়াল: কই গো মেজকর্ত্তা, কেমন আছ?

নিজের বসবার পিঁড়িখানি চরণদাস এগিয়ে দিল। মুখে একটু হাসি টেনে এনে বলল: এস নিবারণ, বস। এই কোন রকম কেটে যাচ্ছে। তা এ দিকে কোথায় যাচ্ছিলে এই অবেলায়?

নিবারণ জবাব দিল: আজ্ঞে তোমার এখানেই এলাম।

চরণদাসের মুখে প্রভাতী মেঘের ছায়া পড়ে তখনই মিলিয়ে গেল, সে বলল: বেশ বেশ, আসবে মাঝে মাঝে।

তারপর অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল: আর শোন এক ব্যাপার। সেদিন গিয়েছিলাম বনকালীর চরে। তিন বছরের খাজনা বাকী, অথচ বেটারা কি না এবারেও কিছু দিতে পারবে না। আর তুমিই বল নিবারণ, বেচারাদের দুঃখকষ্ট দেখে কেমন করে আর জোর জবরদস্তি করে টাকা আনি। কাজেই খালি হাতে ফিরতে হল।

নিবারণ এবার হাতদুটি এক করে বলল: তা কর্ত্তা, আমার দামটা এবার—

বাধা দিল চরণদাস: হ্যা-হ্যা, সে আর তোমায় চাইতে হবে না নিবারণ, আর রবিবারেই তোমার টাকা দেড়টি ঠিক দিয়ে দেব।

নিবারণ বলল: কিন্তু কর্ত্তা আমার যে আর চলে না। আপনিই বিচার করুন, সেই মাঘ মাসের গুড়ের দাম। ধরুন এই পূজো পেরুলেই তো বছরে দাঁড়াবে, আমিই বা আর কত দিন ঘুরব?

চরণদাস ম্লান হেসে জবাব দিল: আরে রাম, আর তোমাকে ঘুরতে হবে না। নারাণ চিঠি লিখেছে, ক'দিনের ছুটি নিয়ে একবার গ্রামের সবাইকে দেখতে আসছে। আরে বুঝতে পারছ না, সেই জন্যেই তো কচি শশা দুটি গাছ হতে আনলাম, নারাণ বেজায় ভালবাসে কি না।

নিবারণ তবু ভরসা পায় না, বলল: সত্যি চিঠি লিখেছে তো মেজকর্ত্তা, না আমায় অমনি অমনি—

চরণদাস গলা পরিষ্কার করে বলল: আরে নিবারণ, তুমি কি আমাকে তেমন লোক ঠাউরেছ? ওরে ও তুলসী, আমার নতুন কেনা ছিটের জামার পকেট থেকে নারাণের চিঠিখানা দে ত।

তুলসী ভিতরে গেল ও তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে বলল: চিঠি তো পেলাম না বাবা। কবে এসেছে বাবা চিঠি? কই আমাদের তো দেখাও নি—

চরণদাস ক্রোধে গর্জ্জন করে উঠল: থাম্ তো তুলসী। এখন তোর একশ প্রশ্নের জবাব দিতে হবে না কি আমাকে? না, এ-সংসারে আর বাস করা চলে না। কোন কিছু এ অলক্ষণে ঘরে থাকবে না। বলি চিঠিখানা শুদ্ধ কি সিদ্ধ করে খেয়েছ?

চরণদাস রাগে গরগর করিতে লাগল। ব্যাপার সুবিধা নয় দেখে নিবারণ উঠে পড়ল, বলল: তা হলে আসছে রবিবারেই আসব মেজকর্ত্তা।

নিবারণকে নির্দ্দিষ্ট দিনে ঋণশোধের নিশ্চিত নির্দ্দেশ জানিয়ে চরণদাস মুখ ফিরিয়েই বলে উঠল: সবাই শুধু আমার দোষই দেখে, আমিই কাউকে দেখতে পারি না, কারু মঙ্গল কামনা করি না। কিন্তু নিত্য পাওনাদারের এ তাগিদ গোছান যে কি ব্যাপার তা ত কেউ বুঝবে না।

বিরাট হতাশায় চরণদাসের কণ্ঠ শুদ্ধ হয়ে এল। স্তিমিত চোখের লাল শিরাগুলি অশ্রুর বন্যায় ডুবে গেল। তাড়াতাড়ি সে গামছা দিয়ে চোখ মুছল, পাছে তুলসী দেখে ফেলে।

দাদার আগমন-প্রতীক্ষায় তুলসীর মন আচ্ছন্ন হয়েছে। এবার সে শুধাল: দাদা কবে আসছে বাবা? এই রবিবারই তো? ও কি মজাই যে হবে। তা হলে শশা দুইটি আমার ছোট বাক্সে আমি তুলে রাখি, নন্তটা আবার যা লোভী, লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক খেয়ে ফেলবে।

বাইরে নন্তর গলা শোনা গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নন্ত বলিল: ডাকপিয়ন বসে আছে বাবা, তোমায় খুঁজছে।

চরণদাসের কানে দেবতার অভয়বাণী বেজে উঠল। তার বুকটা আনন্দের দ্রুত স্পন্দনে নাচতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে সে শুধাল: কেন খুঁজছে রে?

নন্তু জবাব দিল : কি জানি কেন ? চিঠি না কি আছে তোমার নামে।

চরণদাসের স্বর্গরথ থেমে গেল। বিরক্ত হয়ে সে বলিল : চিঠি আছে, তো তুই নিয়ে এলি না কেন ?

নন্তু তেমনি নির্ব্বিকার ভাবেই জবাব দিল : আমায় দিল না যে। বলল, তোমার বাবাকেই ডেকে দাও।

চরণদাসের মুখ আবার আনন্দ-সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে রাঙ্গিয়ে উঠল। নন্তুর হাতে না দিয়ে পিওন যখন তাকেই যেতে বলেছে বিশেষ করে, তখন নিশ্চয় টাকা এসেছে। নারাণ তো আর অবিবেচক নয়। মাসের আজ সতের তারিখ। নিশ্চয় সে টাকা পাঠিয়েছে

হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে চরণদাস বলল : মা তুলসী, তাকের উপর হতে তোর দাদার সেই কালীভরা কমলটা আন তো।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সহর হতে ফিরবার পথে দু-আনা দিয়ে নারাণ একটি ফাউণ্টেন পেন কিনেছিল। কয়েকদিন ব্যবহারেই ওর আকর্ষণ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারপর হতে কলমটা তাকের উপরই আশ্রয় লাভ করেছে। পুত্রের এই আদরের জিনিষটাকে চরণদাস পরম গর্ব্বের চোখে দেখে নারাণের কাছে চিঠি লিখতে বা টাকার রসিদে সই করতে এই কলমটাই ব্যবহার ক'রে একটু আত্মপ্রসাদও অনুভব করে।

কলম আনতে তুলসী ভিতরে যেতেই নন্তুর চোখে পড়ল দাওয়ার দুটি কচি শশা। উৎসাহে সে চীৎকার করে উঠল : বাঃ কি চমৎকার দুটি শশা।

কলমটি হাতে করে দৌড়ে আসতে আসতেই বলল : খবরদার বলছি—ও-দুটিতে যেন চোখ দিও না।

নন্তু দমবার পাত্র নয়। শশা দুটি হাতে নিয়ে সে বলিল : কেন শুনি ? তুই রাক্ষুসী বুঝি এ দুটিতে চোখ লাগিয়েছিস্।

তুলসী জবাব দিল : ইস্, তোর মত হ্যাংলা কি না আমি যে যা পাব তাই খাব। জানিস নন্তু, দাদা বাড়ী আসছে যে,—তাই তো বাবা শশা দুটি তুলে এনেছে।

নন্তুর ঝড়ের মত তীব্র তেজস্বিতা মুহূর্ত্তে বসন্ত-বাতাসের মত শান্ত হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত আনন্দে ওর মুখচোখ হেসে উঠল। দিদির হাতে শশা দুটি দিয়েও বলল : সত্যি রে দিদি, মাইরি বলছিস্—দাদা আস্‌ছে ?

তুলসী জবাব দিল : মাইরি বলছি। বাবা যে বলছিল এইমাত্র।

নন্তু এবার বাবাকে জড়িয়ে ধরে সাগ্রহে শুধাল : দাদা কবে আসবে বাবা ? আমি কিন্তু নৌকার ঘাটে যেয়ে আগে হতে দাঁড়িয়ে থাকব, তুমি না বলতে পারবে না তা বলে রাখছি।

কলম নিয়ে দাওয়া হতে নামতে নামতে ভাইবোনের যুদ্ধ ও সন্ধির সামান্য কথা কয়টি চরণদাসের কানে গেল। অপরিসীম লজ্জার বেদনায় তার মনের উপর বিষাদের ছায়া নামল। নারাণ ইদানীং কোন পত্র লেখে নি আর তার বাড়ী আসবার কোন সম্ভাবনাও নাই। শুধু নিবারণের হাত হতে রেহাই পাবার জন্যই পুত্রের গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনের মিথ্যা সংবাদ সে সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে এই দুটি কিশোর-কিশোরীর মনের আকাশে আনন্দের রামধনু জেগেছে। ওদের এ স্বপ্ন ভেঙ্গে দিতে মনে আঘাত লাগে, নিজের মিথ্যাভাষণ তাতে ওদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। আবার প্রকৃত কথাটি প্রকাশ না করলে, রূঢ় বাস্তবের আঘাত ওদের মনের স্বপ্ন-প্রাসাদ যেদিন ভেঙে পড়বে, দাদা যখন বহু প্রতীক্ষায়ও আসবে না, সে দিনের আঘাত বড় দুঃসহ হয়ে বাজবে ওদের কিশোর বুকে।

চরণদাস চুপ করে দাঁড়াল। বুকের তল হতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সহসা সংসারটা তার চোখে বড় দুর্ব্বহ হয়ে দেখা দিল। বর্ত্তমানের অশেষ দুঃখকষ্টের আঘাত তবু সহ্য করা যায়, কারণ না করে উপায় নাই। কিন্তু বংশের অতীত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার বিফল চেষ্টায় অনবরত যে মিথ্যা ও ফাঁকির মুখোস পরে তাকে জীবন কাটাতে হয়, তা একেবারেই অসহ্য।

বায়ুকোণের আকাশের মত চরণদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাবাকে চুপ করে থাকতে দেখে নন্তু বলল : কৈ বাবা, তুমি গেলে না এখনও ? পিওন যে বসে আছে।

চরণদাসের চমক ভাঙল : হ্যাঁ যাচ্ছি।

এক পা এগিয়েই আবার ফিরে এসে বলল—আর দেখ্ তুলসী, এ শশা ছুটি তোরা ছুজনে মিলে মিশে খেয়ে ফেল। নারাণের বাড়ী আসতে তো এখনও কয়েকদিন দেরী হবে। ততদিন গাছে আরও কত শশা হবে। অনেক ছোট ছোট শশা এবার ফলেছে গাছে।

আকাশে আবার মেঘ ডেকে উঠল গুড় গুড়ুম্।

গুডমেব শব্দ করতে করতে চরণদাস বেরিয়ে গেল।

পথের পাশে নিত্যানন্দের বাড়ী। দাওয়ায় বসে সে হুকা টানছিল, হেসে বলল—কলম হাতে করে কোথায় যাচ্ছ মেজকর্ত্তা? আকাশের যে বড় হাঁকডাক সুরু হয়েছে।

চরণদাস ব্যস্ত ভাবে বলল, তার গলায় আত্মপ্রসাদের আমেজ: চলেছি একটু তাড়াতাড়ি। নারাণ টাকা পাঠিয়েছে কি না তাই ফরমে সই করতে হবে বলে কলমটা নিয়েই চলেছি।

নিত্যানন্দ বিস্মিত হয়ে বলল: নারাণ চাকরী পেয়েছে, কই এ কথা তো আমাদের বলনি মেজকর্ত্তা?

চরণদাস ফাঁপড়ে পড়ল, একটু ইতস্তত: করে বলল: তা হ্যাঁ কি জান, অল্প টাকার চাকরী, মাত্র পঞ্চান্ন টাকা, তাই নারাণ আগে হতে আমাকেই জানায় নি। তা নইলে তোমরা হলে নারাণের শুভানুধ্যায়ী, তোমরাই জানতে সকলের আগে।

নিত্যানন্দ এ কথায় অনুগৃহীত হয়ে গেল, বলল: এবার মেজকর্ত্তা তা হলে আমার টাকা আড়াইটে—

চরণদাস যেতে যেতেই বলল: এখন বড্ড তাড়াতাড়ি ভাই ফিরে এসে সব কথা হবে। তা তোমার টাকার জন্ম ভেব না, ও কাল সকালেই পেয়ে যাবে। জান তো, নারাণ আমার দেনাদায়েক হওয়া মোটেই ভালবাসে না।

নিত্যানন্দ বলল: তা আর হবে না? কোন্ বংশের ছেলে সে, তাও ত দেখতে হবে।

বংশের সুখ্যাতিতে চরণদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে আবার ফিরে এল: সে সব তো তোমার অজানা নয় নিত্যানন্দ, যদু রায়ের বংশের কেউ কখনও কারও কাছে হাত পেতেছে এ কথা কারও বলবার সাধ্য নাই। চিরকাল উপুড় হাত করাই তাদের বংশের অভ্যাস। বংশের ধারা যাবে কোথায় বল?

একটা বিদ্যুৎ চমকে গেল মাথার উপর দিয়ে। মেঘ হুঙ্কার দিল আবার।

চরণদাস পথে নামল। জঙ্গলের ভিতরকার 'হালট' দিয়ে সোজা না যেয়ে সে ঘোষবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের পথ ধরল।

চণ্ডীমণ্ডপে হরিঘোষ একা বসে ছিল মাদুর বিছিয়ে। পাশার আড্ডা সেদিন তখনও জমে নি।

চরণদাস হেসে শুধাল ফাঁকা গলায়: ঘোষদা একা বসে যে, আর সব কোথায়?

ঘোষ উত্তর দিল: এখনও তো কেউ এসে পৌঁছল না। আর জান কি মেজকর্ত্তা, আজকাল কেউ বড় একটা আর আসেও না।

চরণদাস হেসে বলল: কেন বল তো ঘোষদা, বুড়ো বয়সে জ্ঞাতদের সব ঘরের মায়া আবার নতুন করে গজাল না কি?

নিজের রসিকতায় চরণদাস হো হো করে হেসে উঠল। ঘোষ তাতে যোগ না দিয়ে বলল: জান কি মেজকর্ত্তা, সংসারের অভাব অনটনের চাপে কারও মনে আর সখ আহ্লাদের ইচ্ছা হয় না।

চরণদাস তেমনি হেসেই জবাব দিল: আরে দাদা, সংসার আছে বলেই তার কাছে মাথা কেটে দিতে হবে না কি? সংসারে দুঃখকষ্ট তো আছেই; তাই বলে সব ছেড়ে হাত-পা-কাটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকলে কি চলে?

চরণদাস আবার হেসে উঠল। ভাঙা বাঁশীর রুদ্ধ রন্ধ্রে কোন্ অজানা পথে অকালবসন্তের চঞ্চল বাতাস এসে তাকে আজ নিরর্থক মুখর করে তুলেছে, তার সুরে শুধুই আজ আনন্দ-সঙ্গীতের আবেগ-উচ্ছ্বাস!

চরণদাস বলল: ও তুমি ভেব না ঘোষদা। তুমি ছক পেতে বস। আমি এসেই সব ঠিক করে নেব।

ঘোষ শুধাল: কোথায় চলেছ ব্যস্ত হয়ে এই দুর্য্যোগ মাথায় করে?

চরণদাস জবাব দিল গর্ব্ব-মিশ্রিত উৎফুল্ল স্বরে : যাচ্ছি একটু তারিণীদার দোকানে, ডাকপিওন সেখানে বসে আছে। নারাণ টাকা পাঠিয়েছে কি না।

তুলসী-তলায় সন্ধ্যাদীপ দিয়ে তুলসীর মা গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল, বলল : ঠাকুর, নারাণকে আমার ভালয় ভালয় বাড়ী নিয়ে এস, তোমার পূজোয় আমি সন্দেশ-ভোগ দেব।

নন্তু দাওয়ায় বসেছিল, বলল : ও দিদি, আজই দাদার কাছে চিঠি লিখে দে বলছি, এবার পূজায় আমাদের খুব ভাল জামা চাই, গেল বছরের চেয়ে ভাল। ঠিক যেন ঝিল্‌মিল্‌ করে। মা-দুর্গার আঁচল দেখিস্‌ নি, ঠিক তেমনি—

তুলসী সস্নেহ রোষে বলল : থামা এখন তোর ফরমাস। আগে এখানে প্রণাম কর।

দুজনে তুলসী-তলায় মাথা নোয়াল।

রণক্লান্ত সৈনিকের মত চরণদাস এসে দাওয়ায় বসল অত্যন্ত নীরবে, ক্লান্তপদক্ষেপে। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে সামনের মাঠের দিকে তাকাল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ভাদ্রের দুর্য্যোগরাত্রি দ্রুতপদক্ষেপে মাঠের পথ ধরে এগিয়ে আসছে যেন।

তুলসীর মা শুধাল : হ্যাঁগো, ক'টাকা পাঠাল নারাণ? নির্ব্বিষ ভুজঙ্গের ব্যর্থ আক্রোশে চরণদাস গর্জ্জে উঠল, সমস্ত শরীরটাকে কাঁপিয়ে অনবরত বলতে লাগল : পাঠিয়েছে ছাই। তোমার গুণধর ছেলে আমার গলায় দড়ি না দিয়ে ছাড়বে না। হতচ্ছাড়া, বেকুব—কাণ্ডজ্ঞানটাও কি ভাতে দিয়ে খেয়ে আছিস! মাসের নামে মাস কেটে যাচ্ছে, সেদিকে বাবুর খেয়াল নাই, আবার বুড়ো বাপের উপর এক হাত নিয়ে বাহাদুরী করে চিঠি লিখেছেন—

তুলসীর মা বাধা দিল : তুমি অমন করছ কেন? চিঠিতে কি লিখেছে? বাবা আমার ভাল আছে তো.

চরণদাস আহত সর্পের মত ফোঁস্‌ করে উঠল : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমার বেম্পতি পুত্তুর বেশ ভাল আছে। কেন থাকবে না? তার ঘাড়ে তো আর পাওনাদারের তাগিদ নেই, সংসারের খাই খাই নেই—তুলসীর মা ব্যাকুলকণ্ঠে শুধাল : তবে তুমি অমন করছ কেন?

তার দিকে একটু চেয়ে থেকে চরণদাস বলল : কেন করছি? আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখানে মাথা খুঁড়ে মরতে। মাসের কুড়ি ভরতে চলল। অথচ টাকা পাঠান দূরে গেল, বাবুজী চিঠি লিখেছেন খামে, তার আবার টিকিট দিয়েছেন কম। অনেক চেষ্টা করে সেদিনকার হাওলাতী টাকা হতে এক আনা পয়সা রেখেছিলাম নারাণকে বাড়ী আসতে একখানা চিঠি লিখব বলে, সুযোগ বুঝে বেটা পিওন পয়সা কয়টি কেটে নিল—

তুলসীর মা বলল : কোম্পানীর ন্যায্য পাওনা যখন হয়েছে, তখন সে পয়সা তো নেবেই, তাতে পিওনের আর দোষ কি?

মুখ বেঁকিয়ে চরণদাস বলল : দোষ আর কি? কারও কোন দোষ নাই, সব দোষ আমার। তুমি তো ফতোয়া দিয়েই খালাস। কিন্তু ও রকম ন্যায্য পাওনা আরও কত আছে তার খবর রাখ? সে সব মেটাতে হলে ঘরবাড়ী বেচে গাছতলায় দাঁড়াতে হবে তা জান?

তুলসীর মা করুণস্বরে বলল : ভগবানের মনে যদি তাই থাকে, না হয় গাছতলায়ই দাঁড়াব, তাতেই বা কি!

অশ্রুসিক্তকণ্ঠে চরণদাস বলে উঠল : তোমার আর তাতে কি? কিন্তু আমার যে তাতে মাথা কাটা যাবে, বাপ-ঠাকুর্দ্দার উঁচুমুখ নীচু হবে, দশজন হাসবে। তাই তো সব বিষয়েই আমার মাথাব্যথা, তাই তো আমি মন্দ, কারুর ভাল আমি দেখতে পারি না, ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে পায়ের উপর পা রেখে বড় আরামে আছি আমি—

অসহ্য বেদনায় চরণদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। দুই হাতে চোখ ঢেকে সে বুঝি ফুঁপিয়ে কেঁদেই উঠল

বাইরে হরিঘোষের গলা শোনা গেল : কই গো মেজ-কর্ত্তা, এই বেলা এস, পাশার ছক পেতে যে অনেকক্ষণ বসে আছি।

চরণদাস চমকে উঠল। গলাটা পরিষ্কার করে সহজ-স্বরে বলল : আজ আর যেতে পারছি না ঘোষদা, বুঝলে না, সংসারের নানান ঝঞ্ঝাট। তা তুমি ভেব না, কাল হতে আমি নিশ্চয় যাব—নিশ্চয়।

অন্তঃপুর

হিন্দু বিধবার স্বত্ব

—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ঘটনাটি খুব পুরাতন ; তবুও তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য আরম্ভ করা অসঙ্গত হইবে না। ভারতবর্ষের কোন হাইকোর্টের বিচারপতি দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত বিচারকার্য্য করিবার পরে না কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মিঃ মিতাক্ষরা কে ?" কিন্তু আজকাল এমন প্রশ্ন হয়ত সাধারণ শিক্ষিত অতি-সাধারণ ব্যক্তিও জিজ্ঞাসা করিবেন না। অবশ্য ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, বর্ত্তমানে সকলেই সকল বিষয়ে, বিশেষ করিয়া আইন-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। তথাপি এ-কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, এখন আমরা প্রত্যেক বিষয়ের মোটামুটি তথ্যগুলি জানিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এই প্রয়োজনের তাগিদে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদিতে নিত্য নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা চলিতেছে; প্রতিদিন নানাপ্রকার পুস্তক, পুস্তিকা এবং সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইতেছে। তাই, আইন-শাস্ত্র কেবলমাত্র ব্যবহারজীবী ও বিশেষজ্ঞদের 'সম্পত্তি' হইলেও, তাহার কতকগুলি বিষয় অল্প-বিস্তর সকলেই জানিতে চান। সেই কথা মনে করিয়া বিবাহিতা হিন্দু বিধবার উত্তরাধিকার সম্পর্কে সামান্য কিছু বলিবার প্রয়াস করা হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হইতেছে বিধবা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ও সর্ত্তে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে, তাহার মোটামুটি বিবরণ। বিধবার বর্ত্তমান আইনগত 'ষ্টেটাস' ভাল কি মন্দ, অথবা কি হওয়া উচিত সে-সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই, কারণ তাহা আইন-সম্পর্কীয় পত্রিকা ব্যতীত অন্যান্য পত্রিকার এলাকার বাহিরে। সুতরাং আইনের দুরূহ ধারা ও নানা পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধৃত না করিয়া যতদূর সম্ভব সরলভাবে ও সংক্ষেপে আমাদের বিষয়বস্তুটিকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুবিধার্থে প্রবন্ধটিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়াছি; যথা—বিধবার উত্তরাধিকার বিষয়ক আইনের ক্রমবিকাশের ধারা, ১৯৩৭ সনের আইন পাশ হইবার পূর্ব্বেকার অবস্থা এবং নূতন আইনে কি কি পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে। আশা করি এবার মূল প্রবন্ধ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

বুঝা যায়, প্রাচীনকালে আইনের চোখে বিবাহিতা হিন্দু রমণীর অবস্থা এতটা শোচনীয় ছিল না। স্বামীর সম্পত্তিতে স্বামীর সহিত তাহার সহ অধিকারের প্রচলন ছিল। এমন কি, মৃত্যুকালে স্বামী যদি একান্নবর্ত্তী থাকিত, তাহা হইলেও বিধবা একান্নবর্ত্তী পরিবারের সম্পত্তিতে স্বামীর অংশের উত্তরাধিকারিণী অনায়াসে হইতে পারিত। ইহা অবশ্য বৈদিক-যুগের অবসানের সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। তাহার পরে মনু, বৌধায়ন ও বশিষ্ট বিবাহিতা নারীকে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করেন। তাঁহাদের মতে যথাক্রমে পিতা, স্বামী ও পুত্রের অধীনে জীবন যাপন করাই নারী-জীবনের চরম কর্ত্তব্য বিবেচিত হয়। সুতরাং বিষয়-সম্পত্তিতে তাহাদের কোন অধিকারের প্রশ্ন জাগিতে পারে না। বৌধায়ন ও বশিষ্ঠরচিত উত্তরাধিকারীর তালিকায় কোন স্ত্রীলোকের নাম নাই। বৌধায়ন বেদের একটি বিশিষ্ট অংশের উল্লেখ করিয়া বলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তরাধিকারের দাবী কোনমতেই থাকিতে পারে না।

কালক্রমে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে উক্ত বিধানের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

উত্তরাধিকারের নিয়ম অনুসারে একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি ক্রমশঃ পিতা কিংবা স্বামীর দুর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের হস্তে অর্পিত হওয়ার দরুণ কন্যা অথবা বিধবার ভরণ-পোষণের সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর সর্ব্বপ্রথম এই সমস্যার আংশিক সমাধান করেন। বিজ্ঞানেশ্বর রচিত যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতির টীকা সুপরিচিত। ইহারই নাম হইতেছে মিতাক্ষরা। মিতাক্ষরায় পিতা অথবা স্বামীর নিজস্ব ('একান্নবর্ত্তী' সম্পত্তির অংশ নয়) সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারিণী হইবার বিধান রহিয়াছে। স্বামীর মৃত্যুকালে পুত্র, পৌত্র কিংবা প্রপৌত্রদের কেহ বর্ত্তমান না থাকিলে তাহার উত্তরাধিকারের দাবী আসিতে পারিবে; নতুবা তাহার অধিকারের কোন কথা উঠিবে না। কন্যার বেলায় মৃত পিতার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ও বিধবার পরে তাহার দাবী বিবেচিত হইবে। পিতা কিংবা স্বামীর 'একান্নবর্ত্তী' সম্পত্তিতে কন্যা বা বিধবার কোন প্রকার দাবী নাই। তখনকার দিনে একান্নবর্ত্তী থাকিয়াও পৃথক্ সম্পত্তি করিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। কাজেই বিজ্ঞানেশ্বরের নূতন বিধান কতখানি প্রয়োজনে লাগিয়াছিল, তাহা বলা কঠিন।

বিজ্ঞানেশ্বরের পরে যিনি এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি হইতেছেন জীমূতবাহন। তাঁহার অবস্থান-কাল ত্রয়োদশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোন যুগ। তিনি সর্ব্বজনবিদিত দায়ভাগ রচনা করেন। দায়ভাগ সকল স্মৃতি ও শ্রুতির সার লইয়া রচিত হইয়াছে। জীমূতবাহন বিধবাকে স্বামীর 'একান্নবর্ত্তী' ও পৃথক্ এই দুই সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারিণী হইবার বিধান প্রদান করেন। কিন্তু নানাপ্রকার সর্ত্তের দরুণ এই অধিকার পূর্ণাঙ্গ হয় নাই।

তাহার পরে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিবর্ত্তন নজরে পড়ে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও প্রথমতঃ এ দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর 'ষ্টেটাস' ক্রমশঃ খারাপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহার কারণও আছে। ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে সাধারণতঃ দেশীয় পণ্ডিতগণ বিচারকদিগকে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্পর্কে সাহায্য করিতেন এবং অধিকাংশ বিষয়ে বিচারকদিগকে নির্ভর করিতে হইত উক্ত আইনের ইংরেজী অনুবাদের উপর। পণ্ডিতগণ যে সর্ব্বদা পক্ষপাতহীন থাকিতেন তাহা নহে; ইংরেজী অনুবাদেও হয়ত কিছু কিছু ভুল থাকিত। যাহাই হউক, পরে কতকগুলি আইন পাশ করা হয়। তাহার ফলে হিন্দু স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধি-ব্যবস্থা কি রকম দাঁড়ায় তাহাই এবার বলিতে হইবে।

মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ অনুসারে স্বামীর মৃত্যুকালে তদীয় পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্রদের প্রত্যেকে কিংবা যে কোন একজন বর্ত্তমান থাকিলে বিধবা স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে না। ইহা 'একান্নবর্ত্তী' ও পৃথক্ দুই সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পূর্ব্বোক্ত উত্তরাধিকারীদের দাবী সর্ব্বপ্রথম আসে। কেবলমাত্র তাহাদের অবর্ত্তমানে বিধবা উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে। মিতাক্ষরা অনুসারে 'একান্নবর্ত্তী' সম্পত্তিতে স্বামীর অংশ কোন বিধবা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিতে পারে না। সে অংশ স্বামীর যৌথ-সম্পত্তির সহিত যোগ হয়। তবে স্বামীর পৃথক্ সম্পত্তি বিধবা লাভ করিতে পারে। 'একান্নবর্ত্তী' সম্পত্তির বেলায় দায়ভাগে পৃথক্ বিধান দৃষ্ট হয়। দায়ভাগের অন্তর্ভুক্ত একান্নবর্ত্তী পরিবারে স্বামী অন্যান্য অংশীদারের সহিত একত্র সম্পত্তির মালিক হইলেও তাহার পৃথক্ স্বত্ব থাকে, যাহার জন্য তাহার মৃত্যুর পর উক্ত অংশ যৌথ-সম্পত্তির সহিত মিলিত হইবার পরিবর্ত্তে নিজস্ব উত্তরাধিকারীদের দখলে আসে। সুতরাং স্বামীর নিকটতর উত্তরাধিকারী না থাকিলে তদীয় বিধবা 'একান্নবর্ত্তী' সম্পত্তির ন্যায্য অংশের অধিকারিণী হইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এই ভাবে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে বিধবার যে-অধিকার জন্মে তাহা সীমাবদ্ধ। ইহাকে "বিধবার স্বত্ব" বলা হয়। কথাটির একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিধবা ইচ্ছানুযায়ী দান-বিক্রয় করিতে পারে না। সম্পত্তির আয়ের উপরেই কেবল তাহার অধিকার থাকে, এবং তাহার মৃত্যুর পর উক্ত সম্পত্তি স্বামীর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পিত হয়। শ্রেণীগত আচার অনুসারে কোন কোন স্থানে বিধবা এই সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিতে

পারে। বাঙ্গালাদেশে এ রকম কোন নিয়ম নাই। তবে স্বামীর পৈত্রিক সম্পত্তি কোন বিধবাই দান বিক্রয় করিতে পারে না। যে কারণে এই বিধানের সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেছে বিধবার ভরণ-পোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেও প্রকৃতপক্ষে বিধবা ভরণ-পোষণের উপরে আর কিছু দাবী করিতে পারে না। সম্পত্তির আয়টুকু সে কেবল ইচ্ছানুসারে খরচ করিতে পারে। এই আয়ের অর্থ দ্বারা যদি সে স্থাবর কিংবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করে, আর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহা যদি কাহাকেও দান না করে, তাহা হইলে নূতন সম্পত্তি স্বামীর উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকে।

এই আইন সংশোধনের নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি বিল উপস্থাপিত হয়; কিন্তু তাহা গৃহীত হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসরে এই জাতীয় একটি বিল গৃহীত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে স্ত্রীলোককে সম্পত্তি সম্পর্কে অধিকতর সুবিধা প্রদান করা।

এই বিল অনুসারে দায়ভাগের অন্তর্ভুক্ত কোন হিন্দু উইল না রাখিয়া মৃত হইলে পুত্র-পৌত্রাদির সহিত বিধবাও এক অংশের অধিকারিণী হইবে। এ-অংশ পুত্র-পৌত্রাদির অংশের সমান হইবে। স্বামীর পৃথক্ সম্পত্তির ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। উক্ত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকিলে সে যে-অংশের উত্তরাধিকারী হইত, বিধবা পুত্রবধূ সেই অংশের উত্তরাধিকারিণী হইবে। মৃত পুত্রের পুত্র অথবা পৌত্র বর্ত্তমান থাকিলে তাহারা যে-অংশ লাভ করিত, তাহার তুল্য অংশ বিধবা পুত্রবধূ লাভ করিবে। ঠিক এই ভাবে মৃত পুত্রের বিধবা পুত্রবধূও সম্পত্তির এক অংশের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারিবে। মিতাক্ষরার অন্তর্ভুক্ত যে কোন মৃত ব্যক্তির 'একান্নবর্ত্তী' ও পৃথক্ সম্পত্তি উইল না থাকিলে উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে বিভক্ত হইবে। এবং সে ব্যক্তির জীবিত-কালে তদীয় সম্পত্তির উপরে তাহার যে স্বত্ব ছিল, তাহার বিধবাও সেই স্বত্ব উপভোগ করিবে। পূর্ব্বে মিতাক্ষরার অন্তর্ভুক্ত 'একান্নবর্ত্তী' সম্পত্তির কোন অংশ বিধবার প্রাপ্য ছিল না। নূতন আইন অনুসারে বিধবা প্রাপ্ত অংশ ইচ্ছানুযায়ী গোটা সম্পত্তি হইতে পৃথক্ করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু এই অংশ সে দান-বিক্রয় করিতে পারিবে না। অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় কেবল মাত্র সম্পত্তির আয়ের উপরেই তাহার অধিকার থাকিবে। তাহার মৃত্যুর পর উক্ত অংশ স্বামীর পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী লাভ করিবে। এই আইন অনুসারে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু বিধবা মৃত স্বামীর পুত্র-পৌত্রাদির (যদি কেহ স্বামীর মৃত্যুকালে বর্ত্তমান থাকে) সহিত স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশের উত্তরাধিকারিণী হইবে এবং ইচ্ছানুযায়ী নিজ অংশ পৃথক্ করিয়া লইতে পারিবে।

সোভিয়েট রুশিয়ায় জননী ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং স্বার্থ সংরক্ষণ

সোভিয়েট রুশিয়ায় জনসাধারণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে যে-সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে জননী ও শিশু সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ এইখানেই স্বাস্থ্য-বিভাগের অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করা যায়। Institute for the Protection of Motherhood and Childhood নামক প্রতিষ্ঠান জননী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কাজের সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; (১) চিকিৎসা বিভাগ, (২) সামাজিক বিভাগ, (৩) স্ত্রীলোক ও শিশুদের আইন-অধিকার বিভাগ।

চিকিৎসা বিভাগের কার্য্য হইতেছে সাধারণ হাসপাতাল, প্রসূতি হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। স্ত্রীলোক এবং তিন বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদের স্বাস্থ্য-বিষয়ক নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদানের নিমিত্ত স্থানে স্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও চিকিৎসা বিভাগের একটি কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত কতকগুলি স্বাস্থ্য-বিষয়ক গবেষণাগারে নিয়মিত ভাবে নূতন নূতন বিষয় লইয়া গবেষণা চলিতেছে।

শিক্ষাবিস্তার; খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ; গার্হস্থ্য কর্ম্ম ও শিশু-পালন বিষয়ক আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে সভা-সমিতি, মিউজিয়াম, প্রদর্শনী প্রভৃতির ভার ন্যস্ত হইয়াছে সামাজিক বিভাগের উপর।

ীয় বিভাগ কর্ত্তৃক কতকগুলি স্বত্ব সংরক্ষণ সমিতি পরিচালিত হইতেছে। ইহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে প্রয়োজন মত স্ত্রীলোকদের বিনা পারিশ্রমিকে আইন-ঘটিত উপদেশ প্রদান করা। এই কার্য্যের নিমিত্ত বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতগুলির সহিত উক্ত সমিতির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মেয়েদের অন্যান্য অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নও এই সমস্ত সমিতিতে আলোচিত হয়।

শিশু প্রতিপালন

ভারতবর্ষে শিশু-মৃত্যুর হার অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত বেশী। ইহা নিবারণের জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহার উদ্ভাবনকল্পে বিশেষজ্ঞগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, দেশব্যাপী আন্দোলন না হইলে এ প্রচেষ্টা সার্থক হইতে পারে না। এই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ হইতেছে অন্যান্য দেশে শিশু-মৃত্যু নিবারণ সম্পর্কে কি কি পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার সহিত পরিচিত হওয়া এবং সম্ভব হইলে আমাদের অবস্থানুযায়ী কোন কোন বিষয় পরীক্ষা করা।

যে কয়টি রোগে সাধারণতঃ শিশুদের অকালমৃত্যু ঘটে, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে উদরাময়। এই রোগের আক্রমণ হইতে যাহাতে শিশুদিগকে রক্ষা করা যায় এবং অল্প ব্যয়ে অথচ উপযুক্ত ভাবে শিশু-প্রতিপালন করা যাইতে পারে, তজ্জন্য নিউজিল্যাণ্ডের একজন বিচক্ষণ চিকিৎসকের কন্যা মিস ট্রাবী কিং দীর্ঘকাল গবেষণার পর কতকগুলি পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন। ট্রাবী কিং প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত, সহজসাধ্য ও শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ। এই প্রণালী প্রচলনের পূর্ব্বে ডুনাদিন-এ গ্রীষ্মকালীন সংক্রামক উদরাময় রোগে শিশু-মৃত্যুর হার ছিল হাজার করা ২৫। পাঁচ বৎসর পরে সংখ্যা হয় হাজারকরা ৯; পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে হাজারকরা ৪; তৎপরবর্ত্তী পাচ বৎসরে হাজারকরা একেরও কম। তাহার পরে তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত রোগে দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কোন শিশুরই মৃত্যু হয় নাই। বর্ত্তমানে নিউজিল্যাণ্ডে শিশু-মৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই প্রণালীকে মোটামুটি চার ভাগে বিভক্ত করা যায়; (১) প্রসবের পূর্ব্বে শিশু প্রতিপালন সম্পর্কে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করা, (২) প্রসবের পরে নবম মাস পর্য্যন্ত কি ভাবে স্তন্যদুগ্ধ উপযুক্ত পরিমাণে বজায় রাখা যাইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া, (৩) স্তন্যদুগ্ধের অভাব ঘটিলে কি উপায়ে অন্য দুগ্ধকে স্তন্যদুগ্ধের সমতুল্য করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া, (৪) অল্প খরচে পূর্ব্বোক্ত দুগ্ধ প্রস্তুতের উপকরণ সরবরাহ করা এবং সাধ্যমত ইক্ষুজাত শর্করা ও পেটেণ্ট ফুড ইত্যাদি ব্যবহার না করা। আজকাল অধিকাংশ শিশুর পেটেণ্ট ফুডই হইতেছে একমাত্র খাদ্য। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডে শতকরা ৮৭টি শিশু প্রধানতঃ স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করিতেছে। ট্রাবী কিং প্রণালী অনুযায়ী স্বাভাবিক খাদ্যের সাহায্যে শিশু-প্রতিপালন করিবার পদ্ধতি বহু স্থানে প্রচলিত হইয়াছে।

গৃহসজ্জা

সুন্দর ভাবে গৃহসজ্জা করিতে হইলে বহুদিকে দৃষ্টি দিতে হয়। আজকাল বড় বড় শহরে যে সকল আধুনিক গৃহ দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই চক্ষুকে পীড়া দেয়। অপরিসর ঘরে কতকগুলি বিলাতী মতের দীর্ঘায়তন টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি যে ভাবে রাখা হয়, তাহাতে ঘর-খানি যে কেবল দেখিতেই খারাপ লাগে তাহা নহে, ঘরের ভিতরে স্বাভাবিক ভাবে চলা-ফেরাও করা যায় না। ঘরের ভিতরে কি পরিমাণ স্থান মুক্ত রাখা ও কোথায় কোন্ জিনিষটি রাখিলে ঘরের শোভা বর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়ে অল্প-সংখ্যক লোকেরই রুচির পরিচয় লাভ করা যায়। বিশেষতঃ এ দিক্ দিয়া ক্রমশঃ দেশে যে ফেরঙ্গ রুচির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহা ভয়াবহ। আসবাবপত্র খুব কম, কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিষ রহিয়াছে, এইরূপ সজ্জিত ঘর আমাদের দেশীয় রুচিসঙ্গত। এরূপ ঘর আজকাল আমরা কয়টা দেখিতে পাই?

নারী-সমিতি

—শ্রীঅমলা দেবী

[১]

ডাক্তার বিজনমোহন মজুমদারের সহরে খুব নামডাক। রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। আহার ও নিদ্রার জন্য ঘণ্টা-কয়েক ছাড়া দিবারাত্র বাড়ীর বাহিরে কাটাইতে হয়। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বিজলীপ্রভা মজুমদারও সহরে তথা বাঙ্গালাদেশে খ্যাতনাম্নী। তিনি নিখিল বঙ্গ নারী-সমিতির সেক্রেটারী। বাঙ্গালার নারী-জাগরণ তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। তিনিও অত্যন্ত ব্যস্ত। সমিতির কাজে তাঁহাকে তাঁহার অধিকাংশ সময় আফিসে কাটাইতে হয়। অতএব ডাক্তারের গৃহস্থালীর ভার ঝি ও চাকরের উপরেই ন্যস্ত।

বেলা তিনটা; ডাক্তার বিজন শয়নকক্ষে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দৈনিক সংবাদপত্রখানি পাঠ করিতে-ছিলেন। সহসা ললাটদেশে প্রায় অর্দ্ধ ডজন কুঞ্চন-রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া নিম্নলিখিত সংবাদটি মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন।

"একজন সহকর্ম্মী চাই। বয়স পঁচিশের বেশী নয়; সবল, স্বাস্থ্যবান্, সুশ্রী, সুশিক্ষিত ও কর্ম্মক্ষম। বেতন গুণানুযায়ী। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।"

শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবী।

সেক্রেটারী—নিখিল-বঙ্গ নারী-সমিতি।

তারপর, ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "বয়স পঁচিশ—সবল - স্বাস্থ্যবান্,—সুশ্রী—সহকর্ম্মী - মহামুস্কিলে ফেললে দেখছি!"

ঠিক এই সময়ে শ্রীমতী বিজলীপ্রভা টুকটুক করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কহিলেন, "তুমি কি কোথাও বেরুবে?"

মিঃ মজুমদার কহিলেন, "আমি ঘণ্টা খানেক পরে বেরুবো।" কথা শেষ করিতে না করিতেই মিসেস্ মজুমদার যাইতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, "তা' হলে আমি তোমার গাড়ী নিয়ে চললুম, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব; আমার গাড়ী খোকাদের আনতে স্কুলে গেছে—"

মিঃ মজুমদার বাধা দিয়া কহিলেন, "একবার শোন ত'?"

—"কেন? আমার জরুরী কাজ, নষ্ট করবার সময় নেই।"

- "পাঁচ মিনিট—একটা দরকারী কথা—"

মিসেস্ মজুমদার বিরক্ত মুখে কাছে আসিয়া কহিলেন, "কি বলবে চট করে বলে ফেল, আমার বসবার সময় নেই।"

মিঃ মজুমদার সাম্‌নের চেয়ারটা দেখাইয়া কহিলেন, "আরে বস না ছাই! আমার কাছে পাঁচ মিনিট বসলে তোমার সমিতির গোল্লায় যাবার ভয় নেই!"

অগত্যা মিসেস্ মজুমদারকে চেয়ারে বসিতে হইল, কিন্তু ভাব দেখিয়া মনে হইল, তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি-তেছেন।

মিঃ মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের সমিতির কোন ঘটকালী ডিপার্টমেণ্ট আছে না কি?"

মিসেস্ মজুমদার ভুরু কুঁচকাইয়া কহিলেন, "অর্থাৎ?"

—"অর্থাৎ এই বিজ্ঞাপনটা দেখলেই বুঝতে পারবে—" বলিয়া খবরের কাগজটি আগাইয়া দিলেন।

মিসেস্ মজুমদার কাগজটাতে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, বুঝতে পেরেছি। আমাদের আফিসে একজন সহকর্ম্মী চাই, তার জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এতে রসিকতা করবার কিছু নেই তো?"

মিঃ মজুমদার গম্ভীর বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহকর্ম্মী শব্দটির অর্থ?"

—"'সহকর্ম্মী শব্দটির অর্থ' জান না না কি? সত্য সত্য বিলেত থেকে ফিরেছ বলে জানা ছিল না—"

—"আরে চটছ কেন? সবাই সব জিনিস জানে না-কি? তা' ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই তো তাই! স্বামী যা' জানে না, স্ত্রী তা' শিখিয়ে দেবে, স্ত্রী যা' জানে না স্বামী তা' শিখিয়ে দেবে। এই দেখ, তুমি ডিপথেরিয়ার symptoms জান, জান না, জিজ্ঞেস কর বলে দেব…"

—"সত্যি তুমি seriously প্রশ্ন করছ?"

—"Seriously? নিশ্চয়! এ রকম seriously আমি আমার appendicitisএর রোগীকেও কোন দিন প্রশ্ন করিনি—"

—"সহকর্ম্মী'র অর্থ সাহায্যকারী। মফঃস্বলে প্রত্যেক জেলায় আমাদের শাখা-সমিতি খোলা হয়েছে; সর্ব্বদা তাদের খবর নিতে হয়, আদেশ, উপদেশ দিতে হয়; সেইজন্য চিঠি-পত্র লেখা অত্যন্ত বেড়ে গেছে; একজন assistant না হলে একা আর পেরে উঠছি না—"

—"কিন্তু যে qualificationগুলি চেয়েছে, তাতে 'সহকর্ম্মী'র অর্থ অন্যরকম মনে হচ্ছিল। 'সহকর্ম্মী'র যাগগায় 'পাত্র' লিখলেই তোমাদের বিজ্ঞাপনটিকে প্রজাপতি-আফিসের বিজ্ঞাপন বলে চালিয়ে দেওয়া যায়—"

—"প্রজাপতি আফিসের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি হয়তো খুব interested হতে পার,কিন্তু ওসব জানবার আমার সময়ও নেই, প্রয়োজনও নেই।" একটু মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "প্রজাপতি আফিসের বিজ্ঞাপন পড়বার আগে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখো—"

—"দেখেছি বলেই তো ভয়!" তারপর ঔৎসুক্যপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবল, স্বাস্থ্যবান্, সুশ্রী যুবকটি কি বিশেষ করে তোমাকেই সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হচ্ছেন?"

—"আজ্ঞে হাঁ—কিন্তু তাতে আপনার হৃদয়-দহনের কোন প্রয়োজন নেই; সম্প্রতি আমার একত্রিশ চলছে—"

—"কিন্তু আমি যে চল্লিশ! মোটা, কালো, মাথায় টাক, চুলে পাক। আর তুমি,—তন্বী, গৌরাঙ্গী! তোমার—ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশপাশ! ও রকম একজন আঁটসাঁট তরুণ helpmate পেলে এ ঢলঢলে বুড়োকে কি মনে ধরবে? তা' ছাড়া তুমি তো শুনেছি 'বিবাহ-বিচ্ছেদ'এর প্রচণ্ড পাণ্ডা!...আমার দফা তুমি সারলে দেখছি!"

মিসেস মজুমদার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, "তোমার আজ হয়েছে কি! এ রকম তো কখনও দেখিনি! যখন ভাবনার প্রয়োজন ছিল, তখন বেশ নিশ্চিন্ত ছিলে; প্রয়োজন যখন গেছে ফুরিয়ে, তখন তোমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই কোন তরুণ সাহিত্যিকের পাল্লায় পড়নি তো?"

—"না পড়িনি, কারণ অবসর নেই। কিন্তু বিজলী দেবী! একজন মাঝ-বয়সী বুড়োসুড়ো গোছের কোন আফিস থেকে retire করা লোক রাখলে ভাল হয় না? তোমার জন্যে বলছি না; ধর, আরও তো মেয়েরা আছেন, যাদের বয়স কম, অতএব ভাবপ্রবণতা বেশী? তাঁদের মধ্যে ও রকম এক জন ছোক্‌রা galloping phthisisএর রোগীর চেয়েও বিপজ্জনক নয় কি? ...আমার মনে হয়..."

—"তোমার যা' মনে হয় হোক্, তাতে আমাদের ক্ষতি নেই। তুমি এখনও সেই nineteenth centuryর একটা অন্ধকার ভ্যাপসা কোণে বসে আছ।"

মজুমদার চারিদিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কই না তো।"

মিসেস্ মজুমদার বলিতে লাগিলেন, "হাঁ্যা তাই! তাই তোমার মন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; তাই তুমি বুঝতে পারবে না যে, এ যুগে জীবনযাত্রার তরুণ-তরুণী পাশাপাশি চলেছে, পায়ে পা মিলিয়ে, একই মহান্ আদর্শকে লক্ষ্য করে। পরস্পরের সাহচর্য্য তাদের হৃদয়কে দীপ্ত করে, দগ্ধ করে না; খোলা হাওয়ায় থেকে তাদের মন তোমাদের সনাতন susceptibility থেকে মুক্তি পেয়েছে—"

মজুমদার বাধা দিয়া কহিলেন, "তা' পাক, কিন্তু আমার কথাটা একটু চিন্তা করে দেখ, আমি খুব—"

মিসেস্ মজুমদার কহিলেন, "দেখ, তুমি আমাদের জন্য বৃথা সময় নষ্ট ক'রো না, তার চেয়ে সে সময়টা তোমার রোগী-দের চিন্তা ক'রো, তাতে টাকা আসবে। আমাদের কি করা উচিত সে আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,তুমি যখন তোমার গাড়ী কিনেছিলে তখন যদি আমি বলতুম, ওগো! তুমি নূতন ঝক্‌ঝকে গাড়ী কিনো না; নূতন গাড়ী হলেই driver খুব জোরে চালাবে, তাতে তোমার heart troubles হতে পারে, accident হতে পারে, অতএব নূতনের দাম দিয়ে একটা ভাঙ্গা ধড়ধড়ে গাড়ী কেন, খুব আস্তে চলবে, হয়তো চলবেই না..."

মজুমদার বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "আমার গাড়ী কেনার সঙ্গে তোমার আফিসের কেরাণী নেওয়ার সম্পর্ক?"

মিসেস মজুমদার মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "সম্পর্ক এই—তুমি যেমন পুরো দাম দিয়ে নূতন ঝক্‌ঝকে গাড়ীটি কিনেছ, তেমনি আমরা পুরো মাইনে দিয়ে বুড়ো, নড়বড়ে লোক রাখব না; টাকা যেমন দেব, জিনিষ তেমনি বেছে নেব; তাতে

তোমার মত শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শ নেব না—" উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তোমার সঙ্গে বাজে বকবার আমার সময় নেই, আফিসে অনেক কাজ, আমি চললুম—" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু দরজার কাছে গিয়া থামিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "আমার জন্যে বৃথা চিন্তা ক'রো না; ওটা ধাতে সইবে না; তার চেয়ে চিরদিন যা' করেছ, তাই কর—"

মজুমদার হাঁকিয়া কহিলেন, "অর্থাৎ?"

মিসেস্ মজুমদার কি বলিলেন বোঝা গেল না।

মিঃ মজুমদার চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিলেন। বাহিরে মোটরের ষ্টার্ট দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল; তিনি উঠিয়া জানালার কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, গাড়ীখানা বেগে বাহির হইয়া গেল। তিনি বাহিরের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভাবনার অবসর কোথায়? টেলিফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার টেলিফোন ধরিয়া কহিলেন, "কে? ওঃ! কি খবর? temperature বেড়েছে? ছটফট্ করছে? ভয় নেই—ওষুধটা ঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে তো?...যেতে হবে?...আবশ্যক নেই, জ্বর এখনই কমে আসবে... না গেলেই নয়? আচ্ছা যাচ্ছি।"

মিঃ মজুমদার টেলিফোন রাখিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

[২]

মাস কয়েক পরে। বেলা দুইটা। ডাঃ মজুমদার সহরের কল্ সারিয়া বাড়ী ফিরিবামাত্র বহুদিনের পুরাতন ঝি সৌদামিনী আসিয়া কহিল, "বাবা! তোমার সংসার রইল, আমি চললাম।" বলিয়া মুখের কাছে দুই হাত নাড়িয়া দিল।

মজুমদার বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কি হয়েছে? কোথায় যাবে? কখন যাবে? ভাড়া আছে তো?"

যুগপৎ চারিটি প্রশ্নের খোঁচাতে সৌদামিনীর বিস্ফারমান ক্রোধ একেবারে চুপসিয়া আসিল। সে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, "তোমার সংসার চালানো আমার সাধ্যিতে কুলুচ্ছে না, বাবা!"

—"কেন টাকার দরকার? দিচ্ছি" বলিয়া পকেট হইতে একমুঠা টাকা বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন।

হাতটা ঠেলিয়া দিয়া সৌদামিনী কহিল, "টাকার তো অভাব রাখনি বাবা! তবু শুধু টাকা দিয়ে সংসার চালান যায় না—"

ডাক্তার বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তবে?"

সৌদামিনী বলিতে লাগিল, "ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর নিয়ে তোমার মস্ত সংসার; কেউ দেখবার লোক নেই; তুমি সারা দিনরাত বাইরে থাক, বৌমাটিও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আজকাল একটি বারও উঁকি মারছে না—"

ডাক্তার রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "কেন? বিজু বাড়ীতে নেই না কি? কোথায় গেছে?"

—"কোথায় আবার যাবে! সেই যে ও বাড়ীতে ধিঙ্গী মেয়েদের আড্ডা, সেখানে। মেটিং না ফেটিং কি করছে। আজ পনের দিন এ পাশ মাড়ায় নি, ছেলেমেয়ে কান্নাকাটি করছে—"

—"কই, আমি কিছু জানিনে তো? আমাকে বলা উচিত ছিল।"

—"তুমি কি জান, বাবা! কিছুই খবর রাখ না। কেবল টাকা রোজগার করছ। তোমার জন্যেই তো এমন দাঁড়িয়েছে—"

—"আমার জন্যে এমন দাঁড়িয়েছে, বল কি মাসী!" বলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সৌদামিনী বলিতে লাগিল, "তোমাকে এতটুকু বয়স থেকে মানুষ করেছি; আপনার জন কতদিন কত আদর করে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কোনদিন এ সংসার থেকে এক পা নড়তে পারিনি। আর আমি পাচ্ছি না বাবা! আমাকে এবার বিদায় দাও।"

ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "চলে যেতে চাইছ? আমার মনু, কণুর কি ব্যবস্থা হবে?"

মনু অর্থাৎ মনোজ, ডাক্তারের একমাত্র পুত্র, কণু অর্থাৎ কণিকা, একমাত্র মেয়ে।

সৌদামিনী কহিল, "ব্যবস্থা তোমরা কর বাবা! আমি না গেলে তোমাদের চোখ ফুটবে না। পাঁচটা নয়, দশটা নয়, একটা ছেলে, একটা মেয়ে, তাদের ভুলে বাপ-মা এমন করে

বাইরে বাইরে থাকতে পারে, এমন জন্মেও দেখিনি। তোমরা নূতন জিনিষ দেখালে, বাবা!"

ডাক্তার—"কি করব মাসী! আমি যে সারাদিন বাইরে থাকি, সে তো ওদের জন্যেই? তবে বিজু অবিশ্যি—"

সৌদামিনী—"সে কেন বাইরে ধিঙ্গী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, কেও বলবার নাই, স্বামী ভোলা-মহেশ্বর, তাই না এত বাড়? পাড়ার লোক কি বলছে, একবার জিজ্ঞেসা করে দেখ দিকি?"

—"কি বলছে?"

—"যা বলা উচিত, তাই বলছে। দিনরাত একটা ছোকরার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে বেড়ালে, তারা কি তার নাম সঙ্কেত্তন করবে না কি?"

ডাক্তার রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলেন, "একটা ছোকরার সঙ্গে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে! কি যে বল মাসী—"

—"মিছে বলিনি বাছা! সব্বাই দেখেছে। সে দিন সন্ধ্যে-বেলায় মনু, কনু, বাড়ীতে ছিল না, হঠাৎ দেখি বৌমা এসে হাজির, সঙ্গে সেই ছোঁড়াটা। এসেই বলল, 'সদুমাসী আমাকে এখনই ফিরতে হবে, তুমি এই ভদ্রলোককে একটু চা খাওয়াও দেখি', বলেই তিন লাফে নিজের ঘরে চলে গেল। আমি লোকটাকে বসবার ঘরে বসিয়ে, চা করে নিয়ে গিয়ে দিয়েছি, এমন সময়ে দেখি বৌমা নেমে এল, হাতে একটা চামড়ার বাক্স। আমি বললাম, 'বাছা! যাচ্ছ তো তোমার ছেলেদের নিয়ে যাও, তারা কান্নাকাটি করছে।' তা বলে কি না 'কেন?' বললাম,—'তোমাকে দেখতে না পেয়ে। এতটুকু ছেলেমেয়ে মা-ছাড়া কদিন থাকতে পারে বাছা!' বলল, 'কেন, তোমাদের বাবু তো রয়েছেন?' বললাম—'সে রকম তো তুমিও আছ বাছা! বাবু আর বাড়ীতে কতক্ষণ থাকেন?' বললে, 'বাবু যদি না থাকেন তো আমিই বা থাকব কেন? ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব তোমাদের বাবুর চেয়ে আমার একটুও বেশী নয়। উনি যদি তাদের না দেখেন, তো আমিও দেখব না'।"

"আমি বললাম,—'আমি আর পারব না বাছা! তোমরা তোমাদের ছেলেদের ভার নাও।' সে বলল,—'আমাকে বললে কি হবে মাসী! যদি না পার, বাবুকে ব'লো, তিনিই ব্যবস্থা করবেন।' বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গেলাম। তাকিয়ে দেখি, চারিদিকে সব বাড়ীর বারান্দাতে মেয়েদের ভিড় জমে গেছে, সকলের মুখে বাঁকা হাসি। জিজ্ঞেসা করতে লাগল, 'কি গো সদুমাসী, তোমাদের বৌমা এসেই আবার ভর সন্ধ্যেয় বেরুলেন যে? সঙ্গে ঐ লোকটি কে গা? চমৎকার চেহারা বাছা।' বলেই মুচকি হাসি। কে একজন বলল, 'বিজু বৌদির পছন্দ আছে বলতে হবে।' আমি তাদের বললাম, 'নিজের ভাইয়ের সঙ্গে গেল, তাতে তোমাদের এত হাসিই বা কেন, আর অত ঠাট্টা-মস্করাই বা কেন? বলে চলে এলাম। কি করি বাছা! মিছে কথা বলতে হল।"

ডাক্তার শুষ্ক মুখে শুনিতেছিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মিছে কথা নয় মাসী! ছেলেটি বিজুর নিজের ভাই না হলেও ভাইয়ের মত। খুব ভাল ছেলে, শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, বিজুর সহকর্ম্মী।"

সৌদামিনী ভুরু কুঁচকাইয়া কহিল, "কি বললে? সাকর্ম্মি? তা হোক বাছা! তবু মেয়েমানষের সঙ্গে এমন নেপ্টে থাকা ভাল নয়।"

ডাক্তার কথার মোড় ফিরাইবার জন্য কহিলেন, "ভারী তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল দেবে মাসী?"

সৌদামিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "যাই বাবা! যাই, তেষ্টার দোষ কি বাবা! সারাদিনটা টো-টো করে ঘুরছ—" যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার থামিয়া কহিল, "এখন জল নাই বা খেলে, একেবারে চানটান করে খেয়ে দেয়ে নাও না?"

ডাক্তার কহিলেন, "একটু পরে, তুমি এক গ্লাস জল আন।" সৌদামিনী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ঠিক এই সময়ে টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করিয়া বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার উঠিয়া টেলিফোন ধরিলেন।

মেয়েলী গলায় প্রশ্ন আসিল, "হ্যালো!" ডাক্তার গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, "কাকে চান?"

মেয়েলী গলা কহিল, "ওঃ তুমি! আমি বিজলী—ভারী—"

ডাক্তার আগ্রহান্বিত ভাবে কহিলেন, "ওঃ তুমি বিজলী! আমি তোমাকেই ডাকব ভাবছিলুম। দেখ তোমার সঙ্গে ভারী একটা—"

—"হোক ভারী ; আমার কথাটা শোন দিকি। এখনই একবার আসতে হবে আমার এখানে—"

—"নিশ্চয়ই যাব, তোমার সঙ্গে আমার অত্যন্ত দরকার। তবে এখনই না, একটু পরে—"

—"না—না একটু পরে নয়, এখনই—"

—"দেরী সইছে না দেখছি আমার জন্যে খুব মন কেমন করছে বুঝি ?"

—"তোমার রসিকতা উপভোগ করবার মত মনের অবস্থা নয়। ভারী বিপদে পড়েছি—আমার assistantএর জ্বর, টেম্পারেচার ১০৫, বেহুঁসের মত পড়ে আছে। এখনই একবার আসতে পারলে অত্যন্ত বাধিত হব।"

—"ওঃ সেই ছোকরা। সবল, স্বাস্থ্যবান্—তার জ্বর হয়েছে ? তা তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও না—"

—"মূল্যবান উপদেশের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু সম্প্রতি এটিকে কাজে লাগাবার ইচ্ছে নেই। কাজেই এক বারটি এস—কি বলছ ? আসবে ? ভয় নেই পুরো ফি দেব—আসবে না ? না এলে বাধ্য হয়ে আমাকে অন্য ডাক্তার ডাকতে হবে।"

ডাক্তার কহিলেন, "অন্য ডাক্তার ডাকতে হবে না, আমি যাচ্ছি।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

[৩]

নিখিল-বঙ্গ নারী-সমিতির আফিস-গৃহ ডাক্তারের সুপরিচিত। কারণ, বাড়ীটি তাঁহার একদা শ্বশুরালয় ছিল। ডাক্তারের শ্বশুর সহরের নামজাদা উকীল ছিলেন, বিজলী তাঁহার একমাত্র কন্যা। মৃত্যুকালে তিনি তাহাকে বাড়ী খানি ও মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স্ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য ডাক্তারের কোন লাভ হয় নাই। কারণ নারী-প্রগতির 'ভূত' ঘাড়ে চাপা অবধি বিজলী দেবী বাড়ীটিতে আফিস বসাইয়াছেন এবং ব্যাঙ্কের মোটা সুদও উক্ত ভূতের সেবায় খরচ করিতেছেন। বিজলী দেবীর মাতা ঠাকুরাণী ঝামেলা সহ্য করিতে না পারিয়া কাশী বাস করিতেছেন।

ডাক্তারের গাড়ী পৌঁছিবামাত্র বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য হরিচরণ বাহিরে আসিয়া এক মুখ হাসিয়া কহিল, "এজ্ঞে জামাই বাবু!" ডাক্তার কহিলেন, "এই যে হরিচরণ! কেমন আছ ?"

—"এজ্ঞে ভাল আছি, জামাই বাবু!"

—"আমাদের ওদিকে যাও না ? অনেক দিন দেখিনি মনে হচ্ছে—"

হরিচরণ দুই হাত কচ্লাইতে কচ্লাইতে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "এজ্ঞে যাই ত! আপনি বাড়ীতে থাকেন না—"

—"ওঃ যাও! বেশ ভাল, তোমার দিদিমণি কোথায় ?"

—"এজ্ঞে তেতলায়, শোবার ঘরে—"

উপর হইতে উচ্চকণ্ঠে ডাক আসিল "হরি দা!" হরিচরণ উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল, "এজ্ঞে যাই, দিদিমণি।" বলিয়া ছুটিতে উদ্যত হইল।

ডাক্তার ডাকিলেন, "হরিচরণ।"

হরিচরণ থামিয়া কহিল—"এজ্ঞে—"

—"ছুটছ কেন ? আমিও তো যাচ্ছি—"

—"এজ্ঞে চলুন!" বলিয়া ডাক্তারের আগে আগে চলিল।

তেতলায় শোবার ঘরের দরজার সামনে আসিয়া ডাক্তার কহিল, "হরিচরণ! খবর দাও।"

হরিচরণ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "এজ্ঞে খবর! কার খবর।"

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, "আমার খবর, তোমার দিদিমণিকে বলগে, ডাক্তার এসেছে—"

—"এজ্ঞে! আপনি ভিতরে যাবেন, তাও খবর দিতে হবে।"

ঠিক এই সময়ে বিজলী দরজার পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "আর খবর দিতে হবে না ; যা হাঁকাহাঁকি করছ, আমি কেন পাড়া শুদ্ধ খবর পেয়েছে। ইহলোকে হরিদার বুদ্ধি গজাবে না—"

হরিচরণ কাঁচুমাচু হইয়া কহিল, "এজ্ঞে না দিদিমণি।"

বিজলী ডাক্তারকে কহিল, "তুমি ভেতরে এস—" বলিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ডাক্তার তাহাকে অনুসরণ করিলেন।

প্রকাণ্ড পালঙ্কে পুরু গদীর উপর শুভ্র শয্যায় রোগী অচৈতন্যের মত শুইয়া আছে। মাথার দিকে একটা টিপয়ের উপর একটা টেবিল-ফ্যান বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরিতেছে। বালিশের পাশে একটা আইসব্যাগ—

ডাক্তার রোগীর শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'কবে জ্বর আরম্ভ হয়েছে?"

বিজলী কহিল, "কাল দুটোর সময়ে বোধ হয়—"

—"কাঁপুনি ছিল?"

হরিচরণ আগাইয়া আসিয়া কহিল, "এজ্ঞে কাঁপুনি? ওরে বাব্বা! ও রকম কাঁপুনি বাপের জন্মে দেখিনি জামাই বাবু! এজ্ঞে, লেপ, তোষক, কম্বল, সতরঞ্চি, টেবাক্স, ছুটকেশ, যা যেখানে ছিল, সব গায়ে চাপিয়েও কাঁপুনি থামে না, আমি, বামুন, ঠাকুর, দরোয়ান সব গায়ে চড়লাম, এজ্ঞে, তাতেও থামে না—নীচের তালায় মেটিং হচ্ছিল, খবর দিতেই দিদিমণিরা এসে জড়িয়ে ধরলেন, এজ্ঞে তখন থামল।"

বিজলী ধমক দিয়া কহিল, "হরি দা! কি যা' তা' বকছ?"

হরিচরণ কহিল, "এজ্ঞে, দিদিমণি, ঠিকই তো বলছি। রোগের সব লক্ষণ না বললে, জামাই বাবু এজ্ঞে রোগ ধরতে পারবেন কেন?"

বিজলী রুষ্ট ভাবে কহিল, "হয়েছে নীচে যাও—"

হরিচরণ নত মস্তকে প্রস্থান করিল।

ডাক্তার কহিলেন, "কাল তা হলে ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে দেখছি; নারী-সমিতির অধিবেশন ভেঙ্গে গেছে ক্ষতি নেই, কিন্তু কোন সভ্যার হৃদয় ভাঙ্গেনি তো?" একটু হাসিয়া কহিলেন, "তা' হলে আমার দ্বারা চিকিচ্ছে চলবে না, ত্রিলোচন কবরেজকে ডাকতে হবে।"

বিজলী বিরক্ত হইয়া কহিল, ভেঙ্গেছে কি না, খবর তো পাইনি, পেলে যথাস্থানে চিকিচ্ছের ব্যবস্থা করা হবে। তুমি তোমার নিজের কাজ কর।"

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "কাজ? আচ্ছা! জ্বর রেমিশন হয়েছিল?"

—"না, সকালে একটুখানি কমেছিল।"

—"কাল সারারাত জ্বর ছিল?"

—"কাল সারারাত সমস্ত রাত ১০৪ ছিল, একটুও ঘুমোতে পারেনি, ঘুমোতে দেয়নি—"

—"সমস্ত রাত্রি তুমিই কাছে ছিলে?"

—"তা' ছাড়া কে আর থাকবে? মেয়েরাদের তো কেও এখানে থাকে না—"

—"তা' হলে তো ভারী মুস্কিল। সমস্ত রাত্রি রোগীর কাছে থাকলে তুমি নিজে পড়ে যাবে; হরিচরণকে কাছে থাকতে ব'লো—"

—"হরি দা এই রোগী সামলাতে পারবে? তা হলেই হয়েছে। তা' ছাড়া ওর হাতে এই রোগী ছেড়ে দিয়ে আমিই বা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব কেন?"

ডাক্তার মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না? তা'হলে কাছেই থেক?"

বিজলী কহিল, "হাসছ যে? আমার কাছে চাকরী করতে এসে রোগে পড়েছে, আমার কর্ত্তব্য হিসেবে ওকে আমার সেবা করতে হবে—"

—"তা' তো ঠিক কথা। তবে কর্ত্তব্যের জেরটা রোগের পরেও না চললেই ভাল—"

—"তা' এখন থেকে ভেবে কি করবে? বিধাতা পুরুষ যদি জের টানেন তো তোমারও হাত নেই, আমারও হাত নেই—"একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "তুমি অনেক নীচে নেমে গেছ।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আর তুমি? অনেক উপরে, আমার মত হতভাগ্যের একেবারে নাগালের বাইরে, না, বিজলী দেবী?"

কষ্টকণ্ঠে বিজলী কহিল, "তোমাকে রোগীর চিকিৎসা করবার জন্যে ডেকেছি, বিলাপ এবং প্রলাপ শোনাবার জন্যে ডাকিনি!"

গম্ভীর মুখে ডাক্তার কহিলেন, "আমি দুঃখিত বিজলী! আমাকে মাপ কর।" বলিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রোগ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।

রোগী দেখিয়া এবং যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই, কাল সম্ভব জ্বর রেমিশান্ হবে, দরকার বোধ করলে খবর দিতে পার।" তারপর ধীরপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বিজলী সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল। দোতলায় নামিয়া বিজলী কহিল, "এদিকে একবার এস—"বলিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিল এবং ডাক্তার তাহার অনুসরণ করিলেন।

কক্ষটি প্রশস্ত, একদিকে একটি খাটে সাধারণ, কিন্তু পরিচ্ছন্ন শয্যা। একটি ছোট আলনায় দু'চারিখানা কাপড়,

সেমিজ, ব্লাউজ ইত্যাদি ঝোলান আছে, বিছানার পাশে একটি হাতল-বিহীন চেয়ারের সামনে একটি মাঝারি ধরণের টেবিল, তাহাতে লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম। টেবিলের সামনের দেয়ালে দুখানা বড় অয়েল পেন্টিং, একটি বিজলীর পরলোক-প্রবাসী পিতার—এবং আর একটি কাশী-প্রবাসিনী মাতার।

ডাক্তার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "এখানে কে থাকেন?"

বিজলী কহিল, "কে থাকেন বলে মনে হচ্ছে?"

—"কোন মহিলা নিশ্চয়!" মৃদু হাসিয়া, "অবিশ্যি যদি এ বাড়ীর পুরুষদের সাড়ী, সেমিজ পরবার ব্যবস্থা না থাকে—"

বিজলী গম্ভীরভাবে কহিল, "তা' নেই অতএব তোমার ধারণা ঠিক, এটা আমার শোবার ঘর—"

ডাক্তার বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিলেন, "তোমার শোবার ঘর এখানে কেন?"

—"কোথায় তুমি ভেবেছিলে?"

—"কেন তেতলায়—ওখানে তো আরও ঘর—"

বাধা দিয়া বিজলী কহিল, "আছে এবং না থাকলেও অসুবিধে হ'ত না, তবে তোমার মুখ চেয়েই থাকি নি।" বলিয়া হাসিল।

—"আমার মুখ চেয়ে কেন? আমি তো এখানে থাকি না?"

—"নেই বা থাকলে, কিন্তু যতদিন তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকবে, ততদিন তার অমর্য্যাদা করতে পারব না।"

—"ধন্যবাদ বিজলী দেবী! কিন্তু সম্পর্ক কি ছিন্ন হবার সম্ভাবনা আছে?"

—"তা কি করে বলব? 'বিবাহবিচ্ছেদ' প্রস্তাব পাশ হয়ে গেলে, আমাদেরই হয়তো অগ্রণী হতে হবে—" বলিয়া, মুখ নীচু করিয়া, ড্রয়ার খুলিয়া কি হাতড়াইতে লাগিল।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "কেন? পাণ্ডা বলে? বাঙ্গালা দেশে ও প্রথা নেই বিজলী! এখানে পাণ্ডাদের কিছু করতে হয় না, কেবল বক্তৃতা দিলেই চলে।"

বিজলী কহিল "তা হবে! কিন্তু ওটা পুরুষদের প্রথা। বাঙ্গালী মেয়েরা যে তাদের পুরুষদের মত বাক্‌সর্ব্বস্ব নয়, সেইটাই আমরা প্রমাণ করতে চাই—"

ডাক্তার ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "নিশ্চয়! নিশ্চয়! তা তো করতেই হবে, কিন্তু বিজুরাণী, প্রমাণটা অন্য কেও করলে ভাল হয় না? ধর তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয় নি তারাই যদি বিবাহবিচ্ছেদটা চালিয়ে দেয়?"

—"তুমি কি ঠাট্টা করছ না কি? যাদের বিয়ে হয়নি তাদের বিবাহবিচ্ছেদ?"

—"ঠাট্টা করছি! কখ্‌খন না! আমি বলছি...কি বলছি সত্যি তুমি বুঝতে পারনি?"

বিজলী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বুঝিতে পারে নাই। ডাক্তার কহিলেন, "এ সোজা কথাটা তোমার বোঝা উচিত ছিল, বিজলী! আমি পুরুষদের পাণ্ডা নই, অথচ তুমি নারী-সমিতির পাণ্ডা হয়ে আমার একটা সোজা কথা বুঝতে পারলে না? তোমাদের বুদ্ধির মানদণ্ডটা একটু ছোট বলতেই হবে—"

—"ছোট হোক্, কিন্তু তোমার কিছু যদি বলবার থাকে তো চট্‌পট্ বলে ফেল, আমার অবসর কম।"

—"আমি বলছিলুম—ধর তোমাদের সমিতির দুটি তরুণী, নাম ধরা যাক রেবা ও সেবা; তারা দুটি তরুণকে বিয়ে করতে চায় নাম, নিতীন ও ক্ষিতীন। বেশ, রেবা বিয়ে করুক ক্ষিতীনকে আর সেবা, নিতীনকে। দিন কয়েক পরেই তারা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্যে কোর্টে আবেদন করুক। খবরের কাগজে বের করে দাও সেই খবর, ছাপিয়ে দাও তাদের ছবি, দিশী খবরের কাগজের ছবির মত জ্যাব্‌ড়েবে নয়, বেশ স্পষ্ট করে, আর তাদের ছবির নীচে বড় বড় অক্ষরে লিখে দাও, মুক্তি-পথের 'অগ্রদূত', না—না 'অগ্রদূতী –" বিজলী নীরব, ডাক্তার বলিতে লাগিলেন "তার পর যে যার নিজের নিজের লোককে বিয়ে করে সুখে ঘর সংসার করুক্। কোন গোলমাল হবে না, কারও কোন ক্ষতি হবে না, অথচ ডজন খানেক এমনি খবর খবরের কাগজে বেরুলে, পুরুষ-মহল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠবে। ফলে, —সকাল আটটায় উঠেই চায়ের জন্যে তাগিদ, সাড়ে নটায় রান্নার জন্যে হুড়াহুড়ি, আফিস্‌ফেরৎ কড়া মেজাজ ও আস্ফালন, সন্ধ্যেয় একা বায়োস্কোপ-গমন, রাত্রি এগারটায় বাড়ী ফিরে নিদ্রাক্লিষ্ট পত্নীর বিরুদ্ধে পাতিব্রত্যহীনতার অনুযোগ এবং কচি ও কাঁচাগুলির ভার সহধর্ম্মিণীর উপর ছেড়ে দিয়ে সমস্ত রাত্রি সুখনিদ্রা—সব একে একে বন্ধ হয়ে যাবে—"

বিজলী হাসিয়া কহিল, "বক্তৃতাটি নিজের না ধার করা—"

ডাক্তার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "ধার করা? কখ্খনও না। নিজের, একেবারে original; শাস্ত্রে আছে, বিষ্ণুর পা ঘেমে ভাগীরথী বেরিয়েছিলেন; আমার মগজ যে রকম ঘামতে আরম্ভ করেছে, নায়েগ্রার মত বক্তৃতার স্রোত বেরুতে দেরী নেই; আমাকে যদি তোমাদের দলে নাও তো, বক্তৃতা দিয়ে বাঙ্গলা দেশের পুরুষদের আমি একদিনে ঢিট্ করে দেব—"

—"তোমার আবেগ সংবরণ কর। ভাড়া করে বক্তৃতা দেওয়াবার আমাদের দরকার হবে না—নিজেদেব কাজ নিজেরা করবার আমাদের সামর্থ্য আছে—"

ডাক্তার কহিলেন, "নিশ্চয় আছে, কিন্তু বিজলী দেবী! আমার planটার সম্বন্ধে একটু চিন্তা ক'রো। এতে তোমাদের কাজের সুবিধে হবে—"

—"কি সুবিধে?"

—"যতগুলি অবিবাহিতা মেম্বর আছেন, সবগুলির একে একে বিয়ে হয়ে যাবে এবং আমাব গৃহলক্ষ্মী ঘরে ফিরবেন—"

—"আর গৃহ-নারায়ণ টাকা রোজগারের জন্যে সকাল হতে রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত সমস্ত সহর চষে বেড়াবেন এবং তারপর বাড়ী ফিরে নির্ব্বিবাদে নাক ডাকাবেন—"

ডাক্তার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল। তারপব অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, "এই জন্যই কি তুমি চলে এসেছ!"

—"হ্যাঁ।"

—"এই জন্যই বিবাহবিচ্ছেদ?"

—"হ্যাঁ।"

—"তা' হলে উপায়?"

—"একটা কালা ও কাণা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আন সে তোমার গৃহলক্ষ্মীর কাজ ঠিক চালাতে পারবে—"

ডাক্তার ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। বিজলী বলিতে লাগিল, "চোখ-কানওয়ালা কোন মেয়ের তোমার ঘরে থাকা অসম্ভব। তুমি একজন বড় ডাক্তার, মানুষের শরীরে ছুরি চালিয়ে তুমি দেহযন্ত্র মেরামত কর, কাজেই তুমি মানুষকে যন্ত্র ছাড়া কিছুই ভাবতে পার না; তুমি বুঝতে পার না, দেহকে ছাড়িয়ে আছে মানুষের মন, যাকে তুমি তোমার ছুরি চালিয়ে স্পর্শ করতে পার না, যাব স্পন্দন ষ্টেথিস্কোপ্ বসিয়ে শোনবার তোমার সাধ্য নেই, যাব অভাব তুমি তোমার সমস্ত ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স্ দিয়েও মেটাতে পার না।" কিছুক্ষণ নতনেত্রে টেবিলের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "তা' ছাড়া মেয়েমানুষের উপব তোমার কোন সম্ভ্রম-বোধ নেই—"

ডাক্তার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "সম্ভ্রমবোধ নেই! বল কি, বিজলী! আমার যে কোন মেয়ে রোগীকে জিজ্ঞাসা ক'রো, তারা তোমার কথার প্রতিবাদ করবে—"

—"তা' করুক, কিন্তু আমি তোমার etiquetteএর কথা বলছি না, আমি বলছি, যে সূক্ষ্ম রুচিবোধ নর-নারীর সম্পর্ককে সুন্দর ও শোভন করে, তা' তোমার নেই—"

—"নেই? তাব প্রমাণ?"

—"প্রমাণ? আয়নার সামনে দাঁড়ালেই প্রমাণ ধরা পড়বে। ঐ রকম খোঁচা খোঁচা দাড়ি, গোঁফ, উস্কখুস্ক চুল নিয়ে রুচিসম্পন্ন কোন ভদ্রপুরুষ ভদ্রমহিলার সামনে যায় না কি?"

ডাক্তার লজ্জিত ভাবে দাড়ীতে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "কি করব? আমি যে এখনও নাইনি, খাইনি; এই তো ফিরলুম; তা' ছাড়া তোমার কাছে—"

—"কেন? আমি কি ভদ্রমহিলা নয়? এই জন্যই তো বলছিলুম তোমার সম্ভ্রমবোধ নেই—"

দুঃখিত ভাবে ডাক্তার কহিল, "হয়তো নেই। কিন্তু কি আছে, কি নেই, তা এতদিন খেয়াল করবার অবসর হয়নি। ভেবেছিলুম, আমার সংসারে গৃহলক্ষ্মী আছেন বাঁধা; তাঁরই সেবার আয়োজনে সংসারের বাইরে ছিলুম ব্যস্ত; কিন্তু সেই অপরাধে লক্ষ্মীর যে অন্তর্ধান হয়েছে তা' বুঝতে পারিনি—"

—"শুধু নৈবেদ্যের আয়োজন করেই আজকাল গৃহলক্ষ্মীদের সেবা চলবে না, তাদের মনের সেবা করতে হবে; নইলে এ যুগে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে থাকতে হবে, বুঝলে?"

—"বুঝেছি, বিজলী দেবী! যদি না কালা ও কাণা জোটে—দুঃখ, সংসারে কাণা ও কালা বেশী নেই, অথচ আমার মত হতভাগ্য বিস্তর—" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, "এর পর ওঠা যাক্…ও আবার কী? কি? তোমার বাড়ী

এসে ফি নিতে হবে? বিজলী! এখন হতেই আমাকে পর করে দিচ্ছ?"

ভুরু কুঁচকাইয়া বিজলী কহিল, "ফি নেবে না কেন? তোমাকে তোমার স্ত্রী হিসেবে আমি ডাকিনি, আর আমাকে দেখতেও তুমি আসনি; 'নারী-সমিতি'র সেক্রেটারী হিসেবে আমার কর্ম্মচারীকে দেখবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি; তা'ছাড়া তোমার এতখানি সময় নষ্ট হ'লো, তারই বা দাম দেবে কে?"

—"সময় নষ্ট আমার হয়নি, আর হলেও তোমার কাছ হতে তার দাম নিতে পারব না, আমাকে মাপ কর।"

—"তোমার মহানুভবতার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমার কাছ হতে এ অনুগ্রহও আমি নিতে পারব না, আমাকে মাপ কর—"

ডাক্তার মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, "অনুগ্রহ! আচ্ছা দাও—" বলিয়া, টাকা লইয়া পকেটে ফেলিলেন। চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বিজলী কহিল, "ভালই করলে, না হলে পরে অনুতাপ করতে হ'ত—"

ম্লান হাসি হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "হ'ত নয়, আরম্ভ হয়েছে; আচ্ছা, যাবার আগে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে ক'রো না—আমার সঙ্গে বাস করতে সত্যি কি তোমার কষ্ট হয়?

বিজলী নীরব। ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, "তা' হলে তুমি এখানেই থাক। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আমি বুঝতে পারিনে, নইলে অনেক দিন আগেই নিজে হতে এ ব্যবস্থা করে দিতাম।...যাক্ গে যা হয়ে গেছে, তার ওপর হাত নেই। তবে, এরপর আর কোন দিন তোমাকে সাহচর্য্যের উৎপীড়ন সহ্য করতে হবে না—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—কিন্তু একটা অনুরোধ—"

ডাক্তারের চোখে মিনতি, বিজলীর চোখে জিজ্ঞাসা; ডাক্তার কহিলেন, "মিছেমিছি কোলাহল করে লাভ নেই; নিঃশব্দে আমরা পরস্পরের কাছ হতে সরে যেতে চাই। আর ··· ক্ষণু, মনুকে তোমার কাছে নাও—তাদের কষ্ট হচ্ছে—"

বিজলী কহিল, "মনু, ক্ষণু তোমার কাছেই থাক্। আমার এখানে আরও কষ্ট হবে। আমি সব দিন এখানে থাকি না; মাসের মধ্যে পনের দিন আমাকে মফঃস্বলে কাটাতে হয়—"

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

—"মফঃস্বলে আমাদের শাখা-সমিতি আছে; তাদের দেখা শোনা আমাকেই কর্ত্তে হয়—"

—"একা যাও?"

—"না—সঙ্গে—আমার assistant থাকে—"

—"ওঃ" চিন্তিত ভাবে কহিলেন, "তা হলে কি করে হবে? যাক্ যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে; আচ্ছা আমি চলি," বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিজলীও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিল। সিঁড়ির মাথায় আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তোমার কি সত্যি নাওয়া-খাওয়া হয় নি? এখানে কিছু ব্যবস্থা করে দেব? অনেক দেরী হয়ে গেল—"

"ধন্যবাদ! প্রয়োজন নেই—" বলিয়া ডাক্তার নীচে নামিয়া গেলেন। [ক্রমশঃ

অমিলনের হেতু

...জনসাধারণের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার প্রথম কারণ, মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত অমিলন, দ্বন্দ্ব এবং কলহ। যে যে স্থলে ব্যক্তিগত অমিলন প্রভৃতি দেখা যায়, সেই সেই স্থানে কি কারণে উহা ঘটিয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্রই উহার মূল হয় কাম, নতুবা ক্রোধ, নতুবা লোভ, নতুবা মোহ, নতুবা মদ, নতুবা মাৎসর্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত অমিলন, দ্বন্দ্ব এবং কলহের উদ্ভব না হয়, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।...

কর্ণেল বুরক্যাঁর আত্মজীবনী

—শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি আমার সম্মুখে সম্মান ও সামরিক যশের সুমহৎ জীবনের পথ উন্মুক্ত দেখিলাম। একদিকে আমি তিব্বতের পানে হাত বাড়াইতে পারিতাম, অপরদিকে লাহোর ও কাশ্মীরের রাজারা আমাকে তাঁহাদের রাজ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দলে যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিতেছিলেন। এইরূপে আমি আফগানদিগের রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিব্বতের পথে চীনদেশে যাইতে পারিতাম। সিন্ধিয়ার, তথা পেরঁর অস্ত্র-গৌরব, আমার নিকট কৃত প্রস্তাবসমূহ হইতে প্রত্যাশিত সুবিধা-রাজি ও আমাদের সুমহৎ পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে পরিণত করিবার সুযোগসমূহ,—সব মিলাইয়া আমার আশা হইয়াছিল যে, বুঝি বা আমার নিজের, আমার সেনাপতির এবং আমার প্রভু নরপতির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্মরণীয় করিয়া রাখিতে আমি পারিব। সঙ্গে সঙ্গে আমি কল্পনার চক্ষে নিজেকে ককেসাসের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে এবং তথা হইতে নীলনদের সলিলপ্রবাহধৌত উর্ব্বর সমতল প্রদেশে দর্শন করিলাম, যেথায় মাত্র সম্প্রতি ফরাসী বৈজয়ন্তী বায়ুভরে প্রকম্পিত হইতেছিল এবং আমি সেই সুবিখ্যাত গিরিরাজিকে বোনাপার্টের নাম প্রতিধ্বনিত করিতে শুনিলাম। বৃথা আশা...ব্যর্থ সে পরিকল্পনা !

ঠিক যে মুহূর্ত্তে আমি মৎসকাশে কৃত প্রস্তাবসমূহ পেরঁর নিকট পাঠাইতেছিলাম, সেই সময় আমি তাঁহার নিকট হইতে হিন্দুস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ পাই-লাম। নর্ম্মদাতটে যশোবন্ত রাও হোলকারের হস্তে জর্জ্জ হেসিঙ্গের একটি ব্রিগেডের পরাজয় ইহার কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরাকরণের ভার আমি আমার পাঠকবর্গের প্রতি ন্যস্ত করিলাম।...ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকৃত বিপদ্ যখন তাঁহার সম্মুখে দেখা দিয়া-ছিল, তখন তিনি কেন এ ধরণের তৎপরতা দেখান নাই ? যখন একদল ইংরাজ-সেনা তাঁহার বিরুদ্ধে আগুয়ান হইয়াছিল, তখন কেন তিনি সে সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই, যাহা তিনি মুষ্টিমেয় দেশীয়গণের বিরুদ্ধে গ্রহণ করিয়া-ছিলেন ? কেন তিনি......কিন্তু পরের ঘটনা পূর্ব্বে বলা ঠিক নয়।

আমার নিকট কৃত সমস্ত সুবিধাজনক প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া আমি আদেশ পালন করিয়াছিলাম এবং আমার ব্রিগেডকে হিসার নগরোপকণ্ঠ পর্য্যন্ত ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তথায় বর্ষার জন্য উহাদের পরিত্যাগ করিয়া আমি কতকগুলি সওয়ার লইয়া জেনারেল পেরঁকে বিগত অভিযানের রিপোর্ট দিবার জন্য কোয়েল গিয়া-ছিলাম। বর্ষাপগমে অন্যত্র কোথাও আমার কার্য্য আবশ্যক না হওয়ায় আমি আমার ব্রিগেডে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলাম এবং সুবামধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলাম। দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত বিশাল এক মরুদেশের প্রান্তে উহা অবস্থিত ছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ লুণ্ঠনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা প্রত্যহ চরিবার মাঠ হইতে আমাদের উষ্ট্র এবং এমন কি শিবির হইতে দ্রব্যাদি চুরি করিয়া লইয়া যাইত। একদিন চুরি করি-বার সময় তিনজন দস্যু ধরা পড়িল। উহাদের আমি তোপের মুখে উড়াইয়া দিলাম। এই দৃষ্টান্ত এরূপ কার্য্যকর হইয়াছিল যে, আর কখনও আমাদের কোন জিনিষ চুরি যায় নাই।

বিকানীরাধিপতি তাঁহার রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রা জেলা দখল করিয়াছিলেন। উহা আমাদের সুবার অন্তর্গত ছিল। আমি তাঁহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করিয়া ছিলাম। অতঃপর আমি ভাট-সর্দ্দার নবাব খাঁ বাহাদুরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলাম। শিখ-জনপদ এবং বিকানীর রাজ্য এতদুভয়ের মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। প্রাচীনকালে সুলতান ফেরোজ সাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ফতেহাবাদ, সারসা ও ভাটনের নামক তিনটি দুর্গ তাঁহার

অধিকারভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে শেষোক্তটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্, কিন্তু ইহার একটি গুরুতর অসুবিধা ছিল এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী জলাশয় হইতে ইহার দূরত্ব দ্বাদশ ক্রোশেরও অধিক ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও উহার অবস্থানের জন্য তাঁহার সমস্ত দেশ এবং দক্ষিণ ও বাম উভয়পার্শ্বস্থ সন্নিকটবর্ত্তী জনপদে উহা হইতে আধিপত্য করা সম্ভব ছিল। খাঁ বাহাদুর নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার পক্ষে দুর্গগুলি রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তিনি আমাকে এই সর্ত্তে ঐগুলি সমর্পণ করিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকে তজ্জন্য পদোচিত আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিব। আমার প্রতি নিজ বিশ্বস্ততা দেখাইবার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ আমার অভিভাবকত্বে প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত জনপদ-মধ্যে নিয়মিত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন ব্যতিরেকে আমার পক্ষে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব ছিল না। নবাব নিজে মুসলমান হইলেও তাঁহার প্রজারা রাজপুত জাতীয়; অন্ততঃ সেই দাবী করিয়া থাকে। ইহা স্থির যে, তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কোন বিধি-নিষেধ পালন করে না। আহারাদি সম্বন্ধে তাহাদের কোন বিচার নাই; কড়া রকম পানীয়ও তাহারা পান করে। ফলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল এবং সামরিক জীবনে অভ্যস্ত। তাহারা অত্যন্ত বলবান্ ও সাহসী, একটিমাত্র বর্শা সম্বল করিয়া অনাবৃত মস্তকে ও পদে তাহারা যুদ্ধে গমন করিয়া থাকে। ছোট একটি জলপূর্ণ চামড়ার থলি ভিন্ন তাহাদের অপর কোন রসদ-সম্ভার আবশ্যক করে না। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ছাড়িয়া দিলেও তাহাদের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ বলা যাইতে পারে। সাধারণ ভাবে উহাদিগকে যাযাবর বলা যায়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে শিখ ও বিকানীরী-রাজপুতদিগকে আক্রমণ ও তাহাদের গো-মহিষাদি পশু লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে উহারা এক এক দলে নয় বা দশ হাজার করিয়া সমবেত হইয়া থাকে। বহু চেষ্টার ফলে আমি উহাদিগকে গ্রামে বাস এবং কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করাইতে পারিয়াছিলাম। এইভাবে আমি উহাদিগকে শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছিলাম। আমার প্রস্থানের পূর্ব্বেই নিরুপদ্রবে রাজস্ব-সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছিল এবং অচিরেই তাহা প্রায় দুই লক্ষ টাকাতে দাঁড়াইয়াছিল।

যখন আমি এই ভাবে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন আবার জয়পুরাধিপতির সহিত যুদ্ধ বাধিয়াছিল। জেনারেল পের্ঁ তাঁহার দ্বিতীয় এবং চতুর্থসংখ্যক ব্রিগেডদ্বয়সহ ইতোমধ্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে আমিও আমার তৃতীয় ব্রিগেডটি লইয়া জয়পুর হইতে আট ক্রোশ দূরে, ভণ্ডিরাজের নগরপ্রাচীরের বাহিরে যেখানে তিনি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, আসিয়া তাঁহার দলে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের এবং জয়পুর নগরের মধ্যে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে জয়পুররাজ অবস্থিত ছিলেন এবং আমাদের আহার্য্যদ্রব্যাদি লইয়া যাহারা আসিতেছিল, তাহাদের মধ্য-পথে আটক করিতেছিলেন। ভণ্ডিরাজনগর হইতেও আমরা কোন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেজন্য আমি বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম নগরটি সমতলপ্রদেশমধ্যে অবস্থিত ছিল, উহার চারিপার্শ্বে বেশ সুদৃঢ় মৃৎপ্রাচীর ছিল এবং তাহা রক্ষাকার্য্যে দশ সহস্র রাজপুত-সেনা নিযুক্ত ছিল। রাত্রির অন্ধকারে আমি দশটি প্রাচীর-ভগ্নকারী তোপ যথাস্থানে বসাইয়াছিলাম। পর-দিবস সমস্ত দিন ধরিয়া উহারা প্রাচীরোপরি গোলাবর্ষণ করিয়াছিল। তাহার পরদিন প্রাকারের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে সম্মুখ-আক্রমণ সম্ভব হইয়াছিল। আমি সৈনিকদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, নগর অধিকার করিতে পারিলে তাহাদিগকে উহা লুণ্ঠনের অনু-মতি দেওয়া হইবে। অনন্তর আমি উহাদিগকে আগুয়ান হইবার আদেশ দিয়াছিলাম। তিন ঘণ্টা ধরিয়া ভগ্ন প্রাকার-সন্নিধানে তুমুল যুদ্ধের পর আমরা নগর অধিকার করিয়া বিনা বাধায় দুর্গ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলাম। দুর্গের একটি প্রবেশপথে ও অপরটির উপরে বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক, পুরুষ ও শিশু আশ্রয় লইয়াছিল। আমা-দের সৈন্যগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিবার কালে তাহাদের পদতলে বিমর্দ্দিত করিয়া গিয়াছিল। দুর্গমধ্যে আমরা তিন লক্ষ টাকা পাইয়াছিলাম। নগরটি সৈনিকগণের উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল এবং যত কিছু অত্যাচার উপদ্রব তাহারা করিতে পারে, সব সহ্য করিতে বাধ্য হইয়া-ছিল। এই বিষম শাস্তির ফল নিকটে এবং দূরে সর্ব্বত্র অনুভূত হইয়াছিল। ইউরোপ অপেক্ষা হিন্দুস্থানে এই

ধ্বংসের ভীষণতা পরিহার করা সুকঠিন ব্যাপার ; কিন্তু উহার একটি ভাল ফল দেখা গিয়াছিল, জয়পুরীরা অতঃপর বিষম আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল এবং শান্তি-স্থাপনোদ্দেশ্যে তাহাদের নিকট হইতে যাহা কিছু দাবী করা হইয়াছিল, সব কিছুই তাহারা অপ্রতিবাদে মানিয়া লইয়াছিল। সমরাবসানের পর আমি লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া নিজ ব্রিগেডসহ চারি মাস কাল দিল্লী নগরীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি কিছুই করি নাই।

তাঁহার ভীতিপ্রদ করিতকর্ম্মা শত্রু যশোবন্ত রাও হোলকারের সাফল্যে শঙ্কিত হইয়া দৌলৎরাও সিন্ধিয়া পরামর্শ করিবার জন্য পেরঁকে নিজ রাজধানী উজ্জয়িনীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। পেরঁ ইতোপূর্ব্বে তথায় আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারে আর যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। কিছুকাল হইতে সিন্ধিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে তাঁহার নিজের অপেক্ষা তাঁহার সেনাপতির আধিপত্যই বেশী। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দেওয়া ছাড়া পেরঁ তাঁহার নিকট কখনও হিসাব দাখিল করিতেন না, পক্ষান্তরে ইংরাজরাজ্যমধ্যে প্রেরিত তাঁহার সুপ্রচুর অর্থরাশি ব্যতীত তিনি নিজে আগ্রা, দিল্লী, আলিগড় ও কোয়েল নগরে যথেষ্ট ধনসঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সকল কারণে দৌলৎরাও কতকটা বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার অসন্তোষের কথা পেরঁ জানিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতির কারণস্বরূপ অসুখের অজুহাত দেখাইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর সাহায্যের জন্য ম্যঁসিয় দুদ্রেনেকের পরিচালনাধীনে একটিমাত্র ব্রিগেড পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। হোলকার সিন্ধিয়ার নিকট বিষম উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন দেখিয়া পেরঁ মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি উঁহাকে নিজের বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দী বলিয়া ভাবেন নাই। এই ভাবে বরাবরের মত স্বীয় প্রভুকে নিজের প্রতি নির্ভরশীল রাখিবার এবং তাহার ফলে নিজ প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার আশাই তিনি করিয়াছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষে সিন্ধিয়া এবং তাঁহার মিত্র বাজীরাও পেশবাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া হোলকার মহাসমারোহে পেশবা-রাজধানী পুণানগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই পরাজয়ের ফলে বাজীরাও ইংরাজদিগের করে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নিজ রাজ্য তাহাদের হস্তে তুলিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজরা সর্ব্বপ্রথম মারাঠাদের ব্যাপারে কথা বলিবার অধিকার পাইয়াছিল। এদিকে হোলকার তখন তাঁহার ভ্রাতা জিন্নৎরাওকে সিংহাসনে বসাইতেছিলেন।

এইরূপে তাঁহার ঈর্ষ্যা ও অদম্য ধনতৃষ্ণার ফলে পেরঁ সিন্ধিয়ার এবং পেশবার সকল দুর্ভাগ্যের এবং হিন্দুস্থানের সর্ব্বনাশের মূল কারণ হইয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার সকল দোষের উপর আবার ভারতবর্ষ ও ফ্রান্সের পক্ষে,—এমন কি সমগ্র জগতের পক্ষে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—হেয়তম এবং সাংঘাতিকতম অপরাধ অনুষ্ঠান করাও তাঁহার অদৃষ্টে লিখিত ছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজ কোম্পানীর সেনাদল তাহাদের মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের হেড-কোয়ার্টার্স হইতে যাত্রা করিয়া তাহাদের পুরাতন ক্রীতদাস নিজামের সৈন্যদলের সহিত যোগ দিয়াছিল এবং পেশবাকে পুণায় আনিয়া তাঁহার সিংহাসনে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই ব্যাপারে সমস্ত ঘটনাচক্র অনুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গের ব্যাপারে ইংরাজদিগের হস্তক্ষেপে একটি সুফল ফলিয়াছিল। হোলকার এবং সিন্ধিয়া আত্মকলহ ভুলিয়া পুনর্ম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং জেনারেল পেরঁর কোন প্রকৃত সাহায্য পাঠাইতে অসম্মতি সত্ত্বেও মারাঠা সাম্রাজ্য এবং তাহার প্রধান নায়ককে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া বেরারাধিপতির সহিত মন্ত্রণা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের সহিত সমর যে অপরিহার্য্য, অতঃপর সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না। সিন্ধিয়ার দরবারে নিতান্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সর্দ্দার আম্বাজী ইংরাজদিগের ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে নূতন দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। সিন্ধিয়ার নামে তিনি পেরঁকে ইংরাজদিগের সহিত বল-পরীক্ষা আরম্ভ হইলে যাহা কিছু

ঘটিতে পারে তজ্জন্য প্রস্তুত থাকিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মাত্র যেটুকু না করিলে তাঁহাকে নিজকে বিশ্বাস-ঘাতক প্রতিপন্ন করিতে হয়, পের্ঁ তদতিরিক্ত কিছুই করিলেন না।

ইংরাজরা ঠিক এই সময় অতি সামান্য এক অজুহাতে সন্নিকটবর্ত্তী এক রাজার নিকট হইতে সাসনি দুর্গটি দখল করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহারা এক অস্ত্রশস্ত্রের ডিপো স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থান পের্ঁর হেড-কোয়ার্টার্স ও বাসস্থান কোয়েল হইতে তিন লিগ দূরে অবস্থিত ছিল; তথাপি তিনি উহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা-কার্য্যে কোন বাধা দেন নাই।

আমার প্রতি সৈনিকগণের কথঞ্চিৎ আস্থা আছে জানিয়া পের্ঁ আমাকে এসিয়ার অপর এক প্রান্তে শিখ-দিগের নিকট সাম্রাজ্যের করদ-প্রজারূপে তাহারা যে রাজকর প্রদানে বাধ্য ছিল, তাহা দাবী করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু আমার গমনের উদ্দেশ্য যাহাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, সেজন্য সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উহাদের কাছে সৈন্যসাহায্যও দাবী করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। এই যুক্ত দাবী নিশ্চয়ই শিখদিগকে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য করিত; কিন্তু উহাদের উপর আমার কতকটা প্রভাব থাকায় আমি উহাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুত অর্থ এবং বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। রামপুরের রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম মহম্মদ খাঁর রাজ্য ইংরাজরা আক্রমণ করিয়াছিল। তাঁহাকে আমি আমাদের পক্ষে আনিয়াছিলাম। তিনি একাই আমাদিগকে ছয় সহস্র উৎকৃষ্ট সৈনিক যোগাইতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু পের্ঁর পরবর্ত্তী আচরণের জন্য এ সাহায্য আমাদের কোন কার্য্যে লাগে নাই।

ইংরাজদিগের সাফল্যে ভারতবর্ষের সকল দেশীয় নৃপতি শঙ্কাগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং যদিও তাঁহাদের অনেকের পের্ঁর আচরণে যথেষ্ট অসন্তোষের কারণ ছিল, তথাপি তাঁহারা সাধারণ আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাকে অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

পের্ঁর আয়ত্তাধীনে যে সেনাবল ছিল, মাত্র ১৫ অথবা ২০ দিনের মধ্যে তাঁহার পক্ষে তাহা নিজ সন্নিধানে সমবেত করা সম্ভব ছিল। সে সম্বন্ধে যাহাতে একটি ধারণা করা যাইতে পারে, সেই জন্য একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

	রাজার নাম	সৈন্যসংখ্যা
	জয়পুরের রাজা, ফতেসিংহ	৬০,০০০
	ভরতপুরের রাজা রণজিৎসিংহ	৬০,০০০
	রাও রাজা	২০,০০০
	জাঠজাতীয় কর্ণৌলির রাজা	২০,০০০
	হাথরাসের রাজা দয়ারাম এবং তাঁহার আত্মীয় সাসনীর রাজা (ইংরাজের শত্রু)	৩০,০০০
৬।	বাপু সিন্ধিয়া	৬০,০০০
৭।	রাজা রাঞ্জয়াল	২০,০০০
৮।	পরীক্ষিৎগড়ের রাজা সুরৎসিংহ	২০,০০০
৯।	বালাঙ্গড়ের রাজা তারাসিংহ	১০,০০০
	এই সকল দেশীয় সৈন্য ব্যতীত পের্ঁর দুই ব্রিগেডে প্রত্যেকটিতে ৮০০০ করিয়া সুশিক্ষিত সৈনিক ছিল	১৬,০০০
	ইউরোপীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত কঠোর পরিশ্রমক্ষম অশ্বারোহী সৈনিকের সংখ্যা ছিল	২০,০০০
	মোট—	৩,৩৬,০০০

এই সম্ভ্রম-উদ্রেককারী সুবিশাল বাহিনী পের্ঁ স্বীয় আজ্ঞাধীনে পাইতে পারিতেন। ইহাদের সাহায্যে শুধু মারাঠা সাম্রাজ্য রক্ষা কেন, ইংরাজদিগকে তাহাদের অধি-কৃত সকল স্থান হইতে বিতাড়িত করিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম হইতে পারিতেন, কারণ তাহাদের সৈন্য বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। পের্ঁর বিরুদ্ধে উপস্থিত শত্রুসেনা সংখ্যায় মাত্র ৮০০০ ছিল এবং তাহারও দুই-তৃতীয়াংশ আবার দেশীয় ছিল, এ কথা যখন আমি স্মরণ করি, তখন ক্রোধে ক্ষোভে আমার আর জ্ঞান থাকে না। বিবেকের বাণীতে কর্ণপাত করার পরিবর্ত্তে হীন লালসার তাড়নায় তিনি ঐ সকল জাতিকে দুর্ভাগ্যের চরম গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বৃথাই উক্ত রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে সম্মিলিত সেনাদলের সমবেত হইবার জন্য একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতে নির্ব্বন্ধসহকারে অনুনয় করিয়াছিলেন। তিনি তাহা না করিবার সর্ব্বদাই কোন না কো-

অজুহাত খুঁজিয়া বাহির করিতেন এবং এইরূপে তিনি স্বয়ং যে ভীষণ পরিণতির চক্রান্ত করিতেছিলেন, তাহা না ঘটিয়া উঠা পর্য্যন্ত উহাঁদিগকে এক বিলম্বের ব্যাপার হইতে অপর এক বিলম্বের ব্যাপারে অকারণ কালক্ষেপ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের ঘটনাপরম্পরা বর্ণনা করা যাউক। পেরঁ আমাকে আমার কার্য্যে অত শীঘ্র ঐরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং যত অধিকসংখ্যক শিখ আমি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাদের লইয়া অবিলম্বে আমাকে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে দশ সহস্র সওয়ার পাঠাইয়া দিয়া বাকী দশ হাজারকে আমার পুরোবর্ত্তী দলরূপে রওয়ানা করাইয়া দিয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া ২২শে আগষ্ট ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে আসিয়া পৌছি। কোয়েলে পেরঁর নিকট যাওয়া আমার অভিপ্রায় ছিল; এমন সময় তিনি আমাকে দিল্লীর প্রাচীর-বহির্ভাগে শিবির সন্নিবেশ করিতে, মোগলসম্রাট সাহ আলমের শিবিরস্থাপন করাইয়া তাহাতে উহাঁকে বাস করিতে সম্মত করাইতে এবং আমার ব্রিগেডের, যাহা আমি আমার জনৈক অফিসরের অধীনে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সহিত তাঁহাকে আগ্রায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই কার্য্যগুলি সমাধা করিয়া আমি একাকী তাঁহার দলে যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম।

উক্ত বিশ্বাসঘাতক সেনাধ্যক্ষ আর এক ব্রিগেডের ৮০০০ সৈনিককেও স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। মেজর গেসল্যাঁ উহাদের গঠন করিয়াছিলেন এবং পরিচালন করিতেন। পেরঁর আদেশে তিনি দিল্লী ছাড়িয়া কয়েক ক্রোশ দূরে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপে পেরঁ নিজ সৈন্যদল সমবেত করিবার পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন এবং কি প্রকার কার্য্যক্রম অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা যেন নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইয়া সাহায্যকারী সেনাদলকেও সমবেত হইতে দিতেছিলেন না।

এরূপ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দিল্লীতে শিবিরস্থাপনের আদেশ পাইয়া আমি ঘোর বিস্ময়াপন্ন হইলেও তাহা পালনে তৎপর হইয়াছিলাম এবং বাদসাহী শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে উহা অধিকার করাইবার আমার সকল প্রয়াস নিষ্ফল হইয়াছিল। বৃদ্ধ স্বীয় অভ্যস্ত বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না এবং স্থানান্বিত হইবার জন্য আমার সর্ব্ববিধ অনুরোধ উপরোধ বিলম্ব করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বলপ্রয়োগ করা ভিন্ন আমার সম্মুখে গত্যন্তর ছিল না, কিন্তু দূরদর্শী পেরঁ আমাকে তাহা করিবার অধিকার দিয়া রাখেন নাই।

পেরঁ আমাকে উক্ত আদেশগুলি দিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ইংরাজ সেনার গতিবিধির সংবাদ অবগত ছিলেন। জেনারেল লেক যে ৭ই আগষ্ট ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কানপুর হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কোয়েল অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। ২৮শে তারিখে লেক তথায় পৌছান। পেরঁর ভ্রান্ত সেনাসংস্থান যদি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজদ্রোহপ্রসূত না হইয়া শুধু অজ্ঞতা বা ভ্রান্তিজনিত হইত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই শত্রুসেনা নিকটে আসিয়া উপনীত হইলে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে তৎপর হইতেন। কোয়েলে সেনা সমাবেশ করিতে দুই তিন দিনের অধিক সময় কোন মতেই আবশ্যক হইত না। মেজর গেসল্যাঁর ও আমার ব্রিগেডের ১৬০০০ সুনির্ব্বাচিত পদাতিক, পেরঁর নিজের বিশ হাজার অশ্বারোহী ও আমার আনীত বিশ হাজার শিখের সহিত মিলিত হইতে পারিলে বিপক্ষের ৮০০০ সৈন্যকে হেলায় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলার পক্ষে প্রয়োজনাতিরিক্ত হইত।

তাঁহার এ হেয়তম আচরণের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটনের সময় আসিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পেরঁ প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আগ্রা যথায় তাঁহার শ্যালী-পুত্র দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন, দিল্লীতে মহাজন আসনেবাহএর * নিকটে, আলিগড় দুর্গমধ্যে এবং কোয়েল দুর্গে নিজ সন্নিধানে তিনি উহা রক্ষা করিতেন। কিন্তু দীর্ঘকাল হইতেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করা স্থির করিয়াছিলেন এবং ইংরাজাধিকারে কলিকাতায় বিভিন্ন ব্যাঙ্কের নিকট বহু অর্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "ককেরেটের" কারবারে (Coqueret) তাঁহার ২৮ লক্ষ টাকা ন্যস্ত ছিল। বেকেট

* প্রকৃত নামটি কি বলা শক্ত। উহা 'হাসান সাহ' বলিয়া মনে হয়। হরসুখ রায় নামে পেঁরর অপর একজন ব্যাঙ্কারের ইতিহাসে উল্লেখ দেখা যায়।

নামক জনৈক ইংরাজ তাঁহার এই সকল চক্রান্তের বিশ্বাসী এজেন্ট ছিলেন। ভারতবর্ষস্থ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ কথা জানিতেন। এই সকল জনপদে একমাত্র যে ব্যক্তি তাঁহাদের সম্প্রসারণ নিরোধ করিতে পারিতেন, তাঁহাকে এই ভাবে নিজ সারা জীবনের সঞ্চয় বৃটিশ অধিকারে পাঠাইয়া দিয়াও জনৈক ইংরাজকে নিজ বিশ্বাসী অনুচর ও সকল গোপন কার্য্যের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা স্বাক্ষীরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে উহাঁদের প্রতি কতকটা নির্ভরশীল করিয়া ফেলিতেছেন দেখিয়া ইংরাজরা পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সতর্কতা হইতে পেরঁর গুপ্ত অভিসন্ধি ধরা পড়ে। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং পেরঁর সহিত গোপনে আলাপ-আলোচনার পর এই সময় আক্রমণে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, নতুবা তাঁহাদের মাত্র ২০০০ ইউরোপীয় ও ৬০০০ দেশীয় সিপাহী সম্বল করিয়া সুশিক্ষিত ও সমরাভিজ্ঞ এক সেনাদলের (যাহা অনায়াসে তিন লক্ষে পরিণত করা সম্ভব ছিল) বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন ও অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়ে।

পেরঁ প্রত্যাসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ও অসদাচরণে অসন্তুষ্ট, আহ্বান করা সত্ত্বেও তাঁহার আগমনে অসম্মতি এবং নিতান্ত চরম মুহূর্ত্তে প্রেরিত সাহায্যের অপ্রাচুর্য্যে বিষম ক্রুদ্ধ সিন্ধিয়া তাঁহার পদে অম্বাজী ইঙ্গলিয়াকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ইতোমধ্যেই তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণে যাত্রা করিয়াছিলেন। পেরঁ তাঁহাকে অনেকদিন হইতে বিষম অপছন্দ করিতেন। সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার নিজের ও ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা তাঁহার একমাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যে ব্যক্তি তখন পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্যে যৎপরোনাস্তি উদ্যম দেখাইতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁহার নিরুদ্যমতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ইহাই হইল প্রকৃত কারণ।

সুতরাং জেনারেল লেক স্বীয় ৮০০০ সৈনিকসহ পেরঁর বিরুদ্ধে পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত আগুয়ান হইতেছিলেন। তাঁহার সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখা সত্ত্বেও পেরঁর নিকট তখনও ২০,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ শিখ ও সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত ৩০টি পোত ছিল। শত্রুকে পরাজিত করিয়া বিজয়লাভের পক্ষে ইহারা প্রয়োজনের অপেক্ষা অতিরিক্ত ছিল এবং তাঁহার সৈনিকদিগকে বশ্যতার সীমারেখার মধ্যে রাখিতে পেরঁকে বিশেষ আয়াস পাইতে হইয়াছিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ২৯শে আগষ্ট সকাল সাত ঘটিকার সময় ইংরাজ সেনাদল আলিগড় দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। পেরঁর বাসস্থান কোয়েল হইতে উহার দূরত্ব মাত্র দেড় লীগ ছিল। মারাঠা সর্দার ও সেনানায়কগণ পেরঁর দীর্ঘসূত্রতা, সৈন্যদলকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষেপণ, সিন্ধিয়াকে সাহায্য করিতে অসম্মতি এবং শত্রুর সম্মুখেও উদ্যমের অভাব দেখিয়া যৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে পেরঁর চারিদিকে আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে নিজ নিজ উষ্ণীষ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার নিকট ইজ্জতের নামে তাঁহাদিগকে ইংরাজ ব্যাটালিয়নসমূহকে চূর্ণ করিবার অনুমতি দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে এই বিশ্বাসঘাতক এই প্রকার উত্তর দিয়াছিল—"যে ব্যক্তি তাহার বন্দুকের ঘোড়া উঠাইবে অথবা প্রথম গুলি ছুঁড়িবে, আমি তাঁহার প্রাণদণ্ড করিব।" ইংরাজ কামান হইতে প্রথম গোলাবর্ষণে তিনি কি করিলেন? তিনি সকলকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এক সরকারী রিপোর্ট ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।* উক্ত গ্রন্থ আমার নিকট আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে,— "বৃটিশ আক্রমণ প্রতিহত করিবার পক্ষে ম্যাসিয় পেঁরর অধিকৃত স্থান উপযোগী ও সুদৃঢ় ছিল। তাঁহার পুরোদেশ সুপ্রশস্ত এক জলাভূমি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত ছিল; উহা স্থানে স্থানে একেবারেই অগম্য ছিল। তাঁহার পার্শ্বদেশ আলিগড়-দুর্গ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল। তাহা ছাড়া জমির অবস্থা এবং তাঁহার সিপাহীগণের অধিকৃত কয়েকটি গ্রামের অবস্থানের জন্য তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পেরঁ বল-পরীক্ষা করিতে সাহস না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

* Appendix to the notes relative to the late transactions in the Mahratta Empire.

বিশ্বাসঘাতকতার এরূপ সুস্পষ্ট আচরণ পের'র সৈনিকগণের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সমস্ত যাত্রাপথ ধরিয়া সিপাহীরা তারস্বরে তাঁহাকে নিমকহারামীর অপবাদ দিয়া অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে গিয়াছিল। তাঁহার তিন সহস্র অশ্বারোহী পল্টন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পর-দিবস আমার ব্রিগেডে আসিয়াছিল। যে সঘৃণ রোষ তাহারা নিজেরা অনুভব করিতেছিল, তাহা তাহারা আমার লোক-জনদের মধ্যে সংক্রামিত করিয়াছিল। সাধারণ মনোবৃত্তির অংশ গ্রহণ করিতে আমিও বাধ্য হইয়াছিলাম। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অপর কোন অনুকূল বর্ণে রঞ্জিত করা আদৌ সম্ভবপর ছিল না। পের'র হইয়া ওকালতী করিতে আমি ইচ্ছুক হইলেও কিছু করিতে পারিতাম না; উহাতে শুধু অবিবেচনার কাজ করিয়া আমার নিজেকে সন্দেহের চক্ষে ফেলা হইত, কারণ তখন তাঁহার বিপক্ষে সৈনিকগণের মনোভাব চরমে পৌঁছিয়াছিল। উহারা আর তাহার কর্তৃত্ব মানিতে প্রস্তুত ছিল না; সকলে তাঁহার এবং পাপকর্ম্মে তাঁহার সহচরগণের রুধিরদর্শনলোলুপ হইয়া উঠিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমি ব্রিগেড দুইটির সিপাহীগণের এবং সওয়ারগণের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, জেনারেলের নিকট যাইবার জন্য এবং তিনি ঠিক কি কাজ করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য উহারা নিজেদের মধ্য হইতে লোক নির্ব্বাচিত করুক। তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না। তখন আমি স্বীয় ব্যক্তিগত সম্মান, দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার প্রতি আনুগত্য এবং স্বদেশের স্বার্থ, যাহা স্বভাবতঃ ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের স্বার্থের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত ছিল, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যে একমাত্র পথ আমার পক্ষে উন্মুক্ত ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমার ব্রিগেডের সর্ব্বপ্রধান কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া আমি ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত সৈনিকগণকে সমবেত করিয়া পুনরায় শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলাম। বাদসাহের শিবির দিল্লীতে পুনঃ প্রেরণ করিয়া আমি ব্রিগেডসহ তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। রাজধানী হইতে দেড় লীগ দূরে আগ্রার পথে আমরা অবস্থান করিতেছিলাম। যমুনাতটে দ্বিতীয় ব্রিগেডের ঠিক বিপরীত দিকে আমি অবস্থান পরিগ্রহণ করিয়াছিলাম। সিকান্দ্রা হইতে আসার পর উহারা নদীর অপর পারে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। মেজর গেসলাঁ্যা এই দলের অধিনায়ক ছিলেন। পের' সম্বন্ধে উহাদের মতামত আমার সৈনিকগণের অনুরূপ ছিল। মেজর গেসলাঁ্যা আমাকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সৈনিকগণের নামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। আমি তাহা করিয়াছিলাম। যেইমাত্র আমি নৌকা হইতে অবতরণ করিলাম, অমনি তেইশটি তোপধ্বনি হইল। তিনি স্বীয় সৈন্যদলসহ নিজেকে আমার আজ্ঞাধীনে স্থাপন করিলেন। দিল্লীর প্রাকারবহির্ভাগে আমার ব্রিগেডের সহিত যোগ দিবার জন্য আমি উহাদের আদেশ দিলাম। যতগুলি সম্ভব অশ্বারোহী সেনা আমি সংগ্রহ করি। আমি সৈনিকদিগকে বেতন দিয়াছিলাম এবং আবশ্যকীয় রসদ ও গোলা, গুলি বারুদ সব কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলাম। অচিরেই যে সকল গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা যদি না ঘটিত, তাহা হইলে আমি শীঘ্রই শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বেশ ভাল রকম একটি সেনাবাহিনী পরিচালনা করিতে পারিতাম।

ঐ সকল গোলযোগের কারণ ও ধরণ সম্বন্ধে বলিতে হইলে আবার জেনারেল পের'র প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক। ২৯শে তারিখের ঘটনার পর তিনি কোয়েল হইতে ৫ লীগ দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে গমন করেন। ইংরাজরা তথায় তাঁহাকে উত্যক্ত করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল। উহাদের স্বার্থের প্রতি নিজ অনুরাগ তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রকট করিয়াছিলেন। কিন্তু পের'র নিজের সৈনিকেরাই তাঁহার অন্তরায় হইয়াছিল। বিপক্ষতাচরণ-সূচক নিজকার্য্যের জন্য সৈনিকগণের নিকট ক্ষমার্হ বিবেচিত হইবার জন্য (কারণ স্বকীয় নিরাপত্তার জন্য তাহা একান্ত আবশ্যকীয় ছিল) এবং নিজ সেনাদল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলার তাঁহার যে প্ল্যান ছিল, তাহার পরিপন্থী ছিল বলিয়াও বটে, তিনি সুপ্রচুর লুণ্ঠনের লোভ দেখাইয়া অশ্বারোহীদলকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত মাত্র ৬০০ দেহরক্ষীকে নিজ সন্নিধানে রাখিয়া তিনি কাপ্তেন ফ্ল্যুরীর নেতৃত্বে সমগ্র অশ্বারোহী পল্টনকে ইংরাজরাজ্য আক্রমণে পাঠাইয়াছিলেন। ভরতপুর ও হাথরাসের রাজারা এই সময়ে পের'র নিকট তাঁহাদের রাজ্য-মধ্যে আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। হয় তাঁহারা উহাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় প্রত্যয় স্থাপন করেন নাই, নতুবা পের'কে পরীক্ষা করিয়া দেখা তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ইংরাজরা সিন্ধিয়ার সেনাদলভুক্ত তাঁহাদের স্বজাতীয় অফিসরগণকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিবার আদেশ দিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। যাহারা তাহার অন্যথাচরণ করিবে, তাহাদিগকে স্বদেশদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করা হইবে বলা হইয়াছিল। ফরাসী অফিসরদেরও সুপ্রচুর পুরস্কারের বিনিময়ে উহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল পের্ঁ আমাদের ব্রিগেডে তিন জন চর পাঠাইয়াছিলেন। সৈনিকগণের মধ্যে অশান্তি ও মনোভঙ্গ-সৃষ্টি এবং অফিসরগণকে উৎকোচ-প্রদানে নষ্ট করাই তাহাদের গোপন উদ্দেশ্য ছিল। এই তিন ব্যক্তি তাঁহার দেওয়ান, প্রধান হরকরা ও খাস মুন্সী ছিল। আমি উহাদের গ্রেফ্‌তার করিয়াছিলাম। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তাহারা আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করিবার অবকাশ পাইয়াছিল।

[ক্রমশঃ

ব্যথিতা ধরি

—শ্রীরমণী চক্রবর্ত্তী

দিগন্তে মিলায়ে যায় দিনান্তের শেষ রশ্মিরেখা,
সন্ধ্যা নামে কৃষ্ণ বেশ পরি;
ব্যথিতা ধরিত্রী কাঁদে মৌন তার ক্রন্দনের ভাষা,
ধ্বনিতেছে মহাশূন্য ভরি।
শৃঙ্খলপীড়িতা পৃথ্বী ব্যথা আর পারে না সহিতে,
মর্ম্মে জ্বলে দাবাগ্নির জ্বালা;—
হিংস্র মানুষের দল যুগে যুগে শ্যাম বক্ষে তার
রচিয়াছে মহাধ্বংস-শালা।
স্মরণে জাগিছে আজ, তরঙ্গিত নীল সিন্ধু হ'তে,
সৃজনের প্রথম উষায়;
ধরিত্রী লভিল জন্ম, দিকে দিকে ওঠে জয়গান,
গ্রহ-তারা প্রণতি জানায়।
ব্রীড়ানতা বধূসম সে দিনের তরুণী পৃথিবী,
এসেছিল সৌর সভাতলে;
গর্ভেতে মানব ভ্রূণ, জন্ম তার হয়নি তখনো,
মৃত্যু মৌন রাত্রির অঞ্চলে,—
অতর্কিতে সঙ্গোপনে জীবনের জাগিল উৎসব,
এল পশু, আসিল মানব;—
এল ক্রমে পৃথিবীর দিক্ হ'তে দিগন্ত ব্যাপিয়া
ধরণীর সন্ততিরা সব।
তার পরে মানুষের লালসার উদ্ধত কামনা,
অন্যায় স্পর্দ্ধার অহমিকা;—
ক্রূর অভিশাপ সম আপনাকে কলঙ্কিত করি,
জ্বালিল দুঃখের দীপশিখা।
প্রবলের অত্যাচার সভ্যতার পরিচ্ছদ পরি,
জড়ায়ে ধর্ম্মের আবরণ;—
অগণিত মানুষের কেড়ে নিল ক্ষুধার আহার,
গৃহে গৃহে তুলিল ক্রন্দন।
দেশ হতে দেশান্তরে বাড়াইতে সাম্রাজ্যের সীমা,
মানুষের হত্যার উৎসবে;
অযুত নরের প্রাণ ধ্বংস হল ছাগপশুসম!
পীড়িতের ক্রন্দনের রবে;
সন্ধ্যার আকাশ আজ রক্ত রঙে উঠেছে রাঙিয়া,
পৃথিবীর ঝরে অশ্রুধার;
অশ্রুর প্রবাহে তার লবণাক্ত সিন্ধুর সলিল,
ক্রন্দন কি থামিবে না আর!
হে বিষণ্ণ বসুন্ধরা, অশ্রুধারা মুছে ফেল আজি,
বিলাপের কর অবসান;
সমুদ্র পর্ব্বত ঘেরি আজি যেন শুনি অকস্মাৎ,
অনাগত দিনের আহ্বান।
রাত্রির কুহেলী আর শতাব্দীর সঞ্চিত তমসা,
কেঁপে ওঠে আলোর পরশে;
ব্যথিত বঞ্চিত আর সর্ব্বরিক্ত মানব-হৃদয়
পরিপূর্ণ প্রাণের হরষে।
আমিও মানবশিশু ধরণীর এক প্রান্তে বসি,
সেদিনের গাহি জয়গান;—
সেদিন যুগের সূর্য্য দীপ্ত তার ভাস্বর শিখায়,
রাত্রির করিবে অবসান,
সেদিনের যাত্রীদের সচঞ্চল দৃপ্ত পদক্ষেপ,
শুনি আজ দিকে দিগন্তরে;
জাগে নর, জাগে নারী, জাগে শিশু যুবক-যুবতী,
পল্লী আর নগরে নগরে।
মানুষের সভ্যতারে নবরূপে গড়িতে আবার
চলিয়াছে মহা অভিযান;
অনাহারে, অপমানে জর্জ্জরিত যে আছ যেথায়
এস বন্ধু হও আগুয়ান।
আজিকার এই রাত্রি, এ কুৎসিত অন্ধ অমানিশা
পুরাতন এই পৃথিবীরে;
নিঃশেষে বিলীন করি নবীন ধরার অভিষেক
করিব সুনীল সিন্ধুনীরে।

প্রাচ্যের শক্তি জাপান

শ্রীমন্মথনাথ সরকার

সুদূর প্রাচ্যে জাপান যেরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সমগ্র ইউরোপ এমন কি মার্কিনও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্যে জাপান যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর বণিকসম্প্রদায় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। জাপানের রেশমজাত বস্ত্র ইউরোপ ও মার্কিনের বাজার অধিকার করিয়া বসিয়াছে। পণ্য উৎপাদন করিবার ব্যয় জাপানে এত কম যে, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। জাপানের রেশমজাত বস্ত্র ফরাসী দেশে যে দরে বিক্রীত হইতেছে, তাহার উপর শতকরা ত্রিশ টাকা অধিক চাপাইলে তবে ফরাসী দেশে ঐ প্রকার বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে। জাপানের পণ্য বিতাড়িত করিবার অভিপ্রায়ে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশসমূহ সুউচ্চ ট্যারিফ-প্রাকার তুলিয়াও জাপানী পণ্যের হাত হইতে নিস্তার পাইতেছেন না। জাপানের রবারের জুতার ব্যাপক বিক্রয় দেখিয়া গ্রেট বৃটেন বাধ্য হইয়া শুল্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপান ছাড়িবার পাত্র নহে। জাপান একেবারে খাস ইংলণ্ডে যাইয়া রবারের জুতার ফ্যাক্টরী খুলিয়া বসিয়াছে। ভারতের বাজারে শতকরা পঁচাত্তর টাকা হারে শুল্ক দিয়াও জাপান যে দরে বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে, তাহাতে ভারত ও মাঞ্চেষ্টার উভয়েরই প্রতিযোগিতা করা দায় হইয়া উঠিয়াছে। ইস্পাতনির্ম্মাণেও জাপান যেরূপ উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহাতে প্রতীচ্যের না হইলেও, প্রাচ্যের আর কোন দেশ ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের বা মার্কিনের ইস্পাত কিনিবে না। ঘটনাচক্রে অধুনা মানব-জীবনে ইস্পাতের প্রয়োজন ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। জাপান এই পণ্যেরও একচেটিয়া কারবার চালাইবার মতলব করিয়াছে।

পণ্য-উৎপাদন বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইলে কাঁচামালের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। জাপানের কাঁচামাল সংগ্রহের পথ বর্ত্তমানে অনেক পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-চীন জাপানের অধিকারে আসা অবধি জাপান কয়লা, খনিজ তৈল, লৌহ, সার ও খাদ্যশস্য তদঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করিতেছে। মাঞ্চুরিয়ার তৈল-খনিতে পূর্ব্বে মার্কিন ও জার্ম্মানী প্রভৃতি ইউরোপীয় রাজ্যগুলির যে অধিকার ছিল, বর্ত্তমানে তাহা আর নাই। জাপান মাঞ্চুকুও রাজ্যের দোহাই দিয়া বৈদেশিকদের ঐ সকল অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। এ দিকে জাপান আবিসিনিয়ার বিস্তীর্ণ উর্ব্বর ক্ষেত্রে তুলার চাষ চালাইতেছে। অবশ্য ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া অধিকৃত হওয়ার পর জাপানের তদ্দেশে চাষ-আবাদ করিবার কিরূপ সুযোগ-সুবিধা আছে, তাহা আমরা অবগত নহি। শ্যামরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক সিংহাসন ত্যাগ করা অবধি এই রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিচালন-ভার এক প্রকার জাপানের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে। শ্যামরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলস্থ ক্রা নামক যোজকে জাপান এক খাল খনন করিয়া একেবারে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইবার বন্দোবস্ত করিতেছে। যদি প্রস্তাবিত খাল খনিত হয়, তাহা হইলে সিঙ্গাপুর বন্দরের তোড়জোড় ও আয়োজন প্রভৃতি একেবারে ভস্মে ঘি ঢালার মতই হইয়া দাঁড়াইবে। আফগানিস্থান রাজ্যে জাপান শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়িয়া দিতেছে এবং কাবুলে আফগান-জাপানী ব্যাঙ্ক অব কমার্সের পত্তনও হইয়া গিয়াছে।

এই ত গেল জাপানের ব্যবসায়-বাণিজ্যঘটিত কীর্ত্তি। রাজনীতিতেও জাপান প্রাচ্যের অগ্রণী দেশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। জাপানের নৌবহর যে কিরূপ শক্তিশালী, তাহা গত বৎসরের লণ্ডনে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে। সমুদ্রচারী বলিয়া ইংলণ্ড ও মার্কিনের যে গর্ব্ব ছিল, সে গর্ব্ব আজ খর্ব্ব হইতে চলিয়াছে। জাপানের বিমান-বহর যে অকিঞ্চিৎকর নহে, তাহা গত সাংহাই যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সেই যুদ্ধে বিমান হইতে বিক্ষিপ্ত বোমায় য়ুমাং দুর্গশ্রেণী সমভূমি হইয়া গিয়াছিল এবং চীনাদের অধিকৃত চাপেই অঞ্চলে অত্যল্পকালের মধ্যেই বীভৎস ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংলণ্ডরাজের গত রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে জাপানের রাজকুমার প্রিন্স চিচিবু যে বিমানে

আবোহণ করিয়া লণ্ডনে গিয়াছিলেন, সেই বিমানের নির্ম্মাণ-কৌশল ও গতিশক্তি দেখিয়া ইংবাজগণ চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। জাপানেব পদাতিক সৈন্যও সুশিক্ষিত ও সাহসী বলিয়া খ্যাত। এমত অবস্থায় প্রাচ্যে জাপানের সমকক্ষ আব কেহ আছে কি না সন্দেহ।

রুশিয়াকে অবশ্য তুচ্ছ করা যায় না। রুশিয়ার বিমান-বহবও বর্ত্তমান জগতে অপূর্ব্ব। রুশিয়ার বিমানেব প্যাবা-শ্যুট পদ্ধতি এক অভিনব ব্যাপাব। কিন্তু জাপানের রুশিয়াকে ভয় করিবাব কোন কারণ নাই। রুশিয়ার অন্ত-র্ব্বিদ্রোহ এখনও একেবারে দূব হয় নাই। বিশেষতঃ রুশিয়া সোস্তালিষ্ট। যাহাবা সোস্তালিষ্ট বা সমাজতন্ত্রবাদী, তাহাবা পররাজ্য-লোলুপ নহে বা তাহারা আক্রান্ত না হইলে বৈদেশিক শক্তির সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইবে না। রুশিয়াকে জাপানেব বিরুদ্ধে লাগাইবাব জন্য নানা প্রকাব চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু রুশিয়া কিছুতেই সংগ্রামে অবতীর্ণ হইল না। রুশিয়ার যদি জাপানের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনা থাকিত, তাহা হইলে সে কখনই চীনা ইষ্টার্ণ রেলওয়ে জাপানেব নিকট বিক্রয় করিত না, সাখালীন দ্বীপের মৎস্য-ব্যবসায়েব অধিকার জাপানকে দিত না, বা জাপান কর্ত্তৃক চাহাব অধিকাব রুশিয়া কিছুতেই নীরবে মানিয়া লইত না।

উত্তর-মঙ্গোলিয়া বর্ত্তমানে রুশিয়ার গণতন্ত্রেব অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। উত্তর-মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণে বিস্তীর্ণ গোবী মরু। এই মরুর পূর্ব্বে চাহার প্রদেশ এবং দক্ষিণে দক্ষিণ বা ভিতব-মঙ্গোলিয়া। চাহার প্রদেশ ও চীনের হোপেই প্রদেশ বর্ত্তমানে একেবারে চীনের হস্তচ্যুত হইযা গিয়াছে। এই প্রদেশকে জাপান মাঞ্চুকুওর ন্যায় 'স্বাধীন' করিয়া দিয়াছে। ৫ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, এই প্রদেশের সদর খাস পিকিংএ (চীনা নাম পেইপিং) যাইয়া বসিয়াছে। তাহা হইলে জাপান চীনের মহাপ্রাচীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চীনের প্রাচীন রাজধানী পিকিং সহর জাপানের করতলগত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ডেরিয়েন সাগর সম্পূর্ণরূপে জাপানের অধিকারে আসিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান পোর্ট আর্থার অধিকার করে। আর ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে জাপান সমগ্র ডেরিয়েন সাগরের কর্ত্তৃত্ব পাইল। পিকিং হইতে টিয়েন্টসিন্ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জাপানের করতলগত হইল। টিয়েন্টসিন বন্দব জাপানেব অধিকৃত হইলে সমগ্র উত্তর-চীনে চীনের আর কোন শক্তিই থাকিবে না। তাহা হইলে উহার দক্ষিণ অঞ্চলস্থ চিলি ও শানটাং প্রদেশও অদূর ভবিষ্যতে জাপানের অনুকম্পায় চাহাব ও হোপেই প্রদেশের ন্যায় 'স্বাধীনতা' লাভ কবিতে পারে। আব তাহা হইলে পীত নদের উত্তর ভাগস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ জাপানেব অধিকাবে পতিত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। তবে অবশ্য দক্ষিণ-চীনে বা পশ্চিম-চীনে প্রবেশ লাভ করা জাপানেব পক্ষে সহজসাধ্য হইবে না। মহাপ্রাচীরের মধ্যে জাপান প্রবেশ লাভ কবিয়া যে ক্ষান্ত থাকিবে সেরূপ মনে হয় না। পশ্চিম অঞ্চলস্থ সান্‌সী প্রদেশও অচিরে জাপানেব করতলগত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে।

দক্ষিণ বা ভিতর-মঙ্গোলিয়াব সুইয়ুয়ান ও নিংসিয়া প্রদেশ প্রত্যক্ষভাবে জাপানেব কবতলগত না হইলেও জাপানেব নির্দ্দেশমতে এই প্রদেশ দুইটি চালিত হইতেছে বলিয়া অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। এই দুইটি প্রদেশ বিস্তীর্ণ বালুক্ষেত্র মাত্র। এই অঞ্চলের অধিবাসীবা জঙ্গীশ খাঁর বংশধব। অশ্বারোহণে মঙ্গোলেব ন্যায় নিপুণ পৃথিবীতে আর কোন জাতিই নাই। মঙ্গোলগণ বর্ত্তমানে লামা মতাবলম্বী। জাপানের সহিত এই প্রদেশ দুইটিব সর্দ্দাবদেব বিশেষ সম্প্রীতি আছে; সুতরাং জাপান যদি মঙ্গোলদের সাহায্য পায়, তাহা হইলে দক্ষিণ ভাগস্থ চীনের কীংসু ও সেন্‌সী প্রদেশে প্রবেশ করা কিছু বিচিত্র নহে। আর জাপান সেইরূপ করিবে বলিয়া মনে হয়, কেন না এই সকল প্রদেশে সাম্যবাদ তীব্র আকার ধাবণ কবিয়াছে। এই অঞ্চলেব সাম্যবাদ তিব্বত, চীন ও জাপান, ইহাদের সকলের নিকটই আতঙ্কেব হেতু হইয়া পড়িয়াছে। কাজে কাজেই জাপানের পক্ষে ভিতর-চীনে প্রবেশ করা কিছু আশ্চর্য্য নহে। তবে সে কার্য্য অনায়াসে বা অল্প সময়ে সুসিদ্ধ হইবে না।

চীনা তুর্কীস্থান বা সিন্‌কিয়াং বর্ত্তমানে রুশিয়ার নির্দ্দেশে চলিতেছে; সুতরাং চীন দেশ হইতে সাম্যবাদ বিদূরিত কব শুধু যে জাপানের ইচ্ছা তাহা নহে, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জেরও তাহাই অভিপ্রেত। জাপানের উত্তর-চীন অধিকার ইটালি আবিসিনিয়া অধিকারের ন্যায় পৃথিবীর শক্তিপুঞ্জ কর্ত্তৃক নীরবে স্বীকৃত হইবে বলিয়া অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। জাপানে

পুকুরের ঘাটে। [শিল্পী—শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্যবাদ বিতাড়নের সদভিপ্রায় ইংলণ্ড, ইটালী ও জার্ম্মানীর মনঃপুত হইবেই ; সুতরাং জাপান যদি উত্তর-চীন অধিকার করিয়া পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, তাহাতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ বাধা দিবেন কেন ? দেখা যাউক পরিণাম কি হয়।

এদিকে সম্প্রতি সংবাদে প্রকাশ ইটালির সহিত ইংলণ্ডের মিতালি হইতেছে। ভূমধ্যসাগর লইয়া উভয়ের মধ্যে যে মনোবাদ চলিতেছিল, তাহা বোধ হয় এইবার অবসান হইবে। রুশিয়ার 'লাল'-ভীতি না কি সকলের নিকটই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ফ্যাসিজ্‌ম্ ও ডেমোক্রাসি, ইহারা আর পৃথক্ থাকিতে পারে না। ইটালির সহিত ইংলণ্ডের বিবাদ করিবার উপায় নাই। ইরাক ও মশুলের তৈলখনিই হইল এই মিলনের ঘটক।

বিদ্রোহী স্পেনের অধিনায়ক জেনারল ফ্রাঙ্কো না কি আর হালে পানি না পাইয়া ভ্যালেন্সিয়া সরকারের স্বামিত্ব মানিয়া লইবেন। অর্থাৎ, তিনি অধিকৃত অঞ্চল নিজের করতলে রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ স্পেনীয় সরকারের রহিল বলিয়া স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে স্পেনীয় যুদ্ধ অচিরে বন্ধ হইবে বলিয়া মনে হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ভ্যালেন্সিয়া, কার্টাজেনা ও বার্সিলোনা প্রদেশ স্পেনের বর্ত্তমান সরকারের অধীনে থাকিবে এবং স্পেনের অবশিষ্ট অঞ্চলে ফ্রাঙ্কোর অধীনে ফ্যাসিজ্‌ম্-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা তাহা হইলে ইউরোপ হইতে কিছু কালের মত বিদূরিত হইল। এক্ষণে সুদূর প্রাচ্যের চীন ও জাপানের যুদ্ধের অছিলায় ব্যাপক মহাসমর ঘটিতে পারে কি না তাহাই আলোচ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রুশিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না। ইউরোপের কোন শক্তি চীনের সহায়তা করিতে যাইয়া জাপানের সহিত শত্রুতা করিতে ভরসা করিবে না। মার্কিন একরূপ পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অচিরকাল মধ্যে স্বাধীনতা পাইবে ; সুতরাং মার্কিনের মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইবার কোন কামনা নাই বা জাপানকে সায়েস্তা করিবার তাহার প্রয়োজনও নাই। ইংলণ্ড জাপানের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ। প্রাচ্যের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে জাপানের সহিত ইংলণ্ডের বিরোধিতা করা চলে না। আবার ওদিকে রুশিয়ার ভয় ; সুতরাং এ যুদ্ধে চীনের পক্ষে কেহ যে জাপানের সহিত শত্রুতা করিবে এমন সম্ভাবনা দেখা যায় না। চীনের লোকবল প্রচুর থাকিলেও জাপানের সহিত সংগ্রাম চালাইবার তাহার শক্তি নাই। মোট কথা চীন দেশে জাপানের কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিবে এবং যদি কোন দৈবদুর্ব্বিপাক না ঘটে, তাহা হইলে জাপান কালক্রমে সমগ্র প্রাচ্যে কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইবে।

কংগ্রেস ও দেশ

…যে জাতীয় বিশৃঙ্খলা, অসভ্যতা এবং অবিচার কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের পরিচালিত কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতিতে দেখা যাইবে, সেই জাতীয় বিশৃঙ্খলা ঐ ঐ প্রতিষ্ঠান যখন তথাকথিত বুরোক্রেসীর দ্বারা পরিচালিত ছিল—তখন পরিদৃষ্ট হইত না। কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের হস্তে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিণতি এবংবিধ শোচনীয় আকার অবলম্বন করে কেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস-নেতৃবর্গ প্রায়শঃ ব্যবহারজীবী এবং তাঁহারা কি করিয়া অসৎ মানুষ ও কার্য্যকে সৎ এবং সৎ মানুষ ও কার্য্যকে অসৎ বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়, তাহার বক্তৃতায় অল্লাধিক সিদ্ধহস্ত বটে—এবং তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই প্রতারণা ও দম্ভের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিলে মানুষের হিতকর শৃঙ্খলিত গঠন-কার্য্যে সুনিপুণ হওয়া যায়, সেই সমস্ত শিক্ষার বিন্দুমাত্রও শিক্ষিত নহেন। ..

পুস্তক ও পত্রিকা

জীবনীকোষ (ভারতীয়-ঐতিহাসিক)—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। (১ম-৪র্থ খণ্ড)। কলিকাতা ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবব্রত চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত। পৃঃ প্রতিখণ্ডে ১১২ ডিমাই আটপেজী। মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲ টাকা।

উপস্থিত গ্রন্থে বর্ণানুক্রমিক ভাবে ভারতের এবং ভারতবর্ষসম্পর্কিত বিদেশীয়দের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। এই মহাগ্রন্থ একেবারে প্রস্তুত করা খুব শ্রমসাধ্য এবং অর্থব্যয়সাধ্য; তাই গ্রন্থকার ইহাকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। বর্ত্তমান চারি খণ্ডে স্বরবর্ণান্ত নামগুলি সমাপ্ত হইয়াছে, ইহাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৪০। শ্রীযুত শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে জীবনীকোষ (ভারতীয় পৌরাণিক) নামে এতদ্দেশের সমগ্র পুরাণ ও তত্তুল্য গ্রন্থরাশি হইতে ব্যক্তি-নামসমূহ ও তাঁহাদের পরিচয় বর্ণানুক্রমিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের আকারে ২২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত ঐ গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়া বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে যশস্বী করিয়াছে। ভারতীয় ঐতিহাসিক জীবনীকোষও উক্ত গ্রন্থের ন্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা সমগ্র ভাবে প্রকাশিত হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যের এক প্রধান অভাব দূরীভূত হইবে।

বাঙ্গলায় যে এরূপ গ্রন্থ রচনার চেষ্টা ইতঃপূর্ব্বে হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থের তুলনায় সে সকল নিতান্ত অঙ্গহীন। বর্ত্তমান চারি খণ্ডের ৪৪০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যে প্রায় দুই হাজার ব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা ইহার গুরুত্বের আন্দাজ করিতে পারি। এই সকল পরিচয় মোটের উপর বেশ সতর্কতার সহিত রচিত। আমরা এই ভারতীয় ঐতিহাসিক জীবনীকোষের বহুল প্রচার কামনা করি।

পরাজিত জার্ম্মানি—শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত। কলিকাতা ওরিএণ্টাল বুক এজেন্সী, ৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন। পৃঃ ডবল ক্রাউন ষোলপেজী ২৮০+৬৬৩ (চিত্র সংখ্যা ২৪)। মূল্য ৬৲ টাকা।

বিবিধ তথ্যপূর্ণ ভ্রমণকাহিনীকে বেশ হাল্‌কা অথচ সরস ভাষায় প্রকাশ করা শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের বিশেষত্ব। তাঁহার 'বর্ত্তমান জগৎ' নামক গ্রন্থাবলী লিখিয়া তিনি বাঙ্গালী পাঠকের মনোহরণ করিয়াছেন। ঘরে বসিয়া যাঁহারা পুঁথি-পত্রের ভিতর দিয়া বিদেশীয়দের জীবনের বিচিত্র গতির পরিচয় লাভ করিয়া শিক্ষা ও আনন্দ পাইতে চাহেন, শ্রীযুত সরকারই তাঁহাদের একমাত্র সহায়। মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির কিছু পরে গ্রন্থকার জার্ম্মানীর নানা অংশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল, যেহেতু তিনি জার্ম্মান ভাষায় তখন কিছু কিছু প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন সেই কারণে জার্ম্মানদের জীবনযাত্রার ব্যাপার তিনি অপেক্ষাকৃত ঠিক ভাবে পর্য্যবেক্ষণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ফলে তাঁহার এই ভ্রমণবৃত্তান্তে আমরা পরাজিত জার্ম্মানির অবস্থা ভাল করিয়া জানিতে পারি। জার্ম্মান জীবনের রাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি, আমোদ-প্রমোদ-সাহিত্য নাটক ও ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ সমস্তই তাঁহার লেখনীকে প্রেরণা দিয়াছে।

আর তাঁহার সমস্ত লেখাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে বর্ত্তমান গ্রন্থে উল্লিখিত বিবিধ ব্যক্তি, দৃশ্য ও অন্যান্য বস্তুর চিত্রাবলী। আর্ট পেপারে মুদ্রিত ২৪ খানি চিত্র গ্রন্থের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছে। গল্পোপন্যাস প্লাবিত বঙ্গদেশে ইহার উপযুক্ত সমাদর হইবে কি?

প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী প্রণীত (শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার লিখিত ভূমিকাসহ); পৃঃ ডিমাই ৮ পেজী ১৶০+১৬৫, (১২ খানি সচিত্র পৃষ্ঠা) মূল্য ২৷৷০।

সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মোহেন-জো-দড়ো ও পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পা নামক স্থানদ্বয়ের ধ্বংসস্তূপসমূহ আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় এক বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব অনূন দেড় হাজার বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে, যেহেতু ঐ ধ্বংসস্তূপ গুলিকে কিছুতেই খৃষ্ট জন্মের ৩০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে না করিয়া পারা যায় না। অনূন ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী এই সভ্যতার বিশেষ বিবরণ সার জন মার্শাল সম্পাদিত মোহেন-জো-দড়ো অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ সিভিলিজেশন (Mohenjo-daro and Indus Civilization) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। দেড় শতাধিক মুদ্রা মূল্যের ঐ গ্রন্থ পাঠক সাধারণের পক্ষে সুলভ নহে। কাজেই গোস্বামী মহাশয়ের এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালী পাঠকের এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। গ্রন্থকারও এই জন্য বিশেষ ধন্যবাদার্হ। উক্ত ধ্বংসস্তূপগুলির কোন কোনটির খননের সময় তিনি ভারতীয় প্রত্ন-বিভাগের কর্ম্মিরূপে খননস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কাজেই উপস্থিত গ্রন্থ বেশ নির্ভরযোগ্য ভাবে রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সার জন মার্শাল সম্পাদিত গ্রন্থের বা অন্যান্য গ্রন্থের মতামত নির্বিচারে গ্রহণ করেন নাই। স্থানে

স্থানে তিনি প্রাপ্ত ঐতিহাসিক মাল-মশলাকে নূতন ভাবে দেখিবার ইঙ্গিত দিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইবে সাধারণ পাঠক। অন্যূন ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুতীরের (যে সিন্ধু ভারতের লোকদের 'হিন্দু' নাম ও ভারতবর্ষকে 'হিন্দুস্থান' নাম দিয়াছে) লোকেরা কিরূপ ঘরবাড়ীতে ও শহরে বাস করিত, তাহাদের ঘরের মেঝে, দরজা, জানালা, সিঁড়ি, কূপ, স্নানাগার, শৌচাগার, নর্দ্দামা, ইষ্টক, খাদ্যদ্রব্য, কিরূপ ছিল তাহার বিবরণ আমরা উপস্থিত গ্রন্থে পাই। ইহাদের অনুসৃত ক্রীড়া-কৌতুক, শিল্পকলা, ব্যবহৃত বাসন-কোশন ইত্যাদিরও বিবরণ ইহাতে আছে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ধর্ম্ম ও মৃতদেহের সংকার সম্বন্ধেও এই গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু জানিতে পারি। এবং পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতের সভ্যতার সম্বন্ধে এবংবিধ জ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় সভ্যতা কত প্রাচীন ও ব্যাপক। ভারতবর্ষের ও ভারতীয় সভ্যতার নামে গৌরব বোধ করে, এরূপ ব্যক্তি মাত্রেরই উপস্থিত গ্রন্থখানি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

১২ খানি আর্ট পেপারে মুদ্রিত হাফটোন ছবিতে ও মানচিত্রে গ্রন্থে আলোচিত বিষয় সমূহ অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ উত্তম। —ম. ঘ.

প্রাগৈতিহাসিক—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবলক্রাউন ১৬ পেজী, ২১৪ পৃষ্ঠা। মোটা এণ্টিক কাগজে ছাপা। বাঁধাই মনোরম। প্রচ্ছদ সুকল্পিত। মূল্য—দেড় টাকা।

গল্পের বই। প্রাগৈতিহাসিক, চোর, মাটির সাকী, যাত্রা, প্রকৃতি, ফাঁসি, ভূমিকম্প, অন্ধ, চাকরী এবং মাথার রহস্য—এই দশটি গল্প। চাকরী ও মাথার রহস্য বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। অপর কয়টি গল্পও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সবগুলিই পড়া গল্প। কিন্তু পুনরায় নূতন করিয়া পড়িতে গিয়া মনে হইল, একটিও পূর্ব্বে পড়ি নাই। যেমন প্রতিদিন একই গাছে ফুল ফুটিতে দেখিলেও—ইহার বৈচিত্র্য প্রতিদিনই নূতন, ঠিক তেমনই। সত্যকার আর্ট-বস্তুর এই প্রকৃষ্ট প্রকাশ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে আছে। অনেক পাখী যেমন কথা কহিলেই লোকে ভাবে গান গাহিতেছে—অথচ পাখীর তাহার উপর হাত নাই, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পও ঠিক তেমনই। ইহাকেই কি স্বভাব-প্রতিভা বলে?

আধুনিক সাহিত্য—শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী, ৭৮ পৃষ্ঠা। সন্তোষ লাইব্রেরী, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্যের উল্লেখ নাই।

বিচার ও বিবেচনা করিবার বয়সে উপনীত হইলে লেখক নিজেই বুঝিবেন। এই বই না ছাপিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। তাই বলিয়া লেখার ভঙ্গী মন্দ নহে এবং মূলতঃ অপরিণত হইলেও লেখক স্থানে স্থানে এমন কথা কহিয়াছেন, যাহা ভাবিয়া দেখিবার মত।

ভোম্বল সর্দ্দার—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা। ছবিতে ও বাঁধাইয়ের মনোহারিত্বে চিত্তহারী।

ছেলেদের গল্পের বই। এমন করিয়া বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে, আশা ও আতঙ্কের মধ্যে খগেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহ লইয়া যাইতে পারেন না। পড়িতে পড়িতে মনে হয় বয়স কমিয়া গিয়াছে এবং বিনা টিকিটে রেলে চড়িয়া ভোম্বলের মত কোথাও পালাইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

সহজগীতা—শ্রীকেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-টি। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী, তিনশতাধিক পৃষ্ঠা। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত। বৈঁচি (হুগলী)। মূল্য দুই টাকা।

গল্প বলিবার ছলে গীতাকে ভিত্তি করিয়া বহু-অভিজ্ঞ ব্যক্তির জীবন-দর্শন। অত্যন্ত কঠিন কথাও কি করিয়া সহজে রসায়িত হইয়া উঠিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরিচয় পাওয়া যায় এ-দেশের সংস্কৃতির সেই অপূর্ব্ব ঠাসবুনানিকর, যাহার সহিত আধুনিক-যুগের বিস্মৃতি ঘটাইবার চেষ্টা ক্রমাগত হইতেছে।

বৃহত্তর ভারতের পূজা-পার্ব্বণ—সদানন্দ। বেঙ্গল পাবলিশিং হোম, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী, ৬০ পৃষ্ঠা। অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য মূর্ত্তি, শিলালিপি ও মুদ্রার প্রতিকৃতির সহিত সুন্দর ভাবে মুদ্রিত।

কি আশ্চর্য্য দেশে কি পরমাশ্চর্য্য চর্য্যার উত্তরাধিকার লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং দৈনন্দিন জীবনযাপনে কি আশ্চর্য্য ভাবেই না সেই কথা ভুলিয়া থাকি, বইখানি পড়িতে পড়িতে সেই কথাই কেবল মনে হয়। গ্রন্থকার পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। নিবেদনে লিখিয়াছেন—"বৃহত্তর ভারতের পূজায় ব্যবহৃত মন্ত্রাদি যাহা সেই স্থানের 'পাদ্রি' বা ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মুখে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা অধিকাংশ স্থলেই সহজবোধ্য না হওয়ায় বৃহত্তর ভারতের মন্ত্র-সম্বন্ধীয় লেখাটির জন্য Tyra De Kleenএর জার্ম্মান ভাষায় লিখিত Mudras Auf Bali নামক পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।"

জগতের বন্ধু বা জগতের ইমাম্ (প্রথমখণ্ড)—প্রকাশিকা, শ্রীঊর্ম্মিলা সাহা চৌধুরাণী। মূল্য ষোল আনা।

গ্রন্থের লেখক (নিবেদনে লিখিত হইয়াছে) 'করুণাময়ের কৃপায় ৩।৫ বৎসর যাবৎ অনবরত অনন্ত আকাশে বংশীধ্বনি বা শিঙ্গাধ্বনির ন্যায় এক উচ্চ সুমধুর সুরধ্বনি শুনিয়া আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন।" সপ্তম অধ্যায়ে মহাভারতের অর্থব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—"মহাভারতে প্রথমতঃ মানবের অপর প্রধান কৃষিজাত খাদ্যস্বরূপ পঞ্চপ্রকার ডালকে দ্রৌপদী রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ অড়হর যুধিষ্ঠির, ছোলা ভীম বা বৃকোদর,

মুগ অর্জ্জুন, মটর নকুল ও খেসারী সহদেব-শক্তি সদৃশ এবং মসুর কর্ণ, কলাই দাসীপুত্র বিদুরশক্তি রূপকে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে।" ইত্যাদি।

Eight Portraits—ভারত ফোটোটাইপ, ৭২-১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, মদনমোহন মালবিয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, এই কয়েকজনের প্রতিকৃতি সহ সংক্ষিপ্ত জীবনী। প্রতিকৃতিগুলির আর্টেষ্টনী-পরিকল্পনা এবং তাহার মুদ্রণ-পারিপাট্যকে নিখুঁৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভারত ও মধ্য এশিয়া—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। ভারতী ভবন, ২৪।৫।এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

বঙ্গশ্রীতে এই প্রবন্ধের যে অংশ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান পুস্তকে পরিশিষ্ট হিসাবে "মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার অনুসন্ধান" শীর্ষক এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনার ধারা এবং একটি "গ্রন্থসূচী" সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু গবেষণা হইয়াছে, তাহার মোটামুটি পরিচয় ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। যাঁহারা এই বিষয়ে কাজ করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট এই বই তো অপরিহার্য্যই, উপরন্তু ইহার রচনাভঙ্গী এমনই যে, সাধারণ ভাবে শিক্ষিত পাঠকের নিকটও ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অধ্যায়কে এই পুস্তক ঔৎসুক্যের বস্তু করিয়া তুলে। গ্রন্থকারের লিখিত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'ভারত ও ইন্দোচীন' পর্য্যায়ের এই দ্বিতীয় পুস্তক। আমরা তৃতীয় পুস্তকের অপেক্ষায় থাকিলাম।

ছায়াচ্ছন্ন ধরণী—ওয়েন ফ্রান্সিস্ ডাড্‌লী। ডবল ক্রাউন ষোলপেজী ১৮০ পৃষ্ঠা। ছাপা বাঁধাই ভাল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

সুলিখিত একটি বিদেশী উপন্যাসের সুন্দর অনুবাদ। আখ্যানভাগ বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, "মানুষ যে জীবনে কি ভাবে সুখী হইতে পারে, ইহা একটি সমস্যা, এই সমস্যারই সমাধান লেখক এই গ্রন্থে করিয়াছেন। লেখক দেখাইয়াছেন, সুখ নাস্তিকতায় নাই, আছে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে।"

শতদল—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার। প্রাপ্তিস্থান প্রবাসী কার্য্যালয়, ১২০।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। ডবলক্রাউন ষোলপেজী, ১২৮ পৃষ্ঠা। সুন্দর এণ্টিক কাগজে মুদ্রিত। গ্রন্থকার অঙ্কিত প্রচ্ছদ।

কবিতার বই। শতাধিক সুলিখিত কবিতা-সমষ্টি। ইতিপূর্ব্বে কবি "যাত্রী" পুস্তকে যে সকল কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার অতি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে এই 'শতদল' পড়িয়া আমরা খুসী হইয়াছি। কবিতাগুলির মধ্যে পরিণত মাধুর্য্যের সংযম ও শান্তি আছে এবং আছে বিষণ্ণ আনন্দ। "ওগো সুন্দর, ওগো মনোহর"কে তিনি সন্ধ্যার রূপেও দেখিয়াছেন (১০৭ নম্বর), এবং "মধুর প্রভাত কিরণে"ও দেখিয়াছেন (৭০), কিন্তু দুয়েরই মধ্যে তাঁহার আনন্দ ও বিষাদ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

উদ্ভট শ্লোকমালা—কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন, উদ্ভট সাগর, বি-এ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩৬৮ পৃষ্ঠা। মূল্য আড়াই টাকা।

কালিদাস, বররুচি, ভবভূতি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, রুদ্রট, হলায়ুধ, আর্ভক, কবিভট্ট, কবিচন্দ্র, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, অবিনাশ সরস্বতী, নায়ক গোপাল প্রভৃতি পুরুষ-কবি এবং নিবিড় নিতম্বা, বিকট-নিতম্বা, বিজ্জকা, মারুলা, শীলা ভট্টারিকা প্রভৃতি স্ত্রী-কবিগণের কবিতাবলী। 'উদ্ভট' কবিতার অর্থ কি, তাহা গ্রন্থকার ভূমিকায় আলোচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে চারিটি মতের উল্লেখও করিয়াছেন। তাহার যে কোন একটি মত হয় তো অপর মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যে সকল উদ্ভট কবিতা এই গ্রন্থে গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার কোন্ অংশের কোন্ কবিতাটি কোন্‌টি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা সুকঠিন। 'গণিত-কবিতা' লইয়া যে মুহূর্ত্তে পাঠক মত্ত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে পৃষ্ঠা উল্টাইয়া 'চিত্র-কবিতা' দেখিলে মনে হইবে, তাহা হইলে 'গণিত-কবিতা' থাকুক,—এইটিই দেখা যাক—তাহার পর ১, ২, ৩ করিয়া নবরত্ন—সমস্তই মনোহারী। সংগ্রাহক-অনুবাদকের পাণ্ডিত্যে ও রসজ্ঞানে মুগ্ধ হইতে হয়। তাঁহার 'উদ্ভটসাগর' উপাধির সার্থকতা উপলব্ধি হয়।

খেলাঘরণ—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীদুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩।১ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ছয় আনা।

গ্রন্থকার একাধারে লেখক ও চিত্রকর, এই দুয়েরই সম্যক্ পরিচয় বইখানিতে আছে। তাঁহার রচনায় চিত্রের গুণ ও চিত্রে রচনার গুণ পরস্পর পরস্পরকে অধিকতর মূল্যবান্ করিয়াছে। শিশু-সাহিত্যে লেখকের খ্যাতি আছে এবং সে খ্যাতির ভিত্তি যে দুর্ব্বল নহে, তাহা এই পুস্তক-পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

মুদ্রাকর প্রমাদ :—গত সংখ্যায় পল্লীভারত নামে যে-লিনোকাট চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল, উহা শ্রীহেরম্ব গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত।

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত]

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের জাগরণ

শিক্ষা ও সভ্যতার যে আধুনিকতা সম্বন্ধে এই সন্দর্ভে আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহা গত আড়াই হাজার বৎসরব্যাপী। আজকালকার পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা "ক্লাসিক্যাল" ও "মডার্ণ" এই দুইটি শব্দ ব্যবহারে সর্ব্বদা অভ্যস্ত, তাঁহাদের মতে "মডার্ণ এজ্" যে কত বৎসরব্যাপী, তাহার কোন সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কালের বিভাগ তাঁহারা যে চশমায় দেখিয়া থাকেন, সেই চশমার দ্বারা আমাদের কথা সঠিক ভাবে বুঝা যাইবে না। আমরা যাঁহাদের সেবক, তাঁহাদের মতানুসারে প্রতি বার হাজার বৎসরে এক একটি যুগ-সমন্বয়ের সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে।

এই বার হাজার বৎসরের প্রথম দুই হাজার বৎসর মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া নির্ভুল ভাবে বিদ্যমান থাকে এবং মানুষ সর্ব্বতোভাবে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারে।

পরবর্ত্তী আড়াই হাজার বৎসর মানুষের কর্ম্মশক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় ঔদাসীন্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মানুষের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তখনও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই হাজার বৎসরের সংগঠনের ফলে উহা সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয় না এবং সর্ব্বত্রই মানুষ অধিকাংশ পরিমাণে সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত সাড়ে চার হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী পাঁচ হাজার বৎসরে মানুষের আলস্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তখন মানুষের প্রকৃত জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়া থাকে। এই সময়ে মনুষ্য-সমাজে প্রায় সর্ব্বত্রই শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য দেখা দেয় এবং স্থানে স্থানে আর্থিক অভাবের উৎপত্তি ঘটিতে আরম্ভ করে।

শেষবর্ত্তী আড়াই হাজার বৎসরে, মনুষ্যসমাজে শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য এবং আর্থিক অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং মানুষ দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে মানুষের আলস্য ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে বটে এবং কাল-শক্তি বশতঃ মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু মানুষ প্রায়শঃ অভিমানগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই অভিমানের ফলে মানুষের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং এই কালে মানুষ সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অভাববশতঃ জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এই কালের শেষভাগে সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যের চরম দুর্গতি বশতঃ মানুষের অভিমানরূপ মোহান্ধতা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখন আবার মানুষ তাহার প্রথম কালের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয়।

বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা, হোরাশাস্ত্র, পঞ্চসিদ্ধান্তিকা যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত কাল-বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত ব্যবধান যে প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন

কালও যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রূপ অবলম্বন করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কতকগুলি মন্ত্রে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হয় এবং তখন উপরোক্ত কালবিভাগ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

ভারতীয় ঋষিগণের কাল-বিভাগসম্বন্ধীয় উপদেশগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে আমরা শেষবর্ত্তী আড়াই হাজার বৎসরের শেষভাগে উপনীত হইয়াছি।

ইহারই জন্ম গত আড়াই হাজার বৎসরকে আমরা "আধুনিক কাল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতীয় ঋষিগণের উপদেশানুসারে এই আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ হাজার বৎসরকে "মধ্যবর্ত্তী কাল" এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাড়ে চার হাজার বৎসরকে "প্রাচীন কাল" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী কালের শিক্ষা ও সভ্যতা যে স্তরে বিদ্যমান ছিল, তাহার তুলনায় উহা বর্ত্তমান কালে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং শিক্ষিত ও সভ্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সংক্ষেপতঃ, ইহাঁদের মতে শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ আবার উত্তরোত্তর শিক্ষার বিস্তৃতিও ঘটিতেছে।

আমরা এই সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করিয়া থাকি, তাহার অনেকাংশই উপরোক্ত মতবাদের বিপরীত।

আমরা যে পাঁচ হাজার বৎসরকে মধ্যবর্ত্তী কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান কালে মনুষ্যসমাজে শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা ও সভ্যতা বলা যাইতে পারে, তাহা একমাত্র উপরোক্ত প্রাচীন কালেই সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং এমন কি উহা উপরোক্ত মধ্যবর্ত্তী কালেও যাদৃশ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাদৃশ পরিমাণে এখন আর বিদ্যমান নাই। অধুনা মানুষ যাহাকে শিক্ষা বলিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে কু-শিক্ষা এবং যাহাকে সভ্যতা বলিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে কপটতা ও ও কলহ-প্রিয়তায় পরিণত হইয়াছে।

"ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে", এই সনাতন বাক্য স্মরণ করিলেই আমাদের মতবাদ যে ভ্রমহীন এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের মতবাদ যে ভ্রম-পরিপূর্ণ, তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে অথবা উচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সাক্ষ্য মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য ও অভাবে, শারীরিক স্বাস্থ্যে ও অস্বাস্থ্যে, মানসিক শান্তিতে ও অশান্তিতে।

আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যে মানুষ মোহান্ধতা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষিত হইবার এবং কলহপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ, কোন কালে যদি দেখা যায় যে, এই কালে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের তুলনায় একদিকে যেরূপ আর্থিক অপ্রাচুর্য্য, শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, সেইরূপ আবার মোহান্ধতা এবং কলহ-প্রিয়তাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে শিক্ষা ও সভ্যতা যে বাস্তবিক পক্ষে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতে হইবে না?

সোনার পাথরের বাটী অথবা চতুষ্কোণ-যুক্ত গোলকের কথা (angular circle) লোকসমাজে যেরূপ উপহাসযোগ্য, সেইরূপ সুশিক্ষা ও সভ্যতার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, এতাদৃশ কথাও উপহাস-যোগ্য।

কোন বাটী স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহাকে যেরূপ পাথরের বাটী বলা চলে না, কোন তৈজস চতুষ্কোণযুক্ত হইলে তাহা যেরূপ গোলাকার হইতে পারে না, সেইরূপ সুশিক্ষা ও প্রকৃত সভ্যতা বিদ্যমান থাকিলে, মানুষের আর্থিক অভাব অথবা শারীরিক অস্বাস্থ্য অথবা মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

"ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে", এই সনাতন বাক্যানুসারে মনুষ্য-সমাজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা যে ক্রমশঃই নিকৃষ্টতা লাভ করিতেছে, তাহা যেরূপ মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ আবার শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, মানুষ কেন শিক্ষা ও সভ্যতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াসী হইয়া থাকে, তাহা স্থির করিয়া, জগতের কোন্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (এমন কি বোলপুরের বিশ্ববিমোহন কার্য্যালয় ও বারাণসীর হিন্দুত্ব অথবা ভারতীয়ত্ব-বিনাশন যন্ত্রালয় পর্য্যন্ত) কি প্রণালীতে কোন্ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং League of Nations, Brotherhood ও Manhood and Drinking Societies, Science, Engineering ও Philosophical, Economical and Youths Association প্রভৃতি সভ্যতার আখড়াগুলিতে কোন্ শ্রেণীর সভ্যতার আখড়াই দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কার্য্যই মানুষের মনুষ্যত্বাপহারক এবং সভ্যতার প্রায় প্রত্যেক আখড়াটি প্রায়শঃ যৌন অসভ্যতা, চরিত্রহীনতা, কলহপ্রিয়তা, অভিমানগ্রস্ততা ও দ্বেষ-হিংসার দ্যোতকতার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা সপ্রমাণিত করিতে প্রস্তত আছি।

প্রধানতঃ, উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা ও সভ্যতার আখড়াসমূহের সভ্যগিরি লইয়া আধুনিক বিশেষজ্ঞগণের বিশেষজ্ঞতা এবং নামের পশ্চাতে অথবা অগ্রে যে উপনামসমূহ ব্যবহৃত হয়, তাহার মাত্রা লইয়াই ঐ বিশেষজ্ঞতার মাত্রা নির্ণীত হইয়া থাকে। কাযেই প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়টি যে প্রায়শঃ কু-বিদ্যার উৎস হইতে অ-বিদ্যার লীলাভূমিতে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং প্রত্যেক সভ্যতার আখড়াটি যে প্রায়শঃ কলহ-প্রিয়তার আকর হইতে অসভ্যতার বিচারণ-ভূমিরূপে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে, তাহা ঐ বিশেষজ্ঞ-গণের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নহে, কারণ যাহা লইয়া তাঁহাদের জারিজুরী, তাহার এতাদৃশ অসারত্ব প্রতিপন্ন হইলে তাঁহাদের পক্ষে সমাজের নিকট হইতে বিশেষজ্ঞতার সম্মান দাবী করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অথচ ইঁহারাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা।

শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে মানুষের যেরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ভারতের জাগরণ সম্বন্ধেও আমরা ঠিক একই রকমের গোলকধাঁধায় নিপতিত হইয়া পড়িয়াছি।

কুশিক্ষা ও অসভ্যতা যেরূপ আধুনিক মনুষ্য সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে প্রচলন লাভ করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে, ভারতবাসীর রাজ-নৈতিক গুরুগণের মোহান্ধতাও ঠিক একই ভাবে জাগরণ নামে আখ্যাত হইয়া সন্ন্যাসী-সদৃশ ভারতবাসী কৃষক ও জনসাধারণের অবস্থা ক্রমশঃই দীন হইতে দীনতর করিয়া তুলিতে পারিতেছে।

সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, ভারতবাসি-গণের মধ্যে গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে একটা রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ বিপরীত মতবাদ পোষণ করিয়া থাকি, ভারতের জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের মতবাদও প্রায় একই রকমের বিপরীত।

মানুষ যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, তখন তাহার সদাৎ সম্বন্ধে চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসে, ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিমূলক কার্য্যে প্রযত্নশীল হয় এবং তাহার কোন কার্য্য সফল আর কোন কার্য্য বা বিফল হইয়া থাকে। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে একদিকে যেরূপ ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি সম্বন্ধে মানুষ সর্ব্বতোভাবে চিন্তাহীন ও কর্ম্মহীন থাকিতে পারে না, অন্যদিকে আবার তাহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি না হইয়া ক্রমাগত উহার বৃদ্ধি হওয়া অথবা তাহার কার্য্যে ত্রিবিধ অভাবের (অর্থ, স্বাস্থ্য ও শান্তির) অন্ততঃ পক্ষে সাময়িক ভাবেও কথঞ্চিৎ উপশম না হইয়া সর্ব্বদাই উহার বিবর্দ্ধমানতা বিদ্যমান থাকা সম্ভব হয় না।

ব্যক্তিগত নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে যেরূপ সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্তিগত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিমূলক কার্য্যের চিন্তা ও প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়া থাকে এবং কোন কোন চেষ্টা সফল এবং কোন কোন চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন দেশে জাতীয় জাগরণের সূচনা হইলেও

সর্ব্বপ্রথমে ঐ দেশের জনসাধারণের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি-মূলক কার্য্যের চিন্তা ও প্রচেষ্টা আরম্ভ হওয়া এবং কোন না কোন চেষ্টায় অন্ততঃপক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাফল্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। জাতীয় জাগরণের উপরোক্ত সূত্র মানিয়া লইলে, কোন দেশের যখন জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়, তখন যে ঐ দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে কেবলমাত্র বৃদ্ধিই পাইতে পারে না—পরন্তু কখন কখন বা ত্রিবিধ অভাবের হ্রাস এবং কখন কখন বা তাহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষ কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ভারতবাসিগণের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসা-প্রপীড়িত লোকের সংখ্যা ক্রমিক বৃদ্ধি পাইতেছে, অথবা কখনও বৃদ্ধি এবং কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, শুধু গত পঞ্চাশ বৎসর কেন, আরও কতিপয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী জনসাধারণের ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে এবং তাহা কখনও উল্লেখ-যোগ্য ভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। এতাদৃশ অবস্থা লক্ষ্য করিলে ভারতবর্ষে যে কোন প্রকৃত জাগরণ উপস্থিত হয় নাই, তাহা যুক্তিযুক্ত ভাবে স্বীকার করিতে হয় না কি?

ভারতীয় কংগ্রেসের যে আন্দোলন দেখিয়া ভারতে প্রকৃত জাগরণ আসিয়াছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে আন্দোলন পূর্ব্বাপর বিশদ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ প্রায়শঃ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলেও উহাঁরা ভাবতঃ পাশ্চাত্ত্য-দেশীয়। ঐ সঙ্করভাবাপন্ন মানুষগুলির আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্ত্যানুকরণ-প্রসূত। তাহাতে কোন রকমের ঐকান্তিকতা অথবা মূক জনসাধারণের ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির কোন রকম প্রযত্নের বিন্দুমাত্র সাক্ষ্যও পরি-লক্ষিত হইবে না।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, নেতৃত্বাসনে সমাবিষ্ট এতাদৃশ ভাবসঙ্কর মানুষগুলির প্ররোচনায় সহস্র সহস্র নিরীহ যুবক নিজদিগের বলিদান-কার্য্য সমাধান করিয়াছে এবং সহস্র অনাথিনী মাতা ও ভার্য্যাকে মর্ম্মন্তুদভাবে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়াছে। এই নিরীহ যুবকগণের আত্মাহুতি দেখিলে বিস্ময়ের সহিত সত্যই বুঝি জাগরণ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে হয় বটে, কিন্তু নেতৃত্বাসনে কতকগুলি অন্ধ অনুকরণ-প্রিয় মনুষ্যত্বহীন যাত্রার দলের রাজার মত ভাবসঙ্কর মানুষ সমাবিষ্ট থাকায় দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে, পরন্তু ক্ষুৎ-পিপাসা-প্রপীড়নের মাত্রা ও তৎপ্রপীড়িতের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণে অনেকে হয়ত আশার আলোকে উৎফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে তাঁহারা যে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়া পড়িবেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণে যদি জনসাধারণের কোন সুফল লাভ করিবার আশা থাকিত, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে রাজবন্দিগণের সংখ্যা দেশের সমগ্র লোক-সংখ্যার শতকরা একজনের সাত সহস্র অংশের (১/৭০০০) অপেক্ষাও কম এবং রাজবন্দিগণ সম্বন্ধে যাদৃশ আলোচনায় দেশের মধ্যে দলাদলির বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেই রাজ-বন্দিগণের তাদৃশ আলোচনায় দেশের যুবক-যুবতীগণকে এতাদৃশভাবে মাতাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দেখা যাইত না।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণে জনসাধারণের দুঃখ-লাঘবের যদি বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে যিনি নিজেকে দেশের শতকরা ৭০ জনের প্রতিনিধি বলিয়া জাহির করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না, সেই গান্ধীজী ঐ মন্ত্রিত্বগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ-কারের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সেক্রেটারী প্রভৃতি লইয়া সমারোহের সহিত দিল্লী যাত্রা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

জন-সাধারণের ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা দূর করিতে হইলে যে-শ্রেণীর মস্তিষ্কের ও ভারতীয়তার প্রয়োজন, সেই শ্রেণীর মস্তিষ্ক ও ভারতীয়তা যে গান্ধীজী প্রভৃতি কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও নাই, তাহা ইহাঁদের যে-কোন বক্তৃতা অথবা বাণী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আমাদের কথা যে সত্য, তাহা এখনও মানুষ প্রায়শঃ

বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে ঐ সত্যতা আপনা হইতেই পরিস্ফুট হইবে।

আমরা এখনও আমাদিগের যুবক ও যুবতীগণকে এই ব্রিফ্‌লেস আইনব্যবসায়ী-বহুল ভাবসঙ্কর নেতাগুলির প্ররোচনা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। নতুবা ইহাঁদের অদূরদর্শিতার ফলে অদূরভবিষ্যতে দেশের মধ্যে দলাদলির যে হুতাশন প্রজ্বলিত হইবে, তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করা অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে। এই বচনবাগীশ কাপুরুষগণ প্রায়শঃ পরভাগ্যোপজীবী এবং যে সক্ষমতায় নিজেদের অক্ষমতা বুঝা সম্ভব, ইহাঁরা প্রায়শঃ সেই সক্ষমতা-বিবর্জ্জিত। ইহাঁরা প্রতিনিয়ত হয় কন্‌ষ্টিটিউশন নতুবা অপর কাহারও স্কন্ধে দোষ চাপাইতে থাকিবেন।

যে মুহূর্ত্তে আমাদের যুবক-যুবতীগণ এই পরভাগ্যোপজীবী বাক্যবাগীশগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া আত্মপ্রতারণা হইতে বিরত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তে যাঁহাদের নেতৃত্বে দেশের প্রকৃত জাগরণ সম্ভবযোগ্য হইবে, তাঁহা-দিগকে নেতারূপে পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

দেশের জনসাধারণ যে দুরবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই দুরবস্থা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় কংগ্রেসে যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী ও ভারতপ্রবাসী, এমন কি ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ পর্য্যন্ত যোগদান করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা অযথা কাহারও প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা আর কতকাল ঘুমাইয়া রহিব ?

বাঙ্গালা সরকারের ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট

গত ২৯শে জুলাই অপরাহ্ণে বাঙ্গালা সরকারের অর্থ-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার অ্যাসেম্ব্লির সভ্য-গণের নিকট ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেট উপস্থাপিত করিয়াছেন।

অর্থ-সচিবের উপরোক্ত বাজেটসম্বন্ধীয় বক্তব্য (Budget Speech) প্রধানতঃ তিন অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

ভারত-শাসনসম্বন্ধীয় ১৯৩৫ সালের অ্যাক্ট অনুসারে ভারতবাসিগণকে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার (provincial autonomy) এবং সরকারী কোষাগারের উপর পূর্ণাধিকার (fiscal autonomy) দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় কথা-বার্ত্তা মাননীয় অর্থ-সচিবের বক্তৃতার প্রথমাংশ।

উহার দ্বিতীয়াংশে, ১৯৩৬-৩৭ সালে বঙ্গীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল এবং প্রকৃত পক্ষে উহা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, ১৯৩৭-৩৮ সালেই বা ঐ আয়-ব্যয়ের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে বলিয়া মনে করা যাইতেছে, তাহা দেখান হইয়াছে।

বঙ্গীয় অর্থ-সচিবের মতে বর্ত্তমানে বাঙ্গালার প্রধান প্রধান সমস্যা কি কি এবং কোন্ সমস্যা সমাধানের জন্য বঙ্গীয় সরকার কোন্ কোন্ কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন, তৎসম্বন্ধে বিবৃতি এই বক্তৃতার তৃতীয়াংশে প্রদান করা হইয়াছে।

সমগ্র বক্তৃতাটিতে কি কি বলা হইয়াছে, উহাতে যে সমস্ত উপায়ে সরকারের কোষাগার পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে অথবা যে সমস্ত কার্য্যে সরকারের অর্থ ব্যয় করা হইবে বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে, তাহা প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান সমস্যা-সমাধানকল্পে বঙ্গীয় অর্থ-সচিব যে-সমস্ত পরিকল্পনার আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রজাহিতকর কার্য্য-বিষয়ের অর্থ ব্যবহারে তাঁহার যথাযথ অভিজ্ঞতার অথবা মূর্খতার পরিচায়ক, অথবা এক কথায় এবারকার বঙ্গীয় সরকারের বাজেট এবং উহার প্রণেতা বর্ত্তমান অর্থ-সচিব জন-সাধারণের প্রশংসার

যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য, তাহার বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ কোন দায়িত্বপূর্ণ রাজপুরুষের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিবার পন্থা কি কি এবং দ্বিতীয়তঃ জনসাধারণের পক্ষে বাজেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায় তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

রাজপুরুষগণের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিবার যুক্তিসঙ্গত পন্থা

কোন রাজপুরুষের কোন কার্য্য প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য, তৎসম্বন্ধে বিচার কবিতে হইলে স্মরণ বাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের অধীন কোন রাজপুরুষের কোন কার্য্যই সর্ব্বতোভাবে তাঁহার স্বেচ্ছায় পরিকল্পিত অথবা পরিচালিত হইতে পারে না এবং উঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যটি কোন না কোন বিধি (procedure) অনুসারে সম্পাদিত করিতে উঁহারা বাধ্য হইয়া থাকেন। অতএব যদি দেখা যায় যে, কোন রাজপুরুষের কোন কার্য্য সর্ব্বতোভাবে ঐ কার্য্যের মূল উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয় নাই, বরং উহার পরিপন্থী হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ কার্য্যটিকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা নিন্দা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ রাজপুরুষ সর্ব্বাবস্থায় নিন্দার যোগ্য নাও হইতে পারেন। এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, সরকারের কোন নিন্দনীয় কার্য্যের জন্য তৎপ্রণেতা কোন রাজপুরুষের স্কন্ধে সর্ব্বাবস্থায় তজ্জন্য প্রশংসা অথবা নিন্দার ভার যুক্তিসঙ্গতভাবে অর্পণ করা যায় না।

কোন রাজপুরুষ কোন কার্য্য-বিষয়ে জনসাধারণের প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য, তাহা স্থির করিবার উপায় প্রধানতঃ তিনটি। একটি তুলনামূলক, দ্বিতীয়টি প্রযত্নমূলক এবং তৃতীয়টি উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিমাণমূলক।

প্রথমতঃ যদি দেখা যায় যে, কোন রাজপুরুষ কোন বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের তুলনায় অধিকতর অভিজ্ঞতা এবং কার্য্যতৎপরতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার ঐ কার্য্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যসাধক না হইলেও উহা যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের তুলনায় প্রশংসার যোগ্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

কাষেই কোন রাজপুরুষ কোন কার্য্য-বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য, তাহা স্থির করিবার প্রথম উপায়, তাঁহার ঐ কার্য্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ঐ কার্য্যের সহিত তুলনা করা।

দ্বিতীয়তঃ যদি দেখা যায় যে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য কোন কার্য্যে কোন রাজপুরুষ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মত ঐ কার্য্য-বিষয়ে অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই বটে এবং ঐ কার্য্য যাহাতে জনসাধারণের অভীষ্টসাধক হইতে পারে, তাঁহার পরিকল্পনাও তিনি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই বটে, কিন্তু ঐ কার্য্য যাহাতে জনসাধারণের অভীষ্ট-সাধক হয়, তাহার পরিকল্পনার জন্য ঐ রাজপুরুষ যথাসাধ্য প্রযত্নশীল হইয়াছেন, তাহা হইলেও ঐ রাজপুরুষ যে প্রশংসার যোগ্য, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতে হয়।

কাষেই কোন রাজপুরুষ কোন কার্য্য-বিষয়ে জনসাধারণের প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য, তাহা স্থির করিবার দ্বিতীয় উপায়, ঐ কার্য্য যাহাতে জনসাধারণের অভীষ্ট সাধক হয়, তজ্জন্য ঐ রাজপুরুষ যথাযোগ্য পরিশ্রম করিয়াছেন কি না, তাহার বিচার করা।

তৃতীয়তঃ, কোন কার্য্যের পর্য্যালোচনায় কোন অভিজ্ঞতার অথবা পরিশ্রমশীলতার পরিচয় থাক আর না-ই থাক, যদি দেখা যায় যে, ঐ কার্য্য যে ভাবে সম্পাদন করিবার পরিকল্পনা গঠিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বের তুলনায় উহার দ্বারা জনসাধারণের অধিকতর হিত সাধিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তাহা হইলে উহার প্রণেতা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

কোন রাজপুরুষের কোন কার্য্য প্রশংসা অথবা নিন্দার যোগ্য, তাহা স্থির করিবার তৃতীয় পন্থানুসারে ঐ কার্য্য জনসাধারণের ইষ্টসাধক হইবে কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হয়।

রাজপুরুষগণের কার্য্যবলী সমালোচনা করিবার সাধারণ পন্থা প্রধানতঃ তিনটি বটে, কিন্তু যদি কোন কার্য্যে কোন রাজপুরুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, অথবা ঐ কার্য্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে প্রদান করা হউক

আর নাই হউক, তিনি যদি জাহির করেন যে, উহার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার সর্ব্বোতোভাবে তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে, তাহা হইলে উহা যে ভাবে সম্পাদিত করিবার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসা অথবা নিন্দার যোগ্য, ইহা স্থির করিতে হইলে কেবলমাত্র উহার দ্বারা সম্ভাবিত পরিমাণে জনসাধারণের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে কি না, তাহার পরীক্ষা করিলেই চলিতে পারে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সরকারী বাজেটের প্রয়োজনীয়তা

জনসাধারণের পক্ষে সরকারী বাজেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তৎসম্বন্ধে কোন বিশদ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, জগতে কতদিন হইতে বাজেট রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাচীন জগতে কেন বাজেটের প্রয়োজন হইত না আর আধুনিক জগতেই বা উহার প্রয়োজন হয় কেন, বাজেটের অবশ্য আলোচ্য কি কি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। যে বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, সরকারী বাজেটের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা এই সন্দর্ভে সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হওয়া সম্ভব নহে।

এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জ্জন করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারী বাজেটে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করা হইয়া থাকে :—

(১) পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের আয়ের ও ব্যয়ের পরিমাণ কত হইবে বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষেই বা উহা কত দাঁড়াইয়াছে।

(২) আলোচ্য বৎসরে কোন্ কোন্ বিভাগ হইতে কত পরিমাণ আয়ের সম্ভাবনা আছে এবং গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার কোন্ কোন্ কার্য্যে কত ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে।

(৩) সম্ভাবিত আয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক অথবা অল্প হইবার সম্ভাবনা।

(৪) প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় সম্ভাবিত আয় অল্প হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ে অতিরিক্ত কর ধার্য্যের দ্বারা ঐ ঘাটতি নিবারিত হইতে পারে।

(৫) প্রয়োজনীয় ব্যয়ের তুলনায় সম্ভাবিত আয়ের পরিমাণ অধিক হইলে ঐ উদ্বৃত্ত আয়ের কি কি পরিমাণ কোন্ কোন্ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা যাইতে পারে।

জন-সাধারণের পক্ষে সরকারী বাজেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বাজেটে প্রধানতঃ কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়া থাকে, তাহা যেরূপ স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার গভর্ণমেণ্টের আয়, ব্যয় এবং আভ্যন্তরীণ আদান-প্রদানবিধির (internal exchange) মূলসূত্রে কি হওয়া উচিত, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

গভর্ণমেণ্টের আয় ও ব্যয়ের মূলসূত্র কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আধুনিক জগতের বিভিন্ন দেশে যে যে গ্রন্থকারগণ পাবলিক্ ফাইন্যান্স্ (Public Finance) সম্বন্ধে প্রভুত্বসম্পন্ন (authority) বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান করিয়া দেখা যাইবে যে, ঐ সম্বন্ধে বহুবিধ মতপার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে যতই মতপার্থক্য বিদ্যমান থাক না কেন, প্রজার হিতের জন্যই যে গভর্ণমেণ্ট (that Government is for the people), কেবল মাত্র এই সত্যটুকু মানিয়া লইলেই দেখা যাইবে যে, যাহাতে সাধারণের বিন্দুমাত্রও অনিষ্ট হইতে পারে, তাদৃশ কোন উপায়ে উপার্জ্জন করা যে গভর্ণমেণ্টের আয়ের মূলসূত্রে-বিরুদ্ধ হওয়া উচিত এবং যাহাতে গভর্ণমেণ্ট-পরিচালনার ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা কম (minimum) হয়, তাহা যে উহার ব্যয়ের মূলসূত্র হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে কোন মতপার্থক্য থাকিতে পারে না। প্রজার নিরবচ্ছিন্ন হিতের জন্যই যে গভর্ণমেণ্ট (that Government is for the people), এই সত্যটুকু মানিয়া লইলে গভর্ণমেণ্টের কোনরূপে উপার্জ্জনে যাহাতে প্রজার বিন্দুমাত্রও অনিষ্টপাত ঘটিতে না পারে এবং উহার ব্যয়ও যাহাতে প্রয়োজনাপেক্ষা কপর্দ্দকাতিরিক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে যেরূপ লক্ষ্য রাখিতে হয়, সেইরূপ আবার গভর্ণমেণ্টের যাহাতে কোন ক্রমেই অর্থাভাব ঘটিতে না পারে,

রাজ-কোষ যাহাতে কখনও শূন্য না হইয়া সর্ব্বদা অর্থে পরিপূর্ণ থাকে, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখিবার আবশ্যক হইয়া থাকে।

গভর্ণমেণ্টের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের উপরোক্ত মূল সূত্রটি স্মরণ রাখিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কার্য্যতঃ ঐ সূত্রটি সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতে হইলে আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা কতকগুলি বিধি ও নিষেধ মানিয়া চলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যাহাতে কোন প্রজার কোনরূপ অনিষ্টপাত ঘটিবার আশঙ্কার উৎপত্তি না হইতে পারে, এতাদৃশ ভাবে উপার্জ্জন করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে তাঁহার আয়ের কোন্ কোন্ পন্থা বর্জ্জন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত দুইটি নিষেধ-সূত্র একান্ত ভাবে পালনীয়। যথা:—

(১) যে সমস্ত কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের কোনরূপ উপার্জ্জন হয় না, পরন্তু কেবলমাত্র তাহাদের ব্যয়ই হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য হইতে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে কোনক্রমে উপার্জ্জন না করেন, তাহার ব্যবস্থা।

(২) যে সমস্ত কার্য্যের দ্বারা জনসাধারণের উপার্জ্জনের ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে জনসাধারণের কাহারও শারীরিক অথবা মানসিক অথবা আর্থিক কোনরূপ লোকসান ঘটিতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্যে যাহাতে জনসাধারণের কেহ প্রবৃত্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা এবং ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে যাহাতে গভর্ণমেণ্ট কোনক্রমে উপার্জ্জন না করেন, তাহার ব্যবস্থা।

যাহাতে কোন প্রজার কোনরূপ অনিষ্টপাত ঘটিবার আশঙ্কার উৎপত্তি না হইতে পারে, এতাদৃশ ভাবে উপার্জ্জন করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে তাঁহার আয়ের জন্য কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র দুইটি বিধি একান্তভাবে পালনীয়। যথা:—

(১) যে সমস্ত কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ লাভবান্ হইয়া থাকে, অর্থাৎ জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তদতিরিক্ত যে যে উপার্জ্জন করা সম্ভব হইয়া থাকে, সেই সেই কার্য্যের লভ্যাংশের উপর কর ধার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট যাহাতে তাঁহার আয়ের বন্দোবস্ত করেন, তাহার ব্যবস্থা।

(২) যে সমস্ত কার্য্যে কাহারও কোন রকমের অনিষ্ট না করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে জনসাধারণ লাভবান্ হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্য ও তাহাতে জনসাধারণের লভ্যাংশ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

প্রজার নিকট হইতে গৃহীত অর্থ যাহাতে এক কপর্দ্দকও প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয় না হয়, তাহা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কার্য্য বর্জ্জনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ উদ্দেশ্যে অন্ততঃ পক্ষে নিম্নলিখিত তিনটি নিষেধ-সূত্র একান্তভাবে পালনীয়:—

(১) যে শিক্ষায় একজন ছাত্রেরও কোন শ্রেণীর অভিমান, উচ্ছৃঙ্খলতার এবং জাতি-ধর্ম্ম-বিষয়ক সঙ্কীর্ণতার বিন্দুমাত্র পরিমাণেও উদ্ভব হইতে পারে সেই শিক্ষা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(২) যে সমস্ত কার্য্যে জনসাধারণের মধ্যে একজনেরও অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা অথবা নষ্টবুদ্ধির প্রবৃত্তি, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু বিন্দুমাত্র পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য যাহাতে দেশের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) যাহাতে জনসাধারণের একজনেরও আহার বিহার প্রভৃতি জীবনধারণের কোন কার্য্যে ব্যয় বিন্দুমাত্র পরিমাণেও বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা।

প্রজার নিকট হইতে গৃহীত অর্থ যাহাতে এক কপর্দ্দকও প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে ব্যয় না হয়, তাহা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কার্য্য অবলম্বনীয়, তাহার

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ উদ্দেশ্যে অন্ততঃ নিম্নলিখিত তিনটি বিধি একান্তভাবে পালনীয় :—

(১) যে শিক্ষায় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে এবং তাহার উন্নতি ও অবনতি হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া যুগপৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উন্নতি সাধন করা এবং অভিমান, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব সামর্থ্য যথাযথভাবে পরিমাণ করা ও সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা যাহাতে সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে, তাহার ব্যবস্থা করা।

(২) যে সমস্ত কার্য্যে জনসাধারণের প্রত্যেকের আর্থিক স্বচ্ছলতা, স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন এবং দীর্ঘজীবন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সেই সমস্ত কার্য্য যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) যাহাতে জনসাধারণের প্রত্যেকের আহার-বিহার প্রভৃতি জীবনধারণের প্রত্যেক কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প (minimum) ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

যাহাতে কোনরকমে গভর্ণমেন্টের অর্থাভাব না হয় এবং সর্ব্বদাই যাহাতে রাজ-কোষ পরিপূর্ণ থাকে, তজ্জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য বর্জ্জনীয় এবং কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি বিধি ও নিষেধ-সূত্র একান্তভাবে পালনীয় :-

(১) জনসাধারণের মধ্যে পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানে যাহাতে প্রায়শঃ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ ধাতু-নির্ম্মিত অথবা কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(২) সঞ্চয়ের জন্য জনসাধারণ যাহাতে ধাতু নির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবহার করিতে প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানে জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে কড়ি, তিল, যব প্রভৃতি স্বভাবজাত দ্রব্যের ব্যবহার হয় এবং ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার বিনিময়ে যাহাতে অনায়াসেই গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কড়ি, তিল ও যব প্রভৃতি পাওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৫) গভর্ণমেন্ট তাঁহার কর্ম্মচারিগণের বেতনাদি প্রদানকার্য্যে কেবল মাত্র তাম ও রৌপ্যনির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার করিয়া সমগ্র স্বর্ণমুদ্রা যাহাতে রাজকোষে সঞ্চয় করেন, তাহার ব্যবস্থা।

আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের বিধি ও নিষেধ সূত্র সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ সূত্র অনুসন্ধান করিয়া চলিলে একদিকে যেরূপ রাজকোষে কখনও অর্থাভাব অথবা ঋণের প্রয়োজন হইতে পারে না, অন্যদিকে আবার জনসাধারণেরও কখনও অর্থাভাবের উদ্ভব অথবা গভর্ণমেন্টের আয় ও ব্যয়ের জন্য কোনরূপ অসুবিধার সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না।

সরকারী ব্যয় কোন্ কোন্ সূত্রে নিয়ন্ত্রিত হইলে গভর্ণমেন্টের পরিচালনা-কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে (minimum expense) নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার পর্য্যালোচনায় আমরা যে যে বিধি ও নিষেধ-সূত্রের কথা বলিয়াছি, এই সূত্রগুলি ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সূত্রগুলি পালন করিলে, যে শিক্ষার মানুষের পক্ষে বিন্দুমাত্রও উচ্ছৃঙ্খল হওয়া অথবা অমিতব্যয়ী হওয়া সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা তিরোহিত হইতে পারে এবং প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আইন ও শৃঙ্খলাপ্রিয় হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অল্প খরচে জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে। বর্ত্তমানে জগতের প্রত্যেক গভর্ণমেন্টের পরিচালনার অধিকাংশ খরচই যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে কর্ম্মচারিগণের বেতন বাবদ, তাহা পাবলিক ফাইন্যান্সের প্রত্যেক ছাত্রই অবগত আছেন। দেশের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে স্ব স্ব সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে একদিকে যেরূপ সামান্য মাত্র বেতনে রাজকর্ম্মচারী পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, অন্যদিকে আইন-অমান্য এবং কাম-ক্রোধাদি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবৃত্তি তিরোহিত হইলে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য কোনরূপ জটিল অথবা সুবৃহৎ অনু-

ষ্টানের প্রয়োজনীয়তা হ্রস্বতা লাভ করিতে পারে। কাযেই বলা যাইতে পারে যে ব্যবসসম্বন্ধীয় উপরোক্ত বিধি ও নিষেধ-সূত্রসমূহ অনুসৃত হইলে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়ে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে।

জগতে এমন একদিন ছিল, যখন প্রত্যেক দেশেই জীবিকানির্ব্বাহের প্রত্যেক উপকরণটি নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব হইত এবং বৎসরে কেবল মাত্র ৪০।৫০টি টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব হইলেই মানুষ এক একটি সুবৃহৎ পরিবার অনায়াসে প্রতিপালন করিতে পারিত। এই উপার্জ্জন দ্বারা শুধু যে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণেরই উদর পূরণ করা সম্ভব হইত, তাহা নহে, উহা দ্বারা অতিথি সৎকার করা, পুত্র-কন্যাগণের বিবাহ, মাতা-পিতার শ্রাদ্ধ এবং বিবিধ রকমের উৎসব প্রভৃতি নৈমিত্তিক কার্য্যও অনায়াসেই নিষ্পন্ন হইতে পারিত। এখনকার মানুষ মনে করে বটে যে, তখন কোন বিস্তৃত শিক্ষা-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল না, কিন্তু যাঁহারা বেদ অথবা কোরাণ অথবা বাইবেল যথাযথ অর্থে একটু তলাইয়া অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন যে, তখন এখনকার মত প্রবঞ্চনা, দ্বেষ, হিংসা, দাম্ভিকতা, পরস্ত্রী ও কুমারীলোলুপতার শিক্ষা বিদ্যমান ছিল না বটে, কিন্তু প্রত্যেক বালক-বালিকা যাহাতে সুস্থ দেহ, সবল ইন্দ্রিয়, সংহত মন ও নির্ম্মল বুদ্ধি লাভ করিয়া স্ব স্ব কাম-ক্রোধাদি রিপুগণকে সংযত করিতে ও জীবিকার্জ্জন করিতে পারে, তাহার শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যমান ছিল। তখনকার মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীর শিক্ষা বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তখন মানুষের মধ্যে এত প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় নাই এবং কোন দেশেই তখন গভর্ণমেণ্ট-গুলিকে এতাদৃশভাবের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত, রঙবেরঙের পোষাকপরা জজ, মুনসেফ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সার্কেল অফিসার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীরঘেরা জেল অথবা আন্দামান ও সেণ্ট্ হেলেনার সৃষ্টি করিতে হয় নাই। আমরা জগতের যে সময়ের যে চিত্র পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ের সেই চিত্র সম্পূর্ণ ভাবে উদ্ঘাটিত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, তখনকার শিক্ষার ফলে মানুষের সমরলোলুপতা পর্য্যন্ত তিরোহিত হইয়াছিল এবং জগৎময় পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হইয়াছিল। কাযেই একমাত্র সু-শিক্ষা এবং পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের সুব্যবস্থার দ্বারা এক দিকে যেরূপ মানুষের সুখশান্তিময় জীবনযাত্রা সুলভ করা সম্ভব হইয়াছিল, অন্যদিকে আবার গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা-কার্য্যও সর্ব্বতোভাবে জটিলতাহীন এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প ব্যয়-সাধ্য হইতে পারিয়াছিল।

আজকালকার অর্থনীতিবিশারদগণ হয়ত বলিবেন যে, এখনকার অবস্থায় বর্ত্তমানে আর ঐ শিক্ষা অথবা পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানে ঐ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব নহে। কাযেই তাহাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় তখনকার কথা বলা পাগলামী। কিন্তু এই কথা সত্য নহে। প্রয়োজন হইলে আমরা দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি যে, অতি অনায়াসে এখনও এমন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, যাহার ফলে এখনও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনা-কার্য্য এবং প্রত্যেক মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য নামমাত্র ব্যয়ে নির্ব্বাহ হইতে পারে।

মানুষ তাহার তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এমন শিক্ষাই পাইতেছে যে, তাহার নূতন নূতন উপাধিতে (degree) সে মানসিক স্ফীতি অনুভব করিতে পারে বটে, কিন্তু কামবাণে বিদ্ধ নহেন, অথবা প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত ক্রোধে জর্জ্জরিত নহেন, অথবা ছাগদুগ্ধ কিংবা চপ-কাট্‌লেট কিংবা আঙ্গুর পেস্তার লোভপরবশ নহেন, এমন কয়টি মানুষ সারা-জগতের আধুনিক শিক্ষিত মানুষগণের মধ্যে পাওয়া যাইবে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে নৈরাশ্য লাভ করিবার কারণ আছে।

পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানেও এমন ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে যে, প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ, তিন গুণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ঋণে অত্যধিক জর্জ্জরিত নহে, অথবা অনাহারে কিংবা অল্পাহারে শীর্ণমস্তিষ্ক ও শুষ্কদেহ নহে, এমন খুব কম পরিবারই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। অথচ ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, পঞ্চাশ বৎসর আগেও এই ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় নব্বই জন লোক প্রায়শঃ ঋণমুক্ত ছিল। অনেকে মনে করেন যে, তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানদণ্ডও (standard of living) উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং তাহারই জন্য মানুষের অত্যধিক ঋণগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য

হইয়া পড়িয়াছে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই মতবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। তথাকথিত সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ও মাংসাদির যে অংশ স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবহারের অযোগ্য, সেই সেই অংশের দ্বারা প্রস্তুত চপ-কাটলেট প্রভৃতির প্রতি লোলুপতা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে বটে, ব্যবহার্য্য বস্ত্রাদির রঙবেরঙের পরিকল্পনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু তথাকথিত অসভ্যতার দিনে মানুষ দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি যে শ্রেণীর স্বাস্থ্যপ্রদ বিশুদ্ধ আহার্য্য উদরসাৎ করিত, অথবা কাশ্মীরের শাল ও ঢাকার মস্‌লিন-জাতীয় যে শ্রেণীর আরামপ্রদ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিত, তাহা এখন ব্যবহার করিতে পারা তো দূরের কথা, প্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমোদ-প্রমোদের জন্য থিয়েটার-বায়স্কোপের খরচের মাত্রাও প্রত্যেক সংসারে বাড়িয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু তখন প্রায় প্রতি গ্রামে গ্রামে সখের যাত্রা ও সখের থিয়েটারের যে কুটিলতাবিহীন আনন্দ-নিনাদ প্রবাহিত হইত, তাহা এখন আর শুনা যায় না।

শুধু যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের ঋণগ্রস্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টেরও ঋণগ্রস্ততা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

গভর্ণমেণ্টের আয় ও সঞ্চয়-সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ-সূত্রের কথা বলা হইয়াছে, গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সূত্রগুলি পালন করিলে একদিকে যেরূপ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ঋণমুক্ত থাকিয়া কোন প্রজার কোনরূপ বিরক্তিভাজন না হইয়া স্বকীয় অর্থভাণ্ডার সর্ব্বদা পূর্ণ রাখা সম্ভব হইতে পারে, সেইরূপ আবার জনসাধারণের পক্ষেও কোনরূপ ঋণগ্রস্ত না হইয়া কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা ও দুর্দ্দিনের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করা সাধ্যায়ত্ত হইয়া থাকে।

গভর্ণমেণ্টের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের মূল নীতি কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে আলোচনায় যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ-সূত্রের কথা বলা হইয়াছে, ঐগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত মূলনীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হইলে গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এক কথায়, জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না পাইলে গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি করা, জনসাধারণের ব্যয় হ্রস্বতা প্রাপ্ত না হইলে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের লাঘবতা সম্পাদন করা, জনসাধারণের সঞ্চয়বৃদ্ধি সাধিত না হইলে গভর্ণমেণ্টের সঞ্চয় বৃদ্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে জনসাধারণের আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের কথা উপেক্ষা করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহারা এতদ্বিষয়ে দূরদৃষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, উহা সম্ভব হয় না এবং এতাদৃশ ভ্রমাত্মক চেষ্টা গত ১৫০ শত বৎসর হইতে জগতের গভর্ণমেণ্টগুলি করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই বাস্তবতঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের ঋণগ্রস্ততা ও বিপন্নতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক্ষণে, জনসাধারণের পক্ষে সরকারী বাজেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হইবে যে, জনসাধারণ ও সরকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি এবং একের অবনতিতে অপরের অবনতি। কাজেই জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ঘটিতেছে, অথবা তাহার অবনতির আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে গভর্ণমেণ্টের বাজেট পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সরকারী বাজেট পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা অথবা অবনতির আশঙ্কা, তাহা সরকারী বাজেটের কোন্ কোন্ বিষয় পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় উহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত নয়টি :—

(১) যে সমস্ত কার্য্যে কাহারও কোন রকমের অনিষ্ট না করিয়া প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ লাভবান্ হইতে পারে, সেই সমস্ত কার্য্য ও তাহাতে জনসাধারণের লভ্যাংশ যাহাতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তৎসম্বন্ধীয় কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত (initiated), অথবা রক্ষিত (maintained) হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা।

(২) যে সমস্ত কার্য্যে অথবা বস্তুতে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের কোনরূপ উপার্জ্জন হয় না, পরন্তু কেবল-

মাত্র তাহাদের ব্যয়ই হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কার্য্যের অথবা বস্তুর উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট স্বকীয় আয় বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি না, তাহার পরীক্ষা।

(৩) যে শিক্ষায় একজন ছাত্রেরও কোন শ্রেণীর অভিমান উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতি-ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্কীর্ণতার উদ্ভব বিন্দুমাত্র পরিমাণেও হইতে পারে, অথবা যে শিক্ষায় কামক্রোধাদি, সমর-লোলুপতা, পরস্ত্রী ও কুমারী-লোলুপতা, প্রতারণা, নফরগিরির প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই শিক্ষা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জিত হয়, তাহার প্রযত্ন করা হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা।

(৮) যে শিক্ষায় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে এবং উহার উন্নতি ও অবনতি হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া যুগপৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উন্নতি সাধন করা এবং অভিমান, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব সামর্থ্য যথাযথভাবে পরিমাপ করা ও সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত হওয়া সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা যাহাতে সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করে, তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা।

(৫-৯) গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ যাহাতে বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে কাহারও ঋণগ্রস্ত হইতে না হয়, তজ্জন্য যে পাঁচটি বিধি ও নিষেধ-সূত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা।

অর্থ-সচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের ১৯৩৭-৩৮ সালের বাজেটের সমালোচনা

সরকারী বাজেট পরীক্ষা করিবার উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসারে মাননীয় মিঃ সরকারের বাজেট পরীক্ষা করিলে এই বাজেটে গতানুগতিক পন্থাপালন-বিষয়ে কোন গৌরব অথবা লঘুতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যে ব্যবস্থায় কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া জনসাধারণের এবং তৎসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, যে ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি করিবার জন্য জনসাধারণের অনিষ্টপাত ঘটিতে পারে, সেই ব্যবস্থা যাহাতে নিষিদ্ধ হইতে পারে, যে শিক্ষায় জনসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই শিক্ষা নিবৃত্ত করিবার, যে শিক্ষায় জনসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের ব্যয় সঙ্কুচিত হইতে পারে, সেই শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার, যে ব্যবস্থায় জনসাধারণের ও গভর্ণমেণ্টের ঋণভার লঘুতাপ্রাপ্ত হইয়া ঋণ করিবার প্রয়োজন হ্রস্বতা লাভ করিতে পারে ও সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার কোন আয়োজনের বিন্দুমাত্রও সাক্ষ্য সমগ্র বাজেটে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক কথায়, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যে-সমস্ত ব্যবস্থা সাধিত হইলে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের আয় ও সঞ্চয় যুগপৎ বৃদ্ধি পাইতে পারিত, ব্যয় ও ঋণ হ্রস্বতা-প্রাপ্ত হইতে পারিত, তাহা হওয়া ত' দূরের কথা, মাননীয় সরকার মহাশয় গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন এবং যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার আভাস প্রদান করিয়াছেন, তাহার ফলে একদিকে যেরূপ গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের ব্যয় ও ঋণ বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে, অন্যদিকে আবার প্রত্যেকেরই আয় ও সঞ্চয় উত্তরোত্তর হ্রস্বতাপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে মাননীয় সরকার মহাশয়ের বাজেট বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পাঠক-বর্গের সম্মুখে প্রতিপন্ন করিব।

অবস্থানুসারে ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা গভীর ভাবে চিন্তা না করিয়া অবস্থার পরিবর্ত্তনানুসারে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া গতানুগতিক পন্থানুবর্ত্তন করার অপর নাম পাখীর মত "রাম" "রাম" শব্দের উচ্চারণ করা। এই হিসাবে মাননীয় সরকার মহাশয় টীয়াপাখীর কার্য্য যথাবিহিত ভাবে সমাধান করিয়াছেন, তাহা বলা যাইতে পারে। ২।৩ বৎসর আগেও হয়ত এতাদৃশ ভাবে টীয়াপাখীর কার্য্য সম্পাদন করিয়া দেশে অনিন্দিত থাকা সম্ভব হইত, হয়ত এখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ও হাসপাতালে গভর্ণমেণ্টের দানের পরিমাণ

কিছু বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া অথবা প্রজাঋণের লাঘব সাধন করা হইবে ও কুটীরশিল্পের মূলধনের সহায়তা করা হইবে, এবংবিধ আশার বাণী প্রচার করিয়া অদূরদর্শী সম্প্রদায়-বিশেষের নিকট হইতে জয়ধ্বনি উত্থাপিত করা সম্ভব হইবে, কিন্তু মাননীয় সরকার মহাশয়ের শ্রবণশক্তি যদি অটুট থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গলার পৌনে ষোল আনা লোকের অপ্রচুর অন্নাহারজনিত অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি তিনি বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং অদূরভবিষ্যতে, আট বৎসরের অনধিক কালের মধ্যে, যে-প্লাবন জগৎ-মাতার আকাশ-বাতাস ঘিরিয়া ফেলিবে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিবেন। যাঁহারা এখনও টীয়াপাখীর ধর্ম্ম পালন করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহাদের কাছে হয় তো আমাদের এতখানি আশা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু আমরা যে অনুপায়। একটির পর একটি করিয়া যখন আরও নয়টি প্রদেশের বাজেটের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে, তখন হয়ত দেখা যাইবে যে, মাননীয় সরকার মহাশয়ের এতাদৃশ নিন্দনীয় বাজেটই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য।

যাঁহারা এতখানি উদাসীন, যাঁহাদের সামর্থ্য স্কুলের বালক অপেক্ষাও নিন্দনীয়, তাঁহারা যখন দেশের জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতার পদে অধিষ্ঠিত হন, তখনই যে প্রকৃত অধর্ম্মের অভ্যুদয় (predominance of inefficiency) হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলিতে হয় না কি ?

ধর্ম্মের গ্লানি (indifference to real efficiency) অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধর্ম্মের অভ্যুদয়ের এতাদৃশ সাক্ষ্য তো ২০।২৫ বৎসরের আগেও দেখা দেয় নাই। তবে কি আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বিকৃতির তাণ্ডবলীলা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদিত না হইলে প্রকৃতির অবিকৃত খেলার সন্ধান আর মনুষ্যসমাজ পাইবে না ? আমাদের কথা কে বুঝিবে ?

স্নিগ্ধারূপিণী মা, আমরা তোমাকে ডাকিতেছি। যে রূপে তুমি ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়া বিকৃতিরূপ অধর্ম্মের, অথবা তাণ্ডব-লীলার নেতাগণের অভ্যুদয় বিধ্বস্ত করিয়া অগণিত নিরাশ্রয় মূক সন্তানগণের আশ্রয় প্রদান করিবে, সেই রূপের ধ্যান করিতেছি। তুমি কোথায় ?

["মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ও আধুনিক পাণ্ডিত্যের নমুনা"-শীর্ষক সম্পাদকীয় সন্দর্ভের তৃতীয় স্তবক আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।]

সংবাদ ও মন্তব্য

দশ হাজার

গত ৫ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে অর্থ-সচিব মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার তাঁহার বাজেট আলোচনার উত্তরে বলিয়াছেন,—"বলা হইয়াছে যে, বাজেটে বেকারগণের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। কিন্তু বাজেটে দশ হাজার লোক যাহাতে কাজ পাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা আছে।"

*

সাধু নলিনীরঞ্জন! কিন্তু তাঁহার এই হিসাবে কি ব্যবস্থা-পরিষদের ২৫০ সদস্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ? না হইলে সংখ্যা ১০০০০এর উপর আরও ২৫০ জনের নাম যোগ করা হউক। তাহা হইলে ১০২৫০ বেকারের সমস্যার সমাধান হইল। তাই বলিতেছি, সাধু নলিনীরঞ্জন!

নারীর উক্তি

গত ৬ই আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ব্যবস্থা-পরিষদে বেগম হামিদা মামুন বলিয়াছেন, বাঙ্গালার মেয়েরা তোমাদের উচ্চ রাজনীতির ধার ধারে না, কংগ্রেসে কিংবা আর কোনও দল, যেই ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবল হউক, তাহাদের কিছু যায় আসে না।

*

সে কি কথা ? তাহা হইলে এই যে সে দিন কংগ্রেস হইতে প্রোসেসান করিয়া টাউন-হলে গিয়া দেশোদ্ধারের চেষ্টা হইতেছিল, তাহাতে আট দু'গুণে ষোলটি বাঙ্গালী বীর-রমণী কংগ্রেসের ঝাণ্ডা উঁচা করিয়া জেল বরণ করিলেন ? সুতরাং বেগম সাহেবের কথায় আমরা তেমন প্রত্যয় রাখিতে পারিতেছি কই!

পুরাতন মদ্য

ঐ দিনই পরিষদে এস. সি. চক্রবর্ত্তী নামীয় জনৈক কংগ্রেসী সদস্য বলিয়াছেন—অর্থসচিব মহাশয় সেদিনও কংগ্রেসের লোক ছিলেন এবং তিনি ব্যবসাদারও বটে, তাই তাঁহার বক্তৃতায় নূতন সুরের আশা করা গিয়াছিল, কিন্তু এ যে দেখা যাইতেছে, সেই পুরাতন মন্ত্র!

*

তাহা হইলে তো বলিতে হইবে, অর্থ-সচিব মহাশয় কংগ্রেসের মানই রাখিয়াছেন। কংগ্রেসও তো সেই পুরাতন মদ্যেরই ব্যাপারী—গান্ধীজী 'কাম্' সোস্তালিজম 'কাম' চরকা 'কাম' টলষ্টয় ইত্যাদিতে কি নূতন মদ্য তৈয়ারী হইতে পারে ?

অহিংস লাথি

১০ই আগষ্ট তারিখে মন্ত্রীদের বেতন-বিতর্কের অবস্থায় মিঃ জালালুদ্দিন হাশেমী বলিয়াছেন যে, 'একজন যদি সাবধান না হন, তবে শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে লাথি মারিয়া দূর করিয়া

দেওয়া হইবে।' স্পীকার আপত্তি করিলে হাশেমী সাহেব বলিয়াছেন যে, 'আমি প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলি নাই। মিঃ রাজিবুদ্দীন তরফদারকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছি।'

*

বুঝিতে পারিলাম না, হাশেমী সাহেব কি বলিতে চাহেন। লাথির কথা প্রধান মন্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া না বলিলেই তাহা অপরাধ নহে, ইহার ethicsটা আমরা সত্যই বুঝিতে পারিলাম না। যদিও কংগ্রেসীদের মত বোধ হয় এই যে, লাথিই হউক, লাঠিই হউক—অহিংসভাবে মারিতে পারিলে তাহা কোনক্রমেই অপরাধ নহে। তবে একটা প্রশ্ন এই যে, অহিংসভাবে লাথি মারা যায় কি না। ইহার জন্য কংগ্রেস হইতে একটি 'সাব-কমিটি' নিযুক্ত হইতে পারে।

নেতার অভাব

গত ৬ই আগষ্ট কলিকাতার অ্যালবার্ট হলে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ে দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সমবেত জনসভার অনুষ্ঠান হয়। মিঃ সি, সি, বিশ্বাস ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, 'এখন একটু চেষ্টা করিলেই এ দেশে নেতা হওয়া যায়।' ইহার উত্তরে ডক্টর প্রফুল্ল ঘোষ বলিয়াছেন যে, 'মিঃ জাষ্টিস যদি সত্যই মনে করেন যে, দেশে উপযুক্ত নেতার অভাব হইয়াছে'...ইত্যাদি।

*

দেশে যে উপযুক্ত নেতার অভাব হইয়াছে এমন কথা ডক্টর ঘোষের স্বীকার করিতে বাধিল কেন? তিনি নিজকে নেতা ভাবেন বলিয়া? বিশ্বাস মহাশয় বোধ হয় তাহা স্বীকার করেন না। তাই তিনি একজন নেতার উপস্থিতিতেই এমন গোলমেলে কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। বিশ্বাস মহাশয় নিজে নেতা হইলে এ কথা তিনি নিশ্চয়ই বলিতেন না।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

গত ২রা আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দিগণের অনশন অবলম্বন সম্পর্কে সমবেত জনসভায় ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বাণী পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, 'কেবল বাঙ্গলা দেশে শত শত যুবককে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে এবং মাঝে মাঝে সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ করিয়া আমাদের স্মরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে যে, এই প্রদেশে শাসকশক্তি জনমতের নিকট দায়ী নহেন এবং এখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা মরীচিকার মত অস্তিত্বহীন।

*

রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালা দেশের কেবলমাত্র রাজবন্দী শত শত যুবককেই বন্দী দেখিলেন—আমরা তো দেখিতেছি এ দেশে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই এ-যুগে শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছে, কেহ সাহিত্যের শৃঙ্খলে, কেহ দর্শনের, কেহ আর্টের, কেহ শিল্প-বাণিজ্যের। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিলেই বা কি, না করিলেই বা কি—শৃঙ্খলের পরিচয়ই প্রতিদিন সংবাদপত্রসমূহ সরবরাহ করিতেছে। স্বহস্ত-রচিত শৃঙ্খল কি রবীন্দ্রনাথের এ-পর্য্যন্ত দৃষ্টিতে পড়ে নাই? আমরা রবীন্দ্রনাথকে এতখানি অদূরদর্শী ভাবি না। কিংবা যে শৃঙ্খল নিজের হাতে পায়ে ক্রমাগত বাজিতেছে, সেই শৃঙ্খলের শব্দ বন্ধ করিতেই তাঁহার এত ঝঙ্কার? কে বলিবে!

উন্মত্ততার কারণ

*

গত ১১ই আগষ্ট তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে স্বরাষ্ট্র-সচিব জানাইয়াছেন—গত সাত বৎসরে ১২ জন রাজবন্দী পাগল হইয়া যায়, ৭ জনকে রাঁচী প্রেরণ করা হইয়াছে, ইত্যাদি। ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিতে চাহেন—ডাক্তারী রিপোর্টে রাজবন্দীদের উন্মত্ততার কি কারণ দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদে এত ব্যক্তি থাকিতে শ্যামাপ্রসাদ বাবু এই প্রশ্ন করিলেন দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে, এই জন্য পাছে স্বরাষ্ট্র-সচিব বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষী করেন, সে আশঙ্কা তিনি মনে মনে পোষণ করেন। স্বরাষ্ট্র-সচিব অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সময় চাহিয়াছেন। তিনি কি উত্তর দিবেন আমরা জানি না। তবে আমাদের বিশ্বাস রাজবন্দী হইবার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ই দায়ী, উন্মত্ত হইবার জন্যও বিশ্ববিদ্যালয় দায়ী। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর আশঙ্কা অমূলক নহে।

'পঞ্চনদীর তীরে'

অমৃতসরের ৪ঠা আগষ্টের এক সংবাদে প্রকাশ:—কিছু দিন যাবৎ ক্যাম্পবেলপুরের নিকটে একটি নদীর ব্যবহার লইয়া শিখ মুসলমানে বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। গত ১লা এপ্রিল তারিখে উক্ত স্থানে শিখ-মুসলমানে এক দাঙ্গা হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' কি গুরুমুখী ভাষায় অনূদিত হইয়া গিয়াছে? তাহা না হইলে 'নদীর তীর' লইয়া 'বেণী পাকাইয়া' শিখরা মুসলমানের সহিত এমন বিবাদ বাধাইল কেন?

এস মা

এস মা! নবরাগরঙ্গিণি, নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!—এস মা, গৃহে এস—ছয়কোটি সন্তানে একত্রে এককালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব,—মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্র-বালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারিণি, অনন্তশ্রী অনন্তকাল-স্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তিপ্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব—এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা, গৃহে এস—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি?

—বঙ্কিমচন্দ্র

বাঙ্গলা কাব্যে শ্রীদুর্গা

দুর্গোৎসব বাঙ্গালী-জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও বাঙ্গালীর এই অতি প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানটি টি*কিয়া আছে এবং প্রতি বৎসর দেশের আপামর জন-সাধারণকে আনন্দ দিতেছে। এই পূজার প্রকৃত অর্থ ও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী রূপকের সার্থকতা আজ কালধর্ম্মে দেশ হয়ত ভুলিয়াছে, তবু এই পূজার অন্তর্গত আনন্দানুভূতিটুকু পাইতে কেহই অনিচ্ছুক নহে।

দুর্গোৎসবকে আশ্রয় করিয়া এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে বহু কবি বহু উপাদেয় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রোত্তর যুগ পর্য্যন্ত অখণ্ডভাবে দুর্গা-সাহিত্যের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। সেই বিস্তৃত কাব্য-শাখা হইতে বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনাই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বিদেশীয় আদর্শের প্রভাবে জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি শিথিল হওয়ায় এখনকার সাহিত্যে দেশীয় ঐতিহ্যের বাণী প্রায় শোনা যায় না—এমন দিনে এই ধারাবাহিক সংকলন অনেককে আনন্দ দিবে আশা করা যায়।

এই সংকলনকে মূলতঃ আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি—(১) মঙ্গলকাব্য :—মঙ্গল-কাব্যে শিব-দুর্গার গার্হস্থ্য রূপ প্রাধান্য লাভ করি-য়াছে। রাজকন্যা পার্ব্বতী বৃদ্ধ বর শিবের হাতে পড়িয়াছেন—পুত্র-কন্যা লইয়া তাঁহার দুঃখের সংসার। স্বামী অবৈষয়িক ও উদাসীন। নিত্য দাম্পত্য কলহ—নিত্য নূতন অশান্তি। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, রামেশ্বরের শিবায়নে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এই আদর্শ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এখানে শিব দেবাদিদেব শঙ্কর এবং পার্ব্বতী বিশ্ব-জননী নহেন—তাঁহারা প্রাচীন বঙ্গ-সংসারেরই দৈবী সংস্করণ। আমাদের সংকলনের প্রথম পর্য্যায় তাহারই কতকাংশ লইয়া।

(২) উমা-সঙ্গীত :—স্বামীগৃহবাসিনী পার্ব্বতীর বিরহে মাতা মেনকার স্নেহ-বিগলিত দুঃখ লইয়া এই পর্য্যায়ের গানগুলি রচিত। স্নেহশীলা জননী কন্যার দুঃখময় জীবনের কথা ভাবিয়া অশ্রুপাত করেন, পাষাণ স্বামীকে নিন্দা করেন—স্বপ্নে কন্যার যোগিনী মূর্ত্তি দেখিয়া আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠেন—কন্যাকে আনিতে অনুরোধ করেন। ইহাই এ দেশে আগমনী সঙ্গীত বলিয়া কথিত—ইহারই অনুপূরক বিজয়া সঙ্গীতও এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। রামপ্রসাদ, দাশরথি, কমলাকান্ত এই পর্য্যায়ের প্রধান কবি। দুঃখের বিষয় রজনীকান্তের পর এই শ্রেণীর কবিতা আর বাঙ্গালা-ভাষায় দেখা যায় না।

(৩) মাতৃ সঙ্গীত :—বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গামাতার পরি-কল্পনায় দেশমাতৃত্বের আরোপ করেন।—পরবর্ত্তী-কালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও কালি-দাস রায় প্রমুখ অনেক কবি বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত ধারাই অনুসরণ করিয়াছেন—বঙ্গমাতা ও বিশ্বমাতা তাঁহাদের দৃষ্টিতে অভিন্ন—তাঁহারা এই পর্য্যায়ে বহু উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন।

মোটের উপর ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে আজ পর্য্যন্ত দুর্গামাতার বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিভিন্ন সত্তা ও কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালী কবিরা কাব্য রচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এই সংকলনে আমরা প্রত্যেক পর্য্যায় হইতেই কিছু কিছু সংকলন করিয়া দিয়াছি এবং

তাহা হইতে আমাদের দৃষ্টির কিরূপ ক্রমবিকাশ হইয়াছে, তাহাও দেখাইতে পারিয়াছি আশা করি। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালার বহু-বিস্তৃত ও বহুকথিত বৈষ্ণব-কাব্যশাখায় শ্যামা বা উমা-সঙ্গীতের বিন্দুমাত্র নাম-গন্ধ নাই।

পদ্মার বিবাহে শিব-দুর্গার রহস্যালাপ

জামাই এনেছি পুণ্যবান কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে।
এনেছি মুনির সুত রূপে গুণে অদ্ভুত
কন্যা সমর্পিব তারে॥
হাসি বলে চণ্ডী আই তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে চাহিবে তারা পান খাইতে
আর চাবে তৈলে সিন্দূরে॥
হাসি বলে শূলপাণি এয়ো ডাকাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াবো নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে ভয়ে যাবে পালাইয়া।
আছুক পানের কাজ এযোগণ পাবে লাজ
পান গুয়া দিবে কোন জনা।
বিজয় গুপ্তেতে কয় এরূপ উচিত নয়
ঘরে গিয়ে কর সন্নিধানে॥
—বিজয় গুপ্ত (পদ্মা পুরাণ) ১৫০০ খৃষ্টাব্দ।

শিবের উপর দুর্গার কোপ

ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর।
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চূর॥
আঁচলে আঁচলে গিঁঠ বাঁধি এক ঠাঁই।
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই॥
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে ঢঙ্গ।
যাবার কালে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ॥
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান বাঘছাল॥
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় রাখে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি॥
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে।
চড়ে বেড়ায় বুড়া বলদে খাউক তারে বাঘে॥
আগুন লাগুক কান্থের গাল দিয়া লাগুক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাক যেমন পারা বোরে॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা গড়ি ভাঙ্গুক লাঠ।
কপালের তিলকচন্দ্র পাড়ে গিলুক রাহু॥
—বিজয় গুপ্ত।

দেবীর চণ্ডিকা রূপ

মার মার বলি ডাকে ডাকেন ভবানী।
সেনাপতি দানবগণ সমরে নিদারুণ দলে দলে আনাইল॥
রঙ্গিণী রণজয়ী দুন্দুভি বাজে দানবের বাজাইয়া দামা।
রাজপুত নজবর যেমন ধনুর্ধর সমুখে কত সানসানা॥
দাদালিয়া দলবল নকীবাদে নাচে নানান নকশ দানদস্তে।
ধর ধর বলি ধন ধাক্ক দামামা ধমকে ধরাধর কম্পে॥
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িছে শরগুলি বরিষে আকাশে একাকার ধুম।
দিশাহারা দিবসে কত শত ঝঞ্ঝনা গোলা বাজে দুড়ুম দুড়ুম॥
ঝাকে তা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁক বিরিখ ঠাক ঠাকে লাগে লাগে বরিষে তীর।
সানাইয়া হানিতে গড়বাদ্য নহে ত সমরে শিপাহীর শির॥
করিয়া গর্জন ঘোরতর গর্জন তর্জন দানাগণ দর্পে।
সমরে সেনাগণ সংহারে যেমন খগেশ সর্পে॥
—ঘনরাম (ধর্ম্ম মঙ্গল) ১৭০০ খৃষ্টাব্দ।

পিশাচ পসারী ও দেবীর চামুণ্ডা রূপ

পাতিল পেতের হাট পিশাচ পসারী।
নর মাংস কিনিতে পসরা সারি সারি॥
হড়া হড়া হড়া করে ডাকিনী যোগিনী।
কেহ কাটে কেহ কুটে বাটে খানি খানি॥
কেহ কিনে কেহ বেচে কেহ ধরে তুল।
কেহ চাকে কেহ ভকে কেহ করে মুল॥
রচিয়া নাড়ীর ফুল কেহ গাঁথে মালা।
বয়ে লয়ে কেহ কারে যোগাইছে ডালা॥
ননোরম মানুষের মাথার লয়ে ঘি।
যাচিয়া যোগায় যত যোগিনীর ঝি॥
উপর পুরিয়া কেহ নিবারিছে ক্ষুধা।
চুমুকে কবির পিয়ে সম তার সুধা॥
কাঁচা মাংস খায় কেহ ভাজা কোলে ঝালে।
মানুষের গোটা মাথা কেহ ভরে গালে॥
দশনে চিবায় কেহ কুঞ্জরের শুঁড়।
মুয়া বলে মুখে ভরে মানুষের মুড়॥
হাতী লয়ে হাতে কেহ উড়ায় আকাশে।
লাফ দিয়ে লুফে কেহ অমনি গরাসে॥

* * *

হেন হাটে হাকিম হইল হৈমবতী।
করপুটে সম্মুখে ধুমসী করে স্তুতি॥
—ঘনরাম (ধর্ম্মমঙ্গল) ১৭০০ খৃষ্টাব্দ।

দেবীর ছলনা

ব্যাধে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল।
দুর্গতিনাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণ গোধিকা রূপ ধরিয়া পার্ব্বতী।
ব্যাধপথ জুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগয় না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত।
সুবর্ণ গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত।
সুবর্ণ গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে।
ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাঁটে।
সত্বর গমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হরষিত মনে ব্যাধ গদগদ বাণী।
উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিণী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা।
পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্য রূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু।
গেহিণীর মুখে চাহি বোলে কোন্ হেতু॥
—কবিকঙ্কণ (চণ্ডী-মঙ্গল) ১৬০০ খৃষ্টাব্দ।

দেবীর গৃহিণীত্ব

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিনজনে একুনে বদন হল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিনজনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন রুদ্র মূর্ত্তি ডাকে॥
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে থাঁ॥
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌনী হয়ে রয়।
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়॥
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে।
যত পাব তত খাব ধৈর্য্য হব বটে॥
হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে।
ঈষদুষ্ণ সুপ দিল বোগ্যীর পরে॥

লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি।
সুপ হল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড়বড় দেবী এনে দিলা ভাজা দশ।
খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ॥
—রামেশ্বর (শিবায়ন), ১৭০০ খৃষ্টাব্দ

দাম্পত্য কলহে দেবী

দ্রুতবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়।
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়িনী যায়॥
কোলে করি কার্ত্তিকেয়ে হস্তে গজানন।
চঞ্চল চরণে হইল চণ্ডীর গমন॥
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু।
পিছু ডাকে শশীমুখী নাহি শুনে কিছু॥
ঈশান দারুণ দিব্য দিলা দেবরায়।
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায়॥
করে বর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী।
ভাবিল ভাইএর কিরা ভবানীর প্রতি॥
ধাইযা ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে।
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে॥
যাও যাও যত ভাব জানা গেল বলি।
ঠেলিয়া ঠাকুরে ঠাকুরাণী গেল চলি॥
চমৎকার চন্দ্রচূড় চারি দিকে চায়।
নিবারিতে নারিয়া নারদ পানে ধায়॥
রামেশ্বর ভাবে ঋষি বসে দেখ কি।
পাথারে ফেলিয়া গেল পর্ব্বতের ঝি॥
—রামেশ্বর।

দেবীর বোধন

কল কোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে॥
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল
পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী
পাতিল রাজধানী অশোক মূলে॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ ভ্রমর গুণ গুণ,
মদন দিল গুণ ধনুকে হূলে।
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন
মধুমুদিত মন ভারত ভুলে॥
—ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল) ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

শ্রীদুর্গা (ভুবনেশ্বর)

শ্রীদুর্গা (বাঙ্গালা)
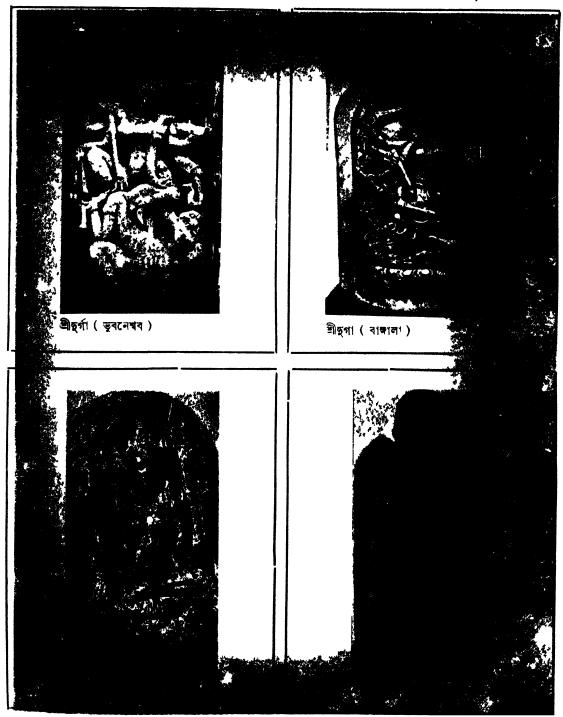
অন্নদার আত্ম-পরিচয়

গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর স্বরূপিণী॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি কাছে যাই॥

—ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল)

সতীর দেহত্যাগ ও শিবের তাণ্ডব

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজুট সংঘটে গঙ্গা।
ছলাচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥
ধ্বক ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ মহা শব্দ গালে॥

* * *

অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে॥

—ভারতচন্দ্র (অন্নদামঙ্গল)

উমার শৈশব

গিরিবর আর আমি পারি না হে
প্রবোধ দিতে উমারে,
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন্যপান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়ে ফুলায় আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥
আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথারে।
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥
উঠি বসে গিরিবর করি বহু সমাদর
গৌরীরে লইলা কোলে করে।
সানন্দে কহিলা হাসি ধর মা এল ও শশী
মুকুর তুলিয়া দিল করে॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥

—রামপ্রসাদ, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

শৈশবক্রীড়া

নগেন্দ্র নন্দিনী উমা রূপের নাহিক সীমা।
পঞ্চম বরিষকালে কর্ণবেধ কুতুহলে।
নানা আভরণ অঙ্গে সমবয়সীর সঙ্গে—
যশোদা রোহিণী রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
হীরা জীরা সরস্বতী হরিপ্রিয়া হৈমবতী
কৌশল্যা বিজয়া জয়া পদ্মাবতী সতী ছায়া—
হরিষ হইয়া মনে সবাকার মধ্যখানে
ধূলায় মন্দির করি বকুলের তলে গৌরী—
ধূগানি কুলটি পাতি সঙ্গে জয়া হৈমবতী—
রাঙ্গা ভাড় রাঙ্গা টাটি রন্ধনের পরিপাটি,
ধূলায় ওদন করি সবাকারে দিল গৌরী,
মিছা সে ভোজনসুখে হাত না পরশে মুখে—
আচমন মিছা জলে তাম্বুল দাও না বলে।
সকলে বালিকা বুদ্ধি পাতখোলা মুখশুদ্ধি।
দণ্ডে দণ্ডে দিবা নিশি আনন্দ সাগরে ভাসি।
কেহ দেয় ছড়া ঝাঁটি যেন গৃহস্থের বাটি।

—সহদেব চক্রবর্ত্তী, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

মাতার স্বপ্নদর্শন

গিরি গৌরী আমার এসেছিল—
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্য-রূপিণী কোথায় লুকালো?
কাঁদিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অকলের নিধি পেয়ে হারালো।

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নেই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণ হল।

—দাশরথি রায়, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

বিগত যামিনীকালে মহীধর মহীপালে কহিতেছে মেনকা মহিষী —
উঠ উঠ গিরিরাজ না হয় অন্তরে লাজ সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি॥
নিরখিয়া সুখতারা চক্ষে বহে শতধারা হৃদয় উদয় প্রাণতারা
ভেবে ভেবে নিরাধারা হইয়াছি নিরাহারা নিদ্রাহারা নয়নের তারা॥
দারুণ দুঃখের ভোগে বিষম বিভ্রম যোগে দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুঃখ কহিব কায় বিদরে পাষাণ কায় হিম হয় হিম-কলেবর॥

*　*　*

মৈনাক সন্তান শোকে শূন্য দেখি তিন লোকে আলোকে আঁধার গিরিপুরী
প্রবল প্রতাপ যার সাগর সলিলে তার মগ্ন হল মোহন মাধুরী॥
সবে এক সুকুমারী তাহারে ভিখারী নারী করিলে হে নিদয় পাষাণ —
আহা কন্যা গুণবতী সরল প্রকৃতি সতী দুঃখানলে দহে তার প্রাণ॥
দেখিলাম স্বপনেতে বৃষ এক বাহনেতে ভিখারীর কোলে ভিখারিণী—
দীনা হীনা ক্ষীণাকারে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে ভূতপ্রেত সঙ্গের সঙ্গিনী॥
অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিভব বিভূতি ছাই, বিষধর বেণীর বন্ধন।
অস্থিমালা কণ্ঠশোভা মহেশের মনোলোভা বাঘছাল কটিতে পিন্ধন॥
অন্নাভাবে তনু শীর্ণ গোধূলিতে সমাকীর্ণ তাম্রবর্ণ চাঁচর কুন্তল—
স্বর্ণশোভা হত বর্ণে, বন ফুলদল কর্ণে নাহি আর সুবর্ণকুণ্ডল॥

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

মাতৃস্নেহ

গিরি, প্রাণগৌরী আন আমার।
উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক এ ঘর লাগে আঁধার॥
আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে।
প্রতিদিন কি আমারে ভুলাবে এ কি তব অবিচার॥
সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রয়েছি পরাণ ধরে।
ধিক হে আমারে ধিক্ হে তোমারে জীবনে কি সাধ আর॥
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত কেঁদোনাক রাণি হও গো শান্ত।
কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি ভাব অসার॥

—কমলাকান্ত,- ১৮০০ খৃষ্টাব্দ

দুর্গোৎসব

সুন্দামাজ বঙ্গ এবে মহাব্রতে রত।
এসেছেন ফিরে উমা বৎসরের পরে,
মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভকতের ঘরে,
বামে কমকান্তি রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী স্বর্ণবীণা করে।
শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক— অসুরশ্রেষ্ঠ, গণ দল যত,
তার পতি গণদেব রাঙা কলেবরে—
করি শিরঃ আদিব্রহ্ম বেদের বচনে।
এক পদ্ম শতদল। শত রূপবতী
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্র গগনে
কি আনন্দ। পূর্ব্ব কথা কয়ে যেন স্মৃতি,
আনিছ কি বারিধারা আজি এ নয়নে?
ফলিবে কি মনে পুনঃ সে পূর্ব্ব ভকতি?

— মাইকেল (চতুর্দ্দশপদী কবিতা) ১৯০০ খৃষ্টাব্দ।

দেবীর দেশমাতৃকা রূপ

.. ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাম্।

*　*

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে—
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

—বঙ্কিমচন্দ্র (বন্দেমাতরম্)

শরতের বঙ্গ ও শারদীয়া

শরতের শুভ্রা ষষ্ঠী যামিনী সুন্দর,
লইয়া পাখালি কোলে শিশু শশধর—
ছাড়িয়া সূতিকাগার—ওগো সুগভীর,
গগন অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির।
এসেছে পাড়ার মেয়ে ওরা সমুদয়—
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়।

*　*　*

ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী-স্নেহের আজ বিশ্ব অধিবাস।
বাজে শঙ্খ, বাজে ঘণ্টা, বাজে ঢাকঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল।
এসেছে প্রবাসী পিতা পতি পুত্র ভাই
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই।
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব বিম্ব শিশু শোভা পায়।

*　　*　　*

ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন।
জননী স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন।

—গোবিন্দচন্দ্র দাস (অতুল)।

দেবী ও বঙ্গজননী

ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
বৎসলতা মূর্ত্তিমতী, গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি॥
তুমি জগদ্ধাত্রী মাতা পালন কর পীযূষ দানে।
মমতা তোর মেদুর হ'ল মধুর হ'ল নবীন ধানে।
সাগরে তোর শঙ্খ বাজে শুনতে যে পাই রাত্রি দিবা,
হিমাচলের তুষার চিরে চল তোমার চলছে কি বা।

*　　*　　*

অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছপা নহিস বৈরিকে
গৌরী তুমি গৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরিকে॥

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিশ্ব জুড়িয়া শোন কান দিয়া—মা এসেছে সব ঘরে
মায়েয় মেয়ের সে মিলনটুকু দিও না মলিন করে।
সারা বৎসরে এ দিন ফিরে না আর,
পথের কাঙ্গাল সেও মুছে আঁখিধার,
সেই মুখখানি বছরের মত দেখে নাও চোখ ভরে॥

*　　*　　*

চুণীর বলয় নীলার কণ্ঠী—সব থাক তব সাথে,
তোমারি স্মরণ শুভ শঙ্খটি নিয়ে যাব শুধু হাতে
মায়ের স্নেহের মিলনের মধু দিয়া,
তোমার প্রসাদ আনিব যে ফিরাইয়া,
বিজয়ার রাতে সঁপি দিব হাতে জ্যোৎস্না নিভৃত ছাতে।
এমনি করে মায়ের ঘরে আদরে গিরে শঙ্করী
দীর্ঘ দিনের দৈন্য জ্বালা ত্রিলোক হরে সম্বরি,
তবু তিনটি দিনের তরে　　মায়ের ঘরে উদয় হবে,
জীবন্মৃত জীবের পরে শিবের সুধা সঞ্চরি,
শিব সোহাগীর সঙ্গে তবু তিনটে দিনের ঘর করি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

স্তন্য সুধা উছলে ওঠে দেশজননীর পয়োধরে।
ক্ষেত্র মাতার নেত্র আঁখি ভালবাসার ভাষায় ভরে।
বন জননীর বাহু লতায়　　জাগে সেনা নিবিড়তায়
গোষ্ঠমাতার ওষ্ঠপুটায় শ্যামা সোহাগ উপচে পড়ে।
রোমাঞ্চিত মমতা আজ বঙ্গমাতার কলেবরে।

*　　*　　*

মা মেনকা জেগে আজ বাংলা মায়ের গেহে গেহে,
বৎসলতা বিরাজিত জননীদের দেহে দেহে।
পুত্র তব পথহারা　　বন্দী চির দুঃখে সারা
গঙ্গাসাগর হ'ল সোণা নয়নঝোরা তোমার স্নেহে।
কাঁদছ তুমি যুগে যুগে বাংলা দেশের গেহে গেহে।

—কালিদাস রায় (আহরণী)।

[শ্রীনন্দগোপাল সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত]

বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

যে ভাবে মহাকাল এই বিশাল ধরণীপৃষ্ঠে স্তরের পর স্তর সংগ্রহ করিয়াছেন যে ভাবে কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মে স্তরের পর স্তর উঠিয়াছে, সেইভাবে বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবে নানারূপ উপাসনা এবং নানারূপ উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে, অতীত-ভক্ত বঙ্গবাসী অতীত সাক্ষীর পরামর্শমত সেই সকল সংগ্রহ করিয়াছেন। যে বিবর্ত্তন-বিকাশ জড় জীব জগতের মূল নিয়ম, সেই নিয়ম বলেই সেই বৈদিককালের শক্তিরূপা অতসীবর্ণময়ী উজ্জ্বলা অনল শিখা আজি এই অধঃপতনের দুর্দ্দিনে সর্ব্বদেব পরিবেষ্টিতা মহা শক্তিতে চণ্ডীমণ্ডপ মণ্ডিত করিতেছেন। বেদের সেই দীপ্তি শক্তি, উপনিষদের শব্দ শক্তি, পুরাণের দেব-শক্তি, কাব্যের শোভা-শক্তি, তন্ত্রের মাতৃ শক্তি, বাঙ্গালীর কন্যা-শক্তি, আর কতকালের কতরূপ শক্তি আজি ইতিহাসের মহা রাসায়নিক সংযোগে দ্রবীভূত অথচ বিবর্ত্তনে বিকশিত হইয়া দুর্গোৎসবের কেন্দ্রীভূতা মহাশক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ধন শক্তি, জ্ঞান-শক্তি—গণ শক্তি, রণ-শক্তি—পাশব শক্তি, দানব শক্তি—বৃক্ষ শক্তি, শিলা শক্তি—অগণিত দেব-শক্তি সেই মহা কেন্দ্রের মহা বৃত্তভাবে মহা শক্তির শক্তি পোষণ এবং শোভাময়ীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এমন দালানভরা ঠাকুর, এমন হৃদয় ভরা প্রতিমা, এমন কালভরা পদ্ধতি, এমন জগৎভরা উপকরণ, এমন মানসভরা পূজা, এমন প্রবৃত্তিভরা উৎসব আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব মানবের হৃদয়োৎসবের চরমোৎকর্ষ এবং বাঙ্গালীর পরম গৌরবের পরিচয়।

আত্মারামের বারোয়ারী

(শ্রীমৎ কমলাকান্ত আফিংচি সকাশাৎ সপ্তম স্বর্গ হইতে প্রাপ্ত)

— না প্রকরণ না প্রহসন বা—

—শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

ভূমিকা

লিখিতং ভূমিকালিপি স্বাধীন-তপস্বীর দেশের শ্রীমাই-ছাজ সাহিত্যিক। আজিকার দিনে মিথ্যাকে সোনার বাগুতায় মুড়ে প্রচার-বিভাগের কারুক্রিয়া করাই সর্ব্বতোভদ্র তান্ত্রিক যন্ত্র-জাতীয় ভদ্রতা—পাঁচ সিকা থেকে তের সিকার ভাগাভাগি বন্দোবস্ত করা হয়েছে·· এবং তথা করণীকরণে কোন এটিকেট-বিরুদ্ধ হয় নি বোধ হয় নিশ্চয়।

প্রহসনীয় কারুক্রিয়া

মস্কো সহরের নব্য আমদানী বাপ্পা জাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীল শ্রী প্রয়োজক সামগ্রী অষ্টাচোভোবোস্কী এই নাটকের সেটিং দিয়েছেন। এর দ্বারা এই টুকু মেনে নিতে হবে যে, রাশ্যা থেকে যিনি কারুক্রিয়া শিখেছেন—বাঙ্গালা দেশ তার উপর কোন কথা বলবার অধিকার রাখতেই পারে না। অতএব প্রহসনীয় কারুক্রিয়া যে perfect—perfectতর—perfectতম, তা অবিসম্বাদীয় সত্যম্ অনৃতং বা।

নাটকীয় সংস্থাপন

স্থান—হাজারভুজার দেশে ঘুঘুচরার মাঠ। কাল—ডাইনী-চরার রাত। পাত্র—নবীন ও প্রবীণ। কুশীলবগণ—নিত্যসিদ্ধ থাকের নব্য বাঙ্গালার আর্টিষ্টগণ।

পূর্ব্বরঙ্গ

অতি প্রকাণ্ড আটচালা বাঁধা। বাঁশের খোঁটায় লাল নীল জরদা রঙের কাপড় জড়ান। তার গায়ে গায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাগজের লতা-পাতা, ফুল দিয়ে সাজান। কোন কোন থামের গায়ে আবার গোলাপ ফুল ও অভ্রের চাঁদ-মালা ঝুলছে। কোন কোন থামের গায়ে ইন্দো-জাপানী হরেক রকম রঙের প্রকৃতিকে টেক্কামারা আর্টিষ্টিক রঙের ফুলও ঝোলান রয়েছে। দেখলেই মনে হয়, এ সবই নিজেদের অক্ষম দৈন্যকে ঢাকবার জন্য যেমন আকাঙ্ক্ষা, তেমনই ফাঁকি দিয়ে ঐশ্বর্য্য দেখাবার ছল প্রয়াস, ও দেশের কাজের বায়নাক্কা দেখিয়ে চাঁদা তোলবার অজুহাত—এই তিন গুণের সরাসরি সামঞ্জস্য বিধায় পৌরাণিকী মন্বন্তরী অহিংসী সভ্যতার চরমোৎকর্ষ যে কি, তা বেশ বোঝবার শক্তি এরা দিয়েছে।

সামগ্রী অষ্টাচোভোবোস্কী।

উত্তরাস্তে বেদী মাটীর, তার উপর দশভুজার ঘাগী দেশের তরুণ শিল্পী সবাই কুমোর, অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে তবে এই মূর্ত্তি গঠন করেছে। সার্ব্বজনীন ক্রিয়াকাণ্ড। সবাই বিনা পারিশ্রমিকে ওই মূর্ত্তিটি গড়ে দিয়েছে। এতে না কি তার সার্ব্বজনীন পাব্লিসিটি হয়েছে। মা না কি স্বপ্নে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে, ঘুঘুচরার মাঠে আমার মূর্ত্তি গড়্—গড়ে গড় করলেই তোর বাড়-বাড়ন্তের অন্ত থাকবে না। সার্ব্বজনীন ডিমোক্র্যাটিক পূজার কর্ম্ম-কর্ত্তা বলেন—খড়কুটো রঙের জন্যে ওর নামে কিছু বিধে।

লেখা হয়েছে, নইলে কুলায় না, বা হিসাবে মিলান যায় না। ••

তাই মাতা এখানে সার্ব্বজনীন। মা অবশ্য মৃণ্ময়ী। বলিদানের সময় হরিজনদের বেণিয়া বাবা এসে স্পর্শ করলেই মা একেবারে ইলেকট্রিক ব্যাটারীর ধাক্কা খাওয়ার মত টাল-মাটাল খেয়ে চিন্ময়ী হয়ে সাড়া দিয়ে উঠে ষোড়শ উপচারের পান্থুয়া হাস্যমুখে খাবেন—এ না কি সকলে শুনেছে, সার্ব্বজনীনদের প্রচারকর্ত্তা তাই বেণিয়া বাবার দিক থেকে প্রচার করতে আছেন। এদিকে লবাই কুমোর

"মা আমাদের মডার্ণদের টেরছ নয়নে চেয়ে দেখছেন।"

বলে, এ মূর্ত্তি তার দেবতামূর্ত্তিপ্রকরণম্ বা রূপমণ্ডনম্ থেকে নেওয়া নয়, ধ্যানে পাওয়া জোড়াসাঁকোর ষড়ঙ্গ খট্টাঙ্গ, যা অজান্তায় সিঁধ দিয়ে পাওয়া গেছে, তারই পুঁয়ে-পাওয়া ডমরু জিনি মাঝা লয়ে—লবাইয়ের এই মূর্ত্তিরচনা। তাই মা আমাদের মডার্ণদের টেরছ-নয়নে চেয়ে দেখছেন। লবাই বলে, তার সঠিক কথা এই যে, বঙ্কিম মা যা হবেন বলে গেছেন—এ হল একেবারে ঠিক তাই—সেই রূপের রূপমণ্ডনম্। আবার এ কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যার কাছ থেকে heat-wave পেয়ে লেনিন জারে জর-জর জোরো রুশিয়াকে নয়া-রাঙ্গা করে গড়েছে, সেই তিনি, আর্টের আধ্যাত্মিকার যে তাণ্ডবরঙ্গ, তা না কি এই লবাই কুমোরকে দান করে আদিভৌতিকের শাস্ত্রের মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ফতুর হয়ে গেছেন। মা তাই দশ হাতে দশটি প্রহরণ নিয়ে, এই নয়া-ঢঙ্গের ঠাটে সিংহীর টাটে বসেছেন। তাই…

ওরে মন সদা দুগ্‌গে দুগ্‌গে নাম মুখে বল।
ভয় পেয়ে অভয়া দিবেক পদ কোকনদ॥

আটচালার অন্যদিকে বারোয়ারীর রঙ্গমাচা বানান হয়েছে। বিজলী বাতির আলোয় চারিদিক যেন দিনের মত করে তুলেছে। আবার অনেক বিজলী বাতি জলার জন্যে লোকের চলাফেরার ছায়াগুলো ভূতের মত লম্বা লম্বা হাত পা মেলে কায়ায়-ছায়ায় ধাক্কাধাক্কি হয়ে যাচ্ছে। থামের গায়ে নানা ছাঁদের অক্ষরে বাঙ্গালায় বাহার করে হাতে-লেখা নানাবিধ প্রবচন বাঁধান ঝুলছে। কোনখানে লেখা "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ"। কোন খানে লেখা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ"। কোন খানে লেখা :

কাব্যানুগ মন্ত্রী যেই খামিচিত করে।
গল্প-পুল্লালেরা শুধু তয়ে ধামা ধরে॥

বারোয়ারী-মণ্ডপের প্রবেশপথের দুধারে দর্ম্মার বেড়ার গায়ে ঝুলছে—'সাবধান পকেট-মার আপনার পাশেই আছে'। যে কেউ মণ্ডপে ঢুকছে, সেই একবার আশ-পাশ দেখেই নিজের পকেট সামলাচ্ছে। যেখানে মহিলাদের বসবার জায়গা, তার কাছের দর্ম্মার ওপর দু'পাশে আঁকা পদ্মের মাঝখানে লেখা "দেহি পদপল্লবমুদারং"। ঠিক সেই দর্ম্মার বেড়ার অন্য ধারে মনসাগাছের মত কাঁটা দেওয়া গাছের ডাল আঁকার উপরে লেখা :—

যে অলক্ত রাঙা পায়ে রাঙা শোভা ধরে।
সেই পায়ে পুরুষেরে নিপীড়িত করে॥

ঠিক সেই দর্ম্মার নীচেই বেড়ার ধারে ধারে মাটীতে মহিলাদের স্যাণ্ডাল, কেড্‌স্, বাইজী নাগরা, ক্ষুরওয়ালা স্লিপার, তুড়ুং-খোঁচা ক্লিয়োপেট্রা চেটাই রেখে মেয়েরা দেবীর চিন্ময়ী-হওয়া দেখবার জন্য পরমোৎসাহে অপেক্ষা করছেন। রামজীদাসের ভলাণ্টিয়ার দলও ঠিক তারই বরাবর আশে পাশে খবরদারী করছে। তাদের পরণে খদ্দরে কাছা-কোঁচা ভাঁজা সালাওয়ার, গায়ে

কাবলী চুড়ীদার; মাথায় মুচিয়াণা বাবরি, গালে সিনেমার জুলপী—এদিকে অনামুখো কিংবা গোঁফ প্রভৃতি কোদাল দিয়ে চাঁচা। বগলে তাদের গো-সাপের চামড়ার ভ্যানিটী কেস—পায়ে ঘুন্টিওয়ালা তুড়ুং চেটাই। তাদের চলা-ফেরার ফাঁকে ফাঁকে পড়া যাচ্ছে লেখা রয়েছে, "সেই ভাল মোদের মার বাগানের কলাপাত"—ঠিক তারই বিপরীতে লেখা রয়েছে.-Freedom first, Freedom second, Freedom last…

এদিকে রঙ্গমাচার দুই পাশে কাপড়ে আঁকা পামের গায়ে আঁকা রয়েছে বাঙ্গালা পটের নটরাজ। সংস্থাপক—রঙ্গদৃশ্যের সংস্থাপক যিনি, তিনি এসে সেই সব সাজিয়ে দিচ্ছেন। নটরাজের ভঙ্গী অনেকটা ছেলেদের তাল-পাতার মানুষের তিড়িং মিড়িং লাফের মত দেখাচ্ছে। শোনা যায় যে, এই বাংলার পট না কি গৌড়-বাঙ্গালা থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ গত হবার পর খদ্দুরে-বাঙ্গালার নিজস্ব প্রাণ থেকে বাঙ্গালার বৈশিষ্টা নিয়ে নবঘনরাত্রি রায় শিল্পী মহাশয়ের হৃদ্‌শতদল পদ্মের শুখনা মুড়ি থেকে তাব-তাপে খইভাজা হয়ে এই আদর্শে বিকশিত হয়ে উঠেছে। খই যেমন চড়-বড় করে ফোটে, এই সব নটরাজেরা তেমনই তড়-বড় করে নাচে। সবাই নোটো!

রঙ্গমাচার পুরোভাগে ভলান্টিয়াররা পাফ্ পাফ্ (pf…pf) করে বিঁড়ির খরসানী ধোঁয়ার সঙ্গে আফিম-গন্ধী হাশিশ-গন্ধী ধোঁয়া ছেড়ে, দর্শকদের দোঁয়া দেখিয়ে প্রোগ্রাম দিচ্ছে আর সাড়ে পাঁচ টকরে পয়সা আদায় করছে। আধলা তাদের কমিশন, আর পাঁচ পয়সা পুজোর। প্রোগ্রামের উপর নবঘনরাত্রি রায়ের শিল্প-সৃষ্টির অনবদ্য সাবলীল তুলিকাভ্যাসের এক তুলির টানে আঁকা "ভাঁওতালনী"। স্বেচ্ছাসেবকগণ বললেন… এ ত' কি দেখছেন মশায়। শিল্পীর চরম সৃষ্টি এই পরমা-নিবৃত্তির রূপ! পাত উল্টে দেখি · এক তুলির টানে কি যেন একটা কুষ্মাণ্ডের মত দেখা যাচ্ছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের মধ্যে একজন পরম পণ্ডিত ছিলেন, তিনি আমাদের বুঝিয়ে বললেন যে, এইটে হল তলবকার উপনিষদের যে পরমা-নিবৃত্তি আর বৃহদারণ্যকের যে অব্যাকৃত রূপ, এতে ব্যাকৃত ভাবেই তা বিকশিত হয়ে উঠেছে…এ পাশ থেকে দেখুন গর্ভাশয়ে রূপ, আর ওপাশ থেকে দেখুন শেষ কুষ্মাণ্ডখণ্ডে পরিণতি—পরমা নিবৃত্তি—শিল্পের চরম। চীনো-জাপানো চাং-চু-হাং সাহেব বলেছেন… চীনের প্রাচীরের চেয়েও আশ্চর্য্য। ঈশ্বরের লীলার এ পরম, কখন কোন আর্টে ধরা দেয় নি, রূপ নেয় নি। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম—কেন না যে আস্ফালনের সঙ্গে দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ প্রতাড়না—তাতে মেনে নিলাম সবই…ভয়ে, কিন্তু তার কিছুই বোঝা গেল না। কেন না- মুষ্টি ছুঁড়লে যে তার নিজেরই হাতে লাগবে, এই ভাবনায় আমরা কাতর হয়ে

ঘুঘু রে দাদা ঘুঘু…"

গেলাম। তারপর বললেন—এ আর্ট এখন বোঝবার সময় নয়, দু'চার হাজার বছর পরে যখন প্রলয় হয়ে আবার সব নতুন হবে, যখন সেদিনকার লোক, সেই আগামী কালে—excavate করার পর এই ভাঁওতালনীর দেখা পাবে …তখন এর ঠিক ঠিক লীলারহস্য উদ্ঘাটিত হবে। তখন এ আর্টের appreciation হবে। He is ten centuries ahead off… ইনি appearanceকে করেছেন real, আর realকে করেছেন unreal…বিশ্বসৃষ্টিতে নবঘনরাত্রির মত এত বড় শিল্পী ভু-ভারতে কখন জন্মায় নি।

স্বেচ্ছাসেবকদের এই প্রকার আর্টের interpretation শুনে আমরা সবাই বেকুবের মত খুসীতে ভরে উঠলাম।

প্রোগ্রামের পরপৃষ্ঠায় দেখলাম সাবেকী শিলালিপির ভাঙা-ভাঙা ছাঁচে নয়া-বাঙ্গালার আর্টিষ্টিক অক্ষরে লেখা "আত্মারামের বারোয়ারী"- প্রযোজক :—শ্রীমৎ রামজীদাস রামজী রাম খাঁ (of হাভানা fame), সংঘর্ষক—বেহালচাঁদ মাতব্বর (of গ্যাডাতলা fame); দৃশ্য পরিকল্পক—শ্রীনবধনরাত্রি রায়; সংস্থাপক—শ্রীঅষ্টাচোভোনোস্কা (of মস্কো fame); সুর—শ্রীভাটিয়ালাখেয়ালিয়া মুকুলপুরা. শ্রেষ্ঠাংশের নটী—শ্রীঐরাবতী তন্বঙ্গী; প্রচারকর্ত্তা—শ্রীগৌচরণ ভোঁভা ও পেন্না-দূত। এরই নীচে লাল ও সোনালা অক্ষরে ছাপা। সমালোচক প্রবর নৃত্যরায়-রাবান খাঁ কলি কলুষনাশন, পরমব্যোমচারী গদাধরী সর্ব্বোত্তম অনন্তনাদ বাচস্পতি ছন্দ-পঞ্চানন শ্রীল শ্রীগোল্লেন্দ্র গন্ধ। আমাদের বারোয়ারীর মহল্লা পর্য্যন্ত নাই দেখে লিখেছেন ..

তাই রে না রে না
　　আগেও না, পরেও না।
　এত নয় যেমন তেমন
　দোদুল দোলার রঙিন স্বপন
　বুক-কাঁচুলী উথলে বলে—না—না—না।
　　তানা নানা তানানানা—না॥
　　অগেও না পরেও না॥

সামাজিক সংস্থাপন

চারিদিকে লোকারণ্য। ভিড় ক্রমেই জমা হয়ে আসছে। মহিলাদের দিকের কঞ্চির বেড়া প্রায় ভেঙে পড়বার যোগাড়। ভিড়ের ভেতর থেকে হাঁড়িচাঁচার মত মধুর সুরে একজন কেরে রে রে চ্যাঁচ্যা করে শীষ দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মান ঐক্যতান বাদন সুরু করে দিলে। মনে হল স্বেচ্ছাসেবকদের কথাই ঠিক, প্রলয়ের সকল সুর এরা এক রকম খুঁজে বার করে নিয়েছে। জাপানের চুমকুড়ী বাঁশী, জার্ম্মানীর মিলিটারী ভেঁপু থামিয়ে আটচালার প্রবেশপথের গায়ে বাইরে অ্যামপ্লিফায়ারের মডার্ণ কাব্য-ফায়ারে গান ঘোর রবাং মহারৌদ্রতেজে বেজে উঠল—

আজ শরতে ঘাসের বনে
　　নীল আকাশের ছায়া দোলে।
ঐ নিরাকার প্রিয়া আমার
　　দোল খেয়ে যায় সবুজ কোলে॥

তারা ধরেব রাগিণী সুর—কেঁদে পেত্নীরা না কি অমনি নাকিসুরে ও করে সুর টেনে টেনে লম্বা করে গায়—হিমাচলের বাতে। গান চলল পথ থেকে ক্রমেই ভিড় বাড়তে লাগল। হঠাৎ একজন লোক মহিলাদের বসবার জায়গার পাশ থেকে হাঁক দিলে—আমরা সব হরিজন। হরিজন। চালাও চণ্ডী! ও নাচ, নড়, নড়ে চালাও চণ্ডী। ত্রিগণে সদা ভকারিণী। ডাকিনীর-কজ্জ প্রসাধনী, নাগনখরাখিনী—কেটক খর্পর ধারিণী প্রসাদ প্রসাধনং কুরু চলল ত্রিগণার চণ্ডী—চলল ত্রিগণার চণ্ডী·

··হল নাড়ুদত্ত চণ্ডী পাঠ করছে· ··
　নমঃ কস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ তস্মৈ নমঃ নমঃ
　যা দেবী সর্ব্বভূটস্য রসরূপেন সংস্থিতা
　ভয়ং দেহি ক্ষয়ং দেহি লয়ং দেহি কীশো জহি॥

'বিড়িং' 'বিড়িং' বিড়িং' ইলেকট্রিক ঘণ্টা বাজতে লাগল।

বসে যান, বসে যান, বসে যান, সব বসে যান· চলল চণ্ডীর বারোয়ারী

একটা জায়গায় বসতে যাব, এমন সময়ে মনে হল, কে যেন গা টিপলে—ফিরে দেখি আমাদের কমলা দাদা।

—দাদা যে, তুমিই এই বারোয়ারী দিয়েছ না?

—না না—বঙ্কিম আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। শোন্‌-আমার সঙ্গে আয়—ওই দেখ কারা সব এসেছে বারোয়ারী শুনতে।

—কারা? কই?

—আমি তোকে ছুঁলেই দেখতে পাবি।

তাকিয়ে দেখি—রামমোহন, বঙ্কিম, গিরিশ, দ্বিজু রায়· ওদিকে রাসবিহারী ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। তার ওধারে গ্যেটে, ইবসেন, স্পেংলার, কালমার্ক্স, লেনিন। তারও ও-পাশে বসে আছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ—ঠিক তারই পিছনে বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

—এঁরা সব দেখতে এসেছেন?

—হ্যাঁ শোন্, এই হবিগ্নাল পাখীর দুটো পালক তোর জন্যে বঙ্কিমের কাছ থেকে ধার করে এনেছি—কাণে গুঁজে রাখ।

—হরিয়াল পাখী কি ?

—ঘুঘু রে দাদা। ঘুঘু। নে চ, তাকে ওই লেনিনের পাশেই দিই, তোরা সব মর্ম বি না—আর আমার সঙ্গে আয়।

কমলা দাদার সঙ্গে গিয়ে লেনিনের পাশে গিয়ে বসলাম। লেনিনের চাঁচা ও ছাটা মেলান ফ্রাঙ্কো স্লাভো দাড়ি, প্রকাণ্ড কপাল, দেখে মনে হল, হাঁ—কপালে পুরুষ বটে।

প্রথমে অর্কেষ্টার সুর বাজতে লাগল। ব্যাণ্ড মাষ্টার তাঁর সেই তাল দেবার ছড়ি নিয়ে বললেন যে, হে সামাজিকগণ। আপনাদের অবগতির জন্য বলে দিই—এই সুরের নাম রাতজাগানীর ভাই সুর-এ সুর শুনলে আর দিনে রেতে ঘুম থাকে না-ঘুম পায় না।

আবার কিড়িং · কিড়িং কিড়িং প্রথম যবনিকা উঠল।

(রামর্জী দাস রামজীরাম গাঁর প্রবেশ ও নান্দীপাঠ)

সৃষ্টির যিনি আদি, আগে তাঁরেই করি নমস্কার।
ক্ষ্যাপলা জালে লুটব টাকা তাই খুলেছি কার বার॥
রাম-রাবণের যুদ্ধ, এ নয়, শুধু সহজ ত্যাগ।
তোমরা কিছু দিলেই আমার ভরবে মনিব্যাগ॥
মামার দেনা দিতেই হবে, দিতেই হবে টাকা।
নয়, ভেজাল খেয়ে দেখতে হবে এই দুনিয়া ফাঁকা॥
—কই হে নাড়ুদা নিয়ে এস ··

দর্শকদের মধ্যে থেকে এক দল (claque) মাইনে করা হাত তালিওয়ালা—বুড়ো অভিনেতা, যাদের পিঁজরা-পোলে যাবার সময় হয়েছে—তারা করতল চটচটা-ধ্বনিতে মুখরিত করে বলে উঠল :

—বেশ বলেছ, খুব বলেছ, একসেলেন্টো, ইনকোর, ইনকোর।

রামজী—(নৃত্যের ভঙ্গীতে—অশ্বপৃষ্ঠে চড়ার মত দুই-পা ফাঁক তাল দিয়ে) এখন তা হলে বারোয়ারীর প্রথম খেল আরম্ভ হোক,—শুন অহে সামাজিকগণ···

··· ···

শুন অহে সামাজিকগণ
বুড়ার ম্যাজিক খেলা দেখেছ কখন ?

বুড়া হয়ে ছোঁড়া সেজে আমি বার্দ্ধক্যকে ত্যাগ করে যৌবনকে রাজটীকে দিয়ে—ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। এক মহাজন মহাপুরুষপ্রবর বলে গেছেন গীতাই শ্রেষ্ঠ—অর্থাৎ গীতা—গী তা—গীতা—উচ্চারণ করলেই, তা থেকে অনাহত ধ্বনি জেগে ওঠে ত্যাগী ত্যাগী—ত্যাগী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বানান অনুসরণ করুন—দেখবেন শব্দটা তাগী—তাগী—তাগী, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে তাগ করেই আছেন,

শ্রীমতী ঐরাবতী ত্রিভঙ্গী।

তিনিই তাগী। মহাপুরুষপ্রবরের মতে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই চরম ও পরম ত্যাগ, সেই জন্য আমরা ও দুইটিকে তাগ করেই আছি,

জয় জয় রামাগুরু বাঞ্ছাকল্পতরু।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ দিব্য পোষা গরু॥
জয় রাম হরি শ্যাম জয় সবাকার।
সবার কৃপায় হোক টঙ্কা ঝনাৎকার॥

...

বল বাম হবি শ্যাম যাদুকী জয় !

—জয়—জয় ।

নাট্য পর্ব্ব

বামজী ।—ভো ভো সামাজিকগণ ! আপনাবা সকলেই অবগত আছেন যে, নটবাজ সকল নাটেবই গুরু আজেন দিনে কিন্তু নটবাণাই গুরুর্ন্নিণী...তাই আপনাদেব চিত্ত সন্তোবৃত্তি চিত্ত-প্রসাধন ও চিত্তবিকাব প্রশমন কবতে নট বাণীব হেমন্তেব ঝাঁপতাবি নৃত্যই প্রকৃষ্টতম। বৈবাগ্য সাধনকল্পে আমবা তাই সকল হৃদয়হাবিণী নত্যেব আয়ো-

'ওরে পোদো এ সব কি হচ্ছে ?'

জন কবেছি। এক্ষণে নৃত্যশাস্ত্রোক্ত লক্ষণযুক্তা নর্ত্তকী মাযা দর্শীব নৃত্য আবম্ভ হবে। ...অধুনা সম্প্রতি যে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী মহান্ অবতাবেব শ্রীশ্রীমন্দিব প্রতিষ্ঠা হবে, তাবই অর্থেব তেবেজুবি ভবাট কবাব জন্য—আমবা কুমাবী-নৃত্যেব স্বরূপ দেখাতে প্রস্তুত হয়েছি। কুমাবী-কামিনী-নৃত্যই কাঞ্চনগ্রহণেব সমুদ্দিষ্ট পন্থা। তাগ আমবা ঠিকই কবেছি। অতএব, হে তাগ-বেতাগকাবিণী বম্যা-প্রথিত-বিশ্রান্তি-উবস-সমুন্নতকাবিণী নটবাণী শ্রীমতী ঐবাবতী রঙ্গী সতী! যদি তোমাব নেপথ্য বিধান অবসিত হয়ে থাকে, তবে অনতিবিলম্বে তোমাব নৃত্যপবা ঝামব-দেহা

নিযে আইস—চতুর্দ্দিকে অভিরূপ ভূযিষ্ঠ সামাজিকগণ উপবিষ্ট, তাঁবা তোমাব পর্য্যাসিত কপোলাদিনী তাগ-বেতাগ নৃত্য দেখে, মাযেব জন্য আনন্দেব মূল্যে কাঞ্চন ত্যাগ কবতে অনুপ্রাণিত হবে বৈবাগ্য সাধনে তৎপব হউন।

(ঐবাবতী তবঙ্গাব প্রবেশ ও তাগ-বেতাগ নৃত্য)

আজি এসেছি, আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে
নিয়ে বোলা ঢোকযাব মান।
আজি তোমাব বিষ্টি খ্ঁতে, এনে দাও নাব কাছে
আমি কবে বব সব দান ॥
...
বাখ বোল ঢোকযাব মান।
আমি কবে বব সব দান ॥

তবঙ্গা— তনবাব কাঁসহন্তান বলে বলে—

তথা শ্যামা বিচলসাদৎ বস্তমুক্ত দ্বিতীযম—না হওনে তত্নমধ্যা প্লাবনং। সামাজিক দর্শকগণেব চিত্তপ্রসাধনে বৈবাগ্য উপলিত হওযান ত্যাগধর্ম্ম অনুশীলন কবণে তাঁদেব মজ্জাগত অভ্যাস থাকায় তাঁবা নিঃশ্বাস শব্দেব সঙ্গে উস খুস কবে উঠলেন। অমনি claque এব দল হাত তালি দিযে উঠল।—বাহবা! বাহব! বহুত আচ্ছা—বহুতী আচ্ছা—

দেখলাম তবে এ বাব সবকাটা টিকেটা বেশ পড়তে লাগল। ওদিকে কান পেতে শুনলাম—

বামমোহন—এই কি প্রকাব ব্রহ্ম সাধন হইল—ভব-বোগ বৈদ্যদিগেব এই কলাট প্রথা নহেক। অহে দেবেন্দ্র, একেশ্বব-বাদ প্রবর্ত্তন কবাই বিধেয আছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্র—আজিকাব দিন বাজা অতি ভযঙ্কব।
অন্যে বাক্য কবে মোবা বব নিরুত্তব ॥

ওদিকে গিবীশ ঘোষ বিবেকানন্দকে মাথায় চাঁটি দিয়ে বললেন :

—ওবে পোদো, এ সব কি হচ্ছে ?

বিবেকানন্দ—ঘোষজা। তুই গিবিশ ঘোষ ঠাকুব হযে গেছিস, তোব আমাব পুণ্যি পেবকাশ হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বঙ্গমাচার্য্য এক ঝাঁক ক্ষীণমধ্যা দেখা গেল। তাবা আঙ্গিক, বাচনিক, সাত্ত্বিক, কামিক, মাবণিক

যত প্রকারের 'ইক' আছে, তার ছন্দ-আন্দোলনে নৃত্য-সহিত গান আরম্ভ করলে।

বঁধু তোমায় করব রাজা
শ্যাওড়া মূলে।
পরমার্থ শিক্ষা দেব
পটল তুলে॥
রাগ অনুরাগ ভরা
ইহকালে রবে মরা
সকল ভুলে।
দেহ মন ভাঙা ভাজা, পরকালে হব তাজা
খাবে গজা মণ্ডা খাজা
দেবে অপ্সরী তুলে—
এক দিলে দুই হয়, ঠাকুরের নামে জয়
পদধূলি মেখে দেব
কপালে গুলে।
করব তোমায় রাজা শ্যাওড়া মূলে॥
(বিশ্রামের যবনিকা পড়ল)

তখন কান পেতে শুনতে লাগলাম—

বিবেকানন্দ—most excellent Theophilus—ওরে ব্রহ্মবন্ধু—সাত ঘাটের জল খেয়ে তুই ফিরে বামুন হবি বলে এসেছিস না—কালীঘাটে?

উপাধ্যায়—হুঁ! দেখে শুনে মনে হচ্ছে এবার গিয়ে চাঁড়াল হব।

বিবেকানন্দ—এরা সব দশনামী তার খবর রাখিস?

উপাধ্যায়—এরা সব বদনামী আর বেনামীর দল—সব পরমার্থিক দেউলে—আর্থিক কষ্ট ঘোচাবার কল করেছে, জাত-ভিখিরীর দেশ—ওঃ।

বিবেকানন্দ—ধর্ম্মটা এরা ব্যবসা করে নিলে—

উপাধ্যায়—কবে থেকে ব্যবসা ছিল না? আর এবারে তুমিই ত এর গোড়া।

বিবেকানন্দ—না খেতে পেয়ে দেশটা মরতে বসেছিল, তাই—

মহর্ষি—তাই তাদের বাঁচানর অষুধ বুঝি এই সন্ন্যাস?

বঙ্কিম—কি কুক্ষণেই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ লিখেছিলাম সব ব্যাটারা দেখছি বেশ আনন্দ করে নিলে হে!

রামমোহন—বঙ্কিম! যেহ রেনাঁ-কে গুরু করিয়া কৃষ্ণ-তত্ত্ব লিখিলা, এহ ত সে তোমার একেশ্বর-বাদ গ্রহণ গ্রাহ্য করিলেক না—এবঞ্চ বরম্ দেখিতেছি অবতার ও অবতারী লইয়া নূতন অনেক ভবরোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বঙ্কিম—(মাথা চুলকাতে চুলকাতে) এহ মূর্খ জন-সম্প্রদায়—এ আপনকার ন প্রতীকে সঃ বুঝিবার শক্তি রাখে না।

"তোর আমার পুণ্যি পেরকাশ হচ্ছে!"

হঠাৎ শুনলাম, কার্লমার্ক্স বলে উঠলেন—Religion, thy name is exploitation, ধর্ম্ম! তোমার আর নামরূপ হল- লোকের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে লেনিন বলে উঠলেন:

—Religion is the opium of the people, ধর্ম্ম হল আফিম, আফিম, মানুষগুলোকে নেশা ধরিয়ে দেয়।

কমলা দাদা দুঃখ করে বললেন: শুনলি এরা আফিমের নিন্দে করে—অ্যাঁ!

আহা! রাতদিন দিনরাত
আফিম মৌতাত
খেয়ে শুধু চিৎপাত
উৎপাত ব্যর্থ;

স্বাধীন কি পরাধীন
ভাববে না কোনো দিন
শুধু চিনি-দুধে দিন
সেই পরম-অর্ঘ্য।

এমন সময় আবার কিড়িং—কিড়িং—কিড়িং—বেজে উঠল। বিশ্রামের যবনিকা উঠে গেল। আবার আলো জ্বলল—ছোঁড়ারা চীৎকার করতে লাগল—পান বিড়ি—পান বিড়ি—সিগারেট—পান বিড়ি—চকোলেট ··

···　　···　　···

মণ্ডপের বিজলী বাতি জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে দেখি রঙ্গমাচার পুরোভাগে বহু মহাজন বসে আছেন—ও বেণিয়া বাবা, ডায়মণ্ড সোসিয়ালিষ্ট, ব্রহ্মাচার্য্য—ও হরি, আমাদের ভানু সিংহও!

"এ রেনাকে গুরু করিয়া", ধর্ম্ম তোমার আসল নাম রূপ হ'ল", "আফিম, আফিম, লোকগুলোকে"।

দেখে ত অবাক। কমলা দাদা বললেন: দেখ না দেখ - মজা হবে দেখ।

(রামজীদাস রাম ধীর মন্থর গতিতে মাচায় এসে
আবার দাঁড়ালেন।)

রামজী- ভো ভো সামাজিক মহোদয়গণ—আপনাদের অনুমতি পেলে, আমরা আমাদের দেশের কৃতী সন্তানদের পদবী-সম্মান দান করার যে আয়োজন করেছি, সে অনুষ্ঠান এখন আরম্ভ করি। সেইজন্য আমরা ভানুসিংহ মহোদয়কে আমন্ত্রিত করেছি।

মণ্ডপ থেকে সমস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠল: তথাস্তু এবম্ ভব।

রামজী—আসুন ভানুসিংহ মহোদয়—আপনিই একমাত্র মনীষী যিনি এই পদবী-সম্মান হাতে করে দিলে—এঁরা সকলে অনুপম লাবণ্য-জড়িত আনন্দে অবলগিত হয়ে যাবেন। পদবীর সাদৃশ্য উদ্ভাবন হেতু পরম রমণীয় প্রস্তাবনাই হবে।

ভানুসিংহ মহোদয় তখন রঙ্গমাচায় গিয়ে উঠলেন। রামজীদাস প্রথমেই ভানুসিংহ মহোদয়কে দুটি নীল শালুক ফুল দিলেন। পরম উৎসাহে ও পরম হর্ষে আকুলিত হয়ে ভানুসিংহ মহোদয় সজল জলদাক্রান্ত চোখে বললেন:

কত কত রভসে　　জনম গোঙায়লুঁ
বুঝলুঁ সবহুঁ সে কেল।
কনক কমল কত　　কতয়ে সে মিললুঁ
অবহুঁ গো শালুক ভেল॥

দর্শকগণ সকলে ধন্য ধন্য করে উঠল।

রামজী—ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং···

ভানুসিংহ মহাশয় তখন এক এক করে ডাক দিলেন:

বেণিয়াবাবা!
দে পাক, দে পাক বাবা,
দে পাক, দে পাক,
সুতোর আগুণে যেন পুড়ে
হয় খাক—সব পুড়ে হয় খাক।
স্বরাজের এই ফাঁক
সবার লেগেছে তাক,
কলির এ জয়ঢাক
বাজে তাকসিন তাক,
খোবাল মাথায় সব পড়ে যাবে টাক।

দে পাক দে পাক বাবা দে পাক দে পাক,
বুটের লাথির শোধ
দিয়েছ তুমি সে যোধ
বেণিয়াকে বেচি এক হাটে।

বেণিয়ার বাবা তুমি
পেয়ে সেই ঝুম্ ঝুমি
দেশবাসী মারা গেল মাঠে॥

মড়ার পাশেতে বসি
বেশ করে দিলে কসি
ক্যাওড়াতলার সেই ঘাটে।

শ্রীচিত্ত পাজীব ধাড়ী
গেছে সে যমেব বাড়ী
ভেঙ্গে দিলে বাঙ্গালাব নাক

"অবচ্ছ" সো শালুক ভেল।

নিমকহাবাম দেশ
হিংসাব নাহি লেশ
ঠেটি-পবা গোলন্দাজ বীব।
নুনেব গামলা জ্বেলে
স্ববাজ আগুন খেলে
বাজা হলে ন্যাংটা ফকীব॥
তুমি হলে অবতাব
ছোঁড়াবা ডুবেব বাব
মুক্তি হল জেলেব গবাদে।
তকলি ঘোবাও যদু
পেযেছ স্ববাজ-কদু
মিলে গেছে শিবী-ফবহাদে॥
বেণিযাব বাবা নাম
অতি শান্ত গুণধাম
পদবী সে বেণিযাব বাবা।

মেবে যাও চাপ্পড়
গালে মুখে থাপ্পড
আমবা যে কতখানি হাবা॥
তোমাবে দিলাম তুলো
এবা সব বড় ভুলো
তুমি শুধু তকলীতে দিযে যাও পাক
গাজাজে আজাজ হোক
বীবলাব ফতে হোক
হবিজনে থাক শুধু পাক
তকলী ঘুবিযে শুধু দিযে যাও পাক
বাবা, দিযে যাও পাক॥

ইতি প্রথম পদবী বিতরণ। অতঃপর ‥

ডায়মণ্ড সোসিয়ালিষ্ট !

ষোল ঘোড়াব বথে চড়ে নাগবা-বাঙা চবণ ফেলে
উদয হল কলকেতা সহব।
সমাজ তাঁতেব বড় তাঁতী স্ববাজ-জালেব বড় হাতী
একখানি জহব—
ওরে একখানি জহর।

"ইটনের পল কাটা বিস্তের বহর।"

সোসিযালিজ্‌ম ডিমোক্রেসী
তাব পিছনে যত 'ক্রেজী'
ফিবেব পিছে বাবই যেমন

পালায় ছেড়ে ঘর,
তোরা হুমড়ি খেয়ে মর।
দেখছিস নি দেবতা এল সবাই এবার স্বরাজ পেল
তোরা নিশেন তুলে ধর
ওরে একখানি জহর॥

*

Comrade, come red যে যেখানে আছ red
raid কর শুধু হাত-পায়—
ভেঙে দাও জমিদারী ভেঙে যাবে জুরি জারী
দানাপানি যেন নাহি পায়।

"রমনা-মাঠের ঘাসের ডগায় আচার্য্য প্রবীণ।"

খাসা সে সোসালিজ্‌ম্ বাজাবে গিজতা গিজম্
খচা খচা খচা খং—
খচা খং খট্।
ষোল ঘোড়া হেঁকে যায় উড়ে ধূলা লাগে গায়
কি আপদ্ বুর্জোয়া
হট রে হট্!
সাম্রাজ্যবাদের শেষ টেঁকুরে হবে নিকেশ
মেকুরের দান বড় পড়েছে জবর
সেলাম! সেলাম সাব
জহর! জহর!!

Claque-এর দল মহাসমারোহে হাততালি দিয়ে ঘোর গোল করে উঠল

ভানুসিংহ মহাশয় তখন তাঁর সেই স্বাভাবিক অনু-নাসিক বংশীর তীব্র সুরে বললেন:

—ওহে সভাসদেরা, একটুখানি শান্ত হও, শান্ত হও… ধৈর্য্য ধর বার্ত্তাকুর চাষে দ্রাক্ষা ফলে না। বেগুণ ও দ্রাক্ষা এক নয়। আমরা ডায়মণ্ড সোসিয়ালিষ্টকে যে পদবী সম্মান দান করছি, তার শ্রীপাঠ এখনও শেষ হয় নি—অতএব শোন:

মথুরার তীর হতে প্রয়াগের তীরে।
এসেছ আবার দেব কত গুণ নিয়ে॥
তোমারে ঘেরিয়া ফের ধর্ম্মরাজ্য এল।
এ মলেচ্ছ দেশ শুধু রসাতলে গেল॥
তুমি দেব ডায়মণ্ড পাকা সে জহর।
ইটনের পল-কাটা বিদ্বেষ বহর॥
তোমার জলুসে পাপ হয়ে যায় লয়।
বেণিয়া বাবার বাবা, হোক তব জয়॥

ইতি দ্বিতীয় পদবী বিতরণ। তৎপর

রম্নাচার্য্য!

সাপে কাটা ছুঁচোয় যেমন
কামড়ালে প্রাণ যায়।
তোমার বিষে জরে তেমন
(নর) সামলান হয় দায়॥
খুব কেরামৎ বান্দা, তোমার
সেলাম, সেলাম তিন।
রমনা মাঠের ঘাসের ডগায়
(হলে) আচার্য্য প্রবীণ॥

ইতি তৃতীয় পদবী বিতরণ।

ভানুসিংহ মহাশয় তখন খুরফাঁক তালে ঘা দিয়েই তাল ফিরিয়ে সুর ধরলেন…

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
(কেন) গোল্ নলচে বদলে বামুন
(গণে) বুড়ীগঙ্গার ঢেউ
কেন বাঘের পিছে ফেউ।

আবার চোরের পিছে ধেউ।
কেন নর্কার হয়ে ফুকারি উঠে
নোবেল—নোবেল মেউ ॥
কেন বেরালে খায় দুধ আর ইঁদুরে খায় খুদ
কেন আফিমে ব্রাণ্ডীতে প্রাণ
হয়ে যায় বুঁদ
আসলের চেয়ে দাম যে বেশী
পেলে সুদের সুদ ॥

কান পেতে শুনলাম— .

চিত্তরঞ্জন—এদের রকমটা কি ?—আমি চেয়েছিলাম দুঃখ দূর করতে—আরে আমি কি পলিটিক্স চেয়েছিলাম—এরা না জানে শাঠ্য—না আছে প্রাণ—

রাসবিহারী—I say চিত্ত, the man who has got no vice,—is a dangerous man, I tell you. Look at that man, he is splendidly terrible—তুমি গিয়েছিলে এর সঙ্গে কারবার করতে—

চিত্তরঞ্জন—কাপট্য আমার ধাতে সহ্য হয় না, আপনি ত জানেন। আমি যেটা ভুল করে এলাম এরা তাকে শোধরাতে পারলে না—সব ওই বেণিয়ার হাতে ছেড়ে দিলে। এখন সবাই গলা টিপে দেশটাকে মারছে—

ওদিকে হঠাৎ ভানুসিংহের গলা শুখিয়ে উঠতে তিনি থেমে গেলেন। রামজী দাসকে কি বললেন—শোনা গেল না।

দর্শকগণ সকলে হৈ হৈ করে উঠল। কেউ বললেন—আমরা সঠিক বুঝলাম না আপনি দয়া করে বুঝিয়ে দিন।

ভানুসিংহ—আপনারা ক্ষণেক বিশ্রাম করুন। আমি পরে সব ব্যাখ্যা করে দেব। এই বলে তিনি গেলাস-ভর্ত্তি আনারসের সরবৎ চুমুক দিতে লাগলেন ওদিকে তখন কান পেতে শুনলাম—

গ্যেটে—What are they aiming at ? এরা সব কি লক্ষ্য করে বলছে—মনে হচ্ছে খানিকটা সং-না কি ?

স্পেংলার—This is decadent, Faustian Civilization, এমনি করেই শেষ কালে decay হয়—এরা coward—অত্যন্ত কাপুরুষ, তাই সব তাতে ideal খুঁজে বেড়ায়—এটা জাতির ধ্বংসের বিশিষ্ট লক্ষণ।

গ্যেটে—হ্যালো স্পেংলার, you bald-headed blessed blockhead. এটা Faustian Civilization নয়, বুঝলে, এরা—জেনেও ভুল পথে গিয়ে পড়েছে—এরা অবতার মানে, এদের এখনও pariah রয়েছে দেখছ না—

বঙ্কিম—গয়টে দাদা, এদের সব গয়টে রোগে ধরেছে—তাই ওদের চোখগুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

দ্বিজু রায়—এ যেন একটা জলোচ্ছ্বাসের, যেন একটা বুদ্‌-বুদের—যেন একটা ঘোলা জলের, যেন একটা পাঁকের নর্দ্দমায়, যেন একটা দুর্গন্ধভরা বুদ্‌-বুদ কাটছে। চাটুয্যে মশাই, এ লোকটা কিন্তু তোমার সিংহাসনে মৌরসী-পাট্টা নিয়ে ফেলেছে।

"ইনকেলাব জিন্দাবাদ—ভিভ্‌ লা রেভল্যুসিঁয়া।"

বঙ্কিম—দ্বিজু, দিল্লীর তক্ত-তাউসের গদী খালি হলে একদিন এক বেটা ভিস্তি বসেছিল। ভিস্তি নিজের পুকুরের জল পায় না, পরের ইঁদারার জল নিয়ে পথ ছড়ায়—পথ ভেজে না ধুলো ওড়ে। বাবার কালে সিংহাসন দেখলে কবে যে সিংহাসনে বসবে—আবার তক্ত-তাউস। নে নে থাম, রাঙ চিত্তিরের আগে সঙ্গে জলবিছুটী দিলে তবে সোজা হয়।

ইবসেন—If you don't mind বঙ্কিম—আমি চেয়েছিলাম মানুষের মুক্তি—এরা বুঝতে না পেরে তা নিয়ে "বউয়ের চিঠি"—আর তোমার দেশশুদ্ধ লোক লেগে গেল ঘর-সংসার ভাঙতে। আমার দেশে যেটা problem, এ দেশে যে সেটা নয়, এর tradition আলাদা, এ তোমরা

এদের বোঝাতে পার না। এ ফাউষ্টীয়ান সভ্যতাও নয়—কিছুই নয়—না বুঝে কেবল নাচানাচি করছে।

বঙ্কিম—হে বিরাট গুম্ফহীন শ্মশ্রু-সমন্বিত উত্তরাদেশের মহামানব! এদের বোঝালে এরা বোঝে না—কিন্তু তোমাদের ওই 'ফষ্টীয়ান' সভ্যতায় রাইন নদীর গতি দেখেই ত বাঙ্গালা দেশ এত 'মিষ্টিয়ান' হয়ে পড়েছে—যত পেরেছ করেছ কেতাবী ব্যবসা—আমরা যেমন চাষা, তাই এই চতুর্ব্বর্গ-পাপের ওপর আবার তোমাদের কেতাবের ভাষা আর তোমাদের 'ফষ্টীয়ান' বিজ্ঞান এসে ফাঁদ পেতে

"আনমনে তকলি ঘোরাতে লাগলেন আর সুতো কাটতে লাগলেন।

বসেছে। যে কেতাবী ছেলেদের তসবির খাড়া করেছ—ছোঁড়ারা যে তাতেই মরে আছে—এখন করি কি?

গ্যেটে—হ্যালো বঙ্কিম! তা নয়, তোমাদের মসদানবী সভ্যতা ছেড়ে—এ নিতে গেলে কেন—

বঙ্কিম—আমাদের পোড়াকপাল—দাদাঠাকুর! কপাল! কপাল!!

গ্যেটে—Fate is accursed Mephistophelian—the eternal deities; did they hold the mastery?

এমন সময় বাইরে একটা ভয়ানক গোল ও কলরব উঠল—

"ওরে ভাই আগুন লেগেছে ঘরে ঘরে ডালে ডালে ফুলে ফুলে চালের বাতায় যে।"

ভানুসিংহ—কি ব্যাপার ?

শোনা গেল কয়েক শত লোক "ইনকেলাব জিন্দাবাদ", "ইনকেলাব জিন্দাবাদ" বলে চীৎকার করছে—*Vive la Revolution.*

ভানুসিংহ কেঁপে উঠলেন, বললেন : ওহে রামজী [দাস গাঁ—শোন শোন, এ কি ! ও কি Red-রা raid করতে এল না কি ?

রামজী—আজ্ঞে ওরা বলিদান দেখতে এসেছে—রেড কি না !

অ্যাঁ—আমি রাজনৈতিক নই,—আমি রাজনৈতিক নই।

বেণিয়া বাবা কোন উত্তরই দিলেন না। মুখে ঠোঁটের ফাঁকে একটু বিষাদের হাসির রেখা টেনে চোখের চশমা নাকের ওপর নামিয়ে—আপন মনে তকলি ঘোরাতে লাগলেন আর স্থতো কাটতে লাগলেন।

কার্ল মার্ক্স—What a fun, see those poor chaps

লেনিন—This is not revolution, Marx. It is Peter repeating Peter—it does never come

"(ওরা) ছাগলার বদলে চামড়া দিলাম...তাক্ ডুমাডুম্ ডুম্।"

লেনিন—Strange ! is this Red ? যারা এত চেঁচায় —তারা রেড ? They are veritable bourgoisie in the mask of proletariat. কর্ম্মহীন অক্ষমতা ! শুধু চীৎকার করে আর কিছু করতে পারে না।

ভানুসিংহ—

এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
(ওই) এসেছে রে তারা এসেছে···

—ও বেনিয়া বাবা ! কি হবে ! অ্যাঁ কি হবে ! পদবী সম্মান বিতরণ করতে এসে—আমার এ কি বিপত্তি !

out of their own soil—as in my country এ মাটি থেকে জন্মায় নি·· এ কলমের চারাও নয় · বাজে ব্যাপার—ধার করে ফতুর।

এমন সময় কতকগুলো ছেলের দল দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল · রামজীদাস তাদের বাধা দিতে গিয়েও পারলেন না—

ওরে ভাই, আগুন লেগেছে ঘরে ঘরে,—

ভানুসিংহ—আহা, তোমরা সব শোন শোন ..ওই

বিশ্বভারতীয় শ্রীদুর্গা-কল্পনা

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

প্রাচীন শিল্পাচার্য্যেরা ভারতে তিনটি প্রধান শিল্প-[illegible] প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় লেখক তারানাথ এই তিনটি ধারাকে লক্ষ্য করে যথাক্রমে পশ্চিম ভারত, মধ্যভারত ও প্রাগ্‌ভারতীয় রীতির উল্লেখ করে গেছেন। এ সমস্ত রীতিতে দেশগত সুষমা ও অর্চিঃ লক্ষ্য করা যায়। কারণ ভারতের নানা জায়গায় বিশ্বভারতীয় শীলতার ঐক্য লক্ষ্য করলেও জাতি, বংশ, রক্ত ও সাধনার সহস্র চিহ্ন নানা প্রকার আকর্ষণ ও বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে দীপ্যমান হয়।

দুঃখের বিষয়, নৃতাত্ত্বিকরা ভারতের বহুকোটি লোকের ভিতর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেও রূপশিল্পের প্রসঙ্গে তা' কি ভাবে ফলিত হয়েছে—আজ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত তা আলোচনা করতে সাহসী হন নি। যতটা হয়েছে তা' একান্ত লঘু ও তরল। ভারতীয় দেববাদের নানা দেবতা ভারতের কোথায় কি ভাবে মর্ম্মরীভূত হয়েছে, তা' কেউ ভাল করে তলিয়ে দেখেন নি। পশ্চিমে যীশু-মূর্ত্তি নানা শিল্পীর হাতে নানা বৈচিত্র্য লাভ করেছে। স্থান ও কালভেদে সমাজের ভিতর নানা পার্থক্য এসে উপস্থিত হয়। তাই এ দেশেও মূর্ত্তিকল্পনায় মৌলিক ঐক্য থাকলেও রসগত শ্রী উদ্ভাবনে ভারতের নানা প্রদেশে নানা রকম বিশেষত্ব ফলিত হয়েছে। শ্রীদুর্গা ভারতীয় দেবমণ্ডলের অন্যতম প্রধান দেবতা। শাস্ত্রের উক্তি গ্রহণ করলে, সকল দেবতার শক্তি তিল তিল ভাবে গৃহীত হয়ে মহাদেবী বহু-প্রহরণধারিণী কল্পিত হয়েছেন। এরূপ অবস্থায় সকল দেশেই মহাদেবীর মর্য্যাদা প্রচুর এবং ভক্তও যথেষ্ট। এ জন্য মহাদেবীর যে সমস্ত প্রতিমা নানা যায়গায় রচিত হয়েছে তা'তে প্রত্যেক দেশেরই প্রাণশক্তি ফলিত হওয়া স্বাভাবিক। রূপকল্পনা সকল দেশের সভ্যতা ও শীলতার আবেষ্টন ও প্রকৃতিগত মর্ম্মব্যথাকে উদ্ঘাটিত করে থাকে।

যবদ্বীপ (দশম-একাদশ শতাব্দী)

প্রতিমার সৌন্দর্য্য অনুধাবন করতে হলে যবদ্বীপে[illegible] রচনার কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। ভারতে[illegible] একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের বাণী ও রূপকৌলীন্যের ধা[illegible] গ্রহণ করে যে সমস্ত শিল্পী যবদ্বীপে যান, তাঁদের কৃতি[illegible] ছিল অসাধারণ। রূপহিল্লোলে বিচিত্র ভঙ্গীর বহুমুখী ছন্[illegible] উদ্ঘাটিত করতে যবদ্বীপের শিল্পীরা বিশেষ ওস্তাদ ছিলেন শারীরিক সুষমার মার্জ্জিত মহিমা সঙ্গত হয়েছিল অ[illegible] নিপুণ স্বভাববাদের প্রেরণার সহিত। যবদ্বীপের মূর্ত্তিতে উদ্ভট আতিশয্য বা উৎকট অত্যুক্তি নেই। কাজেই শ্রীদুর্গা[illegible] মূর্ত্তি রচনাতেও একটা সংযত কারুতা দীপশিখার ম[illegible] সমুজ্জ্বল হয়েছে। মহিষমর্দ্দিনীর ভূষণমণ্ডিত দেহশ্রী[illegible] লালিত্য সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ যোদ্ধার ভঙ্গী গ্রহণ করে নি[illegible] একান্তভাবে ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করতে সস্মিতভা[illegible] মহাদেবী দণ্ডায়মান আছেন শাস্ত্রের সমগ্র লক্ষণ ও উপাদা[illegible] নিয়ে। আদ্যোপান্ত দেহের বিচিত্র রূপভঙ্গীর সম[illegible] সংগ্রহ নিয়ে দেবী ভক্তদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক[illegible] দণ্ডায়মান। মহিষাসুর-বধের উপাখ্যান অতীতের ব্যাপা[illegible] মাত্র, বর্ত্তমানের নয়। তাই সেই ব্যাপারকে মুখ্য করে তোল[illegible] হয় নি। বস্তুতঃ ভূষণ প্রভৃতির এরূপ সুন্দর সমন্বয় অন্য[illegible] পাওয়া দুর্ল্লভ। যবদ্বীপের শিল্পী ভারতের রূপচর্চ্চার চ[illegible] ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান করতে উৎসাহি[illegible] হয়েছেন এবং দুর্গার নানা ভঙ্গীর মূর্ত্তি তৈরী করেছেন।

এলোরা (সপ্তম-নবম শতাব্দী)

অপরদিকে এলোরার অষ্টাদশভুজারূপী মহিষমর্দ্দি[illegible] এক প্রচণ্ড সংগ্রামে মত্তরূপে কল্পিত ও রচিত হয়েছে[illegible]। সিংহবাহিনীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মহিষাসুর নিধনে [illegible] ক্ষিপ্ত সমগ্র মুখশ্রী সমরকৃত্যে উদ্বেলিত। রক্তাক্ত নাটকে[illegible] সীমান্তের ভীষণতা যেন রূপান্বিত। সমগ্র ব্যাপারটিই গতিমূলক প্রেরণায় হিল্লোলিত—কোথাও ভক্তের

প্রতি মহাদেবীর চোখ নিহিত হয় নি। নাটকীয় সম্ভার প্রচুর থাকলেও মহাদেবীর অসীমতার দিক্ ফলিত হয় নি। একদিকে দেবী যেমন যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সীমা-জগতের নায়িকা, অন্য দিকে তিনি সকল ঘটনার সঙ্ঘর্ষের অতীত—কাজেই দেবীর মুখকমলে কোন রকম সাময়িক উত্তেজনা ও ক্রোধ বিম্বিত হওয়া ঠিক নয়। যে মূর্ত্তি পূজার জন্য গৃহীত হবে, সে মূর্ত্তির ভিতর এরূপ এক-দেশদর্শী বার্ত্তা উদ্ঘাটিত করা নাট্য-প্রসঙ্গের দিক হতে সম্ভব হলেও অন্যদিকে হতে উচিত নয়। এ জন্য এলোরার রূপশিল্পের মর্য্যাদা যেমন একদিকে ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তেমনই নাটকীয় ঘটনার একটা প্রাণবান্ প্রকাশে তা এক দিক্ হতে প্রশংসা লাভ করবার যোগ্যতাও অর্জ্জন করেছে।

যবদ্বীপের আর একটি মূর্ত্তিতে ঠিক যুদ্ধোদ্যত অবস্থা ফলিত করা হয়েছে। শ্রীদুর্গার অসুরনিধনে মত্ত অবস্থা কল্পনায় রচিত করে শিল্পী নাটকীয় উত্তেজনা ঘনীভূত করেছেন। তবুও চোখের দৃষ্টির ভিতরে এসেছে দু'রকমের অনির্ব্বচনীয় ভাব। এক একবার মনে হয় তা' তুরীয় কল্পনায় বিভোর, আবার মনে হয় তা' অসুরবিজয়ে বিক্ষিপ্ত। এ রকমের রচনাকে খুবই উচ্চশ্রেণীর বলতে হয়। সীমার সম্পর্ক ও অসীমের আহ্বানকে এক সঙ্গে সঙ্গত করে উচ্চশ্রেণীর কলার মর্য্যাদা এবং মহাদেবীর দিব্যশ্রী রক্ষা করা একটা অসাধারণ কৃতিত্ব সন্দেহ নেই।

মহাবলিপুর (পূর্ব্ব-মধ্য যুগ)

মহাবলিপুরের অসুরনিধনে উত্তেজিত মহাদেবীর সমগ্র দৃশ্যটি সামরিক দৃশ্যের ফলক মনে হয়। সমগ্র ব্যাপারটি একটা dynamic বা গতিমূলক সৃষ্টি। এলোরার রচনার ন্যায় এ মূর্ত্তিও লৌকিক আবেষ্টন ও ভঙ্গীতে মণ্ডিত—তুরীয় সম্পর্ক অনেকটা হীনপ্রভ হয়ে গেছে। মানবিকতার সঙ্কীর্ণ উপাদানে যেমন গ্রীক শিল্প রচিত, গ্রীক দেবীরা সেখানে অতি সামান্য সম্পদ নিয়ে দর্শকের চোখে পড়ে, তেমনই ভারতের কোথাও কোথাও শিল্পীরা মানবিকতার মঞ্চে দিব্য ঘটনাকে নিহিত করে আনন্দ পান। এ মূর্ত্তির শিল্পগত সৌষ্ঠব ও রচনাগত বলিষ্ঠতা আছে প্রচুর। মহিষাসুরের মূর্ত্তিটি একটা বিস্ময়জনক সৃষ্টি। কঠিন সঙ্কল্প, অসাধারণ শক্তি ও প্রচণ্ড তেজে মূর্ত্তিটি পরিপূর্ণ। মহাদেবীর আক্রমণে শিহরিত হয়ে অসুর এগিয়ে যাচ্ছে—দৃশ্যটি উপভোগ্য সন্দেহ নেই। রূপচর্চ্চার দিক্ হতে সমগ্র ব্যাপারটি একটি প্রশংসনীয় সৃষ্টি। দক্ষিণ-ভারতের মহিষমর্দ্দিনীও সুকল্পিত, কিন্তু তাতে নাটকীয় কল্লোল-কল্পনা বা তুরীয় স্থিরতা ও প্রশান্ত কাকতা পাওয়া কঠিন।

কাশী (দ্বাদশ শতাব্দী)

কাশীর অষ্টভুজা শ্রীদুর্গামূর্ত্তির ভিতর একটা উপভোগ্য গৌরব ও মহিমা আছে। সমগ্র রচনায় মহাদেবীই প্রধান একক ঐশ্বর্য্যে প্রদীপ্ত। শীর্ষোপরি উৎক্ষিপ্ত তরবারি সু-শোভন অঙ্গভঙ্গীর সহিত সঙ্গত হয়েছে। দেবীর দৃষ্টিও সংযত ও স্থির—পায়ের অবস্থানেও মর্য্যাদা ও শক্তি ঘোষিত হয়েছে। বস্তুতঃ উত্তর-ভারতের এই রচনায় ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রাণবস্তু আছে। মূর্ত্তিটি পুত্তলিকার মত নিষ্প্রাণ বা কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমষ্টি মাত্র নয়। উত্তর-ভারতের আর্য্যবক্ত তুরীয় সংস্পর্শ দান করতে পারে সহজে। মনে হয় মূর্ত্তিটি যেন যুদ্ধবিগ্রহের ভিতরও ধ্যানমগ্ন।

ভুবনেশ্বর (একাদশ শতাব্দী)

প্রাগ্‌ভারতীয় প্রতিমা রচনায় শিল্পীদের কৃতিত্ব আরও প্রস্ফুট হয়েছে। একদিকে মহিষাসুর নিধনের উদ্যোগ অন্যদিকে আত্মসমাহিত স্থিরতা ও দিব্যদৃষ্টি, কোথাও বা ভক্তদের প্রতি করুণা কটাক্ষ—এ সমস্ত হল প্রাগ্‌ভারতীয় ভাব-সম্ভারের নমুনা। ভুবনেশ্বরের শ্রীদুর্গামূর্ত্তি লালিত্যে ও অঙ্গভঙ্গীর ছন্দে অতুলনীয়। সমগ্র অস্ত্রশস্ত্র ও মহিষা-সুরের অঙ্গবিন্যাস নিয়ে মনে হয়, যেন সমগ্র ব্যাপারটি একটা শতদলের লীলা-প্রসঙ্গ উপস্থিত করেছে। মহাদেবীর মুখে প্রশান্তি ও স্থিরতা লক্ষ্য করবার বিষয়। এতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এমন ভাবে ছন্দোময় করা শিল্পীর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

খিচিঙ্গ (ময়ূরভঞ্জ : দ্বাদশ শতাব্দী)

অপর দিকে ময়ূরভঞ্জের খিচিঙ্গে আবিষ্কৃত দুর্গাপ্রতিমার ঐশ্বর্য্য সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে। দেবীর উৎকট ও ভীষণ ভাব নেই—সমগ্র অসুর-নিধন ব্যাপারটি যেন একটা কাব্যের আখ্যায়িকার মত হয়েছে। তাতে নির্ম্মম নিষ্ঠু-

বতা ও রক্তাক্ত বিভীষিকা নেই, স্বর্গলোকের একটা অসীম মুহূর্ত্ত যেন মর্ম্মরের রূপ গ্রহণ করেছে। খিচিঙ্গের শ্রীদুর্গার মুখশ্রীতে প্রশান্তি ও অতলস্পর্শ গভীরতা দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

নেপাল (একাদশ-ষোড়শ শতাব্দী)

নেপালের অষ্টাদশভুজা শ্রীদুর্গার দৃষ্টি মহিষাসুরের দিকে নিক্ষিপ্ত হয় নি। অগণ্য পূজকের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে ও মুখকমলের সহাস্য ইঙ্গিতে একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ ভুজ যেন সজ্জিত শতদলের মত দেবী-মূর্ত্তিকে ঘিরে আছে। কোন রকম উদ্দাম আন্দোলন বা রণকেন্দ্রের ভীষণ আবহাওয়ার লেশমাত্র এ প্রতিমায় নেই। এলোরা বা মহাবলিপুরের শ্রীদুর্গা ঠিক বিপরীত আদর্শে রচিত। শ্রীদুর্গা মহিষাসুরবধের নাটকীয় অভিনেত্রী মাত্র নন—তিনি মহাদেবী—ঈশ্বরী—সমগ্র জগতের কর্ত্রীশক্তি—মহিষাসুর-বধ একটা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। মহাদেবীর সমগ্র মহিমা, দৃষ্টি বা ব্যক্তিত্ব ক্ষণিকের তরেও মহিষাসুর-নিধনরূপী একটা অকিঞ্চিৎকর ঘটনায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। অসুরবধের মুহূর্ত্ত বা পলক অতি সামান্য ক্ষণ মাত্র। নেপালের নবদুর্গামূর্ত্তিতে মহাদেবীর ঐশ্বর্য্য আরও বিরাটভাবে প্রকটিত হয়েছে। মধ্যস্থলের প্রতিমার চারিদিকে আরও আটটি প্রতিমা রাখা হয়েছে। তাতে করে' একটা অভিনব শ্রী সৃষ্ট হয়েছে।

বাঙ্গলা (দ্বাদশ শতাব্দী)

বাঙ্গলা দেশে শ্রীদুর্গা অতি নিপুণভাবে রচিত হয়ে আসছে। সহাস্যে অসুরনিধন ভক্ত পূজকদের পক্ষেও প্রীতিকর হয়েছে, মনে হচ্ছে অসুরকে যেন পাপের পঙ্কিল আবর্ত্ত হতে মহাদেবী মুক্ত করছেন। অপরদিকে এই হাস্য মুখ উপাসকদেরও উৎসাহিত করছে। সহাস্য নিধনে যে সহজ সৌন্দর্য্য আছে ও অবলীলাক্রমে ঘটনাপর্য্যায়ের সমাধানে যে গৌরব দীপ্ত হয়, তা প্রকাশ পেয়েছে আমাদের বাঙ্গলার শ্রীদুর্গামূর্ত্তিতে। বাঙ্গলার রচিত শিবদুর্গাও চমৎকার ভাবে ভরপুর। এমন চমৎকার মুখশ্রীও অন্যত্র পাওয়া দুর্লভ। বাঙ্গালীর আর্য্য, দ্রাবিড় ও ঈষদ্ মঙ্গোল রক্ত শিল্প-কলাক্ষেত্রেএক অপূর্ব্ব সম্পদ দান করেছে। আর্য্যের subjectivity, দ্রাবিড়ীয় বিপুল বস্তুবাদ ও তুরেনীয় (Turanian) স্বচ্ছতা বাঙ্গলার রচনায় এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা নিয়ে এসেছে। বাঙ্গলার বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন পেলব মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধ লালিত্য আছে, তেমনই মর্ম্মর রূপ-রচনায়ও মাধুর্য্য, লালিত্য ও রস-সমাবেশের অপূর্ব্ব কারুতা লক্ষ্য করা যায়।

এমনই ভাবে শ্রীদুর্গামূর্ত্তি রচনাতে বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি প্রস্ফুট হয়েছে।

মৃত্যুরূপা মা

—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

চাহি না জন্তুর মত অন্নকেন্দ্রী এ হীন জীবন –
ইন্দ্রিয়ের যূপবদ্ধ এ অতৃপ্ত নগণ্য নিশ্বাস,
এই চির অন্ধকারে আত্মঘাতী মূঢ় অবিশ্বাস,
এর চেয়ে মৃত্যু ভাল – ঢের ভাল প্রশান্ত মরণ!
উদার আকাঙ্ক্ষা যাহা, মানুষের মনুষ্যত্ব ধন—
কোথায় হয়েছে লুপ্ত – ওঠে শুধু রুদ্ধ হা-হুতাশ,
অসম্ভাব্য অবাস্তব স্বপ্নঘোরে দীর্ঘ বর্ষ মাস,
তিলে তিলে মৃত্যু-যজ্ঞে ঢেলে চলা আত্মার ইন্ধন।

কোথায় তোমার অস্ত্র? হান হান সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ,
ছিন্ন কর মোহ-রজ্জু অস্তিত্বের এ নগ্ন বিলাস,
আশীর্ব্বাদে জীয়ায়ো না, অভিশাপে
জাগে অভিলাষ,
উত্তপ্ত ধ্বংসের রক্তে রাঙা কর ক্লেদে ক্লিষ্ট প্রাণ!
মৃত্যুরূপে এসো মাতা, নিয়ে সাথে দীপ্ত সর্ব্বনাশ
সঙ্কুচিত অস্তিত্বের বাঁধ ভেঙে ডেকে আন
সর্ব্বগ্রাসী বান।

শিবদুর্গা (বাঙ্গালা)

শ্রীদুর্গা (কাশী)

বুদাপেশ্‌ৎ-ভীন্‌-ভার্শাভা

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ভিয়েনায় দু'টা বক্তৃতা করিয়াছিলাম। হাউস-কীপার ভারি খুসী, সেও একদিন শুনিয়াছে! ভাবে বুঝিলাম, উৎসাহ খুব থাকিলেও বোধগম্য তার বিশেষ কিছু হয় নাই, কেমন লাগিল জিজ্ঞাসায় বলিল, "লোকে খুব সুখ্যাতি করিল, কিন্তু আমার সব চেয়ে ভাল লাগিল যে জায়গাটায় আপনি আপনাদের ধর্ম্মের গুপ্ততত্ত্বের (অর্থাৎ উপনিষৎ।) কথা বলিলেন।" পেশ্‌ৎ হইতে আসিতে ট্রেণে একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, ইঁহারা খুব বড়লোক, রোল্‌স্ গাড়ীতে সারা ইউরোপ ঘুরিয়াছেন। ভিয়েনার ষ্টেশনে এঁর স্বামী আসিয়াছিলেন, তাঁর সঙ্গেও আলাপ হইল। পরে স্বামী-স্ত্রী একটা বক্তৃতায় আসিয়াছিলেন। স্বামী-ভদ্রলোক, বক্তৃতা শুনিয়া মন্তব্য করিলেন, "আপনার সঙ্গে যে আমার স্ত্রীর দৈবাৎ আলাপ হইয়াছিল, ইহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইয়াছে।" একটি কাফেতে হঠাৎ এক বুড়া ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন, হের প্রোফেসর, আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনার দু'টা বক্তৃতায়ই ছিলাম।" আমি নগণ্য লোক, আমার বক্তৃতায় এঁর এত উৎসাহ কেন হইবে, ভাবিলাম হয় ত ভারত সম্বন্ধে আগ্রহ আছে। কথাবার্ত্তায় জানিলাম, তাও বিশেষ না। ইনি বয়সে অনেক প্রবীণ হইলেও এমন সসম্মান ভাব ধারণ করিয়া থাকিলেন যে, কি উদ্দেশ্যে তিনি অধীনের বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন, তা অনেক আলাপেও বুঝিতে পারিলাম না। শ্রোতাদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলাম একটি ছোটামত স্কুলের ছেলে, পরম গম্ভীর ভাবে দুইটি সভাতেই একেবারে প্রথম সারিতে গালে হাত দিয়া বসিয়া শুনিতেছে। এ ছোকরা কি রস পাইল, শুনিবার কৌতূহল হইল, ভাবিয়াছিলাম, ছেলেটি হয় ত সভার পর কিছু জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু ইহার আর খোঁজ পাই নাই। পেশ্‌তে বলিয়াছিলাম কর্ম্মী-স্ত্রীলোকদের একটি সমিতিতে ও ইণ্টারন্যাশন্যাল ক্লাবে। ভিয়েনায় বলিলাম একটি নারীসংঘে ও বিখ্যাত অষ্ট্রিয়ান বক্তৃতামঞ্চ উরানিয়ায় (Urania)। জায়গা বুঝিয়া অর্থাৎ শ্রোতাদের ইচ্ছানুযায়ী কোথাও জার্ম্মানে কোথাও ইংরেজিতে বলিয়াছি। প্রথম বারে জার্ম্মানে বলিয়াছিলাম বড় ভয়ে ভয়ে, না জানি, কোথায় ব্যাকরণ ভুল হইয়া যায়। কিন্তু কাগজে রিপোর্ট দেখিলাম বক্তার জার্ম্মান-জ্ঞান না কি উত্তম।

পেশ্‌ৎ-এ প্রথমবারে একটা কাফেতে প্রায়ই যাইতাম। দ্বিতীয়বার সেখানে যাওয়ামাত্র হেড-ওয়েটার একেবারে নাম ধরিয়া সম্ভাষণ করিল। একটু আশ্চর্য্য হইলাম, লোকটি বলিল, নানা কাগজে আমার ছবি দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ চিনিয়াছে যে, আমি তাহার কাফেতে আসিতাম। বিদেশী দেখিয়া লোকে এমনই তাকায়, তারপর যখন আবার কাগজে ছবি দেখিবার ফলে নিম্নস্বরে পরস্পরের মধ্যে নামটাও উল্লেখ করে, তখন নিজেকে অতি-বিখ্যাত লোকের পর্য্যায়ে পড়িতে দেখিয়া একটু লজ্জা পাইতে হয়। প্রায়ই পরিচিত অনেকে বলিলেন, এখানকার একটা সচিত্র সাপ্তাহিকে ছবি বাহির হইয়াছে। একটা কাফেতে গিয়া বলিলাম, গত সপ্তাহের ঐ কাগজখানা দিতে। ওয়েটারটা দুষ্টামি করিয়া কাগজের যে পৃষ্ঠার ছবি সেটা খুলিয়া ছবিটা আমাকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া মুচ্‌কি হাসিয়া গেল।

ভিয়েনায় পূর্ব্ব-পরিচিতরা ছাড়া নূতন অনেকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইহাঁদের মধ্যে জনকয়েক কাউন্ট-কাউন্টেস্ ব্যারণ-ব্যারণেস্ চায়ে ডাকিয়াছিলেন। অভিজাত-বংশীয় এখানকার এ শ্রেণীর লোকেরা খুব cultured হয়। ইহাঁরা অনেকে বক্তৃতা শুনিতেও আসিয়াছিলেন, সুখ্যাতিবাদও শুনা গেল অনেক। ভারত সম্বন্ধে ইহাঁদের জানাশুনা বেশ আছে, তবে মাথা ঘামাইবার চেষ্টা নাই। আর্ট, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখ আছে। ইহাঁদের মধ্যে বয়সে প্রবীণ ও নবীন দুই-ই ছিলেন, কিন্তু কলা-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ইঁহারা অতি-মডার্ণের পক্ষপাতী নন, রুচিটা রক্তের গুণে বেশ সূক্ষ্ম, সমজদারিটা

খুব মার্জ্জিত। Culture is the power of discrimination, এ কথা ইঁহাদের পক্ষে খাটে। তরুণদের মধ্যে আজকাল সব বিষয়ে লঘুত্বের একটা রেওয়াজ হইয়াছে। ট্র্যাডিশন ছাড়িয়া তাঁহারা যে নূতনকে ধরিয়াছেন, সেটার শুধু বহিরাবরণটারই খোঁজ রাখেন, একটু তলাইয়া কোন বিষয় বুঝিবার সময় ইঁহাদের নাই, সামর্থ্যেরও অভাব। একজন কাউণ্টেস্ স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য-প্রবর্দ্ধক এক রকম নৃত্য-জিম্‌নাষ্টিকের প্রবর্ত্তন করিতেছেন। ইনি বয়সে যুবতী হইলেও শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ইনি মেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে আধুনিকতার বিরুদ্ধে, আঁট কাপড়, হাই-হীল জুতা প্রভৃতিকে অসুন্দর ও অস্বাস্থ্যকর প্রমাণ করিয়া বই লিখিতেছেন। কাউণ্টেস্ ও তাঁহার স্বামীর সঙ্গে অনেক বিষয়ে মতের মিল হইল, তাঁহারাও বলিলেন যে, আলাপে বড় খুসী হইয়াছেন, মনের কথা বলিবার বা বুঝিবার লোক না কি এ দেশে কমই পান। আর একটি নবীন ব্যারণ-দম্পতি গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁহাদের গ্রামের বাড়ীতে কিছুদিন কাটাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু যাইতে পারিব কি না জানি না।

এখানকার সংস্কৃতের অধ্যাপক গাইগারের সঙ্গে এবার দেখা হইল। সেদিন সময় অল্প ছিল, তাই অধ্যাপক-দম্পতির সঙ্গে মাত্র এক ঘণ্টা চায়ের টেবিলে কথাবার্ত্তা হইল, পরে বাড়ী ফিরিবার সময় অধ্যাপকও আমার সঙ্গে চলিলেন ও পথে কিছু আলাপ হইল। একটি উত্তর-ভারতীয় ভদ্রলোকের এখানে ডক্‌টরেট লওয়ার গল্প প্রোফেসর বলিলেন। ভদ্রলোক না কি পৌছিয়াই বলিলেন, তিনি বহু সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, বহু প্রবন্ধও ছাপিয়াছেন, পড়াশুনার তাঁর আর প্রয়োজন নাই, শুধু থীসিস্ লিখিয়া ডক্টরেট লওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রোফেসর তাঁহাকে একটু বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রণালী শিখাইবার চেষ্টা করিলেন, কারণ উত্তর-ভারতের এম-এ ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁহার লেখা বা কথায় কোনও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভদ্রলোক প্রোফেসরের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না, স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া বেড়াইয়া বৎসরান্তে এক থীসিস্ হাজির করিলেন। পুঁথি পড়িয়া প্রোফেসর দেখিলেন যে, একেবারে বাজে কাজ, বলিলেন, উহা তিনি গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ভদ্রলোক তখন হাউ হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন যে, বহু আশা করিয়া তিনি এ দেশে আসিয়াছিলেন, ডক্‌টরেট না পাইলে তাঁর সব বৃথা যাইবে, প্রোফেসর তাঁর সর্ব্বনাশ করিলেন। কান্নার চোটে প্রোফেসর বলিলেন, ভাল, তাঁকে ডকটরেট দেওয়া যাইবে, কিন্তু তিনি থীসিস্ আবার ভাল করিয়া ঠিকমত লিখিয়া প্রোফেসরকে না দেখাইয়া তাহা ছাপিতে পারিবেন না। ভদ্রলোক ইহাতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁহার সেই পুরাতন অকেজো অগ্রহণীয় থীসিসই ছাপাইয়া প্রোফেসরকে ভারত হইতে এক কপি ডাকে পাঠাইয়া দিলেন। অন্য পণ্ডিতেরাও কপি পাইয়া থীসিসের রকম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গাইগারকে চিঠি লিখিতে লাগিলেন। এ দেশে ডকটরেট-থীসিসের দোষ-ত্রুটির জন্য পরীক্ষক ও থীসিস্-গ্রহিতা অধ্যাপককেও দায়ী করা হয়, কিন্তু উত্তর-ভারতীয় পণ্ডিতের তখন কাজ উদ্ধার হইয়া গিয়াছে, এ দেশে নিজের বা প্রোফেসরের বদনামের জন্য তাঁর কী কষ্ট পরিবেদনা!

ভারতীয় ছাত্র-সমিতির এক সান্ধ্য অধিবেশনে একদিন গেলাম। একটিও বাঙ্গালী নাই, জনা ত্রিশ উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয়েরা সমবেত হইলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও এ দেশীয়া বান্ধবীরাও আছেন। ঘরের একদিকে গ্রামোফোনে উর্দ্দু রেকর্ড বাজিতেছে, ধূপকাঠি জ্বালান হইয়াছে, সুপারি-মশলা চিবান হইতেছে, বেশ ভারতীয় বাতাবরণ!—আর ঘরের অন্য দিকে প্রেসিডেণ্ট-সেক্রেটারিতে বচসা হইতেছে, উভয়ে পরস্পরকে উষ্ণভাবে দোষ দিতেছেন, আর জনকয়েক কয়েকটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া যে নিবিড় আলোচনা করিতেছেন, তার বিষয় হইতেছে যে, সম্প্রতি না কি ভূতপূর্ব্ব কয়েকজন সেক্রেটারি সমিতির তহবিল তছ্‌রূপ করিয়াছেন, হিসাব-পত্র জাল করিয়াছেন, এমন কি পরস্পরের অনুপস্থিতে এ উহার বাসায় ঢুকিয়া জিনিষপত্রও বেহাত করিয়াছেন! এই খণ্ড-ভারত তো বিশাল-ভারতেরই প্রতীক, আর্য্য-অনার্য্য, দ্রাবিড়-চীন, শক-হূনদল, পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হইয়া "সেই হোমানলে কলহ-অনলে কাজেরে আহুতি দিয়া, বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া!"

ভিয়েনা হইতে প্রাহা ফিরিয়া মধ্যে একবার ব্রুনো (Bruno) গিয়াছিলাম। এটি মোরাভিয়ার প্রধান নগর, জার্ম্মান নাম ব্রুন্ (Brunn)। এ সহরের উপর দিয়া বহুবার যাতায়াত করিয়াছি, কিন্তু নামিয়া দেখা হইয়া উঠে নাই, তাই এবার সে কাজটা সারিয়া লওয়া গেল। ছোট হইলেও বেশ কর্ম্ম ব্যস্ত সহর।

প্রাহাতে একটা ফরাসী আর্টের প্রদর্শনী দেখিলাম। অতি-মডার্ণ, সাধারণ লোকে বুঝিতেই পারে না এবং পণ্ডিতেরও ধোঁকা লাগে, কিন্তু তবু সবারই একবার দেখিয়া আসা চাই। কয়েকটি মডার্ণ নৃত্যকলারও অভিনয় দেখিলাম। নৃত্যের মধ্য দিয়া ভাবের অভিব্যক্তির আজকাল খুব চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু ফলটা দাঁড়ায় নানা কৌশলে অ্যানাটমি প্রদর্শনে ও বিদূরিত-বসামাংস পেশী পর্য্যবসিত শরীরের নানারূপ বিক্ষেপ ও বিকৃত ভঙ্গীতে। একটি জাপানী গায়কের গান শুনিলাম। গানগুলি জাপানী, কিন্তু সুর এ দেশী। স্বর-শাসন এঁর এমন সুন্দর যে, এ দেশী গায়কদের মধ্যেও সেরূপ বেশী মেলে না। জাপানীরা এ দেশের যেটাই লইয়াছে, সেটাতেই যেন ইউরোপকে out-Europe করিয়াছে। ৯৬ ঘণ্টায় অতি-সাধারণ একটা প্লেনে টোকিও লণ্ডন পাড়ি দিয়া এরা সেদিন ইউরোপকে অবাক করিয়া দিয়া গেল।

জার্ম্মানীর ইউনিভার্সিটিতে কন্‌ভোকেশন বলিয়া কোন জিনিষ নাই, ছাত্র পরীক্ষা দেয়, পাশ করিলে উপাধি পত্র পায়, সে জন্য সভা ডাকা হয় না। সাধারণের কাছে তার প্রকাশ তার ছাপানো থীসিসের দ্বারা, কারণ, থীসিস না ছাপানো পর্য্যন্ত নামের সঙ্গে উপাধি যোগ করার অধিকার ছাত্রের নাই। এখানে চেক ইউনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশন দেখিলাম। কোনরূপ সাজসজ্জা বা আড়ম্বর নাই। ছাত্রেরা ও তাদের আত্মীয়স্বজন বসিয়া গিয়াছে। রেক্টর ও অন্য দু-একজন কর্ম্মচারী উপস্থিত হইলেন, ইঁহারা চেক্-ভাষায় দু'এক কথা বলিলেন, একজন প্রবীণ প্রোফেসর লাটিন ভাষায় একটু বক্তৃতা করিলেন, পরে ছাত্রদের পক্ষ হইতে একজন কর্ত্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিল,—ব্যস্। ছাত্রদের আত্মীয়বর্গ ফুলের তোড়া আনিয়া ছাত্রকে অভিনন্দন করে। পরীক্ষায় পাশ করিলে এ দেশে ছাত্রেরা আত্মীয় ও বিশিষ্ট বন্ধু জনকয়েকের সঙ্গে নৃত্যালয়ে গিয়া সবাই আকণ্ঠ সুরাপান করে ও নাচগান মাতামাতি করিয়া রাতটা কাটাইয়া দেয়। এ দেশের ছাত্রেরাও খুব পরীক্ষা-ভীত হয় ও পরীক্ষাটাকে অন্য পাঁচজনেও খুব একটা ভাবে লয়। পরীক্ষার ভয় নাই ভাব দেখাইলে লোকে মনে করে ফেল করিবে, সহকর্মী যারা পরীক্ষা আগেই পাশ করিয়াছে তারা মনে মনে অমঙ্গল কামনা করে, আর পরীক্ষক অধ্যাপকেরাও অসন্তুষ্ট হন। খুব ভয় লাগিয়াছে ও কাবু হইয়া পড়িয়াছে ভাব দেখাইলে, অধ্যাপক ও সহকর্মী সকলেরই খুব সহানুভূতি পাওয়া যায়। পরীক্ষার চাপে মারা যাইতেছি, এখন একেবারে সময় নাই, ভাব দেখাইয়া ছাত্ররা বান্ধবীদের উপরেও খুব প্রভাব বিস্তার করে।

স্লোভাকিয়ার যে স্পা পিশ্‌চানির (Spa Piestany) কথা আগে বলিয়াছি, সেখানে তিন সপ্তাহ বাতের চিকিৎসার জন্য গিয়াছিলাম। গরম জলের ফোয়ারা ও ভূগর্ভের মাটির [illegible] ম কাদায় চিকিৎসা করা হয়। এই জলে 'ক্ষারের [illegible] ও কাদায় গন্ধক ও রেডিয়াম প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু আছে। শরীরে পুরু করিয়া কাদা মাখিয়া কম্বল জড়াইয়া ২০ মিনিট পড়িয়া থাকুন, তার পরে উঠিয়া ফোয়ারার নীচে দাঁড়াইয়া কাদা ধুইয়া ফেলিয়া গরম জলের বেজিনে ১৫ মিনিট ডুবিয়া থাকুন, উঠিয়া ভিজা গায়ে আবার গরম চাদর কম্বল জড়াইয়া ২০ মিনিট পড়িয়া থাকিয়া ঘামুন—এই হইল মূল চিকিৎসা। তা ছাড়া মাসাজ প্রভৃতিরও অনেক ব্যবস্থা আছে। সাণ্ডর (Sondor) ইন্‌ষ্টিটিউট নামক বিভাগে কৃত্রিম উপায়ে অঙ্গচালনার জন্য প্রায় চল্লিশ-রকমের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আছে, এগুলির সাহায্যে সীটে বসিয়া অক্ষম রোগী হাঁটা, সাঁতার কাটা, বাইসাইকেল বা ঘোড়ায় চড়া, দাঁড় বাওয়া প্রভৃতি যত রকম পেশী-ক্রিয়া সম্ভব, সবই করিতে পারেন। যে হোটেল-টায় ছিলাম, সেটা ওখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হোটেল ও খুব ফ্যাশানেব্‌ল্, দৈনিক থাকা-খাওয়ার খরচ এক পাউণ্ডের উপর। সৌভাগ্যের বিষয় গিয়াছিলাম শীতকালে, তখন সীজন্ নয় বলিয়া বেশী ভিড় ছিল না। হোটেলে মাত্র জন ত্রিশেক লোক, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন। হোটেলের সব কায়দা-কানুন

আমীরি চালের, ঘর হইতে করিডরটুকু পার হইয়া লিফ্ট্, লিফ্টে নামিয়া দশ পা গেলেই লাউঞ্জ, কিন্তু এইটুকুর মধ্যে গোটা দশেক লোক বাউ করিতেছে, আর ক্রমাগত Please Sir, শুভদিন সার, এই দিকে সার প্রভৃতি! খাইবার সময় পরিবেশনের এত জাঁক যে, খাওয়ার স্বস্তি পলায়ন করে। লোক যাঁরা আছেন অধিকাংশই বাতগ্রস্ত বুড়াবুড়ী। ইংরেজদের মধ্যে ছিলেন, একজন বৈজ্ঞানিক ও একজন "স্যর" উপাধিকারী ডিউক্ অভ্ কনটের ভূতপূর্ব্ব Equerry। ইংরেজ ও আমেরিকানদের সঙ্গে পরিচয় সহজেই হইল, কিন্তু ইংরেজেরা মাখামাখি এ সব স্থানে বেশী করে না। দুটি ডেন্‌মার্কবাসী জার্ম্মান ব্যারণের (ইঁহারা মাস্‌তুতো পিস্‌তুতো ভাই) সঙ্গে আলাপ হইল। ইঁহাদের একজন শ্যাম-যবদ্বীপ প্রভৃতিতে বাস করেন ও সেখানে ফিল্‌ম্ তুলিতেছেন। একটি বুড়া চেক জমিদারের সঙ্গে দাবা খেলিতাম। বেশী আলাপ হইল একটি ডেনিশ্ যুবক ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। যুবকটির বাপ কোপেনহেগেনের একটা বড় কাগজের অন্যতম ডিরেক্টার ও যুবক নিজে সেখানকার প্রধান সান্ধ্য কাগজের প্রধান সম্পাদক। ইঁহারা ডেনমার্কের নানাবিষয়ক প্রগতির অনেক খবর দিলেন। একটি পাদ্রী ছিলেন এখানে, তিনি জাতিতে ডেনিশ্, কিন্তু বহু দিন আমেরিকার বাসিন্দা। সম্পাদক যুবক বলিলেন যে, তাঁহার মুখে ডেনমার্কের আধুনিকতার কথা, যথা, জনহীন গির্জ্জা, গর্ভনিরোধ বা গর্ভপাত সম্বন্ধে নারীর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সন্তান-প্রসবে কোন দোষ না দেখা প্রভৃতিতে পাদ্রী একেবারে মুষড়িয়া পড়িয়াছেন। পাদ্রী যত ক্ষুণ্ণ হইতেন, যুবক দেশের কথা তত বাড়াইয়া বলিতেন—ইঁহারা ডেনিশ ভাষায় আলাপ করিতেন বলিয়া পাদ্রী এঁদের সঙ্গে বসিলে আমি একটু দূরে বসিয়া মজা দেখিতাম—সম্পাদক দেশের উন্নতি উৎসাহের সহিত জাহির করিতেছেন আর পাদ্রী 'হা হতোস্মি' ভাব ধারণ করিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া শুনিতেছেন। নোভে মেস্টো সহর এখান হইতে কাছেই। দুবার রেলে ও একবার মোটরে সেখানে গিয়াছিলাম। সেখানকার বন্ধুটি ও তাঁহার মাও এখানে আসিয়াছিলেন।

একদিন মোটরে ব্রাটিস্লাভা গেলাম। একটা নূতন অপেরা দেখিলাম, ইহার গীত-রচয়িতা ইটালিয়ান। পাশে বক্সে বসিয়াছিলেন নগরের মেয়ার, তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইল, মেয়ারের মেয়েও ছিলেন বক্সে, তিনি ইংরেজী বলিতে পারিতেন।

প্রাহা হইতে পোলাণ্ডের রাজধানী ওয়ার্স (স্থানীয় নাম পোলিশ ভাষায় "ভার্শাভা"—Warszawa) গেলাম, লম্বা পথ, এক্সপ্রেস ট্রেণে ১৪ ঘণ্টার রাস্তা। দেশটা আগে রুশিয়ার অধীন ছিল, এখনও বড় দরিদ্র অবস্থা। এ যাত্রায় গ্রহ দুষ্ট ছিল, যেদিন গেলাম, তার পরদিনই ফিরিতে হইল। ফ্রন্টিয়ারে গাড়ী পৌছিয়া পাস্‌পোর্ট পরীক্ষার সময় পুলিশ বলিল, আমার পোলিশ ভীসা (ছাড়পত্রের উপর অনুমতিমূলক ছাপ) নাই, এ ট্রেণে যাইতে পারিব না। শুনিলাম, নামিয়া ফেরৎ ট্রেণে চেকোশ্লোভাকিয়ায় গিয়া কোন পোলিশ কন্‌স্যুলেট হইতে ভীসা আনিতে হইবে। গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সব চেয়ে কাছে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সহরে পোলিশ কনস্যুলেট আছে, সেটা এক ঘণ্টার পথ বটে, কিন্তু যাইতে আসিতে এত বিলম্ব হইবে যে, পরের ট্রেণ পাইতে দিন কাবার হইয়া যাইবে। পুলিশকে বলিলাম, আমার পাসপোর্টে তো বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে ইউরোপের সব দেশে যাইবার অনুমতি আছে এবং এ পর্য্যন্ত যত দেশে গিয়াছি—ইটালী, জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী কোথায় স্থানীয় ভীসা লাগে নাই। পুলিশ বলিল, পোলাণ্ডের জন্য সবারই স্থানীয় ভীসা লাগে। তখন বলিলাম, "পোলাণ্ডে আসা লইয়া প্রাহার পোলিশ লেগেশনের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র ও মৌখিক আলাপও হইয়াছে, তাঁহারা কেহ তো আমাকে ভীসার কথা জানান নাই।" পুলিশ এই চিঠিপত্র দেখিতে চাহিল ও শেষটা সেই গাড়ীতেই যাইবার অনুমতি দিল এই সর্ত্তে যে, ভার্শাভা পৌছিবামাত্র পুলিশ অপিসে গিয়া রেগুলেশন অনুযায়ী ভীসা লইতে হইবে। এ কথাগুলি পাসপোর্টের উপর লিখিয়া দিল। ভার্শাভা পৌছিয়া গেলাম পুলিশের কাছে, এ অপিস ও অপিস ঘুরিয়া যখন ঠিক স্থানে পৌছান গেল, তখন বাধিল মহা বিপত্তি। কয়েকটা বাহিরে আসিয়া চালাক ভিতরে হাঁদা নবীন কর্ম্মচারীর হাতে পড়িলাম,

হতভাগারা না বুঝে ইংরেজী, না বুঝে ভাল জার্মান। চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডে অহি-নকুল সম্বন্ধ, ইহারা ভাবিল, আমি চেকোশ্লোভাকিয়ার বেতনভোগী বিদেশী স্পাই, ফাঁকি দিয়া বিনা ভীসায় গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছি। সব ব্যাপার বলিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিল না। আমাকে সাব্যস্ত করিল জাতিতে আমেরিকান, বৃটিশ পাসপোর্ট লইয়া গোয়েন্দাগিরি করি। ইহাদের দেশে সকলেরই ভীসা লাগে, ফলে ইহারাও অন্য কোথাও গেলে প্রতিফলে সর্ব্বত্রই এদের কাছ হইতেও ভীসা আদায় করা হয়। আমি যে বিনা ভীসায় এত দেশ ঘুরিয়াছি, এ কথা নিছক মিথ্যা ঠিক করিল। বারে বারে জিজ্ঞাসা করিল, "কন তোমার এখানকার ওখানকার ভীসা লাগে নাই ?" ভাবটা এই যে, স্পাই বলিয়া সব জায়গাতেই আমাকে বিনা ভীসায় যাইতে দিয়াছে। ইণ্টার-ন্যাশনাল স্পাই-এর পেশা লাভ করিয়া মনে আমোদ পাইলাম, কিন্তু উপস্থিত বিপদ তো মিটাইতে হইবে। উহারা কোন কথা বিশ্বাস করিল না, কোন যুক্তি বা ব্যাখ্যায় কান দিল না, ঘূর্ণ্যমান সন্দেহোজ্জ্বল চোখে বারে বারে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সেই একই প্রশ্ন। যা হোক বহু তর্ক-বিতর্কের পর বলিল যে, এখন ভীসা যদি আমার চাই, তবে পুরা ফি দিতে হইবে। ফি টা বেশ চড়া, আমার অতগুলা পয়সা বৃথা খরচ করিতে আদৌ ইচ্ছা হইল না। অনেক আপত্তি ও তর্ক তুলিলাম, বলিলাম, আমি মাত্র দিন কয়েকের জন্য আসিয়াছি, ভীসার ফি দিতে গেলে আমার সব পয়সা বাহির হইয়া যাইবে, হোটেল ও খাওয়ার খরচা দিব কোথা হইতে ? কথায় কথায় কথা উঠিল, আমি কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি ? কি দেখিতে চাই ? দেখিয়া তার পর কি করিব, কি লিখিব ? ক্রমাগত সন্দিগ্ধ প্রশ্নে মনে রাগ হইল, প্রথমে নরমভাবে বলিলাম, আমি যা কিছু দ্রষ্টব্য সবই দেখিতে আসিয়াছি এবং যা আমার খুসী তাই লিখিব ! তবু জেদ ছাড়ে না ; ঠিক করিলাম বিনয় তো অনেক করা গিয়াছে, এই বার ঘুঘুর পিছনে ফাঁদও দেখাইব। উচ্চৈস্বরে রাগতভাবে ধমক দিয়া বলিলাম, বেশী পাকামি করিও না, মনে রাখিও আমি বৃটিশ পাসপোর্টধারী। ভীসা দিতে হয় দাও, না দিতে চাও না দিও, কিন্তু আমার উক্তি সব মিথ্যা এ কথা বলিবার অধিকার তোমাদের নাই ; তোমরা মূর্খ ও অজ্ঞ তাই জান না যে, বহুদেশে বৃটিশ পাসপোর্টধারীর ভীসা লাগে না। বারে বারে "হাঁ লাগে, হাঁ লাগে" বলার অধিকার তোমাদের নাই। ভারি বুদ্ধিমানের মত আমাকে স্পাই ঠাওরাইয়াছ, কিন্তু আমার পাসপোর্ট যে বৃটিশ সেটা ভুলিও না। দাও আমার পাসপোর্ট ফেরৎ, আমি ভীসার ফি দিব না। কালই আমি বৃটিশ কন্‌সালকে ব্যাপার জানাইব, যাহা কর্ত্তব্য বৃটিশ কন্‌সাল করিবেন।" কেঁচোর মত নরম হইয়া পাসপোর্ট ফেরৎ দিল। একটা কর্ম্মচারী তখন একটু ভালমানুষী করিবার চেষ্টা করিল। তাহাকে আবার দ্রংষ্ট্রাপ্রদর্শন করিলাম, লোকটা আহাম্মকের মত হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বৃটিশ প্রজার তেজ দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার হইল বটে, কিন্তু বৃটিশ কন্‌সালের কাছে আর গেলাম না, গেলে যা হইত তা আমার জানা ছিল। সেদিন বৈকাল সন্ধ্যা ও পরদিন বৈকাল পর্য্যন্ত সহর দেখিয়া বেড়াইলাম ও বৈকালের গাড়ীতে প্রাহা নিশ্চিন্ত চলিলাম। ফ্রণ্টিয়ারে আবার পুলিসে ধরিল। "কে আপনার ভীসা লইবার কথা ছিল, লন নাই কেন ?"

আমি উত্তরের জন্য তৈয়ারী ছিলাম, ভালমানুষ সাজিয়া বলিলাম, তোমাদের কর্ত্তা অফিসার আমাকে কি সর্ত্তে যাইতে দিয়াছিলেন, তা তোমরা জান। আমি ভার্শাভা পৌছিয়াই পুলিশের কাছে যাই। তাহারা বলিল, ভীসার জন্য অত ফি লাগিবে। আমার কাছে পয়সা কমই ছিল, জানই তো এক দেশ হইতে অন্য দেশে সামান্য পয়সার বেশী সঙ্গে লইবার নিয়ম নাই। ভীসার ফি দিতে গেলে আমার খাই-খরচার পয়সাও থাকিবে না। সেজন্য ইতিকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম বৃটিশ কনসালের কাছে। কনসাল বলিলেন, ভীসা যখন লওয়ার নিয়ম তখন না লইয়া উপায় নাই, যদি ফি দিবার সামর্থ্য আমার না থাকে, তবে অবিলম্বে আমাকে এ দেশ ত্যাগ করিতে হইবে। তাই আমি কনসালের কথামত প্রথম গাড়ীতেই পোলাও ছাড়িয়া যাইতেছি।" পুলিশেরা পরস্পরে মন্ত্রণা করিল, আমাকে খানিক জেরাও করিল।

আমার উক্তি যে সত্য সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া শেষটা বলিল, "কন্‌সাল তো তোমাকে পয়সা ধার দিতে পারিতেন, দিলেন না কেন?" আমি বলিলাম, "কেন দিলেন না তা জানি না, বোধ হয় অর্থ-সম্বন্ধীয় ঝুঁকি লইবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না, তাই আমাকে প্রথম গাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।" আরও কিছু জেরার পর দ্বিধা-বিভক্ত অপ্রসন্ন মনে পুলিশ পাসপোর্টে ছাপ মারিয়া দেশ ছাড়িতে দিল।

সময় সংক্ষেপ হইলেও ভার্শাভার সবই দেখিলাম। ভিশ্চুলা নদীর ধারে মস্ত সহর ভার্শাভা, নদীটাও বেশ বড়। রাস্তাঘাট, বাগান প্রভৃতি বেশ প্রশস্ত। লোক-গুলিও বেশ ভাল মানুষ, যদিও একটু অলস, আরামপ্রিয় ও আমোদলোভী। কায়দা-কানুন এখানে ফরাসী চালের। একে হঠাৎ আসিয়াছিলাম, তাহাতে আবার পরদিনই ফিরিতে হইল, কাজেই দেখাশুনা অল্প লোকের সঙ্গেই হইল। সহরের নূতন ভাগে খুব গঠন চলিতেছে। পুরাতন অংশের যে ভাগে ইহুদীরা থাকে, সেটা দেখিলাম। এই ঘেটোর (ghetto) জু'গুলা নোংরা, দাড়ীওয়ালা, পুরা-মাত্রায় ওরিয়েণ্টাল। ইউরোপের কোন সহরে এখানকার মত এত জু নাই। ইউনিভার্সিটিটি এখানে নদীর ধারে। বড়রাস্তারও কাছে বটে, তবে বাহির হইতে বুঝিবার যো নাই যে ভিতরে অত পরিসর। ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট একটি প্রাচীন প্রাসাদে। এই প্রাসাদের অধিকারিণী একটি কাউণ্টেস্‌, নেপোলিয়নের প্রণয়িনী ছিলেন। ইন্‌ষ্টি-টিউটের লাইব্রেরিয়ান বাড়ী দেখাইতে দেখাইতে একটি ছোট ঘরে আসিয়া বলিলেন, সেই ঘরে নেপোলিয়ান কাউণ্টেসের সঙ্গে নৈশ বিহার করিতেন। এখন এ ঘরটি ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্টের বসিবার ঘর, ইঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি পণ্ডিত নন, রাজনৈতিক, পার্লা-মেণ্টের সোশ্যালিষ্ট মেম্বার। না ইংরেজী, না জার্ম্মান বুঝেন। একটু ফরাসীতে ও লাইব্রেরিয়ানের মধ্যস্থতায় জার্ম্মানে আলাপ হইল। এখানে বাংলা পড়ান শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় ঘোষাল, ইঁহার সঙ্গে কলিকাতায় একবার দেখা হইয়াছিল ও গত বৎসর ভারতীয় ছাত্র-সম্মেলনেও ইনি প্রাহায় আসিয়াছিলেন, এখন হাঁসপাতালে ইঁহার দেখা পাইলাম, একটা অস্ত্র-চিকিৎসার জন্য সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছেন। একটি সৈনিক এখানে আমাকে সঙ্গে করিয়া সহর দেখাইল। পরে একটি যুবক সাংবাদিক ও তার ছাত্রী বান্ধবীর সঙ্গে আলাপে দেশের অনেক খবর পাইলাম। এদেশে মিলিটারি ফ্যাশিজ্‌ম্‌, যদিও তার বাহ্যমূর্ত্তিটা গণ-তান্ত্রিক। দেশ বড় দরিদ্র, চাষারা আলু খাইয়া দিন কাটায়, অনেক সময় নুন কিনিবারও পয়সা জোটে না। মার্শাল পিল্‌সুড্‌স্‌কি দেশ স্বাধীন করিয়াছেন বটে, তবে দেশ এখনও ভিতরে কাঁচা। পিল্‌সুড্‌স্‌কিকে এরা খুব শ[illegible] করে।

ভার্শাভা-স্থিতিটা অকালে শেষ হইল বলিয়া ফেরৎ পথে প্রাহার উপর দিয়া সোজা গেলাম আবার কার্লসবাদে। হুইট্‌সানের ছুটিতে সেখানে সীজন্‌ আরম্ভ হইয়াছে। নূতন নূতন গ্রীষ্মবেশ পরিয়া অগণ্য নরনারী দিন তিনেকের জন্য হাওয়া (এবং জলও) খাইতে আসিয়াছে।

এখানকার কৃষি-পার্টির বাৎসরিক সম্মেলন উপলক্ষে দেশের নানা প্রদেশ হইতে প্রাহাতে কৃষকদের সমাগম হইয়াছিল। সকালে একটি লম্বা প্রোসেশন হইল, বৈকালে নানারূপ গ্রাম্য খেলাধূলার আয়োজন হইল। দুই উপ-লক্ষ্যেই নানা প্রদেশের নরনারীর সেকেলে বিচিত্র বর্ণের সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ দেখা গেল, আর তার সঙ্গে বিবিধ ফোক্‌-ড্যান্‌স্‌। এই গ্রাম্য-নৃত্যের এক একটা এমন সুন্দর যে, বাজনার তালে তালে সহজ ও লঘু অঙ্গ-বিক্ষেপে দেহ-ভঙ্গিমায় যে নৃত্যরস ক্ষরণ হয়, তাহার তুলনা আর এ দেশে দেখি নাই। এই সম্পর্কে মনে হইতেছে, শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় তাঁহার রায়বেঁশে প্রভৃতি নৃত্য[illegible] এ দেশে দেখাইয়া গেলে মন্দ করিতেন না। উদয়শঙ্কর মেনকারা তো ভারতীয় কলার একটা দিক্‌ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, নামও করিয়াছেন বেশ। উদয়শঙ্কর আ[illegible] সেদিন আসিয়াছিলেন, খুব লোক হইয়াছিল। ওরিয়েণ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউট উদয়শঙ্করকে একটি পার্টি দিবেন ঠিক ক[illegible] ছিলেন, কিন্তু উদয়শঙ্কর হঠাৎ আসেন, হঠাৎ যান [illegible] তাহা হইয়া উঠে নাই। একটি রুশিয়ান মহিলা [illegible] নৃত্যচর্চ্চা করিয়াছেন, বোম্বাই চেকোস্লোভাকিয়ান কন্‌-স্যুলেটের একটি চেক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে তাঁর [illegible] হয়। ইনি এখানকার রাশিয়ান সমিতিতে এ[illegible]

ভারতীয় নৃত্য দেখাইলেন ও বাহবাও খুব পাইলেন। উপস্থিত অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নৃত্যগুলা সত্যই ভারতীয় ভাবে মহিলা করিতে পারিয়াছেন কি না। পারিয়াছেন শুনিয়া মহিলার খাতির আরও বাড়িল। একটি ধনীবন্ধুর বাড়ীতে একজন জার্ম্মান থিয়েটারের অভিনেত্রী ও ভিয়েনার একটি বিখ্যাত অপেরা-গায়িকার সঙ্গে আলাপ হইল, শেষোক্ত মহিলাটি ইউরোপের প্রায় সব বড় বড় নগরে অপেরার প্রধান পার্টে গাহিয়া থাকেন। অপেরা-থিয়েটারের ব্যবসা-বিষয়ক অনেক ভিতরের খবর ইঁহাদের কাছে জানা গেল। আরও একটি মহিলার সঙ্গে সেখানে পরিচয় হইল, ইনি জজিয়তি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন, শীঘ্রই বিচারপতি হইবেন। আমাদের দেশের নারীর মর্য্যাদা ও নারীত্বের আদর্শের কথা শুনিয়া ইঁহারা সবাই ভারতীয় কালচারের প্রতি সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন। প্রফেসর লেসনী ও প্রোফেসর পের্ত্তোল্ডের বাড়ীতে দুটা পার্টি হইল। প্রোফেসর পের্ত্তোল্ড ভারত হইতে কলা-সম্বন্ধীয় বহু জিনিষ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। বৃটিশ লেগেশনে আবার একটা পার্টি হইল, নূতন রাজার জন্মোপলক্ষে।

একটি সস্ত্রীক যুবক ভদ্রলোক ও আর একটি ভদ্রলোক ও তাঁহার দুটি বান্ধবীর সঙ্গে মোটরে গিয়াছিলাম প্রাহার মাইল চল্লিশেক দূরে এল্‌বে ও প্রাহার মলডাও নদীর মিলন-স্থলে। স্থানটি পাহাড়ে, একটি পাহাড়ের মাথায় একটা পুরান ক্যাস্‌ল্‌ বা দুর্গ আছে, সেটাতে এখন একটা রেস্তরাঁ ও ওয়াইন খাইবার জায়গা হইয়াছে। পাহাড়ের উপরের ঐ রেস্তরাঁয় বসিয়া নীচের উপত্যকা সুন্দর দেখায়। এলবে নদীর এখানে শিশুমূর্ত্তি। রাত্রে ফিরিবার সময় আমরা একটা পাহাড়ের বনের পথ দিয়া আসিলাম। মোটর দুখানা ইতিমধ্যে পাহাড়ের তলায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। একখানা মোটরে রেডিও ছিল, পৌঁছিয়াই শুনিলাম, আমাদের নূতন রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ মহাশয় তাঁর অভিষেক-সন্ধ্যার বড়কাষ্ঠ বক্তৃতাটি করিতেছেন। যাইবার সময় একটি চেক স্ত্রীলোকের বাসায় গিয়াছিলাম। এ স্ত্রীলোকটির লোকের হস্তস্পর্শ করিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলিবার ক্ষমতা আছে। মহিলাদের মধ্যে একজন অন্য ঘরে গিয়া স্ত্রীলোকটিকে হাত দেখাইলেন ও ফিরিয়া বলিলেন, সে তাঁহাকে অনেক কথা বলিল, তাঁর ছেলেমেয়ের কথা, তাঁর একটা রোগের অপারেশন করাইবেন কি না ভাবিতেছিলেন, সে কথা প্রভৃতি।

প্রাহা সহরের মধ্যেও কয়েকটা পাহাড়ের মাথায় খোলা কাফে ও রেস্তরাঁ আছে। এখন গ্রীষ্মের দিনে সেখানে বসিয়া রোজ বৈকাল-সন্ধ্যা কাটান যায়। একটি নিঃসন্তান প্রোফেসর বিবাহচ্ছেদ করিয়া নূতন বিবাহ করিবেন, তাঁর ভাবী পত্নীটি চিত্রকর। এঁদের সঙ্গে সেদিন গিয়াছিলাম প্রাহার পুরাতন অংশের একটা প্রসিদ্ধ পুরাতন কাফেতে। খানিক পাহাড়ে উঠিয়া একটা বাড়ীর চাতালের মধ্য দিয়া ও অন্য দুটা বাড়ীর উপর দিয়া পৌঁছিতে হয় এখানে। বাড়ীর ছাতে খোলা কাফে, তার একটু উপরেই পুরাতন রাজবাড়ী। সেকালে এখানে ছাত্রদের আড্ডা ছিল। পকেটে রুটি ও হ্যাম ভরিয়া আনিয়া এখানে বসিয়া তারা বিয়ারের সঙ্গে সান্ধ্য-ভোজন করিত ও বেঞ্চিতে বসিয়া সারারাত গান-বাজনা করিত।

নারী-সমি

—শ্রীঅমলা দেবী

[৪]

দিন দশ পরে। কাল অপরাহ্ন। ডাক্তার দোতালার বারান্দায় বসিয়া কি একটা বই পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সাত বৎসরের মেয়ে ক্ষণিকা আসিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে একটা টাকা দিন না—"।

ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, "টাকা নিয়ে তুমি কি করবে মা?"

—"আমার মেয়ের বে দেব- "

—"তোমার আবার মেয়ে হ'ল কখন? আমাকে তো বলনি?"

—"বা, রে! আপনাকে আবার বলতে হবে কেন? আমার সেই ডলি-পুতুলটা আমার মেয়ে জান না? ও বাড়ীর খাঁদুর ছেলের সঙ্গে বে দেব, খাঁদু একটা টাকা না দিলে বে দেবে না বলছে—"

ডাক্তার কন্যাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "একটা টাকা দিলেই তোমার মেয়ের বে হবে?"

ক্ষণু গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। ডাক্তার কহিলেন, "বেশ! টাকা আমি দেব, কিন্তু মা! সস্তা দরে তোমার খাঁদুরাণী মেকী চালাচ্ছে না তো?"

ক্ষণিকা প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "খাঁদু খুব ভাল মেয়ে। জানেন বাবা, ওর ছেলে ঘাড় নাড়তে পারে —"

—"তাই না কি! তা' হলে কোন ভয় নেই। শুধু ঘাড় নাড়তে পারে, এ রকম ছেলের দরও বাঙ্গালা দেশে কম চড়া নয়। তোমার খাঁদুরাণীর খবরের কাগজে নাম বেরুবে—"

ক্ষণু দুই চোখ বড় করিয়া কহিল, "খবরের কাগজে! ঐ যে বড় বড় কাগজগুলো রোজ সকালে আসে?" একটু ভাবিয়া কহিল, "খাঁদু কিন্তু জানতে পারবে না—"

ডাক্তার কহিলেন, "কেন?"

—"খাঁদু তো পড়তে পারে না! ও কখনও স্কুলেই যায় না; খাঁদুর মা বলে, মেয়েদের লেখাপড়া করতে নেই, করলে ভারী খারাপ হয়। খাঁদু অ আ পর্য্যন্ত পড়েনি। আমিও আর স্কুলে যাব না, বাবা।"

ডাক্তার মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "ছিঃ মা! ও কথা বলতে নেই; স্কুলে না গেলে লোকে খারাপ মেয়ে বলবে—"

—"আপনি কিছু জানেন না বাবা! খাঁদুর মা, দিদি কেউ কক্ষণও স্কুলে যায় নি, কেউ ওদের খারাপ বলে? খাঁদুর মা বলে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়। বিধবা কি বাবা? আমাদের সদু দিদির মত, না?"

ডাক্তার উত্তর দিলেন না, চিন্তিত মুখে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণু বলিতে লাগিল, "খাঁদুর দাদা কিন্তু স্কুলে যায়, আমাকে খুব ভালবাসে, লজেঞ্চুস দেয়, খুব চমৎকার সিগারেট খেতে পারে, নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করে, দাদাকেও শেখাচ্ছে—"

ডাক্তার চমকিত হইয়া করিলেন, "কাকে শেখাচ্ছে? খোকাকে?"

ক্ষণু কহিল, "শেখাচ্ছে তো! দাদা কিন্তু বাবা ভারী বোকা, কিছু পারে না, এক টান দিয়েই কাস্তে কাস্তে চোখ মুখ লাল করে বসে। খাঁদু বলে, ওর দাদার মত সিগারেট খেতে ওর বাবাও পারে না—"

এমন সময়ে বাহির হইতে কে কহিল, "ভেতরে আসতে পারি কি?"

ডাক্তার কহিলেন, "কে অজিত, এস—"

ডাঃ অজিত চ্যাটার্জ্জী সাহেবী পোষাকে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সটান্ ডাঃ মজুমদারের কাছে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিলেন। ডাঃ চ্যাটার্জ্জী ডাঃ মজুমদারের নিকট-আত্মীয় ও জুনিয়ার, বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী নয়, অথচ এর মধ্যেই সহরে বেশ নাম করিয়াছেন।

চ্যাটার্জ্জী—"আপনি আজ বেরুবেন না?"

এ নিউ কেরিয়ার [ফর ইণ্ডিয়ান্স ওন্‌লি]
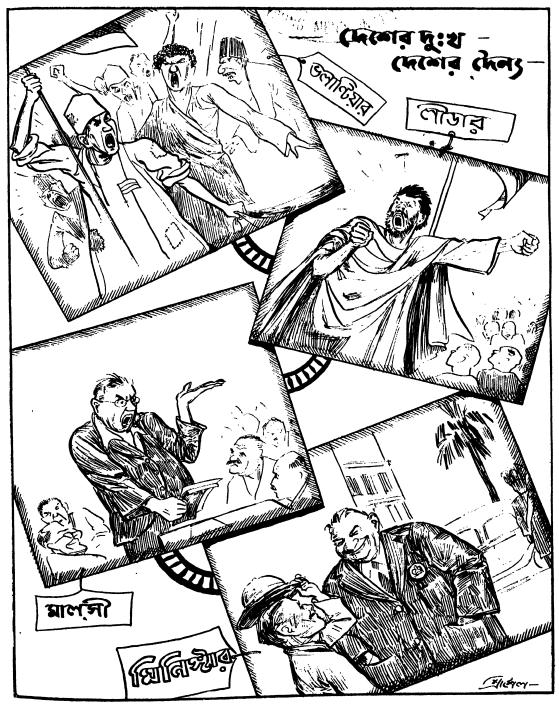
মজুমদার—"কেন বল দেখি? কোন কাজ আছে কি?"

—হ্যাঁ, বোসেদের বাড়ীর একটা কেশ, আমি টাই-ফেড বলেছি। আবার মাঝে ওরা ডাঃ চক্রবর্ত্তীকে ডেকেছিল, সে বলেছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। রোগীটা মরবে নিশ্চয়ই, তবে টাইফয়েডে মরাই ভাল, নইলে বাড়ীটা আমার হাতছাড়া হবে। আপনাকে একবার যেতে হবে দা।"

—"গিয়ে টাইফয়েড বলতে হবে, এই তো?"

—"বলতে হবে কেন? না বলে পারবেন না—It is a clear case of Typhoid, শুধু আমি বলেছি বলে চক্রবর্ত্তী বলছে না, অথচ প্রেসক্রিপশান যা করেছে, তা টাইফয়েডের।"

ডাঃ মজুমদার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "কখন যেতে হবে?"

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী বলিলেন, "ডাঃ চক্রবর্ত্তী রাত্রি আটটায় আসবে বলেছে, আমরা তার কিছু আগে গেলেই হবে। আপনার এ বেলা আর কোন কাজ নেই তো?"

"কাজ আছে বৈ কি! কতকগুলি শক্ত রোগী আছে, তাদের একবার শেষ দেখা দিয়ে আসতে হবে।"

ইতিমধ্যে ক্ষণিকা অজিতবাবুর পকেট হইতে হাত-ড়াইয়া কি খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিল, না পাইয়া আশা-ভঙ্গজনিত দুঃখ ও অভিমানের সহিত কহিল, "কাকা-বাবু, আজও আনেন নি?"

অজিতবাবু লজ্জিতভাবে কহিলেন, "আজও ভুলে গেছি মা, কাল আমি ঠিক নিয়ে আসব।"

ক্ষণু—"হ্যাঁ, আপনি কাল যা নিয়ে আসবেন জানি, কালও তো বলেছিলেন, আজ নিয়ে আসব।"

অজিত ক্ষণিকাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "না রে পাগলী! ঠিক কাল নিয়ে আসব, দেখবি। আচ্ছা, দাঁড়া"—রুমাল বাহির করিয়া "—রুমালে একটা গিঁট দিয়ে রাখি, কাল তা হলে কিছুতেই ভুলব না।"

মজুমদার এতক্ষণ ইহাদের দেখিতেছিলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কি চায় ও?"

ক্ষণিকা অজিতের মুখে হাত দিয়া কহিল, "বলবেন না কাকাবাবু, বললে ভাল হবে না কিন্তু—"

অজিত—"আচ্ছা বলব না, তুই হাত ছাড়—"

এমন সময়ে সৌদামিনী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ক্ষণু রয়েছিস—?" ক্ষণু তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিল, "কেন? আমি না, দাদা নিয়েছে—"

সৌদামিনী কাছে আসিয়া কহিল, "তোর দাদা কোথায়? দুপুর থেকে যে কোথায় বেরিয়েছে—"

ক্ষণু কহিল, "আমি কি জানি?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "দাদা খাঁদুদের বাড়ীতে—"

ডাক্তার মজুমদার কহিলেন, "মণ্টু স্কুলে যায় না?"

সৌদামিনী খন্ খন্ করিয়া কহিল, "কি করে যাবে, বাছা! বাড়ীতে একটিও গাড়ী নেই; বৌমার গাড়ী তো ও বাড়ীতে; তুমি সাত সকালে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যাও। ছোট ছেলে এতদূর হেঁটে যাবে কি করে?"

ডাঃ মজুমদার—"গাড়ীর জন্যে স্কুলে যায় না? যাদের গাড়ী নেই, তাদের ছেলেরা কি করছে?"

সৌদামিনী "তারা কি করছে কি করে জানব বাছা! ও তো তাদের ঘরে জন্মায় নি!"

ডাক্তার গম্ভীর মুখে কহিলেন, "আমাকে আগে বললেই পারতে?"

—"কখন তোমায় বলব? কেউ কি তোমরা বাড়ীতে থাক? তা ছাড়া কোন্ দিক্ আমি দেখি বাছা! আমি তো বলেই দিয়েছি, তোমাদের সংসার তোমরা দেখ, আমি আর পারছি না। আমার বয়স হয়েছে; আমাকে তোমরা ছুটী দাও—কি বল বাবা, অজিত! আমি অন্যায় বলেছি?"

অজিত কহিল, "অন্যায় আর কি মাসী! নিজেদের সংসার নিজেরাই তো দেখা উচিত।"

—"তাই বল বাছা! এই ধর তোমার বৌ, কেমন মেয়েটি বল দেখি বাছা। যেমন রাজলক্ষ্মীর মত রূপ, তেমনি গুণ, সংসার দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়; আর আমাদের বৌমা—"

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, "মনুকে একবার আমার কাছে ডেকে দাও দিকি মাসী—"

সৌদামিনী—"যাচ্ছি বাছা! দাঁড়াও—আমাদের বৌমাটি ধিঙ্গি হয়ে সারা সহর নেচে বেড়াচ্ছেন, সংসারের কুটোটি পর্য্যন্ত দেখছেন না—"

ডাক্তার—"খোকাকে একবার ডেকে দাও না মাসী!"

সৌদামিনী—"যাচ্ছি বাছা! যাচ্ছি, তোমার আবার সবই আশ্চয্যি, উঠল বাই তো দিল্লী, মক্কা, ধাক্কা যাই—এদিকে ছেলে-মেয়ের নাম পর্য্যন্ত কব না—আয় ক্ষণি আয়—"

ক্ষণিকা কহিল, "দোক্তার কৌটো কিন্তু আমি নিইনি! দাদা নিয়েছে, ওর বন্ধুকে দিয়েছে"—মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কাকাবাবু, কাল না আনলে ভাল হবে না কিন্তু—"

ক্ষণু ও সৌদামিনী চলিয়া গেলে, ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চায় ও?"

অজিত কহিল, "কে ওর বন্ধু সাবান চেয়েছে, তাই আমার উপর এক বাক্স সাবান আনবার হুকুম হয়েছে—"

ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "কি করা যায় বল দেখি অজিত?"

অজিত সপ্রশ্ন মুখে ডাক্তারের দিকে চাহিল—

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "তোমার বৌদিদি তো নারী-সমিতিতে মেতেছেন। আমি প্র্যাক্‌টিস্ নিয়ে সারা দিন রাত বাইরে কাটাচ্ছি,—এ দিকে ছেলে-মেয়ে দুটো মা-বাপ-মরা ছেলেদের মতো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, যার তার সঙ্গে মিশছে, সিগারেট-দোক্তা খেতে শিখছে, আর যত কিছু নোংরা বিদ্যে শিখে আসছে"

অজিত কহিল, "বৌদিদি কি কিছু দেখছেন না?"

ডাক্তার কহিলেন, "সে কি এ বাড়ীতে আছে না কি? আজ এক মাস এ পাশ মাড়ায় নি—। ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি যে কি করি, বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"হ্যাঁ হে অজিত, আমাদের বৌমা সমিতিতে নেই?"

অজিত—"না, ও সব হাঙ্গামোয় ও থাকে না। সংসারের কাজে সময় পায় না, তা' ছাড়া ওদের ও সব সয় না।"

ডাক্তার—"তার মানে?"

অজিত হাসিয়া কহিল, "ওর দিদি ছিল স্বদেশী পাণ্ডা: বিলেতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করত, প্রসেশন্ নিয়ে সমস্ত রাত্রি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, হরতালের দিন কলেজ গেলে কলেজের ছেলেদের কান মলে দিত, এমন কি আমার শ্বশুর মশায় সরকারী চাকরী ছাড়তে চাননি বলে hunger strike করেছিল। তারপর, হল তার পায়োরিয়া, দাতে পুঁজ, মুখে বিশ্রী গন্ধ;—যাকে দেখে নেতাদের মাথা ঘুরে যেত, তারাই ও কাছে গেলে নাক ঘুরিয়ে নিতে লাগল; ভলান্টিয়ারের দল যার আশে পাশে পরম নিষ্ঠা সহকারে ভিড় করত, তারাই ততোধিক নিষ্ঠার সহিত ওকে বর্জ্জন করতে লাগল। শেষে দিন কয়েক দেশোদ্ধার বন্ধ রেখে ও বাড়ীতে ফিরল এবং ডেন্টিষ্টকে ডেকে সব দাঁত ফেলে দিয়ে দামী পাথরের দাঁত লাগাল। কিন্তু ফিরে গিয়ে দেখল যে, ইতিমধ্যে জনৈকা সুদর্শনা ও সুদশনা তার স্থান দখল করেছে। ভাঙ্গা আসর আর জমাতে না পেরে শেষে মনের দুঃখে ঘরে ফিরল এবং মাসখানেক পরে এক নিরীহ প্রফেসারের ঘাড়ে চড়ে বসল।"

—"তারপর?"

—"তারপর? চুটিয়ে সংসার করছে। কিন্তু ওদের বাড়ীতে মেয়েদের মধ্যে এমন panic জন্মে গেছে যে, কেউ পারতপক্ষে কোন হাঙ্গামার নাম পর্য্যন্ত করে না।"

ডাক্তার কহিলেন, "তোমার ভাগ্য ভাল হে অজিত! কিন্তু আমি কি করি বল দেখি? তোমার বৌদিদি সহজে ফিরবে বলে মনে হয় না; কারণ আমি ওর ভাব দেখে বুঝেছি যে, আমাদের উপর ওর বিন্দুমাত্র টান নেই। একটা fotish ওকে এমনি পেয়ে বসেছে যে, নিজের সর্ব্বস্ব বলি দিতে ওর বাধছে না।"

অজিত—"আপনি ঘাবড়াবেন না দাদা! ওটা একটা ভাবের সাময়িক নেশা মাত্র। আপনি জানেন না, অসহযোগ আন্দোলনের হিড়িকে কত মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল—"

ডাক্তার—"তা তো জানি ভাই! আর এও জানি, তাদের অনেকে আর ফিরতে পারে নি—"

—"বৌদিদির মত মেয়ে কোন দিন কোন অন্যায় কাজ করতে পারবেন বলে আমার মনে হয় না দাদা !"

—"আমারও তাই মনে হয়। তবে কি জান, ন্যায়-অন্যায় মানুষের মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সহজ অবস্থায় যা' অন্যায় বলে মনে হয়, উত্তেজনার নেশায় তাকেই আবার অত্যন্ত মহৎ কাজ বলে মনে হতে বাধে না। নরহত্যা পাপ, কিন্তু ধর্ম্ম ও দেশ-প্রীতির উন্মত্ততায় মানুষ নরহত্যাকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলে মনে করে—"

—"আপনি কি বলতে চান ?"

—"আমি বলতে চাই, তোমার বৌদিদি বাংলার নারী-সমাজের ভাঙ্গা-গাড়ীটাকে যতদূর পারেন, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান, কারও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু উনি যদি দড়াদড়ি ছিঁড়ে খটাখট্ শব্দে লোকের কানে তালা লাগিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকেন তো লোকে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে এবং আমার সম্বন্ধে সাধুবাদ করবে না।"

চিন্তান্বিত ভাবে অজিত কহিল, "কি হয়েছে খুলে বলুন দেখি - "

ডাক্তার কহিলেন, "কেন, বৌমা তোমাকে কিছু বলেন নি ?" অজিত ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, "ব্যাপারটা এই - নারী সমিতির যাঁরা পাণ্ডা, অর্থাৎ তোমার বৌদিদি এবং আরও জনকয়েক মেয়ে, সহকর্ম্মী-হিসেবে একজন ছোকরাকে ওদের আফিসে নিয়েছে। ওদের দলের বাকী মেয়েদের আপত্তি ওরা শোনে নি, আমিও ক্ষীণ আপত্তি জানিয়েছিলুম, তা' তোমার বৌদিদি যা' তা' যুক্তি দিয়ে আমার আপত্তি উড়িয়ে দেয়। এখন হয়েছে কি, আমার মত যারা হাঁটু-জলে সাঁতার দিতে ভালবাসে, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে, পাছে তাদের শান্তশিষ্ট মেয়েগুলি পা হড়্কে অথৈ জলে গিয়ে পড়ে। তারা নানারকম আলোচনা করছে, কুৎসিৎ ইঙ্গিত করছে—এক অসুবিধে যে, এই সব আলোচনা ও ইঙ্গিত আমার শ্রবণশক্তির পরিধির বাইরে নয়। আমাকে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত প্র্যাক্‌টিস তুলে দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

—"কিছু করতে হবে না আপনাকে, বৌদিদি শীগ্‌গির ফিরে আসবেন। নারী-সমিতির আয়ু আর বেশী দিন নেই।"

সপ্রশ্ন মুখে ডাক্তার কহিলেন, "অর্থাৎ ?"

অজিত কহিল, "অর্থাৎ রোগের বীজ ওরা নিজেরাই জুটিয়েছে। ঐ যে ছোকরাকে ওরা চাকরী দিয়েছে, ওই হবে ওদের সর্ব্বনাশের কারণ। পঞ্চপাণ্ডব এক স্ত্রীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করেছিলেন শুনতে পাই, কিন্তু পঞ্চনারীর যদি একটি মাত্র স্বামী থাকে, তা'হলে চুলোচুলি করে তাদের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটতে দেরী হয় না। ঐ ছোকরাকে ঘিরে এর পর ওদের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের এমনি ঘূর্ণী-বাতাস বইতে থাকবে যে, নারী সমিতির সভ্যা-গুলি একে একে ছিট্‌কে নিজের নিজের ঘরে ফিরে আসবেন—"

ডাক্তার—"অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও যে, তোমার বৌদিদি একদিন ঘরে ফিরবেন ?"

—"নিশ্চয়ই। তবে উর ফিরতে কিছু দেরী হতে পারে, কারণ উনি ফ্যাশনের খাতিরে নয়, সত্যি দরদ নিয়ে কাজে নেমেছিলেন—"

—"বেশ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে থাকব, কিন্তু ছেলে-মেয়ে দুটোর শিক্ষা-দীক্ষা তো ততদিন অপেক্ষা করতে পারবে না ভাই। এখনই তার একটা ব্যবস্থা করা দরকার—" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, "এ সম্বন্ধে একদিন বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে ওঁরাই ভাল বোঝেন—"

—"তাই হবে। তা' হলে এর পর বেরুনো যাক, কি বলেন ?"

ডাক্তার পোষাক পরিবার জন্য উঠিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বাহির হইয়া গেলেন।

[৫]

দিন কয়েক পরে। সময় বেলা তিনটা। বিজলী তাহার কক্ষে বসিয়া মনোযোগ সহকারে কি লিখিতেছিল। আজ বেলা পাঁচটায় নারী-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশন, বোধ করি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময়ে বাহির হইতে নারীকণ্ঠ শ্রুত হইল,—"ভেতরে আসতে পারি কি ?" বিজলী মুখ না তুলিয়াই কহিল, "হাঁ, আসুন।" একজন পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া সুন্দরী যুবতী ভিতরে প্রবেশ

করিল। টেবিলের কাছে আসিতেই বিজলী কহিল, "বসুন।" তারপর মুখ তুলিয়া কহিল, "আরে! সুনীতি যে! বস ভাই, বস। আমি ভেবেছিলাম আমাদের সমিতির কোন মেম্বার—"

যুবতী মৃদু হাসিয়া কহিল, "কেন, তা' হলে বুঝি ঢোকবার অনুমতি দিতে না—"

—"পাগল! তা' আবার কি! তুমি তো এদিক মাড়াও না, ওখানে থাকতে তবু দু' একদিন দিদিকে মনে পড়ত; আজ আমার ভাগ্য ভাল, কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, মনে করে দেখি—" বলিয়া কপাল কুঁচকাইয়া চিন্তার ভাণ করিল।

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "বেশী চিন্তা করতে হবে না; উঠেই বোধ হয় মেথরাণীর মুখ দেখেছিলে?"

—"তা' বৈকি! এত সহজে বুঝি তোমার দেখা পাওয়া যায়! মনে পড়েছে, উঠেই শ্রীমতী উষারাণীর মুখ দেখেছিলাম—"

—"তিনি আবার কে? তোমার সমিতির কোন মেম্বার বুঝি?"

—"না ভাই, আমাদের সাধ্য কি তাঁকে মেম্বার করি; বাড়ীর পাশের শ্রীমতী সুনীতিরাণীকেই মেম্বার করতে পারি নি, উষারাণী তো নাগালের বাইরে—"

—"ও বুঝেছি। রাত্রে ঘুম হয় নি, খুব ভোরে উঠেছিলে; তা' এত কষ্ট করে কাজ কি দিদি! বড়ঠাকুরের কাছে ফিরে গেলেই পার, ঘুমের ওষুধ আছে—"

—"আছে না কি? ও, তাই বুঝি তোমার বড়ঠাকুরের চেলাটি তোমাকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে; একটু চোখ মেলে দিনের আলো পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই—"

—"আমাকে ঘুম পাড়াতে হয় নি, দিদি। আজন্ম ঘুমিয়েই আছি। আর দিনের আলো? ঘুমের দেশের জীব আমি, আলো সহ্য হবে কেন দিদি?"

—"ঘুমের দেশ? কথাটা খুব গৌরবের নয় ভাই। সকল দেশের আকাশে মধ্যাহ্ন-সূর্য্য জ্বলছে, আর তোমার দেশের আকাশে সূর্য্যোদয়ও হয় নি, এ যদি বুঝতে পেরে থাক তো, আর না ঘুমিয়ে জেগে উঠে বস; এই ঘুমের দেশে প্রদীপ জ্বালিয়েও চোখ দুটোকে এখন থেকে সইয়ে নাও—কারণ সূর্য্যোদয়কে তো ঠেকাতে পারবে না ভাই।"

—"ঠেকাতে চাইনে দিদি। কিন্তু তা' বলে মশাল জ্বেলে মাতামাতিও করতে চাইনে। যখন রাত্রি শেষ হবে, তখন প্রভাতের শুভ্র আলোতে কমলের মত আপনি ফুটে উঠব—"

—"কথাটা শুনতে খুব ভাল; ঠাকুরপো এবং তাঁর অগ্রজ কাছে থাকলে শুনে পুলকে তাঁদের চোখে জল আসত; কিন্তু কথা কি জান, ঘুমের দেশেও জীবনযাত্রা আলোর দেশের মত বইতে থাকে, প্রয়োজনের তাগিদ মেটাতে আয়োজন ও আহরণ করতে হয়, শুধু ঘুমিয়ে থাকলে চলে না। আর ঘুমিয়েও তোমরা কেউ নেই, ঘরের মধ্যে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মাথা ঠুকে মরছ, আর ঘরের বাইরে তোমাদের পূজনীয় স্বামী-দেবতার দল মশাল জ্বালিয়ে ফূর্ত্তি করছে—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিজলী কহিল, "থাক্‌গে ভাই, ও-সব কথা। কতদিন পরে দেখা হল, কথা কাটাকাটি করে সময় নষ্ট করে কাজ নেই। তোমাদের সব খবর ভাল তো? ঠাকুরপো, ছেলেরা সব ভাল আছে?"

—"হ্যাঁ, সব ভাল। ও বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা না করলেও বলি, তোমার কর্ত্তাটি ভাল আছেন, ক্ষণু, মণু ভাল আছে—"

—"অযাচিত অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, ভাই। কিন্তু সম্প্রতি ওদের কুশলবার্ত্তা শোনবার সময় নেই, আমার অন্য কাজ আছে—"

—"বল কি দিদি! স্বামীর না হোক, ছেলে-মেয়ের কুশলবার্ত্তা শোনবার তোমার সময় নেই? তোমরা কি প্রকৃতির আইন উল্টে দেবে না কি? নারী-প্রগতি মানে মাতৃত্বের মৃত্যু নয়।"

—"তা' নয় এবং তা' চাইও না। তবু মাতৃত্বের আগে আমরা মনুষ্যত্ব চাই। প্রকৃতির আইন মেনে চলাই সব সময় মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথ নয়, সুনীতি। যদি জগতে প্রকৃতির আইনই একমাত্র আইন হত, তবে কোথায় থাকত তোমার সভ্যতা! কোথায় থাকত তোমার সমাজ!

প্রকৃতির আইন ভেঙ্গেই মানুষ পশুত্বের উপরে উঠেছে—যাক, আবার তর্ক করতে আরম্ভ করলুম। না ভাই, ও সব থাক, তোমার খবর বল। আজ যে হঠাৎ এলে, তা কি পথ ভুলে, না দিদির জন্যে মন কেমন করছিল?"

—"সত্যি দিদি, তোমার জন্যে ভারী মন কেমন করছিল, সেদিন বড়ঠাকুর আমাদের ওখানে এসেছিলেন, তাঁর মুখে তোমার কথা শুনলুম—"

—"কি বলছিলেন? খুব নিন্দে করছিলেন বুঝি?"

—"তোমার নিন্দে কি কখনও করেন দিদি? খুব প্রশংসা করছিলেন—"

বিস্মিত কণ্ঠে বিজলী কহিল, "প্রশংসা করছিলেন? সত্যি?"

সুনীতি কহিল, "বলছিলেন, বাঙ্গালা দেশে তোমার মত মেয়ের জন্ম হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে দেশের মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে এমনি আঁকড়ে পড়ে থাকে যে, স্বয়ং যমরাজ এসে চুলে ধরে টানাটানি করলেও নড়তে চায় না, সেই দেশের মেয়ে হয়ে তুমি একটা আদর্শের পায়ে স্বামী, পুত্র, সংসার, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বলি দিতে চলেছ। তুমি না কি বাংলা দেশের জোয়ান অব্ আর্ক—"

—"চুপ কর, সুনীতি। খুব হয়েছে। ঠাট্টা বুঝবার মত বয়স এবং বুদ্ধি আমার হয়েছে—"

—"ঠাট্টা? বল কি দিদি। আমি তোমাকে ঠাট্টা করব? কখনও করতে দেখেছ কি?"

—"তুমি কেন করবে, ভাই। করছেন তোমার বড়ঠাকুর—"

—"ঠাট্টা বোঝবার বয়স আমারও হয়েছে দিদি। ঠাট্টা উনি করেন নি—"

"তবে?"

—"বরং দুঃখ করছিলেন। বলছিলেন, তোমার সঙ্গ-[...] হয়ে তাঁর স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে—"

—"বিশ্বাস হয় না, সুনীতি, ও কথা তিনি বলেছেন। চোখের উপর দিনের পর দিন কাটিয়েছি, একবার মুখ তুলে চেয়ে দেখেন নি, medical journal-এর [...]লের চেয়ে শক্ত রোগের সকলের চেয়ে modern treatment পড়ে সময় নষ্ট করেছেন। রাত্রি তিনটে পর্য্যন্ত রোগীর বাড়ীতে কাটিয়েছেন, আমি জানালার ধারে বসে পথের দিকে চেয়ে কাটিয়েছি সমস্ত রাত, উনি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করেন নি, কেন জেগে আছি, কি আমার প্রয়োজন। সেই মানুষ কয়দিনের ভেতর হঠাৎ এমনি বদলে গেছে যে অত্যন্ত আধুনিক লেখকের অত্যন্ত আধুনিক নভেলের নায়কের মত বুলি কাটছেন। সত্যি বিশ্বাস হয় না। তুমি হয়ত ভুল শুনেছ সুনীতি।"

সুনীতি কহিল "না দিদি, ভুল শুনব কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বড়ঠাকুর কি তোমাকে ভালবাসেন না বলে তোমার বিশ্বাস?"

বিজলী কহিল, "স্বামী ভালবাসেন না, এ কথা বলা কোন মেয়েমানুষের গৌরবের কথা নয়, সুনীতি। গভীর লজ্জার কথা। এই পর্য্যন্ত বলতে পারি, তিনি আমার চেয়ে তাঁর প্র্যাকটিসকে বেশী ভালবাসেন।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "এতে দুঃখ করবার কিছু নেই, সুনীতি। সব পুরুষ মানুষই তাই, ভালবাসতে তারা পারে না, ভালবাসা তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"

সুনীতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "সে কি দিদি।"

বিজলী কহিল, "হ্যাঁ তাই। ভালবাসা পুরুষের একটা passion, হৃদয়ের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সূর্য্যের আলোতে যেমন চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আমাদের ভালবাসার আলোতে তাদের কঠিন, কর্কশ হৃদয় ঝলমল করে, আমরা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই, কি স্নিগ্ধ, হৃদয় জুড়ানো আলো, বুঝতে পারি না, সে আলো তাদের ধার-করা, বুকের ভিতরের দাহ হতে তার জন্ম নয়'—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—"পুরুষ কোন দিনই মেয়েদের ভালবাসেনি ভাই, তারা ভালবাসতে জানে না, ভালবাসা তাদের ধর্ম্ম নয়—"

—"বল কি দিদি। পুরুষ ভালবাসতে জানে না? তা হলে তারা দেহের রক্ত জল করে সংসার গড়ে, তাকে মনের মত করে সাজিয়ে আমাদের লক্ষ্মীর সিংহাসনে বসায় কেন? আমাদের পায়ে কাঁটাটি ফুটতে না দিয়ে কেন তারা সমস্ত হীনতা, লাঞ্ছনা মাথা পেতে নেয়, মনুষ্যত্বকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে পিছপাও হয় না? পুরুষ যদি

ভাল না বাসত দিদি, তা হলে বুকের রক্ত, দেহের অস্থি দিয়ে এই সভ্যতাকে গড়ে নারীকে পায়ের নীচে না রেখে মাথায় করে রাখত না—"

মৃদু হাসিয়া বিজলী কহিল, "এইই তার ধর্ম্ম ভাই। নদী বয়ে যায়, তার শীতল জলে স্নান করে দেহের দাহ যায় জুড়িয়ে, তার প্রবাহ দুই তীরের মাটিকে উর্ব্বর করে, শস্য-শ্যামল করে; আবার বর্ষায় তারই বন্যা দুই তীরে হাহাকার তোলে। এতে নদীর কৃতিত্ব কিছু নেই, তাকে নিন্দা করবারও কিছু নেই; এই তার ধর্ম্ম—"

—"অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম। নারীর ভালবাসাও তো তা' হলে প্রকৃতির নিয়ম, দিদি। তাতেই বা তার কৃতিত্ব কি?"

—"কিছু আছে বৈ কি ভাই! মিষ্টি সুর বাঁশের বাঁশীতেই বাজে, শালগাছের গুঁড়িতে নয়—"

এমন সময়ে বাহির হইতে নারীকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, "ভেতরে আসতে পারি কি?"

বিজলী কহিল, "আসুন।"

একটি ষোল কি সতের বৎসর বয়সের মেয়ে ঘরে ঢুকিল—সুন্দরী, কৃশাঙ্গী, মুখখানি সুশ্রী, কিন্তু ভোরের চাঁদের মত ম্লান, বিষণ্ণ; সে যেন সর্ব্বদা হৃদয়ের মধ্যে একটি গভীর বেদনাকে বহন করিতেছে—

মেয়েটি একখানি হিসাবের খাতা টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, "মেয়ে-স্কুলের হিসেব ঠিক করে দিয়েছি -"

বিজলী গম্ভীর ভাবে কহিল, "নাইট্-স্কুলের হিসেব-টাও চাই; সময় বড় কম, বাজে কাজ না করে চট্পট্ করে ফেলুন গে—"

মেয়েটি বিজলীর দিকে একবার তাকাইয়া মুখখানি নীচু করিল। বিজলী নীরস কণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, এখন যেতে পারেন—" মেয়েটি নত মস্তকে বাহির হইয়া গেল। সুনীতি মেয়েটির পানে তাকাইয়া ছিল।

মেয়েটি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে সে প্রশ্ন করিল, "মেয়েটিকে চেনা মনে হচ্ছে—"

বিজলী কহিল, "পাগল! তুমি ওকে চিনবে কি করে? ওর বাড়ী এখানে নয়—"

—"কোথায় ওর বাড়ী?"

—"পূর্ব্ববঙ্গে।"

—"তোমার কাছে জুটল কি করে?"

—"কি জানি, নাম শুনে এসেছে বোধ হয়। গরীবের মেয়ে; বাপ নেই, বিধবা মা আছে। অনেক কষ্টে ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরীর চেষ্টায় আমার কাছে আসে। আমারও এমনি একটি মেয়ের দরকার ছিল মেয়ে-স্কুলের জন্যে; ওকেই রাখলুম—"

—"মেয়েটিকে দেখে ভারী sincere মনে হল—"

বিজলী জবাব দিল না; কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিল, "তোমাদের বড় ডাক্তার বাবু তা' হলে পত্নী-বিরহে খুব জখম হয়েছেন, বল। থিয়েটারের রামচন্দ্রের মত 'সীতা' 'সীতা' বলে ডাক ছাড়ছেন না তো?"

হাসিয়া সুনীতি কহিল, "ছাড়ছেন বৈ কি! তবে 'সীতা' 'সীতা' বলে নয়, 'বিজলী' 'বিজলী' বলে—"

—"দিন কয়েক সবুর কর সুনীতি। শুনতে পাবে 'বিজলী' নয়, আর কোন মেয়ের নাম করে ঠিক এমনি সরবে হুঙ্কার ছাড়ছেন—"

—"যদি ছাড়েন তো' দোষ দেব না, দিদি। বরং বরণ-ডালা সাজিয়ে সেই মেয়েকে ঘরে আনবার ব্যবস্থা করব।...উনিও তাই বলছিলেন সেদিন—"

—"তাই না কি! দুজনে মিলে পরামর্শও হয়ে গেছে—না ভাই! এত তাড়াতাড়ি ক'র না, ওঁকে দিন কয়েক মেয়েমানুষের অভাব সহ্য করতে দাও; তা' হলে এর পরে যে আসবে তাকে অবহেলা করতে পারবেন না"

—"অবহেলা কি তোমাকেই করেছিলেন দিদি! তুমি ভুল বুঝে ওঁর উপর অবিচার করেছ—"

—"অবিচার করেছি? অর্থাৎ তুমি বল্তে চাও, গানের মধ্যে দরদের মত, তোমার বড়ঠাকুরের নিরবচ্ছিন্ন কাজের মধ্যে, আমার ওপর ভালবাসা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল, এই তো? হতে পারে হয় তো; কিন্তু ভাই! আমার বুদ্ধি অত্যন্ত ঘোলাটে, ও সব সূক্ষ্ম জিনিষ বোঝবার আমার সাধ্য নেই। ফুলের চেয়ে এসেন্স আমার বোধগম্য চিনির চেয়ে স্যাকারিন্। অবিচার যদি হয়েই থাকে, দোষ আমার নয়, আমার সৃষ্টিকর্ত্তার—কিন্তু থাক গে

ভাই ও সব কথা, স্বামী ভালবাসতেন কি বাসতেন না এ প্রশ্ন আমার পক্ষে এখন নিরর্থক। আমার মন অবাধ আকাশের মধ্যে মুক্তি পেয়েছে, পিঞ্জরের প্রেম তাকে ধরাতে পারবে না—"

এমন সময়ে বাহিরে মোটরের হর্ণ ঘন ঘন বাজিয়া উঠিতে লাগিল। সুনীতি কহিল, "আজ আসি ভাই দিদি!"

বিজলী কহিল, "এখনই যাবে? থাক না আর একটু—"

—"না ভাই! আমি না গেলে উনি বেরুতে পারবেন না—" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজলী হাসিয়া কহিল, "কেন? তোমার মুখ না দেখে বেরুলে রোগীরা কি ঠাকুরপোকে ফি দেবে না না কি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, তাই তো! আমার মুখ না দেখে বেরুলে কি দুর্দ্দশা হয়, তোমার ঠাকুরপোকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখো না? একদিন ছিলাম না, না' তা' করে টাই বেঁধে গেছে এক আই. সি. এস এর স্ত্রীকে দেখতে; তার ও রকম টাই বাঁধা দেখা সহ্য হবে কেন? একেবারে মূর্চ্ছার উপক্রম; তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে রোগীর প্রাণ আর নিজের মান বাঁচাতে হয়" আবার মোটরের হর্ণ—"আচ্ছা চলি দিদি -" বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার ফিরিয়া কহিল, "একটা কথা মনে হ'ল দিদি! তোমার চেনা কোন মেয়ে আছে, বেশ শিক্ষিত, ভদ্র ছেলেমেয়ের ভার নিতে পারে?"

বিজলী প্রশ্ন করিল, "কেন বল দেখি?"

সুনীতি জবাব দিল, "ক্ষণা নন্দর জন্যে বড়ঠাকুর এক জন গভর্ণেশ রাখতে চান।"

—"গভর্ণেশ কেন? তারা একজন টিউটার রাখলেই তা পারেন?

—"উনিও তাই বলেছিলেন। কিন্তু বড়ঠাকুরের তা' পছন্দ হচ্ছে না।"

ভ্রূক কুচকাইয়া বিজলী কহিল, "পছন্দ হচ্ছে না কেন?"

সুনীতি কহিল, "উনি বলছেন, পুরুষদের হাতে ছেলে-মেয়েদের মন বেশ শক্ত হয়ে গড়ে ওঠে বটে, কিন্তু তাতে সৌন্দর্য্য থাকে না—"

—"তাই না কি।" তারপর গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমার ভাই চেনা তেমন কোন মেয়ে নেই—"

—"তা' হলে, আসি দিদি।" বলিয়া সুনীতি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। [ক্রমশঃ

মাইকেল মধুসূদন

—শ্রীঅমিত রায়

জীবনকে রঙ্গমঞ্চ বলা হইয়াছে, কিন্তু ইহার নেপথ্য কোথায়? জীবনের মধ্যেই কোথাও নিশ্চয় আছে, তবু চোখে পড়িতে চায় না। সাধারণ লোকে জীবনের রঙ্গমঞ্চে যে-ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তাহার সঙ্গে নেপথ্য-বিধানের বড় প্রভেদ নাই। রঙ্গমঞ্চেও তাহারা কেরাণী, ইস্কুল মাষ্টার, ভৃত্য এবং ভিখারী, নেপথ্যেও তাহাই; আচারে, ব্যবহারে পোষাকে, কথাবার্ত্তায় প্রভেদ এতই কম যে, দুই জায়গাতেই প্রায় তাহাদের এক রকম মূর্ত্তি; পার্থক্য চোখে পড়ে না; কাজেই আমরা নেপথ্যের কথা এক রকম ভুলিয়াই থাকি।

মাঝে মাঝে দু'চার জন অসাধারণ ব্যক্তি আসেন, যাঁহাদের রঙ্গমঞ্চের মূর্ত্তি আর নেপথ্যের মূর্ত্তিতে ভেদ অনেক; এই বৈচিত্র্যের রহস্য আমরা বুঝি না; তাই তাঁহাদের কেহ বলে ভণ্ড, কেহ বলে অভিনেতা, আর এই দুটি কথাই একার্থ বাচক, কারণ অভিনেতা ভণ্ড বই কি! তবে তাঁহাদের ভণ্ডামি নির্দ্দোষ এবং সরল।

মধুসূদন এই রকম একজন অসাধারণ ব্যক্তি, তাঁহার দীপোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের মূর্ত্তি ও অপেক্ষাকৃত ম্লান নেপথ্য-কক্ষের মূর্ত্তিতে মিলিতে চায় না; আমরা ভাবি লোকটা কি রকম। এক মুখে কত রকম কথাই না বলিতেছে; আবার বলে এক, করে আর; ইহাকে বুঝিয়া ওঠা মুস্কিল; রাগিয়া বলি লোকটা শঠ, কিন্তু মনে রাখা কি খুবই কঠিন যে যাহা কিছু প্রভেদ, তাহা সাজ-পোষাকের; ভাব-ভঙ্গীর, কথাবার্ত্তার; কিন্তু এ সবের তলের লোকটা একই।

এতক্ষণ মধুকে যে ভাবে দেখিয়াছি সে ওই রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা; সহস্র চক্ষুর দীপ্ত দৃষ্টির সম্মুখে করতালি-মুখরিত প্রেক্ষাগৃহের ভূমিকায় অবতীর্ণ মধুসূদন; এবার তাহার নেপথ্য-মূর্ত্তি দেখা যাক্।

মধু বন্ধু গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

> আমার দিন বড় অশান্তিতে কাটিতেছে; মা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তার পরে কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন আজ প্রায় চার দিন হইল মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। আমি গত চার রাত্রির মধ্যে একবারও চোখের পাতা বন্ধ করি নাই।

কয়েকদিন পরে আবার—

> অভাবিতপূর্ব্ব আকস্মিক এক বিপদে আমি মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছি; আমার এক আত্মীয় মারাত্মক ব্যাধিতে শায়িত, সত্য কথা বলিতে কি, ব্যাধির শেষ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার ব্যাধির যন্ত্রণায় আমার মন বড় বিষণ্ণ।

মধুসূদনের এ চিত্রদর্শনে আমরা অভ্যস্ত নই। তাঁহার নিজের জীবনের শেষ ব্যাধিতে দেখিয়াছি বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তিনি যে নিজেও একদিন যৌবনের প্রগল্‌ভতার মধ্যে চারি রাত্রি অনিদ্র থাকিয়া অসুস্থ আত্মীয়ের শিয়রে বসিয়া ছিলেন, ইহা কেমন যেন আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্য্য তো বটেই, কারণ এ মানুষ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা নয়, নেপথ্যের আত্মীয়।

কিন্তু জন্ম-অভিনেতা মধুসূদন কি বেশীক্ষণ নেপথ্য-গৃহে থাকিতে পারেন? পতঙ্গের পক্ষে যেমন দীপালোক, অভিনেতার পক্ষে তেমন পাদ-প্রদীপালোক; নেপথ্যের অন্ধকার তাহাদের কাছে বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেকার অন্ধকার। স্বয়ং বিশ্ব বিধাতা চরম ও আদিম অভিনেতা; একদা তিনি নেপথ্য কক্ষের অন্ধকারে বিরক্ত হইয়া Let there be light বলিয়া সহস্র সূর্য্য-চন্দ্র-তারার উজ্জ্বল পাদ-প্রদীপ-রাজি জ্বালাইয়া দিয়া রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

মধু লিখিতেছেন:—

> আমি যাইতেছি, কিন্তু বন্ধু, যশোরে নয়, আমার পিতার এক সম্ভ্রান্ত বন্ধুর বাড়ীতে। তিনি তমলুকের রাজা।

যে-ঐশ্বর্য্যকে মধু আজীবন আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই রাজ-নিমন্ত্রণে যেন তারই স্বাদ পাইয়া মধু উল্লসিত। আবার কয়েক ছত্র পরেই—

গত মঙ্গলবারে আমার কয়েকটি কবিতা ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনের সম্পাদকের নামে পাঠাইয়াছি। কবিতাগুলি তোমার নামে উৎসর্গ করি নাই—করিয়াছি উইলিয়াম ওয়াডস্বার্থের নামে!

মধু যে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার ভক্ত ছিলেন এমন পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু ওয়ার্ডস্বার্থের খ্যাতিকে তিনি অগ্রাহ্য করেন কেমন করিয়া। ঐ রাজার মধ্যে যেমন ঐশ্বর্য্যটাও লোভনীয়—এখানে কবির মধ্যে তেমনই তাঁহার খ্যাতি। মধু তো এই দুটা বস্তুরই কাঙাল।

আর এক খানি পত্রে তিনি তমলুকের মত জঘন্য স্থানে আসিয়া যে কি অন্যায় করিয়াছেন তা বলিতেছেন, এমন জায়গায় লোকে আসে। কিন্তু সান্ত্বনার কারণও খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তিনি সেই সমুদ্রের কাছে আসিয়াছেন, যে সমুদ্র একদিন তাঁহাকে ইংলণ্ডের অভিমুখে লইয়া যাইবে। আবার নদিনও বেশী দূর নয়। কলিকাতা ছাড়িয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই, তবু খানিক পরিমাণে ইংলণ্ডের কাছে আসিয়াছেন। কলিকাতা হইতে তমলুকের দূরত্ব পঞ্চাশ মাইল।

এক খানি পত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

একটা কথা দুঃখের সঙ্গে জানাইতেছি, যেটুকু ইংরাজি জানিতাম তার অর্দ্ধেক ভুলিয়া গিয়াছি, এবং কবিতা লিখিবার যে-সামান্য শক্তি ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে চলিয়া গিয়াছে। জানিয়া রাখ যে, একটা বিষয়ে কবিতা লিখিতে গিয়া দেখি যে, চার ঘণ্টার এক ছত্রও লিখিতে পারিলাম না। হয় আমার কাব্যলক্ষ্মীকে তোমার কাছে ফেলিয়া আসিয়াছি, নতুবা তিনি অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন! আমার দিন শেষ হইয়াছে ভাবিও না, আমার বিশ্বাস কাব্য-লক্ষ্মী তমলুকের মত স্থানে আসিতে দ্বিধা বোধ করেন। কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিও কবিতা লিখিয়া তোমাকে একেবারে ডুবাইয়া দিব!

কোন্ মধুসূদনের উক্তি! অভিনেতার, না, নেপথ্য-... বোধ হয় যুগপৎ উভয়েরই।

কেবল প্রকৃত কবিরই মাঝে মাঝে এই রকম সন্দেহ উপস্থিত হয়,—বোধ হয় আর কবিতা লিখিতে পারিব না। কাব্যলক্ষ্মীর রহস্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, তাঁহার গতিবিধির উপর তাঁহাদের কর্তৃত্ব নাই। সংসারের কবিরা সহজে অসহায়। অবশ্য ধার্ম্মিক কবিরা ঘড়া ধরিয়া কবিতা লিখিতে পারে, কাব্যলক্ষ্মীর উপরে বিশ্বাস করিলে তাহাদের চলে না।

কলিকাতা ও বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য

কলিকাতার শান বাঁধানো মাটিতে ঘাস গজাইতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের জন্ম কলিকাতাতেই। বিশেষ, মধুসূদনের কাব্য-প্রেরণা কলিকাতার বাস্তব জীবন, কলিকাতার বন্ধুদের সাহচর্য্যের অপেক্ষা রাখে। কলিকাতা ছাড়িলে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী মূক, কলিকাতায় ফিরিলেই তিনি আবার মুখর। মধুসূদনের সব শ্রেষ্ঠ কাব্যই কলিকাতার ফসল।

মধুর বন্ধুপ্রীতি প্রবাদে পরিণত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু বন্ধুর জন্য স্বার্থত্যাগ অনেকেই করিতে পারে, করিয়াছেও, মধুসূদন আর একটু অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন। তিনি গৌরদাসকে লিখিতেছেন,—

> আমি ইংলণ্ডে যখন যাব,—আশা করি সে সময় বেশি বেশি দূরবর্ত্তী নয় (আগামী শীতকালে), আমি স্থির করিয়াছি, তোমার একখানি ছবি সঙ্গে লইব, তাহাতে যতই খরচ পড়ুক। তোমার একখানি ছোট ছবির জন্য—আমার পোষাকগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে রাজি।

এ উক্তিতে উদ্বিগ্ন হইবার কিছু নাই; মধুও জানিতেন, গৌরদাসও জানিতেন, আমরাও জানি, ছোট একখানি ছবি অঙ্কিত করিবার জন্য তাঁহার কিছুই বেচিতে হইবে না—মধুর যথেষ্ট টাকা ছিল। মধুর ভাবটা—পোষাক বেচিতে হইবে না সত্য বটে, তাই বলিয়া বিক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে ছাড়িব কেন? বড় রকম স্বার্থত্যাগ করিবার সময় সংসারে বড় আসে না, তাই বলিয়া কলমের মুখেও আসিবে না?

মধুসূদনের বন্ধুপ্রীতি অসাধারণ, কিন্তু তাহা ইংরাজি ব্যাকরণের অপেক্ষা বড় নয়। বেচারা গৌরদাস একখানি পত্রে "দি সেক্সপীয়র" লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। একে ইংরাজি

ব্যাকরণ ভুল, তাহাতে স্বয়ং সেক্সপীয়রের নামে! মধুসূদন লিখিতেছেন :—

> গৌর, তুমি আমার ছাত্র হইলে তোমাকে বেত মারিতাম। নামের আগে কখন "দি" "এ" বসে না। "দি ম্যুরস্ পোয়েম" !!! ভবিষ্যতে সাবধান!

ইংরাজি ব্যাকরণের প্রপার নাউন ও ইংলণ্ডের কাব্য, বন্ধুদের প্রীতি ও রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের লোভের ঘাটে ঘাটে মধুসূদনের জীবনের নৌকা ভিড়িতে ভিড়িতে ক্রমে একটা আবর্ত্তের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ সে আওড়ের মুখে পড়িয়া ব্যাকরণ, কাব্য, বন্ধু, ঐশ্বর্য্য সব কোথায় ছুটিয়া গেল; অভিনেতার সাজ-পোষাক কোথায় উড়িয়া গেল; সেই নৌকা-বানচাল তীব্র ঘূর্ণীর উপরে জীবনে প্রথম বারের জন্য নিজের অন্তরস্থিত দানবীয় শক্তির সঙ্গে তাঁহার মুখোমুখি হইল।

> গৌর! আজ হইতে তিন মাস পরে আমার বিবাহ—কি সর্ব্বনাশ! আমার ভাবী পত্নী এক জমিদার-কন্যা—বেচারা! তাহার অদৃষ্টে কত না দুঃখ আছে! তুমি তো জান, বিদেশে যাইবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে কত প্রবল! সূর্য্য উদিত না হইতেও পারে, কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা আমি মন হইতে দূর করিতে পারি না। নিশ্চিত জানিও, আর দুই এক বৎসরের মধ্যে আমি হয় ইংলণ্ড যাইব, নতুবা জীবিত থাকিব না—এই দুইয়ের একটা নিশ্চয় ঘটিবে।

আমরা নিশ্চয় জানি, এই দুইয়ের কোনটাই ঘটে নাই। মধুসূদন দুই এক বছরের মধ্যে ইংলণ্ড যাইতে পারেন নাই—এবং দিব্য বাঁচিয়া ছিলেন।

যে-সময়ে বাঙালী বালকেরা ত্রয়োদশে বিবাহিত হইয়া চৌদ্দয় পিতৃত্ব লাভ করিত, সেই সময়ে মধুসূদনের পিতা বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত পুত্রকে অবিবাহিত রাখিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার মনের সামাজিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির পিতাদের প্রতি প্রায়ই সুবিচার হয় না; ভবিষ্যতের লোকেরা পুত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাঁহাদের দোষী সাব্যস্ত করে; কিন্তু কবির সমসাময়িক অন্য লোকেরাও কবিদের ভুল বুঝিয়াছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়; কবির পিতারাও সেই সমসাময়িকদের অন্যতম!

মধুসূদনের পিতা-মাতা যে একমাত্র পুত্রের বিবাহের চেষ্টা করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই; মধুর মত আর্থিক অবস্থার যুবকদের ইহার আগেই বিবাহ হইত; মধু যে বিড়ম্বিত এমন কথা বলা চলে না, দেশব্যাপী বিড়ম্বনা মধুর অদৃষ্টেও ঘটিয়াছিল।

হয় তো, রাজনারায়ণ দত্ত এত শীঘ্র বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন না, কিন্তু জাহ্নবী দেবীর তাগিদে তাঁহাকে সচেষ্ট হইতে হইয়াছিল। মধু বিবাহের কথা শুনিয়া আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতামাতা সন্তানের বৈবাহিক আপত্তিকে প্রায়ই মৌখিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিবাহের পত্র হইয়া গেলে মধুসূদন জাহ্নবী দেবীকে বলিলেন—"মা এ কাজ কেন করিলে; আমি তো বিবাহ করিব না।" মাতা ভাবী বৈবাহিক ও বধূর প্রশংসা করিলে মধু পুনরায় বলিলেন "মা তুমি যতই বল, বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরাজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হ'তে পারে না।"

এই বাক্যই মধুসূদনের কাল হইল; জাহ্নবী দেবী শঙ্কিত হইলেন; দু'একটি যুবকের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, তিনি হয় তো ভাবিলেন, ধর্ম্মের জন্য আবার কে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; হয় বিবাহ, না হয় টাকার জন্যই খৃষ্টান হয়। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

হঠাৎ একদিন রাজনারায়ণ দত্ত গৌরদাসের পিতা রাজকৃষ্ণ বসাকের কাছে আসিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিলেন যে, "মধুসূদন কোথায় চলিয়া গিয়াছে; আমরা তাহার কোন সন্ধান পাইতেছি না। তোমার ছেলে গৌরদাসের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব; সে এ বিষয়ের সন্ধান দিতে পারে।" কিন্তু গৌরদাস কিছুই বলিতে পারিলেন না।

আলোচনা

পঞ্জিকা-সংস্কার

ইণ্ডিয়ান রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী

মহোদয়েষু—

মহাশয়,

৭।৮ দিবস আগে আপনার পত্র * আমার হস্তগত হইয়াছে।

স্থির দিন-সংখ্যাসম্পন্ন মাসের প্রবর্ত্তন করিবার জন্য আপনাদের বিশেষ সমিতির অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাবের এবং তাহার মূলে যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, সেই যুক্তির কোন সারবত্তা আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই।

বিভিন্ন রাশিতে রবির সংক্রমণ দেখিয়া যেরূপ ভাবে সৌরমাস স্থির করিবার এবং তিথি-সংখ্যা দেখিয়া যেরূপ ভাবে চান্দ্রমাস স্থির করিবার পদ্ধতি পঞ্জিকা প্রণেতাগণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত অথবা আপনাদের প্রস্তাবিত উপায়ে দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাস স্থির করিবার কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, তৎসম্বন্ধে ভ্রমহীন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমার মতে সর্ব্বাগ্রে লৌকিক জীবনে পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা কোথায় তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইবে।

যদি দেখা যায় যে, যে যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পঞ্জিকার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাস স্থির করিলেও সাধিত হইতে পারে, তাহা হইলে আপনাদের প্রস্তাবের মূলে যে কথঞ্চিৎ যুক্তিযুক্ততা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আর যদি দেখা যায় যে, যে যে কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পঞ্জিকার প্রয়োজন, দিন-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাস স্থির করিলে, সেই সেই কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিবার সহায়তা করা তো দূরের কথা, বরঞ্চ প্রতিবন্ধী হইতে পারে, তাহা হইলে আপনাদের প্রস্তাব যে সর্ব্বতোভাবে যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

লৌকিক জীবনে পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তৎসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে, জ্যোতিষের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ, জ্যোতিষকে ভিত্তি করিয়াই পঞ্জিকার গঠন সম্পাদিত হইয়াছে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, জ্যোতিষের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে ক্রমে জ্যোতিষের স্বরূপ কি, গ্রহ বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উৎপত্তি হয় কেন, গ্রহের সংখ্যা নয়টির বেশী অথবা কম না হইয়া ঠিক নয়টি হয় কেন, রবি প্রভৃতি যে গ্রহকে যে নামে আখ্যাত করা হইয়া থাকে, তাহাকে অন্য কোন নামে আখ্যাত না করিয়া ঐ নামেই আখ্যাত করা হয় কেন, গ্রহগণ নিশ্চল ও স্থির না থাকিয়া সর্ব্বদা চলনশীল অথবা অয়নশীল হয় কেন, গ্রহগণের ও তাহার অয়নশীলতার অস্তিত্ব সঠিক ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি, রাশি বলিতে কি বুঝায়, রাশির সংখ্যা বারটির অধিক অথবা কম না হইয়া ঠিক ঠিক বারটি কেন হইল কেন, যে রাশিকে যে নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, সেই রাশিকে অন্য কোন নামে অভিহিত না করিয়া ঐ নামে অভিহিত করা হয় কেন, এবংবিধ অনেক রকমের তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইবার এবং প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। জ্যোতিষের বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্য্য, অর্থাৎ গ্রহ, অয়ন, রাশি, ঋতু, মাস, তারিখ, নক্ষত্র, তিথি, বার প্রভৃতি বিষয়ক তথ্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জ্যোতিষের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে এবং ঐ স্বরূপ স্থির করিয়া উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যে

* বাঙ্গালা মাসের দিন সংখ্যা নির্দ্দিষ্টীকরণের প্রস্তাব-বিষয়ক ১৩৪৪ সনের ৮ই শ্রাবণ তারিখের পত্র।

সমস্ত আলোচনার আবশ্যকতা আছে, তাহা এতাদৃশ পত্রাকারে প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

কাযেই, জ্যোতিষের এবং পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা স্থির করিতে হইলে ঐ সম্বন্ধে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কি বলিয়াছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

জ্যোতিষ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যাজুষ-জ্যোতিষ, আর্চ্চ-জ্যোতিষ, শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের এবং অথর্ব্ববেদের অংশবিশেষ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত দুইখানি বেদ ও বেদাঙ্গ ছাড়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে অপরাপর যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকেরই মূল যে সর্ব্বতোভাবে ঐ বেদ ও বেদাঙ্গে নিহিত রহিয়াছে, ইহা সহজেই সপ্রমাণিত হইতে পারে।

বেদ, বেদাঙ্গ ছাড়া জ্যোতিষ সম্বন্ধে আর যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ আছে, সেই সমস্ত গ্রন্থের কোন্‌খানি নির্ভরযোগ্য এবং কোন্‌খানি উপেক্ষার যোগ্য, তাহা স্থির করিতে হইলে, ঐ গ্রন্থগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিতে হয়। ঐ গ্রন্থগুলির মধ্যে কার্য্যকারণের যৌক্তিকতা-সম্পন্ন অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে কতকগুলি, যাঁহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডলের বিভিন্ন কার্য্যাবলী ও অবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা লিখিত; কতকগুলি, যাঁহারা ঐ কার্য্যাবলী ও অবস্থা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণের কথা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা লিখিত; আর কতকগুলি, যাঁহারা ঐ কার্য্যাবলী ও অবস্থা আংশিকভাবেও প্রত্যক্ষ করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থসমূহে সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের দ্বারা লিখিত।

আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, পরম-সিদ্ধান্ত, সোম-সিদ্ধান্ত, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত, পিতামহ-সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধ-বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত এবং গার্গ-সংহিতাকে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ বলিতে হয়।

পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা, বৃহৎ-সংহিতা, হোরা-শাস্ত্র প্রভৃ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

মহা-সিদ্ধান্তিকা, সিদ্ধান্ত-শিরোমণি, ভুবন-দী· গোল-দীপিকা, বর্ণ দীপিকা, সিদ্ধান্ত-রহস্য প্রভৃতি · তৃতীয় শ্রেণীর।

এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর গ্রন্থ নির্ভর-যোগ্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ যে অবিশ্বাস্য, ইহ বলাই বাহুল্য। তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ অবিশ্বাস্য ব উহার প্রত্যেক কথাটিই যে ভ্রান্তিময়, তাহা মনে করা ·· নহে। ঐ তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যেও স্থানে স্থানে ·· যোগ্য কথা পাওয়া যায়

জ্যোতিষের এবং পঞ্জিকার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ·· দ্রষ্টা ঋষিগণ কি বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা ক·· বসিয়া জ্যোতিষের কোন্ গ্রন্থ নির্ভর-যোগ্য এবং ·· গ্রন্থ অবজ্ঞার যোগ্য, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ·· করিলাম, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। আমার ·· কোন্ কোন্ গ্রন্থ প্রামাণ্য (authority), তাহা স্থির ·· লওয়া।

আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বেদ ও বেদাঙ্গ · প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মধ্যে উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর ·· ও সংহিতা-প্রণেতা অজ্ঞাতনামা মনীষিগণ, এবং বরাহ·· সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। আর, আর্য্য-ভট্ট, ভাস্ক·· ভট্টনারায়ণ, ভট্টোৎপল প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ সর্ব্বদা বিশ্ব· যোগ্য নহে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ জ্যোতিষের প্রয়োজনীয়তা ·· কি বলিয়াছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা · যে, যাজুষ ও আর্চ্চ-জ্যোতিষের উভয়ত্রই ঐ সম্বন্ধে · যাহা বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক · উল্লেখযোগ্য—

"জ্যোতিষাময়নং পুণ্যং প্রবক্ষ্যাম্যানুপূর্ব্বশঃ।
সম্মতং ব্রাহ্মণেন্দ্রাণাং যজ্ঞকালার্থসিদ্ধয়ে" ॥
বেদা হি যজ্ঞার্থমভিপ্রবৃত্তাঃ
কালানুপূর্ব্বা বিহিতাশ্চ যজ্ঞাঃ।
তস্মাদিদং কালবিধানশাস্ত্রং
যো জ্যোতিষং বেদ স বেদ যজ্ঞান্ ॥

উপরোক্ত দুইটি শ্লোকের প্রথমটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "যজ্ঞকালার্থ-সিদ্ধি"র জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আর, দ্বিতীয় শ্লোকটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জ্যোতিষের অপর নাম "কাল-বিধান-শাস্ত্র", অর্থাৎ কি নিয়মানুসারে কালের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার শাস্ত্র এবং যিনি সম্যক্ ভাবে জ্যোতিষ অবগত হইতে পারেন, তিনি "যজ্ঞ" কাহাকে বলে, তাহাও সম্যক ভাবে অবগত হইতে সক্ষম হন।

উপরোক্ত প্রথম শ্লোকটি হইতে যখন দেখা যাইতেছে যে "যজ্ঞ-কালার্থসিদ্ধি"র জন্য জ্যোতিষের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তখন "যজ্ঞ-কালার্থসিদ্ধি" বলিতে কি বুঝায়, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে জ্যোতিষের কি প্রয়োজন, তাহা বুঝা সম্ভবযোগ্য হয়।

আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের যে কাল, তাহার অর্থের যে সিদ্ধি (জ্যোতিষ্টোমাদীনাং যজ্ঞানাং যে কালাস্তদর্থানাং যা সিদ্ধিঃ), তাহাকে "যজ্ঞ কালার্থ-সিদ্ধিঃ" বলা হইয়া থাকে।

আমাদের মতে আধুনিক পণ্ডিতগণের উপরোক্ত ব্যাখ্যা মোটেই পরিস্ফুট নহে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ "যজ্ঞ" বলিতে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ অথবা "হোম" বুঝিয়া থাকেন বটে, কিন্তু "শব্দস্ফোট" পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে বিদ্যা অথবা অভ্যাসের দ্বারা মানুষের অন্তবস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্য এবং চৈতন্যের কারণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেই বিদ্যা অথবা অভ্যাসকে "যজ্ঞ" বলা হইয়া থাকে, আজকালকার পুরোহিতগণ যেরূপ ভাবে "যজ্ঞ" অথবা "হোম" নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা অন্তবস্থ বায়ুর গতি অথবা কার্য্য, অথবা চৈতন্যের কারণ সম্বন্ধে কোন উপলব্ধির কোনরূপ সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু বেদানুসারে ঐ হোমের প্রকৃত প্রক্রিয়া কি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার দ্বারা অন্তবস্থ বায়ুর গতি এবং কার্য্য ও স্ব স্ব চৈতন্যের কারণ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে। শব্দস্ফোটানুসারে যদিও "হোম" এই শব্দটিকে "যজ্ঞ" শব্দটির প্রতিশব্দ বলা চলে না, কিন্তু হোমের দ্বারা যজ্ঞের উদ্দেশ্য নিষ্পন্ন হইতে পারে বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে ব্যাবহারিক (লৌকিক) ভাষায় "যজ্ঞ" শব্দের অর্থে "হোম" বলা হইয়া থাকে।

"যজ্ঞকালার্থসিদ্ধি" বলিতে কি বুঝায়, তাহা (বেদোক্ত শিক্ষা, ব্যাকরণ ও নিরুক্তের সাহায্যে) স্থির করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ বাক্যটির অর্থ মানুষের অভ্যন্তরে বায়ুর গতি ও কার্য্য এবং চৈতন্য বিভিন্নতার উদ্ভব হয় কেন, যে বিদ্যা অথবা অভ্যাসের দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্য এবং চৈতন্যের কারণ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, সেই বিদ্যা অথবা অভ্যাসের প্রক্রিয়া কোন্ সময়ে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হইতে পারে, তাহা আনুপূর্ব্বিক পরিজ্ঞাত হইবার জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, সত্যদ্রষ্টা ঋষিদিগের কথানুসারে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রধান আবশ্যকতা দুইটি; যথা—

(১) মানুষের অভ্যন্তরে বায়ুর গতি ও কার্য্যের এবং চৈতন্যের বিভিন্নতার উদ্ভব হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া;

(২) যে প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্য এবং চৈতন্যের কারণ উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, সেই প্রক্রিয়া কোন্ সময়ে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য হইতে পারে তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপরে যে দুইটি কথা বলা হইল, ঐ দুইটি কথার প্রথমটি তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, স্ব স্ব অভ্যন্তরে বায়ু কোথা হইতে কোন্ রাস্তায় কত বেগের সহিত প্রবিষ্ট হইয়া কোন্ কোন্ রাস্তায় কত বেগের সহিত সর্ব্বশরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিতেছে, ঐ বায়ু সর্ব্বশরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিয়া কোন অঙ্গের উপর কি কি কার্য্য করিতেছে, কেনই বা শরীরাভ্যন্তরস্থ ঐ বায়ুর গতির বা কার্য্যের এত পরিবর্ত্তন অহরহঃ সাধিত হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া নিজ নিজ শরীরে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে মানুষের পক্ষে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে

রক্ষা পাইয়া দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুই যে মূলতঃ আমাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সর্ব্বপ্রধান নিদান, প্রধানতঃ অন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্যের তারতম্যবশতঃই যে আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইহা একটু চেষ্টা করিলেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। চরকসংহিতায় ও অথর্ব্ববেদে বায়ু সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লেখা রহিয়াছে, তন্মধ্যে যথাযথ অর্থে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে আমাদিগের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। শরীরাভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্য-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তত্ত্ব-গুলি পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে একদিকে যেরূপ অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার মনুষ্যদেহের রক্তমাংস প্রভৃতি জড়পদার্থ-নির্ম্মিত প্রত্যেক অঙ্গে চৈতন্যের উদ্ভব ও পরি-বর্ত্তন হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মানুষের পক্ষে আর্থিক অভাব হইতে রক্ষা পাইয়া সম্পদের প্রাচুর্য্য লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে, কারণ নিজ শরীরাভ্যন্তরে চৈতন্যের উদ্ভব ও পরিবর্ত্তন কেন হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে নিজ নিজ বুদ্ধি-শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয় কেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া ঐ বুদ্ধি-শক্তির বৃদ্ধি সাধন করিবার সামর্থ্য লাভ করা সম্ভব হয়, নিজ নিজ বুদ্ধি-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে পারিলে স্ব স্ব মনকে সংযত করা সম্ভব হয়, স্ব স্ব মনকে সংযত করিতে পারিলে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টি যাহাতে কোনরূপ বিপথগামী না হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য-শক্তিসম্পন্ন হয়, তাহা করার সামর্থ্য লাভ করা যায়। এইরূপ ভাবে বুদ্ধির বৃদ্ধি করিয়া মনকে সংযত ও ইন্দ্রিয়কে সক্ষম করিয়া তুলিতে পারিলে যে মানুষের পক্ষে প্রকৃত অর্থের প্রাচুর্য্য লাভ করা সহজসাধ্য হয়, তাহা অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় ও প্রত্যভিজ্ঞসূত্রে হইতে আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

মানুষের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্যের এবং চৈতন্যের বিভিন্নতার উদ্ভব হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য, অকাল-মৃত্যু ও প্রকৃত অর্থের প্রকৃত অসচ্ছলতার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া স্বাস্থ্য, দীর্ঘযৌবন, দীর্ঘজীবন ও প্রকৃত অর্থের প্রাচুর্য্য উপভোগ করা সম্ভব হয় বটে—কিন্তু অভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্যের এবং চৈতন্যের উৎপত্তি ও বিভিন্নতার কারণগুলিকে প্রত্যক্ষ করা সহজসাধ্য নহে।

যাঁহারা দর্শন ও বেদের সাহায্যে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রণীত আত্ম-তত্ত্বে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, ত্রিবিধ অংশ (অর্থাৎ সত্ত্বা, আত্মা ও শরীর) লইয়া মানুষের অবয়ব। এই ত্রিবিধ অংশের একাংশ ব্যক্ত এবং সকল ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অপরাংশ অব্যক্ত এবং কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ মেদ অথবা শব্দ অথবা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর তৃতীয়াংশ কেবলমাত্র বুদ্ধি-গ্রাহ্য।

মানুষের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্যের এবং চৈতন্যের উৎপত্তি ও বিভিন্নতার উদ্ভব হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যা-বয়বের ঐ ত্রিবিধ অংশ প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে মনুষ্যাবয়বের ঐ ত্রিবিধ অংশের ব্যক্তাংশ প্রত্যক্ষ করা সহজসাধ্য, অব্যক্ত অথবা অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাংশ প্রত্যক্ষ করা কষ্টসাধ্য অথবা দুঃসাধ্য এবং বুদ্ধি-গ্রাহ্যাংশ প্রত্যক্ষ করা অসাধ্য। কিন্তু, ভারতীয় ঋষিগণের দর্শনে ও বেদে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যাবয়বের বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ প্রত্যক্ষ করিয়া উহা সম্যক ভাবে বুঝিতে না পারিলে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশ সর্ব্বতোভাবে সম্যক্ রূপে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না, কারণ বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ হইতে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশের উদ্ভব হয়।

কাজেই, ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানুষের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর গতি ও কার্য্য প্রতিনিয়ত কেন পরিবর্ত্তিত হয় এবং মানুষের জড় অঙ্গে কিরূপভাবে চৈতন্যের উদ্ভব হয় ও অহরহঃ ঐ চৈতন্যের পরিবর্ত্তনই বা কেন হয়, তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিয়া আর্থিক অভাব, অকালবার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে একদিকে যেরূপ সম্যক্ আত্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, অন্য দিকে আবার মনুষ্যাবয়বের বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ ও অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশও প্রত্যক্ষ করিবার একান্ত আবশ্যকতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

কি উপায়ে মনুষ্যাবয়বের এই বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাংশ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা সকল বয়সে অথবা সকল দিনে অথবা দিবস ও রাত্রের সকল সময়ে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। একটু চেষ্টা করিলেই দেখা যাইবে যে, মানুষ যে সমস্ত জিনিষ পঞ্চদশ বৎসর বয়সে অথবা দিবসের দ্বিপ্রহরে নানা রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও বুঝিতে পারে না, সেই সমস্ত জিনিষ হয়ত অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে দিবসের প্রত্যুষভাগে সহজেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। যাহা দিবসের দ্বিপ্রহরে বুঝা সম্ভব হয় না, তাহা প্রাতঃকালে বুঝা সম্ভব কি প্রকারে? যাহা প্রাতঃকালে বুঝা সম্ভব হয় না, তাহা রাত্রি দ্বিপ্রহরে বুঝিবার ক্ষমতা আইসে কোথা হইতে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে শরীরের যেরূপ অবস্থা দেখা যায়, অন্যদিন সেইরূপ অবস্থা দেখা যায় না কেন, এবংবিধ প্রশ্নের আলোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি, সেই পৃথিবী, যে-সূর্য্যের বিদ্যমানতাবশতঃ পৃথিবীর সমস্ত জীব তেজস্বান্ হইয়া থাকে, সেই সূর্য্য এবং যে-চন্দ্রের বিদ্যমানতাবশতঃ সমস্ত পৃথিবীর জীব রসক্ত হইয়া থাকে, সেই চন্দ্র প্রতিনিয়ত চলনশীল রহিয়াছে, এবং এই পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের পরস্পরের মধ্যে অবস্থানের তারতম্যানুসারে পৃথিবীস্থ জীবের বিভিন্ন শক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

বেদাঙ্গান্তর্গত জ্যোতিষের নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত কথা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হইবে:—

স্বরাক্রমেতে সোমার্কৌ যদা সাকং সবাসবৌ।
স্যাৎ তদাঽঽদিযুগং মাঘস্তপঃ শুক্লোঽয়নং হ্যুদক্
প্রপদ্যেতে শ্রবিষ্ঠাদৌ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুদক্।
সার্পার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা॥
ধর্ম্মবৃদ্ধিরপাং প্রস্থ ক্ষপাহ্রাস উদগ্গতৌ।
দক্ষিণেতৌ বিপর্য্যাসঃ ষণ্মুহূর্ত্ত্যয়নেন তু॥

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের চলনশীলতা-বশতঃ তাহাদের পরস্পরের অবস্থান সম্বন্ধে তারতম্যের উদ্ভব হয়, সেই তারতম্যানুসারে পৃথিবীস্থ জীবের বিভিন্ন শক্তির অথবা সক্ষমতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাই জীবের শক্তির তারতম্যের একমাত্র কারণ নহে। ভারতীয় ঋষিগণের দর্শন ও বেদানুসারে জীবের শক্তির তারতম্যের কারণ সর্ব্বসমেত তিনটি, যথা:—

(১) পিতা ও মাতার শক্তি (আজকাল যাহাকে heredity বলা হইয়া থাকে, কতকাংশে তাহা);

(২) স্বীয় সাধনা অথবা কর্ম্ম;

(৩) সূর্য্য, চন্দ্র ও জীব এই তিনের পরস্পরের অবস্থানের তারতম্য।

উপরোক্ত যে তিনটি কারণে জীবের শক্তির অথবা সক্ষমতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি জীবের আয়ত্তাধীন। কিন্তু, তৃতীয়টি সম্পূর্ণভাবে জীবের আয়ত্ত বহির্ভূত।

পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্র এই তিনের পরস্পরের অবস্থান তারতম্য-বশতঃ যে জীবের শক্তির অথবা সক্ষমতার তারতম্য ঘটিয়া থাকে, ইহা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জীবনের যে কোন অংশে অথবা যে কোন দিনে কোন মানুষের পক্ষে স্বীয় অবয়বের বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ অথবা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশ প্রত্যক্ষ করা অথবা সকল প্রকারের কার্য্যে সম্যক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। পরন্ত, অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু এবং আর্থিক অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে স্বকীয় অবয়বের বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ অথবা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাংশ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, অথবা নিজ অবয়বাভ্যন্তরস্থ বায়ুর শক্তি ও কার্য্য সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে, অথবা চৈতন্যের উদ্ভব হয় কি প্রকারে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, অথবা কোন্ শ্রেণীর কার্য্য কখন সফল হইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইলে, সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী, এই তিনের পরস্পরের অবস্থানের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সময় অথবা দিনবিশেষে সূর্য্য, চন্দ্র ও পৃথিবী, এই তিনের পরস্পরের অবস্থানের সম্বন্ধ পরীক্ষা করিবার সহায়তার জন্যই সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে পঞ্জিকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোন সময় অথবা দিনবিশেষে সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পরের অবস্থানের সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে যুগ, অব্দ, মাসের এবং রাশির পরিকল্পনা

গৃহীত হইয়াছিল ; চন্দ্র ও পৃথিবীর পরস্পরের অবস্থানের সম্বন্ধ কি তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে যুগ, অব্দ, মাস, রাশি, তিথি ও নক্ষত্রের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল।

অধুনা যেরূপভাবে পঞ্জিকার যুগ, অব্দ, মাস, রাশি, তিথি ও নক্ষত্রের গণনাকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা পঞ্জিকার মূল উদ্দেশ্য নিষ্পন্ন হয় না, কারণ আধুনিক গণনাপ্রণালী ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। এই ভ্রমপ্রমাদের জন্য পঞ্জিকার যুগ, অব্দ, মাস প্রভৃতির গণনাপ্রণালী যে পরিবর্ত্তনযোগ্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু এখনও যেরূপ ভাবে রাশিবিশেষে রবির সংক্রমণ দেখিয়া মাস স্থির করিবার পদ্ধতি বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে একদিন যে সূর্য্য ও পৃথিবীর অবস্থানের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য মাসের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু, যেদিন হইতে রবির কোন সংক্রমণের দিকে কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া একটা নির্দ্ধারিত দিন-সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত মাস স্থির করিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই দিন হইতে পঞ্জিকার পরিকল্পনার মূলে যে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে।

আমার মতে, পঞ্জিকার গণনাপ্রণালীর সংস্কারের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক যে অবস্থায় উপনীত হইলে পঞ্জিকার বৈজ্ঞানিকতা সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া উঠা এবং নির্ভুল ভাবে উহার সংস্কার সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, বর্ত্তমান অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, পরমায়ুর অভাবের দিনে সেই অবস্থা লাভ করা সম্ভব নহে। কাজেই, এতাদৃশ কোন সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার আগে মানুষ যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং পরমায়ুর অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সারা পৃথিবীর বায়ু ও জল এবং মৃত্তিকা নানারকম বিষময় পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে সর্ব্বত্রই অর্থাভাব, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু দেখা দিয়াছে। জগতের বায়ু, জল ও মৃত্তিকা যখন বিষময় পদার্থে পরিপূর্ণ হয় এবং যখন অর্থাভাব প্রভৃতির ব্যাপক ভাবে উদ্ভব হইতে থাকে, তখন মানুষের পক্ষে প্রকৃত বুদ্ধি অথবা মস্তিষ্কলাভ ক্লেশসাধ্য হয় এবং তখন মূর্খগণ পণ্ডিত-নামের খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হয় এবং অধর্ম্ম ধর্ম্মের নামে অভ্যুদয় লাভ করে। কাজেই, এতাদৃশ সময়ে প্রকৃত মস্তিষ্কবান্ লোক দুর্ঘট।

আমি আপনাদের পণ্ডিতগণকে এতাদৃশ ভ্রমপূর্ণ সংস্কার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

বিনীত—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

শ্রীদুর্গা (এলোরা)

শ্রীদুর্গা (খিচিঙ্গ-ময়ুরভঞ্জ)

বাঙ্গালীর দুর্গাপূজা

—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

দুর্গাপূজার তত্ত্বকথা সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া নানা [illegible] নানা মনীষী বিবিধ আলোচনা করিয়াছেন। এই [illegible] পরিসর সন্দর্ভে গত ৬০ বৎসরের বাঙ্গালা সাহিত্য-দিক হইতে কতিপয় চিন্তাশীল মনস্বীর উক্তির সামান্য মাত্র কিছু অংশ উপস্থিত করা হইল।

দুর্গাপূজার বিষয়বস্তুটিকে বর্ত্তমান যুগের বাঙ্গালী পাঠকের নিকট কতকটা পরিস্ফুট করিবার পক্ষে ইহা একদিকে যেমন নগণ্য হইবে না, তেমনই এই ষাট বৎসর কালের বাঙ্গালা চিন্তাধারার একটি পরিচয়ও ইহাতে পাওয়া যাইবে। প্রবন্ধে বিষয়টিকে কালানুযায়ী না দেখিয়া চিন্তাধারার পারম্পর্য্যের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে 'শক্তি-সাধনা' শীর্ষক প্রবন্ধে [illegible]ভূষণ মুখোপাধ্যায়* মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

গুণবৈষম্য হইতেই সৃষ্টি। মানুষ যখন অত্যন্ত অসভ্য, অশিক্ষিত থাকে, তখন তাহাদের তমোগুণ অত্যন্ত অধিক, রজোগুণ তাহার অপেক্ষা অল্প এবং সত্ত্বগুণ নিতান্তই অল্প থাকে। তাহাদের বুদ্ধির তেমন বিকাশ হয় না। ইহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি প্রায় স্ফূর্ত্তি পায় না। নিষ্ঠুরতা প্রকাশে ইহারা আনন্দ বোধ করে, সকল কাজে আড়ম্বর অত্যন্ত ভালবাসে। ইহাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ করিতে হয়। উহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইহারা যখন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, তখন অল্প অল্প ধর্ম্মের কথা তাহাদের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে হয়। সেই ধর্ম্মের কথায় মারামারি কাটাকাটির কথা, বিস্ময়জনক ব্যাপারের কথা প্রভৃতি থাকিলে এই শ্রেণীর লোক ঐ কথা শুনিতে আকৃষ্ট হয়। ইহাদের জন্য প্রতিমা পূজা, পশুবলি প্রভৃতি নিতান্তই আবশ্যক। যতদিন উহারা ক্রমশঃ ধ্যানধারণা করিতে না শিখে, ততদিন বাহ্যাড়ম্বর, প্রতিমাই তাহাদের দেবতা। ক্রমশঃ যথা শাস্ত্র, ধর্ম্মের আড়ম্বর প্রভৃতির আশ্রয়, প্রপূজিকা ও [illegible] প্রভৃতির দ্বারা যখন তমোগুণ ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে থাকে তখন সাধকের সেই বাহ্যপ্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া তাহা হৃদয়ে ধ্যান ধারণা করিবার অধিকার জন্মে। এইরূপে রজোগুণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গুরু, সাধকের বহির্ম্মুখী পূজা অন্তর্মুখী করিতে চেষ্টা করিবেন। তখন বাহ্যপ্রতিমা সাধকের সহায়ক। তবে, সে বাহ্য-প্রতিমা অবলম্বন করিয়া হৃদয়ে সেই দেবীমূর্ত্তি ধ্যান করিতে থাকিবে। তখন সে ধ্যানকালে হৃদয়স্থ মূর্ত্তিকে "বিদ্যাসি ত্বং পরমাসি মায়া" বলিয়া সম্বোধন করিবে। কিন্তু তখনও তাহার পূজায় প্রতিমাদির প্রয়োজন। ক্রমশঃ যতই তাহার তমোগুণ লুপ্ত, রজোগুণ প্রধান ও সত্ত্বগুণ উন্মেষিত হইবে, ততই সে মানস পূজার অধিকারী হইবে। ততই সে ভাবিবে

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।

এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে গুরুর উপদেশে ক্রমশঃ তাহার প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মীলিত হইবে। ক্রমে যখন তাহার সাত্ত্বিকভাব প্রধান হইয়া উঠে; তমোগুণ প্রায় লুপ্ত হইবে, তখন সে সমগ্র বিশ্বে মহামায়ার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে, যখন তাহার আত্মপর ভেদ থাকিবে না,—ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ সংযত হইবে, মন আর সুখে আকৃষ্ট, দুঃখে অবসন্ন, শোকে কাতর হইবে না—পশুবলি দিতে হইবে না, তখন সে বিশ্বময়ী মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে জ্ঞান[illegible] পুণ্যাপুণ্য পশুবলি দিয়া পরে চিত্তকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া মায়ার ডোর ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহার মুক্তি হয়। ইহাই তন্ত্রের সাধন-তত্ত্ব। দুর্গাপূজা সেই তান্ত্রিক পূজার শ্রেষ্ঠ পূজা।

(১৩২০ সনের আশ্বিন সংখ্যার আর্য্যাবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত)

হিন্দুর ধারণা এই যে, দুর্গা-প্রতিমাতে বাহ্যিক রিপু-নিগ্রহের ভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক পথের সাধক এই ভাবধারা অবলম্বন করিয়া স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়বৃত্তি-নিচয়কে মাতৃচরণে উৎসর্গ করিয়া মাতৃপূজার যথার্থ অধিকার লাভ করে। নিম্ন অধিকারীর ছাগ বলি দিবার নিষ্ঠুরতার দিক উন্নততর অধিকারীর কাছে তখন ইন্দ্রিয়-বৃত্তি উৎসর্গ করিবার মর্ম্মার্থে রূপান্তরিত হয়। অহিংসা ও জীবে দয়ার ভাব সাধকের মনকে করুণায় মধুর করিয়া তোলে।

* শেক্সপীয়ারের গল্পের অনুবাদক। সোমপ্রকাশ, বিশ্বদূত, প্রয়াগদূত, [illegible], মুসলমান ইত্যাদি বাঙ্গালা পত্রিকা এবং ইণ্ডিয়ান একো, [illegible], বিয়ারার প্রভৃতি ইংরাজি পত্রিকার পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিছুদিন বঙ্গবাসী পত্রিকারও পরিচালনা করেন। গত ১৯১৪ সনের ২৯শে মার্চ্চ ৬০ বৎসর বয়সে কার্ম্মাটারে পরলোকগমন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে "মহাপূজায় পশুবলি" শীর্ষক প্রবন্ধে হরিপদ নন্দী মহাশয় ২০ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

পশুবলির প্রকৃত অর্থ প্রাণিহত্যা নহে। পশুবলির তাৎপর্য্য,—তোমার হৃদয়নিহিত কামক্রোধাদি পশুত্বভাবাপন্ন বৃত্তিনিচয় মায়ের শ্রীপাদপদ্মে বলি দাও। জ্ঞান খড়্গে অজ্ঞান পশুকে বলি দাও। যে প্রবল প্রবৃত্তিনিচয়ের বশবর্ত্তী হইয়া মানব পশুর ন্যায় আচরণকারী হয়, যাহার প্ররোচনায় মানব আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানব জীবন-লাভের প্রকৃত তথ্যানুসন্ধানে অসমর্থ হয়, যাহার কুহকে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ জরা জন্মমৃত্যুর হস্তে পতিত হইয়াও সুখানুভব করে, সেই পশুপ্রবৃত্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়নিচয়ের জ্ঞানরূপ খড়্গে বলি দিবার নামই পশুবলি।... অশীতিপর বৃদ্ধের ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ ইতঃপূর্ব্বেই নানারূপ কামনা-পথে পরিচালিত হইয়া বয়ধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রিয়সামর্থ্য স্বতঃই নিস্তেজ বশতঃ নিবৃত্ত হয়। তাহার ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা কখনও মহাপূজার বলিদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাহাকে বলে 'পাখী উড়তে না পারলেই পোষ মানে।' সেই জন্যই নিদাগী, নিখুঁত যুবা বলিই প্রশস্ত বলা হইয়াছে অতএব পশুত্বভাবাপন্ন প্রবৃত্তিপথগামী প্রবল ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করতঃ নিগ্রহদ্বারা নিষ্কাম আরাধনাতে প্রবৃত্ত হও। দেখিবে তোমার হৃদয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার অসুরনাশিনী চিন্ময়ী দশভুজামূর্ত্তি উদিত হইয়া তোমার হৃদয়নিহিত দুর্দ্দমনীয় রিপুরূপ অসুরদলনপূর্ব্বক তোমাকে চিরশান্তিময় রাজ্যে লইয়া যাইবেন। তুমি সর্ব্বসন্তাপহারিণী শ্রীশ্রীভগবতীর সুশীতল শ্রীচরণ-তলে উপবেশন করিয়া বিমল শান্তিলাভে সমর্থ হইবে। সংসারের অনিত্য শোকতাপ জ্বালা যন্ত্রণা আর কিছুতেই তোমাকে ব্যথিত করিতে পারিবে না। (১৩২৪ সনের আশ্বিন সংখ্যার 'তত্ত্বমঞ্জরী' হইতে উদ্ধৃত)

হিন্দু মনে করে, বাহিরের পূজা-আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের পূজাকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য অন্তরেও দেবীর গঠন ও মন্দির-মার্জ্জনার আয়োজন করিতে হয়। তাহা না হইলে কলুষকলঙ্কিত মনে দেবীর আরাধনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। মানসপূজাধিকারীর চিত্তকে দেবীমন্দিরের যোগ্য করিবার প্রসঙ্গে ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে "পূজার আয়োজন" শীর্ষক প্রবন্ধে বিজয়নাথ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

এই আয়োজনের প্রধান উপায় মন। বাহিরে যেমন আয়োজন আবশ্যক, ভিতরেও ঠিক তাই। মা আমার অনন্তরূপিণী জগৎ জননী, সুতরাং তিনি সকলের নিকটে প্রত্যেকের আপন ভাবে সমান। মা মূলাধারা, তিনি জগতের মূল, সুতরাং ব্রহ্মের শক্তি বা সাদা কথায় ঈশ্বর বা ঈশ্বরী— ভগবান বা ভগবতী।

ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে পূজার আয়োজন চাই। প্রথমে বাটী ঘর দরজা পরিষ্কার করিতে হইবে—তোমার মনের মধ্যে যে সমস্ত ময়লা মাটি, যে সমস্ত ধন-জন-মান-মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষা আছে, যে ষড় রিপুর পরিতৃপ্তির বাসনা আছে, যে হিংসা, দ্বেষ, কুৎসা ইত্যাদির ঝুল তোমার মনে লাগিয়া আছে, সে সমস্ত ঝাড়িয়া ফেল, মনের কাদা ধুইয়া ফেল। তৎপরে মায়ের কাঠাম তৈরী কর, মায়ের গড়ন দাও। তোমার হৃদয় মাকে যে ভাবে ডাকিতে চাহে, যে ভাবে তোমার মন ভগবানের দিকে মজে, ঈশ্বরের যে ভাবে তোমার অন্তরের প্রফুল্লতা জন্মে, সেই ভাবের কাঠাম মনের মধ্যে গড়। অর্থাৎ যাহার মনে ঈশ্বরের দুর্গাভাব ভাল লাগে সে তাহার কাঠাম গড়.... তাতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

('তত্ত্বমঞ্জরী' পত্রিকার ১৩০৭ সনের আশ্বিন সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত)

ভাবসাধনা ও শক্তি আরাধনার পথে তন্ত্রসাধনার মর্ম্মকথা ব্যাখ্যা করিয়া ২৪ বৎসর পূর্ব্বে "শারদীয়া পূজা" প্রবন্ধে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৭-১৯২৩) মহাশয় বলিয়াছিলেন,—

শক্তিসাধনার দুইটি অঙ্গ আছে। (১) ভাবসাধনা (২) শক্তি আরাধনা। শক্তি আরাধনার অন্তর্গত জপ, যজ্ঞ, ষটচক্রভেদ, শবসাধনা, আসনসিদ্ধি ভৈরবীচক্র প্রভৃতি। ভাবসাধনায় পূজা, উপাসনা, ধ্যান, জপ, লীলা, সেবা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। দুর্গোৎসব এই ভাবসাধনার অন্তর্গত সামাজিক উৎসব। কুলকুণ্ডলিনীকে মা বলিয়া মাতৃভাবে তাহাকে জাগাইয়া, চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ী করিয়া যে পূজাপদ্ধতি, তাহাই শারদীয়া পূজা। ইহা অকালবোধন, ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিবীর যে অংশে আমরা বাস করিতেছি, তাহারই স্বাপকালে দেবনিদ্রার কালে এই পূজা বোধন করিতে হইয়াছে বলিয়াই শারদীয়া পূজায় অকাল বোধন করিতে হয়। মাতৃপূজা আত্মার খেলা, দেহী আত্মা বংশানুক্রমের প্রভাবে কোন্ ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া আছেন তাহা বুঝিতে ও জানিতে [illegible] যাহাদের কৃপায় আমি দেহী হইয়াছি, তাহাদেরই করুণা প্রার্থনা করিতে হয়। সে করুণা লাভ করিলে কুণ্ডলিনীকে অকালে জাগাইতেও [illegible] বাধা থাকে না।... মাকে জাগাই ভাব দিয়া। মা আমার হিমালয়-কন্যা। এ হিমালয় নেপালের উত্তরের হিমালয় পর্ব্বত নহে, [illegible] দেহস্থ বামকোণব্যাপী হিমালয় পর্ব্বত আছে, তদ্দেশজাতা মা আমার কন্যা। দেহের বাম কোণে হৃদপিণ্ড, তাহারই মধ্যে পর্ব্বে পর্ব্বে [illegible] হিমালয় ভাবগিরি আছে। মাকে দেহস্থ দক্ষিণ কোণের কৈলাস [illegible] হইতে নামাইয়া হৃদয়ের হিমালয়ে আনিয়া বসাইতে হইবে। ইহা [illegible] দুর্গোৎসবের অকালবোধন। দক্ষিণায়নে—স্বাপকালে মা কৈলাসে [illegible] সংযুক্তা হইয়া থাকেন। এ সময়ে কৈলাস হইতে মাকে হৃদগেহে [illegible] করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই ভাবময়ীকে আগমনী গান [illegible] হয়—মাকে কন্যারূপে আহ্বান করিতে হয়। পুরাণ, তন্ত্রের এই [illegible] তত্ত্বটুকু লইয়া অতি মনোহর উপাখ্যান সকল রচনা করিয়াছেন। [illegible] গৌরীর এই উপাখ্যান পাঠ করিলে ভাবোদয় হয়। ভাব [illegible]

মা! আরও বলি, তুমি ত নিরাকারা, ইহা সর্ব্ব বেদাগমের সিদ্ধান্তিত কথা, আবার এ কথাও শাস্ত্রে পাওয়া যায় যে, তুমিও আমাদের মত শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, শ্রবণ, মনন, ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎ হইয়া থাক, এবং আমরাও তোমা হইতে জল, অনল ও দিনরাত্রির মত অত্যন্ত ভিন্ন নহি, কিন্তু আমরা চৈতন্যময়ী তোমারই একটি কণা, অজ্ঞানানুবিদ্ধ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, বা ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও আশয়ে সংসৃষ্ট চিতিশক্তি তুমিই আমরা হইয়াছি, সেই অজ্ঞানের আবরণ—শক্তির মাহাত্ম্যেই আমরা নিত্যসুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ...

এ জন্যই মা! নিরাকার শব্দের কল্পিত আকারের ন্যায়, এই শরৎ-কালে মনোহর মণ্ডপে ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিবিধ উপহারে তোমার দশভুজা মূর্ত্তি সাক্ষাৎ করিব। (১৩০৭ সনের আশ্বিন সংখ্যার 'জন্মভূমি' হইতে উদ্ধৃত)

হিন্দুর বিশ্বাস বিভিন্ন ভাবাশ্রিত বিভিন্ন মূর্ত্তি বা রূপের-মধ্য দিয়া দেবী দুর্গা তাঁহার আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই সম্বন্ধে "দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ২৮ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

দুর্গোৎসব হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ব্রত। ইহার অন্য নাম শক্তিপূজা। পূর্ণব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনা করার নাম শক্তিপূজা। জননী কখনও দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, কখনও জগৎপ্রসূতি জগদ্ধাত্রী, কখনও কালভয়-নিবারিণী কালী। এই শক্তির আর একটি নাম মহামায়া। যাঁহার প্রভাব জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান তিনিই মহামায়া। তাঁহারই ঐন্দ্রজালিক কুহকে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল 'আমি' 'আমি' শব্দ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমার পুত্র, আমার সংসার, আমার জন্ম, আমার মৃত্যু সেই মহামায়ারই প্রভাবের ফল।

(১৩১৬ সনের কার্ত্তিক সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' হইতে উদ্ধৃত)

হর-গৌরীর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় অসীম ও সীমার বিবৃতি ও সৃষ্টি-কৌশল, ব্রহ্ম ও হরের ভাবগত অভেদাত্মক মিলসূত্র এবং বিচারমূলে আনন্দরূপিণী গৌরী যে বস্তুতঃ কি, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "হর-গৌরী" শীর্ষক প্রবন্ধে বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

সীমার শেষ সীমাকেই অনেক সময় আমরা অসীম অসীম বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকি। মনুষ্যবুদ্ধি সীমাবোধের অতীত নয় বলিয়াই জড় জগতে পরমাণুর, আধ্যাত্মিক জগতে মনগড়া ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। কালবশে জড় জগৎ হইতে পঞ্চভূত গিয়াছে, ঈথার গিয়াছে, এক সর্ব্বব্যাপী শক্তিতে তৎসমস্তই সমাহিত হইয়াছে। আবার এক জীবন্ত মহতী ইচ্ছার বক্ষে সেই এক সার্ব্বভৌম শক্তিরও সমাধি প্রস্তুত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক জগৎ হইতেও গাছপালা, মাটি, পাথর, নদী, নালা, আগুন, বাতাস বিদূরিত হইয়াছে, পুতুল গিয়াছে, চতুর্ব্ব গিয়াছে, মানবীয় শক্তিও বিতাড়িত হইয়াছে, এ সকলই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত দয়াবান্ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। আর্য্যঋষি আধ্যাত্মিক জগতে অগাধ জ্ঞানরাশি অর্জ্জন করিয়া শেষটা বলিয়াছেন "ব্রহ্ম নির্গুণ"। বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", তিনিই ব্রহ্ম বা অসীম পুরুষ। সমস্ত শূন্যের সহিত বিশ্ব ইহাতেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং তিনিই এই সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য-চন্দ্র-তারাখচিত নীলনভস্তল, গোলাপ, যূঁই, বেল, মালতী, রজনীগন্ধা, চামেলী প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পুষ্পরাজিতে সুশোভিত, স্নিগ্ধ সবুজ তরুলতা সৌধবিমণ্ডিত, সমুদ্র-নদী-তড়াগ-হ্রদ-সমন্বিত শ্বেত ধবল গিরিরাজি এবং উৎস ঝরণালঙ্কৃত, বিহঙ্গ-কলরব-কূজিত এই ঐশ্বর্য্য-ময় সৌন্দর্য্যময় আনন্দ-সুখময় বিচিত্র ধরাধাম সকলই ইহাকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব সত্বায় বিরাজ করিতেছে। ইনিই হর। ইনি রূপের অতীত বা অরূপ। সমস্ত রূপরাশি এখানেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। রূপ বা স্থূলত্ব কিম্বা সীমাকে হরণ করিয়া—আপনাতে বিলীন করিয়া ইনিও হর এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যেমন সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রাখিয়া, রহিয়াছেন তেমনই সকল বিশেষত্বকে সাধারণত্ব বা [illegible] হইতে বিভক্ত করিয়াছেন। বিভক্ত বিশেষ বস্তুসকলের আধার [illegible] অবকাশ এই অসীম। সুতরাং ইনিই হর। ইনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া সকলের সকল প্রকার বিঘ্ন বিপদভয় হরণ করিয়াছেন, অতএব ইনিই হর। অপরূপ গুণাতীত হর শুভ্রবর্ণ বা অম্বর কল্পিত হইয়াছেন। হরের বীজমন্ত্র "ব্যোম", ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন ব্রহ্মকে আকাশরূপে ধ্যান করিতে হইবে।

গৌরী বা প্রকৃতি কে? প্রকৃতি সীমা—বৈচিত্র্যজননী, রূপময়ী। যাহা আমাদের জ্ঞাত, যাহা আমরা বুঝি, ধারণা করিতে পারি, [illegible] সীমা। যে ঋষি বলিয়াছেন "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", তিনিই বলিয়াছেন, "আনন্দম্ ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। অসীম বা ব্রহ্ম হইতে যে চিদানন্দধারা নিত্যকাল প্রবাহিত হইতেছে, আমরা কেবল তাহাই জানি, তাহাই প্রাণে ধারণ করিতে পারি, তাহাই ভোগ করিয়া পান করিয়া বাঁচিয়া আছি। আনন্দ কাহাকে বলে? যাহা চিৎ অর্থাৎ আলোকময়। আলোকই রূপ, আলোকই [illegible], আলোকই সৃষ্টি। আনন্দের আরও লক্ষণ আছে। আনন্দ [illegible] বা নিত্য তরঙ্গময়, পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সমাধা করাই [illegible] কার্য্য, অথবা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় আনন্দ-মহাসমুদ্রের বুদ্বুদমাত্র।

এখন দেখা যাইতেছে, যেই শক্তির গর্ভ হইতে এই বিচিত্র [illegible] বাহ্য প্রকাশ হইয়াছে, সেই আদিম মূল মহাশক্তিই আনন্দ—চিদানন্দ। আনন্দই প্রকৃতি, আনন্দই সীমা, আনন্দই গৌরী। এই জন্য [illegible] কবি গৌরীকে রূপের আদর্শ—সৌন্দর্য্যের প্রতিমা—বৈচিত্র্যের চরম [illegible] করিয়া গড়াইয়াছেন। আলোকের বাহ্যরূপ ভগুকাকনবৎ। [illegible]

গৌরীর বরাঙ্গপ্রভা গৌর বা তপ্তকাঞ্চনের আভার ন্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। গৌরী কে? ঘনীভূত আনন্দ—ঘনীভূত প্রেম—বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মপ্রেম। গৌরী মহাশক্তি—আদ্যাশক্তি কেন? গৌরী হইতেই এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি সমুদ্ভূত ও প্রকাশিত, গৌরীই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। চিদ্‌ঘনানন্দ বা প্রেমই ব্রহ্মের শক্তি।"

(১২৯১ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'নব্যভারত' হইতে উদ্ধৃত)

প্রতিমার বাহ্যরূপ-ভঙ্গিমার সঙ্গে পার্থিব সম্পদ-সুখের ইঙ্গিত কোন কোন ভক্ত উপাসকের শিশুসুলভ সরল বুদ্ধিকে মুগ্ধ ও মধুর করিয়া তোলে। ৩৩ বৎসর পূর্বে "দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে এই দিক হইতে রামচন্দ্র সেন মহাশয় দুর্গাপূজাকে দেখিয়া লিখিয়াছেন,—

ঐ দেখ ভাই সম্মুখে মায়ের আনন্দময়ী প্রতিমা। ঐ দেখ বরাভয় করে মা আমাদিগকে বরাভয় প্রদান করিতেছেন। ঐ দেখ আশপাশ মেখলাধারিণী মা আমাদের অষ্টভুজে অষ্টদিক্ রক্ষা করিতেছেন। ঐ দেখ মা আপনার পদতলে পাপাসুরকে দমন করিয়া আমাদের পাপ হরণ করিতেছেন। ঐ দেখ মা আমাদের সঙ্গে স্বীয় সুত গণপতিকে লইয়া আমাদিগকে সিদ্ধিদান করিবার জন্য আসিয়াছেন। ঐ দেখ সম্পত্তিবিধায়িনী কমলাকে লইয়া আসিয়াছেন আমাদের দুঃখ-দারিদ্র্য নাশ করিতে। ঐ দেখ বামে বাক্‌বাণী সরস্বতীকে আমাদিগের জড়তা দূর করিবার জন্য সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন, ঐ দেখ কার্ত্তিকেয়, আমাদিগের লুপ্তপ্রায় বীর্য্যের পুনরুদ্দীপন করিবার জন্য মা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। মা আমাদের দয়াময়ী, দয়ার ভাণ্ডার খুলিয়া জগন্মাতা অন্নপূর্ণা আমাদিগকে অন্ন বিলাইতে আসিয়াছেন। ভাই আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। এস ভাই সকলে মিলিয়া রক্তজবা হাতে লইয়া মন্ত্র পড়িয়া মায়ের ধ্যান করিতে থাকি।

(১৩১১ সনের আশ্বিন সংখ্যার জন্মভূমি হইতে উদ্ধৃত)

যে দেবীপ্রতিমাতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া পরিবার-পরিজন মিলিত হইয়া নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভাবে স্বজন জ্ঞানে যাহাকে পূজা অর্চ্চনা করা হয়, বিসর্জ্জনে সেই দেবী যখন অন্তর্হিতা হন, তখন পরিজনবর্গের সরল মনে ব্যথা ফুকারিয়া উঠে এবং বৎসরান্তে তাঁহাকে আবার ফিরিয়া পাইবার অমৃতময়ী আশা হৃদয়কে যে সান্ত্বনা প্রদান করে, তাহার মধ্যেই ভক্ত সাধকের সমাজ-জীবনের পারিবারিক ধর্ম্মাচরণ ও পূজার্চ্চনা কেমন সহজ সাফল্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া "দুর্গাপূজা" শীর্ষক লেখায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কথাশিল্পের সাহায্যে বাইশ বৎসর পূর্ব্বে সুন্দর একখানি আলেখ্য অঙ্কন করেন:—

মার বিসর্জ্জন হইয়া গেল। ভগবতী যে মাটি সেই মাটি হইতেই মহামায়ার মূর্ত্তি গড়া হইয়াছিল, মাটিরই সাজসজ্জায় তাঁহাকে সাজান হইয়াছিল। যিনি মাটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই মাটির মূর্ত্তিতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সজীব করিয়াছিলেন, তাঁহাকে "পরাশক্তি" করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সকলের চেয়ে বড় করিয়াছিলেন—এখন তিনি আর নাই। যে মাটি সে আবার মাটিই হইয়া গেল, জলে মিশিয়া গেল। যত লোক আসিয়াছিল, এ ব্যাপার সকলেই স্বচক্ষে দেখিল। শোকে, ক্ষোভে, দুঃখে আপন ঘর ফিরিল। যাহার দালানে দুর্গা আসিয়াছিলেন, তাঁহার কথা ও দূরে থাকুক দেশশুদ্ধ লোক দেখিতে লাগিল - সব শূন্য। সবাই শূন্য মনে বাড়ী ফিরিল। গৃহিণী শূন্য দালানে আসিয়া সব শূন্যময় দেখিলেন, তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন, কাঁদিয়া ত আকুল। কর্ত্তারও অবস্থা তাই। তবে তিনি পুরুষ। তিনি গৃহিণীকে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন "ভয় কি? মা আবার এক বৎসর পরে আসিবেন।" সেই আশায় বুক বাঁধিয়া সকলে আবার সংসারধর্ম্মে মন দিল।

(১৩২৩ সনের আশ্বিন সংখ্যার নারায়ণ' হইতে উদ্ধৃত)

সকল রচনার পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পরিশিষ্টে কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে যাঁহাদের চিন্তাধারা বিভিন্নরূপ ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল, নিম্নে তাঁহাদের কয়েকজনের রচনা কোন্ সনে কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সূচী সন্নিবিষ্ট হইল।

মাতৃপূজা— বিপিনচন্দ্র পাল (নারায়ণ — আশ্বিন ১৩২৩)
দুর্গাস্তোত্র—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (নারায়ণ আশ্বিন ১৩২৩)
আবাহন — অক্ষয়কুমার বড়াল (সাহিত্য—বৈশাখ ১৩০০)
পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব—চন্দ্রশেখর কর (সাহিত্য আশ্বিন ১৩০৪)
দেবীর মর্ত্ত্যে ভ্রমণ— রজনীকান্ত ভক্তিবিনোদ (জন্মভূমি—আশ্বিন ১৩০৯)
আগমনী ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (জন্মভূমি আশ্বিন ১৩০৮)
বোধন— ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া (জন্মভূমি— আশ্বিন ১৩১১)
দুর্গোৎসব—রামচন্দ্র সেন (জন্মভূমি আশ্বিন ১৩১১)
শারদোৎসব—কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় (জন্মভূমি আশ্বিন ১৩২০)
দুর্গাষ্টক—অম্বিকাচরণ গুপ্ত (জন্মভূমি— আশ্বিন ১৩২০)
শারদীয়া মা—স্বর্ণপ্রভা ঘোষ (জন্মভূমি – আশ্বিন ১৩২০)
আবাহন—গিরিজাকুমার বসু (ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক ১৩২৭)
আনন্দময়ী—রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (ভারতবর্ষ—কার্ত্তিক ১৩২১)
আগমনী—বৈদ্যনাথ কাব্যতীর্থ (ব্রাহ্মণ-সমাজ—আশ্বিন ১৩২১)
দুর্গোৎসব চিত্র—শশধর শর্ম্মণঃ (ব্রাহ্মণ সমাজ—আশ্বিন ১৩২১)
দুর্গোৎসব কামনা—পঞ্চানন তর্করত্ন (ব্রাহ্মণ সমাজ—আশ্বিন ১৩২১)

শারদ লক্ষ্মী কালিদাস রায় (আর্য্যাবর্ত্ত—আশ্বিন ১৩২০)
শক্তিসাধনা—শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় (আর্য্যাবর্ত্ত—আশ্বিন ১৩২০)
আগমনী—অমূল্যরত্ন কাব্যতীর্থ (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩২১)
"মা"—অবলাকান্ত মজুমদার (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩২১)
মহাপূজা—বিজয়নাথ মজুমদার (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩২১)
মহাশক্তি—বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় (নব্যভারত—আশ্বিন ১২৯০)
দেবতত্ত্ব—কিশোরীলাল রায় (নব্যভারত—মাঘ ১২৯১)
হরগৌরী—বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় (নব্যভারত—জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫)
শক্তি আবাহন কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (মালঞ্চ আশ্বিন ১৩২৩)
আবাহন—হরিপ্রসন্ন বসু (মালঞ্চ—আশ্বিন ১৩২৩)
আবাহন—দেওয়ানা ব্রজেন্দ্রমোহিনী (মালঞ্চ—আশ্বিন ১৩২৩)
শক্তিপূজার কথা—কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত (মালঞ্চ—কার্ত্তিক ১৩২৪)
শারদীয়া পূজা—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য—কার্ত্তিক ১৩২০)
দুর্গাপূজা—অনঙ্গমোহন চৌধুরী (নব্যভারত—আশ্বিন ১৩১৯)
দুর্গাপূজা—গোবিন্দচন্দ্র দাস (নব্যভারত—আশ্বিন ১৩১৯)
দুর্গাপূজা—নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (নব্যভারত—আশ্বিন ১৩২১)
*দুর্গা—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গদর্শন—জ্যৈষ্ঠ ১২৮০)
দুর্গোৎসব—কমলাকান্তস্য ছাত্র, ভীষ্মদেবস্য পুত্র, খাসনবীশ জুনিয়র M.A., B.L., (বঙ্গদর্শন—ভাদ্র ১২৮৫)
দুর্গোৎসব—ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (বঙ্গদর্শন—কার্ত্তিক ১৩১৬)
দুর্গাপূজা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (নারায়ণ—আশ্বিন ১৩২৩)
দীনের দুর্গোৎসব—জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ (জন্মভূমি—আশ্বিন ১৩০৭)
আগমনী—ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩২২)
শারদীয়া—অভ্রীশনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩২২)
এস মা—কাঙ্গাল (তত্ত্বমঞ্জরী—অগ্রহায়ণ ১৩২২)
পূজার আয়োজন—বিজয়নাথ মজুমদার (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩০৭)
মহাপূজায় পশুবলি—হরিপদ নন্দী (তত্ত্বমঞ্জরী—আশ্বিন ১৩২৪)
আগমনী—কালিদাস রায় (আর্য্যাবর্ত্ত—আশ্বিন ১৩১৮)

* এই রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনের তদানীন্তন সম্পাদক হিসাবে ইহাকে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলা যাইতে পারে।

বিতৃষ্ণা

—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

যে দেশের মৃত্তিকায় জন্ম মোর হ'ল একদিন,
আকাশে চাহিয়া কাঁদি শুধিবারে যে দেশের ঋণ,
হায় আমি হতভাগ্য! হে ঈশ্বর, কেন দিলে মোরে—
এত স্বপ্ন, এত আশা? রাখিলে না কেন অন্ধকারে—
অনন্ত শর্ব্বরীবক্ষে তুহিন-শীতল কারাগারে?
যে দেশের হৃৎপিণ্ড অসাড় নিস্পন্দ অন্ধকারে,
আত্মার আশ্রয়চ্যুত শক্তিহারা বীভৎস কঙ্কাল,
পর্ব্বত-প্রমাণ যেথা চিতাভস্মে জন্মিছে জঞ্জাল,
বিষাক্ত দুর্গন্ধ বাষ্পে জীবের নিঃশ্বাস রোধ করি',
নৈরাশ্য-সিন্ধুর বুকে দিগ্-ভ্রষ্ট যে দেশের তরী।
আপক্ব শস্যের ভারে যে দেশের সবুজ অঞ্চল,
মদোন্মত্ত দুঃশাসন লজ্জাহীন টানে অবিরল—
স্বার্থে অন্ধ চলমান সভ্যতার বিচার-সভায়;
যে দেশের মানুষেরা সুবিধা-সুযোগটুকু চায়,
শ্মশান-কুক্কুর আর শৃগাল ও শকুনির মত
মৃত মানুষের রক্ত শুষে শুষে খায় অবিরত
পঙ্কের জলৌকা সম। হে ঈশ্বর, কেন সেথা মোরে
আত্মার আশ্রয়-চ্যুত রাখিয়াছ মিথ্যা স্বপ্নঘোরে?
বাঁচিবার মিথ্যা আশা কেন দিলে, কি হবে আমার?
তার চেয়ে মৃত্যু দাও, বিস্মৃতির স্তব্ধ অন্ধকার।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[৬]

চৌধুরীকর্ত্তা পূজার ফর্দ্দ ধীরে সুস্থে করিতে বলিয়াছিলেন; ফর্দ্দ ধীরে সুস্থেই হইতেছে, ত্বরার কোন লক্ষণ নাই।

সেদিন বিকাল বেলা দীর্ঘ নিদ্রার পরে ভট্টাচার্য্যের মন বড়ই প্রফুল্ল ছিল, তিনি হাঁকিলেন, ওহে বাণী, এস, একবার বসা যাক। জমীদার বাড়ী থেকে বড়ই তাগিদ আসছে।

বাণীবিজয়ের অপ্রস্তুত থাকিবার কথা নয়, কারণ তাহার গরজ আরও জরুরি, সেই জন্য সে আদেশ মাত্র লেখনী ও মস্যাধার লইয়া আসিয়া বসিল। ভট্টাচার্য্য দ্রব্যাদির নাম বলিতে যাইবেন, এমন সময়ে যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বলিলেন—ওহে বাণী, গিন্নীকে ডাক, এ সব বিষয়ে তার যেমন স্মরণশক্তি, আমার তেমন নয়।

বাণী লেখনী রাখিয়া গৃহিণীকে ডাকিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী আসিলেন, বলিলেন, আমাকে আবার কেন, তোমাদের এ সব শাস্তরের কথার মধ্যে আমি কি করব!

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, গিন্নী, শুধু শাস্তর হলে কি আর তোমাকে ডাকতাম, এর মধ্যে যে 'বস্তর' আছে—

বাণীবিজয় কথাটাকে আরও একটু ঠেলিয়া দিবার জন্য বলিল,—আজ্ঞে শুধু বস্তর কেন, তৈজস, স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্ন, নানা রকম ব্যাপার আছে—

গিন্নী একটি পিতলের কৌটা হইতে খানিকটা দোক্তা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পানটাকে বেশ আয়ত্ত করিয়া আনিতে আনিতে বলিলেন,—আমার বাপু ও সব ভাল লাগে না। দেব-দ্বিজের কাজের মধ্যে অমন করে দৃষ্টি দিলে অমঙ্গল হবে বাপু!—এই পর্য্যন্ত বলিয়া গিন্নী বসিয়া পড়িলেন—বাণীবিজয় ক্ষিপ্রহস্তে একখানা কুশাসন অগ্রসর করিয়া দিল; কুশাসনে গৃহিণীকে কেবল অর্দ্ধেক ধরিল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, গিন্নী, তোমাকে এত দিন ধরে শাস্ত্র চর্চ্চা করালাম, আর এখনও ভুল ভাঙ্গল না। আরে ওই দেব-দ্বিজের মধ্যে দ্বিজ তো আমরাই।

শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া গৃহিণী মনে কতকটা আশ্বস্ত হইলেন—তবু সংশয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কি জানি বাপু, আমি অত শত বুঝি না, তোমরা সব পণ্ডিত, যা হয় কর, কিন্তু দেবতাদের বাদ দিও না।

বাণীবিজয় বলিল, আজ্ঞে দেবতাদের জন্য ভাবিবেন, কিন্তু ওঁদের দেয্য দিলে চৌধুরী কর্ত্তা না রেগে যান।

ভট্টাচার্য্য উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, দেবতা হে, দেবতা, চৌধুরীকর্ত্তা আমাদের দেবতা।

গৃহিণী বলিলেন—তা হলে আমাদের দেব দ্বিজে বেশ মিলন হয়েছে। তারপর ব্যস্তভাবে বলিলেন—নাও, নাও, আমার তাড়াতাড়ি আছে। বোসেদের বড় বউয়ের কাল সাধ, সেখানে আমাকে যেতে হবে। আমাকে আবার ডাক কেন? নাও বাপু, যখন ডেকেছ, সামান্য দু'চারটা জিনিষ যা দরকার বলে যাচ্ছি। এই পর্য্যন্ত এক নিশ্বাসে বলিয়া, তিনি যাইবার জন্য কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ না করিয়া জমিয়া বসিলেন।

—নাও, বাবা, বাণী লিখে নাও, আমি আবার ভুলে যাব, বুড়োমানুষের মনকে বিশ্বাস নেই—বলিয়া গৃহিণী আরম্ভ করিলেন, সদুর বাড়ীতে আজ ছ'মাসের মধ্যে কিছু পাঠান হয় নি, তা মনে আছে কি? কেবল লেখা পড়া নিয়ে থাকলেই চলে না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার হতভাগ্য ভট্টাচার্য্যের দিকে বক্রদৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর আবার আরম্ভ হইল,—যেমন যেমন বলব, অমনি লিখে নিয়ো বাবা বাণী। সদুর জন্য তাঁতের শাড়ী দুখানা, জামাই-এর ধুতি-চাদর একজোড়া; খেন্তি, পটল, কানু, হ'ল গিয়ে তিন জন, তাদেরও তো কিছু দেওয়া হয় নি। খেন্তি, পটলের ডুরেশাড়ী আর ধুতি

দু'জোড়া। কানুর জন্য দোলাই একখানা। লিখছ তো বাবা বাণীবিজয় ?

বাণীবিজয় সম্মতি জ্ঞাপন করিল। গৃহিণীর ফর্দ্দ শুনিয়া কর্ত্তার মনে নানা ভাবের চমক লাগিতেছিল, কখন বিস্ময়, কখন প্রশংসা, কখন বা ঈষৎ ভক্তি, কিন্তু হঠাৎ দোলাই এর ফরমাস শুনিয়া কর্ত্তার চমক ভাঙ্গিল, তিনি উপরোধের সুরে বলিলেন, গিন্নী দোলাইটা কি ঠিক হল ?

গিন্নী তখন তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা জগদম্বার সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মনে মনে একটা হিসাব করিতেছিলেন, হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন নয় ?

—দৈবক্রিয়াতে দোলাই দেবার বিধান তো কোন শাস্ত্রে নেই।

—সব শাস্ত্রই কি তোমার পড়া হয়েছে ?

কর্ত্তা বলিলেন—এমন কথা কোন্ পাষণ্ড বলবে, কিন্তু কোন্ শাস্ত্রে আছে তোমার যদি জানা থাকে—তবে—তবে—

—কি ? আমি মেয়ে মানুষ শাস্ত্র পড়ব—আর তুমি তা হলে কি করবে ?

কর্ত্তা বুঝিলেন গৃহিণী ক্রুদ্ধ হইয়াছেন; গৃহিণী রাগিলে নাকের নথ স্থির হইয়া থাকে; বাহুর অনন্ত জোড়া ঘন ঘন কাঁপিয়া ওঠে। গৃহিণী বলিলেন, আমি মুখ্য মেয়েমানুষ; শাস্তর জানি না, কিন্তু আমার করে কখন কি কতখানি দরকার তা জানি। এই সব জিনিষ আমার চা-ই। শাস্তরে না থাকে কিনে এনে দাও।

গৃহিণীর শেষ যুক্তিটা আকস্মিক বজ্রের মত কর্ত্তার মাথায় আসিয়া পড়িল; তিনি ইতস্তত করিতে লাগিলেন। কর্ত্তার দুর্দ্দশা দেখিয়া বাণীবিজয় বলিল, মহাশয় আমার যতদূর স্মরণ হয় পরাশর সংহিতায় দোলাই-এর উল্লেখ আছে, অতএব—

—অতএব ব্যস্ত হবার কারণ নেই। বলে যাও গিন্নী, তোমার আর কি কি প্রয়োজন।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—আমার বাবার কাছে শুনেছি, বুঝলে বাণী,—তিনি আমাদের অঞ্চলের সব চেয়ে বড় পণ্ডিত ছিলেন (বাণী এ কথা বহুবার শুনিয়াছে)—যে, ঋষিদের লেখা শাস্ত্রে এমন জিনিষ নেই যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি একবার পূজার ফর্দ্দের মধ্যে একটা লোহার সিন্দুক, দু'খানা ঢাল, শড়কি ভরে দিয়েছিলেন। এই পর্য্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনা করিয়া পুনরায় বক্তব্য বিষয়ে ফিরিয়া আসিলেন—ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী কখনও কথার সূত্র ভুলিয়া গিয়াছেন, এমন অপবাদ কেহ দিতে পারে না।

—লিখে নাও বাবা বাণী, আমার আবার মতিভ্রম হয়। গতবার পুজোয় জগদম্বাকে কিছু দিতে পারিনি। এই বলিয়া তিনি জগদম্বার সংসারের লোকসংখ্যা গণনা আরম্ভ করিলেন। জগদম্বা, আর তার দুই জা' হল গিয়ে তিন; জামাইরা তিন ভাই, হল গিয়ে ছয়—কেমন হল না বাণী ? খাঁদু, হাঁদু, মতি, রতন হল গিয়ে চার, ছয় আর চারে কত বাবা বাণী ? বার ? না ?

বাণী বলিল, আজ্ঞে—দশ ?

—মাত্র দশ ? উঁহু আরও বেশী হবে।—গৃহিণী পুনরায় আদমসুমারী আরম্ভ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, গিন্নী, একটু তাড়াতাড়ি কর, তুমি না ঘোষেদের বাড়ী যাবে বলছিলে ?

—দৈব-কার্য্যে তাড়াতাড়ি করলে অপরাধ হবে; ও আমি পারব না, মাগো!—বলিয়া গৃহিণী দেবতার উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন। ভট্টাচা[illegible] নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

—এদের সকলেরই একখানা করে ধুতি আর শাড়ী চাই, এখন এই হলেই চলবে; তারপর না হয় পুজোর সময় আবার দেখা যাবে। বলিয়া গৃহিণী নিজের বিচক্ষণতায় নিজেই অবাক হইয়া গেলেন।

গৃহিণীর তালিকাকে সমাপ্তিতে আনিবার জন্য ভট্টাচা[illegible] বলিলেন—বাণী তা হলে লিখে নাও, আর দেরী নয়।

—কিন্তু এদিকে বাসন-পত্তরের অবস্থা দেখেছ। [illegible] যে ভেঙে চুরে গেল—

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, সে সব হবে এখন, পুজোর সময়

—না, না, সব পুজোর জন্য ফেলে রাখলে চলবে না। ততদিন-ই বা চলবে কি করে ? গোটা-দুই পিতলের কলসী, খান পাঁচ সাত কানপুরি থালা; গোটা দুই [illegible] ঘটি, অন্তত একটা ডেকচি না হলেই নয়!

ভট্টাচার্য্য পুনরায় শঙ্কিত ভাবে বলিলেন, গিন্নী, তুমি তো বললে! কিন্তু এখন এ সব জিনিষ আমি শাস্ত্রের সঙ্গে মিল করি কি করে? খামকা তো চাওয়া যায় না!

—তোমার ভরসায় বাপু আমি এ সব বলি নি! বাবা বাণী তুমি একটু পুঁথি নেড়ে চেড়ে মিলিয়ে দিযো।

বাণী গদগদ ভাবে বলিল, মা ঠাকরুণ, সে জন্য আপনি ভাববেন না; আমাদের শাস্ত্র যেমন উদার তেমনই ভাবগভ, ওর মধ্যে সব ঢুকবে, সব ভাব ও'তে সইবে।

গৃহিণী প্রশংসাসূচক স্বরে বলিলেন, তুমিই পড়েছিলে বাবা শাস্তর! আচ্ছা বাণী খানকতক কাঁঠালের তক্তা চুরিয়ে দিতে পার? বাড়ীতে যে তক্তাপোষের অভাব হয়েছে।

—কি যে বলেছন মা ঠাকরুণ, কাঁঠালের কাঠ তো সামান্য জিনিষ, আস্ত কাঁঠাল গাছ ঢুকিয়ে দিতে পারি।

—আর সেই সঙ্গে খানকতক পাকুড় গাছের তক্তা; জানলা দরজা হবে; আর একটা শালগাছের গুঁড়ি, ঢেঁকি তৈরি হবে। চৌধুরীদের পুকুরপাড়ে গোটাকয়েক শাল গাছ আছে অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করেছি।

বাণীবিজয় গাছের নাম লিখিয়া লইল। তার পরে একটু কাশিয়া, সঙ্কোচের সঙ্গে বলিল, সবই তো হল মা, কিন্তু আপনার জন্য তো কিছু হ'ল না—

—আমার আবার কি দরকার? তুমিও যেমন!

—সে কি হয়? আপনার জন্যে কিছু না হলে তালিকা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে! এই আমি লিখলাম, পট্টবস্ত্র একখানা—এই বলিয়া পট্টবস্ত্র একখানার স্থলে দুইখানা লিখিল।

—গৃহিণী কৃত্রিম বৈরাগ্যের সঙ্গে বলিলেন, হুঁ: আমার জন্য আবার পট্টবস্ত্র! না না বাণী, ওটা কেটে দাও। তিনি নিশ্চয় জানিতেন বাণী কাটিয়া দিবে না।

বাণী জিভ কাটিয়া বলিল, ওইটি পারব না মা, আর যা হয় করি।

গৃহিণীর হঠাৎ ঘোষেদের বউয়ের সাধের কথা মনে পড়িয়া গেল। তিনি মুখের মধ্যে খানিকটা দোক্তা ফেলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, যা হয় তোমরা কর—আমার বাপু তাড়াতাড়ি, আমি চললাম। তিনি অতি কষ্টে শরীরটাকে টানিয়া তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

গৃহিণী চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য এদিক ওদিক দেখিয়া মৃদু স্বরে বলিলেন, যাক তবু গিন্নী এবার অন্নের উপর দিয়েই গেছেন!—অনেক কিছুই এখনও বাকি রয়ে গেল। লেখ তো বাপু—খড়ম দুই জোড়া, চন্দ্রপাদুকা দুই জোড়া; ভাল মুর্শিদাবাদি ছত্র দুইটি, আস্ত মৃগচর্ম তিনখানা,—

ভট্টাচার্য্যের ক্রম-বর্দ্ধমান তালিকার মধ্যে বাণীবিজয় নূতন নূতন দ্রব্যের নাম সংযোগ করিয়া দিতে লাগিল—

—শীতল পাটি দুইখানি—

ভট্টাচার্য্য,—শয্যাদ্রব্য দুই দফা।

বাণী বিজয়,—ভোটকম্বল এক জোড়া—

ভট্টাচার্য্য শয্যাধার একখানা: শয্যাধার মানে বুঝলে তো, খাট—

বাণীবিজয়—আজ্ঞে তা বুঝেছি বই কি; সংস্কৃত নাম না হলে দানের দ্রব্য বুদ্ধি উত্তেজিত হয় না।

ভট্টাচার্য্য—ঠিক বুঝেছ হে! শাস্ত্রের মর্ম্ম তুমি ঠিক ধরতে পেরেছ। গাড়ু, একটি—

বাণীবিজয়—গামছা ছয়খানা—

এই রকম ভাবে বাণীবিজয় ও তাহার শাস্ত্র-পিতা দুয়েটে অনেকক্ষণ ধরিয়া তালিকা প্রস্তুত করিল; একজন যাহা ভুলিয়া যায় অন্যজন তাহা মনে করাইয়া দেয়; ইহাকেই বোধ করি বলে গুরু-শিষ্য সংবাদ।

ফর্দ্দ যখন ছয় পাতা হইল, ভট্টাচার্য্য উদার ভাবে বলিলেন, থাক থাক আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে। উদারতা পূর্ণ উদরের বৃত্তি মাত্র।

তালিকা দেখিয়া গুরু ও শিষ্য উভয়েই সন্তুষ্ট হইল! বাণীবিজয়ের পট্টবস্ত্র যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, গুরুর তো কথাই নাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, ওখানা সাবধানে রেখে দাও; কাল প্রত্যুষে একবার চৌধুরী-বাড়ী যাওয়া যাবে।

তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন, এমন বোধ হয় কিছু বেশী হল না! এত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে!

বাণী বলিল, আজ্ঞে কিছু না! ওদের পক্ষে সামান্যই, আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। জগতের রহস্যই তো এই!

আমরা ভাবছি কত না জানি হল। দেখবেন চৌধুরী-কর্ত্তা দেখে বলবেন—মাত্র এই!

ভট্টাচার্য্য ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে আর কিছু ঢুকিয়ে দেব না কি?

বাণী বলিল, আজ্ঞে সময় আছেই। সারারাত্রি ভেবে দেখবেন এখন। কিছু মনে পড়লে তখন—

—বেশ, বেশ; তোমার সাংসারিক বুদ্ধি আছে হে, জীবনে উন্নতি করবে।

এমন আশীর্ব্বাদ পাছে নিস্ফল হয়, তাই সে গুরুর পায়ের কাছে টিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, তুমিও রাতটা একটু ভেবে দেখো। এ সুযোগ গেলে আবার সেই পুজোর আগে ছাড়া হবে না।

—যে আজ্ঞে, বলিয়া বাণীবিজয় দ্রুত প্রস্থান করিল। পাশের ঘরে সে অনেকক্ষণ হইতে কাহার যেন পদ-সঞ্চালন-শব্দ শুনিতে পাইতেছে।

[৭]

অনেক দিন পরে আবার চৌধুরী-বাড়ী উৎসবের আয়োজনে মুখর হইয়া উঠিল। রাজমিস্ত্রী বাড়ীঘর সংস্কার করিতে লাগিয়া গেল; চুণকাম হইতে লাগিল; রংমিস্ত্রী পুরাতন রঙের উপরে নূতন করিয়া তুলি বুলাইতে আরম্ভ করিল; প্রকাণ্ড আঙিনায় সামিয়ানা খাটাইবার জন্য বাঁশ পোতা আরম্ভ হইল; ঝাড়লণ্ঠন টাঙাইবার জন্য কাঠের খুঁটি পোতা হইল; চৌধুরী-বাড়ীর সকলেই ব্যস্ত।

কাছারীর কাজের উগ্রমূর্ত্তিও অনেকটা কোমল হইয়া আসিল, আমলা-গোমস্তার দল হিসাবের খাতা ছাড়িয়া বেহিসাবী কাজে লাগিয়া গেল, এমন কি দেওয়ানজীর কড়া হাঁক-ডাকের মধ্যে কড়ি-মধ্যমের আভাস দেখা দিল, ব্যস্ততার আতিশয্যে তিনি চাবির তোড়া বারংবার হারাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক বারই অন্যের উপর দোষারোপ করা সত্বেও নিজের কোমর হইতে তাহা আবিষ্কৃত হইতে লাগিল।

দেউড়ীতে বরকন্দাজেরা নূতন পাগড়ী নূতনতর ভঙ্গীতে বাঁধিতে সুরু করিল এবং পুরাতন লাঠিতে তৈল প্রয়োগ করিয়া নূতন করিয়া তুলিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেল। আলিবর্দ্দী পাগড়ি বাঁধিয়া আঙরাখা গায়ে দিয়া, নাগরা জুতা পরিয়া দেউড়ীতে জমাইয়া বসিয়া কয়েক মাসের ভ্রমণ-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। আলিবর্দ্দীর মনে ঐতিহাসিকের বীজ সুপ্ত ছিল; বৈদেশিক সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ পাইলে ঐতিহাসিকের খ্যাতি সে নিশ্চয় লাভ করিতে পারিত। প্রতিদিন নূতন করিয়া আবৃত্তির সঙ্গে তাহার কাহিনী পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রতিদিনই সত্যের সঙ্গে অধিকতর কল্পনার ভেজাল মিশিতেছে, অবশেষে নিরীহ সত্য অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিল, কল্পনা আলিবর্দ্দীর রসনার তাড়নায় মহাকাব্যের সীমায় গিয়া পৌছিল।

বৈঠকখানায় উদয়নারায়ণ আসর জমাইয়া বসিয়াছেন, পশ্চিমা শালওয়ালা বিনা মুনাফায় অত্যুৎসাহের সঙ্গে শাল বেচিতেছে; মুর্শিদাবাদের ও রাজসাহীর মুগার কাপড়ওয়ালার ন্যায্য মূল্যের দুই তিন গুণ দামে কাপড়, শাড়ী বিক্রয় করিতেছে, নূতন বাসন কেনা হইতেছে; স্যাকরা পুরাতন গহনা বদলাইয়া নূতন গহনা দিতেছে; উদয়নারায়ণ সবই কিনিতেছেন, মুখে তাঁহার 'না' নাই। ভট্টাচার্য্যের সশঙ্ক ছয় পাতার ফর্দ্দ কর্ত্তার বদান্যতার ইঙ্গিতে বার পাতায় পৌছিয়াছে।

দেওয়ানজী বারংবার চাবি খুঁজিবার অবকাশে বৈঠকখানায় ও কাছারীর মধ্যে টানা-পোড়েন পাড়িতেছেন। চারিদিকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইতেছে; পরগণায় পরগণায়, প্রত্যেক মহালে প্রধানদের নামে চিঠি দেওয়া হইতেছে, তাহারা যেন যথানির্দ্দিষ্ট তারিখে ছোট বড় সকল প্রজাকে সঙ্গে লইয়া সদরে আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্মীয়-স্বজনকে সপরিবারে উৎসবের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে; চারিপাশের জমিদারদের উৎসবে যোগ দিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে; কেহ যেন বাদ না পড়ে—কর্ত্তার কড়া হুকুম।

দেওয়ানজী ব্যস্তভাবে বৈঠকখানায় ঢুকিয়া বলিলেন, কর্ত্তা, তারাপুরের বাবুদের কি চিঠি দেওয়া হবে ?

কর্ত্তা বলিলেন, তোমার হল কি রামজয়, কতবার তো ওই একই কথা বললাম।

— তাই তো, তাই তো, দাঁড়ান, আমি লিখে নি—এই বলিয়া দেওয়ানজী দ্বিগুণ ব্যস্ততার সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। একটু পরেই আবার ঘুরিয়া আসিয়া বলিলেন, চাবির গোছাটা কি ফেলে গেলাম না কি ?

কর্ত্তা বলিলেন, ফেলবে কেন ? ওই তো তোমার কোমরে ? রামজয় কোমরে হাত দিয়া বলিলেন, কোমরেই তো বটে, কি মুস্কিল ! বুড়ো হয়েছি, কিছুই আর ঠিক পারি না। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তোমার গোলমাল চাবিতে নয়, বুদ্ধিতে।

—সে আর বলতে ! আজ সকাল থেকে অন্তত একশ বার চাবি হারিয়েছি আর—

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—একশ বারই কোমরে পেয়েছ।

—ঠিক ধরেছেন ! এতেই বোঝা যাচ্ছে বুড়ো হয়েছি—

—চাবি না হারালেও তুমি বুড়ো হয়েছ ! আর তুমি যদি বুড়ো হও, আমার তবে অবস্থা কি ভাব তো।

—আজ্ঞে ভেবে দেখব এখন—বলিয়া তিনি আবার প্রস্থান করিলেন। যেন কথাটা একাকী নিভৃতে বসিয়া না ভাবিলে বোঝা মুস্কিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বক্তদহের জমিদারকে কি বলা যায় ? চিঠি দেওয়া হবে কি ?

—নিশ্চয়, একশ বার। কেন তার অপরাধটা কি ? বিশেষ একবার বক্তদহের বক্তকমলের মালিক এসে আমার ভাগীরথীর শ্বেতপদ্মকে দেখে যাক,—জিতল কে, না দর্পনারায়ণ।

—আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা। আমি তা হলে সেই ব্যবস্থা করিগে'।

—যাও, কিন্তু আর যেন চাবি হারিও না।

দেওয়ানজী বলিলেন—আমার ওই হয়েছে এক বিপদ্। চাবি সামলাতে গেলে কাজের কথা ভুলে যাই ; কাজ করতে গেলে চাবি যায় হারিয়ে। বলিয়া দেওয়ানজী কাছারীর দিকে খড়মের শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

*

চৌধুরীদের প্রকাণ্ড আঙিনায় সামিয়ানার তলে মধু অধিকারীর যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে—"অভিমন্যু বধ" পালা। আসরে তিলধারণের স্থান নাই। মাঝখানে যাত্রার আসর ; এক পাশে গালিচার উপরে ডওরান মাত্র লোহিত উদয়নারায়ণ ; তাঁহার চারিপাশে গণ্যমান্য অতিথিগণ ; ছোট বড জমিদার, জোতদার, আত্মীয়-স্বজন, একধারে দর্পনারায়ণ। রূপার রেকাবে করিয়া পান, মশলা বিলি করা হইতেছে। বয়স্ক লোকেরা কর্ত্তাকে আড়াল করিয়া তামাকু টানিতেছে ; গোলাব-পাশ হইতে গোলাব জল ছিটান হইতেছে। মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া ভৃত্যেরা বড বড হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে, আর যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে উত্তরা-অভিমন্যুর বিদায়-সম্ভাষণ চলিতেছে ; যাত্রাদলের একটি ছোট ছেলে করুণ কণ্ঠে আসন্ন বিদায়ের বন্যাকে কণ্ঠে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া গাহিতেছে—

…তুমি মম, সুধা সম। ·

এমন সময়ে বক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায় আসরে প্রবেশ করিল ; দেওয়ানজী যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাহাকে বসাইলেন। পরন্তপকে দেখিয়া দর্পনারায়ণ চমকিয়া উঠিল। এ লোকটা আসিল কোথা হইতে। সে শুনিয়াছিল বিদেশী এক জমিদারের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সেই বিদেশী জমিদার যে ওই হতভাগাটা, তাহা দর্পনারায়ণের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। তাহার ধারণা হইল, সে যে বনমালাকে বিবাহ করিয়াছে, পরন্তপ কোন সূত্রে তাহা জানিয়াছে, সেই জন্যই তাহাকে অপমানিত করিবার জন্য সে এই উৎসবে আসিয়াছে।

দর্পনারায়ণকে দেখিয়া পরন্তপ বিস্মিতও হইল না, নূতন করিয়া কষ্টও হইল না। সে জানিত না, বনমালাকেই দর্পনারায়ণ বিবাহ করিয়াছে, আর জোড়াদীঘির চৌধুরী-বাড়ীতে যে দর্পনারায়ণের সাক্ষাৎ মিলিবে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কোথায় ! দুইজন দুইজনকে লক্ষ্য করিতে লাগিল, কেহ কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না।

দর্পনারায়ণের মনে আর একটা ব্যথার গুপ্ত-কাঁটা খচ্-খচ্ করিয়া ফুটিতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল না, এই নূতন ক্ষোভ কিসের জন্য! যদি সে ভাল করিয়া নিজের মনের মধ্যে তাকাইত, তবে বুঝিতে পারিত, ইহা ঈর্ষা; যে লোকটাকে সে সবচেয়ে ঘৃণা করে, যাহাকে সে নরাধম মনে করে, তাহারই সৌভাগ্যে ঈর্ষা! শেষে ওই হতভাগাটা ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করিল! নিজে সে ইন্দ্রাণীকে বিবাহ করে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আর কেহ করিবে কেন! আর কেহ যদি করিল, সে পরন্তপ ব্যতীত অন্য লোক হইল না কেন! তাহার মনে হইল পরন্তপ এ দিক দিয়াও তাহার উপরে এক হাত লইয়াছে। ইন্দ্রাণীকে না পাইবার দুঃখ অত্যন্ত তীব্র ভাবে সে অনুভব করিতে লাগিল।

রাত্রি অনেক হইলে দেওয়ানজী পরন্তপকে আহারের জন্য লইয়া গেল। আহার শেষ করিয়া পরন্তপ বিদায় লইয়া বাড়ী রওনা হইল। যখন দেউড়ী অতিক্রম করিয়া একটু নির্জ্জন ও অন্ধকার স্থানে আসিয়াছে, অমনই সে পৃষ্ঠদেশে কাহার স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল; দেখিল দর্পনারায়ণ। এক মুহূর্ত্তের জন্য দুইজনে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। দর্পনারায়ণ প্রথমে কথা বলিল,—আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া বাকি রয়ে গিয়েছে।

পরন্তপ বলিল, সে অভিযোগ তো আমার, সেদিন আমি মত্ত অবস্থায় ছিলাম।

—আজ বুঝি তার প্রতিশোধ দিতে এসেছিলেন!

—প্রতিশোধ দিতে আর পারলাম কই? হলে মন্দ হত না!

দর্পনারায়ণ বলিল, সে জন্য দুঃখ কেন? তলোয়ারের হাত ঠিক আছে তো? না, জমিদারী পেয়ে এখন বাবু হয়ে গিয়েছেন?

—তলোয়ার পেলে বোঝা যেত।

—তবে আসুন আমার সঙ্গে।—এই বলিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া দর্পনারায়ণ চলিতে লাগিল।

সরু, বাঁকা অন্ধকার পথ দিয়া, লোকজন এড়াইয়া চলিতে চলিতে সে চৌধুরী-বাড়ীর প্রাচীনতম যে অংশটাতে বাস্তুর বাগান, সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। বলিল, একটু অপেক্ষা করুন। সে দ্রুত অন্তর্দ্ধান করিল এবং এক পরেই দুইখানা কোষমুক্ত তলোয়ার, একটি মশাল, চকমকি পাথর ও শোলা লইয়া ফিরিয়া আসিল। চকমকি ঠুকি মশাল জ্বালিল; মশালের পীত আলোকে পরন্তপ দেখি জায়গাটা জঙ্গলে পূর্ণ, নির্জ্জন, মারিয়া ফেলিলেও কেহ জানিতে পারিবে না। দর্পনারায়ণ মশালটাকে মাটিতে পুঁতিয়া দিল; মশালের আলোকে তলোয়ার ঝকঝক করিয়া উঠিল।

এই সব কাজ করিবার পরে দর্পনারায়ণ বলিল—এইবার—

পরন্তপ মালকোচা মারিয়া, চাদর কোমরে জড়াইয়া একখানা তলোয়ার গ্রহণ করিল; অন্য খানা দর্পনারায়ণ উঠাইয়া লইল।

তখন সেই গভীর রাত্রিতে, নির্জ্জন বনকল্প স্থানে, মশালের আলোকে, দুই শত্রুতে, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীতে, দুই বুদ্ধিভ্রংশ ব্যক্তিতে, মৃত্যুপণ করিয়া অসি চালনা করিতে লাগিল। অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিয়া ঝন্‌ঝনা উঠিতে লাগিল। মশালের আলোকে চঞ্চল তলোয়ারে বিদ্যুৎ সঞ্চার করিতে লাগিল; দুইজনের পরিশ্রমের নিঃশ্বাস দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল। দুই জনেই সমান নিপুণ। দুইজনে ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া, চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করিয়া, কপালে ঘাম ঝরাইয়া অসি চালনা করিতে লাগিল, কেহ কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিল না। যখন অনেক ক্ষণ এইরূপ চলিয়াছে, হঠাৎ সেই বনের প্রান্ত হইতে একটা কঠোর শুষ্ক অট্টহাস্য উত্থিত হইল; পরন্তপ চমকিয়া উঠিল; চকিয়া উঠিতেই পা পিছলাইয়া গেল: পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল; পড়িবার সময়ে মশালটার উপরে পড়িল, মশাল নিবিয়া বন অন্ধকার হইল। সে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়ে দর্পনারায়ণ গিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল; পরন্তপ বুঝিল, পতনের বেগে তাহার হাতের তরবারি কোথায় ছিটকাইয়া পড়িয়াছে; দর্পনারায়ণের উদ্যত তরবারি শত্রুর উপর পড়িল না, হঠাৎ তাহার ইন্দ্রাণীর মুখ মনে পড়িয়া গিয়াছে; ইন্দ্রাণীর স্বর্ণ মুকুরের মত উজ্জ্বল, চিক্কণ, প্রতিভা ও সৌন্দর্য্যের চিক

লীলাস্থল, অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ। সে তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া পরন্তপকে হাত ধরিয়া তুলিল—বলিল—উঠুন!

পরন্তপ বলিল—কিসের শব্দে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলাম তাই—আমার তলোয়ার খানা—

—দরকার নাই।

—কেন?

—আজ আর নয়।

পরন্তপ বলিল—তবে কি আর এক দিন হবে?

দর্পনারায়ণ শুধু বলিল—দেখা যাবে।

কিন্তু দুই জনেই বুঝিল ইহাই শেষ নয়; পলাশীর মাঠে যাহার সূত্রপাত, রক্তপাত বিনা তাহা শান্ত হইবে না। দর্পনারায়ণকে অনুসরণ করিয়া পরন্তপ চলিতে লাগিল; দেউড়ীর কাছে আসিয়া পরন্তপকে পথে তুলিয়া দিল; দুইজনে নীরবে পরমতম শত্রুর কাছে বিদায় লইল।

[৮]

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি। রক্তদহে বড় ধুম করিয়া বিশ্বকর্ম্মা পূজা হয়। কারণ এই গ্রামে প্রায় দুই তিন শত ঘর কামারের বাস। সেদিন তাহারা যন্ত্রপাতি ধুইয়া মুছিয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় কর্ম্মকার বিশ্বকর্ম্মার পূজা করে; বিকাল বেলায় সকলে মিলিয়া জমিদার-বাড়ী যায়; সেখানে এই উপলক্ষ্যে তাহাদের বার্ষিক নিমন্ত্রণ, পেট ভরিয়া খায়; আহারের পরে নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলা হয়।

পূজার একটা নারিকেল দুই পক্ষের মধ্যে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়—মাঝখানে একটা সীমানা থাকে, যে পক্ষ নিজেদের সীমানায় নারিকেলটি লইয়া যাইতে পারে, তাহাদের জয় হয়। এই খেলা রক্তদহে অনেক বছর হইতে হইয়া আসিতেছে, কেহ তাহাদের হারাইতে পারে নাই। রক্তদহের লোকেরা আশে পাশের সব গাঁয়ের লোকদের এই খেলায় হারাইয়া দিয়াছে। এক একবার তাহারা এক একটা গ্রামকে আহ্বান করে, কিন্তু কেহই জিতিয়া যাইতে পারে নাই।

এবার তাহারা জোড়াদীঘির লোকদের এই উপলক্ষ্যে আহ্বান করিয়াছে; জোড়াদীঘিকে তাহারা বড় এ উপলক্ষ্যে আহ্বান করে না, আগে দু' একবার করিয়াছে, তাহারা জিতিতে পারে নাই। এবারের আহ্বানের বিশেষ একটু অর্থ আছে।

রক্তদহের লোকেরা জোড়াদীঘির লোকদের উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছে; জোড়াদীঘিকে তাহারা বিশ্বাসঘাতক মনে করে; জোড়াদীঘির জমিদার তাহাদের জমিদার-কন্যাকে বিবাহ করিবে অঙ্গীকার করিয়া সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে; এই অপমান তাহারা কিছুতেই ভুলিতে পারে নাই।

যখন তাহারা শুনিল, ইন্দ্রাণীর পরিবর্ত্তে দর্পনারায়ণ অপরিচিত এক মেয়েকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে, তখন খুব এক চোট প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু রাগ তাহাতে যায় নাই। তাই তাহারা স্থির করিয়াছে, জোড়াদীঘিকে নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলায় হারাইয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবে।

ইহাতে জমিদারেরও ইঙ্গিত আছে। ইন্দ্রাণী রক্তদহের প্রধানদের ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছে, জোড়াদীঘিকে পরাজিত করিতে পারিলে তাহাদের সকলকে নূতন ধুতি-চাদর পার্ব্বণী দিবে। ইন্দ্রাণী আরও বলিয়াছে, পশ্চিমের মাঠে দুইদল একত্র হইলে ছাদের উপর হইতে সে নিজের হাতে নারিকেল ছুঁড়িয়া দিবে। রক্তদহের প্রধানেরা ইন্দ্রাণীকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে—ইন্দ্রাণীর ইচ্ছা সকলকে জানাইয়া দিয়াছে, তাহাদের উৎসাহের আর সীমা নাই।

জোড়াদীঘি রক্তদহের আহ্বান গ্রহণ করিল। জোড়াদীঘির প্রধানেরা রক্তদহে রওনা হইবার আগে চৌধুরী-বাড়ীতে দেখা করিতে গেল। দর্পনারায়ণ সমস্ত শুনিয়া বুঝিল—ইহা তাহাকেই অপদস্থ করিবার চেষ্টা এবং বুঝিলেন—ইহা পূর্ব্বাভাস মাত্র—সহজে এ বহ্নি নিভিবে না। সে সকলকে উৎসাহ দিল—বড় রকম বকশিস কবুল করিল এবং আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিল। চৌধুরী-বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া অগণিত লোক বিভিন্ন পথ দিয়া রক্তদহের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর পশ্চিমের দিকে যে বিস্তীর্ণ মাঠের কথা এর আগে উল্লেখ করিয়াছি, সেই মাঠে লোক জমিতে আরম্ভ করিল। অপরাহ্নে নারিকেল কাড়াকাড়ি

আরম্ভ হইবে, কিন্তু দুপুর হইতেই ভিড় সুরু হইল। রক্তদহের লোকেরা গ্রামেই থাকে, তাহারা আগেই আসিয়াছে, ক্রমে দলে দলে জোড়াদীঘির লোক আসিতে লাগিল। দুইদল দুইদিকে দাঁড়াইল, কিন্তু লোকের সংখ্যা শেষে এতই বাড়িয়া গেল যে, রক্তদহে জোড়াদীঘিতে ভেদাভেদ রহিল না।

ভাদ্র মাস, কাজেই মাথার উপর দিয়া কাঠফাটা রৌদ্র ও ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি চলিতে লাগিল, তাহাতে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই; মাঝে মাঝে উভয় গ্রামে বচসা ও কলহ হইতে লাগিল—কিন্তু সকলেই সংযত হইয়া রহিল। মানুষ বিনাসূত্রে মারামারি করে না—ইহাতেই বোধ করি মনুষ্যত্ব। ফুটবল খেলায় যেমন নিরীহ চর্ম্ম-গোলকটি উপলক্ষ্য করিয়া মারামারি ও নাক ফাটান রীতি, এখানেও তাহারা তেমনি নিরেট নারিকেলটির অপেক্ষায় রহিল—সেটি জনতার মধ্যে পড়িলেই তাণ্ডব সুরু হইয়া যাইবে।

জমিদার-বাড়ীর দেউড়ীতে তৃতীয় প্রহরের ঘণ্টা বাজিলে দেখা গেল—বিস্তৃত মাঠ জনসমাগমে পূর্ণ;—ছাদের উপর হইতে নীচে চাহিলে দেখা যায় কেবল কালো মাথা; সম্মুখে, দূরে, বামে, দক্ষিণে কেবল কালো মাথা; আর মাঝেমাঝে উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ব্যগ্র মুখের কালো রং, কটা রং, আর তার নীচেই শাদা চাদর ও কাপড়ের আভাস।

কিছুক্ষণ পরে চাঁপা ঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রাণী ছাদের উপরে আসিল। ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া জনতার কোলাহল হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল—এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পরেই আবার গোলমাল সুরু হইল। ইন্দ্রাণীর আবির্ভাবের কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ পুরোহিত একটি সিঁদুরমাখা নারিকেল লইয়া উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রাণী নারিকেলটি লইল; চাঁপা তিনবার শঙ্খধ্বনি করিল, তখন ইন্দ্রাণী মাল্যোপম হাত দুইখানি লীলায়িত করিয়া সেই সিঁদুরমাখা নারিকেলটি নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

অমনি সেই বৃহৎ জনতা বিকট চীৎকার করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, পড়িবা মাত্র নারিকেল কোথায় অন্তর্হিত হইল। তখন মারামারি, কাড়াকাড়ি, হাতাহাতি পড়িয়া গেল—সকলেরই বিশ্বাস, তাহার কাছে ছাড়া অন্যের কাছে নারিকেল আছে, কিন্তু কোথায় আছে কেউ জানে না। যে যাহাকে পারিতেছে, আক্রমণ করিতেছে, মারিতেছে, আবার ছাড়িয়া দিয়া অন্যকে ধরিতেছে। ক্রমে সেই জনতা আট দশটি দলে আপনিই বিভক্ত হইয়া গেল—কোথায় নারিকেল! মাঝেমাঝে এক একবার সন্তরণে অক্ষম মজ্জমান ব্যক্তির মুণ্ডের মত নারিকেলটি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেখা দিতেছে, পর মুহূর্ত্তেই আবার কোথায় তলাইয়া যাইতেছে।

ছাদের উপর হইতে ইন্দ্রাণী, চাঁপা, জমিদার-বাড়ীর লোকজন নিম্নের তাণ্ডব দেখিতে লাগিল। ছাদের উপর দাঁড়াইলে মাঠের শেষে নদীর জল দেখা যায়—ওই নদীই হইতেছে রক্তদহের সীমানা; জোড়াদীঘির লোকেরা যদি নারিকেল নদীর ওপারে লইয়া যাইতে পারে, তবে তাহাদেরই জয়। ইন্দ্রাণীরা বুঝিতে পারিল না কোন্ দল জিতিতেছে, এত অল্প সময়ে বোঝা সম্ভবও নয়। যাহারা লড়িতেছে—তাহারাও জানে না কোন্ দলের জয় হইবে; সত্য কথা বলিতে তাহারা আরও কম জানে। কিন্তু এটুকু তাহারা বুঝিতে পারিতেছে যে, আজ দুই পক্ষই মরীয়া।

এই বিপুল তাণ্ডবে কাহারও চাদর উড়িয়া গেল, কাহারও কাপড় ছিঁড়িল, কাহারও চুল ছিঁড়িল, অনেকেই আহত হইয়া পালাইতে আরম্ভ করিল।

এই আট দশটা উপদলের কোন্‌খানে যে নারিকেল কেহ জানে না, তবে প্রত্যেক দলেরই বিশ্বাস তাহাদের জনতার কেন্দ্রেই সেই চরম ফল বর্ত্তমান। কোন দেবতা যদি মানুষের ইতিহাসের গতিকে এমন ভাবে উপর হইতে লক্ষ্য করেন, তবে তিনি মনে করিবেন, এই পৃথিবীর প্রাঙ্গনে নানাজাতির মধ্যেও এমনই এক নারিকেল কাড়াকাড়ি খেলা চলিতেছে। প্রত্যেক জাতিই মনে করে, তাহারাই জীবনের সত্যকে ধরিতে পারিয়াছে, তাহাদেরই তাহা দৈবসম্পত্তি, অন্য জাতি তাহা কাড়িয়া লইতে না পারে, ইহাই তাহাদের মৃত্যুপণ প্রয়াস।

অনেক ক্ষণ পরে ইন্দ্রাণীরা আবার ছাদের উপর হইতে দেখিল, জনতা যেন ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, প্রায় অলক্ষ্য গতিতে নদীর দিকেই চলিয়াছে; তাহারা বুঝিল, জোড়াদীঘির দল জিতিতেছে। ইন্দ্রাণীর মুখ কালো হইয়া গেল—পরন্তপ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রক্তদহের লোকদের

সাবধান করিয়া দিবার জন্য দুইজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিল। কিন্তু জনতা ক্রমেই নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাঠের সম্মুখের অংশে এখন আর লোক নাই, কেবল ছিন্ন-চাদর, ছিন্ন-কাপড় আর সহস্র মনুষ্যের পদাঘাতে কর্দ্দমাক্ত ভূমি; মাঝে মাঝে, এখানে ওখানে আহত ও পরিশ্রান্ত ব্যক্তিরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে। হঠাৎ বিরাট এক উল্লাস ধ্বনিতে চমকিয়া চাহিয়া ইন্দ্রাণীরা দেখিল জনতা গিয়া নদীর জলে পড়িয়াছে; দেখিতে দেখিতে নদীর জল সহস্র নরমুণ্ডে কালো হইয়া গেল; জোড়াদীঘির লোক নারিকেল লইয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছে।

জলের মধ্যে হাতাহাতি চলিল—কিন্তু এখন জোড়াদীঘির জনসংখ্যাই বেশী—রক্তদহের দল ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। যাহারা সাঁতার দিতেছিল, তাহারা ক্রমে পরপারে উঠিতে আরম্ভ করিল;—প্রায় যখন অধিকাংশ জোড়াদীঘির লোক পরপারে উঠিতেছে, তখন একজন নিজের চাদর হইতে নারিকেলটি খুলিয়া দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া পরপারবর্ত্তী রক্তদহের অধিবাসীদের দেখাইল—সকলে মিলিয়া বিরাট জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। রক্তদহের লোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া নদীর তীরে বসিয়া পড়িল। কিন্তু একেবারে বসিয়া থাকিল না; তখনও জোড়াদীঘির অনেক লোক এ পারে ছিল, তাহারা উঠিয়া সেই হতভাগ্যদের পিটিতে সুরু করিল। হাত দিয়া, পা দিয়া, লাঠি দিয়া, যে যাহা দিয়া পারিল মারিল। জোড়া-

অল্পসংখ্যক হতভাগ্যেরা যাহারা পারিল, নদীতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইল, যাহারা পারিল না, নিরুপায় ভাবে মার খাইতে খাইতে বসিয়া পড়িল, অনেকেরই মাথা ফাটিল; অনেকেরই হাত পা ভাঙ্গিল।

সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই সব মীমাংসা হইয়া গেল—ইন্দ্রাণী মুখ লাল করিয়া, ক্রমে কালো করিয়া ছাদ হইতে অন্তর্হিত হইল। সে দিন রক্তদহের অধিকাংশ ঘরেই সন্ধ্যাবাতি জ্বলিল না।

[ক্রমশঃ

প্রার্থনা

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

কত মিথ্যা আবরণ দিয়া
হে সত্য, তোমারে আমি রেখেছি ঢাকিয়া!
যাহা নই সাজি তাহা,
লুকাই রয়েছে যাহা,
খাঁচার বুল্‌বুল্ মোর ঘেরাটোপে অন্ধপ্রায় আঁখি
ভুলে গেছে নীলাকাশ, আলোর আভাসে থাকি থাকি
ওঠে তবু ডাকি।

কত ফাঁকি কত প্রতারণা
করেছে আবেগহারা তোমার প্রেরণা
বুকের স্পন্দনে মোর;
আজি পশিয়াছে চোর
প্রাণের নিভৃতে যেথা ছিল মোর অমৃতের খনি,
নিঃশেষে লতেছে হরি গোপন সম্পদ রত্নমণি
দিবস-রজনী।

হে আমার পরশ মাণিক,
তোমার পরশখানি সোণা করে দিক
সব ধূলি সব মাটি,
হক স্বর্ণ হক খাঁটি,
তোমার জ্বলন্ত শিখা, হে পাবক, জ্বালুক মশাল,
ভস্মীভূত হক বক্ষে পুঞ্জীভূত এ জালজঞ্জাল,
হে রুদ্র ভয়াল।

হান বাজ, আন ঝঞ্ঝাবাত,
মোর ধ্বংসস্তূপে হক মিথ্যার নিপাত।
আবার নূতন করি
তোমার মন্দির গড়ি,
সে দেউলে আমরণ থেক তুমি স্বর্ণ-সিংহাসনে,
পদপ্রান্তে দিয়ো স্থান, পূজি যেন অচল আসনে
রাজীব-চরণে।

নাট্যাভিনয়ে পুতুল (বামে) পুতুল সঙ (দক্ষিণে)

পুতুল-রমণী এবং তাহার পুতুল-কুকুর

পুতুল-নর্ত্তকী (উপরে)
পুতুলের রাণী পুতুল রাজদূতের 'সম্মান' গ্রহণ করিতেছেন (পার্শ্বে)

কায়াপুতুল ও ছায়াপুতুল

—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

বিবাট বহস্তকে পিছনে বেখে পৃথিবীব বুকে একদিন মানুষেব জন্ম-মৃত্যু সুরু হল, ধীবে ধীবে মানুষ ক্রমোন্নতিব পথে এগিয়ে চলতে লাগল। তাবপব তাব বিচাব-বুদ্ধিব সঙ্গে তুমুল দ্বন্দ্বেব অবসান কবে, খাওয়া-পবাব ভাবনা মিটিয়ে, যুগেব পব যুগকে অতিক্রম কবে, একদিন সে কলা শিল্পেব দিকে নজব দিল। এই শিল্প তখন হল তাব খাওয়া পবাব চেয় বড়। অবসব সময়ে যাব সৃষ্টি তাকে তৃপ্তি দেবাব জন্য, প্রকৃত তৃপ্তি সে তাতে পেল না; তখন মানুষ সাধাবণ শিল্প-কলাকে ছেড়ে আবও নূতন কিছু বিহাবেব আকাঙ্ক্ষায় উতলা হল। সেই দিন হল অভিনয়েব জন্ম।

পুতুলনাচের সৈনিক পুতুল (রোম)।

এই অভিনয় এ যুগেবই একমাত্র সম্পত্তি নয়। প্রাচীন যুগে দেবতাবাও অভিনয় কবতেন, মহাদেবেব তাণ্ডব নৃত্য, নটবাজ নাম, এই সবেবই সংবাদ বয়ে আনে। এ ছাড়া মহাভাবত, বামায়ণ, পাতঞ্জল, পাণিনি ও কালিদাসেব গ্রন্থাবলীব মধ্যেও প্রাচীনকালের নৃত্যগীত, আনন্দ উৎসব ও অভিনয়েব যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভাবতেব বুকে এই অভিনয় গ্রীকো-বোমান সভ্যতাব বহু পূর্ব্ব হ'তে

বাঙ্গালায় পুতুলনাচ—চারিটি পুতুল ও চারিটি পুতুল-নাচিয়ে (উপরে)।
বাঙ্গালাদেশে পুতুল নাচাইবার পূর্ব্বাবস্থা (পার্শ্বে)।

প্রচলিত হয়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর জগতের বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ দিন চলে গেছে। এক এক জাতির

পুতুলনাচের অভিনয়-মঞ্চ (যবদ্বীপ)।

জীবনের শিল্প-গতি-ছন্দ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পৃথিবীর বুকে লুপ্ত হয়েছে। বহু সংস্কৃতি ও জাগৃতির (renascence ও reformationএর) সঙ্গে সঙ্গে নতুন জাতি, নতুন পন্থী সময়ের এই ঘূর্ণ্যমান চক্রের এক ফাঁক দিয়ে ধরিত্রীর বুকে তাদের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে, শিল্প-বিজ্ঞানের নবযুগ আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু পুরাতনকে মানুষ একেবারে বাদ দিতে পারে নি। বহু ক্ষেত্রে সেই পুরাতনকে নিয়েই নবরূপে রূপ দিয়েছে মাত্র।

এই অভিনয় ও চারুশিল্পের ক্রম-প্রচলন ও ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর ভাবধারা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। থিয়েটার, অপেরা, পাঁচালী, কবি, তর্জ্জা, কথকতা এবং তার সঙ্গে ভারতের বুকে আর একটি উৎসব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেটি হল পুতুলনাচ ও ছায়ানাটক।

এই পুতুলনাচের জন্ম সম্বন্ধে নানা মতভেদ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, অনেক লেখক যেমন লিখে থাকেন যে, ভারতের নাট্যশালার আরম্ভ গ্রীকদের ধার করা আদর্শ থেকে, তেমনি অনেক আধুনিক লেখক লিখেছেন যে, রোমীয় সভ্যতাই না কি পুতুলনাচের আদিপুরুষ। রোমের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে নবজাগরণের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিল্পকলা যখন চরম উৎকর্ষের পথে এগিয়ে চলছিল, তখন না কি গাছের কাঠ ও ছাল থেকে নানা প্রকার পুতুল ও মুখোস তারা তৈরী করত। তারপর ঐ সব পুতুলদের নিয়ে পালা করে সাধারণের সাম্‌নে অভিনয় দেখাত। তা' থেকেই এই পুতুলনাচ-(marionettes)এর প্রচলন পৃথিবীর অন্যান্য সমসাময়িক উন্নতিশীল জাতির মধ্যে না কি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। আবার অনেকে বলেন, ৭ম ও ৮ম শতকে বৌদ্ধ যুগে যখন প্রথম চীন দেশে বর্ণকা বা মুখোসের (mask) প্রচলন হয়, পুতুলনাচ সেই সময় থেকেই চীনে আধিপত্য বিস্তার করে। এই জন্য চীনদেশকেই অনেকে পুতুল-অভিনয়ের জন্মস্থান বলে জাহির করেন।

ভারতের বুকে এই ছায়ানাটক ও পুতুল অভিনয়ের উল্লেখ বহু পুরাতন পুঁথিপত্রের মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের মধ্যে পাকস্থমন রাজার দানের কথায় শালভঞ্জিকার (puppet) উল্লেখ পাওয়া যায়। ৮০০-৬০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পাঞ্চালদেশে

পুতুলনাচ (যবদ্বীপ)—'ওআইয়াং কুলিৎ'

কুরুরাজ্যের মধ্যে কাঠের পুতুল তৈরী হত তার বহু প্রমাণ আছে, তবে সেটা অভিনয়ের জন্য নয়, অন্য কারণে। পাত পুতুলনাচ হতে দেখা যায়। তবে অতি আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, ইউরোপ ও অন্যান্য প্রগতিশীল জাতির সঙ্গে সমানে পা ফেলে আমরা অনেক বিষয়ে এখনও এগিয়ে যাইনি বলেই হক বা সাধারণ শিক্ষিত, বর্ত্তমানের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত এদেশীয় লোকের রুচির বিভিন্নতাতেই হক, এই পুতুলনাচ আমাদের মধ্যে থেকে প্রায় লোপ পেতে বসেছে, নবরূপে তার পরিচয় ঘটে নি।

পুতুলনাচ (যবদ্বীপ)– মহাভারত অভিনয়।

আমাদের দেশের প্রাচীন যুগের পুতুলদের অবস্থা, অবয়ব ও পোষাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল, তার কথা বলতে গিয়ে C. Magnin তাঁর বৃহৎ Historie des Marionettes en Euste নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখেছেন যে, ...লের মধ্যেও ছায়ানাটকের উক্তি দেখা যায়। অনেকে বলেন, অভিনয়ের পূর্ব্বে এই পুতুলনাচের উদ্ভব হয়েছে কিন্তু সেটা ঠিক বলে মনে হয় না। অভিনয়ের পরে, না হয় অভিনয়ের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুতুলনাচ প্রসার লাভ করেছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'দ্বীপময় ভারত' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন— পুতুলনাচের সঙ্গে মানুষের অভিনীত নাটকের যে একটা যোগ ছিল তা' সংস্কৃত নাটকের 'সূত্রধর' শব্দই যেন ইঙ্গিত করছে। ছায়ানাটক শব্দটি সংস্কৃতে আছে, আর সম্ভবতঃ এর দ্বারা পুতুল বা ছবির ছায়ার সাহায্যে অভিনয় সূচিত হয়।" তবে ভারতবর্ষে এই জিনিষটা ততটা লোকপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি বলে তিনি অভিমত দিয়েছেন।

ভারতবর্ষে যে সকল পুতুলনাচ হত, তার মধ্যে ভগবান, দৈত্য দানব, রাক্ষস খোক্কস প্রভৃতি বীভৎস আকারের পুতুলই ছিল বেশী—তার দেবতা ও দৈত্যদের যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনেই প্রায় পুতুল অভিনয়ের আয়োজন প্রস্তুত হত। বেশীর ভাগ পুতুলদেরই হাত মুখ নাড়ার ক্ষমতা থাকত না—অর্থাৎ, সে মূর্ত্তি ছিল একেবারে একটি মূর্ত্তি কেটে বার করা। তাদের চালনা করবার জন্য বা মাথা নেড়ে অভিমত জ্ঞাপন করবার জন্য, শরীরের সঙ্গে হাতের বা মাথার বিশেষ রকমের সংযোগের বিধান থাকত না। প্রয়োজন হলে মূর্ত্তিটিকে সর্ব্বসমেত ঘুরাতে ফিরাতে হত—প্রবৃত্তির বিভিন্ন নড়ন-

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এখনও ভারতের, বিশেষ করে বাঙ্গালার, অনেক গ্রামে রথ ও চৈত্রের মেলায় বা অন্য কোন উৎসবে, যাত্রা, কবি ও পাঁচালীর মত, রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান নিয়ে রকাসুর বধ, রাম রাবণের যুদ্ধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি পালা অবলম্বনে

পুতুলনাচ (চীন)—বাঁশ, কাগজ ও পিটুলী দ্বারা তৈয়ারী এবং বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত।
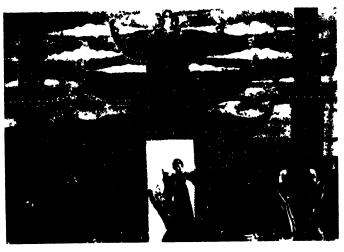
চড়নমূলক অভিব্যক্তি দেখান ঐ সব পুতুলদের দ্বারা মোটেই সম্ভব ছিল না। অন্য কতকগুলি ছিল, যেগুলি প্রয়োজনমত হাত পা তুলতে, নামাতে বা মাথা সঞ্চালন করে খানিকটা সচল ভাব প্রকাশ করতে পারত।

পুতুলনাচ (জাপান) — আলোক ও দৃশ্যবৈচিত্র্য দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে যে সব পুতুলনাচের কথা শোনা যায়, তা প্রায়ই বিকৃত আকারের ও বীভৎস ধরণের ছিল বটে; কিন্তু বর্ত্তমানে তার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। বাঙ্গালার পালার পালাংশ প্রায় সবই ধর্ম্ম-আখ্যান নিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদ যাত্রা-থিয়েটারের মতই ব্যবহার হয়ে থাকে—তাও আবার বহু ক্ষেত্রেই অর্থাভাবে জীর্ণ। তবে অনেক পুতুলই এখন হাত পা মাথা, এমন কি, চোয়াল পর্য্যন্ত নাড়তে পারে। রাক্ষসের ভূমিকায় রাক্ষসকে দিয়ে যদি কোন সহ-অভিনেতাকে কামড়াবার প্রয়োজন হয়, তা' হলে এখনকার পুতুল নাচিয়েরা কৌশলে দড়ি টেনে পুতুলকে দিয়ে বৃহৎ মুখব্যাদান করাতে পারে। সখীদের নাচে পুতুলদের কোমর দোলা-তেও দেখা যায়।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে পুতুলনাচের জন্য একটা লম্বা চালা (দাঁড়ঘরা) বাধা হয় এবং সেই চালার সম্মুখে, অর্থাৎ যে দিক থেকে লোক দেখবে সেই দিকে, দাঁড়ান মানুষের মাথার ওপর হাত খানেক পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়, ভিতরে যারা দাঁড়িয়ে পুতুলগুলিকে নাচাবে, সেই লোকগুলিকে পাছে দেখা যায়, এই জন্য। তারপর পুতুলনাচের দলের লোকেরা ভিতর থেকে সরু লাঠি বা মোটা বাখারী পুতুলগুলির কাঠের ফ্রেমের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, নিজেদের কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেগুলিকে দাঁড় করায়—তবেই বাইরের দর্শকরা সেগুলিকে দেখতে পায়। ঘরের ভিতর থেকে দলের লোকেরা যে যে দৃশ্যে যে পুতুলের প্রয়োজন, সেই ভাবে চার পাঁচজন কোমরে পুতুল বেঁধে ওঠে ও বিভিন্ন পালার অনুসরণে বক্তৃতা করে এবং অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, তলা থেকে দড়ি টেনে পুতুলের হাত ও মুখ নাড়াতে থাকে। এই সব পুতুলনাচের দৃশ্যপট, (scenography) পুতুলনাচের সাধারণ দলপতিরাই প্রস্তুত করে থাকে। আর অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ঢোল, কাঁসি ও বাঁশীর সহযোগে নানাপ্রকার সঙ্গীত চলতে

ইটালীর স্কালাতে ডক্টর ভিট্টোরিয়ো পোদ্রেকা তাঁহার পুতুল-অভিনয়ের ভূমিকায় নিজে নামিয়া ফরাসী, জার্ম্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় এবং নরওয়েজীয় ভাষায় অভিনয়ের বিষয়বস্তু বুঝাইয়া দেন।

দেখা যায়। এই কাঠের পুতুল ছাড়াও আমাদের দেশে বর্ত্তমানে দু'চার স্থানে এক প্রকার তারের পুতুলের প্রচলন দেখা যায়। এগুলি কাঠের পুতুল অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট এবং ইউরোপীয় প্রণালীতে উপর দিক্ থেকে তারের সাহায্যে নাচান হয়ে থাকে। এগুলির গঠন-প্রণালী ও অভিনয়-কৌশলের মধ্যে বৈদেশিক প্রভাবই বেশী।

ভিয়েনার রিচার্ড ষ্টেশনারের পুতুল-ফিল্মের অভিনয়-দৃশ্য।

এই পুতুলনাচ ক্রমশঃ প্রাচীন ভারত থেকে—চীন, জাপান, যবদ্বীপ, শ্যাম, মিশর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী দেশ হতে ক্রমে ক্রমে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। চীন দেশের প্রাচীন পুতুলনাচ এখনও লুপ্ত না হয়ে, ব্যাপকভাবে নগরের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রাগারে অভিনীত হয়ে থাকে। দর্শকদের সংখ্যাও বড় কম হয় না। বায়স্কোপ, থিয়েটার দেখে দেখে লোকেরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এই পুতুলনাচ তখন তাদের তৃপ্তি দেয়। সত্য সত্যই চীন দেশের এই পুতুলগুলি মধ্যে এমন কতকগুলি অদ্ভুত জীবন্ত ভাব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে যে, শিল্পীর অপূর্ব্ব কৌশলে জড়ের মধ্যে এই প্রাণপ্রতিষ্ঠা দেখে, লোকে আশ্চর্য্য না হয়ে পারে না। American Museum of Natural Historyতে পুরাতন চীনের পুতুলনাচের বহু যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন রকমের পুতুল সযত্নে রক্ষিত আছে।

১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্যাম দেশে পুতুলনাচের খুব প্রভাব ছিল. এখন তা কমে এসেছে। শ্যাম দেশের সে সময়কার নৃপতি নিজেই ছিলেন পুতুল-অভিনয়ের একজন উদ্যোগী। ব্রহ্মদেশে পুতুলনাচ পূর্ব্বের চাইতে এখন বেড়ে গিয়েছে এবং স্থানবিশেষে পুতুলনাচ দেখতে দুই তিন হাজার লোককে সমবেত হতে দেখা যায়। ওখানে কাঠের গায়ে গালা ও রং দিয়ে পুতুলগুলি তৈরী হয়ে থাকে। সাজ-পোষাকের জাঁক-জমকের বহরও কম নয়। শোনা যায়, ব্রহ্মের পুতুল-নাচিয়েরা পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে তাদের পুতুলনাচের দল নিয়ে ইউরোপের বহু রঙ্গমঞ্চে পুতুলনাচ দেখিয়ে বহু পয়সা রোজগার করত। তুরস্কে পুতুলনাচের পালা একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছে। পুতুলনাচ এখন তাদের তত তৃপ্তি দেয় না।

পুতুলনাচ (জার্ম্মানী)—আলেক্স ষ্ট্রাসেরের একটি অভিনয়-দৃশ্য

পুরাকালে ওখানে পুতুলদের ছায়া-অভিনয় দেখান হত খুব ব্যাপক ভাবে, আর ওদের দেশের ছবির মধ্যে থাকত যুদ্ধ-

বিগ্রহের পালাই বেশী। (Karagheuz-Turkish Shadow Figure. p. 82)

'টেম্পেষ্ট'-অভিনয়ে পুতুলরাজা এলোন শো।

খৃঃ হাজার অব্দের শেষের দিকে বালী ও যবদ্বীপে পুতুলনাচের ভিতর দিয়ে পালার অভিনয় হত এবং আজও তা' চলে আসছে। যবদ্বীপের পুতুলনাচকে কেবল পুতুলনাচ বললে ভুল করা হবে, কারণ, অন্যান্য দেশের মত ওখানে কেবল পুতুলনাচ হয় না—বৃহৎ মণ্ডপ বেঁধে পুতুলদের ছায়া পরদার উপর ফেলে ছায়া-অভিনয় হযে থাকে; এটা যবদ্বীপের অতি-পুরাতন একটি বৈশিষ্ট্য। যবদ্বীপের এই ছায়া-ছবির কথা বলতে গিয়ে মিঃ অ্যালফ্রেড ম্যানিল্ড তাঁর পুস্তকের এক পাতায় যবদ্বীপকেই motion picture ছায়াচিত্রের জন্মস্থান বলে স্বীকার করে গেছেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয় তাঁর 'দ্বীপ-ভারতে নাট্যকলা' নামক প্রবন্ধে বালী ও যবদ্বীপের পুতুলনাচ সম্বন্ধে লিখেছেন, "বালী ও যবদ্বীপের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে এক জায়গায় দেখি, মঞ্চের উপর শৈব ও বৌদ্ধ পুরোহিত মন্ত্র পাঠাদি করছেন এবং মঞ্চের নীচে একদল মানুষ বসে পুতুলনাচ দেখিয়ে যাচ্ছে।" ও দেশের এই পুতুলের ছায়া-ছবির নাম 'ওআইয়াং কুলিৎ' (৩৫৪ পৃঃ) এবং যবদ্বীপের পল্লী-সাহিত্য অবলম্বনে বা রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে যে ছায়া-নাটক হয়, তার নাম 'ওআইয়াং পুর্ব্ব'।

রহস্যময় তিব্বতেও বৌদ্ধ প্রভাবের সময় থেকে লামাদের মধ্যে নানা প্রকার কিম্ভূতকিমাকার, অদ্ভুত ধরণের কাঠের মুখোসের প্রভাব ও পুতুলনাচের প্রসার চলে আসছে। এখানে পুতুলগুলি তৈরী হয় সাধারণতঃ পুরাতন ছেঁড়া ন্যাকড়া ও এক প্রকার গাছের দড়ির সাহায্যে এবং ঐ সব ছেঁড়া ন্যাকড়াকে নানা ভাবে রং করে, জড়িয়ে জড়িয়ে তারা রোগা, মোটা, বেঁটে, লম্বা, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি অভিনেতা তৈরী করে। তবে ঐ পুতুলটি সরলভাবে যাতে দাঁড়াতে পারে বা অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে, তার জন্যে ঐ ন্যাকড়ার মধ্যে প্রথমে তারা একটা বেতের বা কাঠের ফ্রেম তৈরী করে নেয় এবং তার সঙ্গে হাত-পা-মুখ নাড়াবার জন্যে, শরীরের ভেতর দিয়ে দড়ি ঝুলিয়ে রাখে। ইউরোপ ও জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে পুতুলদের অঙ্গসঞ্চালনের জন্যে দড়িগুলি যেমন বাইরের দিক দিয়ে বেরিয়ে থাকে, এখানে সে রকম না হয়ে আমাদের বাঙ্গালা দেশের মত সব দড়িগুলিই ফ্রেমের ভেতর দিয়ে টেনে আনা হয়। তিব্বতের লাসা সহরে পুতুলনাচের জন্যে বৌদ্ধদের এখনও দুএকটি স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ আছে। আগেকার দিনে তিব্বতের উপর চীনের প্রভাব যখন খুব বেশী ছিল, সেই সময় চীন থেকেই এই পুতুলনাচ বোধহয় তিব্বতে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

ইতালীর পুতুলনাচিয়ে পোদ্রেকা—দুই পার্শ্বে দুইটি পুতুল।

জাপানে পুতুলনাচের উন্নতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেখানকার আধুনিক পুতুলগুলি কাগজ (papercut) থেকে

তৈরী হয়ে থাকে এবং সেগুলি এত নিখুঁত হয় যে, অনেক সময় উপযুক্ত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলে,
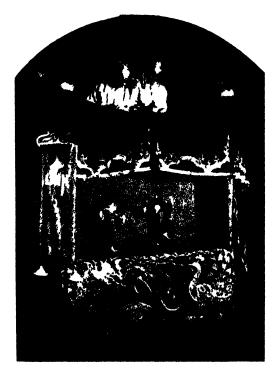
পুতুলনাচ (প্যারি)। যোজেফ হাইড্‌নের 'অ্যাপথিকারি' নাটিকার একটি প্রণয়-দৃশ্য—ভলপিনো গৃলেটাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে, অন্তরালে সঙ্গীত চলিতেছে।

কোন আগন্তুকের সেগুলিকে জীবন্ত মানুষ বলে ভ্রম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। যে সব কাগজ আবর্জনার সঙ্গে মাটি হয়ে যায়, জাপানীরা সেইগুলিকে সংগ্রহ করে পচিয়ে, সেই পচা কাগজকে জমিয়ে পুতুল তৈরী করে এবং সেইগুলির উপর নানাভাবে রং ফলিয়ে সুদৃশ্য করে থাকে। সম্প্রতি জাপানের এই পুতুলনাচ কেবল মঞ্চের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, জাপানীরা তাদের এই পুতুলগুলির নানা প্রকার পালা তৈরী করে নাচগান, বাজনার সহযোগে নানা প্রকার চলচ্চিত্র তৈরী করছে এবং সেগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু সিনেমা-হাউসে লোকে আগ্রহের সঙ্গে দেখছে। অনেক সময় বায়স্কোপে 'মিকি মাউসে'র ছবির চাইতে Japanese animation in paper marionettes লোককে তৃপ্তি দেয় বেশী। সুলেখক Alen Potemkin একস্থানে লিখেছেন—স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে এই ভাবে আর্টিষ্ট জাপানী কাগজের পুতুল তৈয়ারী করেন এবং সেগুলি বড়ই নয়নাভিরাম হয় (the artist works for a pattern of contrasted paper designs of Japanese puppet which are very pleasurable to the eye.) প্রথর শিল্প চাতুর্য্য ও ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন জাপান, বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও রূপ কলার সাহায্য নিয়ে, আলোছায়ার (shade light এর) দ্বারা নতুন রূপের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়ে—পুতুলগুলির চেহারায় ও অঙ্গাংশের মধ্যে এমন কতকগুলি জাতীয় অভিনবত্ব স্বভাব বেঁধে দিয়েছে যে, দেখে জগতের সকল জাতি ও সকল বয়েসের লোকই আনন্দিত না হয়ে পারবে না।

ষ্টারেভিচের Voice of the Nightingale নামক পুতুল ফিল্মের একটি দৃশ্য।

গ্রীকদের মধ্যেও অনেক দিন আগে থেকে এই পুতুলনাচ চলে আসছিল। তারপর কালক্রমে মধ্যযুগে এসে একদিন

এই শিল্প তাদের কাছ থেকে লোপ পেয়ে ইতালীতে এসে প্রবর্ত্তিত হয় '—most certainly traditions descen-

পুতুল ডাকাত।

ding from the ancient Greeks, who introduced these delightful figures into Italy and from other countries have found amusement in this art'. (The Roman Marionettes —L. Rendell)। পুরাতন গ্রীকদের এই পুতুলনাচের জন্ম-তারিখ ও শৈশবের ইতিবৃত্ত কালের কোন্ অতল তলে তলিয়ে গেছে, তা' আজ আর খুঁজে বার করা যায় না। তবে ১৭২১ খৃষ্টাব্দে লিখিত La Sage এর পাতা থেকে টের পাওয়া যায় যে, ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে Pepys না কি নানা প্রকার folk-tales ও legends অবলম্বনে কয়েকটি পুতুল তৈরী করে, ইতালীর জনসাধারণকে পুতুলনাচ দেখিয়েছিলেন এবং তার আরও কিছুদিন পরে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে Pepys-ই লণ্ডনে এসে চেয়ারিংক্রশ-এর (Charing Cross এর) নিকট সাউথ ওয়ার্ক ফেয়ারে (South-work Fair) ডিক হুইটিংটন (Dick Whittington) নামে পুতুলদের প্রথম অভিনয় দেখান। তারপর ১৮৯৯ সালে এসে এই শিল্প ইতালীর রোমান থিয়েটারের অংশীভূত হয় এবং ওখানকার আর্ট-ডিরেক্টর ডাঃ ভিত্তোরিও পোদ্রেক্কার (Dr. Vittorio Podrecca) সহযোগিতায় ১৯১৩ সালে লণ্ডনের নিউ স্কেল থিয়েটারে (New Scale Theatre) তাঁরা দল বেঁধে পুতুল-অভিনয় করতে আসেন এবং যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত তিয়েত্রো দী পিকোলি (teatro die piccoli—theatre of the little people) নাম কেবল মাত্র ইতালীর নয়; সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত সারা ইউরোপের একটি গৌরবের বস্তু।

ইতালীতে এই সব পুতুলদের সাজাবার জন্যে বা তাদের সাজ-পোষাকের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ঠিক করা আছে, সেই সব বিভাগের লোকেরা অভিনয়ের রূপসজ্জা অনুযায়ী পুতুলদের সাজিয়ে দিয়ে থাকে। অভিনয় করার সময় এক একটি পুতুলের জন্য এক একটি লোকের প্রয়োজন হয়, তবে কোন কোন দক্ষ নাচিয়ে একটির অধিক পুতুলকেও নাচাতে পারেন। অধুনা ইতালীতে যে সব উন্নত ধরণের পুতুল প্রস্তুত হয়েছে, তাদের সাজ-পোষাক ও অঙ্গভঙ্গী একেবারে

ষ্ট্রাভিন্স্কির Voice of the Nightingale পুতুলনাচের অপর দৃশ্য।
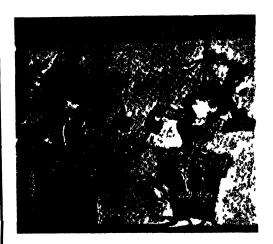
বিখ্যাত আমেরিকান পুতুল-নাচিয়ে ম্যান্টিওস্ এবং তাঁহার পুতুলনাচের কারখানা।

কাঠের তৈয়ারী পুতুলনাচের পুতুল (ব্রহ্মদেশ)। পোষাক ইত্যাদি রেশমের। উচ্চতা ১ হাত।

মৃত্যুমুখে (ইতালীয় পুতুলনাচ)।

পুতুলনাচ (তিব্বত)।

পুতুল চাষী (ইতালী)।

ত্রুটিহীন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সেখানে পুতুলগুলির মধ্যে জীবন্ত ভাব যতটা রাখা সম্ভব বা তাদের নড়াচড়ায় জীবন্ত

মার্কিন পুতুল নাচিয়ে ম্যাটিওস্ তাঁহার পুত্রকন্যা স্বরূপ পুতুল সমভিব্যাহারে
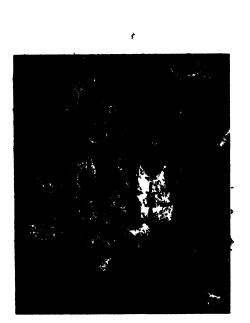
ভাব, যাকে বলা চলে action এবং verisimilitude, তাই যাতে নষ্ট না হয়, তার জন্য কর্ম্মকর্ত্তারা সর্ব্বদাই সতর্ক। পুতুলনাচ শেখাবার জন্যে ওখানে দু'তিনটি স্কুল খোলা হয়েছে, কারণ পুতুলদের গতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষিত শিল্পী ছাড়া অভিনয়ের ক্রমাভিব্যক্তি (continuity) নষ্ট হওয়ার পদে পদে সম্ভাবনা আছে। পুতুলনাচের সঙ্গে এখানেও বহু পূর্ব্ব কাল হতে বহু প্রকারের যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা চলে আসছে। ইংলণ্ডে সেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' ও 'রোমিও-জুলিয়েটে'র পুতুল-অভিনয় দেখিয়ে এঁরা ঐ দেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন ও প্রতিপত্তি স্থাপন করেন। আজও তাঁদের নাম কোন অংশে ম্লান হয় নি—নিপুণ প্রয়োগ-শিল্পী পোদ্রেকার অটুট অভিজ্ঞতা আজও তাঁর যশ সমান ভাবে খাড়া করে রেখেছে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ভাইকিং এগ্‌লিং-এর (Viking Eggeling-এর) কঠোর পরিশ্রমের ফলে, আজ সহরের বুকে তিনটি পুতুল-থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সেগুলি দিন দিন জনসাধারণকে অপূর্ব্ব তৃপ্তি দিয়ে আসছে। অন্যান্য দেশের পুতুল থিয়েটারগুলিতে যেমন বেশীর ভাগ শিশুদেরই যাতায়াত করতে দেখা যায়, এখানে ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ এখানে দেখতে পাবেন, পাকাচুলওয়ালা বুড়ো-বুড়ীদেরই যাতায়াত এই প্রেক্ষাগৃহে বেশী। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসীরা অনেক সময় সিনেমা ও অপেরায় না গিয়ে, পুতুলনাচ দেখতে গিয়ে থাকে। সেখানকার সুসজ্জিত উন্নত প্রণালীর প্যাভেলিয়নের আলোকমালা যখন ধীরে ধীরে কমে গিয়ে ঘরটি সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়—আর তার সঙ্গে সঙ্গে সজ্জিত পুতুল-মঞ্চটি চারি পাশ হতে নানান রঙের আলোয় রঙিন হয়ে ওঠে, তখন সকলেই অবাক্ হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এদিক ওদিক (stage wings-এর পাশ থেকে) পূর্ণ সজীবতা নিয়ে পুতুলগুলি মঞ্চের উপর বেরিয়ে এসে অভিনয় করতে থাকে। প্রয়োগ-শিল্পীদের চাতুর্য্যে কোথাও অভিনয়ের এতটুকুও অসঙ্গতি ধরা পড়ে না, আর সেই অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বক্তৃতা ও গান-বাজনা সমান ভাবে চলতে থাকে। এখানকার পুতুল থিয়েটারে ঐতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনামূলক নাটকের চাইতে হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিই
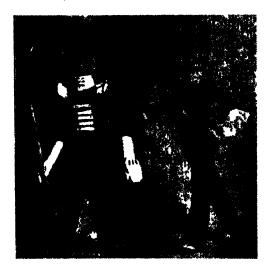
পুতুল সার্জ্জেণ্ট ও নূতন সৈনিক—উইলিয়ম সিমণ্ডস্ কৃত।

বহুক্ষেত্রে জমে ওঠে বেশী। চেকোস্লোভেকিয়ায় এবং প্রাগ্ সহরে পুতুল-থিয়েটারের মধ্যে স্বাস্থ্যনীতি, ব্যায়াম ও নানা প্রকার কলা-কৌশলের আধিক্য দেখতে

পাওয়া যায়। এখানে প্রয়োগ-শিল্পীদের মধ্যে লোকমুখে ফোল্‌ক্‌ম্যান্ (Volkman) ও ফয়তা সুখাদার (Vojta Suchardas) নাম খুব বিখ্যাত। এখানকার স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পুতুলনাচের ভিতর দিয়ে স্বাস্থ্যনীতি প্রচারের জন্য কয়েকটি

অন্ধ বালক পুতুল—উইলিয়ম সিমণ্ডস্ কৃত।

প্রতিষ্ঠানকে বেশ কিছু সাহায্য করে থাকেন। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের গবর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি পুতুল-থিয়েটারে বিনা দর্শনীতেই প্রবেশাধিকার আছে। প্রাগের বিখ্যাত 'সকোল' (Sokol) মুভমেণ্ট এর পুতুলছবি ফিল্মের এক বিশেষ সম্পদ্।

ভিয়েনা ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীর মধ্যে এই পুতুলনাচের প্রসা কম নয়। জার্ম্মানীর বিখ্যাত মনীষী রিচার্ড টেশনা ভিয়েনায় এই পুতুলনাচের নবযুগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা আশ্চর্য্য প্রয়োগ কৌশল, সাজ-পোষাকের পারিপাট্য পুতুল-সঞ্চালনের সুব্যবস্থা সব দেশের পুতুলনাচকেই যেন ছাপিয়ে গেছে। 'ওবারএমার গাউ' বিখ্যাত 'প্যাসন প্লে'কে তিনি পুতুলদের দ্বারা অভিনয় করান; তা ছাড়া বৌ উপাখ্যান থেকেও তাঁর কয়েকটি নাটক অভিনীত হতে দে গেছে। টেশনার নিজে একজন খুব ধার্ম্মিক লোক, কাজে ধর্ম্ম মূলক অভিনয়ের উপর তাঁর আগ্রহ বেশী।

জার্ম্মানী ও ফরাসী দেশের পুতুলগুলি বর্ত্তমানে মা কাঠ ও ন্যাকড়া ছেড়ে সম্পূর্ণ কাগজের উপর এসে নির্ভর করে দাঁড়িয়েছে। এঁরা বলেন, কাগজের পুতুলগুলির সুবিধা অনেক; প্রথমতঃ এগুলি হয় খুব হাল্‌কা, কাজেই চলানো ফেরানো (manipulate) করার কোন অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়তঃ রং ফলান ও আলো ব্যবহারের কৌশল অতি সুন্দর ভাবে এই কাগজের পুতুলগুলির মধ্যে দেখান যায়। জার্ম্মানীতে বেশী করে মেয়েরাই এই শিল্পটিতে হাত দিয়েছেন। দু'তিনটি পুতুল-থিয়েটার কেবল মাত্র মেয়েদের তত্ত্বাবধানেই চলে, আর সেখানকার দর্শকও সব মেয়েরা। ললি রিনি গার-এর (Lollie Reininger) নাম স্ত্রী পুতুল প্রয়োগ শিল্পীদের মধ্যে বিখ্যাত। তা ছাড়া আলেক্স স্ত্রাসেরের Alex Strasser নামও আজ জগদ্বিখ্যাত হয়ে পড়েছে।

অফুরন্ত আনন্দ-উৎসবের জন্যে যে প্যারিসের চোখে ঘুম নেই, যে প্যারিস মানুষের ব্যথা-বেদনা ভুলিয়ে, শতদিক শতভাবে মানুষের মনকে গতিহারা ও চোখকে রঙিন ক'রে দেবার চেষ্টা করে, ক্যাবারে, প্যাতিসারি, ফলি বার্জে, মুল্যাঁরুজ, ক্যাজিনো—বিশ্ববিখ্যাত নটী জোসেফাইন বেকারের নৃত্য-গীত প্রভৃতি রিভিউ, সিনেমা ও অনুষ্ঠানের মধ্যেও সেই প্যারিসের বিলাসিনী মেয়েদের সপ্তাহের মধ্যে একদিন এই পুতুলনাচ বা তার ফিল্ম না দেখলে মন খারাপ হয়ে থাকে। প্যারিসের puppet film ও পুতুল মঞ্চাভিনয়ে লাডিসলাস ষ্টারেভি ফিল্ম (Ladislas S...

witch) যে কীর্ত্তি দেখিয়েছেন, তা অপূর্ব্ব! তাঁর সেই পুতুলনাচ বা পুতুলনাচের ফিল্ম না দেখলে ক্ষোভ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ষ্টারেভিচ-এর (Starewitch) অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলে আজ প্যারিসের বুকে দলে দলে আমেরিকান টুরিষ্টরা এসে আগে ষ্টারেভিচ-এর পুতুলনাচের খোঁজ নেয় ও দেখতে যায়। এ যেন সেই লণ্ডনে মাদাম্ টুসোর রহস্যময় ওয়াক্স-এগজিবিশন-এর (wax exhibition) মত, না দেখলে শিল্পের একটা মস্ত দিক্ বাদ থেকে যায়। ১৯২৯ সালে পুতুলনাচের ফিল্ম তৈরী করে তিনি রিজেন-ফিল্ড শর্ট-ফিল্ম-মেডেল (Risenfied short film medal) পান, ভয়েস অব্ দি নাইটিংগেল (Voice of the Nightingale) তাঁর একটি বিখ্যাত পুতুল-ফিল্ম।

এই সব দেশ ছাড়াও আমেরিকা, আফ্রিকা, রুশিয়া, স্পেন, মেক্সিকো, হনলুলু প্রভৃতি দেশে এক এক জন শিল্পী নিজেদের জাতীয় শিল্পকে গড়ে তুল্‌বার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। আর আমরা, যারা একদিন শিল্প-বাণিজ্যে, দর্শন-বিজ্ঞানে সব জাতের সেরা ছিলাম, জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি হাতে করে, যারা একদিন সগর্ব্বে পৃথিবীর বুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলাম; আজ সেই আমরা সব হারাতে বসেছি। অতীতের গৌরব, অতীতের শিল্পকলাকে আজ আমরা ঠিক তেমন করে যেন চাই না, পুরাতন যা কিছু তা' আজ আর আমাদের মনের সঙ্গে খাপ খায় না। স্নিগ্ধ শ্যামল বাঙ্গালা দেশের বুকে সব রূপ-রস-গন্ধ আজ লুকিয়ে গেছে। পল্লীর সেই পুরাতন বটের ছায়ার তলে, গ্রামবাসীর যাত্রা, পাঁচালী, কবি, তরজা, আনন্দ-উৎসব আজ আর এই সভ্যতার যুগে আমোদ-প্রমোদের মধ্যে স্থান পায় না। এই যে সর্ব্বতোভাবে নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে ত্যাগ করে, নিজেদের অতীত গৌরব ও শিল্পকলার নাম বর্জ্জন করে অন্ধভাবে অপরকে অনুকরণ করার বৃত্তি দিনের পর দিন আমাদের বেড়ে চলেছে, তাতে করে আগামী শতাব্দীর মধ্যে ভারতের ভাবী জাতির নিজস্ব গতি যে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন হয়ে পড়বে, সেই আশঙ্কা কার না মনে জাগে!*

অন্ধ বালক পুতুল সিমণ্ড্স্ কৃত।

* প্রবন্ধ লিখতে নিম্নলিখিত বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে—(১) Book of Marionettes by Helen H. Joseph, (২) Dryad and Fauns in Puppet Pantomime in Wnodland by William Simmond. (৩) Das Buch das Marionettes by H. Siegfried. (৪) The Heroes of the Puppet Stage by M. Anderson. (৫) Marionettes Theatre of Munich Artist by Paul Brams.

সোনার চাকরি

—শ্রীমনোজ বসু

চতুরানন চক্রবর্ত্তী চাকরিস্থলে রওনা হয়েছেন। ডান হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, বাঁ হাতে ন্যাকড়ায় বাঁধা তিন কুড়ি ডিম। বুড়ো কর্ত্তা গত হয়েছেন, ছোকরা বাবুদের দিনকাল—কাজেই এখন কিছু কাল এই রকম ভেট নিয়ে যাওয়ার দরকার আছে।

গ্রাম-সীমায় দহকুলোর খাল। সাঁকোর সামনে মনোহর গাঙ্গুলীর বাড়ী। মনোহর দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন, হুঁকো হাতে রাস্তা অবধি নেমে এলেন।

—এস, এস ভায়া,—সাজা তামাক আর পিছনের ডাক, কোনটা অগ্রাহ্য করে যেতে নেই। আপ্যায়ন করে হাত ধরে গাঙ্গুলী তাঁকে দাওয়ায় তক্তাপোষের উপর এনে বসালেন। গাড়ী সেই আটটা সাতাশে—তাড়াতাড়ি নেই; কেবল বারবেলার ভয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে আসা। দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত চতুরানন হুঁকোয় অবিরাম বেগে গোটা আষ্টেক টান দিলেন। তার পর মুখের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—তামাক মিঠে কই সে রকম?

হুঁকো রেখে হাত মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—হয়েছে কি, মুখ গেছে খারাপ হয়ে। বাবুর বাড়ী তামাক চলে, ভরি তার পাঁচসিকে। আধক্রোশ জুড়ে গন্ধ ছাড়ে।

চক্ষু কপালে তুলে মনোহর বললেন-বল কি?

ফুটফুটে একটি মেয়ে গল্প শুনতে এসে দাঁড়িয়েছে। মনোহর বললেন—ও টুনি, শ্বশুরের পা ধোয়ার জল এনে দিলি নে? কি রকম নিন্দে করবে, দেখিস।

ধ্যেৎ—বলে টুনি বিদ্যুতের বেগে পালিয়ে গেল।

মনোহর দুঃখিত স্বরে বললেন—বললাম ভায়া, কালীপুজোটা কাটিয়ে যাও। বছর অন্তর একবার ঢাকের বাড়ি পড়ে—তুমি থেকে গেলে কত আমোদ হত বল দিকি?

চতুরানন বললেন—সর্ব্বনাশ, তার জো আছে! বাবুর বাড়ীতেও যে পুজো—দু' রাত্তির থিয়েটার—দেড় হাজার মানুষ খাবে। কিন্তু লোহার সিন্দুকের চাবি রয়েছে এই শর্ম্মারামের কোমরে।

মনোহর বললেন—বল কি, সমস্ত টাকা তোমা[র] হেপাজতে?

অসহায়ের মত মুখ করে চতুরানন বললেন—ম[রে] গেলাম ভাই, টাকা গুণতে গুণতে। আসবার দিন [ছোট] বাবুর ঘরে চাবি দিতে গেলাম। তিনি ত রেগে আগু[ন]। বলেন, অত ঝঞ্ঝাট পোহাব ত আপনারা আছেন কেন? জমাখরচ নিয়ে গেলে কাগজ ছিঁড়ে ফেলেন। বলে[ন], সিন্দুকে যা আছে, তাই জমা; যা খরচ হয়েছে তা[ই] খরচ। অত কাগজ দেখবার ফুরসৎ নেই।

নিশ্বাস ফেলে মনোহর বললেন—সোনার চা[করি] তোমার ভায়া। বলতে গিয়ে ছাঁৎ করে একটা পুরা[নো] কথা মনে পড়ে যায়। দু'বছর আগে চতুরানন য[খন] চাকরির খোঁজে বেরুচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর কাছে দশ[টা] টাকা হাওলাত চেয়ে বসেন। মনোহর না বলবার লো[ক] নন; বলেছিলেন—দেব। পুরো দেড়টি মাস সক[াল] বিকাল অজস্র তাগাদা সত্ত্বেও টাকাটা দেওয়া হয় [নি]। কিন্তু দেওয়া উচিত ছিল - একশ বার উচিত ছিল।

চুড়ি ঝিনমিন করে উঠল। চতুরানন মুখ [তুলে] দেখলেন, টুনি ঘরের ভিতর কবাট ধরে দাড়িয়ে আছে। হাসিমুখে ডাক দিলেন—তুমি এস মা, আমি তোমা[র] শ্বশুর হতে যাচ্ছি না—কক্ষনো না। কেবল তুমি আ[মার] মা হবে। রাজি ত?

শুধু ডাকের অপেক্ষা। টুনি ছুটে এসে তাঁর গা [ঘেঁষে] দাঁড়াল।

মনোহর তৃপ্তিভরা চোখে মেয়ের দিকে এক[বার] চাইলেন। বললেন—তোমাকে যে কি ভাল[বাসে] ভায়া,—এই তুমি চলে যাচ্ছ, তোমার গল্প কত করবে।

চতুরানন টুনির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—আমা[র] মা-জননী কি না—সাক্ষাৎ মহামায়া। একটা মু[স্কিল], লালুর সঙ্গে মোটে বনে না। তা সে যেমন ধারা ছেলে— বলতে বলতে সস্নেহে তার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে[ন]—

হ্যাঁ মা, লালুটাকে তা হলে আগে তাড়িয়ে দিই, তার পর তুমি আমার বাড়ী গিয়ে থাকবে। কেমন?

টুনি ঘাড় নেড়ে সাগ্রহে অনুমোদন জানাল।

মনোহর বলতে লাগলেন—ঈস, আস্পর্দ্ধা কত! কার্ত্তিকের মত ছেলে—তাকে তাড়িয়ে অমন ঐ এক ঝগড়াটেকে লোকে ঘরে নিয়ে যাবে!

টুনি সংক্ষেপে মন্তব্য করল—লোহার কার্ত্তিক।

মিঠে না হলেও পরপর আরও তিন-চার ছিলিম তামাক পুড়ল। তার পর বেলার দিকে চেয়ে চতুরানন উঠে পড়লেন।

মনোহর খানিকটা দূর সঙ্গে সঙ্গে চললেন।—আবার কবে আসছ?

চতুরাননের মুখ বিমর্ষ হয়ে উঠল। বললেন—ইচ্ছে ত করে, কিন্তু মোটে ছুটি দিতে চায় না। দেখি, বশেখের দিকে চেষ্টা করে দেখব একবার।

সেই সময় যাতে শুভকর্ম্মটা হয়ে যায়—

চতুরানন শেষ করতে দিলেন না।—কি জান মনোহর, মানে লালুটা একটা পাশ না দেওয়া পর্য্যন্ত এ সবের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হয় না। হঠাৎ নীচু গলায় আরম্ভ করলেন—মেজ বাবু আমাদের মহাশয় ব্যক্তি। একদিন এর মধ্যে বললেন—খাজাঞ্চি বাবু, তোমার ছেলে পাশ দিয়ে আসুক, তাকে এষ্টেটের ম্যানেজার করে দেব—

ভাবী ম্যানেজারীর খবরে মনোহর অতিমাত্রায় উল্লসিত হলেন। বললেন—বেশ, বেশ—পাশ ত তা হলে করতেই হবে। তুমি বিদেশে থাক, আমি ত বাড়ী আছি, ভাবনা কি? সকাল বিকাল দুবেলা তদারক করব। সমস্ত ভার রইল আমার উপর। কিন্তু তায়া বশেখেই শুভকর্ম্ম সেরে ফেলতে হবে। পড়ুক—তার পর যত ইচ্ছে পড়ে যাক না! কি বল?

ঘাড় নেড়ে চতুরানন সাঁকোর উপর উঠলেন।

বেশী দিন নয়, দিন দশেক পরে লালমোহনের নামে চিঠি এল—পোষ্টকার্ডের চিঠি—

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবে। ৺ স্থানে তোমাদের মঙ্গল নিয়ত প্রার্থনা করিতেছি। অপর গত ২রা কার্ত্তিক তারিখে শেষ রাত্রে তোমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের ওলাউঠা হয়। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সজ্ঞানে ৺লাভ করিয়াছেন। যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্যাদি করিবে। পত্রদ্বারা সমাচার জ্ঞাপন ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীভাগ্যধর চৌধুরী
সদর নায়েব, বরাহনগর ষ্টেট।

সেদিন রবিবার, স্কুল নেই। দুপুরে খেয়ে দেয়ে লালমোহন ঘুড়ি-নাটাই নিয়ে রওনা হচ্ছিল, এমন সময় চিঠি এল। মা উঠানের উপর আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগলেন। মনোহর গাঙ্গুলী ছুটে এলেন। পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই ভেঙে এসে পড়ল। সকলেই হা-হুতাশ করছে, চোখ মুছছে। লালু কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই।

সন্ধ্যার সময় চারিদিক বড় মেঘলা হয়ে এসেছে। বাইরের লোক-জন তখন আর কেউ নেই। নূতন কাপড় ও নূতন উত্তরীয় পরে লালু মাটির উপর চুপ করে বসে আছে। টুনি পারতপক্ষে তার কাছে ঘেঁসে না; আজ কোন্ দিক দিয়ে হঠাৎ এসে ঝুপ করে তার সামনে বসল। ডাকল—লালু দা? লালুর চোখে অঝোর ধারা নামল, যেন বাঁধ ভেঙে বন্যা ছুটেছে। আর টুনি কত বড় গিন্নী হয়ে গিয়েছে—বার বার লালুর চোখের জল মুছিয়ে দেয়, ওদিকে নিজেই আবার কাঁদতে থাকে।

দিন দুই পরে মনোহর অনেক মুশাবিদা করে লালমোহনকে দিয়ে জমিদার-বাড়ী এক চিঠি পাঠালেন। যথাসময়ে চিঠির জবাব এল; সঙ্গে এল একশ টাকা ইনসিওর হয়ে। সদর নায়েব ভাগ্যধর চৌধুরীই জবাব দিয়েছেন—

রোকায় আশীর্ব্বাদ জানিবে। তোমার পত্রপাঠে তোমার পিতাঠাকুরের শ্রাদ্ধাদির জন্য মহামহিম শ্রীল শ্রীযুক্ত মেজবাবু মহাশয় একশত টাকা সাহায্য পাঠাইলেন। আর চাকরির বিষয়ে যাহা লিখিয়াছ, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত আদেশ করিয়াছেন—তুমি যখনই

অত্রে সদবে আসিয়া উপস্থিত হইবে, মেজবাবু তোমার পিতার কার্য্যে তোমাকে বহাল কবিবেন।··

শ্রাদ্ধের ব্যাপার চুকে গেল। চতুরানন বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি, ঐ একশ টাকায় কুলিয়ে উঠল না; মনোহর সব ব্যবস্থা করতে লাগলেন। বললেন—আমি বেঁচে থাকতে লালুর আবার দায়টা কি? চতুরাননের সঙ্গে আমার যে কেবল দেহটাই ছিল আলাদা। আহা—তার মনে কত যে সাধ-বাসনা ছিল!

মনোহর বারবার চোখ মুছতে লাগলেন।

লালুর মা মনোহরের সঙ্গে কথা বলেন না। দরজার আড়াল থেকে ছেলের উদ্দেশ্যে বললেন—খোকা, তোর কাকাবাবুকে দিয়ে তা হলে নায়েব মহাশয়কে আর একখানা চিঠি লিখে দে। বাড়ী বসে থাকলে চলবে না ত।

মনোহর রাগ করে উঠলেন।—ঠাকরুণের আক্কেল চমৎকার! দুধের ছেলেকে পাঠাবেন চাকরি করতে। ও সব হবে না বলে দিচ্ছি।—

লালুর মা বললেন- ও খোকা, বল্ যে তিনি একটা পয়সাও ত রেখে যেতে পারেন নি—

মনোহর বললেন—আমাকে ত রেখে গেছে। শোন, ঘলে রাখছি—লালুর পড়াশুনোর ভার সে আমাব উপর দিয়ে গেছে। একজামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত চাকরি বাকরি হবে না। একজামিনের পর গিয়ে চাকরি নেবে। পাশ করতে পারলে অত বড় এষ্টেটের ম্যানেজার! আহা-হা, কত সাধ বাসনা ছিল তার,—বলে রেখেছিল,এই বশেখেই আমার টুনিকে ঘরে নিয়ে আসবে। সে আর হল না। কালাশৌচ না কাটলে ত আর হচ্ছে না--কাটুক একটা বছর—

সেই ব্যবস্থাই হল। কেবল লালুর লেখাপড়া নয়, মনোহর বিপন্ন সংসারের সমস্ত ভার নিলেন। একবার দশটাকা হাওলাত না দিয়ে যে ভুল করেছিলেন, এতদিনে সুদসমেত তার সংশোধন হতে লাগল।

একজামিনের পর লালমোহন চাকরির প্রার্থনায় বরাহনগর সদরে গিয়ে হাজির হল। ভাগ্যধর চৌধুরী অত্যন্ত শীর্ণ বেঁটে মানুষটি—একখানা পুরাণো খবরের কাগজের উপর গুণে গুণে একশ আটবার দুর্গানাম লিখছিলেন। তারপর মাথা ঠেকিয়ে কাগজখানা একপাশে রেখে প্রশ্ন করলেন—বাপু, লেখাপড়া দু'এক কলম শিখেছ?

— আজ্ঞে—

—কতদূর শিখেছ? বিঘেকালি কষতে পার?

- আজ্ঞে হ্যাঁ।—

—আচ্ছা, পাঁচশ বাইশ টাকা সাত আনা পাঁচগণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি এক দন্তি জমা—তিনশ তেত্রিশ টাকা পাঁচ আনা এক ক্রান্তি খরচ—কৈফিয়ৎ কেটে তহ্‌বিল ঠিক করতে পার?

— পাবি বোধ হয়।

সদর নায়েব এক মুহূর্ত্ত অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন—পার, তবে এখানে মরতে এসেছে কেন? এরা গোঁয়ারেব গুষ্টি। কোন্ দিন এক চড় বসিয়ে দেবে—ঐ থুকথুকে ননীর মত শরীব, মাথা ঘুরে পড়ে অপঘাতে মরবে। আহা-হা খাসা লোক ছিল চক্রবর্ত্তী—এমন লোকেরও এই গতি হল। সরে এস বাপু, এই দিকে—কানে কানে কথাটা বলি। ওলাওঠা না হাতী—

ফিস্ ফিস্ করে ভাগ্যধর বলতে লাগলেন- মেজবাবুর বাবুর্চির অসুখ, তোমার বাবাকে তিনি মুর্গী রাঁধবার ফরমায়েস করেছিলেন। হাজার হোক বামুনের ছেলে—ম্লেচ্ছ কাজ পারবে কেন—ঝাল বেশী হয়ে গেছে। মেজবাবু—বুঝতেই পারছ—একটু বেসামাল ছিলেন; দিলেন চক্রবর্ত্তীর পেটে এক লাথি। বামুনের ছেলে সেই যে বাবা গো—বলে মাটিতে পড়ল, আর উঠল না।

হঠাৎ জুতার আওয়াজ হল। নায়েব সচকিতে তাকিয়ে দেখলেন, মেজবাবুই বারাণ্ডা পার হয়ে উপরে উঠছেন। অমনি গলা সপ্তমে তুলে ভাগ্যধর বলতে লাগলেন—মেজবাবুর দয়ার শরীর, এমন মনিব আর পাবে না। তোমার বাবার শ্রাদ্ধে রোক একশ টাকা সাহায্য করলেন। কে করে থাকে? বেশ ত'—কাল সকাল থেকেই বাপের চাকরিতে লেগে যাও। কাজ সামান্য,—মেজবাবুর তামাক সাজা, কাপড় কোঁচানো, গা-হাত-পা মাঝে মাঝে টিপে দেওয়া—চান করবার জল, এটা সেটা ফাইফরমাস··· তা পারবে তুমি, জোয়ান-যুবা ছেলে—কেন পারবে না? সকাল থেকেই তবে লেগে যাও—

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বাংলার ভক্তিধর্ম্ম

—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

১। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের ভক্তিধর্ম্ম

ঐতিহাসিকের নিকট বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব আকস্মিক ঘটনা নহে। শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব প্রেমোন্মাদ আস্বাদনের জন্য বাংলা দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছিল। দামোদরপুরের চতুর্থ লিপি হইতে জানা যায় যে, ৪৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দস্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভূমি দান করা হইয়াছিল (Ep. Indi. Vol. xv. p. 113. Vol. xvii, p. 193, 345) পাহাড়পুরের খননকালে যে যুগল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন (R. D. Banerjee, The Age of the Imperial Guptas, p. 121)।

বিক্রমপুরের শ্যামল বর্ম্মণের পুত্র ভোজ বর্ম্মণ বেলাবা তাম্রলিপিতে "গোপীশত-কেলিকারঃ" শ্রীকৃষ্ণের কথা লিখিয়াছেন। পালরাজগণের রাজ্যকালের অসংখ্য বিষ্ণু-মূর্ত্তি বাংলা দেশের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৃহে ও কলিকাতায় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত আছে। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন "Throughout the length of the dominions of the Palas, *i.e.* throughout the modern provinces of Bengal and Behar and part of the U. P., images of the various forms of Vishnu have been found in very large numbers. In fact, they outnumber any other class of images that have been found (Eastern Indian School of Mediæval Sculpture, p. 101)।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে রাধাকৃষ্ণ উপাসনা বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা-কালে উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও স্বয়ং সম্রাট্ লক্ষ্মণ সেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়া অনেক ভক্তিমূলক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরদাস "সদুক্তিকর্ণামৃতে" বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগ্রহ করেন। আনুমানিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কবি অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের "কৃষ্ণকীর্ত্তন" হইতে বুঝা যায়, সে যুগে সাধারণ বাঙ্গালী কি ভাবে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিত।

শ্রীরূপ গোস্বামী বাংলা দেশে প্রাক্-চৈতন্য যুগের প্রেম-ধর্ম্ম আলোচনার ইতিহাস অবগত ছিলেন। তিনি "পদ্যাবলী"তে লক্ষ্মণসেন, উমাপতি ধর প্রভৃতির শ্লোক সঙ্কলন করিয়াছেন। ইতিহাস জানিয়াও তিনি লিখিয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্য যে ভক্তিরত্ন প্রকাশ করিলেন, তাহা বেদে, উপনিষদে বা ভগবানের অন্য কোন পূর্ণাবতারে প্রচারিত হয় নাই (স্তবমালা, তৃতীয় অষ্টক, তৃতীয় শ্লোক)। শ্রীরূপ গোস্বামীর ন্যায় সূক্ষ্মভাব-দর্শী ভক্ত ও পণ্ডিত শ্রীচৈতন্যের প্রেমপ্রচারের মধ্যে এমন কিছু অভিনব ভাব দর্শন করিয়াছিলেন, যাহার জন্য ঐ রূপ কথা লিখিয়াছেন।

২। শ্রীচৈতন্যের পরমগুরু মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যবৃন্দ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে মাধবেন্দ্র পুরীকে প্রেমধর্ম্মের আদি প্রচারক বলা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মাধবেন্দ্র পুরীর নিম্নলিখিত তেরজন শিষ্যের নাম করা হইয়াছে—ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী, কেশব ভারতী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণু পুরী, কেশব পুরী, কৃষ্ণানন্দ পুরী, নৃসিংহ তীর্থ, সুখানন্দ পুরী, অদ্বৈত, রঙ্গ পুরী ও রামচন্দ্র পুরী (১।৯।৯—১২, ২।৪।১০৯—১১০, ২।৯।২৫৮, ৩।৮।১৯)। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই তেরজন ছাড়া পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে (৫৬) মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলা হইয়াছে। জয়ানন্দ মাধবেন্দ্রের আর চারিজন শিষ্যের নাম করিয়াছেন, যথা রঘুনাথ পুরী, অনন্ত পুরী, অমর পুরী, গোপাল পুরী (পৃঃ ৩৪)। শ্রীজীব বৈষ্ণব-বন্দনায় নিত্যানন্দের গুরু সঙ্কর্ষণ পুরীকে মাধবেন্দ্রের শিষ্য বলিয়াছেন (২৯০)। তাহা হইলে মাধবেন্দ্র পুরীর ১৯ জন শিষ্যের নাম পাওয়া গেল। শ্রীজীব বলেন—

মাধবেন্দ্রস্য বহবঃ শিষ্যাধর্ম্মপিবিস্তৃতাঃ (২৮৯)।

উক্ত ১৯ জন শিষ্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের সহিত ঈশ্বর পুরীর গয়ায় (বা জয়ানন্দ মতে রাজগিরে), পরমানন্দ পুরীর সহিত ঋষভ পর্ব্বতে [মাদুরা জেলায় (চঃ ২।৯।১৫২)], পাণ্ডুপুরে বা পাণ্ঢারপুরে (শোলাপুর জেলা) শ্রীরঙ্গপুরীর সহিত (চঃ ২।৯।২৫৮) দেখা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরীর ও পরমানন্দ পুরীর ত্রিহুতে জন্ম। অদ্বৈতের শ্রীহট্টে এবং পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির চট্টগ্রামে জন্ম। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পরমানন্দপুরী, পশ্চিম প্রান্তে শ্রীরঙ্গপুরী, পূর্ব্ব প্রান্তে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও অদ্বৈত এবং উত্তর-ভারতে ঈশ্বর পুরী মাধবেন্দ্র প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অন্যান্য শিষ্যও নিশ্চয়ই বিভিন্ন স্থানে প্রচারকার্য্য চালাইতেছিলেন। মাধবেন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যদল শ্রীচৈতন্যের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিশ্বম্ভর মিশ্রের গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বেই যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম জানা যায়। মুরারিগুপ্তের কড়চায় (১।৪) মাধবেন্দ্র পুরী, অদ্বৈত, চন্দ্রশেখর, শ্রীবাস, মুকুন্দ, হরিদাস, নিত্যানন্দ, ঈশ্বর পুরী ও শুক্লাম্বরের নাম; শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে (১।১৮) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব, নৃসিংহ, দেবানন্দ, বক্রেশ্বর ও শ্রীকান্ত, শ্রীপতি, শ্রীরাম নামক শ্রীবাসের তিন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

> নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
> পূর্ব্বেই জন্মিলা সভে ঈশ্বর আজ্ঞায়॥
> শ্রীচন্দ্র শেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।
> শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগুড়, গঙ্গাদাস॥ ১।২।২৮ পৃঃ
> ... ...
> সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান, শুক্লাম্বর।
> মিলিলা সকল যত প্রেম অনুচর॥ ২।১।১৫২ পৃঃ
>
> রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তাঁর নাম।
> প্রভুর বাপের সঙ্গী, জন্ম এক গ্রাম॥
> তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদমকরন্দ।
> কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥ ২।১।১৬১ পৃঃ

শেখরের পদ হইতে জানা যায় যে, নরহরি সরকার শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে ব্রজরস গান করিয়াছিলেন (গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃঃ ৩০২)। এতদ্ব্যতীত কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু গুণরাজখান শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্ব্বে বাংলা দেশে ভাগবতের আলোচনা বিরল ছিল না। দেবানন্দ পণ্ডিত, রত্নগর্ভ আচার্য্য, মালাধর বসু প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পঠন পাঠন করিতেন। কিন্তু খুব সম্ভব, মাধবেন্দ্র পুরীর ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রচারের ফলেই এই ক্ষুদ্র ভক্তগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল।

৩। বাংলা দেশের উপর মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাব

এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, মুরারিগুপ্ত, কর্ণপূর ও বৃন্দাবন দাস বিশ্বম্ভরের ভাবাবেশের পূর্ব্বে যে সকল ভক্তের নাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের উপরই মাধবেন্দ্র পুরীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১।৯) হইতে জানা যায় যে, মাধবেন্দ্র শ্রীরঙ্গ পুরীর সহিত একবার নবদ্বীপে আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধু রত্নগর্ভ আচার্য্য, হিরণ্য ও জগদীশ নবদ্বীপনিবাসী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গঙ্গাদাস এবং সদাশিব পণ্ডিত মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট হইতে প্রেমধর্ম্ম পাইয়া থাকিবেন। ঈশ্বর পুরী কুমারহট্টের লোক, শ্রীমান পণ্ডিতের বাড়ীও কুমারহট্টে। কুমারহট্ট হইতে হুগলী জেলার আকনা বেশী দূর নহে। জয়কৃষ্ণ মতে

> আকনায় গড়ুর আচার্য্য সভে কহে।
> কাশীশ্বর, বক্রেশ্বর পণ্ডিতহো তাহে॥

ঈশ্বর পুরীর প্রভাবে গরুড় পণ্ডিত বক্রেশ্বর প্রভৃতি‌র বৈষ্ণব হওয়া অসম্ভব নহে। বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রা‌ম মেমারী ষ্টেশনের নিকটে—সুতরাং কুমারহট্টের নিক‌টে ঈশ্বর পুরীর প্রভাব কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর উপর ‌পড়ে নাই, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না।

শ্রীচৈতন্যের বয়োজ্যেষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গীয় ভক্তদের উপ‌র মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর প্রভাব সম্ভাবনামূলক হইলেও, পূর্ব্ববঙ্গের ভক্তদের উপর ঐ প্রভাব স্পষ্ট। অদ্বৈ‌ত শ্রীহট্টের লোক এবং মুরারিগুপ্ত, শ্রীবাসেরা চারি ভাই

এবং চন্দ্রশেখরও শ্রীহট্টিয়া। অদ্বৈত মাধবেন্দ্রের শিষ্য এবং নবদ্বীপে তাঁহারই সভায় বা বাড়ীতে উক্ত ভক্তগণ মিলিত হইয়া কীর্ত্তন ও ভাগবত পাঠ করিতেন।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাড়ী চট্টগ্রাম জেলার চক্রশাল গ্রামে। বাসুদেব দত্ত, মুকুন্দ দত্ত, গোবিন্দ দত্ত ঐ গ্রামের লোক। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণে গৌড়দেশে অবস্থিত ভক্তগণের মধ্যে নিজের গুরুবর্গ, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর ব্যতীত কেবল মাত্র বাসুদেব দত্তাদি তিন ভাইকে বন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দ দত্ত নবদ্বীপের টোলে পড়িতেন। মুকুন্দ নিমাইয়ের ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে দূরে পলায়ন করিতেন। ইহা

> "দেখি জিজ্ঞাসয়ে প্রভু গোবিন্দের স্থানে
> এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥ ভা -১।৭।৭৮ পৃঃ

এই গোবিন্দ গোবিন্দ দত্ত; কেন না, এক ভাইয়ের কথা অন্য ভাইয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব। তাহা হইলে গোবিন্দ দত্তও নবদ্বীপে থাকিতেন জানা গেল। মুকুন্দ অদ্বৈতের সভাতে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মাঝে মাঝে নবদ্বীপ আসিতেন। তিনি গদাধর পণ্ডিতের পিতা মাধব মিশ্রের বন্ধু ছিলেন। কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় মাধব মিশ্রকে "তৎপ্রকাশ বিশেষ" বলিয়াছেন (৫৭)। গদাধরের আবাল্য ভক্তি পিতার সংসর্গজাত।

শ্রীচৈতন্যের ভাবাবেশের পূর্ব্বে যে সকল ভক্ত কৃষ্ণকথা আলোচনায় রত ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের উপরই মাধবেন্দ্র পুরী ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রত্যক্ষ বা বা পরোক্ষ প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গেল। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য ভাগবতে (১।৬।৬৯ পৃঃ) আছে

> ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
> গৌর চন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥

শ্রীজীব গোস্বামীও এই জন্য বৈষ্ণব-বন্দনার শেষে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে "মাধব সম্প্রদায়" বলিয়াছেন। যথা—

> এতদ্বৈষ্ণব-বন্দনং সুখকরং সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদং।
> শ্রীমন্মাধব-সম্প্রদায়-গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তি-প্রদং॥

৪। মাধবেন্দ্রপুরী কি মাধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্য?

মাধবেন্দ্র পুরী তথা শ্রীচৈতন্য কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা লইয়া গুরুতর মতভেদ আছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ও বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ ভাষ্যের প্রথমে ও প্রমেয়রত্নাবলীতে শ্রীচৈতন্যকে মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত রূপে বর্ণিত দেখিয়া লিখিয়াছেন —

"Barring the two passages referred to above, there is no evidence anywhere in the standard works of Bengal Vaisnavism that Madhavendra Puri or his disciple Isvara Puri, who influenced the early religious inclinations of Caitanya were in fact Madhva ascetics (Festschrift Moriz Winternitz 'Pre-Caitanya Vaisnavism in Bengal', p. 200)।"

তিনি উক্ত গ্রন্থের ১৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার গুরুপ্রণালীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"This list is quoted with approval in the Bhaktiratnakara (18th century). It could not have been copied from Baladeva Vidyabhusana's list, but was probably derived from the same source."

শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয়ও বলেন, "শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতির মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না" (শ্রীভাগবতসন্দর্ভের ভূমিকা)। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ বসুও ডক্টর দের মতের অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (বসুমতী, ১৩৪২ পৌষ, পৃঃ, ৪৫৩)।

আমি যে সকল গ্রন্থে মাধবেন্দ্র পুরীর মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্তি থাকার কথা পাইয়াছি, তাহা কালানুযায়ী সাজাইয়া নিম্নে দিতেছি।

১। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (২১-২৫) ১৫৭৬ খৃঃ অঃ

২। গোপালগুরু কৃত পদ্য (ভক্তি রত্নাকর ৩১২-৩১৩ পৃঃ ধৃত)

৩। দেবকীনন্দন, বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনার পুঁথি

৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগৌরগণস্বরূপ তত্ত্ব চন্দ্রিকার পুঁথি

৫। অনুরাগবল্লী [১৬৯৬ খৃঃ অঃ (পৃঃ ৪৮-৪৯)]

৬। ভক্তিরত্নাকর (পৃঃ ৩০৮—১১)

৭। গোবিন্দ ভাষ্য

৮। প্রমেয় রত্নাবলী।

৯। লালদাস কৃত ভক্তমাল (পৃঃ ২৬-২৭, বসুমতী সংস্করণ)।

এই গুলি ছাড়া নাতিপ্রামাণিক "মুরলীবিলাস" (পৃঃ ৪১৭-৯) ও অদ্বৈতপ্রকাশেও মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কথা আছে। পূর্ব্বোক্ত নয়খানি গ্রন্থে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমোক্ত দুইটি গুরুপ্রণালীর শ্লোক বা তাহার অনুবাদ ধৃত হইয়াছে।

গোপালগুরুর পদ্যের শেষে আছে—

ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাপ্যয়া যোঽসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥

শ্রীচৈতন্যের নাম যে নিমানন্দ ছিল, ইহা দেবকীনন্দন স্বীকার করেন নাই, সেই জন্য বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহার অনুবাদ দেন নাই। গোপালগুরুর পদ্যে মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর "পুরী" উপাধি লিখিত হয় নাই—বলদেব বিদ্যাভূষণও সেই রীতি অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। গোপালগুরু বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য বলিয়া দেবকীনন্দনের বৃহৎ বৈষ্ণব-বন্দনায় ও ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ৩১২) বর্ণিত হইয়াছেন। অমৃতলাল পাল "বক্রেশ্বর চরিতে" গোপালগুরুকে পুরীর রাধাকান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াছেন। গোপালগুরু হইতে ১৩০৭ সাল পর্য্যন্ত ১৬ জন মহান্তের নামও তিনি দিয়াছেন। তিনি বলেন, "বৃন্দাবনের গোপালগুরুর শিষ্যেরা নিমাই সম্প্রদায়ী এবং স্পষ্টদায়ীক বলিয়া অভিহিত" (১১৭ পৃঃ)। গোপালগুরুর কথা যে সহসা উড়াইয়া দেওয়া যায় না, তাহা দেখা গেল।

৫। গৌরগণোদ্দেশদীপিকার প্রামাণিকতা

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় মাধ্ব গুরুপ্রণালী আছে বলিয়া অনেকে ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না[১]। তাঁহারা বলেন যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থ লিখিয়া কবি কর্ণপূরের নামে চালাইয়া দেন। এইরূপ সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ প্রথমত বলদেব বিদ্যাভূষণ ১৬৮৬ শকে বা ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে স্তবাবলীর টীকা লেখেন ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ে প্রচলিত আছে। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে মনোহর দাস অনুরাগবল্লী গ্রন্থে উহা দিয়াছেন। তিনি আবার গোপালগুরুর লেখা গুরুপ্রণালী উদ্ধার করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও বলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্ব্ববর্ত্তী। বিশ্বনাথের নিজের দেওয়া তারিখ হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৬০১ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অর্থাৎ ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে "শ্রীকৃষ্ণ ভজনামৃত", ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে উজ্জ্বল নীলমণির "আনন্দচন্দ্রিকা টীকা" ও ১৬২৬ শকে মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। প্রবাদ যে, তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমের সহিত বলদেব বিদ্যাভূষণ জয়পুরে বিচার করিতে যান। এক্ষেত্রে যখন বিশ্বনাথের "গৌরগুণস্বরূপতত্ত্বচন্দ্রিকায়" মাধ্ব গুরুপ্রণালী পাওয়া যায়, তখন উহা সর্ব্বপ্রথমে বলদেব বিদ্যাভূষণ "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" জাল করিয়া চালাইলেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

দ্বিতীয়ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকা যে কবি কর্ণপূরের রচনা, তাহা বলদেবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক দুই জন প্রসিদ্ধ লেখকের উক্তি হইতে জানা যায়। এই দুই জনের মধ্যে একজন হইতেছেন "ভক্তি রত্নাকর"প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী। তিনি ৭৭, ১৪২, ১৫০, ৭৩৭, ৮০০, ১০১৬, ১০১৭ পৃষ্ঠায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকার শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। তিনি ৩১১ পৃষ্ঠায় মাধ্ব গুরুপ্রণালী লিখিবার সময় বলিয়াছেন, "তথাহি শ্রীকবি-কর্ণপূর-কৃত-শ্রীমদগৌর-গণোদ্দেশদীপিকায়াং"। অন্য লেখক হইতেছেন বাংলা ভক্তমালের লেখক লালদাস বা কৃষ্ণদাস। তিনিও উক্ত গুরুপ্রণালী কবি কর্ণপূরকৃত বলিয়াছেন। (পৃঃ ২৬-২৭)

তৃতীয়ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লেখক শ্রীনাথের

১। (ক) রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ—বৈষ্ণব সাহিত্য কাশিমবাজার সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পূর্ণ বিবরণ পৃঃ ১২।০।
(খ) শ্রীচৈতন্যমতবোধিনী ৪০৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ।
(গ) সোনার গৌরাঙ্গ পত্রিকা, তৃতীয় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ১৩২ সাল, ৬৭৪ পৃঃ।
(ঘ) মাসিক বসুমতী, ১৩৪২, পৌষ, ৪৫৫ পৃঃ।

গুরু (৩) ও শিবানন্দকে পিতা (৪) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য দাস ও রামদাসের কথা বলিতে যাইয়া লেখক তাঁহাদিগকে "মজ্জ্যেষ্ঠৌ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৪৫)। সারঙ্গ ঠাকুরের তত্ত্ব নিরূপণ-কালে গ্রন্থকার বলিতেছেন, "প্রহ্লাদোমন্যতে কৈশ্চিৎ মৎ পিত্রা ন মন্যতে"। শিবানন্দের পুত্র ভিন্ন অন্য কেহ বই লিখিলে 'আমার পিতার এই মত নহে" এরূপ লিখিতেন না। এই সব প্রমাণবলে আমি সিদ্ধান্ত করি যে, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা শিবানন্দপুত্র কবি কর্ণপূরেরই লেখা।

৬। বাংলাদেশে প্রচলিত গুরুপ্রণালী ও উদীপিমঠের গুরুপ্রণালী

উপরে লিখিত বিচার হইতে পাওয়া গেল যে, শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট সমসাময়িক দুই ভক্ত—কর্ণপূর ও গোপালগুরু—মাধবেন্দ্রপুরীকে মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীঅমরচন্দ্র রায় (উদ্বোধন, ১৩৩৬ চৈত্র, পৃঃ ১৩৬-১৩৮, ১৩৩৭ বৈশাখ, পৃঃ ২৪৬-৫৩), ডক্টর সুশীলকুমার দে ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গুরুপ্রণালীর সহিত ও ঐতিহাসিক ভাবে নির্ণীত কালের সহিত কর্ণপূরাদি বর্ণিত গুরুপ্রণালীর মিল নাই। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত উদীপিমঠের গুরুপ্রণালী ও কর্ণপূর-প্রদত্ত প্রণালী পাশাপাশি সাজাইয়া বিচার করা যাউক।

(ক) গৌরগণোদ্দেশদীপিকার তালিকা	(খ) উদীপিমঠে রক্ষিত তালিকা মূলশাখা	(গ) উদীপিমঠে রক্ষিত তালিকা, অন্য শাখা (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা পৃঃ ৪৭) ও বসুমতী ১৩৪২ পৌষ
১। মধ্বাচার্য্য	১। মধ্ব ১০৬০ শক	
২। পদ্মনাভ	২। পদ্মনাভ ১১২০ শক	
৩। নরহরি	৩। নরহরি ১১২৭ শক	
৪। মাধব দ্বিজ	৪। মাধব ১১৩৬ শক	
৫। অক্ষোভ	৫। অক্ষোভ্য ১১৫৯ শক	
৬। জয়তীর্থ	৬। জয়তীর্থ ১১৩৭ শক	
৭। জ্ঞান সিন্ধু	৭। বিদ্যানিধি বা বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ শক	
৮। মহানিধি	৮। কবীন্দ্র ১২৫৫ শক	রাজেন্দ্র তীর্থ
৯। বিদ্যানিধি	৯। বাগীশ ১২৬১ শক	বিজয়ধ্বজ
১০। রাজেন্দ্র	১০। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক	পুরুষোত্তম
১১। জয়ধর্ম্ম	১১। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক	সুব্রহ্মণ্য
১২। ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ	১২। রঘুনাথ ১৩৬৬ শক	ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়
১৩। ব্যাস তীর্থ	১৩। রঘুবর্য ১৪২৪ শক	
১৪। লক্ষ্মীপতি	১৪। রঘূত্তম ১৪৭১ শক	
১৫। মাধবেন্দ্র	১৫। বেদব্যাস তীর্থ ১৫১৭ শক	

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র ঘোষ "ন্যায়ামৃতে"র রচয়িতার সময় ১৪৮৬ হইতে ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ লিখিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি "মতান্তরে ১৫৫৪ হইতে ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উদীপির উত্তরাদীর মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন" (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা পৃঃ ৪৭-৭৮)। উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, ব্যাসরায় রঘুনাথের সমপর্য্যায়ের লোক। রঘুনাথের মঠাধিপ হওয়ার তারিখ ১৩৬৬ শক বা ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দ হওয়াই সম্ভব। যাঁহারা ব্যাসরায়ের তারিখ ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় রঘূত্তমের শিষ্য বেদব্যাসতীর্থের সহিত ব্রহ্মণ্যের শিষ্য ব্যাসরায়কে অভিন্ন ভাবিয়াছেন। ন্যায়ামৃতে ব্যাসতীর্থ ব্রহ্মণ্যকেই গুরু বলিয়াছেন, যথা

সদা বিষ্ণুপদাসক্তং সেবে ব্রহ্মণ্য ভাস্করম্ ।১৫

শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে, ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা ২৩ বৎসর বয়সে অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে, অর্থাৎ ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের শেষে বা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে। ব্যাসতীর্থ যদি ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে গুরু হন, তাহা হইলে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের সহিত তাঁহার গুরু হওয়ার সময়ের ৬৫ বৎসর ব্যবধান পাওয়া যায়। ঐ ৬৫ বৎসরের মধ্যে ব্যাসতীর্থের নিকট লক্ষ্মীপতির, লক্ষ্মীপতির নিকট মাধবেন্দ্রের ও মাধবেন্দ্রের নিকট ঈশ্বর পুরীর দীক্ষা লওয়া অসম্ভব নহে। কেন না উদীপির মঠের তালিকায় দেখা যায় যে, ১২৫৫ হইতে ১২৯৮ শক, এই ৪৩ বৎসরের মধ্যে চারিজন গুরু হইয়াছেন।

কর্ণপূরের তালিকার সহিত উদীপিমঠের তালিকায় ষষ্ঠগুরু জয়তীর্থ পর্য্যন্ত মিল আছে, তারপর মিল নাই। কিন্তু ঐ মঠেই রক্ষিত অন্য শাখা বলিয়া উল্লিখিত তালিকায়

কর্ণপূর প্রদত্ত রাজেন্দ্র, পুরুষোত্তম, সুব্রহ্মণ্য, ব্যাসরায় নাম পাওয়া যায়; কেবল কর্ণপূর-প্রদত্ত জয়ধর্ম্ম স্থানে উহাতে বিজয়ধ্বজ নাম আছে। জয়ধর্ম্মের নামান্তর বিজয়ধ্বজ হওয়া অসম্ভব নহে। উদীপির তালিকার শাখান্তরে রাজেন্দ্রের গুরুর নাম বিদ্যানিধি আছে, কর্ণপুরের মতেও রাজেন্দ্রের গুরু বিদ্যানিধি। কর্ণপুরে জয়তীর্থের পর জ্ঞানসিন্ধু ও মহানিধি এই দুইটি নাম পাওয়া যায়; উদীপির তালিকায় জয়তীর্থের পরই বিদ্যানিধি। ষোড়শ শতাব্দীর বইয়ে লেখা তালিকার সহিত যদি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রক্ষিত কোন মঠে লেখা তালিকার এই সামান্য গরমিল দেখা যায়, তাহা হইলে ষোড়শ শতাব্দীর বইকে ভুল বলা সঙ্গত হয় না। কেন না কোন কারণ বশত মঠের তালিকায় জ্ঞানসিন্ধু ও মহানিধির নাম বাদ পড়িতে পারে।

মঠের তালিকায় লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বর পুরীর নাম নাই। তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ হয়তো লক্ষ্মীপতি মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু মঠাধীশ হন নাই—মঠে শুধু মঠাধীশদেরই নাম আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কপূর্ণর মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিলেও, মাধবেন্দ্রকে প্রেমধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন। মাধবেন্দ্র ভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহীদের লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার গুরু লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্ব গুরুপ্রণালী হইতে-পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব। প্রবোধানন্দ তাঁহার প্রশিষ্য হিত হরিবংশকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে দেওয়া হয় নাই, তেমনই মাধবেন্দ্রের গুরু বলিয়া লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্ব সম্প্রদায় হইতে কাটিয়া দেওয়া বিচিত্র নহে।

৭। বাংলার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মধুসূদন সরস্বতী

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন, "যাহা হউক, মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার পূর্ব্বে যখন ব্যাসরাজের "ন্যায়ামৃত' লিখিত হয় এবং মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধি রচনা শেষ হইলে ব্যাসরাজ নিজে বার্দ্ধক্য হেতু অসমর্থ বলিয়া তাঁহার শিষ্য ব্যাসরাজকে[১] ঐ গ্রন্থ খণ্ডন করিবার অনুমতি প্রদান করেন, তখন ব্যাসরাজ যে শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরও বহুকাল জীবিত ছিলেন, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না"। সত্যেন্দ্র বাবু এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে লওয়া। ঘোষ মহাশয়ের লিখিত মধুসূদন সরস্বতীর জীবনী যে কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত, তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃঃ ১১৬)। ঐ সকল কিংবদন্তী যে পরস্পর-বিরোধী তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। ঘোষ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, মধুসূদন সরস্বতীর জন্ম ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের সন্নিহিত সময় (ঐ-পৃঃ ১২৬)। কিন্তু ১৩২-১৩৬ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে, দ্বাদশ বর্ষ বয়সে মধুসূদন "নবদ্বীপে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছে" শুনিয়া নবদ্বীপে গমন করেন। শ্রীচৈতন্য ১৫১০ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে যান। ১৫২৫ + ১২ = ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন মধুসূদন নবদ্বীপে যান বলিয়া প্রবাদ, তখন শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর চারি বৎসর অতীত হইয়াছে। সত্যেন্দ্র বাবু "মধুসূদনের জন্ম-সময় ১৫২০ খৃষ্টাব্দ বা তাহার ২।১ বৎসর পূর্ব্বে" নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত প্রবাদের সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদনের জন্ম ধরিলেও, তাঁহার বার বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদর্শনে আসা সম্ভব হয় না। শ্রীচৈতন্য তখন নীলাচলে গম্ভীরার মধ্যে প্রেমাবেশে মত্ত ছিলেন, এ কথা বাংলা দেশের সকলেই জানিতেন, আর মধুসূদন জানিতেন না? এই জন্য বলিতে হয় যে, সামান্য প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর লেখক কর্ণপূর ও গোপালগুরুকে ভ্রান্ত মনে করা সুবিবেচনার কাজ নহে। পরন্তু "অদ্বৈতসিদ্ধি"র ভূমিকায় ঘোষ মহাশয় যে সব তারিখ দিয়াছেন, তাহা নির্ভুল নহে। তিনি লিখিয়াছেন (৪১ পৃঃ) যে বল্লভাচার্য্য ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। কিন্তু বল্লভাচার্য্য

(১) এইখানে "বসুমতী"র মুদ্রাকর প্রমাদ দেখা যাইতেছে। প্রকৃত পক্ষে গুরুর নাম ব্যাসরাজ বা ব্যাসরায়, শিষ্যের নাম ব্যাসরাম (অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, পৃঃ ১৬৭)।

প্রকৃতপক্ষে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে তিরোধান করেন, (I. D. M. C., 1934 P. 268)।

৮। পূর্ব্বভারতে পুরী, গিরি, ভারতী

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি কর্ণপূর ও গোপালগুরুর মত সহজে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, কিন্তু পুরী উপাধিযুক্ত মাধবেন্দ্র কি করিয়া তীর্থ উপাধিধারী মাধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন তাহাও বুঝা কঠিন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সকল পুরী-ভারতীই শঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। অনেক গৃহী ব্যক্তির উপাধিও পুরী-ভারতী প্রভৃতি ছিল। যথা অসমীয়া শঙ্করদেবের বংশ-পরিচয়ে দেখা যায়, গন্ধর্ব্ব গিরির পুত্র রামগিরি, রামগিরির পুত্র হেমগিরি, তাঁহার পুত্র হরিহর গিরি প্রভৃতি (লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াকৃত "শঙ্করদেব", পৃঃ ৯)। শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামীরা অদ্বৈতের পূর্ব্বপুরুষদের যে পরিচয় দেন, তাহাতে পাওয়া যায় জটাধর ভারতীর পুত্র বাণীকান্ত সরস্বতী, তৎপুত্র সাকুতিনাথ পুরী (Dacca Review, March, 1913)। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে আছে—

> জ্ঞাত-তত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদেস্থিতিঃ
> পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরিনামা স উচ্যতে।

এই হিসাবে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পারে।

এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মাধবেন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় কয়েকবার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। হয়তো প্রথমে তিনি পুরী-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হ'ন, তারপর অদ্বৈতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া চরম দ্বৈতবাদী মাধ্ব সম্প্রদায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যেরূপ খৃষ্টান হইয়াও নূতন নামে পরিচিত হন নাই, সেইরূপ মাধবেন্দ্র পুরী উপাধিতেই পরিচিত রহিয়া গেলেন। পরে মাধ্ব সম্প্রদায়েও প্রেমধর্ম্মের যথেষ্ট স্ফুরণ না দেখিয়া নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন।

৯। মাধ্ব সম্প্রদায় ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়

মাধ্ব সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যে সাধ্য-সাধন বিষয়ে মিল নাই, তাহা ১৩৩৫ সালে কটকের রাসবিহারী মঠের অধ্যক্ষ রাধাকৃষ্ণ বসু প্রমাণ করিয়া দেখান (বীরভূমি ১৩৩৫ সাল, ৯।৪, পৃঃ ১৮৮-৯)। এইরূপ অমিল দেখিয়াই কর্ণপূর মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিয়া তন্মধ্যেই মাধবেন্দ্রকে নূতন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বলিয়াছেন।

শ্রীজীব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীকার করেন না যে, শ্রীচৈতন্য মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত। শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীচৈতন্যকে "স্বসম্প্রদায সহস্রাধিদৈবং" বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত উদীপির মাধ্ব সম্প্রদায়ীদিগের বিচার বর্ণনা করিয়াছেন (২।৯।২৪৯-৫১)। তিনি মাধ্ব-গুরুর মুখ দিয়া সাধ্য সম্বন্ধে বলাইযাছেন "পঞ্চ বিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন" ২।৯।২৩৯।

তিনি ১।৩।১৬ পয়ারে লিখিয়াছেন—

> সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
> সাযুজ্য না লয় ভক্ত, যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥

মাধ্ব মতে সার্ষ্টির অর্থ ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও সাযুজ্য অর্থ ব্রহ্মঐক্য নহে। পদ্মনাভ মাধ্ব সিদ্ধান্তসারে "তত্ত্বক্তং ভাষ্যে" বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক তুলিয়াছেন—

> মুক্তাঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগলেশতঃ ক্বচিৎ।
> বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন॥

অর্থাৎ, মুক্ত পুরুষেরা পরম পুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করে, কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারে না। ডক্টর ঘাটে The Vedanta নামক গ্রন্থে (Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. 1926) মাধ্ব মতের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন, "Even in Moksa Jiva cannot be one with Brahma. Bhoktr, Bhogya and Niamaka are eternaliy distinct and equally real." উদীপি-মঠের মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরু যে নিজের সম্প্রদায়ের মত-বাদের প্রধান কথাই জানিতেন না, এ কথা কল্পনা করা অসম্ভব। সেই জন্য সন্দেহ হয় যে, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সহিত মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুর বিচারটি যথাযথভাবে লেখেন নাই।

সিদ্ধান্ত :

মাধবেন্দ্র পুরী মাধ্ব সম্প্রদায়ের আনুগত্য অন্তত কিছু-কালের জন্য করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে কর্ণপূর ও ও গোপালগুরুর ন্যায় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লোক ঐরূপ কথা লিখিতে পারেন না—লিখিলেও বৈষ্ণব সমাজ উহা স্বীকার করিয়া লইতেন না। শ্রীজীব কোথাও স্পষ্ট বলেন নাই যে, মাধবেন্দ্রের সঙ্গে মাধ্ব সম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু মাধবেন্দ্রের প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের সহিত মাধ্ব মতের গুরুতর পার্থক্য দেখিয়াই তিনি বৈষ্ণব-বন্দনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মাধ্ব সম্প্রদায় বলিয়াছেন। এই মত খুবই সমীচীন ও যুক্তিসঙ্গত।

প্রেম ও নাক

—শ্রীবাঘবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

চায়েব পেয়ালা শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে গিরীন দা বললেন—বুঝলে মাষ্টার, বড়ই ফ্যাসাদে পড়েছি। মেয়েটার বয়েস হল এই সাত—যুগধর্মে এর মধ্যেই উসখুস করতে আরম্ভ করেছে। বিয়েটা চুকিয়ে দিয়ে যে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব—তারও উপায় নেই। কী উদ্‌ভুট্টি আইন বাবা—চোদ্দ না হলে বিয়ে দিতে

মেয়েটির বয়স হল সাত, যুগধর্মে এর মধ্যেই উসখুস করতে আরম্ভ করেছে...।

পারবে না। এ যুগে চোদ্দ বছরের মধ্যে মেয়ে যে বত্রিশ বার প্রেমে পড়তে পাবে—সে কথাটা কেউ ভাবলে না।

ছোট গদা অবাক হয়ে বললে—ওই টুকু মেয়ে প্রেমে পড়বে কী? আপনার যেমন সব কথা। ডাগরটি হক—দেখে শুনে একটা ভাল বিয়ে দিয়ে দেবেন।

গিরীন দা বললেন—তুমি ত ব্রাদার বলেই খালাস। আজকালকার মেয়েদের ত আর জান না। বর নিয়ে আসব—মেয়ে বলবে, ওর বাঁদিকের ভুরুটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তখন আর একটি সৎ পাত্র খুঁজে বের করতে যে আমার নাভিশ্বাস হবে। প্রেম করতে গিয়ে আমাদের পাড়ার গজেন ছোকরা প্রায় বিবাগী হয়ে গেল।

বীরু জিজ্ঞেস করল—গজেনের আবার কী হল?

গিরীন দা একটা হতাশাসূচক আওয়াজ করে বললেন—হবার আর বাকী রইল কী? কলেজের পড়া শেষ করে দিব্যি বেকার ছোকরা পাঁচজনের ফাইফরমাস খেটে বেড়াত—অদৃষ্টের দুর্ভোগ, পড়ল প্রেমে। ওর বৌদির মাসতুত ভাইয়ের শালী, ব্যারাকপুরের দিকে কোথায় থাকে, তার সঙ্গে। গজেন ছোকরা এদিকে বেশ সুপুরুষ—দুঃখের মধ্যে নাকটা বাঁকা—অনেকটা—'য'ফলার মত দেখতে। ছেলের বাড়ীর সবাই, মেয়ের বাপ-মা—সবাই রাজী—মেয়ে বেঁকে বসে বলল—উঁহুঁ এ বিয়ে হতে পারে না।

ছোট গদা বলল—মেয়েটার নাম কী?

—বণু ব'লে ডাকে—ভাল নাম বুঝি অরুণা। আজকালকার মেয়েদের ত আর চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। সোজা গজেনকে বলল—তুমিই বল—ও রকম যার নাক, তাকে বিয়ে করা সম্ভব কী না। মনে কর আমাদের ছেলেমেয়েরা যদি তোমার ধারা পায়—তা হলে?

রতন মাষ্টার চোখ বড় করে বলল—একেবারে মুখের ওপর এই কথা বললে?

—তা বললে বৈ কী। গজেন বেচারী দু'তিন দিন মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াল। তারপর এক ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে গিয়ে মেয়েটিকে বললে—দেখ, আমার নাক বরাবর এ রকম ছিল না। ইস্কুলে পড়বার সময় সাইকেল অ্যাকসিডেন্ট হয়ে এ রকম ধারা হয়েছে। ডাক্তারে বলেছে ভবিষ্যতে ছেলে-পিলেদের নাক এ রকম হতে পারে না।

অরুণা ভেবে বললে—তা অবশ্য বলতে পার। কিন্তু আমার কী হবে? এ যে হিন্দু আইন, ডিভোর্স চলবে না। আমায় ত সারা জীবন ঐ নাক দেখতে হবে? ও বাবা সে আমি পারব না—

এর পর মাসখানেক গজেন বাড়ী বসে দু' রিম কাগজ ভর্ত্তি গল্প-কবিতা লিখে ফেললে। শেষে এক বন্ধুর কথায়

পেলম্যানিজ্‌ম-এর কোর্স নিয়ে—একদিন সোজা অরুণাকে গিয়ে বললে—দেখ, আজ শেষবারের বার তোমায় বলছি। আজ যদি আমায় বিয়ে করতে রাজী না হও, তা হলে কালই বাড়ীতে অন্য মেয়ে খোঁজ করতে বলব।

শুনে মিনিট দুই চুপ করে থেকে অরুণা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে—উঃ, কী নিষ্ঠুর তুমি। নাক বাদ দিয়ে—তোমায় যে আমি কত ভালবাসি—তা কী তুমি জান না?

গজেন চটে গিয়ে বললে—তোমার ঐ এক কথা হয়েছে—নাক। নাক কী আমি নতুন করে গড়িয়ে আনব?

কথাটা শুনেই অরুণার মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। চোখ মুছে ধরা গলায় বললে—আজকাল ডাক্তারীতে কত কী হচ্ছে। নাকও নিশ্চয়ই বদলান যায়। আমায় যদি সত্যি ভালবাসতে—তা হলে কী আর এতদিন চেষ্টা করতে না।

গজেন ভেবে দেখলে কথাটা সত্যি। যুদ্ধের সময় কত লোকের নাক-মুখ ডাক্তাররা বদলে দিয়েছে। মাঙ্কি-গ্ল্যাণ্ড লাগিয়ে যদি বুড়ো ছোঁড়া হয়—তা হলে নাকই বা কেন বদলান যাবে না?

অরুণাকে ছোকরা খুবই ভালবেসেছিল—তাই বললে—বেশ। নাক আমি বদলাব। কিন্তু কী রকম নাক তোমার পছন্দ বেশ ভেবে চিন্তে বল। পরে যে আবার বলবে—এ নাকও আমার ভাল লাগছে না—তা চলবে না।

অরুণা ভুরু কুঁচকে সামনে থেকে, পেছন থেকে, পাশ থেকে, দূরে দাঁড়িয়ে, খুব কাছে এসে—নানা ভাবে গজেনকে দেখলে। মনশ্চক্ষে বেঁটে, মোটা, টিকল, থ্যাবড়া, বড়শীর মত, তিল-ফুল-জিনি—প্রভৃতি হাজারো রকম নাক দেখে বেচারীর মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। কিন্তু কী রকম নাকটি হলে গজেনকে মানাবে—এ আর ঠিক করতে না পেরে শেষকালে মরিয়া হয়ে বললে—বাঁশীর মত নাক!

গজেন পরদিন এক যাত্রাপার্টি থেকে করোনেট, বিউগ্‌ল, ক্ল্যারিওনেট, ভেঁপু—মায় বাঁশের বাঁশী পর্য্যন্ত এক রাশ বাঁশী এনে হাজির করলে। অরুণা সবগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে বলতেই পারলে না, এ রকম নাক হলে মানুষকে কী রকম দেখতে হতে পারে। দু' হাতে মাথা টিপে ধরে বললে—আজকে শরীরটা ভাল নেই—। তুমি এগুলো নিয়ে যাও। কাল বরং খানকতক ছবি নিয়ে এস।

গ্রীক, রোমান, বিলাতী, মাদ্রাজী, সব ছবি দেখার পর—একটা কোন্ সাবানের কোম্পানীর বিজ্ঞাপনের কেষ্টর ছবির নাক অরুণার অসম্ভব পছন্দ হয়ে গেল। গজেনকে বললে—অবিকল এই রকম নাক আমার চাই।···বড্ড ভাল লাগে।

..উঃ কী নিষ্ঠুর তুমি। নাক বাদ দিয়ে তোমায় যে আমি কত ভালবাসি।

গজেন গম্ভীর হয়ে বললে—হুঁ, তাই হবে। তবে দেব-দেবীর নাকের মত কী মানুষের নাক হয়!

অরুণা জোর দিয়ে বললে—হতেই হবে। জান তো প্রেম বিশ্বজয়ী।

একটু দম নিয়ে গিরীন দা' আবার আরম্ভ করলেন—হাঁ, তার পর, গজেন ছোকরার সাহস আছে বলতে হবে। কোথা থেকে খুঁজে এক জাপানী ডাক্তার বের করলে। বাড়ীর সকলের অনুযোগ, কান্নাকাটি, বন্ধুবান্ধবের আপত্তি না মেনে স্রেফ নাক অপারেশন করালে। সুন্দর হতে হলে কষ্ট করতে হয়—তার ওপর আবার কেষ্টর মত নাক। মাস তিনেক যন্ত্রণা ভোগ করার পর গজেনের নাকের ব্যাণ্ডেজ খুলে দেওয়া হল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে

নিজের নাকের পৌরাণিক প্রতিবিম্ব দেখে—গজেন ত প্রথমে নিজেকে চিনতেই পাবে না। দু'চার দিন হাত বুলিয়ে আর আয়নায় দেখে—যখন বুঝলে, সত্যিই এ তার নিজেরই নাক—তখন আর গজেনকে পায় কে! দিন রাত আয়নার সামনে নানা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের নাকের সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে থাকে। প্রথম দিন বাইরে বেরিয়ে মনে হল—সবাই ওর নাকের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

দু'চার দিন হাত বুলিয়ে আয়নায় দেখে—যখন বুঝলে, সত্যিই এ তার নিজেরই নাক—তখন আর গজেনকে পায় কে!
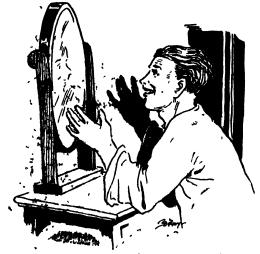
অরুণাদের বাড়ীতে যেতে প্রথমেই অরুণার সঙ্গে দেখা। গজেনের চেহারা দেখে অরুণার আনন্দে প্রায় বাক্‌রোধ হয়ে যাবার যোগাড় হল। অবাক হয়ে বললে—তুমি! এত সুন্দর! কে জানত—নাক বদ্‌লালে তোমায় এত ভাল দেখাবে। ঠিক যেন আইভর নোভেলো ইন র‍্যাট।

Ivor Novello! কথাটা শুনে গজেনের অনেক কিছু মনে হয়ে গেল। সে যেন নতুন পথের সন্ধান পেলে। খানিকক্ষণ ঘাড় বাঁকিয়ে নাকে হাত বুলাতে বুলাতে অরুণাকে দেখে ভাবলে—এমন যার নাক, তার সঙ্গে কী এ মেয়ে মানায়। একে কোনদিন বিয়ে করবার কল্পনা করেছিল ভেবেই গজেন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এখন কোন সিনেমা কোম্পানীতে ট্রেণিং নিয়ে হোলিউড যেতে পারলে হয়ত গ্রেটা গার্বো কি জোয়ান ক্রফোর্ড পর্য্যন্ত তার প্রেমে পড়ে যেতে পারে।

উত্তেজিত হয়ে উঠে গজেন বললে—তা হলে অরুণা, আমি চললাম।

অরুণা আশ্চর্য্য হয়ে বললে—এখনি? কোথায়?

গজেন কোন উত্তর না দিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল। পরদিন শুনলাম কোন্ এক ফিল্‌ম কোম্পানীতে ছোঁড়া চাকরী পেয়েছে।

বীরু বললে—বাঃ এত ভালই হয়েছে। ছোঁড়াটার একটা হিল্লে হয়ে গেল।

গিরীন দা বীরুর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন—এ রকম করলে সমাজ ক'দিন টিঁকবে? যাক্ গে। ও তোমরা বুঝবে না। মাষ্টার আমার তিন কাপ চায়ের দাম থাকল।

চিত্রকলা ও তাহার রসোপলব্ধি

—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হুইজ্‌লার অঙ্কিত 'দি ওল্ড ব্যাটারসিয়া ব্রিজ' নামক চিত্র সম্পর্কে রাস্‌কিন্‌ মন্তব্য করিয়াছিলেন, শিল্পী জন সাধারণের মুখের উপর এক পাত্র রং ঢালিয়া দিয়াছেন। এই মন্তব্যের ফলে অপমানিত শিল্পীর মানহানির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাস্‌কিন্‌কে এক শিলিং দণ্ড দিতে হইয়াছিল। কিন্তু হুইজলারের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ন্যাশনাল গ্যালারীর কর্তৃপক্ষ দুই হাজার গিনি দিয়া উক্ত চিত্রখানি ক্রয় করেন। ঘটনাটি হইতে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, রাস্‌কিন্‌ কি ভাবে চিত্রখানির বিচার করিয়াছিলেন? উত্তরে বলা যায়, বাস্তবের সহিত চিত্রের সাদৃশ্য আছে কি না, এই মাপকাঠির সাহায্যে রাস্‌কিন্‌ চিত্রটির বিচার করিয়াছিলেন। ইহাই কি একমাত্র মাপকাঠি? রাস্‌কিনের পরে বহু বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও এই সমস্যা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

একখানি ছবি দেখিয়া সাধারণ লোকের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহার প্রায় সবটুকুই অস্পষ্ট রহিয়া যায়। ছবিখানি তাহার ভাল কিংবা খারাপ লাগিতে পারে। ভাল লাগিলে তাহার মনে অস্পষ্ট আনন্দ ও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়; নতুবা তাহার অপরিসর মনে কোন ভাব-বৈলক্ষণ্যই অনুভূত হয় না। অবশ্য অত্যধিক খারাপ লাগিলে ছবিখানি তাহাকে পীড়া দিতে থাকে। তাহার মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, এই ভাল লাগা কিংবা খারাপ লাগা সবই নির্ভর করে চিত্রের বাস্তবানুসারিতার উপর। তাহার কারণও আছে। সাধারণতঃ যে সকল বস্তু মূলতঃ আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভিজ্ঞতার বাহিরে, তাহা কেবল যে আমরা কল্পনা করিতে পারি না তাহাই নহে, এই কল্পনার জন্য কোন আকিঞ্চনও আমাদের মনে জাগে না। আমাদের পরিচয়ের সমষ্টির উপরে আমাদের সকল কল্পনা একান্ত ভাবে নির্ভর করে। তাই, কি চিত্রকলা, কি সাহিত্য, সর্ব্বত্রই আমরা আমাদের একান্ত পরিচিত দুনিয়াকে খুঁজিয়া বেড়াই এবং এই মাপকাঠির সাহায্যে অনায়াসে বলিয়া থাকি, গ্রীক ভাস্কর্য্য সুন্দর, কেন না তাহা নিছক বাস্তবকে রূপ দিয়াছে; ইউরোপীয় চিত্রকলা বাস্তবপন্থী সুতরাং মনোরম, ভারতীয় কলা অ-বাস্তব, তাই তাহার রসোপলব্ধি করা সম্ভব না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, গ্রীক ভাস্কর্য্যে ও ইউরোপীয় চিত্রে আমরা যে সকল মূর্ত্তি দেখি, তাহার অনুরূপ মূর্ত্তি পৃথিবীতে কি সত্যই দেখা

বালিকার প্রতিকৃতি। [বত্তিচেলি (১৪৪৭-১৫১০)]

যায়? একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, বাস্তবের সহিত সম্পর্ক-বর্জ্জিত আর্ট সম্ভব না হইলেও, বাস্তবের নিছক অনুকরণকে প্রকৃত আর্ট বলা চলে না।

ধরা যাক জনৈক শিল্পী একটি অট্টালিকার ছবি আঁকিতেছেন। তিনি দুই ভাবে তাঁহার ছবি আঁকিতে পারেন। প্রথমতঃ, রং-এর সাহায্যে তিনি এমন একটি বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহার ফলে দর্শকের মনে অঙ্কিত ছবিকে অট্টালিকার অনুরূপ বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ছবিটি যে সুন্দর হইবে তাহা বলা যায় না। এ-রকম

ছবি আঁকিয়া শিল্পী নিজে সন্তুষ্ট না-ও হইতে পারেন। তাঁহার দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে, বিভিন্ন রং-এর সমাবেশে বাস্তবতার বিভ্রম না ঘটাইয়া এমন একখানি ছবি আঁকা, যাহার নিজস্ব একটি সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু সে ছবি অট্টালিকার অনুরূপ হইবে না। এ-অবস্থায় তিনি কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? সত্যের পথ অবলম্বন করিলে সৌন্দর্য্যের কথা ভুলিতে হইবে, আবার কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে গেলে বাস্তবের সহিত চিত্রের কোন সাদৃশ্য থাকিবে না। এই খানেই শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

ম্যাডোনা। [র‍্যাফেল (১৪৮৩-১৫২০)]

তাঁহার অন্তরে দুইটি বিভিন্ন ইচ্ছা প্রকাশের পথ খুঁজিতেছে,—এক, তাঁহার বাস্তবপ্রীতি ও অপরটি তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য্যবোধ। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি বাধা আছে—প্রথমতঃ, তিনি সমগ্র অট্টালিকাটি দেখিতে পাইতেছেন না; দ্বিতীয়তঃ, অট্টালিকার উপরে যে আলো আসিয়া পড়ে, তাহা চিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে উপযুক্ত রং-এর অভাব; তৃতীয়তঃ, পারিপার্শ্বিকের সহিত অট্টালিকার যে সম্বন্ধ, চিত্রে তাহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া দুরূহ।

সুদক্ষ শিল্পী একটি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি অট্টালিকার ছবি আঁকেন সন্দেহ নাই, তবে সেই সঙ্গে ছবিখানি যাহাতে সুন্দর হয়, সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি থাকে। ছবি দেখিয়া মনে হয় না, আমরা গাছ কিংবা পাহাড় দেখিতেছি। ছবির অট্টালিকার সহিত বাস্তব অট্টালিকার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ছবিখানি অট্টালিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহার কারণ, কতকগুলি বিষয়ে বাস্তবের সহিত ছবির সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়, প্রকৃত অট্টালিকার যতগুলি জানালা-দরজা আছে, ছবিতেও সমসংখ্যক জানালা-দরজা আঁকিতে হয়। বলা বাহুল্য, শিল্পী অট্টালিকার যতটুকু অংশ আঁকিবেন, তাহার জানালা দরজা কিংবা অন্যান্য প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির কথাই উল্লেখ করা হইতেছে। সুতরাং শিল্পীর কাজ হইতেছে, বাস্তবের সহিত কতকগুলি বিষয়ে মিল রাখিয়া সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তোলা। বাস্তবের সহিত মিল রাখিতে হইবে এই জন্য যে, ছবি দেখিবা মাত্র আমাদের মনে পরিচিত বস্তুর কথা উদিত হইবে; সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এই জন্য যে, ছবিখানি যেন আমাদের রসপিপাসাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে। যে শিল্পী বাস্তবকে একান্ত ভাবে অনুকরণ করেন, তাঁহার চিত্র বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফোটোগ্রাফির যুগে তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কিছুই নাই। আবার যিনি বাস্তবকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া কেবল সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার চিত্র দেখিয়া সাধারণ লোকের মন কোন আনন্দই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যে শিল্পী চিত্রে বস্তু ও কল্পনার সমন্বয় করিতে পারেন, তাঁহার চিত্র চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকে।

এখন সমস্যা হইতেছে, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধ কি এবং কি ভাবে তাঁহার চিত্রে সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে? এখানেও দুইটি বিষয় মিলিত হইয়া শিল্পীর তুলিকাকে জীবন্ত করিয়া তোলে। এক হইতেছে, তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, নিজের বিশিষ্ট দর্শনভঙ্গী বা দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য ও দ্বিতীয়টি হইতেছে, দেশ ও কালের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বা দেশ ও কালগত দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্য।

দৃশ্যমান জগতের কোন বস্তু সকলে এক দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকা এক এক জন

এক এক ভাবে দেখিতে পাবেন। ইঞ্জিনিয়ার দেখিবেন, অট্টালিকাটির গঠন-প্রণালী কি রূপ, ইহারই দোষ ত্রুটি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। গৃহে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা কিন্তু অট্টালিকাকে অন্য চোখে দেখিবেন, আবার অসম্পর্কিত পথচারীর নিকট তাহা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য্য-পূর্ণ একটি বিরাট বাড়ী বলিয়া মনে হইবে, শিল্পীরও সেইরূপ একটি নিজস্ব দৃষ্টি রহিয়াছে। অট্টালিকার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হয়ত তাঁহার নজরে পড়িবে, কিংবা হয়ত তাহার বহিরাভ্যন্তরে পরিব্যাপ্ত একটি বিশেষ ভাব তাঁহাকে আকৃষ্ট করিবে। এক কথায় অট্টালিকাটি তাঁহার মনে ভিন্ন একটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবে। এই রূপান্তরিত মূর্ত্তিই তিনি চিত্রে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন এবং এই মূর্ত্তির মাধুর্য্য চিত্রের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিবে।

দর্শনভঙ্গীটি শিল্পীর নিজস্ব, তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহিত ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ইহার সহিত আর একজনের দর্শনভঙ্গীর কোন তুলনা করা চলে না। এই বিভিন্ন ও বিশিষ্ট দর্শনভঙ্গীর জন্য কোন বস্তু একজনের নিকট সুন্দর বোধ হইলেও আর একজনের নিকট অ-সুন্দর লাগিতে পারে এবং একই কারণে একজন হয়ত কোন বস্তুর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন, সেখানে আর একজন অন্য একটি বৈশিষ্ট্য দেখিয়া মুগ্ধ হন। বোতিচেলির নিকট সকল বস্তুর রেখা-সমন্বয় ছিল একমাত্র লক্ষ্য করিবার বিষয়। তাই তাহার প্রতিটি চিত্রে জীবন্ত রেখার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। দর্শকের দৃষ্টি যাহাতে সম্পূর্ণভাবে এইখানে আবদ্ধ হয়, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র প্রচেষ্টা। রেমব্রান্টের দৃষ্টি থাকিত আলো ও ছায়ার লীলা-বৈচিত্র্যের পরে। তাঁহার চিত্রে বোতিচেলির রেখা-সুষমা নাই, আছে আলো এবং ছায়ার ক্রমপর্য্যায়।

কিন্তু দর্শনভঙ্গীর মূলে বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকিলেই চলে না, বস্তুদর্শনে শিল্পীর মনে সৃষ্টি-সক্ষম অনুভূতিগুলি সক্রিয় হওয়াও আবশ্যক। নতুবা শিল্পীর উদ্দেশ্য সফল হয় না। এই ক্রিয়াশীল অনুভূতির ফলে অনেক সময় অ-সুন্দর বস্তুও শিল্পীর হস্তে রূপান্তরিত হইয়া চিত্রে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া ওঠে। সুতরাং এ কথা বলিলে ভুল হইবে না, অঙ্কিত চিত্রের সৌন্দর্য্যের সহিত চিত্রের নির্ব্বাচিত বস্তুর সৌন্দর্য্যের কোন যোগ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ রেমব্রান্ট অঙ্কিত 'মৃত বৃষভ' চিত্রখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বীভৎস বস্তু কেমন করিয়া অতি সুন্দর চিত্রে পরিণত হইতে পারে, তাহা এই চিত্রখানি দেখিলে [illegible] চিত্র সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে, শিল্পীর নিজস্ব সৌন্দর্য্যানুভূতির কথা ভুলিলে চলিবে না।

শিল্পীর ব্যক্তিগত বিশেষত্বের জন্য একই বস্তু বিভিন্ন শিল্পীর তুলিকায় বিভিন্নরূপে ফুটিয়া উঠে। [illegible] যত চিত্র আজ পর্য্যন্ত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার পর্য্যালোচনা

মেষগৃহে জোয়াকিম। [জোত্তো (১২৬৬-১৩৩৭)]

করিলেই এই সত্য প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়াও বড় কথা এই যে, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিল্পী বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন করেন। অর্থাৎ, এমন সকল বিষয় তিনি নির্ব্বাচন করেন, যাহা তাঁহার নিজস্ব সৌন্দর্য্যানুভূতিগুলিকে স্পন্দিত করে এবং যাহার ছবি আঁকিয়া তিনি আপন অন্তরের ভাবকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারেন। অবশ্য এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য ছাড়া, দেশ ও কালগত দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের প্রভাবও তাঁহাকে পরিচালিত করে। সাহিত্যে আমরা যেমন সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার উপরে দেশ ও কালের প্রভাব দেখিতে পাই, তেমনই চিত্রকলাতেও এই তিনটি কারণের সন্ধান পাই।

এই দেশ ও কালগত দৃষ্টিবিশিষ্ট্যের প্রমাণ পাওয়া যায়, যখন কোন ছবি দেখিয়া কেহ মন্তব্য করেন, উহা জাপানী কিংবা ইতালীয়ান প্রভাবযুক্ত, অথবা প্রাচীন কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর ছবির লক্ষণযুক্ত। বলা বাহুল্য, দেশ ও কালগত দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য না থাকিলে ছবি সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য করিবার আবশ্যক হইত না এবং বিভিন্ন দেশ ও চিত্রকলার ভিতরে বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নজরে পড়িত না।

বৃদ্ধ পোলাণ্ডবাসী। [রেমব্রাণ্ট (১৬০৭-১৬৬৯)]

অথচ এমন কথা বলা চলে না, যাহাতে বোধ হইতে পারে, দেশ ও কালগত দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য শিল্পীর নিজস্ব দর্শনভঙ্গী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বস্তুতঃ উহারা হাজার হাজার শিল্পীর ব্যক্তিগত দর্শনধারার সমষ্টিবিশেষ; উহারা যেন বিরাট নদী, যেখানে অসংখ্য নিজস্ব দৃষ্টির ক্ষুদ্র ধারা আসিয়া উপনদীর মত মিলিত হইয়াছে। ইহাদের স্রোতের বিরুদ্ধে শিল্পীর অগ্র-গমন সম্ভব নয়। তিনি তাঁহার প্রতিভাবলে দেশ-কালগত শিল্পধারাকে সঞ্জীবিত বা সঞ্চালিত করিতে পারেন, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। র‍্যাফেল যে-দৃষ্টিতে 'ড্রেস্‌ডেন্ ম্যাডোনা'র মাতৃমূর্ত্তিকে দেখিয়াছিলেন, জোত্তর পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না, জোত্ত র‍্যাফেল অপেক্ষা নিকৃষ্ট শিল্পী। ইহার একমাত্র কারণ, দুই শিল্পীর পারিপার্শ্বিকতা ও কালের ব্যবধানের দরুণ র‍্যাফেল মানব-দেহকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, জোত্ত সে ভাবে দেখিতে পারেন নাই। জোত্তর নিজস্ব ও তাঁহার সমসাময়িক শিল্পীর দর্শনভঙ্গী যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পরে বহু দর্শনধারা মিলিত হইয়া র‍্যাফেলের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়াছে। এই জন্যই র‍্যাফেল জোত্তর উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। এমনি করিয়াই ক্রমশঃ দর্শনভঙ্গী প্রসারতা লাভ করিতে পারে। তাই দর্শনভঙ্গীর সম্ভাবনা অনন্ত এবং বিচিত্র।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব বশতঃ একই দেশের বিভিন্ন যুগের ছবির ভিতরে কতকগুলি বিষয়ের মিল দেখা যায়। আবার কালের প্রভাবের দরুণ এক যুগের বিভিন্ন দেশের ছবির মধ্যেও কিছু কিছু মিল নজরে পড়ে। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ছবি পাশাপাশি ধরিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, কোন্ কোন্ বিষয়গুলি একান্ত প্রাচ্য ভাবাপন্ন এবং কোন্ কোন্ বিষয়গুলি পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন। কোন শতাব্দীর একখানি ইতালীয়ান ও আর একখানি ডাচ ছবি পাশাপাশি দেখিলে কালগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ দুই ছবিতেই দেখা যায়। তাই ছবি দেখিবার সময় দেশ ও কালগত দর্শনধারার কথা ভুলিলে চলিবে না। রেম্‌ব্রাণ্ট যদি ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন কালে জন্ম গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার 'বৃদ্ধা মহিলার' রূপের পরিবর্ত্তন হইত সন্দেহ নাই। তাঁহার ছবি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম; তিনিও বিখ্যাত হইতেন, কিন্তু সে রেম্‌ব্রাণ্টের সহিত আমাদের পরিচিত রেম্‌ব্রাণ্টের কোন সাদৃশ্যই থাকিত না।

উক্ত তিনটি দর্শনধারা ব্যতীত আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা শিল্পীর ষ্টাইলকে গঠন করিয়া তোলে। ইহা হইতেছে কলানৈপুণ্য। বিভিন্ন দর্শনধারার সম্মিলিত শক্তি শিল্পীর অন্তরে যে-ভাবতরঙ্গ জাগাইয়া তোলে, তাহাই তাঁহার কলানৈপুণ্যে সুন্দর হইয়া চিত্রে ফুটিয়া উঠে। কলানৈপুণ্যকে বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি দেখা যায়, ইহার ভিতরে এক দিকে আছে বিশেষ কতকগুলি রং-এর প্রতি শিল্পীর আকর্ষণ এবং আর এক দিকে আছে, তুলিকার

সাহায্যে সেই রং সমাবেশের আনন্দ। উক্ত রংগুলি তিনি এই জন্য পছন্দ করেন যে, উহাদের সাহায্যে তিনি নিজের ভাবকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন। যখন প্রচলিত রং তাঁহার ভাবপ্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তখন তিনি বিভিন্ন রং মিশ্রণ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত 'এফেক্ট' সৃষ্ট হবার চেষ্টা করেন। এই ভাবে বহু নূতন নূতন রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া প্রয়োজন মত তিনি গাঢ় কিংবা তরল রং ব্যবহার করেন। তারপর তুলিকা-চালনাতেও এমনই একটা বৈশিষ্ট্য থাকে, অর্থাৎ ভাবপ্রকাশের জন্য কি রকম তুলিকার প্রয়োজন এবং তাহার টান কি রকম হওয়া দরকার, সে বিষয়েও তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি থাকে এবং বিশেষ পরীক্ষার পর তিনি উপযুক্ত তুলিকা নির্ব্বাচন করেন ও নিজের উদ্ভাবিত টান আয়ত্ত করেন। একটু লক্ষ্য করিলে যে-কোন চিত্রে শিল্পীর প্রিয় রং ও তুলিকার বিশেষ টান পরিলক্ষিত হয়। এই কলানৈপুণ্যের সহিত পরিচিত না হইলে চিত্রের রসোপলব্ধি অনেক সময় সম্ভব হয় না।

শরীররক্ষিণীর প্রাতরভিবাদন গ্রহণে চন্দ্রগুপ্ত (ইণ্ডিয়া হাউসের একখানি চিত্র)। শ্রীসুধাংশু চৌধুরী।

দর্শনধারা তিনটি ও কলা

নৈপুণ্যের দিক্ হইতে যে শিল্পী পরিপূর্ণতা লাভ করেন, তিনি চিত্রকলার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকেন। এই রকম শিল্পীর সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের আবির্ভাব আকস্মিক, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ এইরূপ প্রতিভাশালী শিল্পী দেখা না দিলে চিত্রকলা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। একটি উদাহরণ হইতেই আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট হইবে। ইউরোপে কালগত দর্শনধারা যখন সুদীর্ঘ ছয় শতাব্দীব্যাপী 'বাইজানটাইন্ আর্টের' ধরা-বাঁধা নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তখন সেই নিশ্চল দর্শনভঙ্গীকে সচল করিয়া তোলেন জোত্ত। সে যুগে সেণ্ট ফ্রান্সিস যেমন ইতালীয়ানদের ভাস্কর্য্যের জগতে একটি পরিবর্ত্তন আনিয়া দেন, তেমনি তাঁও চিত্রকলার জগতে একটি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিয়াছিলেন। সেণ্ট ফ্রান্সিসের জীবনী হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া তিনি 'বাইজানটাইন্ ট্র্যাডিশনের' নিগড় হইতে মুক্তি লাভ করেন এবং চিত্রকলার নূতন পথের ইঙ্গিত দেন। তাঁহার পরে রিনেসাঁসের যে অপূর্ব্ব বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে, তাহার পশ্চাতেও ছিলেন এমনই কয়েকজন প্রতিভাশালী শিল্পী। কেবলমাত্র ইতালীতে নহে, সকল দেশের চিত্রকলায় নব নব আন্দোলন সম্ভব হইয়াছে এক এক জন বিরাট শিল্পীর আবির্ভাবে।

চিত্রকলার এরূপ একটি আন্দোলন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন আন্দোলনই দেশকালের প্রভাব এবং শিল্পীর ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে বর্জ্জন করিতে পারে নাই। চিত্রকলার আন্দোলনের উদ্দেশ্য গতানুগতিক আদর্শ, অঙ্কনপদ্ধতি ইত্যাদি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, নূতন আদর্শ, নূতন অঙ্কনপদ্ধতি অবলম্বন করা, যাহার ফলে চিত্রকলা সজীব ও বিচিত্র হইতে পারে। তাই প্রত্যেক আন্দোলনেই নূতন আদর্শ ও নূতন অঙ্কনপদ্ধতি প্রভৃতি দেখা দেয়। কিন্তু কোন আন্দোলন দেশ-কালের প্রভাব

এবং শিল্পীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ব্যতীত সম্ভব হয় না। কারণ, চিত্রকলার মূলে থাকেন শিল্পী ; তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য এবং দেশ-কালের প্রভাব কি ভাবে বর্জ্জন করিবেন ? সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশগত বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতে পারে, কিন্তু শিল্পী চিরকাল থাকিবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দিকে আমাদের দৃষ্টি ধাবিত হইবে। বর্ত্তমান যুগে শিল্পীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার কারণও আছে।

প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান যুগে নিছক বস্তুর রূপ ফুটাইয়া তোলা সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন ক্যানভাসের উপর প্রকৃতির ছবি কি ভাবে আঁকা যাইতে পারে, তাহা লইয়া কোন শিল্পী সন্তুষ্ট থাকিতে চাহিতেছেন না। তাই দৃশ্যমান জগতের প্রতিচ্ছবি আঁকিবার পরিবর্ত্তে আপনাকে প্রকাশের পক্ষে তাঁহার কোন বাধাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে লোক বা সম্প্রদায়বিশেষের অভিরুচি ও নির্দ্দেশ অনুসারে ছবি আঁকিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে চিত্রকলাকে ধর্ম্ম বা জাতীয় আন্দোলনের প্রোপাগাণ্ডার দিক দিয়ে নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করিতে বাধ্য করা হয় না। আগে তাহা করা হইত। তাই পৃষ্ঠপোষক ও জনসাধারণের দাবী মিটাইবার জন্য গ্রীক ভাস্করকে দৈহিক সৌন্দর্য্য ফুটাইবার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইত। খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম যুগ হইতে 'হাই রিনেসান্স' পর্য্যন্ত শিল্পী-সম্প্রদায়ের উপরে ধর্ম্ম-প্রচারকদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যের সকল বিষয়বস্তুই ধর্ম্ম-সম্পর্কীয়। মোগল ও রাজপুত চিত্রে সম্রাট্ এবং রাজাদের প্রভাব কতখানি ছিল, তাহা সকলেই জানেন। এ রকম ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারিত না।

কিন্তু এখন শিল্পীর উপরে সে প্রভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। তাই এ-যুগের শিল্পী চিত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশের অধিকতর সুযোগ লাভ করিয়াছেন। এখন অন্যের নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাদের চলিতে হয় না। ইহাতে সুবিধা এবং অসুবিধা দুই-ই আছে। আগে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই শিল্পীর অর্থের অভাব দূর হইত ; বর্ত্তমানে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী চিত্রাঙ্কন করিয়া তাঁহারা আনন্দ লাভ করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু অর্থলাভের জন্য এমন রসজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদে[র] খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, যাঁহারা অর্থের অভাব পূ[রণ] করিতে পারেন। এই জাতীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টি আক[র্ষণ] করিবার নিমিত্ত চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে হয়। চিত্রের ক্রেতাও নূতন দৃষ্টিতে শিল্পী ও চিত্রকলাকে দেখি[তে] আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা শিল্পীকে বলেন না, 'লা[স্ট] জাজমেণ্ট' অথবা তাঁহাদের নিজেদেরই মহত্ত্ব-বিষয়ক ছ[বি] আঁকিয়া দিতে হইবে। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা চিত্র বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিকাসো কিংবা সেজা[নে]র কোন ছবি আছে কি না। চিত্রের বিষয়বস্তু হইতে শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অবশ্য কমার্শিয়াল আর্ট এবং বর্ত্তমান রুশিয়া, ইতালী ও জার্ম্মানীর চিত্রকলার কথা স্বতন্ত্র।

চিত্রকলার এই ধারা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে চিত্র-সমালোচনার ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাস্তবের সহিত চিত্রের সাদৃশ্য আছে কি না, তাহার উপরে চিত্রে[র] রসোপলব্ধি নির্ভর করে না। এখন চিত্র সম্পর্কে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন ; এক হইতেছে শিল্পীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়, কোন বস্তু সম্পর্কে শিল্পী[র] সৌন্দর্য্যানুভূতি। এই সৌন্দর্য্যানুভূতি অনুসারে শি[ল্পী] যখন ছবি আঁকেন, তখন অঙ্কিত বস্তুর সহিত প্রকৃত বস্তুটি[র] হয়ত কোন সাদৃশ্যই থাকে না। তাহার ফলে সাধা[রণ] ব্যক্তির নিকট চিত্রের বস্তুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত বলিয়া ম[নে] হয়। সুতরাং উহা হইতে রসোপলব্ধি করা তাহার প[ক্ষে] সম্ভব হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ সেজান অঙ্কিত তিনটি আপেলের ছবির উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত ছবি[র] আপেলের সহিত বাস্তব আপেলের কোন সাদৃশ্যই নাই সুতরাং ছবিখানির রসোপলব্ধি করা সাধারণ লোকের প[ক্ষে] কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেজানের ভক্তগ[ণ] বলেন, বাস্তব আপেলের সহিত ছবির আপেলের কো[ন] সাদৃশ্য না-ই বা থাকুক, তাহাতে ক্ষতি কি! ছবিতে র[ং]-এর যে-চাতুর্য্য আছে, তাহার কি কোন মূল্যই নাই ? এ[ই]

জাতীয় ছবি দেখিয়া কি মনে হয় না, 'pictures notously mad with the Sun' ?

যাই হোক্, এ-সকল ছবির রসোপলব্ধি করিতে হইলে, অঙ্কিত বস্তুগুলিকে শিল্পীর সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রতীক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব হইবে কি না বলা যায় না। তবে এ-কথা সত্য যে, সাধারণ লোক উক্ত প্রতীকগুলি আয়ত্ত করিতে পারে নাই বলিয়াই বর্ত্তমান যুগের শিল্পীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শুনা যায়। হয়ত নূতন শিল্পী-সম্প্রদায় বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিন্তু সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই।

এবার ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। ৩০ বৎসরের ভিতরে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা সকলের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার মাঝে এই নব্য ভারতীয় চিত্রকলার যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা কেবল ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের অভ্যন্তর সুশোভিত করিবার জন্য কোন ভারতীয় শিল্পীকে আহ্বান করা হয় নাই। তাহার পরে কয় বৎসরই বা কাটিয়াছে, অথচ ইহার মধ্যে নব্য ভারতীয় চিত্রকলা সকলকে জয় করিয়াছে। তাই ইণ্ডিয়া হাউসের 'ফ্রেস্কো' আঁকিবার জন্য ভারতীয় শিল্পীকে আহ্বান করা হইয়াছিল। এবং অন্য ব্যাপারেও ভারতীয় শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হইতেছে।

একটি দৃশ্য। [সেজান (১৮৩৯-১৮৯২)]

এই আন্দোলনের প্রথম এবং প্রধান উদ্যোক্তা হইতেছেন শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বাঙ্গলা দেশই ইহার আদি কেন্দ্র। পরে বাঙ্গলা হইতে এই আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার সহিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একটি যোগ আছে। কেন না, ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার বহু উপাদান—অর্থাৎ ভারতীয় প্রাচীন দর্শনধারার উপর নির্ভর করিয়াই এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তাই ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার বিরুদ্ধে অবাস্তবতার যে অভিযোগ রহিয়াছে, তাহা নব্য ভারতীয় চিত্রকলার বিরুদ্ধেও আনা হয়। পূর্ব্ব আলোচনা অনুযায়ী বিচার করিলে, এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহার পরেও সাধারণ লোকের মনে নব্য ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে কতকগুলি সন্দেহ থাকিয়া যায়।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্রকলার যে ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব অল্পবিস্তর অনেকের উপরেই দেখা যায়। ইহা অসঙ্গতও নয়। কারণ, তাঁহার নিকট শিক্ষার ফলে যাঁহারা দক্ষতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষকতা করিতেছেন। সুতরাং শিল্পী-গুরুর প্রভাব বহু শিল্পী কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে এ প্রভাবের দরুণ কাহারও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইতে

পারে না। কিন্তু দুই চারজন শিল্পী তাঁহাদের অনুকরণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়, ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হইয়াছে। এইরূপ অনুকরণ চিত্রকলার উন্নতির অন্তরায় সন্দেহ নাই। আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, কেবল ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের মূল বিষয়কে অবলম্বন করিয়া আজও যদি ছবি আঁকিতে হয়, তাহা হইলে শিল্পীর বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। আধ্যাত্মিক বা পৌরাণিক বিষয়কে একেবারে বর্জ্জন করিতে বলি না, নূতন দৃষ্টিতে উক্ত বিষয়গুলিকে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু কাল এবং জীবনযাত্রা পরিবর্ত্তনের ফলে যে সকল বস্তুর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে, নব্য চিত্রকলায় তাহার কতগুলির সন্ধান পাওয়া যায়? তাহা ছাড়া, জনকয়েক শিল্পীর বিরুদ্ধে এই কথা শুনা যায় যে, তাঁহারা একান্তভাবে ইউরোপীয় প্রভাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইউরোপীয় চিত্রকলা হইতে শিক্ষা করিবার বহু বিষয় আছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, কিন্তু তাই বলিয়া ভিন্ন দেশীয় চিত্রকলার অন্ধ অনুকরণ দেশের চিত্রকলার সজীবতাকে ধ্বংস করে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত সন্দেহগুলি সত্য নাও হইতে পারে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে যে সকল সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে, নব্য আন্দোলনের সচেতন ব্যাখ্যা প্রায় নাই বলিলেও চলে। শিল্পী-রসজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট হইতে নব্য ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শ, অঙ্কনপদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা না জানা পর্য্যন্ত সাধারণ দর্শকের সংশয় দূর হইবে না। তাহার ফলে বহু উঁচুদরের ছবিও অনাদৃত থাকিবে। প্রত্যেক দেশেই চিত্রকলার যে কোন আন্দোলন সুরু হইলে, তাহার উদ্দেশ্য, অঙ্কনপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা প্রকার ব্যাখ্যা এবং সমালোচনা প্রকাশিত হয়, যাহার ফলে সাধারণ লোকের পক্ষে রসোপলব্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু এ দেশে সে রকম কয়টি ব্যাখ্যা বা সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে?

অমৃতের পুত্র তুমি

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চেয়ে দেখ ভস্ম মাখি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগে শিব,
ভারতের ভাগ্যাকাশে অন্ধকার ঘনীভূত রহে।
অভিশপ্ত স্বদেশের নির্ব্বাপিত মঙ্গল-প্রদীপ,
জীবনের মসীকৃষ্ণ সিন্ধুতটে ঘূর্ণীবাত্যা বহে।
আনন্দের লেশমাত্র নাহি বন্ধু আমাদের প্রাণে,
তবু চাহি আনন্দেরে। বিষাদের বিষাক্ত বাতাসে
তাহারে লভিতে হবে, শোকতপ্ত এ বঙ্গ শ্মশানে
শবের সাধন-গীত গাহি এস পিশাচের পাশে।

লহ বজ্র বক্ষ পাতি, বহ্নি শিখা কর আলিঙ্গন,
এই তো আনন্দ বন্ধু। মরণেরে কর উপহাস,
উল্কাপাত হক বিশ্বে, ভেঙে যাক ক্লীবের স্বপন,
চূর্ণ হক শতাব্দীর অহঙ্কার—বাসনা-বিলাস।
নটরাজ নৃত্যছন্দে ভেঙে যাক ভাবুকের ধ্যান,
রণলুব্ধ মানবের মর্ম্মে আনি তীব্র হাহাকার—
এই তো আনন্দ বন্ধু, এস করি কালের কল্যাণ,
মেদিনী উঠিবে কাঁপি, ধূমকেতু উদিবে আবার।

স্বস্তিকের চিহ্ন দাও শোণিতের লালিমার সাথে,
দুর্ভাগ্যের দ্বারপথে এস বন্ধু দুর্ভিক্ষের সাথী।
রক্তজবা আন তুলে শুচিস্মিত শারদ-প্রভাতে,
শক্তিপূজা করি এস বোধনের নবঘট পাতি।
চণ্ডালের চর্ম্মাসনে পূজারীর দাও আজি ঠাঁই,
কঙ্কালের বেদী ’পরে জননীর হক আরাধন।
কন্থাপরা দুঃখক্লিষ্ট পল্লীবধূ এ মন্দিরে চাই,
বরণ করিবে দেবী যুগশঙ্খ করি’ আবাহন।

রক্তচন্দনের ফোঁটা অভাগ্যের তপ্ত অশ্রু দিয়া
এস বন্ধু পরি এবে। উৎসবের উপচার-ডালি
সাজাও কুসুম-অর্ঘ্যে, নববস্ত্রে মাঙ্গল্য রচিয়া
আনন্দময়ীর পূজা করি এস পুণ্য দীপ জ্বালি।
বাড়ব বহ্নির মত জাগো ভাই ভিখারী-মানব,
মলিন বদনে কেন চেয়ে আছ ঐশ্বর্য্যের দ্বারে!
অমৃতের পুত্র তুমি। আপনারে ভাবিও না শব
জাগাও উৎসব দিনে তোমাদের অখণ্ড সম্ভারে।
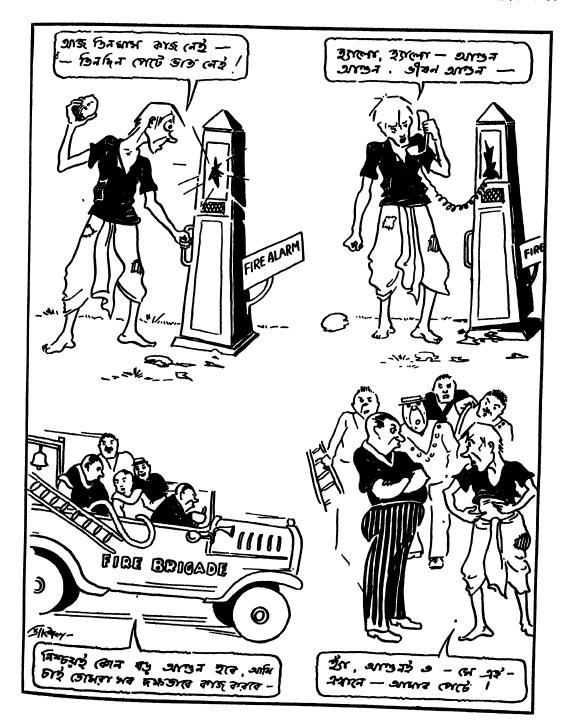
আজ তিনমাস কাজ নেই —
— তিনদিন পেটে ভাত নেই !
হ্যালো, হ্যালো — আগুন
আগুন . ভীষণ আগুন —
FIRE ALARM
FIRE BRIGADE
নিশ্চয়ই কোন বড় আগুন হবে, আমি
চাই তোমরা সব দক্ষভাবে কাজ করবে —
হ্যাঁ, আগুনই ত — যে এই —
এখানে — আমার পেটে !

অদৃশ্য বহ্নি

ভারতীয় ও গ্রীক্ নাট্যকলা

— শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন সভ্যজাতির মধ্যে কেবলমাত্র প্রাচীন গ্রীকগণের ও ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যেই নাট্যকলার উদ্ভব হয়েছিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুচারু নাট্যাভিনয়ের জন্য নানা উন্নত চারু-শিল্পের একাধারে সমাবেশের প্রয়োজন হয়,—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, নৃত্য, সঙ্গীত, বেশবিন্যাস-কৌশল, মাল্যরচনা, অলঙ্কাররচনা, গন্ধোপজীবীর সুগন্ধ সৃষ্টি, মনোবিজ্ঞানে নাট্যকারের গভীর অধিকার ও অভিনেতৃগণের অভিনয়-দক্ষতা। এই দুই জাতির মধ্যেই এতগুলি শিল্পের একাধারে উন্নতি হয়েছিল। ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারা যায়, এই সকল শিল্পে প্রাচীন ভারত উন্নতির কিরূপ উচ্চশীর্ষে উঠেছিল। ভরতের নাট্যশাস্ত্র কেবল নাট্যকারকে নাট্য-রচনার উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত নয়, নাট্যাভিনয়ে যতগুলি শিল্পীর সহায়তার প্রয়োজন, এতে তাদের সকলের উপযোগী উপদেশ আছে,—যে স্থপতি রঙ্গগৃহ নির্ম্মাণ করেন, যে সূত্রধর রঙ্গালয়ের আসবাব প্রস্তুত করেন, যে শিল্পিগণ কুশীলবদের বেশভূষা, রত্নাভরণ, গন্ধমাল্য রচনা করেন, যে চিত্রকর দৃশ্য-পট অঙ্কিত করেন, নৃত্যাচার্য্য, নর্ত্তক-নর্ত্তকী, নট-নটী সকলেই ভরতের গ্রন্থ থেকে সাহায্য পেত। এই সকল শিল্পের অনু-শীলন এরূপ নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদিত হত যে, প্রয়োগকালে তাতে শিক্ষা বা শ্রমের লেশমাত্র দেখা যেত না। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে মন্দিরগাত্রে কয়েকটি নর্ত্তকীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে, নৃত্যারম্ভের সলজ্জ ভাব থেকে নৃত্যাবসানের মত্ততা পর্য্যন্ত। এদের হাত-পা, চোখ, ভুরু প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সে সকল ভরতের অনুশাসন অনুযায়ী নির্দ্দোষ হয়েছে। কিন্তু এই সকল ভঙ্গী এমনই সহজ ও সাবলীল যে দেখলে মনে হয়, সেগুলি নৃত্যচ্ছন্দে আপনা আপনিই ফুটে উঠেছে। ভারতের প্রাচীন নাটকে এমনই একটা সহজ স্বাভাবিকতা, মৃদু শালীনতা, সুসঙ্গত সৌষ্ঠব আছে ও মনোরম কাব্যালোকের রশ্মিপাত হয়েছে যে, কোন জাতি সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে আরোহণ না করলে তা সম্ভব বোধ হয় না। ভারতীয় নাট্য আরম্ভ হয় দেব-বন্দনায় ও পরিসমাপ্ত হয় স্বস্তিবাচনে। এরূপ নৈপুণ্যের সহিত পাত্র প্রবেশ ও পাত্র নির্গম করান হয়, যেন দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে নাট্য-বর্ণিত জীবনের পার্থক্য নয়নের অন্তরালেই থেকে যায়। প্রয়োগদক্ষ ভারতীয় নাট্যাচার্য্যগণ বুঝতেন যে, প্রয়োগকালে শিক্ষা ও শ্রম প্রচ্ছন্ন রাখাই প্রয়োগবিদের নৈপুণ্য।

প্রাচীন গ্রীকগণ নাট্যরচনায় প্রধানতঃ তিনটি রস ব্যবহার করতেন,—ট্র্যাজেডিতে করুণ ও ভয়ানক রস (pity and terror) ও কমেডিতে হাস্যরস। গ্রীক করুণ রস কিন্তু উপর্য্যুপরি দৈবদুর্ব্বিপাকে মানুষের দুর্দ্দশায় শোক মাত্র, তা ভরতের বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের অপরিসীম কমনীয়তায় মণ্ডিত নয়। এই দুই রস পরিবেশনে কিন্তু গ্রীক নাট্যকার কোন কৃপণতা করতেন না,—তিনি শ্রোতার মনকে এরূপ নিবিড় দুঃখ ও ভয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে তুলে দিতেন যে, তা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠত। এর হেতুও সহজেই বোঝা যায়। গ্রীক নাটকগুলি অভিনীত হত আথেন্সের প্রাকৃত লোকের সমক্ষে, উন্মুক্ত আকাশতলে। একই দৃশ্যের মধ্যে নাটকের সমুদয় কার্য্য শেষ করতে হত। পট-পরিবর্ত্তনে ও বেশ পরিবর্ত্তনে রসটি জমে উঠবার সুযোগ পেত না। আর এই শ্রোতৃবর্গের বিচারের উপর নাট্যকারের পারিতোষিক নির্ভর করত। প্রাকৃত মন স্বভাবতই স্থূল, সূক্ষ্ম ভাবরাশি গ্রহণ করতে অক্ষম, নাট্য-রচনা বা অভিনয়ের সূক্ষ্ম কলাকৌশল বড় তাদের দৃষ্টিপথে পড়ে না। সে জন্য গ্রীক নাট্যকারকে এরূপ গাঢ় রস পরিবেশন করতে হত, শ্রোতৃবর্গের মনকে এরূপভাবে আলোড়িত করতে হত, যাতে তাদের রসোপলব্ধি হয়। প্রাচীন ভারতে নাটক অভিনীত হত, মার্জ্জিত-রুচি রাজপুরুষ ও বুধমণ্ডলীর সমক্ষে কিংবা পূতচরিত নির্ম্মলান্তঃ-করণ ভক্তগণের সমক্ষে দেবায়তনে। সে জন্য ভারতীয় নাট্যকারের পরিবেশিত রস শ্রোতৃবর্গের মনকে এরূপ বিপুল বেগে আলোড়িত করত না, তা' হৃদ্যতায়, মাধুর্য্যে অধিক উপাদেয়। কিন্তু গ্রীক কমেডির হাস্যরস ভারতীয় হাস্যরসের

চেয়ে সমধিক মনোজ্ঞ। ভারতে কেবল শৃঙ্গারাত্মকাবকেই হাস্যরস বলা হত, ও তা-ই ভারতীয় প্রহসনের উপজীব্য। সাধারণ মানুষের বাক্যে ও কার্য্যে, চেষ্টায় ও সাফল্যে অদ্ভুত অসঙ্গতিই হাস্যরসের প্রধান উপাদান, গ্রীক কমেডি-প্রণেতৃগণ এ কথা বিলক্ষণ বুঝতেন। এই অসঙ্গতি সাময়িক ঘটনায় প্রকট করে তুললে অধিক উপভোগ্য হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, সে জন্য অধিকাংশ গ্রীক কমেডিই সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত। গ্রীক কমেডি-প্রণেতৃগণ সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায় আতুর চিরন্তন মানবের মনটিকে স্পর্শ করতে পারতেন,—এই ছিল তাঁদের কৃতিত্ব। এই জন্য গ্রীক কমেডি আজও আমাদিগকে আনন্দ দান করে

কিন্তু যে রসসম্ভার অবলম্বনে ভারতীয় নাট্যকলা রচিত,তা' গ্রীক অপেক্ষা সুসমৃদ্ধ। ভারতীয় নাট্যকার করুণ, ভয়ানক ও হাস্যরস প্রয়োগ ত করতেনই, অধিকন্তু এমন কতকগুলি রস প্রয়োগ করতেন, যাদের জীবন, বৈচিত্র্য ও উপাদেয়তা এগুলি অপেক্ষা অনেক অধিক।—সকল রসের শ্রেষ্ঠ শৃঙ্গাররস বা আদিরস ভারতীয় নাট্যকারের ব্যবহার-নৈপুণ্যে বহু বিচিত্র আনন্দের উৎস হয়ে আছে। এই রসের বিশ্লেষণ যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ভারতে হয়েছে, এ রূপ আর কোথাও হয় নাই, আর এ রস যে মানব-মনের কত গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে, তা ভারতীয়ের মত কোন জাতিই বুঝে নাই। শৃঙ্গাররস ও করুণরসের পরই উপাদেয়তা ও ব্যাপকতায় বীররসের স্থান। ভারতীয় নাট্যকার ও আলঙ্কারিকগণ বীররসকে সাবধানে রৌদ্ররস থেকে পৃথক্ করে বর্ণনা করেছেন ও ব্যবহার করেছেন। বীররসের কেন্দ্রস্থ স্থায়ীভাব উৎসাহ আর রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব ক্রোধ। এই পার্থক্য থেকেই বোঝা যায়, কেন বীররস নাটকের প্রধান উপজীব্য রসরূপে গৃহীত হতে পারে, রৌদ্ররস পারে না,—বীররস দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে, ক্রোধমূলক রৌদ্ররসের জীবন অতি অল্প। রৌদ্ররসকে অযথা প্রসারিত করলে, তা অতি সুলভ উপহাসের সামগ্রী হয়ে পড়ে। রৌদ্ররসের মতই স্বল্পপ্রাণ কিন্তু অতি মনোহর রস অদ্ভুতরস। এর প্রভাবে মানুষের মন অতি অপ্রত্যাশিত আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠে। ভারতীয় নাট্যকারগণ এই রস উপযুক্ত মাত্রায় সর্ব্বত্র প্রয়োগ করেছেন; বীভৎস রসে মানুষের মন জুগুপ্সায় সঙ্কুচিত হয়, অমেধ্য বস্তুর দর্শনে ও স্পর্শে ঘৃণায় শিউরে উঠে। একেও নাটকীয় রসের মধ্যে, উপভোগ্য বস্তুর মধ্যে গণনা করা ভারতীয় নাট্যকারগণের অল্প কৃতিত্ব নয়। এই প্রধান আটটি রস ব্যতীত আরও দুটি মনোহর রস ভারতীয় নাট্যে ব্যবহৃত হয়, শান্তরস ও বাৎসল্যরস। এ দুইটি মাধুর্য্যে অতীব মনোহর হলেও এতে বৈচিত্র্য বড় অল্প, সে জন্য এগুলিকে নাটকের প্রধান উপজীব্য রসভাবে ব্যবহার করলে, নাটক অনেকটা একঘেয়ে বোধ হয়। সে জন্য অতি অল্পসংখ্যক নাটকেই এগুলিকে প্রধান রস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নিপুণ হস্তে এগুলিও যে উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে, শান্তরসাত্মক "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" তার দৃষ্টান্ত। এই দুটি রস এত অল্প ব্যবহার হবার আরও একটি নিগূঢ় কারণ আছে। ভারতীয় নাটকে একটি রস প্রধান হলেও তাকে রীতিমত বিকশিত করে তুলতে অন্যান্য রস অল্পাধিক পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়। অধিকাংশ স্থলেই এই অল্প-ব্যবহৃত গৌণরসগুলি সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের আকারেই থাকে, কচিৎ কখনও সম্পূর্ণ রসে পরিণত হয়। ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ কোন্ রসের সহিত কোন্ রস ব্যবহৃত হতে পারে এবং কোন্ রসের সহিত কোন্ রসের বিরোধ, তা নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। শান্ত ও বাৎসল্যরসের অসুবিধা এই যে, সে-দুটি মানুষের মনকে এমনই তন্ময় করে দেয়, এমনই সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করে বসে যে, তাদের সহিত অন্য কোন রসই একত্র টিকে থাকতে পারে না। শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রণয় ব্যাপার কণ্বমুনির শান্তরসাস্পদ তপোবনে সংঘটিত করে কালিদাসকে বড়ই সাবধানে সংযমের সহিত লেখনী চালনা করতে হয়েছে। তবুও মনে হয়, যেন শান্তরসই প্রধান হয়ে পড়েছে, এই সুন্দর প্রণয়কাহিনীট যেন সঙ্গোপনে কাণে কাণে বলা হয়ে গেল; শকুন্তলার স্বামীগৃহে গমনের সঙ্গে সঙ্গেই কণ্বমুণি, বৃদ্ধা গোতমী, উদ্ধত শার্ঙ্গরব, প্রিয় সখী প্রিয়ংবদা ও সুষমাময়ী অনসূয়া বনতোষিণীর সহিত গভীর তপস্যায় পুনরায় নিমগ্ন হয়ে গেল। এই কালিদাসের হাতেই কীর্ত্তি বিক্রমোর্ব্বশীতে পুরূরবার উচ্ছ্বসিত প্রণয়-নিবেদন ও উন্মত্ত বিরহব্যথা স্মরণ করলেই বোঝা যাবে, শান্তরসের বিন্দুমাত্র স্পর্শে বিপুল আবেগপূর্ণ প্রাণবন্ত শৃঙ্গাররস বর্ণনাতেও কবিকে কত সংযত হতে হয়েছে।

একটি প্রধান রসকে ফুটিয়ে তুলতে অন্যান্য সহায়ক রসের উপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার ভারতীয় নাট্যপ্রতিভার একটি চমৎকার বিশেষত্ব। গ্রীক নাট্যকার এ কথা ভাবতেও পারত না। বাঙ্গালীরা যেমন একই ব্যঞ্জনে নানা আস্বাদের নানা ভোজ্যবস্তু ব্যবহার করে ও একই ব্যঞ্জনকে দুই তিনবার বন্ধন করে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোক এ কথা ভাবতেও পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে, ভারতীয় নাট্যকারের এত যত্নে প্রস্তুত রসে কিন্তু গ্রীক নাট্যকারের পরিবেশিত রসের তীক্ষ্ণ তীব্রতা নেই। গ্রীক নাট্যকার যে আনন্দের বন্যা আনেন, তা যেন মুহুর্মুহু বেদনার বেলাভূমিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। ভারতীয় নাট্যকার যে আনন্দ দেন, তাতে মধ্যে মধ্যে ক্রোধ-ঘৃণার ঘোর রব থাকলেও, তা যেন রবিকরোদ্ভাসিত চঞ্চল তরঙ্গের লীলা। এই দুই দেশে শ্রোতৃবর্গের বিভিন্নতা ব্যতীত এর আর একটি নিগূঢ় কারণ আছে। দুই জাতি মানুষের জীবনকে, মানুষের ভাগ্যকে দুই বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। গ্রীকগণ মনে করতেন যে, মানুষ কখনও তার অদৃষ্টে সন্তুষ্ট নয়, যে অসন্তোষ তাকে নিয়তই উন্নতির দিকে, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছে তা দৈবপ্রেরিত, অপার্থিব। কিন্তু মানুষ কখনও অবিমিশ্র সুখ ভোগ করতে পারে না, কারণ দেবতারা ঈর্ষাপরায়ণ; রহস্যময় অবগুণ্ঠনে আবৃত ভাগ্যদেবীগণ অদৃশ্য মেঘের মত মানুষের জীবনাকাশে ঘুরতে ঘুরতে অতর্কিতে তার আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলিকে অন্ধকার করে দেন। ভারতীয় আর্য্যগণও অদৃষ্টে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু তাঁদের চোখে গ্রীকদের মত ভাগ্যদেবী কামচারী, চপলপ্রকৃতি, রহস্যময়ী নন। তাঁদের চোখে অদৃষ্ট কেবলমাত্র মানুষের সঞ্চিত কর্ম্মের ফল, তার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনার নামরূপে বহির্বিকাশ মাত্র। এই সকল ফল মানুষকে ভুগতে হবেই, কারুর সাধ্য নেই যে এ সকল অতিক্রম করে। ভারতীয় আর্য্যগণ জীবনকে উন্মত্ত উল্লাস ও গভীর অবসাদের লীলাভূমি বা আকস্মিক অন্ধ ঘটনার সংঘর্ষের ফল বলে বিবেচনা করতেন না। তাঁদের চোখে, জীবন সুসংবদ্ধ সুনির্দ্দিষ্ট বস্তু, এর প্রতিঘটনাই মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্মের বা বাসনার ফল, মানুষের মনের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি। মানুষ যা বাসনা করে, সর্ব্বান্তঃকরণে যার সাধনা করে, জীবনে তাই লাভ করে।

ভারতীয় আর্য্যগণ মানুষ যা কিছু চায়, মানুষের যত কিছু কাম্য আছে, তা'কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ও সেগুলির নাম দিয়েছেন চতুর্ব্বর্গ,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়, প্রণালী ও ফল আলোচনা করেছেন চারিটি বিভিন্ন শাস্ত্রে,—ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। এগুলির অধিকাংশই ত্রিকালজ্ঞ ঋষি বা মহাপুরুষ প্রণীত ও বহুকাল ধরে শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ এগুলির আলোচনা করেছেন ও তাঁদের গভীর চিন্তারাশি লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছেন। এর মধ্যে যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করতে গেলে ভারতীয় মনীষার অতুলনীয় প্রভাব, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিকসুলভ নিরপেক্ষতা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে থাকতে হয়। কোথাও চপলতা নেই, বৃথা বাগাড়ম্বর নেই, পাণ্ডিত্য-প্রকাশের প্রয়াস নেই, বিষয়বস্তু ধীরে, শান্ত ভাবে, উপযুক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত আলোচিত হয়েছে ও সুবিন্যস্ত হয়েছে।

এ কথাও ভারতীয় আর্য্যগণের দৃষ্টি এড়ায় নাই যে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, অভিজ্ঞতা সঞ্চারের সহিত, মানুষের মনের পরিবর্ত্তন হয়। যৌবনে যা ভাল লাগত, প্রৌঢ় বয়সে আর তা ভাল লাগে না। বাল্যে যা আনন্দ দিত, বার্দ্ধক্যে তাতে হাসির উদ্রেক হয় মাত্র। সে জন্য তাঁরা আর্য্যগণের জীবনকেও চারিটি আশ্রমে বিভক্ত করেছিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি। প্রতি আশ্রমের উপযোগী জীবনযাত্রার প্রণালীও নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। জীবনের সমস্ত আনন্দ, বিষাদ, সফলতা ও নিষ্ফলতার ভিতর আর্য্যগণ জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখতেন।

ভারতীয় নাট্যকারগণ মানুষের জীবনকে যেরূপ ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতেন ও স্থির বুদ্ধির সহিত মানবচিত্তের বৃত্তি সকলের বিশ্লেষণ করতেন, তাতে তাঁদের প্রকৃতির এক অপূর্ব্ব প্রসন্নতা ও স্বভাবের সমতা সূচিত হয়। এইরূপ প্রকৃতি গ্রীকগণের ছিল না। ভারতীয় আর্য্যচিত্তের এই গুণ তাঁদের নাটকেও প্রতিফলিত হয়েছে। ভারতীয় নাটক এই জন্যই এত সূক্ষ্ম ভাবরাশির প্রকাশক, সূক্ষ্ম শিল্প-নৈপুণ্যে সুসমৃদ্ধ। অবশ্য ভারতে আর্য্য-প্রতিভার অধোগতির সময় নাট্যরচনার নানা খুঁটিনাটি বিধি রচিত হয়েছিল। কিন্তু কোন সাহিত্য বিচার করতে গেলে, তাতে যা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তা দিয়েই বিচার করতে হয়। আর এ হিসাবে যে-প্রতিভা শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিকের মত নাটক দিয়েছে, তা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার সহিত আসন পাবার যোগ্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বাঙলার আধুনিক কাল্‌চার

—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী আমাকে বলেন যে, 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক বাঙলার culture সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছেন এবং সেই সূত্রে বন্ধুবর আমাকেও একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেন।

এরূপ প্রবন্ধ লেখবার অর্থাৎ নিজের মতামত ব্যক্ত করবার গোড়াতেই বাধা এই যে, বাঙলায় এমন কোন শব্দ নেই, যা culture অর্থে ব্যবহার করা যায়।

শুনতে পাই, আজকাল কেউ কেউ culture-এর বাঙলা 'কৃষ্টি' শব্দ সৃষ্টি করেছেন। আমি ও শব্দ ব্যবহার করতে ইতস্তত: করি। কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে আমি ও-শব্দের সাক্ষাৎ লাভ করি নি। অবশ্য আমার সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান সামান্য। সুতরাং কৃষ্টি শব্দ যে বেদে অথবা বার্ত্তাশাস্ত্রে নেই, এমন কথা আমি বলতে চাই নে। তবে কৃষ্টি শব্দটা আমার কাণে খট করে লাগে। আমাদের ভাষায় অবশ্য অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ আমদানী করতে হবে, কিন্তু নির্বিচারে নয়। আমাদের কাণ ও মন দুই সজাগ রাখতে হবে, যাতে করে সংস্কৃত শব্দ বাঙলা ভাষায় বেখাপ্পা না লাগে। আমি পূর্ব্বে এই সূত্রে বৈদগ্ধ্য শব্দ ব্যবহার করেছি এই বিশ্বাসে যে, বৈদগ্ধ্য culture এর স্থলাভিষিক্ত হলেও হতে পারে। Culture-এর অর্থ যাই হোক—তার কোন সার্থকতা আছে কি না, সে বিষয়েও তর্ক আছে।

Culture লোকের মনের বস্ত্রই হোক আর অন্নই হোক,—বিদ্যার সঙ্গে তার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে আছে, তা সর্ব্বজনবিদিত। আমরা নিরক্ষর লোককে cultured লোক বলি নে, টোলের পণ্ডিতকেও বলি নে। কারণ পাণ্ডিত্য প্রায়ই একবর্গা হয়। বিদ্বান অথচ চোখকাণ-খোলা, এমন ব্যক্তিকেই আমরা বিদগ্ধ পুরুষ বলি।

পাণ্ডিত্য প্রায়ই এক বিষয়েই হয়। কিন্তু বৈদগ্ধ্য নানা বিষয়ের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কস্মিনকালেও লোকপ্রিয় ছিল না। আলঙ্কারিকরা ব্যাকরণাভ্যাসাৎ জড়বুদ্ধি পণ্ডিতদের অসামাজিক বলে বিদ্রূপ করেছেন; এবং স্বয়ং কালিদাস বলেছেন যে "বেদাভ্যাসজড়: কথং নু বিষয় ব্যাবৃত্তকৌতূহল:' পুরা মুনি কখনই উর্ব্বশীর মত মনোহর রূপের নির্ম্মাতা হতে পারেন না।

বৈদগ্ধ্য ওরফে culture গুণটি সামাজিক, শুধু ব্যক্তিগত নয়। Culture যদি মনের অন্ন না হয় ত মনের বস্ত্র ত নিশ্চয়ই। সামাজিক লোকের বস্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। সভ্য সমাজের স্পষ্ট বন্ধন হচ্ছে বসনের বন্ধন। Culture যে মনের পোষাক নয়, এমন কথা আমি বলি নে। তবে তা যে মনের বসন ও ভূষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং culture সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। বর্ত্তমানে বাঙলা দেশে যতটা culture আছে, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে আর কোথায়ও ততটা নেই। এ বিশ্বাস কতক আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ প্রসূত হতে পারে। সত্য কথা বলতে হলে, আমরা যে যত বেশি 'মহাভারত' ভক্ত হই না কেন আমরা কেউই বঙ্গ প্রীতি হতে মুক্ত নই। সে যাই হোক, cultureও আকাশ থেকে পড়ে না, দেশের মাটি থেকেই গড়ে ওঠে, অর্থাৎ তা জাতির অতীত culture-এর উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এখন বাঙলায় প্রাক্‌ বিটিশ যুগের culture সম্বন্ধে বাগ্‌বিস্তার করা নিরাপদ নয়। তা অনেকটা মনগড়া হতে বাধ্য।

আমি এ প্রবন্ধে বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু বলব না। যদিচ কোন দেশেরই culture ধর্ম্মের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। ইউরোপীয় culture আজ পর্য্যন্ত মূলত খৃষ্টান cultures. Renaissance-এর যুগে গ্রীক সাহিত্যের প্রভাবে ইউরোপের মনে নূতন দুয়ার খুলে গিয়েছে, তার অন্তরে নূতন জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি জাগ্রত হয়েছে। এর ফলে সে দেশের সভ্যতার রূপ অবশ্য অনেকটা বদলে গিয়েছে; কিন্তু খৃষ্টান সভ্যতার পাকা ইমারত আজও

দাঁড়িয়ে বসেছে। পরম্পরাগত খৃষ্টানী মনোভাব আজও তাদের দেহেতে শক্তি ও মনে ভক্তি যোগাচ্ছে।

এখন প্রকৃত প্রস্তাবে ফিরে আসা যাক। ইংরেজ এদেশে রাজা হবার পূর্ব্বে বাঙালীর culture কি-জাতের ছিল বলা কঠিন। কিন্তু এর একখানি দলিল আমার চোখে পড়েছে।

ভারতচন্দ্র বড় কবি কি না, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু তিনি যে মহা cultured লোক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি কোন্ কোন্ বিদ্যার চর্চ্চা করেছিলেন, তার ফর্দ্দ তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর নিজের কথা এই—"ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক,

অলঙ্কার, সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক।

পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসি।"

এর থেকে জানা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় জ্ঞানই ছিল culture এর লক্ষণ। এ কালে আমরা সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ লোকদের cultured বলতে ইতস্ততঃ করি।

সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের জ্ঞান আমাদের স্বল্প, আর পারসির পরিবর্ত্তে ইংরেজী ভাষাই হয়েছে একালে আমাদের culture এর প্রধান উপাদান। মুসলমান রাজের পরিবর্ত্তে ইংরেজ রাজের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। এ পরিবর্ত্তনের অর্থ হচ্ছে, সরকারী ভাষা পারসির পরিবর্ত্তে ইংরেজী হওয়া। কিন্তু কেবলমাত্র সেই কারণে ইংরেজী আমাদের culture এর অঙ্গ হত না।

বর্ত্তমানে আমরা সাহিত্যিকই হই আর দার্শনিকই হই, বৈজ্ঞানিকই হই আর পলিটিসিয়ানই হই, আমরা বিলেতি সাহিত্য, বিলেতি দর্শন, বিলেতি বিজ্ঞান ও বিলেতি পলিটিক্সের কাছে অন্ততঃ চৌদ্দ-আনা ঋণী। এ কথা স্বীকার করতে আমাদের জাতীয় vanityতে বাধে। কিন্তু যা সত্য—তার সত্যতা আমাদের সম্মতির উপর নির্ভর করে না। আমাদের নব cultureকে বিলেতি culture বললে অত্যুক্তি হয় না।

আমার বিশ্বাস নবাবী আমলে আমাদের হিন্দুদের কাছে পারসি ভাষা একমাত্র সরকারী ভাষা বলেই গণ্য ছিল। কারণ প্রাক্-বৃটিশ যুগের বঙ্গসাহিত্যে পারসি culture-এর কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র অবশ্য পারসি-নবীশ ছিলেন, কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থে যে culture এর পরিচয় পাওয়া যায়, তা ষোল আনাই সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরও কিছুদূর পিছিয়ে যাওয়া যাক। রূপ সনাতন নিশ্চয়ই পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কেন না তাঁরা ত হুসেন সা'র রাজকার্য্য চালাতেন। কিন্তু রূপ-সনাতনের রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে, তাঁরা যে পারসি ভাষা জানতেন তার পরোক্ষেরও উল্লেখ নেই। অবশ্য নবাবী আমলে পারসি ও আরবী সাহিত্য পরোক্ষভাবে আমাদের বৈষ্ণবমতকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ের পুনর্বিচার করব না, কেন না আমি পূর্ব্বে সে বিচার করেছি।

ইংরেজী ভাষা যে আমাদের culture-এর সহায়ক হবে—শুধু সেরেস্তার ভাষা থেকে যাবে না—এ সত্য প্রথমতঃ ধরা পড়ে বাংলার এ যুগের অগ্রণী মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের দিব্য দৃষ্টিতে।

আমি কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর বিষয় ইংরেজী ভাষায় লিখি যে,—

"He remains for all time the supreme representative of the spirit of the new age, and the genius of our ancient land. He looked at European civilisation from the pinnacle of Indian culture, and saw and welcomed all that was living and life giving in it."

আমি এ কথাগুলির পুনরুল্লেখ করলুম এই কারণে যে, আমি এ মত পরিবর্ত্তন করিনি। বরং ইতিমধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ চর্চ্চা করে আমার পূর্ব্বমত আরও দৃঢ় হয়েছে।

আমরা যে culture নিয়ে আজ গর্ব্ব করি, সে culture "যো আপসে আতা উসকো আনে দেও" এইভাবে আত্মসাৎ করিনি। রামমোহন রায় এই culture-কে মনের সঙ্গে গ্রহণ করবার এবং আমাদের অন্তরঙ্গ করবার যে সব উপায় বাৎলেছিলেন, সেই সব উপায়ই আমরা অবলম্বন করেছি, স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দচিত্তে।

আমাদের আধুনিক সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজনীতির শিক্ষার সূত্রপাত যে রামমোহন রায় করেছিলেন, সে বিষয়ে যদি কারও সন্দেহ থাকে ত তাঁকে

রামমোহনের বাঙলা ও ইংরেজী প্রবন্ধাদি পড়তে অনুরোধ করি। আর যদি তাঁর সে-সব লেখা পড়বার অবসর না থাকে ত আমার লিখিত "রামমোহন রায়" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পড়লে আমি আজ যা বলছি, সে কথা যে কাল্পনিক নয়—সত্য, তা তাঁরা জানতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—রামমোহনের প্রদর্শিত মার্গে আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কতদূর অগ্রসর হয়েছি। আমাদের ধর্ম্মমত এখন আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের দার্শনিক মত হয়ে উঠেছে। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর বৈদান্তিক। যদিচ এই বেদান্ত প্রচারের জন্য রামমোহনকে প্রথম প্রথম অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলতেন যে, আমরা আত্ম-বিস্মৃত জাত। আমরা আমাদের অতীত সম্বন্ধে কতদূর জ্ঞানহীন, তার প্রমাণ যে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত একটি বাঙালী মহাপুরুষের নাম ব্যতীত আমরা আর কিছুই জানিনে; এবং তাঁর সম্বন্ধে নানারূপ অলীক ধারণার জঞ্জাল আমাদের মনে পুঞ্জীভূত হয়েছে। ফলে আমাদের অন্তর মিথ্যা কথার আস্তাকুঁড় হয়ে রয়েছে। অজ্ঞতার হাত হতে মুক্তি একমাত্র জ্ঞানার্জ্জনসাপেক্ষ—চিহ্নিত আয়াস-সাধ্য। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমাদের যুগের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আমরা বিলেতি সভ্যতার কাছে ঋণী। বিজ্ঞানের কোনও জাতি-ভেদ নেই। পৃথিবী যদি সূর্য্যের চারদিকে পাক খায়, তা হলে ইংলণ্ডও খায়, বাঙলাও খায়। ইংলণ্ডের জল যদি hydrogen-oxygen-এ গঠিত হয়, তা'হলে বাঙলার জলও ঐ দুই উপাদানে গঠিত।

এ যুগের রাজনীতি ও সমাজনীতির মূল কথা হচ্ছে liberty; আর liberty জিনিষটে human, সুতরাং তা লাভ করবার চেষ্টা আমরা করবই। আর দর্শন জিনিষটেও মূলত সার্ব্বভৌম। অবশ্য দেশভেদে তার নানারূপ ভেদ আছে। কোন দেশের দর্শন ধর্ম্মঘেঁষা, কোন দেশের দর্শন এ যুগের বিজ্ঞান-ঘেঁষা; এই যা প্রভেদ। সাহিত্য জিনিষটা পরের কাছ থেকে অবশ্য চুরি করা যায় না। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য যে অংশ বিলেতি সাহিত্যের মাছিমারা নকল, সে অংশটা সাহিত্য হিসেবে গণ্য নয়। সাহিত্যেই জাতীয় প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ।

রামমোহন যে culture-এর আবাহন করেছিলেন, সে culture-এর শতদল পদ্ম হচ্ছেন বাঙলার রবীন্দ্রনাথ। দেশী-বিলেতি সর্ব্বপ্রকার culture-এর তিনিই হচ্ছেন চূড়ান্ত ফুল ও ফল। রবীন্দ্রনাথের কাব্য হচ্ছে উপনিষদের বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত,—Freud-এর দর্শনের উপর নয়।

যে culture-এর উত্তরাধিকারী ছিলেন ভারতচন্দ্র ও রামমোহন, সেই একই culture-এ রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত; শুধু বিলেতি মুক্তির বাণীও তাঁর প্রতিভা আত্মসাৎ করেছে। আমার শেষ কথা এই যে, যিনি সংস্কৃত সাহিত্য দর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাঁকে আমি cultured বলতে প্রস্তুত নই। কেবলমাত্র ইংরাজীনবীশ বাঙলার সভ্যতা-কাণ্ডে পরগাছা মাত্র।

হিটলারের অভ্যুদয়

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ

খৃষ্টীয় ১৯৩৩ অব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে জার্ম্মানীর ইতিহাসে যে অপূর্ব্ব অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা খুব বিপ্লব-ভবিষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও সে দেশের অতীত ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য-বিহীন নয়। জার্ম্মানীর মত শিক্ষা ও সভ্যতায় অগ্রগণ্য দেশের অধিবাসীরা কিরূপে হিটলারের মত একটা অর্দ্ধশিক্ষিত, ভাবপ্রবণ, সাধারণ লোক-চালককে (demagogue) নিজদের সর্ব্বময় কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই বিষয়ে বিস্ময়ের কোন অবকাশ বড় থাকে না। ভিন্ন ভিন্ন ছোট বড় নেতার স্বেচ্ছাচারের অধীনে জার্ম্মান জাতির পূর্ব্বপুরুষ বিভিন্ন টিউটন জাতির লোকেরা য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যে নির্ম্মম দস্যুতা করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহার সঙ্গে বিস্‌মার্কের যুগের জার্ম্মান সাম্রাজ্যের কঠোর রাজ-শাসনের আলোচনা করিলে বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে—কি জার্ম্মানীর রাষ্ট্রে, কি সমাজে, গণতন্ত্রের প্রভাব কত অকিঞ্চিৎকর। তাই মহাযুদ্ধের অবসানে বিভিন্ন প্রতিকূল ঘটনাচক্রের উৎপীড়নে জার্ম্মানীতে যে সাধারণ-তন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে না ছিল ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য সমর্থন, না ছিল দেশবাসিগণের নির্ভরযোগ্য উৎসাহ। এই কারণে হ্বাইমারে (Weimar) রচিত জার্ম্মান শাসন-তন্ত্রের সংস্থিতি-পত্র (constitution) অধিকাংশ বিষয়ে উদারতামূলক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত টিঁকিল না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়া উহা মাত্র ১৫ বৎসর জীবিত ছিল এবং উহার সমগ্র জীবন-কাল বিবিধ বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়াই কাটিয়াছে।

এই বাধা-বহুল চিররুগ্ন জীবৎকাল হইতে তাহাকে মুক্তি দিলেন স্বয়ং হিটলার। বর্ত্তমান জার্ম্মানী প্রাচীন স্মৃতিকেই আবার নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিল। যেখানে ছিল কাইসার উইলিয়মের স্বৈরাচার, সেখানে আসিল হিটলারের হুকুমশাহী (dictatorship)। এই অদ্ভুতচরিত্র ব্যক্তিটির অভ্যুদয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য এবং আলোচ্য বিষয়টিকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে জার্ম্মাণ সাধারণ-তন্ত্রের স্বল্পকালব্যাপী অস্তিত্বের ইতিহাস সংক্ষেপে দেখিয়া যাইতে হইবে।

সব দিক্ হইতে দেখিতে গেলে জার্ম্মান সাধারণ-তন্ত্রের সংস্থিতিপত্র (কন্‌ষ্টিটিউশন) জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদারমতসম্পন্ন ছিল। ইহা রাজা, অভিজাত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংঘ (church), এই তিন বস্তুকে বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। ব্রিটিশ গণতন্ত্রে এই তিনটির কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব নাই বটে, তবু সেগুলি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খানিক রঙ্

হিটলার।

চড়ায়। ফরাসীদের, তথা বাল্‌টিক রাষ্ট্রসমূহের সংস্থিতির সঙ্গে উহার তফাৎ এইখানে যে, উহাতে অনেক স্থলে জনমত (referendum) গ্রহণ করার ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়ে উহার মিল সুইট্‌সারল্যাণ্ডের পদ্ধতির সঙ্গে কিন্তু সুইস্ পদ্ধতি হইতে উহার বিশেষত্ব এই যে, উহাতে নারীদিগকে সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছে; ইহার সংশোধনের সুবিধা বেশী এবং পদে পদে ইহাতে রক্ষামূলক বাধা-(check)সৃষ্টির উপায় নাই। এ বিষয়ে উহা মার্কিন সংস্থিতি অপেক্ষা কম

প্যাঁচালো। এই সংস্থিতিপত্র দ্বারা নির্ম্মিত শাসনযন্ত্র বেশ সবল ও সুব্যবস্থাগ্য এবং ইহার অধিকার-তালিকা (bill of rights) নিতান্ত সত্যাগ্রহসুলভ ছিল। তবে দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই গণতন্ত্র দুঃখ-দারিদ্র্যের ও অপমানের সময় আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সেই জন্য জনসাধারণ উহাকে খুব শুভজনক বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। ইহার কোন কোন ধারা যে কাগজে লেখা হইয়াছিল, সেই কাগজের বাহিরে প্রচার-লাভ করে নাই। যে ধারাটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা হইতেছে ৪৮ ধারা। উহাতে প্রেসিডেণ্টকে—বক্তৃতা ও খবরের কাগজের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির ও রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ গঠনের অধিকার এবং খামখেয়ালী গ্রেপ্তার, খানাতল্লাসী, জিনিষপত্র ক্রোক প্রভৃতি হইতে মুক্ত থাকার অধিকার—সাময়িক ভাবে বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল।

এই সংস্থিতিপত্রকে চালু করিবার জন্য ডিমোক্রাট্, ক্যাথলিক কেন্দ্রীয় দল এবং উদারনীতিক সমাজতান্ত্রিকরা এক জোট (coalition) বাঁধিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে দক্ষিণ ও বাম দিক্ হইতে সমান ভাবে বাধা পাইতে হইয়াছিল। এই বিপক্ষ দলসমূহের মধ্যে কোন কোন দল এমন ভাবিতেন যে, যতদিন না নিজ নিজ মৎলব হাসিল করার সুবিধা হইবে, ততদিনই সাধারণ-তন্ত্রকে সমর্থন করা দরকার। হিটলার দ্বারা সঙ্ঘীভূত ন্যাশনাল সোশালিষ্ট জার্ম্মাণ শ্রমিক দল (সংক্ষেপে নাৎসী, Nazi) ইহাদের অন্যতম ও সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ছিল। এই দল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কমই গ্রাহ্য করিত। যে গবর্ণমেণ্ট ভার্সাই-এর সন্ধি স্বাক্ষর ও তাহার সর্ত্তসমূহ পালন করিয়া জাতীয় সম্মান নষ্ট করিয়াছে, সেই গবর্ণমেণ্টের সহিত তাহারা কোন রফা-নিষ্পত্তি করিতেই ইচ্ছুক ছিল না। তাহাদের নিরন্তর চেষ্টা ছিল অপমানের প্রতিকার-কল্পে কতিপয় মস্তককে ভূলুণ্ঠিত করা। এই সকল রাজনীতিক দলের বাহিরেও গণতন্ত্রের বিস্তর শত্রু ছিল। সৈন্য-বিভাগ, শাসন-বিভাগ, ভূস্বামীবর্গ, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানতঃ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিল। জার্ম্মানী সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ জার্ম্মান তখনও তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে নাই।

কিন্তু গণতন্ত্রের প্রধান শত্রু হইল প্রতিকূল ঘটনাচক্র, মানুষ নহে। ফরাসী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক রূঢ় অধিকার, মুদ্রার মূল্য-হ্রাস, ক্ষতিপূরণের ও অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের সুদীর্ঘ কালব্যাপী দাবী, জগৎময় ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা—এই কয়টির মত ব্যাপার জগতের যে-কোন রাষ্ট্রের চালকগণের চালিত শাসনযন্ত্রকে দুর্ব্বল এবং তাঁহাদের প্রতিপক্ষকে বলবান্ করিয়া তুলিতে পারিত। পরাজিত, নিরুৎসাহ এবং ক্রুদ্ধ জার্ম্মানীর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী যে বিশেষ শান্তিজনক হয় নাই, তাহা খুবই স্বাভাবিক।

১৯২০ অব্দের মার্চ্চমাসে জার্ম্মান সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধবাদিগণ এক প্রকাশ্য বিদ্রোহের চেষ্টা করিল। ডক্টর ফোন কাপ (Von Kapp) নামক এক ব্যক্তি নিজেকে রাষ্ট্রের প্রধান সচিব (Chancellor) এবং জেনারেল ফোন লিটউইৎসকে (Von Luettwitz) দেশরক্ষা বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হিসাবে ঘোষণা করিলেন। এই ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ সমর্থন পাওয়া গিয়াছিল এমন কতিপয় সৈন্যদল হইতে, যাহারা ভার্সাই সন্ধিসর্ত্তের অনুসারে অস্ত্রত্যাগ করিতে রাজী হয় নাই। কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় রাজতন্ত্রী এই ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিল; কারণ তখন ইহা খুব কাঁচা কাজ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। ভাবী বিপ্লবীরা সামান্য ক্লেশেই বার্লিন দখল করিয়া ফেলিল, কিন্তু সমগ্র দেশ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইল না। স্থানভ্রষ্ট গণরাষ্ট্রের কর্ত্তারা ড্রেসডেন এবং ষ্টুটগার্টে পালাইয়া গেলেন; শ্রমিকগণ এক দেশজোড়া ধর্ম্মঘট করিয়া বসিল। এই ব্যাপারে সেনা-বিভাগের এবং ভূস্বামিবর্গের অধিকাংশই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে সমুদয় আন্দোলন ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কাপ (Kapp) দেশ হইতে পালাইয়া গেলেন। রুঢ় অঞ্চলের কারখানা-সহরগুলি সেই সুযোগে কম্যুনিজমের ধ্বজা উত্তোলন করিল। জার্ম্মান সাধারণ-তন্ত্রের কর্ত্তারা তখন অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় ব্যক্তিগণকে শাসনতন্ত্র হইতে অপসারিত করিলেন এবং জুন মাসে এক নির্ব্বাচন আহ্বান করিলেন।

কাপ-বিপ্লব (Kapp-revolt) কেবল সাধারণ-তন্ত্রের উচ্ছেদচেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। বিপ্লবীরা ১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে এরৎসবের্গের (Erzberger) নামক কেন্দ্রীয় ক্যাথলিক দলের একজনকে এবং পরবর্ত্তী বৎসর হ্বাল্টের রাথেনো (Walter Rathenau) নামক এক ইহুদী ধনী ও উদার রাজনীতিককে হত্যা করাইল। যেই উদারপন্থী

স্বাধীনতার শান্তি পর্ব্ব (মূকাভিনয়)
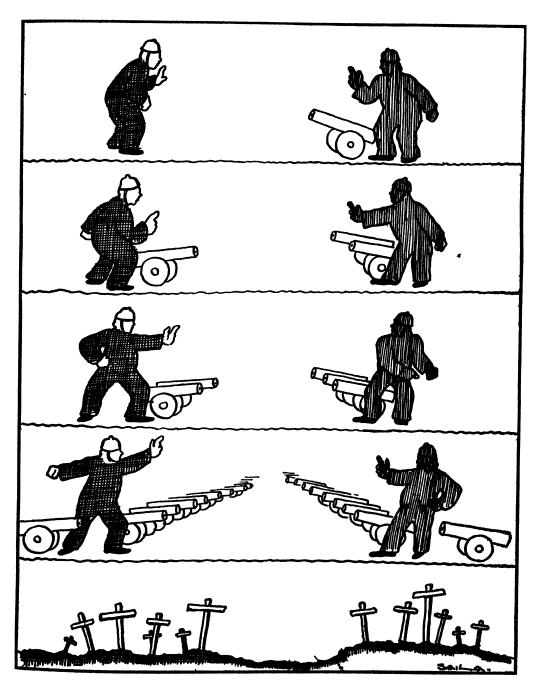
নেতারা দেশকে বিপদ হইতে বাঁচাইবার মানসে শান্তি সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই সকলকে মৃত্যুদণ্ডে (গুপ্তঘাতকের সাহায্যে) দণ্ডিত করাই হইয়াছিল প্রতিক্রিয়া-পন্থী ষড়যন্ত্রকারিগণের অন্যতম উদ্দেশ্য। যে হেতু বাভেরিয়া প্রদেশে কম্যুনিষ্ট বিপ্লব ১৯১৯ সালে একবার অল্প সময়ের জন্য মাথা তুলিয়াছিল, সেই হেতু সেখানে রাজতন্ত্র-সমর্থক আন্দোলন বেশ প্রবল ছিল এবং সেই কারণেই বাভেরিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্র চলিবার উত্তম ক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। জার্ম্মানীর বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে যে আড়াআড়ির ভাব ছিল, তাহার ফলেও বাভেরিয়া বার্লিনের নায়কত্বাধীন সাধারণ তন্ত্রকে রক্ষার ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইল না।

১৯২৩ সালে আডোল্ফ হিট্‌লার (Adolf Hitler) নামক একজন আন্দোলনকারী জেনারেল লুডেনডর্ফের সহায়তায় মিউনিক হইতে নিজেকে প্রধান রাষ্ট্রসচিব (Chancellor) ঘোষণা করিলেন। ঐ ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যক্তিও এরূপ কাণ্ড বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে কোন চেষ্টাই কৃতকার্য্য হয় নাই। ষড়যন্ত্রকারীদের অনেকে হত ও কারারুদ্ধ হইল। তখন পর্য্যন্ত কেহই জানিত না যে, মিউনিকের 'তাড়িখানার হাঙ্গামের' (beerhall-rebellion) কৌতুককর অভিনেতা হিট্‌লারই নবীন জার্ম্মানীর দৈব-প্রেরিত ভাগ্যবিধাতা।

মাইক্রোফোনের সম্মুখে বক্তা হিটলার। সম্মুখে দর্শক দল।

১৯২০ সালের রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচন জার্ম্মান সাধারণ-তন্ত্রকে দুর্ব্বল করিয়া দিল। কারণ, তখন কতিপয় উদারনৈতিক সোশ্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্টের সমালোচক দলে যোগ দিয়াছিল। এই দুর্ব্বলতার ফলে উপর্য্যুপরি তিনবার প্রধান সচিব (Chancellor) বদল করিতে হইল। এই পরিবর্ত্তনের এক প্রধান কারণ ছিল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ও মুদ্রামূল্যহ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্যা-সমূহের গুরুতর চাপ। ফরাসী রাষ্ট্র কর্ত্তৃক রুঢ় অঞ্চল দখল এবং জার্ম্মানীর আর্থিক বিশ্বাস্যতার (credit) চরম অবস্থা, এই দুই মিলিয়া জার্ম্মান সাধারণ-তন্ত্রের সৌভাগ্যকে শোচনীয় রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল। এই অবস্থায় চ্যান্সেলর ভিল্‌হেল্‌ম মার্ক্স (Wilhelm Marx) এবং বৈদেশিক সচিব গুষ্টাভ ষ্ট্রেসেমান (Gustav Stresemann) ডস্ প্ল্যান (Dawes Plan) সমর্থন করিলেন এবং উহাকে বলবৎ করিবার জন্য রাষ্ট্রসভায় আইন পাশ করাইলেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ বর্ত্তমান থাকায় গবর্ণমেণ্ট শক্তিশালী না হইয়া দুর্ব্বলতর হইল। ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে এই অবস্থা বেশ প্রকট হইয়া উঠিল। এই নির্ব্বাচন একদিকে কম্যুনিষ্ট দলকে পুষ্ট করিল এবং অপর দিকে ন্যাশনালিষ্টরাও দলে ভারী হইল, তদুপরি লুডেনডর্ফ ও হিটলারের দলের লোকেরা একটা ছোটখাট উপদল গড়িয়া রাষ্ট্রসভায় প্রবেশ করিল। ফলে কোন স্থায়ী শাসনতন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারিল না। ছয় মাস পরে আবার নির্ব্বাচন করাইতে হইল। এইবার এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। একদিকে কম্যুনিষ্টদের অনেকে সোশ্যালিষ্ট দলে যোগ দিলেন এবং অপর দিকে হিটলার ও লুডেনডর্ফ-পন্থীরা রক্ষণশীল ন্যাশনালিষ্ট দলে ভিড়িয়া পড়িল। এতদ্ব্যতীত আর কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ১৯২৫ সালে চ্যান্সেলর হান্‌স লুটার (Hans Luther) সোশ্যালিষ্ট-গণকে শাসনতন্ত্র হইতে বাদ দিলেন এবং যুদ্ধের পরে সর্ব্ব-প্রথমে ন্যাশনালিষ্টরা গবর্ণমেণ্ট চালনায় যোগদান করিতে পারিল। জার্ম্মানী বামমার্গ (left) পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ মার্গে (right) ঝুঁকিয়া পড়িল। ১৯১৮—১৯১৯ সাল হইতে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! কারণ, তখনকার সমস্যা ছিল

দেশ সোশ্যালিষ্ট হইবে কি কম্যুনিষ্ট হইবে। আর ১৯২৫ সালে সোজাসুজি ন্যাশনালিজ্‌মের দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক।

১৯২৪ সালের জার্ম্মান রাষ্ট্রসভার জোড়া নির্ব্বাচনের সঙ্গে ১৯২৫ সালে জোড়া প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন আসিয়া পড়িল। সাধারণতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ফ্রিডরিশ এবার্ট (Friedrich Ebert)। তিনি সোশ্যালিষ্ট হইলেও কোন ব্যাপারে নিজ মতামত জোর করিয়া খাটাইতে চাহিতেন না এবং রাষ্ট্রসভায় মন্ত্রিমণ্ডল যাহা সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহাই বাধ্যতার সহিত স্বীকার করিতেন। তাঁহার এই উদারতার ফলে তাঁহার বিরুদ্ধ মতবাদীরাও তাঁহাকে বিশ্বাস ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। ১৯২৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর জার্ম্মানীর সর্ব্বসাধারণ একযোগে শোক প্রকাশ করিয়াছিল। জার্ম্মান আইন অনুসারে কেবল সুস্পষ্ট ভাবে বেশী ভোট

বক্তা হিটলার।

(absolute majority) পাইলেই প্রেসিডেণ্টের নির্ব্বাচন সিদ্ধ হওয়ার কথা। আর তাহা না হইলে, দ্বিতীয় বার নির্ব্বাচন গ্রহণ করা হইত এবং সেই নির্ব্বাচনে বেশী ভোট যিনি পাইতেন, তিনিই প্রেসিডেণ্টের পদ পাইতেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক দলই একবার নিজেদের বলাবল পরীক্ষা করিবার জন্য এক একটি প্রার্থী মনোনীত করিল। সেই নির্ব্বাচনের ফল হইল নিম্নলিখিত প্রকার :—

(১) কার্ল ইয়ারেস (কনজারভেটিব কোআলিশন) ভোট—১,০৪,১৬,৬৫৫।

(২) অটো ব্রাউন (সোশ্যাল ডেমোক্রাট) ৭৮,০২,৪৯৬।

(৩) হ্বিলহেল্ম মার্কস (কেন্দ্রীয়) ৩৮,৮৭,৭৩৪।

(৪) এর্নষ্ট টেলমান (ডেমোক্রাট) ১৫,৬৮,৩৯৮।

(৫) এচ্‌, হেল্ট (বাভেরিয়ার দল) ১০,০৭,৪৫০।

(৬) লুডেনডর্ফ (উগ্র জাতীয়তা বাদী) ২,৮৫৭,৯৩।

ইহার মধ্যে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ দল একযোগে ভূতপূর্ব প্রধান সচিব মার্কস্‌কে সমর্থন করিতে চেষ্টিত হইল। আর তাহা ঠেকাইবার জন্য রক্ষণশীল দলের লোকেরা এক নূতন বুদ্ধি করিল। সারা জার্ম্মানীর শ্রদ্ধেয় বীর হিণ্ডেনবুর্গকে তাহারা প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য দাঁড় করাইল। দুই প্রধান দলের মধ্যে বেশ জোর 'ভোটিং' চলিল। পরিশেষে দেখা গেল, যদি কম্যুনিষ্টরা উদারনীতিক কোআলিশনের সঙ্গে যোগদান করিত, তবে মার্কসই নির্ব্বাচিত হইতেন; কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এই ব্যাপার ঘটিল যে, কম্যুনিষ্টরাই নিজ হাতে রক্ষণশীলগণকে জয়লাভে সাহায্য করিল। এপ্রিল মাসের নির্ব্বাচনের ফল নিম্নলিখিত প্রকার হইল :—

হিণ্ডেনবুর্গ (রক্ষণশীল কোআলিশন) ১,৪৬,৫৫,৭[illegible] ভোট।

হ্বিলহেল্‌ম্ মার্ক্‌স (উদারনীতিক কোআলিশন) ১,৩৭,৫৪,৬১৫।

এর্ন্‌ষ্ট থেলমান (কম্যুনিষ্ট) ১৯,৩১,১৫১।

জার্ম্মান উদারনীতিকগণ এবং বৈদেশিক দর্শকেরা বিশেষ আশঙ্কা করিলেও এই নির্ব্বাচনের অদূর ফলপ্রাপ্তি বিশেষ মন্দ হয় নাই। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ একজন প্রাচীন প্রুশিয়ান অভিজাত, রাজতন্ত্রী রাজনীতিক এবং হোহেনৎসোলার্ণ বংশের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন হইলেও লুডেনডর্ফের ন্যায় 'ফ্যানাটিক' (অন্ধ উৎসাহী) ছিলেন না। কাপ (Kapp) অথবা হিটলার (Hitler) বিপ্লবে তিনি জড়িত ছিলেন না। এক হিসাবে তাঁহার নির্ব্বাচন রাজতন্ত্রীদের দুর্ব্বল করিয়াছিল; কারণ, তাহাদের নিজেদের মনোনীত প্রেসিডেণ্ট-পদপ্রার্থীকে আক্রমণ না করিয়া তাঁহার শাসন-তন্ত্রকে আক্রমণ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তবু, হিণ্ডেনবুর্গের অতুলনীয় ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং তৎপ্রতি বহু ব্যক্তির রাজনীতিগন্ধশূন্য শ্রদ্ধার কথা ধরিলেও এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মনে হয় যে, জার্ম্মান জাতি যে পূর্ণবয়স্কদের ভোটে একজন রাজতন্ত্রীকে রাষ্ট্রনায়কের গদীতে বসাইল, তাহা সাধারণতন্ত্রের পক্ষে মোটেই শুভলক্ষণ ছিল না। জার্ম্মান জাতি সাধারণতন্ত্র (রিপাব্লিক) চলিলে কি হয়, তাহার মন তখনও ঐ ভাবে ভাবিত হয় নাই।

কিছুদিন যাবৎ রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য বেশ ভালই চলিল। কিন্তু বৈদেশিক সচিব ষ্ট্রেসেমানের নেতৃত্বে জার্ম্মানী তাহার 'একঘরে' অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া লোকার্ণো পিস প্যাক্ট ও লীগ অব নেশন্স-এ যোগদান করিতে পারিল। হিণ্ডেন-বুর্গের মত ষ্ট্রেসেমানও রক্ষণশীল, প্রবল জাতীয়তাবাদী এবং রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তিনিও নব যুগের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া ছিলেন। হিণ্ডেনবুর্গ ছিলেন সৈনিক, তাই তিনি তাঁহার গবর্ণমেণ্টকে ব্যক্তিগত সম্ভ্রম এবং মাহাত্ম্য ছাড়া আর কিছুই দান করিতে পারেন নাই, কিন্তু ষ্ট্রেসেমান ছিলেন তীক্ষ্ণধী, বস্তুতান্ত্রিক, রাজনৈতিক এবং ধনিক চালিত জনসাধারণের দলপতি; বিস্মার্কের পরে জার্ম্মানীতে যে সব রাষ্ট্রব্যাপারকুশলী বৈদেশিক সচিব জন্মিয়াছেন, ষ্ট্রেসেমান তাঁহাদের সকলের সেরা। কিন্তু এ সকল শুভ লক্ষণ সত্ত্বেও জার্ম্মানীর পার্লামেণ্টারী শাসন ভাল চলিল না। এমন বহু দল গজাইল, যাহাদের সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মপন্থা আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহে। কাজেই কোন মন্ত্রীই নিজের দল যথেষ্ট ভাবে পুষ্ট করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিত্বের পর মন্ত্রিত্ব ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু য়ুরোপের দ্বীপ ব্যতিরিক্ত (continental) অংশের কোন রাষ্ট্রই ত এই বিপদ হইতে মুক্ত নহে।

যুদ্ধের পরে জার্ম্মানীতে শ্রমশিল্পের এক অপ্রত্যাশিত অভ্যুদয় ঘটিল। পরাজিত জার্ম্মানীতে তখন বিজয়ী বিটেন অপেক্ষা বেকার লোকের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। জার্ম্মানীর সোশ্যালিষ্ট মন্ত্রীদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকার সময় অপেক্ষা তখন দেশ আর্থিক হিসাবে ধনতন্ত্রের (capitalism) দিকে অগ্রসর হইতেছিল। বহু-ক্রোড়পতি হুগো ষ্টিনেস্ (Hugo Stinnes) উচ্চতায় সমস্ত রাষ্ট্রনীতিক মণ্ডলীতে সকলকে ছাড়াইয়া এক দানবের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সমগ্র জার্ম্মানীর এক পঞ্চমাংশ দ্রব্যের উৎপাদন তাঁহার অধীনে সম্পন্ন হইতেছিল। তাঁহার জীবনের শেষ বর্ষে (১৯২৩) তিনি ১৩৮৮টি কারবারের সহিত জড়িত ছিলেন। ষ্টিনেসরূপ সূর্য্যের চারিদিকে ছিল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপগ্রহগণ, যথা:—ক্রুপ (Krupp), টিসেন (Thyssen), জিমেন্স্ (Siemens), রটেনউ (Rathenau)। সোশ্যালিষ্টরা বিরক্তি ও বিদ্রূপের সহিত বলিত যে, ব্যবসায়ী ষ্টিনেসের লাভের জন্যই মহাযুদ্ধটি ঘটান হইয়াছিল। কিন্তু শিল্পোৎপাদকগণ অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী ধনী ছিল বিনাশ্রমে লাভকারীর (Profiteer) এবং টাকার বাজারের জুয়াড়ীর (Currency Gamblers) দল। ইহারাই বার্লিনের হোটেল-গুলিতে ভিড় করিত এবং অত্যধিক ব্যয়বাহুল্য দ্বারা বিদেশী-গণের এই ধারণা জন্মাইত যে, জার্ম্মানদের হাতে বেশ অর্থ আছে, তাহারা কেন ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে সমর্থ।

মুসোলিনী।

এই সময়কার জার্ম্মান চিন্তার ধারা ছিল অনেকটা ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের (১৮৭১) পরবর্ত্তী কালের ফরাসীদের চিন্তার মত। দুই ক্ষেত্রেই বিজিত রাষ্ট্রের লোকেরা তাহাদের শাসকগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করিয়াছে, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই নূতন শাসন-তন্ত্র দুর্ব্বল এবং জনসাধারণের মন হতাশ ও নিরুৎসাহ। সাহিত্যের ইতিহাস রাষ্ট্রীয় ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলে না; কারণ,

ব্যক্তিবিশেষ তাহার খেয়াল-খুসী মত এমন কিছু লিখিতে পারে যাহা মোটেই দেশ-কালের সঙ্গে মেলে না; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন কোনও এক শ্রেণীর বই সমাদর লাভ করে, তখন তাহার একটা বিশেষ অর্থ করা যায়। অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার (Oswald Spengler) লিখিত "পশ্চিম দেশের অস্তগমন" (Untergang des Abendlands) যদিও যুদ্ধের সময় ও তাহার পূর্ব্বে লিখিত, ইহা বাহির হইয়াছিল যুদ্ধের অবসানে। ভাবী ধ্বংসের কথা বলিয়া এই বইখানি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কেইজারলিঙ (Keyserling) রচিত 'ভ্রমণ কাহিনী'ও প্রাচ্যের স্বপ্নমাখা মরমিয়া চিন্তার ধারা আমদানী করিয়া লোকের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। এতদ্‌ব্যতীত হতাশা ও অধোগতির কাহিনীপূর্ণ নাটক ও ছবি যথাক্রমে বার্লিনের নাট্যশালা ও চিত্রসংগ্রহে ভিড় করিয়াছিল। মোটের উপর যুদ্ধের অন্তে জার্ম্মান জাতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া এক শোচনীয় নৈরাশ্যবাদ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

অপেক্ষাকৃত তরুণ জার্ম্মানের দল এই নৈরাশ্য দেখিয়া অতিশয় অধীরতা অনুভব করিল। ইহাই হইল জার্ম্মান যুব-আন্দোলনের মূল কারণ। জার্ম্মান জাতির ভবিষ্যৎকে সমুচিত মহিমা দান এবং তৎসঙ্গে বর্ত্তমানকে দুঃখ-দৈন্যের নিষ্পেষণ হইতে উদ্ধার করা, এই দুই হইল যুব-আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেহ রোমান ক্যাথলিক, কেহ প্রটেষ্টাণ্ট, কেহ কম্যুনিষ্ট দল আশ্রয় করিল ও নবযুগের স্বপ্ন দেখিল এবং কেহ বা মধ্যযুগের জার্ম্মানীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইল—যখন তাহার জীবনযাত্রা বীরত্বপূর্ণ অথচ নিরাড়ম্বর ছিল। যুবক-যুবতীরা দলে দলে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও সহজ জীবনযাত্রার সুখদুঃখ অভ্যাস করিবার জন্য সহর হইতে গ্রামে ও সহরান্তরে বেড়াইতে বাহির হইল। জীবনযাত্রার সরলতা জার্ম্মান ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ দেখা গিয়াছে। বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে এই যুব-আন্দোলন একান্ত উগ্রভাবে স্বাদেশিকতাবাদী (chauvinistic) ছিল। যুবজনের অধিকাংশেরই যুদ্ধের দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহাদের অনেকেরই নিকট উহা পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বীরত্ব-স্মৃতির সহিত জড়িত। যুদ্ধের পরে জার্ম্মানীর পুনর্নির্ম্মাণের ব্যাপারে দেশময় যে দুঃখদুর্দ্দশা প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্য প্রাচীন রাজতন্ত্রের ভুল-ত্রুটিকে দায়ী না করিয়া তাহারা গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির ভ্রমপ্রমাদ অথবা বৈদেশিক বিজেতাদের অত্যাচারকেই দায়ী করিল।

এইরূপ মনোবৃত্তি যে বিপ্লবপ্রয়াসী বিভিন্ন দলের পক্ষে বেশ সুযোগ সৃষ্টি করিল তাহা বলাই বাহুল্য। মৃদু এবং পার্লামেণ্টারী শাসনের উপর বিরক্ত তেজস্বী যুবক কম্যুনিষ্ট হইবে কি রাজতন্ত্রী হইবে মাঝে মাঝে যেন দৈবই ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছে। বিপ্লবপ্রয়াসী দলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা করিতকর্ম্মা ছিল ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্টরা (National Socialists)। এই দল ইতালির ফাসিষ্ট আন্দোলনের মত দেশপ্রেমিক যুবজনের মনকে ভারী নাড়া দিয়াছিল। এই দলের নেতা আডোলফ হিটলার, মুসোলিনীর মতই মহাযুদ্ধের একটি যুবক ছিলেন। তিনি অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার পিতা ছিলেন একজন শুল্কবিভাগের কর্ম্মচারী। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে তিনি বাভেরিয়ায় চলিয়া আসেন এবং গৃহচিত্রকরের (house-painter) কাজ করেন এবং তাহার পরে তিনি জার্ম্মান সৈন্যদলে যোগদান করিয়া বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেন। তাঁহার সঙ্গে সমান ভাবের কতিপয় ভাবুক লইয়া যুদ্ধান্তে তিনি 'ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট' নামে একটি দল গড়িয়া তুলিলেন। এই দলের কার্য্যসূচীতে পঁচিশটি দফা ছিল। এই প্রচার মর্ম্ম: অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বৃহৎ জার্ম্মানীর যোগ; ভার্সাই সন্ধির অস্বীকার; খাঁটি জার্ম্মান রক্ত ছাড়া অন্য কাহাকেও রাষ্ট্রীয় অধিকার না দেওয়া; (অর্থাৎ কোন ইহুদী সেই অধিকার পাইবে না;) যে সব লোক যুদ্ধের পর জার্ম্মানীতে প্রবেশ করিয়া স্থায়ী বসবাস করিতেছিল তাহাদিগকে বিতাড়ন; বিনা শ্রমে ও যত্নে অর্জিত আয়কে কমাইয়া দেওয়া; যুদ্ধকালের সুযোগ লইয়া যাহারা ব্যবসায়ে অন্যায় অর্থলাভ করিয়াছে, সেই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা; আমেরিকান পদ্ধতিতে যে বড় বড় ডিপার্টমেণ্ট ষ্টোর হইল সেগুলিকে তুলিয়া দেওয়া; পুঁজির কেন্দ্রীকরণ, ভূমি-রাজস্বাদির সংস্কার; সামাজিক সংস্কার; অ-জার্ম্মান (বিশেষ ভাবে ইহুদী) খবরের কাগজের বিলোপসাধন, এবং সমগ্র জার্ম্মান রাষ্ট্রের উপর এক একীভূত কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা।

যদি হিটলার নামে কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ না করিতেন, তবু জার্ম্মানীতে গণতন্ত্র, গণরাষ্ট্র এবং সোশ্যালিজমের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। কিন্তু হিটলারই এই প্রতিক্রিয়ার

আন্দোলনকে তাহার বর্ত্তমান বিশিষ্ট ছাপ দিয়াছেন। তাঁহার দলগঠনের রীতি-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে ইতালীয় ফাসিষ্ট হইতে গৃহীত। নিজ দলকে তিনি একটি বিশিষ্ট সম সাজে সজ্জিত স্বেচ্ছা সৈনিক (uniformed volunteer militia) বাহিনীতে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার কটা রঙের জামা বা ঝটিকা-বাহিনী (sturm abteilungen) মুসোলিনীর স্কোয়াদ্রিস্তি'কে (squadristi) মনে করাইয়া দেয়। দুইটি তিনই তাহাদের নেতাকে একরূপ নমস্কারে অভ্যর্থিত করে, 'স্বস্তিক' চিহ্ন, ফাসিষ্টদের 'কুঠার ও দণ্ড' চিহ্নের মতই পতাকপ্রীতির সূচনা করে, দুই দলের লোকরাই প্রকাশ্য ভাবে রাস্তার লড়াইয়ে নিজ নিজ বিপক্ষ দলের (কম্যুনিষ্টদের) পর আক্রমণ ও তাহাদের প্রাণনাশ করিয়াছে। মোটের উপর হঠাৎ মনে হইবে 'নাৎসী' জার্ম্মানী ফাসিষ্ট ইতালীর রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও দুইটি আন্দোলনের মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্য আছে, তবু উহা ষোলআনা সাদৃশ্য নহে। তাহাদের পার্থক্য স্ব স্ব নেতার ব্যক্তিত্বের জন্য ঘটিয়াছে। ইতালীর ডিক্টেটরের যে নিস্পৃহ রসজ্ঞান, উপযুক্ত সাধারণ জ্ঞান এবং হাতে কলমে কাজ করার ক্ষমতা আছে, হিটলারের তাহা নাই। হিটলার মুসোলিনী অপেক্ষা সঙ্কীর্ণবুদ্ধির লোক কিন্তু তীব্রতর এবং খাঁটি অন্ধ উৎসাহী (fanatic)। মনে হয়, হিটলার মুসোলিনীর চেয়ে বেশী বাগ্মিতাসম্পন্ন; বৈদেশিক লেখকদের অনেকের মতে জার্ম্মানীতে এ পর্য্যন্ত যত বক্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হিটলার তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তাহার সমস্ত শক্তির উৎস হইতেছে তাহার দীপ্ত আন্তরিকতা ও দুর্দ্দম ভাবাবেগ, যাহা দ্বারা তিনি নিজকে ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে যুগপৎ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারেন। ... ফাসিষ্ট ও নাৎসী উভয় দলই 'নেশন' বা রাষ্ট্রকে শ্রেণী, ধর্ম্মসম্প্রদায়, দল, ব্যক্তিগত স্বার্থ, এমন কি সুনীতি জ্ঞানেরও ... র স্থান দেয়; নাৎসীদের এই বিশেষত্ব যে, তাহারা জাতি (race) বা রক্তের বিশুদ্ধতার উপরই বেশী জোর দেয়।

নাৎসীদের নিকট জাতি (race) ও নেশন একার্থক। যাহারা এক রক্তের লোক নয়, তাহারা কখনো খাঁটি জার্ম্মান হইতে পারে না। কোন কোন জার্ম্মান এই দাবী করিয়াছিল যে, কেবল পিঙ্গলকেশ দীর্ঘকায় 'নর্ডিক' জাতির লোকরাই খাঁটি জার্ম্মান—মানব জাতির মধ্যে সর্ব্বোত্তম—কিন্তু সেইরূপ আদর্শ গ্রহণ করিলে দক্ষিণ জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার লোকরা বাদ পড়ে, এজন্য সেই আদর্শ চলে নাই। তাহার পরে বলা উঠিল যে 'আর্য্য' জাতির লোকদের মধ্যে টিউটনেরাই হইল গঠনমূলক কল্পনা শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই টিউটন্ বংশধর জার্ম্মানরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই আর্য্য নামের গৌরববৃদ্ধি শুধু সেমিটিক ইহুদীদিগকে জার্ম্মান রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করার জন্য। বিংশ শতাব্দীর ইহুদীবিদ্বেষ ইউরোপীয়

হিণ্ডেনবুর্গ।

মধ্যযুগের ইহুদীবিদ্বেষের মত ধর্ম্ম সংক্রান্ত নয়। কারণ, খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত ইহুদী খাঁটি ইহুদী অপেক্ষা বেশী ঘৃণিত; এই ইহুদী-বিদ্বেষ খানিকটা অর্থনৈতিক শত্রুতামূলক। ইহুদীরা সহরবাসী লোক, ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন। কাজেই ব্যবসায় বাণিজ্য-ক্ষেত্রে তাহাদের ভিড় একটু বেশী এবং তাহাদের এই সকল ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যতার জন্য তাহারা অন্যদের ঈর্ষ্যার পাত্র। ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষের অন্য কারণ রাষ্ট্রনীতিক, তাহারা একটি বিশ্বপ্রেমিক (cosmopolitan) জাতি এবং সর্ব্বত্রই উৎপীড়িত, তাহার ফলে অনেকে বিপ্লব-

মূলক রাষ্ট্রীয় পথের পথিক এবং য়ুরোপের নানা কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট দলে তাহাদের সমধিক প্রভাব রহিয়াছে। সমগ্র জার্ম্মানীতে ইহুদী সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ (৬,০০,০০০), সমগ্র লোকসংখ্যার এক দশমাংশ। কিন্তু সমগ্র দেশের বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহারা যে প্রধান স্থান দখল করিয়াছিল, তাহাতে সংখ্যাধিক লোকেরা ঈর্ষ্যান্বিত না হইয়া পারে না।

ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট বা নাৎসীদলের জয়লাভের এক উপায় হইতেছে উহার বিচিত্র নাম। 'ন্যাশনাল' কথাটি মাক্সপন্থী

ফ্রিড্‌রিশ্ এবার্ট।

সোশ্যালিজ্‌ম বিরোধী রক্ষণশীল জার্ম্মানদের নিকট প্রিয়; আর 'সোশ্যালিষ্ট' কথাটি সেই সকল লোককে আকৃষ্ট করিয়াছিল—যাহারা ভাবিয়াছিল যে, নূতন দল বড় বড় জমিদারীগুলিকে ভাঙ্গিয়া এবং বড় বড় দোকানগুলিকে তুলিয়া দিয়া ছোট ছোট কৃষক ও দোকানদারের জীবিকার সুবিধা করিয়া দিবে। এই 'দু-মুখো' নামের গুণে নাৎসীদল বহু লোককে আকৃষ্ট করিল, অন্ততঃ সমস্ত 'আর্য্য'গণকে। নানা বিচিত্র উদ্দেশ্য লইয়া লোকে এই দলে যোগদান করিল। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে অথচ চাকরী নাই এমন লোক দলে আসিল; সোশ্যালিষ্টও কেহ কেহ আসিল, যাহারা নিজদলের লোকের কর্ম্মপন্থার উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিল, টাকার মূল্য কমি যাওয়ায় যে-সব সরকারী ঋণপত্রের মালিক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি তাহারাও আসিল, অল্প বেতনের কেরাণী, বেকার বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট, ইহুদীদের প্রতিযোগিতায় সন্ত্রস্ত দোকানদার, কতিপয় কবি ও ভাবুক, ইহাঁরা সকলে নাৎসী দলে ভিড়িলেন দল বাঁধিয়া পতাকা হাতে লইয়া গান গাহিয়া, মার্চ্চ করি যাওয়া এবং মাঝে মাঝে একটু আধটু লড়াই করাতে যাহাদের লোভ ছিল এমন হুজুগপ্রিয় কিছু কিছু লোকও এই দলে ে দিল। যে সকল লোক ১৯৩২ পর্য্যন্ত দলে যোগ দেয় না, তাহারা অবশেষে বলশেভিজ্‌মের ভয়ে নাৎসী দলে যোগ দিয়াছিল। ইহারা ছিল ধনী ও অভিজাতবর্গ। রক্ষণশীল ইতালিয়ানদের ফাসিষ্টদের সম্বন্ধে যে তাচ্ছিল্যের ভাব গোড়ায় ছিল ইহাদের ভাবও অনেকটা সেই প্রকারের। ইহা লক্ষ করার বিষয় যে, রাজতন্ত্রীদের 'ষ্টীল হেলমেট' দল নাৎসী দল হইতে বহু দিন পৃথক ছিল এবং ঐ দলকে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ভাবিত।

নাৎসীরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা করিলেও তাহারা পুনঃ ১৯১৩ সালের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে চাহে না তাহারা হোহেনৎসোলার্নদের (Hohenzollerns) পুনঃ বর্ত্তন সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট মতামত প্রকাশ করে না। ... এইটি হইল ন্যাশনালিষ্টদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য। হিট লার ও তাঁহার বন্ধুরা এক তৃতীয় রাষ্ট্রের কথা বলেন, যে ... প্রথম জার্ম্মান রাষ্ট্র ও দ্বিতীয় জার্ম্মান রাষ্ট্র (সাম্রাজ্য ও ১৯১ —১৯১৮ পর্য্যন্ত রাষ্ট্র) হইতে বেশী মহিমাসম্পন্ন হইবে।

জগদ্‌ব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দা সুরু হইলে ... জার্ম্মান সাধারণতন্ত্রকে আত্মরক্ষার জন্য সতত উদ্যত থা... হইল। ইহার বহুবিধ কারণ ছিল, যথা:—যুদ্ধ আরম্ভ হ... পরে যে লক্ষ লক্ষ লোক কোনও প্রকারে দু'বেলা ... জুটাইতেছিল, মন্দার বাজারে তাহাদের সে সুযোগটুকু নষ্ট হইয়াছিল; যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া দুঃসাধ্য ... উঠিয়াছিল; যুদ্ধের পরে যে একদল লোক বয়ঃপ্রাপ্ত ... ভোটদানের অধিকারী হইয়াছিল, তাহারা যুদ্ধকালের ... জানিত না; অথচ শান্তির কালের দুঃখ-কষ্ট বেশ ভাল ক... অনুভব করিত। জার্ম্মানীর ষ্ট্রেসেমান ও ফ্রান্সের ...

নতো মিটমাট করিবার পক্ষপাতী রাজনীতিকের মৃত্যু এবং দশ বৎসরব্যাপী নাৎসী আন্দোলনের ফলও জার্মান সাধারণ তন্ত্রকে আত্মরক্ষাপরায়ণ করিয়া তুলিল। ১৯৩০ সালের জার্মান রাষ্ট্রসভার নির্ব্বাচনে নাৎসী দল ১২টি আসন হইতে একেবারে ১০৭টি আসন দখল করিয়া বসিল। কম্যুনিষ্টরাও কিছু বেশী স্থান অধিকার করিল। স্থান হারাইল 'মডারেট' দল। প্রধান রাষ্ট্র সচিব হাইনরিখ ব্রানিং (Heinrich Bruening) ছিলেন নাৎসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে এক প্রার্থ বাধা। রাষ্ট্র সভায় তাঁহার পক্ষের সর্ব্বোচ্চ দল না থাকা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের সহায়তায় তিনি ক্রমান্বয়ে বহু হুকুমনামার (decrees) সাহায্যে শাসন যন্ত্র চালাইতেছিলেন। ১৯৩২ সালে আবার প্রেসিডেন্টের নির্ব্বাচন আসিয়া পড়িল। ব্রানিং পারিলে ঐ নির্ব্বাচনকে পিছাইয়া দিতেন, কিন্তু ঐরূপ করিলে নাৎসী দল দেশময় একটা হাঙ্গাম ফ্যাসাদ বাধাইয়া বসিতে পারে এই ভয়ে তিনি তাহা করিলেন না। হিণ্ডেনবুর্গের অসাধারণ জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও হিটলার প্রেসিডেন্ট পদে নির্ব্বাচিত হইবার আশা করিল। সমগ্র যুরোপখণ্ড উদ্বিগ্ন ভাবে আশঙ্কা করিল—পাছে হিটলারের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে, অথবা জার্ম্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে আবার লড়াই সুরু হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে হিণ্ডেনবুর্গের নির্ব্বাচন আশঙ্কা করিয়া ১৯২৫ সালে সারা যরোপ চিন্তিত হইয়াছিল সেই হিণ্ডেনবুর্গ যুরোপীয় শান্তির চরম আশ্রয় বলিয়া বিগণিত হইলেন!

সে যাহাই হউক এবারেও প্রায় গত নির্ব্বাচনের ব্যাপারই পুনরাবৃত্ত হইল। দুই বার নির্ব্বাচন ও ভোট গ্রহণ করিতে হইল। দ্বিতীয় বারে হিণ্ডেনবুর্গ ১,৯৩,৫৯,৯৮৩ ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইলেন; হিটলার পাইলেন ১,৩৪,১৮,৫৪৭ ভোট এবং কম্যুনিষ্ট দল ৩৭,০৬,৭৫৯ ভোট। হিণ্ডেনবুর্গের জয়লাভে জগতের লোক এই ভাবিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল যে, হিটলারের আন্দোলনে ভাটা পড়িতে সুরু হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই স্বস্তির ভাব একটু অকালপ্রসূত (premature)। কারণ, স্পষ্ট দেখা গেল হিটলারের পক্ষে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ভোট রহিয়াছে এবং তাহাকে ঠেকাইতে পারে শুধু একজন রাজভক্ত পঁচাশী বৎসরের প্রুশিয়ান সেনানী, যাহার যুদ্ধের সুনাম বশতঃ ভোট সংগ্রহে বিশেষ সুবিধা ছিল।

মে মাসে ব্রানিং পদত্যাগ করিলেন। এক কারণ, জনসাধারণের বিরুদ্ধতায় শাসন পরিচালনা ব্যাপারে তিনি অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; অপর কারণ, বড় বড় জার্ম্মান জমিদারীগুলিকে ছোট ছোট চাষীর খামারে পরিণত করার তাঁহার যে কল্পনা ছিল তাহাতে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ রাজী হন নাঃ। হিণ্ডেনবুর্গ তাহার স্থলে ফ্রানৎস ফোন পাপেন (Franz von Papen) নামক একজন রাজতন্ত্রীকে ঐ পদে নিযুক্ত করেন। ঐ পাপেন একবার যুক্তরাষ্ট্রে বসিয়া অবৈধ ষড়যন্ত্র চালাইবার অপরাধে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্র সভায় নূতন নির্ব্বাচন গ্রহণ করিলেন। তাহাতে নাৎসীদের সংখ্যা ১০৭ হইতে ২৩০ এ উঠিল। এরূপ বিরুদ্ধতার মধ্যে কোন কাজই

ব্রেই সমান

সম্ভবপর নয়, বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট ভোটও যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। নবেম্বরে পাপেন আবার ভোটারগণের দ্বারস্থ হইলেন। তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না। কম্যুনিষ্টরা আবার বেশী আসন লাভ করিল। মোট ১০০ আসন পাইল এবং নাৎসীরা কিছু আসন হারাইল। কিন্তু কোন পক্ষই কাজ চালাইবার মত দল (majority) গড়িতে সক্ষম হইল না। হিটলার এমন কোন যুক্ত দলের (coalition) মন্ত্রিত্ব লইতে চাহিলেন, না যেখানে তাঁহার ষোল আনা কর্ত্তৃত্ব চলিবে না।

হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে সর্ব্বময় ক্ষমতা দিতে তখনও অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই ফোন পাপেনকে পরিত্যাগ করিয়া জেনারেল কুর্ট ফোন শ্লাইখের (Kurt von Schleicher) নামক রাজতন্ত্রী এক ব্যক্তিকে প্রধান সচিব নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি গোড়াতেই শাসন সমস্যার সমাধান করিতে অক্ষম হইলেন। তখন নিরুপায় হিণ্ডেনবুর্গকে হিটলারের শরণাপন্ন হইতে হইল। ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারি তাঁহার আমন্ত্রণে হিটলার জার্ম্মানীর প্রধান সচিবের (Chancellor) পদ গ্রহণ করিলেন। জার্ম্মানীর ইতিহাসে নাৎসী যুগের আরম্ভ হইল। এই যুগ তাহার বর্ত্তমান যুগ।

আবাহন

—শ্রীকানাইলাল দেবশর্ম্মা

সোয়ামীর অনুমতি লয়ে
উমারাণী আসিবে হেথায়।
মোদের এখানে র'বে দিন গুটি কয়।

এরই লাগি দেখি চেয়ে
সব ঠাঁই পড়িয়াছে সাড়া!
মাঠঘাট ভরিয়াছে আলোয় আলোয়
হেথায়-হেথায় যেন কেমন উচ্ছ্বাস!
মা গো তুই জানিস যে যাদু
যাদুকর বাপ ছিল তোর।
দিকে দিকে পড়িয়াছে সোর
আসিতেছে দশভুজা মাতা।
রোগ-শোক নয়নের জল
এতকাল ছিল যাহা, আর রবে না তা'।
সংসার উঠিবে ভরি'
দূর হ'তে আসিবে প্রবাসী;
নিরানন্দ হাসিবে এবার
উমা দিবে সব দুখ নাশি।

জমিদার রায়েদের বাড়ী
কালই সব পড়েছে আসিয়া
লয়ে কত পূজার সম্ভার।
ঢপ যাত্রা মহা সমারোহ
তোমার প্রতিমা তারা
গড়িয়াছে খুব বড় করি।
প্রেমানন্দ পুরোহিত
যা'র বড় নাহিক সাধক
এ দেশেতে আর
রায়েদের বাড়ীতে এবার
করিবেন অর্চ্চনা তোমার।
ধনে পুত্রে সুখে সুখে
রায়েদের যাচ্ঞার ডালি
ভরি দিবে উমারাণী
হাসিমুখে বরাভয় ঢালি।

মোর ঘরে নাই বিত্ত
নাই কোলাহল।
মণ্ডপের টিনগুলি
ফুটো হয়ে গেছে।
ছেলেটাও রোগশয্যা পাতি
রয়েছে বিদেশে—
একা আমি অনাথ সন্তান তোর।
মা-যে নাই মোর।
উপচার কোথা' পাই
অর্থ মোর নাই।
কোথা পা'ব ষড়ৈশ্বর্য্য
করিবারে তব অভিষেক?
বছরের মাঝে তিন দিন
করিব তোমার পূজন
তা-ও মোর সাধ্যের অতীত।
বড় দুখী, বড় অভাজন
আমি তব অধম সন্তান।

দুঃসাহস তবু করিয়াছি
ও-পাড়ার শ্রীনাথেরে লয়ে
(যা'র চেয়ে শ্রী-হীন অনাথ
মোরে ছাড়া কেহ নাই গাঁয়ে)
আয়োজন পূজার তোমার।
যোয়ান ছেলেটা মরে
বিদেশেতে ম্যালেরিয়া জ্বরে;
সংসারের অভাব-পীড়ন
যুগভরা রোগ-জরা
মিটিছে না আর···
আসিবে তো রায়বাড়ী
তার'ই কোন ফাঁকে
একবার আসিও জননী!
নহে বেশী ঘুরপথ মাগো,
মাঠখানি পার হয়ে সীমানার ধারে
মোর বাড়ী রায়েদের নহে বেশী দূরে।
অন্তর জ্বালিয়া মা গো
প্রতীক্ষায় থাকিব তোমার।
দয়া করি মোর বাড়ী আসিও এবার!

মণি ডাক্তার

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ় মাসের প্রথমে জ্যৈষ্ঠের গরমটা কাটিয়া গিয়াছে তাই রক্ষা, যে কষ্ট পাইয়াছিলাম গত মাসে! এই বাগান-ঘেরা হাটতলায় কি একটু বাতাস আসে?

কিছু করিতে পারিলাম না এখানেও। আছি তো আজ দেড় বছর। শুধু এখানে কেন, বয়স তো প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ ছাড়াইতে চলিয়াছে, এখনও পর্য্যন্ত কি করিলাম জীবনে? কত জায়গায় ঘুরিলাম, কোথাও না হইল পসার, না জমিল প্র্যাক্‌টিস্। বাগ আঁচড়া, কলা-বোধা, শিমুলতলী, সত্রাজিৎপুর, বাদাম গাঁ, কত গ্রামের নামই বা করিব। কোথাও মাস কয়েকের বেশী চলে না। এই পলাশপাড়ায় যখন প্রথম আসি, বেশ চলিয়াছিল কয়েক মাস। ভাবিয়াছিলাম ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন বুঝি। কিন্তু তার পরেই কি যে ঘটিল, আজ কয়েক মাস একটি পয়সার মুখ দেখিতে পাই না।

এখন মনে হয় কুণ্ডু বাবুদের আড়তে যখন চাকুরী করিতাম শ্যামবাজারে, সেই সময়টাই আমার খুব ভাল গিয়াছে। আমাদের গ্রামের একজন লোক চাকুরীটা জুটাইয়া দিয়াছিল; খাতাপত্র লিখিতাম, হাতের লেখা দেখিয়া বাবুরা খুসী হইয়াছিল। আট নয় মাসের বেশী সেখানে ছিলাম, তার মধ্যে কলিকাতায় যাহা কিছু দেখিবার আছে, সব দেখিয়াছি। চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, বায়োস্কোপ, থিয়েটার, পরেশনাথের বাগান, কালীঘাটের কালীমন্দির। কি জায়গাই কলিকাতা!

চাকুরীটি যাইবার পরে পরের দাসত্বের উপর বিতৃষ্ণা হইল। ভাবিলাম, ডাক্তারী ব্যবসা বেশ চমৎকার স্বাধীন পেশা। কুণ্ডু বাবুদের বাড়ীর ডাক্তার বাবুকে ধরিয়া তাঁহার ডিসপেন্সারিতে বসিয়া মাস দুই কাজ শিখিলাম। কিছু বাংলা ডাক্তারী বই কিনিয়া পড়াশুনাও করিলাম। তারপর হইতেই নিজের দেশ ছাড়িয়া এই সুদূর যশোহর জেলার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।

এ গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস নাই, হিন্দুর মধ্যে কয়েক ঘর গোয়ালা ও কলু আছে, বাকী সব মুসলমান। পলাশপুরে কারও কোঠাবাড়ী নাই, সকলে নিতান্ত গরীব, সকলেরই খড়ের ঘর। খুব বেশী লোকের বাসও যে এখানে আছে, তাও নয়। যদি বলেন এখানে কেন ডাক্তারী করিতে আসিয়াছি, তার একটা কারণ নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামের মধ্যে এখানেই হাট বসে। এমন কিছু বড় হাট নয়, তবুও বুধবারে ও শনিবারে অনেকগুলি গ্রামের লোক জড় হয়।

হাটতলায় ক'খানা খড়ের আটচালা ও সবাইপুরের গাঙ্গুলীদের ছ'আনি তরফের কাছারী-ঘর আছে। কাছারী-ঘরখানা দেওয়ালবিহীন খড়ের ঘর। বছরের মধ্যে কিস্তীর সময় জমিদারের তহশীলদার আসিয়া মাস দুই থাকিয়া খাজানাপত্র আদায় করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং ঘরখানা ভাল করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। ঘরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সারা মেজেতে ইঁদুরের গর্ত্ত, মটকা দিয়া বর্ষার জল পড়ে, ঝড়-ঝাপটা হইলে ঘরের মধ্যে বসিয়াও জলে ভিজিতে হয়! ছ'আনির বাবুদের এ হেন কাছারী-ঘরে নায়েবকে বলিয়া কহিয়া আশ্রয় লইয়া আছি।

একাই থাকি। এ দিকের সব গাঁয়ের মত এ গাঁয়েও বনজঙ্গল, বাঁশবন, প্রাচীন আমের বাগান বড় বেশী। হাটতলার তিনদিক ঘিরিয়া নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান, একদিকে শুঁড়ি জঙ্গলের গা ধরিয়া আধপোয়া পথ গেলে বেগবতী নদী—স্থানীয় নাম বেতনা। বনজঙ্গলের দরুণ দিনের বেলাও হাটতলাটা যেন খানিকটা অন্ধকার দেখায়, রাত্ত হইলে হাটতলায় লোকজন থাকে না, দু' একখানা যা দোকানপত্র আছে, দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার পরে হাটতলা একেবারে নির্জ্জন হইয়া পড়ে, বনে, ঝোপে ঝাড়ে বাঁশবাগানে জোনাকী জলে, কচিৎ ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের দুর্গন্ধ বাহির হয়, উত্তর দিকের শিমুলগাছটায় পেঁচা ডাকে, আমি একা বসিয়া ভাত রাঁধি, কোন কোন দিন

ভাত চড়াইয়া দিয়া একতারাটা হাতে লইয়া আপন মনে গান করি।

আজ ছয় সাত মাস একটা পয়সা আয় নাই। হাটে ঢেঁড়া পিটাইয়া দিয়াছি, চার আনা ভিজিট লইব, ওষুধের দাম দাগপিছু এক আনা। তবুও রোগীর দেখা নাই। ভাগ্যে মুজিবর রহমান লোকটা ভাল, নিজের দোকান হইতে আজ চার পাঁচ মাস ধারে চাল ডাল দেয়, তাই কোন রকমে চলিতেছে।

গোয়ালা-পাড়ায় দামু ঘোষের বাড়ী একটা নিমোনিয়া কেস ছিল গত মাসে। মুজিবর এদিকের মধ্যে মাতব্বর লোক, সবাই তার কথা মানে, তাকে ধরিয়া সুপারিশ করাইয়াছিলাম দামু ঘোষের কাছে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমায় না ডাকিয়া ডাকিল গিয়া বলরামপুরের অবিনাশ সেক্‌রা কবিরাজকে। অবিনাশ কবিরাজের ওপর তাদের না কি অশেষ বিশ্বাস।

সুবাসিনীকে লইয়া হইয়াছে মুস্কিল। বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত তাকে বাপের বাড়ী ফেলিয়া রাখিয়াছি। একখানা ভাল কাপড় পর্য্যন্ত কোন দিন দিতে পারি নাই, ছেলেটির দুধের দাম সাত আট টাকা বাকী, শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ তাগাদা করিয়া চিঠির উপর চিঠি দেন, কোথায় পাইব সাত আট টাকা, নিজেই পাই না পেটে খাইতে। টাকা দিতে পারি না বলিয়া শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ মহা অসন্তুষ্ট, তিনি ভাবেন কত টাকাই রোজগার করিতেছি ডাক্তারীতে।

কেহ বলিলে হয় তো বিশ্বাস করিবে না, আজ চার পাঁচ মাস এক রকম শুধু ভাত খাই। তরকারীপত্র কিনিবার পয়সা কোথায়? পাড়াগাঁ হইলেও এখানে জিনিসপত্র উৎপন্ন হয় না বলিয়া অতিরিক্ত আক্রা—পটল দুই আনা সের, আলু ছয় পয়সা। মাছ চার আনা, ছয় আনার কম নয়। কেহ দেখিতে পাইবে বলিয়া খুব ভোরে নদীর ধার হইতে শুশুনি আর কাঁচড়াদাম শাক তুলিয়া আনি মাঝে মাঝে। আজকাল আমের সময়, শুধু আমভাতে আর ভাত; কতদিন শুধু নুন দিয়াই ভাত খাইয়াছি।

[illegible]য়া ডাক্তার নই, কিন্তু তাতে কি? বাড়ী বসিয়া [illegible] কি আর ডাক্তারী শেখা যায় না? আজ সাত আট বছর তো ডাক্তারী করিতেছি, অভিজ্ঞতা বলিয়া একটা জিনিসও তো আছে! পাশকরা ডাক্তারের হাতে কি আর রোগী মরে না? ধোপাখালির ইন্দু ডাক্তার আসিয়া বিধু গোয়ালিনীর মেয়েটাকে বাঁচাইতে পারিয়াছিল?

তবে কেন যে দুষ্ট লোকে রটাইয়াছে, মণি ডাক্তারের ওষুধ খাইলে জ্যান্ত মানুষ মরিয়া ভূত হয়, ইহার কারণ কে বলিবে? আমি গরীব বলিয়া আমার দিকে কেউ হয় না, এক মুজিবর ছাড়া—ঐ লোকটা আজ তিন চার মাস বিনা আপত্তিতে নিজের দোকান হইতে চাল ডাল না দিলে আমাকে উপবাস করিতে হইত। সে আমার জন্যে যত করিয়াছে, এ অঞ্চলের কেহ তাহার সিকিও কোন দিন করে নাই। তাহার ঋণ কখনও শোধ করিতে পারিব না।

এ সব অজ-পাড়াগাঁ। রেলষ্টেশন হইতে দশ বারো ক্রোশ দূরে। কাছে কোন বড় বাজার কি গঞ্জ নাই, লোকজন নিতান্ত অশিক্ষিত; রোগ হইলে ডাক্তার ডাকার বদলে জল-পড়া তেল-পড়া দিয়া কাজ সারে। ফকির ডাকাইয়া ঝাড়ফুঁক করে, বলে অপদেবতার দৃষ্টি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিবার রেওয়াজই নাই।

বাড়ী যাই নাই আজ দেড় বছর। পলাশপাড় আসিবার আগে কিছুদিন ছিলাম সত্রাজিৎপুরে, তখন হইতেই যাই নাই। বাড়ী মানে শ্বশুরবাড়ী—নিজের বাড়ীঘর বলিয়া কিছু নাই অনেক দিন হইতেই। শ্বশুর-বাড়ী যাইতে হইলে আট ক্রোশ হাঁটিয়া নাভারণ ষ্টেশনে রেলে চাপিতে হইবে। সেখান হইতে মসলন্দপুর ষ্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে যাইতে হইবে খোলাপোতা সেখানে মার্টিন লাইনের ছোট রেলে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত গিয়া ইছামতীতে নৌকায় ছয় সাত ঘণ্টা গেলে তবে শ্বশুর বাড়ী। সবশুদ্ধ তিন চার টাকা খরচ পড়ে—যখনই টাকা হাতে আসিয়াছে, তখনই মণি অর্ডার করিয়া সুবাসিনী নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—তিন চার টাকার মুখ একসঙ্গে কমই দেখিয়াছি আজ দু'বছরের মধ্যে। টাকা না পাঠাইলে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের আর আমার বিধবা শালী গঞ্জনার চোটে বেচারীকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে হয়।

তাই এবার যখন আসি, খাওয়া-দাওয়া সারিয়া নৌকায় চড়িব, সুবাসিনী কোণের ঘরে ডাকিয়া বলিল—

শোন, এবার আমায় এখানে বেশীদিন ফেলে রেখ না—তুমি যেখানেই থাক, আমায় নিয়ে যেয়ো শীগ্‌গির।

—সেই সব পাড়াগাঁয়ে কি আর থাকতে পারবে?

—এই বা এমন কি সহর? তা ছাড়া তুমি যেখানে থাকবে, সেইখানেই আমার সহর। এখানে দিদির বাক্যির জ্বালায় এক এক সময় মনে হয় গলায় দড়ি দিই, কি গাঙে ডুবে মরি।

—সবই বুঝি সুবি, আমার যদি একটুকু সংস্থান হয় কোথাও, তবে তোমাকে ঠিক সেখানে নিয়ে যাব। আমিই কি তোমাকে আর কোথাও ফেলে মনের সুখে থাকি ভাব? তবে কি করি বল—

শাশুড়ী ঠাকরুণ বলিলেন—তুমি বাপু অমনি নিউদ্দিশ হয়ে থেক না গিয়ে। আমার এই আবস্থা, সংসারে একপাল কুপুষ্যি কোথা থেকে কি করি বল তো? এক কাঁড়ি দুধের দেনা গোয়ালার কাছে, ছেঁড়া কাপড় পরে পরে দিন কাটায়, মা হয়ে চোখের সামনে দেখতে পারিনে বলে এক জোড়া কাপড় কিনে এনে দিয়েছিলাম, তার দাম এখনও বাকী—তোমার তো বাপু এখান থেকে চলে গেলে আর চুলের টিকি দেখা যায় না—কি যে আমি করি, এমন পুরুষ মানুষ বাপের জন্মে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই অবস্থায় আসিয়া আজ দেড় বছর শ্বশুরবাড়ী মুখো হই নাই। অবশ্য এর মধ্যে মাঝে মাঝে হাতে যখন যা আসিয়াছে, সুবাসিনীর নামে পাঠাইয়া দিয়াছি—কিন্তু সব শুদ্ধ ধরিলে, খরচের তুলনায় তার পরিমাণ খুব বেশী তো নয়। কিন্তু আমি কি করিব, চেষ্টার তো ত্রুটী করিতেছি না! চুরি-ডাকাতি তো আমি করিতে পারি না!

সত্যই, সুবাসিনীকে বিবাহ করিয়া পর্য্যন্ত বেশী দিন তাহার সাথে একত্র থাকিবার সুযোগ আমার হয় নাই। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, একটা কিছু সুবিধা হইলেই তাহাকে লইয়া গিয়া কাছে রাখিব। কিন্তু বিবাহ করিয়াছি আজ ছয় সাত বছর, তার মধ্যে এ সুযোগ কখনও হইল না। শ্বশুরবাড়ীতেই বা গিয়া কয়দিন থাকা যায়, একে মেয়ে এতকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তার উপর জামাই গিয়া দুদিনের বেশী দশদিন থাকিলেই শাশুড়ী ঠাকরুণ স্পষ্ট বিরক্ত হইয়া উঠেন বেশ বুঝিতে পারি, কাজেই বুদ্ধিমানের মত আগেই সরিয়া পড়ি। নিজের মান নিজের কাছে।

একদিন শুনিলাম পানখোলার পাঠশালায় একজন মাষ্টারের পোষ্ট খালি আছে। মুজিবর রহমানের দোকানে সকালে বিকালে বসিয়া দুই একটা সুখ-দুঃখের কথা বলি, সে আমায় পরামর্শ দিল, মাষ্টারির জন্যে চেষ্টা দেখিতে।

বাড়ী আসিয়া কথাটা ভাবিলাম। সাত আট বছর ডাক্তারি করিয়া তো দেখা গেল পেটের ভাত জুটান দায়—তবুও একটা বাঁধা চাকুরী করিলে, মাস গেলে যত কমই হোক, কিছু হাতে আসিবে।

খবর লইয়া জানিলাম, মকরন্দপুরের শ্রীনাথ দাস ঐ পাঠশালার সেক্রেটারী। পরদিন সকালে রওনা হইলাম মকরন্দপুরে।

মকরন্দপুর এখান হইতে সাত আট ক্রোশের কম নয়। সকালে স্নান সারিয়া দুটি চাল গালে দিয়া জল খাইয়া বাহির হইলাম। মকরন্দপুর কোন্ দিকে আমার ঠিকমত জানা ছিল না, পলাশপুর ছাড়াইয়া অম্বিকাপুরের কলুবাড়ীর কাছে যাইতে কলুরা বলিয়া দিল, মিটকিপোতার খেয়া পার হইয়া নককুলের মধ্য দিয়া গেলে, দেড় ক্রোশ রাস্তা কম হইতে পারে।

সকাল আটটার মধ্যে খেয়া পার হইলাম। একটি ছোট ছেলে আমার সঙ্গে এক নৌকায় পার হইল। মাঠের মধ্যে কিছুদূর গিয়া সে একটা বটগাছের তলা দেখাইয়া বলিয়া দিল—ঐ গাছতলা দিয়ে চলে যান বাবু, বাঁ দিকে নককুলের রাস্তা।

রোদ বেশ চড়িয়াছে। ছোট একটা খাল হাঁটিয়া পার হইয়া বড় একটা আম্রবাগানের ভিতরে গিয়া পড়িলাম। এ সব অঞ্চলের আমবাগান মানে গভীর জঙ্গল। তার মধ্যে অতি কষ্টে পথ খুঁজিয়া লইয়া বাগানটা পার হইয়া যাইতেই একটা কোঠাবাড়ী দেখা গেল। ক্রমে অনেকগুলি দালান-কোঠা পথের ধারে দেখা যাইতে লাগিল। অধিকাংশই পুরাতন, প্রাচীন কার্ণিসে দেওয়ালে বট-অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। গ্রামখানা ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে একটা বটগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। পিপাসা পাইয়াছে। ভাবিলাম, নককুলে কাহারও বাড়ী

জল চাহিয়া খাইলেই হইত। এদিকে শুধুই মাঠ, নিকটে আর কোন গ্রামও তো নজরে পড়ে না।

পুনরায় পথ হাঁটিতে লাগিলাম। পথে সবই চাষাদের গাঁ পড়িতে লাগিল। ব্রাহ্মণ মানুষ, যেখানে সেখানে তো জল খাইতে পারি না?

সুঁদরপুর, চাতরা, নলদি, মামুদপুর…

তারপরেই পড়িল আর একটা মাঠ। বেলা তখন দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে। কিছু খাইতে পাইলে ভালই হইত—পেট জ্বলিয়া উঠিল। আপাততঃ জল খাইলেও চলিত। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড কি ছাই এ দিকে কোথাও একটা টিউব-ওয়েলও করিয়া দেয় নাই কোন গ্রামে? মাঠের মধ্যে কোথাও কি একটা পুকুর নাই?

এত পথ হাঁটা অভ্যাস ছিল না। ক্লান্ত হইয়া আর একটা গাছতলায় বেশী রোদের সময়টা বসিতেই কখন ফিরফিরে হাওয়ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, উঠিয়া দেখি বেলা পড়িয়া গিয়াছে। সূর্য্য পশ্চিমধারে হেলিয়া মামুদপুরের আমবন বাঁশবনের আড়ালে গিয়া পড়িয়াছে।

মেটেরাস্তায় হাঁটিয়া যখন নদীর ধারে পৌঁছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পৌঁছিয়া দেখি খেয়াঘাট কচুড়ি-পানায় বুঁজিয়া গিয়াছে, খেয়ার নৌকাখানি ডুবান অবস্থায় এপারে বাঁধা। কোথাও জনপ্রাণী নাই।

কি বিপদ্! এখন পার হওয়ার কি করি? নিকটে একটা চাষা গাঁ। সেখানে খোঁজ লইয়া জানিলাম, কচুড়ি-পানায় ঘাট বুঁজিয়া যাওয়ায় সেখানকার খেয়া আজ মাস-খানেক যাবৎ বন্ধ। আরও ক্রোশখানেক উজানে খালিশ-পুরের ঘাটে খেয়া পড়িতেছে।

এই অবস্থায় মাঠ ভাঙিয়া এক ক্রোশ নদীর ধারে ধারে খালিশপুর পর্য্যন্ত যাওয়াও তো দেখিতেছি বড় কষ্ট! পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—পোয়াটাক পথ গিয়া একটা বড় শিমুলগাছের নীচে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।

অন্ধকারে আধ মাইল হাঁটিয়া নদীর পারে একটা শিমুল গাছ দেখা গেল বটে, কিন্তু জল সেখানে বিশেষ কম বলিয়া মনে হইল না। ডাঙার কাদায় মানুষের পায়ের দাগ দেখিয়া ভাবিলাম হইবেও বা, এখানে পারাপার হইয়াছে বটে লোকজন। জলে তো নামিলাম, জল ক্রমে হাঁটুর উপর ছাড়াইয়া কোমরে উঠিল। কোমর হইতে বুক, বুক হইতে গলা। কাপড়-জামা ভিজিয়া গাতা হইয়া গেল—তখনও জল উঠিতেছে—নাকে আসিয়া যখন ঠেকিল, তখন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়া ডিঙি মারিয়া চলিতেছি। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে,—ভয় হইল একা এই অন্ধকারে অজানা নদী পার হইতে কুমীর না ধরে! বড় কুমীর না আসুক, দুই একটা মেছো কুমীরেও তো গুঁতাটা আসটা দিতে পারে!

কোন রকমে ওপারে গিয়া উঠিলাম। কোন দিকে লোকালয় নাই, একটা আলোও জলে না এই অন্ধকারে। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে দুইদিকে রাস্তা গিয়াছে। মকরন্দপুরের রাস্তা কোন্ দিকে—ডাইনে না বাঁয়ে? কে বলিয়া দিবে, জনমানবের চিহ্ন নাই কোথাও। ভাগ্য আবার এমনই, ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পথটি ধরিলাম, সেইটিই কি ঠিক ভুল পথ! আধক্রোশ তিনপোয়া পথ হাঁটার পরে এক বাগ্দীবাড়ীতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—আমি তিনপোয়া পথ উল্টাদিকে আসিয়া পড়িয়াছি। যাওয়া উচিত ছিল ডাইনের পথে, আসিয়াছি বাঁয়ের পথে।

আবার তখন ফিরিয়া গিয়া সেই পথের মোড়ে আসিলাম। সেখান হইতে ডাইনের পথ ধরিলাম। এইবার পথে বিষম জঙ্গল। বড় বড় আমবাগান, বাঁশবন, আর ভয়ানক আগাছার জঙ্গল। আমি জানিতাম, এখানে খুব বাঘের ভয়। দিনমানে গরু-বাছুর বাঘে লইয়া যায়—একবার আমি একটা রোগীর চিকিৎসা করি, তাহার কাঁধে গো-বাঘায় থাবা মারিয়াছিল।

ভীষণ অন্ধকার—রাস্তা হাঁটা বেজায় কষ্ট, পাকা আম পড়িয়া পথ ছাইয়া আছে—এ সব অঞ্চলে এত আম যে, আমের দর নাই, তলায় পড়া আম কেউ বড় একটা কুড়ায় না। অন্ধকারে আমের উপর পা দিয়া পা পিছলাইয়া যাইতে লাগিল। আম তো ভাল, সাপের ঘাড়ে পা দিলেই আমার ডাক্তারলীলা অচিরাৎ সাঙ্গ করিতে হইবে, তাই ভাবিতেছি।

অতি কষ্টে মকরন্দপুর পৌঁছিলাম রাত নয়টার সময়। সেক্রেটারী শ্রীনাথ দাসের বাড়ীতেই রাত্রে আশ্রয় লইলাম।

কিন্তু চাকুরী মিলিল না, যাতায়াতই সার। পরদিন সকালে শ্রীনাথ দাস বলিল—এ মাসে নয়, আশ্বিন মাস থেকে ভাবছি লোক নেব। ইস্কুলের অবস্থা ভাল নয়। ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্য আছে মাসে দশ আনা, সেইটিই ভরসা। ছাত্রদত্ত বেতন মাসে ওঠে মোট তের সিকে। দুজন মাষ্টার কি করে রাখি? তা আপনি আশ্বিন মাসের দিকে একবার খোঁজ করবেন।

গেল মিটিয়া। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাইব কি যে বানগোলা ইউ-পি পাঠশালায় দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদের জন্য বসিয়া থাকিব। বেতন শুনিলাম পাঁচ টাকা। হেড পণ্ডিত পান নয় টাকা।

সারাদিন হাঁটিয়া আবার ফিরিলাম পলাশপুরে। সন্ধ্যা হবতে। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, পা টন্‌টন্‌ করিতেছে। মুজিবর জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ডাক্তার বাবু? তাহাকে সব বলিলাম, তারপর নিজের অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ভাঙা লণ্ঠনটা আনিলাম। নদীর ঘাট হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া মাদুরটা বিছাইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষুধা খুবই পাইয়াছিল, কিন্তু উঠিয়া রাঁধিবার উৎসাহ মোটেই ছিল না। গোটাকতক আম খাইয়া রাত্রি কাটিল।

অন্ধকারে শুইয়া শুইয়া কত কথা ভাবি। একা একা কাটাইতে হয়, কথা বলিবার মানুষ পাই না, এই হইয়াছে সকলের চেয়ে কষ্ট। কি করিয়া যে দিন কাটে! ইচ্ছা হয় স্ত্রীকে আনিয়া কাছে রাখিতে। কতকাল তাহাকে দেখি নাই। তাহার একটু সেবা পাইতে সাধ হয়। এত সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া আসিলাম, ইচ্ছা হয় কাছে বসিয়া একটু গল্প করুক, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সুখে থাকিব। কিন্তু আনি কোথা হইতে? খাওয়াই কি?

হাটতলায় কি ভীষণ অন্ধকার! মাত্র দুখানি দোকান, তাও দোকানীরা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে বড় বড় গাছপালার অন্ধকারে জোনাকী জ্বলিতেছে, বিলাতী আমড়াগাছটার বাদুড়ে ডানা ঝট্‌পট্‌ করিতেছে।

গভীর রাত্রি হইয়াছে, কিন্তু গরমে ঘুম আসে না চোখে। কি বিশ্রী গুমোট! সারারাত্রি ঢুব্‌ঢাব্‌ শব্দে পাকা আম পড়িতেছে চারিদিকের আমবাগানে, শুইয়া শুইয়া শুনিতেছি।

উঃ, কি একঘেয়েই হইয়া উঠিয়াছে এখানকার জীবন! সকালে উঠিয়া নদীর ধারে একটু বেড়াইয়া আসিয়া সেই যে হাটতলায় ফিরিয়া আসি, বেশীদূর কোথাও বেড়াইতে যাইতে পারি না, কি জানি রোগী আসিয়া যদি ফিরিয়া যায়? সারাদিন ডিস্‌পেন্‌সারি আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, আশায় আশায়।

মুদি জোড়া আঁখি বসি তমালের তলে
শান্তিমদে মাতি ভাবি পাইব
পাদপদ্ম। কাঁপে হিয়া দুরু দুরু করি—

আর তা ছাড়া যাবই বা কোথায়? চাষা গাঁ, কোন ভদ্রলোকের বাড়ী নাই যে বসিয়া একটু গল্প-গুজব করি। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই আমার ফুটো খড়ের ঘরের ডিস্‌পেন্সারী আর মুজিবরের দোকান, দোকান আর ডিস্‌পেন্সারী। কোন কোন দিন সন্ধ্যার দিকে পিপলি পাড়ার বিলের ধারে বেড়াইতে গিয়া দেখি বাগ্দীরা কি পল্লিয়া ডোঙায় উঠিয়া কোঁচ ছুঁড়িয়া কই মাছ মারিতেছে। অন্ধকার দেখিয়া দুটা হয় তো শাক তুলিয়াও আনি কোন কোন দিন। একঘেয়ে আম-ভাতে ভাত অখণ্ড প্রতাপে রাজ্য চালাইতেছে তো বৈশাখ মাস হইতেই—কতদিন আর ভাল লাগে?

আমার নায়ের কপাল নয়। কাল ও পাড়ায় বিষ্ণু কলুর বড় ছেলেকে সন্ধ্যার পরে ঘানি-ঘরের দরজায় সাপে কামড়াইল, আমি শুনিয়াই ছুটিয়া গেলাম, আমায় কেহ ডাকিতে আসে নাই বটে, কিন্তু কানে শুনিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারি কি করিয়া? গিয়াই শক্ত করিয়া গোটা-কতক বাঁধন দিলাম, দষ্ট স্থান চিরিয়া পটাস্‌ পারম্যাঙ্গানেট টিপিয়া দিলাম—এমন সময় পাড়ার লোকে ওঝা ডাকিয়া আনিল। ওঝা আসিয়াই আমার বাঁধন খুলিয়া ফেলিতে হুকুম দিল। আমার নিষেধ কেহই গ্রাহ্য করিল না। বাঁধন খুলিয়া ঝাড়-ফুঁক করিতে করিতে রোগী সারিয়া উঠিল। ঝাড়-ফুক সব বাজে, আমার বাঁধনে আর পটাস্‌ পারম্যাঙ্গেনেটে কাজ হইয়াছিল—নাম হইল সেই ওঝার।

যাক্, সেই জন্য আমি দুঃখিত নয়, একজনের জীবন বাঁচিয়া গেল, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

না খাওয়ার কষ্টও সহ্য করিতে পারি। একঘেয়ে জীবনের কষ্টে একেবারে মারা যাইতে বসিয়াছি। তবুও বসিয়া বসিয়া দিবা-স্বপ্নে কাটাইয়া মনের কষ্ট মন হইতে তাড়াই।

টাকা পয়সা হাতে হইলে কি করিব বসিয়া বসিয়া তাহাও ভাবি।

সুবাসিনীকে লইয়া আসিব, খোকাকে লইয়া আসিব। নদীর ধারে মুজিবর জমি দিতে চাহিয়াছে, সেখানে দুখানা খড়ের ঘর তুলিব আপাততঃ। বাড়ীর চারিধারে ছোট একখানা ফুল বাগান করিব, যেমন স্থানীয় নায়েব বাবুর বাসায় আছে। সন্ধ্যা বেলা আধফুটন্ত বেলকুঁড়ি এই গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় রেকাবি করিয়া তুলিয়া আনিয়া কিছু ঘরে রাখিয়া দিব, কিছু সুবাসিনীর খোঁপায় পরাইয়া দিব। এখানকার তহশিলদারকে বলিয়া কিছু ধানের জমি লইয়া চাষবাস করিব, ঘরে ধান হইলে স্বচ্ছলতা আপনিই দেখা দিবে। সুবাসিনীকে বিবাহ করিয়া এ পর্য্যন্ত কখনও এতটুকু সুখী করিতে পারি নাই—তার জন্য সদাসর্ব্বদা মনটা কেমন করে। নির্জ্জনে বসিলেই তার দুঃখ ভাবিয়া প্রাণ [illegible]

ভাদ্র মাসে একদিন ডিস্‌পেন্সারি ঘরে বসিয়া আছি, দেখি যে একটি মেয়ে হাটতলায় বনের মধ্যে জামতলাটায় কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া খানিকক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—কি খুঁজছ ওখানে খুকী?

মেয়েটি লাজুক সুরে বলিল—ঘেঁটকোলের ডগা—

—কি হবে ঘেঁটকোলের ডগা?

—ঘেঁটকোলের ডগা তো খায়—

কথাটা জানিতাম না। ঘেঁটকোলের ডগা যদি খাওয়া যায়, তবে তো আমার তরকারী কিনিবার সমস্যা ঘুচিয়া যায়। হাটতলার চারিদিকের বন-জঙ্গলেই দেখিতেছি বহু ঘেঁটকোল আছে। কিন্তু গাছটি চিনিতাম না, নাম শুনিয়া আসিয়াছি বটে।

বলিলাম—কৈ, কি রকম গাছ দেখি?

মেয়েটি বলিল—এই দেখুন, কচুগাছের মত দেখতে। কিন্তু একটা পাতা তিনটে ভাঁজ করা—

—কি করে খায়?

—যেমন ইচ্ছে। ছেঁচকি করে খায়, চচ্চড়ি করেও খায়। খাবেন, দেব তুলে?

মেয়েটির কাছে একটু চাল দেখাইলাম। ডাক্তার বাবু হইয়া বুনো ঘেঁটকোলের ডগা কি করিয়া খাইব, তবে যদি নিতান্তই খাইতে হয়, সে এই অবজ্ঞাত বন্য উদ্ভিদের প্রতি নিতান্ত কৃপা করিয়াই খাইব,—এই ভাবটা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার পোষাক-পরিচ্ছদের দৈন্যের সঙ্গে আমার খাদ্যসংক্রান্ত রুচির আভিজাত্যের অসামঞ্জস্য মেয়েটির চোখে ধরা পড়িয়াছিল বোধ হয়।

বলিলাম—ও সব কচু-ঘেঁচুর ডগা কে রাঁধবে? কি করে রাঁধতে হয়?

মেয়েটি শিখাইয়া দিল, ঘেঁটকোলের ডগার ছেঁচকি রাঁধিবার প্রণালী, এক আঁটি ডগা তুলিয়া দিয়াও গেল।

যাইবার সময় আমার রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—এখানে থাকে কে?

—আমিই থাকি।

—সে কথা নয়, আপনার সঙ্গে আর থাকে কে? রেঁধেবেড়ে দেয় কে?

—কেউ না, নিজেই রাঁধি।

সেই হইতে মেয়েটি আমায় কেমন একটু কৃপার চক্ষে দেখিল বোধ হয়। যখনই সে হাটতলায় ঘেঁটকোলের ডগা সংগ্রহ করিতে আসিত—আমায় এক আঁটি দিয়া যাইত।

সকালের দিকেও আসিত, আবার বৈকালেও আসিত। একদিন বৈকালে আপন মনে বসিয়া আছি, মেয়েটি আসিয়া দাওয়ার ধারে কোঁচড় থেকে কিছু ডুমুর বাহির করিয়া রাখিয়া বলিল—এ বেলা হয়ে কলুদের পুকুরপাড় থেকে ডুমুর পেড়েছিলাম, তাই আপনাকে দুটো দিয়ে যাচ্ছি।

মেয়েটি কে তা আমি কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। মেয়েটি দেখিতে ভাল, বেশ বড় বড় চোখ, বয়েস আঠারো উনিশ হইবে। গায়ের রং যতটা ফর্সা, এ সব পাড়াগাঁয়ে ত

সুন্দর গায়ের রং প্রায়ই দেখা যায় না। তবে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরের মেয়ে নয় দেখিলেই বোঝা যায়। সেদিন তাহার পরিচয় লইয়া জানিলাম, সে এই গ্রামেরই বিধু গোয়ালিনীর মেয়ে, তার ভাল নাম সম্ভবতঃ প্রেমলতা বা ঐ রকম কিছু, সবাই 'প্রেমি' বলিয়া ডাকে। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, যেমন সাধারণতঃ আমাদের দেশে গোয়ালার ঘরে হয়।

মেয়েটি কিছুক্ষণ চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল বলিল—আপনার বিয়ে হয় নি?

—কেন হবে না?

—তবে বৌকে নিয়ে আসেন না কেন? এখানে তো আপনার রান্নাবান্নার খুব কষ্ট।

—হাঁ, তা বটে। এইবার আনব ভাবছি।

—মা বাবা আছেন?

—নাঃ।

—কোথায় আপনার বাড়ী?

—সে তুমি চিনতে পারবে না, সে অনেক দূর।

এই ভাবে আলাপের সূত্রপাত। তার পর কতদিন সকালে, বিকালে প্রেমি আসিত, কোন দিন ওলের ডাঁটা, কোন দিন ডুমুর, কোন দিন বা একটা চালতা, নিজে যা বনে জঙ্গলে সংগ্রহ করিত, তার কিছু ভাগ আমায় না দিলে তার যেন তৃপ্তি হইত না। মাঝে মাঝে ওইখানটায় দাঁড়াইয়া চালের বাতা ধরিয়া কত গল্প করিত। সরলা বালিকা কাঠ কুড়াইয়া, শাকপাতা সংগ্রহ করিয়া তার দরিদ্র মায়ের গৃহস্থালীর অভাব দূর করিতে যেমন চেষ্টা করিত, তেমনই এই দরিদ্র ডাক্তারের প্রতি গভীর অনুকম্পা বশতঃ তার ভাতের থালার উপকরণও জুটাইয়া দিত। বড় ভাল লাগিত তাকে। একটা অদৃশ্য সহানুভূতির সূত্রে সে আমাকে বাঁধিয়াছিল এবং বোধ হয় আমিও তাকে বাঁধিয়াছিলাম। পলাশপুরের হাটতলার নিঃসঙ্গ জীবনে একটি মমতাময়ী নারীর সঙ্গ বোধ হয় খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তাই সে আসিলে মনটা খুসী হইয়া উঠিত। ইদানীং সে আসিতও ঘন ঘন, নানা ছল-ছুতায়, কারণে অকারণে। আসিয়া খেইহারা কথাবার্ত্তায় থাকিয়া যাইতও অনেকক্ষণ।

এক দিন লক্ষ্য করিলাম, প্রেমি তার বেশভূষার দিকে নজর দিয়াছে। প্রথম সেদিন তার যত্ন করিয়া বাঁধা খোঁপাটির দিকে চাহিয়া আমার এ কথা মনে হইল। ফর্সা শাড়ীখানি পরিপাটী করিয়া পরিতে শিখিয়াছে। মুখের হাসির মধ্যে একদিন সলজ্জ সঙ্কোচের ভাব দেখিলাম, যে ধরণের হাসি তার মুখে নতুন। আর কত ভাবেই সেবা করিবার চেষ্টা করিত, শাক তুলিয়া, তরকারী কুটিয়া দিয়া। আগে আগে আসিয়া চালের বাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, ইদানীং দাওয়ার কোণে ওইখানটায় বসিত। তার মুখের ভাব যেন দিন দিন আরও সুশ্রী হইয়া উঠিতেছিল।

পলাশপুরে তো কত লোক আছে, হাটতলায় তো কত লোক যাতায়াত করে, এই দরিদ্র ডাক্তারের নিঃসঙ্গ জীবনের প্রতি কেহই তো অমন দরদ দেখায় নাই—তাই বলি পুরুষমানুষের মেয়েমানুষের মত বন্ধু কোথায়?

গত ফাল্গুন মাসে উপরি উপরি কয়েক দিন সে আসিল না। মনটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমন তো কখনও হয় না। দু তিন দিন পরে কানে গেল বিধু গোয়ালিনীর মেয়ের টাইফয়েড হইয়াছে। কেহ ডাকিতে না আসিলেও দেখিতে গেলাম। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, এ বয়সে টাইফয়েড, শিবের অসাধ্য রোগ। প্রাণপণে চিকিৎসা করিতে লাগিলাম—উহারা সাত দিন পরে আমার উপর আস্থা হারাইয়া ডাকাইল ইন্দু ডাক্তারকে। আমাকে রোগশয্যার পাশে দেখিয়া প্রেমি-র মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল প্রথম দিন। শুনিলাম ইন্দু ডাক্তার যে দিন দেখিতে আসিয়াছিল, সে দিন সে ইন্দু ডাক্তারের ঔষধ খাইতে চায় নাই। মরণের ছয় সাত দিন পূর্ব্ব হইতে সে অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।

আজ কয়েক মাস হইল আমি আবার যে একা, সেই একা। কে আর আমার জন্য শাক, ডুমুর, ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া দিবে, এখন আবার সেই আম-ভাতে ভাত!

বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। রাস্তাঘাটে বেজায় কাদা, মশার উৎপাত বাড়িয়াছে। হাটতলার চারিপাশের বাগানের বড় বড় গাছের মাথায় সারাদিন ধরিয়া মেঘ জমিতেছে, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িয়া আকাশ একটুখানি ফরসা

হইতেছে···আবার মেঘ উড়িয়া আসিতেছে, আবার বৃষ্টি। জলে ভিজিয়া গাছের গুঁড়িগুলির রং আবলুষের মত কালো দেখাইতেছে।

চুপ করিয়া একা বসিয়া থাকি। মনে হয় যেন কারাগারে আবদ্ধ হইয়া আছি। যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, মুজিবরের দোকানে গিয়া বসি। নীচু চালাঘরের দোকান, রেড়ির তেল, কেরোসিন তেল, জিরেমরিচ, খড়িমাটী, কড়া তামাক, আলকাতরা, পচা সর্ষের তেল, সব মিলিয়া কেমন একটা গন্ধ দোকানঘরটায়। গন্ধটায় মন হু হু করে, মনে হয় এ কোথায় পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া আছি! কবে এ বেড়াজালের নাগপাশ হইতে মুক্তি পাইব? আদৌ মুক্তি পাইব কি না তাই বা কে জানে? জীবনটা যেন কেমন ধারা হইয়া গেল। তবুও যদি—এত কষ্টেও এই একঘেয়ে অজ পাড়াগাঁয়েও, আমার মনে হয়, সব কষ্ট সহ্য করিতে পারিতাম, যদি সুবাসিনী ও খোকা কাছে থাকিত।

একবার যখন কলিকাতায় থাকিতাম, ভবানীপুর দিয়া আসিতেছি, দেখি একটা বড় বাড়ী হইতে দলে দলে মেয়েরা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছে। নানা বয়সের মেয়ে আছে তার মধ্যে।

ভাবিলাম—এ কি? এত মেয়ে আসে কোথা হইতে? ব্যাপার কি একবার দেখিতে হইতেছে তো!

তার পর জানিলাম—সেটা একটা মেয়েদের কলেজ। কি চমৎকার সব মেয়ে ছিল তার মধ্যে। কেমন সব শাড়ী পরণে, কেমন চশমা, কি রূপ! আর একবার দেবেন্দ্র ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলাম, একটি বড়লোকের বাড়ীর দোতলায় কোন্ এক মেয়ে গান গাহিতেছিল, দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া শুনিলাম। অমন সুন্দর গান তার পর আর কখনও শুনি নাই। কোথায়ই বা শুনিব? গানের কয়েকটি লাইন এখনও মনে আছে।

প্রিয় তুমি আস নাই আজ ভোরে
মধুমালতীর নয়নে শিশির দোলে।

সে সব গান আমাদের মত মাটীর মানুষের জন্য নয়।

সারাদিন ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির পরে সন্ধ্যার সময়টা একটু বাদলা থামিয়াছে। গাছপালার অন্ধকারের সঙ্গে আকাশের অন্ধকার মিলিয়া হাটতলা যেমন নির্জ্জন, তেমনই অন্ধকার। ডোবার জলে মনের আনন্দে ব্যাঙ ডাকিতেছে, প্রেম যেখানে ঘেঁটকোলের ডগা তুলিয়া বেড়াইত, সেই সব শুষণী বনে ঝিঁ ঝিঁ পোকার দল একঘেয়ে ডাক জুড়িয়া দিয়াছে। জামগাছের উঁচু ডালটা হইতে দমকা হাওয়ায় ছড় ছড় করিয়া পাকা জাম বনের মধ্যে অন্ধকারে জলে ভেজা শেওড়াবনের মাথায় পড়িতেছে।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় একা বসিয়া ভাবি···

বোধিসত্ত্বের প্রার্থনা

—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

অশ্রু-সজল ব্যথিত ধরায় ঘুচাতে বেদন-ভার,
লক্ষ লক্ষ জনমে লভিব দুঃখের সংসার।
আমি হব হেথা ক্ষুধার অন্ন—তৃষ্ণার বারিধারা,
ব্যথিত করুণ নয়ন-সলিলে গলিয়া হইব হারা;

দুঃখ-শোকের সান্ত্বনা হব—নিরাশার বুকে আশা,
রুদ্ধ হিয়ার অতলে জাগিব অস্ফুট মৃদু ভাষা;
অন্ধকারের গহন গভীরে একাকী জ্বালিব আলো,
জগতের সনে হাসিয়া কাঁদিয়া সবারে বাসিব ভালো।

সংসার যদি নয়নের জলে পড়ে' থাকে মোর পিছে,
মিথ্যা আমার বোধির সাধনা,—নির্ব্বাণ হোক মিছে

গোধূলি

[শিল্পী—শ্রীঅবনী সেন

বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রূপকথা

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

বর্ষাকাল। রবিবার। ভেবেছিলুম প্রাত্যহিক আড্ডার রবিবাসরীয় সংস্করণটা ভাল জমবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। ওটা বোধ হয় বিধাতার স্বভাব। সমস্ত দুপুর এমনই বৃষ্টি হল যে, আমাদের গলি ভেনিসের খালে পরিণত হল। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে ভাবছি কি করা যায়। এমন সময়ে পায়ে রবারের জুতো, গায়ে বর্ষাতী এবং মাথায় ছাতা বৈজ্ঞানিক প্রবেশ করল।

ওর নাম কোনকালে একটা ছিল এবং এখনও হয়ত আছে। কিন্তু যেখানে সেখানে যখন তখন যাকে তাকে বিজ্ঞান বোঝাবার চেষ্টার ফলে ওর নাম দাঁড়িয়েছে বৈজ্ঞানিক। দলে ভারী থাকলে না হয় কোন রকমে জোর-জবরদস্তি করে ওর মুখ বন্ধ করা যেত, কিন্তু আজ আমি একলা সুতরাং অসহায়। বুঝলুম বরাতে দুঃখ আছে।

বললুম: কি হে কি খবর?

ছাতাটা বন্ধ করে ও কোণে দাঁড় করিয়ে রাখল। বর্ষাতীটা একটা ক্যালেণ্ডার-ঝোলান পেরেকে টাঙিয়ে দিল। তার পর জুতো জোড়া খুলে উপুড় করে রেখে বললে: তোমাদের কর্পোরেশন কি চমৎকার ড্রেনেজ সীস্টেম করেছে। আরে বাপু, হাইড্রলিক্স জানিস না ত ও সব নিয়ে মাথা ঘামান কেন?

কর্পোরেশন যে 'আমাদের' কেন হল এবং সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত দায়িত্ব কি বুঝলুম না, বললুম: কর্পোরেশন নিয়ে আর টানাটানি কেন? এমনিই ত ট্যাক্স দেওয়া ভার। তার উপর যদি ওরা জানতে পারে যে, তোমার ঐ হাইড্রলিক্স জানে না, তখন হয়ত বলে বসবে যে, হাইড্রলিক্স শেখাবার জন্যে বিলেতে লোক পাঠাতে হবে, অতএব ট্যাক্স বাড়ল। তখন অবস্থাটা কি হবে ভাব! তার চেয়ে বরং ভাব যে, কলকাতা আজ ভেনিস বনে গেছে।

ও বললে: মনে না হয় করা যেত, যদি নৌকা ভাড়া পাওয়া যেত, ভেনিসে নিশ্চয়ই এক হাঁটু জল ভেঙে বেড়াতে হয় না। এখানে যদি নৌকা চাও ত এই শ্যামবাজার থেকে কসবা ছুটতে হবে।

আমি বললুম: থাক্। ও প্রসঙ্গ এখন বাদ দাও এবং এক কাপ চা খেয়ে শরীরটা গরম করে নাও।

বৈজ্ঞানিক গেল চটে, বললে: বিজ্ঞান না জানলেই লোকে এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কথা বলে। যে কোন গণ্ডমূর্খ জানে যে, চা মানুষের হার্টকে একটু ক্ষণিক উত্তেজনা দেয়, শারীরিক তাপ বৃদ্ধি হয় না। (বৈজ্ঞানিকের এই উক্তিতে মনে মনে সায় দিলুম, কিন্তু প্রকাশ্যে বলবার সাহস সঞ্চয় করতে পারলুম না)। শারীরিক তাপ বাড়াতে হলে কার্বোহাইড্রেট দেওয়া দরকার। সব চেয়ে তাপ দেবার ক্ষমতা হচ্ছে চিনিজাতীয় জিনিসের, যেমন মনে কর মিছরীর শরবং।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম তা হলে তোমাকে কি মিছরীর শরবংই দিতে বলব?

এবার ও হেসে ফেললে, বললে: চা খাব না এ কথা ত বলিনি, চায়ের ক্রিয়া বোঝাচ্ছিলুম মাত্র। অনেক বৈজ্ঞানিক প্রকাশ্যে চায়ের নিন্দা করেন, কিন্তু আড়ালে যে খান না তা ত বলা যায় না, সুতরাং—

আমি বাধা দিয়ে বললুম: সুতরাং যে হেতু তুমি বৈজ্ঞানিক, অতএব কাজে এবং কথায় সামঞ্জস্য রাখবার মত অবৈজ্ঞানিকসুলভ আচরণ তোমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।

অতএব চা খাওয়া গেল, অর্থাৎ আমাদের হার্টকে ক্ষণিক উত্তেজিত করা গেল এবং বৃথা সময় নষ্ট না করে দুজনে দুই চুরুট ধরিয়ে তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়া গেল।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি। খানিক পরে বৈজ্ঞানিককে বললুম: ওহে চুপচাপ কাঁহাতক শুয়ে থাকা যায়। তার চেয়ে বরং এক কাজ কর। চিরকাল ত বিজ্ঞান বকে এলে, আজ না হয় তার ব্যতিক্রম করে একটা গল্প বল।

থানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মস্ত বড় একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে বৈজ্ঞানিক বললে: বলতে পারি কিন্তু প্রেমের গল্পও নয় বা ভূতের গল্পও নয়, রূপকথা।

আমি বললুম: নিউটন, আইনষ্টাইন প্রভৃতিকে যখন তখন খুন করতে যখন তোমার বাধে না, তখন হান্স আণ্ডারসেনকে জবেহ করতে আর আপত্তি কি? মোট কথা আরম্ভ কর।

গল্প শুরু হল: তোমরা, অর্থাৎ যারা হিন্দুশাস্ত্রের খবর রাখ, নিশ্চয়ই জান যে, পুরাকালে বিশ্বামিত্র একবার বিশ্বসৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন,কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ছে সে কাজ তাঁর শেষ হয় নি। বিশ্বসৃষ্টির কাজ স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও, মানে যদি তিনি থাকেন, বোধ হয় আজও শেষ করে উঠতে পারেন নি, হয়ত কোন দিনই এর শেষ হবে না। আমার গল্পের বিষয় হচ্ছে কলির বিশ্বামিত্রের। তোমাদের বিশ্বামিত্র সৃষ্টি শুরু করেন রাগে, আমার রূপকথার নায়ক অনুরাগে, তবে অনুরাগটা অবশ্য ব্যক্তিক নয়, বৈজ্ঞানিক।

সব রূপকথাই মোটামুটি এক ছাঁচে ঢালা, অর্থাৎ সব রূপকারই motif এক। নায়ক হয় রাজপুত্র নয় রাখাল ছেলে। কাম্য তাদের রাজকন্যে বা অন্য কিছু,—মাঝখানে সাত সমুদ্র তের নদী বা তেপান্তরের মাঠের বাধা। আমার গল্পের নায়কের বেলায়ও এই মূলসূত্রের ব্যতিক্রম পাবে না। নায়কের নাম রাদারফোর্ড, জন্ম সুদূর নিউজিল্যাণ্ড। স্কলারশিপ পেয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে তিনি এলেন ক্যাম্ব্রিজে এবং বহু সাধনার পর তাঁর বিশ্বসৃষ্টি সম্পূর্ণ হল। রূপকথার নায়ক রাজকন্যের সঙ্গে শেষ পর্যান্ত পায় রাজত্ব, কিন্তু আধুনিক যুগে রাজত্ব পাওয়া একটু কঠিন এবং বোধ হয় নিরাপদও নয়, কাজেই রাদারফোর্ড শেষ পর্য্যন্ত লর্ডের বেশী এগোতে পারলেন না।

এবার বিশ্বসৃষ্টির মূলে যাওয়া যাক। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোটী কোটী বিভিন্ন জিনিষ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটাই সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এবং স্বতন্ত্র জিনিষ নয়। পুরাকালে ভারতীয় দার্শনিকরা বলতেন যে, পৃথিবীতে মোট পাচটি জিনিষ আছে, ক্ষিতি,অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। এই পাঁচটি জিনিষের বিভিন্ন অনুপাতের মিশ্রণে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। গ্রীক দার্শনিকরা ব্যোমকে বাদ দিয়ে মূল পদার্থের মোট সংখ্যা দাঁড় করালেন চার। ব্যাপারটা আরও সোজা করে বোঝান যাক। কলকাতা শহরে অসংখ্য বাড়ী রয়েছে, একটার সঙ্গে অপরটা[illegible] কোন মিল নেই, প্রত্যেকটিরই একটি পৃথক্‌ এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মাত্র কয়েকটি মূল উপাদান দিয়ে এইগুলি তৈরী। ইট, কাঠ, লোহা, চু[illegible], শুরকী, বালী, সিমেন্ট, পাথর ছাড়া বাড়ী তৈরী করার বিশে[illegible] আর কোন উপাদান পাওয়া যায় না। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে[illegible] সেই রকম কয়েকটি মাত্র মূল উপাদান আছে।

আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য চার বা পাঁচটি[illegible] পদার্থে সন্তুষ্ট নন, তাঁদের মতে মূল পদার্থের মোট সং[illegible] বিরানব্বই। যদিও এর চেয়ে বেশী হতে বাধা কি তার কোন সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় নি।

যে কোন একটি মূল পদার্থ নিয়ে যদি ভাঙতে আরম্ভ করা যায়, তা হলে শেষ পর্যান্ত এমন এক অবস্থায় পৌছান যাবে যে, তাকে আর ভাঙা যায় না। কোন মূল পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় পরমাণু। ইংরাজিতে পরমাণুকে বলা হয় atom, অর্থাৎ যা আর কাটা যায় না। গোটাকতক [illegible] মিলে একটি পরমাণু হয়। পরমাণু এবং অণু অত্যন্ত ছোট। দু'একটা উদাহরণ দিলে এদের আয়তন সম্বন্ধে কিছু বোঝা যাবে। মনে কর একটা কাচের পাত্র নেওয়া হল, সাধারণ অবস্থায় এতে যে বাতাস আছে, তার চাপ হবে প্রায় ৭৬০ মিলিমিটার, অর্থাৎ প্রায় ৩০ ইঞ্চি। এখন মনে কর, এয়ার-পাম্প দিয়ে পাত্রের ভেতর থেকে এতখানি বাতাস টেনে নেওয়া হল যে, বাতাসের চাপ হল ১ মিলিমিটারের ১০ লক্ষ ভাগ। সাধারণ হিসেবে দেখতে গেলে পাত্রের মধ্যে কিছুই বাতাস নেই, কিন্তু এই বাতাসেই প্রতি ঘন-ইঞ্চি, অর্থাৎ ১ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি চওড়া ও ১ ইঞ্চি উঁচু জায়গায় অন্ততঃ তিন হাজার দু-শো কোটী অণু আছে। সংখ্যাটির পরিমাণ এই রকমে আরও ভাল বুঝবে যে, পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা প্রায় দু'শো কোটী, অর্থাৎ ঐ সংখ্যার ১৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। ১ [illegible] জলে যতগুলো অণু আছে,সবগুলোকে যদি পাশাপাশি সাজিয়ে মালার মত করে গাঁথা যায়, তা হলে সেই মালার দৈর্ঘ্য [illegible] প্রায় চার হাজার কোটী মাইল; পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে পথ অতিক্রম করে, এই দৈর্ঘ্য তার প্রায় ৭০ গুণ বড়।

এই ত গেল অণুর আয়তন, সুতরাং পরমাণুর আয়তন সম্বন্ধে আন্দাজ না করাই বোধ হয় নিরাপদ। আগেই বলেছি যে, কোন জিনিষ মানে কতকগুলো পরমাণুর সমষ্টি, কিন্তু পরমাণুগুলো গায়ে গায়ে লেগে থাকে না। বায়স্কোপের টিকিট ঘরের সামনে লোকে যেমন ভিড় করে দাঁড়ায়, পরমাণুগুলো মোটেই সে রকম কাছাকাছি থাকে না। একটা পরমাণু এবং অন্য পরমাণুগুলোর মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থাকে। পরমাণুর আকারের তুলনায় ফাঁক বেশ বড়। এক টুকরা লোহা বা তোমার মস্তিষ্ক, সাধারণ লোকে যা নিরেট ভাবে, মোটেই নিরেট নয়। রাদারফোর্ড পরীক্ষা করে দেখলেন যে, প্রকৃতি দেবী আসলে জুয়াচোর, সব জিনিষই তিনি এমন বানিয়েছেন যে, আসলের চেয়ে ফাঁক বেশী, অর্থাৎ সবটাই ফাঁকি। একটি ছোট ছেলে একবার না কি জালের সংজ্ঞা দিয়াছিল সুতোয় বাঁধা গোটাকতক গর্ত্ত, অর্থাৎ গর্ত্তটাই আসল, সুতোটাই ফাঁকি। পরমাণুগুলো এই জালের সুতোর মত মনে করতে হবে।

একটানা এতক্ষণ কথা বলে বোধ হয় দম নেবার জন্য বৈজ্ঞানিক একটু থামল।

আমি বললুম : কই হে। তোমার গল্প কোথায় ? গল্পের লোভ দেখিয়ে নির্জ্জলা বিজ্ঞান চালাচ্ছ।

বৈজ্ঞানিক : কীর্ত্তন গানের আগে যেমন গৌরচন্দ্রিকা বা বইয়ের আগে যেমন preface, এটা তাই। আসল গল্প এখনও দেরী আছে। গল্প শুনতে গেলে ধৈর্য্য দরকার।

আমি বললুম : তথাস্তু।

আবার শুরু হল : এতক্ষণ পর্য্যন্ত মোটামুটি ভাবে অণু ও পরমাণুর ব্যাপার বোঝান গেল। এবার আরও অগ্রসর হওয়া যাক। আগেই বলা হয়েছে যে, বিলাতী বিজ্ঞান-শাস্ত্র মতে পরমাণু এমন এক জিনিষ যে, আর তা ভাঙা যায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বড়ই খুঁতখুতে লোক—সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা বললেন, এমন ত হতে পারে যে, পরমাণু ভেঙে অন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে। মনে কর, যেমন টাকা ভাঙালে শেষ পর্য্যন্ত পাইয়ের চেয়ে ছোট মুদ্রা পাওয়া যায় না। মুদ্রা হিসাবে পাই অবিভাজ্য বটে, কিন্তু সেটাকে ভাঙলে কয়েক রকম ধাতু ত পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্বের শেষ সীমা পাই, কিন্তু সেটাই সর্ব্বশেষ সীমা ত নয়। বিলেতে ক্রুক্‌স্ ও জে. জে. টমসন এবং জার্ম্মানীতে হিটফ, গোল্ডষ্টাইন প্রভৃতির পরীক্ষায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ হল যে, পরমাণু কোন বস্তুর শেষ সীমা নয়।

পরমাণু ভাঙা গেল এবং যা পাওয়া গেল, তা যেন একটু তাক্ লাগাবার মত। দেখা গেল যে, যে কোন পরমাণু ভাঙলে পাওয়া যায় কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ, খানিকটা পজিটিভ এবং একই পরিমাণ নেগেটিভ। যে কোন জিনিষই হোক, শেষ পর্য্যন্ত এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিদ্যুৎ ছাড়া আর কিছুই নেই। এ ত ভারী এক কথা। পদার্থ নয় অপদার্থ,

কারণ বিদ্যুৎ যে পদার্থ নয়, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কোন মতদ্বৈধ হবে না।

আমি বললুম, তার মানে তুমি বলতে চাও, টিয়াপাখী পাখী নয়, আসলেতে পাখী সে।"

বৈজ্ঞানিক বললে, তাই। তা ছাড়া সুকুমার রায় চৌধুরী যে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন তা ভুল না। যাক সে কথা : 'আবোল তাবোল' ছেড়ে কাজের কথা শোন। বিদ্যুতের ব্যাপার এখনও শেষ হয় নি। পৃথিবীতে সব চেয়ে হালকা জিনিস হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ওজন ০.০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ১৬৩ গ্রাম। ১ গ্রাম ১ তোলার প্রায় ১২ ভাগের ১ ভাগ। কোন পরমাণু ভাঙলে যে নেগেটিভ বিদ্যুতের কণিকা পাওয়া যায়, তার নাম দেওয়া হল 'ইলেকট্রন'। একটি ইলেকট্রনের

হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে প্রায় ১৮৪০ গুণ হাল্কা, সুতরাং সাধারণ হিসাবে দেখতে গেলে ইলেক্‌ট্রনের ভার কিছুই নয় বলা যেতে পারে। একটা হাইড্রোজেন-পরমাণু ভাঙলে একটি ইলেক্‌ট্রন পাওয়া যায়, বাকী ভারী অংশটা পজিটিভ বিদ্যুৎ। এই ভারী অংশের নাম দেওয়া হল 'প্রোটন'। প্রোটনে এবং ইলেক্‌ট্রনে বিদ্যুতের পরিমাণ ঠিক সমান, কিন্তু গোল বাধল ঐ ওজন নিয়ে, প্রোটনের ওজন ইলেক্‌ট্রনের ওজনের চেয়ে প্রায় ১৮৪০ গুণ ভারী। ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিকদের ঠিক মনঃপূত হল না, দুইই বিদ্যুৎ, দুইয়েরই পরিমাণ এক, একমাত্র তফাৎ যে একটা পজিটিভ, অপরটা নেগেটিভ, অথচ তাদের আচরণ এত বিভিন্ন। অনেক চেষ্টা করেও কোন কিনারা করা গেল না, সুতরাং তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে লিখলেন—"নেগেটিভ বিদ্যুৎ ইলেক্‌ট্রনরূপে বিশুদ্ধ বিদ্যুৎ হিসাবে পাওয়া যায়। পজিটিভ বিদ্যুৎ অদ্যাবধি

বিশুদ্ধ বিদ্যুৎরূপে পাওয়া যায় নাই, উহা সকল সময়েই জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।"

১৯৩২ পর্য্যন্ত এই মত বহাল রইল। কিন্তু ১৯৩২ সালে জনৈক মার্কিন ছোকরা বৈজ্ঞানিক অ্যাণ্ডারসন দেখালেন যে, পজিটিভ বিদ্যুৎও ভেজালহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। এই বিদ্যুৎ-কণিকার নাম দেওয়া হল 'পজিট্রন', অর্থাৎ পজিটিভ ইলেকট্রন। এই পজিট্রনের ওজন ইলেক্‌ট্রনের সমান।

আমি বললুম: তা হলে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কি হল—গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিলে না কি?

বৈজ্ঞানিক: বিসর্জ্জন দেব কেন? "পজিটিভ বিদ্যুৎ অদ্যাবধি বিশুদ্ধ বিদ্যুৎরূপে পাওয়া যায় নাই" লাল কালিতে কেটে দিলুম, আর "সকল সময়েই" এর জায়গায় "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই" লিখে দিলুম।

অনেক এগিয়ে যাওয়া গেছে, একটু পিছু হটা যাক। ১৯৩২ থেকে ১৯১১ সালে ফিরে যাওয়া যাক। রাদার-ফোর্ড যে গোড়াতেই প্রকৃতি দেবীর ফাঁকি আন্দাজ করে পেয়েছিলেন তা বোধ হয় আগেই বলেছি। রাদারফোর্ডের কি রকম সন্দেহ হল যে, সমস্ত জিনিষই একমাত্র প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন দিয়ে তৈরী। অর্থাৎ ৯২টা বিভিন্ন মৌলিক বিভিন্ন সংখ্যা ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমষ্টি মাত্র। আরও একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে; সাধারণ অবস্থায় কোন বস্তু বিদ্যুতাবিষ্ট থাকে না, এবং যেহেতু প্রোটনের এবং ইলেক্‌ট্রনের বিদ্যুতাবেশ সমান, অতএব কোন বস্তুর পরমাণুতে প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা একই হওয়া দরকার।

যদি ভাল ইঞ্জিনিয়ারের হাতে বাড়ী তৈরী করবার সব মালমশলা পড়ে, তা হলে ইচ্ছামত ছোট বা বড় যে কোন রকম বাড়ী তৈরী করা ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। রাদারফোর্ড ভাবলেন, সমস্ত বস্তুর মূল প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রন সুতরাং ইচ্ছামত প্রোটন এবং ইলেক্‌ট্রন পেলে যা খুসী তাই তৈরী করা যেতে পারে।

বৈজ্ঞানিক একটু থামল এবং আর একটা চুরুট ধরিয়ে বললে: এইবার মন দিয়ে শোন, আমার আসল গল্প এতক্ষণে শুরু হল।

মস্ত বড় পরীক্ষাগারে রাদারফোর্ড বসে আছেন, সামনে তাঁর দুটো নতুন বাক্স, সরু সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা, একটার গায়ে লেখা আছে 'ই'। আর একটার গায়ে লেখা আছে 'প্র'। লোভী ছেলে চকোলেটে পেলে যেমন খুসী হয়ে লুব্ধ নেত্রে বাক্সের দিকে তাকিয়ে থাকে, রাদারফোর্ডও তেমনি করে বসে আছেন। কিন্তু লোভ আর কতক্ষণ সামলে রাখা যায়, রাদারফোর্ড আর থাকতে পারলেন না, বাক্স দুটো খুলে ফেললেন এবং ভেতরের জিনিষগুলো দেখে এত খুসী হয়ে গেলেন যে, নিজের মনে একলা একলাই হাসতে লাগলেন—যেন মুড়ি চাইতে কেউ রসগোল্লা এনে দিয়েছে। 'ই' লেখা বাক্সে একগাদা ইলেকট্রন এবং 'প্র' লেখা বাক্সে একগাদা প্রোটন। পাছে গুলিয়ে যায়, সেইজন্য কারখানা প্রোটনগুলোর চক্‌চকে কাল রঙ্‌ লাগিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রনগুলোর দিয়েছে সাদা রঙ্‌। কিন্তু রঙ্‌ না করলেও চলত, কারণ প্রোটনগুলো সীসের গুলীর মত ভারী, ইলেকট্রনগুলো যেন সাবানের বুদ্বুদ।

রাদারফোর্ড আস্তে আস্তে দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে ভাবতে লাগলেন—এইবার জুট পাওয়া গেছে, দেখা যাক কি রকম ইমারত খাড়া করা যায়। তারপর একটা প্রোটন এবং একটা ইলেক্‌ট্রন তুলে নিলেন, প্রোটনটা টেবিলের মাঝখানে রেখে খানিকটা দূরে ইলেকট্রনটাকে বসিয়ে দিলেন।

বৈজ্ঞানিকের চুরুটটা নিবে গেছল, ধরাবার জন্য একটু থামল এবং আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম: চালাকি পেয়েছ! আমিও আই-এস-সি পড়েছিলাম। প্রোটন এবং ইলেকট্রন চুপচাপ ভদ্রলোকের মত দূরে দূরে থাকবে কেন, একটা না পজিটিভ, আর একটা না নেগেটিভ, দুটো দুটোকে আকর্ষণ করবে না? কোন জিনিস যদি স্প্রিং এ বেঁধে টেনে রাখা যায়, সেই রকম অবস্থা হবে না কি? ছাড়া পেলেই উল্টো দিকে চলে যাবে না? রাদারফোর্ড তোমার খুব পরমাণু বানাচ্ছেন!

বৈজ্ঞানিক বললে: আরে সবটা শোনই না ছাই। রাদারফোর্ড যে তোমার মত ভাবেন নি তা নয়। তোমার স্প্রিং এ বাঁধা ওজনটা যদি ঘোরাতে আরম্ভ কর, তা হলে দেখবে সেটা আর উল্টো দিকে যাবার চেষ্টা করবে না। জিনিষটা ঘোরার জন্য সেটা বাইরের দিকে ছিটকে যাবার চেষ্টা করবে এবং স্প্রিং এর আকর্ষণ তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করবে, দুটো বিপরীত ক্রিয়া যদি সমান হয়, তা হলে জিনিষটা কোন দিকেই যাবে না। সুতরাং রাদারফোর্ড করলেন কি, না প্রোটন থেকে বেশ খানিকটা দূরে ইলেক্‌ট্রনটাকে রেখে তাকে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলেন। ইলেক্‌ট্রনটা তিনি এমন বেগে ঘুরিয়ে দিলেন যে, তাড়িতিক আকর্ষণ আর কেন্দ্রবিমুখ বল, অর্থাৎ centrifugal force ঠিক সমান হয়। টাগ্-অফ ওয়রে যদি দুই দল ঠিক সমান জোরে টানে, তা হলে যেমন কোন দলই কাউকে টেনে নিয়ে যেতে পারে না, ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম দাঁড়াল। মাঝখানে একটা প্রোটন এবং তাকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণমান একটা ইলেক্‌ট্রন, যেমন সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী বা অন্য গ্রহরা ঘুরে বেড়ায়, এই হল সবচেয়ে সরল পরমাণু এবং এই হচ্ছে রাদারফোর্ডের প্রথম সৃষ্টি। রাদারফোর্ড নিজের মনে বলে উঠলেন—ব্যস, হাইড্রোজেন মিল গিয়া।

অতএব বুঝতে পারছ যে পুরাণো বৈজ্ঞানিকেরা যে বলতেন পরমাণু হচ্ছে সেই জিনিস, যাকে আর ছোট অংশে ভাগ করা যায় না, সেটি সম্পূর্ণ বাজে কথা। মনে কর আমার এই জ্বলন্ত চুরুটটা হাতে নিয়ে যদি ছেলেবেলায় যেমন করে ইঞ্জিন চালাতুম, সেই রকম বাঁই বাঁই করে হাত ঘোরাতে থাকি, আর তুমি বল যে, একটা আগুনের চাকা দেখতে পাচ্ছি, তা হলে যেমন সত্যি বলা হবে, পুরাণো বৈজ্ঞানিকদের মত সেই রকম আর কি। দেখা যাচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণু মানে দুটো অত্যন্ত ক্ষুদ্র জিনিস পরস্পর থেকে বিরাট দূরে থেকে একটা অপরের চারিদিকে ভীষণ বেগে ঘুরছে। মাঝখানে কিছুই নেই, একেবারে ফাঁক, অর্থাৎ আসলে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকি।

আমি বললুম: কিন্তু তোমার ঐ 'বিরাট' কথাটাই বিরাট ভাবে মাথা গুলিয়ে দিলে। গোটা পরমাণুটা নিশ্চয়ই খুব বড় জিনিস নয়, সুতরাং তার মধ্যে 'বিরাট' দূরত্ব যেন 'বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি'র মত মনে হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক বললে: বিরাটত্বটা এখানে নিতান্তই আপেক্ষিক। প্রায় সাড়ে পঁচিশ কোটী হাইড্রোজেন-পরমাণু পাশাপাশি রাখলে মাত্র ১ ইঞ্চি লম্বা হবে, কিন্তু পরমাণু এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও ইলেকট্রন ও প্রোটন এই তুলনায় একেবারেই নগণ্য। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবে। মনে কর আটলান্টিক মহাসাগরে ঠিক য়ুরোপ ও আমেরিকার মাঝখানে একটা জাহাজ আছে, আর আর-একটা জাহাজ এই জাহাজকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং দ্বিতীয় জাহাজটি যে বৃত্তে ঘুরছে, সেই বৃত্ত একদিকে নিউ ইয়র্ক, নীচে বিষুবরেখা এবং উপরে আইসল্যাণ্ড পর্য্যন্ত পৌঁছায়। সমস্ত আটলান্টিক মহাসাগরে আর কোন জাহাজ নেই। এই হচ্ছে

জড় পদার্থের প্রকৃত রূপ। যদি ভূগোল ভুলে না গিয়ে থাক, তা হলে বুঝতে পারবে বিরাট দূরত্ব বলা সঙ্গত হয়েছে কি না। এই রকম বিরাটত্বের দ্বিতীয় উদাহরণ পাওয়া যায় মহাকাশে। মহাকাশে যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে পাও, সেইগুলো আপেক্ষিক ভাবে দেখতে গেলে এত রকম বিরাট দূরে দূরে অবস্থিত। তুমি, আমি, দেওয়াল, চেয়ার, টেবিল, চুরুটের ছাই এবং ধোঁয়া সবই এই প্রবল বেগে ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ কণিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমার দেহে যতগুলো ইলেকট্রন এবং প্রোটন আছে, সবগুলোর ব্যবধান ঘুচিয়ে যদি এক যায়গায় জড় করতে পার ত একটা ছুঁচের ডগায় ধরান যেতে পারে।
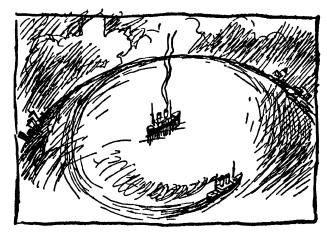
আবার একটু পেছনে যাওয়া যাচ্ছে। আগে বলেছি যে সব শুদ্ধ মোট মাত্র ৯২টি মৌলিক আছে। পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ হলেও এদের মধ্যে কিছু কিছু ধর্মের মিল আছে। রাসায়নিকরা কোন জিনিষের পরমাণুর ওজন কত তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না, কিন্তু হাইড্রোজেনের তুলনায় কোন্‌টার পরমাণু কত ভারী, সেটা তাদের বিশেষ দরকারে লাগে। তাঁরা হাইড্রোজেনের ভার বললেন ১ এবং এই হিসেবে অক্‌সিজেনের ভার ১৬, নাইট্রোজেনের ১৪ ইত্যাদি হয়। ১৮৬৯ সালে জনৈক জার্মান—লোটার মায়ার এবং একজন রুশ মেণ্ডেলিয়েফ, দেখলেন যে,পরপর ওজন হিসাবে সাজালে একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার পরে পরে যে মৌলিক দ্রব্য পাওয়া যায়, সেগুলোর ভেতর ধর্মের বেশ মিল দেখতে পাওয়া যায়। যেমন মনে কর, তোমাকে গোটাকতক বিভিন্ন আকারের রঙীন পুঁতি দেওয়া হল, তুমি বড থেকে ছোট হিসেবে পর পর সাজিয়ে যদি মালা গেঁথে দেখ যে, প্রতি অষ্টমটার রঙ লা[ল] এবং তার পরেরটা সবুজ, তার পর হলদে, নীল ইত্যাদি, তা হলে বুঝবে যে, আকার এবং রঙের মধ্যে একটা সম্ব[ন্ধ] আছে। রাসায়নিকরা এই রকম ভাবে ভার অনুযা[য়ী] পরমাণু সাজিয়ে যে তালিকা পেয়েছেন, সেটাকে বলা হ[য়] 'পিরিয়ডিক টেব্‌ল' (periodic table)। প্রথম যখন [এই] টেব্‌ল তৈরী করা হয় তখন ৭২টা মূল পদার্থ জানা ছিল [এবং] সুতরাং ঠিকমত সাজাতে গিয়ে তালিকার অনেকগুলো [ঘর] খালি রাখতে হয়। মেণ্ডেলিয়েফ কিন্তু এই তালিকার নির্ভুলতা সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চিত হন যে, তিনি অনেকগু[লো] অনাবিষ্কৃত মৌলিকের গুণ আগে থেকে ভবিষ্[যদ্‌]বাণী করেন এবং পরে তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বা[ণী] আশ্চর্য্যরূপে ফলে যায়। এখন এই তালিকা[র] প্রায় সব ঘরই ভরে গেছে, মাত্র দুটো ঘর খা[লি] আছে। পিরিয়ডিক টেবলের গোড়ায় সব [চেয়ে] হালকা জিনিষ হাইড্রোজেন এবং শেষে সব চে[য়ে] ভারি জিনিষ য়ুরেনিয়ম।

আবার রাদারফোর্ডের কাছে ফিরে যা[ওয়া] যাক। হাইড্রোজেন সৃষ্টি করে ত' তিনি [ভারি] খুসী। তিনি ভেবে দেখলেন যে, সব পদার্থের পরমাণুর গঠনই হাইড্রোজেনের অনুরূপ [—] মাঝখানে একটা ভারী কেন্দ্র এবং চতুর্দ্দিকে ঘূ[র্ণ্যমা]ন ইলেক্‌ট্রন। এক কথায় পরমাণুর গঠন সৌরজগতের ম[ত]।

হাইড্রোজেনের পরেই হিলিয়াম, ভার ৪। রাদার[ফোর্ড] হিলিয়ম সৃষ্টি করতে লেগে গেলেন। আশা ক[রি] আছে যে, ভার একমাত্র প্রোটনেরই থাকে, ইলেক্‌ট্রনের [ভার] নেই বললেই চলে, সুতরাং মাঝখানে চারটে প্রো[টন] বসাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে চারটে ইলেক্‌ট্রনও কাজে লা[গাতে] হবে। কিন্তু গোল বাধল গোড়াতেই, প্রোটনগুলোর [চ]রিত্র একই রকমের—সবগুলোই পজিটিভ, সুতরাং [সব] পরস্পরকে যথাসাধ্য দূরে রাখতে চেষ্টা করবে। [চারটে] প্রোটন হাতের মুঠোয় ধরে রেখে রাদারফোর্ড বেশ [অনুভব] করতে লাগলেন যে, সেগুলো হাতের মুঠোর ভেতর [ছটফট] করছে, কোন রকম সুবিধে পেলেই চারটে চার দিকে [ছিটকে]

পড়বে। রাদারফোর্ড ভাবলেন—সর্বনাশ করবে দেখছি, হিলিয়ম তৈরী হবার আগেই ভেঙে ছত্রখান হয়ে পড়বে।

আরও মুশ্‌কিল আছে; হিলিয়ম সময়ে সময়ে একটা ইলেক্‌ট্রন-বিহীন অবস্থায় বা বড় জোর দুটি ইলেক্‌ট্রন বিহীন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তিনটে বা চারটে ইলেক্‌ট্রন নেই এ রকম অবস্থায় কখনও হিলিয়াম পাওয়া যায় না। কেন্দ্রটা ভারী, সহজে ভাঙে না, সাধারণতঃ পরমাণু থেকে ইলেকট্রনই খসে যায়। সুতরাং সমস্যা দাঁড়াল এই যে কেন্দ্রে ৪টি প্রোটন বসাতে হবে এবং বাইরে ২টি ইলেক্‌ট্রন দিতে হবে, বাকি দু'টো ইলেকট্রন কোথায় বসান যায়। রাদারফোর্ড ভাবলেন কোন রকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দুটো ইলেক্‌ট্রনকে কেন্দ্রের মধ্যে চারটে প্রোটনের মাঝে রেখে দিতে হবে। রাদারফোর্ড কিছুতেই ব্যাপারটার কোন সোজা মীমাংসা করতে পারলেন না।

বৈজ্ঞানিক খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে: রাদারফোর্ডের কি ব্যবস্থা করা যায় বল, বেচারা বড্ড বিপদে পড়েছে। কিছু ভেবে পেলাম না, কাজেই চুপ করে রইলাম।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলে: রূপকথার নায়ক বিপদে পড়লে কি হয় জান না, কোন পরী বা জিন বা সাধু বা যে কেউ একটা কোন উপায় বাতলে দেয়। সুতরাং আমার কি উচিত নয় আধুনিক কালের জ্ঞান নিয়ে রাদারফোর্ডকে একটু সাহায্য করা।

আমি বললাম: পার ত' ভালই কিন্তু করবে কি?

বৈজ্ঞানিক বললে: বিশেষ কিছুই নয় খালি এক বাক্স নিউট্রন নিয়ে আসব।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সেটা আবার কি বস্তু?

বৈজ্ঞানিক বললে: মনে রেখ আমাদের গল্পের কাল ১৯১১। ১৯৩২ সালে রাদারফোর্ডেরই শিষ্য চ্যাড্‌উইক এই নিউট্রন আবিষ্কার করেন। নিউট্রনের ওজন প্রায় প্রোটনেরই সমান, কিন্তু সব চেয়ে সুবিধের ব্যাপার এই যে, নিউট্রনে পজিটিভ বা নেগেটিভ কোন রকম বিদ্যুতের বালাই নেই।

অবশ্য এমনও হতে পারে যে, রাদারফোর্ড নিউট্রন-জাতীয় কিছু থাকার কল্পনা করে নিজেই তা' সৃষ্টি করতে লেগে গেলেন। এক হাতে একটা ইলেকট্রন এবং অন্য হাতে একটা প্রোটন নিয়ে যেমনি তিনি দুটোতে একটু চাপ দিলেন, টেপা বোতাম বন্ধ করবার সময় যেমন শব্দ হয় খুট, সেই রকম একটু শব্দ হল। রাদারফোর্ড দেখলেন, ইলেক্‌ট্রন এবং প্রোটনের পজিটিভ এবং নেগেটিভ বিদ্যুতাবেশ একেবারে নিরুদ্দেশ। "ছিল কি ও ছিল, হাতে রইল পেন্সিল"-এর মত রাদারফোর্ড দেখলেন, প্রোটন কি ইলেকট্রন, হাতে রইল নিউট্রন।

অবশ্য সত্যই নিউট্রনের জন্ম এই রকম করে হয়েছে কিনা বলা যায় না। এমনও হতে পারে যে নিউট্রন, পজিট্রন ও ইলেক্‌ট্রনের মত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবী করতে পারে,

আমাদের ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, মোট কথা হচ্ছে যে, আমি রাদারফোর্ডকে গোটাকতক নিউট্রন দেবই।

যাক। রাদারফোর্ডকে নিউট্রন দেওয়া হল, সুতরাং রাদারফোর্ড নিশ্চিন্ত মনে হিলিয়াম সৃষ্টি করতে লেগে গেলেন। মাঝখানে দুটো প্রোটন এবং দু'টো নিউট্রন রাখলেন এবং দূরে দুটো ইলেক্‌ট্রন বসিয়ে ইলেকট্রনগুলো সজোরে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিতেই কেল্লা ফতে! হিলিয়ম সৃষ্টি হয়ে গেল। হিলিয়মের ওজন ৪ এবং কেন্দ্রে দুটো ইলেকট্রন দেওয়া হয়েছে, সুতরাং ওজনে মিলে গেল। দুটোর বেশী ইলেক্‌ট্রন কখনও হিলিয়াম পরমাণু থেকে বেরিয়ে যায় না এবং রাদারফোর্ডের পরমাণুতেও দুটোর বেশী ঘূর্ণমান ইলেক্‌ট্রন নেই, কাজেই সেখানেও মিলে গেল।

এর পরে বিশ্বসৃষ্টির কাজ খুব সহজ হয়ে গেল। রাদারফোর্ড বাইরে একটা করে ইলেকট্রন বাড়িয়ে যেতে লাগলেন, কেন্দ্রে একটা করে প্রোটন বাড়াতে লাগলেন এবং ভার ঠিক রাখবার জন্যে যটা নিউট্রন দরকার, ততগুলো ভেতরে বসাতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে রাদারফোর্ডের দক্ষ হাতে একে একে এক একটা নূতন পরমাণু গড়ে উঠতে লাগল। সমস্ত দিন কাজ করবার পর সন্ধ্যের সময় রাদারফোর্ড সব চেয়ে ভারী মৌলিক য়ুরেনিয়ম গড়লেন। বিরাট কেন্দ্র, কেন্দ্রে ৯২টা প্রোটন এবং ১৪৬টা নিউট্রন এবং বাইরে ৯২টা ইলেকট্রন বিভিন্ন দূরে বসান। ইলেকট্রনগুলো বোঁ বোঁ করে ঘুরিয়ে দিয়ে সব কাজ শেষ করে রাদারফোর্ড ল্যাবরেটরী ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আমি বললুম: বেশ বুঝলুম, কিন্তু হিলিয়াম নিয়ে একটু বেশী মাথা ঘামান হল না, ওটাকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হল কেন?

বৈজ্ঞানিক কোন কথা না বলে টেবিলের ওপর থেকে ১খানা কাগজ টেনে নিয়ে খস্ খস্ করে খানিকটা লিখলে এবং কাগজটা আমার হাতে দিলে। দেখলুম কাগজে এই লেখা রয়েছে:

পিরিয়ডিক টেব্‌ল

ক্রমিক সংখ্যা	৯	১১	১৩	১৫
মৌলিক	ফ্লোরিন	সোডিয়াম	অ্যালুমিনিয়ম	ফস্ফরাস
প্রোটনের সংখ্যা	৯	১১	১৩	১৫
নিউট্রনের সংখ্যা	১০	১২	১৪	১৬
ভার=প্রোটন +নিউট্রন	১৯	২৩	২৭	৩১

বৈজ্ঞানিক আবার আরম্ভ করলে: মনে আছে বোধ হয় যে, হিলিয়মের কেন্দ্রে ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন আছে, এখন এই যে মৌলিকগুলোর হিসেব লেখা হয়েছে, সেগুলোর মজা দেখছ, এর যে কোন একটার পরমাণুর কেন্দ্রে দুটো প্রোটন আর দুটো নিউট্রন, অর্থাৎ একটা হিলিয়াম কেন্দ্রে জুড়ে দিলেই পরের পরমাণুটার কেন্দ্র তৈরী হয়ে গেল। ক্রমিক সংখ্যাগুলো ভালো করে দেখ, ঠিক পর পর নেই, একটার পর পর একটা বাদ দিয়ে লেখা হয়েছে। কাজেই যে কোন পরমাণুর কেন্দ্র তৈরী করতে হলে তার আগের আগের পরমাণুর কেন্দ্রে ১টা হিলিয়াম কেন্দ্র জুড়ে দাও, তা হলেই হয়ে গেল। বাইরে কটা ইলেকট্রন বসাতে হবে সে সম্বন্ধে কোন গোলমালই নেই, যটা প্রোটন তটা ইলেকট্রন সোজা হিসেব। এখন আশা করি বুঝতে পারছ যে হিলিয়মের পরমাণু বিশেষ করে তার কেন্দ্রের গঠন একটু বিশেষ রকমের।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম: এই তা হলে তোমাদের, অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বসৃষ্টির ইতিবৃত্ত!

বৈজ্ঞানিক—হাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা যে ঠিক কি রকম ভাবে গোড়ায় হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। হয় ত সৃষ্টির আদিতে মহাশূন্যে কেবলমাত্র গোটাকতক ইলেকট্রন আর প্রোটন বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার পরে হয় ত কোন সময়ে কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের মিলন ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন জিনিষের পরমাণু গড়ে ওঠে। একবার পরমাণু পেলেই বৈজ্ঞানিকদের সমস্যা হয়ে গেল সরল। নানা জিনিষের পরমাণু বিভিন্নভাবে মিলিত হয়ে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রকম সরল ও জটিল রাসায়নিক গড়ে উঠল। ক্রমে জীবদেহ যা দিয়ে তৈরী সেই প্রোটোপ্লাজম যা জীবপঙ্ক গড়ে উঠল। এর থেকে কোন রকমে একটি জীবন্ত কোষ বা cell সৃষ্টি কর; যদিও জীবন বলতে কি বা বুঝায় এবং তার সৃষ্টিই বা কি করে হল কেউ জানে না, তা হলেই জীববিজ্ঞানবিদ নানা রকম কোষের সমষ্টি দিয়ে জটিলতম জীব পর্যান্ত বানিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু গলদ রয়ে গেল দু জায়গায়, প্রথমে ইলেকট্রন বা প্রোটনের সৃষ্টি কি করে হল এবং প্রাণের সৃষ্টিই বা কি করে হয়। এই প্রশ্নের উত্তর আজও কেউ দিতে পারেন নি, বোধ হয় কোনদিনই পারবেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বৈজ্ঞানিক বললে: ভেবো না যে রাদারফোর্ডের গল্প শেষ হয়ে গেছে। মন দিয়ে শোন, আরও আছে।

মোটমাট তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, সব জিনিষের পরমাণুতে তিন রকমের কণিকা আছে, প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন। সব পরমাণুর আবার দুটো বিশিষ্ট সংখ্যা আছে, একটা তার পরমাণুর ভার, অর্থাৎ প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার সমষ্টি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে পিরিয়ডিক টেব্‌লে তার

ক্রমিক সংখ্যা, এই সংখ্যাটি কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যার সঙ্গে সমান। আমরা আগেই দেখেছি যে,একটা একটা করে প্রোটন যোগ করে পরের পর পরমাণু সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং এই সংখ্যাটি সবচেয়ে দরকারী সংখ্যা। অর্থাৎ যে পরমাণুর ক্রমিক সংখ্যা যত, কেন্দ্রের প্রোটনের সংখ্যাও তত। আগেকার রাসায়নিক পণ্ডিতরা যদিও পরমাণুর ভার, মানে প্রোটন + নিউট্রনের সংখ্যা হিসেবে পিরিয়ডিক টেব্‌ল সাজিয়েছিলেন, কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা প্রোটনের সংখ্যা হিসেবে পিরিয়ডিক টেব্‌ল সাজিয়েছেন। এই সংখ্যাকে পরমাণবিক সংখ্যা বা atomic number বলা হয়। গোড়াকার পিরিয়ডিক টেব্‌ল কিছু কিছু গোলমাল ছিল, কিন্তু এই atomic number হিসেবে সাজিয়ে পিরিয়ডিক টেব্‌লের গোলমাল মিটে গেছে।

আবার রাদারফোর্ডের পরীক্ষাগারে ফিরে যাওয়া যাক্। সব পরমাণু তৈরী করে ঠিকঠাক পর পর সাজিয়ে সেই যে রাদারফোর্ড বেরিয়ে পড়েছেন, কিন্তু মনের আনন্দে দরজা বন্ধ করে যেতে ভুলে গেছেন। এখন হয়েছে কি, বাড়ীর ছোট খুকি সেই পরীক্ষাগারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তার ভারী কৌতূহল হল, ঘরের ভিতর উঁকি মেরে দেখলে যে, পরপর ৯২টা পরমাণু সাজান রয়েছে, গাদা গাদা ইলেক্‌ট্রন কেন্দ্রগুলোর চারপাশে বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুকি ত ভারী খুসী, টেবিলের কাছে গিয়ে হাঁ করে দেখতে লাগল। সবচেয়ে তার পছন্দ হল ৮৮ নম্বরের পরমাণু রেডিয়ম। রেডিয়মের ভার ২২৬। হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হল, ভীষণ শব্দ করে রেডিয়মের কেন্দ্র থেকে একটা হিলিয়ম-কেন্দ্র বন্দুকের গুলির মত খুকির কানের পাশ দিয়ে ভীষণ জোরে বেরিয়ে গিয়ে দেওয়ালে টাঙান পিরিয়ডিক টেব্‌লের চার্টের উপর গিয়ে লাগল, সেটা ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেল। এ দিকে কেন্দ্র থেকে দুটো প্রোটন কমে যাওয়ায় বাইরের দুটো ইলেক্‌ট্রনের উপর টান গেল কমে, তারা খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ করে কেটে পড়ল। এখন তা হলে রইল কেন্দ্রে ৮৬টা প্রোটন আর ভার দাঁড়াল ২২২। এই ৮৬ নম্বর পরমাণুর নাম র‍্যাডন।

খুকি ত এই সব ব্যাপার দেখে একটুখানি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একেবারে টেনে দৌড় লাগাল বাড়ীর ভেতর। এ দিকে শব্দ শুনে হন্তদন্ত হয়ে রাদারফোর্ড দৌড়ে ল্যাবরেটরীতে এলেন। সে ব্যাপার দেখেই তাঁর চক্ষু স্থির। ভীষণ চটে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"আমার রেডিয়ম কোথায় গেল, এই যে এখানে রেডিয়ম রেখে গেলুম, সেখানে র‍্যাডন এল কোথা থেকে।"

তাই ত! রেডিয়ম গেল কোথায়! রেডিয়ম ভেঙে দিব্যি আপনি আপনি র‍্যাডন হয়ে বসে আছে। রাদারফোর্ডের স্বহস্তনির্মিত র‍্যাডনের সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই!
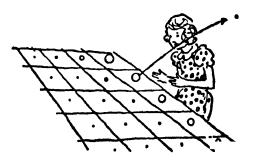
রাদারফোর্ড অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে 'ধ্যেৎ' বলে মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারে বসে পড়লেন। এত কষ্ট করে নিজের হাতের গড়া পরমাণুদের কাণ্ড দেখে রাদারফোর্ড একে-

বারে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন অপেক্ষাকৃত হালকা পরমাণুগুলো বেশ ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করছে, কিন্তু ওদের মধ্যে ভারী পরমাণুগুলো, রাসায়নিকরা যাদের তেজোবিকিরক বা radioactive বলেন, সেগুলোর আচরণের কোন স্থিরতা নেই।

দেখা গেল যে, হঠাৎ তেজোবিকিরক একটা পরমাণুর কেন্দ্র থেকে একটা হিলিয়ম-কেন্দ্র বা আল্‌ফা-কণা বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা দু ঘর পিছিয়ে যেতে লাগল। কোন কোন পরমাণুর কেন্দ্র থেকে বা একটা ইলেক্‌ট্রন অর্থাৎ বিটা-কণা বেরিয়ে গিয়ে একটা নিউট্রন প্রোট্রন হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা এক ঘর এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু প্রোটন বেড়ে যাওয়ার দরুণ ইলেক্‌ট্রনও একটা বেড়ে যাওয়া দরকার, কাজেই যে ইলেক্‌ট্রনটা অন্য কোথা থেকে ছিটকে এসে কাছে পড়ল, সেটার আর রক্ষে নেই। প্রোটনের টানে পড়ে সেটাও চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করে-দিল। এতেও নিশ্চিন্ত নেই, বহু ইলেক্‌ট্রন বা বিটা-কণা

যেখান থেকে পালাতে লাগল, সেখানে এক্স-রে জাতীয় গামা রশ্মির উদ্ভব হতে লাগল। এক কথায় রাদারফোর্ডের পরমাণু সম্প্রদায়ে ভীষণ এক গোলমাল বেধে গেল।

রাদারফোর্ড অত্যন্ত ভাবনায় পড়ে গেলেন, কিন্তু খানিক ক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলেন যে, ব্যাপারটা যতটা গোলমেলে ভাবা গেছল ততটা নয়। প্রথমে ত রেডিয়ম ভেঙ্গে র‍্যাডন হয়ে গেল, কিন্তু র‍্যাডনও স্থির থাকল না, বার-কতক ভাঙতে ভাঙতে পিরিয়ডিক টেবলে পিছিয়ে যেতে যেতে শেষে ৮২ নম্বর মৌলিক হয়ে দাঁড়াল। তার পর আর কোন গোলমাল নেই, ৮২ নম্বরে এসে আর কোন পরিবর্ত্তন হল না। এই ৮২ নম্বর মৌলিক হচ্ছে সীসে।

ভাঙনপন্থ ত সীসেয় এসে থামল, কিন্তু এই সীসে আবার গোল বাধাল। সাধারণ সীসের পরমাণু ভার ২০৭.২ কিন্তু রেডিয়ম ভেঙে যে-সীসে পাওয়া গেল, তার ভার দেখা গেল ২০৬। রাদারফোর্ড এর কোন কিনারা করতে না পেরে এই সীসের এক টুকরো তাঁর রাসায়নিক বন্ধুকে পাঠিয়ে দিলেন পরীক্ষা করে দেখবার জন্য যে আসলে এটা ঠিক সীসে কি না। রাসায়নিক নানা রকম পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সীসার যা কিছু গুণ বা ধর্ম থাকা উচিত, সবই এই নূতন সীসায় আছে, সাধারণ সীসের সঙ্গে একমাত্র প্রভেদ ওজনে। তখন অগত্যা দুরকমের সীসেকে পিরিয়ডিক টেবলের এক জায়গায় বসান হল এবং সীসের এই বিভিন্ন প্রকারের নাম দেওয়া হল 'আইসোটোপ' isotope, অর্থাৎ সমস্থানীয়, যেহেতু পিরিয়ডিক টেবলে তাদের একই ঘরে বসান ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আরও একটু সমস্যা রয়ে গেল। রাদারফোর্ডের পরমাণু-সৃষ্টি যে ভাবে করা গেল, তাতে সকল পরমাণুর ভার হাইড্রোজেনের ভারের তুলনায় গোটা সংখ্যা হওয়া উচিত, ভগ্নাংশ থাকবার কোন হেতু নেই, কারণ সকল পরমাণুর ভার প্রধানতঃ কেন্দ্রেই এবং কেন্দ্রের নিউট্রন এবং প্রোটনের প্রত্যেকের ওজন একই। খুব ভাল করে মেপেও রাসায়নিকরা কিন্তু দেখলেন যে, বহু বস্তুর পরমাণুর ভার ভগ্নাংশ দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে, ধর ক্লোরিন, ক্লোরিনের পরমাণু ভার ৩৫.৫। আগেই বলেছি যে, পরমাণু ভার= প্রোটন+নিউট্রন, কিন্তু আধখানা প্রোটন বা নিউট্রন ক[illegible] করা যায় না, কারণ সব জিনিষের শেষ সীমা ঐ প্রোট[illegible] নিউট্রন এবং ইলেকট্রন। ভারের হিসেব করবার সময় ইলেক[illegible] ধরবার প্রয়োজন নেই, কারণ ইলেকট্রনের ওজন প্রোটন [illegible] নিউট্রনের ভারের প্রায় ২ হাজার ভাগ মাত্র। পরে পরীক্ষার ফলে জানা যায় যে, ক্লোরিনের দুটো আইসোটোপ আছে ওজন ৩৫ এবং ৩৭ এবং ক্লোরিন গ্যাসে প্রথমটার ৩ ভাগ [illegible] শেষেরটার ১ ভাগ সব সময়েই একসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। রাসায়নিকরা যখন পরমাণু ভার মাপেন, তখন তাঁরা [illegible] একটা বা দুটো ক্লোরিন পরমাণু পান না, কোটী কোটী পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে হয় এবং কাজেই যা ফল পা[illegible] যায়, সেটা হচ্ছে একটা গড় ফল বা average value

রাদারফোর্ডের আর একজন শিষ্য অ্যাসটন আইসোটো[illegible] সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা করেন। বর্ত্তমানে জানা গিয়েছে যে, [illegible] কাংশ জিনিষেরই আইসোটোপ আছে, এমন কি হাইড্রোজে[illegible] পর্য্যন্তও বাদ যায় নি। হাইড্রোজেনের ভার ১ কিন্তু ২ এ[illegible] ৩ ভারওয়ালা হাইড্রোজেন পরমাণুও পাওয়া গেছে। [illegible] জলের কথা বোধ হয় শুনে থাকবে, ভারী জল এই ২ পরম[illegible] ভার হাইড্রোজেন ও সাধারণ অক্সিজেনের যৌগিক।

শেষ পর্য্যন্ত তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, রাদারফো[illegible] প্রাথমিক ভয় অনেকটা অমূলক, কারণ মোটামটি সব[illegible] সমস্যারই মীমাংসা হয়ে গেল। অবশ্য সকল সমস্যার [illegible] সমাধান বোধ হয় কোন দিন হয় না, সেদিন একটা [illegible] পড়ছিলুম "a new scientific discovery [illegible] more problems than it solves." যাই হোক [illegible] কথা আমার বক্তব্য যখন আসলে রূপকথা, তখন শেষ [illegible] নায়কের সকল সমস্যার মীমাংসা না করলে অন্যায় [illegible] সুতরাং আমার কথাটি ফুরলো ইত্যাদি। কিন্তু আস[illegible] ভুল না যে, এটা নিতান্তই রূপকথা, কারণ কেউ [illegible] ইলেকট্রন বা প্রোটন চোখে দেখে নি, হাতে করা [illegible] কথা।

বৈজ্ঞানিক থামল। রাত দশটা বেজে গেছে। কা[illegible] পরিষ্কার। তারা দেখা দিয়েছে। আমি ভাবতে [illegible] বিরাট শূন্যতায় ভরা এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ।

হবে, আমার বিশ্বাস হল না। কাজেই, মরিয়া হয়ে অনিলকে খুঁজে বার করতে হল আমাকেই।

"ও! শোবে? তার আর ভাবনা কি! সটান্ তেতলায় চলে যাও। এই সিঁড়ি দিয়ে সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি দুটো ঘর বাদ দিয়ে আমার ঘর,—শুয়ে থাক গে আমার বিছানায়। প্রথম দুটো দরজা ছাড়িয়ে—তিন নম্বরের দরজা, মনে থাকবে তো? আজ শোবার ভারি গোলমাল, যা ভীড়!"

আক্ষেপ করে' চলে যায় অনিল। আমাকে পদক্ষেপ করতে হয়।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, সর্ব্বাঙ্গ ঢুলছে—কী খাটুনিই না গেছে সারাদিন! যার বিয়ে তাকে না হয় দেওয়া হয়েছে বলি, আমরা যে হলাম জবাই। কোন রকমে সিঁড়ি টপ্‌কে, নম্বর গুণে, ঘরে এসে পৌছলাম। ভাল করে চোখ মেলে তখন চাইতেও পারছি না।

দরজা ভেজানই ছিল—ঠেলতেই খুলে গেল। ঘর অন্ধকার। কোথায় সুইচ কে জানে। বিছানাকেই বা কোন্ প্রদেশে গিয়ে আবিষ্কার করব! পা বাড়াতেই সামনে একটা সোফা পেয়ে গেলাম। তাতেই গা এলিয়ে দিলাম, পাম্প্-শু জোড়া খুলেই। মুহূর্ত্তের মধ্যেই দুর্দ্দমনীয় ঘুম এসে আমায় কবলগত করল।

অনেকক্ষণই ঘুমিয়েছিলাম নিঃসন্দেহ। হালকা কথার পল্‌কা আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

"আচ্ছা 'লেজী' তো তুই! এখনও শুয়ে আছিস? আটটা বেজে গেছে জানিস?"

মেয়েলি গলার জবাব: "আটটা বেজেছে, বলিস কি ভাই? ভারি 'টায়ার্‌ড' হয়ে পড়েছিলাম কাল!"

এ সব কি কথোপকথন? আমার ঘরেই! বিস্মিত ভাবে আমি স্বগতোক্তি করি। মানে কি এর?

সোফা থেকে ঘাড় তুলে পিছনে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছয় চক্ষের মিলন। আমার বাদ দিয়ে বাকি চার চোখের মধ্যে দুটি চোখের অধিকারিণীকে আমি তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলাম—দূর্ব্বা! অনিলের বড়দাদার ছোট শালী। সেই মেয়েটি।

রাত্রির চতুর্থ প্রহরটা আমি তারই বিছানার পাশে সোফায় শুয়ে তোফা ঘুমিয়েছি—আমার অজ্ঞাতসারে। ভাল করে এ কথা ভাবতে না ভাবতেই, আমার হৃদকম্প সুরু হয়ে গেল।

"এখানে এ কে? কে এ লোকটা? অ্যাঁ?" মেয়েরা আর্ত্তনাদ করতে আরম্ভ করল।......

চারিধারে চেঁচামেচি, হট্টগোল, ছুটোপাটি হুলুস্থূল হয়ে গেল, তারই মাঝে এক ফাঁকে চোরের মত সরে পড়ে সোজা নীচে ড্রইং-রুমে চলে এলাম। কী সর্ব্বনাশ—ভাব দেখি একবার।

একটা চেয়ারে বসে আর এক চেয়ারে পা তুলে দিয়ে হাঁপ ছাড়ি। খালি পায়ের দিকে দৃষ্টি পড়তেই পাম্প্-শু'র কথা মনে পড়ে যায়,—সেই মেয়েটির ঘরেই অন্তঃ-পতিত হয়ে আছে! হায় হায়, অমন দামী পাম্প-শু জোড়াই গেল এই দুর্বিপাকে! ফিরিয়ে কি দেবে? বিশ্বাস তো হয় না! আর কেই বা চাইতে যাচ্ছে। ধরতে গেলে খোয়াই গেছে জুতোজোড়া।

একটু পরেই অনিলের আবির্ভাব হয়। "এ [illegible] কি কাণ্ড বল্ তো? ছি ছি!—" বলতে বলতে [illegible] ঢোকে।

"বাঃ! আমার কি দোষ? আমি তো—" ব্যাপারটা আগাগোড়া বোঝাবার চেষ্টা করি অনিলকে। বোঝে কি না, বুঝতে চায় কি না, সেই জানে।

অনিল যায় তো সুনীল আসে। অনিলের [illegible] সুনীল, যার বৌ-ভাতে আমার এই শুভাগমন। সে [illegible] রেগেই আগুন!

"তুই যে এত বড় একটা রাস্কেল্ হয়েছিস তা [illegible] জানতাম না—" এক চোট ঝাড়া গর্জ্জনের পর [illegible] একটু নরম হয়—"তোর মত এমন আহাম্মক তো [illegible] নি!"

"সত্যি বলছি বড়দা—", আমি প্রতিবাদ [illegible] "—অনর্থক মাথা গরম করছ তোমরা। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল, অনিলের ঘর মনে করে'—"

"তবু ভাল যে একটা কৈফিয়ৎ ভেবে বার করতে পেরেছ।" ঘাড় নেড়ে বড়দা বললেন, "যাক, ঐ [illegible] সবাইকে বলবে। অনেকটা রক্ষা হবে তাতে।"

বড়দার উপদেশে এমন রাগ হল আমার!

এর পরে অনিল এসে খবর দিল, এই ব্যাপার নিয়ে দুটো আদালত বসে গেছে বাড়ীতে। একটা কর্ত্তাদের, একটা গিন্নীদের।

"দূর্ব্বাও বলছে যে সে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে দরজায় খিল্ দিতে ভুলে গিয়েছিল। এদিকে তুমিও বলছ তোমারও ঘুমে এমন চোখ জড়িয়েছিল যে—, মানে, তোমাদের আগে থেকে যে সড়্ ছিল না, এ কথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না।"

বিশ্বাস করতে চাইছে না? আমার কথাও নয়, দূর্ব্বার কথাও নয়? রেগে টং হয়ে ভাবলাম, না চাক বিশ্বাস করতে, বয়েই গেল আমার। আদালতের রায় নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার হবে না।

আধঘণ্টা পরে আবার সুনীল।

"শোন গনেশ—" জজের মত ভারিক্কি মেজাজে আর গম্ভীর গলায় তার আবার সুরু হল—"কিছু হয়ে থাক্ আর নাই হয়ে থাক্, এখন একটি মাত্র পথ খোলা আছে। দূর্ব্বাকে তোমার বিয়ে করতে হবে। সকলেরই এই মত।"

আমি চমকে গেলাম। "না, না, কিছুতেই না—" প্রায় খেপে উঠলাম—"বিয়ে আমি করবই না, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। দূর্ব্বাকেও না, কাউকেই না।"

"তা হলে তুমি কি করতে চাও শুনি?" বড়দা গম্ভীর আওয়াজে প্রশ্ন করলেন।

"আমি চলে যেতে চাই—" সহজ ভাবেই জবাব দিলাম—"আমার পাম্প-শু জোড়া ফিরিয়ে দিলেই যেতে পারি।"

"ঠাট্টার কথা নয়, গণেশ। মেয়েটার কী সর্ব্বনাশ তুমি করে' যাচ্ছ, তা ভেবে দেখেছ? ওকে কি আর কেউ বিয়ে করতে চাইবে?"

"বাঃ, আমার সর্ব্বনাশের দিকটা যে কেউ দেখছ না তোমরা!"—অভিযোগের সুরে বললাম—"গণেশ বলে' কি আমায় নিতান্তই গোবর-গণেশ পেয়েছে তোমরা? নিজের হাতে নিজেকেই ফাঁসিতে লট্‌কাব?"

"সেই দিক্‌টাই তো দেখছি। এই বিয়ে না হলেই তোমার সর্ব্বনাশ। আমার বড়শালা নামজাদা বক্সার। সে বলেছে, দূর্ব্বাকে বিয়ে না করলে এক ঘুসিতে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে দেবে।"

অতঃপর, আমাকে পুনর্ব্বিবেচনা করতে হল, বাধ্য হয়েই। সমস্ত জিনিষটাই নতুন করে দেখতে হল, ঘাড়ের ভাঙবার সম্ভাবনার দিক থেকে। অগত্যা চুপ করে থাকলাম।

"তা হলে, আজ রাত্রেই একটা লগ্ন আছে, কেমন?"—বড়দা আমার মৌন-সম্মতিকেই স্বীকার করে নিলেন। হঠাৎ সুর বদলে বললেন, "যাক, বাঁচা গেল। খাবার-দাবার জিনিষও অনেক জমে ছিল, ফেলা না গিয়ে কাজে লেগে গেল, ভালই হল!"

রাগে দুঃখে অভিমানে আধমরা হয়ে ভাবতে লাগলাম, এরা আমাকে ভাবছে কি? আমি যেন নেহাৎ ফেলনা, বিয়ে করা ছাড়া আর কোন কাজ যেন আমার নেই! ওদের খাবার দাবার কাজে লাগানর জন্যেই জন্মেছিলাম। এমন রাগ হল আমার! কিন্তু মনের রাগ মনেই চেপে রাখলাম।

অবশেষে বিয়ের লগ্নে সে পাশে এসে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত কাঁদতে থাকল আর আমি ক্রমাগত গুম হয়ে থাকলাম। তার দিকে ফিরেও চাইলাম না।

অবশেষে, বাত্রে, রসিকতার যাবতীয় উপদ্রব নিঃশেষ হয়ে যাবার পরে—বাসর-ঘরে রইলাম কেবল সে আর আমি।

তখন আমি তার মুখের দিকে চাইলাম। ঘাড় না বাঁকিয়ে সোজাই তাকালাম। আর তো ঘাড়ের মট্ করে ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কা নেই, ওর দাদাকেও আর ভয় করি না আমি। এখন এবং এখানে একমাত্র আমিই কর্ত্তা।

চেয়ে দেখি, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে মেয়েটা! সারাদিন ধরে তার উপরেও কম ঝক্কি যায় নি তা হলে!

আমার বক্তৃতার সূত্রপাতের আগেই সে বলতে সুরু করল "আমি জানি আপনার কোন দোষ নেই; আপনার বিয়ে করবার ইচ্ছা ছিল না।" তারপর খানিক ফুঁপিয়ে আবার বলল, "আপনি আমাকে ভাল বাসেন না। বাধ্য হয়েই আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে আপনাকে। এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন! আপনি যদি চান, আমি বিষ খেয়ে কিংবা কাপড়ে কেরোসিন লাগিয়ে মরতে রাজি আছি, আপনার পথের কাঁটা হয়ে আমি থাকব না—!"

এ কথা শোনার পর মানুষ রাগ করে থাকতে পারে?

কিন্তু তারপর পুরো পাঁচ বছর কেটে গেছে, এখনও আমি যখন ডাকি—'দূর্ব্বা!' সে জবাব দেয়—কি বলছেন 'দুর্ব্বাশা?'

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

অবিনাশ ..অফিসে নিত্য লেট বিপন্ন কেরাণী (বয়স ৪২ বৎসর)।

বড় বাবু ..অফিসের হেডবাবু।

কৈলাস, ভুবন, সত্য, মণীন্দ্র, ভূষণ প্রভৃতি } অফিসের কেরাণী।

কেষ্টা অবিনাশের ভৃত্য।

জয়রাম বক্সী...জাতীয় বিবাহ-বন্ধন-সঙ্ঘের সেক্রেটারি।

পঞ্চপাণ্ডব · তারিণী দেবীর পাঁচ পুত্র-কন্যা (বয়স ১২ হইতে ৫ বৎসর)।

দ্বাদশ-গোপাল...দ্বাদশটি গ্রহরূপা পথের ছেলে এবং একটি ক্রন্দমান ছ'মাসের শিশু।

তারিণী দেবী...অবিনাশ বিপদ-তরঙ্গিনী ভাগ্য-বিধায়িনী (বয়স ৩২ বৎসর)।

প্রথম দৃশ্য

অবিনাশের ঘর

[একদিকে খাট, খাটে বিছানা, বিছানার উপর বই, ধোপার বাড়ার কাপড়-চোপড়, হার্ম্মোনিয়মের বাক্স, একবারে মলিন শয্যা—তাহাতে বালিশ নাই। অপরদিকে একটি চেষ্টার ড্রয়ার; তার মাথায় চায়ের পেয়ালা, পিরীচ, বাইকার্ব্বনেট অব্ সোডার প্রায় খালি বোতল প্রভৃতি, আর্শির টেবিল, তার উপরে দাড়ি কামাইবার সেট - সদ্য-ব্যবহৃত, অমাজ্জিত মলিন ভাবে পড়িয়া আছে। আ'লনা—তাহাতে জামা-কাপড়-আলোয়ান প্রভৃতি বিশৃঙ্খল ভাবে রক্ষিত]

অবিনাশ। (স্নানান্তে গায়ে-গেঞ্জি ঘরে আসিয়া মাথায় ব্রাস চালাইয়া ক্ষণেক দাঁড়াইল; পরে খাটের তলায় সংরক্ষিত জুতাজোড়া টানিয়া হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গী করিল; পরে আত্মগতভাবে) যাচ্চলে—জুতোজোড়া বুরুশ করা হলো না—ভারী ময়লা হয়ে রয়েছে! আগে জামাটা গায়ে দিয়ে নি। নিয়েই (আলনার কাছে আসিল; জুতা রাখিয়া আলনা ঘাঁটিয়া ফর্সা কামিজ মিলিল না; আছে ময়লা শার্ট,—সেটা টানিয়া সগর্জ্জনে ডাকিল) কেষ্টা—কেষ্টা—

(কেষ্টার প্রবেশ)

ধোপার বাড়ী সব কাপড়-জামা মিলিয়ে কাচতে দিলে যদি তো এ ময়লা শার্টটি কার জন্যে রাখলে কেষ্টচন্দর?

কেষ্টা। এজ্ঞে, ও-জামা আনলায় আছে, আপনি আমায় আনলার জামা-কাপড়ে হাত দিতে মানা করেছ,—সেই সোনার বোতাম হারানো ইস্তক—

অবিনাশ। তা বলে' চেয়ে দেখবে না, আনলার ময়লা জামা-কাপড় রইলো কি না?

কেষ্টা। এজ্ঞে, ময়লা সার্ট তো দেখেছি। আপনি হাত দিতে মানা করেছেন, তাই আনলা থেকে নিয়ে ধোপাকে দিই নি।

অবিনাশ। বটে! এমন... হলে কদ্দিন? Your most obedient servant—একেবারে? তা, এটা নিয়ে যাও ধোপার বাড়া দিয়ে এসো। (কেষ্টার হাতে শার্ট দিল কেষ্টার প্রস্থান। পরে অবিনাশ বিছানায় জড়ো-করা ধোপার বাড়ার ধোয়া-কাচা জামা-কাপড়ের মধ্য হইতে ধোপদোস্ত শার্ট বাছিয়া সেটা গায়ে চড়াইল; চড়াইয়া) ওঃ এই জুতোজোড়া—(জুতা বাস করিতে করিতে)

গান

যে সময়ে না করে বিয়ে,
সে করে খুব কুকর্ম্ম।
তার সারা জীবন কষ্টে কাটে—
পেটে হয় সে গলদ্‌ঘর্ম্ম!
ভোরে ওঠে চায়ের তেষ্টা—
মেটাতে চাই নিজের চেষ্টা।
কেষ্টা চাকর করে না তা—
করলে ঘোর অধর্ম্ম।
বাজার ছোটা আছে নিত্যি—তবু বাবা পড়ে পিত্তি,
ঠাকুর যা তার ধরে পাতে, দেখলে জ্বলে চিত্ত।

[বড় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল]

[গান থামাইয়া অবিনাশ চকিতে থ]

ওরে বাবা! বেলা দশটা। না, আজও ... আফিসে লেট—ভয়ঙ্কর লেট। এই জুতোজোড়ার ... ···ব্যাটা জুতো! (জুতা ও ব্রাশ ছুড়িয়া মেঝেয় ফেলি...) নাঃ···ওরে কেষ্টা··· কেষ্টা···

[কেষ্টার প্রবেশ — তার হাতে সেই ময়লা শার্ট]

কেষ্টা। পেছু ডাকলেন! ময়লা শার্ট নিয়ে আমি ধোপার ওখানে দিতে যাচ্ছিলুম।

অবিনাশ। বেশ করছো, বাপধন। তার আগে এক কাজ করো। হ্যাঁ ঐ ঠাকুর! ঠাকুরকে বলো, আমার ভাত বাড়তে! ভাত...বেলা হয়ে গেছে ..চটপট—

কেষ্টা। এজ্ঞে, ঠাকুর তো আজ আসে নি। ভাত রান্না হয় নি।

অবিনাশ। এতক্ষণ আমায় সে কথা বলো নি কেন?

কেষ্টা। আপনি বাজারে গেলেন কি না।

অবিনাশ। আমি তো অগস্ত্য-যাত্রা করি নি বাপু, বাজারে বাস করতে যাইনি। বাজার থেকে অনেকক্ষণ বাড়ী ফিরেছি—

কেষ্টা। আমার খেয়াল হয় নি!

অবিনাশ। খেয়াল হয় নি। তার মানে?

কেষ্টা। কাল রাত্তিরে ঐ মল্লিক-বাড়ীতে যাত্রা হয়েছিল—শুনে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!

অবিনাশ। বটে! ভাবী আরামে বাস করছো, দেখছি। যাত্রা, ঘুম, খেয়াল। মাইনে পাও না? অমনি চাকরি করছো—না? যেমন বামুন, তেমনি চাকর। দুটি এক মায়ের পেটের যমজ বাচ্চা!.. ঠাকুর কেন আসে নি, শুনি?

কেষ্টা। এজ্ঞে, সে বলছিল, গঙ্গা নাইতে যাবে—ওর কে দিতে এসেছে—তার সঙ্গে গঙ্গা নেয়ে কালীঘাটে যাবে—

অবিনাশ। হুঁ...বেরোও...বেরোও তোমরা দুটিতে। এখানে আর সুবিধে হবে না—আমার সাফ কথা। এমন বামুন চাকর আমি নেহি মাংতা! জ্বালাতন! বিয়ে-থা না করে চল্লিশটা বছর যদি বৌ-বিহনে আরামসে কাটিয়ে দিতে পেরে থাকি তো বাকী দিনগুলো বামুন-চাকর বিহনে আমার কেটে যাবে'খন। ..ব্যাটাদের জ্বালায় অফিসে রোজ লেট। চাকরী যেতে বসেছে...বিশ বছরের চাকরি!...চাকরি রাখার জন্যেই তোমাদের রাখা, বুঝলে। নইলে কি আমার বয়ে গেছে! বলে, একলা মানুষ, experienced bachelor আমি। বাজার হাটে আমার বাস করবার কথা! হুঁঃ..

কেষ্টা। এজ্ঞে...

অবিনাশ। কি কাজটা করো, বাপু, শুনি! সকালে চায়ের ব্যবস্থা—আমি নিজের হাতে করি।

কেষ্টা। আপনি বলেন, পেয়ালায় হাত দিতে হবে না তোমায়...

অবিনাশ। তা যে-বটে পেয়ালা ভাঙতে লাগলে, আমার ফেল হবার জো! · তার পর জামা-কাপড়ে সাবান দেওয়া

কেষ্টা। আমার কাজ আপনার পছন্দ হয় না...

অবিনাশ। জুতো বুরুশ—তাও করি নিজের হাতে।

কেষ্টা। আপনি বলেন, আমি বুরুশ করতে পারি

অবিনাশ। কি না করি বাপু! শুধু শুধু মাইনে দিয়ে তোমাদের রেখে লাভ? ঠাকুরটি তো আমার পাতে ধরে ছ্যান আলু ভাতে আর ভাত—জল-সই ডাল আর ঝোল নয় ডালনা। এত বাজার আনি · তা সব যায় ঐ দুটি অজগরের জঠরে। ·

কেষ্টা। এজ্ঞে...

অবিনাশ। আর এজ্ঞের কাজ নেই—এবারে সে-আজ্ঞে। সরে পড়ো। আমার গায়ে আর মাস নেই—ক্ষেত্রান্তরে চেষ্টা দ্যাখ গে। সামনের রোববারে এসে মাইনে নিয়ে যেয়ো হিসেব করে। এখানে আর পোষাবে না—(কথা কহিবার সঙ্গে সঙ্গে জামার বোতাম খুঁজিয়া জামায় আঁটিল। এটা-ওটা নাড়িয়া গুছানো) দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভালো। · আজ তো খাওয়ার দফা গয়া। কুছ পরোয়া নেই। এখন.. কি, কেষ্ট ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে! এ বাড়ীটা শ্রীবৃন্দাবন নয় আর আমি তোমার ধেনু নই যে, খেয়াল-ভরে আমাকে চরিয়ে খাবে। সরে পড়ো...সরে পড়ো।

কেষ্টা। এজ্ঞে, তা হলে সত্যি সত্যি জবাব দিচ্ছেন?

অবিনাশ। সত্যি জবাব...সাফ জবাব। ঘরে-দোরে তালা লাগিয়ে অফিসে বেরুবো—বুঝলে? ঠাকুর রান্না,

আর চাকর কেষ্ট। জুটেছে ভালো—ছুটিতে মিলে রাম-কেষ্ট—আমাকে পরমহংস বানাবার জো! সেটি আর হচ্ছে না। যাও, যাও—আমার সময় নেই বকাবকি কর-বার!

কেষ্টা। এজ্ঞে, তা হলে এ ময়লা শার্ট?

অবিনাশ। রেখে চলে যাও।

কেষ্টা। তা হলে পয়সা দিন—জলপানির। না হলে এ বেলায় কি খাবো?

অবিনাশ। ও—হ্যাঁ। এই নাও জলপানির পয়সা! (ঝন্-ঝন্ শব্দে আটটা পয়সা ফেলিয়া দিল)।

কেষ্টা। (পয়সা কুড়াইয়া) তা হলে আসি, বাবু। পেন্নাম। (প্রস্থান)।

অবিনাশ। আপদ গেল। হাড়ে এবার বাতাস লাগবে (ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল)।

গান

নাঃ, আজো দেখছি, দেরী হলো—
চাকরি রাখা দায়!
(কোট লইয়া দেখিয়া) ওমা, কোটে বোতাম একটিও নেই!
হায় হায় হায়!
কোথা পাই ছুঁচ? কোথায় সুতো?
এ তো দেখছি আচ্ছা গুঁতো!
ওরে কেষ্টা...কেষ্টা...ও বাপ কেষ্ট...
নাঃ, ব্যাটা লম্ফ দেছে লম্বা পায়!

দ্বিতীয় দৃশ্য

অফিস-কামরা

[টাইপরাইটার চলিয়াছে খটাখট শব্দে। ভুবন, কৈলাস, ভূষণ প্রভৃতি কেরাণীরা টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছে। চাপরাশিরা যাতায়াত করিতেছে, ফাইল আনিতেছে, ফাইল লইয়া চলিয়াছে]

ভুবন। গতিক যা দাঁড়াচ্ছে, সুবিধে দেখছি না

কৈলাস। বড়বাবুটি দিনে দিনে যে চীজ দাঁড়াচ্ছেন! ভাখো না, সে দিন আমার দশ মিনিট লেট্ হয়েছিল, বাড়ীতে অসুখ ছিল, তাই। বললুম, ব্যাটা তবু আট আনা জরিমানা করিয়ে দেছে। আর ওঁর সম্বন্ধী ঐ চুণ্ডি গণেশ ব্যাটা নবাব পুত্তুর বিড়ি টানতে টানতে রোজ আপিসে আসছে বেলা বারোটায়, সাড়ে বারোটায়, তার বেলা টুঁ শব্দটি তোলে না।

কৈলাস। ভুলে যাচ্ছ দাদা, সে হলো বড়বাবুর সম্বন্ধী! আপিসে চাকরী করতে এসে যদি ভদ্র ব্যবহার চাও তো বড়বাবুর সম্বন্ধী হয়ে জন্ম নিলে না কেন?

ভূষণ। তপস্যা চাই হে, সম্বন্ধী-জন্ম পেতে চাইলে।

(অবিনাশের প্রবেশ)

এই যে অবিনাশ···

কৈলাস। কটা বেজেছে—খেয়াল আছে? আজকে মজাটি টের পাবে'খন।

অবিনাশ। আর চলে না দাদা। বামুন ব্যাটা কোথায় ভেগেছে। না খেয়ে আপিসে আসছি। (চারি-দিকে চাহিয়া) Attendance বইখানা কোথায়? দেখতে পাচ্ছি না তো।

ভুবন। বড়বাবু ব্যাটা নিয়ে গেছে—একদম সেই সাহেবের টেবিলে।···এর মধ্যে চারবার ব্যাটা এসে ঘুরে গেছে তোমার খোঁজে। বলে, অবিনাশ ভেবেছে কি? এখনও আসবার সময় হলো না?··· ঐ যে আবার আসছে—ব্যাটা সাক্ষাৎ দুঃশাসন!

(বড়বাবুর প্রবেশ)

বড়বাবু। এই যে অবিনাশ! আপিসের কথা তা হলে মনে পড়েছে এতক্ষণে! ভালো ভালো। তবে কি জানো, আপিসটা ঠিক শ্বশুর-বাড়ী নয়···

মণীন্দ্র। ভগ্নীপতির বাড়ীও নয়···তাই বলছিলুম।

বড়বাবু। কে? মণি, বুঝি! ভারী ডেঁপো হয়েছো। সাহেবদের সঙ্গে ইংরাজীতে দুটো কথা কইতে পারো বলে ভারী দর্প হয়েছে···না? কিন্তু মনে রেখো, অতি দর্পে হতা লঙ্কা···এত বড় লঙ্কা—সেও ছারে খারে গিয়েছিল—তুমি তো পুঁচকে ধানি।...ইংরিজী কথার ঝাঁজে চাকরি রক্ষা পায় না, বাপু।

মণীন্দ্র। আজ্ঞে না স্যর, তা তো আমি বলিনি। আমি বলছিলুম, অবিনাশ বাবু যে আমাদের গণেশের নকল করতে চান্···সেটা ওঁকে মানায় না···বড়বাবু ওঁর ভগ্নী-পতি নন্ তো···

ভুবন। ভগ্নীপতি-বড়বাবু পথে-ঘাটে পড়ে থাকে না মণি...ভাগ্যি করা চাই।

বড়বাবু। ভুবন!

ভুবন। না স্যর, তা হক্ কথা বলবো আমি। ব্যাচারী গণেশকে সকলে হিংসে করে। আমার তা সহ্য হয় না। আমি এত বোঝাই যে ওরে বাপু, ভগবান যাকে যেমন ভাগ্য দেছেন।...হিংসে করা শুধু energy নষ্ট করা বৈ নয়

বড়বাবু। (রক্তবর্ণ চোখে চারিধারে চাহিয়া) ভুবনের সে মাসের হিসেবটা দেখা হয়েছে?

ভুবন। কাল সেরে ফেলেছি।

বড়বাবু। বেশ ··তা হলে এক কাজ করো। এটা মিটিং হচ্ছে না। কথার ফাঁকিতে আমাকে ভুলোতে পারবে না। হাঁ·· তারপর—ক'টা বেজেছে অবিনাশ?

অবিনাশ। আজ একটু লেট হয়ে গেছে স্যর ··

বড়বাবু। একটু! বেলা এগারোটা বেজে গেছে। চাকরি করতে হলে ঘড়ির পানে নজর রাখতে হয়। সাহেবের সঙ্গে এইমাত্র সেই কথা হচ্ছিল·· কাঁহাতক আমি আর গরু তাড়াবো, বলো? · সবেরই একটা সীমা আছে। তুমি যা ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে তুলছো! রোজ লেট। সাহেব বলছিল, অবিনাশের বোধ হয় এখানকার চাকরী তেতো লাগছে!·· অনেক বলা-কওয়ায় আজকের দিনটা তোমার চাকরি বাঁচিয়েছি···কিন্তু আর বাঁচে না।··· সাহেব বলেছে, বেশ, তোমার কথা রেখে অবিনাশকে আর একটা চান্স দিচ্ছি·· শেষ চান্স! মানে, আজকের লেটের জন্মে পাঁচ টাকা জরিমানা। তবে এ-কথা সাফ বলে দেছে,—ফিরে-বারে এক মিনিট লেট হলে এ আপিসে আর তোমার চাকরী করা চলবে না!

অবিনাশ। না স্যর—আর আমার লেট হবে না।· ঠিক করেছি, আজ আপিসের পর রাত্রে আর বাড়ী ফিরবো না—আপিসেই দরোয়ানদের খাটিয়ার পাশে পড়ে থাকবো।

বড়বাবু। দরোয়ানের খাটিয়ার পাশে পড়ে থাকো কি দিল্লীর মশনদে থাকো, তাতে আপিসের কিছু এসে যাবে না। আমায় শুধু দেখতে হবে, যারা মাইনে দিচ্ছে মাস গেলে, তাদের কাজ টাইম মিলিয়ে পুরোপুরি আদায় হচ্ছে কি না!···এখন যাও, attendance-কেতাবে নামটা আঁচড়ে এসো সে কেতাব আছে সাহেবের টেবিলে।

অবিনাশ। যাই স্যর। (প্রস্থান)

বড়বাবু। জাপানের কাগজগুলো যেন আজ ready হয় কৈলাস ..আর মণি, তুমি সেই correspondence ফাইলটা আজ clear করে ফেলো·· ও আর ফেলে রাখা চলে না বুঝলে।...ইংরিজীর তুবড়ি ছুড়তে হয়, ঘরে গিয়ে ছুড়ো · আপিসে নয়। আমি কাজ চাই · ইংরিজির ছুঁচো-বাজি চাই না··· (প্রস্থান)

মণীন্দ্র। আমায় যদি ব্যাটা বাগে পায় তো বোধ হয় চিবিয়ে খায়।

ভূষণ। লোহায় দাঁত বসছে না। বড়-সাহেব তোমায় চাকরিতে বসিয়েছে ফুটবল খেলার মাঠে তোমার খেলা আর ইংরিজিতে দখল দেখে··তোমার গায়ে দাঁত বসাতে পাচ্ছে না বলে ব্যাটা দম ফেটে মরে যাচ্ছে·

কৈলাস। দম ফেটেই একদিন ও মরবে, দেখে নিয়ো —এ আমি বলে রাখছি।

ভুবন। এই জরিমানার যে ফন্দী···আমার কি মনে হয়, জানো কৈলাস?

কৈলাস। কি?

ভুবন। এ জরিমানার কথা সাহেব হয়তো জানে না · এ টাকা ও-ব্যাটা আদায় করে নিজের ট্যাঁকে গোঁজে। না হলে মাইনের রসিদ নেবার সময় পুরো টাকার রসিদ নেবে কেন?

(অবিনাশের পুনঃপ্রবেশ)

কি হলো অবিনাশ?

অবিনাশ। নামটুকু নিঃশব্দে সই করে এলুম।

কৈলাস। সাহেব কিছু বললে?

অবিনাশ। না·· সাহেব কি লিখছে খুব attentively।

মণীন্দ্র। হুঁ। ভুবনদা যা বলেছো, তাই। জরিমানার টাকা ঐ বড়বাবু ব্যাটা ন্যায়···সম্বন্ধীকে ঢুকিয়েছে বিনা-পয়সার apprentice—তার বিড়ির পয়সা ব্যাটা জোগাচ্ছে, বেচারী-আমাদের কাছ থেকে জরিমানা উশুল করে। তা অবিনাশবাবু, সাহেবের কাছে জরিমানার কথা তোলেন না কেন?

অবিনাশ। শেষে ভাই, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কি সাপ বার করে বসবো?

ভুবন। তোমারো দোষ আছে, অবিনাশ। জানো তো, বড়বাবু ব্যাটা হাড় পিশাচ। কেন যে তুমি এমন লেট করো রোজ?

অবিনাশ। কেন করি—কি করে বুঝবে বলো দাদা? বিয়ে-থা করেছো, বাড়ীতে বৌদি সব দেখেন-শোনেন—কোনো রকম ঝক্কি নেই। আমার হলো—আমি একলা মানুষ, বামুন চাকরের উপর নির্ভর। নিজের হাতে সব করতে হয়—জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত। এই ছাখো না কোট (গায়ের আলোয়ান খুলিয়া কোট দেখাইল·· কোটে একটিও বোতাম নাই)—একটি বোতাম

...এঁ্যা—পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ বৎসর? বলেন কি?

নেই। কোথায় ছুঁচ, কোথায় সুতো, কে-বা হাতের কাছে জুগিয়ে ছায়? বোতামই বা কে টাঁকে? বোতাম-খোলা কোটের উপর ব্যাপার চড়িয়ে চলে এসেছি।

কৈলাস। তোমার নিজের বুদ্ধির দোষে। বিয়ে-থা করলে না কি দুঃখে, বলো তো? এত করে বলি—কত মেয়ের সন্ধান দিচ্ছি··

ভূষণ। সত্যি হে অবিনাশ, একটি স্ত্রী পুরুষ-জাতের কতখানি দুঃখ-উদ্বেগ যে মোচন করেন

মণীন্দ্র। যেন ডানা মেলে ডানার আড়ালে আমাদের আগ্‌লে রেখেছেন।

কৈলাস। তার ফলে আমাদের ছাখো,—এখানকার ঐ গড়ের মাঠে German war বাধলেও সাড়ে ন'টায় ভাত খাইয়ে আপিসের পথে ঠিক রওনা করিয়ে দেবে। বিয়ে করেছি বলেই না চাকরিটে বজায় রেখেছি। Service-registerটি বেদাগ—একটি কালো দাগ তাতে পড়তে পায় নি।

ভুবন। চাকরি করতে হলে বাড়ীতে একটি স্ত্রী থাকলে চলে না, অবিনাশ।

ভূষণ। গেল-মাসে লেটের দরুণ কত টাকা জরিমানা দেছ?

অবিনাশ। ষোল টাকা।

ভুবন। ওরে বাস্‌রে।

কৈলাস। দুর্বুদ্ধি। ষোল টাকায় একটি স্ত্রীকে অনায়াসে ঘরে এনে পালন করা চলে। বামুন-চাকরের চেয়ে ঢের সস্তায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়।

অবিনাশ। সব বুঝি। কিন্তু এ-বয়সে তো আর একটা পুঁচকে মেয়ে ধরে আনতে পারি না। তাতে কি আমার সুবিধে হবে, বলুন?

মণীন্দ্র। পুঁচকে মেয়ে বিয়ে করবেন কেন অবিনাশ বাবু? ঐ যে জাতীয় বিবাহ-বন্ধন-সঙ্ঘ আছে· চলে যান্ তাদের ওখানে। তারা সব বয়সের পাত্রী মজুত রেখেছে। যেমন চান· মানে, পাঁচ বছর বয়স থেকে পয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত।

অবিনাশ। বলো কি হে? পাঁচ বছর থেকে শুরু করে পয়তাল্লিশ বছর পর্য্যন্ত বয়স—বিবাহের পাত্রী?

মণীন্দ্র। তাই। Times have changed. এ হলো যুগ age of civilisation, science, industry, চারদিকে কি কাণ্ড না বাধিয়ে তুলছে দিন-দিন।

অবিনাশ। তুমি তামাসা করছো। পাঁচ বছরের পাত্রী আবার পঁয়তাল্লিশ বছরের পাত্রী!

মণীন্দ্র। তামাসা নয় অবিনাশ বাবু। যান তাদের অফিসে, দেখবেন, দরজার সামনে মস্ত ফর্দ্দ ঝুলছে হোটেলের দেওয়ালে যেমন চপ, কাটলেট, ফাউল-কারি মাটন-কারির ফিরিস্তি থাকে,—তেমনি লম্বা লিষ্টি। সাত, আট, দশ, পঁচিশ, ত্রিশ·· সব বয়সের পাত্রী দেখবেন· তাদের নাম-ধাম কুলুজী-সমেত!

কৈলাস। সত্যি কথা হে অবিনাশ। আমাদের পাড়ার দামোদর গাঙ্গুলী। পঞ্চাশ বছর বয়সে কষ্ট করে তার পরিবার গেল মরে—সংসার শূন্য। ও-বয়সে পুঁচকে মেয়ে বিয়ে করে লাভ নেই, দামোদর গাঙ্গুলি গেল চলে ঐ জাতীয় বিবাহ বন্ধন সঙ্ঘে, দেখে-শুনে সেখান থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের গিন্নীবান্নী গোছ বৌ বিয়ে করে নিয়ে এলো, সংসারের সঙ্গে exactly fit করেছে।

অবিনাশ। বলেন কি?

কৈলাস। তাই। দামোদর বাবুর বাড়ী যাও, এখন কে বলবে, ভদ্রলোকের দ্বিতীয়-পক্ষের সংসার।

মণীন্দ্র। বুঝছেন না অবিনাশবাবু pure business. Demand বুঝে supply করতে পারলেই success. তা সে demand জুতোর হোক, বা জরুর হোক।

অবিনাশ। হুঁ! all right বামুন-চাকর দুটিকে বিদেয় করে দোরে তালা লাগিয়ে আপিসে এসেছি। আপিস-ফেরৎ সোজা যাবো ঐ বিয়ের বাঁধনদের দলে— সেখান থেকে বিয়ে করে বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরে বাড়ীর তালা খুলে সস্ত্রীক আজ গৃহপ্রবেশ করবো—এই আমার প্রতিজ্ঞা! দেখি, এবার থেকে কি করে আপিসে লেট হয়, আর বড়বাবু ব্যাটা আমার চাকরি খায়।

ভুবন। সাবাস্ অবিনাশ! একেই বলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

তৃতীয় দৃশ্য

জাতীয় বিবাহ-বন্ধন-সঙ্ঘ

দ্বারের সামনে মস্ত ক্যাটালগ আঁটা। তাহাতে ৫ বৎসর বয়স হইতে ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পাত্রীদের তালিকা। দু'একজন লোক ক্যাটালগের উপর হুমড়ি খাইয়া নোট-বুকে কি সব নোট করিতেছে—নিঃশব্দে উমেদারগণের যাতায়াত করা এবং যাতায়াত চলিতেছে। সামনে দাঁড়াইয়া সেক্রেটারি জয়রাম বক্সী]

জয়রাম বক্সী। (সুরে)

> **আমাদের এই জাতীয় বিবাহ-বন্ধন সঙ্ঘ—**
> **আমরা পাত্রী জোগাই সকল রকম**
> **জুড়ে সারা বঙ্গ।**
> **সব বয়সের পাত্রী মজুত পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ—**
> **অর্থাৎ যিনি যেমনটি চান, যেমনটি যাঁর wish!**
> **আছে পর্দ্দা-মার্কা, ফর্দ্দা-পার্কা…**
> **(অবিনাশের প্রবেশ)**

জয়রাম। (গান থামিল) কাকে চান?

অবিনাশ। পাত্রী।

জয়রাম। (অবিনাশকে আপাদমস্তক লক্ষ্য করিয়া) নিজের জন্যে?

অবিনাশ। তা নয় তো কি আপিসের বড়বাবুর জন্যে এই ভর সন্ধ্যাবেলায় এককাল বরতে এসেছি, ভেবেছেন?

জয়রাম। বেশ, তা হলে আমার সঙ্গে কথা বলুন। আমার নাম শ্রীজয়রাম বক্সী—এই জাতীয় বিবাহ বন্ধন-সঙ্ঘের আমি সেক্রেটারি। নিজের জন্য আপনি পাত্রী চান?

অবিনাশ। হাঁ।

জয়রাম। বেশ কথা। কত বয়সের পাত্রী চান, বলুন। সব বয়সের পাত্রী এখানে মজুত পাবেন। মানে, পাঁচ বছর বয়স থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর্য্যন্ত।

অবিনাশ। সত্যি। পাঁচ বছর?

জয়রাম। বাঃরে তম, মশায়, বারস ব জন্য। বাংলায় সাত কোটি পুরুষের বাস। কেউ চায়—এ কালের হালচাল দেখে যাঁরা ভয়গ্রস্ত তাঁরা চান, পাঁচ বছর বয়সের পাত্রী… মানে, বিয়ে করে' বাচ্চা বৌটিকে নিয়ে গিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের ছাঁচে গড়ে তুলবে! পাঁচ রকমের বাতাস এসেছে দেশে—Eastern বাতাস, Western বাতাস, Northern, Southern—তবে এতকাল এই দেশের হাওয়া, বাসী-গঙ্গা হাওয়া, খোকাই হাওয়া—বাড়ছে বুঝছেন তো,—law of demand and supply বিবাহ কি আর এখন বিবাহ আছে, মশায়? বিবাহ এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রচণ্ড সমস্যা!

অবিনাশ। চাকরি-রাখা সমস্যার চেয়ে বড় সমস্যা নয়, মশায়।—তা যাক—আমার কিন্তু ও পাঁচ বছর বয়সের পাত্রীতে চলবে না। সকালে আপিস যাই, ফিরি সন্ধ্যার পর। সময় কোথায় বলুন যে পাঁচ বছর বয়সের পুঁচকে বৌ নিয়ে গিয়ে তাকে ক-খ-গ-ঘ পড়িয়ে মানুষ করবো!

জয়রাম। বেশ, তা হলে আট বছর আছে,—দশ বছর আছে

অবিনাশ। উহুঁ! পুতুলের বায়না করবে, খেলার

বায়না করবে—কোথায় ছুটবো এ বয়সে পুতুল আর খেলনা কিনতে!

জয়রাম। ঠিক···তা হলে ষোল-সতেরো বছর বয়সের দি! বেশ হবে।

অবিনাশ। না, না, না। বাপ রে, চাকরির কথা তা হলে মনে থাকবে না! বৌয়ের মুখের পানে চেয়ে পদ্য লিখতে বসে যাবো—দুনিয়া ভুলে, চাকরি ভুলে, সর্ব্বনাশ ঘটে যাবে। ওতে চলবে না মশায়। বুঝছেন না, আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর!

···কত লিষ্ট চান? এই দেখুন একের নম্বরে ...।

জয়রাম। ও—তা হলে সাতাশ-আটাশ দি—fit করবে'খন!

অবিনাশ না মশায়, নিজের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও লোকের মুখে শুনতে পাই, ও বয়সের মেয়েরা গহনা চায়, শাড়ী ব্লাউশ-চায়, মোটর চড়ে' বেড়াতে চায়। সিনেমার উপরে ভারী লোভ।

জয়রাম। তা হলে আপনি নিন ত্রিশ-বত্রিশ বছর··· এ বয়সে ঝকি কম।

অবিনাশ। আছে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের পাত্রী?

জয়রাম। কত চান? (ক্যাটালগের কাছে আসিয়া লিষ্টে নির্দ্দেশান্তে) এই দেখুন লিষ্ট—একের নম্বরে শ্রীমতী তারিণী দেবী। রাঁধতে জানেন, বাড়তে জানেন, চুল বাঁধতে জানেন, টেম্পারেচার দেখতে জানেন, বালিশের ওয়াড় সেলাই করতে জানেন, জামার বোতাম টাঁকতে জানেন···

অবিনাশ। ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্—ব্যস্·· এইটি ঠিক fit করবে আমায়। মানে, ঠিক এমনিটি আমি খুঁজছি। এই দেখুন, কোটের বোতাম ছেঁড়া···

জয়রাম। বেশ, তা হলে আসুন,—চেহারা দেখবেন।

অবিনাশ। চেহারা দেখে কি করবো? চেহারার জন্যে আমি বিয়ে করছি না, মশায়, আমি বিয়ে করছি,··· অর্থাৎ, বুঝছেন না? মানে, এমন স্ত্রী চাইছি, যিনি ঠিক বেলা নটায় ভাত খাইয়ে রোজ আমায় আপিসে চালান করতে পারবেন। চাকরিটি যেতে বসেছে—রোজ লেট··· সে জন্যে মাসে পনেরো ষোল টাকা করে' জরিমানা দিচ্ছি। এবারে লেট হলে চাকরি থেকে বরখাস্ত হতে হবে—বলে' দেছে। এই আমার অবস্থা। সব কথা আপনাকে খুলে বললুম। এখন এই অবস্থা বুঝে আপনি ব্যবস্থা করে' দিন।

জয়রাম। বুঝে নিছি। এই শ্রীমতী তারিণী দেবীই তা হলে ঠিক হবে। সংসার সম্বন্ধে এঁর কিছু experience আছে।

অবিনাশ। শ্রীমতী তারিণী দেবী এখানে আছেন? মানে, আমি বিয়ে করে' বাড়ী ফিরতে চাই-আজ··· এখনি।

জয়রাম। এখনি!···পাঁজি? লগ্ন?

অবিনাশ। না মশায়। ঐ পাঁজির জন্যে আজ পর্য্যন্ত বিয়ে করা হলো না আমার। অর্থাৎ চাকরিতে ঢোকবার পরেই বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকা হলো—তা ছুটিছাটার দিনে একটিও লগ্ন মিললো না—যে দিন লগ্ন মিললো— সাহেব সেদিন ছুটি দিলে না—কাজেই বিয়ের ফুরসৎ আমার জীবনে ঘটলো না।···যে-চাকরির জন্যে এই ভীষ্মদেব হয়ে আছি, সে চাকরিটি এখন যায়-যায়—তাই মশায়, নাম শুনে আপনাদের এই সঙ্ঘের দ্বারস্থ হয়েছি আজ ভর্ সন্ধ্যাবেলায়।

জয়রাম। বিয়েটা তা হলে civil marriage-মতে হবে

অবিনাশ। Civil, criminal বুঝি না মশায়—বুঝি শুধু marriage এবং সে marriage হওয়া চাই আজ এবং এখনি। কাল সকাল হবার আগে বিয়ের হাঙ্গাম চুকিয়ে ফেলতে হবে'''সকালে আপিস আছে।

(নেপথ্যে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি)

জয়রাম। তা হলে বেশ, চলে আসুন ভিতরে। আপিস-কামরায় আরো দুটি শুভ-বিবাহ সুসম্পন্ন হচ্ছে—শুনছেন না ঐ শাঁখের আওয়াজ আর উলু ?···চলে আসুন চটপট—আপনারটাও ঐ সঙ্গে দি সেরে। নাম্বার থ্রী !

(উভয়ের সত্ত্ব-গৃহমধ্যে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অবিনাশের গৃহ

অবিনাশ ও তারিণী দেবী

[তারিণী দেবীকে অবিনাশ সাদরে আবাহন করিয়া আনিল]

অবিনাশ।

ওঁ আয়াহি তারিণী দেবী, অবিনাশ-ভীতি-হারিণী—

করো তার জরিমানা-মুক্তিং চাকরিং রক্ষা দয়াময়ী !

দোরে তালা লাগিয়ে ও বেলায় আপিসে বেরিয়েছি—সে তালার চাবি তোমার হাতে তুলে দিছি। ছিল আমার দুজন—একটি বামুন, একটি চাকর—তাদের হাতে দিছি যা পেয়েছি। নগদ টাকা মাইনে দিয়ে, সেই টাকার পরিবর্ত্তে যা পেয়েছি—সে কাহিনী যদি বলি,তুমি বোধ হয় অহল্যার মতো পাষাণ বনে' যাবে।···সে দুটিকে ভাগিয়েছি। সংক্ষেপে শুধু জানিয়ে রাখি,—আমি অতি হতভাগা। চাকরিকে ধ্যান-জ্ঞান করে' বিয়ের ফুরশৎ পাই নি। আজ আমার সে চাকরি যেতে বসেছে—শুধু একটি স্ত্রীর অভাবে। আপিসে রোজ লেট—লেটের জন্য জরিমানা দিচ্ছি মাসে ষোল টাকা হিসেবে—তাতেও ওঁরা সন্তুষ্ট নন্—নোটিশ দেছেন—এবারে লেট হলে চাকরিটি গঙ্গায় পাঠাবেন। তাই দেবি, তারিণী দেবি, অবিনাশের এ বিপদে বিপদভঞ্জিনী গৃহিণীরূপে তার চার্জ্জ তুমি গ্রহণ করো। তুমি আমার Court of Wards— আজ থেকে আমি তোমার ওয়ার্ড। তোমার কাছে জীবন যৌবন আমি চাই না,—শুধু, চাই তুমি আমার চাকরিটি রক্ষা করো।··· পারবে আমার চাকরি রক্ষা করতে ?

তারিণী। ফলেন পরিচীয়তে। আগে থেকে কিছু বলে অহঙ্কার প্রকাশ করতে চাই না।

অবিনাশ। আঃ—তা হলে এবারে চাও এই ঘরের পানে—ঐ আমার সজ্জা ঐ শয্যা···

গান

ঐটি দেখছো শয্যা···(শয্যার প্রতি নির্দ্দেশ)

তারিণী। ছি, ছি, এ কি সজ্জা ! মরি লজ্জায় !

(সঙ্গে সঙ্গে শয্যা গুছানো) চিরকুট কালি-মাখা !

(ময়লা চাদর টানিয়া ওয়াড়হীন বালিশের পানে চাহিয়া)

অবিনাশ। যত অযত্ন আনি, সব উড়ে যায়—যেন গো গজায় পাখা !

তারিণী। (উচ্ছিষ্ট চায়ের পেয়ালার পানে নির্দ্দেশান্তে)

চায়ের পেয়ালা পড়ে আছে, মাগো, গায়ে সেঁটে আছে মাছি !

অবিনাশ। চাকর বাকরে ধোয় না মাজে না, নিজেই দুবেলা মাজি।

তারিণী। (চতুর্দ্দিকে চাহিয়া) বুঝেছি ব্যাপার !

অবিনাশ। ক্ষ্যাপার মতন...চাই তোমার আঁচল-ঢাকা !

[ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল]

তারিণী। দশটা রাত্তির ! উঃ, না, না—শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো ! না হলে অসুখ করবে। সারা দিন রপ্টানি গেছে,—আপিসে খাটুনি, বিয়ের হাঙ্গাম···(র‍্যাপার ও কোট টানিয়া লইয়া যথাস্থানে রক্ষা) জিরেন চাই, জিরেন। শোও, শোও—আমি লেপ চাপা দি। (অবিনাশকে ধরিয়া শয্যায় শোওয়াইয়া দিল—তার অঙ্গে র‍্যাগ চাপা দিল)।

অবিনাশ। (মাথা তুলিয়া) তুমি···?

তারিণী। (র‍্যাপার পাট করিতে করিতে) আমি হলুম বাড়ীর গিন্নী—সব দেখবো শুনবো—খিতুবো, গুছোব —তার পর। আমার কি এখনি শুলে চলে ? শোও, শোও, শোও—চোখ বোঁজো—

অবিনাশ। আঃ ! হুকুম এমন মিষ্টি-মধুর—আজ তা প্রথম বুঝলুম।

তারিণী। না, না, আর কথা কয়ো না ! চোখ বোজো, বুজে ঘুমোও। না হলে শরীর থাকবে কেন ? চল্লিশ বছর বয়স হলে ভারী সাবধানে শরীর রাখতে হয়। —Regular diet, regular rest, regular sleep.

অবিনাশ। (শুইয়া সুরে) জীবনে এলো আজ প্রথম বসন্ত !

তারিণী। আবার! চুপ!

[অবিনাশ চুপ করিল—চক্ষু মুদিল। তারিণী ধোপার বাড়ীর কাচা কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিল আলমারির মধ্যে; দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিল; অবিনাশের নাসাধ্বনি। তারিণী মশারি ফেলিয়া দিল, তারপর ল্যাম্প নিবাইয়া দিল।

[ক্ষণকাল স্তব্ধতা—তারপর বাহিরে মোরগের ডাক। দিনের আলো ফুটিল। রৌদ্র ঘরে প্রবেশ করিল। তারিণী মশারি তুলিয়া দিল বাহিরে গেল; ঘড়িতে সাতটা বাজিল, তারিণী ঘরে প্রবেশ করিল, হাতে চায়ের পেয়ালা]

গান

তারিণী। সকাল সাতটা বেজে গেছে ওঠো জাগো, প্রিয় জাগো!
চায়ের পেয়ালা ready., খেয়ে নিয়ে দিনের কর্ম্মে লাগো!
প্রিয় জাগো।

অবিনাশ। (উঠিয়া চা শিপ্ করিতে করিতে) আঃ আঃ আঃ! চায়ে কি সু-তার,
জীবনে এমন খাইনিকো আর।

তারিণী। চট্‌পট্ খেয়ে ছোটো তো বাজার…

অবিনাশ। ঠিক ঠিক ঠিক! হাঁ গো! হাঁ, হাঁ গো।

তারিণী। নটায় অন্ন!

অবিনাশ। আমি বিপন্ন!

তারিণী। লেট্ হবে তা না হলে।

অবিনাশ। এবারের লেটে চাকরিটি যাবে, বড়বাবু দেছে বলে'…

তারিণী। ভয় নেই।

অবিনাশ। জানি, মাভৈঃ তারিণী, বিপদ-বারিণী!

তারিণী। এত বকো তুমি, মাগো! মা, মা, মাগো!

পঞ্চম দৃশ্য

অবিনাশের গৃহ-সম্মুখ

গান

দিনের শেষে আবার সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা হলো!
আপিস হলো বন্ধ, সবাই ঘরে ফিরে চলো—
(বাবুরা ঘরে ফিরে চলো)

[রঙ্গমঞ্চে অফিস-প্রত্যাগত বাবুর দল—কেরাণী, উকিল, মোক্তার, কারিগরের দল চলিয়াছে গৃহাভিমুখে]

উকিল মোক্তার হাকিম চলে, চলে কেরাণী রে—
কারো আঁখি খুশী-ভরা, কারো ভরা নীরে—
পেলো কেউ বা টকা, কেউ বা ফক্কা—উপায় কি তার বলো!

[অফিস-প্রত্যাগতদের প্রস্থানান্তে অবিনাশের প্রবেশ: তার হাতে কয়েকটা বাণ্ডিল ও কাগজের ভর্ত্তি-বাস্কি]

[গৃহমধ্য হইতে বিচিত্র শব্দ—দরজা-জানালা-ভাঙ্গা দুদ্দাড়, কাঁচের পেয়ালা পিরীচ ভাঙ্গার শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে বালকদের চীৎকার,—"তোকে খুন করবো খুন করবো। "ও মাগো, আমার মেরে ফেললে গো!" তারিণীর কণ্ঠ, ওরে ও দস্যি, ও বাঁদর, খুনোখুনি করে হাতে কি দড়ি পড়াবি, শেষে"]

সে শব্দ প্রভৃতি শুনিয়া অবিনাশ ক্ষণকাল হতভম্বের মতো দাঁড়াইল, পরে]

অবিনাশ। বাড়ী ভুল হলো না কি? এ রকম হাঁক-ডাক, তর্জ্জন-গর্জ্জন আমার বাড়ীতে তো হতে পারে না! গৃহিণী দশভুজা হয়ে physical exercise করছেন? (চারিদিকে উদ্বিগ্ন ভাবে অবলোকন) বাড়ী ভুল হবে কি! পঁয়তাল্লিশ বছর একাদিক্রমে বাস করছি…অসম্ভব। ঐ তো বাড়ীর নম্বর… সেভেন্টিন্…

[ভিতরে সমানে দুদ্দাড়-শব্দ চলিয়াছে। তারিণীর চীৎকার—"আর, পিঠের ছাল কারো রাখবো না! হাভাতেগুলো মরবার আর জায়গা পায়নি" "বালককণ্ঠে—"ওম দ্যাখো, দ্যাখো, আমার লুচি কেড়ে নিয়ে খেলে, মেজদা।" আবার বালক কণ্ঠে—"আমার মাংসর বাটীতে কেন ও লুচি ডুবুলো ওর।" তারিণী-কণ্ঠে—"ফোট্‌কে"।]

অবিনাশ। (কাণ পাতিয়া শুনিয়া) ও! রেডিয়ো-ড্রামা হচ্ছে! বুঝেছি। (দ্বারে কড়া নাড়িয়া) দেবি, তারিণী দেবি, দোর খোলো। অনেক জিনিষ-পত্তর হাতে…হাত ভেরে গেছে।

নেপথ্যে তারিণী। ওরে তোরা থাম রে—ব্যাগ্রতা করি। মানুষ তেতে পুড়ে আসছে আপিস থেকে—তাকে একটু ঠাণ্ডা হতে দে।

[সঙ্গে সঙ্গে তারিণী ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া দিল; অবিনাশ ভিতরে প্রবেশ করিল]

পট-পরিবর্ত্তন

ক্রোড় দৃশ্য

অবিনাশের বাড়ীর দালান

[পঞ্চপাণ্ডব। সামনে পাত্র-ভরা ভোজ্য। একটি বালক আর একটিকে উপুড় করিয়া ফেলিয়াছে—ফেলিয়া তার পিঠে বসিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া ঝাঁকনি দিতেছে—আর দুজন বালক মিলিয়া পাঁচের নম্বর ছেলেকে দেওয়ালে চাপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রাণপণে চেঁচাইতেছে—"পাজী, শুয়োর, ড্যাম, ইষ্টুপিট—তোদের আমি কামড়াবো, আমি কামড়াবো।" অবিনাশের প্রবেশ মাত্র সকলের কণ্ঠ নীরব যেন tableaux-অভিনয়]

অবিনাশ। (প্রবেশান্তে ব্যাপার দেখিয়া শিহরিয়া; দুই চোখ বিস্ময়ে আকুল—তার ভাব হতভম্ব)

তারিণী। অবাক হয়ে কি দেখছো?

অবিনাশ। (সবিস্ময়ে) তারো হচ্ছে?

তারিণী। তারো! তার মানে?

অবিনাশ। এরা?

তারিণী। (সাহ্লাদে) আমার ছেলেমেয়ে।

অবিনাশ। তোমার ছেলেমেয়ে! তার মানে? একটি বেলা আপিসে গেছি…

তারিণী। হ্যাঁ। তুমি আপিসে যাবার পরেই তো…

অবিনাশ। (বাধা দিয়া) বলো কি! এতগুলি! তোমার ছেলেমেয়ে? তার মানে, তোমার পেটে জন্মেছে?

তারিণী। আমার পেটেই জন্মেছে বৈ কি।

অবিনাশ। (হতভম্ব ভাব বাড়িল—বাণ্ডিলপত্র হস্তচ্যুত হইয়া মেঝেয় পড়িল)

তারিণী। আমার আর-পক্ষের গো। তোমাদের যেমন নানা পক্ষ হয়, এ কালে আমাদেরও তেমনি। Equality, Fraternity, Liberty. এতে অবাক হবার কি আছে?

অবিনাশ। না, সে জন্ম অবাক হইনি। তবে, মানে …দেখিনি, জানি না।

তারিণী। এবারে ছাখো, জানো। জানবে বৈ কি। মানে, এরা ছিল অনাথ আশ্রমে। মানুষ করবার সামর্থ্য ছিল না বলেই তো। এখন যখন আমার ঘর-সংসার হলো, নিজে থিতু হলুম, তখন বাছাদের কি আর কোল-ছাড়া করে রাখতে পারি! তুমিই বলো…

অবিনাশ। তা তো বটেই! তবে এ…এ-কথা,…মানে, তোমার এতগুলি ছেলেমেয়ে আছে আর-পক্ষের—এ কথা আগে আমায় বলো নি কি না!

তারিণী। বলবার সময় তুমি দিলে কি যে বলবো! ছিলুম ঐ বিবাহ-সঙ্ঘে। তুমি গিয়ে বললে পাঁজি নয়, পুঁথি নয়, কোন কথা নয়—এখনি বিয়ে করতে চাই। বিয়ে করবো! তার মধ্যে মানুষ এত কথা বলে কি করে, বলো!

অবিনাশ। ওঃ! (সবেগ নিশ্বাস)

তারিণী। তা এর জন্যে এত আকাশ-পাতাল ভাবছো কি! এ তো ভালো কথা! এ বয়সে একেবারে এক-বাড়ী ছেলেমেয়ে পেয়ে গেছ আমার দৌলতে! একটি নয়, দুটি নয়, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে একেবারে পাঁচ-পাঁচটি—যার নাম পঞ্চ-পাণ্ডব! ভাগ্যি বলে' মানো!

অবিনাশ। (সহসা চাঙ্গা হইয়া) বটেই তো! বটেই তো! নিশ্চয়!

ষষ্ঠ দৃশ্য

অফিস-কামরা

অবিনাশ, ভুবন, ভূষণ, মণীন্দ্র

অবিনাশ। একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচ-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে!

কৈলাস। বলো কি হে। শুনে যে আঁতকে উঠছি!

অবিনাশ। চোখে দেখলে হার্টফেল হয়ে যেতো। গিয়ে দেখি, বাড়ীর যা হাল…after the earthquake মানে, সেবারের সেই ভূমিকম্পের পর ঐ ছাপরা, মুঙ্গের—এ সব জায়গার ছবি দেখেছিলেন তো কাগজে,—বাড়ীর হাল তার চেয়েও pathetic! চায়ের পেয়ালা, ডিশ, সার্শির কাঁচ ভেঙ্গে চচনচ করেছে—ঘর আর দালানের মেঝেগুলো ভাঙ্গা কাঁচের দৌলতে ভীষ্মের শরশয্যা হয়ে আছে!

ভুবন। সত্যি?

অবিনাশ। ভাঁড়ার ঘর যেন ভাগাড়—ভাঙ্গা হাঁড়ি, ভাঙ্গা সরা, ভাঙ্গা জালা—চাল ডাল ঘী তেল সব একে-বারে থৈ থৈ করছে! দরজা ভেঙ্গেছে। কাঠগুলোর এমন দশা করেছে যে, উনুনে দেওয়া ছাড়া তাতে আর অন্য কোন কাজ চলে না। ছেলেগুলো খাচ্ছে আর খাচ্ছে—দেখতে সব ইয়া ছেল্-ডিগডিগে—যেন কেঁচো, না, কেন্নুই! কিন্তু মুখের হাঁ? আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেছেন কখনো?

সকলে। হাঁ হাঁ হাঁ।

অবিনাশ। তা হলে হিপপটেমাশ দেখেছেন নিশ্চয়! সেই হিপপটেমাশের হাঁ! হরদম্ ক'টাতে গিলে খাচ্ছে আর খাচ্ছে! ভাত ডাল লুচি মাংস মাছ সন্দেশ জিলিপি গজা কচুরি শিঙাড়া! ক্ষুদ্র একটি চাকরি—অতগুলি জঠর ঠেলে সে চাকরি রক্ষা করা অসম্ভব!

কৈলাস। তাইতো! এ যে সুখে থাকতে ভূতের কিল খাওয়া!

অবিনাশ। বেলা পড়ে আসছে, বাড়ী ফিরতে হবে মনে করছি, আর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ছাখো না! তাও কি ছাই এক মিনিট চুপ করে থাকবে? বাড়ীতে অষ্টপ্রহর German War চলেছে—গোলা ফাটছে, বোমা ফুটছে, shell পড়ছে, জেপলিন্, হাউইটজার, সাব-মেরিন, ম্যান অব ওয়ার!—সত্যি বলছি দাদা, একটি বেলায় ব্যাপার দেখে থ হয়ে আছি। মনে হচ্ছে, এক বেলা আমার সহ্য হচ্ছে না, আর ঐ German War ওরা অতকাল ধরে চালিয়ে ছিল কি করে', বাহাদুর বলতে হয়—পাগল হয়ে আত্মহত্যা করেনি!

ভুবন। কি জানো, অবিনাশ – চিরকালের অনভ্যাস! হঠাৎ এত বড় সংসার হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়েছে—তা যাবে, ক্রমেই সয়ে যাবে'খন।

অবিনাশ। কোন কালে সইবে না। নিজের ছেলে মেয়ে হলেও না হয় মানুষ…

মণীন্দ্র। স্ত্রী যখন অর্দ্ধাঙ্গিণী, তখন এগুলিকেও তাঁর সঙ্গে আধা-আধি বখরা করে নিতে হবে বৈ কি।

অবিনাশ। সত্যি—তোমরা বিহিত করে দাও। না হলে কি যে আমি করবো, আর কি করবো না, বুঝতে পারছি না।

কৈলাস। লোটা-কম্বল নেবে না কি অবিনাশ?

ভূষণ। না, না, লোটা-কম্বল কেন? আছে, উপায় আছে।

অবিনাশ। কি উপায়, বলো ভূষণ দা।

ভূষণ। বিষে বিষক্ষয় করতে হবে! Auto-vaccine-এর মতো।

অবিনাশ। তার মানে?

ভূষণ। মানে, সময়ের জিনিষ সময়েই ভালো, অসময়ে তেতো লাগে! এই ছাখো না, শীতের দিনে কপির যেমন স্বাদ পাবে, গ্রীষ্মকালের কপিতে কি তেমন স্বাদ পাবে?

মণীন্দ্র। ঠিক বলেছো ভূষণ দা। ঐ ইলিশ মাছ! শীতকালে খাও, মনে হবে, যেন জুতো খাচ্ছি।

অবিনাশ। সে জুতোও হজম হয় ভাই কিন্তু যে জুতো আমার বরাতে জুটেছে, ওঃ! বিয়ে করতে না না করতে বলো কি, বুকের উপরে দুর্য্যোধন-মার্কা পাঁচ-পাঁচটা ছেলে কুরুক্ষেত্র জুড়ে দেছে। এমন দুর্দ্দশা পৃথিবীতে আর কারো ঘটেছে কখনো?

ভুবন। সত্যি কথা।

অবিনাশ। তোমার ঐ উপায়ের কথা বলো ভূষণ দা…ঐ যে বললে, বিষে বিষক্ষয়!…তা ও বিষ কোথায় পাবো?

ভূষণ। পথ থেকে সে বিষ দেবো'খন জোগাড় করে। আপিসের পরে আমার সঙ্গে বেরিয়ো…রোগ যেমন বুনো ওল, দাওয়াই চাই তেমনি বাঘা তেঁতুল! তবে কিছু খরচ করতে হবে। মানে, পাঁচ-সাতখানা রিক্‌শ-গাড়ীর ভাড়া আর নগদ কিছু পূজো!…নাও, মন-মরা হয়ে থেকো না… চাঙ্গা হও। লেজারখানা এগিয়ে দাও দিকিনি বড় বাবু ব্যাটা কখন এসে পড়বে… বলবে, ক'জনে খুব গল্প জমিয়েছ যে…

কৈলাস। আসল কথা কি জানো, যে-বয়সের যা… বেশী বয়স অবধি বিয়ে না করা যেমন কুকর্ম্ম, বেশী বয়সে বিয়ে করাও তেমনি সমান কুকর্ম্ম! কখ্খনো তুমি বিয়ে করো নি · দুম্ করে এ বয়সে বিয়ে করে বসলে, সে বিয়ে ধাতে সওয়াতে একটু বেগ পেতে হবেই তো ভাই!

ভুবন। বড়বাবু ব্যাটা আসছে…

[সকলে নিঃশব্দে খাতাপত্র লইয়া তাহাতে মনোযোগ অর্পণ করিল; বড়বাবু ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল]

সপ্তম দৃশ্য

অবিনাশের ঘর

তারিণী ও পঞ্চপাণ্ডব

[খাবারের চ্যাঙড়া খাবারে পূর্ণ। তারিণী তার সামনে বসিয়াছে… পঞ্চপুত্র তাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। সকলে ভোজনে লিপ্ত। তারিণী কনিষ্ঠটির মুখে খাদ্য ঠাঁসিয়া দিতেছে]

তারিণী। খেয়ে নে, পেট ঠেশে খেয়ে নে…

পুত্র। (মুখের মধ্যে খাদ্য ঠাশা; অস্ফুট কণ্ঠে) আঁর পাঁরচি নাঁ গোঁ!

তারিণী। হতভাগা ছেলে! খেতে পারিস না কি রে! না খেয়ে খেয়ে খেতেই ভুলে গেছিস!…না পারিস, তবু খেতে হবে। ভগবান যদি মুখ তুলে চেয়েছেন, মুখের সদ্গতি কর্! যে আমার বরাত—কুষ্ঠিতে আছে

পতি স্থানে শনি! তাই বলছি, কবে আবার অনাথ আশ্রমে ফিরে যেতে হয়...আমার হাতে এবারকারের এ নোয়া বজায় থাকতে থাকতে পেট ঠেশে মুখ ঠেশে খেয়ে দেহগুলোকে আমার এই নোয়ার বাঁধনে বেঁধে মজবুৎ করে নে!

[নেপথ্যে পাঁচ সাতখানি রিকশর মিশ্র অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি, সেই সঙ্গে অবিনাশের কণ্ঠস্বর Quick march, Right about turn·· Halt ·· Quick March—অবিনাশের স্বর থামিলে বারোজন বালকের সমস্বরে রব "বাব্বা-বাব্বা বাব্বা-বাব্বা, বাব্বা-বাব্বা" এবং শিশু-কণ্ঠে কান্নার শব্দ "ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া!"

তারিণী। (সচকিতভাবে) ও কিসের শব্দ রে?

তারিণী। (তার চেতনা ফিরিল; ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল); তারপর ব্যাপার কি? হ্যাঁ গা, রাজ্যের যত হাভাতে ভিখিরী ছেলে ধরে ধরে এনে পুরলে·· এর মানে?

অবিনাশ। ভিখিরী নয়। আমার ছেলে···বারোটি ডাগর হয়েছে···আর এই সব ছোটটি এর বয়স ন'মাস (শিশুর "ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া" কান্না) না, না, না, ছোনামণি, কেঁদো না, কেঁদো না···(ঝুমঝুমি বাজাইল) এইটিকে আঁতুড়ে রেখে এদের মা মারা গেছে···(নিশ্বাস ফেলিল) আমার আর পক্ষের স্ত্রী।

বাব্বা, বাব্বা, বাব্বা বাব্বা, ওঁয়া, ওঁয়া ওঁয়া।
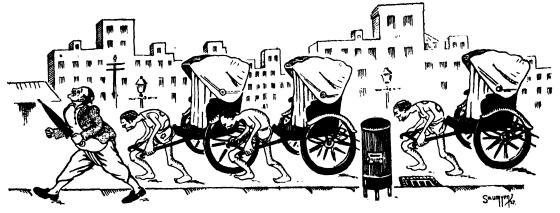
১ পুত্র। গোরারা পথে মার্চ্চ করে যাচ্ছে বোধ হয়।

তারিণী। (উৎকর্ণ) না। এ যে আমাদের বাড়ীর মধ্যে। সিঁড়িতে উঠছে যেন কারা···

[দোতলার সিঁড়িতে বহু চরণের মার্চ্চের ভঙ্গীতে ওঠার শব্দ "বাব্বা বাব্বা" প্রভৃতি চীৎকার অবিরাম; ক্রমে স্পষ্টতর এবং নিকটতর হইতেছে]

২ পুত্র। (উঠিয়া দেখিতে গেল। সহসা ফিরিয়া ভীত কণ্ঠে) মাগো, ওপরে আসছে গো!

[সঙ্গে সঙ্গে পাঁচটি ছেলে তারিণীকে ঘিরিয়া তাকে জাপটাইয়া ধরিয়া "আঁ আঁ" আর্ত্ত চীৎকার তুলিল, তারিণীও আর্ত্ত চীৎকার তুলিল। অবিনাশ ও তার সঙ্গে বারোজন ছিন্নবেশ কদর্য্যমূর্ত্তি পথের ভিখারী-বালক আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল। ছেলেরা সমানে হাঁকিতেছে 'বাব্বা বাব্বা বাব্বা বাব্বা বাব্বা" এবং শিশুর অবিরাম ক্রন্দন "ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া!" শিশুটি অবিনাশের কোলে]

অবিনাশ। Halt! [সকলে দাঁড়াইল। এবং শব্দ থামিল]

তারিণী। আর পক্ষ! স্ত্রী!

অবিনাশ। হ্যাঁ। তারি পেটে জন্মেছে। এক পক্ষেই এই তেরোটি! ছিল এদের দিদিমার কাছে। কে এখানে দেখে—তাই! তা, আবার যখন সংসারী হলুম·· ওদের জন্যে নতুন মা নিয়ে এলুম, তখন আর পরের বাড়ী ফেলে রাখি কেন? নিয়ে এলুম। তোমার পাঁচটি ছেলের সঙ্গে মিশে দল পুরু করে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হয়ে তোমার কোল-জোড়া করে বাস করবে এখানে।

তারিণী। মস্করা!

অবিনাশ। মস্করা! বারোটি ছেলে নিয়ে কেউ মস্করা করে না, প্রিয়তমে···এরা আমার আর-পক্ষের পেটের ছেলে··

তারিণী। হুঁ! বিয়ে হতে না হতে এমন শাঠ্য!

এত বড় কাপট্য !...ওগো বাবা গো, মা গো, আমি কোথায় যাবো গো। (কান্না)

[তারিণীর পাঁচ ছেলে মায়ের কান্নায় সমস্বরে যোগ দিল। দ্বাদশ গোপাল গিয়া খাবারের চ্যাঙড়া আক্রমণ করিল]

তারিণী। চ, তোরা চ—মেয়ে মানুষ···বয়স হয়েছে··· তা হোক, লেডি-ক্যানভাসারি করে তোদের যেমন করে পারি, খাওয়াবো—তবু এখানে আর এক মিনিট থাকবো না! ওগো বাবা গো, মা গো—এক দিনে এমন শাঠ্য, এমন কাপট্য! এর পরে এ নাট্য যে ফেটে একেবারে ছত্রকট্ট হয়ে যাবে! চ, চ তোরা (ঝাঁকানি দিয়া) দেখি, ও কেমন করে' ওর চাকরি বজায় রাখে!

অবিনাশ। ওরে বাবা, তাই তো! না, না, না—(কোলের শিশুকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া করযোড়ে) ক্ষমা···ক্ষমা করো তারিণী দেবী! এই আমি নাকে খৎ দিচ্ছি, কাণ মলছি—মেরে কেটে আর দুটো বছর—যা থাকে বরাতে, তার পরে আমি পেন্সন নেবো। তখন না হয় চলে যেয়ো। রাগ করে' এখন চলে' যেয়ো না গো! এ সংসার···এ তোমাদের—এর একটি কোণে হাত-পা গুটিয়ে আমি পড়ে থাকবো'খন। কিছু চাই না তারিণী দেবী—তোমার জীবন-যৌবন কিছু আমাকে দিতে হবে না—শুধু ন'টা বেলায় পাতে দুটি ভাত ফেলে দিয়ো—আমার চাকরিটি কোনমতে রক্ষা পাক! যে দিন-কাল পড়েছে···বাবা রে! রাজ্য গেলে রাজ্য মেলে, স্ত্রী গেলে স্ত্রী মেলে—সব গেলে সব ফিরে পাওয়া যায় কিন্তু চাকরি একবার গেলে আর তাকে ফিরে পাওয়া যায় না! যে চাকরির জন্যে বড়বাবুর লাথি-জুতো খাচ্ছি, সে চাকরি বজায় রাখতে তোমাদের এ গুঁতো—এ রসগোল্লা! খাবো, খাবো, আমি খাবো তিন সত্যি করছি।

তারিণী। বেশ। কিন্তু তোমার এই দ্বাদশ-গোপাল আর তার সঙ্গে ঐ ফাউটুকু,—এই একের পিঠে তিন··· তেরটি ছেলে ?

অবিনাশ। মিথ্যা কথা বলবো না—এরা আমার কেউ নয়। আমার কোনো কালে কোনো পক্ষ হয় নি। তুমিই আমার প্রথম আর শেষ পক্ষ—সত্যি! এগুলোকে পথ থেকে ঝেঁটিয়ে রিক্‌শ গাড়ীতে তুলে এখানে এনেছি। এখনি ওদের স্বস্থানে পাঠাচ্ছি। এই, এই, তোরা যা যেখানে ছিলি, সেইখানে যা! এই নে, চার-চার আনা মজুরি···তিন টাকা চার আনা নগদ।

১ গোপাল। তা কিনো লিবো মুশয়! তুমি বলিয়েছ এক-পেট করে খিলাইবে! একটি করে' রূপেয়া লিবে, তবে সব যাবে মুশয়!

অবশিষ্ট গোপালগণ। (মাথা নাড়িয়া) একটি করে' রূপিয়া—হঁা!

অবিনাশ। লে বাবা, তাই লে—এক টাকা করেই লে—লিয়ে সরে পড়! আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্ নে! এই নে, তেরো জন—তেরো টাকা। নে, বাচ্ছাটাকে তুলে নে,—নিয়ে সব যা—যা, যা, যা···

[দ্বাদশ-গোপালের শিশুসহ প্রস্থান..."বান্দা বান্দা, বান্দা বান্দা, বান্দা বান্দা" রবে মার্চ্চের ভঙ্গীতে নিষ্ক্রান্ত]

জানি, যখন বিয়ে করেচি, খরচে তখন বন্যা বয়ে যাবে। এই তো সবে সুরু। ওঃ—এর চেয়ে মাসে মাসে ষোল টাকা জরিমানা—ঢের ভালো ছিল!

তারিণী। কিন্তু জরিমানার পালা তো চুকে গেছে। এবারে এক দিন লেট হলে চাকরি যে আর থাকবে না!

অবিনাশ। ও—ঠিক, ঠিক, ঠিক, ঠিক! ভারী হুঁশ করিয়ে দেছ, প্রিয়তমে।

তারিণী। (বিজয়-দৃপ্তের ভঙ্গীতে) হুঁ!

অবিনাশ। তা হলে এবারে - তা—তা—তা—তারিণী দেবী, সন্ধি তো ?

তারিণী। বেশ। কিন্তু সর্ত্ত আছে।

অবিনাশ। বলো—

গান

তারিণী। আমার ইচ্ছেয় কার্য্য হবে, কর্ত্তা তুমি নামে।
আমি করবো খরচ-পত্র, তুমি জোগাও দামে।
অবিনাশ। তাই তাই তাই তাই তাই, ওগো, তাই তাই তাই তাই তাই।
তারিণী। রোজগার-পাতি বেবাক সে-সব দেবে আমার হাতে।
তুমি শুধু বেলা ন'টায় ভাতটি পাবে পাতে।
অবিনাশ। তাই তাই তাই তাই তাই, ওগো, তাই তাই তাই তাই তাই।
তারিণী। আমার কাজে চাইবেনাকো কোনো কৈফিয়ৎই—
কলের পুতুল রবে তুমি, আমার ইচ্ছায় গতি!
অবিনাশ। তাই তাই তাই তাই তাই, ওগো, তাই তাই তাই তাই তাই।
তারিণী। অর্থাৎ তোমার চাকরি রক্ষা আমার কৃপায় হবে।
এইটি বুঝে তুমি আমার আজ্ঞাবহ রবে!
অবিনাশ। তাই তাই তাই তাই তাই ওগো, তাই তাই তাই তাই তাই।

(শেষ ছত্র গাহিবার সঙ্গে অবিনাশ তারিণীর চরণপ্রান্তে পড়িল)

যবনিকা

দুর্গোৎসব

—শ্রীহেমন্তকুমার ভট্টাচার্য্য

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ॥

(ঋগ্বেদ—রাত্রিসূক্ত—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যকান্তর্গত নারায়ণোপনিষৎ।)

শারদীয় দুর্গোৎসব আমাদের প্রধান উৎসব। ইহা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য—ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাকে কাম্যও বলা হইয়াছে, নিত্যও বলা হইয়াছে। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—যাহা না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাহা নিত্য। দুর্গোৎসব নিত্য, দুর্গোৎসব না করিলে প্রত্যবায় জন্মে। শারদীয়া দুর্গাপূজা সামর্থ্যানুসারে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, প্রতিমা নির্ম্মাণ সম্ভব না হইলে ঘটে, বাণলিঙ্গে বা শালগ্রাম শিলায় যথাশক্তি উপচারে দেবীর পূজা করিতে হইবে, অন্ততঃ গন্ধপুষ্পের দ্বারাও শারদীয়া দুর্গাপূজা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য, ইহা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে বর্ষীয়সী মহিলাদের মুখে মুখে শোনা যায়—"দুগ্‌গোচ্ছব কলির অশ্বমেধ"। এই প্রবাদবাক্যটি শাস্ত্রমূলক, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, দেবীপুরাণে এবং মহাভাগবতে দুর্গোৎসবকে অশ্বমেধস্বরূপ বলা হইয়াছে—

"নবম্যাং বোধনং কৃত্বা পক্ষং সংপূজ্য মানবঃ।
অশ্বমেধফলং লব্ধ্বা দশম্যাং চ বিসর্জ্জয়েৎ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতি-খণ্ড ৬৫-৭)

অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামপ্রদায়িকা॥
(দেবীপুরাণ, ২২।২৩)

অশ্বমেধাদিযজ্ঞানাং কোটীনামপি যৎ ফলম্।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃত্বার্চ্চাং বার্ষিকীমিমাম্॥
(মহাভাগবত, ৪৬।১২)।

এই অবশ্যকর্ত্তব্য দুর্গোৎসব সম্বন্ধে দু-একটি কথা এই প্রবন্ধে বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করা হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই সামান্য প্রবন্ধে বিশাল শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের দুর্গোৎসব-বিষয়ক সকল উক্তি সঙ্কলন করা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য গ্রন্থসমূহের বিশালতাই ইহার একমাত্র কারণ নহে,—লেখকের উপযুক্ত বিদ্যা ও যোগ্যতার অভাবও আছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে অনুসন্ধিৎসু নবীন বিদ্বৎসমাজে দুর্গা বৈদিক দেবতা কি না এই বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং কেহ কেহ 'দুর্গা বৈদিক দেবতা নহেন' এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন। ঋগ্বেদের অন্তর্গত রাত্রি-সূক্তে উল্লিখিত 'দুর্গা' শব্দের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইলে, কেহ কেহ না কি রাত্রিসূক্তকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু ঋগ্বেদ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-তৈত্তিরীয়, আরণ্যক, কেনোপনিষদ্ প্রভৃতি একাধিক বৈদিক গ্রন্থে দুর্গা, উমা, হৈমবতী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দর্শনে সর্ব্বত্রই প্রক্ষিপ্তবাদ সঙ্গত না হওয়ায় সে মতবাদ উপেক্ষিত হইয়াছে এবং প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, দুর্গা বৈদিক দেবতা।*

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ২৩শ অধ্যায়ে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুনকৃত যে দুর্গাস্তোত্রের উল্লেখ আছে, তাহাতে দুর্গা, ভদ্রকালী, কাত্যায়নী, উগ্রচণ্ডা, মহিষাসৃক্-প্রিয়া, উমা, শাকম্ভরী, স্কন্দমাতা প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে এবং সেই স্তোত্রের মধ্যেই "বেদশ্রুতি মহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি" বলিয়া দুর্গাকে সম্বোধন করা হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণ প্রাচীন ও প্রামাণিক পুরাণ। পুরাণের পঞ্চম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে দুর্গাকে ভদ্রকালী, অম্বিকা ও বেদগর্ভা বলা হইয়াছে এবং এই দুর্গার শুম্ভ-

---

* "স্তোষ্যামি প্রয়তো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্॥"
(ঋগ্‌বেদ, রাত্রিসূক্ত)

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানাম্,
উমাংহৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।"
(কেনোপনিষৎ)

নিশুম্ভাদি বধের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সুরথের দুর্গাপূজা প্রণালীকে বেদোক্ত প্রণালী বলা হইয়াছে এবং দুর্গার কৌথুমোক্ত ষোড়শ নামের বেদোক্ত অর্থ কথিত হইয়াছে।

মহাভাগবতে দেবীর সিংহারূঢ়া দশভুজা মূর্ত্তিকে বৈদিকী-মূর্ত্তি বলা হইয়াছে—

তত্র যা বৈদিকী মূর্ত্তির্দেব্যা দশভুজা পরা।
অতসীকুসুমাভাসা সিংহপৃষ্ঠনিষেদুষী॥

(মহাভাগবত ৪৩।১৮)

গৌড়প্রসিদ্ধ গোপাল চক্রবর্ত্তী দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম অধ্যায়ের ৪৪শ শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেবীর মুক্তিহেতুত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে একটি শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে দেবীর বেদোক্ত মন্ত্রের উল্লেখ আছে।*

ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে দুর্গার নামান্তর 'সতী' শব্দের উল্লেখ আছে। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় মহামায়ার ব্রহ্ম-স্বরূপত্ব প্রতিপাদন প্রসঙ্গে দেবীভাষ্যে সেই শ্রুতি বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি…"

(দেবীভাষ্য, ১ অঃ, ৪৭ শ্লোক)

দেবীর আবির্ভাব

অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি, ষোড়শভুজা ভদ্রকালীমূর্ত্তি এবং দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি, এই তিনমূর্ত্তিতে দেবী তিনবার আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কালিকাপুরাণে কথিত আছে—সত্যযুগে মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবগণ মহামায়ার স্তব করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবী ষোড়শভুজা ভদ্রকালী রূপে আবির্ভূতা হন এবং হিমালয়স্থিত কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে দেবগণের তেজ হইতে দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মহিষাসুরের সংহার করেন। এই দুর্গাই কাত্যায়নের কন্যাত্ব স্বীকার করিয়া কাত্যায়নী নামে আখ্যাত হন।

মহিষাসুর তিন কল্পে তিন বার জন্মগ্রহণ করে এবং তিন বারই দেবীর হস্তে নিহত হয়। প্রথম কল্পে দেবী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তিতে, দ্বিতীয় কল্পে ষোড়শভুজা ভদ্রকালী মূর্ত্তিতে এবং তৃতীয় কল্পে কাত্যায়নাশ্রমে আবির্ভূতা দশভুজা মূর্ত্তিতে মহিষাসুরকে বধ করেন। দেবী স্বয়ং মহিষাসুরকে বলিয়াছেন—

"আদিসৃষ্টাবুগ্রচণ্ডামূর্ত্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুরা।
দ্বিতীয়সৃষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ॥
দুর্গারূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহানুগম্॥"

(কালিকাপুরাণ, ৬০।১১৮)

ত্রেতাযুগে রাবণবধার্থে দেবগণ ব্রহ্মার পৌরোহিত্যে মহামায়ার পূজা করেন। তখনও দেবীর দশভুজা মূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়—

প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ।
নৃণাং ত্রেতাযুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া॥"

(কালিকাপুরাণ, ৬১।৩৯)

উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তির প্রথম আবির্ভাব হয় দক্ষযজ্ঞের সময়। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় প্রজাপতি দক্ষ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। তিনি সেই যজ্ঞে ঘৃণা করিয়া মহাদেবকে এবং দেবীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহাতে রুষ্ট হইয়া দেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমীতে দেহত্যাগপূর্ব্বক উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করত কোটি যোগিনীর সহিত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন।

(কালিকাপুরাণ ৬১ অঃ)

বিষ্ণুপুরাণে যশোদার গর্ভে যে দেবীর পরবর্ত্তী আবির্ভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে তাহার উল্লেখ আছে। দেবী স্বয়ং দেবগণকে বলিতেছেন—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অপর দুইটি অসুর জন্ম গ্রহণ করিবে; আমি স্বয়ং নন্দগোপ-গৃহে যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিব।" এই অবতারই দেবীর সর্ব্বপরবর্ত্তী অবতার। চণ্ডীর টীকায় নাগোজী ভট্ট দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধি এই শুম্ভ-নিশুম্ভের উৎপত্তি-কাল বলিয়া

* "শ্রুতৌ চ---'অথৈনং ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ কো হি মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রঃ দেবতানাঞ্চ দৈবতম্। কিমুপাস্য বিদ্যার্থশো ধনং পুত্র-পৌত্রকবিত্বঞ্চ নির্ব্বাণমোক্ষং লভতে বুধঃ।' ইত্যুপক্রম্য 'অথাহ ভগবান্ মন্ত্রাণাং পরমো মন্ত্রঃ" ইত্যুক্ত্বা দেব্যা মন্ত্রবিশেষ মভিধায় 'অস্যারাধনাৎ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বং ভবতি বিদ্যার্থশঃ কবিত্বঞ্চ ধনধান্যপুত্রাদি মোক্ষঞ্চেত্যুক্তত্বাৎ।"

(তত্ত্বপ্রকাশিকা)

শ্রীদুর্গা (মহাবলিপুর)
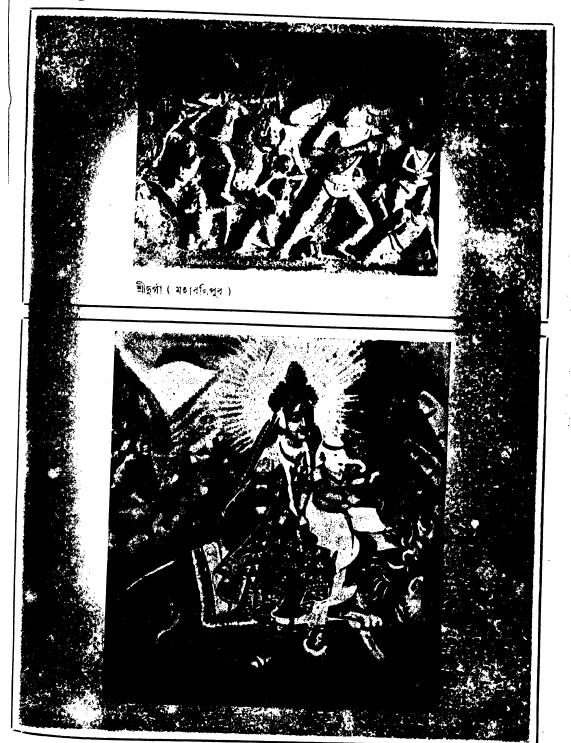
নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় তাঁহার দেবীভাষ্যে এই মূর্ত্তির কাল নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—সম্প্রতি বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগের শেষ পাদ কলিকাল চলিতেছে। দেবী যখন দেবগণের নিকট এই অবতারের ভবিষ্যত্তা কীর্ত্তন করেন, তখন ছিল দ্বিতীয় মন্বন্তর। কেহ কেহ বলেন, এই অবতার বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। কহ্লনের মতে এই অবতার হইয়াছিল চারি হাজার চারি শত বৎসর পূর্ব্বে, তর্করত্ন মহাশয় কিঞ্চিন্ন্যূন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই অবতার হইয়াছিল বলিয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। দেবীভাষ্য ১১শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

চণ্ডীতে যে রক্তদন্তিকা বা রক্তচামুণ্ডা রূপে দেবীর আর একবার আবির্ভাবের উল্লেখ আছে, নাগোজী ভট্টের মতে এই অবতার বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশযুগের তৃতীয় পাদ দ্বাপর যুগের পরে, অর্থাৎ কলির প্রারম্ভেই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই অবতার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের খব বেশী পরবর্ত্তী নহে। ইহা ছাড়া শতবার্ষিক অনাবৃষ্টিতে শতাক্ষীমূর্ত্তি এবং পরে দুইবার ভীমা ও ভ্রামরীমূর্ত্তিতে দেবীর আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। নাগোজী ভট্ট এই তিন অবতারের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যথাক্রমে বৈবস্বত মন্বন্তরের ৪০শ, ৫০শ ও ৬০তম যুগ। এ বিষয়ে তিনি লক্ষ্মীতন্ত্রের বচনও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং বর্ত্তমান কল্পে দেবীর এই তিন অবতারের এখনও বহু বিলম্ব আছে।

দুর্গোৎসবের ইতিহাস

দুর্গোৎসব কবে হইতে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত হইয়াছে, এই প্রশ্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত দুর্গাপূজাতত্ত্বের ভূমিকায় 'নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত আকারে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তন হইয়াছে' এইরূপ একটি নবীন মতবাদের উল্লেখ করিয়া তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিদ্যাপতির 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব', তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শূলপাণির 'দুর্গোৎসব বিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থে দুর্গাপূজার বিস্তারিত বিবরণ ও পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে। রঘুনন্দন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালা দেশে দুর্গাপূজা রীতিমত প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দনের সময়ে দুর্গাপূজায় দেশাচার বা লোকাচারের স্থান হইয়াছিল। নবপত্রিকাকে অপরাজিতা লতার দ্বারা বেষ্টন করিবার শাস্ত্র নাই, ইহা দেশাচার বলিয়া রঘুনন্দন উল্লেখ করিয়াছেন। কোন অনুষ্ঠানই দীর্ঘকাল প্রচলিত না হইলে সমাজে আচাররূপে গৃহীত হইতে পারে না। সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এই সমস্ত যুক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত নবীন মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দুর্গাপূজা সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই—

"ততঃ প্রভৃতি সা মূর্ত্তিঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র পূজ্যতে,।
মূলমূর্ত্তিঃ সুগুপ্তাঽভূৎ স্বমূর্ত্ত্যা খ্যাতিমাগতা॥"
(৫৯।৯)

দেবী হিমালয়ে কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে দশভুজা দুর্গামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া মহিষাসুরকে বধ করিলে দেবগণ সেই দশভুজামূর্ত্তির পূজা করেন। ইহা সত্যযুগের ঘটনা, সেই সময়ে দেবীর মূল মূর্ত্তি গুপ্ত হইয়া সেই দশভুজা মূর্ত্তিই প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং তদবধি সর্ব্বত্র সকলেই সেই মূর্ত্তির পূজা করিয়া আসিতেছেন।

এইস্থানে—

দেবানাং বরদানেন ব্রহ্মাদ্যৈ রূপযোজনাৎ।
যন্মূর্ত্তিঃ পূজ্যতে সর্ব্বৈস্তাং মূর্ত্তিং শৃণু ভৈরব॥

এই বলিয়া বাঙ্গালাদেশে যে-মন্ত্রে ধ্যান করিয়া যে মূর্ত্তির পূজা করা হয়, সেই 'জটাজূটসমাযুক্তাম্' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ ধ্যান-মন্ত্রদ্বারা সেই দশভুজা মূর্ত্তিরই বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাভাগবতে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার যে বর্ণনা আছে, বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত দুর্গাপূজা সর্ব্বাংশেই তদনুরূপ।

শারদীয়া পূজা

রাজা সুরথ প্রথমে দুর্গাপূজা করেন, পরে রামচন্দ্র ও অবশেষে দেবতা ও মনুষ্যগণ দুর্গাপূজা করেন। ত্রিপুরাসুরের

বধকালে মহাদেব একবার দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লেখও দেখা যায়।*

রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির পূজাবৃত্তান্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতেও ইহার উল্লেখ আছে। সুরথ, সমাধি, দেবগণ ও রামচন্দ্র যে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা শরৎকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি ষোড়শ-ভুজা ভদ্রকালীমূর্ত্তি এবং দশভুজা দুর্গামূর্ত্তির আবির্ভাবও শরৎকালেই হইয়াছিল। আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে মহিষাসুর নিহত হয়, নবমীতে দেবগণ দেবীর পূজা করেন ও দশমীতে বিসর্জ্জন করেন। দেবীপুরাণে যে ঘোরাসুরবধার্থে বিন্ধ্যাচলে দেবীর আর একবার আবির্ভাবের উল্লেখ আছে, তাহাও শরৎকালেই হইয়াছিল; দেবগণ অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে এবং নবমীতে মহোৎসবের সহিত পূজা করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই পূজার নাম শারদীয়া পূজা।

যদিও সুরথ ও রামচন্দ্র বসন্তকালেও আর একবার দেবীর পূজা করিয়াছিলেন এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়, তথাপি শরৎকালই দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভাবের কাল বলিয়া এবং সুরথ ও রামচন্দ্রের প্রধান পূজা ও দেবগণের বিভিন্ন প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত একাধিকবারের পূজাও শরৎকালেই হইয়াছিল বলিয়া শারদীয়া পূজাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা

রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। রামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কথা মহাভাগবত, কালিকাপুরাণ এবং দেবীভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পূজাও শরৎকালেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শরৎকাল দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন দেবগণের রাত্রি, এই জন্যই শারদীয়া পূজায় দেবীর জাগরণের জন্য বোধন করিতে হয়। রামচন্দ্রের পূজায় ব্রহ্মা সৌর-আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমীতে বোধন করিয়া মহানবমী পর্য্যন্ত এক পক্ষ কাল পূজা করিয়া দশমীতে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধিও পক্ষব্যাপিনী পূজাই করিয়াছিলেন।

মহাভাগবতোক্ত রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা-প্রণালী সর্ব্বাংশে বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত পূজাপ্রণালীর অনুরূপ। অন্য পুরাণদ্বয়ে কিছু কিছু মতভেদ দেখা যায়। এই মতভেদ সম্ভবতঃ কল্পভেদপ্রযুক্ত। রাম-রাবণের যুদ্ধ ও দুর্গাপূজা কল্পে কল্পে বহুবার হইয়াছে এবং হইবে। এ সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়—

> প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ।
> তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ॥
> এবং রামসহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।
> ভবিতব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ত্ততে॥

দেবীর গৌরীত্বপ্রাপ্তি

দাক্ষায়ণী দক্ষযজ্ঞে নিমন্ত্রণ না পাইয়া অভিমানে দেহত্যাগ করেন এবং হিমালয়-পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যাদ্বারা পুনরায় মহাদেবের পত্নীত্ব লাভ করেন। প্রথমে তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণা, এই জন্য তাঁহার এক নাম ছিল কালী। একদিন উর্ব্বশী প্রভৃতি গৌরবর্ণা অপ্সরাদিগের সমক্ষে মহাদেব তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সম্বোধন করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি মহাদেবের সঙ্গত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা সুবর্ণতুল্য গৌরকান্তি লাভ করেন

মৎস্য-পুরাণেও গৌরীত্ব-প্রাপ্তি সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকা কিঞ্চিৎ নূতন আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

সিংহবাহন

দেবীর সিংহ-বাহন সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়—

মহাদেবের কথায় রুষ্ট হইয়া পার্ব্বতী যখন গৌরীত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে যান, তখন তিনি মহাদেবের প্রতি সন্দিগ্ধতা বশতঃ বীরক নামক প্রমথকে মহাদেবের দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া যান। বীরকের উপর আদেশ থাকে যে, মহাদেবের নিকট যেন অপর কোন স্ত্রীলোক আগমন না করে। পার্ব্বতী তপস্যার্থে গমন করিলে এক সময়ে সুযোগ বুঝিয়া মহাদেবের হস্তে নিহত অন্ধকাসুরের পুত্র আড়ি নামক দৈত্য পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার অভিপ্রায়ে পার্ব্বতীর বেশে মহাদেবের নিকট আগমন করে। বায়ু-প্রেরিত দূত পার্ব্বতীকে মহাদেবের নিকট অপর স্ত্রীলোকের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করায়

---

* 'পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
দ্বিতীয়ে রামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা।
তৎপশ্চাজ্জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড ১।১৪।)

পার্ব্বতী যখন রুষ্ট হইয়া দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত বীরককে অভিশাপ প্রদান করেন, তখন তাঁহার ক্রোধ হইতে এক সিংহের উৎপত্তি হয়। পার্ব্বতী অভিমানে এবং ক্ষোভে অধীর হইয়া সেই সিংহের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া বরদানে তাঁহার দেহে সুবর্ণতুল্য গৌরকান্তি প্রদান করেন এবং সেই সিংহকে বাহনরূপে গ্রহণ করত দেব-কার্য্যার্থে বিন্ধ্যাচলে গমন করিতে আদেশ করেন।

কালিকাপুরাণে দেখা যায়—

"কদাচিৎ সা সিতপ্রেতে কদাচিৎ রক্তপঙ্কজে।
কদাচিৎ কেশরিপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী॥
(৫৮।৫১)

সিতপ্রেতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজম্।
হরির্হরিস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ॥
স্বমূর্ত্ত্যা বাহনত্বং তু তেষাং যস্মান্ন যুজ্যতে।
তস্মান্মূর্ত্ত্যন্তরং কৃত্বা বাহনত্বং গতাস্ত্রয়ঃ॥"
(৫৮।৬৬-৬৭)

দেবী কখনও প্রেতোপরি, কখনও রক্তপঙ্কজে এবং কখনও সিংহপৃষ্ঠে বিরাজ করেন। তিনি একাই সমস্ত জগতের প্রকৃতি; ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব সেই জগন্ময়ী দেবীকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাদের নিজ নিজ মূর্ত্তিতে বাহন হওয়া অশোভন বলিয়া মহাদেব প্রেতরূপে, ব্রহ্মা রক্তপদ্মরূপে, এবং বিষ্ণু সিংহরূপে দেবীর বাহনত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

আবার সিংহের উপর রক্তপদ্ম, তদুপরি শব, তদুপরি দেবীমূর্ত্তির ধ্যান ও পূজা করিবার ব্যবস্থাও আছে—

'সিংহোপরি স্থিতং পদ্মং রক্তং তস্যোর্দ্ধগঃ শবঃ।
তস্যোপরি মহামায়া বরদাভয়দায়িনী॥"
(কালিকাপুরাণ ৫৮।৬৯)

এই মূর্ত্তি কামেশ্বরী মূর্ত্তি নহেন। কারণ, কামেশ্বরী মূর্ত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে সিংহের উপর শব, তদুপরি রক্তপদ্ম, তদুপরি কামেশ্বরী মূর্ত্তির অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তির নাম কামদা মূর্ত্তি।

নারায়ণী

দুর্গার প্রণাম মন্ত্রে "নারায়ণি নমোঽস্তুতে"র মধ্যে নারায়ণী নাম শুনিয়া কেহ কেহ প্রশ্ন করেন—নারায়ণের শক্তিই ত নারায়ণী, দুর্গা শিবের শক্তি, ইঁহার নাম নারায়ণী হইল কেন? ইহা লইয়া কিছু কিছু আলোচনা দেখা যায়। ইহার উত্তরে বলা যায়—

"একৈব শক্তিঃ পরমেশ্বরস্য
ভিন্না চতুর্দ্ধা বিনিয়োগকালে।
ভোগে ভবানী পুরুষেষু বিষ্ণুঃ
কোপেষু কালী সমরেষু দুর্গা"
"ব্রহ্মস্বরূপা প্রকৃতি র্ন ভিন্না
যয়া চ সৃষ্টিং কুরুতে সনাতনঃ।
* * * *
নারায়ণী সা পরমা সনাতনী
শক্তিশ্চ পুংসঃ পরমাত্মনশ্চ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—ব্রহ্মখণ্ড, ৩০ অঃ)

পরমেশ্বরের একই শক্তি প্রয়োগকালে ভবানী, বিষ্ণু, কালী ও দুর্গারূপে বিভক্ত। এই শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন, ইনি বিষ্ণুরও শক্তি, মহেশ্বরেরও শক্তি। চণ্ডীতেও দুর্গাকে 'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা' বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণান্তর্গত পরশুরামকৃত দুর্গাস্তোত্রে দুর্গাই ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর পালনশক্তি এবং মহেশ্বরের সংহার-শক্তিরূপে উল্লিখিতা হইয়াছেন।

স্থানান্তরেও দেখা যায়—

"মূলপ্রকৃতিরেকা সা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী।
সৃষ্টৌ পঞ্চবিধা সা চ বিষ্ণুমায়া সনাতনী॥
* * * *
নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা সা চ পূজ্যা সরস্বতী॥
সাবিত্রী বেদমাতা চ সা চ পূজ্যা বিধেঃ প্রিয়া।
শঙ্করস্য প্রিয়া দুর্গা… ……"

একই শক্তি বা মূলপ্রকৃতি নারায়ণের শক্তি—সম্পদ্রূপিণী লক্ষ্মী ও বাগধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, ব্রহ্মার শক্তি—বেদমাতা সাবিত্রী এবং শঙ্করের শক্তি দুর্গারূপে পরিকীর্ত্তিতা।

দেবীপুরাণে নারায়ণী নামের অর্থনিরূপক একটী বচন

দেখা যায়। বচনটীর বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণীত না হইলে অর্থ স্থির করা সহজ নহে।*

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ৫৭ অধ্যায়ে নারদমুখে কৌথুমোক্ত ষোড়শ নামের মধ্যে দুর্গার নারায়ণী নামের উল্লেখ আছে এবং তাহার বেদোক্ত অর্থ বলিয়া এইরূপ অর্থ কথিত হইয়াছে—

"যশসা তেজসা রূপৈর্নারায়ণসমা গুণৈঃ।
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতা॥"

মহাভারতোক্ত দুর্গাস্তোত্রে

"উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি!
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তু তে॥"

ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন—"শ্বেতে মহেশ্বররূপে! কৃষ্ণে বাসুদেব রূপে!" তিনিই আবার দুর্গাকে সর্ব্বদেবতারূপিণী এবং সর্ব্বাত্মিকাও বলিয়াছেন—"স্কন্দমাতরিতি সর্ব্বদেবতারূপত্বোপলক্ষণম্"। "হিরণ্যাক্ষি বিবিধরূপযুক্তনেত্রে মনুষ্যাদৌ, সুধূম্রাক্ষি মার্জ্জারাদৌ, এতেন সার্ব্বাত্ম্যমুক্তং ভবতি।"

ললিতা-সহস্রনামে ভগবতীর 'পদ্মনাভসহোদরী' নাম দেখা যায়। তদ্দর্শনে সৌভাগ্যভাস্করে (ললিতাসহস্রনামভাষ্য 'নারায়ণী'শব্দের 'নারায়ণভগিনী' এইরূপ অর্থও করা হইয়াছে।

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয় এই প্রসঙ্গে সৌভাগ্য ভাস্করের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—

"পরং ব্রহ্ম প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এই দুইভাগে বিভক্ত হন। পরং ব্রহ্ম বা পরম শিব হইতে প্রথম যে শক্তির স্ফুরণ হয়, তাহাই ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম পুরুষ ও স্ত্রী দুই ভাগে বিভক্ত হয়, পুরুষভাগ বিষ্ণু এবং স্ত্রীভাগ আদ্যাশক্তি; এই আদ্যাশক্তি শিবের মহিষী। এক পরং ব্রহ্ম হইতে বিষ্ণু ও আদ্যাশক্তি উভয়ের আবির্ভাব বলিয়া আদ্যাশক্তি বিষ্ণু বা নারায়ণের ভগিনী, এই জন্য তাঁহার নাম নারায়ণী। দুর্গা আদ্যাশক্তির বিভূতিমূর্ত্তি, এইজন্য তাঁহার নামও নারায়ণী।"

* জলায়ানা নরা গৌর্য্যা সমুদ্রশয়নাথবা।
নারায়ণী সমখ্যাতা নরনারীং প্রকুর্ব্বতা॥
(দেবীপুরাণ ৩৭।৭, বঙ্গবাসী ২য় সংস্করণ)

মূর্ত্তিরহস্য

দেবী নিত্যা—সনাতনী, তাঁহার উৎপত্তির কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু দেবগণের কার্য্যসিদ্ধি, দুর্দ্দান্ত দানবগণের নিধন এবং জগতের উপকারার্থে তিনি মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূতা হন। শাস্ত্রে তাঁহার এই আবির্ভাবই উৎপত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। দেবীর বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। মহিষাসুর-বধ ও ঘোরাসুরবধে দেবী দশভুজা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং দেবগণ ও রামচন্দ্র দশভুজা মূর্ত্তিরই পূজা করিয়াছিলেন। গৌরীলোকে দেবীর যে নিত্যমূর্ত্তি বিরাজমান, তাহাও দশভুজা এবং দশভুজা মূর্ত্তি বৈদিকী মূর্ত্তি বলিয়া মহাভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে; সম্ভবতঃ এই জন্যই দশভুজা মূর্ত্তির পূজাই জগতে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দেবীর পাদলগ্ন হইয়া মহিষাসুরের পূজাপ্রাপ্তির কথা কালিকাপুরাণে আছে। সিংহও নারায়ণের মূর্ত্তি এবং দেবীর বাহন হিসাবে দেবীর সহিত পূজার অধিকার লাভ করিয়াছে। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্ত্তিক-গণেশের পূজার প্রমাণ কালীবিলাস-তন্ত্রে পাওয়া যায়। জয়া, বিজয়া, ময়ূর, মূষিক, শিব, ব্রহ্মা, সাবিত্রী ও নবসিদ্ধির পূজার বিষয়ও কালীবিলাস-তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বর-পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা-পদ্ধতিতে চিত্রিত দেবতার পূজার কথা মাত্র আছে। কিন্তু প্রতিমার চালচিত্রে কোন্ কোন্ দেবতার মূর্ত্তি চিত্রিত করিতে হইবে এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

বিজয়া দশমী

নবমীতে রাবণ নিহত হইলে দশমীর দিন পূজান্তে মহা উৎসব সহকারে দেবীর বিসর্জ্জন দিয়া রামচন্দ্র বিজয়োৎসব করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই দশমী বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। এই দিন নৃত্য-গীত বাদ্যাদি সহকারে দেবীর বিসর্জ্জনান্তে ধূলী-কর্দ্দমাদি নিক্ষেপ ও গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্রীড়া-কৌতুক করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা হিংসাদ্বেষাদি-বিহীন শত্রুমিত্রাদি সংস্কারমুক্ত নির্ম্মল অন্তঃকরণের অসীম আনন্দোচ্ছ্বাস এবং পরস্পর সম্প্রীতির অভিব্যঞ্জক। রাবণবধের পর আনন্দে অধীর হইয়াই হয় ত বানর ও ভল্লুকগণ এইরূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিল এবং তদনুকরণে ইহাও বিজয়াদশমীর উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ সুরুচিবিরুদ্ধ বলিয়াই ইহাকে শাবরোৎসব বলা হইয়াছে।

সর্ব্ব-মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ক্লদেৎ কলবেয়ারের হাসিটা কি মার্ভেলাস——

আচ্ছা তুমি ক্লদেতের মত হাসতে পার না

তোমার মধ্যে সেই হাসি ফোটাবই

স্ত্রী যার ক্লদেতের মত হাসতে পারেনা তার মরনই মঙ্গল

সমর—

উচ্চাশার সমাধি

সহুরে মেয়ে

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

হরিবিলাস সরদার বিবাহ সংক্রান্ত বিলটা কতদিন হইল পাশ হইয়াছে বলুন তো ?···আপনি যে আঙ্গুল গুণিতে বসিয়া গেলেন ! না, অত মাস তারিখ ধরিয়া হিসাবে দরকার নাই। মোটামুটি ছয় সাত বছর হইল, না ?

তাহা হইলে আমার নায়িকা সোনিয়ার বয়স হইল আঠারর কিছু বেশী, আর নায়ক মিঠুয়ার বয়স সম্ভবত পনের, দু'এক মাস কমই হইবে, বেশী তো নয়ই।

সোনিয়ার বাপের বাড়ী বিহারের একটি সহরের উপান্তে ; সহরের ক্ষীণ আলো আর পাড়াগাঁয়ের অন্ধকারের সন্ধিস্থলে আর কি। বাপ প্রথমটা সরদা অ্যাক্টের গোলযোগটা অতটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না, সহরে ও রকম কত ঢেউ উঠিতেছে, আবার মিলাইয়া যাইতেছে। যখন ঢেউটা মিলাইয়া না গিয়া সত্যই দেশটাকে তোলপাড় করিয়া তুলিল, তখন সে চিন্তিত না হইয়া পারিল না। ছেলের বাজার তখন গরম হইয়া উঠিয়াছে—পাওয়াই দুষ্কর। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া প্রায় ক্রোশ ছয়েক দূরে একটি নিভৃত পল্লীতে মিঠুয়ার সন্ধান পাওয়া গেল। তখন তাহার উচ্চতা সওয়া গজ আন্দাজ,—সোনিয়ার চেয়ে ঠিক এক মুঠার উপর দুই আঙ্গুল বড়। বিবাহ হইয়া গেল।

মধ্যের এই ছয় সাত বৎসরের ইতিহাস বাদই দেওয়া যাক্। কোনও রোমান্সের খোরাক নাই,—নায়ক-নায়িকার মধ্যে কুল্যে দেখা-সাক্ষাতের জো নাই তো রোমান্স ! —আপনাদের অত সহজে থামান যাইবে না, জানি। জিজ্ঞাসা করিবেন—অন্তরালের, অদর্শনের রোমান্স ?··· মিঠুয়ার তরফে যে কিছুই নাই, এ কথা বেশ নিঃসংশয়ে বলা চলে। ছেলেটা হাঁদা গোছের, খানিকটা বড় হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। নিয়মিতভাবে খাওয়া দাওয়া, গরু-মহিষ চরান আর ক্ষেতে ফসল তোলার বাহিরেও যে একটা দুনিয়া আছে, সে সম্বন্ধে তাহার অত খোঁজ-খবর নাই। তাহার 'মনোভাব' নামক জিনিসটাই গজায় নাই, সে ক্ষেত্রে সোনিয়া সম্বন্ধে তাহার মনোভাবটা কি সে কথাই ওঠে না। এক কথায় বলা চলে ছোঁড়াটা 'মাথায় বাড়িয়াছে', কিন্তু মাথার ভিতরে বাড়ে নাই।

অবশ্য সোনিয়ার কথা একটু ভিন্ন। একে মেয়ে, তায় যত অজই হোক্ না, সহরের একটু গন্ধ আছে। তাহা ছাড়া বয়সেও তো সে মিঠুয়ার চেয়ে বড়। এর উপর যখন ধরা যায় তাহার স্বভাবটাও স্বামীর মত হাঁদাটে নয়, তখন তাহার মনের জটিলতা স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না। ঘরকরনার কাজের অতিরিক্তও তাহার কাজ আছে—কাপড়টি ছোবান, সাজিমাটি দিয়া ঘাটে বসিয়া চুলের গোছা ধোওয়া, সহরে মার সঙ্গে কিছু বেচাকেনা করিতে গেলে সহরের হাওয়া একটু লক্ষ্য করা,—বাঙ্গালীদের 'বেটী-বহু'রা কি ভাবে কপালে টিপটি পরে, এদেশীরা হাতে কি ধরণের মেহদির নক্সা তোলে, মণিবন্ধে বাজুতে, কণ্ঠের নীচে কি ধরণের উল্কি আজকাল চলতি—এই সব।

সুবিধা পাইলে—ধরুন, মা যখন কাহারও বাড়িতে ধানটা ঝাড়িয়া দিতেছে, কিংবা ডালটা বাছিয়া দিতেছে—সে সমবয়সীদের দলে ভিড়িয়া যায়—অবশ্য তাহার অবস্থার মেয়ের পক্ষে যতটা ঘনিষ্ঠভাবে ভিড়া সম্ভব। মোট কথা, মিঠুয়া বোধ হয় যে সময়টা মহিষের পিঠে শুইয়া মাঠের মাঝে অকাতরে নিদ্রা দিতেছে, কিংবা ঘুড়ি-লাটায়ের ঝগড়ায় মার খাইয়া কান্নার চোটে পাড়া মাথায় করিতেছে, তাহার পত্নী সোনিয়া তখন সমবয়সীদের কাছে এমন সব সংবাদ শুনিতেছে, যাহাতে তাহাকে নিজের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিতেছে।

অবস্থা যখন এবম্প্রকার, মিঠুয়ার বাপ বুধন মড়র একদিন হঠাৎ আসিয়া বেহাই-বাড়িতে উপস্থিত হইল। বৌদি মহতো নেশা-পানি আনিয়া বেহাইকে অভ্যর্থনা করিল। বুধনের মেজাজটা একটু যেন বেশী রকম রুক্ষ, বলিল—"এ তো ভাল কথা নয় সম্ধি (বেহাই), টাকা নেই টাকা নেই বলে মেয়ের দ্বিরাগমন করাচ্ছ না, ওদিকে আমার যে মুখ

দেখান তার। বেটীর চালচলন সহুরে হয়ে উঠছে—সে দেশ পর্য্যন্ত এ কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল, অথচ তোমার যেন হুঁসই নেই। কবে তোমার টাকা হবে, মেয়েকে কায়দামাফিক বিদায় করবে, সে ভরসায় থাকলে তো চলবে না। আমি আজ এসেছিলাম সহরের দিকে, ফিরে গিয়ে জ্যোৎখীজীর (জ্যোতিষীজীর) কাছ থেকে দিন দেখিয়ে ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি মেয়ে পাঠাবার জোগাড় কর।" বেহাই বিস্তর কাকুতি-মিনতি করিল। ক্ষেতে মকাইটা হইয়াছে ভাল এবার, ফসলটা উঠিলেই মেয়েকে বিদায় করিবে। হাত এখন নিতান্তই খালি, পাওনাদারকে কয়েক মাস সুদ পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই, সেদিকে একটি পয়সারও আশা নাই··· 'এখন পাঠালে কিছুই করতে পারব না, সব সাধ-আহ্লাদই বাকী থেকে যাবে···নাও সম্‌ধি, তুমি আজ যে মোটেই গেলাস তুলছ না···"

ছেলের বাপ রাজী হইল না,—ছেলের বাপই তো? অষ্টম বার গেলাসটা ভরিয়া বলিল—'মনে সুখই নেই তো গেলাস ভরা। তুমি মেয়েকে এক বস্ত্রে, খালি হাতে পাঠিয়ে দাও; আমার জোটে দেব পরতে, না জোটে ন্যাকড়া পরবে। আমি ইজ্জৎদার লোক, আমার ইজ্জৎ বজায় থাকলেই হল। ···তবে আসল কথাটা বলতেই হ'ল সম্‌ধি,—আজ সহর থেকে আসার পথে কনিয়াকে (বধূকে) সখীদের সঙ্গে যে-রকম বেহায়াপনা করতে করতে আসতে দেখলাম, তাতে··· ।"

পেটে অনেক খানি গিয়াছে, রাগিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। রৌদিও যোগদান করিল। খানিকটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিল—"কে কার বেটি, কে কার বাপ?—সব রামজীর লীলা। তুমি নিয়ে যাও তোমার কনিয়াকে সম্‌ধি।"

বুধন গেলাসট শেষ করিয়া শান্তভাবে একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিল—"না হয় থাকই তবে মকাই পাকা পর্য্যন্ত। তুমি ইজ্জৎদার লোক তোমার কথাটা ঠেলব?—আমার মন যেন সায় দিচ্ছে না।"

রৌদি তখন পাঠাইবার দিকেই ঝুঁকিয়াছে, প্রবল বেগে হাত নাড়িয়া বলিল—"না, না; সব মায়ার বন্ধন সম্‌ধি, যত শীগ্‌গির কাটান যায় ততই মঙ্গল; বলে—

শুনো কবীর কহত রঘুনাথা
মায়ধার নরক পথ যাতা—

—মায়ার নদী নরকেই নিয়ে যায়। নদীতে গা ভাসাতে চাই না।"

বুধন দুই হাঁটুর উপর হাতের কনুই দুইটা ন্যস্ত করিয়া বলিল—'ঠিক ব'লেছ সম্‌ধি—

আরে কৌন কিস্‌কা বেটা ভইয়া, কৌন কিস্‌কা বাপ।
মায়াকা হও মুঠঠি বান্‌হে, হাত পসারো—সাফ্‌।

—কেই বা কার? মায়ার বশে হাত মুঠো করে ভাবছি—কি রত্নই না রয়েছে; খুলে দেখ—ফাঁকি!···কাটিয়াকে আর আছে না কি?—দেখ তো।···না থাকে দরকার নেই··· এও একটা মায়াই বলতে হবে কি না, যত এড়ান যায় ভাল।

(২)

রৌদির বাড়ীতে এই দার্শনিক বৈঠকের দুইদিন পরে মিঠুয়া বধূকে লইতে আসিল। মাথায় একটা গোলাপী চীনে সিল্কের টুপি; গায়ে সবুজ গেঞ্জির উপর একটা পাৎলা পিরাণ, কোমরে হলুদ-ছোবান কাপড়, হাতে একটা বাঁশের লাঠি। মাথায় জবজবে করিয়া মাখা সরিষার তেল টুপির নীচের অংশটা ভিজাইয়া কয়েকটি ধারায় কপাল, গাল, ঘাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছে—; চোখে কাজল।

পথে এক বাণ্ডিল বিড়ি কিনিয়াছিল, শ্বশুরবাড়ীর নিকট আসিয়া একটা কাণে গুঁজিয়া দিয়া যথাসম্ভব সহুরে হইয়া লইল।

শ্বশুর শাশুড়ী বাড়ী ছিল না। সোনিয়াকে তাহার দুই-তিন জন সখী জোর করিয়া আনিয়া ঘরের ছ্যাঁচা বেড়ার আড়ালে দাঁড় করাইল—অবশ্য খুব যে জোর করিতে হইল, এমন নয়। বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখিয়া ঠোঁট উল্টাইয়া, নাক সিটকাইয়া সোনিয়া চাপা গলায় বলিল—"ইস্‌! কি ছোঁড়া মদ্দ রে আমার!···আমি সোজা লোক? নিজে দেড় হাত হলেও চার হাতের লাঠিই আমার।"

সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল।

একজন সখী বলিল—'তুই তো ঐ বিড়ির মতই তোর কাণে গুঁজে রাখবি সোনিয়া।'

অপর একজন বলিল—'দেখিস্, যেন বিড়ির মত ফুঁকে দিস্ নি তা' বলে।'

আর একটা হাসির লহর উঠিল।

সব না বুঝিলেও, বেড়ার আড়ালে যে একটা কিছু হইতেছে, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া, মিঠুয়া সেটা বেশ বুঝিতে পারিল। নিজের পুরুষত্বটাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা গলা খাঁখারি দিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহাতে আরও একটা কি মন্তব্যের সঙ্গে বেড়ার ও ধারে প্রবলতর হাসির বেগ ওঠায় অসহায় ভাবে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

একটু যেন ভিতর হইতে ধাক্কা খাইয়া একটি মেয়ে একেবারে সামনে আসিয়া পড়িল। একটু থতমত খাইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখে কাপড় দিয়া প্রশ্ন করিল—"পহুনা (কুটুম্) বেশ ভাল আছ তো?"

মিঠুয়া মাথা নীচু করিয়া বলিল—"হুঁ।"

"বলদ মহিষ সব কেমন আছে?"—নিজেও হাসিয়া উঠিল, পাশেও দুই তিনটি কণ্ঠে হাসির শব্দ পাওয়া গেল। মিঠুয়া আরও ঘাড় গুঁজিয়া নিরুত্তর রহিল।

আর একটি মেয়ে দুইবার উঁকিঝুঁকি মারিয়া বাহিরে আসিল। অযথা এক ঝলক হাসিয়া আবার কৃত্রিম গম্ভীরতার সহিত বলিল,—'আহা কচি ছেলে, দু'কোশ পথ হেঁটে এসে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গো! দুধ খেয়ে এসেছিলে পহুনা?"

মিঠুয়া তেলে-ঘামে একেবারে জবরজঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। মাথা নীচু করিয়া আড়চোখে দেখিল, আর একটি বাহির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া বলিল—'মুখ তোল তো পহুনা, কটি দাঁত হয়েছে দেখি। আহা, সত্যি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ঘাড় তুলতে পারছে না।···আচ্ছা, ভাবনা নেই, যাবার সময় হেঁটে যেতে হবে না,—মিতিন্‌কে (সইকে) বলব কোলে করে নিয়ে···

এমন সময় অপর এক দিকে বৌদির গলার আওয়াজ শোনা গেল। সে বাড়ি ছিল না, এই মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মেয়েরা যে যেখানে পারিল ছুট্ দিল।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৌদির স্ত্রী এবং ভগ্নীও বাড়ী ফিরিল; পাড়ার বর্ষীয়সীদের ডাকিয়া রাত বারোটা পর্য্যন্ত গান হইল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই এই সমস্ত ব্যাপার হইতেছে জানিয়া মিঠুয়া মেয়েগুলার হাতে খোয়ান আত্মমর্য্যাদা আবার অনেকটা ফিরিয়া পাইল এবং রাতে দৈনন্দিন নেশা করিয়া শ্বশুর যখন তাহার চিবুক ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া অন্ততঃ আর একটা দিনও থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, তখন সে পুনর্লব্ধ আত্মমর্য্যাদার বশে কোন ক্রমেই রাজী হইল না।

পরের দিন বিকালে সাজগোজ করিয়া এবং শ্বশুরের দেওয়া একজোড়া রঙীন কাপড় আর উড়ানিটা কাঁধে ফেলিয়া একটা গোটা পুরুষের তেজে বউকে লইয়া বিদায় হইল।

সোনিয়া যাইবে না বলিয়া বাড়ীর মধ্যে খুব একচোট কান্নাকাটি ওজর আপত্তি করিল, চৌকাঠের বাহিরে আসিয়া আর এক চোট ধস্তাধস্তি করিল, তাহার পর ঘোমটার মধ্যে একটানা কান্নার সুর তুলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। মা, পিসী, পাড়ার বর্ষীয়সী আর সখীরা কাঁদিতে কাঁদিতে গ্রামের প্রান্তে 'বড়হম্ দেওতার' (ব্রহ্মদেব) আস্তানা পর্য্যন্ত সঙ্গে গেল, তাহার পরে একবার গলা-জড়াজড়ি করিয়া কাঁদিয়া, সোনিয়াকে বিদায় দিয়া আস্তানার কদমতলাটিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

(৩)

পথটা প্রায় পোয়াখানেক পর্য্যন্ত সোজা গিয়াছে। এটুকু সোনিয়া এমন ধীরে ধীরে চলিল যে, দুই তিনবার মিঠুয়াকে থামিয়া পড়িয়া তাহার অপেক্ষা করিতে হইল। আপত্তির যে-রকম নমুনা দেখিয়াছে, দুরন্ত বাড়াইয়া শেষ কালে পলাইয়া যাইতেও পারে—সহুরে মেয়েকে বিশ্বাস নাই। মোড়টা ঘুরিয়া খানিকটা পরে কিন্তু তাহার যেন বোধ হইল, বধূর পদক্ষেপ একটু একটু করিয়া দ্রুত হইয়া উঠিতেছে। নূতন বধূ হইতে একটা ভব্য দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য তাহাকেও গতিবেগটা বাড়াইয়া দিতে হইল। দেখিল তাহাতেও নিস্তার নাই। তখন নির্জ্জন রাস্তায় তাহার গা'টা যেন ছমছম করিতে লাগিল।—মেয়েটা ঘাড়ে পড়িবার দাখিল হইয়াছে, মতলবখানা কি?

হঠাৎ সোনিয়া চলিতে চলিতে থামিয়া গেল। মিঠুয়া অজ্ঞাতে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখিয়া ধীরে

ধীরে বধূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মীয়া ভিন্ন এত বড় মেয়ের সহিত কখনও কথা কহে নাই, প্রবল অস্বস্তিতে পড়িয়া লাঠির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল

খানিকক্ষণ পরে ঘোমটার মধ্যে থেকেই ফিস্ ফিস্ করিয়া প্রথম কথা ফুটিল—'ইস্, দৌড়ন হচ্ছে একেবারে।'

ইহা অতিমাত্রায় অপ্রত্যাশিত! মিঠুয়ার প্রথমটা কথাই জোগাইল না, একটু পরে জিভে ঠোঁট ভিজাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—'বাঃ, তুমিই তো জোরে চলতে আরম্ভ করলে, আমি সে রকম ভাবে চললে এগিয়েই যেতে।'

ঘোমটায় একটা ঝাঁকানি হইল, শব্দ বাহির হইল—'গমার কাঁহাকে!'—অর্থাৎ গেঁয়ো কোথাকার!

মিঠুয়ার যাহা কিছু বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল, বধূর এরূপ সম্ভাষণে একেবারেই বিলুপ্তপ্রায় হইল। একটু পরে বলিল—"বেশ, চল আস্তে আস্তেই।'

খানিকটা গেল। একটু পরে হঠাৎ পিছন ফিরিতে দেখিল—বধূর মাথায় ঘোমটা নাই, কখন খুলিয়া ফেলিয়াছে; সে সশঙ্ক ভাবে মুখটা তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইল। ভাবিতে লাগিল—এ তো ভীষণ ফ্যাসাদে পড়া গেল, মাঝ-রাস্তায় কি করিয়া এই অভাবনীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পিছনে তাহার জামার খুঁটে টান পড়িল। যদিও ফিরিয়া দেখিল, বধূর হাত তাহার অঞ্চলের ভিতরেই অচঞ্চল ভাবে আছে, তবুও তাহার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ ঐ দুঃসাহসিকারই কাজ। প্রশ্ন করিল—'কিছু বলছ?'

বধূ ঘোমটামুক্ত মুখটা ব্যঙ্গের সহিত ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—'কাকে?'

'আমায়?'

সোনিয়া ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল—'ওঃ, ওঁকে বলছে, মস্ত সমঝদার লোক কি না! গেঁয়ো বুঝবে শুধু মোষ-বলদের কথা।'

এ রকম ভাবে ঘা দিলে মিঠুয়ার মত লোকেরও লাগে, রাগে মুখটা ভার করিয়া বলিল—'হাঁঃ, বুঝি কি না বলেই দেখ না।'

'ঢের বলেছি আর ঢের বুঝেছ; চল এখন, সামনে লোক আসছে।"

ঘোমটাটা টানিয়া দিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। যখন আন্দাজ করিল লোকটা দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, ঘোমটাটা খুলিয়া একেবারে পাশাপাশি আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। বোধ হয় দুইজনে মতলব করিয়া পথিকটিকে প্রবঞ্চনা করায় দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাটা আরও নিবিড় হইয়া গেল। অবশ্য সোনিয়াই অগ্রণী, বলিল—'গল্প করতে করতে চল না; হাবা না বোবা?'

'কি গল্প বলব?—রাজারাণীর না হুড়ারের (নেবড়ের)?'

সোনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"মনসার (মিনসের) কথা শোন না? আমি কি খুকী যে বাঘ-ভূতের গল্প শুনব? তুমিই বরং দুধের ছেলে...কালকের কথা মনে আছে?—আমার মিতিনদের হাতে নাকালটা?'

মিঠুয়া চুপ করিয়া রহিল। সখীদেরই একটা কথা সম্বন্ধে সঙ্কেত করিয়া সোনিয়া বলিল—'পা ব্যথা করছে না তো? —যদি করে তো বল না হয়—'

শেষ করিতে না পারিয়া মুখে হাত দিয়া হাসিয়া উঠিল। মিঠুয়া লাঠিটা বাগাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—'তাদের সব-গুলোকে আমি কাঁধে করে অমন পাঁচ ক্রোশ ঘুরে আসতে পারি—আমার নাম মিঠ্ঠু মড়র, হুঁ!'

'ওঃ, তাই তো গা! তা, তাদের বললে না কেন?—তা'হলে হনুমানজি বলে তোমায় পূজো করত—"

হাসিতে হাসিতে বলিল—'তিনিও রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে—সবাইকে এক সঙ্গে ঘাড়ে বয়ে নিয়ে বেড়াতেন। নাও, খানিকটা এগিয়ে যাও, একটা গ্রাম এসে পড়ল। এখন হাতে ধরে মড়রকে দেখাই দু'বছর।'

নিজেও ঘোমটাটা টানিয়া দিল এবং গতি মন্দ করিয়া স্বামীর আর নিজের মাঝে উপযুক্ত ব্যবধান করিয়া লইল। গ্রামটায় বসতি বিরল, তবে রাস্তার দুধারে দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া বাড়ী প্রায় আধ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ছেলেমেয়েরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া, কোথাও বা রাস্তার মাঝে আসিয়া—'কনিয়া গে, দুগো ধনিয়া দে—' বলিয়া দুলিয়া দুলিয়া ছড়া কাটিতে লাগিল। একটু যাহারা বোঝে, বর-কনের বয়সের তারতম্য লইয়া অম্ল-মধুর মন্তব্য ছাড়িতে লাগিল।

(৪)

গ্রাম ছাড়াইয়া খানিকটা গিয়া রাস্তার ধারে একটা পুকুর পড়ে। রাস্তার একটু পাশেই একটা ঝাঁকড়া বকুল গাছের তলায় রাণাভাঙা একটা পুরাতন ঘাট। লোকজন নাই কেহ। সোনিয়া বলিল—"তেষ্টা পেয়েছে, চল একটু বসি।"

মিঠ্ঠু মড়র বাহাদুরী দেখাইয়া বলিল—'ইঃ, দু'-ক্রোশ তো পথ, তার মধ্যে আবার চার বার বস! আমার তেষ্টা পায় নি।'

সোনিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—'তবে তুমি যাও।'

'আর তুমি?'

'আমি জিরিয়ে টিরিয়ে বাড়ী ফিরে যাব।'

যা মেয়ে দেখা যাইতেছে, ও তা পারে। মিঠুয়া শুষ্ক মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং সোনিয়া ঘাটের রাণায় একটা জায়গায় গিয়া বসিলে সেও গিয়া পাশে বসিল। সোনিয়া পা-টা গুটাইয়া লইয়া বলিল—'দেখ কাণ্ডটা! আর জায়গা নেই না কি যে একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে? আচ্ছা পাড়াগেঁয়ে ভূত তো!'

মিঠুয়া অতিমাত্র অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে যে রকম উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে মনে করিয়াছিল খুব কাছে বসাটাই বরং অভিজ্ঞ নাগরিকের মত হইবে। বোকার মত একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—'আর বসবার মত পাকা জায়গা তো দেখছি না; তা হলে তো আমায় নীচে বসতে হয়।'

সোনিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল,—'তাইতো গা—এত বড় অপমান! আমি—কত বয়স হল? এগার?'

মিঠুয়া যথাসম্ভব জোর দিয়া বলিল—'পন্দ্রহ!'

সোনিয়া কথাটাতে মিঠুয়ার চেয়েও জোর দিয়া, চোখ পাকাইয়া, মাথা নাড়িয়া বলিল—"—আমি পন্দ্রহ বছরের মদ্দ—অমুক মড়র—আমি বসব নীচে! নীচে বসবে না তো কোথায় বসবে? —আমার বয়স যে উন্নৈস! —বিশ্বাস হচ্ছে না?' —বলিয়া তাহার উনিশ বৎসরের সমস্ত শরীরখানি কপট দর্পে বিজ্বলিত করিয়া, রাণার নীচে পা দুইটি ঝুলাইয়া, বিপরীত দিকে গ্রীবা বাঁকাইয়া বসিল।

একটু পরে ফিরিয়া দেখিল, পনের বৎসরের জীবটি নিজের পরাজয় মানিয়া লইয়া, জড়সড় হইয়া তাহার পায়ের কাছে, ঘাসের উপর বসিয়া আছে। একটু মুচকিয়া হাসিল, তাহার পর বলিল—'বসে না থেকে, দু'টো ভাল সারির (বকুলের) ফুল কুড়োও দিকিন। আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি।'

'ফুল কি হবে?'

'বাড়ী গিয়ে তোমায় ভেজে খাওয়াব,—হাঁদারাম—'

মুখ ধুইয়া অঞ্জলি করিয়া জল পান করিয়া উঠিল। ছোবান শাড়ীর কোঁচা দিয়া মুখ মুছিয়া মিঠুয়ার দিকে মুখটা হঠাৎ বাড়াইয়া বলিল,—'দেখ তো আমার কপালের টিকলিটা (টিপ) ঠিক আছে কি না।'

'এক পাশে সরে গেছে।'

'কোন্ দিকটায়?'

'ডান দিকে।'

সোনিয়া মেহদি-রঞ্জান তিনটি আঙ্গুলের ডগা টিপ ছাড়া কপালের আর সব জায়গাটায় বুলাইয়া বলিল—'কোথায়? বুঝতে পারছি না তো।'

'ডান দিকে ভুরুর ওপরে।'

সোনিয়া আবার সেইরূপ ভাবে হাত বুলাইয়া বলিল—'কোথায়?—ছৎ, মিছে কথা, পড়ে গেছে নিশ্চয়।'

'না, না, পড়ে নি।'

সোনিয়া ঝগড়া করার মত করিয়া বলিয়া উঠিল—'হাঁ, হাঁ, হাঁ,—পড়েছে, নিশ্চয় পড়েছে,—চাষা!'

মিঠুয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল;—এটুকু ছোট কপালটায় হাত বুলাইয়া টিপটা কোথায় ধরিতে পারিল না, এ যে বিশ্বাস করা শক্ত। তা' ছাড়া ইহাতে রাগ করিবার ঝগড়া করিবারই বা কি আছে? একটু হতভম্ব হইয়া বলিল—'যদি রাগ না কর তো দেখিয়ে দিই।'

'যদি খালি টিকলিটা খুঁটে নিয়ে বসিয়ে দিতে পার তো কিছু বলব না, কিন্তু খবরদার যেন···ন্যাকাকে কোন কাজ দিয়ে বিশ্বাস নেই।'

ন্যাকার হাতটা কাঁপিতেই ছিল, তাহার উপর বাঙ্গালী প্যাটার্ণের ক্ষুদ্র টিপটা বেশ একটু বাগড়াও দিল; খুঁটিতে

গিয়া কপাল হইতে নাকে পড়িল, সেখান হইতে দুইটি ঠোঁটের মাঝখানে।

মিঠুয়া ভয়ে ভয়ে, যতটা সম্ভব আলগাভাবে সেটাকে উদ্ধার করিয়া কপালে বসাইয়া দিল এবং একটা নিশ্চিন্ততার সহিত নিশ্বাস ফেলিল।

সোনিয়া দুইটি আঙুল দিয়া টিপটা একটু চাপিয়া দিয়া বলিল 'গেঁয়ো কোথাকার!'

মিঠুয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, 'আবার ও কথা বলছ কেন? দিই নি ঠিক করে খুব সাবধানে?'

'নিশ্চয় বলব, আমার খুসী! নাও চল। আকাঠ গেঁয়ো!'

আবার দুইজনে চলিতে আরম্ভ করিল। সোনিয়া কি ভাবিতেছিল, একটু পরে বলিল, 'তুমি গেঁয়ো বললে চট; কিন্তু কাউকে যদি বল যে আমার গায়ে হাত দিয়ে কপালের টিপ পরিয়ে দিয়েছ তো সে আরও গেঁয়ো বলবে। মনে থাকে যেন!'

মিঠুয়া মস্ত বড় বুদ্ধিমানের মত বলিল, 'সে আমি বলতে যাব কেন? এতই বোকা না কি?'

কথাবার্ত্তা আরও অন্তরঙ্গতার সহিত হইতে লাগিল। পথের মাঝে লোক দেখিয়া যতবারই দুইজনে সরিয়া যাইতে লাগিল, লোক চলিয়া গেলে ততবারই আবার আরও কাছাকাছি হইয়া চলিতে লাগিল। সোনিয়া গ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করিল। শ্বশুর-বাড়ীর কথা, ননদ, দেওর, গরু, মহিষ; নিজে সহরের কথাও বলিতে লাগিল। বাঙ্গালী মেয়েদের কথা। কে এক বাঙ্গালীর মেয়ে তাকে বড্ড ভালবাসিত, সোনিয়া তাহাদের বাড়ি ঘুঁটা জোগাইতে যাইত মাঝে মাঝে —তাহাকে আদর করিয়া বলিত, 'সোণামঈ'—মানে, সোণার তৈয়ারি। সে না কি সুন্দর বলিয়া তাহাকে এই আখ্যা দিয়াছিল···বাবাঃ বাবাঃ, বাঙ্গালীর মেয়েরা এত মিথ্যাও জানে! সোনিয়া না কি আবার সুন্দর।

মিঠুয়ার সাহস বাড়িয়াছে, একটু বোধ হয় জ্ঞানবুদ্ধিও হইয়াছে পথ চলিতে চলিতে। বলিল, 'মিছে কথা আর কি বলেছে? তুমি তো সুন্দরই।'

'নিজে যে সুন্দর সে ওরকম বলে—মানে, বাঙ্গালীর বৌ নিজে সুন্দর বলেই আমার প্রশংসা করত।'

মিঠুয়া ঠিক বুঝিতে পারিল না, এর মধ্যে তাহারও প্রশংসা প্রচ্ছন্ন আছে কি না।

যেন মনে হইল তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই একটু বলিয়াছে এবং যে ক্রমাগতই এক নাগাড়ে 'গেঁয়ো, গেঁয়ো' করিয়া আসিয়াছে, তার মুখে ভালই লাগিল কথাটা।

হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিল, 'বাড়ীর কাছে এসে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ঐ ইঁদারাটার পাশ দিয়ে ঘুরলেই আমাদের বাড়ীর রাস্তা কি না। আচ্ছা আসবার সময় তুমি অত কান্নাকাটি করছিলে কেন বলত? এখন তো বেশ—'

সোনিয়া একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল। খপ করিয়া এক গলা ঘোমটা টানিয়া দিয়া চাপা স্বরে উদ্বিগ্নভাবে বলিল, 'সত্যি, এসে পড়েছি না কি! আগে বলতে হয়,—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও—'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটার ভিতর হইতে কান্নার সুর উঠিল। মিঠুয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, 'এ কি! এই তো দিব্যি ছিলে, বললে, আমাদের বাড়ী খুব ভাল লাগবে, আরও বললে—'

স্বামীকে বেশ একটু ধাক্কা দিয়াই আগাইয়া দিয়া সোনিয়া তাড়াতাড়ি বলিল, 'বাড়ি যে এসে পড়েছে। গমার ভুঁইয়াকে নিয়ে কি ফ্যাসাদেই—'

অতঃপর নিজের গতি মন্দ করিয়া দিয়া বেশ উচ্চস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল।

প্যারিসের কথা

—শ্রীবরুণকুমার মিত্র

কোন রকম একটা হুজুগ তুলে কিছু পয়সা রোজগার করবার চেষ্টা আজকাল সব জাতের মধ্যেই (বিশেষ করে ইউরোপে) দেখা যায়। এবার প্যারিসের ইন্টার-ন্যাশন্যাল এগজিবিশন দেখতে গিয়ে এই কথাটি বেশী করে বুঝলাম। ইউরোপের বড় বড় সহরে দেখা গেল (গত বৎসর মে-জুন মাসের কথা বলছি), Exposition Internationale des Arts et Technique-এর বিজ্ঞাপনে ভর্ত্তি হয়ে গেছে, রেলওয়ে ষ্টেশনে পোষ্টার এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ দ্রষ্টব্য :—প্যারিসের রেলের ভাড়া যাত্রীদের জন্য শতকরা পঞ্চাশ কমেছে, হোটেলের চার্জ্জও কম করা হয়েছে। ফলে এগজিবিশনের সময় ফরাসীর চাইতে বেশী বিদেশীর ভিড় দেখা গেল প্যারিসে। সব চাইতে আমাদের পক্ষে যা দুঃখের কথা সেটি এই যে, সব জিনিসের দাম বেড়ে গেল। মায় ভ্যারাইটি থিয়েটারগুলোর পর্য্যন্ত। অবশ্য এর অন্য একটা কারণও ছিল। সেটা অর্থনীতির একটি জটিল সমস্যা বিষয়ক—ফ্রাঁর ডিভ্যালুয়েশন (ভগবান্ জানেন এ ব্যাপারটা কি)।

প্যারিস এগজিবিসন : বিঃয়-

মোদ্দা কথা এই যে, এগজিবিশনের নামে ফ্রান্সের কিছু পয়সা ঘরে এল। যারা এগজিবিশন দেখেছেন, তাঁরা অবিশ্য স্বীকার করবেন, যে-পয়সাটা তাঁদের খরচ হয়েছে, তার পূরো দাম সুদ শুদ্ধ উশুলও হয়েছে। মনে হয়, পয়সার রোজগারের ফন্দীতেই হোক আর যাতেই হোক, ইউরোপের সব জাতই কাজ করতে জানে। ফরাসীরা সত্যই এগজিবিশনটাকে একটা চিত্তহারী অপূর্ব্ব জিনিষ করে গড়ে তুলেছে।

ফরাসী জাত—তারা সব সময়েই সৌন্দর্য্যকে সৃষ্টি করছে, —অবশ্য তাদের রুচি অনুযায়ী এবং সেই সৌন্দর্য্যকে প্রাণপণে চাইছে উপভোগ করতে। তাই এগজিবিশনে একদিকে বিভিন্ন দেশের জিনিষে pavillion-গুলো ভরেই তারা ক্ষান্ত হয় নি, ওই বিরাট ব্যাপারকে রাত্রে একটি স্বপ্নপুরীর মত করবার জন্য আলোয় এবং ফোয়ারায়, সব বিষয়ে তারা কোন ত্রুটি করে নি।

এই জিনিসটা শুধু এই এগজিবিশনের মধ্যেই নয়—সমস্ত প্যারিসকে সব সময়েই রাত্রে যেন স্বপ্নরাজ্য বলে মনে হয়। লোকগুলোকেও দেখে মনে হয়, তারা সব সময়েই স্বপ্ন দেখছে এবং মহা আনন্দে আছে—ধীরে সুস্থে চলে, আর পথের ধারে বসে কফি বা মদ্য পান করে। আমাদের দেশে জল খাওয়া আর ওখানে মদ খাওয়া প্রায় একই ব্যাপার।

তথাপি জাতটা গরীব। কিন্তু তাতে ওদের কোন পরোয়া নেই। ভাবুক জাত। কিন্তু সমস্ত বিষয়েই একটা বৈপরীত্য দেখা যায়। একদিকে যেমন Louvre অত্যন্ত

উঁচুদরের ব্যাপার, অন্যদিকে তেমনই night club-এ জঘন্য হল্লা। বড়লোকদের মধ্যে যেমন বাবুয়ানী ও বনেদী চাল, গরীবদের মধ্যে তেমনই ছেঁড়া জামা-কাপড়ের ছড়াছড়ি—যেমন দারিদ্র্য এদেশেও নজরে পড়ে না। কিন্তু তথাপি ওখানে দেখলাম, সব স্তরের লোকই চাইছে জীবন উপভোগ করতে। হয়ত, গলির মোড়েই লোক-চলাচল বন্ধ করে একটা ছোট গোছের অরকেষ্ট্রা বসিয়ে ভিড় করে নলনাচ আরম্ভ করে দিল—অনেকটা আমাদের ছেলেবেলাকার রাস্তায় ইঁট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলার মত। দেখে শুনে মনে হল, এই কি ওদের liberte, egalite, fraternite?

প্রদর্শনীর আলোক সজ্জা।

G. K. C. ফরাসীদের সম্বন্ধে বলেছেন—The frenchman is the man in the street; he can dine in the street and die in the street.…

আমার ফরাসীদের ভাল লেগেছে। ইউরোপে বোধ হয় এই একটি মাত্র জাত আছে, যারা সবার সঙ্গে মিশতে পারে—কাল-সাদার বিচার করে না, এবং অপর জাতের লোক দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে, দেমাক দেখিয়ে চুপচাপ বসে থাকে না। বিদেশীদের ওরা অবশ্য যথাসাধ্য ঠকায়—কিন্তু পরিবর্ত্তে বিদেশীদের যথেষ্ট অত্যাচারও সহ্য করে। শুনেছি, Parisienরা আসল ফরাসীদের থেকে অন্যপ্রকার—তারা, অর্থাৎ গ্রামের লোকেরা, না কি ভারি সরল। সেটা অবশ্য বিশ্বাস করা কঠিন। তবে তাদের মধ্যে Parisienদের যথেচ্ছাচার নেই এবং মেয়েরা অনেকটা পর্দ্দানশীন। এখনও তাদের মধ্যে বিয়ের ঠিক-ঠাক বাপ-মায়েরাই করে থাকেন। G. B. S. বলেছেন, ফরাসী চিরকালই বাপের হাত ... রয়ে গেল। কথাটা হয়তো অনেক পরি... সত্য। কিন্তু এর মধ্যে লজ্জার কি আছে, তা ভারতীয় চিত্তেন বোধগম্য হয় না। আমার এক ফরাসী বন্ধু—নাম তার ভালত্যাঁ—সে বাপের সঙ্গে হস্তমর্দ্দনের বদলে গালে চুমু খেত। হাস্যাস্পদ—কিন্তু, ওরা সবাই তাই করে এবং মা-বাবাকে বেজায় ভয় করে।

খুব রসিক জাত এরা। যদিও আমাদের কাছে ওদের রসিকতা অশ্লীল বলে মনে হয়। ইউরোপীয় হিসেবে ঠিক অশ্লীল হয় তো নয়; কিন্তু রীতিমত 'ভালগার' যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওরে হাসির চোটে সেটুকু হয় তো কারও চোখে পড়ে না। আমাদের কিন্তু হাসির মধ্যেও ঐ কণ্টকটুকু সব সময়েই বিঁধত। মনে হত—ঠিক নয়, এ ঠিক নয়। এ কি ভারতীয় সংস্কার?

মোট কথা, এরা বেশ ভাল—ইংরাজদের সঙ্গে এবং জার্ম্মানদের সঙ্গে একটুও মেলে না, ইটালীয়দের সঙ্গে একটু মেলে। ইণ্টারন্যাশনাল পলিটিক্সের বড় বিশেষ কিছু খবর রাখি না, কিন্তু ফরাসীদের দেখে বুঝেছি, ইংরেজ হয়তো কৌশলে জার্ম্মান আর ইটালীয়ানদের সঙ্গে পলিটিক্সে মিতালী করে নিলেও নিতে পারে, ফরাসীরা কখনও তা পারবে না।

প্যারিস ঘুরে এসে ফরাসীজাতের সুপ্রসিদ্ধ nude on the stage সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আমার মনে হয়, ফ্রান্সের Folies Bergere, Casino de Paris ইত্যাদি ধরণের জিনিসগুলো দিয়ে ফরাসী জাতের চিত্তপ্রকৃতির বিচার করা যায় না, কেন না এই জাতীয় ভ্যারাইটি থিয়েটারগুলো সব বিদেশীর জন্য—বিদেশীরাই এদের পৃষ্ঠ

প্রাচীন চিত্র (অষ্টাদশভুজা ও হরগৌরী)।
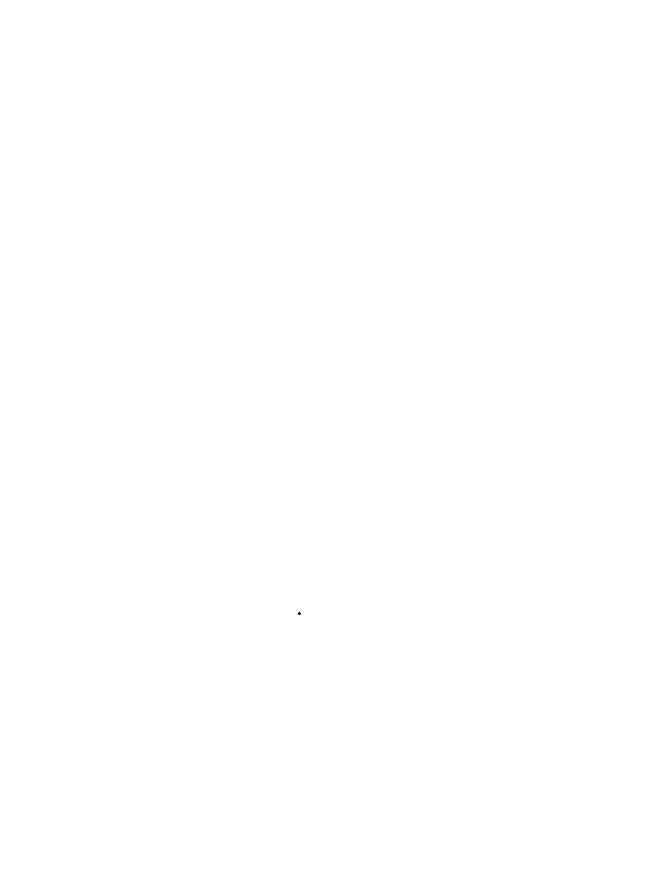
পোষাক। ফরাসীদের মধ্যে একটা ঠাট্টাই প্রচলিত আছে যে, যদি মার্কিন বা ইংরেজের (এখনও যে ভারতীয়দের এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নি কেন তা জানি না) সঙ্গে দেখা করতে চাও তো Folies Bergere-এ যাও। আমাদের ভাবলেও কেমন লাগবে, এই সব জায়গায় ষ্টেজের মেয়েরা কাপড় একেবারে পরে না—এই নগ্ন নৃত্যাদি সমস্ত জিনিসটার মধ্যেই না কি অত্যন্ত একটা artistic representation আছে! এই সব মেয়েরা কিন্তু Ecole des Beaux Arts-এর ছাত্রী!

আমার এক বন্ধুর মত, এই stage freedom জিনিসটা খুব ভাল—কেন না তিনি বলছেন, freedom জিনিসটা সব স্থানেই ভাল, যদি না তার অপব্যবহার ঘটে। তাঁর মত এই যে, যেমন মনে তেমনি দেহে, কোথাও hypocrisy জিনিসটা থাকা ঠিক নয়।

প্যারিস এগজিবিশন : ছায়াচিত্র প্যাভিলিয়ন।

বন্ধুটি ভারতীয় এবং এখনও মেমসাহেব বিবাহ করেন নি। লণ্ডনে মাস ছুয়েক আগে strip teasing (অর্থাৎ এই ষ্টেজের উপর পরিধানের বস্ত্র খুলে ফেলা) নিয়ে খুব হৈচৈ হয়। কোনও একটি বিখ্যাত মার্কিণ মহিলা (নাম মনে নেই) প্যালেডিয়াম থিয়েটারে এই strip teasing দেখান সম্বন্ধে সেন্সরের অনুমতি চেয়েছিলেন। আমেরিকার আর্টিষ্ট মহলে এই মহিলা অতি গুণী মেয়ে বলে খ্যাত এবং তাঁর strip teasingটা না কি শুধু strip teasingই নয়, তাঁর ভূমিকার অভিনয়ের একটা অপরিহার্য্য ও খুবই জরুরী অঙ্গ। ইংরাজ সেন্সার বললেন, ইংলণ্ডে ওসব জিনিস চলতে পারে না, ইংরেজ জাতি না কি 'বখে' হয়ে যাবেন। অথচ প্যারিসের Folies Bergere এবং night club-এ শতকরা ৫০ জনই ইংরেজ। প্রবাসে বোধ হয় ইংরেজ জাত গৃহের নিয়মকানুন কিছুই মানেন না। ভারতভূমিতে বিচরণকারী ইংরেজ জাতদের দেখেও তাই মনে হয়।

একটা কথা ভুললে চলবে না যে, এই যে strip teasing-এর প্যারিস, যে প্যারিস নাইট ক্লাবে ভর্ত্তি, সে প্যারিস ফরাসীদের প্যারিস নয়—ওগুলো বিদেশীদের জন্য। যেমন সমুদ্র-তীরের বন্দরগুলি, মার্সেই ও পোর্ট সৈয়দ—প্যারিসের এ দিকটাও তাই।

যা কিছু 'ভালগার' জিনিস আমি প্যারিসের ষ্টেজে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে, সে সবই আমাদের হাসাবার জন্য এবং আমরা, অর্থাৎ বিদেশীয়েরা সত্যি সত্যিই তা দেখে খুবই হাসি। সে-হাসি এমনই যে, অনেক সময়েই সত্য সত্যই ভারতীয় সংস্কার সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত vulgarity ব্যাকগ্রাউণ্ডে পড়ে যায়।
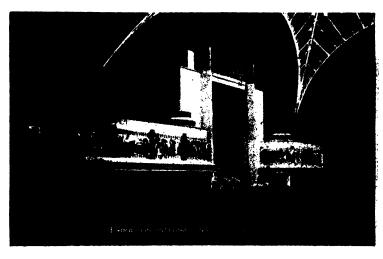
একদিকে যেমন এদের কুড়েমি দেখে মনটা খুশী হয়ে হয়ে ওঠে আমাদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য ভেবে, অন্য দিকে তেমনি দুঃখ হয়, কেন পারি না আমরা আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সমস্ত কিছু গৌরবকে ও ঐশ্বর্য্যকে ওদের মত আঁকড়িয়ে ধরতে? নিজের দেশকে, নিজেদের রীতিনীতিকে কি ভালই বাসে ওরা, কিন্তু তাই নিয়ে ঘরের কোণে ওরা বসেও নেই। বর্ত্তমান জগতের চিন্তাধারায় সব বিষয়েই

অল্প-বিস্তর ফরাসী ছাপ আছে—ফরাসী ঐতিহ্যের। তথাপি ওদের দৈনিক জীবন যাপনের ব্যাপার দেখলেই বোঝা যায়, ওরা আধুনিক বিজ্ঞানকেও যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েছে। প্যারিসের সমস্ত বাড়ীতেই সেণ্ট্রাল হিটিং, দরজায় অটোম্যাটিক কুলুপ এবং সাধারণত সব বিষয়েই অটোম্যাটিক ব্যাপার। সব চেয়ে চোখে পড়ে, প্যারিসের ট্রাফিক কণ্ট্রোল। মনে হয়, প্যারিসে পুলিস অত্যন্ত অলস, কিন্তু যদিও গাড়ীঘোড়া (সবই প্রায় ট্যাক্সি ও প্রাইভেট মোটর) প্রাণপণ বেগেই যায়, মজা এই যে, লণ্ডনের চাইতে প্যারিসে অনেক কম অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে থাকে ; এ বিষয়ে লণ্ডনের অত খরচ করা সত্ত্বেও। বাসগুলো দেখতে কদাকার, কিন্তু বিভীষণ রকমে কর্ম্মোপযোগী, খুব শীঘ্র যায় এবং দু এক মিনিট অন্তরই রাস্তায় বাস পাওয়া যায়। 'মেত্রো'ও অর্থাৎ টিউব রেলও তাই। ট্রামকে পুরাকালের ব্যাপার বলে ফরাসীরা বর্জ্জন করেছে।

করোনেশনের সময় ইংরাজী খবরের কাগজে ভীষণ লেখালেখি চলেছিল যে, যাঁরা অন্য দেশ হতে আসবেন, তাঁদের লণ্ডনে ধরে রাখতে পারা যায় কি করে? শুধু 'রোষ্ট বীফ' আর 'ইয়র্কসায়ার পুডিং' খাইয়ে? দ্রষ্টব্য কিছু না দেখতে পেয়ে অতিথিরা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত প্যারিসে পালিয়ে যাবেন, কারণ প্যারিসে সবই সস্তা,—যেমন খাওয়া-দাওয়া, তেমনই আমোদ-প্রমোদ, সবই অনেক সস্তা ও অনেক ভাল। কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকের পক্ষে লণ্ডনের কোনও নাইট-ক্লাবে যাওয়া অসম্ভব। তাই করোনেশনের সময় রব উঠল, মার্কিন অতিথিরা নাইটক্লাব না পেলে হতাশ হয়ে প্যারিসে চলে যাবেন। ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় ইংলণ্ডের করোনেশনের মরশুমে সব চাইতে লাভ করেছিল শেষ পর্য্যন্ত প্যারিস। অর্থাৎ, অর্দ্ধেক লোক যাঁরা এসেছিলেন প্যারিসের এগজিবিসন দেখতে, ইংলণ্ডের করোনেশনটা তাঁরা পথে দেখে গেলেন। বাকী অর্দ্ধেক যাঁরা এসেছিলেন ইংলণ্ডে করোনেশন দেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে, তাঁরাও শেষ পর্য্যন্ত পৌছলেন গিয়ে প্যারিসে এগজিবিসন দেখতে।

প্যারিস এগজিবিশন : বামে রুশ ও দক্ষিণে রুমানিয়ান প্যাভিলিয়ন।

বিদেশীদের পক্ষেও করোনেশনে দেখবার কিছু বিশেষ ছিল না। লণ্ডন সহরটাকে সাজাবার একটা চেষ্টা হয়েছিল এবং বুড়ো দাইকে হাল-ফ্যাসানের গাউন পরলে যেমন দেখতে হয়, তেমনি করোনেশনের সময় লণ্ডনকে একটু উজ্জ্বলও দেখতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! প্রোসেশন তো তিন ঘণ্টাতেই ফুরিয়ে গেল, কাজেই সমস্যা দাঁড়াল এই যে, বিদেশীরা করেন কি? তাঁরা তো আর বিদেশ থেকে অত খরচ করে মাত্র তিন ঘণ্টার দৃশ্য দেখতে আসেন নি! দেশের লোকের সঙ্গে মেশা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। সিনেমা, বায়স্কোপ আর কত চলে! মোট কথা, লণ্ডনের করোনেশন-অতিথিরা মত দিলেন, সময় কাটান লণ্ডনে চলে বেশ, কিন্তু সময়টাকে ভাল ভাবে উপভোগ করে কাটান এ সহরে বেশ শক্ত। বিশেষতঃ বিদেশীর পক্ষে।

করোনেশনের ব্যাপার আগাগোড়া দেখে আমার মনে

হয়েছিল, এই হৈ চৈ সত্ত্বেও করোনেশন আর আমাদের ধনী হিন্দুর বিয়ের ব্যাপারে বিশেষ তফাৎ নেই, দুটোই কেবলই অর্থহীন ritual-এ ভর্ত্তী। করোনেশন দেখছি, কি এক হিন্দু রাজার বিয়ে দেখছি তা ভুলে যেতে হয়। তারপরে যেমন আমাদের বিয়ে-বাড়ীর বর চলে গেলে সময় কাটানো দুষ্কর হয়ে পড়ে এবং বদহজমের ঢেকুর ওঠে, তেমনি। তাই যাঁরা এলেন, তাঁদের কেউ করোনেশনান্তে ছুটলেন কন্টিনেণ্টে, কেউ চলে গেলেন বাড়ী—স্বদেশ। ইংলণ্ডে 'কন্টিনেণ্টে' যাওয়াটা একটা আভিজাত্যের নিদর্শন!

সেদিন অবধি জার্ম্মেনী যাওয়াটাই খুব ফ্যাশান ছিল। কেন না এক পাউণ্ডে ২০-২৪ মার্ক (registered, অর্থাৎ যা কেবল বিদেশীদের জন্যই) পাওয়া যেত, কাজেই সব দেশের চাইতে জার্ম্মেনীতে যাওয়াটাই ছিল মোটের উপর ভীষণ সস্তা। এখন কিন্তু এক পাউণ্ডে ১৮-১৯ মার্ক, কাজেই ওখানে যাওয়াটা আর ফ্যাশান বোধ হয় থাকবে না। এবারে তো লণ্ডন-শুদ্ধ ভারতীয় যাকেই চিনি, সেই প্যারিসে চলেছে দেখে এলাম।

তারা অন্যায় করেনি কিছু। মোটের উপর বাধ্য হয়ে যদি কন্টিনেণ্টে যেতেই হয়, তবে ভারতীয় মাত্রেরই প্যারিস যাওয়া উচিত—যে-প্যারিসের কথা মনে হলেই ভারতীয় ছাত্র মাত্রেরই মনে পড়বে—

…Le secret de ton caresse
Dit moi d'amour
Toute la nuit
Tout le jour…

তোমারই সোহাগস্মৃতি প্রেমবার্ত্তা আনে বহি,
দিবস-রজনী…

ছলে বলে বা কৌশলে

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

ছলে বলে বা কৌশলে মানী জনে করা হতমান
কিংবা করা অপকার দেখাইয়া উপকার-ভাণ
বিপদে টানিয়া আনা আশ্বাসিয়া বাক্যে পরিত্রাণ
নিজ হাতে হত্যা করা নিজেরই সমূহ অকল্যাণ।

প্রকাশ্যে বন্ধুত্বভাব আড়ালে শত্রুতা আচরণ
অন্তর কৌটিল্যভরা বাহিরে সারল্য আবরণ
এ জগতে বিচরণ স্বেচ্ছায় ঘৃণ্য কারাবরণ
অশান্তি আক্ষেপ ভরা দুর্ব্বহ জীবন আমরণ।

মুখে ভক্তি উচ্ছ্বসিত সঙ্কুচিত শূন্য শক্ত প্রাণ
কথার দরদী, সুধু গরীবের করে রক্ত পান
মান বিনিময়ে নামে অর্থহীন ফাঁকা মস্ত দান
সখ সুধু শুনি সুখে দীন লোভাহত ভক্ত গান।
অধর্ম্ম ধর্ম্মের সাজে ধার্ম্মিকেরে করিয়া লাঞ্ছনা
জয়ী হবে কর্ম্মনাশা অপকর্ম্ম, কে করে বাঞ্ছনা ?

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তরঙ্গের চিঠিখানা অসমাপ্ত।

বেশ বোঝা যায়, তরঙ্গ আরও অনেক কথা লিখিয়াছিল, কিন্তু কে যেন চিঠির বাকী অংশ ছিঁড়িয়া লইয়াছে। খামটি খোলা ছিল কি বন্ধ ছিল, প্রথমে অনুপম লক্ষ্য করে নাই। এবার খামখানা একটু ভাল করিয়া দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, কে যেন অপটু হাতে জল দিয়া ভিজাইয়া খামটি খুলিয়াছিল, তারপর একান্ত অবহেলার সঙ্গে আবার বন্ধ করিয়াছে।

সীতা স্বীকার করিলেন, 'হ্যাঁ, আমি খুলেছিলাম চিঠিটা। কিছু মনে করছ না তো? কদিনে যা ভালবেসেছিলাম মেয়েটাকে অনু, না খুলে থাকতে পারলাম না।'

অনুপম বলিল, 'চিঠির শেষটা কোথায় গেল?'

সীতা নির্ব্বিবাদে বলিলেন, 'আমি ছিঁড়ে নিয়েছি।'

'কেন?'

'মরবার সময় ঝোঁকের মাথায় একটা মেয়ে যা তা লিখে রেখে গেছে, সকলকে কি তাই পড়তে দেওয়া যায়? তুমিই বল, যায়?'

'কিন্তু লিখে তো গিয়েছিল আমাকে? আমার চিঠি আপনি খুলে পড়লেন, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলেন না। তারপর আধার চিঠির অর্দ্ধেকটা রেখে দিলেন ছিঁড়ে। নিয়ে আসুন, কোথায় রেখেছেন।'

সীতা নির্ব্বিবাদে বলিলেন, 'সে কি আর আছে? সে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।'

তরঙ্গের মৃত্যুর আঘাতটাই খিলের মত এতক্ষণ অনুপমের মনের রাগটাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, এবার সে যেন রাগে দিশেহারা হইয়া গেল। ক্রোধের বশে মানুষ খুন করিবার আগে খুনী যে ভাবে তাকায়, তেমন দৃষ্টিতে সীতা পিসীমার দিকে চাহিয়া সে বলিল, 'পুড়িয়ে ফেলেছেন? ইয়ার্কি পেয়েছেন না কি আপনি, এঁ্যা?'

সীতা যে গুরুজন সে কথা ভুলিয়া একটা বিশ্রী গালও অনুপমের জিভের ডগায় আসিয়াছিল, কত কষ্টেই সে গালটা চাপিয়া রাখিল!

সীতা পিসীমার আজ ভাবান্তর আসিয়াছে। আজ তেমনি তিনি শান্ত, সহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী মহিলা,—কথায় ব্যবহারে কোন রকম পাগলামি নাই, বরং তরঙ্গের চিঠির শেষাংশ ছিঁড়িয়া লওয়ার জন্য অনুপম যে রাগারাগি করার মত ছেলেমানুষী পাগলামি আরম্ভ করিবে, অনেক দিন আগে হইতে, তরঙ্গের গলায় দড়ি দেওয়ারও আগে হইতে, তিনি যেন তাহা জানিতেন এবং অনুপমকে সামলাইবার ভারটাও তখন হইতেই তিনি গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছেন। ধীর স্থির গম্ভীর গলায় বলিলেন, 'ছেলেমানুষী করো না অনুপম। তরঙ্গ চিঠিখানা আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিল, ইচ্ছে করলে সমস্ত চিঠিটাই তো আমি তোমাকে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম? তাই ইচ্ছে ছিল আমার, নেহাৎ তরঙ্গের শেষ কথাটা একেবারে ঠেলতে পারলাম না বলে অর্দ্ধেকটা তোমায় দিয়েছি। হ্যাঁ অনুপম, তরঙ্গ যে এভাবে আমাদের ছেড়ে গেল তার চেয়ে তরঙ্গের চিঠির খানিকটা পড়তে পারলে না এটাই কি তোমার কাছে বড় হল?'

অনুপম ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, 'এমনি ভাবে ছেড়ে গেল বলেই তো চিঠির সবটা পড়বার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। কি লিখেছিল বাকীটাতে?'

'সে তোমার জেনে কাজ নেই।'

সীতাকে কোনমতেই বলান গেল না। পেটে কথা রাখা সীতার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু অনুপমকে চিঠির বাকী অংশে তরঙ্গ যে সব কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল সেই কথাগুলি তিনি বোধ হয় একেবারে বুকের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিলেন, ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিল না।

কেবল এইটুকু জানা গেল, তরঙ্গের বাকী কথাগুলি

ভাল নয়। নিজেকে আর জগৎশুদ্ধ মানুষকে সে বড় খারাপভাবে গালাগালি দিয়াছে। নিজের সম্বন্ধেও এমন কতগুলি কথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে—

'কি সেই কথাগুলি ?'

'আমি তা বলতে পারব না বাবু।'

তরঙ্গের প্রকৃতি যে স্বাভাবিক ছিল না, সীতা দয়া করিয়া অনুপমকে তার চিঠির যেটুকু অংশ দিয়াছিলেন, সেটুকু পড়িলেই তা বেশ বোঝা যায়। আরও অনেকের মাথাও যেন তরঙ্গ কম-বেশী খারাপ করিয়া দিয়া গেল। সকলের জীবনে এমন একটা সমস্যা, এমন একটা রহস্য, এমন একটা অভূতপূর্ব্ব প্রভাব সে বিস্তার করিয়াছিল যে, সকলের মনের তলে তলে তার নাটকীয় আত্মলোপের আঘাতটা যেন, তার কথা ভুলিয়া থাকিবার সময়েও, চোরের মত সিঁদ কাটিয়া বেড়াইতে লাগিল—সুখ শান্তি যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে কারও মনে, অপহরণ করিবে।

অন্য কারও মনে সুখ শান্তি থাক বা নাই থাক, অনুপমের মনে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল তরঙ্গ ? যে ধাঁধাঁ তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছে, তার কি মীমাংসা সে নিজেই দিয়া গিয়াছিল, সীতা পিসীমা যাহা আগুনে সঁপিয়া দিয়াছেন ? ক্রমে ক্রমে সীতা পিসীমার কথাই যেন সত্য হইয়া দাঁড়ায়, তরঙ্গ যে এ ভাবে তাহাদের ছাড়িয়া গিয়াছে, তার চেয়ে তরঙ্গের শেষ চিঠির শেষটা যে সে পড়িতে পারিল না, এটাই অনুপমের কাছে বড় হইয়া ওঠে। সীতা পিসীমার কাছে সে মিনতি করে, রাগারাগি করে, ভয় দেখায়, আবোল-তাবোল বকে—কিন্তু দেখা যায়, সীতা এ বিষয়ে বড় শক্ত।

'না আমি বলব না। কেন এ রকম করছ অনুপম ?'

'সবটা না হয়, আভাসে একটু বলুন ?'

'তাও বলব না।'

•

জহর কয়েকদিন ঝিমাইল। তরঙ্গ অনুপমকে চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে দেখিয়া হঠাৎ জহরের মনে প্রবল আঘাত লাগিয়াছে, তরঙ্গকে কিছুদিন হইতে তার ভাল লাগিতেছিল না,—তবু। সে থাকিতে অনুপমকে চি কেন ? তবে কি অনুপমের জন্যই তরঙ্গ তাকে অপমান করিয়াছিল ? সে থাকিতে অনুপমকে যখন চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে, তখন আর কি অর্থ হয় তরঙ্গের ব্যবহারের ?

মনটা যখন জহরের এই সব কথা ভাবিয়া অত্যন্ত খারাপ, একদিন লীলাময় ব্যস্তসমস্ত ভাবে আসিয়া বলিলেন, 'টাকা আছে জহর ? মিসেস সেন কিছু টাকা চাচ্ছেন।'

'মিসেস সেন কোথায় ?'

'সেইখানে। তোমাকেও যেতে বললেন।'

'কত টাকা চাচ্ছেন ?'

এমনভাবে জহর কথাটা জিজ্ঞাসা করিল, যেন টাকার ভাণ্ডার তাহার অফুরন্ত, যত চাও ততই পাইবে।

লীলাময় একগাল হাসিয়া বলিলেন, 'কিছু বেশী করেই নিয়ে যেতে বললেন, বললেন, বড্ড দরকার, সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবেন।'

সেই হোটেলের সেই ঘরে সেই আবহাওয়ায় সেই রকম আনন্দোচ্ছল মিসেস সেন বন্ধু-বান্ধবকে আমোদ যোগাইতেছিলেন। লীলাময়ের চোখের ইসারায় একটু আড়ালে আসিলেন।

জহর স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, 'কত টাকা চাই ?'

মিসেস সেন মধুর হাসিয়া বলিলেন, 'দরকার তো ছিল অনেক টাকার, তুমি কত দিতে পার তাই বল না !'

'এক শ'।'

'মোটে ? আচ্ছা, তাই দাও।'

জহর বলিল, 'আজ তো সঙ্গে নেই। কাল দেব।'

'কাল কখন ?'

'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একটা মিটিং আছে না কাল,—আপনিও তো লেকচার দেবেন দেখলাম খবরের কাগজে, দেবেন না ?'

মিসেস সেন মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলেন।

জহর বলিল, 'আমিও একটা লেকচার দেব ভাবছি। লেকচার দিয়ে আপনাকে টাকাটা দেব।'

শুনিয়া মিসেস সেন গম্ভীর মুখে লীলাময়ের দিকে চাহিলেন। লীলাময় অস্বস্তির সঙ্গে বলিলেন, 'কি বলবে না বলবে আগে থেকে ঠিক না করে এ রকম হঠাৎ লেকচার দেওয়া—'

জহর শান্ত ভাবেই বলিল, 'পাগলামি করব না, ভয় নেই। যা বলা চলে তাই বলব, আপনাদের লেকচারের দাম কমবে না। ও সব ছেলেমানুষী আমার কেটে গেছে।'

লীলাময় তবু বিপন্নভাবে বলিলেন, 'কালকের মিটিংটা থাক্ না? এর পরের মিটিংটাতে তোমায় যদি বলতে না দিই, তা হলে কি বলেছি। সেই ভাল হবে, কেমন? আগে থেকে খবরের কাগজে তোমার নাম বার করে দেব, যা বলবে পরদিন কাগজে সভার রিপোর্টে তারও খানিকটা—'

জহর বলিল, 'কেবল কথায় কি চিরকাল চিড়ে ভেজে লীলাময়বাবু! দিন না, এখুনি ফোন করে দিন না কাগজের আপিসে, আমার নামটা আপনাদের নামের সঙ্গে বক্তার লিষ্টে ছাপিয়ে দিতে। পরন্তু যদি মিটিং-এর রিপোর্টে আমার নামটাও যায়, আরও কিছু টাকা না হয় বেশীই দেব।'

মিসেস সেন আর লীলাময়ের চোখে চোখে কথা হইয়া গেল। মিসেস সেন জহরের বাহুমূল ধরিয়া আদরের আর আব্দারের সুরে বলিলেন, 'কেন এ রকম করছ জহর? কালকের মিটিংটা থাক না? এমন কত মিটিং হবে। আমি নিজে—'

কিন্তু জহর একটু পাথর বনিয়া গিয়াছে, তাকে কোন রকমেই দমান গেল না। ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। কেবল খবরের কাগজের আপিসে ফোন করিলেই চলে না, দলের আরও যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গেও একটু কথাবার্ত্তা হওয়া দরকার,—কাল যদি তাঁহারা দলের বাহিরের এক ছোকরাকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ছেলেখেলা করিতে দিতে আপত্তি করেন, যদি লীলাময়ের উপর সকলে চটিয়া যান?

চিন্তিত মুখে লীলাময় বলিলেন, 'বড় হাঙ্গামায় ফেললে। অনেকগুলো ফোন করতে হবে। এখানে তো মাগনা ফোন নেই।'

জহর মৃদু হাসিয়া বলিল, 'চলুন না ফোন করবেন, ফোনের পয়সা আমি দেব।'

মিসেস সেনও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'আর আজকের ফূর্ত্তির পয়সা?'

জহর বলিল, 'তাও দেব।'

পাকিয়া যেন একেবারে ঝানু হইয়া গিয়াছে জহর। নাম করার, বড় হওয়ার, প্রসিদ্ধি-লাভের সমস্ত কলা-কৌশল যেন তার নখদর্পণে। সে জানে, আরও অনেক কিছুই লীলাময়, মিসেস সেন আর তার সাঙ্গোপাঙ্গের পাবলিক লাইফ-এর পিছনে আছে,—আরও কদর্য্য, আরও কুৎসিত, আরও জটিল। কিন্তু এ কথাও সে জানে যে, যতটুকু জ্ঞান সে অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে, সেটুকু ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে আরও যত কিছু জানিবার আছে সবই সে জানিতে পারিবে এবং জানিতে পারিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবে নিজের প্রগতির উদ্দেশ্যে।

প্রগতি? ভাবপ্রবণ মন জহরের, মিসেস সেনের ঈষৎ-বিস্মিত দুষ্টামিভরা চাহনি ও হাসি, সাঙ্গপাঙ্গের বীভৎস রসিকতা এবং অতৃপ্ত ক্ষুধিত অন্তরকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য তিলে তিলে আত্মহত্যা,—সব একটা বিপরীত ভাব জাগাইয়া তোলে জহরের মনে,—গায়ের জোরে যে মনের ক্রিয়াকে এখানে সে ঘটাইয়া চলিয়াছে, প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যেন তার সময়ের ব্যবধান নাই, ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও মন জুড়িয়া দাপাদাপি করিতেছে এই কি প্রগতি? এক দিন না হয় সে নিজেকে করিয়া তুলিবে খ্যাতনামা, লোকে না হয় কয়েক মিনিট মনে রাখিবার জন্য সাগ্রহে তার কথা শুনিবে, কিন্তু কি হইবে সেই সাফল্যে? দামী পোষাক গায়ে দিবার জন্য সর্ব্বাঙ্গে কুৎসিত ব্যাধিই যদি তাকে সঞ্চয় করিতে হয়, কি করিবে সে দামী পোষাক দিয়া?

গভীর রাত্রে গভীর বেদনায় জহরের ঘুম আসে না। এখন শুধু প্রতিক্রিয়া চলিতেছে কি না, বিষাদটা তাই এত কটু। জীবনের রাজপথ খুঁজিয়া না পাইয়াও গলিঘুঁজি দিয়াই তো এতকাল সে খুসী মনে আগাইয়া আসিয়াছে, আজ শ্যাওলা-পিছিল নর্দ্দমা দিয়া হাঁটিবার সখ মিটাইতে

গিয়া একটি মাত্র আছাড় খাইয়াই যেন সর্ব্বাঙ্গে টনটনে বেদনা ধরিয়া গেল।

জহরের মা তরঙ্গের ব্যাপারটা লইয়া ক্ষেপিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া দিলেন। একেই একটু স্নায়বিক বিকার-গ্রস্ত মানুষ, সর্ব্বদা অস্বাভাবিকতার মধ্যে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছাটা চাপিয়া চলিতে চলিতেই তাহার প্রাণান্ত হয়, তার উপর এত বড় একটা সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। বিনা অসুখে কয়েক দিনের মধ্যে তিনি শীর্ণ হইয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিলেন,—রাগারাগি, চেঁচামেচি, গালাগালি আর মাথা-কপাল কোটা। এটা জহরের মার পক্ষে অভিনব। ভীরু, ভোঁতা, জীবনীশক্তির অভাব-গ্রস্তা অকালবৃদ্ধা মানুষ তিনি, তার পক্ষে এ রকম প্রচণ্ড উগ্রতা যেমন বেমানান, তেমনি ভীতিকর।

ডাক্তার ওষুধ দিলেন। কিন্তু ওষুধে কি হইবে? ওষুধের নেশায় জহরের মা কেবল মড়ার মত বিছানায় শুইয়া রাত্রিটা কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। ওষুধটা অবশ্য ঘুমের, জহরের মার মড়ার মত পড়িয়া থাকাটাও অবশ্য সকলে ঘুম বলিয়াই ধরিয়া লইলেন, কিন্তু প্রকৃতি দেবী যার নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছেন, কার ক্ষমতা আছে তাকে প্রকৃত নিদ্রা দান করিবে?

ডাক্তার বলিলেন,‘চেঞ্জে পাঠাতে পারলে মন্দ হত না। এ সব রোগীর পক্ষে সহরের গোলমাল বড় খারাপ—বেশ একটু শান্ত নির্জ্জন অ্যাটমস্‌ফিয়ারে—’

চেঞ্জের ব্যবস্থা হইল। নাম-করা একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে—যেখানে এত লোক এত রকমের ব্যারাম লইয়া চেঞ্জে যায় যে, স্থানটি হইয়া থাকে রোগের আড়ৎ আর রুগ্ন নরনারীর ভিড়ে সহরের মতই জনপূর্ণ।

জহরের মা বলিলেন, ‘আমি দেশে যাব। দেশের জন্য আমার মন কেমন করছে।’

বলিয়া বীরেশ্বরের পা ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বীরেশ্বর বলিলেন, ‘কেঁদো না মা, কেঁদো না, দেশে যাবার জন্য কাঁদবার কি হয়েছে? কালকেই আমরা দেশে রওনা হব।’

ডাক্তার এ প্রস্তাবে সায় দিলেন। বীরেশ্বর নিজে জহরের মা, সীতা আর জহরকে সঙ্গে করিয়া গেলেন দেশে।

দিন তিনেকের জন্য জহর অসুস্থা জননীর সঙ্গে দেশে গেল। একটা সভায় তার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, কিন্তু কি আর করা যায়, মার জন্য এটুকু ত্যাগ স্বীকার না করিলে চলে না। ছেলেকে ছাড়িয়া দেশে যাইতে জহরের মা কিছুতেই রাজী হইলেন না, কাঁদিয়া দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া ভয়ানক ব্যাপার আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এবং ছেলের সঙ্গে দেশে যাওয়ামাত্র হইয়া গেলেন জড় পদার্থের মত শান্ত ও নির্জ্জীব। দেশের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে অনেককাল আগে একবার যে সলজ্জ নম্রতার সঙ্গে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন, এতকাল পরে আবার সেই বাড়ীতে সেই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া প্রথম বধূজীবনের সরমস্নিগ্ধ নম্রতাই যেন নির্জ্জীবতায় রূপান্তরিত হইয়া তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দেশ দেখিয়া জহর কিন্তু পাইল আঘাত।

গ্রাম জহর দেখিয়াছে। ছেলেবেলায় এই গ্রামেও কয়েকবার সে আসিয়াছিল, ঝাপসা মনেও যেন আছে। তা ছাড়া, সহরতলীর গ্রামে কতবার সে বেড়াইতে গিয়াছে, ট্রেণে কোথাও যাওয়ার সময় দু’দিকে কত অফুরন্ত গ্রাম তার নজরে পড়িয়াছে, গ্রাম সম্বন্ধে কত বই সে পড়িয়াছে।

কিন্তু এ কি গ্রাম! পথ-ঘাট বাড়ী-ঘর বন-জঙ্গল ডোবা-পুকুর এ সব কিছুই মনের মধ্যে গ্রামের যে ছবিটি আছে তার সঙ্গে মেলে না, মানুষগুলি মনের মধ্যে গ্রামের যে মানুষগুলি বাস করে তাদের স্বজাতি নয়, গ্রাম্য জীবনের যে রোমান্টিক কল্পনা মনের মধ্যে এত কাল যত্নে পোষণ করিয়াছে, এই গ্রামের গ্রাম্য-জীবনের সঙ্গে তার পার্থক্য যেন কবিতার বই আর খবরের কাগজের।

বরং সহরের সঙ্গে এক বিষয়ে এ গ্রামের মিল আছে। এখানেও মানুষ তরঙ্গের মত আত্মহত্যা করে।

তরঙ্গের বয়সী একটি বৌ, তবে তরঙ্গের মত রূপসীও নয়, স্বাস্থ্যবতীও নয়। বাড়ীর সম্মুখে জঙ্গল, বাড়ীর পিছনে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের মতই রুগ্ন ধানের ক্ষেতে স্বাস্থ্যহীন ধান গাছ, ডাইনে আমবাগান, বাঁয়ে প্রতিবেশীর বাড়ীর চার ভিটার চারখানা পড়’ পড়’ ঘরের মধ্যে একখানা ঘর কবে পড়িয়া গিয়াছে আর তোলা হয় নাই। এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেদের প্রকাণ্ড জীর্ণ গৃহের গোয়াল-ঘরটিতে বৌটি তরঙ্গকে অনুকরণ করিয়াছে।

গোয়াল-ঘরে আজ যে অনেক কাল ধরিয়া গরু বাস করে না, সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। এ বাড়ীর লোক দুধ খায় না। এমন কি, গোয়ালঘরের সম্মুখে একজন বয়স্কা রমণীর কোলে পাঁচ ছ’ মাসের যে কাঠির মত ক্ষীণ খোকাটি ক্ষীণস্বরে কাঁদিতেছে, সেও খায় না। কোথায় পাইবে? গোয়াল-ঘরে দড়িতে তার যে কঙ্কালসার জননী ঝুলিতেছে, তার শুষ্ক, আলগা চামড়ার মত স্তন দুটিতে দুধ থাকা সম্ভব নয়। (ক্রমশঃ)

৺প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ

গত ৫ই আশ্বিন বেলা প্রায় ১১ ঘটিকায় কাশীধামে কোটালীপাড়ার খ্যাতনামা বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়া পরগণার অন্তর্গত হরিণহাটী গ্রামে ১২৭৩ সনে কার্ত্তিকমাসে তাঁহার জন্ম হয়।

৺প্রসন্নকুমার বেদান্ততীর্থ।
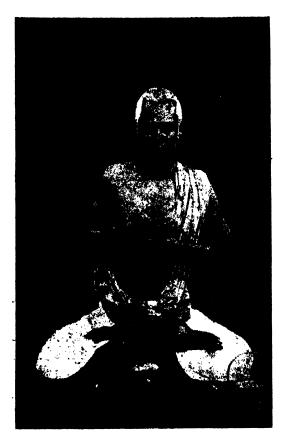
১১ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। তদবধি ১৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার ভাগ্যে পড়াশুনা ঘটে নাই। ১৭ বৎসর বয়সে পাঠ আরম্ভ করিয়া ২১ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি কাব্যতীর্থ উপাধি লাভ করেন এবং পর পর নবদ্বীপ ও সারস্বত সমাজের ব্যাকরণের উপাধিও অর্জ্জন করেন। প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা তাঁহার এমন আয়ত্ত হইয়াছিল যে, মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে তিনি প্রকাশ্য সভায় সংস্কৃত শ্লোকে এক ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতা দান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ২১ বৎসর বয়সে তাঁহার আজীবনের সাধনা বেদান্তপাঠের সূচনা। ২৯ বৎসরে তিনি বেদান্ততীর্থ উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে সাংখ্য, পাতঞ্জল, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি ইত্যাদিও পাঠ করেন। এই ন্যায় পাঠ করিবার সময়েই তাঁহার আত্মজিজ্ঞাসা জন্মায়। পরবর্ত্তী কালে ইহাই তাঁহাকে বহু রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল এবং আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কবিতা তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার অধিকাংশ কবিতাই সংস্কৃতে রচিত হইলেও বহু বাঙ্গলা কবিতাও তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ছয়টী দর্শনের প্রত্যেক দর্শন, বেদ, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতি সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত রচনা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী তাঁহার ঐ ঐ বিষয়ক গভীর চিন্তার নিদর্শন।

তাঁহার রচনা সর্ব্বসমেত সর্ব্ববিষয়ে প্রায় ৭ হাজার পৃষ্ঠায় আবদ্ধ। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা বেদান্ত সম্বন্ধে। তিনি শাঙ্কর-ভাষ্যের টীকা, অনুবাদ ও স্বতন্ত্র একখানি ভাষ্য (সরলবোধিনী) লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত ছিল এই যে, যতদিন না মানুষের অন্নাভাব দূর হইবে, ততদিন বেদান্ত বুঝিবার উপযোগী বুদ্ধিরও উন্মেষ হইবে না। অন্নাভাবক্লিষ্ট নরনারীর মধ্যে বেদান্তপ্রচার সম্ভব নহে, তাই বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থ প্রকাশের তিনি বিরুদ্ধ ছিলেন।

শেষ বয়সে তিনি দিনের প্রায় ১১ ঘণ্টা কাল অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। ২১ বৎসর বয়স হইতে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা কাল অধ্যয়নে অতিবাহিত হয় নাই, এমন দিন তাঁহার জীবনে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সমস্ত কাজে ঘড়ীর ন্যায় শৃঙ্খলা ছিল। সময়ের অপব্যবহার তিনি কখনও করেন নাই। তাঁহার লাইব্রেরীর সর্ব্ববিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা সহস্রাধিক এবং ইহার প্রত্যেকখানি তিনি যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

জীবনের প্রারম্ভেই ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। বাল্যবিবাহের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২০ সনে ডিসেম্বর মাসে তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে। তাহার পর এই ১৭ বৎসর ধরিয়া তিনি প্রায়শঃ কাশীধামে লিখনে-পঠনে নিমগ্ন ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই সময়ে দিনের অধিকাংশ কালই তাঁহার অধ্যয়নে অতিবাহিত হইত। যে সামান্য অবসর মিলিত, তাহা হোমিওপ্যাথী ও আয়ুর্ব্বেদের চর্চ্চায় কাটাইতেন

আত্মপ্রচার, পর-চর্চ্চা, খেলাধূলা ও খোস-গল্পে সময়াতিবাহিত করা তিনি সর্ব্বদাই নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতেন।

প্রাচীন রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণেতর কাহাকেও শিষ্য অথবা যজমানরূপে গ্রহণ করা, অথবা কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ দান অথবা চাঁদা গ্রহণ করা তিনি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন।

এদেশে ইংরাজীয়ানা চালু হইবার পূর্ব্বে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, তাঁহার জীবনের অনেক কার্য্যে সেই সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিব। বেদান্ততীর্থ হইবার পর দক্ষিণ-কলিকাতায় কোন সুপ্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীর অধ্যক্ষতার নিমিত্ত তিনি মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণত্বে (ভৃতকাধ্যাপকত্বে) তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি সেই পদ গ্রহণ করেন নাই। আজিকার দাসত্বজীবী ব্রাহ্মণের নিকট দেশের প্রাচীন সংস্কৃতির এই আদর্শ লুপ্তপ্রায়। তাঁহার মতে ভারতীয় ঋষিগণের কৃষ্টি একদিন সমগ্র মানব-সমাজের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিল। নিবন্ধকারগণের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ ব্যাখ্যায় ঐ কৃষ্টি বিকলাঙ্গ হইয়াছে এবং তাহার ফলে সর্ব্বত্রই পুনরায় দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখা দিয়াছে। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজে যুক্তিহীন যে সমস্ত গোঁড়ামী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ পূর্ব্বোক্ত নিবন্ধকারগণের ভ্রমাত্মক কু-ব্যাখ্যার পরিণাম। ঋষিগণের শাস্ত্রে যুক্তিহীনতা পরিলক্ষিত হয় না, ইহাও তাঁহার অন্যতম কথা।

জীবনে তাঁহার শেষ কামনা ছিল কাশীতে দেহরক্ষা। সে কামনা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। জীবনের শেষমুহূর্ত্তেও বিশ্বনাথের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে মণিকর্ণিকায় বিশ্বনাথের ক্ষেত্রে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাসের অবসান ঘটিয়াছে।

মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা, আটটি পৌত্র, ছয়টি পৌত্রী এবং আটটি দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য বঙ্গগৌরব বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ইত্যাদি বহু শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠান ও "বঙ্গশ্রী"র অন্যতম পরিচালক; মধ্যম শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ব্যবহারাজীব; কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজার।

আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে অন্তরোত্থিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি

সার্থকতা

—শ্রীকালিদাস রায়

সাধনা-শৌর্য্যের বলে বিশ্বে যারা লভেছে বিজয়
তাহাদের স্মৃতি পূজে বর্ষে বর্ষে জাতীয় উৎসব,
তাহাদের জয়গানে ইতিহাস কভু ক্লান্ত নয়,
মূর্ত্তিচূড়া স্মৃতিস্তম্ভে উদ্‌ঘোষিত তাদের গৌরব।
আর যারা বিন্দু বিন্দু করিয়াছে বক্ষোরক্ত পাত,
সমস্ত জীবনখানি সাধনায় করেছে অর্পণ,
সাফল্য করেনি লাভ, তবু তারা মর্ম্মে দিবারাত
পুষিয়া রেখেছে ব্রত, শাবকেরে কুলায় যেমন ;
লুপ্ত কি তাদের স্মৃতি ? লাঞ্ছনায় লোক-গঞ্জনায়
হয়ত কাটিয়া গেছে তাহাদের ব্যথার্ত্ত জীবন,
হয়ত তাদেরে কেহ চিনে নাই মোহবশে হায়,
অপূর্ণ ফেলিয়া ব্রত মৃত্যুদণ্ড করেছে গ্রহণ।
তাদেরে কি ভোলা যায় ? তারাই ত অন্তরঙ্গ জন,
মানবজাতির গূঢ় মর্ম্মস্থলে তারা করে বাস,
অন্তরের প্রীতিরসে আছে তারা গোপনে মগন,
সর্ব্ব ব্যর্থতার মাঝে তাহাদেরই শুনি দীর্ঘশ্বাস।
সর্ব্ব অবিচার মাঝে তারা আজো কাঁদিয়া কাঁদায়,
তাহাদের লাঞ্ছনার প্রায়শ্চিত্ত করে বিশ্বলোক,
শত শত কাব্য-নাট্যে তাহাদের ব্যথা রূপ পায়,
বিশ্ব ভরি শ্লোকরূপ ধরে আজি তাহাদের শোক।
সেই শোকে যুগে যুগে বিশ্ববাণী করে অশ্রুপাত,
তায় পুণ্য অভিষেক লভি' তারা হয়েছে দেবতা,
তাদের বেদনা নব-সাধনার করে সুপ্রভাত,
অপূর্ণ তাদের ব্রত বিশ্বচিত্তে লভেছে পূর্ণতা।
কর্ম্মে অধিকার জেনে সঁপে গেছে কর্ম্মফলচয়,
বিশ্বনর ব্রহ্মে তারা, বৈশ্বানরে আহুতির মত,
নিঃস্ব নর ছিল তারা, হইয়াছে বিশ্বনরময়,
সার্ব্বভৌম হইয়াছে তাহাদের জীবনের ব্রত।

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা এবং ভারতবর্ষের জাগরণ

শিক্ষা ও সভ্যতার যে আধুনিকতা সম্বন্ধে এই সন্দর্ভে আমরা আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহা গত আড়াই হাজার বৎসরব্যাপী। আজকালকার পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা "ক্লাসিক্যাল" ও "মডার্ণ" এই দুইটি শব্দ ব্যবহারে সর্ব্বদা অভ্যস্ত, তাঁহাদের মতে "মডার্ণ টাইম" যে কত বৎসরব্যাপী, তাহার কোন সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। কালের বিভাগ তাঁহারা যে চশমায় দেখিয়া থাকেন, সেই চশমার দ্বারা আমাদের কথা সঠিক ভাবে বুঝা যাইবে না। আমরা যাঁহাদের সেবক, তাহাদের মতানুসারে প্রতি বার হাজার বৎসরে এক একটি যুগ-সমন্বয়ে সম্পূর্ণতা সাধিত হইয়া থাকে।

এই বার হাজার বৎসরের প্রথম দুই হাজার বৎসর মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া নির্ভুল ভাবে বিদ্যমান থাকে এবং মানুষ সর্ব্বতোভাবে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উপভোগ করিতে পারে।

পরবর্ত্তী আড়াই হাজার বৎসর মানুষের কর্ম্মশক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং তাহার ফলে মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় ঔদাসীন্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। মানুষের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তখনও পূর্ব্ববর্ত্তী দুই হাজার বৎসরের সংগঠনের ফলে উহা সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয় না এবং সর্ব্বত্রই মানুষ অধিকাংশ পরিমাণে সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যসুখ উপভোগ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত সাড়ে চার হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী পাঁচ হাজার বৎসরে মানুষের আলস্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তখন মানুষের প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়া থাকে। এই সময়ে মনুষ্যসমাজে প্রায় সর্ব্বত্রই শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য দেখা দেয় এবং স্থানে স্থানে আর্থিক অভাবের উৎপত্তি ঘটিতে আরম্ভ করে।

শেষবর্ত্তী আড়াই হাজার বৎসরে, মনুষ্যসমাজে শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য এবং আর্থিক অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং মানুষ দুঃখ-কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে মানুষের আলস্য ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে বটে এবং কাল-শক্তিবশতঃ মনুষ্য-সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানঅনুশীলনের প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু মানুষ প্রায়শঃ অভিমানগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই অভিমানের ফলে মানুষের পক্ষে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং এই কালে মানুষ সর্ব্ববিধ স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ অভাব-বশতঃ জর্জ্জরিত হইতে থাকে। এই কালের শেষভাগে সর্ব্ব-বিধ স্বাস্থ্যের চরম দুর্গতিবশতঃ মানুষের অভিমান, মোহান্ধতা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখন আবার মানুষ তাহার প্রথম কালের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয়।

বরাহমিহিরপ্রণীত বৃহৎসংহিতা, হোরাশাস্ত্র, পঞ্চ-সিদ্ধান্তিক যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত কাল-বিজ্ঞানের তাৎপর্য্য ও বৈজ্ঞানিকতা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও ভূমণ্ডলমধ্যস্থিত ব্যবধান যে প্রতিনিয়ত পরি-বর্ত্তিত হইতেছে এবং তন্নিবন্ধন কালও যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রূপ অবলম্বন করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের কতকগুলি মন্ত্রে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হয়

এবং তখন উপরোক্ত কালবিভাগ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

ভারতীয় ঋষিগণের কাল-বিভাগসম্বন্ধীয় উপদেশগুলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে আমরা শেষবর্ত্তী আড়াই হাজার বৎসরের শেষভাগে উপনীত হইয়াছি।

ইহারই জন্য গত আড়াই হাজার বৎসরকে আমরা "আধুনিক" কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি। ভারতীয় ঋষি-গণের উপদেশানুসারে এই আড়াই হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ হাজার বৎসরকে "মধ্যবর্ত্তী কাল" এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সাড়ে চার হাজার বৎসরকে "প্রাচীন কাল" বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে।

আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, প্রাচীন ও মধ্যবর্ত্তী কালের শিক্ষা ও সভ্যতা যে স্তরে বিদ্যমান ছিল, তাহার তুলনায় উহা বর্ত্তমান কালে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং শিক্ষিত ও সভ্য সম্প্রদায়ের সংখ্যাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। সংক্ষেপতঃ, ইহাঁদের মতে শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ আবার উত্তরোত্তর শিক্ষার বিস্তৃতিও ঘটিতেছে।

আমরা এই সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করিয়া থাকি, তাহার অনেকাংশই উপরোক্ত মতবাদের বিপরীত।

আমরা যে পাঁচ হাজার বৎসরকে মধ্যবর্ত্তী কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান কালে মনুষ্যসমাজে শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টা কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে—ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা ও সভ্যতা বলা যাইতে পারে, তাহা একমাত্র উপরোক্ত প্রাচীন কালেই সর্ব্বতোভাবে ও সম্পূর্ণ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং এমন কি উহা উপরোক্ত মধ্যবর্ত্তী কালেও যাদৃশ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাদৃশ পরিমাণে এখন আর বিদ্যমান নাই। অধুনা মানুষ যাহাকে শিক্ষা বলিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকপক্ষে কু-শিক্ষা এবং যাহাকে সভ্যতা বলিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিক-পক্ষে কপটতা ও কলহপ্রিয়তায় পরিণত হইয়াছে।

"ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে", এই সনাতন বাক্য স্মরণ করিলেই আমাদের মতবাদ যে ভ্রমহীন এবং আমাদের বিরুদ্ধবাদিগণের মতবাদ যে ভ্রম-পরিপূর্ণ, তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের শিক্ষা ও সভ্যতা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে অথবা উচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সাক্ষ্য মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য ও অভাবে, শারীরিক স্বাস্থ্যে ও অস্বাস্থ্যে, মানসিক শান্তিতে ও অশান্তিতে।

আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে যে মানুষ মোহান্ধতা পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষিত হইবার এবং কলহপ্রিয়তা পরিত্যাগ করিয়া সভ্য হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহা বলাই বাহুল্য। অথচ, কোন কালে যদি দেখা যায় যে, এই কালে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের তুলনায় একদিকে যেরূপ আর্থিক অপ্রাচুর্য্য, শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, সেইরূপ আবার মোহান্ধতা এবং কলহ-প্রিয়তাও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে শিক্ষা ও সভ্যতা যে বাস্তবিক পক্ষে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা কি যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতে হইবে না?

সোনার পাথরের বাটী অথবা চতুষ্কোণ-যুক্ত গোলকের কথা (angular circle) লোকসমাজে যেরূপ উপহাসযোগ্য, সেইরূপ সুশিক্ষা ও সভ্যতার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও মানুষের আর্থিক অভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, এতাদৃশ কথাও উপহাস-যোগ্য।

কোন বাটী স্বর্ণের দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহাকে যেরূপ পাথরের বাটী বলা চলে না, কোন ক্ষেত্র চতুষ্কোণযুক্ত হইলে তাহা যেরূপ গোলাকার হইতে পারে না, সেইরূপ সুশিক্ষা ও প্রকৃত সভ্যতা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের আর্থিক অভাব অথবা শারীরিক অস্বাস্থ্য অথবা মানসিক অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

"ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে", এই সনাতন বাক্যানুসারে মনুষ্য-সমাজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিলে বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা যে ক্রমশঃই নিকৃষ্টতা লাভ করিতেছে, তাহা যেরূপ মোটামুটিভাবে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ আবার শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, মানুষ কেন শিক্ষা ও সভ্যতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াসী হইয়া থাকে তাহা স্থির করিয়া, জগতের কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এমন

কি বোলপুরের বিশ্ববিমোহন কার্য্যালয় ও বারাণসীর হিন্দুত্ব অথবা ভারতীয়ত্ব-বিনাশন যন্ত্রালয় পর্য্যন্ত) কি প্রণালীতে কোন্ বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে এবং League of Nations Brotherhood ও Manhood and Drinking Societies, Science, Engineering ও Philosophical, Economical and Youths Association প্রভৃতি সভ্যতার আখড়াগুলিতে কোন্ শ্রেণীর সভ্যতার আখড়াই দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রায় প্রত্যেক আখড়াটি প্রায়শঃ যৌন অসভ্যতা, চরিত্রহীনতা, কলহপ্রিয়তা, অভিমানগ্রস্ততা ও দ্বেষ-হিংসার দ্যোতকতার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা সপ্রমাণিত করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রধানতঃ, উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষা ও সভ্যতার আখড়াসমূহের সভ্যগিরি লইয়া আধুনিক বিশেষজ্ঞগণের বিশেষজ্ঞতা এবং নামের পশ্চাতে অথবা অগ্রে যে উপনামসমূহ ব্যবহৃত হয়, তাহার মাত্রা লইয়াই ঐ বিশেষজ্ঞতার মাত্রা নির্ণীত হইয়া থাকে। কাযেই প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়টি যে প্রায়শঃ কু-বিদ্যার উৎস হইতে অ-বিদ্যার লীলাভূমিতে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং প্রত্যেক সভ্যতার আখড়াটি যে প্রায়শঃ কলহ-প্রিয়তার আকর হইতে অসভ্যতার বিচরণভূমিরূপে পর্য্যবসিত হইতে বসিয়াছে, তাহা ঐ বিশেষজ্ঞগণের পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নহে, কারণ যাহা লইয়া তাঁহাদের জারিজুরী, তাহার এতাদৃশ অসারত্ব প্রতিপন্ন হইলে তাঁহাদের পক্ষে সমাজের নিকট হইতে বিশেষজ্ঞতার সম্মান দাবী করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ বিলুপ্ত হইয়া যায়। অথচ, ইহাঁরাই আমাদের ভাগ্যবিধাতা।

শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে মানুষের যেরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ভারতের জাগরণ সম্বন্ধেও আমরা ঠিক একই রকমের গোলকধাঁধায় নিপতিত হইয়া পড়িয়াছি।

কুশিক্ষা ও অসভ্যতা যেরূপ আধুনিক মনুষ্য-সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে প্রচলন লাভ করিয়া মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সক্ষম হইতেছে, ভারতবাসীর রাজনৈতিক গুরুগণের মোহান্ধতাও ঠিক একই ভাবে জাগরণ নামে আখ্যাত হইয়া সন্ন্যাসী সদৃশ ভারতবাসী কৃষক ও জনসাধারণের অবস্থা ক্রমশঃই দীন হইতে দীনতর করিয়া তুলিতে পারিতেছে।

সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে, ভারতবাসিগণের মধ্যে গত পঞ্চাশ বৎসর হইতে একটা রাজনৈতিক জাগরণ দেখা দিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতার উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যেরূপ বিপরীত মতবাদ পোষণ করিয়া থাকি, ভারতের জাগরণ সম্বন্ধে আমাদের মতবাদও প্রায় একই রকমের বিপরীত।

মানুষ যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, তখন তাহার সদসৎ সম্বন্ধে চিন্তাশক্তি ফিরিয়া আসে, ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিমূলক কার্য্যে প্রযত্নশীল হয় এবং তাহার কোন কার্য্য সফল আর কোন কার্য্য বা বিফল হইয়া থাকে। নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে একদিকে যেরূপ ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি সম্বন্ধে মানুষ সর্ব্বতোভাবে চিন্তাহীন ও কর্ম্মহীন থাকিতে পারে না, অন্যদিকে আবার তাহার ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি না হইয়া ক্রমাগত উহার বৃদ্ধি হওয়া অথবা তাহার কার্য্যে ত্রিবিধ অভাবের (অর্থ, স্বাস্থ্য ও শান্তির) অন্ততঃ পক্ষে সাময়িক ভাবেও কথঞ্চিৎ উপশম না হইয়া সর্ব্বদাই উহার বিবর্দ্ধমানতা বিদ্যমান থাকা সম্ভব হয় না।

ব্যক্তিগত নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে যেরূপ সর্ব্বপ্রথমে ব্যক্তিগত ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিমূলক কার্য্যের চিন্তা ও প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়া থাকে এবং কোন কোন চেষ্টা সফল এবং কোন কোন চেষ্টা বিফল হইয়া থাকে, সেইরূপ কোন দেশে জাতীয় জাগরণের সূচনা হইলেও সর্ব্বপ্রথমে ঐ দেশের জনসাধারণের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তিমূলক কার্য্যের চিন্তা ও প্রচেষ্টা আরম্ভ হওয়া এবং কোন না কোন চেষ্টায় অন্ততঃপক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাফল্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। জাতীয় জাগরণের উপরোক্ত সূত্র মানিয়া লইলে, কোন দেশের যখন জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হয়, তখন যে ঐ দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সর্ব্বতোভাবে কেবলমাত্র বৃদ্ধিই পাইতে পারে না—পরন্তু কখন কখন বা ত্রিবিধ অভাবের হ্রাস এবং কখন কখন বা তাহার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

গত পঞ্চাশ বৎসরে ভারতবর্ষ কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ভারতবাসিগণের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসা-প্রপীড়িত লোকের সংখ্যা ক্রমিক বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা

কখনও বৃদ্ধি এবং কখনও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, শুধু গত পঞ্চাশ বৎসর কেন, আরও কতিপয় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ভারতবাসী জনসাধারণের ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে এবং তাহা কখনও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। এতাদৃশ অবস্থা লক্ষ্য করিলে ভারতবর্ষে যে কোন প্রকৃত জাগরণ উপস্থিত হয় নাই, তাহা যুক্তিযুক্তভাবে স্বীকার করিতে হয় না কি?

ভারতীয় কংগ্রেসের যে আন্দোলন দেখিয়া ভারতে প্রকৃত জাগরণ আসিয়াছে বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হয়, সে আন্দোলন পূর্ব্বাপর বিশদ ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ প্রায়শঃ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলেও উহাঁরা ভাবতঃ পাশ্চাত্ত্যদেশীয়। ঐ সঙ্করভাবাপন্ন মানুষগুলির আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্ত্যানুকরণ-প্রসূত। তাহাতে কোন রকমের ঐকান্তিকতা অথবা মূক জনসাধারণের ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির কোন রকম প্রযত্নের বিন্দুমাত্র সাক্ষ্যও পরিলক্ষিত হইবে না।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, নেতৃত্বাসনে সমাবিষ্ট এতাদৃশ ভাবসঙ্কর মানুষগুলির প্ররোচনায় সহস্র সহস্র নিরীহ যুবক নিজদিগের বলিদান-কার্য্য সমাধান করিয়াছে এবং সহস্র অনাথিনী মাতা ও ভার্য্যাকে মর্ম্মন্তুদভাবে দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়াছে। এই নিরীহ যুবকগণের আত্মাহুতি দেখিলে বিস্ময়ের সহিত সত্যই বুঝি জাগরণ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিতে হয় বটে, কিন্তু নেতৃত্বাসনে কতকগুলি অন্ধ অনুকরণ-প্রিয় মনুষ্যত্বহীন যাত্রার দলের রাজার মত ভাবসঙ্কর মানুষ সমাবিষ্ট থাকায় দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে, পরন্তু ক্ষুৎপিপাসা-প্রপীড়ণের মাত্রা ও তৎপ্রপীড়িতের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণে অনেকে হয়ত আশার আলোকে উৎফুল্ল হইয়াছেন, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে তাঁহারা যে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়া পড়িবেন, ইহা মনে করিবার কারণ আছে।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণে যদি জনসাধারণের কোন সুফল লাভ করিবার আশা থাকিত, তাহা হইলে ঐ মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যে রাজবন্দিগণের সংখ্যা দেশের সমগ্র লোকসংখ্যার শতকরা একজনের সাত সহস্র অংশের অপেক্ষাও কম এবং রাজবন্দিগণ সম্বন্ধে যাদৃশ আলোচনায় দেশের মধ্যে দলাদলির বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সেই রাজবন্দিগণের তাদৃশ আলোচনায় দেশের যুবক-যুবতীগণকে এতাদৃশভাবে মাতাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টা দেখা যাইত না।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণে জনসাধারণের দুঃখ-লাঘবের যদি বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে যিনি নিজেকে দেশের শতকরা ৭০ জনের প্রতিনিধি বলিয়া জাহির করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন না, সেই গান্ধীজী ঐ মন্ত্রিত্বগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সেক্রেটারী প্রভৃতি লইয়া সমারোহের সহিত দিল্লী যাত্রা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন।

জন-সাধারণের ক্ষুৎপিপাসার জ্বালা দূর করিতে হইলে যে-শ্রেণীর মস্তিষ্কের ও ভারতীয়তার প্রয়োজন, সেই শ্রেণীর মস্তিষ্ক ও ভারতীয়তা যে গান্ধীজী প্রভৃতি কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মধ্যে কাহারও নাই, তাহা ইঁহাদের যে-কোন বক্তৃতা অথবা বাণী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আমাদের কথা যে সত্য, তাহা এখনও মানুষ প্রায়শঃ বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে ঐ সত্যতা আপনা হইতেই পরিস্ফুট হইবে।

আমরা এখনও আমাদিগের যুবক ও যুবতীগণকে এই ব্রিফ্‌লেস আইনব্যবসায়ী-বহুল ভাবসঙ্কর নেতাগুলির প্ররোচনা সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। নতুবা ইঁহাদের অদূরদর্শিতার ফলে অদূরভবিষ্যতে দেশের মধ্যে দলাদলির যে হুতাশন প্রজ্বলিত হইবে, তাহা হইতে দেশকে রক্ষা করা অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে। এই বচনবাগীশ কাপুরুষগণ প্রায়শঃ পরভাগোপজীবী এবং যে সক্ষমতায় নিজেদের অক্ষমতা বুঝা সম্ভব, ইঁহারা প্রায়শঃ সেই সক্ষমতা-বিবর্জ্জিত। ইঁহারা প্রতিনিয়ত হয় কনষ্টিটিউশন নতুবা অপর কাহারও স্কন্ধে দোষ চাপাইতে থাকিবেন।

যে মুহূর্ত্তে আমাদের যুবক-যুবতীগণ এই পরভাগোপজীবী বাক্যবাগীশগণের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া আত্মপ্রতারণা হইতে বিরত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তে যাঁহাদের নেতৃত্বে দেশের প্রকৃত জাগরণ সম্ভবযোগ্য হইবে, তাঁহাদিগকে নেতারূপে পাওয়ার আশা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

দেশের জনসাধারণ যে দুরবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে

সেই দুরবস্থা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় কংগ্রেসে যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী ও ভারতপ্রবাসী, এমন কি ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণ পর্য্যন্ত যোগদান করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহারা অযথা কাহারও প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ-বহ্নি ছড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

আমরা আর কতকাল ঘুমাইয়া রহিব ?

ভারত কোন্ দিকে ?

ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের প্রায় প্রত্যেক মানুষটি যে আজকাল অল্পাধিক পরিমাণে অর্থাভাব অথবা শান্তির অভাবে জর্জ্জরিত, তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ কাহারও মতপার্থক্য নাই। ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক অথবা অর্থ-নৈতিক অথবা সামাজিক জীবন অথবা তাহাদের শিক্ষা যেরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহাতে অদূরভবিষ্যতে উপরোক্ত অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবার আশা করা যাইতে পারে, অথবা ঐ ত্রিবিধ অভাব উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ভারতবর্ষে যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং ভারতবাসী নিজেরাই যখন নিজেদের ভাগ্যবিধাতা হইতে পারিয়াছেন, তখন অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসিগণের সর্ব্ববিধ দুঃখ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যাঁহারা উদারনৈতিক এবং যাঁহারা দীর্ঘকাল গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের চাকুরীর পর অবসর গ্রহণ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, কংগ্রেস যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া সংগঠনের কার্য্যে (constructive work) হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসিগণ সর্ব্ববিধ উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। কোনরূপ প্রকৃত সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, জীবনক্ষেত্রের কোন বিভাগে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ না করিয়া যাঁহারা হয় মৃত দেশবন্ধুর, নতুবা গান্ধীজীর, নতুবা জওহরলালজীর পোঁ ধরিয়া মোড়লগিরি পাইবার জন্য ব্যস্ত, যাঁহারা প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মানুষকে প্রতারণা করাই পারিবারিক জীবন-নির্ব্বাহের প্রধান পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা বন্ধুবান্ধব ও উত্তমর্ণগণের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহা পরিশোধ না করাই জীবনের মহাব্রত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা প্রভুদ্রোহিতাকে "কীর্ত্তি" বলিয়া জাহির করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, সেই কংগ্রেস-পন্থিগণ এবং অপরিণত-বুদ্ধি, উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তৃতীয় আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা মনে করিতেছেন যে, ইংরাজ যেরূপ কায়দায় পড়িয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহাতে দেশের মধ্যে সোস্যালিজম্ অথবা কমিউনিজমের একটা কিছু চালাইতে পারিলে দেশবাসিগণের অভাব দূর করা সম্ভব হইত বটে, কিন্তু গান্ধীজীপরিচালিত কংগ্রেসের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি গৃহীত হওয়ায় ঐ আশা সুদূরপরাহত হইয়াছে। আজকাল যাঁহারা সোস্যালিষ্ট নামে পরিচিত এবং যাঁহারা এখনও কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণকার্য্যে সায় দিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

দেশের যিনি যাহাই মনে করুন না কেন, আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের রাজনৈতিক জীবন অথবা অর্থনৈতিক জীবন অথবা সামাজিক জীবন অথবা দেশবাসীর শিক্ষা বর্ত্তমানে যে সূত্রানুসারে চলিতেছে, তদনুসারে চলিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের আর্থিক, অথবা দৈহিক, অথবা মানসিক কোনরূপ উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, পরন্তু উত্তরোত্তর সর্ব্ববিধ বিষয়েই অবনতি চলিতে থাকিবে। উদারনীতির মানুষগণকেই ধরা যাউক, আর গান্ধীপন্থিগণকেই ধরা যাউক, অথবা সোস্যালিষ্টগণকেই ধরা যাউক, প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই একদিকে যেমন

কতকগুলি সমাজের অবজ্ঞার যোগ্য জীব বিদ্যমান আছেন, সেইরূপ আবার যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে স্ব স্ব অন্তর হইতে সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, এতাদৃশ মহাত্মাও বিদ্যমান রহিয়াছেন। এইরূপভাবে দেখিলে উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মাভিমান ও খ্যাতির লালসা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রকৃত সন্ন্যাসী সদৃশ ঐ কৃষককুল এবং কামার-কুমার প্রভৃতি কুটীরশিল্পিগণের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া যে-দেশে একদিন বার মাসে তের পার্ব্বণের উল্লাস প্রবাহিত হইত, সেই দেশে আজ প্রায়শঃ ঘরে ঘরে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব কেন ছড়াইয়া পড়িতেছে তাহার কারণ-নির্ণয়কে অথবা কি উপায়ে ঐ অর্থাভাব প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে দূরীকৃত হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা স্থির করাকে জীবনের মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, এমন একজন মানুষও আজ সমগ্র ভারতবর্ষে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

আমাদের মতে জগতের অন্যান্য দেশ যেরূপ মরুভূমি সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে, অন্যান্য দেশের মানুষগুলির অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করা ক্রমশঃই যেরূপ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়িতেছে, ভারতবর্ষ এখনও তাদৃশ অবস্থায় উপনীত হয় নাই। তথাপি ভারতবাসী যে আজ নিরন্ন, স্বাস্থ্যহীন ও শান্তিহীন, তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষে আজ বুদ্ধিজীবী মানুষগণের মধ্যে প্রকৃত ভারতবাসীর অভাব।

ভারতবাসী শ্রমজীবিগণের মধ্যে প্রকৃত ভারতবাসী বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু একে তো তাহারা নিদ্রিত, তাহার পর আবার বুদ্ধিজীবিগণের সহায়তা ব্যতীত কেবলমাত্র শ্রমজীবিগণের দ্বারা কোন দেশের কোন সমস্যার সম্যক্ সমাধান হওয়া কখনও সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে আজকাল যাঁহারা বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্ত্য চাল-চলনে অনুপ্রাণিত। জন্মতঃ ভারতবাসী হইলেও ভাবতঃ তাঁহারা বিদেশী। কাযেই, আজ ভারতবর্ষ বুদ্ধিজীবি-পক্ষে খাঁটি ভারতবাসী শূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রায়শঃ সর্ব্বত্রই ভাবতঃ দোঁ-আসলা মানুষে বোঝাই হইয়া গিয়াছে। যেস্থানের নেতৃত্ব দোঁ-আসলা মানুষের হাতে নিপতিত হয়, সেই দেশে কোন মঙ্গলের আশা করা যুক্তিসঙ্গত কি?

অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসিগণের কোন সমস্যার প্রকৃত সমাধান হওয়া যে সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা প্রত্যেক প্রদেশের কাউন্সিলে বাজেট লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অবহিত হইলেও বুঝা যাইতে পারে।

প্রত্যেক প্রদেশে কাউন্সিলের এবৎসরকার বাজেট সমালোচনায় যে যে কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অনেকেরই প্রীতিপ্রদ :—

(১) রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান কর।
(২) পুলিশের ব্যয় কমাইয়া দেও।
(৩) মন্ত্রীদিগের বেতন হ্রাস কর।
(৪) অ্যাসেম্ব্লির সভ্যগণের ভাতা বাড়াইয়া দেও এবং তাঁহাদের মাসিক বেতনের বরাদ্দ হউক।
(৫) প্রজাদিগের রাজস্বের হার কমাইয়া দেওয়া হউক।
(৬) শিক্ষার ব্যয়ের জন্য আরও অধিক টাকা মঞ্জুর করা হউক।
(৭) দাতব্যচিকিৎসালয়ের কার্য্য যাহাতে প্রসার লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য আরও অধিক টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ হউক।
(৮) মদ্যপান নিবারণের ব্যবস্থা সাধিত হউক।
(৯) ড্রেনেজ ও ইরিগেশনের কার্য্যে আরও অধিক টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা সাধিত হউক।
(১০) কো-অপারেটিভ ক্রেডিট বিভাগে আরও বেশী টাকা চাই।
(১১) শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগে আরও বেশী টাকা দিতে হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

প্রাদেশিক কাউন্সিলসমূহের আলোচনায় যে-সমস্ত কথা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থান পাইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত কথার অধিকাংশই সম্প্রদায়গত স্বার্থ-সংরক্ষণবিষয়ক এবং উহার মধ্যে এমন একটি কথাও নাই, যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণের কোন ইষ্ট সাধিত হইতে পারে।

যখন অনশন ও অর্দ্ধাশন দেশের চৌদ্দ আনা লোককে অল্পাধিক প্রপীড়িত করিয়া তুলে, যখন অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রায় প্রত্যেক পরিবারকে বিব্রত করে, তখন যদি কেবলমাত্র উপরোক্ত ভাবের ফাঁকা আওয়াজের আদান-প্রদান চলিতে থাকে, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে হতাশার কারণ উদ্ভব হয় না কি ?

যখন সারা ভারতবর্ষে বার মাসের তের পার্ব্বণের কোলাহল প্রবাহিত ছিল, তখন দেশের কোন্ বিভাগে কি ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহা দেখিবার চক্ষু থাকিলে এখনও ভারতবাসী জনসাধারণকে সর্ব্ববিধ অভাব হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত করা সম্ভব হইতে পারে।

কিন্তু, তাহা দেখিবার চক্ষু কোথায় ? দেশ যে এখন দোঁ-আসলায় ভরিয়া যাইতেছে !

স্বাধীনতা ও গান্ধীজী

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বরের 'হরিজন' পত্রিকায় কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গান্ধীজী প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পরামর্শ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, তখন ১৯৩৫ সালের ভারত-সংস্কারসম্বন্ধীয় আইন তাঁহার পড়া হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার পর তিনি উহা অধ্যয়ন করিয়াছেন।

তাঁহার মতে ঐ আইনে যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা (special powers) এবং রক্ষা-কবচ (safeguards) ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিগণের জন্য রক্ষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচ সত্ত্বেও উপরোক্ত আইনের আমলে ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে।

ঐ আইন অনুসারে দেশের মধ্যে যখন কোন হিংসার (violence) উদ্ভব হইবে, অথবা যখন কোন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ দলের সহিত অপর কোন সংখ্যা-গরিষ্ঠ দলের মতানৈক্যের (clash) সৃষ্টি হইবে, তখন বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচ-গুলির ব্যবহার করা হইবে।

গান্ধীজীর ঐ প্রবন্ধের নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) প্রকৃত অহিংসা, অসহযোগ এবং আত্মবিশুদ্ধির বিধি অনুসারে কংগ্রেসের কার্য্য চলিতে থাকিলে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(I have not the shadow of a doubt that if the Congress is true to the spirit of non-violence, non-co-operation and self-purification it will succeed in its mission.)

(২) ইংরাজের শাসনপদ্ধতি কাষ্ঠবৎ নির্ম্মম এবং এমন কি উহাকে সয়তানীপরিপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, কিন্তু যে নর-নারীগণের দ্বারা ঐ শাসনপদ্ধতি পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই নর-নারীগণকে নির্ম্মম অথবা সয়তান বলা চলে না।

(The British system is wooden and even satanic, but not so, the men and women behind the system.)

(৩) অহিংসার নীতি অনুসারে শাসকগণ যাহাতে পরিবর্ত্তিত হন, তাহার চেষ্টা করার প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হইতে ইচ্ছুক হউন আর নাই হউন, তাঁহাদিগকে হত্যা করা চলে না।

(Our non-violence meant that we were out to convert the administrators of the system, not to destroy them, though the conversion might or might not be willing.)

(৪) ইংরাজগণ তাঁহাদের ক্ষমতাকে দৃঢ়তা-সম্পন্ন করিবার জন্য কামান ও অন্যান্য যাহা কিছু রক্ষা করিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহারা যত্তপি দেখিতে পান যে, উহা নিষ্প্রয়ো-

জনীয়, তাহা হইলে তাঁহারা আপনা হইতেই কামান প্রভৃতির ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন এবং হয় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, নতুবা শাসকের মত কেবলমাত্র হুকুম করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া বন্ধুবৎ আমাদের সহযোগিতা করিতে থাকিবেন।

(If not-withstanding their desire to the contrary they saw their guns and everything they had created for the consolidation of their authority useless, because we had no use for them, they could not do otherwise than bow to the inevitable and either retire from the scene or remain on our terms, i. e., as friends to co-operate with us and not as rulers to impose their will upon us) ।

"হরিজনে"র উপরোক্ত প্রবন্ধে "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ" ও "১৯৩৫ সালের সংস্কার-আইন" সম্বন্ধে গান্ধীজী যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে সরল ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, গান্ধীজীর মতে ১৯৩৫ সালের সংস্কার-আইনে ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণের জন্য যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচ সংরক্ষিত হইয়াছে, ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচগুলি না থাকিলে উপরোক্ত ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারেই ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইত। ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধিগণের জন্য উপরোক্ত বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচসমূহ লিপিবদ্ধ হওয়ায় ভারতবাসিগণের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ঐ আইন অনুসারে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু প্রকৃত অহিংস অসহযোগ এবং আত্মবিশুদ্ধির কার্য্য কংগ্রেসের দ্বারা গৃহীত ও পরিচালিত হইতে থাকিলে ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচ সত্ত্বেও ভারতবাসিগণের পক্ষে ঐ ১৯৩৫ সালের সংস্কার-আইনের আমলেই স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে। তাহার কারণ, দেশবাসিগণের দ্বারা অহিংস নীতি সর্ব্বতোভাবে পরিগৃহীত হইলে, যে শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা নিবারণের জন্য বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচগুলির ব্যবহারের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, সেই শ্রেণীর বিশৃঙ্খলা উদ্ভব হইবার কোন আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিবে না, তখন ১৯৩৫ সালের সংস্কার আইনের ঐ বিশেষ ক্ষমতা ও রক্ষা-কবচসমূহ ব্যবহারের কোন প্রয়োজন থাকিবে না এবং তাহা হইলে উহা থাকিয়াও না থাকিবার মত অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি লইয়া সমারোহের সহিত বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, অথবা কথায় কথায় বুলেটিন প্রকাশিত হইতে থাকিলে যে মনোবৃত্তির অথবা চাল-চলনের অভিব্যক্তি হয়, তাহার সহিত গান্ধীজীর উপরোক্ত প্রবন্ধটি মিলাইয়া লইয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিলে মনে হয় যে, গান্ধীজী এখন মনুষ্য সমাজকে বলিতে চান যে, তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী আন্দোলন শেষ হইয়াছে, ভারতবাসী এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে।

অবশ্য, ইহার পর ভারতবাসিগণ যাহাতে তাঁহাদের বোলপুরের সত্তর বছরের নাচনেওয়ালা গুরুদেবটিকে এবং তাঁহাকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় যীশুখৃষ্টের মত পূজা করিতে আরম্ভ করে, তাহার ব্যবস্থা যাহাতে হয়, তাহার কোন অভিলাষ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা শুনিতে পাই নাই বটে, কিন্তু দৈনিক কয় পয়সায় তাঁহার ছাগদুগ্ধ, বেদানার রস, অগ্রহায়ণ মাসে আমফল প্রভৃতি মূল্যবান্ খাদ্য খাইবার খরচ নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, তিনি কিরূপ ভাবে বাহিরের লোককে তাড়াইয়া দিয়া নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া এক একখানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চলা ফেরা করিয়া থাকেন, আঠারটি সেফটীপিনের সহযোগে কিরূপ ভাবে তিনি কৌপীন পরিধান করিয়া থাকেন, তাঁহার হাসি ও কাসি কিরূপ ভাবে সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহার প্রচার করিবার জন্য তাঁহার কথাবার্ত্তায় যেরূপ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে গান্ধীজীর নিকট হইতে উপরোক্ত ভাবের একটা বুলেটিন প্রকাশিত হইলে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই না।

ভারতীয় ঋষিগণের গ্রন্থ ঘাঁটিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ আত্মপ্রশংসা অথবা আত্ম-প্রচারকে আত্মহত্যা বলিয়া মনে করিত এবং যাঁহারা ঐ আত্ম-প্রশংসা ও আত্ম-প্রচারের

লালসা পরিত্যাগ করিতে অক্ষম হইতেন, তাঁহারা পাপাত্মা বলিয়া বিবেচিত হইতেন, কিন্তু আজ মনুষ্যসমাজে ভাবের স্রোত এমন বিকৃত হইয়াছে যে, আত্ম প্রশংসা ও আত্ম-প্রচারকারী মানুষগণ "পাপাত্মা"র স্থলে "মহাত্মা" বলিয়া আখ্যা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

এই ভারতবর্ষে একদিন ছিল, যখন দেশের মহাত্মাগণ কে তাঁহাদের নিন্দা করিতেছেন, অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেন, এবং যাঁহারা স্তাবক অথবা প্রশংসাকারী, তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতেন, কারণ নিন্দুকগণ আত্ম-পরীক্ষার এবং স্তাবকগণ আত্মপ্রতারণার সাহায্য করে বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু আধুনিক মহাত্মাগণ (?) বিরুদ্ধ সমালোচক-দিগকে অবজ্ঞাত করিয়া কিরূপ ভাবে স্তাবকগণের দ্বারা পরিবৃত থাকিবেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই উদ্যোগী হইয়া থাকেন। ইহা কি অদৃষ্টের পরিহাস নহে ?

ইহারই নাম কি অধর্ম্মের অভ্যুদয় নহে? মনুষ্য-সমাজের অবস্থা যে দীন হইতে উত্তরোত্তর দীনতর হইয়া পড়িতেছে, ইহাই কি তাহার অন্যতম কারণ নহে ?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ এবং ১৯৩৫ সালের "সংস্কার-আইন" সম্বন্ধে গান্ধীজী যে মতবাদ প্রচার করিয়া-ছেন, তাহার মূল্য কতখানি, তাহা দেখাইতে বসিয়া প্রাণের খেদে অবান্তর কথায় যে কালক্ষেপ করিলাম, তজ্জন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের পূর্ব্বে পর্য্যন্ত ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইন সম্বন্ধে গান্ধীজী দেশবাসীকে যে-সমস্ত কথা শুনাইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে হইত যে, ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনের আমলে ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বায়ত্ত-শাসন পর্য্যন্ত পাওয়া সম্ভব নহে। আর, আজ তিনি আমাদিগকে শুনাইতেছেন যে, স্বায়ত্তশাসন তো অতি নগণ্য ঐ আইনের বলে ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে। অবশ্য, তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, আগে ঐ আইন তাঁহার পড়ার সুযোগ হয় নাই, আর এখন, টীকাকারের সহায়তায় উহা তলাইয়া বুঝিবার সুযোগ তিনি পাইয়াছেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-আইন সম্বন্ধে তিনি এবং তাঁহার অনুচরবর্গ আগে যে মতবাদ প্রচার করিতেন, তাহাই ঠিক, অথবা এখন তাঁহারা যে মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, উহা ঠিক, অথবা ঐ দুইটি মতবাদই বে-ঠিক তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে গান্ধীজীর দায়িত্বজ্ঞান যে কতখানি, তাহা পরিমাপ করিবার জন্য দেশবাসীকে অনু-রোধ করিতেছি।

যে-গ্রন্থ তলাইয়া অধ্যয়ন করিলে মতবাদের এতখানি পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা, সেই গ্রন্থ না পড়িয়া তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা কি অপরিপক্ক তরুণ বুদ্ধির সমুচিত নহে ? এতাদৃশ মানুষকে জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানুষ মনে করা কাণাছেলেকে পদ্মলোচনযুক্ত বলিয়া আখ্যাত করিবার সমতুল্য নহে কি ?

সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারের টীকার সহায়তায় ১৯৩৫ সালের সংস্কার-আইন পড়িয়া শুনিয়া গান্ধীজী বলিতেছেন বটে যে, অহিংসার সহায়তায় সংখ্যালঘিষ্ঠ (minority) ও সংখ্যা-গরিষ্ঠ (majority) দলের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ যাহাতে উত্থাপিত না হয়, তাহা করিতে পারিলে এবং অহিংসা, অসহযোগ ও আত্ম-বিশুদ্ধির প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকিলে, ঐ ১৯৩৫ সালের আইনের আমলেই স্বায়ত্ত-শাসন তো নগণ্য কথা, স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু আমরা ঐ আইন হইতে গান্ধীজীর ঐ কথা বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের মতে দেশের ও দেশবাসীর মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার, অথবা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার এবং অসহযোগের প্রবৃত্তি ও চেষ্টা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গান্ধীজী যে অহিংসার কথা বলিতেছেন, সেই অহিংসা একটি কথার কথা মাত্র হইয়া থাকিবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও দলাদলির অবসান হওয়া তো দূরের কথা, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

প্রকৃত অহিংসার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইলে সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও দলাদলির অবসান হইতে পারে বটে এবং তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে ক্রমশঃ স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাধীনতা লাভ করাও সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত

ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার, অথবা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার, অথবা অসহযোগের প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগাইবার কার্য্য চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই ঐ অহিংসারূপী আলেয়ার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না এবং স্বাধীনতা তো দূরের কথা, প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসন পর্য্যন্ত লাভ করা সম্ভব হইবে না, অর্থাৎ এক কথায় ততদিন পর্য্যন্ত নয় মণ তেলও পুড়িবে না এবং রাধাও নাচিবে না।

১৯৩৫ সালের সংস্কার-আইন পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, ইংরাজ জাতিকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার, অথবা তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা না করিলে ভারতবাসিগণ যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ঐ আইনে স্থান পাইয়াছে বটে, ইংরাজ জাতিকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার অথবা তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার কাহারও কোন চেষ্টা যাহাতে সফল না হয়, তাহার ব্যবস্থাও ঐ আইনে স্থান পাইয়াছে বটে, ইংরাজ জাতিকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার অথবা তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার কোন চেষ্টা না করিলে ভারতবাসিগণের পক্ষে ঐ আইনের আমলে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন, তাহা লাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করাও সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহার সহায়তায় কোন বিশেষ শিক্ষা ও সাধনা অর্জ্জন না করিয়া একমাত্র ঐ আইনের বলেই ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, এমন কিছু অথবা ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার, কিংবা তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার কোন চেষ্টা করিলে কোন রূপ স্বাধীনতা তো দূরের কথা, স্বায়ত্ত-শাসন পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে এমন কোন ব্যবস্থা সমগ্র আইনের কোন স্থানে বিন্দুমাত্র স্থানও পায় নাই।

আমাদের উপরোক্ত কথা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে হইলে বলিতে হইবে যে, প্রকৃত স্বাধীনতা যে, অর্জ্জন করিবার উপযুক্ত একটা মহান্ বস্তু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহা শিক্ষা ও সাধনাবিশেষের দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। কোন মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে অথবা কোন দেশ সঙ্ঘগতভাবে শিক্ষা ও সাধনাবিশেষের দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইতে পারে বটে, কিন্তু কোন মানুষ অপর কোন মানুষকে অথবা কোন জাতি অপর কোন জাতিকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিতে কখনও সক্ষম হয় না।

১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনের আমলে ভারতবাসিগণ যদি ইংরাজগণকে তাড়াইয়া দিবার অথবা তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে যে শিক্ষা ও সাধনার বলে কোন দেশের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, সেই শিক্ষা ও সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ শিক্ষা ও সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে অথবা উহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে কেবলমাত্র ঐ আইনের কোন ব্যবস্থার সহায়তায় ভারতবাসীর পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে না। যে ইংরাজ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ মুখ্যতঃ ঐ আইনের প্রণেতা, তাঁহারা ঐ আইনের মধ্য দিয়া ভারতবাসিগণকে কোনরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা-নামক বস্তু প্রেরণ করেন নাই, কারণ একজনের পক্ষে অপর একজনকে স্বাধীনতা-নামক বস্তুটি বাক্স-মুটিয়া অথবা রেল-মোটর প্রভৃতির সহায়তায় প্রেরণ করা সম্ভব নহে এবং ইংরাজ জাতির নিজেদের মধ্যেই ঐ প্রকৃত স্বাধীনতা বিদ্যমান নাই।

এক জাতির পক্ষে অপর জাতিকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু প্রচলিত ভাষানুসারে স্বায়ত্তশাসন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা প্রদান করা সম্ভবযোগ্য। তদনুসারে ভারতবাসিগণ যাহাতে স্বায়ত্তশাসন পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনে সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবাসিগণ যদি ইংরাজগণকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবার অথবা তাঁহাদের যুক্তিসঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ঐ স্বায়ত্ত-শাসন পর্য্যন্ত লাভ করা সম্ভব হইবে না।

হিংসার উদ্ভব না হইলে, অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে, বিশেষ ক্ষমতা

ও রক্ষা-কবচসমূহের কোন ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইবে না এবং তদনুসারে একমাত্র অহিংসা, অসহযোগ এবং আত্ম-বিশুদ্ধতার দ্বারাই ভারতবর্ষের পক্ষে ১৯৩৫ সালের সংস্কৃত-আইনবলে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে বলিয়া গান্ধীজী যে মতবাদ প্রচার করিতেছেন, ঐ মতবাদ যে ভ্রমাত্মক, তাহা সপ্রমাণিত করিবার আগে আমাদের উপরোক্ত মতবাদ যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আমাদের উপরোক্ত মতবাদ, অর্থাৎ প্রকৃত স্বাধীনতা যে কোন দেশের পক্ষে অপর কোন দেশকে প্রদান করা সম্ভব নহে, উহা যে একমাত্র শিক্ষা ও সাধনাবিশেষের দ্বারা লাভ করিতে হয়, ইংরাজ জাতি যে তৎপ্রণীত কোন আইনের দ্বারা ভারতবাসীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন নাই, কারণ তাঁহারা তাহা করিতে পারেন না, ইংরাজ জাতির পক্ষে অপর কোন চকে স্বাধীনতা দেওয়ার যোগ্যতা লাভ করা তো দূরের কথা, তাঁহারা নিজেরাই যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন নাই, আমাদের এবংবিধ কথাগুলি বিশদ ভাবে বুঝিতে হইলে, প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে।

আজকাল, কোন দেশ যখন একমাত্র নিজ দেশের মানুষের দ্বারা শাসিত হয়, তখন ঐ দেশকে স্বাধীন বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চাকুরীজীবী, পরমুখাপেক্ষী অথবা পরাধীন হইলেও স্বাধীনতার আধুনিক সংজ্ঞানুসারে ঐ উপরোক্ত দেশকে স্বাধীন বলিয়া আখ্যাত করিতে আজকাল রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ কোন সঙ্কোচ অথবা কুণ্ঠা বোধ করেন না। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা এখন আর স্বাধীনতা কথাটির ব্যবহার হইতে উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

দুই হাজার বৎসরের আগেকার গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এখন যে অর্থে স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তখন ঐ অর্থে উহা ব্যবহৃত হইত না, এবং যেদিন হইতে মানুষ স্বাধীনতা শব্দটি বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মানুষের পশুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ স্বাধীনতার আধুনিক অর্থানুসারে মানুষ নরশোণিতলোলুপ হইলেও বীরপদবাচ্য হইয়া সুখ্যাতির যোগ্য হইতে পারে। নরশোণিতলোলুপতা কি পশুত্ব নহে? ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ইংরাজের অভ্যুদয়কালে দাসত্ব-প্রথা নিবারিত হইয়াছে বলিয়া ইংরাজ জাতি যে শ্লাঘা অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রাচীন দাসত্ব প্রথার সহিত আধুনিক দাসত্ব-প্রথার তুলনা করিলে দুইয়ের ভিতরে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই মোট জনসংখ্যার তুলনায় দাসের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে যে ইংরাজ জাতির শতকরা আশী জন মানুষ স্বাধীন ভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, বিংশ শতাব্দীতে সেই ইংরাজ জাতির শতকরা ৯৫ জন লোক স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহের জন্য চাকুরীর মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। চাকুরীজীবিত্ব কি দাসত্বেরই রূপান্তর-মাত্র নহে? কেবল মাত্র ব্যক্তিগত ভাবেই যে ইংরাজ জাতির মধ্যে দাসত্বজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, সঙ্ঘগত ভাবেও ইংরাজ জাতির পরমুখাপেক্ষিতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, স্বকীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের সমগ্র অধিবাসীর যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে, ১৯৩১ সালে তাহার অল্পাধিক দুই আনা (১৪%) মাত্র গ্রেট ব্রিটেনে উৎপন্ন হইয়াছে। বাকী চৌদ্দ আনার (৮৬%) জন্য ইংরাজ জাতিকে সারা বৎসর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইয়াছে। ১৮১৮ সালের আগে ইংরাজ জাতির এতাদৃশ অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। তখনও সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রায় চৌদ্দ আনা নিজেদের দেশেই উৎপন্ন হইত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। এইরূপ ভাবে দেখিলে যে শুধু ইংরাজ জাতিরই ব্যক্তিগত ভাবের দাসত্ব ও জাতিগত ভাবে পরমুখাপেক্ষিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নহে, ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক জাতির একই রূপ পতনের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। কোন্ দিন হইতে এবং কেন ইউরোপীয়দের পশুত্ব, দাসত্ব, পরমুখাপেক্ষিতাপ্রবৃত্তি এতাদৃশ পরিণতি

বৃদ্ধি পাইল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের উপরোক্ত অধোগতির সূচনা আর স্বাধীনতার বর্ত্তমান সংজ্ঞা প্রায় সমসাময়িক।

আগেই বলিয়াছি যে, স্বাধীনতা শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইত না। এমন একদিন ছিল, যখন কোন দেশ অথবা জাতি স্বদেশীয় অথবা স্বজাতীয় লোকের দ্বারা শাসিত হইয়াও অসভ্য দাসের জাতি বলিয়া অভিহিত হইতে পারিত, আর অন্য দেশের অথবা অন্য জাতির লোকের দ্বারা শাসিত হইলেও সুসভ্য জাতি বলিয়া সম্মান লাভ করিতে পারিত।

তখন স্বাধীনতা ছিল দুই রকমের—আধুনিক ভাষায় ঐ দুই রকম স্বাধীনতার এক রকমের স্বাধীনতাকে লৌকিক স্বাধীনতা আর অপর রকমের স্বাধীনতাকে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে।

তখন স্বাধীনতা বলিতে মানুষ যাহা বুঝিত, তাহা সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ "স্ব" অর্থাৎ আসল মানুষটি কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন হইত, দ্বিতীয়তঃ, নিজের অধীনতা ও নিজাতিরিক্ত অপর বস্তুর অধীনতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানিবার প্রয়োজন হইত এবং তৃতীয়তঃ, যে উপায়ে নিজাতিরিক্ত অপর কোন বস্তুর অধীনতাপাশে বদ্ধ না হইয়া সর্ব্বদা মুক্ত থাকিতে পারা যায়, সেই উপায় পরিজ্ঞাত হইয়া তাহাতে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন হইত।

যে তিনটি জ্ঞান ও অভ্যাসের বলে তখনকার স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব হয়, সেই তিনটি জ্ঞান ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া সম্যক্ ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার সর্ব্বপ্রথমটি যে 'স্ব' অর্থাৎ আসল মানুষটি কি, তাহা উপলব্ধি করা, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, ক্ষুধার জ্বালা, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, মনের অস্থিরতা এবং বুদ্ধির অপূর্ণতা বিদ্যমান থাকিলে 'স্ব' অর্থাৎ আসল মানুষটি যে কি বস্তু, তাহা নির্ভুলভাবে আংশিক পরিমাণেও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। আর একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ব্যাধির যাতনা বিদ্যমান থাকিলে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দূর করা ও কোনরূপ বিবাদ-বিসংবাদের ফলে অশান্তি ও অসন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকিলে মনের অস্থিরতা দূর করিয়া বুদ্ধির পূর্ণতা সাধন করা সম্ভব হয় না।

কাজেই, যে তিনটি জ্ঞান ও অভ্যাসের বলে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, সেই তিনটি জ্ঞান ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া সম্যক্ ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের মধ্যে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের ক্ষুধার জ্বালা, ব্যাধির যাতনা, বিবাদ ও বিসংবাদের অশান্তি ও অসন্তুষ্টি অন্ততঃপক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়া উত্তরোত্তর যাহাতে উহা সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহারই নাম 'লৌকিক স্বাধীনতা' অর্জ্জন করা, আর যে তিনটি জ্ঞান ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে সম্যক্ ভাবে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, সেই তিনটি জ্ঞানে ও অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়ার নাম 'আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা' অর্জ্জন করা।

জগতের সর্ব্বত্র মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া এদেশ ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ব্যাধির যাতনার ফলে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইতেছে, বিবাদ ও বিসংবাদের ফলে অশান্তি ও অসন্তুষ্টিতে সর্ব্বদা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে, ইহা মনে করিলে কি স্বাধীনতা কথাটির মধ্যে যে উৎকর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই উৎকর্ষের ক্ষুন্নতা সাধন করা হয় না?

জগতের সর্ব্বত্র মানুষ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে মানুষের মধ্য হইতে যে প্রকৃত স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। তৎসত্ত্বেও যদি বলা হয় যে, অমুক অমুক জাতি "স্বাধীন", তাহা হইলে তাহাতে মাত্র স্বাধীনতাকে পরিহাস করা হইয়া থাকে এবং অন্য কোন ফলোদয় হয় না।

লৌকিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, লৌকিক স্বাধীনতাকে প্রাথমিক স্বাধীনতা এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে পূর্ণ-স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করা যাইতে

পারে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, প্রাথমিক স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হইলে পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না।

কি করিলে সর্ব্বসাধারণের ক্ষুধার জ্বালা, ব্যাধির যাতনা, বিবাদ ও বিসংবাদের অশান্তি ও অসন্তুষ্টি অন্ততঃ পক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়া উত্তরোত্তর উহা সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে স্বায়ত্ত-শাসনের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু শাসন বলিতে আজকাল সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন থাকিলেই যে উহা সাধিত হইবে, অথবা বিদেশীয়ের শাসন থাকিলেই যে উহা সাধিত হইতে পারে না, অথবা স্বায়ত্ত-শাসন না হইলেই যে উহা সাধিত হইতে পারে না, ইহা বলা চলে না।

মানুষ অদূর ভবিষ্যতে দেখিতে পাইবে যে, গান্ধীজী ও জওহরলালজীর মতিবুদ্ধির পরিবর্ত্তন না হইলে তাঁহাদের পরিচালিত মন্ত্রিসভার কার্য্যের ফলে প্রত্যেক প্রদেশে মানুষের ক্ষুধার জ্বালা, ব্যাধির যাতনা ও বিবাদ ও বিসংবাদের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে পাইতে অন্তর্বিদ্রোহে পরিণত হইবে।

কোন্ উপায়ে সর্ব্বসাধারণের ক্ষুধার জ্বালা, ব্যাধির যাতনা, বিবাদ ও বিসংবাদের অশান্তি ও অসন্তুষ্টি অন্ততঃ-পক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়া উত্তরোত্তর উহা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা পাশ্চাত্যভাবাপন্ন গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানীর রাজত্বে কখনও সাধিত হইতে পারে না বটে, কিন্তু উঁহারাই যদি পূর্ণ ভারতীয়-ভাবাপন্ন হইয়া স্ব স্ব অভিমান সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, তাহা হইলে যেরূপ তাঁহাদের শাসনকালেই উহা সাধিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার জ্যাক্-জন কোম্পানী যদি ভারতীয়-ভাবাপন্ন হইয়া ভারতের শাসন পরিচালিত করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারাও ভারতের প্রাথমিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, উভয়ের একটা বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন আছে।

কাজেই বলা যাইতে পারে যে, যতদিন পর্য্যন্ত এক বিশেষ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা স্ব স্ব শক্তির উৎকর্ষ সাধিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন জাতির পক্ষে কোন ক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা তো দূরের কথা, প্রাথমিক স্বাধীনতা পর্য্যন্ত লাভ করা সম্ভব হইবে না এবং ঐ শিক্ষা ও সাধনা অর্জ্জন করিতে পারিলে শাসক বিদেশীয়ই হউন, আর দেশীয়ই হউন, উঁহার সহায়তায় পূর্ণ-স্বাধীনতা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।

কোন্ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা দেশের প্রাথমিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভব হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা বহুবার আলোচনা করিয়াছি। কাজেই এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিব না।

উপসংহারে আমরা দেশবাসীকে বলিতে চাই যে, পূর্ণ স্বাধীনতাই হউক, আর প্রাথমিক স্বাধীনতাই হউক, আর দেশবাসীর আর্থিক অভাব মোচন করাই হউক, ইহার যে কোনটিতে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজ-বিদ্বেষ যাহাতে ভারতবাসীর মন হইতে দূরীভূত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহার পর দ্বিতীয়তঃ সুশীল ও সুবোধ বালকের মত ইংরাজ ও ইংরাজী-শিক্ষাভিমানী রাজ-প্রতিনিধিগণের নিকট সর্ব্বসাধারণের অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু দূর করিবার উপযুক্ত পরিকল্পনা যাচ্ঞা করিতে হইবে এবং উহার সমাক ও সর্ব্বতোভাবের পরিকল্পনা যে কোন আধুনিক ইউরোপীয় অথবা আমেরিকান অথবা জাপানী শাস্ত্রে বিদ্যমান নাই, তাহা সম্ভ্রমের সহিত ঐ ইংরাজ ও ইংরাজী-শিক্ষাভিমানী রাজ-প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞগণকে বুঝাইতে হইবে। এই দুইটি কার্য্য সম্পাদিত হইলে, কে কে কোথায় কোথায় বাইবেল, কোরাণ ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের মহাবাক্যগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য লুক্কায়িত ভাবে সাধনা করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই দেশ হইতে যখন বিদ্বেষ ও অভিমান দূর করিবার চেষ্টা প্রকৃত ভাবে আরম্ভ হইবে, তখন জনসাধারণের পক্ষে

প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অথবা প্রকৃত সাধকের নির্দ্দেশ পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে এবং একমাত্র তখনই দেশবাসীর দুঃখের অবসান হওয়া সম্ভব হইতে পারে।

গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানী যে বিদ্বেষ ও অভিমানে বোঝাই এবং সেই হিসাবে তাঁহারা যে অতগুলি কংসরূপী তাহা দেশবাসীর প্রাণে কবে স্থান পাইবে?

একই মুখে অহিংসা ও অসহযোগের কথা যে কত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনা, হিংসা ছাড়া যে অসহযোগ হইতে পারে না, মুখে অহিংসার কথা বলিয়া কার্য্যতঃ কাহাকেও বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করা, অথবা কাহারও ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার প্রয়াসী হওয়া যে কত বড় শঠতা, প্রবঞ্চনা ও শঠতার দ্বারা কোন দেশের মুক্তি তো দূরের কথা কাহারও ব্যক্তিগত উন্নয়ন পর্য্যন্ত যে সাধিত হইতে পারে না, তাহা মানুষ কেন বুঝে না?

পরের নিকট হইতে ধারকরা কথা পাখীর মত বোলনেওয়ালা, নফর-বৃত্তি-সম্পন্ন, আত্ম-প্রবঞ্চক ঐ কংসরূপী মানুষগুলির বিভ্রান্তিকর কুহক ইহার প্রধান কারণ নহে কি?

গান্ধীজী ও তাঁহার বোলপুরের গুরুদেবটিকে আমরা বলিতে চাই যে, তাঁহারা আমাদের যুবক যুবতীগণকে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়া আসিতেছেন, তাহার ফলে ঐ যুবক-যুবতীগণের প্রায় সকলের প্রাণেই কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে, কখনও বা পরোক্ষভাবে তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রধানতঃ উঁহাদের কৃতকার্য্যের ফলেই পুত্র-কন্যাকে লইয়া শান্তির সহিত পিতার ঘর করা, স্ত্রীকে লইয়া নির্ব্বিবাদে স্বামীর ঘর করা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমাদের যুবক ও যুবতীগণ হয়ত এখনও যৌবনের আচ্ছন্নতায় উহা সম্যক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কিন্তু চিরদিন আচ্ছন্ন থাকা প্রকৃতির নিয়ম নহে। অদূরভবিষ্যতে সময় আসিবে, যখন সমগ্র যুবক ও যুবতী বুঝিতে পারিবে যে, বর্ত্তমান যুগের কে কে তাহাদের এতাদৃশ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন।

আমরা গান্ধীজী ও বর্ত্তমানযুগের নাচনেওয়ালা 'নাহাকুরে' কবীন্দ্র রবীন্দ্রকে এখনও সাবধান হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা আর কতদিন নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে নিজদিগকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে সমর্থ হইবেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন কি? হিসাব-কিতাবের দিন প্রায় সমাগত নহে কি?

জমিদার ও কৃষক-প্রজা

বাঙ্গালার মন্ত্রণা-পরিষদে (Bengal Legislative Assembly) কয়েক সপ্তাহ হইতে প্রজাস্বত্ব রক্ষা করিবার একটি আইনের কয়েকটি ধারা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। ঐ আইনের যে যে কথা আলোচনার বিষয় হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতাবৎকাল প্রজার কোন ঋণের জন্য কোন জমি বিক্রয় করিতে হইলে আইন অনুসারে জমীদার ইহা ক্রয় করিতে সম্মত হইলে বাহিরের আর কাহারও উহা ক্রয় করা সম্ভব-যোগ্য হইত না। জমীদারদিগের এই বিশেষ ক্ষমতা বজায় থাকা সঙ্গত কি না, তাহাই অ্যাসেম্ব্লির সভ্যগণের উপরোক্ত আলোচনার প্রথম কথা। ইহা ছাড়া এতাবৎকাল কোন প্রজার কোন জমী বিক্রয় হইলে যিনি উহা ক্রয় করিতেন, তাঁহাকে নাম খারিজ করিবার জন্য জমীদারদিগকে একটা ফি প্রদান করিতে হইত। ন্যায়সঙ্গত ভাবে জমীদারদিগের ঐ ফি পাওয়া উচিত কি না, তাহাই অ্যাসেম্ব্লির সভ্যগণের উপরোক্ত আলোচনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য কথা।

এতদ্বিষয়ক আলোচনায় সভ্যগণের মধ্যে যে-দল সংখ্যায় গরিষ্ঠতা লাভ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, তাঁহাদের মতে জমীদারদিগের জমী ক্রয় করিবার কোন বিশেষ স্বত্ব অথবা জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে জমীদারদিগের জন্য কোন নাম-খারিজী ফি সংরক্ষিত হওয়া বিধেয় নহে।

কৃষক-প্রজাদিগের ঋণভার, অন্নাভাব ও অর্থাভাব যাহাতে অনতিবিলম্বে লাঘবতা প্রাপ্ত হইতে পারে এবং ঐ ঋণভার, অন্নাভাব, অর্থাভাব যাহাতে উত্তরোত্তর সম্যক্

ভাবে সমূলে বিনষ্ট হইয়া কৃষক-প্রজাগণ যাহাতে পুনরায় ঐশ্বর্য্যের 'লাল দীঘি'তে সন্তরণ করিতে পারে, তাহা করা সভ্যগণের প্রায় প্রত্যেকেরই যে উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে একাধিক সুর বাজিয়া উঠিয়াছে।

জমীদারদিগের জমী ক্রয় করিবার কোন বিশেষ স্বত্ব অথবা জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে কোন নামখারিজী ফি সংরক্ষিত হওয়া উচিত নহে বলিয়া যাঁহাদিগের মতবাদ, তাঁহাদের কথায় বুঝিতে হয় যে, জমীয় ক্রয়ে কাহারও কোন বিশেষ স্বত্ব রক্ষিত না হইলে এবং জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে কোন নামখারিজী ফি প্রদান করিতে না হইলে প্রজার পক্ষে জমী বিক্রয়ে কিছু অধিকতর মূল্য পাওয়া সম্ভব হইতে পারে এবং তাহাতে প্রজার লাভবান্ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে জমীদারের বিশেষ স্বত্ব ও নামখারিজী ফির প্রথা নাকচ করিয়া দিলে যে কৃষক-প্রজাদিগের পক্ষে জমী বিক্রয় করিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্য পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা বাঙ্গালা অ্যাসেম্ব্লির দেড়শত টাকা বেতন ও নানারকমের ভাতাভোগী নিয়ত প্রজা-দুঃখ-কাতর মস্তিষ্কবান্ সভ্যবৃন্দ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু অধিকতর মূল্য পাইয়া কৃষক-প্রজা যদ্যপি তাদের জমি বিক্রয় করিবার অধিকতর সুযোগ লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে কৃষক প্রজাদিগের ঋণভার, অন্নাভাব এবং অর্থাভাব যে কিরূপভাবে লাঘবতা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা অ্যাসেম্ব্লির ঐ মনীষিবৃন্দের কেহই নর-লোকের এই জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন নাই।

আমাদের মতে গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানী পরিচালিত কংগ্রেস ও উহার অনুগামিগণ কৃষক প্রজাদিগের ঋণভার, অন্নাভাব, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যভাব ও শিক্ষাভাব দূর করিবার জন্য যাহা যাহা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কার্য্যটির ফলে কৃষক-প্রজাগণের প্রত্যেক দুঃখটী অর্থাৎ তাহাদের ঋণভার, অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শিক্ষাভাবের প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং হয় গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানী ও তাঁহাদের অনুগামিগণের মতবাদ যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয় নতুবা ঐ মতবাদের মুষ্টিমেয় পাণ্ডাগণ যাহাতে কুক্কুরের মত কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হন, তাহা ভারতের মুসলমান ও তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের দ্বারা সংঘটিত না হইলে অদূরভবিষ্যতে ভারতবর্ষ অন্তর্বিদ্রোহে জর্জ্জরিত হইয়া যাইবে।

জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে জমীদারদিগের যে বিশেষ স্বত্ব ও নামখারিজী ফি প্রদান করিবার প্রথা বহুকাল হইতে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা প্রজাদিগের বর্ত্তমান অর্থাভাবের দিনে বজায় থাকা উচিত কি না তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবার আগে গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানীর ও তাঁহাদের অনুগামিগণের কার্য্যে কৃষক-প্রজা ও জমীদারদিগের মধ্যে যে মনোমালিন্যের উদ্ভব হইতে চলিয়াছে, ঐ মনোমালিন্য বিদ্যমান থাকিলে কৃষক-প্রজাগণের কোনরূপ সমস্যার পূরণ হইতে পারে কি না তদ্বিষয়ে আমরা সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা করিব।

কৃষক-প্রজা ও জমীদারদিগের মধ্যে কোনরূপ মনোমালিন্য বিদ্যমান থাকিলে কৃষক-প্রজাদিগের ঋণভার, অন্নাভাব, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শিক্ষাভাব প্রভৃতি কোন সমস্যার কোনরূপ সমাধান হওয়া সম্ভব কি না, তদ্বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে কি কি উপায়ে তাহাদের ঋণভার প্রভৃতি সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

অনেকে মনে করেন যে, কৃষকগণ যাহাতে অল্পসুদে অনায়াসে অধিকতর পরিমাণে ঋণ পাইতে পারে, কো-অপারেটিভ বিভাগ প্রভৃতির দ্বারা তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে কৃষকের ঋণভার-সমস্যার সমাধান, অন্নাভাবের সময় যাহাতে প্রচুর বিদেশীয় অথবা ভিন্ন প্রদেশীয় শস্যের আমদানী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অন্নাভাব-সমস্যার সমাধান, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে পারিলে অর্থাভাব-সমস্যার সমাধান, গ্রামে গ্রামে যাহাতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে পারিলে স্বাস্থ্যাভাব-সমস্যার সমাধান, বিশ্ব-বিদ্যালয়ানুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে পারিলে শিক্ষা-সমস্যার সমাধান সাধিত হইতে পারে। একটু তলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে ঋণ করিবার প্রয়োজন না হয়, তাহা করিতে না পারিলে

…কে অনায়াসলভ্য করিলে ঋণভার-লাঘব হওয়া তো দূরের কথা, ঋণভার বৃদ্ধি পাওয়া যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ আবার যাহাতে প্লাবন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, শস্যের মহামারী প্রভৃতির কারণ দূরীভূত হইয়া প্রচুর শস্য হইতে পারে, তাহা না করিতে পারিয়া অন্নাভাব দূর করিবার জন্য বিদেশজাত অথবা ভিন্ন প্রদেশজাত শস্যের আমদানী সুগম করিলে অন্নাভাব দূর হওয়া তো দূরের কথা, অন্নাভাব বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী ; সমগ্র কৃষিজাত ও সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে সুলভ হয়, তাহা না করিয়া উহার কোনটির মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিলে কৃষক-প্রজাগণের অর্থাভাব দূর হওয়া তো দূরের কথা, অর্থাভাব বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী ; যাহাতে অস্বাস্থ্যের উদ্ভব না হয়, তাহা করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আয়োজন করিলে স্বাস্থ্যাভাব দূর হওয়া তো দূরের কথা, রুগ্নলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যে শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা, মনের সংযম ও বুদ্ধির পূর্ণতা বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে না পারিয়া যে শিক্ষায় কেবলমাত্র আক্ষরিকতা বৃদ্ধি পায়, তাহার আয়োজন করিলে ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, মনের অসংযম ও বুদ্ধির ক্ষীণতা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হইয়া স্বাধীনচেতা মৌলিক চিন্তাশীল স্বাধীনতা-[illegible] লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা, অন্ধ-অনু-[illegible]প্রিয় টীয়াপাখী-সদৃশ উচ্ছৃঙ্খল, পরমুখাপেক্ষী, চাকুরী-[illegible]কেরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। চারিদিকে [illegible]ইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কার্য্যত-ও যে যে স্থানে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার প্রসার, রাস্তা ও যানবাহনের বৃদ্ধি, দাতব্য-চিকিৎসালয়ের বৃদ্ধি, আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ানুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যার আধিক্য সম্পাদিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কৃষক-প্রজাগণের ঋণভার, অন্নাভাব, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কি করিলে কৃষক-প্রজাগণের ঋণ-সমস্যা প্রভৃতি সমস্যার [illegible] সমাধান সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সন্ধানে [illegible] হইলে দেখা যাইবে যে, এতদর্থে কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভযোগ্য হইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবার প্রয়োজন হয়। কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভযোগ্য হয়, একমাত্র [illegible] করিতে পারিলেই একসঙ্গে কৃষকের ঋণসমস্যা, অন্ন-সমস্যা এবং অর্থ-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। কি কি কার্য্য ও ব্যবস্থার দ্বারা কৃষকের পক্ষে কৃষিকার্য্য যাহাতে লাভজনক হয়, তাহা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যে-কার্য্যের দ্বারা কৃষিকার্য্যের লাভজনকতা সম্ভব-যোগ্য হয়, তাহার ফলে দেশের বায়ু, জল ও মৃত্তিকার বিশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং কোন দেশের বায়ু, জল ও মৃত্তিকা যাহাতে বিশুদ্ধ থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে ঐ দেশের স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধানও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

এইরূপ ভাবে দেখিলে, দেখা যাইবে যে, কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে সর্ব্বদা লাভযোগ্য হয়, একমাত্র তাহা করিতে পারিলেই কৃষক-প্রজাগণের ঋণ-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান সম্পাদিত হইতে পারে। ইহার পর যে শিক্ষায় ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতা মনের সংযম ও বুদ্ধির পূর্ণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই শিক্ষা কৃষকগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের শিক্ষা-সমস্যার সমাধানও সম্ভবযোগ্য হইবে। আমরা একাধিক-বার দেখাইয়াছি যে, জগতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বর্ত্তমানে যে শিক্ষা বিতরণ করিতেছে, তাহাতে মানুষের ইন্দ্রিয়ের সক্ষমতা, মনের সংযম ও বুদ্ধির পূর্ণতা সাধি[illegible]ওয়া তো দূরের কথা, উহার ফলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির দৌর্ব্বল্য, মনের অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা, বুদ্ধির অসারতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ফলে যিনি যত বেশী উপনাম সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার ইন্দ্রিয় তত বেশী দুর্ব্বল, মন তত বেশী অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল এবং বুদ্ধি তত বেশী অসার হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, ঐ উপনাম-বিশিষ্ট মানুষগুলির ইন্দ্রিয় ও মন কিছু কিছু বৈকল্যপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়া থাকে। আমরা তদুত্তরে বলিব যে, প্রকৃত বুদ্ধি মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিবার সহায়তা

করিয়া থাকে। অথচ এই উপনামবিশিষ্ট মানুষগুলি কোনরূপের বেতন ও অর্থ বা বৃত্তিভোগী হইয়া অপরের কৃপাভোগী না হইতে পারিলে তাঁহাদের পক্ষে প্রায়শঃ স্ব স্ব পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করা পর্য্যন্ত অসম্ভব হয়। যাঁহারা এতাদৃশভাবে নফর জীবন যাপন করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি খুব পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা যায় কি ?

আমাদের মতে প্রকৃত শিক্ষা বর্ত্তমানে মনুষ্যসমাজের অজ্ঞাত। শিক্ষা নামে বর্ত্তমানে যাহা চলিয়াছে, তাহা প্রায়শঃ কুশিক্ষা। কুশিক্ষা অপেক্ষা শিক্ষার অভাব, অথবা অ-শিক্ষাও ভাল। কাজেই শিক্ষা-সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্পাদিত করিতে হইলে তদ্বিষয়ে সাধক ও সাধনার প্রয়োজন। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সাধক ও সাধনার দেখা না পাওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষার যে-অংশ খাঁটি আধুনিক, সেই অংশ যাহাতে আধুনিক রূপে প্রসার লাভ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা, বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের মতে বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যার সমাধান করা। অধিকন্তু, মানুষ যখন ঋণভারে, অন্নাভাবে, অর্থাভাবে এবং স্বাস্থ্যাভাবে জর্জ্জরিত ও নিপীড়িত হয়, তখন তাহাকে কোন শিক্ষার কথা বলিলে কোন ফলোদয় হইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

কাযেই, কৃষক-প্রজাগণের দুঃখ যাঁহাদিগের প্রাণ বাস্তবিক পক্ষে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাঁহাদের কার্য্যে, কি করিলে কৃষি-কার্য্য কৃষকের পক্ষে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে লাভযোগ্য হইতে পারে, ইহা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা বর্ত্তমান অবস্থায় যুক্তিসঙ্গতভাবে উদ্ভব হইতে পারে না।

কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় কৃষি-কার্য্য কৃষকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে লাভযোগ্য হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, জমী লইয়া কৃষি-কার্য্যের আরম্ভ এবং জমীজাত দ্রব্য লইয়া উহার পরিণতি। কাযেই জমী ও জমীজাত দ্রব্যের সাফল্যে কৃষি-কার্য্যের সাফল্য, জমী ও জমীজাত দ্রব্যের সাফল্য বাদ দিয়া আর কিছুতে কৃষিকার্য্যের সাফল্য প্রত্যাশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কি করিয়া জমী ও জমীজাত দ্রব্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দে[illegible] যাইবে যে, এতদুদ্দেশ্যে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়ে অ[illegible]হিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় :—

(১) জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে [illegible] থাকে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা।

(২) যে জমী স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর এবং যাহা চা[illegible] করিলে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের অপ্রচু[illegible] অথবা মজুরীর আধিক্যবশতঃ কৃষকের পক্ষে [illegible] লোকসানজনক হইতে পারে, সেই জমী যাহা[illegible] কৃষক চাষ না করে এবং তাহা যাহাতে [illegible] জমী অথবা চারণভূমিরূপে রক্ষিত হয়, [illegible] ব্যবস্থা।

(৩) বৎসরের যে সময় জমীতে যেরূপভাবে চা[illegible] করিলে এবং যে-শ্রেণীর বীজ বপন ক[illegible] স্বভাবতঃ উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষ অধিক হইতে পারে, সেই জমীতে বৎসরের [illegible] সময়ে সেইভাবে যাহাতে চাষ করা হয় এ[illegible] সেই শ্রেণীর বীজ যাহাতে বপন করা হয়, [illegible] ব্যবস্থা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—লাঙ্গল দেওয়া, নিড়ান এবং শস্য-ক[illegible] আমরা 'চাষ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি।

(৪) যাহারা স্বহস্তে 'চাষ' করিয়া থাকে, তা[illegible] প্রত্যেকে প্রতি বৎসরে যত জমী চাষ [illegible] পারে, তত জমী তাহাদের প্রত্যেকে [illegible] পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৫) যাহারা স্বহস্তে চাষ করিয়া থাকে, [illegible] প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য [illegible] ভাল থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

(৬) এক একজন কৃষককে যত জমী প্রদা[illegible] হইয়া থাকে, তাহার সীমানা লইয়া [illegible] মধ্যে যাহাতে কোন দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব না [illegible] তাহার ব্যবস্থা।

(৭) যে সমস্ত পশুর সাহায্যে লাঙ্গল দিবার অথ[illegible] কর্ত্তিত পক্ব ফসল গুল্মচ্যুত করিবার কার্য্য [illegible]

হইয়া থাকে, এক একজন কৃষকের যাহাতে সেই সমস্ত পশুর অনটন না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৮) উপরোক্ত পশুর স্বাস্থ্য যাহাতে অটুট থাকে, তাহার ব্যবস্থা।

(৯) ঐ পশুগুলির যাহাতে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্যের অভাব না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(১০) কৃষিজাত শস্য যাহাতে অনায়াসে শিল্প ও শিল্পীর সাহায্যে মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(১১) যে প্রদেশে যে দ্রব্য প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই প্রদেশ হইতে যে স্থানে উহার উৎপত্তি অপ্রচুর হয়, সেইখানে যাহাতে উহার রপ্তানী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(১২) বিভিন্ন কৃষি-জাত ও শিল্প-জাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যাহাতে মূল্য ও মজুরীর হারের সহিত সমতা (parity) রক্ষিত হয় তাহার ব্যবস্থা।

কোন দেশে এই দ্বাদশটি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত থাকিলে কৃষি-কার্য্য যে কৃষকের পক্ষে লোকসানজনক হইতে পারে না, তাহা ঐ দ্বাদশটি ব্যবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে। কৃষি-কার্য্যবিষয়ক উপরোক্ত দ্বাদশটি ব্যবস্থা তলাইয়া চিন্তা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, উহার কয়েকটি দৈহিক-শ্রমসাপেক্ষ আর কয়েকটি বুদ্ধির শ্রম-সাপেক্ষ।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, কৃষি-কার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে লাভের যোগ্য হয়, তাহা করিতে হইলে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবিগণকে সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, জগতে ... শতাব্দীর পূর্ব্বে এমন একদিন ছিল, যখন মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বত্র, এমন কি ইয়োরোপে পর্য্যন্ত, কৃষিকার্য্য কৃষকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে লাভের যোগ্য হইয়াছিল এবং ... জগতের প্রত্যেক দেশের মানুষ অন্য কোন দেশের ... নির্ভর না করিয়া অথবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ... রাস্তায় কোনরূপ গমনাগমন না করিয়া নিজে-দের দেশে বসবাস করিয়া সম্যক্ শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। তখন কাহারও মধ্যে যে ঋণসমস্যা, অথবা অর্থাভাব, অথবা অন্নাভাব, অথবা স্বাস্থ্যাভাব, অথবা শিক্ষাভাবের দৈন্য এতাদৃশ পরিমাণে বিদ্যমান ছিল না, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

উপরোক্ত সময়ে মনুষ্যসমাজের গঠন কিরূপ ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তখন প্রায় প্রত্যেক দেশে মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল:—

(১) জীব ও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ কি এবং কোন্ উপায়ে প্রত্যেক জীবের স্থিতি সর্ব্বতোভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও সম্যক্ ভাবে সুখময় হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে ঔৎসুক্য অথবা প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধান-স্পৃহা (Researches of Science and Philosophy)। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষায় খাঁটি ব্রাহ্মণ বলা হইত। পুরাতন আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণে এবং পুরাতন হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলে এই শ্রেণীর লোক বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে তখন এই শ্রেণীর লোক যে ছিলেন, তাহার সাক্ষ্য কোরাণ ও বাইবেলে পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর লোক তখন তাঁহাদের সাফল্যের তারতম্যানুসারে ব্রাহ্মণ, মুনি ও ঋষি নামে অভিহিত হইতেন।

(২) যে উপায়ে প্রত্যেক জীবের স্থিতি সর্ব্বতোভাবে দীর্ঘস্থায়ী ও সম্যক্ ভাবে সুখময় হইতে পারে সেই উপায়সমূহের সংগঠন যাহাতে কার্য্যতঃ সম্পাদিত হয় এবং উহা অটুট থাকে, তাহার কার্য্য। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ বলা হইত। কোরাণ ও বাইবেল যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে এই শ্রেণীর লোকের বিদ্যমানতার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

(৩) যে যে উপায়ে মানুষ কামান্ধতা পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যতঃ প্রকৃতভাবে অর্থার্থী হইতে পারে এবং তাহাদের যাহাতে অর্থাভাব বিদূরিত হয়, তাহা

দেখাইবার কার্য্য। যাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বৈশ্য-ব্রাহ্মণ বলা হইত।

(৪) ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণগণের আদিষ্ট সংগঠনের কার্য্য। যাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহাদিগকে খাঁটি "ক্ষত্রিয়" বলা হইত।

(৫) বৈশ্য-ব্রাহ্মণগণের আদিষ্ট সংগঠনের কার্য্য। যাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাঁহাদিগকে খাঁটি বৈশ্য বলা হইত। খাঁটি বৈশ্যগণের মধ্যে যাঁহারা বৈশ্য-ব্রাহ্মণগণের আদিষ্ট পথে কৃষি-বিষয়ক সংগঠনের কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে কৃষি-বিষয়ক বৈশ্য, আর যাঁহারা শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক সংগঠনের কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বাণিজ্য-বিষয়ক বৈশ্য অথবা বণিক্-বৈশ্য বলিয়া অভিহিত করা হইত।

(৬) সর্ব্ববিধ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সেবা ও তাঁহাদের আদিষ্ট সংগঠন সম্পন্ন করিবার জন্য কায়িক শ্রমের কার্য্য। যাঁহারা এই কায়িক শ্রমের কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে খাঁটি শূদ্র বলা হইত। খাঁটি শূদ্রগণের মধ্যে যাঁহারা কৃষি-কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে বৈশ্যশূদ্র অথবা কৃষক এবং যাঁহারা পশুরক্ষা, শিল্পবাণিজ্যের কার্য্যে ব্রতী থাকিতেন, তাঁহাদিগকে কার্য্যভেদে রাখাল, গোয়াল, তাঁতী, কুমার, কামার, জোলা প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করা হইত।

এই সময়ে মনুষ্যসমাজে একমাত্র মানবধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল। তখন হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান অথবা মুসলমান ধর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই।

একদিন মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য যে জগতের সর্ব্বত্র সমগ্র মনুষ্যসমাজের মধ্যে উপরোক্ত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল এবং তখন মনুষ্যসমাজের কুত্রাপি কোন স্তরের মানুষের মধ্যেই যে ঋণভার, অর্থাভাব, অন্নাভাব, স্বাস্থ্যাভাব প্রভৃতির সমস্যা বিদ্যমান ছিল না, তাহা প্রয়োজন হইলে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদ ও সংহিতা হইতে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।

মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে উপরে যে ছয়টি শ্রেণীর কথা বলা হইল, তাহা মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষি-বিষয়ক কার্য্য প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর মানুষ, যথা, (১) বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, (২) কৃষি-বিষয়ক বৈশ্য, (৩) কৃষি-বিষয়ক শূদ্র, অর্থাৎ কৃষকগণ মিলিত হইয়া সম্পন্ন করিতেন।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ তিন শ্রেণীর মানুষ তাঁহাদের তিন শ্রেণীর কার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য কখনও কাহারও পক্ষে কথঞ্চিৎ মাত্রায়ও লোকসানজনক হয় নাই এবং কালক্রমে বৈশ্য-ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ও কৃষি-বিষয়ক বৈশ্যগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া কোন প্রকৃত কার্য্য নির্ব্বাহ না করিয়া কায়স্থ এবং জোতদার ও জমিদার নামে পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে শুধু যে কৃষি-বিষয়ক বৈশ্যগণই "কায়স্থ" নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে কৃষি-বিষয়ক শূদ্রগণও "কায়স্থ" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কায়স্থগণের মধ্যে এই দুই শ্রেণীই মূলতঃ কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইলেও যাঁহারা কৃষি-বিষয়ক বৈশ্যশ্রেণী হইতে কায়স্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ সদাচারসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্ম-জ্ঞানযুক্ত, আর যাঁহারা কৃষিবিষয়ক শূদ্রশ্রেণী হইতে কায়স্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ নাস্তিক, কৃতঘ্ন, কদাচারসম্পন্ন, ধূর্ত্ত ও সর্পবৎ ক্রুর। এইরূপভাবে প্রাচীন কালের শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলে বৈশ্য-ব্রাহ্মণ, ও কৃষি-বিষয়ক বৈশ্যের বিলুপ্তি এবং কায়স্থের উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র কৃষি-জীবী শূদ্রগণের সাধনা ও কর্ত্তব্যনির্ব্বাহের ফলে বহুদিন পর্য্যন্ত কৃষিবিষয়ে মানবসমাজের সমস্যা এতাদৃশ কুজ্ঝটিকাপূর্ণ হইতে পারে নাই।

উপরোক্ত ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য দিতেছে তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে যাঁহারা জমীদার নামে খ্যাত, তাঁহাদের কেহ কেহ প্রাচীন কৃষি-বিষয়ক বুদ্ধিজীবীগণের বংশধর এবং তাঁহারাই একদিন কৃষকগণের সহিত মিলিত হইয়া কৃষিসম্বন্ধে সাধনা ও সংগঠন করিয়াছিলেন বলিয়া মানবসমাজে এতাদৃশ শঙ্কাপ্রদ সমস্যাসমূহের উদ্ভব হইতে পারে নাই।

কাযেই, যুক্তি অনুসারে বলিতে হইবে যে, যাঁহাদের কাযোর ফলে জমীদার ও প্রজাগণের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অমিলনের উদ্ভব হইতে পারে, তাঁহারা আইন অমান্য (civil disobedience) করিয়া জেলে যাওয়ার ফলে দেশপ্রেম (patriotism)-সম্বন্ধীয় কথায় যতই কৌলীন্য ও এক-চেটিয়াত্ব (monopolisation) অর্জ্জন করুন না কেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভাবতঃ নফর (slaves) ও দো-আসলা (half-caste) এবং মানবসমাজের শত্রু।

আমরা এখনও বলি যে, যাঁহারা আত্ম-প্রতারক নহেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, নিজেদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্যই কৃষকসমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়োজন। যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিবেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, উহাতে কোন মহত্ত্বের নিদর্শন নাই, পরন্তু উহা প্রত্যেকেরই নিজের কার্য্য।

বুদ্ধিজীবিগণের কৃষিবিষয়ক কর্ত্তব্য কি কি, তাহা জমীদার-শ্রেণীর মানুষগুলি বিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই কৃষিসম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। জমীদার-গণ যাহাতে নষ্ট হইয়া যান, তাহা করিলে কখনও কৃষির সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানও সম্ভবযোগ্য হইবে না। পরন্তু, কৃষকের দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইলে যাহাতে প্রকৃত কর্ত্তব্য-জ্ঞানযুক্ত জমীদার-শ্রেণীরও পুনরভ্যুদয় হয় এবং এই জমীদারগণ যাহাতে তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে বাধ্য হন, তাহার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কৃষকের অবস্থায় জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে যাহাতে কাহারও কোন বিশেষ স্বত্ব বজায় না থাকে, অথবা জমীদারগণকে যাহাতে কোন নামথারিজের ফি না দিতে হয়, তাহার স্বপক্ষে যে বহু যুক্তি আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু যত-দিন পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানযুক্ত ও কর্ত্তব্যসাধননিরত জমীদার-শ্রেণীর যাহাতে পুনরভ্যুদয় হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পা-দিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন লভ্যাংশ নাকচ করিবার ব্যবস্থা করিলে জমীদার ও কৃষক-প্রজাগণের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে বটে এবং তাহাতে কৃষকের অন্নাভাব প্রভৃতি সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে মাত্র, কিন্তু অন্য কোন ফলোদয় হইবে না।

উপসংহারে আমরা কৃষক ও তাহাদের প্রকৃত প্রতিনিধি-গণকে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

তাঁহারা যদি ইংরাজী বুলিতে,—অথবা যাঁহারা কখনও কোন গঠনকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার কোন সুযোগ আদৌ লাভ করিতে পারেন নাই, যাঁহারা প্রায়শঃ হয় নফরগিরির দ্বারা, নতুবা পরের মাথায় কাঠাল ভাঙ্গিয়া আশ্রম-সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন, যাঁহারা বাপের অর্জ্জিত পয়সায় পোদ্দারী করিতেছেন, তাঁহারা যে-কংগ্রেসের পরিচালক,—সেই কংগ্রে-সের মত-বাদে বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, মনুষ্যসমাজে প্রলয় সমাগত এবং তাহার জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

প্রলয়াবস্থা যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত মানুষ কি আজ মনুষ্য-সমাজে একজনও নাই? আর কতদিন আমরা তাণ্ডবনৃত্যে মাতিয়া থাকিব?

ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিলে অথবা তাঁহা-দের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করিলে হিন্দু ও মুসলমানে, হিন্দু ও হিন্দুতে, মুসলমান ও মুসলমানে, প্রত্যেক প্রদেশে প্রদেশে, জমীদার ও প্রজায় যাহাতে কলহের উদ্ভব হয়, তাহার বীজ যে গত ৩৫ সালের সংস্কার আইনে নিহিত রহিয়াছে, অন্যদিকে ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা অথবা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার চেষ্টা না করিলে ঐ সংস্কার আইনের সহায়তাতেই যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন, প্রজা ও জমীদারের মিলন সংঘটিত হইতে পারে এবং তদনু-সারে গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানী ও তাঁহাদের অনুচরবর্গই যে আমাদের সর্ব্বনাশের মূল, তাহা আমরা কবে বুঝিব?

বর্ত্তমান শিক্ষা ও শিক্ষিতের নমুনা

রাজসাহী কলেজের হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণের মধ্যে হোষ্টেলের সাম্প্রদায়িক আবাসস্থান লইয়া যে একটা তুমুল কলহের উদ্ভব হইয়াছিল, তজ্জন্য যে ঐ কলেজ সাময়িক ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় বাংলা আসেম্ব্লিতে প্রকাণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। ঐ বাগ্‌বিতণ্ডার

রূপ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু সভ্যগণের মতে যত কিছু দোষ মুসলমান ছাত্রগণের এবং ঐ মুসলমান ছাত্রগণের সাম্প্রদায়িক ভাবের জন্যই হিন্দু ছাত্রগণ ক্ষুব্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিল, আর মুসলমান সভ্যগণের মতে যত কিছু দোষ হিন্দু ছাত্রগণের এবং ঐ হিন্দু ছাত্রগণ মুসলমান ছাত্রগণের প্রতি অবজ্ঞা না দেখাইলে এতাদৃশ কলহের উদ্ভব হইত না। হিন্দু সভ্যগণের কথায় বুঝিতে হয় যে, মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক-ভাবাপন্ন এবং তাঁহারা, অর্থাৎ হিন্দুগণ ঐ ভাব হইতে মুক্ত। কলেজটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া হিন্দু সভ্যগণ প্রায়শঃ মিলিত হইয়া প্রধান মন্ত্রীকে পর্য্যাপ্ত বাক্যবাণে বিপর্যস্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে-শিক্ষায় আট বৎসর অতিবাহিত করিয়াও মানুষ হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক, মানুষ যে মানুষ তাহা ছাত্রগণ বুঝিতে না পারিয়া নিজদিগকে হিন্দু ও মুসলমান নামে বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া মনে করে, সেই শিক্ষা ও সেই শিক্ষালয় বন্ধ হইয়া গেলে মানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা অথবা লাভের সম্ভাবনা ?

যে হিন্দুগণ একযোগে মুসলমানগণকে মুসলমান বলিয়া আক্রমণ করিতে অথবা তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহারা নিজদিগকে সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্ত মনে করিতে পারেন—কোন্ যুক্তি-বলে? যাঁহাদের এতটুকু যুক্তিজ্ঞান নাই, তাঁহারা নিজদিগকে শিক্ষিত অথবা কোনরূপ নেতা বলিয়া মনে করিতে যে কুণ্ঠাবোধ করেন না, আমাদের মতে তাহার কারণ, তাঁহারা ইংরাজী-শিক্ষিত এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন।

'লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

কার্ত্তিক—১৩৪৪

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।

বিজয়ার নমস্কার

আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে "বিজয়ার নমস্কার" জানাইতেছি।

"বিজয়ার নমস্কার" জানাইবার সময় আমাদের মনে প্রথমতঃ দুইটি প্রশ্ন জাগ্রত হইতেছে। ঐ দুইটি প্রশ্নের মধ্যে প্রথমটি, "বিজয়া" ব্যাপারটি কি? এবং দ্বিতীয়টি, "নমস্কার প্রকরণ"টির উদ্দেশ্য কি?

বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে বিজয়ার দিন পরস্পরের মধ্যে এত আলিঙ্গনের কোলাহল কেন, অন্য কোন দিন এবংবিধ মিলনের ব্যবস্থা না হইয়া একমাত্র বিজয়ার দিনই ঐ ব্যবস্থা সংঘটিত হইল কেন, তাহার অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলে কতদিন হইতে এবং জগতের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজয়ার এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

কতদিন হইতে জগতের কোন্ কোন্ স্থানে, কোন্ কোন্ মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজয়ার এতাদৃশ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে,জগতের যে যে স্থানে যে যে মনুষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাপেক্ষা প্রাচীনতর কোন ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সংস্কারের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই সেই স্থানে এবং সেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে শরৎ কালে কোন না কোন আকারে বিজয়ার বৈশিষ্ট্য চলিয়া আসিতেছে।

বাংলাদেশে বাঙ্গালীগণ যেরূপ ভাবে "দুর্গোৎসব" করিয়া থাকেন, তাদৃশ দুর্গোৎসব হয় ত' অন্য কোন দেশে, অথবা অন্য কোন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে দেখা যাইবে না, কিন্তু বিজয়ার অথবা শরৎ কালের অন্য কোন দিনে তাদৃশ কোন না কোন উৎসব ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যে কয়েক বৎসর আগেও প্রচলিত ছিল, তাহার সাক্ষ্য অনায়াসেই পাওয়া যাইবে।

কাজেই, বিজয়ার আলিঙ্গন-উৎসব যে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

কোন্ মহাত্মা কবে কি উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথমে দুর্গোৎসব ও বিজয়ার উৎসব মনুষ্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উক্ত উৎসব-পরিকল্পনা সর্ব্বাগ্রে সত্যদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষিগণের চিন্তায় স্থান পাইয়াছিল এবং তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে উহা মনুষ্য-সমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। আরও দেখা যাইবে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের দ্বারা দুর্গোৎসব এবং বিজয়ার উৎসবের ব্যবস্থা মানব-সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ দুইটি উৎসবেরই যাদৃশ ব্যবস্থা ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এখন আর ঠিক ঠিক সেই সেই ব্যবস্থা

বিদ্যমান নাই। পরন্তু, গত ছয় হাজার বৎসর হইতে তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে ঋষিগণের কথা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিবার অক্ষমতা প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রবর্ত্তিত দুর্গোৎসব ও বিজয়ার উৎসবের ব্যবস্থায় এতাদৃশ বিকৃতি স্থান পাইয়াছে যে, এখন আর ঐ ব্যবস্থা বিদ্যমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং দুর্গাপূজার নামে কতকগুলি অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন জঞ্জাল ও প্রতারণা-পূর্ণ প্রক্রিয়া এবং দুর্গোৎসব ও বিজয়ার উৎসবের নামে প্রায়শঃ কতকগুলি তাণ্ডব নৃত্যের হৈ-হৈ চলিতে পারিতেছে। জনসাধারণ যাহাতে শারীরিক ও মানসিক দুঃখের হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইতে পারে, ধনের প্রাচুর্য্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া উৎসবের নামে যাহাতে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের হানিকর কোন কার্য্যে জনসাধারণ প্রবৃত্ত না হয়, তাহার সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যেই যে ঋষিগণের মনে স্মরণাতীত কাল পূর্ব্বে দুর্গোৎসব ও বিজয়ার উৎসবের পরিকল্পনা স্থান পাইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য এখনও অথর্ব্ববেদ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণ এবং কালিকাপুরাণে উজ্জ্বল ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু, যে ভাষায় ঐ বেদ ও পুরাণ লিখিত রহিয়াছে, সেই ভাষা আধুনিক পণ্ডিতগণ যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই দুর্গাপূজা, দুর্গোৎসব এবং বিজয়ার উৎসবের প্রকৃত মর্ম্ম ও পদ্ধতি তাঁহারা উদ্ঘাটন করিতে পারেন না এবং তাঁহারা ঐ মর্ম্ম ও পদ্ধতি উদ্ঘাটন করিতে পারেন না বলিয়াই মানুষ দুর্গোৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াও শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকে এবং দুর্গোৎসব সত্ত্বেও মানুষের শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য,পুত্র-কন্যার বিয়োগ-জনিত শোক-তাপ, দারিদ্র্য উপস্থিত হয় বলিয়াই ক্রমে ক্রমে মানুষ দুর্গোৎসবের গূঢ় প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ঐ উৎসব বড়-মানুষের ও বড়-মানুষীর একটা ফ্যাশনের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'বিজয়া' ব্যাপারটা কি, অর্থাৎ উহার উদ্দেশ্য ও প্রকরণ কি, তাহা আমূল ভাবে বুঝিতে হইলে অথর্ব্ববেদ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও কালিকাপুরাণ সম্যক ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। কোন পত্রিকার কোন সন্দর্ভে উহার আমূল কথা প্রচার করা সম্ভব নহে। এই সন্দর্ভে আমরা ঐ-সম্বন্ধীয় মোটা কথাগুলি মাত্র পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব।

বিজয়ার উদ্দেশ্য ও প্রকরণ কি, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, দেব-দেবতা-দেবী, পূজা, দেব-দেবতা-দেবীর পূজা, এবং প্রতিমা, দুর্গা, দুর্গা-পূজা, দুর্গোৎসব, এই কয়টি প্রকরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

দেব, দেবতা ও দেবী এই তিনটি শব্দের সংজ্ঞা কি ?

দেব, দেবতা ও দেবী, এই তিনটি শব্দ যে সত্য-দ্রষ্টা ঋষিগণ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিতেন, তাহা তাঁহাদের প্রণীত বেদ, বেদান্ত, তন্ত্র, দর্শন ও সংহিতা গ্রন্থের মূল অংশের সহিত কথঞ্চিৎ পরিমাণেও যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই স্বীকার করিবেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের স্ফোট-বাদ যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া শব্দ-স্ফুরণের মূল কোথায় এবং তাহার ক্রমিক প্রকরণ কি, তাহা নিজ নিজ দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়া বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তদনুসারে দেব বলিতে বুঝায় জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধিগ্রাহ্য অব্যক্ত সেই অংশগুলি, যে অংশগুলির বিদ্যমানতা বশতঃ জীবের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের বীজ অথবা অণু-ভূত অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে; দেবতা বলিতে বুঝায় জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য অব্যক্ত সেই অংশগুলি, যে অংশগুলির বিদ্যমানতা বশতঃ জীবের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের অভিব্যক্তি হইতে এবং উহার প্রত্যেকটির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারিতেছে; দেবী বলিতে বুঝায় জীব-দেহাভ্যন্তরস্থ ও ভূমণ্ডলস্থ অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য সেই অব্যক্ত কার্য্য-সমূহ (functions) যাহার বিদ্যমানতা বশতঃ জীব-

দেহের ও ভূমণ্ডলের ব্যক্ত কার্য্য-সমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে।

যাঁহারা নিজ দেহাভ্যন্তরে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও আত্মতত্ত্বের কোন অংশ প্রত্যক্ষ করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ঐ আত্মতত্ত্বকে প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিতে পারা যায়। উহার এক অংশকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-তত্ত্ব এবং অপর অংশকে কার্য্য-তত্ত্ব অথবা শক্তি-তত্ত্ব নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যাহাকে Anatomy বলা হইয়া থাকে, তাহা উপরোক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-তত্ত্বের সামান্য অংশ-মাত্র, আর যাহাকে Physiology বলা হইয়া থাকে, তাহাও উপরোক্ত কার্য্য-তত্ত্ব অথবা শক্তি-তত্ত্বের সামান্য অংশ-মাত্র।

প্রত্যেক জীবের দেহাভ্যন্তরে কোথায় কোন্ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ বিদ্যমান আছে, কোন্ পদ্ধতিতে এবং কোন্ কোন্ 'দ্রব্যের' সহায়তায় ঐ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গগুলির গঠন ও পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে, এতাদৃশ তথ্যগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-তত্ত্ব হইতে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে।

কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে অথবা কোন্ কোন্ কার্য্য-শক্তির সহায়তায় জীব তাহার বিভিন্ন শক্তি (অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শন প্রভৃতি) লাভ করিয়া থাকে, কেনই বা বিভিন্ন জীবের উপরোক্ত বিভিন্ন শক্তি এত বিভিন্নতা লাভ করিয়া থাকে, এতাদৃশ তথ্যগুলি কার্য্য-তত্ত্ব অথবা শক্তি-তত্ত্ব হইতে প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের প্রত্যেক অঙ্গটি এবং প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটি তিন অংশে বিভক্ত। উহার একাংশ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য,মধ্যমাংশ অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং মূলাংশ বুদ্ধি-গ্রাহ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানব-শরীরের যে কোন অস্থিখানিকে গ্রহণ করিয়া কোথা হইতে কি ভাবে উহার উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে উপলব্ধি-প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, উহার একাংশ ত্বকের দ্বারা অনুভবযোগ্য বটে, কিন্তু ক্রমেই উহা এত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরাবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে,যে অংশ হইতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অংশের উদ্ভব হইতেছে, সেই অংশ একমাত্র মেদের অনুভবযোগ্য বটে, কিন্তু অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের অনুভবযোগ্য নহে। যে অংশ হইতে মেদ-গ্রাহ্যাংশের উদ্ভব হইতেছে সেই অংশের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অংশ একমাত্র বুদ্ধি গ্রাহ্য।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, শুধু মানব-শরীরের অস্থি কেন, বিশ্বদুনিয়ায় প্রকৃতির সৃষ্টিতে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটি উপরোক্ত তিন অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেক অঙ্গটির ও প্রত্যেক প্রত্যঙ্গটির একটি কার্য্যশক্তি বিদ্যমান আছে। ঐ কার্য্যশক্তির কোথা হইতে কি পদ্ধতিতে উদ্ভব হইতেছে অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্যশক্তির মূলে এক একটি অব্যক্ত কার্য্য-শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ অব্যক্ত কার্য্য-শক্তি হইতে ব্যক্ত কার্য্যশক্তির উৎপত্তি হইতেছে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অব্যক্ত কার্য্যশক্তিকে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যক্ষ করা না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যশক্তি (physiological functions) আমূলভাবে বুঝিতে পারা সম্ভব হয় না।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে অংশটি অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই অংশটিকে ঐ ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিষয়ক দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, আর যে যে অংশ কেবল মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেই সেই অংশকে তাঁহারা দেব নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্যশক্তি যে যে অব্যক্ত কার্য্যশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই অব্যক্ত কার্য্যশক্তি ঋষিগণের ভাষায় এক একটি দেবী বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছে।

পূজার সংজ্ঞা

বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠানুসারে যাহা অব্যক্ত, অথবা অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাকে উপলব্ধি করিয়া তাহার কার্য্য প্রত্যক্ষ করার নাম পূজা।

দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা এবং প্রতিমা

দেব, দেবতা, দেবী এবং পূজার সংজ্ঞা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা বলিতে দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনটির, অথবা কার্য্য-শক্তির কোনটির অব্যক্তাংশ উপলব্ধি করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করার নাম ঐ দেব, অথবা ঐ দেবতা, অথবা ঐ দেবীর পূজা করা।

দেহাভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা উহার কার্য্যশক্তি, উহার অব্যক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা অব্যক্ত কার্য্য-শক্তি হইতে যে যে পদ্ধতিতে অথবা যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কার্য্য-শক্তির সহায়তায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিমূর্ত্তি অথবা চিত্রের নাম ঐ ঐ দেব, অথবা দেবতা, অথবা দেবীর প্রতিমা।

বিভিন্ন দেব, দেবী, ও দেবতার পূজায় সাফল্য লাভ করিতে পারিলে যে, দেহাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ এবং তাহার প্রত্যেকটির সর্ব্ববিধ কার্য্যশক্তি সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা এক-দিকে যেরূপ অথর্ব্ববেদের সহায়তায় প্রমাণিত হইতে পারে, অন্যদিকে আবার কোন দেব ও দেবীর পূজায় যে সমস্ত প্রকরণ অবলম্বন করা হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিলেও এতদ্বিষয়ে অনুমান করা সম্ভব হইতে পারে।

প্রত্যেক পূজাতেই যে-দেব, অথবা দেবীর পূজা করা হইবে, তাঁহার পট অথবা প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়া পুরোহিতগণ কতকগুলি প্রাথমিক কার্য্য সমাপন করিয়া অঙ্গ-ন্যাস এবং কর-ন্যাস করিয়া থাকেন এবং তাহার পর কূর্ম্ম-মুদ্রার সাহায্যে ধ্যান করিয়া সর্ব্বশেষে ঐ দেবতার বীজ-মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন।

অঙ্গ-ন্যাস, কর-ন্যাস, কূর্ম্ম-মুদ্রা, ধ্যান, বীজ-মন্ত্রের জপ এবং প্রতিমার উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, অঙ্গ-ন্যাস ও কর-ন্যাসের সহায়-তায় প্রধানতঃ যে যে অঙ্গ ও কার্য্যশক্তির যোগে মানবের দেহ পরিচালিত হইয়া থাকে, পুরোহিত সর্ব্ব প্রথমে স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ সেই সেই অঙ্গ ও কার্য্যশক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তাহার পর কূর্ম্মমুদ্রার সহায়তায় স্বীয় পৃষ্ঠদেশ ও নাভিদেশের যত-খানি কূর্ম্মপৃষ্ঠের সহিত তুলনীয়, ততখানি স্থান সম্যক ভাবে অনুভব করা সম্ভবযোগ্য হয়।

এইভাবে শরীরের যে যে অঙ্গ ও কার্য্য-শক্তির যোগে মানবদেহ পরিচালিত হইয়া থাকে, সেই সেই অঙ্গ ও কার্য্য-শক্তি এবং স্বীয় পৃষ্ঠদেশ ও নাভিদেশের বিস্তৃতি ও বিভিন্ন কার্য্য অনুভব করিয়া লইয়া সাধক ধ্যান ও সম্মুখস্থ প্রতিমূর্ত্তির সহায়তায় যে অব্যক্ত অঙ্গ অথবা কার্য্য-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি পূজায় ব্রতী হইয়াছেন, সেই অব্যক্ত অথবা কার্য্য-শক্তি নিজ দেহাভ্যন্তরে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন। দেহের কোন্ স্থানে ঐ অঙ্গ অথবা কার্য্যশক্তি বিদ্যমান রহি-য়াছে, তাহা ধ্যানের (অর্থাৎ বর্ণনার) অর্থ বুঝিলে এবং প্রতিমা (অর্থাৎ উহার ফটো অথবা প্রতিমূর্ত্তি) অধ্যয়ন করিতে জানিলে অনুমান করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। দেহের কোন্ স্থানে ঐ অব্যক্ত অঙ্গ অথবা কার্য্য-শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা তাহার বর্ণনা (অর্থাৎ ধ্যান) এবং প্রকৃতির (অর্থাৎ প্রতিমার) সহায়তায় অনুমান করা সহজসাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ঐ আরাধ্য দেব, অথবা আরাধ্য দেবীর মূলমন্ত্র জপ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। মূলমন্ত্র জপ করিবার অর্থ ঐ মন্ত্ররূপী শব্দের স্পর্শ লওয়া। কিরূপভাবে শব্দের স্পর্শ অনুভব করিতে হয়, তাহার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণের সহিত মুখমধ্যস্থ বায়ুর কম্পন আরম্ভ হইয়া থাকে এবং বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে বিভিন্ন স্থানে বায়ুর ঐ কম্পন আরম্ভ হইয়া বিভিন্ন বেগে (velocity), বিভিন্ন গতিতে (direction), বিভিন্ন স্থানে উহার অবসান (termination) ঘটিয়া থাকে।

সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ এমন ভাবেই বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে বিভিন্ন দেব ও দেবীর বীজ-মন্ত্রগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, দেহাভ্যন্তরস্থ যে অঙ্গ অথবা কার্য্য-শক্তি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সাধক দেব অথবা দেবী-

বিশেষের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ঐ দেব অথবা দেবীর বীজ-মন্ত্র উচ্চারণ করিলে বায়ুর যে কম্পন আরম্ভ হয়, তাহা যে স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া যে স্থান দিয়া যেখানে অবসান লাভ করিয়া থাকে, ঠিক ঠিক সেই স্থানেই ঐ অব্যক্ত অঙ্গ অথবা কার্য্য-শক্তি বিদ্যমান থাকে।

প্রত্যেক স্পর্শ কিরূপভাবে দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা অবগত হইয়া কোন মন্ত্রের সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে মন্ত্র-সম্বন্ধীয় আমাদের উপরোক্ত কথাগুলির সত্যতা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না। কার্য্যে ব্রতী না হইলে উপরোক্ত কথাগুলির সত্যতা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না বটে, কিন্তু প্রত্যেক শব্দের যে এক একটা স্পর্শ আছে, প্রত্যেক শব্দে যে বিভিন্ন স্থান হইতে বায়ুর কম্পন আরম্ভ হইয়া বিভিন্ন গতিতে বিভিন্ন বেগে ও বিভিন্ন স্থানে উহা অবসান লাভ করিয়া থাকে, শব্দ-সমন্বয়ের সাহায্যে যে দেহের বিভিন্ন স্থানের স্পর্শ লওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা খুব সম্ভব সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও অনুমান করা অসম্ভব হইবে না।

কাজেই বলা যাইতে পারে যে, কোন পূজার প্রকরণসমূহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই পূজার দ্বারা যে দেহাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অব্যক্ত অঙ্গের ও অব্যক্ত কার্য্য-শক্তির স্পর্শ লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

পূজার প্রয়োজনীয়তা

পূজার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা বলিতে হইলে আত্ম-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার, অথবা মানুষের দেহে কোন্ কোন্ অব্যক্ত অঙ্গ এবং কোন্ কোন্ অব্যক্ত কার্য্যশক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া থাকে। কারণ, আগেই বলিয়াছি "দেব" বলিতে বুঝায় জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ বুদ্ধিগ্রাহ্য অব্যক্ত সেই অংশগুলি, যে অংশগুলির বিদ্যমানতা বশতঃ জীবের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের বীজ অথবা অণুভূত অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে, "দেবতা" বলিতে বুঝায় জীবের দেহাভ্যন্তরস্থ অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অব্যক্ত সেই অংশগুলি যে অংশগুলির বিদ্যমানতা বশতঃ জীবের মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের অভিব্যক্তি হইতে এবং উহার প্রত্যেকটির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারিতেছে, "দেবী" বলিতে বুঝায় জীব-দেহাভ্যন্তরস্থ ও ভূমণ্ডলস্থ অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য সেই অব্যক্ত কার্য্য-শক্তিসমূহ, যাহার বিদ্যমানতা বশতঃ জীবদেহের ও ভূমণ্ডলের ব্যক্ত কার্য্যসমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে, এবং দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা বলিতে দেহাভ্যন্তরস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনটির অথবা কার্য্য-শক্তির কোনটির অব্যক্তাংশ উপলব্ধি করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করার নাম, ঐ দেব অথবা ঐ দেবতা অথবা ঐ দেবীর পূজা করা।

আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার, অথবা মানুষের দেহে কোন্ কোন্ অব্যক্ত কার্য্যশক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজনীয়তা কি, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে একবার মনুষ্য-জীবনে কি কি আবশ্যক, তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

মনুষ্য-জীবনে যাহা আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত ছয়টি কথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে, যথা,—

(১) আর্থিক প্রাচুর্য্য, অর্থাৎ স্বাস্থ্যপ্রদ অন্ন, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা, লৌকিকতা, কুটুম্বিতা প্রভৃতির জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহার কোনটির অভাব যাহাতে না হয়, তাদৃশ অবস্থা;

(২) স্বাবলম্বন, অর্থাৎ ভিক্ষা, শঠতা ও প্রবঞ্চনা, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, অথবা এক কথায়, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া যাহাতে মনুষ্যজাতির ধনবৃদ্ধি করিয়া অথবা ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া স্বীয় আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাদৃশ অবস্থা;

(৩) মানসিক শান্তি;

(৪) মানসিক সন্তুষ্টি;

(৫) দীর্ঘ যৌবন, অর্থাৎ রোগহীনতা;

(৬) দীর্ঘ জীবন, অর্থাৎ শোক-তাপহীনতা।

মানুষের জীবনে কি কি বস্তুর আবশ্যক, তৎসম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি অর্জ্জন করিতে হইলে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এমন কি, সুস্থ শরীর, সুস্থ ইন্দ্রিয়, সুস্থ মন এবং সুস্থ বুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে মানুষের যে কি কি বস্তুর প্রয়োজন, তাহাও আত্ম-তত্ত্বের জ্ঞান ব্যতীত স্থির করা সম্ভব নহে।

কোন্ বস্তুতে অথবা কোন্ ব্যবস্থায় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সুস্থ থাকিবে, তাহা স্থির করিতে হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃদ্ধি ও ক্ষয় হয় কি প্রকারে, তাহা প্রত্যক্ষ করা একান্ত আবশ্যকীয় নহে কি? কি প্রকারে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করার নাম আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া।

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সম্যক্ ভাবে সুস্থ রাখিবার জন্য কোন্ কোন্ বস্তুর ও ব্যবস্থার প্রয়োজন তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ আত্মতত্ত্বের জ্ঞান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, সেইরূপ আবার শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে হইলে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহা যথোপযুক্ত পরিমাণে অর্জ্জন করাও আত্মতত্ত্বের জ্ঞান ব্যতীত সম্ভবযোগ্য নহে।

আগেই বলিয়াছি যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিতে হইলে আর্থিক প্রাচুর্য্য, স্বাবলম্বন, মানসিক শান্তি, মানসিক সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন—এই ছয়টি বস্তু একান্ত প্রয়োজনীয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিতে হইলে মানুষের বুদ্ধি যাহাতে ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া বৃদ্ধি লাভ করে, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহা করিতে হইলে কি প্রকারে বুদ্ধির ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয়, তাহা নিজ দেহাভ্যন্তরে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কি করিলে কাহারও গলগ্রহ না হইয়া মনুষ্যজাতির ধনবৃদ্ধি করিয়া অথবা ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিয়া স্ব স্ব আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলেও যাহাতে বুদ্ধির ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি সাধিত হয়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্যও আত্মতত্ত্বজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান রহিয়াছে।

কাজেই বলা যাইতে পারে যে, মানুষকে যথার্থভাবে মনুষ্যনামের উপযোগী হইতে হইলে আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান, অথবা দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা করিতে হয় কি প্রকারে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

দুর্গা, দুর্গা-পূজা ও দুর্গোৎসব

বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠানুসারে "দুর্গা" বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য-শক্তি যাহার বিদ্যমানতা-বশতঃ মানুষের জিহ্বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন এবং মানুষের চক্ষু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

মূলতঃ কোন্ শক্তির বশে মানুষ তাহার বাক্‌শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে, ঐ মূলশক্তি মানবদেহের কোন্ কোন্ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কি পদ্ধতিতে বিকশিত হইয়া থাকে, তাহা দুর্গার ধ্যান যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে এবং দুর্গার প্রতিমা যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারা সম্ভব হয়।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধি ও অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি অজ্ঞাত শক্তির নাম "দুর্গা"। তাঁহার ধ্যান অথবা ঐ অব্যক্ত শক্তির বর্ণনা যে ভাষায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেই ভাষা অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় ভাষা। ঐ ভাষা কোন লৌকিক ব্যাকরণের দ্বারা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। উহা যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে, শব্দবিজ্ঞানের সাধনায়, অথবা এক কথায়, বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করিতে হয়।

পাছে মানুষ ঐ অব্যক্ত শক্তির বর্ণনা-গ্রহণে কোন রূপ ভুল করে, তজ্জন্য সত্যদ্রষ্টা পরমারাধ্য হৃদয়েশ্বরগণ

ঐ অব্যক্ত শক্তির মূল কোথায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনায় কালিকাপুরাণে, ঐ অব্যক্ত শক্তি বুদ্ধিগ্রাহ্য অবস্থায় ক্রমে উপনীত হয় কি প্রকারে, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় পদ্মপুরাণে, উহা বুদ্ধিগ্রাহ্য অবস্থায় এবং ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অবস্থায় উপনীত হইয়া বিকৃতি প্রাপ্ত হয় কি প্রকারে এবং মানুষ কাম-লোভাবিষ্ট হয় কি প্রকারে, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় মার্কণ্ডেয় পুরাণে কারিকার উপর কারিকা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যে ভাষায় ঐ কারিকাগুলি লিখিত, তাহাও অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় এবং উহা একমাত্র বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠ ব্যতীত কোন লৌকিক ব্যাকরণের দ্বারা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। উহা যে লৌকিক ব্যাকরণের দ্বারা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তথাকথিত পণ্ডিতগণ উহা বিকৃত অর্থে ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং মানব-সমাজকে প্রতারিত করিয়া সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণকে শ্রদ্ধা-হীন মানুষের চক্ষে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। ফলে, এক দিকে যেরূপ উপরোক্ত তথাকথিত দাম্ভিক পণ্ডিতগণ প্রায়শঃ নির্ব্বংশ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছেন, সেইরূপ অন্যদিকে আবার যে পূজা যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হইলে, মানবসমাজের অশেষবিধ কল্যাণসাধনে সক্ষম, সেই পূজা বর্ত্তমানে বড় মানুষের ও বড়-মানুষীর একটা আমোদের খেলামাত্রে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। কোন দেব অথবা দেবীর ধ্যান যথাযথ অর্থে বুঝিয়া উঠা যেরূপ সাধনাসাপেক্ষ, সেইরূপ উহার প্রতিমা অধ্যয়ন করাও সহজসাধ্য নহে।

কোন চলনশীল যন্ত্রের কোন অংশের নক্সা প্রস্তুত করা, অথবা ঐ নক্সা অধ্যয়ন করা যে কত দুরূহ, তাহা যাঁহারা উহা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়াছেন।

চলনশীল যন্ত্রের কোন অংশের নক্সা কিরূপভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা সাধনা ছাড়া সহজ বুদ্ধি (common sense) দ্বারা শিক্ষা করা সম্ভব হয় না। চলনশীল যন্ত্রের কোন অংশের নক্সা কিরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হয় এবং তাহার অধ্যয়নই বা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যা কোন আধুনিক গ্রন্থে আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। উহার সন্ধান একমাত্র বেদে পাওয়া যাইবে এবং আমাদের মনে হয়, বাইবেল এবং কোরাণেও উহা লিপিবদ্ধ আছে।

মূলতঃ কোন্ শক্তির বশে মানুষ তাহার বাক্‌শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতে পারে, ঐ মূলশক্তি মানব-দেহের কোন্ কোন্ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কি পদ্ধতিতে বিকশিত হইয়া থাকে, তাহা যে দুর্গার ধ্যান যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে এবং দুর্গার প্রতিমা যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে সম্যক্ পরি-মাণে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়, প্রয়োজন হইলে উহা আমরা দাম্ভিকতাহীন অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের সম্মুখে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি।

যে প্রকরণের দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত "দুর্গা" নামক শক্তিটি নিজ দেহাভ্যন্তরে অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়, সেই প্রকরণের নাম "দুর্গা-পূজা"।

মূলতঃ যে শক্তিবশে মানুষের জিহ্বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন এবং চক্ষু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ পরিমাণে অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইলে প্রথমতঃ বাক্‌শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি অসংযততা প্রাপ্ত হইলে উহা হইতে যে কাম, ক্রোধ ও লোভের উদ্ভব হইতে পারে এবং যে শক্তিবশে মানুষ বাক্ ও দৃষ্টি চালনার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে, সেই শক্তি সর্ব্বতোভাবে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং তাহার কিয়দংশ যে অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ ঐ শক্তি যে সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয় দ্বারা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, পরন্তু উহার কিয়দংশ যে বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তৃতীয়তঃ ঐ শক্তি যে সর্ব্বতোভাবে নিজ দেহাভ্যন্তরে, এমন কি বুদ্ধি দ্বারা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, পরন্তু উহার বীজ যে নিকটবর্ত্তী বায়ুমণ্ডলে নিহিত রহিয়াছে, তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবে যে শক্তিবশে মানুষের জিহ্বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং চক্ষু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ পরিমাণে অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তিন ভাগে উহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং ইহারই জন্য দুর্গা-পূজাও তিন দিনে সাধিত হইয়া থাকে।

যে শক্তিবশে মানুষের জিহ্বা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং চক্ষু দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হয়, সেই শক্তি বৎসরের প্রত্যেক দিন অথবা দিনের প্রত্যেক সময় অনুভব করিয়া প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থানের তারতম্যানুসারে মানুষের কার্য্যশক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে এবং কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ অবস্থানের দিনে ঐ অনুভূতি সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। ইহারই জন্য কোন বিশেষ বিশেষ দিন ব্যতীত দুর্গা-পূজা করা সম্ভব হয় না।

বৎসরের প্রত্যেক দিনে, অথবা দিবসের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে যেরূপ উপরোক্ত অনুভূতি লওয়া সম্ভব হয় না, সেইরূপ সকল মানুষের পক্ষেও উহা সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা আত্মানুভূতির সাধনায় কিয়ৎ পরিমাণেও অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, কেবল মাত্র তাঁহাদেরই পক্ষে ঐ অনুভূতি লওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। তাহারই জন্য কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণই পূজার অধিকারী হইয়া থাকেন; কারণ, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের কথানুসারে আত্মানুভূতির সাধনারত না হইলে মানুষ ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য হইতে পারে না।

যদিও প্রকৃত ব্রাহ্মণ না হইলে কোন পূজার অধিকারী হওয়া যায় না, তথাপি সকল বর্ণের লোকেরই সকল রকম দেব, দেবতা ও দেবী সম্বন্ধে রহস্য পরিজ্ঞাত হইবার অনুসন্ধিৎসা বিদ্যমান থাকিতে পারে। বিশেষতঃ, মূল কোন্ শক্তিবশে মানুষের জিহ্বা তাহার বাক্‌শক্তি লাভ করিয়া থাকে, অথবা তাহার চক্ষু দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া থাকে, উহা পরিজ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মানুষেরই আবশ্যকীয়।

এইরূপে যখন কোন দেব, দেবতা অথবা দেবী সম্বন্ধীয় রহস্য ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে অথবা অপর কোন নিম্নাধিকারী ব্রাহ্মণকে পরিজ্ঞাত করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ পূজায় ব্রতী হইয়া থাকেন, তখন ঐ পূজাকে উৎসব বলা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক উৎসবেই পূজার অধিকারী ব্রাহ্মণগণ প্রথমে স্বয়ং ঐ পূজা সমাপ্ত করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার নিজ দেহ অভ্যন্তরে আরাধ্য অঙ্গের অব্যক্তাংশ, অথবা আরাধ্য কার্য্যশক্তির অব্যক্তাংশ অনুভব করিয়া যজমানকে এতৎসম্বন্ধীয় মোটা কথাগুলি অল্প কথায় বুঝাইয়া দিবেন এবং তাঁহার কথাগুলি যে সঠিক, তাহা কোন দ্বিখণ্ডিত পশুর শরীর হইতে দেখাইয়া দিবেন, ইহা ঋষিগণের নির্দ্দেশ। বলিদানের প্রকরণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া তলাইয়া বুঝিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত কথাগুলির সত্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হইবে।

বেদ ও পুরাণোক্ত পূজা এবং উৎসব যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, বলিদান ব্যতীত পূজা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু পুরোহিতের দ্বারা কোন দেব, অথবা দেবতা, অথবা দেবীর উৎসব-কার্য্য সম্পন্ন করাইলে তাহা কখনও কোন পশুর বলিদান ব্যতীত সুসাধিত হইতে পারে না। প্রায়ই দেখা যাইবে যে, যে ব্রাহ্মণগণ এতাদৃশ ভাবে পশু-বলিদান ব্যতীত উৎসব-কার্য্যের সহায়তা করেন, তাঁহারা নানারূপ বিপদ্ ও বিঘ্নে পতিত হইয়া থাকেন।

এইরূপ ভাবে ক্রমিক তিন দিন দুর্গোৎসবের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার পর দেহের কোন্ অবস্থা হইতে উপরোক্ত অনুভূতি-কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা বিস্তৃতভাবে চতুর্থ দিনে পুরোহিত তাঁহার যজমানবর্গকে বুঝাইয়া দিয়া থাকেন। ইহারই নাম 'শান্তি'কার্য্য। তিনদিনের পূজা এবং শান্তিকার্য্যের ফলে, অব্যক্ত হইতে কি রূপে প্রকাশমান বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা যজমানের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় এবং তখন যজমান আনন্দানুভব করেন এবং তিনি যে উহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা বন্ধুবান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করিয়া উহার সার্থকতা বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন।

অব্যক্ত হইতে কিরূপে প্রকাশমান বস্তুর প্রকাশ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম "বিজয়া" অথবা "দশমী"। আর, উহা বুঝিতে পারিয়া মানুষ যখন তাহার বন্ধুবান্ধবগণের নিকট প্রকাশ করে যে, আমি 'অমুকটি' উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তখন বিজয়ার "নমস্কার" জানান হইয়া থাকে।

কত কালের দুর্গাপূজা, দুর্গোৎসব, বিজয়ার উৎসব, বিজয়ার নমস্কার এখনও বিদ্যমান আছে, কিন্তু তার সার্থকতা আজ কোথায়!

উপসংহার

উপসংহারে আমরা পাঠকবর্গকে বলিতে চাই যে, যে ঐতিহাসিকগণ কোন মানুষের অথবা মতলবের প্রচারের (for the purpose of propaganda) জন্য ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসে অচল বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া কার্য্য-কারণের যুক্তি অনুসারে ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্য-সমাজে এমন একদিন ছিল, যখন জগতের সর্ব্বত্র দেব, দেবতা ও দেবীর আসল পূজা সম্পাদিত হইত। ঐ আসল পূজা সম্পাদিত হইত বলিয়াই মনুষ্যসমাজ একদিন সর্ব্বতোভাবে আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যে সংগঠনে ঐ আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে, তাহার জ্ঞানও অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছিল। তখন ঐ সংগঠনও সম্পাদিত হইয়াছিল। ঐ সংগঠন সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়াই পরবর্ত্তী মনুষ্য-সমাজের পক্ষে কোন জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়াও দেব, দেবতা ও দেবীর পূজা না করিয়াও আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক শান্তি বহুদিন পর্য্যন্ত বজায় রাখা সম্ভবযোগ্য হইয়াছিল। এই সময়েই মানুষ দেব, দেবতা ও দেবীর প্রকৃত পূজা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর যখন আবার মনুষ্য-সমাজে নানাবিধ দুঃখ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল, তখন আবার মনুষ্যও সমাজের ... কালিক পণ্ডিতগণ ঐ পূজাতত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আসল তত্ত্বের সন্ধান পান নাই এবং পূজাতত্ত্ব যে কত প্রয়োজনীয়, তাহাও কাহাকেও বাস্তবতঃ বুঝাইতে সক্ষম হন নাই। ইহার ফলে কোন কোন সম্প্রদায় পূজা-প্রকরণকে নিষ্প্রয়োজনীয় ও কুসংস্কারজনিত মনে করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা পূজা-প্রকরণকে নিষ্প্রয়োজনীয় কুসংস্কারজাত মনে করিয়া উহা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু পূজা-প্রকরণে অভ্যস্ত না হইলে যে সংগঠনে অথবা যে পদ্ধতিতে সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে সর্ব্ববিধ দুঃখের হাত হইতে মুক্ত করা সম্ভব হয়, সেই সংগঠন অথবা সেই পদ্ধতির জ্ঞান অর্জ্জন করা সাধ্যায়ত্ত হয় না। ফলে, তাঁহারা অদ্যাবধি ঐ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদের অভ্যুদয়কাল হইতে মনুষ্য-সমাজ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাবে হাবুডুবু খাইতেছে।

মানুষ এখন বুঝুক আর না-ই বুঝুক, আমাদের কথা যে সত্য, তাহা অবস্থার তাড়নায় অদূর ভবিষ্যতে বুঝিতে সক্ষম হইবে।

যাঁহারা মানুষকে প্রতারিত করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নানাবিধরূপে মনুষ্যসমাজের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন এবং মানুষের মঙ্গল করিতেছেন বলিয়া ভান করিতেছেন, অথচ সমগ্র মনুষ্যসমাজ দিনের পর দিন অবস্থার অধিকতর জটিলতায় নিপীড়িত হইতেছে, সেই মানুষগুলিকে যথার্থরূপে আমরা কবে চিনিতে পারিব ও বর্ত্তমানের সমস্ত সর্ব্বনাশের মূলে যে ইঁহারা, তাহা আমরা কবে বুঝিব?

প্রাহা হইতে পারী

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

জুলাই মাস পড়িতেই ইউনিভার্সিটি বন্ধ হইল, "ছুটির বাঁশী বাজল, বাজল ঐ নীল গগনে!" প্যারিসে এ বার বিশ্ব-প্রদর্শনী চলিতেছে। আগে কয়েকবার আয়োজন করিয়াও প্যারিস যাওয়া হইয়া উঠে নাই, নানা বাধা-বিঘ্নে যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছে। ঠিক করিলাম, এ বার প্যারিস দেখিতেই হইবে। প্রথম ইউরোপে আসিয়া ইটালি হইতে হামবুর্গ যাইবার পথে মিউনিক হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সহরটা দেখা হয় নাই, হাতে যে সময়-টুকু ছিল, তা ষ্টেশনেই কাটাইয়াছিলাম। তাই প্রাহা হইতে প্যারিস চলিলাম মিউনিক হইয়া।

মিউনিক (জার্ম্মাণ নাম ম্যুন্শেন্—Munchen) দক্ষিণ জার্ম্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশের প্রধান নগর, প্রাহা হইতে ৯ ঘণ্টার পথ। রাজনৈতিক ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে যেমন বার্লিনের পরে হামবুর্গ জার্ম্মানীর দ্বিতীয় নগর, সেইরূপ কৃষ্টি ও কলাবিজ্ঞান চর্চ্চায় মিউনিক জার্ম্মানীর দ্বিতীয় নগর, এমন কি প্রধান নগর বলিলেও চলে। এখানকার ইউনিভার্সিটিতে অনেক খ্যাতনামা প্রোফেসর আছেন, এখানকার মিউজিয়মগুলিতে জার্ম্মান কলা-বিজ্ঞানের নিদর্শনগুলির বিচিত্র সম্ভার। গীতবাদ্য-কলা-শিল্প প্রভৃতিতে এখানকার লোক খুব আমোদী ও উৎসাহী। উত্তর-জার্ম্মানীর তুলনায় ব্যাভেরিয়ার লোকেরা অনেকটা হাল্কা প্রকৃতির ও আমোদপ্রিয়, উত্তর-জার্ম্মানীর প্রাশিয়ানদের মত 'কেঠো' নয়! এখানকার চলিত ভাষা এবং উচ্চারণও উত্তর-জার্ম্মানী হইতে বিভিন্ন। উত্তর-জার্ম্মানীর উঁচু-জার্ম্মান (hochdeutsch অর্থাৎ high german) এখন সারা জার্ম্মানীর সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইয়াছে, শিক্ষিত লোকে সকলেই এখন কথায় ও লেখায় উঁচু-জার্ম্মান ব্যবহার করে, কিন্তু প্রাশিয়ার ও ব্যাভেরিয়ার কথ্য ভাষায় এতই বিভিন্নতা যে, দুই প্রদেশের গ্রাম্য লোকে পরস্পরের কথা বুঝিতেই পারে না। প্রাশিয়া, ব্যাভেরিয়া, স্যাক্সনি প্রভৃতি জার্ম্মানীর বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের মধ্যে প্রাদেশিকতা ও আত্মাভিমান খুব প্রবল, প্রত্যেকেই নিজেদের খাঁটি জার্ম্মান ও অন্যদের অপেক্ষাকৃত হীন মনে করে। ভাগ্যে রাজন্যটা ভারতবর্ষ নয়, হইলে শুনিতে পাইতাম, "তোমাদের মধ্যে বহু ভাষা, বহু প্রাদেশিকতা, তোমরা স্বাধীন হইবার উপযুক্ত নও, 'পাক্স বিটানিকা' ছাড়া তোমাদের আর গতি নাই।" তাও সারাটা জার্ম্মানীর আকার একটা ভারতীয় প্রদেশের বেশী নয়।

নাট্সি দলের জন্মভূমি বলিয়া মিউনিক আজকাল জার্ম্মান সরকারের চক্ষে মক্কার মত তীর্থ-স্থান। সহরের কেন্দ্রস্থলে ইঁহারা একটা "ব্রাউন হাউস" নামক বাড়ীতে পার্টির ঘাঁটি বসাইয়াছেন, দলের মৃত লোকদের স্মৃতিরক্ষার জন্য ঘটা করিয়া সুবৃহৎ মেমোরিয়াল স্থাপন করিয়াছেন ও সেখানে অহোরাত্র শান্ত্রী পাহারা বসাইয়াছেন। ইউরোপের পলিটিক্স বা দেশপ্রীতি আজকাল পার্টির জয়নাদে নিনাদিত, পার্টিই দেশ, পার্টিই সত্য, পার্টিই ধর্ম্ম হইয়াছে। পার্টিতে যে যোগ না দিবে, পার্টির স্তুতিগান যে না করিবে, তার লাঞ্ছনার সীমা নাই, সব পথ, সব আশা তার বন্ধ। ফলে দাঁড়াইয়াছে, মিথ্যাচার; পার্টিভুক্ত দুই-তৃতীয়াংশ লোক প্রাণের দায়ে পার্টির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, পার্টির সঙ্গে তাদের কোন সহানুভূতি নাই, সময় ও সুবিধা পাইলেই তারা পার্টির বিরুদ্ধাচরণ করিবে। অত্যুগ্র এক-রোখামিতে লোকের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, নাট্সিরা জার্ম্মান জীবনে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে কোথাও এমন কিছু থাকিতে দিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যা নাট্সি মতবাদের বশ্যতা স্বীকার না করে। জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক আকাশ আজকাল নাট্সি কালাপাহাড়দিগের নাগদের স্থূল হস্তাবলেপনে আচ্ছন্ন। অ-নাট্সি [illegible] নিরোধ করিয়াই ইঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, আর্টের [illegible] নাট্সি মতের সৃষ্টি করিবেন ঠিক করিয়াছেন। [illegible] এই মতলবে সম্প্রতি একটা নাট্সি আর্টের এক [illegible]

গলিয়া ইঁহারা লোক হাসাইয়াছেন। রোমেও দেখিয়াছিলাম, মুসসোলিনি ফাশিষ্ট-আর্টের একটা বৃহৎ আয়োজন করিয়াছেন। গা ও গলার জোরে যদি কলা-সাহিত্যের সৃজন-ক্রিয়া হুকুম করা যাইত, তবে ভালই হইত, ডিক্টেটর ও ভগবানে যেটুকু তফাৎ এখনও আছে, সেটুকুও দূরীভূত হইয়া ডিক্‌টেটরদের জয়ঢেঁড়ায় হয় তো জগতে শান্তি স্থাপিত হইত।

মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলি ঘুরিবার পর জার্ম্মানীতে আসিয়া সকলের আগে চোখে পড়ে, রাস্তাঘাট বাড়ীঘরের পরিচ্ছন্নতা ও পরিসর। মিউনিকের "ডয়েট্‌শে আকাডেমী" কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে কিছু বৃত্তি দিয়া জার্ম্মানীতে পড়ার জন্য ডাকেন। বৃত্তি অতি সামান্য, যাঁহারা আসেন, তাঁহারা সকলেই পরে দেখেন খরচ কুলাইয়া উঠা দুষ্কর, যা খরচ পড়ে, তাহাতে বৃত্তিটুকু না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কয়েকবার প্রস্তাব হইয়াছে যে, বৃত্তির মাত্রা বাড়াইয়া সেই টাকায় দশজনের জায়গায় দুজনকে নির্ভাবনায় লেখাপড়া করিতে দিলে ভাল হয়, তাহাতে যোগ্যতম লোকদেরই সুবিধা হয়। আকাডেমী কিন্তু এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই, কারণ তাঁহারা বলেন, বৃত্তির স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রতি বৎসর তাঁহারা শত শত ভারতীয় উচ্চ উপাধিধারীদের কাছ হইতে বহু সুপারিশ ও কাকুতি-মিনতিপূর্ণ দরখাস্ত পাইয়া থাকেন।

মিউনিক হইতে প্যারিস প্রায় পনর ঘণ্টার পথ, প্রায় সমস্তটা জার্ম্মানী ও ফ্রান্স ভেদ করিয়া যাইতে হয়। মিউনিক হইতে ষ্টুটগার্ট পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক ট্রেন। তারপর রাইনল্যাণ্ডের ও ব্ল্যাক-ফরেষ্টের শেষ সীমার উপর দিয়া ষ্ট্রাসবুর্গ আসিয়া ফরাসী দেশ আরম্ভ হয়। ফরাসী দেশটা প্রায় সমস্তটাই সমতল ও দেখিতে বৈচিত্র্যহীন, এ জন্য লোকে বলে, সারা ফ্রান্সে এক প্যারিসই দর্শনীয়, বাকি সবটা দেশ একঘেয়ে। ফরাসী রেলের নূতন থার্ড ক্লাস গাড়ীগুলি বেশ, প্রশস্ত ও গদিযুক্ত। পরে নরওয়েজিয়ান, ডেনিশ ও সুইডিশ রেলে গদি-আঁটা থার্ডক্লাস দেখিলাম, কন্টিনেন্টের অন্য কোন দেশে আর ইহা নাই। রাত্রে একটি প্রণয়ী-যুগল কামরায় ঢুকিলেন, সমস্তটা পথ বেশ নিবিড়ভাবে পরস্পরের কণ্ঠ-বক্ষলগ্ন হইয়া চলিলেন। "আমুদে রসিক জাতি ফরাসীরা, এতটা অশ্লীল ভাব প্রকাশ্যে অন্য দেশে দেখি নাই।

সকাল বেলায় প্যারিস পৌঁছিলাম। রাস্তায় বাহির হইয়া দেখি, লোকজন অল্পই চলাফেরা করিতেছে। সহরের মাঝখানে প্রধান বুলভারের দিকে গিয়া দেখিলাম, কাফেগুলির সামনে ফুটপাথে সতরাদির আবর্জ্জনা জমা হইয়া রহিয়াছে। ফরাসীরা একটু অলস প্রকৃতির, অনেকটা রাত্রি আমোদপ্রমোদ করিয়া কাটায়, সকালে উঠিবার তাড়া নাই, ধীরে সুস্থে 'দৈনন্দিন' কর্ম্মারম্ভ করে। বেলা সাতটার সময় রাস্তা ঝাঁট দেওয়া আরম্ভ হয়। জার্ম্মানীতে দেখিয়াছি, রাত ২টা, ৩টার সময় রাস্তা পরিষ্কার হয়, ভোরে বাহির সর্ব্বত্র ঝটঝটে পরিষ্কার। লাটিন অন্যান্য জাতির মত ফরাসীদেরও পরিষ্কারতা বোধ কম, বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্ম সবারই একটু শ্রীহীন অবস্থা।

লাটিন-পাড়ায় ঘর নিলাম। পুরাতন ও সস্তা পাড়া, ছাত্ররা বেশীর ভাগই এ পাড়ায় বাস করে। আর্টিষ্ট ও অনেক বিদেশীদেরও আড্ডা এখানে। ফলে এ পাড়ার আবহাওয়া একটু বোহেমিয়ান রকমের, মেলামেশা আলাপ আমোদ বেশ স্বচ্ছন্দানুগামী। এ পাড়ার কাছেই বিখ্যাত বিদ্যামন্দির সর্‌বোন্ (Sorbonne) ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞাননিকেতন। অদূরে বৃহৎ লুকসেমবুর্গ বাগান, বাগানের মাঝখানে একটা পুরাতন রাজবাড়ী, এখন কিছু আর্ট-সংগ্রহ রাখা হইয়াছে। পাড়ার আর এক দিকে পাঁতেঅঁ (Pantheon)। এটি আগে একটি বৃহৎ গির্জ্জা ছিল, এখন ইহা ফরাসীদেশের যশোমন্দির, অর্থাৎ বিলাতের ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবির মত ফ্রান্সের যশস্বী সন্তানেরা এই পাঁতেঅঁর গর্ভগৃহে ক্ষীণালোকিত ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে সমাহিত হইবার সম্মান লাভ করেন। ভিক্তর হ্যুগো, রুসো, ভলতেয়ার প্রভৃতি ফরাসী জাতির গৌরবস্তম্ভেরা এখানে শেষশয্যায় শায়িত আছেন। পাঁতেঅঁর একপাশে ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টি অভ্ ল', অন্য পাশে একটা বড় বাড়ী, লোকজন যাওয়া আসা করিতেছে। কি দ্রষ্টব্য এ বাড়ীটাতে আছে, না বুঝিয়া পোর্তিয়ে (portier) বা দারোয়ানকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। ফরাসী ভাষা লইয়া এক মহা বিপদ! আমার উচ্চারণ ওরা বুঝে না,

ওদের একত্র বিজড়িত বহু-অনুনাসিকপূর্ণ শব্দসমষ্টিও আমার বোধগম্য হয় না, কাগজে না লিখিয়া দেখাইলে দুপক্ষের অর্থগ্রহণ দুষ্কর। যা হোক দারোয়ান বাড়ীটিতে কি আছে, সে কথা কিছুতেই কথায় বুঝাইতে পারিল না। পাশে একটি স্ত্রীলোক ফুটপাথে দাঁড়াইয়া খবরের কাগজ বেচিতেছিল, দারোয়ান তাহাকে ডাকিয়া স্ত্রীলোকটির ও নিজের অনামিকাদ্বয়ের নিম্ন প্রকোষ্ঠটি বার বার তর্জ্জনী দিয়া দেখাইল, বুঝিলাম স্ত্রী-পুরুষের আংটিবদলের ইঙ্গিত করিতেছে, বাড়ীটাতে বিবাহ রেজিষ্ট্রি হয়। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইবার জন্য বিবাহের পর এ দেশের বর-কনে গির্জ্জার মধ্য দিয়া যেমন করিয়া বাহুবদ্ধ হইয়া যায় সেইভাবে স্ত্রীলোকটির বাহুগ্রহণ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই রকম তো ?" দারোয়ান ভারি খুসী হইয়া সহাস্যে বলিল, "উই উই (হাঁ, হাঁ)" ভাষা লইয়া পথে ঘাটে বিপদ হইলেই জাতিভ্রাতা মনে করিয়া অনেক নিগ্রো সহায়তা করিয়াছে। ইহাদের অনেকে ইংরেজিভাষী আমেরিকান নিগ্রো, অনেকে আবার ফরাসী প্রজা। প্যারিসের সর্ব্বত্র নিগ্রোদের দেখা যায়। বর্ণবিদ্বেষ ফরাসীদের নাই, নিগ্রোরক্ত-মিশ্রিত এ-দেশীয় দো-আঁশলা বালকবালিকা নরনারী অনেক চোখে পড়িল। বড় হৃদ্যতা ও সৌজন্য দেখাইল ইহারা, স্বজাতীয় মনে করিয়া ; এ-দেশবাসী ভারতীয় ভ্রাতারা এটি শিক্ষা করিলে ভাল হয়! একটি নিগ্রো যুবক এখানে ল' পড়ে, বলিল, "আমি ইংলিশম্যান।" ভাবিলাম রহস্য করিতেছে, জাজ্জ্বল্যমান কৃষ্ণমুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "তবে তুমি সাদা নও কেন ?" পূর্ণ সপ্রতিভভাবে বলিল "আমি কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু ইংলিশম্যান।" পরে আরও আলাপে জানিলাম, উহার বাপ বৃটিশ-কঙ্গোবাসী বৃটিশ প্রজা, সেহেতু সেও ইংলিশম্যান !

সরবোন্ ও পাঁতেঅঁ ছাড়াইয়া একটু আগাইলেই সেন্ (Seine) নদী। পুরা সহরটার মধ্য দিয়া এই নদী গিয়াছে, উপরে গোটা ত্রিশেক ব্রিজ। নদী বেচারীর জলটুকু ছাড়া অষ্টপৃষ্ঠে সিমেণ্ট পাথরের বাঁধন, মাটির চিহ্ন ও নদীর স্বাভাবিক মূর্ত্তি তিরোহিত হইয়াছে। তবু যে এদের কাব্য-সাহিত্যে-গল্পে প্যারিসের সেনের এত বর্ণনা, এত গুণগান কেন, বুঝা মুস্কিল! আহা, বেচারারা দেখে তো নাই, আমাদের দেশের দিগন্তবিস্তারী কলস্রোতা পদ্মা-গঙ্গা—কি করিবে ? কবি-কল্পনার দুধের সাধ ঘোলেই মিটাইতে হইতেছে। এই জায়গাটায় নদী দ্বিস্রোত হইয়া মধ্যে একটি দ্বীপের মত সৃষ্টি করিয়াছে, এই দ্বীপের উপর পুরাতন নতর্ দাম্ (Notre Dame) গির্জ্জা। দ্বাদশ শতাব্দীতে পোপ তৃতীয় আলেকজাণ্ডার ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন, প্যারিসের ইহাই প্রাচীনতম বড় গির্জ্জা। অনেক বিদেশী রাজার অভিষেক হইয়াছে এই গির্জ্জায়, যথা ইংলণ্ডের ষষ্ঠ হেন্‌রী ও স্কটদের রাণী মেরী। নাপোলেয়ঁও এই গির্জ্জায় নিজের সম্রাট-অভিষেকের আয়োজন করিয়াছিলেন। পৌরোহিত্য করিতে ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন রোম হইতে পোপ-মহারাজকে, কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় পোপ ইঁহার মাথায় মুকুট পরাইবেন কি, ইনি পোপের হাত হইতে মুকুট লইয়া নিজ হাতেই তাহা স্ব-মস্তকে আরোপিত করেন, মহিষী জোসেফীনের মাথায়ও নিজেই মুকুট পরাইয় দেন, এমনই স্বাধিকার-প্রমত্ত ছিলেন এই বীর পুরুষ।

সেন্ পার হইয়া ডান দিকে কিছু দূরে পুরাতন কয়েদি-খানা বাস্তীয় (Bastille)। ফরাসী বিদ্রোহের সময় উন্মত্ত জনতা এই বন্দীশালা ভাঙ্গিয়া কয়েদীদের মুক্ত করিয়া দিয়া নূতন রাজকীয় বন্দীদের এখানে বদ্ধ করিয়া পৈশাচিক তাণ্ডবাভিনয় করিয়াছিল। বাস্তীয় হইতে আবার ফিরিতে নদীর প্রায় ধারেই পড়ে ওতেল দ্য ভিল্ (Hotel de Ville), পারী নগরীর শাসন পরিচালনা হয় এখান হইতে। বাস্তীয় হইতে পশ্চিম দিকে বড় একটা রাস্তা গিয়াছে, বাস্তীয়ের কাছে, ইহার নাম রু্য দ্য রিভোলি (Rue de Rivoli)। এই রাস্তা বাহিয়া আসিলে বাঁয়ে পড়ে লুভর (Louvre) প্রাসাদ ও পালে রোইয়াল (Palais Royal)। এগুলি আগে রাজপ্রাসাদ ছিল, লুভর-এ এখন প্রকাণ্ড মিউজিয়ম। নাপোলেয়ঁ নানাদেশ জয় করিয়া অনেক আর্টের সামগ্রী অপহরণ করিয়া আনেন। ইতালি হইতে আনিত অনেক মূর্ত্তি ও চিত্র লুভর-এ রক্ষিত হইয়াছে। লুভর-এর ভাস্কর্য্য ও চিত্র-বিভাগ কলারসিকের পরম দ্রষ্টব্য স্থান। Mona

Lisa নামক মাডোনা-চিত্র ও Venus de Milo নামক বিখ্যাত মূর্ত্তিটি এখানে আছে। কি কমণীয় কান্তি এই ভীনাস্-মূর্ত্তিটির! কি বা সেকালে, কি বা একালে, আর্টিষ্টরা নারীদের কামিনী ভাবের পরিস্ফুটনেই যত্নবান, কিন্তু এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নারীমূর্ত্তিটিতে নারীদেহের রমণীয় লাবণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যে শান্তশ্রী ও শুচিশোভার বিকাশ হইয়াছে, তাহার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। যাহার যশের সঙ্গে প্রতিলিপি দেখিয়া এতদিন পরিচয় ছিল, তাহার স্নিগ্ধ ছবিতে আজ নয়নের তৃপ্তি হইল।

লুভর্ প্রাসাদের সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাগান, ইহার নাম ত্যুয়েরি (Tuileries)। ফরাসীবিদ্রোহের ইতিহাসে ইহা প্রসিদ্ধ, এইখানে জনতা মিলিত হইয়া রাজপ্রাসাদের বাতায়নের দিকে তাহাদের অভিযোগ ও ক্রুদ্ধ-তর্জ্জন প্রেরণ করিত। এখান হইতে বাহির হইয়া ডানদিকে একটু গেলেই প্যারিসের কেন্দ্রস্থল, অপেরা, নাপোলেয়ঁ-নির্ম্মিত রোমান-মন্দির-স্পর্দ্ধী মাদেলেন গির্জ্জা, বড় বড় বুলভার। এই খানে ঘুরিয়া পৌছা যায় প্লাস্ দ্য লা কঁকর্দ (Place de la Concorde) নামক বৃহৎ চত্বরে। এটি পারী-জনতার মিলন কেন্দ্র। এক সন্ধ্যায় এখানে অনেক ফোক-ডান্সের ও ফোক্-সঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। জনতার এত ভীড় যে, কিছু দেখা বা শুনা অতি কষ্টসাধ্য। র্যু দ্য রিভোলি রাস্তাটা নামে এখানে শেষ, কিন্তু কার্য্যে আভেন্যু দে শাঁজেলিজে (Avenue des Champs Elysees) ও তাহার পর আভেন্যু দ্য লা গ্রান্দ্ আর্মে (Avenue de la Grande Armee) নাম ধারণ করিয়া বৃহত্তর আকারে আরও পশ্চিমে প্রসারিত হইয়াছে। এই রাস্তা দুটির মিলন-স্থলে বিখ্যাত আর্ক্ দ্য লা ত্রিয়োঁফ্ (Arc de la Triomphe) নামক বিজয়-তোরণ। ফরাসী-বিদ্রোহের সময় এইখানে গিলোটিনটি স্থাপিত হইয়া তাহার সংহার-লীলা দেখাইয়া গিয়াছে। ফরাসী স্বাধীনতা-দিবসের জয়ন্তীর দিন এখানে একটা বিরাট মিলিটারি প্যারেডের সমারোহ দেখিলাম। কাতারে কাতারে পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা, মোটর ও কামানের সারি, অগণিত ক্ষুদ্র-বৃহদাকার ট্যাঙ্ক ও উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন। ক্ষিতিব্যোম মহানাদে নিনাদিত, বিকম্পিত হইয়া উঠিল। প্যারেডে দলে দলে নবাগত নিগ্রো সেনা দেখান হইল, এরা ফরাসীদের বড় আদরের জিনিষ।

এই তো প্যারিসের প্রধান দ্রষ্টব্যের মধ্যে কয়েকটি। এ ছাড়া ফরাসী বিপ্লব, খ্যাতনামা আর্টিষ্ট-লেখক পণ্ডিত ও নানা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার স্মৃতিবিজড়িত শত শত স্থান দেখিবার আছে। লোকসংখ্যায় লণ্ডন বড় হইলেও দ্রষ্টব্য স্থানে, সৌধ-বীথিকা উদ্যানের গৌরবে প্যারিসের মত সুন্দর নগর আর ইউরোপে নাই। রাত্রে নানাবর্ণের আলোকমালায় বিমণ্ডিত প্যারিসের পথগুলির যে অমরাবতীর রূপচ্ছটা উছলিয়া উঠে, তাহাতে দর্শকমাত্রেরই চিত্ত বিমোহিত হয়। পরদের দিনে কয়েক রাত্রে দেখিলাম, কাফের সামনে ফুটপাথ বা রাস্তার উপর নাচের আয়োজন হইয়াছে, একটা মঞ্চের মত খাড়া করিয়া ব্যাণ্ড বাজিতেছে ও রাস্তার লোক ইচ্ছামত সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া নাচিতে লাগিয়া যাইতেছে। প্যারিসের নৈশজীবন লোকখ্যাত, কাফে-কাবারে-নৃত্যালয়ে আমোদের ঢালাও আয়োজন। ফরাসী প্রমোদালয়ে ও আর্টে নগ্নদের প্রাচুর্য্য ও ফরাসী সাহিত্যের কামবিলাসিতাকে পণ্ডিতেরা ক্যাথলিক ধর্ম্মের অস্বাভাবিক গুরুভারের প্রতিক্রিয়া বলিয়াছেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মের শিক্ষায় মানব-জন্মটা পাপপ্রসূত, স্বভাবজ, দেহজ সকল কর্ম্মই সদা পাপভয়ে আচ্ছন্ন। গির্জ্জার ধর্ম্ম ও লোকধর্ম্মে এই নিদারুণ বৈষম্যবশতঃ লোকধর্ম্ম সহজ সীমা অতিক্রম করিয়া গির্জ্জাধর্ম্মের অস্বাভাবিকতার শোধ লইয়াছে। হইতে পারে এ কথা সত্য। যে কারণেই হউক, অন্য সবার মত ফরাসীরাও ইন্দ্রিয়সুখবিলাসী প্রবৃত্তি-মার্গের পথিক; অন্যদের সঙ্গে তফাৎ এই, ফরাসীদের নিবৃত্তি-ভণ্ডামি নাই। এই সরলতা আছে বলিয়া ফরাসী জীবনে অস্বাভাবিকতার বদলে শতধাস্ফূর্ত্ত কর্ম্মিষ্ঠতা প্রকাশ হইয়াছে। সাহিত্যে, কলায়, জ্ঞানবিজ্ঞানে, সমরকৌশলে, রাষ্ট্রনীতিতে এখনও ইউরোপের শিরোভূষণ ফরাসীজাতি। লক্ষ্য করিলাম, ইহারা বাগ্‌বিদগ্ধ, কিন্তু অন্য লাটিন জাতির মত শুধু বাচাল নয়, অস্থির ও চঞ্চল, কিন্তু প্রতিভা ক্ষুরধার, সহজপন্থী, কিন্তু মহা কর্ম্মিষ্ঠ। কলা-সাহিত্যে কেহ ইহাদের সমকক্ষতা করিতে পারে না, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ইহারা জার্ম্মানদের সমান, কূট-কপট রাজ-

নীতিতে ইংরেজরা ইহাদের সম্ভ্রম করিয়া চলে। জার্ম্মানদের জ্ঞানপিপাসা ও কর্ম্মিষ্ঠতা, ইংরেজদের কেজো বুদ্ধি, দুইই আছে ফরাসীর এবং তাহার উপর আছে অসাধারণ প্রতিভা। ইংরেজের চালিয়াতি ও জার্ম্মানের ভারিক্কে গুরু-গাম্ভীর্য্য ফরাসী চরিত্রে নাই, অথচ কাজ সমাধা হয় কি লঘু স্পর্শে। প্যারিসে পুলিশ চোখে পড়ে না, সবই যেন নির্ব্বাধা ও মুক্ত, কিন্তু কোথাও একটু কিছু এদিক-ওদিক হইলেই কোথা হইতে পালে পালে পুলিশ আসিয়া নিঃশব্দে শান্তি স্থাপন করিয়া যায়।

আর্ক দ্য লা ত্রিয়োঁফ্ হইতে সেন্ নদীর দক্ষিণ পারে আসিলে পাওয়া যায় এফেল টাওয়ার, লিফটে উপরে উঠিয়া সারা সহরটার চেহারা দেখা যায়। পূর্ব্বদিকে আরও আগাইয়া আসিলে, পুরাতন একটা দুর্গের মত, এখানে আগে চতুর্দ্দশ লুই স্থাপিত একটা দুঃস্থ সৈনিকদের সুবৃহৎ আবাস ছিল। এখন এখানে একটা মিলিটারি মিউজিয়ম হইয়াছে। এই বাড়ীর সংলগ্ন একটা পুরাতন গির্জ্জায় নাপল্যেয়ঁ ও তাঁহার পরিবারবর্গ সমাধিস্থ আছেন। মার্শাল ফোশ্‌কেও এখানে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই গির্জ্জাটি ফ্রান্সের রণবীরদের পাঁতেয়ঁ। খুব অনাড়ম্বর সাদাসিধা ভাবে এত বড় দুজন দেশগৌরব মহাবীর এখানে চিরবিশ্রামে শায়িত আছেন। ফরাসীরা বাজে হুজুগ ভালবাসে না! এঁরা ইংরেজ হইলে সমাধি-স্থলে না জানি কি ঘোর-ঘটার ব্যবস্থা হইত, জার্ম্মান হইলে তাহার আড়ম্বরে কাছে ঘেঁষা যাইত না।

প্যারিসের উপকণ্ঠেও অনেক পুরাতন স্থান দেখার আছে, তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য ভার্সাই প্রাসাদ। বহুপ্রসারী সুবিন্যস্ত উদ্যানের মধ্যে এই প্রাসাদ, ইহার অনুকরণে অন্য অনেক বিদেশীয় রাজপ্রাসাদ, বিশেষতঃ বার্লিন পটস্‌ডামের "সাঁ সুসী" (Sans Succi) পরিকল্পিত হইয়াছিল। কি সুখেই ছিলেন সেকালের বুর্বঁ রাজারা, তাঁহাদের আরাম জোগাইবার জন্য প্রাসাদের মধ্যেই দশ হাজার পরিচারক বাস করিত। এই প্রাসাদের একটি বৃহৎ কক্ষে ১৯১৯ সালের ভার্সাই সন্ধির মুরুব্বিরা জমায়েৎ হইতেন, আলোচনার সময় ধর্ম্মজ্ঞানী রাষ্ট্রপতি উইলসন পরাজিত জার্ম্মানির প্রতি একটু সুবিচারেচ্ছার ভাব দেখাইলেই চতুর-চূড়ামণি লয়েড জর্জ্জ চুল্লীর সামনের কার্পেট ডিঙ্গাইয়া উইলসনের পাশে আসিয়া কানে কানে তাঁহাকে দুষ্ট-সরস্বতীর মন্ত্রণা দিয়া তাঁহার মন ভাঙ্গাইতেন।

বিশ্ব-প্রদর্শনী দেখা গেল। আয়োজন এখনও শেষ হয় নাই, রাজনৈতিক গণ্ডগোল, শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট প্রভৃতি বহু বাধা পড়িয়াছে, তবু যতদূর হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয়। প্লাস্ দ্য লা কঁকর্দ হইতে ত্রকাদেরো পর্য্যন্ত সেন্ নদীর দুই ধারে মাইল দেড়েক পথের মূর্ত্তি বদলাইয়া প্রদর্শনী বসিয়াছে। দেখিতে হইয়াছে অতি মনোরম। কলা-শিল্প-সম্পৃক্ত সব দেশের সব রকম দ্রষ্টব্য দেখান হইয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ পৃথক অংশে। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশ এক একটি প্যাভিলিয়ন খাড়া করিয়া নিজ নিজ গৌরব প্রচার করিয়াছেন। প্রত্যেক প্যাভিলিয়ন সেই দেশীয় রুচি ও রীতি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই দেশের বাতাবরণ আমদানি করিয়াছে। ব্রিটিশ প্যাভিলিয়নটি হইয়াছে একটা দেশলাইয়ের বাক্সের মত, বাহির হইতে দেখিতে নয়নাভিরাম নয়, কিন্তু ভিতরে বেশ-বিন্যাস-সৌষ্ঠব। অন্যদেশের প্যাভিলিয়নগুলি বড় সুন্দর হইয়াছে। জার্ম্মান প্যাভিলিয়নটি ঋজু দৃঢ়তার জয়ধ্বজার মত দাঁড়াইয়া আছে, ভিতরে ছবিতে মূর্ত্তিতে দ্রষ্টব্যে মুখ্য প্রদর্শনীয় হিটলার ও নাট্‌সি জার্ম্মানির জয়জয়কার। ফরাসীরা রসিক জাতি, জার্ম্মান প্যাভিলিয়নের সামনেই দিয়াছে সোভিয়েট প্যাভিলিয়নের স্থান। সোভিয়েট প্যাভিলিয়ন যেন সমুদ্ধত স্পর্দ্ধায় উচ্চৈঃস্বরে ফাশিষ্টদের শাসাইয়া "ক্রমং ববন্ধ ক্রমিতুং সকোপঃ", আর ভিতরে সর্ব্বত্র রাজত্ব করিতেছেন গুঁফো ষ্টালিন ও তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া লেনীনের গুণ্ডারূপী ছায়ামূর্ত্তি! প্রদর্শনী ছাড়িয়া নাপল্যেয়ঁর সমাধিস্থল দোম ডেজেনভালীদ (Dome des Inva lides) হইতে একটু পূবে আসিলেই প্যারিসের হোয়াইট-হল ক্যে, দর্‌সে (Quay d' Orsay) নামক রাস্তার উপর বিভিন্ন সরকারী আফিস এবং ইহারই কাছে ফরাসী পার্লামেণ্ট শাঁবর্ দে দেপ্যুতে (Chambre des Deputés)। প্যারিসে ঘুরিয়া বেড়াইবার বেশ সুবিধা, ট্যাক্সিভাড়া খুব সস্তা। এখনকার আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের নাম মেত্রোপোলিটা

(metropolitain), সংক্ষেপে "মেত্রো" বলা হয়, ইহার ভাড়াও অতি অল্প এবং বেশ সহজেই কি করিয়া কোথায় যাইতে হইবে তাহা বোধগম্য হয়। সহরের কেন্দ্রস্থলে অপেরা-ষ্টেশনের কাছে একটা যন্ত্র আছে, এটাতে মেত্রোর সব ষ্টেশনের নাম অকারাদি ক্রমে লেখা ও প্রত্যেক নামের পাশে একটা করিয়া ইলেক্‌ট্রিক বোতাম, এই বোতামটি টিপিলেই সহরের একটা ম্যাপের উপর অপেরা হইতে সেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত কতকগুলি আলো জ্বলিয়া উঠে, বেশ বুঝা যায় কোন্ লাইনে গিয়া কোন্ ষ্টেশনে বদল করিয়া কোন্ কোন্ ষ্টেশন পার হইয়া সেখানে পৌছান যাইবে। লণ্ডনের 'টিউবেও' বেশ সহজে গতিপথ নির্ণয় করা যায়, কিন্তু বার্লিনের উ-বান (U-Bahn, U মানে Untergrund) এত জটিল যে, তার রহস্য ভেদ করা কষ্টসাধ্য। প্যারিসের বাসে দেখিলাম, অনেক মেয়ে কণ্ডাক্টার। টিকিট কিনিতে হয় ভিতরে উঠিয়া কিন্তু গাড়ীতে চড়িবার আগে ষ্টপ-থামের গায়ে ঝুলান একটা রীল হইতে পর পর নম্বরওয়ালা টিকিট ছিঁড়িয়া লইতে হয়, এই নম্বর অনুসারে যাদের আগের নম্বর তারা বসিতে পায়, বাকীরা দাঁড়াইয়া যায় ও উদ্বৃত্তরা পরের গাড়ীতে আসে, হুড়াহুড়ি ধাক্কাধাক্কির প্রয়োজন হয় না।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু অথচ রসিক মঁসিয়দের দেখিয়া আনন্দ হইল। অন্য বিষয়ে সকল গুণবানদের সমান অথচ বুদ্ধির ধারাটা বেশী ও রসবোধটা তীক্ষ্ণ বলিয়া সবাইকে লইয়া এরা ঠাট্টা করে। এদের কৃষ্টি ও সামাজিক আদব-কায়দা ইয়োরোপের সবাই অনুকরণ করে। কিন্তু ইংরেজ ও জার্ম্মানরা এদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ইহাদের লইয়া এরা বড় ব্যঙ্গ করে। কন্টিনেণ্টে সর্ব্বত্র দেখিলাম ইংরেজদের কি খাতির, যেন দেবতার মত ভক্তি করে, আর এখানে এরা ইংরেজদের পিঠ চাপড়ায়, ইংরেজ প্রকৃতির যত দুর্ব্বলতা ধরা পড়িয়াছে এদের কাছে। কত রঙ্গ পরিহাস শুনিলাম এখানে অন্য ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে—জার্ম্মানদের কথা বলে, "একজন জার্ম্মান পণ্ডিত, দুজন জার্ম্মান হইলেই একটা সমিতি-স্থাপন, তিন জন জার্ম্মান একত্র হইলেই বাধাও একটা লড়াই!" ইংরাজদের কথা বলে, "একজন ইংরেজ নিরেট গর্দ্দভ, দুইজন ইংরেজ হইলেই কলনি-স্থাপন, আর তিন জন ইংরাজ হইলেই না বিটিশ এম্পায়ার!"

ভারত-তাত্ত্বিক ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি পরলোকে। ইঁহার বাড়ীতে সাপ্তাহিক চায়ের নিমন্ত্রণে প্যারিসে ভারতীয়দের মিলন-স্থান ছিল। ইহুদীদের একটি সমিতিতে সভাপতিত্ব করিতে করিতে হঠাৎ লেভি প্রাণত্যাগ করেন। দুঃখের বিষয় অন্য ফরাসী ভারততাত্ত্বিকদের সঙ্গে এবার দেখা হইল না, ছুটিতে সবাই প্যারিস ছাড়িয়া গিয়াছেন।

ভাঙা বাড়ী

— শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

বসুধা আছিল সুধা ভরা,
　মানুষে গড়িল তারে বিষ;
স্নেহ প্রেম মমতার ধরা,
　সরলে গরল হল বিষ।

কত যুগ সাধনার ফলে,
　গড়ে তোলা এই চারু গেহ,
ভুলে গিয়ে আপনারি ছলে—
　কারে' আর মানিল না কেহ

নভস্পর্শী গৃহ-চূড়া মোর,
　আজি আর স্পর্শে না আকাশ,
ব্যাকুল আঁধার মহা ঘোর
　হাহাকারে ফিরিছে বাতাস।

সেই ঘরে ছিল পরে পরে;
　মণি মুক্তা স্বর্ণ রাশি-রাশি,
কমলা কমলদল 'পরে
　কমলিনী বধূমুখে হাসি,

কল কল কল্লোলিত গান,
নব রাস মঞ্চের দোলায়;
সহজ আনন্দভরা প্রাণ
করতালি দিয়ে নাচে গায়।

অন্নপূর্ণা অন্নের থালি ভরি
অন্ন জনে করে বিতরণ,
অন্নকোটে সে উৎসব স্মরি'
জল ভরে আজি দুনয়ন।
দেবতারা উল্লসিত হয়ে
প্রাতঃ সন্ধ্যা পূজা নিত যেথা
সে ঘরে জ্বলে না দীপ ভরে,
ক্রন্দনের রোল উঠে সেথা।
পশ্চিমের ঝঞ্ঝা বেগে এল
দিক-ঝলা প্রলয়-নাচন,
লক্ষ্মীর অঞ্চল খসে গেল,
পরাইল শৃঙ্খল বাঁধন।
মা আমার লুকাইল মুখ,
ভেঙে গেল সুমঙ্গল ঘট,
মানুষে ভাবিল মহাসুখ—
ভরে গেল রং-মাখা নট।

চারি ভিতে অস্থিস্তূপ মেলা,
জীবিত না মৃতের কঙ্কাল,
ঘরে-ঘরে প্রেতের এ খেলা,
স্তূপাকার কালচার জঞ্জাল।
সারমেয় করে কাড়াকাড়ি
শুষ্ক অস্থি মড মড়ি উঠে,
কাল পেঁচা উড়ে বাড়ী বাড়ী
পাকসাটে গৃধিনীরা লুঠে।
অশ্রুবিন্দু সৈকতে শুধায়
অন্ধকারা ত্রিযামা যামিনী,
ঝিন ঝিম ঝিনিকার গান
কাঁদে মহালক্ষ্মী অভাগিনী।

মোরা আলো পেয়েছি!
আহা! মোরা আলো পেয়েছি!!
লক্ষ্মী কাঁদুন আঁধার ঘরে
আমরা বেরিয়েছি!
ওরে একশ' বছর ধরে'
মা জননী করে'
এরা রেখেছিল, পোঁটলা যেমন
—এই পোঁটলা যেমন, পোঁটলা যেমন
জড়ভরত করে'
এখন খট্‌খটাখট ঢুলকী চালে
বেরিয়ে পড়েছি
মোরা আলো পেয়েছি!

দেখছ কি? এই ভ্যানিটি,
এই ভ্যানিটি, এই ভ্যানিটি কেন.
প্যানিটি শুরে গাঁথা এবার
মহাকবির দেশ,

দেখো যেন গায়ে লাগে না ঠেশ,
সুঁটকী হয়ে বুঁচকী ফেলে
সাজ করেছি বেশ,
এখন ঠক্‌ঠকা ঠক্ ঠক্
উঠছি গিয়ে ভাবন নিয়ে
মামদোতলার চক্ !
রাতে বেড়াই
'ক্যাসানোভা'য় রাতে বেড়াই
গুলজারী প্রাণ স্ফূর্ত্তি যোগাই,
কভু উঠি, কভু গড়াই
রাত বেড়ান কি মজা ভাই !
মোরা স্বাধীন হয়েছি,
সাগরের টিকী কেটে, কালেজে—তামিল নিয়েছি
মোরা আলো পেয়েছি !!!

*

এতদিনে বুঝিয়াছি দুঃখ কারে বলে
কর্ম্মের বাঁধনে পড়ি ইন্দ্রিয়ের দাস
ইন্দ্রিয়-প্রবণ পথে অন্ধ হয়ে ধাই
দূর আলেয়ার পানে—আর নহে, ওহে
পলিটিক্স,—স্বার্থের সংঘাত তুমি শুধু,
বুঝিয়াছি, পরিয়াছি কল্যাণ মুখোস
হে নমিনি ! নিরীহ যে ভদ্রলোক তুমি
সংসারের সহজ জীবন ছাড়ি কর সাধ
হুজুরী পব্লিক-ম্যান—ওহে ভোট, ভোট
যে তোমার···কল শুধু বৃথা স্বাধীনতা,
স্বদেশের সর্ব্বনাশ, গর্দ্দভ বনিয়া
আছ সুখে। ওহে দোলো সভাপতি-রাজ !
নাহি লাজ আরে রে উন্মাদ ! জান নিজে
তোমারে মানে না কেহ, মানে কম, বেশী
যারা তারা যে চাহে না, তাও জান তুমি
তবু স্বার্থ, পতি-নাম বড়ই মধুর !
মেম্বর লোয়ার হাউস তুমি, তিনলোকে
শ্রুত তব নাম, ভাতা আছে, পাতা আছে,
আছে ঘুঁস-ঘাস, কিন্তু কোন আশা নাই
প্রমোশন অপার হাউসে। আর তুমি
রেপব্লিক ! অনাচারে অত্যাচারে জন্ম
লভে যেই, অ্যানার্কীর অগ্রগামী দূত
নিয়ে যাও যমদ্বারে মহা অভিযানে।
বাকী তুমি হে মিলেনিয়াম ! যুগ যুগ
শতেক বছর ধরি যত রিফর্ম্মার
জন্ম লভে করে গোল করে দাগাবাজী
ধর্ম্মধ্বজী যত মহাজন, তাহাদের
ধরি পুরি কফিণ মাঝারে ভাল ভাল
গজাল পেরেক দিয়ে বন্ধ করি, সেই
কফিণের ডালা, আপনি প্রকৃতি তবে
পায় সে রেহাই, বেঁচে যায় নরলোক !

বুঝিয়াছি সভ্যতার রূপ মোহনিয়া
সে মোহ টুটেছে মোর, ফিরাব এবার
মুখ, মাতা তুমি জন্মভূমি মোর,
দূর হতে আসে ক্ষীণ আলোকের রেখা
পড়িয়াছি সভ্যতার লেখা—পড়িয়াছি
দুঃখ-পাঠশালে—আশা তাই—দুঃখ
যাবে দূরে আবার এ ভাঙাবাড়ী, নব-
রূপ নিয়ে গৃহচূড়ে উড়াবে পতাকা।

প্রদর্শনী

১. একাকী।

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র হইতে

প্রতিজ্ঞা।

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র

বাঙ্গালীর ব্যবসায়

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

বাঙ্গালী সৌখীন জাতি। ভদ্রতায়, সৌজন্যে ও বাক্‌-পটুতায় বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে অগ্রণী। মেধা ও শিক্ষায়ও বাঙ্গালীর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনে, রাজকার্য্য পরিচালনে, নেতৃত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় বাঙ্গালীর তুলনা এক বাঙ্গালীই। বাঙ্গালীর এত গুণ থাকিতে আজ বাঙ্গালার ব্যবসায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবাঙ্গালীর অধিকৃত কেন? এই বিষয় অবলম্বনে আমরা এই প্রবন্ধে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইয়াছিল। ভূমি সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থা এখনও বর্ত্তমান আছে বটে, তবে তাহার অনেক রদ-বদল হইয়া গিয়াছে। বিধানের আবরণ অক্ষুণ্ণ থাকিলেও শাসন-তন্ত্রের মনোভাব অনেকটা বদলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূলে কুঠারাঘাত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ভূমি ও রাজস্ব সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গালায় যে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী নির্ব্বিবাদে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত কালাতি-পাত করিবার এক রকম সুযোগ পাইয়াছিল। সমগ্র ভারতের মধ্যে শুধু এক বাঙ্গালীই ইংরাজ রাজত্বের সুশাসনের প্রথম ফল আনন্দে ভোগ করিবার সুবিধা পাইয়া-ছিল।

বাঙ্গালার যৌথ-পরিবার এক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে বলশেভিক রুশিয়ায় যেমন কাহারও গ্রাসাচ্ছাদন, পুত্রকন্যার বিদ্যাশিক্ষা, রোগ-পীড়া প্রভৃতির জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না বলিয়া শোনা যাইতেছে। অর্থের কাহারও প্রয়োজন নাই, অথচ সকলেই স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেছে। রাজ্য-পরিচালন হইতে আরম্ভ করিয়া আপামর রুশিয়ানের গার্হস্থ্য জীবন পর্য্যন্ত শাসনতন্ত্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও শাসিত হইতেছে। বাঙ্গালার যৌথ-পরিবারের লোকদিগেরও তদপেক্ষা অবস্থা ভাল বই মন্দ ছিল না। এক একটি পরিবারের যে পরিমাণ ভূমি ছিল, তাহা হইতে এক বৎসরের খাদ্য সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত থাকিত। জোলা খাজানার পরিবর্ত্তে, অথবা ধান ও নারিকেল-সুপারী প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সমগ্র পরিবারের লজ্জা নিবারণ করিত। জালুক মৎস্য যোগাইত। বার মাসে তের পার্ব্বণ সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হইত। গোশালায় গাভী দুগ্ধ যোগাইত এবং বাগানের নানা প্রকার ফল ও শাকসব্জী হইতে নিত্য আহার্য্যের যথেষ্ট উপকরণ পাওয়া যাইত। কাহারও রোগ হইলে বাড়ীর সকলেই রোগীর পরিচর্য্যা করিত। তাহাতে পিতামাতার চিন্তাভার অনেক লাঘব হইত। কন্যার বিবাহের জন্য পরিবারের কর্ত্তাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন না। এক একটি কন্যার বিবাহ সমগ্র পরি-বারের দায় বলিয়া বিবেচিত হইত। কন্যার পিতামাতার চিন্তায় অন্ন-জল ত্যাগ করিতে হইত না। বাঙ্গালার যে সুখ তাহা আজ গিয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাও অচিরকাল মধ্যে বিলুপ্ত হইবে।

দেড়শত বৎসরের অধিক কাল হইতে বাঙ্গালী যৌথ-পরিবারের এই প্রকার সুখভোগ করিয়া আজ এত অলস ও সৌখীন হইয়া পড়িয়াছে। জীবিকার্জ্জনের কঠিন আবর্ত্তে পড়িয়া আজ তাই বাঙ্গালী হাবুডুবু খাইতেছে। কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য যে বাঙ্গালীর কম, তাহার মূলে এই পারিবারিক সুখ। অলসতা, সৌখীনতা, শ্রমে কুণ্ঠা ও ব্যয়-বাহুল্য হইল ব্যবসায়ীর পরম শত্রু। বাঙ্গালী এই সকল শত্রুকে এখনও পরাজিত করিতে পারে নাই বলিয়া আজ মাড়বারী, ভাটিয়া প্রভৃতি অবাঙ্গালী বণিকগণ বিদ্যা-বুদ্ধিতে কম হইলেও বাঙ্গালীকে তাহার স্বক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিতেছে।

বাঙ্গালার সহজলভ্য খাদ্য-শস্য ও স্নিগ্ধ জলবায়ু অলসতার অন্যতম পরিপোষক। যিনি মাড়বারীগণের বাসভূমি রাজ-পুতনা ও ভাটিয়াদিগের জন্মভূমি কাথিয়াবাড় দেখিয়া আসিয়াছেন, তিনি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, প্রাকৃতিক অনুশাসনই তাহাদের গৃহত্যাগের প্রধান কারণ। স্বদেশে বাস করিলে উহাদিগকে অনাহারে মরিতে হয়।

কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত দ্বারকা-তীর্থের নিকটে ভাটিয়া নামক একটি পল্লী আছে। সম্ভবতঃ এই পল্লী হইতে গুজরাটিদের সাধারণ নাম ভাটিয়া বলিয়া কলিকাতায় খ্যাত হইয়াছে। কলিকাতায় বিকানীর ও জয়পুরের বহু অধিবাসী কারবার করিতেছেন, অথচ সকলকেই মাড়বারী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, রাজপুতনার মধ্য-প্রদেশ বাদ দিলে এই সমগ্র ভূভাগকে একপ্রকার মরুভূমি বলা চলে। কাথিয়াবাড়ও তদ্রূপ। এক গির্ণার পর্ব্বত ব্যতীত জলধারা সমন্বিত আর কোন উচ্চপর্ব্বত তথায় নাই। নদী, পুষ্করিণী, তড়াগ এ সকল তদঞ্চলে একরূপ নাই বলিলেও চলে। সাময়িক বারিপাতের অভাব। রাজপুতনায় জওয়ারের চাষ হইয়া থাকে মাত্র। কাথিয়াবাড়ের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকায় অতি কষ্টে কিছু চাষ হয় বটে, তাহাও অপর্য্যাপ্ত এবং শস্যের প্রকারভেদও বিরল। এই হেতু ঐ সকল অঞ্চলের লোকদিগকে বণিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নানাদেশে বাস করিতে হইতেছে। খাদ্যদ্রব্যের এত অভাব সত্ত্বেও ঐ সকল অঞ্চলের পানীয় জলে এমনই শক্তি যে, তথাকার লোকের স্বাস্থ্য বাঙ্গালার ঈর্ষ্যার বিষয়ীভূত, আর বাঙ্গালায় নানাপ্রকার খাদ্য, অসংখ্য নদ-নদী, পর্জ্জন্যদেবের অপরিমিত কৃপা সত্ত্বেও শুধু এক পানীয় জলের শক্তিহীনতা হেতু বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য এত মন্দ।

নৈসর্গিক নিয়মের উপর হয় তো মানবের কোন হাত নাই এবং সেই নিয়ম হয় তো তাহাকে পালন করিতেই হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ের এমন কতকগুলি মূলমন্ত্র আছে, যাহা শিক্ষা-সাপেক্ষ। এই সকল মূলমন্ত্র শিক্ষা না করিলে কেহ বাণিজ্য-বীর হইতে পারেন না। আমার এই প্রবন্ধে একটি গল্পদ্বারা প্রধান মূলমন্ত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

কোন এক গ্রামে কয়েকঘর তিলি ও কতিপয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিলিরা সকলেই বেশ অবস্থাপন্ন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের অবস্থা ভাল নহে। তন্মধ্যে একজন ব্রাহ্মণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ। মাঝে মাঝে তাঁহাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হয়। ব্রাহ্মণ কষ্টের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন একজন ধনী তিলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার দুর্দ্দশা দূর করিবার কোন উপায় হয় কি না। তিলি শুনিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আচ্ছা দাদাঠাকুর, আপনি কাল সকালে আমার সঙ্গে বাহির যাইতে পারিবেন, দেখি আপনার কিছু সুবিধা করিতে পারি কি না?"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া পুলকিত হইয়া বলিলেন—

"কেন পারিব না। আমার ত কোন কাজ নাই। তা কাল কখন যাইতে হইবে এবং কোথায় যাইতে হইবে বলিতে পার?"

তিলি বলিলেন যে, কোথায় যাইতে হইবে, তাহা তিনি জানেন না, তবে বেশ সকালে যাত্রা করিতে হইবে। যাহা হউক, বন্দোবস্ত হইল যে তিলি সকালে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইবেন।

পরদিন প্রভাতে তিনি আসিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে একটু বসিতে বলিয়া আহ্নিক করিতে গেলেন। আহ্নিক সারিয়া আসিয়া তিলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহাদের ফিরিতে দেরী হইবে কি না। তিলি উত্তরে বলিলেন যে, দেরী হইতে পারে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহা হইলে তিনি কিছু চিড়া ও বাতাসা সঙ্গে লইবেন কি না। তিলি উত্তরে বলিলেন যে, তাঁহার ইচ্ছা হইলে লইতে পারেন। ব্রাহ্মণ কিছু চিড়া ও বাতাসা গামছায় বাঁধিয়া লইয়া তিলির সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। উভয়ে গল্প করিতে করিতে রাস্তা ধরিয়া চলিলেন। বহুদূর হাঁটিয়া মধ্যাহ্নকালে উভয়ে একটি পুষ্করিণীর নিকটে আসিলে ব্রাহ্মণ তিলিকে বলিলেন যে, পথশ্রমে তিনি বড় কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং উভয়ে কিছুক্ষণ পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া বিশ্রাম করিয়া ও জলপান করিয়া তৎপরে পুনরায় যাত্রা করিবেন। তিলি কোন আপত্তি করিলেন না। যাহা হউক, উভয়ে পুষ্করিণীর তটে কিছুক্ষণ বসিয়া তৎপরে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় তিলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আর কতদূর যাইতে হইবে। উত্তরে তিলি বলিলেন তিনি যে, তাহা জানেন না। ব্রাহ্মণ তৎপরে জলযোগ করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিলি তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

ব্রাহ্মণ পুষ্করিণীর ঘাটের একস্থান বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া লইয়া চিড়া ভিজাইয়া বাতাসাযোগে ভক্ষণ করিলেন ভোজনান্তর পুষ্করিণীতে নামিয়া জলপান করিলেন। তিলিরও

অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল। তিনি তাঁহার ছাতাটি পুকুরের জলের কিনারায় কাদার মধ্যে পুঁতিয়া দিয়া তাহার মধ্যস্থলে চাদরখানি কোমর হইতে খুলিয়া লইয়া বেশ করিয়া জড়াইলেন এবং তৎপরে ট্যাঁক হইতে একখানি বাতাসা বাহির করিয়া ঐ চাদরের উপরে স্থাপন করিলেন। ঐ বাতাসের উপর রৌদ্র পড়িয়া জলের যে স্থানে তাহার ছায়াসম্পাত হইল, তিনি সেই স্থানে যাইয়া তিন গণ্ডূষ জলপান করিলেন। পরে পুনরায় বাতাসাটি তুলিয়া লইয়া আবার ট্যাঁকে পুরিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া বসিয়া দেখিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না।

কিছুক্ষণ পরে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"আর বসিয়া কি হইবে, কোথায় যাইবে যাওয়া যাক।"

তিনি বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন—"আর যাইয়া কি হইবে দাদাঠাকুর, আপনি ত মূলধন খাইয়া বসিলেন। আপনার ত আর পাথেয় রহিল না। এই দেখুন না, আমি বাড়ী হইতে যে বাতাসাখানি লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও ঠিক আছে।"

তিনির ইচ্ছা ছিল যে, ব্রাহ্মণকে কিছু টাকা দিয়া তাঁহাকে একটি কারবারে বসাইয়া দিবেন। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাহাতে ব্রাহ্মণের কোন উপকার হইবে না, তাঁহারও টাকা নষ্ট হইবে।

গল্পটি তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু ব্যবসায়ে মূলধনের মর্য্যাদা ঠিক ঐ রূপ। মূলধন বজায় রাখিয়া কারবার চালাইবার মত বুদ্ধি বাঙ্গালীর বড় কম। আর প্রধানতঃ এই কারণেই বাঙ্গালীর ব্যবসায় অল্পদিনের মধ্যেই উঠিয়া যায়। ব্যবসায়-বুদ্ধি বাঙ্গালীর কিছু কম নাই, পরিশ্রম করিবার শক্তিও আছে, সততারও অভাব নাই; কিন্তু এই মূলধনের মর্য্যাদাজ্ঞানের অভাবেই বাঙ্গালী আজ ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজারে প্রতিপত্তিহীন।

মূলধনের অভাবে কারবার করিতে পারিতেছেন না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই আক্ষেপের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। প্রকৃত ব্যবসায়ীর পক্ষে মূলধনের কখনও অভাব ঘটে না। অবশ্য আশানুরূপ মূলধন মিলিতে না পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কারবার করিতে না পারিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কোটিপতি বণিকেরও অর্থের অভাব। অর্থের অভাব সকলেরই আছে। কিন্তু যাহা পাওয়া যায়, তাহাই লইয়া যে কারবারে বসিতে পারে, সেই হইল চতুর বণিক। টাকা কেহ কাহাকেও দেয় না। টাকা উপার্জ্জন করিবার মত বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। ধাপ্পা মারিয়া, মিথ্যা কথা বলিয়া, কথার ছলনায় লোককে মুগ্ধ করিয়া টাকা কিছু উপার্জ্জন করা যায় সত্য, কিন্তু তাহার কোন স্থায়িত্ব নাই। সে ভাবে যাহারা উপার্জ্জন করে, তাহারা নিজের, ধনীর ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর, তথা দেশের অনিষ্ট সাধন করে। টাকা কখনও বসিয়া থাকে না। যাহারা টাকা খাটাইতে না জানে, তাহারা যদি অন্যায়ভাবে টাকার বৃদ্ধিগুণ নষ্ট করে, তাহা হইলে তাহারা দেশের পরমশত্রু বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই সকল অনভিজ্ঞ বণিকের হাতে টাকার যে হতাদর হয়, তাহার বিষময় ফল সমগ্র সমাজ ও দেশকে ভোগ করিতে হয়।

টাকা টাকা করিয়া উন্মাদ হইয়া ছুটিয়া বেড়াইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, টাকা হইতে টাকা বাড়াইবার শক্তি আমার আছে কি না। যদি সে শক্তি আমার না থাকে, তাহা হইলে আমাকে কোন ব্যবসায়ে হাত দিবার পূর্ব্বে সেই ব্যবসায়ের মন্ত্র শিক্ষা করিতে হইবে। সেই মন্ত্র যদি শিক্ষা করিতে আমি না পারি এবং আমার যদি টাকাকে বৃদ্ধিগুণ দিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে জাতীয় অর্থের কিয়দংশ লইয়া আমি যদি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হই, তাহাতে আমার পাপাচরণ হইবে। আর আমার এই পাপের ফল ভোগ করিবে আমার সমাজ, আমার জাতি ও দেশ। আমার ঘরের পানীয় জলের একমাত্র কলস যদি আমার পুত্র ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে বাড়ীর সকলকেই যেমন পিপাসায় কষ্ট পাইতে হয়, তেমনই আমি যদি আমার পিতার পাঁচশত টাকা লইয়া দোকানদারী না জানা সত্ত্বেও দোকান খুলিয়া বসি, তাহা হইলে সে দোকান যে ফেল হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; আর তাহার ফলে আমি যে শুধু পিতার পাঁচশত টাকা নষ্ট করিলাম, তাহা নহে, ঐ পরিমাণ অর্থের বৃদ্ধিগুণ নষ্ট করিয়া সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিলাম।

সেই হেতু বলিতেছি যে, ব্যবসায়ের নীতি শিক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। প্রকৃত ব্যবসায়ী না হইয়া কখনও কোন ব্যবসায়ে হাত দেওয়া উচিত নহে। যে প্রকৃত ব্যবসায়ী এবং যে মূলধনের প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝে, সে কখনও ব্যবসায়ে ফেল হইবে না।

হেসে নাও দু' দিন বই ত' নয়

২৯শে অক্টোবর হইতে ভারতমাতার বুকে কলিকাতা সহরে সমগ্র ভারতের নায়কবৃন্দের এক জলসা হইয়া গিয়াছে—ফলে কলিকাতা সহরে রোগীর জন্য কমলা-লেবু ইত্যাদি হইতে দৈনন্দিন সকল আহার্য্যের মূল্য অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছিল—আর দেশবাসী বায়স্কোপ, থিয়েটার ব্যতীত আরও

মিটিং হইতে ফিরিবার পথে

কিছুদিন পূর্ব্বে ওয়াই-ডাব্লিউ-সি-এ ভবনে 'সেফ্‌টি ফার্ষ্ট' মিটিং-এর অধিবেশন হয়। উহাতে বলা হইয়াছে, মারাত্মক দুর্ঘটনা [illegible] অধিকাংশ মোটরগাড়ীর দরুণ সংঘটিত হয়। এই দুর্ঘটনাদি নিবারণের জন্যই 'সেফটি ফার্ষ্ট' আন্দোলনের সূত্রপাত। মোটরগা[illegible] [illegible] ঠিক তাহাই দেখান হইয়াছে।

বিচিত্র জগৎ

হোরেস্‌ঃ রোমের পল্লীপ্রকৃতির কবি

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন রোমানগণ কবি ও ভবিষ্যদ্বক্তা বোধক একটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করত।

আমার কবিতা হবে মৃত্যুঞ্জয়ী, যত দিন যাবে, তাদের যশঃসৌরভ তত বর্দ্ধিত হবে।”
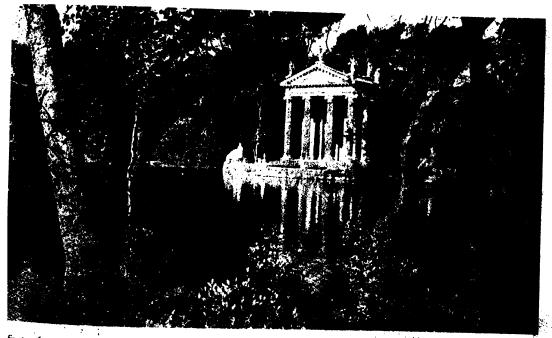
ভিলা বর্গেজ—কবি হোরেসের সময়ের বহু পরে গ্রীক মন্দিরের ভাস্কর্য্যের অনুকরণে এইরূপ অনেক ভিলা প্রস্তুত হয়। এই ভিলার নিকটেই বর্গেজ মিউজিয়ম, যেখানে টিসিয়ান, রুবেনস, র‍্যাফেল প্রভৃতি অমর শিল্পীর সৃষ্টি রক্ষিত আছে।

কেমন করে তাদের বিশ্বাস হয়েছিল যে, প্রতিভাবান কবি আর দ্রষ্টা আসলে একই মানুষ। দু'হাজার বছর আগে একজন কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য্য রকমে সফল হয়েছে বলা যায়। এক পরম আনন্দের মুহূর্ত্তে তিনি বলেছিলেন:—

“আমি কখনই একেবারে মরব না। হয়ত আমার হাড় ক'খানা সমাধিস্থ করা হবে, কিন্তু আমার নাম ও

তাঁর ভরসা হয়ত অনেক কমে যেত, যদি তিনি রোম সাম্রাজ্যের পতন মানসদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন, বর্ব্বর ভ্যাণ্ডালগণ কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যের ধ্বংস লক্ষ্য করতেন। কিন্তু তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে—আজ সিজারদের প্রাসাদের চিহ্ন নেই, সাম্রাজ্যের বহু জয়স্তম্ভ কালের কোলে বিলীন, রোমান্‌ ফোরাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে—কিন্তু পৃথিবীর সাহিত্যের উপর সে প্রাচীন কবির প্রভাব এখনও জীবন্ত।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬৫ অব্দের ৮ই ডিসেম্বর হোরেস ভেনুসিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর পুরো নাম কুইন্টাস্ হোরেসিয়াস্ ফ্ল্যাকটাস্। ভেনুসিয়াতে খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৯১ অব্দে সামাইট্ যুদ্ধের কিছু পরেই রোমান উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এ্যাপেনাইন্ পর্ব্বতমালার পাদমূলে অবস্থিত এই সুন্দর উপনিবেশটি কখনই খুব উন্নতি করতে পারে নি—বর্ত্তমানে এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা সবশুদ্ধ ন'হাজারের বেশী নয়—এর বর্ত্তমান নাম ভেনোসা।

ভেনোসা নগরে কবি হোরেসের প্রতিমূর্ত্তি।

এই নগরে একটি সুপ্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান, স্থানীয় লোকের কাছে এটা কাসা ডি ওরোজিও বলে পরিচিত। সকলের বিশ্বাস হোরেস এই বাড়ীতে বাস করতেন—কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রমাণ বড়ই ক্ষীণ। এখানে হোরেসের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে, ভাস্কর্য্য হিসাবে এর বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন গ্রন্থে ভেনুসিয়ার উল্লেখ খুব কমই পাওয়া যায়, এখনও পর্য্যন্ত এই নগরের সম্বন্ধে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, হোরেস এখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এখন যেখানে নগরের সাধারণ বাজার, সেখানে প্রাচীন যুগে নগরের ফোরাম ছিল, গ্রাম্য কৃষকেরা তাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলমূল বিক্রয়ার্থ নিয়ে আসত, দু'একখানা দোকানে জিনিষপত্রের সামান্য কেনাবেচা চলত।

হোরেসের পিতা পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিলেন, পরে স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন। স্বাধীন হওয়ার পরে জনৈক পোদ্দারের কর্ম্মচারী হিসাবে চাকুরী করে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

ভেনুসিয়ার স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার পরে হোরেস পিতার সঙ্গে রোম নগরে উচ্চশিক্ষার জন্য যান। তাঁর ব্যঙ্গ-কবিতার গ্রন্থের প্রথম ভাগের ষষ্ঠ কবিতায় হোরেস তাঁর পিতার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। হোরেসের ধনশালী পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিপালক ম্যাকেনাসের উদ্দেশ্যে এই বইখানা লিখিত।

বালকেরা সাত বৎসর বয়সে পাঠশালায় প্রেরিত হত। অক্ষর পড়তে ও লিখতে শেখা এবং সামান্য সামান্য অঙ্ক কষা শিখতে পাঁচ বৎসর কেটে যেত। মোম চালাই করা প্লেটের উপর ধাতুনির্ম্মিত সূঁচলো কলম ('stylus) দিয়ে ছেলেরা লিখতে শিখত। গ্রীক ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণ-প্রণালী ও বানান-রীতি এই সব প্রাথমিক পাঠশালায় একটি প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল।

তারপরে ভাল ভাল উপদেশমালা, প্রবাদ-বাক্য ও উৎকৃষ্ট সাহিত্য থেকে সংগৃহীত অংশ মুখস্থ করতে হত। অঙ্কশাস্ত্র শেখাতে কিছু বেশী সময় ব্যয় করার রীতি ছিল।

হোরেসের পিতা পুত্রের লেখাপড়ার শেখার আগ্রহ ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে বুঝতে পারলেন যে, গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বেশী দিন একে রাখা চলবে না। তাই তিনি ছেলেকে এনে রোমে বড় স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষকটি বেজায় কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কথায় কথায় বেত্র ব্যবহার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করে রেখেছিলেন। তাঁর এই নতুন ছাত্রটির কাব্যে প্রাচীন দিনের সেই হেড-মাষ্টার অমর হয়ে আছেন।

এই উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল রোমান ও গ্রীক সাহিত্য। বেশী জোর দেওয়া হত

কাব্য শাস্ত্রের উপর। বড় বড় কবিদের কাব্যের ভাল ভাল অংশ মুখস্থ রাখার পদ্ধতি ছিল, ব্যাকরণ নিয়ে বড় কড়াকড়ি ছিল। জ্যামিতি, সঙ্গীত, নৃত্যকলা বিষয়েও অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হত।

হোরেস বড় হয়ে যখন দেশ-প্রসিদ্ধ কবি বলে পরিচিত হন, তখন তাঁর নিজের কাব্যের অনেক অংশ রোমের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে।

এর পরেও উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। ছাত্রেরা কোন নামজাদা বক্তার কাছে গিয়ে কিছু দিন ধরে শিখত বড় সভায় দাঁড়িয়ে কি করে বক্তৃতা করতে হয়। বাগ্মিতা-শিক্ষাই ছিল প্রাচীন রোমের চরমতম উচ্চ শিক্ষা। কেউ কেউ এর সঙ্গে অলঙ্কার শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চা করত।

রোমে উচ্চশিক্ষা লাভ করার পরে হোরেস গ্রীসে প্রেরিত হন, গ্রীক পণ্ডিতদের কাছে তদ্দেশীয় সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করতে।

এটা হল জুলিয়াস সিজার নিহত হওয়ার বছরখানেক বা তার কিছু বেশীর পূর্ব্বের ঘটনা।

ব্রুটাস্ ও ক্যাসিয়াস যখন গ্রীসে যান, তখন একদল প্রবাসী রোমান ছাত্র তাঁদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি হয়ে পড়ে। হোরেসও সেই দলের একজন। ব্রুটাসের শাসনাধীনে তিনি ট্রিবিউনের পদ পেয়েছিলেন, কিন্তু ফিলিপির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পদচ্যুত হন।

এই যুদ্ধের সময় তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়, যুদ্ধান্তে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন যখন করেন, তখন তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ। কবিতা লিখে ও কবিতার বই বিক্রী করে তিনি অন্ন-সংস্থানের চেষ্টা করেন কিছুদিন। কিন্তু কবিতার বাজার চিরকালই খারাপ, তখনও যা ছিল, দু' হাজার বছর পরে আজও সেই অবস্থা। কিছুদিন পরে হোরেস বুঝলেন, কবিতা বিক্রয়ের আয়ের ওপর নির্ভর করতে হলে তাঁকে উপবাসে দিন কাটাতে হবে। অনেক চেষ্টার পরে কুইন্টাসের দপ্তরে তিনি একটি কেরাণীগিরি চাকুরী পেলেন—তারপরে তাঁর অবস্থা অনেকটা স্বচ্ছল হয়ে উঠল।

এই সময় বিখ্যাত কবি ভার্জিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং ভার্জিলই হোরেসের ইটালিতে প্রত্যাবর্ত্তনের তিন বৎসর পরে তৎকালীন বিখ্যাত ধনী, শিল্প ও কাব্যের বড় পৃষ্টপোষক সেয়াস্ সিল্সিয়াস্ ম্যাকেনাসের সঙ্গে হোরেসের পরিচয় করিয়ে দেন।

এই অভিজাত বংশীয় রোমান একজন বিশিষ্ট সাম্রাজ্য-বাদী ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁরই প্ররোচনায় অক্টেভিয়াস্ রাজদণ্ড গ্রহণ করতে উৎসাহিত হন এবং অগষ্টাস্ নাম গ্রহণ করেন। সম্রাট কর্ত্তৃক তিনি সমগ্র ইটালির শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হন এবং দেশের মধ্যে নিঃসন্দেহে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল।

ম্যাকেনাস প্রভূত সম্পত্তি ও অর্থের উত্তরাধিকারী

কবি হোরেসের মৃত্যুর ৮০ বৎসর পরে রোমে এই বিরাট প্রেক্ষাভূমি (অ্যাম্পিথিয়েটার) প্রস্তুত সুরু হয়—এখানে ৪৫,০০০ দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা আছে।

হয়েছিলেন এবং নিজেও যথেষ্ট বিত্ত অর্জ্জন করেন। এস্কুইলিন্ পর্ব্বতে তাঁর সুরম্য প্রাসাদে সে যুগের সকল বড় বড় কবি ও লেখকের মিলন-স্থল ছিল।

এস্কুইলিন্ পর্ব্বতের বিখ্যাত উদ্যান ম্যাকেনাস প্রস্তুত করেছিলেন। প্রথমে এইখানে মহামারীর আড্ডা স্বরূপ অতীব অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ছিল,—আশ্চর্য্য নয়, যখন আমরা শুনি যে বহুকাল ধরে এইখানে সাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমাধিভূমি ছিল। ম্যাকেনাস্ এই পচা জলার উপর অনেক উঁচ করে মাটি ছড়িয়ে দিয়ে জায়গাটাকে

শুকনো খট্‌খটে করেন, তার পর অতি সুন্দর বাগান তৈরী করে সমস্ত জলাটাকে তিনি অপরূপ সৌন্দর্য্যভূমিতে পরিণত করেন।

প্রসঙ্গক্রমে এ কথা উল্লেখ করা অবান্তর হবে না যে, আজকাল যাকে বলে ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনিং অর্থাৎ প্রাকৃতিক দৃশ্য-যুক্ত উদ্যান, আমেরিকায় বা ইউরোপে যে শিল্প অবলম্বন করে বহু লোকে অন্নসংস্থান করছে, সেই প্রাচীন যুগের রোমেও এ আর্ট অজ্ঞাত ছিল না। ভারতবর্ষেও যে ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মোগল যুগের উদ্যান গঠনের রীতি দেখে,—যদিও অবশ্য তা অনেক পরের কথা।
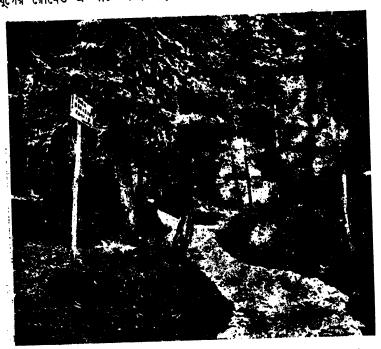
অগষ্টাস কবি হোরাসকে এইখানে বাস করিবার জন্য একটি ভিলা দান করেন। অকৃত্রিম প্রাকৃতিক দৃশ্য কবির বড় প্রিয় ছিল।

জলাভূমিকে সুন্দর উদ্যানে পরিণত করার এই সাফল্যকে চিরস্মরণীয় করেছেন হোরেস্‌ তাঁর অমর কাব্যের প্রথম খণ্ডে। প্রবাদ এই যে, ম্যাকেনাসের মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ৬৪ খৃষ্টাব্দে এই উদ্যানমধ্যস্থ প্রাসাদ থেকে নৃশংস নীরো রোম নগরীর দহ্যমান দৃশ্য আনন্দে উপভোগ করেছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে একটি প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছিল সাণ্টা মারিয়া ম্যাজ্জোর ও ল্যাটেরান নদীর মাঝামাঝি স্থানে। অনেকে অনুমান করেন, এই বাড়ীটা এক সময়ে ম্যাকেনাসের উদ্যানস্থ অভিনয়মঞ্চের প্রেক্ষামণ্ডপ ছিল। ঘরটি চতুষ্কোণ এবং এর উত্তর দিকে অনেকগুলি সিঁড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, এগুলি এক সময়ে থিয়েটারের দর্শকদের বসবার আসন ছিল।

ম্যাকেনাস হোরেসকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। হোরেসের ওপর তাঁর প্রভাবও ছিল খুব বেশী। ম্যাকেনাস্‌ হোরেসের যা কিছু উপকার করেছিলেন, হোরেস্‌ তা শোধ দিয়েছেন ম্যাকনাসকে নিজের কাব্যের মধ্যে অমর করে রেখে। নইলে আজ কে এই ধনী রোমানের কথা মনে রাখত? ম্যাকেনাসের অনিদ্রা রোগের কথা আমরা হোরেসের কাব্য থেকে জানতে পারি। আর জানতে পারি ম্যাকেনাসের নানা খামখেয়ালীর কথা। রাত্রে সুনিদ্রা হবে কিসে? অনেক ভেবে ম্যাকেনাস্‌ একটা কৃত্রিম জলপ্রপাত বানালেন শোবার ঘরের অদূরে, যাতে তার ঝর ঝর জলপতনের শব্দে তাঁর নিদ্রাবেশ হয়। একদল বাদক নিযুক্ত করলেন, তারা বসে বীণায় বাজাবে মৃদু, নিদ্রাকর্ষক সুর।

ম্যাকেনাসের পরামর্শে সম্রাট অগষ্টাস্‌ হোরেসকে কিছু ভূমি দান করেন। এই স্থানটি রোমনগর থেকে কয়েক ঘণ্টার পথ মাত্র। লুক্রিটিলিস্‌ শৈলের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র মনোরম অরণ্যাবৃত উপত্যকা হিসেবে এর প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতি সুন্দর।

হোরেসের বাসভূমির প্রকৃত অবস্থান নিরূপিত না হলেও মোটামুটি সে জায়গাটা নির্ণয় করা কঠিন নয়। তা থেকে বোঝা যায় যে, হোরেস্ তাঁর এই পল্লীভবনে অত্যন্ত সুখে দিন কাটাতেন, অথচ সে যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষি ও রাজনীতির কেন্দ্র থেকে তাঁকে বেশীদূরে অবস্থান করতে হত না।

তাঁর পুস্তক থেকে যতটা জানতে পারি, পল্লী-বাটিকায় হোরেসের দৈনন্দিন কাজ ছিল নিম্নলিখিতরূপ :

প্রাতঃকালে উঠে তিনি লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত থাকতেন, ন'টার সময়ে রুটি ও মধুর সংযোগে প্রাতর্ভোজন সম্পন্ন করতেন। কখন কখন তার সঙ্গে পনীর ও শুষ্ক ফলও থাকত। মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে তিনি একটু বেড়াতে বার হতেন। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে কিছুক্ষণ ঘুমাতেন। আকাশ পরিষ্কার থাকলে হোরেস তাঁর গৃহের অদূরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় সাধারণতঃ শয়ন করতেন। নিকটেই বয়ে যেত একটি কুলু কুলু নাদী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। বৈকালটিতে তিনি সাধারণতঃ বেড়াতেন এবং কিছু শারীরিক ব্যায়াম করতেন। অপরাহ্ণ চারটার সময়ে দিবসের প্রথম প্রধান ভোজ নিষ্পন্ন হত। এতে আয়োজনের প্রাচুর্য্য ছিল। সাধারণতঃ ডিম, লেটুস্, জলজ শাক, মধু প্রথমে খাওয়া হত। পরে বহুরকম ভোজ্যের ডিশ আসত। তার মধ্যে থাকত মাছ, মুরগি, মাংস, পক্ক ও টাটকা ফল, পিষ্টক ও মদ্য। পরবর্ত্তী যুগে এই বৈকালিক আহারের ভোজ্যের সংখ্যা রোমানদের মধ্যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ভিয়া সাক্রা : রোমের এই অংশটি কবির লেখনীতে অমর হইয়া আছে।

সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রসালাপ করতেন, নয়ত গায়ক কিংবা বাদকদিগের কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শুনতেন। হোরেসের পল্লীভবনের চতুর্দ্দিকে ছিল শ্যামল মাঠ, শস্য-ক্ষেত্র, নিকটেই ছিল একটি সুন্দর বনভূমি, ছাগচারণের ক্ষেত্র এবং একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। তাঁর একটি সুন্দর ক্ষুদ্র কবিতা এই পার্ব্বত্য ঝর্ণার উদ্দেশ্যে লিখিত। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের ষষ্ঠ কবিতায় হোরেস নাগরিক জীবনের অসারতা ও পল্লীজীবনের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করেছেন। কবিতাটির প্রতি পংক্তিতে গ্রামবাসে তাঁর পূর্ণ তৃপ্তি ও সন্তোষের আভাস পাওয়া যায় এবং সমগ্র কবিতাটি তাঁর সদয় পৃষ্ঠপোষক ম্যাকেনাসের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি ধন্যবাদের বাণী।

"আমি চিরকাল এই চেয়ে এসেছি—এক টুকরো জমি, যা খুব বড় না হলেও আমার চলবে। একটুখানি বাগান, তার সঙ্গে থাকবে ছোট্ট একটা বনভূমি। কিন্তু দেবতারা সদয় হয়ে তার চেয়ে অনেক বেশীই আমাকে দিয়েছেন, আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, তাঁদের কাছে যা পেয়েছি, আমার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যেন তা ভোগ করতে পারি।"

মাঝে মাঝে তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করতেন। এরা গ্রাম্য লোক, বড় সরল ছিল এদের চরিত্র। হোরেস লিখে গিয়েছেন, এরা পরনিন্দা পরচর্চ্চা

করতে অভ্যস্ত ছিল না, ভোজন সমাপ্ত করে অনেকেই সরল গল্প বলত।

তাঁর 'ইপোড্‌স্' কবিতাবলীর দ্বিতীয়টিতে হোরেস আর একবার পল্লীজীবনের সুখ বর্ণনা করেছেন। কবিতাটিতে একটি সুদখোর কৃপণ মহাজনের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। রোমে তার ব্যবসাতে ক্ষতি হওয়ায় সে ভাবলে সহরের বাস উঠিয়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে সে চাষার কাজ করবে। "তার মত সুখী আর কে আছে, ব্যবসার ঝঞ্ঝাট যাকে পোয়াতে হয় না? প্রাচীন কালের লোকের মত সে সরল জীবন যাপন করতে পারে। নিজের লাঙল গরু দিয়ে নিজের জমি সে নিশ্চিন্তে চষতে পারে, টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসায় যে দুশ্চিন্তা, তা তাকে পোয়াতে হয় না। আদালতে তাকে ছুটতে হয় না মামলা করতে, বড়লোকের বাড়ীর উঁচু গাড়ীবারান্দার তলায় তাকে বসে থাকতে হয় না। সে মনের আনন্দে পরম আরামে কোন প্রাচীন গাছের শীতল ছায়ায় ঘন তৃণশয্যায় শুয়ে নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদীর কুলুকুলু ধ্বনি উপভোগ করতে পারে।

"যখন শীতকাল আসে, বৃষ্টি ও তুষারপাত সুরু হয়, তখন সে শিকারী কুকুর নিয়ে শিকারে বার হতে পারে, কিংবা বনে ফাঁদ পেতে থ্রাস পাখী ধরতে পারে। আর যদি তার গৃহে এ্যাপুলিয়ান প্রদেশের শক্ত মেয়ে গৃহিণী হিসাবে থাকে, তবে তো কথাই নেই। বাড়ী ফিরে সে দেখতে পায় কাঠের গুঁড়ির আগুন করা হয়েছে চিম্‌নিতে, তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তাদের মায়ের সঙ্গে সেখানে আগুন পোয়াতে জড় হয়ে বাপের প্রত্যাবর্ত্তন প্রতীক্ষা করছে সাগ্রহে—তবে আর মানুষে কি চাইবে?

"অনেকে হয়তো লুসার্ণের ঝিনুক ভালবাসে, কিংবা টারবট মাছ, কিংবা টার্কি, অথবা হয়তো আইয়োনিয়ান্ তিত্তির পাখী—ওসব আমি চাইনে, যদি গৃহিণীর হাতে তৈরী সাদাসিধে সামান্য খাদ্য খেতে পাই।"

এই হল সুদখোর মহাজন আল্‌ফিয়ুসের কথা।

প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখে সে সব টাকাকড়ি আদায় করে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে গ্রামে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়—কিন্তু যেমনি পরের মাসের পয়লাটি আসে, সমস্ত টাকা দাদন দিয়ে সে সহরকে আরও জোর করে আঁকড়ে ধরে।

বর্ত্তমানে ইটালির সুন্দর চওড়া রাজপথগুলি দিয়ে যাঁরা লিমোসিন্ হাঁকিয়ে বেড়িয়ে বেড়ান, তাঁদের কাছে হোরেসের কাব্যগ্রন্থের পঞ্চম ব্যঙ্গ-কবিতায় রোমের তৎকালীন রাজপথে ভ্রমণের বর্ণনা অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ হবে। কি ভয়ানক তফাৎ তখনকার ও এখনকার ভ্রমণের সুখ-সুবিধায়!

এ্যাপিয়ান রাজপথ তখন ছিল, এখনও আছে, দেশের একটি বড় ও বিখ্যাত রাজপথ। হোরেস এই পথে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোন একটি স্থানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। সরাইখানাটি যেমন অপরিষ্কার তেমনি নানারকমে অসুবিধাজনক। প্রথম তো সেখানকার রেট বড় চড়া, তারপরে সরাই-রক্ষক লোকটি অভদ্র জুয়াচোর।

বিছানায় পালকভর্ত্তি তোষক আছে বলে দাম আদায় করলে, শেষে দেখা গেল তোষকের মধ্যে খড় ভর্ত্তি।

হোরেসের সময়ে রোমে প্রধানতঃ দু'রকম যানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল,'লেক্‌টিকা' আর 'রেডা'। 'লেকটিকা' এক ধরণের পাল্কী বা ডুলি, তার ছাদ ছিল চামড়ার তৈরী, বসবার জন্যে ভেতরে নরম গদি দেওয়া থাকত, মাথা রেখে বিশ্রাম করবার ব্যবস্থাও ছিল। মালিকের পদবী ও টাকার জোর অনুসারে লেক্‌টিকা দুই থেকে ছয় বা আটজন ক্রীতদাসে বয়ে নিয়ে যেত। এই পাল্কীর একটা সুবিধা এই ছিল যে, সহরে ও পল্লীপথে সর্ব্বত্রই চলত, কিন্তু চক্রযুক্ত যান সে সময়ে সহরে প্রবেশ করতে পারত না।

'রেডা' চার চাকার বড় গাড়ী, এতে জিনিষপত্র ও অনেক লোকজন নিয়ে ভ্রমণ করবার সুবিধা ছিল। 'রেডা' অশ্বতরে টানত, বড়লোকে অশ্বতরের পরিবর্ত্তে সুসজ্জিত গল্ দেশীয় ঘোড়া ব্যবহার করতেন।

হোরেস্ যাচ্ছিলেন রোম নগর থেকে ব্রিন্দিসি। বেশী লোক ছিল বলে ইনি 'রেডা'য় গিয়েছিলেন মনে হয়। বোধ হয় তাঁর যাবার খুব তাড়াতাড়ি ছিল না,

কারণ রোম থেকে ৫৬ মাইল দূরে টেরাচিনয়ে তিনি পৌছান তিনদিনে।

যাদের বেশী তাড়াতাড়ি নেই, এমন পথিকদের জন্যে হোরেস লিখে গিয়েছেন, এ্যাপিয়ান ওয়ে নামক বিখ্যাত রাজপথটিই ভাল। অন্যান্য পথে ঝাঁকুনি যতটা লাগে, এ্যাপিয়ান্ ওয়েতে অত ঝাঁকুনি সহ্য করতে হয় না।

ফোরো এ্যাপিও থেকে খানিক দূর হোরেসকে খালপথে নৌকাতে যেতে হয়। উঃ সে কি ভীষণ কষ্টের ব্যাপার! ক্রীতদাসগুলো মাঝিদের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করছে, বড় বড় মশা, দু'ধারে জলাভূমি সারারাত ধরে একঘেয়ে বেঙ-ডাকানির চোটে ঘুম অসম্ভব হয়ে পড়ল, এরই মধ্যে আবার একজন মাতাল মাঝি তার প্রণয়িনীর উদ্দেশে গান করতে লাগল। অনেক কষ্টে হোরেসের একটু ঘুম এসেছিল; কিন্তু ভোরে উঠে দেখলেন মাঝি ও ক্রীতদাসেরাও সারারাত্রি ঘুমিয়েছে, সারারাত্রি নৌকো এক দম এগোয় নি।

দৈনন্দিন জীবনের সামান্য সামান্য আনন্দকে হোরেস্ তাঁর কাব্যে রূপ দিয়ে গিয়েছেন, তাই তাঁর কাব্য এই দুই হাজার বছর ধরে সকল ক্লাসিক কবিতার ভক্তের প্রিয়। তিনি তাঁর কাব্যে এক জায়গায় বলেছিলেন, তাঁর এই সব কবিতা পিরামিডের অপেক্ষাও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে।

তাঁর সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

দ্বন্দ্ব

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ওগো মিথ্যা, জয়ী হলে তুমি,
হলে মোর স্বেচ্ছাবৃত আত্মবধ্যভূমি!
সত্যেরে বরিয়া মনে তোমারে করেছি আমি আত্মসমর্পণ,
তোমারে বাসি না ভাল, তবু তোমা সনে ঘর করি আজীবন।

এ কেমন ভালবাসা হায়,
যার তরে কাঁদি, তারে নিত্য ঠেলি পায়!
জানি ঘৃণা করি যারে পদে পদে শুনি আর রাখি তার কথা,
জেনে শুনে আছি ভুলে দিবানিশি যারে,
সে যে প্রাণের দেবতা।

তবু থেকে থেকে ওঠে কেঁদে
প্রাণ মোর, মিথ্যা মোরে রেখেছে যে বেঁধে;
বাঁধন কাটিতে চাই, শক্তি নাই, জান আমি কত দুরবল,
তোমার উদ্দেশে মোর নিদ্রাহীন রাতে শুধু ঢালি আঁখিজল।

পড়ে আছি এ ধূলি-শয়নে
শক্তি নাই চলিবার মোর তোমা সনে।
বন্ধুর জীবন-পথে তুমি সুদূরের পান্থ, হিমাদ্রিশিখর
পঁহুছিতে চাও হেঁটে, সন্তরিয়া উত্তরিতে দুস্তর সাগর।

ওগো বলী, ওগো বীর, কহ,
রব কি মিথ্যার দাস নিত্য অহরহ?
তোমারে পূজিয়া চিত্তে বলবীর্য্য লভিবে না কভু কি দুর্ব্বল,
ভাঙিতে কি পারিবে না দুর্ব্বিষহ দাসত্বের মিথ্যার শৃঙ্খল?

প্রেম কি দিবে না শক্তি মোরে,
ছিঁড়িতে মিথ্যার এই মোহময় ডোরে?
শিকড় নিগড়ে বাঁধা মাটি সনে গুঁড়ি যার কেন তার শাখা
ওঠে হায় উর্দ্ধমুখে,
কভু সে কি উড়িবে না শূন্যে মেলি পাখা?

ওগো আবিঃ, হে প্রাণের আলো,
মনে হয় তুমি মোরে বাস বুঝি ভাল।
তোমার কিরণ পড়ে এ শাখীর পত্রে পত্রে উর্দ্ধ হতে ঝরি,
তোমার পবনে তারা থেকে থেকে হর্ষাবেশে ওঠে যে শিহরি!

তুমি ভালবাস তাই আমি,
জীবনে অসতী হয়ে তবু ডাকি—স্বামী!
সে ডাকে মিথ্যার লেশ নাহি যদি থাকে মোর, তবে একদিন
হয়ত লভিব বল, মিথ্যামুক্ত হয়ে তব হব আজ্ঞাধীন।

আমরা খাই কেন?

—ডাক্তার

"আমরা খাই কেন?" এ প্রশ্ন করলে, হয়ত পিসীমা খানিকক্ষণ মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠবেন—"পোড়া পেটের জন্য! ওরই জন্যে ত পৃথিবীতে যত গোলমাল।"

ক্ষুধা পায় বলেই মানুষ খায়; আবার ক্ষুধা না পেলেও লোভে পড়ে কিম্বা উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতনও অনেক সময় খেতে হয়। 'ক্ষুধা পায়' বললেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল না, কারণ তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন হবে "ক্ষুধা পায় কেন?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের দেহটা কি ধরণের জিনিষ সেটা মোটামুটি জানা দরকার, কারণ তা না হলে উত্তরটা বুঝাবার সুবিধা হবে না।

বায়স্কোপে কিংবা গড়ের মাঠে কিংবা অন্য কোথাও যাঁরা শিক্ষিত সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখেছেন, তাঁরা হয় ত একটা জিনিষ লক্ষ্য করে থাকবেন যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন, এই সব সৈন্যদের প্রত্যেকের একটা সংযোগ আছে। এই সৈন্যসমষ্টির সঙ্গে যদি মানুষের দেহের তুলনা করা হয়, তা হলে যদিও সেটা কালিদাসের উপমার মতন সুষ্ঠু নাও হয়, তথাপি সেটাকে খুব বেশী ভুল বলা যায় না।

শরীরের কোনও অংশ যদি খুব পাতলা করে কেটে অনুবীক্ষণের (মাইক্রস্‌কোপের) সাহায্যে দেখা যায়, তা হলে দেখতে পাই কতকগুলি নানা আকারের ঘরের মতন জিনিষ পাশাপাশি সাজান রয়েছে। এই ঘরগুলিকে ইংরাজীতে cell এবং বাংলায় কোষ বলা হয়। প্রত্যেক সৈন্যের মতন প্রত্যেক কোষ এক একটি বিভিন্ন জীব।

সৈন্যদের যেমন আহার প্রয়োজন এবং শরীরের আবর্জ্জনা দূর করা প্রয়োজন, কোষেরও ঠিক তাই প্রয়োজন। কমিসেরিয়েট্ ডিপার্টমেণ্টের মতন রক্ত আমাদের শরীরের এই কাজটি করে। সৈন্যদলের মধ্যেও মৃত্যু হচ্ছে এবং তাদের বদলে নূতন সৈন্য আসছে—শরীরের মধ্যেও কোষের মৃত্যু হচ্ছে এবং তাদের জায়গায় নূতন কোষের সৃষ্টি হচ্ছে। তফাৎ এই যে, সৈন্য আনতে হয় অন্য জায়গা থেকে কিন্তু কোষ সৃষ্টি হয় কোষ থেকেই। সৈন্যদের মধ্যে যেমন প্রত্যেকের চেহারা কিংবা স্বভাব কিম্বা কাজ সব সময় এক নয়, কোষের মধ্যেও প্রত্যেকের চেহারা কিংবা স্বভাব কিংবা কাজ এক নয়। যকৃতের কোষ আর স্নায়ুর কোষের চেহারা কিংবা কাজ যে এক নয়, সেটা বলাই বাহুল্য।

শরীর বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন—এই সব কোটী কোটী কোষগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার। ইংরাজীতে একটা কথা আছে an army marches on its stomach, অর্থাৎ সৈন্যদল চালনা করতে হলে আগে দরকার তাদের উপযুক্ত খাদ্যের। দেহের কোষেদের বেলায়ও সেই কথা সত্য। যদি কোষেরা উপযুক্ত খাদ্য পায় এবং যদি তাদের খাদ্য-গ্রহণ ক্ষমতা লোপ না পেয়ে থাকে, তা হলেই শরীর বেঁচে থাকে। শরীরের যা কিছু কাজ বাস্তবিক কোষেরাই করে আর ক্ষয় যা কিছু হয় তা এদেরই হয়। এই কোষ-সমষ্টিই দেহ।

কোষের ক্ষয়নিবারণ আর কার্য্যশক্তির জন্যই প্রয়োজন হয় খাদ্যের। মানুষের তৈরী যন্ত্রের কোনও জায়গায় ক্ষয় হলে যন্ত্র যে জিনিষ দিয়ে তৈরী (লোহা কাঠ প্রভৃতি) সেই জিনিষ খানিকটা যোগ করে দিলেই চলতে পারে। ভগবানের তৈরী এই দেহযন্ত্রের কোনও কোষের ক্ষয় হলে কেবলমাত্র সেইটুকু বাহির থেকে পূরণ করা সম্ভব নয়। অনেকটা জায়গা ক্ষয় হয় যদি তা হলে হয়ত অন্য জায়গার খানিকটা মাংস কিংবা অস্থি সেখানে লাগিয়া দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু নিয়তই যে ক্ষয় হচ্ছে আমাদের শরীরে, সে ক্ষয় এতই সামান্য যে, সেটা বাহির থেকে যোগ করা সম্ভব নয়। যোগ করা সম্ভব নয় বলেই ভগবানের সৃষ্ট এই যন্ত্র নিজেই সেই কাজ করে নিতে পারে।

নিদ্রিত কিংবা জাগ্রত মানুষের এমন কোনও অবস্থাই সাধারণতঃ আসে না, যখন শরীরের সমস্ত অঙ্গ একেবারে

নিশ্চল হয়ে থাকে। নিদ্রিত মানুষের হৃদ্‌যন্ত্র (heart) বন্ধ হলে কিংবা নিঃশ্বাস বন্ধ হলে তখন সে চিরনিদ্রিত। জাগ্রত অবস্থায় কোনও কোনও অঙ্গ হয়ত একটু বেশী দ্রুত চলে। মানুষের তৈরী যন্ত্র যখন কাজ করে, তখন যেমন তৈল (পেট্রল ইত্যাদি) কিংবা বাষ্পের প্রয়োজন হয়, তেমনই দেহের কাজ চালাইবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। দেহের ক্ষয় যখন দেহকেই পূরণ করতে হয়, তখন নিশ্চয়ই সেই জিনিষ খাদ্য থেকে সংগ্রহ করা ভিন্ন অন্য উপায় নেই

শরীরে খাদ্যের প্রয়োজন দুটি কাজের জন্য—(১) দেহের কাজ চালাবার জন্য ইন্ধনের, (২) ক্ষয়-পূরণের জন্য। এ ভিন্ন আরও একটি প্রয়োজন আছে—যাদের শরীর এখনও পূর্ণতা পায় নাই, অর্থাৎ অল্প-বয়স্করা, তাদের বৃদ্ধির জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন আছে।

শরীরের ক্ষয়পূরণের জন্য যখন খাদ্যের প্রয়োজন, তখন দেখা উচিত মোটামুটি ভাবে শরীর কি কি জিনিষ দিয়ে তৈরী। দেহের মালমশলা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, অর্দ্ধেকের উপর কেবল জল। দেহের ওজনের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ জলই পাওয়া যায়। সব অংশেই যে জলের ভাগ সমান তা নয়—কোথাও বেশী কোথাও কম। দেহের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অংশ, অর্থাৎ অস্থিতে আছে শতকরা ২২ ভাগ আর কিড্‌নি (kidney) বা মূত্রগ্রন্থিতে (বৃক্ক্) আছে শতকরা ৮২ ভাগ। স্যর আরথার শিপ্‌লি (Sir Arthur Shipley) তাঁর 'Life' বলে এক বইতে বলেছেন—Even the Archbishop of Canterbury comprises 59 per cent of water, অর্থাৎ ক্যান্টারবারীর আর্কবিশপের শরীরেও শতকরা ৫৯ ভাগ জল। কোষের ভিতরের প্রায় সমস্ত অংশই তরল। সেই তরল পদার্থটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাহাতে অনেক রকম জিনিষ জলে মিশ্রিত আছে। জলের এত প্রয়োজন তার একটি মহৎ গুণের জন্য। খাদ্যকে তরল করে দেহসাৎ করবার উপযুক্ত করতে জলই শ্রেষ্ঠ। শরীর থেকে জল অনবরত বাহির হয়। ঠাণ্ডা কাঁচের ওপর নিঃশ্বাস ফেললে দেখা যায় কাঁচ অস্বচ্ছ হয়। সেই জায়গায় দেখা যায় খুব ছোট ছোট জলবিন্দু জমে রয়েছে। ঘাম এবং প্রস্রাবের সঙ্গে শরীরের অনেক ময়লা বেরিয়ে যায়। শীতকালে প্রত্যহ প্রায় ✓২॥০ সের জলের প্রয়োজন হয়—গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হয় এর চেয়ে অনেক বেশী। জলের এত বেশী প্রয়োজনের জন্যই আর্য্য-ঋষিরা এর নাম দিয়েছিলেন "জীবন"।

শরীরের মাংসকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় প্রোটীন (protein) বলা হয়। প্রোটীনের বাংলা নাম করা হয়েছে ছানা-জাতীয় পদার্থ। অস্থি আর মেদ ভিন্ন দেহের কঠিন ভাগের প্রায় সবটাই এই শ্রেণীর প্রোটীনের তৈরী। সেইজন্য প্রোটীন খাদ্যের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। মাংস ভিন্ন আরও একটি জিনিষ শরীরে আছে যা সকলেই জানেন। সেটি মেদ অথবা চর্ব্বি। শরীরে এর পরিমাণের কোনও স্থিরতা নেই—তিন মণ দশ সের ওজনের শরীরের মেদ নিশ্চয় ৩৮ সের ওজনের শরীরের মেদের চেয়ে বেশী। মেদ অর্থে আমরা বুঝি জান্তব একটি জিনিষ, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এর নাম হচ্ছে স্নেহজাতীয় পদার্থ। স্নেহজাতীয় পদার্থ বলতে সব রকম তৈলই বুঝায়; কি প্রাণীজ কি ভেষজ। সেই জন্যই ঘি, তেল প্রভৃতি আমাদের আহারের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মোটামুটি ভাবে আমরা মাত্র এই দুইটি জিনিষই শরীরে আছে বলেই জানি। এই দুইটি জিনিষ ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিষ আছে। ক্যালসিয়াম্ অর্থাৎ চুণ হাড়ের একটি প্রধান অংশ। রক্তের হেমোগ্লোবিনই সুন্দরীর গণ্ডে রক্তিমাভা দেয় আর লোহ হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের একটি অংশ। এই দুইটি জিনিষ বাদে আরও অনেকগুলি ধাতব পদার্থ শরীরে আছে। যথা সোডিয়ম্, ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি। এই সব জিনিষ শরীর থেকে সমস্ত ক্ষণ ক্ষয় হয়, আর আহার থেকে ক্রমাগত পূরণ হয়।

শর্করাজাতীয় জিনিষ, যাকে ইংরাজীতে কার্ব্বোহাইড্রেট (carbohydrate) বলে, শরীরের কাজে লাগে ইন্ধন-রূপে। শরীর-গঠন ব্যাপারে এর প্রয়োজন অতি সামান্য। শরীরের আরও একটি ভাল ইন্ধন আছে, সেটি ফ্যাট্ অর্থাৎ মেদ।

কোনও জিনিষ মেরামৎ করতে হলে সেটি যে বস্তু দিয়ে তৈরী (লোহা কাঠ প্রভৃতি) তাই দিয়ে মেরামত

করাই প্রশস্ত। মানুষের শরীরের ক্ষয়পূরণের জন্য যদি মানুষের মাংস ব্যবহার হত, তা হলেই হয়ত সব চেয়ে উপযুক্ত হত। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, কারণ প্রথম বাধা রাজার আইন, আর দ্বিতীয় বাধা শরীর থেকে মাংস দিতে খুব কম লোকেরই সম্মতি পাওয়া যাবে। মধুর অভাবে গুড় দিবার মতন যদি মানুষ না খেয়ে অন্য জন্তু খাওয়া যায়, তা হলেও কতকটা চলতে পারে। কিন্তু তাই বা সব সময় পাওয়া যায় কোথায়? তখন নজর পড়ে নিরীহ গাছপালার উপর। কারণ মানুষ যেমন মুখ্যতঃ প্রোটীন, ফ্যাট্ এবং কার্ব্বোহাইড্রেটের তৈরী, গাছপালাও ঠিক মুখ্যতঃ ঐ তিনটি জিনিষেরই তৈরী। শরীরের মালমশলার দিক্ থেকে যদিও এদের অনেকটা মিল আছে, তথাপি এদের মধ্যে অমিল অনেক। চেহারার দিক্ থেকে যে মিল নেই, সে কথা না বললেও বোঝা মোটেই শক্ত নয়। জীবজন্তু আর গাছপালার খাদ্য-সংগ্রহ ব্যাপারে অমিল খুব বেশী।

মানুষের খাদ্য, অর্থাৎ প্রোটীন ইত্যাদি কোনটাই মূল পদার্থ নয়; প্রত্যেকেই এরা কতকগুলি মূল পদার্থ, অর্থাৎ কার্ব্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতির সংযোগে তৈরী। প্রোটীন ইত্যাদি মানুষ কিংবা অন্য জন্তু তাদের মূল পদার্থ থেকে তৈরী করে নিতে পারে না। তাদের প্রয়োজন হয় রেডিমেড্ অর্থাৎ তৈরী জিনিষের। সেই সব জিনিষ তারা ভেঙেচুরে সামান্য অদল-বদল করে নিতে পারে। হাওয়া থেকে কিংবা মাটী থেকে মূল পদার্থ নিয়ে তাদের নিজেদের দরকার মতন প্রোটীন ইত্যাদি করে নিতে পারে কেবল গাছপালারাই। এই জায়গাতেই মানুষের সঙ্গে গাছের খাদ্যসংগ্রহ ব্যাপারে তফাৎ; আর সেইজন্যেই প্রাণীজগৎকে ষোল আনা নির্ভর করতে হয় উদ্ভিদ্ জগতের উপর।

পাকা বাড়ী তৈরী করতে দরকার হয় ইঁটের। কেউ মাটি দিয়ে ইঁট গড়ে তাকে পুড়িয়ে নেন, আর কেউ বা অন্য ভাঙা বাড়ী থেকে ইঁট নেন। যারা ইঁট তৈরী করিয়ে নেন্, তাঁদের উদ্ভিদ্ পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে, আর যাঁরা অন্য বাড়ীর ইঁট নেন, তাঁদের প্রাণী পর্য্যায়ে ফেলা যায়। সেনেট্ হাউস্ ভেঙে কেউ যদি মৎলব করেন ইলেকট্রিক্ সাপ্লাইএর বাড়ীর মতন বাড়ী করবার, তা হলে তিনি মুস্কিলে পড়বেন, গোল থামের ইঁটগুলি নিয়ে। সেগুলি একদম বরবাদ হয়ে যাবে। এই রকম করে তাঁকে অনেক মাল-মশলা ফেলা-ছড়া করতে হবে। প্রাণী-জগতের অবস্থা অনেকটা সেই রকম। গাছের দেহেও প্রোটীন আছে, আবার মানুষের দেহেও প্রোটীন আছে, কিন্তু দুই প্রোটীন রাসায়নিক হিসাবে অনেকটা এক হলেও ঠিক এক নয়। কারণ প্রোটীন আবার কতকগুলি জিনিষের সমষ্টি—সেই মূলগুলির তফাৎ হলেই প্রোটিনের তফাৎ হয়। মানুষকে করতে হয় গাছের প্রোটিনকে ভেঙে তার মূল জিনিষগুলির ভেতর থেকে তার দরকার মতন জিনিষ বেছে নেওয়া। সেই জন্যই অনেক ফেলা-ছড়া এবং ভাঙ্গাগড়া করতে হয়।

একটা জিনিষ হয়ত অনেকেই জানেন যে, মানুষ সাউথ পোলেই যাক্ আর সাহারায় যাক্, তার শরীরের তাপ একই থাকে। সাহেবদের দেশে সেটা ৯৮-৯৮৷৷০ ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে, আর আমাদের দেশে স্বাভাবিক তাপ ৯৬৷৷০ ডিগ্রি থেকে ৯৭৷৷০ ডিগ্রি থাকে। যদিও এখানে স্বাভাবিক (normal) কথাটা লেখা হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ বৈজ্ঞানিক হিসেবে ধরলে চলবে না। কারণ বৈজ্ঞানিক হিসেবে যদি বলা হয় স্বাভাবিক তাপ ৯৭° ডিগ্রি, তা হলে যার তাপ ৯৭°-২ হয় তার সেটা অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে। শরীরতত্ত্বের সব জায়গাতেই প্রায় স্বাভাবিক অর্থে গড়পড়তা (average) অর্থে ধরা হয়েছে।

শরীরের এই তাপ-সমতা রাখবার জন্যই গ্রীষ্মকালে ঘাম হয় এবং শীতকালে চামড়ার নীচে রক্ত চলাচল কম করে দিয়ে তাপ রক্ষা হয়। খাদ্যই এই তাপ-সমতা রক্ষা করে। কোন জিনিষ দগ্ধ হয় মানে বৈজ্ঞানিক ভাষায় সেই জিনিষের সঙ্গে অক্সিজেন যোগ হয়, যাকে ইংরাজীতে oxidise বলে। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে যে অক্সিজেন নিই, সেটা রক্তের সঙ্গে যায় প্রত্যেক কোষে। সেখানে গিয়ে মেশে খাদ্যের সঙ্গে এবং তখন খাদ্য দগ্ধ হয় আর শরীরে তাপ হয়। মানুষের শরীরের তাপ মাত্র ৯৭-৯৮° ডিগ্রি (প্রায় ৩৭° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্)। এই

সামান্য গরমে যে কি করে খাদ্য অক্সিডাইজ্‌ড হয়, তাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। মানুষের ল্যাবরেটারীতে এটা সম্ভব নয়, কেবল ভগবানের কারখানাতেই সম্ভব। দেখা গিয়েছে, প্রোটীন শরীরে দগ্ধ হলে যতখানি তাপ-স্ফুরণ হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশী তাপ পাওয়া যায় এবং সেই তাপ পাওয়া যায় সঞ্চিত কার্ব্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট দগ্ধ হওয়ার দরুণ। প্রোটীনের এই তাপস্ফুরণ শক্তি বেশী বলেই আমাদের দেশে মাংসের প্রচলন শীতপ্রধান দেশের চেয়ে অনেক কম। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়, বাঙালীর খাদ্যে প্রোটীন খুব কম (unbalanced)। এ কথাটা প্রথম আরম্ভ করেন সাহেবরা এবং তাঁদের কথা শুনে আমাদের দেশের তথা-কথিত খাদ্যবিদ্‌রা সেই ধুয়া প্রচলিত রাখেন। এ কথাটার সত্যাসত্য বিচার করা খুবই শক্ত, একদম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। একটা জাতির খাদ্যের হঠাৎ আমূল পরিবর্ত্তন করে দেওয়া বাতুলতা বললেও চলে।

খাদ্যের তাপস্ফুরণ-ক্ষমতা আছে বলেই সাধারণতঃ লোকে গ্রীষ্মকালে কম খায়।

আমরা খাই কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তা হলে বলতে হয়—তিনটি কারণের জন্য—

(১) শরীরের ক্ষয় পূরণ এবং যাদের পূর্ণ বৃদ্ধি হয় নাই তাদের বৃদ্ধির জন্য;

(২) শরীরের কাজ চালাবার ইন্ধনের জন্য, এবং

(৩) শরীরের তাপ-সমতা রক্ষার জন্য।

অবশ্য বৈজ্ঞানিক যে উত্তরই দিন না কেন—ক্ষুধা পেলে এ প্রশ্নের উত্তরে পিসীমার কথাই মনে পড়ে—"পোড়া পেটের জন্যে।"

অশ্রু

—শ্রীকরুণাময় বসু

আমি তাহাদের কবি,
বুভুক্ষু ভিক্ষুক যারা বিশ্বের অবজ্ঞা লভি
পথে পথে ঘোরে লক্ষ্যহারা।
মানুষ জানে না যে তাহাদের একই ক্ষুধা, একই সূর্য্যতারা,
একই রক্ত, হৃদয়ের একই ভালবাসা;
তবু তারা অবজ্ঞাত, কণ্ঠে রহে চির মৌন ভাষা।
জন্মিয়া মরিয়া থাকে আলোহীন অন্নহীন ঘরে,
রুদ্ধ বাতায়ন তলে চৈত্র বায়ু কভু না মর্ম্মরে,
বনে কভু ফোটে না ক' ফুল।
ঊর্দ্ধে চেয়ে দিন গোণে কবে হবে সমাপ্তি অকূল
মধ্যাহ্ন রৌদ্রের তাপে গলাইয়া জীবনের সুরা
ধরণীরে করিয়াছে অনন্ত মধুরা,
সে মধু আনন্দ দিয়ে স্ফীত করি অনাত্মীয় ঝুলি,
অত্যাচার, অপমান নিজে লয় তুলি',
ঘরে আনে অন্ধকার, অবিচ্ছিন্ন অনন্ত বিষাদ।
তাহাদের আমি প্রতিনিধি, আজি তাই করি আর্ত্তনাদ।
জন্ম হ'তে সে যে ঘৃণা, সে যে ছোট, এই তার মনে
লয় গাঁথি'।
আলোক কাঁদিয়া গেল তার কুঁড়ে ঘরে, পোহাল না
যুগান্তের রাতি।
জীবনের গতি তার লক্ষ্য করে, এতটুকু সময় কোথায়?
প্রাণ যে আবদ্ধ রহে প্রাণহীন যন্ত্রের চাকায়।
পেটে তার অন্ন নাই, তবু কিছু নাই প্রতিবাদ,
এতটুকু ক্ষুব্ধ কলরব।
পাশে চলে প্রাসাদে প্রাসাদে প্রমোদের উচ্ছল উৎসব॥

নিজের বুকের রক্তে ভিজায়েছে এ মাটির ধরা;
তাইতো কুসুম ফোটে বনে বনে, শ্যামল হয়েছে বসুন্ধরা।
ক্ষেতে তাই সোণার ফসল।
তার প্রতিদান? তৃষ্ণা পেলে পান করে আপনার
তপ্ত অশ্রুজল।
সহস্র বৎসর ধরি' সহিয়াছে শব্দহীন এই অপমান।
পীড়িত আত্মার তলে জাগিয়াছে আজ তাই রুদ্র ভগবান।
নিঃশব্দে ইঙ্গিতে কহে, 'লহ এই আমার প্রসাদ।'
প্রভাত আনিয়া দেয় দিগন্তের রক্তরাঙা দীপ্ত আশীর্ব্বাদ।
যুগান্তের তন্দ্রা টুটি যৌবন মেলেছে আজ সুদূরের পাখা।
সত্যহীন মূঢ়! সংস্কার আলোক কেমনে দিবে ঢাকা?
আজি তাই জীবনের নব অভ্যুদয়—
আমি কবি গাহি আজ স্বাধীন আত্মার শেষ জয়।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[৯]

সেবার বিজয়া-দশমীর বিসর্জ্জনের সময়ে এক কাণ্ড ঘটিল; লোকে বুঝিল, বিষ সারা শরীর ব্যাপ্ত করিয়াছে, ইহার প্রতিকার শীঘ্র ও সহজে হইবার নয়।

বহুকাল হইতে একটি প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, জোড়াদীঘির আশেপাশে চারিদিকের বহু গ্রামের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের জন্য জোড়াদীঘির ঘাটে নৌকা-যোগে আসিত। জোড়াদীঘির চৌধুরী বাড়ীদের প্রতিমা তো থাকিতই—তা ছাড়া ছোট বড়, মাঝারি নানা আকারের প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি প্রতিমা জুটিত,— তার মধ্যে রক্তদহের প্রতিমাও একখানি।

উপযুক্ত লগ্ন উপস্থিত হইলে সকলের আগে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইত, তারপরে অন্য সকলের। জোড়াদীঘির প্রভাব, প্রতিপত্তি ও বংশের প্রাচীনতাই বোধ করি ইহার কারণ। এই রকম বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কতদিন কেহ বলিতে পারে না, এমন কি অশীতিপর বৃদ্ধেরাও নয়।

সেবারও যথা নিয়মে দুর দুরান্তের প্রতিমা জোড়াদীঘির ঘাটে আসিয়া ভিড়িতে লাগিল; জোড়াদীঘির অত্যুচ্চ প্রতিমা বাইশ জন জোয়ান জেলের স্কন্ধে বাহিত হইয়া জোড়া-দেওয়া নৌকার উপর আসিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত নদী নানা বর্ণের নানা আকারের প্রতিমায় ভরিয়া গেল—নদীর জল বিচিত্র ছায়াপাতে খচিত হইয়া উঠিল।

এই উপলক্ষ্যে জোড়াদীঘির নদীর দুই তীরে প্রকাণ্ড মেলা বসিত; ছেলেবুড়া, যুবক-যুবতী, হিন্দু-মুসলমানে প্রায় পনেরো বিশ হাজার লোক জমিয়া যাইত। সেবারও তেমনই মেলা বসিয়াছে; নদীর পারে রাশি রাশি আখ, পাতার বাঁশী, মাটির রং-করা পুতুল আর মিঠাইয়ের দোকান। সকলেরই পরণে নূতন কোরা কাপড়, অনেকের গায়ে চাদর, কিন্তু অধিকাংশই খালি গায়ে; বিবাহিত মেয়েদের সিঁথিতে চওড়া করিয়া সিঁদুরের দাগ—মুখে হাসি ও কৌতূহল।

নদীতে প্রতিমার নৌকা ছাড়াও অসংখ্য নৌকা; অনেকগুলি বড় বড়, তাহাতে রং-করা হাড়ি, পাতিল, কলসী; আখের নৌকাও আছে; বড় বড় পান্সীতে ছইয়ের উপরে গ্রামান্তর হইতে আগত দর্শকের দল; ইহাদের একটু অবস্থা ভাল; সতরঞ্চি পাতিয়া বসিয়া গান-বাজনা করিতেছে; হোঃ হোঃ করিয়া হাসিতেছে; মাঝে মাঝে সিদ্ধি ও সুরা পান করিতেছে। বহু ছিপ-নৌকা বাচ খেলিবার জন্য আসিয়াছে; আঠার, কুড়ি, ত্রিশ জন করিয়া যুবক এক সঙ্গে একতালে বৈঠা মারিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাইয়া দিবার জন্য প্রাণপাত করিতেছে; মাঝে মাঝে বড় নৌকায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া নৌকা ডুবিতেছে—সকলে সাঁতরাইয়া তীরে উঠিতেছে, তাহাতেও আনন্দ কম নয়।

একখানি প্রকাণ্ড বজরায় জোড়াদীঘির বাবুরা উপবিষ্ট, দর্পনারায়ণ এবং তাহার শরীক ভাই রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ; দুইজন বরকন্দাজ খোলা তলোয়াল ও ঢাল লইয়া পাহারা দিবার ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান আর আলিবর্দ্দী সর্দ্দার প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়া বন্দুক হাতে করিয়া বাবুদের নিকট উপস্থিত। অন্যান্য বার স্বয়ং উদয়নারায়ণও আসিতেন—কিন্তু এবার তিনি আসেন নাই, ক্রমেই তিনি অশক্ত হইয়া পড়িতেছেন; এবার তিনি চৌধুরী বাড়ীর চার তলায় চিলেকোঠার কাছে দাঁড়াইয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিবেন বলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বনমালাও আছে। সত্য কথা বলিতে কি, চারতলা হইতে নদী দেখা যায় না, তবে কোলাহল শোনা যায়, গাছপালার মালাগুলি দেখা যায়।

নদীতে আর একখানি বজরায়, সেখানিও বড়, রক্তদহের জমিদার পরন্তপ রায়—এবারে রক্তদহের জাঁকজমক একটু বেশী; বহুদিন রক্তদহের জমিদার আসিতে পারেন নাই, জমিদার কেহ ছিল না, একমাত্র মালিক ছিল ইন্দ্রাণী, স্ত্রীলোক তো প্রতিমার সঙ্গে আসিতে পারে না, কাজেই

তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ দেওয়ানজী আসিতেন ; দেওয়ানজী আসিয়া জোড়াদীঘির বাবুদের বজরায় উঠিয়া দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন—উদয়নারায়ণকে বিজয়ার প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী ফিরিতেন। এবার সব অন্য রকম ; রক্তদহের বজরা জোড়াদীঘির বজরার কাছে ভিড়িল না, কোন তীর হইতে কোনরূপ সম্ভাষণ হইল না ; প্রত্যেকে নিজের নিজের বজরায় বসিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা আসন্ন হইয়া আসিল—বিসর্জ্জনের জন্য প্রতিমাগুলি ঘাটের কাছে আসিয়া জমিতে লাগিল ; প্রতিমার অঙ্গ হইতে তাঁতের ধুতি ও শাড়ী খোলা আরম্ভ হইল ; ফুল, বেলাপাতা ও ঘট সংগৃহীত হইয়া নৌকার একপাশে স্তূপীকৃত হইল ; ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজে নিকটবর্ত্তী গাছের ডাল হইতে কাকের দল চীৎকার করিয়া বারে বারে উড়িতে আরম্ভ করিল—মেলার সেই পনের বিশ হাজার লোক বিসর্জ্জনের চরম মুহূর্ত্তের জন্য উদগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। জোড়াদীঘির পুরোহিত ভট্টাচার্য্য প্রতিমার নৌকায় ছিলেন, সঙ্গে বাণীবিজয়ও ছিল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাণী, সময় তো আসন্ন। বাণী বড় ব্যস্ত ছিল, সে বলিল—আজ্ঞে প্রতিমার বস্ত্রাদি সংগ্রহ করেছি—এখন আদেশ দিতে পারেন, কিন্তু একটি বিষয়ে বড়ই গোল বেধেছে। ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্যাপার কি ?

বাণীবিজয় বলিল—আজ্ঞে, এই নাস্তিককে (এই বলিয়া সে প্রতিমা-বাহক জেলের সর্দ্দারকে দেখাইয়া দিল) কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, কলা-বউয়ের শাড়ী পুরোহিতের প্রাপ্য—

তাহাকে অর্দ্ধপথে থামাইয়া দিয়া জেলের সর্দ্দার বলিল—ঠাকুর আজ বছরকার দিনে মিথ্যা কথা বল না। ভট্‌চায মশায়, শাড়ী আপনার পাওনা হলে আমি নেব কেন ? ঠাকুর মশাই বলছিল শাড়ীখানা তার পাওনা, শাস্তরে না কি লিখেছে !

বাণীবিজয় দমিবার পাত্র নয়, সে হাঃ হাঃ শব্দে হাসিয়া উঠিয়া (তাহার পেটে আজ প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি পড়িয়াছে) বলিল, রামকান্ত শাস্ত্র পড়নি বলেই এমন কথা বলছ ! শাস্ত্র পড়লে জানতে যে বিষ্ণু সেই কৃষ্ণ ; যে রাম সেই রাবণ, বাবা রামকান্ত, গুরু-শিষ্য কোন ভেদ নাই !

ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, শাড়ীখানা বুঝি কূটতর্কের ফাঁক দিয়া বাণীবিজয়ের হাতে গিয়া পড়ে, তিনি বলিলেন—বাণীবিজয়, তুমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছ, তোমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত !

ইহা শুনিয়া বাণীবিজয় ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল বলিল, শাস্ত্র-পিতা, গুরো, তোমার মুখে এমন দুরূহ বাণী ! এ প্রাণ আর রাখব না। রাঙা মায়ের সঙ্গে এ পোড়া দেহ নদীর জলে যাক্। এই বলিয়া সে ছোঁ মারিয়া রামকান্তর হাত হইতে শাড়ীখানা লইয়া নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভট্টাচার্য্য হায় হায় করিয়া উঠিলেন। রামকান্ত তাঁহাকে শান্ত হইতে বলিয়া বলিল—ঠাকুরের পেটে আজ মহাদেবের প্রসাদ কিছু বেশী পড়েছে, জল থেকে উঠলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভট্টাচার্য্য যেন আপন মনেই বলিলেন—তা তো যাবে, কিন্তু শাড়ীখানা গেল।

জোড়াদীঘির নৌকাতে যখন এই সব ঘটনা ঘটিতেছে, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্তদহের দল এক কাণ্ড করিয়া বসিল। রক্তদহের জমিদারের ইঙ্গিতে জোড়াদীঘির প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে, রক্তদহের প্রতিমা জলে নিক্ষিপ্ত হইল।

[১০]

এই ব্যাপার দেখিয়া সুবৃহৎ জনতার কোলাহল মুহূর্ত্তের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া গেল ; তাহারা যেন ইহা দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না—নিজেদের চক্ষুকেই যেন তাহাদের অবিশ্বাস হইল। সামাজিক এই রীতি-বিপর্য্যয় তাহাদের কাছে চন্দ্র-সূর্য্যের পথচ্যুতির মত অসম্ভব, অবিশ্বাস্য কাণ্ড !

শুধু এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পরেই যেন নরকের সহস্র দ্বার খুলিয়া গেল ! কে কোথা হইতে ইঙ্গিত করিল ইহা জানা গেল না, কেহ বলে জোড়াদীঘির বাবুদের নৌকা হইতেই বন্দুকের গুলিতে হুকুম হইল, কেহ বলে রক্তদহের বজরা হইতে আদেশ আসিল, কেহ বলে তাহাদের পিছন

হইতে কে যেন উচ্চকণ্ঠে হুকুম করিল, কিন্তু সকলেই বলে তাহারা পিছন হইতে বিষম চাপ অনুভব করিল; সেই বেগে তাহারা আগুয়ান হইয়া আসিল। তখন এক বিষম ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি, মারামারি বাধিয়া গেল। জনতা যেন এক কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—মার, মার, রক্তদহের শালাদের মার! দেখিতে দেখিতে স্তূপীকৃত আখের রাশি লোকের হাতে লাঠি হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল; সেই লাঠি আন্দাজের উপরে ভর করিয়া সকলে রক্তদহের লোকদের মাথা লক্ষ্য করিয়া চালাইতে লাগিল—অল্প সময়ের মধ্যেই আখের টুকরায় মাঠ ঘাট নদীর জল ভরিয়া গেল; আখের রাশির চিহ্নমাত্র রহিল না।

জোড়াদীঘির লোকদের রাগিবার কারণ একটি মাত্র নয়, সে দিন নারিকেল কাড়াকাড়ি করিতে ভিন্ গায়ে গিয়া তাহারা মার খাইয়া আসিয়াছিল, সে কথা ভুলিতে পারে নাই; আজ নিজেদের গাঁয়ে এমন সুযোগ ছাড়িয়া দিবার পাত্র তাহারা নহে। ইক্ষুদণ্ডের আয়ু ফুরাইতে না ফুরাইতে রাশি রাশি বংশদণ্ড আসিয়া পড়িল, সেই বংশদণ্ডের সঙ্গে জোড়াদীঘির জমিদারদের লাঠিয়ালরাও আসিল। এই লাঠিয়ালের দল সকলে জোড়াদীঘিতে থাকে না—জমিদারির মধ্যে নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকে; প্রয়োজন হইলে সদরে আসিয়া জুটে; এখন পূজার সময়ে তাহারা আমোদ করিতে সদরে আসিয়াছিল, অপ্রত্যাশিত ভাবে কাজ জুটিয়া গেল। কিন্তু শুধু জোড়াদীঘির লোক বা লাঠিয়াল নয়, আশপাশের যে-সব গ্রাম হইতে বহু হাজার লোক আসিয়াছিল তাহারাও জোড়াদীঘির সঙ্গে যোগ দিল; নানাভাবে তাহারা জোড়াদীঘির বাবুদের কাছে ঋণী; যাহারা সে ঋণ অনুভব করে না, তাহারাও যোগ দিল। মারিবার সুযোগ পাইলে কে ছাড়ে, বিশেষ প্রতিপক্ষ যদি দুর্ব্বল হয়!

নদীর ভাটি অংশে রক্তদহের লোকেরা দাঁড়াইয়াছিল; তাহারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া পালাইতে লাগিল; যাহারা পালাইতে পারিল না, জলে ঝাঁপ দিল; নিস্তার সেখানেও নাই; এইমাত্র যাহারা ছিপ লইয়া বাচ খেলিতেছিল, তাহারা দেখিতে দেখিতে নৌ-সেনা হইয়া উঠিয়া বৈঠা দিয়া, লগি দিয়া সাঁতারু ব্যক্তিদের মাথায় আঘাত করিতে লাগিল, কেহ ডুব-সাঁতার দিয়া পালাইল, কেহ কেহ সত্যই ডুবিল।

দর্পনারায়ণ বজরার উপরে ছিল; সে এই ব্যাপার দেখিয়া আলিবর্দ্দীকে হুকুম করিল— গুলি কর! আলিবর্দ্দী বুঝিল কোন্ দিকে। সে বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিল, ঠিক সেই সময়ে নৌকা টাল খাইল, তাহার হাত কাঁপিয়া গেল। দূরে বজরার ছাদে বসিয়া পরন্তপ বন্ধুবান্ধব লইয়া সিদ্ধি পান করিতেছিল, একটি গুলি আসিয়া সিদ্ধির ভাঁড় ভাঙিয়া দিল; পরন্তপ বুঝিল দ্বিতীয় গুলির অপেক্ষা করিলে মাথা ভাঙিবে; সে ভিতরে গিয়া হুকুম দিল নৌকা স্রোতে ছাড়িয়া দাও—যে যেখানে আছ দাঁড়ে বসিয়া শীঘ্র পালাও! পরন্তপের বজরা স্রোতের মুখে ছুটিল, কিন্তু বেশী দূর যাইবার পূর্ব্বেই আট দশখানা ছিপ আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। প্রথম দু'একখানা ছিপের উপর দিয়া বজরা চলিয়া গেল, কিন্তু ছিপের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। পরন্তপ ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। সৌভাগ্যক্রমে আততায়ীদের হাতে বন্দুক ছিল না, তাহারা লাঠি ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল; বেঙা চৌকিদার প্রভুর পাশে লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া আঘাত বাঁচাইয়া যাইতে লাগিল। বেঙা যে এমন সুদক্ষ লাঠিয়াল পরন্তপ তাহা জানিত না।

ছিপের লোকেরা ক্রমে বজরা বাহিয়া উঠিবার উপক্রম করিল; পরন্তপ পালাইবার সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করিল, এমন সময়ে কিছু দূরে একখানি নৌকা দেখিতে পাইল, তাহার মনে হইল সেখানা রক্তদহের লোকদের। তখন পরন্তপ বেঙাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ছিপ অতিক্রম করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল—বেঙাও সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িল। ছিপের লোকেরা বজরা পাইয়াই সন্তুষ্ট হইল—তাহাকে আর অনুসরণ করিল না। পরন্তপ ও বেঙা সেই নৌকায় চাপিয়া প্রবল স্রোতের টানে জোড়াদীঘির ঘাট হইতে বহু দূরে গিয়া পড়িল। এ দিকে ছিপের লোকেরা বজরায় উঠিয়া বজরার জিনিষপত্র ভাঙ্গিল, তার পরে বজরা ভাঙ্গিল এবং অবশেষে তাহা ডুবাইয়া দিয়া অত্যুল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে দেখা গেল, বহু লোক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে, তাহাদের সকলেই রক্তদহের নয়;

কয়েকজন নিহত হইয়াছে, তাহাদের দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য প্রতিমা বিসর্জ্জন অনুষ্ঠান করিয়া আর হইল না; মারামারির সময়ে স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিমাগুলির অধোগমন ঘটিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নদীর তীর খালি হইয়া গেল, তখন দেখা গেল সেই শূন্য মাঠ আখের টুকরা, ভাঙা হাড়ি কুড়ি, মাটির পুতুল, আর ছিন্ন ধুতি চাদরে কীর্ণ।

নদীর ঘাটে দর্পনারায়ণ, দেওয়ানজী এবং তাহার শরীক তরফের দুই ভাই বিশ্বনাথ ও রঘুনাথ দাঁড়াইয়া ছিল।

দেওয়ানজী বলিল—খোকাবাবু, কর্ত্তা যেন এ কথা জানতে না পারেন, তা হলে আর রক্ষা থাকবে না।

দর্পনারায়ণ বলিল—না, তাঁর কানে উঠিয়ে লাভ নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই চাপা দিলে চলবে না। এর একটা প্রতিকার চাই

রঘুনাথ বলিল—প্রতিকার তো আমাদের হাতেই—

দর্পনারায়ণ বলিল—দেখ, তোমাদের কথাই আমার মনে হচ্ছিল। কাল সকালে একবার তোমরা দুজন আমার বৈঠকখানায় এস; আমরা ছাড়া দেওয়ানজী ও আলিবর্দ্দী থাকবে; কি করা যায় ভাবা যাবে।

রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ উভয়েই ইহাতে সম্মতি জানাইল। তখন সকলে বিজয়ার সম্ভাষণাদি প্রথামত নিজেদের মধ্যে সারিয়া অন্যত্র সম্পন্ন করিবার জন্য চৌধুরী বাড়ীর দিকে চলিল

[১১]

রঘুনাথের গলা সকলের উপরে উঠিয়াছে, সে তার-স্বরে বলিতেছে—মেজ দা, তুমি বুঝতে পারছ না, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের গালে চুণ-কালি পড়ল!

মেজ দা বুঝিতে পারিয়াছে; রঘুনাথ নিজেকে বুঝাইবার জন্যই বলিতেছে, মেজ দাকে নয়; নিজেকে নিজে সম্মোহিত করিয়া তোলা তাহার পক্ষে আবশ্যক।

বিশ্বনাথ অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাবে বলিল—রঘু, আমার বুঝতে কিছুই বাকি নেই। এখন প্রতিকারটা কি?

রঘুনাথ বাহুবল বোঝে, কিন্তু প্রতিকার বোঝে না। তাহার ধারণা অপমানিত হইলে যাহারা প্রতিকার চিন্তা করে তাহারা ভীরু; নিজে সে চিন্তা করে নাই কাজেই ব্যাহত হইয়া প্রশ্নটাকেই বীর রসের সঙ্গে আবৃত্তি করিল—প্রতিকার কি?

এতক্ষণ দর্পনারায়ণ কোন কথা বলে নাই; সে বলিল—সেই কথাই তো চিন্তা করবার সময় এসেছে। অপমানের প্রতিকার যদি কেবল মন্ত্রণা হত, তা হলে এই তিন দিনে তা ক্ষালন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তো তা নয়!

আসল কথা, আজ তিনদিন ধরিয়া তাহারা ক্রমাগত শলা-পরামর্শ করিয়াও এই অপমানের কোন কিনারা করিতে পারে নাই। নানা মুনির নানা মত, তার মধ্যে কোন্‌টা যে গ্রাহ্য, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই।

বৈঠকখানার ফরাসের উপর দর্পনারায়ণ, বিশ্বনাথ, রঘুনাথ ও রামজয় লাহিড়ী; তক্তপোষের নীচে মেঝেতে আলিবর্দ্দী সর্দ্দার। এই পাঁচজনকে লইয়া মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন গত তিন ধরিয়া চলিতেছে। তবে তাহারা একটি ব্যাপারে সফলতা লাভ করিয়াছে, সেদিনকার ঘটনার কোন সংবাদ উদয়নারায়ণের কানে পৌঁছায় নাই।

কয়েকমাস আগে হইলে ইহা সম্ভব হইত না। দর্পনারায়ণকে জমিদারির ভার দিবার পর হইতে উদয়নারায়ণ বিষয়কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; আর বড় একটা বৈঠকখানাতেও আসেন না; তেতালার নিজের ঘরটিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া জীবনের শেষ কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিবার তাঁহার ইচ্ছা। বিশেষ, দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তি তাঁহার ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; নেহাৎ পরিচিত লোককেও প্রথমে চিনিতে পারেন না; দর্প-নারায়ণের কণ্ঠস্বরও সব সময়ে তাঁহার পক্ষে শোনা অসম্ভব। তিনি এই অপমান জানিতে পারিলে এতদিনে যাহা হয় একটা কাণ্ড করিয়া বসিতেন; রঘুনাথের কথাই সত্য হইত, প্রতিকার চিন্তা করিয়া তিনি মন্ত্রণা-সভা বসাই-তেন না। রঘুনাথ নিজেও ইহা জানিত, তাই সে বলিল,—আজ বড়কর্ত্তা অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন বলেই তোমরা এত

মন্ত্রণা করবার সময় পাচ্ছ। কিন্তু মনে রেখ লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে হাতুড়ি মেরে লাভ নেই।

দর্পনারায়ণ বলিল—রঘুনাথ, তুমি কেন মনে কচ্ছ লোহা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। এ তাপ সহজে যাবার নয়, জোড়াদীঘি বা রক্তদহের এক বংশ থাকতে নয়।

সত্য কথা বলিতে কি, দর্পনারায়ণ ও পরন্তপের গুপ্ত রহস্য এরা কেউ জানে না, তাই ব্যাপারটাকে একটা সাময়িক উৎপাত বলিয়া মনে করিতেছিল।

রঘুনাথ বলিল—আবার ঠাণ্ডা হতে কি লাগে! তিন দিন তিন রাত পেরিয়ে গেল। আশে-পাশের গাঁয়ের লোক সব যে মুখ চেপে হাসছে! বলছে, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের আর সেদিন নেই! বলছে, থাকত কর্ত্তার বয়স, আর থাকত স্বরূপ সর্দ্দার! তারপরে খানিকটা দম ধরিয়া থাকিয়া সে বলিল—তোমাদের তো শুনতে হয় না, আমার যে লজ্জায় মাথা কাটা গেল।

দেওয়ান রামজয় লাহিড়ী এতক্ষণ নির্ব্বাক শ্রোতা মাত্র ছিল, এবার বলিল—ছোটবাবু, আসল কথাটা তোমরা ভুলে গিয়েছ; দুটো প্রস্তাব প্রথমে হয়েছিল—এখন ঠিক কর, তার মধ্যে কোন্‌টা করা উচিত!

এই বলিয়া সে প্রস্তাব দুইটির বর্ণনা সুরু করিল—আমাদের প্রথম প্রস্তাব ছিল যে, রক্তদহের লক্ষীপুরের হাট লুট করতে হবে; আর দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল—হাট-ঘাট নয়, একেবারে খাস রক্তদহের জমিদার-বাড়ী চড়াও করে শিক্ষা দিয়ে আসতে হবে। এখন ঠিক কর এর মধ্যে কোন্‌টা করা উচিত। আমরা কেউ বলিনি যে অপমানের শোধ দেওয়া হবে না!

—এর মধ্যে আবার ঠিক করবার কি আছে? তারা আমাদের গাঁয়ে এসে, আমাদের ঘাটে এসে, আগে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে চৌধুরীদের মুখ নীচু করে দিয়ে গেল—আর আমরা যাব তাদের হাট লুট করতে! ডাকাত না কি আমরা!—রঘুনাথ বলিতে বলিতে বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না—বারংবার আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিতেছিল।

দর্পনারায়ণ বলিল—আমার মনে হয় প্রথমে হাট লুট দিয়েই আরম্ভ করা উচিত—তারপরে—

—তারপরে ডাকাত নাম নিয়ে চুপ করে ঘরে বসে থেক।

দর্পনারায়ণ রঘুনাথের উষ্মাতে হাসিয়া ফেলিল, বলিল,—চুপ করে বসে থাকার কথা তো বলিনি। বলছিলাম, তারপরে বাড়ী লুট করলেই হবে।

কিন্তু দেখ,—রঘুনাথ বলিল—পরামর্শ করতে করতে ওরা আরও অনেক সর্ব্বনাশ করবে। পরন্তপ রায় সহজ লোক নয়।

রঘুনাথের কথা অসম্ভবরূপে ফলিয়া গেল।

তাহাদের মন্ত্রণা চলিতেছে, এমন সময়ে চর-রুইমারির প্রধান বৃদ্ধ বদন মণ্ডল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া হাজির হইল!

হঠাৎ আবার এ কি!

দর্পনারায়ণ প্রথমে কথা বলিল—কি মণ্ডল, ব্যাপার কি?

বদনের কান্না থামেই না। অনেক বার জিজ্ঞাসার পরে সে বলিল—দাদাবাবু, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

একসঙ্গে পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিল—কি সর্ব্বনাশ? কি ব্যাপার? কোথায় হল? কে করল?

বদন আবার কাঁদিতে লাগিল।

রঘুনাথের উত্তরই তাহার উত্তর হইল। রঘুনাথ বলিল,—রক্তদহের জমিদার! কি করেছে বল?

বদন ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। তারপরে তাহার নিকট হইতে যাহা নির্গত হইল, তাহার মধ্য হইতে অশ্রু বাদ দিলে ঘটনা এইরূপ দাঁড়ায়।

বদন মণ্ডল ও চার পাঁচজন লোক মিলিয়া চর-রুইমারির খাজনার টাকা সদরে আনিতেছিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা তাহাদের সঙ্গে ছিল। রক্তদহের গ্রামের ঘাটে নদী পার হইয়া বিশ্রাম করিতেছিল, এমন সময়ে গ্রামের লোক প্রায় বিশ পঁচিশজন জুটিয়া গেল। প্রথমে তাহারা ভদ্র ভাবেই টাকাটা চাহিয়াছিল; শেষে মারামারির উদ্যোগ করিল। ইহারাও ছাড়িবার পাত্র নয়; পাঁচজনে লাঠির জোরে পঁচিশজনকে হঠাইয়া দিল! কিন্তু এমন সময়ে স্বয়ং রক্তদহের জমিদার আরও প্রায় পঞ্চাশজন লোক লইয়া উপস্থিত হইয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা কাড়িয়া লইল। তাহারা অক্ষত থাকিতে

সের নাই। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বদন গায়ের চাদর খুলিয়া দেখাইল, লাঠির আঘাতের কাল-শিরা দাগ!

দর্পনারায়ণ বলিল—তোমার সঙ্গের আর সকলে কোথায়?

বদন বলিল - দেউড়িতে; সকলেরই মাথায় চোট লেগেছে!

দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—আলিবর্দ্দী, আজ কি বার রে?

আলিবর্দ্দী এতক্ষণ পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া ছিল; সে প্রভুর মনের ভাব বুঝিয়া বলিল,—শুক্রবার দাদাবাবু! আজই লক্ষ্মীপুরের হাট!

রঘুনাথ এতক্ষণে নিজের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল,—আজ শুক্রবারের গো-হাটা!

দর্পনারায়ণ বলিল,—আলিবর্দ্দী তোর দল ঠিক আছে?

আলিবর্দ্দী বলিল,—সংবাদ দিয়ে তাদের আজ তিন দিন হল আনিয়ে রেখেছি।

—কত লোক আছে?

—দেড় শ হবে; গাঁ থেকেও শ খানেক জুটবে।

—লাঠি কত? শড়কি-ই বা কত?

আলিবর্দ্দী একটু ভাবিয়া বলিল,—তা আধাআধি হবে।

—পারবি?

—হুকুম করে' দেখ।

—যা তবে! কাজ সেরে আজ রাত্রেই ফেরা চাই।

আলিবর্দ্দী সেলাম করিয়া বাহির হইতে যাইবে, এমন সময়ে রঘুনাথ বলিল—আলিবর্দ্দী, লক্ষ্মীপুরের হাটের ইজারাদার মদন বৈরাগীর মাথা চাই। লোকটা প্রতিমা বিসর্জ্জনের প্রধান উদ্যোগী ছিল। রক্তদহের প্রতিমার নৌকায় লোকটাকে আমি লক্ষ্য করেছি। তার সে হাসি এখনও আমি ভুলতে পারছি না। সেই দাঁত দুপাটি আনতে হবে।

আলিবর্দ্দী একটু ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—শুধু দাঁত না মাথাও?

রঘুনাথ বলিল—দাঁতের সঙ্গে মাথা!

আলিবর্দ্দী আভূমি নত সেলাম করিয়া বাহির হইয়া গেল

[-২

বিজয়া-দশমীর পরে প্রায় দুই মাস চলিয়া গিয়াছে; বিসর্জ্জন ব্যাপার লইয়া জোড়াদীঘি ও রক্তদহের মধ্যে যে বিবাদের সূত্রপাত দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে; থামিবার কোন লক্ষণ নাই; বরঞ্চ ব্যাধির বিষ সমগ্র শরীরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জোড়াদীঘির লাঠিয়ালেরা রক্তদহের লক্ষ্মীপুরের হাট লুঠ করিবার পরে বিবাদটা আর কেবল জমিদারদের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই—প্রজারা নিজ নিজ জমিদারদের পক্ষ লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে। প্রতিদিন নূতন নূতন লুঠ-তরাজ দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর দুই জমিদার বাড়ীতে পৌছিতে লাগিল, এবং জমিদারগণও সাহস ও অর্থ দিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শেষে এমন অবস্থা হইল যে, রক্তদহ ও জোড়াদীঘির প্রজাদের ধন প্রাণ অপর পক্ষের আক্রমণে বিপন্ন হইয়া পড়িল; রক্তদহের এলাকায় কোন ক্রমে জোড়াদীঘির প্রজা আসিয়া পড়িলে সে মার না খাইয়া ফিরিত না, অনেক সময় প্রাণহানি পর্য্যন্ত ঘটিত, আবার রক্তদহের প্রজাদেরও জোড়াদীঘির এলাকায় আসিলেই সেই বিপদ।

এই ব্যাধির মূল কোথায়, তাহা কেবল পরন্তপ ও দর্পনারায়ণ জানিত, কাজেই তাহারা ইহাতে বিস্মিত হইল না, বরঞ্চ তাহারা যেন প্রতিদিন ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অন্য সকলে ভাবিল, ইহা জোড়াদীঘি ও রক্তদহের বংশানুক্রমিক স্বাভাবিক বিবাদ মাত্র। কিন্তু এই একান্ত ভাবে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সম্পূর্ণ ভাবে দলগত হইয়া উঠিল; ইহাই মানুষের ধারা।

জমিদারদের বিবাদের অংশ লইয়া প্রজারা যখন মারামারি আরম্ভ করিল, তার ফল এই দাঁড়াইল যে, দুই গ্রামের মধ্যবর্ত্তী গ্রামসমূহে চাষ আবাদ একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। সে বছর রবিশস্য যথাসময়ে বোনা হইল না, যাহা বা হইল, তাহাও কাটিবার লোকের অভাবে মাঠে শুকাইয়া গেল। জোড়াদীঘি হইতে যে পাকা সড়ক রক্তদহের দিকে

গিয়াছে, তাহাতে পথিকের চলা বন্ধ হইল; পাকা পথে আগাছা জন্মিয়া গেল। এক একদিন জোড়াদীঘির জমিদার বাড়ীর লোকেরা অনেক রাত্রে ছাদের উপর হইতে দেখিতে পাইত, দূরে— কতদূরে ঠিক বুঝিবার উপায় নাই, অগ্নি-শিখা! গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে! কোন্ গ্রাম বোঝা যাইত না, তবে কে এই কাণ্ড করিয়াছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিত না।

এই বিবাদের ফলে জোড়াদীঘির চৌধুরীদেরই ক্ষতি বেশী হইতে লাগিল। ইহার বিশেষ কারণও ছিল। চৌধুরীদের বড় সম্পত্তি চলন বিলের মধ্যে। এখন, এই চলন বিলে যাইতে হইলে, কি জলপথে, কি স্থলপথে, রক্তদহ হইয়া যাইতে হয়। কাজেই জোড়াদীঘির জমিদার বাড়ীর সঙ্গে চলন বিলের সম্পত্তির যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হইল। প্রজারা জমিদার বাড়ীতে আসিতে সাহস করিত না; খাজনার টাকা ঠিক সময়ে পৌছিত না; প্রায়ই মাঝ পথে প্রতিপক্ষ লুটিয়া লইত। শেষে রক্তদহের লোক চলন বিলে গিয়া জোড়াদীঘির সম্পত্তি হইতে জোর করিয়া খাজনা আদায় করিতে আরম্ভ করিল।

এই সংবাদ জোড়াদীঘিতে পৌছিলে দর্পনারায়ণের পক্ষে আর শান্ত হইয়া থাকা অসম্ভব হইল।

সে একদিন আলিবর্দ্দীকে ডাকিয়া বলিল,—আলিবর্দ্দী আর তো চুপ করে' থাকা যায় না।

আলিবর্দ্দী বলিল,—কেন যে চুপ করে' আছ দাদাবাবু তা তো বুঝি না! তুমি হুকুম কর নি বলেই আমরা বসে আছি।

দর্পনারায়ণ বলিল,—আমি দেখছিলাম ওরা কতদূর যায়।

আলিবর্দ্দী হাসিয়া বলিল,—শয়তানকে ছেড়ে দিলে সে বেহস্তে পর্য্যন্ত যাবে; এ আর কে না জানে!

দর্পনারায়ণ বলিল,—তুই এক কাজ কর! গাঁয়ে গাঁয়ে আজই খবর পাঠিয়ে দে, যেখানে যত লাঠিয়াল আছে, শড়কিবাজ আছে, এখানে এসে জুটুক। সঙ্গে যেন লাঠি, শড়কি আনে; যারা না আনবে তাদের আমরা দেব।

আলিবর্দ্দীর মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দর্পনারায়ণ বলিয়াই চলিল—ওদের বাড়ী লুঠ করে শিক্ষা দিয়ে আসতে হবে, নইলে থামবে না! তারপরে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল—কি রে পারবি তো!

আলিবর্দ্দী কোন কথা বলিল না, কেবল উৎসাহে বুকের উপরে চাপড় মারিল।

—তবে যা, কাছারী থেকে লিখন লিখিয়ে নিয়ে সব গাঁয়ে গাঁয়ে পাঠিয়ে দে—অন্তত চার পাঁচশো লোক চাই।

মন আনন্দাতিশয্যে পূর্ণ হইলে কথা কম বাহির হয়, আলিবর্দ্দীর কথা বলিবার মত মনের অবস্থা নয়; সে তাড়াতাড়ি দর্পনারায়ণকে মস্ত একটা সেলাম করিয়া কাছারীর দিকে চলিয়া গেল। [ক্রমশঃ

কংগ্রেস কথার প্রকৃত অর্থ

... কোন দেশের কোন কংগ্রেসকে প্রকৃতপক্ষে দেশীয় কংগ্রেস নামের যোগ্য করিতে হইলে, এই কংগ্রেসে যাদৃশ কার্য্যোদ্দেশ্য এবং কার্য্যতালিকা গৃহীত হইলে দেশবাসী প্রত্যেকের পক্ষে উহাতে যোগ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে এবং কাহারও পক্ষে তাহাতে যোগ দেওয়া অসম্ভব না হয়, তাদৃশ কার্য্যোদ্দেশ্য এবং কার্য্যতালিকা ঐ কংগ্রেসে পরিগৃহীত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে কার্য্যোদ্দেশ্য (creed) এবং কার্য্যতালিকা (programme) গৃহীত হইলে দেশের কাহারও পক্ষে ঐ কংগ্রেসে যোগদান করা অসম্ভব হয়, সেই কংগ্রেসকে নামতঃ কংগ্রেস বলিলেও, যুক্তিসঙ্গতভাবে কার্য্যতঃ কংগ্রেস বলা চলে না। যে প্রতিষ্ঠানে দেশের একজনেরও পক্ষে যোগদান করা অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিষ্ঠানকে কংগ্রেস বলিয়া অভিহিত করিলে উহা "কাণা ছেলেকে পদ্মলোচন" বলিয়া অভিহিত করার অনুরূপ হইয়া থাকে। কারণ, "কংগ্রেস" এই ইংরাজী শব্দটির যাহা অর্থ, তাহাতে উহাকে দেশের সর্ব্বসাধারণের মিলনক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে হয়। ...

চিত্র-চরিত্র

মাইকেল মধুসূদন

—শ্রীঅমিত রায়

উনিশ আর বিশে বাংলা প্রবাদ অনুসারে প্রভেদ নগণ্য, কিন্তু উনবিংশ ও বিংশ শতকে প্রভেদ এত বেশী যে আমরা পূর্ব্ব-গামী শতাব্দী সম্বন্ধে এক রকম কিছুই জানি না। অনেকেরই ধারণা তৎকালীন হিন্দু কলেজ হিন্দু ছাত্রদিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিত; কথাটা সত্য নয়। বরঞ্চ হিন্দু কলেজের আবহাওয়া খৃষ্ট-ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর পক্ষে অনুকূল ছিল না, সত্য কথা বলতে কি সে আবহাওয়া সকল ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর অযোগ্য ছিল।

এ সম্বন্ধে মধুসূদনের একজন সহাধ্যায়ী লিখিতেছেন:—

"কলেজের অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার-ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করিতেন সত্য। কিন্তু ঐ কলেজের কোন ছাত্র যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, এ আশঙ্কা অনেকের ছিল না। তাহার কারণ দুইটি;—প্রথম কারণ অনেকে গিবন পড়িতেন, হিউম, ব্রাউন ও ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লব সময়ের আর আর গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন এবং মৃত ডিরোজিও সাহেবের চরিত্র অনুকরণ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ, মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব। কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহার এক বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি ছাত্রদিগের পিতা-মাতা যাহা না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিতেন। এই স্থলে আমার নিজের এক দৃষ্টান্ত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মির্জাপুর মিশনে মেণ্ডিস নামক একজন পাদরী আসিয়াছিলেন। কলেজের যে-বালক বাইবেল পড়িতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাকে তিনি এক এক খণ্ড উক্ত পুস্তক উপহার দিবেন, এই ঘোষণা পাইয়া আমরা ৬/৭ জন কলেজের ছাত্র উক্ত সাহেবের নিকট উপস্থিত হই। তিনি অতি সমাদরে আমাদিগকে বসাইয়া, আপন ধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করেন। পরে বিদায় হইবার সময়ে এক এক খানি বাইবেল দেন।

* * *

পথে আসিবার সময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, বাইবেল উপহার পাওয়ার বিষয় কাহাকেও জানাইব না। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ হেয়ার সাহেবের অনুসন্ধান কে বলিতে পারে! তিনি পাঁচ ছয় মাস পরে এক দিবস আমাদের সকলকে ৪টার পর তাঁহার নিকটে যাইতে কহেন, কিন্তু একই দিনে সকলকে যাইতে বলেন নাই। প্রথমে—কে লইয়া যান; তাহাকে অনেক মিষ্টকথা কহিয়া সকল বিষয় জানিয়া লন। এইরূপ সকলকে ডাকাইয়া বাইবেল গুলি হস্তগত করেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহার প্রিয় কাশী মালী দ্বারা আমাদিগকে ডাকাইয়া লইয়া যান। এক্ষণে যেখানে ক্যাথিড্রেল মিশন কলেজ, সেই স্থানে উপরের ঘরে তাঁহার বৈঠক হইত। আমাদিগকে দেখিয়া তিনি এক বিকট মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহার এমন মূর্ত্তি কখন দেখি নাই। আমাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই প্রায়শ্চিত্ত হইল, অর্থাৎ প্রত্যেককে এক এক ডজন বেত্রাঘাত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আসিবার সময়, নানা প্রকার মিষ্ট কথা বলিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেন। আমরা সেই অবধি বাইবেল পড়া দূরে থাকুক, কোন গির্জ্জার নিকট দিয়া চলিতাম না।"

ইহা তো এক দিকের কথা মাত্র, কলেজের ভিতরের দিকের কথা; কিন্তু আর এক দিক ছিল, কলেজের বাইরে প্রকাণ্ড বাংলা দেশ, যেখানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও প্রলোভন যেমন বেশী, তেমনই আবার হেয়ার সাহেবের বেত্রদণ্ড সেখানে অচল!—

মধুসূদনের খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড কে. এম. ব্যানার্জি লিখিতেছেন:—

"আমি তখন হেদুয়ার নিকটে বাস করি; তখন আমি ক্রাইষ্ট চার্চ্চের পাদ্রী। সে এক দিন ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসুরূপে আমার নিকটে আসিয়া আত্ম-পরিচয় দিল, শীঘ্রই খৃষ্টান হইবে বলিল। দুই তিন দিন যাতায়াতের পরে ও অনেক আলাপ

করিয়া বুঝিলাম, তাহার খৃষ্ট-ধর্ম্মে ভক্তি ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছার অপেক্ষা বেশী নয়।

আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিলাম, বিলাত যাইতে সাহায্য করিতে আমি অসমর্থ। সে যেন অসন্তুষ্ট হইল; ইহার পরে সে আর তেমন ঘন ঘন আসিত না।"

রেভারেণ্ড বন্দোপাধ্যায় সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানিলে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতাম—কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার চেয়ে বেশী জানি। তিনি খৃষ্টান্ হইলে বিলাত পাঠাইতে অসমর্থ, কিন্তু খৃষ্টান না হইলে পুলিশে দিবার ভয় দেখাইতে ছাড়েন না। যথা:—

"তৎপরে আমি এক খানি রঘুবংশের জন্য প্রখ্যাতনামা কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করি। ঐ সময় খুব সম্ভব হুইলার সাহেব তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থী ছিলেন। বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, যে "কেন তুমি ভিক্ষা কর? খৃষ্টান হও, সকল সাহায্য পাইবে, অন্যথা তোমাকে পুলিশে দিব।"

এই বিবৃতির পরে মধুসূদনের খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণে বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের দায়িত্ব কতখানি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তবে খুব সম্ভব তিনি যে সাফাই গাহিয়াছেন, তত সামান্য নয়। খৃষ্ট-ধর্ম্মে সত্যই কেহ অনুরক্ত হইলে তিনি তাহাকে দীক্ষিত করিয়া লইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মধুসূদনের খৃষ্ট-ধর্ম্মে অনুরাগ বিলাত যাইবার নামান্তর মাত্র, পাদ্রী সাহেব নিজেই তাহা বলিয়াছেন, এ ক্ষেত্রে মধুর খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার আনন্দিত হইবার কথা নয়। কিন্তু ধর্ম্ম যেখানে অপর কিছুর ছদ্মবেশ, সেখানে এত সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে চলে কেমন করিয়া!

যাহা হউক, ক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যে প্রকাশ পাইল মধুসূদন খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণের জন্য পাদ্রীদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; এবং পাদ্রীরা পাছে পৌত্তলিক লাঠিবাজ হিন্দুরা মধুকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে তাহাকে কেল্লায় সৈন্যদের হেফাজতে নিরাপদ করিয়া রাখিয়াছে।

সকলে যখন মধুর জন্য দুঃখ করিতেছে, কি ভাবে তাহাকে পাদ্রীদের কবল হইতে উদ্ধার করা যায় তাহার উপায় ভাবিতেছে, এমন সময়ে রেভারেণ্ড বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন—"আপনারা অনর্থক মধুর জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খৃষ্টান হইবার নিমিত্ত তাহার দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে। সে খোকা নয়, দুগ্ধপোষ্য বালক নয় যে, পাদ্রীরা তাহাকে ভুলাইয়া খৃষ্টান করিবে। ধর্ম্মের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিতে তাহার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়স হইয়াছে এবং হিন্দু ধর্ম্মের অসারতা জানিয়া মধু খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই দেখুন তাহার কেমন বুদ্ধি; আপনাদের তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করার আশঙ্কায় সে লাট পাদ্রীর নিকট প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুরোধ মতে কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লার কর্ত্তা ব্রিগেডিয়ার পৌনি সাহেব সাদরে মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিয়াছেন যে, আপনারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিতে না পারেন

এ উক্তি কার? কৃষ্ণমোহনের না কোন প্রাচ্য পেকস্নিফের? 'ধর্ম্মের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিয়া' এবং 'হিন্দু-ধর্ম্মের অসারতা জানিয়া'! বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কি তাঁহার বিলাত-গমনের উৎকট আকাঙ্ক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন!

গৌরদাস মধুসূদনের সহিত কেল্লায় দেখা করিতে গেলেন। সৈনিক ও পাদ্রীপরিবেষ্টিত মধুসূদন কুসংস্কারাচ্ছিন্ন পৌত্তলিক বন্ধুর সমীপে আসিলেন। একা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, কি জানি আবার তাহার সুপ্ত পৌত্তলিক প্রবৃত্তি মাথা নাড়া দিয়ে উঠে, শুধু পাদ্রীদের উপরেও বিশ্বাস নাই; বাইবেল প্রভাবশালী বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে বারুদ যুক্ত হইলে একেবারে অব্যর্থ! বাইবেল ও বারুদ ইউরোপীয় সভ্যতার যমজ সন্তান; খৃষ্ট-ধর্ম্মের উপযুক্ত প্রতীক, একটি ভগবানের, অপরটি শয়তানের!

মধু নব-ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক আলোচনা করিলেন; কুসংস্কারের ক্রোড় হইতে কেমন করিয়া হঠাৎ তাঁহার কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তাহাও বলিলেন, কেমন ভাবে বিলাত যাইবার ছদ্ম ইচ্ছার জানালা দিয়া নূতন আলোক তাঁহার মনে প্রবেশ করিয়াছে, বলিলেন। কিন্তু মূঢ় গৌরদাস আলোকের চিহ্নমাত্র মধুসূদনের কোনখানে দেখিতে পাইলেন না, না তাঁহার মুখে, না তাঁহার ভবিষ্যতে। পিতামাতার শোকের কথা বর্ণনা করিয়া একবার তাঁহাকে বাড়ী গিয়া দেখা দিয়া আসিতে অনুরোধ করিলে হঠাৎ মধু এক সেলাম ঠুকিয়া প্রস্থান করিল। ইহাই মধুর প্রেমের ধর্ম্ম!

তার পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মধুসূদনের

দীক্ষা হইল। পাছে দীক্ষার সময়ে হিন্দুরা গীর্জ্জা আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় সৈন্যদল পাহারায় নিযুক্ত হইল—রুদ্ধদ্বার গীর্জ্জায় 'খৃষ্টতাপাদন' চলিতে লাগিল। খৃষ্টদেব যে-ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার বাহিরের দরজা বন্ধ করিলে কি আসে যায়, ইহাই বোধ হয় তাঁহাদের মনের কথা ছিল!

দীক্ষাস্থলে আর্চ-ডীকন ডিলট্রি উপস্থিত; শুক নাসা ও অস্থিবহুল মুখমণ্ডল লইয়া, কড়িকাঠে নিবদ্ধ-দৃষ্টি রেভারেণ্ড বাঁড়ুয্যে মহাশয় উপস্থিত; আর দুই-চারি জন সহৃদয় ইংরাজ সপরিবারে উপস্থিত; মধুসূদন সগর্ব্বে দণ্ডায়মান, সকলের মনোযোগের কেন্দ্রে ও নূতন পোষাকের পারিপাট্যে।

মধুসূদনের স্বলিখিত সঙ্গীত আরম্ভ হইল:—

Long sunk in superstition's night,
By sin and Satan driven—
... ...
I hasten'd to eternity
O'er error's dreadful sea!

মধু উপস্থিত ব্যক্তিদের উপরে তাঁহার গানের প্রভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন; আন্তরিকতা অপেক্ষা অন্ত্যানুপ্রাসের প্রতি তাঁহার অধিক দৃষ্টি! এ দীক্ষা-সঙ্গীতের অর্থ সম্বন্ধে আর যাহার মনেই দ্বিধা থাকুক, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের ছিল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন—I hasten'd to eternity, o'er error's dreadful sea-টা নিরেট রূপক; eternity অর্থ ইংলণ্ড, আর dreadful sea-টা আধিভৌতিক সমুদ্র; তবে সেটা বঙ্গোপসাগর নয়, ঝঞ্ঝাসঙ্কুল বিস্কে উপসাগর!

আর এই সঙ্গীতের তালে তালে দূর ভবিতব্যের অশ্রুত কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে।"

পারাবত-পাঁতি

-শ্রীজগদানন্দ বিশ্বাস

নানান্ জাতির পারাবত আছে
আমাদের সব জাতির মত;
ভিতরের ছোপ একই সবার
বাহিরের রঙ পৃথক্ যত।

'মিশর-নারী'র মত গরবিণী—
মুখ শাদা ওই 'মুক্ষি' গুলি;
ঘাড় নেড়ে নেড়ে চলা-ফেরা করে
ভুলেও ওদের নাহিক ভুলি।
পুচ্ছ তুলিয়া উচ্চ গ্রীবায়
গর্ব্বে 'লক্কা' চলিছে ঠায়;
আমি উহাদের 'ফিরিঙ্গী' বলি
রঙে ঢঙে একই মিল দেখায়।

'ঠুন্‌কি লোটন' শুভ্র বরণ
মাথায় মোহন ঝুঁটিটি বাঁধা;
'ইহুদী-রমণী' দেখে মনে হয়
নাচন ওদের জনম সাধা।

সার্ট পরিধান 'জাক্‌বিন্' গুলি
সৌখিন 'আমেরিকান্' মত;
মাথায় শুভ্র হ্যাট পরা যেন
সাত রঙা শালে মানায় কত।

পুষ্ট 'সেরাজ' মনোহর সাজ
পরিয়া চরাটে বাহিরে যায়;
দেহ-ভার বহে' যায় গুড়ি হ'য়ে
যেন 'মাড়োয়ারী-বণিক' প্রায়।

'গ্রহবাজ' বাজী দেয় যে শূন্যে
ভেল্কি লাগায়ে দু'-চক্ষুতে;
গৃহ-মায়া-হারা 'বেদুইন্' তারা
নিতি গড়ে নীড় সুচক্ষুতে।

স্বাধীনচিত্ত 'নেপালী'র মত
পাহাড় দেশের 'পাপর' গুলি,
স্রষ্টা ওদের গড়েছেন যেন
উজাড় করিয়া রঙের তুলি।
'গোলা-পারাবত' 'সাঁওতাল' সম
ডিহির কুটীরে রচেছে নীড়;
খোলা মাঠে চরে শূন্যেতে উড়ে
পান করে বহা দু'বেলা নীর।

'পারাবত-পাঁতি' হোক নানা জাতি
সবাই একই সুরেতে হাঁকে;
সকলের সাথে সকলেই মিলে
ভেদাভেদ শুধু নরের থাকে।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে ভারতীয় তত্ত্বসমুচ্চয়

— শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ইউরোপীয় পর্য্যটকেরা ভারতে এসে চারিদিকের রূপসৃষ্টি দেখে বিস্মিত হয়ে যান। ভাস্কর্য্যে এরূপ অদ্ভুত ও

অর্দ্ধনারীশ্বর (বাঙ্গালা)।

অপ্রত্যাশিত রচনা জগতে কেউ কখনও দেখেনি। মানুষের শরীরকে অনুকরণ করে গ্রীকরা দেবদেবী রচনা করেছে, তাও সুস্পষ্ট স্বাভাবিকতায় সকলের চিত্তহরণ করেছে। কোন জটিল ব্যাপার মর্ম্মরের ভাষার ভিতর দিয়ে উপস্থিত করা হয় নি। অ্যাপলো, ভিনাস প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি কতকটা উচ্চস্তরের মানুষ হিসাবেই তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে ধাঁধাঁ নেই—কোন নিগূঢ় রসবিতণ্ডা নেই, সব কিছুই সরল, স্পষ্ট ও স্বচ্ছ।

অথচ ভারতে এলে এই সারল্যের বিপর্য্যয় পর্য্যটকদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়। ভারতবর্ষে অবতরণ করেই যে গুহাভ্যন্তরে সকলে উপস্থিত হন, তাতে দেখা যায় কয়েকটি অদ্ভুত মূর্ত্তি। একটি খানিকটা পুরুষ ও খানিকটা মেয়ে, অন্যটির তিনটি মাথা! বিদেশী পর্য্যটকদের পক্ষে এর চেয়ে বড় হেঁয়ালী আর কি হতে পারে? একেবারে প্রথম পরিচয়ে এরূপ অদ্ভুত রচনার সাক্ষাৎ লাভ করে মূর্ত্তির প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করা তাঁদের পক্ষে একটা কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নেই। এজন্য বহুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয়দের নিকট অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিটি 'Amazon' নামে পরিচিত ছিল এবং ত্রিমূর্ত্তিটিও উদ্ভট রসের উদ্দীপক, অনেকটা হাস্যকর কার্টুন স্থানীয় মূর্ত্তি বলে গৃহীত হয়েছিল। ক্রমশঃ পাশ্চাত্ত্য দর্শকদের আরও নানা মূর্ত্তি চোখে পড়ে,—বহুশীর্ষা, বহুহস্তা, মুদিতনয়ন প্রভৃতি। এই সকল মূর্ত্তি বিদেশী পর্য্যটকদের মনে এমন বিস্ময় উৎপন্ন করে যে, তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকেরাও এসব মূর্ত্তিকে 'bizarre' (কিম্ভূত কিমাকার), 'grotesque' (বীভৎস), 'monstrous' (বিকটাকার) প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই জন্যই এক সময় স্যর জন বার্ডউড স্পষ্টই বলেছিলেন:—"Sculpture and painting are unknown as fine arts in India" (ভারতবর্ষে উচ্চ স্তরের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য অজ্ঞাত)। এ

রাধাকৃষ্ণ (বাঙ্গালা — পাহাড়পুর)।

শ্রেণীর দর্শকদের নিকট ভারতীয় রূপবার্ত্তার গভীর ও দূঢ়-গামী বার্ত্তা অস্পষ্ট হওয়া স্বাভাবিক ছিল। দুঃখের বিষয়,

হরিহর মূর্ত্তি।

এ যুগেও তত্ত্বের দিক্ হতে ভারতীয় সৃষ্টিকে কেউ অনুধাবন করেন নি বলে এখনও ভারতীয় রচনা তাঁদের কাছে হেঁয়ালি। কিছুকাল পূর্ব্বেও লর্ড রোণাল্ডশে ভারতীয় ভাস্কর্য্যকে কিম্ভুত কিমাকার বলে উল্লেখ করে মায়াবাদের দোহাই দিয়ে এ সমস্তের বিরূপতার কারণ নির্দ্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষের মায়াবাদকে এমনভাবে দুর্ব্বোধ্যকে ধামাচাপা দেওয়ার কাজে প্রয়োগ করার এই দৃষ্টান্ত দেখে কৌতুক বোধ হয়। যা বাস্তবিক কুৎসিত তাকে মায়াবাদের খাতিরে সুন্দর বলা যায় না, মায়াবাদ তাকে লুপ্ত বা অদৃশ্য করতে পারে না। বস্তুতঃ এ ব্যাপারটিও অর্দ্ধনারীশ্বরকে Amazon বলার মত। আজ পর্য্যন্ত তত্ত্বের দিক্ হতে ভাল রকমে ভারতীয় রম্যকলার ব্যাখ্যা হয় নি—এ জন্য এখনও ভারতীয় কলা পশ্চিমের নিকট দুর্ব্বোধ্য।

গুহাভ্যন্তরে যে দুটি মূর্ত্তি পর্য্যটকদের বিস্ময় উৎপন্ন করে, সে দুটি মূর্ত্তি মাত্র নয়—ভারতের বহু মূর্ত্তিই ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্বের নানাদিক্ উদ্ভাসিত করে থাকে। সে সব তত্ত্ব যে শুধু অধ্যাত্ম ব্যাপার নিয়ে তা নয়। এ দেশে জ্ঞানের বিশ্লেষণ হয়েছে নানাভাবে। 'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ'—জ্ঞান হতে মুক্তি হয়, এ রূপ কথা এ দেশেই প্রচলিত। বাস্তবিক জ্ঞান কি,—সত্য কি? এ সব প্রশ্ন ভারতবর্ষের প্রতি যুগে উত্থাপিত হয়েছে।

এখানকার সত্য কি এই প্রশ্নটির বিশ্লেষণে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং স্থলবিশেষে ত্রিত্ববাদ ও বহুত্ববাদ বিশেষভাবে আলোচনার বিষয় হয়েছে। আশ্চর্য্যের কিছুই নেই যে, এই সকল ভাবকে রূপের ভাষায় উদ্ঘাটনের চেষ্টাও এ দেশে ভাল রকমেই হবে।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে জগতে দেব-দেবী বা নরনারীর ঐক্য, অর্থাৎ দুইয়ে এক এবং একে দুই—এই দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই তত্ত্ব যে পূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচিত হত তা শুধু প্রমাণিত হয়, এই মূর্ত্তির দ্বারা।

বিষ্ণু মূর্ত্তি (বাঙ্গালা)।

ভারতের এই তত্ত্ব দেবদেবীর ঐক্য-কল্পনায় উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্বামী ও স্ত্রী অসম্পূর্ণ—দুজনে মিলেই

বাস্তবিক এক—এই পরম সত্য একটা জাগতিক প্রশ্নের মীমাংসা করেছে। জগতের এই বিরাট সমস্যা

নটরাজ (মান্দ্রাজ)।

নানা দেশে নানা ভাবে উপস্থিত হয়েছে। কোথাও বা নর ও নারীর সম্পর্কে বিরোধ ও বৈপরীত্যের উপর নিহিত—কোথাও বা প্রভু ও দাসী-কল্পনার সহিত যুক্ত। বাস্তবিক তত্ত্বগত সামঞ্জস্য শুধু ভারতবর্ষেই কল্পিত হয়েছে। শুধু অধ্যাত্ম ঐক্য মাত্র নহে, দেহগত ঐক্যও এই পুরুষ ও স্ত্রী-সম্পর্কের ভিতর আছে, এ কল্পনা বিশ্বের সকল সভ্যতা করতে পারে নি। ভারতীয় তত্ত্বে স্ত্রীই শক্তি-রূপিণী। এলিফেন্টা গুহায় একদিকে এই বিশ্বজনীন তত্ত্ব,—অন্যদিকে আর একটি গভীর তত্ত্ব—তিনে এক এবং একে তিন—ত্রিমূর্ত্তির ভিতর দিয়ে দ্যোতিত হয়েছে। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার নয়—এদের সম্পর্ক অতি গভীর—এমন কি তিনটি অবস্থা মিলেই জগতের প্রতিষ্ঠা—এ রকম কল্পনা জগতে আর কোথাও বড় একটা হয় নি। এই বিশ্বজনীন তত্ত্বটি ত্রিমূর্ত্তি রচনা করে শিল্পী দেখিয়েছেন। কাজেই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের মূলতত্ত্ব একদিকে, অন্য দিকে জীবতত্ত্বের গূঢ় রহস্য রূপান্বিত করে' চিরন্তন সত্যরূপে সকলের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে মর্ম্মরের ভাষায়। এ দেশে গভীর সত্যগুলি পুঁথির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না—সর্ব্বসাধারণের জন্য সে-সব বিশ্ববোধ্য রূপকলার ভাষায় উৎকীর্ণ হয়ে প্রকাশ পেত।

ভারতের ভাস্কর্য্যে নানা দার্শনিক তত্ত্ব স্বচ্ছ রূপ পেয়েছে। একই ব্যাপারের নানা রূপ এমনি করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অর্দ্ধনারীশ্বরে যেমন দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব উত্থাপিত হয়েছে, পুং ও স্ত্রী-শক্তির ঐক্য তেমনই হরিহর মূর্ত্তিতে দেখান হয়েছে। যদিও ব্যবহারের দিক্ দিয়ে হরির ও হরের গুণাবলী বিপরীত ও বিভিন্ন, তবুও মূলতঃ এই দুই দেবতত্ত্ব এক। এ কথাটি পুস্তকে আছে—অথচ তাকে মর্ম্মরের ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য করার প্রয়োজন ছিল। ভারতের মূর্ত্তিকলা তাই করে ধন্য হয়েছে। রূপকলার দিক হতে এ দুটি মূর্ত্তি আশ্চর্য্য ভাবে সফল হয়েছে। বাঙ্গলা দেশের এবং অন্যত্র রচিত অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তির দুই বিভিন্ন অংশকে এমন সঙ্গত ও রূপালঙ্কারে

জগদীশপুরের বুদ্ধ মূর্ত্তি।

এমন সুশোভন করা হয়েছে যে, মনে হয় না মূর্ত্তিটিতে দুটি বিপরীত ব্যাপারের মিলন হয়েছে। তেমনি হরিহর

মূর্ত্তিটিও মনে হয় দুটি কল্পনার মিলন হলেও যেন সমগ্র ব্যাপারটি এক ও অদ্বৈত। এ রকম রচনায় শিল্পীর কৃতিত্ব

তারা মূর্ত্তি (বাঙ্গালা)।

অসাধারণ। দুদিকে দুরকমের সৃষ্টি দ্বারা একটা বিরোধের পরিবর্ত্তে একটা সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সৃষ্টি করে শিল্পী সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করেছেন।

শুধু দ্বৈতাদ্বৈত ক্ষেত্রে মাত্র নয়, অন্য ক্ষেত্রেও ভারতীয় শিল্পীর সফলতা অসাধারণ। ত্রিমূর্ত্তির তিনটি মস্তকও এমন সুসঙ্গত হয়েছে যে, মনে হয়, একই শিবের তিনটি অবস্থা রচনা করা হয়েছে। ত্রিত্ববাদের দুঃসাধ্য মূর্ত্তি রচনা করা জগতের যে কোন শিল্পীর সুসাধ্য নয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের ত্রিমূর্ত্তি একই আকারে সুসঙ্গত করা একান্ত দুরূহ ব্যাপার—অথচ ত্রিমূর্ত্তিতে এও যে সফল হয়েছে, তা পাশ্চাত্ত্য সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন। ত্রিমূর্ত্তিকে 'perfect work of art', শিল্পকলার চরমোৎকর্ষের নিদর্শন বলা হয়েছে। বস্তুত সমস্ত মূর্ত্তিটিই রূপকস্থানীয়। বাঙ্গলাদেশের বিষ্ণুমূর্ত্তিতে শুধু যে তিনটি মস্তক আছে তা নয়—বহু হস্তও আছে। ইউরোপীয় সমালোচকেরা এ রূপ বহুহস্তের সংযোগকে বিকট ও কিম্ভূত কিমাকার বলেন। বস্তুতঃ দশদিকে বিস্তৃত হাত বা সবদিকে রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত হস্তযুক্ত রক্ষাকর্ত্তা কল্পনায় অবশ্যম্ভাবী হয়। বিশ্বের সব দিকে ব্যাপ্তি আছে—সুতরাং বহুহস্তযুক্ত দেবতা কল্পনা না করলে বিশ্বের সকল দিকে ব্যাপ্ত বা কর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন দেবতার কল্পনা প্রকাশ পায় না। শিল্পী বহুকে ঐক্যদান করেছেন একটি মূর্ত্তির মধ্যে। এ ক্ষেত্রে দুয়ে এক নয়, বহু মিলে এক হয়েছে একটা বিরাট কল্পনায়।

অথচ শুধু দুইটি হস্তযুক্ত মূর্ত্তিও ভারতীয় শিল্পে প্রচুর আছে এবং একক মূর্ত্তিও যথেষ্ট। অদ্বৈত কল্পনায়—"শান্তং শিবং অদ্বৈতং", এই তত্ত্বকে উদ্ঘাটিত করার জন্য বহু মূর্ত্তিই রচিত হয়েছে। নটরাজের অদ্বৈত বা একক মূর্ত্তিতে বিপরীতের ব্যঞ্জনা আছে। নটরাজের নৃত্য বিশ্বের অশান্ত গতিক্রিয়ার প্রতিপাদক। এ অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার নয় —বিশ্বের সমগ্র গতিশীল ব্যাপারে ছন্দ আছে—তাল আছে। সব কিছু এলোমেলো অসম্বদ্ধ নয়। অণুতে অণুতে আকর্ষণ বিকর্ষণ, ধ্বংসের আলোড়ন, সৃষ্টির ক্রিয়া

শ্রাবণ বেলগোলার জৈন গোমতেশ্বর মূর্ত্তি।

প্রভৃতির ভিতর ছন্দ আছে। নটরাজের নৃত্যে শিল্পী সেই ছন্দকে মূর্ত্তিদান করেছেন।

দ্বৈততত্ত্ব ক্ষেত্রে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি শিল্পীর একটি অসাধারণ দান। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের হিল্লোলিত বৈচিত্র্য সঙ্গীত স্থানীয় হয়েছে। বস্তুতঃ এ দেশে অতি চমৎকার যুগ্মমূর্ত্তি পাওয়া যায়। শিবদুর্গা, বিষ্ণুলক্ষ্মী প্রভৃতি মূর্ত্তির সুশোভন মর্য্যাদা সকলের চিত্ত হরণ করে। গ্রীক বা মিশরীয় শিল্পে এরূপ মূর্ত্তি দুর্লভ।

এ রূপভাবে ভারতবর্ষে অদ্বৈত, দ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত মূর্ত্তি সৃষ্টি হয়েছে। বহুতত্ত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদের পরিচায়ক বিশ্বরূপ ও ত্রিমূর্ত্তি শুধু নয়, পঞ্চানন, চতুরানন প্রভৃতি কল্পনাকেও সার্থক করা হয়েছে। যাঁরা ভারতীয় দর্শন ও তত্ত্ব বোঝেন, কেবল তাঁদেরই নিকট এ সব মূর্ত্তির সার্থকতা সুস্পষ্ট।

অপর দিকে বৌদ্ধতত্ত্বের গভীর ব্যাপারগুলিও মর্ম্মরে বিকশিত করা হয়েছে। ধ্যানের প্রক্রিয়া বা চিন্তার ধারাকে রূপ দান করার চেষ্টায় গ্রীক শিল্প ব্যর্থ হয়েছে। মানসী লীলার পরিচায়ক মূর্ত্তি এ জন্য অন্যান্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় নেই। অথচ বৌদ্ধতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে এ রকম অন্তর-লোকের বার্ত্তাকে উদ্‌ঘাটন করার প্রয়োজন হয়েছিল। ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তিকেও ইউরোপীয় দর্শকেরা প্রথম অবস্থায় উপলব্ধি করেননি। এ মূর্ত্তিকে বিদ্রূপ করে "vacuous barren image" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা যে একটা মনস্তাত্ত্বিক মূর্ত্তি তা' খুব কম ইউরোপীয়ই বুঝতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ ভারত-বর্ষই মনস্তত্ত্বালোচনায় প্রথম ও প্রধান স্থান ছিল। কাজেই সেই তত্ত্বকেও ভারতীয় শিল্পীই মর্ম্মরের ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

অপর দিকে তন্ত্রের সর্ব্বব্যাপী দেবী-কল্পনা বা শক্তি-কল্পনাও ভাস্কর্য্যের সর্ব্বত্র প্রকাশ পেয়েছে। অর্দ্ধনারী-শ্বর ও যুগলমূর্ত্তি প্রভৃতিতে এই দেবীকল্পনা মূর্ত্ত হয়েছে। দেবী ছাড়া দেব যে অসহায় ও শক্তিহীন, এই তত্ত্ব নানা-ভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ স্বীকার করে। সেই জন্য বহু দেবতার কল্পনা হয়। তার ভিতর 'তারা' কল্পনা একটা প্রধান ব্যাপার ছিল। শ্বেততারা, পীততারা প্রভৃতি সুপরিচিত আখ্যা এই মহাদেবীর জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল। এসিয়ার সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক শক্তিবাদের প্রতিমাস্থানীয় হয়ে মহাদেবী তারা রচিত হয়েছিল। বাঙ্গলাদেশেও তারাধ্যান সুপ্রচলিত হয়েছিল।

জৈনতত্ত্বের নানা দিকও মূর্ত্তিকলায় প্রস্ফুট হয়েছে। মহৎ হতে মহত্তর, অণু হতেও অণু—এই কল্পনা জৈন-শিল্পে প্রস্ফুট হয়েছে। জৈনদের শ্রাবণ বেলগোলার গোমতেশ্বরের মূর্ত্তি প্রায় ৬৩ ফুট উচু। অপরদিকে আবু মন্দিরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রচনা জৈন স্যাদ্বাদের প্রতিপাদক।

এই ভাবে বিচার করলে দেখা যায়, ভারতীয় তত্ত্বের অতি কঠিন বিষয়গুলিকেও মূর্ত্তিদান করে ভারতীয় শিল্পী অমর হয়েছেন। জগতের আর কোন শিল্পে এ রূপ সাধনা বা সিদ্ধি হয় নি।

ভারতীয় স্থাপত্য

... ভারতীয় স্থাপত্য বলিয়া কতকগুলি বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানুষ যদি কখনও আবার ভারতীয় উন্নতির ধারা যথাযথ বুঝিতে পারে, তাহা হইলে দেখিবে যে, এখন যাহা ভারতীয় স্থাপত্য বলিয়া প্রচলিত, তাহাতে প্রশংসনীয় কিছু কিছু থাকিলেও, তাহা উন্নত ভারতের উন্নত স্থাপত্য নহে, অবনত ভারতের অবনত স্থাপত্যের নিদর্শন। যদি আমাদের ভারতীয় সম্মানবোধ থাকে, তাহা হইলে এই স্থাপত্য কোনক্রমেই রক্ষিত হওয়া সঙ্গত নহে, পরন্তু সর্ব্বথা ইহার বিলোপ সাধনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন একটা জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহার নিজস্ব বলিয়া কিছু রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি থাকে না এবং রক্ষা করে না। যাহা মানুষের ইষ্টপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা সে লাভ করিতে পারিলেই প্রতিবেশী জাতিগুলিকে বিতরণ করে। কারণ প্রকৃত উন্নতিশীল জাতি জানে যে, প্রতিবেশী জাতিগুলির উন্নতি সাধিত না হইলে, স্বীয় উন্নতি সম্যক্‌ এবং সর্ব্বাঙ্গীন হয় না। ফলে প্রকৃত উন্নতির যুগে সারা পৃথিবীতে সমস্ত জাতির ভিতর সকল রকম বিধিব্যবস্থার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ...

জগতে শান্তিরক্ষা ও জাতিসংঘ

—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। শান্তিস্থাপনে সাধুতা

শান্তিসংস্থাপনের প্রবল আকাংক্ষারূপ যে শ্রেষ্ঠ দান ভগবান আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহা সার্থক করিতে চাহিলে, আমাদের হৃদয়কে সত্য সত্য পবিত্র ও বিশুদ্ধ করা চাই। শান্তিস্থাপনের জ্ঞান ও বুদ্ধি হয়ত আমাদের হৃদয়ে আসন লাভ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু হৃদয় সত্য সত্য পবিত্র ও বিশুদ্ধ না হইলে, সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিকে শান্তিস্থাপনের কার্যে যথাযথ প্রয়োগ করা সহজ হয় না। শান্তিস্থাপনে আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতকার্য হইতে চাহিলে, সর্বাগ্রে সাধুচরিত্র হওয়া আবশ্যক। যাহার চরিত্র সাধু নয়, যাহার চরিত্রে এতটুকু সন্দেহের কারণ থাকে, তাহার উপর জনসাধারণের আস্থার অভাব হয়, সুতরাং তাহার শান্তিস্থাপনের চেষ্টা নিষ্ফল হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। শান্তিস্থাপনের উদ্যোক্তাকে পবিত্রহৃদয়, সত্যপরায়ণ এবং ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার সহিত নিজের সাধু ইচ্ছাকে যুক্ত করিয়া নিজের অন্তরে শান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। একটা কথাতে চলিত আছে—স্বয়ং অসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি—নিজে অসিদ্ধ হইলে অপরকে সিদ্ধি দান করিবে কি প্রকারে? তাই বলি, অগ্রে নিজে শান্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ কর, তবে জনসাধারণের মধ্যে শান্তিবিধানে সক্ষম হইবে। যে ব্যক্তি আত্মসংযম প্রভৃতি অবলম্বনে অন্তরে শান্তির আসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, যিনি চরিত্রে, ব্যবহারে, আহারে বিহারে উন্নতস্তরে অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারই পক্ষে শুধু মুখে নহে, কথায় নহে, কিন্তু সত্য সত্য কার্যতও শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব। ইহাই বুঝাইবার জন্য বোধ হয় বাইবেলে যিশু খৃষ্টকে অগ্রে ধর্মরাজ আখ্যা দিয়া পরে তাঁহাকে শান্তিসংস্থাপক বলা হইয়াছে। যেখানে ধর্ম ও ধর্মমূলক সুনীতির স্থান হয় না, সেখানে শান্তির স্থান যে থাকিতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই কারণে ধর্মসংস্থাপকগণ ধন্য এবং তাঁহাদের অনুবর্তী শান্তচিত্ত শান্তিসংস্থাপকেরাও ধন্য। ধর্মের পথে অগ্রসর হও, সত্যনিষ্ঠ হইয়া ভগবানের পথে আপনাকে পরিচালিত কর এবং গৃহে, পরিবারে, সমাজে ও দেশে মিলন আনয়নের পথ প্রশস্ত করিয়া দাও। এই প্রণালীতে কার্যের ব্যবস্থা করিয়া শান্তিস্থাপনে সফলতা লাভ কর।

২। পাপ নিজের উত্তাপে নিজেই ভস্মীভূত হয়

শুধু মুখে শান্তি চাই বলিয়া শত চীৎকার করিলেও শান্তি স্থাপনের কোনই সম্ভাবনা আসিবে না। মুখে শান্তিবচন, কিন্তু অন্তরে সমরলালসা ও গোপনে সমরসজ্জা শান্তিস্থাপনে সহায়তা করিবার পরিবর্তে, অচিরে শান্তিবিধ্বংসী সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিবারই সহায়তা করে। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যবহার ঘোর দুর্নীতিমূলক কপটতা মাত্র—সত্য ভাষায় ইহার নাম "বিষকুম্ভং পয়োমুখং" ব্যবহার। আত্মরক্ষার উপযুক্ত, স্বীয় সম্পত্তি ও মানমর্যাদা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত ধনবল ও লোকবল সঞ্চিত রাখা অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা এক কথা, আর সুবিধা পাইলেই পরের সর্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করা সম্পূর্ণ পৃথক্ কথা—উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ। শেষোক্ত কার্যের মূলে সমাজবিধ্বংসী ও সর্বনাশকর পরস্বাপহরণের প্রবৃত্তি সর্বদাই জাগ্রত থাকে। ইহা বড়ই সত্য কথা যে, পাপ নিজের উত্তাপে নিজেকেই ভস্মসাৎ করে। আমাদের শাস্ত্রেও এই সত্যতত্ত্ব ঘোষিত হইয়াছে যে, পাপাচারী ব্যক্তি অধর্ম আচরণ করিয়া কিছুকালের জন্য ন্যূনাধিক সমৃদ্ধি লাভ করিলেও, পরিণামে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরাও প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করি যে, নরহত্যা প্রভৃতি পাপভিত্তি সংগ্রামের ফলে শুধু পরেরই অনিষ্ট সাধিত হয় না, কিন্তু পাপাচারী সংগ্রাম-প্রবর্তক নিজেও পাপের পূর্ণতায় নিপীড়িত হইয়া নিজের সর্বনাশ আনয়ন করে। যে জাতির অন্তরে যুদ্ধের লালসা জাগ্রত থাকিবে, সে জাতির মধ্যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রধানতঃ ধ্বংসসাধক যন্ত্রাদির আবিষ্কারে ও নির্মাণে প্রযুক্ত হইবে। যে সকল বিষয়ের উন্নতিসাধনে সত্য সত্য মানব-সমাজের ক্রমোন্নতি

সাধিত হইতে পারে, সংস্কৃতি উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে অগ্রসর হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ করিবার অল্পই অবসর দেওয়া হয়। বর্ত্তমান জর্মনী ইহার জলন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। বর্ত্তমান যুগে সংগ্রামে জয়লাভের উপযুক্ত উপকরণ প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যে যে অপরিমিত ব্যয় হয়, সে ব্যয় সমরমুখী জাতিসমূহের শক্তি এতই গ্রাস করে যে, তাহাদের প্রকৃত উন্নতি ও হিতসাধক কর্ম্মসম্পাদনের উপযোগী বল বহুল পরিমাণে বিলুপ্ত হয়। সমরমুখী জাতিসমূহের নেতাগণ যে সকল সেনাদল প্রস্তুত করিতে থাকেন, সেই সকল বহুকাল ধরিয়া উপযুক্ত বা নিজ মনোমত কার্য্য না পাইলে অনেক সময়ে বড়ই অস্থির হয় এবং নিরতিশয় অধৈর্য্য প্রকাশ করে। এমন কি, তাহারা নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত কর্ত্তৃপক্ষেরও বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তখন তাহাদের সেই অধৈর্য্য ও বিদ্রোহিতা নিবারণ করিয়া নিজেদের নেতৃত্ব বজায় রাখিবার জন্যও রাষ্ট্রনেতাগণ সমরাগ্নি প্রজ্জলিত করা আবশ্যক মনে করেন। শোনা যায়, ইহাই না কি বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের প্রকৃত মূল। যিশুখৃষ্ট সত্যই বলিয়াছেন "যদি তরবারিকে আশ্রয় কর, তবে তরবারিই তোমার বিনাশ সাধন করিবে"—(For all they that take to the sword shall perish with the sword.)।

৩। সমরপ্রিয় জাতিগণের কপটতা

বর্ত্তমান যুগের কর্মক্ষেত্রের প্রতি চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, যে জাতি শান্তির নাম করিয়া, শান্তি চাই বলিয়া যত অধিক চীৎকার করে, সেই জাতিই আবার তত সোরগোল করিয়া স্বদেশবাসীকে যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে সময়ে অসময়ে উত্তেজিত করিতে লাগিয়া যায়। এই ভাবে উত্তেজিত হইলে সমস্ত জাতিই সামরিক ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন সেই জাতীয় জনসাধারণ শান্তিরক্ষায় যুদ্ধসজ্জা অপরিহার্য্য বলিয়া ভ্রান্ত ধারণা করে। তখন এই ভ্রান্ত ধারণার বিবটীকা লইয়া উত্তেজক ও উত্তেজিত দেশবাসী সকলেই শান্তিস্থাপনে যুদ্ধের অনিবার্য্য প্রয়োজনীয়তাকে নিতান্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। অহিফেনসেবী যেমন অহিফেনের অপকারিতা বুঝিতে পারে না এবং বুঝিতে চাহেও না, সেইরূপ সমর সমর্থক ব্যক্তিগণও ঐ মতের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ও অস্থায্যতা উপলব্ধি করিতে পারে না এবং চাহেও না। বিগত ইউরোপীয় মহাসমর প্রজ্জলিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া পূর্ব্বাবধিই জর্মনীর জননেতাগণ তাহার আবালবৃদ্ধবনিতা অধিবাসীকে শান্তিলাভের জন্য যুদ্ধের অনিবার্য্যতা ও উপকারিতায় সুদীক্ষিত করিবার জন্য মহা আড়ম্বর পূর্ণ ঢক্কানিনাদে সংবাদপত্রে, বিদ্যালয়ে প্রভৃতি নানা উপায়ে এই দুর্নীতিমূলক মন্ত্র বিঘোষিত করিতে লাগিলেন—"war is a biological necessity"—"জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়।" এই মত ক্রমাগত কর্ণে বাজিবার ফলে ক্রমে জর্মনীর অধিবাসীরা ইহাকে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় সমরাগ্নিতে ঝম্পপ্রদানে দ্বিধা বোধ করিল না। বলদর্পিত মুসলিনিও অন্য ভাষায় এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"একমাত্র যুদ্ধের দ্বারাই মানুষের সকল শক্তি সর্বাপেক্ষা বিকাশলাভের অবসর পায় এবং যে সকল জাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার সাহস পোষণ করে, যুদ্ধ তাহাদিগকে আভিজাত্যের গৌরবে অভিষিক্ত করে।"*

আবার মুসলিনিই আপনাকে কথায় কথায় শান্তিপ্রয়াসী বলিয়া প্রচার করিতেও কিছুমাত্র ইতস্তত: বোধ করেন না।

৪। সর্বগ্রাসী নীতির পরিণাম

মুখে যিনি যাহাই বলুন, ইহা বোধ হয় কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, অধিকাংশ স্থলেই সমর-সজ্জার মূলে থাকে, সর্ব্বগ্রাসী মনোবৃত্তি এবং তাহার আনুষঙ্গিক সহচর—পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবাসিগণের প্রতি অবিশ্বাস। দেখিলাম, আমার প্রতিবাসী দুর্বল, তাহার জমিজমা বিশেষ লাভজনক এবং সেই জমিজমা অবলম্বনে সে ধনরত্নে যথেষ্ট সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, অথচ তাহার সেই জমিজমা রক্ষা করিবার উপযুক্ত লোকজনের বিশেষ অভাব। অপর দিকে দেখিলাম, আমার নিজের যথেষ্ট লোকজন আছে, কিন্তু আমার নিজের জমিজমা হইতে প্রতিবাসীর মত যথেষ্ট ধনরত্ন উৎপাদনে সক্ষম হইতেছি

---

* War alone brings up to its highest tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the peoples who have the courage to meet it. The Statesman 12.5.35

নিরপেক্ষ-নীতি=নিরপেক্ষতা-নীতি

নিরপেক্ষ নীতি

জাপান

চীন

Saila

শান্তি-বৈঠকের নেপথ্যে

না। তখন প্রতিবাসীর জমিজমার উপর আমার লুব্ধ দৃষ্টি পড়িল এবং ছলে বলে কৌশলে ঐ জমিজমাটি গ্রাস করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কথাই আছে—আত্মবৎ মন্যতে জগৎ—আপনার ন্যায় লোকে জগৎ দেখে। আমার নিজের মনোবৃত্তি অনুধাবন করিয়া ভাবিলাম; হয়ত প্রতিবাসীও আমার ন্যায় দুষ্টভাব প্রণোদিত হইয়া আমার জমিজমাটুকু গোপনে হরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। প্রতিবাসী ব্যক্তিগণের ন্যায় প্রতিবাসী জাতিগণেরও মধ্যে অনেক সময়ে এই প্রকার দুষ্ট কূটভাবসকল কার্য্য করিতে থাকে। এইরূপে অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে হইতে, একদিন কোন সামান্য সূত্র ধরিয়া সহসা প্রজ্বলিত আকারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অবিশ্বাস একবার অন্তরে বদ্ধমূল হইলে, তাহা কোন-না-কোন আকারে বাহিরে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না। এইরূপে অন্তরে বাহিরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে থাকিলে উহা নিজের উত্তাপে নিজে ভস্মীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত সহজে নির্বাণপ্রাপ্ত হইতে চাহে না। তখন প্রতিবাসিগণ পরস্পরের সর্বগ্রাসী নীতির বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষার অনন্ত উপায় ভাবিয়া যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে সর্বস্ব পণ করিয়া বসে। তখন তাহারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিবেচনা করিবার বুদ্ধিশক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে যে, তাহারা মৃত্যুমুখে কিরূপ দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। তখন প্রতিবাসিগণ পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাদৃষ্টিতে "নজর" বা খরদৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হয়। এই "নজর" রাখার অর্থ হইল কামান, গোলাগুলি, যুদ্ধ-জাহাজ, উড়ো জাহাজ, বোমা প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ অধিক হইতে অধিকতর সংগ্রহ এবং সে সমস্ত ব্যবহার করিবার উপযুক্ত সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও সৈন্যগণকে শক্তিমান করিয়া তোলা। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল, প্রতিবাসী জাতিসমূহের অধিক হইতে অধিকতর ব্যয়ভার বহন এবং ইহার শেষ পরিণাম হইল, ঐ প্রকার উত্তরোত্তর অধিক ব্যয়ভারের চাপে প্রতিবাসী জাতিগণের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার পথে অগ্রসর হওয়া।

৫। ধর্মের লক্ষ্য সম্প্রীতিবর্দ্ধন, হিংসার প্রশ্রয়দান নহে

উপরে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বিবেচক ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, শান্তিস্থাপনের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য্য, এই মতবাদ যুক্তিসহ নহে এবং এরূপ ভ্রান্ত মতবাদ প্রচারের ফলে শান্তিস্থাপনের পথ প্রশস্ত হইবার পরিবর্ত্তে সংকীর্ণই হইয়া ওঠে। তদ্ব্যতীত, এইরূপ অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত মতবাদ বহুল প্রচার করিবার ফলে কত প্রকার ভয়াবহ পরিণাম ফল আসিতে পারে, তাহা গত মহাসমরে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে। ইহা তো জানা কথা যে, ধর্মযাজকদিগের কর্ত্তব্য হইতেছে, নিজের স্বার্থ-হানির আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়াও লোকের দুঃখ-কষ্ট নিবারণে প্রবৃত্ত হওয়া, রোগ-শোকে সান্ত্বনা প্রদান করা এবং জনসমাজে শান্তি ও আনন্দ বৃদ্ধির উপায়ের সন্ধান দেওয়া। কিন্তু গত মহাসমরের সময় পূর্বোক্ত ভ্রান্ত মতবাদ বহুল প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য জগতের ধর্মযাজকদিগেরও কর্ত্তব্যবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারাও নিজ নিজ ভজনালয়ে উপদেশ দিবার সময়ে শান্তিস্থাপনের প্রকৃত উপায়ের সন্ধান না দিয়া, উপাসকবর্গকে যুদ্ধের পক্ষপাতী করিবার জন্যই সকল উপায়ে যতদুর সম্ভব উত্তেজিত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভাবিলে হৃদয় দুঃখে ও ঘৃণায় অভিভূত হয় যে, সে সময়ে বিলাতের কোন সুপ্রসিদ্ধ ধর্মযাজক কামানের উপর তাঁহার আশীর্বাদ বর্ষণ করিতে কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই, যদিও তিনি খুব ভালরূপেই জানিতেন যে, কামানের একমাত্র কার্য্যই হইল, নরহত্যা ও গ্রাম, পল্লী প্রভৃতির ধ্বংসসাধন। তদানীন্তন ধর্মোপদেষ্টা অনেকেই স্বমত সমর্থন করিবার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্র নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র, এইরূপ অনেক "ন্যায়ের ফাঁকি" আবিষ্কার করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টিকে প্রকৃত সত্য হইতে দূরে সরাইয়া মিথ্যার ঘন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জগতে শান্তিস্থাপন যাঁহাদের কর্ত্তব্য, যাঁহাদের নিকট হইতে লোকে অধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আশা করে, তাঁহারা যখন নরহত্যা প্রভৃতি অধর্ম্য কার্য্যের অনুকূল মতপ্রকাশে দণ্ডায়মান দেখা গেল, তখন তাঁহাদের ঐ প্রকার মুখে শান্তি-বচন কিন্তু আচরণে ধর্মবিরোধিতা দেখিয়া জনসাধারণের অনেকে শুধু তাঁহাদের প্রতি নহে, কিন্তু ঈশ্বরের উপর ও ধর্মের উপর যদি অনাস্থা প্রকাশ করিতে থাকে, তবে তাহাদের উপর বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না।

প্রেম-নিবেদন

রণদেবতা মার্স। (কোর্টশিপের সুরে) মাভৈঃ শান্তিদেবী! এ সমস্তই আমার প্রেমের অর্ঘ্য এবং সবগুলিই বর্ত্তমান পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির সর্ব্ববৃহৎ কারখানায় তৈয়ারী, মূল্যও কম নহে মাদাময়্জেল—

বলা বাহুল্য যে, ধর্মের নামে ও ঈশ্বরের নামে তথাকথিত ধর্মপ্রচারকদিগের ভণ্ডামি ও কপটতায় তাহাদের হৃদয় জর্জরিত হইবার কারণেই তাহারা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা পোষণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এ বাড়ীর ওবাড়ীর প্রাচীরের ভেদ, এ দেশ ও দেশ ভৌগোলিক প্রভেদ প্রভৃতি সর্ববিধ অপ্রাকৃত প্রভেদ অতিক্রম করিয়া মানুষের সহিত মানুষের সম্প্রীতিবর্দ্ধনই হইল সকল ধর্মের মূল ভিত্তি, লক্ষ্য ও গৌরব। ঈশ্বরকে সকলের একই পিতামাতা বলিয়া শিক্ষা দেওয়া এবং সকল দেশের ও সকল জাতির মানুষের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার করাই হইল, সত্যধর্মের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য; হিংস্র পশুদের ন্যায় পরস্পরকে কামড়াকামড়ি করিতে প্রশ্রয় দেওয়া কোন ধর্মেরই একটুকু উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

৬। ভ্রান্তিপ্রদর্শন

শান্তভাবে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে একটু আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, সমরলোলুপ ব্যক্তিগণের প্রচারিত মতবাদসকল প্রকৃতপক্ষে অসার—উহাদের কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। শান্তি-স্থাপনের জন্য বা জীবন-রক্ষার জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইলে শান্তিসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রবৃত্তি মানবমাত্রেরই অন্তরে চিরখোদিত থাকিত না এবং বিবাদ-কলহের প্রতি বিরক্তিও চিরজাগ্রত থাকিত না। প্রত্যেক মানব যদি শান্তিকে কেন্দ্রে রাখিয়া ধর্মের ভিত্তিতে সদ্ভাবের উপর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তবে সমুজ্জ্বল সংস্কৃতির বিলোপসাধক প্রজ্বলিত সমরাগ্নিতে নরবলি দিবার কথাই উঠিতে পারে না। উপরোল্লিখিত যে ভ্রান্ত নীতি মুসলিনি বিঘোষিত করিয়াছেন, তাহার ভ্রম গত মহাসমরে জ্বলন্ত আকারে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। ঐ মহাসমর সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার যুগে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে সংস্কৃতি যে সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, মহাসমরের দীপ্তশিখ অগ্নিতে সেই উন্নতিমুখী সংস্কৃতির কত বড় অংশ যে ইন্ধন স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কেবল তাহাই নহে। যে-সকল মহাপুরুষ মহাসমরের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমুন্নত সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধনে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বয়সনির্বিশেষে, জ্ঞাননির্বিশেষে তাঁহাদের অনেকে দণ্ডভয় এবং দেশরক্ষার উপায় সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রভৃতি নানা কারণে মহাসমরের প্রজ্বলিত হুতাশনে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সংস্কৃতিসাধক লোকের অভাবে প্রকৃত সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধনের পথ বহুল পরিমাণে রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার পরিণামে জগতের যে কি দারুণ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা বিবেচক সুধীমাত্রই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের অধিবাসী এই সত্য যে মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে, তাহার পরিচয় প্রতিদিন সংবাদপত্র খুলিলেই পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য মহাদেশবাসিগণ নিত্য নিয়ত যুদ্ধের সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়া সত্য প্রজ্ঞান ও প্রাণস্পর্শী গভীর তত্ত্বপ্রকাশের সাহিত্য এবং জনসমাজের হিতসাধক বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতিসাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার বড় বেশী অবসর পাইতেছে না। এখন প্রধানতঃ যুদ্ধে বিজয়-লাভকে কেন্দ্রে রাখিয়া প্রকৃত সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদক এবং জনসমাজের সর্বনাশসাধক ও প্রকৃত উন্নতির শ্বাসরোধক সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাবের প্রতি যত্ন প্রদত্ত হইতেছে। সেদিন সংবাদপত্রে দেখি, জর্মনীতে স্বাধীনভাবে প্রজ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন বন্ধ করিয়া সকল বিষয়কে যুদ্ধে বিজয়-লাভের অনুকূল করিয়া প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৭। এখনও শান্তির আশা দূরাৎ সুদূরে

বর্ত্তমানে জগতের গগনমণ্ডল যে প্রকার দ্বেষহিংসা ও ত্রাসভয় ও অবিশ্বাসের ঘন কৃষ্ণবর্ণ মেঘজালে সমাচ্ছন্ন এবং শতবিধ ষড়্যন্ত্রের দূষিত বাতাসে পরিপূর্ণ, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, প্রকৃত শান্তিস্থাপনের আশা এখনও অনেক দূরে। যুদ্ধ একবার আরম্ভ হইলে তাহার শেষ যে কোথায় হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অথচ সকলেই অনাগত যুদ্ধের পরিণাম ভাবিয়া আকুল। যুদ্ধের আগুন একবার জ্বলিয়া উঠিলে, সভ্যতা সংস্কৃতি প্রভৃতি যাহা কিছু মানব-সমাজের উন্নতি ও মঙ্গলসাধক এবং সভ্যতা-ভব্যতার পরিচায়ক, সে সমস্তই যে চকিতের মধ্যে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে, তাহা পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ সুনিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করিয়া শান্তি-রক্ষার উদ্দেশ্যে নিরস্ত্রীকরণ অস্ত্রবৃদ্ধি-নিয়ন্ত্রণ, প্রভৃতি অন্যায়-

প্রতিরোধক নানা বিষয়ের মিলিত ভাবে অবতারণা করিতেছে। কিন্তু সবল জাতিগণের সমর-লালসার নিবৃত্তি না হইলে সে সকল প্রস্তাব বিশেষ কার্য্যকর হইবে বলিয়া দেখা যাইতেছে না। অন্তরে শান্তির মূল প্রতিষ্ঠিত হইলেই বাহিরেও শান্তি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইবে না। আমরা বারংবার বলিয়া আসিতেছি যে, আসল কথা হইতেছে —হৃদয়ের পরিবর্ত্তন চাই। অস্ত্রের ঝনঝনানির প্রতি সমাদর প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভূমিকে লক্ষ্মীর আলয় করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার ফলে সহজেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন শান্তির আবহাওয়ায় শিল্প-সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞান ও ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ, সকলই উন্নতির পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবে এবং সভ্যতা ও মহত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সাধুতার মুখোস পরিত্যাগ কর এবং আপনার প্রকৃত রূপ দেখ। 'অজ্ঞাত যোদ্ধার সমাধিক্ষেত্রে' দুই মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইলেই শান্তি-স্থাপনের পথ উন্মুক্ত হইবে না। শান্তি-স্থাপনের যদি সত্যই অভিলাষ থাকে, তবে রাজা বিশ্বামিত্রের ন্যায় ক্ষাত্রশক্তির প্রতি অন্তরের সহিত ধিক্কার প্রদান কর এবং ভগবানের অপ্রতিহত অমোঘ শক্তির উপর একান্ত আস্থা রাখিয়া শুভকর্ম সাধনে নিরত হও। প্রকৃত ধর্মকে অন্তরে গ্রহণ কর, ধারণ কর ও পোষণ কর—ধর্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন। ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকল কর্ম করিতে থাকিলেই অচিরে শান্তির সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই

৮। মন্দের ভিতরে ভাল

ভগবানের মঙ্গল-বিধানে জগতে কোন কিছু নিছক মন্দ বা absolute evil দেখা যায় না। সকল মন্দের ভিতরেই কোন কিছু ভাল, কোন কিছু মঙ্গল অন্তর্নিহিত থাকে দৃষ্ট হয়। বলদর্পিত জাতি যখন সর্ব্বগ্রাসী নীতির অনুসরণ করিয়া অপরাপর জাতির প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন জাতিসমূহ অনেক সময়েই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংঘবদ্ধ হইয়া ঐ অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধাপ্রদানে উদ্যত হয়। জর্মনগণ যখন বলদর্পে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া চতুঃপার্শ্বস্থ বিভিন্ন জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইয়া মহাসমরের সূত্রপাত করিল, তখন উৎপীড়নের বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত জাতিসমূহ 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'—এই নীতির অনুসরণে সংঘবদ্ধ হইয়া জর্মনদিগের সর্বগ্রাসী নীতিতে সর্বতোভাবে বাধাপ্রদান করিল। সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়াই এবং তাহার ফলে "জাতিসংঘ" স্থাপিত হওয়াই মহাসমরের পরিণামে এক মহালাভ দাঁড়াইল। দেখা যাইতেছে, সংঘীয় জাতিগণ হইতে গুরুতর বাধা পাইবার আশঙ্কায় বলদৃপ্ত জাতিগণ মুখে যতই কেন আস্ফালন ও অহঙ্কার প্রকাশ করুক না কেন, কার্য্যতঃ প্রকাশ্যভাবে কোন নূতন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস করিতেছে না। সংঘীয় জাতিসমূহ সত্য সত্য আপনাদের প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলে জগতে শান্তিধারা বর্ষণের কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিত না। কিন্তু তাহারা সকল প্রতিবাসীদিগের প্রদর্শিত ভয় লোভ প্রভৃতি নানা জালে জড়িত হইয়া প্রধানতঃ নিজ নিজ স্বার্থে আঘাত লাগিবার ভয়ে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস সর্বতোভাবে অটুট রাখিতে পারিতেছে না এবং কাজেই প্রতিজ্ঞানুরূপ কর্ম করিতেও অগ্রসর হইতেছে না। কোন সম্পত্তির দশ জন অংশীদার হইলে সাধারণতঃ তাহার যে অবস্থা হয়, জাতিসংঘেরও বর্ত্তমানে অনেকটা সেই অবস্থা ঘটিতেছে। কোন অত্যাচারের কথা শুনিলে যেখানে সত্য সত্য মিলিত ভাবে কার্য্য করিলে ত্বরিত প্রতিকারের সম্ভাবনা হইত, সেখানে সংঘীয় প্রত্যেক জাতিই বিভীষিকাকম্পিত হৃদয়ে 'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ' অর্থাৎ কোন কার্য্যে অগ্রগামী হইবে না, —এই নীতি অনুসরণ করিবার ফলে মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে না পারিয়া জাতিসংঘ অত্যাচারের বিশেষ কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছে না, ইহা এক প্রকার সর্ববাদী-স্বীকৃত। সংঘের প্রত্যেক জাতিই প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে অপর জাতিগণ কি করে দেখিবার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। কাজেই জাতিসংঘের বিচার-আলোচনা শেষ হইবার পূর্বেই অনেক স্থলে অত্যাচারে বাধা দেওয়া সম্ভবপর হয় না এবং সেই কারণে বলদৃপ্ত জাতিগণের নিকট জাতিসংঘকে প্রকারান্তরে পরাজয়-স্বীকারে বাধ্য হইতে ও উপহাসাস্পদও হইতেছে। যেখানে জাতিসংঘ সত্য সত্য মিলিত হৃদয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, সেখানে অন্যায়ের প্রতিকার অনেক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক অবিশ্বাসের কারণে প্রতিবাসী জাতিসমূহ এ ছুতায়-

ও ছুতায় পরস্পরের সঙ্গত অধিকারের উপর অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া, প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে না নামিয়া এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রভৃতির 'ফাঁকি' বাঁচাইয়া যতটুকু হইতে পারে, ততটুকুই অপরাপর সম্পত্তি ও অধিকার গ্রাস করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। ইহার মধ্যে কৌতুকের বিষয় এই যে, অপহৃত ও অপহারক উভয়েরই মুখে সর্বদাই এক কথা—উভয়েই শান্তিকামী, কেহই কাহারও অনিষ্টসাধনে এতটুকু অভিলাষী নয়। এইরূপ মিথ্যা শান্তিবাণীর ছায়ায় প্রতিবাসী ও অপ্রতিবাসী সকল জাতিরই মধ্যে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও তাহার পরিণামে বিবাদ-কলহ ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে চাহিতেছে। এখন সকল জাতির মধ্যে সর্বদাই এই আশঙ্কা জাগিয়া আছে দেখা যায় যে, কখন কোন্ এক সামান্য ঘটনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে ঐ বিবাদ-কলহে নিপতিত হইয়া উহাকে প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত করিয়া দেয়। গত মহাসমরের পরে এবার যদি পুনরায় সমর-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তবে সে হুতাশনে জাতিসংঘ বল, আর বলদর্পিত ধনমত্ত জাতিই বল, সকলেই যে আহুতিস্বরূপ পড়িয়া চিরকালের জন্য ভস্মসাৎ হইবে না এবং তাহার পরিণামে কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য সভ্য জগতের বহু যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সৃষ্ট ও পুষ্ট সংস্কৃতিও বহুলাংশে চিরবিলুপ্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বিশ্বামিত্রের পদানুসরণ করিয়া যদি সাহসের সহিত 'ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং' এই মহামন্ত্র প্রচার করিয়া জগদ্বাসীকে উহাতে দীক্ষিত করিতে পার; যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত ব্রহ্মকেন্দ্রক ও কর্মভিত্তি অমোঘ শান্তিবাণী হৃদয়ের মধ্যে সত্য সত্য পোষণ করিতে পার, তবেই জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী, নতুবা জাতিসংঘ বল, সন্ধিপত্র বল, শান্তিস্থাপনের সকল প্রচেষ্টাই নিরর্থক—ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।*

* আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, বঙ্গশ্রীতে প্রকাশের জন্য এই প্রবন্ধটি প্রেরণ করিবার অব্যবহিত পরেই গত ১লা কার্ত্তিক এই প্রবন্ধের লেখক ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং বহু কাল সুচারুরূপে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। 'আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ', 'আর্যনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা', 'রাজা হরিশ্চন্দ্র', 'ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি', 'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি', 'কলিকাতায় চলাফেরা', 'শিক্ষা-সমস্যা ও কৃষিশিক্ষা', 'শান্তি', 'আঁখিজল', 'বন্ধু আমার', 'তোমরা আর আমরা', 'মায়ে পোয়ে', 'প্রভাতী', 'খেয়াল', 'মা', 'আলাপ', 'পিতা নোহসি' প্রভৃতি পুস্তক তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

স্বাধীনতা ও বর্ত্তমান জগৎ

… জগতের সর্ব্বত্র মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া এদেশ-ওদেশ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ব্যাধির যাতনার ফলে অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইতেছে, বিবাদ ও বিসংবাদের ফলে অশান্তি ও অসন্তুষ্টিতে সর্বদা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে, ইহা মনে করিলে কি স্বাধীনতা কথাটির মধ্যে যে উৎকর্ষ বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই উৎকর্ষের ক্ষুণ্ণতা সাধন করা হয় না?

জগতের সর্ব্বত্র মানুষ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে মানুষের মধ্য হইতে যে প্রকৃত স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না। তৎসত্ত্বেও যদি বলা হয় যে, অমুক অমুক জাতি "স্বাধীন", তাহা হইলে তাহাতে মাত্র স্বাধীনতাকে পরিহাস করা হইয়া থাকে এবং অন্য কোন ফলোদয় হয় না। …

সেকাল ও একালের নোয়াখালী

—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

প্রথম পর্ব্ব

১। নোয়াখালী জেলার অবস্থা ও অবস্থিতি

বঙ্গদেশে নোয়াখালী খুব ছোট জেলা। জেলাটি ক্ষুদ্র হইলেও এক সময় এখানে শস্য-সম্পদের অভাব ছিল না। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে সিজর ফ্রেডারিক (Ceasor Frederick) নামক জনৈক ভিনিস্-দেশীয় পরিব্রাজক ভ্রমণ উপলক্ষে নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়,—তিনি এই দ্বীপকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তত্রত্য কৃষিসম্পদ্ দেখিয়া তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ও জিনিষপত্র তখন যেন জলের দরে বেচাকেনা হইত। তিনি কিঞ্চিদধিক তিন শিলিং (প্রায় সোয়া দুই টাকা) দিয়া একটি গরু ও দেড় শিলিং দিয়া একটি শূকর এবং খুব হৃষ্টপুষ্ট একটি মুরগী এক পেনি (প্রায় এক আনা) ব্যয় করিয়া কিনিয়াছিলেন। কিনিবার পরে স্থানীয় অপরাপর লোকের নিকট ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উক্ত বিক্রেতা তাঁহার নিকট হইতে না কি উপযুক্ত মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্যই পাইয়াছিল। তখন টাকায় চৌষট্টি সের করিয়া চাউল, লঙ্কা ও তুলা বিক্রয় হইত এবং লবণ, ডাল ও গুড় টাকায় বত্রিশ সের করিয়া বিক্রয় হইত বলিয়া তৎকালীন সরকারী বিবরণীতে পাওয়া যায়।

এই জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের অরণ্য-পরিশোভিত পাহাড়িয়া প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে মেঘনা ও বঙ্গোপসাগরের সুবিস্তীর্ণ ফেনাম্বুরাশি জেলাটিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে, মানচিত্রে জেলাটির আকৃতি দেখিতে অনেকটা জলের উপর ভাসমান প্রদীপের মত প্রতীয়মান হয়।

পূর্ব্বকালে সাদাসিধা জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব এখানে প্রায় দৃষ্ট হইত না। এই জিলার প্রধান উৎপন্ন শস্য ধান্য, সুপারি, নারিকেল, লঙ্কা, তুলা ও পাট প্রভৃতি। ইহা ছাড়া নানা রকম ফল-ফলারি, শাক-শব্জী ও তরিতরকারী এখানে উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদীর তীরবর্ত্তী ভূভাগে লোনামাটির অভাব নাই। পল্লীবাসীরা প্রয়োজন অনুরূপ নুন তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে।
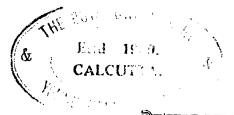
এই জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে তাঁতি বা যুগী সম্প্রদায়ের লোক অধিক দেখা যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা
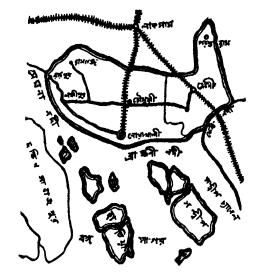
নোয়াখালীর মানচিত্র।

যাইতে পারে, নোয়াখালী জেলায় এই সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য বাংলাদেশের অপরাপর জেলা হইতে তুলনায় অনেক বেশী। বস্ত্র-বয়ন ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। তাই এখান হইতে প্রচুর তাঁতের কাপড় বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। অতএব, খাদ্য ও পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদনের দিক্ দিয়া মোটের উপর জেলাটিকে নেহাৎ দুর্ব্বল বলা চলে না। মাটি ও জলবায়ু কৃষির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল বলিয়া উৎপাদকদিগের এখানে ফসল উৎপাদন করাটাও অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

বড় রকমের কল-কারখানা, মিল্ ও রেলপথবাহুল্যরূপ

অথবা উৎপীড়নের অস্বাভাবিক উৎপাত এখনও এই জেলাটিকে তত বেশী উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। প্রয়োজন অনুরূপ যান-বাহনের বিশেষ অসুবিধা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

রাস্তা-ঘাট, খাল প্রভৃতি দ্বারা জেলার অধিবাসীদিগের চলা-ফেরার ও চাষ-আবাদের সুবিধা যাহাতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে, সে দিকে চেষ্টা চলিয়াছে। কিন্তু তবুও এ কথা সত্য যে, অতীতের সুখের দিন এখন আর নাই

এক সময় ছিল যখন পল্লীর মাঠে মাঠে প্রচুর ফসল ফলিয়া থাকিত, শ্যামল কাননে ও বাগানে বাগানে ফুলফল ভরিয়া থাকিত। গোয়ালে গোয়ালে দুগ্ধবতী গাভী ও দীঘি-পুকুরে মৎস্যের প্রাচুর্য্য এবং গ্রামে বস্ত্রশিল্পের বিস্তৃতিতে ছোট জেলাখানি স্বাস্থ্য ও সুখের মাধুর্য্যে শ্রী ও সম্পদ্‌শালী ছিল। কালক্রমে বিচিত্র আবর্ত্তনের সংঘাতে এখন সেই প্রাচুর্য্যে হানি প্রায় সকল দিকেই মর্ম্মন্তুদ চেহারায় দেখা দিয়াছে।

অভাবের দুনিয়ায় নিদারুণ তৃষ্ণা-রাক্ষসীর কবলে পড়িয়া চতুর্দ্দিকে 'ত্রাহি ত্রাহি' রব উঠিয়াছে। তাহার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র জেলার অধিবাসিবৃন্দকেও জীবন-যাত্রার সঙ্কটময় পথে পা বাড়াইতে হইতেছে।

যুগ-সভ্যতার অবদান ক্রমেই যেন অভিসম্পাতের মত ভাগ্য-বিড়ম্বনার কারণ হইতেছে। অত্যধিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন-বেদীতে সুখ-শান্তিকে বলিদান দিয়া মানবজীবন দিন দিন শোচনীয়ভাবে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য, ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক প্রতিকুলতাও যে অনেকটা সহকারী হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

স্থানীয় অবস্থা সকল দিক দিয়া পর্য্যালোচনা করিলে ও তন্ন তন্ন করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ বিচার করিলে, সুখ-দুঃখের মূলীভূত হেতু যে আংশিক ধরা যায় না, এমন নহে।

প্রথমতঃ, নোয়াখালী জেলাতে কোন পাহাড়, পর্ব্বত বা অরণ্যভূমি নাই, অথচ নিকটেই আছে খরস্রোতা তটবিধ্বংসী ভয়ঙ্করী মেঘনা নদী। অনাবাদী অরণ্যভূমি নাই বলিয়া বসতি-বিস্তারের স্থান নাই, অথচ আবাদী ভূমি বা বসতি-স্থান নিত্য নদীগর্ভে অবলুপ্ত হইতেছে। একদিকে বসতিস্থান বা ফসলের জমি কমিয়া যাইতেছে, অপর দিকে লোক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে তাই ক্রম-বর্দ্ধমান লোক-সংখ্যার বসবাসের জন্য ফল-ফলারির বাগান বা ফসলের জমি নষ্ট করিয়াও তথায় বাড়ি-ঘর করিবার প্রয়োজন হইতেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাচীন জমির উর্ব্বরাশক্তি ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, অপর দিকে নূতন নূতন বাড়ী-ঘরের প্রয়োজনে অনেক জমি ব্যবহৃত হইতেছে। এভাবে চাষের জমি যাহা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহাতে উৎপন্ন শস্য-ফসল শোষণের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান উত্তরাধিকারীর অতিরিক্ত প্রাচুর্য্যের অভাব নাই। উহার উপর বর্দ্ধিত হারের রাজস্ব ও সামাজিক জীবন-যাপনসংক্রান্ত বিবিধ ব্যয়বাহুল্যও চাপিয়া বসিয়াছে। জন্মভূমির বক্ষ খুঁড়িয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে, অথচ অধিবাসীর হাহাকার ঘুচে না; মাটি আর কত রসদ জোগাইবে?

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার পরিমাণফল ছিল ১৬৪৪ বর্গমাইল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে উহা কমিয়া ১৫১৮ বর্গমাইলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ভূমি-বিস্তৃতির দিকে এইরূপ পরিণতি হইল। এখন লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির একটি সামান্য হিসাব দেওয়া যাক। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা ছিল ৭১৩৯৩৪ আর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লোকসংখ্যা হইয়াছে ১৭০৬৭১৯। এই ষাট বৎসরে মধ্যে প্রায় আড়াই গুণ লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সময়ের ভিতরে নোয়াখালী জেলাতে তিনটি আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। বাংলা ১৩০০ সনের ও ১২৮৩ সনের রোমাঞ্চকর সাইক্লোনে নোয়াখালীর লক্ষাধিক লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহা না হইলে এই ষাট বৎসরের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা আরও যে অনেক বেশী পরিস্ফুট লাভ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপরের হিসাবে মোটামুটি দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান সময় প্রতি বর্গমাইল বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রায় ১১২৪ জন লোকের ভাগ্যে পড়িয়াছে। গৃহপালিত পশু, পাখী প্রভৃতিকেও ইহার সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ দিতে হইবে

ইহার মধ্যে বাস করা, শস্য উৎপাদন করা ও উৎপন্ন জিনিষ হইতে আনুসঙ্গিক খরচ-খরচা পোষাইয়া জীবিকার উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করা ও ভদ্রভাবে সভ্যতার ক্রমবিকাশসাধনে সাহায্য করা মানুষের পক্ষে কতখানি সম্ভব, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই একটু হিসাব করিলে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

প্রত্যেক মানুষের অতিরিক্ত উপার্জ্জন না হইলে এখন যেন আর চলে না, অথচ নারী, শিশু, রোগী ও অশক্ত সর্ব্বত্রই আছে এবং থাকিবেও।

তারপরে ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্বন্ধে সামান্য একটু দৃষ্টি দেওয়া যা'ক। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার ল্যাণ্ড রেভিনিউ ছিল ১২৭১৫৬৲ টাকা। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী ৪৬২৭৬৫৲ টাকা দেখা যায়। এই হিসাবকেই ইদানীন্তন রেভিনিউ ধরিয়া লইলে দেখিতে পাওয়া যায়,পূর্ব্বের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানে প্রায় চার গুণ রেভিনিউ বর্দ্ধিত হইয়াছে, অথচ জমি অনেক কমিয়া গিয়াছে ; অপর দিকে খাদক-সংখ্যাও অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে। অতএব, এই জেলার জীবিকা-সমস্যা কি ভাবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা সহজেই অনুমেয়।

ফসল উৎপাদনের পক্ষে মেঘনাগর্ভে যে সকল ছোট ছোট দ্বীপ ও চরভূমি আবাদ হইতেছে, নূতন পলিমাটি-সংযোগে ঐ সকল ভূভাগ অত্যন্ত উর্ব্বর। তথায় ফসলও ফলে উপকূল অঞ্চল হইতে অনেক বেশী। অবশ্য, যদিও সেই সকল অঞ্চলে কখন কখন নোনা-পড়া ও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি শস্যহানিকর রিপুর উপদ্রব দেখা যায়, তথাপি বহুশ্রম করিয়া বিপদ্-আপদের সম্মুখীন হইয়া চাষ করিলে, তুলনায় সেই সকল অঞ্চলে শস্য-উৎপাদন যে বেশী হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাহিরের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানী-সংক্রান্ত ব্যাপারে উৎপাদক-শ্রেণীর মধ্যে কোন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয় না। এই জেলার সমগ্র অধিবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য রক্ষা করা, মূল্য নিরূপণ করা ও তদতিরিক্ত সামগ্রীর রপ্তানীবিষয়ক কোন বিধিবদ্ধ পদ্ধতির সুব্যবস্থা এখানে নাই। উৎপাদক-শ্রেণী ফসল-কালে উৎপন্ন ফসল ও দ্রব্যাদি প্রচুর অর্থলোভে যথেচ্ছ হাত-ছাড়া করিয়া ফেলে জনসাধারণের মধ্যে ইহারই পরিণাম ফল, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব, দুর্ম্মূল্যতা ও অর্থাভাবের কারণ-সৃষ্টির আংশিক হেতু হিসাবেই দেখা দেয়।

নোয়াখালীর বর্ত্তমান সদর ষ্টেশন সুধারাম সহরের অবস্থাও ভয়ঙ্কর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। মেঘনা নদী সহরখানিকে প্রায় সম্পূর্ণ ই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে।

বাংলাদেশে নদীসন্নিহিত অনেক জেলার উপকূল ভূভাগের উপর দিয়াই অল্প-বিস্তর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের বিক্ষোভ-সম্পাত না হইয়া থাকে এমন নহে, কিন্তু নোয়াখালী জেলার সুধারাম সহরের (হেড কোয়ার্টার) উপর দিয়া বিগত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে যে বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সংঘাত উপর্য্যুপরি আসিয়াছে, তাহার সহিত অন্য কোন জেলার তুলনা হয় না। দীর্ঘকাল ধরিয়া এক দিকে সহর রক্ষার উদ্যোগ-চেষ্টা চলিতেছে, অপর দিকে মেঘনার প্রচণ্ড তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সামুদ্রিক তাণ্ডবতার নির্ম্মম সংঘাতলীলা উহাকে ধ্বংসের দিকে টানিয়া চলিয়াছে। উহার ফলে প্রাচীন সহরের সুসজ্জিত রাস্তাঘাট, বৃক্ষ, বাগান ও সৌধ-সৌষ্ঠব প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময় ধ্বংসাবশেষ সামান্য কয়েকখানি বহু স্থানান্তরিত ৷৷হান কুটীর ও দোকান-ঘর, কেবলমাত্র প্রাচীন দেওয়ানী কাছারী-সৌধ ও কলেক্টরী-সৌধ শঙ্কিতভাবে যেন ধ্বংসের শেষ মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। সহরের প্রায় চারিদিকেই নদী ঘেরিয়া আসিয়াছে। বর্ষার প্রবল প্লাবনে সমগ্র সহর প্রায় তিন চারি ফিট জলের নীচে ডুবিয়া যায়। ক্ষুদ্র একটি ছিন্নপত্রের ভাসমান অবস্থার মত শত-ছিন্ন ক্ষুদ্র সহরখানি যখন জোয়ারের জলে ভাসিতে থাকে, তখন স্থানীয় জনসাধারণের কষ্টের অবধি থাকে না। এই দুর্য্যোগকালে দেখা যায়, নোয়াখালীর ডাঙ্গায় নৌকা চলে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জলপ্লাবনের সময় রাজপথের উপর দিয়া 'সাম্পান্' নৌকা চলাচলের দৃশ্য দেখিলে, সহরবাসীর ঘনায়মান দুঃখ ও বিপদের করুণ ছবি স্বতই মনে জাগ্রত হইয়া উঠে।

সরকার পক্ষের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সহর টিকিবার আর ভরসা নাই। অদূরে "মাইজদীর" সুবিস্তীর্ণ

প্রান্তরে বিপুল অর্থব্যয়ে নূতন সহরের গঠনকার্য্য চলিয়াছে। অবিলম্বে সহর স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে।

নোয়াখালী জেলার প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; তথাপি যতদূর সম্ভব সন্ধান করিয়া, বর্ত্তমান কাল হইতে কিঞ্চিদধিক দুই হাজার বৎসর পিছনের ঐতিহাসিক সূত্র ধরিয়া ও তদতিরিক্ত প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বন করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধে নোয়াখালীর ইতিহাস-গঠনের উদ্যোগ করা গেল। তখনকার কাল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্বতোমুখী উত্থান-পতনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনশীল নিত্য নূতন ধারা কত বিচিত্র ভাবে সমাগত হইয়াছে, তাহার পরিস্ফুট তথ্য ক্রমশঃ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে

যদিও প্রাক্তন ঐতিহাসিক মতবাদকে আশ্রয় করা ছাড়া বর্ত্তমান ইতিহাস সৃষ্টির উপায়ান্তর নাই, তথাপি যতদূর সম্ভব স্থানীয় তথ্যের সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের লেখার পর্য্যালোচনা করিয়া ও পূর্ব্বাপর বিচার বিবেচনা করিয়া নোয়াখালী জেলার ঐতিহাসিক সত্যসার বিবরণী প্রকাশ করাই হইবে এই সন্দর্ভ সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য

২। পৌরাণিক ও পূর্ব্ববর্ত্তী প্রমাণ

পৌরাণিক গল্পে বলিরাজার পুত্রদিগের দ্বারা পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলগুলি অধিকৃত ছিল বলিয়া যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া সুহ্মের (Suhma) অধিকৃত স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, নোয়াখালী জেলা ও ইহার উত্তরস্থিত এবং পূর্ব্বস্থিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া সুহ্মের রাজ্য ছিল। এই সকল অঞ্চলে পুরাকালে এক অদ্ভুত জাতি বাস করিত তাহারা মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না বটে, কিন্তু আর্য্যপ্রচারিত আচার ও শাস্ত্রাদির গণ্ডীমধ্যেও তাহাদের অধিকাংশই বদ্ধ ছিল না।

মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে খৃষ্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বের বিবরণীতে পাওয়া যায়, তিনি গঙ্গানদীর পশ্চিম তটভূমিকে "Gangaridae" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পারের একটা অদ্ভুত জাতির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই অদ্ভুত জাতির সঙ্গে সুহ্ম রাজ্যের কাহিনীর সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ মহাভারতীয় কাহিনী অনুসারে দেখা যায়, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি একবার মুঙ্গের অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) ও নিকটবর্ত্তী অন্যান্য অঞ্চল জয় করিয়া অবশেষে সুহ্মরাজ্যও জয় করিয়াছিলেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্র-উপকূলের ম্লেচ্ছদিগকে পরাভূত করিয়া বিজয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।

এই সকল প্রমাণ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, নোয়াখালী সুহ্ম রাজ্যের সীমার মধ্যেই অবস্থিত ছিল। মেগাস্থিনিসের বর্ণিত অদ্ভুত জাতির সঙ্গে ভীম-বিজিত ম্লেচ্ছ জাতির সামঞ্জস্য আছে বলিয়াও মনে হয় এবং বর্ত্তমান নোয়াখালীর সমুদ্র-উপকূলস্থ বেপরোয়া-স্বভাবসম্পন্ন ধীবর (মৎস্যজীবী) জাতির পূর্ব্বপুরুষগণকেই যে ম্লেচ্ছ জাতি বলা হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

মিঃ জে. ই. ওয়েব্‌ষ্টার (Mr. J. E. Webstar) অনুমান করেন, বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলা লোক-বসতির উপযুক্ত হইয়াছে এই হাজার তিনেক বৎসরের কথা। তাঁহার এই অনুমানের সঙ্গে মহাভারতীয় যুগের বিচরণের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়া ধরা যায় না।

১২৯৯ ও ১৩০০ সালের "নব্য ভারত" ও "জন্মভূমি"—সাময়িক পত্রিকায় খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫১৭ অব্দকে মহাভারতীয় যুধিষ্ঠিরের কাল নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে বটে, কিন্তু সকল মতকে ঐক্য করিয়া দেখিলে, নির্দ্দিষ্ট সাল, তারিখ বলিতে না পারিলেও, মোটামুটি কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে যুধিষ্ঠিরাদির কাল ছিল, তাহা অনেকটা অনুমিত হয়।

তাহা হইলে ভীম কর্ত্তৃক সুহ্ম-জয়ের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে, নোয়াখালীর অবস্থিতি সম্বন্ধে মিঃ ওয়েব্‌ষ্টারের (Webstar) তিন হাজার বৎসরের অনুমানকে আরও কয়েক হাজার বৎসর পিছনে লইয়া যাইতে হয়।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়, তিনি সমতট বঙ্গরাজ্যের পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে কমলাঙ্ক নগর (বর্ত্তমান কুমিল্লা সহর) দেখিয়াছিলেন। ইহা সাগর-কূলবর্ত্তী দেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। আধুনিক কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ লইয়া তখন একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্ভবতঃ, এই রাজ্যেরই রাজধানী কমলাঙ্ক।

ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে, ত্রিপুরা রাজ্য ও কমলাঙ্ক রাজ্য তৎকালে বিভিন্ন ছিল। বর্ত্তমান নোয়াখালীতে তখন কোন সহর ছিল না বলিয়াই মনে হয়। সমুদ্র-উপকূলস্থ নোয়াখালীর তৎকালীন ভূভাগ কুমিল্লারাজ্য-ভুক্ত ছিল। নানা পরিবর্ত্তনের পথে পরবর্ত্তী কালে এই সকল স্থানের বিভিন্ন অবস্থা ঘটিয়াছে

"রাজমালা"র প্রথম বল্লরীতে পাওয়া যায়, এক সময় ত্রিপুরার রাজা মহারাজ ছেংথুংফা ও মহারাণী ত্রিপুরা-সুন্দরী গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া মেহেরকুল অধিকার করেন। এই যুদ্ধের ফলে মেঘনার তীর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা প্রসারিত হইয়াছিল।

ইহা হিউয়েন্‌সাং-এর ভ্রমণকালের পরের বৃত্তান্ত বলি-য়াই মনে হয়। যাহা হউক, ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান মেহেরকুলের সন্নিকটবর্ত্তী ডাকাতিয়া নদী হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত ভূভাগ তখন ত্রিপুরার অধিকারে গিয়াছিল। ঐ ভূখণ্ডের কিয়দংশ বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভুক্ত স্থান। নোয়াখালীর অন্তর্গত রাইপুরের নিকটেই ডাকা-তিয়া নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

যাহা হউক, কে বা কাহারা এবং কি রকম প্রকৃতির লোক এই দেশের অনাবাদী ভূখণ্ড আবাদ করিয়া, বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সর্ব্বপ্রথম এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিল, তাহার যথার্থ ফিরিস্তি পাওয়া যায় না। মিঃ ওয়েবষ্টার (Mr. Webstar) মনে করেন, নোয়াখালীর বর্ত্তমান নমঃশূদ্রদিগের (চণ্ডাল বা চাঁড়াল) পূর্ব্বপুরুষগণই এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। মিঃ ও. ডোনেল-এর (O. Donnel) রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়,—কোচ্‌দিগের (জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী ধীবর জাতি) পূর্ব্বে উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল হইতে এদেশে একটা লোহিতিক (Mongoloid) জাতির আগমন হইয়াছিল। তিনি অনুমান করেন, বর্ত্তমান যুগী বা যোগীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহারাই ছিল। তাই বোধ হয়, নোয়াখালী জেলার যুগী সম্প্রদায়ের মূল উৎপত্তির ইতিহাস খুব সুস্পষ্ট নহে, অথচ ইহারাই এই জেলায় হিন্দুদিগের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু ইহাদের চেহারা ও গায়ের রঙের সঙ্গে লোহিতিক জাতির সাদৃশ্যের যথেষ্ট অভাব আছে। অতএব মিঃ ও, ডোনেল-এর অনুমানটা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা চলে না। ক্রমশঃ বিস্তৃত বিবরণীর ক্ষেত্রে ইহার আলোচনা থাকিবে।

ডাঃ বুকানন (Dr. Buchanan) এই যুগী সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ পালরাজগণের সঙ্গে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। তাহা হইলে ইহা মাত্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর ঘটনা বলিয়াই সাব্যস্ত হয়।

মোটের উপর, প্রাচীন অধিবাসী কাহারা ছিল তাহার সম্যক্ পরিচয় না পাইলেও,এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা লেখাপড়ায় শিক্ষিত ছিল বলিয়া কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাহাদের এমন কোন সাহিত্য বা ইতিহাসের সন্ধানও মিলে না, যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই মেঘনানদীর দ্বীপপুঞ্জের ও উপকূল-বিভাগীয় নিম্নভূমি অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসীদের বসতি-স্থাপনের কাল নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। কোথা হইতে কাহারা কখন এখানে আগমন করিয়াছে, তাহা এখনও সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহে।

যাহারাই প্রথম আসুক, আসিয়াই যে উর্ব্বর অঞ্চল দেখিয়া শস্যফসল উৎপাদন করিবার ও খাদ্যবস্তুপ্রাপ্তির অনুকূল স্থান বাছিয়া বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। চর ও দ্বীপ অঞ্চল এবং নদীর নিকটের উপ-কূলভাগ বা অপরাপর নিম্নভূমি স্বভাবতঃই বেশী উর্ব্বর থাকে, বিশেষতঃ চাষবাসের সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য ধরাকেও একটি উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করা তত্রত্য অধিবাসি-গণের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। আমরা দেখিতে পাই, বস্তুতঃ এই চাষের কাজ ও মৎস্য-ব্যবসায়ের কাজ যে সম্প্র-দায়ের হাতে আছে, তাহারা বর্ত্তমান কৈবর্ত্ত ও নমঃশূদ্র জাতি। এই হিসাবে ধরা যাইতে পারে, এই দুই সম্প্রদায়ই

এখানকার আদিম সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী অধিবাসী। মুসলমান আমলে ইহাদের অনেকেই ধর্ম্মান্তরিত হইয়া মুসলমান শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। সরকারী বিবরণের মর্ম্মে পাওয়া যায়, নোয়াখালীর মুসলমানদিগের অধিকাংশই ধর্ম্মান্তরিত প্রাচীন নমঃশূদ্র সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে

৩। ভুলুয়ার উৎপত্তি

অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের অধিবাসিগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নোয়াখালীতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই হিন্দু ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি যখন গৌড়দেশ জয় করেন, তখন কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু তথায় উৎপীড়নের ভয়ে মেঘনার পূর্ব্বপারে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ভুলুয়ার প্রাচীন কায়স্থ জমিদারগণ উহাদেরই বংশধর। তাঁহারা মেঘনার পশ্চিম পারের কায়স্থ বংশ হইতে এখানে সমাগত হইয়াছেন বলিয়া এখানকার অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশবীজীতে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মিথিলার রাজা আদিশূরের (এই আদিশূর বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপতি বৈদ্যবংশীয় আদিশূর নহেন। ইনি মিথিলায় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত) নবম পুত্র বিশ্বম্ভর শূরের নোয়াখালীতে বসবাসের সময়কেই নোয়াখালীতে প্রথম হিন্দু-বসতিস্থাপনের ঐতিহাসিক কাল হিসাবে পরিগৃহীত হইয়াছে।

কথিত আছে, একদা বিশ্বম্ভর শূর মিথিলা হইতে চট্টগ্রামের চট্টনাথ শৈলে তীর্থভ্রমণে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার পথে নোয়াখালীর নিকটস্থ মেঘনার সুবিস্তীর্ণ জলরাশিতে যখন আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি হইল। চারিদিকে অনন্ত জলকল্লোল। কুলকিনারা দেখা যায় না। রাত্রির অন্ধকার ঘনীভূত হইল। নাবিকগণ আর নৌকা চালনা করিল না। রাজাদেশে নৌকা নঙ্গর করা হইল। গভীর রাত্রিতে রাজা স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, এক অনিন্দ্যসুন্দরী দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে অভয় দান করিয়া বলিতেছেন, "বৎস, ভয় করিও না। রাত্রি-প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইবে। দেখিবে, এখানকার জলরাশি শুকাইয়া যাইবে। তুমি এই তরণীর দক্ষিণ-সন্নিহিত ভূভাগ খনন করিলে ভূগর্ভে আমার বারাহী প্রতিমা দেখিতে পাইবে। এই পাষাণ প্রতিমাকে উত্তোলন করিয়া এই স্থানে সংস্থাপিত করিবে। আমার অনুগ্রহে দেখিতে পাইবে, এই সামান্য চরভূমি অল্পদিনের মধ্যে বিশাল ভূখণ্ডে পরিণত হইবে। তুমি এই ভূখণ্ডের অধিপতি হইবে ও বহুকাল তোমার বংশধরেরা এই স্থানে রাজত্ব করিতে পারিবে।"

নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রাজা তাঁহার পারিষদ ও ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন। সকলে "শুভ শুভ" বলিয়া হর্ষ প্রকাশ করিলেন। সঙ্গীরা সকলে আনন্দে মাতিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল, অল্প সময়ের মধ্যে নদীর জল নামিয়া গিয়াছে। রাজার নির্দ্দেশমত তখনই ভূভাগ খনন করা হইল। সামান্য খনন করিতে না করিতেই পাষাণ প্রতিমা পাওয়া গেল। সাতিশয় শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত উহাকে যথাবিহিত অভিষেক করাইয়া সেই দিনই প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

সেদিন ভোর হইতেই সূর্য্য দেখা যায় নাই। সমস্ত আকাশ কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন ছিল। যথারীতি পূজাদি কার্য্যসমাপন হইল। অবশেষে কুয়াসা কাটিল, সূর্য্য দেখা দিল। রাজা সূর্য্য-সন্দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ "ভুল হুয়া, ভুল হুয়া" বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলে সূর্য্যের পানে তাকাইয়া দেখিল। সকলেরই মনে হইল, সত্যই দেবীর প্রতিষ্ঠা ও বলিদানাদি কর্ম্ম সমস্তই ভুল ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সাধারণতঃ দক্ষিণ অথবা পশ্চিমাস্য করিয়া দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করাটাই শাস্ত্রীয় বিধি; অথচ বারাহী দেবীর প্রতিমা ভুলক্রমে পূর্ব্বাস্য করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে এবং পশ্চিমমুখী ছাগমুণ্ড স্থাপন করিয়া বলিদান দেওয়া হইয়াছে। সেই হইতে নোয়াখালীর ভুলুয়া অঞ্চলে অদ্যাবধি বলির ছাগাদি পশ্চিমমুখী স্থাপনের প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে, রাজা বিশ্বম্ভর শূরের "ভুল হুয়া" শব্দ হইতেই অপভ্রংশ ভাবে উক্ত স্থানের নাম "ভুলুয়া" হইয়াছে। ইহা বক্তিয়ার খিলিজির গৌড়দেশ শাসন-পর্ব্বের সমসাময়িক ঘটনা।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে "বালা জোয়ার" বলিয়া নোয়াখালীর সমুদ্রতটবর্ত্তী একটি স্থানের নাম পাওয়া যায়। দক্ষিণ-বঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী কতিপয় স্থানকে "ভাটি" বলা হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এই "বালা" নামটিও "ভুলুয়ার" অপভ্রংশ এবং "বালা" ও "ভাটি" একই স্থান। আমরা দেখিতে পাই, প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে নোয়াখালীর অন্তর্গত বাবুপুরের চৌধুরী জমিদারদিগের মধ্যে একটি লড়াই হইয়াছিল। সেই লড়াইএর আনুপূর্ব্বিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া "চৌধুরীর লড়াই" নামক একখানি পুস্তিকা সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে উক্ত চৌধুরী বংশের বিত্ত-গৌরব ঘোষণা করিবার ছলে বলা হইয়াছে, "আমাদের মতন জমিদার আর 'ভাটি'র বাংলায় নাই।" এই বাবুপুর ভুলুয়ারই এক অংশ। অতএব "আইন-ই-আকবরী"র "বালা জোয়ার" ও ভাটি এবং আধুনিক "ভুলুয়াকে" দক্ষিণ-বঙ্গের সমুদ্রতীরবর্ত্তী একই স্থানের বিভিন্ন নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

হোম-শিখা

—শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আগুন-গিরির গুহার মত বক্ষে এ কি বিরাট জ্বালা,
তারই মাঝে কে তুমি মা আগুন-ফুলে গাঁথছ মালা!
এ কি নিঠুর খেলা তোমার অগ্নিময়ী মা গো আমার
বজ্রাগুনের দহন বিনা হৃদয় কি মোর হয় না আলা?
আগুন-গিরির গুহার মত বক্ষে এ কি বিরাট জ্বালা॥

ফোটে না কি এ ফুল মা গো আগুনমণির পরশ ছাড়া,
গন্ধ কি আর ছোটে না মা ভাঙে না কি কুসুম-কারা?
অন্তরেরই অন্তরালে সৃষ্টি ছাড়া কোন্ খেয়ালে
একলা বসে আপন মনে খেলছ তুমি কেমন ধারা?
ফোটে না কি এ ফুল মা গো আগুনমণির পরশ ছাড়া॥

আগুন মাঝে কি গুণ আছে বল্ না মোরে বল্ না মা গো,
আগুন যেথা আপনি সেথা মূর্ত্ত হয়ে তুমিই জাগো।
আগুনের পর আগুন জ্বেলে আড়াল থেকে ঠেলে ঠেলে
কুশ্রী হতে কুশ্রী করে তোল আমার দীনতা গো।
আগুন যেথা আপনি সেথা মূর্ত্ত হয়ে তুমিই জাগো॥

বসুন্ধরার বক্ষভরা রাবণ রাজার চিতার মত,
জ্বলছে আগুন জ্বলছে আগুন জ্বলছে আগুন অবিরত।
সেই আগুন কি তরুলতায় পুষ্প হয়ে নাচে শাখায়
অন্তঃশীলা সেই আগুনের বইছে ধারা শত শত।
বসুন্ধরার বক্ষে জ্বলে সেই আগুনই চিতার মত॥

সেই আগুনই শিশুর মুখে গোলাপ হয়ে রঙিয়ে ওঠে
মায়ের বুকে সেই আগুনই স্তন্যসুধা হয়ে ছোটে।
সেই আগুনের বেগে বেগে চন্দ্র সূর্য্য উঠল জেগে
তারার পরে তারার ফুল নীল আকাশের কুঞ্জে ফোটে
শিরায় শিরায় সেই আগুনই রক্ত হয়ে নেচে ওঠে॥

সেই আগুনই ছড়িয়ে আছে হাজার রূপে বিশ্বময়
সেই আগুনেই সৃষ্টি স্থিতি সেই আগুনেই প্রলয় হয়।
সেই আগুনই চোখের তারায় দেখার মণি হয়ে দাঁড়ায়
আলো-বাতাস আকাশ জল পুষ্প পাতা সমুদয়।
হাজার রূপে ছড়িয়ে আছে এই আগুনই বিশ্বময়॥

এই জগৎটা ঝাড়ের আলো হাজার বাতি হাজার ডালে
সবুজ লাল হলদে পীত এই আগুনের ইন্দ্রজালে।
হাজার ডালে হাজার বাতি জ্বলছে সারা দিবস রাতি
আলোর শতদল ফুটেছে হাজার আলোর রঙমশালে।
ঝাড়ের আলো এই জগৎটা এই আগুনের ইন্দ্রজালে॥

মায়াবিনী এই রূপসী লুকিয়ে আছে সবার মাঝে
নেচে বেড়ায় এই চপলাই হাজার রূপে হাজার সাজে।
এই অ-বলাই চুপে চুপে মিলিয়ে থাকে রূপে রূপে
ক্ষণে ক্ষণে ঝিকিমিকিয়ে এই ষোড়শীই মিলায় লাজে।
আঁচলের লাল শিখাটুকু টুক্ দিয়ে যায় সবার মাঝে॥

কলিকাতা-সহর-বর্ণন

(রূপচাঁদ-পংক্ষী-রচিত)

—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

'রূপচাঁদ পংক্ষী'র পূর্ব্বপুরুষগণ বহুপূর্ব্বে উড়িষ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত চিল্‌কা-হ্রদের নিকটে বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বংশধরগণও নানা কারণে নানা স্থানে গিয়া বাস করেন। রূপচাঁদের পূর্ণ নাম 'রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র'। তাঁহার পিতার নাম 'গৌরহরি দাস মহাপাত্র' ও পিতামহের নাম 'হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র'। গৌরহরি দাস, রাজা হরিহর ভঞ্জের আম-মোক্তার ছিলেন। এই কর্ম্মোপলক্ষে তিনি কলিকাতায় গড়-গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মিত হইবার সময়ে তিনি বাধ্য হইয়া গড়-গোবিন্দপুর ত্যাগ করিয়া বৌবাজারের অন্তর্গত মলঙ্গায় আসিয়া বাস করেন। রূপচাঁদ, ১২২১ বঙ্গাব্দে, ১৪ই মাঘ (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী) তারিখে মলঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমতঃ রামমোহন সরকার নামক জনৈক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৫ বৎসর বয়সের সময় তিনি হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে প্রবেশ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার গান-বাজনার দিকে সবিশেষ অনুরাগ ছিল। এই হেতু, তিনি ভাল করিয়া ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালা ও উৎকল ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন; প্রথমতঃ 'ঘেঁটু'র গীত হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে পাঁচালী, হাফ-আখড়াই, কবির লড়াই প্রভৃতি দলের গীত রচনা করিয়াছিলেন। তিনি যে দলের গীত বাঁধিয়া দিতেন ও যে আসরে স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন, সেই দল সেই আসরে বসিয়া জয় লাভ করিতেন; এবং তখনই রূপচাঁদের যশে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইত। এইরূপে রূপচাঁদের সুনাম পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। একবার বড়বাজারে মল্লিক বাবুদের বাড়ীতে রূপচাঁদের দলের কবিতা-সংগ্রাম হইতেছিল। তাহাতে রূপচাঁদ জয়লাভ করিলেন। তাঁহার কবিতা রচনার উৎকর্ষ ও মাধুর্য্য দেখিয়া উপস্থিত গুণী লোক সকল তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা বৈদ্যনাথ, আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু), রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু), মোহনচাঁদ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি কলিকাতার গণ্যমান্য সমজদার সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মহাসমাদর পূর্ব্বক 'পক্ষিরাজ' উপাধি প্রদান করেন। এই 'পক্ষিরাজ' হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নাম হইল 'পংক্ষীরাজ'। আমি ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি তখন হিদেরাম বাঁড়ুয্যের লেনের পার্শ্ববর্ত্তী ২০নং সেণ্ট জেমস্ লেনে বাস করিতেন। সুবিখ্যাত পাবলিসার ও পুস্তক-বিক্রেতা বন্ধুবর স্বর্গত কেশবলাল আঢ্য মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে আমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। দেখিলাম, পংক্ষীরাজ মহাশয় অতি সুরসিক লোক। কথায় কথায় তিনি লোকদিগকে হাসাইতে পারিতেন। তাঁহার বৈঠকখানার ভিতরে বিস্তর মরাপাখী ও গাওনা বাজনার যন্ত্র দেখিয়াছিলাম! তাঁহার একখানি গাড়ী ছিল। ইহা প্রায় দেড় তলার সমান উচ্চ। ইহার চেহারা কিম্ভূত-কিমাকার। দেখিতে ঠিক খাঁচার মত। মিউনিসিপ্যালিটী ইহার জন্য লাইসেন্স চাহিলে তিনি বলিতেন, "বাবা, আমার ত গাড়ী নয়। ইহা একটি খাঁচা। খাঁচার আবার লাইসেন্স কি? লোকে পাখী পোষে। তাহার খাঁচার জন্য কি লোকে লাইসেন্স দেয়?" আমি তাঁহার নিকটে 'কলিকাতা-সহর-বর্ণন' সম্বন্ধে গানটি লিখিয়া লইতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "ইহা বহুদিন পূর্ব্বে আমি রচনা করিয়াছিলাম। ইহা ত এখন আমার মনে নাই।" তখন কেশববাবু বলিলেন, "আমার নিকটে ইহা লেখা আছে। আপনাকে দিব।" তৎপরে আমি কেশববাবুর বাটিতে গিয়া নিম্নলিখিত গানটি লিখিয়া লইয়াছিলাম। এক্ষণে ইহা "বঙ্গশ্রী"র পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিলাম। রূপচাঁদের অনেকটা জীবন-চরিত ও অনেকগুলি গান আমার সংগৃহীত আছে। বাহুল্য-ভয়ে তাহা এ স্থলে দেওয়া হইল না। বারান্তরে তাহা পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা

রহিল। রূপচাঁদ পংক্ষী মহাশয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

রূপচাঁদ পংক্ষী তাঁহার জীবদ্দশায় কলিকাতার যে রূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি নিম্নলিখিত স্বরচিত কবিতায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :—

রাগ—সিন্ধু ; তাল—যৎ।

ধন্য ধন্য কল্‌কাতা সহর, স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর,
পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী, দক্ষিণে গঙ্গাসাগর॥
(পূবে বাদা-চিংড়ীহাটা, পদ্মানদী তদুত্তর)

হেষ্টিংস্-ব্রিজ বাগবাজার, এই আয়তন তার,
সার্কিউলার-রোড, পোর্মিট-ধার ;
অতুল মর্ত্ত্য-ভুবনে, বৈকুণ্ঠ যায় হার মেনে,
হেরে টেলিগ্রাফ, বলে বাপ্,
লাজে লুকায় পুরন্দর॥
(তারেতে তার, বর্ণ-বিস্তার, ধন্য শিল্পী কারিকর)

তার হেরে তার লাগ্‌লো দিশে,
তারে তারে খপর আসে,
ছয় মাসের পথ এক দিবসে
মেলে তত্ত্ব অনাসে ;
ধন্য ডাক্তার ওসানেসী, সকলকে করেছেন খুসী,
ব্রিটন, দিশি গুণরাশি, সুখে বসি হউন অমর॥
(রোগ শোক তাপ নাশী, হউন্ সরল-অন্তর)

স্বর্গধামে মন্দাকিনী, কল্‌কাতাতে সুরধুনী,
নন্দন-কানন ইডেন্-গার্ডন্ সম নিছনি,
ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, কল্‌কাতায় ফিটেন রথ,
পারিজাতকে করে মাৎ গোলাপ সেঁওতী নাগেশ্বর॥
(ফুলের টবে ধাপে ধাপে শোভা পায় সিঁড়ির উপর)

বরিষায় হয় বজ্রাঘাত,
হেথায় কামান ঝাড়চে দিনরাত,
অপরাহ্নে সায়াহ্নে নিশির প্রভাত,
স্বর্গে আছেন ইন্দ্রের শচী,
এখন শচী দেখ্‌লে হয় অরুচি,
ইংরাজের মিস্ কচি কচি, অঙ্গভঙ্গী বহুতর॥
(গাউন-পরা রুমাল-ভরা এসেন্স-রোজ, ল্যাভেণ্ডর)

উর্ব্বশী কিন্নরী রম্ভা নর্ত্তকী সুন্দরী,
সম সৌদামিনী-জ্যোতি সব সুরনারী ;
কল্‌কাতাতে ওয়ফা-উলী, খ্যাম্‌টা-উলী, টপ খেয়ালী,
মেয়ে-পাঁচালী যাত্রা-উলী গলি গলি তর-বিতর॥
(পেয়ালী টপ্পা-উলী মদ-মাতালী ঘর-ঘর)

পরিষ্কার পথ, নাইকো ময়লা,
সারি সারি গ্যাস-লাইট্ জ্বালা,
চন্দ্রদেবের ষোল-কলা হ'তে উজ্জ্বলা ;
শুক্লপক্ষে উদেন শশী, এর পক্ষপাত নাই কোন নিশি,
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, উভয় পক্ষ নয় অন্তর॥
(চাঁদেতে আর গ্যাসে তুলা কল্লে ইংরাজ কারিকর)

করিয়ে বুদ্ধির কৌশল, পল্‌তা হ'তে আনলে জল,
জলে যত সিংহের বল লক্ষহাত প্রবল ;
ধন্য ব্রিটেন রাজধানী, প্রজার ঘরে বাহিরে সুরধুনী,
অপঘাতে ম'লে প্রাণী, তাহার ভূত-প্রেতের নাইকো ভয়
(যাবে মনের সুখে স্বর্গলোকে হইয়া অমর নর)

আ মরি কি পরিপাটী, ব্রিটেন-রাজী-রাজবাটী
আকৃতিটী বাটী পাঁচটী, ফলতঃ একটী ;
প্যালেস্-অফ্-গবর্ণমেন্ট, শোভা করে জিনি বৈকুণ্ঠ,
গড়ের মাঠে মনুমেণ্ট, পেঁড়োর মন্দিরের সোদর॥
(আগাম্বা সাত-তলা লম্বা, যেন জগদম্বার বাবার ঘর)

ফোর্ট-উইলিয়ম ইংরাজ-কেল্লা,
কামান বন্দুক গুলি-গোলা
চারি পাশে দ্বার খোলা, জল-প্রণালা ;
ষড়্‌যন্ত্র এম্‌নি কল, বিপক্ষ না পায় স্থল,
সেল্-খানায় অস্ত্র-মহল, সোল্‌জার সব ভয়ঙ্কর॥
(ইংলিস্ গোরা, খোস্-চেহারা, রণেতে অতি তৎপর)

আর্টিলারি ক্যাভাল্‌রি
ক্যাপটেন লেফটেন কর্ম্মচারী
জেনারল কর্ণেল মিলিটারী অশ্ব-উপরি।
ধন্য রে ব্রিটিস্-সৈন্য, ত্রিজগতে ধন্যমান্য
সর্ব্ববীর-অগ্রগণ্য স্বয়ং প্রভু কম্যাণ্ডার॥
(শোভে টুপীর উপর শ্বেত ফেদার)

গভর্ণর-জেনারল, বেঙ্গল-গভর্ণর
প্রাইভেট্ সেক্রেটর মেম্বর
এডিকং কম্যাণ্ডর এডমিনিস্‌ট্রেটর রেজিষ্টর
লেজিস্‌লেটিভ ফাইন্যান্স্যাল্
হোম-মিলিটারী জুডিস্যাল্

করেন গভর্ণমেণ্টের অধীন মেরিণ পোষ্ট-মাষ্টার ॥
(জোর দণ্ড ভিক্টোরিয়া জয় তাঁর নিরন্তর)

বৃটিস্ বড় সাহাব, ভাবেন সর্ব্বজীবে সমভাব
কি রাজা কি নবাব, রাখেন সবার সঙ্গেই ভাব ;
প্রজা পীড়ন কল্লে রাজা, বিচারে দেন উচিত সাজা,
বৃটেন-গণের আইন সোজা, মুড়ি-মিছরীর সমান দর ॥
(বাগেতে ছাগেতে জল-পানের এক সরোবর)

ট্রেজারি টাকশাল, হাইকোর্ট টাউন-হল,
পোষ্টাফিস ব্যাংশাল পুলিস সেণ্টপল্,
সল্ট-বোর্ড, বেঙ্গল-হোম, মেটকাফ-হল,
সেলার্স-হোম, হরিণ-বাড়ী চোরের পক্ষে যমের ঘর ॥
(খোয়া ভাঙ্গায়, ময়দা পেসায়, ঘানি টানায় নিরন্তর)

ধন্য ধন টাকসাল, তৈয়ার হচ্ছে নগ্‌দা-মাল,
সুখে থাকুন চিরকাল বৃটেন মহীপাল,
হয় লক্ষ টাকায় এক-শ নোট,
হায় কি কাগজের চোট,
নোটে লালায়িত বাহির ঘর ॥
(বদ্‌লাইয়ের সময়, আপনার টাকায়,
আপনারে করিতে হয় স্বাক্ষর)

জাহাজে-পূর্ণ জাহ্নবীর গর্ভটা
আমদানী রপ্তানী জেটী
মাল তোলার কল পরিপাটী
শোভে কয়েকটী ;
যে মাল ক্রিয়ার হ'তো একমাসে
তাহা হয় এক দিবসে,
ছয়লাপ্‌ জেটীর পাশে পাশে,
কচ্চেন পোর্ট-কমিশনর ॥
(খিদিরপুরে ডক্ হবে, তার পাশেতে খাল খুলিবে
যাবে সাগর বরাবর)

ইষ্টিম্ ভেস্‌ল, রেলওয়ে,
এই সকলের তেজ হেরিয়ে,
বেদ ব্রহ্মা ভোমা হয়ে গেলেন চাপিয়ে ;
অগ্নি জল আর পবনে,
যায় এক মাসের পথ একটা দিনে,
এক কোটী মণ দ্রব্য টানে
নাহি রাত্রি দিন অবসর ॥
(রেলের বাঁশী শুনে আসি জোটে যত নারী নর)

লেজলী-সাহেবের বুদ্ধি নিজ,
হাবড়ার ঘাটে বাঁধে ব্রিজ,
শিল্পবিদ্যা জগদারাধ্যা
হায় কি আজব চিজ ;
ত্রেতায় ভেসেছে পাথর,
ইনি লোহা ভাসান্ জলের উপর,
মাঝে খুলিলে জাহাজ চলে,
অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর ॥
(রেল খুলিবার হেতু হুগলীর সেতু জুবিলী-ব্রিজ নামান্তর)

হচ্টেল্ হোটেল্ কাফি-রুম,
বোর্ডিং লজিঙ্ বেদিং-রুম,
আড্ডা নান্‌বাই, মোগলাই মিঠাই
ইংরেজের বল্-রুম ;
চণ্ডু গুলি বহুতর, ভেটেল্‌নীদের খালি ঘর,
পাখীব্যাচা কাদাখোঁচা
উল্লুক ভল্লুক বুনো নর ॥
(বিলাতী ইন্দুর, কেনেরী, নুরী,
শুক শারী পয়হামার পর)

আম্-হাউস অতিথি-শালা,
কত আছে, যায় না বলা,
রাবণের চিতার মত খোলা,
জ্বলে দু-বেলা ;
আহার প্রস্তুত কাঁচি পাকি,
যার যেরূপ হয় অভিরুচি,
পিষ্টক পায়স মাংস লুচি,
ভারত-আশ্রম ধর্ম্মের ঘর ॥
(ন্যাড়া নেড়ী, খালি বাড়ী, কর্ত্তাভজা স্বতন্তর)

পুলিস-সেক্সন ইষ্টেসন
সহর-যুড়ে নেটিভ্ ইউরোপিয়ন্,
ডি. উইলসন্, কেশব সেন,
আছেন সবচিন্ জেণ্টল্‌মেন্,
গঙ্গাধর সেন, রমানাথ সেন
আরাম করেন পিলে-জ্বর ॥
(হোমিওপ্যাথিকে সুখ্যাতি নিলে সরকার মহেন্দ্র)

এলোপ্যাথিক অলি গলি,
তাখিজ খাঁ, আস্রফ্-আলি,
জগবন্ধু ব্রজবন্ধু হালদার কালী,

ধর্ম্মদাস রামনারায়ণ দাস,
শিবুদাস কৃষ্ণদাস,
নীলমাধব লালমাধব,
কান্তগিরি আর-জি-কর ॥
(আর হাতুড়ে ডাক্তারের ভীড়ে পথ চলা দুষ্কর)

নিকাস হচ্চে ময়লা জল,
ক'রেছে প্রস্তুত ড্রেনেজ্-কল,
ধুলো থামে দিলে জল
স্বতন্ত্র এক কল ;
অগ্নিদেব হ'লে প্রবল
নির্ব্বাণ করে দমকল,
গোরাদের চেহারা দেখে
ভয়ে পলায় বৈশ্বানর।
পালে জল যোগাতে সাধ্যমতে
সাধ্য কি পোড়ে ঘর ॥
(মেসিনেতে দিলে দম্, জোরে করে ঝম্ ঝম্
তেজে বেরোয় ওয়াটর)

সতীর কনিষ্ঠ অঙ্গুলী
কলিকাতায় আছেন কালী
মা কালী কল্‌কাতা-ওয়ালী সর্ব্বমঙ্গলী
শ্যামা মায়ের কি বৈভব
প্রত্যহ হয় উৎসব
ঈশানেতে হয় কাল-ভৈরব
শ্রীপ্রভুনকুলেশ্বর ॥
(কালী ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য দেবগণের অগোচর)

সকল প্রস্তুত কল্‌কাতাতে,
এমন নাই এ ভূ-ভারতে,
একলা মার্টিনের ফণ্ড হ'তে,
তরে জগতে ;
অনাথ-মন্দির ঔষধালয়,
জেলে জেলে অন্ন বিলায়,
ঐ ফণ্ডের ধন, কারাগার হয় মোচন,
ইন্‌সল্‌ভেণ্ট পায় নর ॥
(অন্ধে খঞ্জে টালিগঞ্জে, টিকিট পায় বৎসর বৎসর)

বার মাস নিশি দিবা,
হ'তেছে অতিথি সেবা,
প্রতি ঘরে দেব সেবা
দেবী আর দেবা ;

বাগবাজারে মদন মোহন,
ভক্তগণের জীবন-ধন,
উত্তরে গুপ্ত বৃন্দাবন,
খড়দহে শ্রীশ্যামসুন্দর ॥
(নিত্যানন্দ-সুত বীরভদ্র-সেবিত
তরাতে ভবেরি নর)

স্থানে স্থানে পুরাণ-প্রকাশ,
চতুষ্পাটীতে হয় বিদ্যার অভ্যাস
ঝুলন দোল নিত্য রাস
শ্রীকৃষ্ণ-বিলাস ;
কৈলাস-নাথের লীলা-প্রকাশ,
খিদিরপুরে ভূ-কৈলাস,
হরিসভা বারমাস
সঙ্কীর্ত্তন অষ্ট-প্রহর ॥
(নন্দোৎসব মহোৎসব সাধু-গণের সমাদর)

পল্লী পল্লী দেবালয়
বর্ণিবার সাধ্য নয়
ঔষধালয়, ধর্ম্মালয়, অতিথি-আলয় ;
ইংরেজ ডাক্তার কি মজবুত,
হেরে পলায় যমের দূত,
হাতুড়ে-দাঁটা ছার-ছাপটা
যায় যমের ঘর ॥
(গলায় দড়ী, চেপে গাড়ী
জলে ডুবে মরে নর)

কাশীক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা,
এখন তথাকার লোক অন্ন পায় না,
চোর-বাগানে ক্ষুধিতের নাহি বঞ্চনা ;
রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক রায়
অকাতরে অন্ন বিলায়,
বসৎ-বাটী পরিপাটী,
মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠ-নগর ॥
(চিড়িয়াখানার যে কারখানা, বাণী বর্ণিতে কাতর)

লালা বাবু, আশুতোষ,
মতিলাল শীল, কৃষ্ণ বোস,
পুণ্যবান্ নির্দ্দোষ, অকুতঃ সাহস,
ধর্ম্মময়ী রাসমণি
আছেন বহু দানী মানী,

গুণী জ্ঞানী শিরোমণি অধ্যাপক বিদ্যাসাগর।
(কল্‌কাতার গাছে পাতায় রত্ন গাঁথা,
কোথা লাগে রত্নাকর)

বাগবাজার কুলী বাজার,
বাজারে বাজারে একাকার,
এত বাজার দোকানদার,
কোন রাজ্যে নাইকো আর ;
পাহার-ওয়ালা গলি গলি,
হাতে ল'য়ে পুলিশ ঝুলি,
দেখ্‌লে মাতাল মাতোয়ালী,
ঠেলে ঢুকায় গারদ-ঘর ॥
(উত্তম মধ্যম অধম দিয়ে করে বহু সমাদর)

চিৎপুর-রোড, চৌরঙ্গী-রোড,
মেচোবাজার-রোড, এলিয়ট্‌-রোড,
এস্‌প্ল্যানেড-রোড, ষ্ট্র্যাণ্ড-রোড,
থিয়েটার-রোড, পার্ক-ষ্ট্রীট্‌ ;
ক্লাইভ-ষ্ট্রীট্‌, বিডন্‌-ষ্ট্রীট্‌,
ক্যানিং-ষ্ট্রীট্‌, রাসেল-ষ্ট্রীট্‌
ক্যামাক্‌-ষ্ট্রীট্‌,
জান্‌-বাজার বৌ-বাজার,
বৈটুক-খানা, সার্কিউলর ॥
(অলি-গলির খপরগুলি মিউনিসিপ্যালের গোচর)

গভর্ণমেণ্ট-প্যালেস্‌, ফ্যারারলী-প্লেস্‌,
ওয়েলেস্‌লি-প্লেস্‌, হুমায়ুন-প্লেস্‌,
কত শত আছে প্লেস্‌, কে করে তার শেষ ;
ম্যাঙ্গো-লেন, জিগ্‌জ্যাগ-লেন,
ডিক্রুজ-লেন, ব্রাটুস্‌-লেন,
ভিক্টোরিয়া-টেরেস্‌, এজরা-টেরেস্‌,
সার্পেনটাইন স্বাভেঞ্জর ॥
(লায়ন্স-রেঞ্জ, মিছরী-গঞ্জ, এক্সচেঞ্জ, থইরুমেটর)

পাটের কল, ময়দার কল,
রেড়ির কল, কাপড়ের কল,
সুরকীর কল, জল তোলার কল,
খোওয়া-ভাঙা কল ;
কলাকৃতি ঐরাবৎ
করে এক-দিবসে সোজা পথ,
কলের খুরে দণ্ডবৎ।
জুড়ে গেল গ্রাম নগর ॥
(আনাচে কানাচে কল পেতেছে
দাস দাসী মেলা দুষ্কর)

সেরে দিলে কলে কলে
এর পর বানাবে কলেতে ছেলে,
পুত্রহীন মহীতলে থাক্‌বে না কো মূলে ;
ম'লে করবে বিষয়-ভোগ,
শিশু পাবার এই সুযোগ,
পুত্রহীন-মহারোগ হ'তে হবে অবসর ॥
(একটা ম'লে কল চালালে
দশটা পাবে ফি বৎসর)

কল্‌কাতার যে নিছনি,
বর্ণিতে অশক্ত বাণী,
আর চলে না লেখনী,
সংক্ষেপে ভণি ;
কত রোড, কত গলি,
সাধ্য কি যে তাহা বলি,
ইচ্ছা করে ছবি তুলি,
হ'য়ে উঠা সুদুষ্কর ॥
(অল্প স্বল্পে নূানকল্পে
ভণে দীন খগবর)

কেন এমনটি হইল ?

যখনই মনে মনে ভাবি যে, মা আমাদের, আমরাই তাঁহার গর্ভজাত, তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করিবার দায়িত্ব আমাদের, অথচ অন্য মায়ের সন্তানকে লইয়া আমাদের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে, তখনই প্রশ্নের উদয় হয় যে, কেন এমনটি হইল ?

তাহার একমাত্র উত্তর—আমরা প্রথমে অনুপযুক্ত হইয়াছি এবং আপনাদের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে পারি নাই। তাই অন্য মায়ের সন্তান আসিয়া আমাদের মায়ের সেবা ও পরিচর্য্যা গ্রহণ করিয়াছে।...

নারী-সমিতি

—শ্রীঅমলা দেবী

[৬]

দিন কয়েক পরে। ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহ। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বিজলী তাহার কক্ষে বসিয়া 'নারী-প্রগতি' সম্বন্ধে একখানা বই পড়িতেছিল। পাশের জানালা দিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বড়বাবুর আফিস-কামরায় কেরাণীর মত ভীরু, মন্দ গতিতে প্রবেশ করিতেছিল এবং জানালার ওপারে একটি কঙ্কালসার টগরগাছ হইতে ফুলের মৃদু গন্ধ আসিতেছিল। কিছু দূরে একটি ছাত্রাবাসে কোন বিরহী ছাত্র বাঁশীতে করুণ সুর বাজাইতেছিল এবং বাড়ীর পাশে পোড়ো জমিতে বসিয়া পাড়ার তরুণ দল জটলা করিয়া সুদূর প্রিয়ার উদ্দেশে হাঁকাহাঁকি করিতেছিল।

কাজেই, এ অবস্থায় বিজলীর চোখ যদি 'নারী-প্রগতি' সম্বন্ধে মূল্যবান্ পুস্তকের পৃষ্ঠা ছাড়িয়া কিছুক্ষণের জন্য সামনে জানালার দিকে তাকাইয়া থাকে এবং মন যদি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কঠিন সামাজিক তত্ত্ব ছাড়িয়া হাল্কা হাসি ও গল্পের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিজলী বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া জানালার ধারে আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইল, তারপর সুইচ বন্ধ করিয়া দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। পার্শ্বের কক্ষে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিস মুখার্জ্জী লেখাপড়া করিতেছিল। বিজলী দরজার সামনে দাঁড়াইতেই, সে মুখ তুলিয়া চাহিয়াই চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজলী কহিল, "যে চিঠিগুলো লিখতে বলেছিলুম, লেখা হয়েছে?"

মিস মুখার্জ্জী মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "হচ্ছে, শেষ হয়নি।"

নীরস, গম্ভীর কণ্ঠে বিজলী কহিল, "আজই শেষ করে ফেলা চাই—"

মিস মুখার্জ্জী কহিল, "আজই শেষ হবে কি করে?··· তা ছাড়া এ তো আমারকাজ নয়? মিষ্টার রায় তো এখন কিছু কাজ করলেই পারেন—"

বিজলী কড়া কণ্ঠে জবাব দিল "কি আপনার কাজ, কি নয়, তা' আপনার দেখবার আবশ্যক নেই, মিস মুখার্জ্জী। কাজ করবার জন্যেই যখন মাইনে নিচ্ছেন, তখন আপনার মর্জ্জিমত কাজ করা তো চলবে না, যা বলব, তাই করতে হবে। তা' ছাড়া মিঃ রায়ের সম্বন্ধে আপনার মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই—" বলিয়া গট্‌গট্ করিয়া তেতলায় চলিয়া গেল।

তেতলার বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুইয়া সহকর্ম্মী সুবিমল বাবু জ্যোৎস্না সেবন করিতেছিল। বিজলী আসিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেই বিজলী কহিল, "থাক্ উঠে কাজ নেই—" বলিয়া অদূরে আর একটা ইজি-চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিজলী কহিল, "কেমন আছ?"

সুবিমল জবাব দিল, "ভাল আছি, দিদি!"

—"ওষুধ নিয়মিত ভাবে খাচ্ছ তো?

—"হ্যাঁ।"

—"বল পাচ্ছ বলে মনে হচ্ছে?"

—"হ্যাঁ, এরপর কিছু কিছু কাজ করতে পারব বলে মনে হচ্ছে—"

—"কাজের জন্যে ভাবনা নেই; ও এক রকম করে চলে যাচ্ছে—"

—"মিস মুখার্জ্জীর ভারী কষ্ট হচ্ছে; ছেলেমানুষ, একা সামলাতে পারছেন না বোধ হয়"—বিজলী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,, "তোমাকে বলছিল না কি? কখন দেখা হল?"

সুবিমল কহিল, "না দেখা হয়নি; দেখা হবে কি করে? ওপরে তো তিনি আসেন না—আমি এমনিতেই বুঝতে পারছি—"

বিজলী শুধু কহিল, "ওঃ।" তারপর কিছুক্ষণ দুই-জনেই চুপ চাপ।

কিছুক্ষণ পরে বিজলী কহিল, "এখন দিন কতক সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়াই ভাল, নইলে আবার পড়ে যাবে;

তাতে ক্ষতি আরও বেশী হবে। মিস মুখার্জ্জী অবিশ্যি চায় যে, তুমি এখনই কাজ করতে আরম্ভ কর; তোমার বিশ্রাম তার সহ্য হচ্ছে না বোধ হয়—" বলিয়া হাসিল।

সুবিমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "তার মানে?"

—"এখনই বলছিল, তোমার কাজ কেন সে করবে—"

—"তাই না কি?"

বিজলী কহিল, "জান বিমল! পুরুষ লেখকেরা যে লেখে—নারীদের মনের চাবী দেবতাদেরও নাগালের বাইরে—কথাটা হয় তো কিছু সত্যি। এই দেখ না, মিস্ মুখার্জ্জী যখন এল, কত নিরীহ ভাল মানুষ—কাজে কত উৎসাহ—যা বলি ছুটে তাই করতে যায়—কিন্তু মাস দুই যেতে না যেতেই দেখছি, ওর সম্বন্ধে মত বদলাতে হচ্ছে—"

সুবিমল প্রশ্ন করিল, "কেন? কি করেছে সে?"

—"বিশেষ এমন কিছু করে নি—তবে খুব ভাল মানুষ বলে মনে হচ্ছে না—"

বাধা দিয়া সুবিমল কহিল, "মিস মুখার্জ্জীকে দেখে তো তা' মনে হয় না; আপনি হয় তো ওকে ঠিক বুঝতে পারছেন না—"

তিক্ত হাসি হাসিয়া বিজলী কহিল, "আমি ওকে নিয়ে কাজ করছি, আমি বুঝতে পারছি না, আর তুমি এখানে বসে সব বুঝতে পারছ? তোমার বোধশক্তি খুব প্রখর বলতে হবে, সুবিমল!"

অপ্রতিভ ভাবে সুবিমল কহিল, "আমি অন্যায় বলেছি দিদি! আমাকে মাপ করবেন—"

কিছুক্ষণ পরে বিজলী কহিল, "আচ্ছা বিমল! তোমার কি মিস মুখার্জ্জীর সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল?"

—"কেন বলুন দেখি?"

—"তোমার বাড়ীও তো পূর্ব্ববঙ্গে?"

—"পূর্ব্ববঙ্গে শুধু আমার কেন, দিদি, আরও দুচার কোটী লোকের বাড়ী, তা' বলে কি সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় থাকতে হবে?"

ধীরে ধীরে বিজলী বলিতে লাগিল, "কি জানি, আমার একদিন মনে হয়েছিল—তোমার জ্বরের সময় এক-দিন সমস্ত রাত্রি জেগে শেষের দিকে ইজি-চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছি, কাছেই মেজেতে হরি দা ঘুমুচ্ছে—ঘরে আলো নেই—হঠাৎ কি শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল; চোখ মেলে দেখি, আবছায়া অন্ধকারে, তোমার মাথার কাছে একজন মেয়ে যেন বসে; ভাবলুম হয় তো স্বপ্ন দেখছি; ভাল করে চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলুম, মেয়েটি তেমনি বসে আছে। ডাকলুম, 'কে'? কোন জবাব দিল না; কেমন যেন ভয় করতে লাগল; হরি দাকে ডাকলুম; হরি দা অবিশ্যি উঠল না, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পেলুম, মেয়েটি উঠে ধীরে ধীরে বাইরে চলে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে সুইচ টিপে আলো জেলে দেখি, ঘরে কেউ নেই; বারান্দায় বেরিয়ে এলুম, কেউ নেই; দোতলায় গিয়ে দেখলুম, মিস মুখার্জ্জীর দরজা বন্ধ; ডাকলুম কোন সাড়া নেই। তার পর দিন সকালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে স্পষ্ট অস্বীকার করল। অথচ একটি মেয়ে যে দেখেছিলুম, তাতে ভুল নেই এবং সেই মেয়েটি যে মিস্ মুখার্জ্জী ছাড়া আর কে হতে পারে, ভেবে স্থির করতে পারিনি—"

সুবিমল কহিল, "রাত্রির অন্ধকারে যা' দেখা যায়, দিনের আলোতে সব সময়ে তাকে কি প্রমাণ করা যায় দিদি?"

বিস্মিত কণ্ঠে বিজলী কহিল, "তার মানে?"

—"রাত্রির অন্ধকারে জীবনের খেলা যখন স্তব্ধ থাকে, তখন সারা বিশ্ব ব্যেপে মনের খেলা চলতে থাকে। বিচার-বুদ্ধির জগতে যার দেখা পাওয়া দুরাশা, তারই মন হয় তো রাত্রির অন্ধকারে কত নদী, সাগর, দেশ, মহাদেশ পার হয়ে আমাদের মনকে স্পর্শ করে যায়, দোলা দিয়ে যায়। আবার আমাদের মন আমাদের অজ্ঞাতে কত জানা, অজানা প্রিয়জনের কাছে ঘুরে আসে—"

—"অর্থাৎ তুমি কি বলতে চাও—"

—"আমি বলতে চাই, সে দিন যাকে দেখেছিলেন, বাস্তব জীবনে তার অস্তিত্ব সাক্ষী-সাবুদ দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন না। এমন হতে পারে, আমার কোন প্রিয়জন—যিনি দূরে আছেন, হয় তো বা যিনি ইহজগতে নেই—তিনি হয় তো আমাকে দেখতে এসেছিলেন—আপনি তাঁকেই দেখেছেন—"

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বিজলী কহিল, "কে জানে বাপু, আমি অত বুঝি না; একজনকে সেদিন দেখেছি, সে যেই হোক্। তোমার আপনার লোকেরা যদি মনোপ্লেনে চড়ে এসে দেখে গিয়ে থাকে, আমার কোন আপত্তি নেই। মোট কথা, মিস মুখার্জ্জীর আসায় আমার আপত্তি।"

—"আপত্তি কেন? আমরা দুজনেই সমিতির চাকর। সে হিসেবে, আমার রোগে আমার খোঁজ-খবর নেওয়া তাঁর তো কর্ত্তব্য।"

—"কর্ত্তব্য—কিন্তু দিনের আলোয়, রাত্রির অন্ধকারে নয়। তা' ছাড়া, আমাদের সমিতির কোন তরুণীর তোমার সঙ্গে মেলা-মেশা করা নিষেধ।"

—"আমার অপরাধ?" ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমার ভদ্রতার উপরে আপনাদের যদি বিশ্বাস না থাকে, তা' হলে আমাকে বিদায় দিলেই পারেন।"

—"আমার ছোট ভাই-এর ভদ্রতার উপরে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, ভাই!...তা' ছাড়া তোমার কোন ত্রুটির জন্যে তো এ নিয়ম নয়।"

—"তবে?"

—"আগুনকে আল্‌গা রাখলেই বিপদ ঘটে, লোকে চিরদিন তাই দেখে এসেছে। কাজেই যদি তারা আগুনকে সাবধানে রাখে, তা' হলে তাদের তো দোষ দেওয়া যায় না ভাই। অথচ আগুন ছাড়া জীবনযাত্রাও চলে না, এও তারা জানে।"

—"আপনার কি বিশ্বাস দিদি, নর-নারীর সম্পর্ক দাহ্য-দাহকের সম্পর্ক? কখনও কি তারা সহজ ভাবে, বন্ধুর মত, কম্রেডের মত, মিলতে পারে না?"

—"আমার নিজের বিশ্বাস ঠিক উল্টো। আমার মনে হয়, যে-নারীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান আছে, সে নির্ভয়ে যে কোন পুরুষের সঙ্গে মিশতে পারে।"

—"তবে এ রকম নিয়ম হতে দিলেন কেন? আপনাদের আদর্শ জীবনযাত্রাও যদি air-tight compartment হয়, তবে সনাতন অন্দরমহলে তো বেশ ছিলেন দিদি। সেখান থেকে চলে আসবার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

—"সমিতি তো আমার একার নয় ভাই। আমার নিজের মতেও তাকে চালান যায় না। বেশীর ভাগ সভ্য যা' বলবে তাই করতে হবে।"

—"বেশীর ভাগ সভ্যের যদি এই মত হয়ে থাকে তো বাঙ্গালা দেশে নারী-প্রগতির ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ বলে মনে হয় না।"

বিজলী কহিল, "তা নয় ভাই, তা নয়। বাতে পঙ্গু রোগী যখন প্রথম হাঁটতে থাকে, তখন তার কত সতর্কতা, কত ভয়, কিন্তু মনে তার পরিপূর্ণ আশা, একদিন সহজ মানুষের মত সোজা হয়ে চলতে পারবে। আমাদেরও তো তাই ভাই! কতদিন পঙ্গুর মত কাটাতে হয়েছে বল দেখি। আজ আমরা এই প্রথম চলতে আরম্ভ করেছি, তাই প্রতি পদে আমাদের আশঙ্কা, তাই আড়ষ্ট আমাদের চলবার ভঙ্গী; তবু আমাদের আশা আছে, একদিন স্বাধীন দেশের মেয়েদের মত সোজা হয়ে সহজ, সাবলীল গতিতে চলতে পারব।"

এমন সময়ে মিস মুখার্জ্জী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কতকগুলা খামে মোড়া চিঠি টেবিলের উপর নামাইয়া কহিল, "চিঠিগুলো সব লিখেছি, ঠিকানা লিখতে পারি নি।"

বিজলী গম্ভীর ভাবে কহিল, "পারেন নি কেন?"

—"না জানলে লিখব কি করে?"

—"আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করলেই পারতেন।"

—"কতক্ষণ অপেক্ষা করব? আপনাদের জ্যোৎস্না রাত্রির গল্প কখন শেষ হবে তার ঠিক কি?"

বিজলী চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "চিঠিগুলো নিয়ে যান। ঠিকানার খাতা আমার টেবিলে আছে, নিন গে, আজ রাত্রেই লিখে ফেলা চাই।"

—"আজ আর আমি পারব না, মিসেস মজুমদার। আমার আঙ্গুলগুলো কন্ কন্ করছে, চোখ টন্ টন্ করছে।" বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। মিঃ রায়ের, অর্থাৎ সুবিমলের দিকে তাকাইয়া কহিল, "মিঃ রায়ের শরীর নিশ্চয় খুব ভাল, না হলে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে কবিত্ব করতেন না।"

বিজলী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "মিঃ রায়ের সম্বন্ধে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, মিস মুখার্জ্জী।"

—"দরকার হয়ে পড়ছে যে, মিসেস মজুমদার! উনি যদি বসে বসে বাজে গল্প না করে নিজের কাজ কিছু কিছু করেন তো ওঁর সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার হবে না—" বলিয়া সুবিমলের দিকে তাকাইল। সুবিমলও তাহার দিকে তাকাইয়া ছিল, দুজনে চোখো-চোখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিজলী তিক্তকণ্ঠে কহিল, "মিস মুখার্জ্জী, আপনার মন অত্যন্ত ছোট।"

—"কি করব, মিসেস মজুমদার! ভগবান যেমন করে পাঠিয়েছেন, তার বেশী হবার আমার ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া, উদার হলেই বা আমার চলবে কেন? এই বিদেশে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, যদি আমার অসুখ হয়, কে আমায় দেখবে? মিঃ রায়ের ভাবনা কি, ওর তো আপনি আছেন।"

বিজলী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মিস মুখার্জ্জী, আপনার কথাগুলো ভদ্রতার সীমা পার হয়ে যাচ্ছে, আপনি নীচে যান।"

—"স্বার্থে আঘাত লাগলে সবারই ভদ্রতার মুখোস খসে যায়, মিসেস মজুমদার।"

—"আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন, মিস মুখার্জ্জী। মিঃ রায়ের জন্যে আপনাকে কী বেশী পরিশ্রম করতে হচ্ছে! অধিকাংশ কাজ তো আমিই করে দি।"

—"আপনি করতে পারেন, আমি করব কেন?"

—"আপনি যে এত স্বার্থপর, তা ভাবতে পারি নি মিস মুখার্জ্জী। যাক্ আপনি নীচে যান, কাল থেকে মিঃ রায়ের কোন কাজ আপনাকে করতে হবে না—যান নীচে যান।"

মিস্ মুখার্জ্জী বসিয়া রহিল। বিজলী কহিল, "অবাধ্য হবেন না, মিস্ মুখার্জ্জী। যতদিন এখানে আছেন, ততদিন আমাদের আইন মানবার চেষ্টা করুন। উঠুন, আর এক মিনিট নয়, নীচে যান—" মিস মুখার্জ্জী উঠিল, বিজলী ও সুবিমলের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইল এবং নীচে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিজলী কহিল, "নিজের কাণেই শুনলে তো, বিমল! এ রকম মেয়ে নিয়ে কি করে কাজ চালানো যায়—"

সুবিমল কহিল, "মিস্ মুখার্জ্জী নেহাৎ ছেলে মানুষ দিদি! তা ছাড়া আমার মনে হয়, খুব সরল।"

—"আমরা তো 'তপোবন' খুলিনি মিঃ রায় যে, এ রকম 'সারল্যের প্রতিমা' নিয়ে আমাদের চলবে।"

—"আমার মনে হয়, এর আগে ও কখন চাকরী করেনি, কাজেই চাকরী করবার আইন-কানুন ওর এখনও আয়ত্ত হয়নি। কাজ করতে করতেই ও শিখে নেবে।"

—"ও কবে শিখে নেবে, তার জন্যে আমাদের কাজ তো অপেক্ষা করতে পারে না, মিঃ রায়!"

—"কি করবেন বলুন! আমাদের আফিস-ঘরের দরজাগুলো লম্বায় চওড়ায় ভারী ছোট, কাজেই আমাদের বড় নীচু হয়ে, সঙ্কুচিত হয়ে সেখানে যাওয়া আসা করতে হয়। প্রথম প্রথম সকলকেই ঠোক্কর খেতে হয়, তারপর ক্রমেই অভ্যাসের ফলে আমাদের আয়তন দরজা মাফিক খর্ব্ব হয়ে আসে, তখন যাওয়া-আসা, চলাফেরা করতে কষ্ট হয় না।"

এমন সময়ে সিঁড়ি হইতে মোটা মেয়েলী গলায় কথা আসিল, "বিজলী রয়েছ না কি?" এবং তাহার পিছনে পিছনে কথয়িত্রী প্রবেশ করিলেন—দীর্ঘ স্থূল দেহ, রঙ্গীন সিল্কের সাড়ীতে আঁটসাঁট করিয়া মোড়া, নারী-সমিতির প্রেসিডেণ্ট, সহরের নামজাদা উকীল অনন্ত গাঙ্গুলীর অন্দর এবং তৎসংলগ্ন বুক-পকেটের অধীশ্বরী শ্রীমতী গাঙ্গুলী—কাণে ইলোরা প্যাটার্ণের দুল, মুখে পাউডারের প্রচুর প্রলেপ, গালে রং দিয়া বয়সের ছাপ ঢাকিবার প্রচণ্ড প্রয়াস। বেজায় উঁচু হিলওয়ালা জুতা পরিয়া গোঁড়াইয়া গোঁড়াইয়া আসিয়া হাজির হইলেন। বিজলী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আসুন, মিসেস গাঙ্গুলী, বসুন।" বলিয়া ইজি-চেয়ারটা ঠেলিয়া দিল। মিসেস্ গাঙ্গুলী "থাক্, থাক্" বলিয়া ইজি-চেয়ারটায় বসিয়া পড়িলেন। গুরুভারে অনভ্যস্ত ক্ষীণকায় চেয়ারটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বিজলী আর একটা চেয়ার টানিয়া পাশে বসিল।

বিজলী কহিল, "আপনি অনেক দিন এ দিকে আসেন নি, মিসেস গাঙ্গুলী।"

"কি করে আসব ভাই! (মিসেস গাঙ্গুলীর বয়স চল্লিশের বেশী; তবু বয়ঃকনিষ্ঠাদের সঙ্গে, এমন কি নিজের মেয়ের বন্ধুদের সঙ্গেও, 'ভাই' বলিয়া আলাপ করেন) বাড়ীতে ছেলের অসুখ চলছে—"

কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত বিজলী কহিল, "অসুখ! কই, কিছু খবর জানতে পারিনি তো?"

মিসেস গাঙ্গুলী মনে মনে কহিলেন, "কি করে জানতে পারবে, তোমার কি কোন জ্ঞানগম্যি আছে"; মুখে মোলায়েম কণ্ঠে কহিলেন, "আজ এক মাস হতে চলল, সেই যে মিঃ রায়ের অসুখের সময় একদিন এসেছিলাম, তারপর দিন থেকেই আরম্ভ, তাই আর খোঁজ খবর করতে পারিনি—" মিষ্টার রায়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "আপনি এখন একটু সেরেছেন তো?" সুবিমল ঘাড় নাড়িয়া সারিয়া উঠিয়াছে জানাইল।

মিসেস্ গাঙ্গুলী কহিলেন, "খুব সেরে উঠেছেন বলে তো মনে হচ্ছে না! ও রকম অসুখের পর কি এই সহরে বসে সারা যায়? কোথাও একটু ঘুরে আসুন—"

সুবিমল একটু হাসিয়া কহিল, "কোথায় যাব বলুন? তা ছাড়া ও সব সখ কি আমাদের মত গরীব লোকের পোষায়?"

—"ও কথা বলবেন না, মিঃ রায়। স্বাস্থ্য গরীব বড়লোক সকলেরই সমান প্রয়োজন। গরীবের তো বরং আরও বেশী প্রয়োজন। তা ছাড়া আপনি চিরদিন তো আর গরীব থাকবেন না, আপনার যা শিক্ষা ও সামর্থ্য আছে, তাতে আপনি একদিন বড়লোক হবেনই। গরীব বলে এখন স্বাস্থ্যটি যদি খুইয়ে বসেন, যখন বড়লোক হবেন, তখন আপনার ধনসম্পত্তি ভোগ করবে কে?"

সুবিমল কহিল, "শিক্ষা ও সামর্থ্য থাকলেই মানুষ বড় লোক হয় না, মিসেস্ গাঙ্গুলী।"

—"হয় না স্বীকার করি। কিন্তু যাদের শিক্ষা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সুযোগের শুভ-সংযোগ ঘটে, তাদের জীবনে সৌভাগ্যের ফসল ফলতে দেরী হয় না। এই দেখুন না, আমার স্বামী গরীবের ছেলে ছিলেন, এম. এ., বি. এল. পাশ করে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে টিউশানী করতেন। সেখানে আমার বাবার নজরে পড়ে যান। এখন তিনি সহরের সকলের চেয়ে সেরা উকীল, পঞ্চাশ গিনির কমে টেঁকুর পর্য্যন্ত তুলেন না। কি বল ভাই বিজলী! তুমি তো সব জান—"

বিজলী কহিল, "জানি বৈ কি, মিসেস্ গাঙ্গুলী!" মনে মনে কহিল, "কারও না জানলে নিস্তার আছে কি না—"

মিসেস্ গাঙ্গুলী কহিলেন, "একটা কথা আমার মনে হয়েছে, আমাকে তো ছেলেটাকে নিয়ে কোথাও একবার যেতেই হবে, ডাক্তার মজুমদার কড়া হুকুম জারী করে গেছেন।"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল, "উনিই দেখছেন বুঝি?"

মিসেস্ গাঙ্গুলী দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন, "বা রে! মিষ্টার মজুমদার ছাড়া আমাদের বাড়ীতে দেখবে কে? চাকর-বাকরের জ্বর হলেও আমরা ডাঃ মজুমদার ছাড়া কাউকে ডাকিনে।" সুবিমলের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ কি বলছিলুম—বেশ তো চলুন না আমাদের সঙ্গে? রাঁচীতে প্রকাণ্ড বাড়ী আমাদের, আপনার মত দশ বিশ জন গেলেও আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।"

সুবিমল কহিল, "আপনাকে ধন্যবাদ মিসেস্ গাঙ্গুলী। আমার শরীর এখন অনেক সেরেছে বলে মনে হচ্ছে, কোথাও যাবার দরকার হবে না। তা ছাড়া এর পর কিছু কিছু কাজ করা দরকার, এমনি অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে।"

মিসেস্ গাঙ্গুলী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, "আপনি ভুল বলছেন, মিঃ রায়! আপনার শরীর কিছু সারে নি, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আপনার এখনও একটি মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া উচিত, কি বল ভাই বিজলী!"

বিজলী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

মিসেস্ গাঙ্গুলী বিজলীকে কহিলেন, "আর তোমাকেও বলি ভাই, তোমারও শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে। শুধু কাজ করলেই তো হয় না, কাজের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করা চাই, যেমন ইঞ্জিন চালাতে হলে মাঝে মাঝে জল আর কয়লার যোগান দিতে হয়। তা হলে তুমিও চল না ভাই আমাদের সঙ্গে? বেশ হৈ হৈ করে মাসখানেক কাটান যাবে; শরীর ও মন দুই সুস্থ হবে, চাই কি, ইচ্ছে

করলে ওখানে মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু কাজও করতে পার।"

বিজলী চুপ করিয়া থাকিল।

মিসেস গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন, "বেশ, এই কথা রইল, তোমরা তৈরী হয়ে নাও, দু একদিনের মধ্যে যেতে হবে। তা হলে আজ আসি ভাই বিজলী। রাত হয়ে গেল।" বলিয়া উঠিয়া বিজলীকে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "একবার এস, তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে।"

দোতলায় আসিয়া দুইজনে বিজলীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিল। শ্রীমতী গাঙ্গুলী কহিলেন, "ভারী ফ্যাসাদে পড়েছি ভাই বিজলী! এখন তুমি যদি উদ্ধার করতে পার।"

বিজলী সপ্রশ্নমুখে তাঁহার দিকে চাহিল। মিসেস্ গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন, "আমাদের রেবাকে তো তুমি জান? কতবার সমিতির মিটিংএ এসেছে। ও তো কলেজে পড়ছে—কিন্তু ভাই! ভারী গোপনীয় কথা, কাউকে বলতে পাবে না কিন্তু—"

বিজলী হাসিয়া কহিল, "আপনি বলতে নিষেধ করলে বলব কেন।"

—"হ্যাঁ ভাই! কাউকে ব'লো না। কি বলছিলুম, হ্যাঁ, দিন তো কলেজ যায়, আমরা জানি বেশ পড়াশোনা করছে, করছিলও তো তাই, ইণ্টারমিডিয়েটে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করেছে, কটা মেয়ে করতে পারে ভাই। দু'চার জন বাদ দিলে মেয়েদের মগজে কি আছে, আমরা তো তা জানি।"

বিজলী হাসিয়া কহিল, "মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা খুব উঁচু দেখছি।"

শ্রীমতী গাঙ্গুলী তাড়াতাড়ি কহিলেন, "না-না ঘরোয়া ভাবে বলছি, তা বলে কি পুরুষদের কাছে এ কথা বলি না কি! না সভায় দাঁড়িয়ে এ কথা বলব! আমাকে তেমন পাও নি…যাকগে ও কথা—কি বলছিলুম, হ্যাঁ, রোজ নাকে মুখে ভাত গুঁজে সাত সকালে কলেজ যায়, আমরা ভাবি মেয়ে আমাদের খুব পড়াশুনা করছে, এদিকে ওর বন্ধু ইলাকে জিজ্ঞেসা করে শুনি, একটি দিনও কলেজে যায় না, কে একটা ছেলে, জাতে না কি তাঁতী, তার সঙ্গে সারাদিন সারা সহরে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। ইলা[illegible] না কি বলেছে, আমরা যদি তাঁতীর পোর সঙ্গে ও বিয়ে দিতে আপত্তি করি, তা হলে ওরা এক সঙ্গে গলা ধরাধরি করে জলে ডুববে, নয়ত পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খাবে। কি সাংঘাতিক কথা বল তো ভাই!"

বিজলী কহিল, "ছেলেটি যদি ভাল হয় তো বিয়ে দিতে আপত্তি কি। আপনি তো অসবর্ণ বিবাহ চালাবার পক্ষপাতী।"

—"পক্ষপাতী তো বটেই! তা বলে বামুনের ঘরে ঐ তাঁতীর ছেলেকে জামাই বলে ধরে তুলতে পারব না, ভাই! তোমরা যাই বল।"

মৃদু হাসিয়া বিজলী কহিল, "তা হলে কি করবেন স্থির করেছেন?"

—"সবাই যা করে; একটি স্বজাতির ছেলে দেখতে হবে।"

—"মেয়ে যদি বিয়ে করতে না চায়?"

—"সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা! তোমাকে একটা উপায় করতে হবে।"

বিজলী বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমি কি উপায় করব? আমি তো ঘটক আফিস খুলিনি।"

মিসেস্ গাঙ্গুলী বিজলীর দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিয়া চোখ টিপিয়া শ্লেষের সহিত কহিলেন, "তোমার তো ঘটক আফিসের বাড়া—কেমন দিব্যি একটি ছেলে পুষে রেখেছ!" তারপর সহজভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই বিজলী! ঐ ছেলেটিকে যোগাড় করে দিতে হবে—"

বিজলী কহিল, "আপনি সুবিমল বাবুর কথা বলছেন?"

মিসেস্ গাঙ্গুলী আগ্রহের সহিত কহিলেন, "হ্যাঁ ভাই! ঐ ছেলেটিই—ঐ ছেলেটি তুমি আমাকে দাও, তার বদলে আমি তোমার সমিতিতে মোটা চাঁদা দেব, আরও অনেক মেম্বার যোগাড় করে দেব।"

বিজলী কহিল "সমিতি তো আপনাদেরই, মিসেস গাঙ্গুলী! এর ভাল চিরদিন দেখে এসেছেন, দেখতে হবেও।…কিন্তু আমি কি করতে পারি—"

—"তোমাকে কিছু করতে হবে না, ভাই! তুমি শুধু মিঃ রায়কে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। রেবাও যাচ্ছে; ও রকম ছেলেকে দেখলে মেয়ের আমার তাঁতীর পোকে ভুলতে দেরী হবে না।"

বিজলী নীরব।

মিসেস গাঙ্গুলী অনুনয়ের সহিত কহিলেন, "না ভাই! অমত ক'রো না—আমাদের সঙ্গে চল। তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, অথচ বামুনের মেয়েকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করা হবে। কি বল?"

বিজলী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

মিসেস গাঙ্গুলী নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "আমি তো ভাই তোমাদের সমিতির জন্যে অনেক করেছি, আরও অনেক করতে পারি। কাজেই আমার একটা উপকার করলে তোমাদের মহা পাতক হবে না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, "অবশ্যি মিঃ রায় গেলে তোমাদের একজন লোক চাই। তবে বিজ্ঞাপন দিলে লোকের অভাব হবে না··· বিশেষ এ রকমের চাকরীতে—" বলিয়া মুচকি হাসিলেন।

বিজলী ভাবিতেছিল, হয়তো সব কথা কানে গেল না। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল "আমি একটু ভেবে দেখি; কাল আপনাকে খবর দেব।"

মিসেস গাঙ্গুলী কহিলেন, "বেশী ভেবে লাভ নেই। তোমাকে যেতেই হবে। তুমি গোছগাছ করতে আরম্ভ করে দাও। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না, তুমি নিশ্চিন্ত থেক···আচ্ছা আজকার মত উঠি; কাল আবার হয়তো আসতে পারি, কাজের ভিড় থাকলে নাও আসতে পারি; মোদ্দা তুমি যত শীঘ্র পার ঠিকঠাক হয়ে নাও, দু-একদিনের মধ্যে যেতেই হবে।"

মিসেস গাঙ্গুলী বাহির হইয়া গেলেন। বিজলী সঙ্গে সঙ্গে গেল। গাড়ীতে উঠিয়াও মিসেস গাঙ্গুলী কহিলেন, "আসি ভাই, বিজলী! অমত করলে চলবে না, মনে থাকে যেন।"

মিসেস গাঙ্গুলীর গাড়ী চলিতে লাগিল। গাড়ীতে আর একজন মহিলা বসিয়া ছিলেন, মিসেস গাঙ্গুলীর বোন—বাঙ্গালার বাহিরে জনৈক সরকারী চাকুরের গৃহিণী—বোনপোর অসুখের খবর পাইয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল?"

মিসেস গাঙ্গুলী কহিলেন, "কি জানি ভাই! যে রকম লেপ্টে আছে, ওর কবল থেকে টেনে বের করাই শক্ত।"

—"উনি ডাক্তার মজুমদারের স্ত্রী তো?"

—"হ্যাঁ তাই তো! দেখেছ তো, কি রকম আপন-ভোলা লোক, এ যুগের মানুষ বলে মনে হয় না, কি দাও বা না দাও ভ্রূক্ষেপ নেই।"

—"সত্যি!" নিজের ডাক্তারের কথা স্মরণ করিয়া মহিলাটিকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে হইল। মিসেস গাঙ্গুলী কহিলেন, "ভাল মানুষ পেয়েই না, বিজলীর তড়বড়ানি। আমাদের মত স্বামী হলে ধিঙ্গীগিরি বেরিয়ে যেত।"

মহিলাটি হাসিলেন, পত্নী-আনুগত্যের জন্য মিঃ গাঙ্গুলীর সুনাম স্বল্প নহে।

মহিলাটি কহিলেন, "সত্যিই তো দিদি! পুরুষ মানুষদের পৌরুষ নেই বলেই না আজকালকার মেয়েদের এত বাহাদুরী।"

নিজের কক্ষে ফিরিয়া বিজলী ভাবিতে বসিল। মিসেস গাঙ্গুলীর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল। কি স্বার্থপর মেয়েমানুষ! নিজের কাজের জন্য কাহাকেও কিছু অনুরোধ করিতে লজ্জা করে না। মনে করে, বিশ্বশুদ্ধ সবাই তাহার স্বার্থসিদ্ধির রসদ যোগাইবার জন্য হাঁ করিয়া বসিয়া আছে, ইঙ্গিতমাত্র কুকুরের মত ছুটিয়া হুজুরে হাজির হইবে। কাহারও কোন কাজ নাই, সুবিধা, অসুবিধা নাই।···আর যদি কেহ হুকুম তামিল না করে—তাহা হইলে তাহার আর রক্ষা নাই—মিসেস গাঙ্গুলী এবং তাহার পার্শ্বচারিণীদের হিংস্র জিহ্বাগুলি চারিদিকে এমনি বিষ ছড়াইতে থাকিবে যে, আত্মীয় স্বজনের কাছে পর্য্যন্ত মুখ দেখানো দায় হইয়া উঠিবে, বাহিরের পাঁচজনের কাছে বাহির হওয়া দূরের কথা। অথচ ইহারাই নারী-প্রগতির পাণ্ডা, ইহারাই দেশের ধূলি-লুণ্ঠিত নারীত্বকে তুলিয়া খাড়া করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বাহির হইয়াছে।

বিজলীর নিজের উপরও রাগ হয়। কেন সে ইহাদের ভয় করে? নিজে যদি খাঁটী থাকে তো নিন্দাকে কিসের

ভয়? যদি বা নিজের মতামতকে উপেক্ষা করিয়া নিজের বিবেক-নির্দ্দিষ্ট পথে না চলিতে পারে, তাহা হইলে স্বাধীনতার অর্থ কি? এ কথা সে কিছুতেই ভাবিতে পারে না—সভ্য সমাজে স্বাধীনতার সত্যি কোন অর্থ নাই, মানুষ সভ্যতার স্তরে স্তরে নিজেই নিজেকে শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়াছে, চারিদিকে দেওয়ালের পর দেওয়াল গাঁথিয়াছে—গৃহ, সমাজ, রাষ্ট্র ধর্ম্ম! স্বাধীনতা ও সভ্যতা, এক অপরের পরিপন্থী।

এমন সময়ে বাহির হইতে মিস্ মুখার্জ্জী কহিল, "ভেতরে আসতে পারি কি?" বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিজলী সপ্রশ্ন ও বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইল।

মিস মুখার্জ্জী কহিল, "একটু বিরক্ত করতে এলাম" বলিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিল।

বিজলী কহিল, "দেখুন মিস মুখার্জ্জী! আপনার যা' বলবার একটু তাড়াতাড়ি শেষ করুন, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।"

—"আপনি মিঃ রায়কে নিয়ে না কি চেঞ্জে যাচ্ছেন?"

—"কে আপনাকে বললে?"

—"কে আবার বলবে? নিজের কানে শুনলাম, মিসেস গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার পরামর্শ হচ্ছিল।"

—"আড়ি পাতছিলেন বুঝি? আপনার নব নব প্রকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, মিস মুখার্জ্জী!"

—"মিসেস গাঙ্গুলীর কম্বু কণ্ঠ শুনতে পেতে আড়ি পাততে হয় না, মিসেস মজুমদার! এমনি শুনতে পাওয়া যায়।"

—"কিন্তু তা' হলেও, যে কথা আপনার শোনবার জন্যে বলা হয়নি, তা নিয়ে আলোচনা করতে আসা আমার মনে হয়, খুব ভদ্রতাসঙ্গত নয়, তবে আমরা হলুম সেকেলে. আপনাদের আজকালকার ভদ্রতার আইন বোধ করি বদলেছে।"

একটু চাপা হাসি হাসিয়া মিস মুখার্জ্জী কহিল, "বদ-লেছে বই কি, মিসেস মজুমদার! আপনাদের ভদ্রতার নামে কপটতা আমাদের নাই, আমাদের যা বক্তব্য তা' সোজাসুজি আমরা বলে ফেলি এবং যা' কর্ত্তব্য তা করতে দ্বিধা করিনে।"

—"শুনে প্রীত হলুম, মিস মুখার্জ্জী! এখন আপনার বক্তব্যটা চট করে বলে ফেলুন, যত সংক্ষেপে হয় ততই ভাল, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে।"

—"আপনারা দুজন চলে গেলে, এখানের কাজ চালাবে কে?"

—"সে সম্বন্ধে আপনার দুশ্চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আপনি আপনার নিজের কাজ করবেন।"

বিষাক্ত হাসি হাসিয়া মিস মুখার্জ্জী কহিল, "আর আপনারা কি করবেন?......প্রমোদ ভ্রমণ?"

রাগে বিজলীর মুখ লাল হইয়া উঠিল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "আমার ঘর হতে বেরিয়ে যান, মিস মুখার্জ্জী! যান, উঠে যান, আমার এখানে আপনার মত অভদ্র মেয়ের স্থান হবে না। আপনাকে আমি এক মাস সময় দিলুম, এর মধ্যে অন্য কোথাও চাকরী যোগাড় করবার চেষ্টা করুন—কিন্তু তারপর এক মিনিট এখানে থাকা চলবে না।"

—"থাকতেও চাইনে মিসেস মজুমদার! যত শীগগির পারি চলে যাবার চেষ্টা করব। আপনাদের ভদ্র আব-হাওয়ায় আমার অভদ্র মনের দম বন্ধ হয়ে আসছে—আপনি অপমান করে তাড়িয়ে না দিলেও আমি নিজেই চলে যেতাম।" বলিয়া দ্রুত পদে বাহির হইয়া গেল। [ক্রমশঃ

বুদ্ধির উৎকর্ষ

...বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া কার্য্য-পরিচালনাযোগ্য হইতে হইলে "বুদ্ধি" কাহাকে বলে এবং শরীরের মধ্যে কোথায় তাহার স্থান, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা হইতে পারে একমাত্র কার্য্যস্থলে। কোন্ পুস্তকে কি লেখা আছে, তাহা স্মরণ আছে কি না, তাহার পরীক্ষা দ্বারা প্রকৃত বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করা যায় না।...

ওবেরামারগাও

—শ্রীবরুণকুমার মিত্র

একটি বন্ধুর সঙ্গে 'প্যাশন প্লে'র জন্য জগদ্বিখ্যাত ওবেরামারগাও গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

দক্ষিণ-জার্ম্মানীতে ভ্রমণ করতে করতে ব্যাভেরিয়ার মিউনিক সহরে পৌছুলে, দিনটা যদি পরিষ্কার হয়, ষাট মাইল দূরে আল্পস পর্ব্বতের চূড়া নয়ন-মন মুগ্ধ করে। ইলেকট্রিক ট্রেন বা মোটরবাসে করে মিউনিক থেকে ষ্টার্ণবার্গ লেক অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় পরিবেষ্টিত ওবেরামারগাও গ্রামে যাবার পথ—এই পথের ধারের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলেই এমন এক আশ্চর্য্য ভাবে মন পূর্ণ হয়ে যায়, যাকে স্বর্গীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌছুলে কোফেল শৃঙ্গ এবং শৃঙ্গের উপরে বৃহৎ কাঠের ক্রশ দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মধ্যযুগের ছাপমারা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা ক্ষুদ্র এই গ্রামটি চারিদিকেই পাহাড়-বেষ্টিত। এই পাহাড়ে উঠতে গিয়েই আমার সঙ্গীটি পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত চশমা ভেঙ্গে প্রায় কাণা হবার দাখিল হয়েছিলেন। গ্রামটি এমনই ছোট যে, চশমার দোকান প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না।

দশ বৎসর অন্তর যে বৎসর এই গ্রামে 'প্যাশন প্লে' হয়, সেই বৎসর ছাড়া এই গ্রামে বিদেশীদের এক রকম দেখাই যায় না। কিন্তু ঐ একটি বৎসর এখানে বিদেশীরা ভেঙ্গে পড়ে এবং এই এক বৎসরে গ্রামের অধিবাসীদের প্রচুর আয় হয়। এই আয়ে তাদের পরবর্ত্তী দশ বৎসরের ব্যয়-নির্ব্বাহের সাহায্য হয়, যদিও গ্রামে চাষবাস, পশু-পালন ও কারুশিল্পও আছে।

সমস্ত গ্রামটিই নট-নটীতে ভরা। গ্রামের লোকেদের মাথায় বড় বড় বাবরী চুল, গায়ের রং মেটে এবং মেয়েরা কোনরূপ কৃত্রিম সৌন্দর্য্য-চর্চ্চার ধার ধারে না,—পরিচ্ছদও অনেকটা আমাদের দেশের মেয়েদের মত। আমার তো দেখে মনে হয়েছিল, হঠাৎ বাংলার কোন এক পাড়াগাঁয়ে এসে পৌছেছি। যদিও জার্ম্মানীর দক্ষিণ দিকে আবহাওয়া এখনও বেশ গ্রাম্য, তথাপি জার্ম্মানী হেন দেশে এমন একটি গ্রামের অস্তিত্ব রীতিমত বিস্ময়কর! মনে হয়, মধ্যযুগের ইউরোপকে
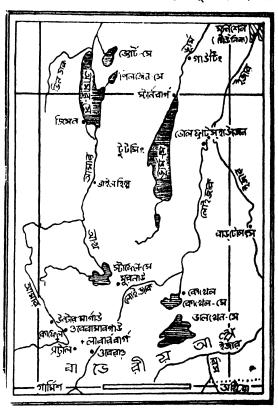
অষ্ট্রিয়ার প্রত্যন্ত-সীমা হইতে মাত্র নয় মাইল দূরে, জার্ম্মানীর দক্ষিণে ওবেরামারগাও। মিউনিক হইতে বিমান-পথে মাত্র ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত এই গ্রামেই পৃথিবী-প্রসিদ্ধ 'প্যাশন-প্লে' গত ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতি দশম বৎসরে নিয়মিত ভাবে অভিনীত হইয়া আসিতেছে।

এরা এই গ্রামের মধ্যে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করেছে—আজ পর্য্যন্ত।

যে 'প্যাশন প্লে'র জন্য দশ বৎসর অন্তর এখানে কম বেশী ৩০০০০০ বিদেশী নরনারী এসে ভিড় করে, হয় তো সকলেই জানেন, তা হচ্ছে যীশুখৃষ্টের জীবনের ঘটনাবলীর অভিনয়। শোনা যায়, এই 'প্যাশন প্লে'র গোড়াপত্তন হয় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে

ভয়ানক প্লেগের আক্রমণ থেকে। সেই সময় গ্রামের সকলে গির্জ্জায় একত্র হয়ে প্রার্থনা জানায় যে, তারা যদি প্লেগের হাত থেকে রেহাই পায়, তা হলে প্রতি দশ বছর অন্তর যীশুর উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করার এবং দেহত্যাগ করার কাহিনী অভিনয় করবে। প্লেগের আক্রমণ না কি বন্ধ হয়ে যায় এবং পর বৎসর প্রথম 'প্যাশন প্লে' অভিনীত হয়।

গ্রামের প্রত্যেকেই এক এক জন অভিনেতা—কেউ সাজে পীটার, কেউ ম্যাডোনা। যে যা সাজে, সে চিরজীবন ধরে বৎসরের পর বৎসর তাই সেজে আসছে। যে যীশুখৃষ্ট সাজে, সে সত্যই তাঁর মত জীবন যাপন করে বলে শুনেছি, অর্থাৎ এরা ক্ষণিকের অভিনেতা নয়—ষ্টেজের বাইরেও এরা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য রেখে চলে। তাই পুরুষের বাবরী-কাটা চুল—মেয়েদেরও লম্বা চুল। এমনি ভাবে জীবন কাটিয়ে এ গাঁয়ের লোকেরা পড়ে আছে একেবারে মধ্যযুগের মাঝখানে। তাই বলে, এরা খুব যে খারাপ আছে, তা নয়। বরং আধুনিকতা-বিধ্বস্ত ইউরোপের অপরাপর অঞ্চল-সমূহের তুলনায় এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা অনেকখানি লোভ-নীয়।

ওবেরামারগাও: সাধারণতঃ যে-পথ নির্জ্জন এবং নীরব, বিদেশীদের ভিড়ে 'প্যাশন-প্লে'র কয়েক দিন সেই পথই জনপূর্ণ ও সরব হইয়া উঠে।

কোন রকম যান-বাহন এ গ্রামে নেই, হোটেলও নেই, সরু সরু পথ মাঠের মধ্য দিয়ে চলে মিশেছে নদীর ধারে, পাহাড়ের গায়।

গ্রামেরই মাঝখানে প্রেক্ষাগৃহ। খুব বড় ষ্টেজ—উপরটা সামনের দিকে খোলা, তবে অডিটোরিয়ামটা ঢাকা। সীটগুলি অত্যন্ত জঘন্য—আমাদের বায়স্কোপের চার আনার সীটের চাইতেও, যদিও একটা সীটের দাম তিন পাউণ্ডের কম নয়। আলাদা সীট বোধ হয় কিনতে পাওয়া যায় না। থাকবার ঘর, খাওয়া ও সীট একই সঙ্গে। যাত্রী যাঁরা আসেন, তাঁদের জন্য বাড়ী আগে হতেই দু'রাত্রির জন্য ঠিক করা থাকে। নিজেরা সব বন্দোবস্ত করলে খরচ হয়ত অনেক কম হয়—কিন্তু এজেন্টের মারফৎ সব ঠিক করা হয়েছিল বলে আমাদের খরচ অন্যায় রকম বেশী হয়েছিল।

তারপর ক্রমোন্নতি হয়ে অভিনয় এখন যা দাঁড়িয়েছে, তা অতি সুন্দর এবং নাট্য-শিল্পের দিক্ দিয়ে খুব উঁচু দরের জিনিষ। অভিনেতাদের নাট্যকলা জানা দরকার, কিন্তু কেবল নাট্যকলা জানলেই এই অভিনয়ের অভিনেতা হওয়া যায় না, অভিনেতার চরিত্রবান্ হওয়া চাই। গ্রামবাসীদের মধ্যে যে অভিনয়ে স্থান পায় না, সে সাধারণের অশ্রদ্ধার পাত্র। অপর দিকে অভিনয়ে যে যীশুখৃষ্ট সাজে, সে পৃথিবীতে সব চাইতে বড় সম্মান পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

ন'টা আন্দাজ সময়ে সবাই আমরা প্রেক্ষাগৃহের দিকে বসবার বালিস হাতে গিয়ে পৌছুলাম। তখনই মনে হল, কত বড় বিরাট ব্যাপার এটা—পৃথিবীর সব জাতই বোধ হয় সেখানে দর্শক আর শ্রোতা হিসাবে জড় হয়েছে। বাস্তবিক

ওবেরামারগাও : 'প্যাশন থিয়েটার' রঙ্গমঞ্চের দৃশ্য

ওবেরামারগাও : প্যাশন-প্লের একটি দৃশ্য—যীশুখ্রীষ্টের শেষ ভোজ (the last supper)।

এই প্যাশন-প্লে সমগ্র ইউরোপে প্রসিদ্ধ। তার অনেকখানি হয়তো প্রোপাগাণ্ডার জোরে। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি

ওবেরামারগাওয়ের রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে যে ব্যক্তি আপাদমস্তক শুভ্র বস্ত্রাবৃত ধর্ম্ম-যাজক, সাধারণ জীবনে সে কামার মাত্র।

কি? এরা নিজেদের যা কিছু আছে, তা যে কত বাড়াতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ জার্ম্মেনী এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। অবিশ্যি, জার্ম্মেনী প্রত্যেক জিনিস এত ভাল ভাবে আর এত বড় করে করে যে, তাও বিস্ময়কর ব্যাপার। এবার অলিম্পিক্‌স্‌-এও তাই দেখলাম। কোথায় লণ্ডনের অলিম্পিক গ্রাউণ্ডস্‌, আর কোথায় জার্ম্মেনীর অত বড় বিরাট অলিম্পিক ষ্ট্যাডিয়াম। এরা যে রকম প্রচণ্ড প্রোপাগাণ্ডা চালাতে পারে, তার সমর্থনে এই সব কাজ ভাল আর বৃহৎ ভাবে করার কথাটাও উল্লেখ করা দরকার।

যাই হোক, দশটায় প্লে আরম্ভ হল। জার্ম্মান ভাষায় – কাজেই বোঝবার বালাই ছিল না। হাতে প্রোগ্রামটিতে প্রায় সব ভাষাতেই তর্জ্জমা ছিল, তাই থেকে সব অবশ্য বোঝা যেতে পারত। কিন্তু দেখা এবং পড়া দুটো এক সঙ্গে হয় না বলে, ব্যাপারটা কতকটা আন্দাজী হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি।

প্রথমেই জুড়ীর মত প্রায় ৫০ জন মেয়ে এবং ছেলে এক সারে ড্রিলের ভঙ্গীতে দাঁড়াল, মাঝখানে একজন বুড়ো গোছের লোক। পরেই কি অভিনয় হবে, তার সম্বন্ধে সে একটা ধর্ম্মমূলক বক্তৃতা দিল। তারপরেই ৫০ জনের কোরাস্‌ এবং আলাদা আলাদা দুজনের গান হল। অত্যন্ত উঁচুদরের operatic গান বলে মনে হল। এই কোরাসের আবির্ভাব প্রত্যেক অঙ্কের পরই হয়েছিল। কেবল শেষ অঙ্কে, যার আগে যীশুর মৃত্যু ঘটে গেছে,—এই কোরাস কাল পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে এসেছিল। বাকী কয় অঙ্কে সাদা পরিচ্ছদ।

দৈনন্দিন জীবনে যে কুমার, রঙ্গমঞ্চে সে ইহুদী ধর্ম্মযাজক অ্যানাস্‌। যীশুখ্রীষ্টের বিরুদ্ধে সদম্ভে অভিযোগ আনয়ন করিবার দৃশ্যে ইহাকে দেখিলে কল্পনাও করিতে বেগ পাইতে হয় যে, জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ইহাকে মৃৎপাত্র তৈয়ারী করিতে হয়।

এই কোরাসের পর প্লে আরম্ভ হল। প্রথমেই সেই (synagogue ইহুদী ধর্ম্ম-সম্মেলন) পরিষ্কার করার দৃশ্য

তারপরে ক্রমে ক্রমে বাইবেলে যা আমরা পড়ে থাকি, তা সমস্তই দেখান হল। যীশুর ধর্ম্মপ্রচার, তাঁর বিচার, ক্রুশ-

রঙ্গমঞ্চের সেণ্ট পিটার দৈনন্দিন জীবনে গোয়ালা 'হুবার্ট'—গ্রামে সে কেবল দুধই বিক্রয় করে না, চারিদিকে, বিশেষতঃ শিশুদের দলে হাসি ও গানও বিতরণ করে।

বিদ্ধকরণ এবং শেষে পুনরাবির্ভাব। প্রত্যেক অঙ্কের অবসরে Old Testament থেকে এবং Book of Kings থেকে এক একটি বিষয়ের tableau (tableau-vivant) দেখান হল। এই tableau গুলির প্রত্যেকটিতে অন্তত ২৫-৩০ জন করে ছিল। শিল্পকলার দিক থেকে এগুলি কত যে উঁচুদরের হয়েছিল, তা আমার বন্ধুর মন্তব্য থেকেই প্রকাশ পাবে। তিনি কয়েকটা tableau খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে সাব্যস্ত করলেন, সেগুলি মোমের বা মাটীর পুতুল! তিনি এতদূর স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলেন যে, আমার সঙ্গে এক পাউণ্ড বাজী পর্য্যন্ত ধরলেন। বাজী অবশ্য তিনি হেরেছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

বেলা পাঁচটা আন্দাজ প্লে শেষ হল। হাত পা অতক্ষণ ওই রকম কাঠের চেয়ারে বসে প্রায় অবশ হয়ে উঠেছিল।

ষ্টেজের উপর অভিনেতাদের কোনও রকম মেক-আপ নেই দেখে এবং ষ্টেজের বাইরেও তাদের একই রকম দেখে এটা ভুলে যেতে হয় যে, তারা বিংশ শতাব্দীর লোক। যে ক্রাইষ্ট সেজেছিল, তাকে সত্যই একজন অতি-মানুষ বলে মনে হয়।

একটা ব্যাপার বড় চোখে বিশ্রী ঠেকল। ক্রাইষ্টকে যখন ক্রুশবিদ্ধ করা হয়, তখন তার পরণে মাত্র একটা কৌপীন গোছের ছিল, কিন্তু বাকী গায়ে একটা গেঞ্জীর আবরণ ছিল—যেটা হয়ত রাত্রে ফুটলাইটের আলোয় সাধারণ ষ্টেজে চোখে পড়ত না, কিন্তু এখানে বেশ চোখে পড়েছিল এবং অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকছিল, অস্বাভাবিক বলে।

রঙ্গমঞ্চের এই অভিনয় ওবেরামারগাওয়ের দৈনন্দিন

'বুবি' হেনিগ্: বয়সে অতি শিশু, কিন্তু পিতার সংসারের যাবতীয় কাজ ইহার দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। রঙ্গমঞ্চে শিশু-অভিনেতাদের মধ্যে 'হেনিগ্' নামকরা অভিনেতা।

জীবনযাত্রার উপর কি প্রভাব বিস্তার করে, তার একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি।

যে জুডাসের পার্ট অভিনয় করে, সে বেচারীর উপর গ্রামের অনেকে কেবল ঐ পার্ট অভিনয় করার জন্যই অত্যন্ত বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে, লোক হিসাবে সে যত ভালই হোক। এমন কি, সে যে বাড়ীতে থাকে, লোকে সে বাড়ীর চৌকাঠ পর্য্যন্ত মাড়াতে চায় না। পূর্ব্বে অনেকে তাকে আঘাত করবার চেষ্টাও করেছিল।

ওবেরামারগাও-এর সকলেই 'প্যাশন-প্লে'তে মনোমত পার্ট পাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু সকলের আশা মেটে না। চব্বিশ জন সদস্য নিয়ে প্যাশন প্লে কমিটী গঠিত হয়, এই কমিটী সকল অভিনেতা নির্ব্বাচিত করে। নির্ব্বাচনের পর কেউ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কেউ আশাভঙ্গের বেদনা অনুভব করে।

গ্রামের সকলেই যদিও কম-বেশী বাইবেলোক্ত ব্যক্তিদের মতই জীবন যাপন করে, প্যাশন প্লে'র ছ'মাস পূর্ব্বে অভিনেতা নির্ব্বাচন সমাপ্ত করে তাদের রিহার্সাল আরম্ভ করা হয়, যাতে প্লে একেবারে নিখুঁত হয়।

সিনেমাতেও বাইবেলের গল্পের ভিত্তিতে রচিত ফিল্ম দেখেছি, কিন্তু এই 'প্যাশন-প্লে'র সঙ্গে সে সমস্তের তুলনাই হয় না। এতবড় একটা বৃহৎ ব্যাপারকে এমন স্বাভাবিকভাবে অভিনয়ের মধ্যে রূপ দিতে গেলে যে সাধনার দরকার, তা ওবোরমারগাও-এর কৃষকদেরই আছে। এরা বহির্জ্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, দৈনিক জীবনেও প্রাচীন কালের অভিনেতা হিসাবে ইস্রায়েলদের মত থাকে এবং এদের সকলের কাছেই জীবনে 'প্যাশন-প্লে'র সাফল্যের চেয়ে বড় কিছু নেই।

আধুনিক ইউরোপের একটি গ্রামে এই শ্রেণীর জীবন-যাপনে রত একদল কৃষক সমস্ত ইউরোপের আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে রয়েছে, এ কথা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই না ঘটে।

আঁধারে জ্যোতির রেখা

—শ্রীঅনীশ রায়

আকাশে নেমেছে গভীর কালিমা নেমেছে বরষাধারা,
তুমুল ঝটিকা তাথৈ নাচিয়া চলিছে পাগল-পারা।
আঁধার নেমেছে সহসা অকালে ধরণীর এই পারে,
ওপারের কোলে অস্তরবির গৌরব পারাবারে।

*

নাচিয়া গাহিয়া চলে যায় যত রূপের পরীর রাণী,
আকাশে পবনে সেথা জানি শুধু অস্ফুট কাণাকাণি।

*

জানি জানি আর এ পারে আমার আঁধারে জ্যোতির রেখা,
আবছা উষায় মেঘের মাঝারে লিখে যেতে চায় লেখা।
মেঘেতে মেঘেতে গভীর কালিমা পিছনে প্রখর আলো,
পিছনেই যেন মনের মাধুরী সুমুখে বরণ কালো।

*

ও কালো মেঘের এ গভীর বাণী আসিয়াছে আজি কাণে,
কালোরে ভুলেছি পিছনের আলো মধুর বারতা জানে।

*

এই বারিধারা সুন্দর ঝরা নাচিয়া পড়িবে ধারে,
সফল এ ধরা উঠিবে মুঞ্জি অরূপ-পুলক-ভারে।
গরবিণী নদী থমকি' থমকি' চলিবে গরব-ভরে,
যৌবনমদে গরবা নারীর অপরূপ ছল-ভরে।

*

সমগ্র নভ উঠিবে বিকশি যূথিকা-ফুলের মত,
আকাশে আকাশে বাণ ডেকে আসে শুভ্র কিরণ যত।

*

আঁধার নাশিয়া নামিবে আলোক আসিবে রঙের খেলা,
গরবে নাচিবে মরালের মত জীবন-নদীর ভেলা।
পলকে উঠিবে সকল ভুবনে একটি উজল হাসি,
শুষ্ক-তৃণেতে উঠিবে মুঞ্জি অরূপ পুষ্পরাশি।

সাহিত্য ও সমাজ

—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ

জীববিদ্যা লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা বলেন মানুষ primate শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীতে আছে কয়েক প্রকার বাঁদর ও মানুষ। এই হীন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া আজ যে গুণে মানুষ সৃষ্ট জীবের মধ্যে প্রধান, তাহা হইতেছে তাহার জানিবার এবং জানিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা। এই দুই ইচ্ছা হইতে মানুষের ভাষা, সমাজ, সাহিত্য ও প্রতিপত্তির উদ্ভব। এই ইচ্ছার নিদর্শন যুগে যুগে পাওয়া যায়, এমন কি ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও স্পেনের পর্ব্বত-গুহায় ও পশুকঙ্কালের উপর মানুষ এই প্রকাশের সঙ্কেত রাখিয়া গিয়াছে। আদিম মানবের নিভৃত কন্দর হইতে উৎসরিত এই দুই ক্ষীণ ধারা কালে মিলিত হইয়া বিশালকায়া হইয়া কৃষ্টি বা সংস্কৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সংস্কৃতি অর্থে আমরা মোটামুটি বুঝি মন ও হৃদয়ের প্রসার। প্রসারিত মন বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ছুটে, জগৎকে দেখিতে ও চিনিতে চায়, প্রসারিত হৃদয় নানা দেশে অবস্থিত মানব-সমাজকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসিতে শিখে। হৃদয়ের প্রসার লাভ হয় মানুষের সঙ্গে মিশিয়া, তাহার শিল্প ও সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া। কিন্তু যখন মনের ভাব, অনুভূতি ও উপলব্ধি লেখার আকার পায় নাই, তখন এই প্রসারলাভের এক মাত্র উপায় ছিল মানুষের কাছে যাওয়া, তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহা, তাহার সাহচর্য্য লাভ করা। বহুদিন এমন করিয়া কাটিয়া গিয়াছে এবং এই অতি প্রাচীন অভিজ্ঞতার নিদর্শন রহিয়াছে প্রবাদে "মানুষের কুটুম—এলে গেলে।" কিন্তু মনের ভাবকে শুধু শব্দের বাঁধনে রাখিতে মানুষের ভাল লাগিল না, সে তার অশরীরী ভাবকে রূপ দিল এবং বিপুল আনন্দে তাহার নাম রাখিল অক্ষর, অর্থাৎ ক্ষরণশূন্য—যাহা অব্যয়, অক্ষয়।

এই অভিনব সঙ্কেত কোন্ দেশে কবে বাহির হইয়াছিল তাহার খোঁজ মানুষ পায় নাই। ইহা ভারতে কবে হইল এবং কোথা হইতে হইল, উহা সেমিটিক্ জাতি হইতে গৃহীত, কিংবা দেশীয় ছবি-অক্ষর হইতে উদ্ভূত, যজুর্বেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে "লিপিবিদ্যা" ও পাণিনিতে "লিবিকর" ও "লিপিকরের" অর্থ কি, জাতকে "অক্ষরিকা" ও ত্রিপিটকে "লেখ" বা "লেখক" শব্দ আছে কি না, এই সব পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা লইয়া এখানে আমাদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। ফল কথা, এই আবিষ্কারের সঙ্গে মানব-ইতিহাসে এক নূতন যুগ আসিল। আমার মরণের সঙ্গে আমার বাণী আর বিকৃত হইল না, লোপ পাইল না; তাহা অক্ষয় হইয়া রহিল। সাহিত্যের সৃষ্টি হইল এই সব রচনার মূল উৎস মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক জ্ঞাপনের ইচ্ছা। কিন্তু কোন জিনিষ জানাইতে হইলে অন্যের নিকট তাহা জানাইতে হয়—অন্যের উপযোগী করিয়া, অন্যের বোধগম্য করিয়া, উপকার করিয়া তাহা প্রকাশ করিতে হয়। এই যে অন্যের বা আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ মানব-সমাজের প্রতি সহানুভূতি, ইহা হইতে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। একটা বুঝাপড়া হইল; যেহেতু একের অন্যকে প্রয়োজন, সেই জন্য যাহা সাহিত্য হইবে, তাহা সমাজ বুঝিতে পারিবে, তাহা সামাজিক কল্যাণে লাগিবে। মানব-সমাজের আশা, ভরসা, উদ্যম ও অবসাদ, ত্রুটি, স্খলন, সব সাহিত্যের মধ্যে স্থান পাইয়া তাহা সমাজকে সত্যের পথে লইয়া যাইবে। ইহাও ঠিক হইল যে, কোন্ লেখা হিতকর কি অহিতকর, সে প্রশ্নের শেষ বিচার হইবে সমাজের রাজদ্বারে।

প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বহুদিন ধরিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে এই নীতির প্রচলন ছিল। সেই জন্য যিনি সাহিত্য সৃষ্টি করিতেন, তাঁহার মধ্যে থাকিত আত্মসংযম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্যক্ জ্ঞান। যেখানে এই দুইটির একটির অভাব হইত, সেখানে লেখাকে সাহিত্য-স্তরে স্থান দেওয়া হইত না, সেখানে বস্তু রসসম্ভারযুক্ত হইত না এবং যে সব বস্তু রসস্তরে না পৌছায়, তাহাদের সাহিত্যের উপযোগী উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা হইত না। এই সব

যে নিয়ম ছিল তাহা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া—সে উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজের কল্যাণ। নিরুদ্দেশ, নিজস্ব, বেপরোয়া সাহিত্য তখন সৃষ্টি হয় নাই, কারণ তখন সমাজ-বন্ধন ছিল অটুট। আজকাল যে কথা লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে খুব সমালোচনা হয় এবং যাহার জন্য বুক ফুলাইয়া গর্ব্ব করা হয় যে, সরস্বতী অসতী হইলেও যায় আসে না, যদি তার রূপ ও সৌন্দর্য্য থাকে, সেই art for art's sake-এর ধারণা পূর্ব্বে ছিল না। সৃষ্টির আদিম প্রাতে মানুষের পদ্য ও শিল্প ধর্ম্ম-জীবনের সহিত নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল, কারণ সেই স্থান হইতেই তাহার উৎপত্তি এবং যতদিন সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল কোন এক বিশিষ্ট বন্ধনে, ততদিন এই নূতন রীতির কথা কেহ তুলে নাই। অন্য দেশেও নয়, ভারতবর্ষেও নয়। কুমারস্বামী এই কথাই বলিয়াছেন: হিন্দুরা কখনও art for art's sake-এ বিশ্বাস করিত না, য়ুরোপের মধ্যযুগের ন্যায় তাহাদের শিল্পকলা হইত লোককে ভালবাসিয়া। তাহারা ঐহিক ও পার-লৌকিকের মধ্যে পার্থক্য করে নাই। তাহারা যে চেষ্টা করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে যায় নাই, ইহাতে আমি ।। প্রায় সমস্ত হিন্দু শিল্পকলাই ধর্ম্মপ্রাণযুক্ত। ("The Hindus have never believed in art for art's sake, their art like that of mediaeval Europe, was an art for love's sake. They made no distinction between sacred and profane. I am glad to think that they never consciously sought for beauty. Almost all Hindu art is religious.")

সাহিত্য-স্রষ্টার চরম লক্ষ্য ছিল সমাজ এবং সমাজের রাজদ্বারে তাঁহার বিচার হইত। ইহার মুখ্য কারণ এই, যে-সমস্ত লেখা সাহিত্য-স্তরে উঠে, তাহার মালমসলা যোগায় সমাজ এবং স্রষ্টার মনোভাব গড়িয়া তুলে সমাজের পরিবেশ। সাহিত্যিক স্বয়ম্ভূ বা দেশকালাতীত নন, তিনি বিশ্বমানব নন, তিনি কোন এক বিশিষ্ট সমাজের জীব, সেই সমাজের রীতি-নীতি ও ভাবধারা লইয়া তাঁহার কারবার, সেই সমাজের জলবায়ুতে তিনি মানুষ। এই পারিপার্শ্বিক গ্রহণ বা বর্জ্জন করিয়া তাহার প্রতি আনুগত্য স্বীকার বা বিদ্রোহিতা করিয়া তিনি লিখিবার অনুপ্রেরণা পান। লেখকের মনোভাব ও সমাজের অবস্থা, এই দুইয়ের সুখকর সংমিশ্রণে হয় সাহিত্যসৃষ্টি। তাঁহার মন ও শক্তি সমাজের দ্বারা বহুপরিমাণে রঞ্জিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, এ কথা আজকাল অনেকেই স্বীকার করেন। সেই-জন্য শেষ পর্য্যন্ত সমাজই দেখিবে যে, কোন্ প্রকার সাহিত্য মানবের কল্যাণ বা অকল্যাণ করিতেছে, যাহা সত্য, স্বাভাবিক ও সুন্দর তাহা লইয়া চর্চ্চা করিতেছে, না, যাহা অলীক, অস্বাভাবিক ও কুৎসিত, তাহারই আলো-চনায় সময়ের অপব্যবহার করিতেছে। সমাজই বিচার করিবে, তাহা সমাজ-জীবনকে পুষ্ট, বর্দ্ধিত, ফলচ্ছায়া-সমন্বিত করিতেছে, না, তাহা শুধু পরগাছা হইয়া অনিষ্ট সাধন করিতেছে। যাঁহারা মনে করেন, সমাজের এ অধিকার নাই, আছে শুধু তাঁহাদের, যাঁহারা দুই চারিখানি রোমাঞ্চকর কামোদ্দীপক নভেল নাটক লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত,—তাঁহারাই ত অপরাধী; চোরের বিচার চোরে করে না, করে বিচারক, সমাজের মুখপাত্র হইয়া।

সমাজ যখন অখণ্ড থাকে, সমাজের মধ্যে ঐক্য থাকে, জীবনধারার ও চিন্তার সাদৃশ্য থাকে, যখন প্রধান প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে ঐকমত্য থাকে, এক কথায় যখন সমাজ-জীবন এক সূত্রে গ্রথিত থাকে, তখন বিচার সুগম হয় এবং বিচারের ফলে শাস্তি বা পুরস্কার দানও সহজ হইয়া উঠে। তখন প্রকৃত সাহিত্যসৃষ্টির পথও সুগম হয়। লেখক ও পাঠকের মধ্যে ভাবধারার সামঞ্জস্য থাকায় লেখা বুঝিতে কষ্ট হয় না, পরিস্থিতির আনুকূল্যের জন্য লেখক অনুপ্রেরণা পান, আর পাঠক পান সহানুভূতি। কিন্তু যখন সমাজ শতধা বিখণ্ডিত, লোক পরস্পরের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, তখন বিচার করিবার কেহ থাকে না এবং থাকিলেও বিচারের রায় কেহ মানে না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তখন আসে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সাহিত্যস্রষ্টা প্রতি পদে পদে বাধা পান। কিন্তু তিনি যদি শক্তিমান হন, তখন তাঁহার লেখার দম্ভ এবং অস্বচ্ছন্দতা থাকা সত্ত্বেও, সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে মন জাগরূক থাকায়, তাঁহার লেখার মধ্যে বিধ্বস্ত সমাজের কল্যাণের প্রচেষ্টা থাকে, যে পথে যাইলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে, তাহার নির্দ্দেশ থাকে। ইহার দ্বারাই ধ্বংসোন্মুখ সমাজ পুনর্জ্জীবন লাভ করে। কিন্তু

যে সব লেখক শক্তিহীন, কিংবা শক্তি থাকিয়াও যাঁহাদের মনে পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা থাকে না, যাঁহারা মোহান্ধ হইয়া নিজ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, সেই সব লেখক সমাজের দুর্দ্দিনে নিজেকে একাকী, নিঃসহায় ও বিদ্রোহী মনে করেন। সমাজ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় মূল সূত্রের অনুসন্ধান তাঁহারা পান না, তাই নিজের বা শ্রেণীবিশেষের অনাচার, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার লেখার প্রধান উপাদান হয়। তাঁহারা চিরন্তন পথ ছাড়িয়া দিয়া মুহূর্ত্ত-বাদী হইয়া পড়েন—মুহূর্ত্তের সুখ, দুঃখ, হাব, ভাব, চিন্তা ও অনুভূতিকে অনন্তের রঙে রঞ্জিত করিতে চেষ্টা করেন। অনেক সময় আবার কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিজের কুক্ষির মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করিয়া নিজের সংবেদন, অনুভূতি, উপহতি লইয়াই মসগুল হইয়া পড়েন, সেই গুলিরই চুল-চেরা ভাগ করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, সেই সব কৃত্রিম মনোভাবকে চরম সত্য বলিয়া মনে হয়। ইহাতে ভাবশুদ্ধি না হইয়া ভাবাবেশের আধিক্য হয়—ইংরাজ সমালোচকের কথায় বলিতে গেলে "emotionalism becomes an end in itself". আবার যখন দেখা যায় যে, এই পথে আর বেশী দূর যাওয়া চলে না, তখন কেহ কেহ নিছক বিয়োজন বা abstraction লইয়া তৃপ্তিলাভ করেন। ফলে এইরূপ পরিবেশের মধ্যেও এই শ্রেণীর সাহিত্যিকের হাতে যে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা নিতান্ত সৌখীন আত্মাভিব্যক্তি হইয়া পড়ে, পঙ্গু সমাজের কল্যাণে আসে না। সমাজ-জীবন গড়িতে হইলে কোন্ জিনিষ ধরিয়া রাখা নিতান্ত প্রয়োজন এবং কোন্ জিনিষকে বর্জ্জন আবশ্যক, এ সম্বন্ধে সে সাহিত্য কোনই নির্দ্দেশ করে না, তাহাতে সামাজিক ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনর্লাভের কোন চেষ্টা থাকে না এবং তাহা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর ও দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য হয়। এই শ্রেণীর লেখকেরা কল্পনাপ্রসূত অনুর্ব্বর বালুকারাশির মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করেন। উটপক্ষীবৃত্তি অবলম্বনে যে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, তাহা অল্পকালের মধ্যেই শুকাইয়া যায়, কারণ তাহার সহিত মৃত্তিকার সংযোগ নাই, শুষ্ক বালির উপর মহীরুহ জন্মায় না। বিধ্বস্ত সমাজের চিত্র তাহাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সমাজ-জীবনের মূল সূত্রের সন্ধানের চেষ্টা তাহার মধ্যে নাই বলিয়া তাহা সমাজের কল্যাণে লাগে না।

সমাজ-জীবনের সহিত—সে জীবন যতই পঙ্গু হউক না কেন—যোগসূত্র ছিন্ন হওয়ায় এই শ্রেণীর সাহিত্য লেখার ভঙ্গীও অন্যরূপ হইয়া যায়। তাঁহারা যখন লেখেন, তখন সমাজকে মনের সামনে রাখেন না, রাখেন তাঁহাদের সমধর্ম্মাবলম্বী দু চারজন বন্ধুবান্ধবকে। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে লেখা এবং যে ভাষায় লেখা হয়, তাহা তাঁহাদেরই শুধু বোধগম্য। অবশ্য সমস্ত লেখাই অপরের উদ্দেশ্যে, তবে এই "অপর" অর্থে আমি, তুমি, আমার অভিন্ন-হৃদয়, সহধর্ম্মী দু পাঁচ জন হইতে পারে, আবার অপর অর্থে আমি ছাড়া আমার ভাষা যাহাদের নিকট পরিচিত, সেই বিশিষ্ট মানব-সমাজও হইতে পারে। এই কথাটির অর্থ-গ্রহণের উপর লেখার ভাবভঙ্গী অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যাঁহারা এই সঙ্কীর্ণ অর্থে লয়েন, তাঁহারা লিখেন গণ্ডীর ভাষায়—যে ভাষা গণ্ডীর বাহিরের লোকের বুঝা শক্ত হইয়া পড়ে। Swift যে ভাষায় Stellaকে চিঠি লিখিতেন, সে ভাষা কয়জন বুঝে? সম্প্রতি Ezra Pound যে ভাষায় Canto লিখিয়াছেন, সে ভাষা বুঝিতে হইলে শুধু পাউণ্ড-পন্থী হইলে চলিবে না, পাউণ্ডে যাইতে হইবে। গণ্ডীর ভাষায় লিখিয়া যখন আমি পুস্তক ছাপাই, তখন বুঝিতে হইবে, হয় সমাজ নাই, কিংবা যদি থাকে, তার অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। এইরূপ মনোভাবের জন্য লেখক ও পাঠকের মধ্যে পরিভাষা বিভিন্ন হয়। পাঠকের আলস্য এবং লেখকের শক্তিহীনতা কিংবা ভাষা লইয়া পরীক্ষার উৎকট বাসনা ক্রমে এই পার্থক্য বৃদ্ধি করে। লেখক ভাষার সম্পদ্‌বৃদ্ধির ও সংস্কারের অজুহাতে এমন এক আড়ষ্ট, জাতিহীন, দুরূহ, দুর্ব্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করেন যে, তাহা পড়িয়া বুঝা যায় না, তিনি ভাষার সংস্কার না সৎকার করিতেছেন!

বর্ত্তমান কালে যে সাহিত্য য়ুরোপে আসর জমকাইয়া বসিয়া আছে, সে এই প্রকার সমাজহীন সাহিত্য,—অন্য প্রকার যে সব সাহিত্য রচনা হইতেছে, তাহারা আছে নেপথ্যে। বহু শতাব্দী ধরিয়া অবিদ্যার অনুসরণে এবং মহাজনের অমানুষিক উৎপীড়নে বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত য়ুরোপে এমন এক পরিস্থিতি আসিয়াছে, যাহার ফলে সমগ্র সমাজ বিচ্ছিন্ন ও কেন্দ্রচ্যুত। যে ঐতিহ্য, নীতির ও ধর্ম্মের বন্ধন

মধ্য-যুগে সমগ্র য়ুরোপবাসীকে একসমাজভুক্ত করিয়াছিল, তাহারা এখন শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাহাদের তেমন আর কার্য্যকরী শক্তি নাই, সেই জন্য তাহাদের বাতিল করিয়া দিবার প্রস্তাব চলিয়াছে। যাঁহারা হঠকারী, তাঁহারা খুব উৎসাহ পাইতেছেন, যাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। Gide তাঁহার পুস্তক The Counterfeiters-এ বলিয়াছেন, "If the salt hath lost its savour, wherewith shall it be salted ?—that is the tragedy with which I am concerned."

এই পঞ্চমুখে গীত সাহিত্যের মধ্যে আদিম বন্ধনী খসিয়া পড়ায় কোন খেদ দেখা যায় না, বরং একটা মুক্তির উল্লাস দেখা যায়। সমাজ এত দিন যে উদ্দাম ব্যক্তিত্বকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ সে সাবালক হইয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা যে অন্যায় করিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। সেই জন্য সমাজের প্রাচীন বন্ধনী শ্লথ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত জিনিষ বনচারী মানবকে পশুত্ব হইতে উন্নত করিয়া সভ্য করিয়াছিল, সেইগুলির বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান চলিয়াছে। সেইগুলিই হইয়াছে এখন অনাবশ্যক, হীন ও হেয়, আর মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিই হইয়াছে অত্যাবশ্যক, শ্রেয়ঃ ও পূজ্য। তাহার ষোড়শোপচারে আরাধনা চলিয়াছে। তাঁহাদের এই আদিম প্রীতির মধ্যে কিন্তু অনেক গোলযোগ আছে। মনে করিবেন না যে, তাঁহারা বাস্তবিকই বনচারী আদিম মানুষের সমাজে ফিরিয়া যাইতে চান—তাঁহারা এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য জগতেই থাকিতে চান, কারণ অনুরূপ আহার বিহারে তাঁহারা অনভ্যস্ত—তবে তাঁহারা আদিম মানুষ হইতে চান শুধু ইন্দ্রিয়ের সেবায়। রোমান্টিক সাহিত্যে যে আদিম বর্ব্বরের পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, এখন পূজাবসানে তাহার সম্মুখে বলিদান চলিয়াছে, আর করাল-বদনা নর-মাংসলোলুপা ভৈরবীর চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদ্বিধাহীন নগ্ন দৈত্যেরা খর্পরহস্তে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। এই মহা শ্মশানে, নানা প্রকার বিভীষিকা ও নানা বিকট চীৎকার উঠিতেছে। একদিকে জার্ম্মানীতে মদদর্পে Fascist Rosenburg চীৎকার করিতেছেন, "Back to earth and blood ! Away from the culture of mankind. It does not exist at all, just as the world history does not exist." অপরদিকে মহাযুদ্ধের রক্ত পান করিয়া লোলুপ ইংরাজ D. H. Lawrence সভ্য জগৎ ছাড়িয়া মেক্সিকোতে যাইয়া আস্ফালন করিতেছেন,—

"I am Huitzilopochtli
The Red Huitzilopochtli,
The blood red,
I am Huitzilopochtli
White of the bone
Bone in the blood !"

একদিকে এই আদিম প্রবৃত্তিসমূহের হুঙ্কার, অপরদিকে ঘন অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তা। রণোন্মাদনার অবসানে ক্লান্ত দেহ-মন লইয়া ফরাসী জাতির মনের অবস্থা Louis Ferdinand Celine তাঁহার নভেলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, "আর কেন ? চোখ বুঁজে থাক", ("shut your eye, that is all that is necessary") এবং Malraux সেই কথার সায় দিয়া ব্যর্থতার বেদনায় হতাশের স্বরে বলিতেছেন, "তোমরাও জান, আমিও জানি, জীবন নিরর্থক" ("You know as well as I do that life is meaningless.") প্রবৃত্তির মুখের বল্গা খুলিয়া লইলে এ অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। আবার কেহ কেহ সমাজে থাকার জন্য বাহিরের জীবন ভুলিয়া যাইয়া মুহূর্ত্তের অনুভূতির পশ্চাতে চলিয়াছেন, কিংবা সূক্ষ্ম দৈনন্দিন মনোভাবের চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়া পরম নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিতেছেন, ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। Marcel Proust, Joyce-এর কথা স্মরণ করুন।

বিধ্বস্ত সমাজের প্রতীক, এই মুহূর্ত্তবাদী দেহলোলুপ কিংবা অবসাদগ্রস্ত সাহিত্য আজকাল য়ুরোপে আসর জমকাইয়া বসিয়া আছে। এই সাহিত্য হয় প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মত্ত, নয় নিষ্ঠুরতা, জিঘাংসা বা বিদ্রোহে পূর্ণ, কিংবা বিশ্বভোলা অবসাদ, আত্মগ্লানি ধিক্কারে পীড়িত। ইহাতে আছে প্রবৃত্তির লেলিহান জিহ্বা, নরমাংসের প্রতি বিপথগামী কাপালিকের নির্ম্মম স্পৃহা, আর কামানলে আহুতির শেষে মন ও হৃদয়ের পাণ্ডুর ভস্মাবশেষ। যাহা অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর, তাহা লইয়াই এই সাহিত্যে মাতামাতি চলিয়াছে—ইহাতে স্বাস্থ্যের চিহ্ন নাই। সেই

জন্য Eliot বলিয়াছেন, ইহা পীড়িতের সাহিত্য এবং Bonamy Dobree স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান লেখকেরা পীড়িতের মত (in the position of the sickmen), তাই অখাদ্যে ইহাদের রুচি, যাহা স্বাদু ও স্বাভাবিক তাহাতে বিতৃষ্ণা। এই কারণেই আবার স্বাভাবিক সমাজ গড়িয়া তুলিবার জন্য মনন-ক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে য়ুরোপে যে দুই প্রচেষ্টা চলিতেছে, সেইগুলির প্রতি রুগ্ন, কেন্দ্রচ্যুত, সমাজ-বন্ধনে আস্থাহীন এই সব লেখক হয় উদাসীন, নয় বীতশ্রদ্ধ, ইহাদের মুখে কালি দিবার চেষ্টার বিরাম নাই। ম্যারিটা, ক্রিসটোফার ডসন্, বরডয়েড প্রভৃতি নব্য ক্যাথলিকগণের ধর্ম্মের বন্ধনে পুনরায় সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা ইহারা হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, আবার রুশিয়ার সাম্যবাদের উপর, বার্ত্তাশাস্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ-গঠনের যে বিরাট প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহার কথা শুনিলেও হয় ইহাদের আতঙ্ক আসে, নয় রক্ত দ্বিগুণমাত্রায় গরম হইয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, বর্ত্তমান কালে এই দেশে একদল সুধী সাহিত্যিক আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহাদের লেখায়—গদ্যে, বিশেষতঃ পদ্যে—পূর্ব্বোক্ত প্রকার বিকৃত য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রচার, প্রশংসা, অনুকরণ বা অনুসরণ চরম কাম্য ও কৃষ্টির প্রধান লক্ষণ বলিয়া গণিত হয় এবং যাঁহারা তাঁহাদের সহিত একমত না হইতে পারে, তাঁহাদের উট-পক্ষী, পেচক বা philistine আখ্যা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। এইরূপ সাহিত্য পড়িতে পড়িতে তাঁহারা মনে করেন, ভারতবর্ষের, অন্ততঃ পক্ষে বাঙ্গালার পরিস্থিতি একবারে হুবহু য়ুরোপের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বেকার লেখকেরাও য়ুরোপের সাহিত্যের নিকট হইতে অনেক ধার করিয়াছেন সত্য, সেই জন্য বাংলা সাহিত্য চিরদিনের জন্য ঋণী, কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সব উত্তমর্ণের নিকট ধার করা হইয়াছে, তাঁহারা ছিলেন প্রতিষ্ঠিত লেখক, আর সমাজের প্রতি তাঁহাদের মনোভাব ছিল অন্য প্রকার। কিন্তু এখন যাঁহাদের অনুকরণ চলিয়াছে, তাঁহাদের ব্যবহার সামাজিক নয়, আর সময় তাঁহাদের কপালে এখনও অমরত্বের টিকা দেয় নাই। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যিকদের মত এরূপ উৎকট বিলাত-প্রীতিও পূর্ব্বেকার লেখকদের মধ্যে প্রকাশ পায় নাই। শুধু লেখায় নয়, কথাবার্ত্তায়, চালচলনে তাঁহারা সমস্ত জিনিষটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা fascist না communist? প্রতি পদে পদে দোহাই দেন Richard, Leavis, Cauldwell-এর। তাঁহাদের কাছে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" ভারতবর্ষ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র দেশ আছে, তাহার একটা স্বতন্ত্র সমাজ ও সংস্কৃতি আছে এবং সেই সমাজ-প্রতিষ্ঠানের মূলে এক নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। Fascist বা communist বলিতে য়ুরোপ যাহা বুঝে, ঠিক হয় ত সে অর্থে আমরা দুইটার কোনটাই নয়। কিন্তু এ কথা তাঁহারা মানেন না। সত্য হিন্দুসমাজে প্রত্যেকের কার্য্য অনুসারে স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমের মূলে এই কথাই ছিল। ইহা ছিল গুণকর্ম্মবিভাগের উপর, যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয়, functional society (as opposed to acquisative society)। ইহাতে অনেকটা ছিল সাম্যবাদের নীতি, কিন্তু ইহা ছিল Platoর communism, Marxএর নয়। ইহাতে ব্যক্তির অস্তিত্ব একবারে নষ্ট হয় নাই, ধর্ম্মে ধাক্কা দেওয়া হয় নাই, মানুষের সেবা ও ভগবানের সেবার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া বলা হয় নাই—"For the worship of God Soviet Communism substitutes the service of man."

রঙীন চোখে না দেখিয়া সহজ চোখে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, য়ুরোপের পরিস্থিতি এ দেশে এখনও আসে নাই। অতএব সে পরিস্থিতির মাঝে যে সাহিত্যের উদ্ভব, সেই সাহিত্য অনুসরণ বা অনুকরণ করিয়া বিশেষ ফল আছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ অধুনা বাংলায় গদ্যে, পদ্যে, নভেলে, নাটকে এবং সেই বিচিত্র সৃষ্টিতে, যাহাকে দুষ্ট লোকেরা "গবিতা" বলে, এই সমস্ত ব্যাপারেই এই অনুসরণ বা অনুকরণ চলিতেছে। যে সাহিত্য অনুকরণ করিতেছি, তাহা সমাজবন্ধন-হীন—আকাশস্থ, নিরালম্ব, বায়ুভুক। আমাদের সমাজে যে অল্পবিস্তর ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সে সাহিত্য আনিয়া তাহার রোধ হইবে না, বরং বাড়িয়া যাইবে। অনাচার, উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা প্রবাহিত হইবে। এ কথার প্রমাণ বিগত দশের বৎসরের মধ্যে অনেকে পাইয়াছেন। অতএব যাঁহারা সমাজের কল্যাণকামী, তাঁহাদের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রয়োজন। বর্ত্তমানে এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা পণ্ডিত, চরিত্রবান, সুরুচি-সম্পন্ন, সাহিত্যের নামে যে পাঁক ঘাঁটা চলিতেছে, তাহার একান্ত বিরোধী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারাও এই আবর্ত্তে পড়িয়া এক প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, যাহার ভাষা আড়ষ্ট ও কষ্ট-কল্পিত এবং যাহার বস্তু নিতান্ত ফাঁকা, যাহার বিষয় সমাজের কল্যাণে আসিবে না। ইঁহাদের ফাঁকা বলিলাম এই জন্য যে, ইঁহাদের লেখায় জগতের ও মানব-জীবনের সম্যক্ উপলব্ধি বা জ্ঞানের পরিচয় বিশেষ পাই না,—ইঁহাদের বিদ্যা পুস্তকস্থ। পুস্তকে যাহা পড়িয়াছেন, সেইটিই পাক দিয়া বলেন এবং জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে তাঁহারা মন-গড়া যে জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, তাহাকেই বাস্তব জগৎ ধারণা

করিয়া তাহারই ছবি আঁকেন। তাহারই রেখার সৌন্দর্য্যে, তাহারই রঙে বিভোর হইয়া থাকেন। এই কল্পনার পাত্রে মাঝে মাঝে ট্রামের ঘরঘরানি, ম্যাকেঞ্জি লায়েলের দোকান, মিলের ধোঁওয়া, য়ুকালিপটাস্ গাছ, মাতালের মাতলামি রূপ বাস্তবতা মিশাইয়া এক পরম উপাদেয় punch তৈয়ারি করেন। আধুনিক লেখকেরা মনে করেন, তাঁহারা 'বাস্তব' হইতেছেন; কিন্তু আধুনিক লেখকদের মধ্যে কয়জনের লেখায় বাস্তবের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায়? তাঁহারা 'সুশিক্ষিত', কিন্তু তাঁহারা নভেলে আঁকেন মনগড়া বিলাত-ঘেঁসা এক ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবার, যে পরিবারের সংখ্যা হাজারে একটির বেশী নয়—আর কবিতায় দেন তাঁহাদের বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত পরিচয়ের সঙ্কেত, কিংবা নিজ সৌখীন মনোভাবের অভিব্যক্তি। নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে ব্যভিচারী ভাব বলে, যথা—নির্ব্বেদ, বিভাব, অনুভাব, গ্লানি, অসূয়া—এই সবেরই প্রাধান্য থাকে সেখানে, যাহাকে স্থায়ীভাব বলে, তাহার চিত্র বড় বেশী পাই না। বাঙ্গালায় শতকরা একশতটি ব্যক্তি যে জীবন-যাপন করে, সমাজ ও দেশকে যে ভাব ও ভাবনায় উদ্বেলিত করে, যে সমস্ত সমস্যা আসিয়া চিন্তাশীল লোকের দ্বারে ঘা দেয়, সেই সব জিনিষের পরিচয় আমরা এখানে কতটুকু পাই? বাস্তবের সঙ্গে এই লেখকদের কিরূপ পরিচয়? বাস্তব অর্থে কি বুঝিতে হইবে "রিক্সায় টানা গণিকা", "রাস্তার ধারের কলতলায় বেশ্যাদের কলকলানি", "ফিরিঙ্গী মেয়েদের উন্নত বুক", "পিচের রাস্তা", "বড়বাজারের বিড়ীর আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া আর পানের পিক", "চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে বিষণ্ণমুখ উর্ব্বর মেয়েরা, আর চুলের গন্ধ আর নরম মাংস"? ইহাদের সহিত পরিচয় থাকিলেই কি বাস্তবের সহিত যথার্থ পরিচয় হইল? যে কথা হইতে বাস্তব আসিয়াছে, সেই বস্তুর ব্যঞ্জনা বিশাল—তাহাতে বুঝায় যাহার সত্তা অকপট। এই বিরাট বিশ্বপ্রকৃতি, মানব-জীবন, হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, নিবিড় ব্যথা ও আনন্দ এবং সর্ব্বোপরি তিনি, যিনি চিরানন্দময়। এই সব বস্তুর আভাস সেখানে ত বড় বেশী পাই না। তাঁহারা নিজের কথাই ষোল কাহন করেন, নিজেদের উপলব্ধি সব চেয়ে বড় জিনিষ মনে করেন। তাঁহাদের গুরু T. S. Eliotএর কথাই তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা হয়—"In an age of unsettled beliefs and enfeebled tradition, the man of letters, the poet, the novelist, are in a situation dangerous for themselves and for their readers……The first requisite usually held up by the promoters of personality is that a man should "be himself" and this "sincerity" is considered more important than that the self in question should socially and spiritually be a good or a bad one. This view of personality is merely an assumption on the part of the modern world and is no more tenable than several other views, which have been held out at various times and in several places."

বাস্তবের সহিত পরিচয়ের স্বল্পতা প্রযুক্তই তাঁহারা বিদেশীয় ভঙ্গী অনুকরণ করেন এবং তাঁহাদের লেখার মধ্যে একটা অস্বচ্ছন্দতার, অবসাদের, নাসিকাকুঞ্চনের বা তীব্র বিতৃষ্ণা ও ধিক্কার বা লুপ্তবীর্য্যের কামলিপ্সার ভান করেন। সেগুলির পশ্চাতে উপযুক্ত চালচিত্র না থাকায় সে রূপগুলিকে নিতান্ত ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়, সেগুলি একটি নটভঙ্গীমাত্র বলিয়া বোধ হয়।

ইহা না করিয়া শক্তিমান লেখকেরা যদি সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করেন, ইহার অভাব, অনুযোগ শুনেন, যে সমস্ত বিশ্বাসের উপর সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি ফিরাইয়া আনিতে ও যথার্থ আশা ও আনন্দ দান করিয়া ইহাকে সঞ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন, কষাঘাতে ইহার মোহ দূর করেন এবং উচ্চ আদর্শ সম্মুখে ধরেন, তবে তাঁহারা মানবের প্রভূত কল্যাণের হেতু হইবেন, তখন তাঁহারা লেখার উপযুক্ত ভাষা ফিরিয়া পাইবেন এবং তাঁহাদের রচনা চিরজীবন লাভ করিবে। এ দেশের সমাজে ভাঙ্গন ধরিয়াছে সত্য—বর্ণাশ্রমের কোন আশ্রমই খাঁটীভাবে নাই—ব্রহ্মচর্য্য লুপ্ত, গার্হস্থ্য জীবন স্বার্থপর বিলাসে নিমজ্জিত, বানপ্রস্থ শুধু সরকারী পেনসানভোক্তাদের আছে, আর যতি উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ ভাঙ্গন সত্ত্বেও এখনও বাঁধ দেওয়া অসম্ভব বোধ হয় নয়—এখনও সে ভাঙ্গন এতদূর যায় নাই, যাহাতে লেখক ও পাঠকের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে, যাহার জন্য এক দিককার ডাক অপর দিকে আর পৌছায় না।

সমাজের অখণ্ড অবস্থায়, স্বাস্থ্যের দিনে, মহাকাব্যের যুগে সাহিত্য রচনা হইত সমাজের কল্যাণে, সে নীতি ফিরাইয়া আনিবার দিন কি চলিয়া গিয়াছে?

প্রোহিবিশনের আতঙ্ক

DOCTOR

SAILA
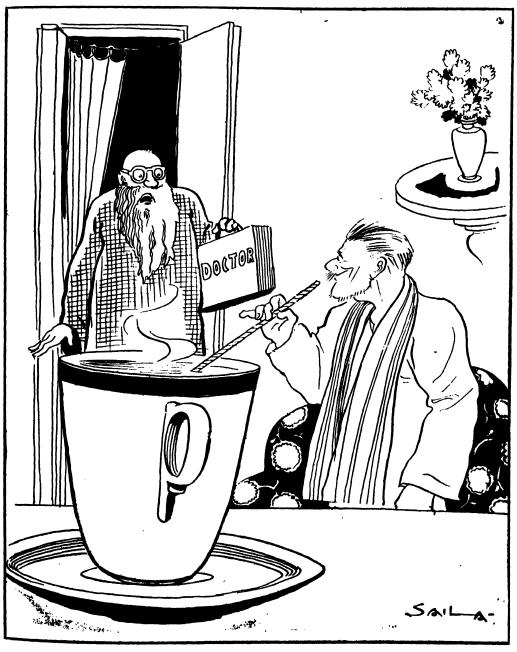
ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার রোগী (বিস্মিত ডাক্তারকে)—আজ্ঞে হ্যাঁ ! দিন এক পেয়ালা খেতে বলেছিলেন—তাই কাপটা একটু বড় করে…

মুরারি ডাক্তারের ঠিকেদারি

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

[১]
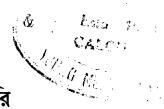
শেষ পর্য্যন্ত মুরারি ডাক্তারকে ডাকাই স্থির হইল।

মেয়ের মনটা সুধু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল। বলিল, "ওপাড়া থেকে সাধন ডাক্তারকে ডাকলে ভাল হত না তারু কাকা? অবিশ্যি মুরারি কাকা খুবই ভাল, কিন্তু আমার যেমন অদেষ্ট..."

তারিণী খুড়ো হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "আর সেদো এসে তোর অদেষ্ট পালটে দেবে? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কি বলেছেন জানিস?"

তিনি নিজেও জানেন না বলিয়া আবার হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

স্বামী বিরক্ত হইয়া বলিল, "তখন থেকে সাধন-ডাক্তার, সাধন-ডাক্তার যে করছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন তো তারু কাকা, সাধন ডাক্তারের খাই আর হাপা মেটান কি চাড্ডিখানি কথা? কলেজের পাশ-করা ডাক্তার, বোধ হয় এমন একটা ওষুধের নাম করে বসবে, রোগী ছেড়ে ছোট কলকতা ওষুধ খুঁজতে। ও যাবে কাছা-কোঁচা এটে? আমার দ্বারা তো হবে না, বলে নিজের শরীর নিয়েই প্রাণান্ত। আর এই কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ধর করা, বছরে বছরে একটি করে বেড়েই চলেছে, নিজেদের পাড়ার ডাক্তারকে আমাদের মত ছাপোষা গেরস্থর অবহেলা করা চলে? আপনিই বলুন না খুড়ো।"

দোরের পাশ হইতে উত্তর আসিল, "চুপ করতে বল, আর ছেলেগুলোর অকল্যাণ কামনা করতে হবে না। আসুন তা হলে মুরারি কাকা, আমার কপালে যা আছে হবে।"

তারু খুড়ো বলিলেন, "ভালই হবে বাছা। মুরারির অনেক গুণ, রোগী হাতে তুলে দিলাম, তারপর নিশ্চিন্তি, আর ওসব পাশ-করা ডাক্তারদের কি যে বলে, ইয়েও অনেক —রোগী দেখবি, রোগী দেখ, তা নয়, তার পেচ্ছাব সাঁচ করিয়ে আনাও, তার রক্ত দেখব—আর লোকটা বেজায় অর্থপিশাচও বাছা, সে সব কথা তুলতে হলে"...কি ভাবিয়া আর না তুলিয়া খুড়ো আরও ঘন ঘন হুঁকা টানিতে লাগিলেন।

দোরের পাশ থেকে উহারই মধ্যে একটু উষ্মার সহিত আপত্তি হইল, "তা হলে উনি যেন একাই আসেন, আমি ভলন্টিয়র-ছোঁড়াদের দরজা মাড়াতে দোব না, তা বলে দিচ্ছি...অলুক্ষুণ!"

প্রত্যেক গ্রামেই দু'একজন লোক থাকে—প্রৌঢ় কিংবা বৃদ্ধ—সমস্ত গ্রাম যাহাদের মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে—লোভের বিষয় শ্রাদ্ধের দিনটি। বসিয়া বসিয়া সবার চোখের সামনে সে টাকা করিতেছে, খরচের বেলায় কিন্তু হাতটান। উত্তরাধিকারীদের হাত বেশ দরাজ। এখন বিশেষ সুবিধা পাইতেছে না, কিন্তু খরচের জন্য যে তাহাদের হাত নিস্‌পিস্‌ করে, নানা ছুতানাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের রাশটানা হাতের প্রথম খরচ শ্রাদ্ধটা তারা ভাল করিয়া করিবে—গ্রামের সে একটা বড় আশা ও উৎসবের দিন।

পরেশ চক্রবর্ত্তী কতকটা এই ধরণের মানুষ। তাঁর পরমায়ু লইয়া গ্রামের চেয়ে আবার তাঁর বাড়ীর মধ্যে বেশী উৎকণ্ঠা, কেন না, উত্তরাধিকারী জামাই। অপুত্রক শ্বশুরের কন্যা বিবাহ করিয়া লোকটা খুব একটা দাও মারিল বলিয়া আশা করিয়াছিল; কিন্তু ঐ রকম অস্থিচর্ম্মসার শরীরের মধ্যে পরমায়ুর বহর দেখিয়া তাহার নিজের পরমায়ু নিত্য হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বছরকে বছর ঘুরিয়া যাইতেছে, অসুখে পড়িবার নামগন্ধ নাই! যদি বা হইল-একটু কিছু, একটা দিন উপবাস দিয়া সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা। ক্রমেই যেন ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া উঠিতেছিল। মুখ ফুটিয়া তো কিছু বলা যায় না, সুধু গুমরিয়া মরা।

এইবার যেন একটু কাবু করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। জামাই চিকিৎসার পরামর্শের জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছে। আহা, শ্বশুর মানুষ, যদি

পরমায়ু থাকে তো আলাদা কথা, না হইলে ভগবান করুন যেন অল্প ভোগের উপর দিয়াই নিষ্কৃতি পান। গুরুজন···

সুধু মেয়ের মনটি বড় ভার। বুড়ো বাপ, চার চারটে দিন কখন তাঁহাকে কেহ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখে নাই। পরিচর্য্যা করিতে করিতে কেবলই বাহিরে গিয়া চোখ মুছিতেছে।

মুরারি ডাক্তার আসিল। বেশ গোলগাল চেহারা, মুখে প্রসন্ন হাসি। কথাবার্ত্তা চলাফেরার মধ্যে সকলের সঙ্গে একটি নিবিড় আত্মীয়তার ভাব মাখান এবং সেই জন্য গলার আওয়াজটা খুব মুক্ত। আর সব অবস্থাতেই এক ভাব,—নিমন্ত্রণ-বাড়ীতেই হোক বা রোগীর ঘরেই হোক; রোগের প্রথম অবস্থাতেই হোক, মাঝ অবস্থাতেই হোক, শ্বাসের সময়েই হোক। গলার সেই এক রকম স্বর, সেই অকৃপণ হাস্য, সেই নির্ব্বাধ মুখরতা···

সদানন্দ লোক, সব তাতেই পাওয়া যায়; তবে রোগের সময় লোকে একটু এড়াইয়া চলে। মুরারি ডাক্তার একবার ঢুকিলে না কি শ্রাদ্ধের লুচিটি পরিবেশন না করা পর্য্যন্ত ফেরে না। গ্রামে 'মুরারি ডাক্তারের ঠিকে' বলিয়া একটা চলতি কথাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বাড়ী ঢুকিয়াই একগাল হাসিয়া বলিলেন—"এই যে বাবাজী, ভাল তো? পরেশ দা কোন্ ঘরে?···নিঝুম হ'য়ে পড়ে আছেন? তা আর এমন অন্যায় হয়েছে কি বাপু? তিন কুড়ি বয়েস হল, এখন কি আর লাফালাফি করে বেড়াবেন?···দে বিন্দু, একটা আসন দে দিকিন, এইটুকু আসতেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমারও তো হল—আর কি, এই আশ্বিনটা পেরুলেই পঞ্চাশ বছর।"

বিন্দুবাসিনী রকে আসনটা পাতিয়া দিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া বলিল, "আজ চার দিন থেকে শয্যেগত, ফিরে পাব তো বাবাকে মুরারি কাকা?"—জোরে অশ্রু নামিল।

মুরারি ডাক্তার বাড়ী কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "শুনছ পাগলীর কথা?···ধর যদি নাই পাস। পারবি চিরকাল ধরে রাখতে? মুরারি কাকার হাতে তো পরমায়ু নেই, তবু না হয় জোড়াতাড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলাম, কিন্তু ক' দিন?···"

তারিণী খুড়ো প্রবেশ করিলেন।

"এই যে খুড়োও এসেছে।···বিন্দু বলে—ফিরে পাব তো বাবাকে? তাই বলছিলাম—বলি, মুরারি কাকা ওষুধই দেবে, পরমায়ু তো দেবে না? ওঁর যদি তলব এসে থাকে···" হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তারিণী খুড়ো বলিলেন, "পরমায়ু স্বয়ং ভগবানই দিতে অপারগ, তা তুমি আমি কোন ছার। সেই—ভাগবতে সেইখানটায় বলেছেন না?···নে বিন্দি, একটু তামাক সেজে আন্ দিকিন।···দেখলে না কি দাদাকে?"

"না, হচ্ছে কি না, তাড়াতাড়ি কিসের? তামাকটা আসুক, একটু বেদম হয়ে পড়েছি। তোমার শরীরটা কেমন যাচ্ছে খুড়ো?···হ্যাঁ বাবাজী, তোমার সেই কাজটার কি হল, শুনলাম একটু আশা হয়েছে···"

"আর আশা, নবীন দা রোজই তাগাদা দিচ্ছে, চল একবার সায়েবের কাছে নিয়ে যাই, নতুন সিজনটা সুরু হয়েছে; তা দেখুন না, ঠিক মোকা বুঝে শ্বশুর ঠাকুরের এই···"

"তা বটে। তা এ দিকটা চুকে গেলে, তুমি কর একবার দেখা, তোমাদের হলে আবার আমাদের ছেলে-পুলেগুলোর একটা রাস্তা খুলবে।"

তামাক আসিল; আরও সব নানা রকম আলোচনা হইল। তারপর ধীরে সুস্থে মুরারি ডাক্তার গিয়া রোগীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ পরেশ চক্রবর্ত্তী ও পাশ ফিরিয়া আচ্ছন্ন ভাবে পড়িয়া আছেন। মুরারি ডাক্তার মুক্তকণ্ঠে ডাক দিলেন, "দাদা!"

রোগী একটু চকিত হইয়া উঠিয়া পাশ ফিরিলেন এবং একটু বিহ্বল ভাবে চাহিয়া থাকিয়া বিছানার পাশে আঙুল কয়টা চাপিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "বস।"

মুরারি ডাক্তার নিজের স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করিলেন, "বলি, মতলবখানা কি?"

বৃদ্ধ উত্তর স্বরূপ উপরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।

"আজ্ঞে না, সেটি এখন হচ্ছে না, মেয়ে জামাই বড্ড ছেলে মানুষ।···ও দিকে উনি টানছেন তো এ দিকে মুরারি ডাক্তারও এসে ধরলে।···দাও দিকিন হাতটা।"

তারিণী খুড়ো আর বিন্দুর দিকে চাহিয়া নিজের রসিকতায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। দরজার কাছে

ছেলেমেয়ে কয়টি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিছু একটা মজার কথা হইয়াছে ভাবিয়া তাহারাও পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিল। বিন্দু তারিণী ঘোষালের হাতটা একটু স্পর্শ করিয়া বাহিরে ডাকিয়া চাপা গলায় বলিল, "কাকা, ও রকম করে বলছেন ··রোগীর মন···"

তারিণী খুড়ো একটু হাসিয়া বলিলেন, "শোন কথা বিন্দুর! চিরকালটা 'কাকা কাকা' বলে ঠাট্টা করে এসেছে, আজ আর বলবে না? কি রকম মিষ্টি শুনতে হল বল দিকিন, বুড়ো বয়সের একটা সাধ। সেদো কি বাইরের কোন ডাক্তার এসে বলতে পারত অমন প্রাণ খুলে? ···আর একটা টিকে ভেঙে দে তো কলকেটাতে। মুরারি এসে হাত ধরেছে, নিশ্চিন্তি, আর তোকে এ দিকে দেখতে হবে না—ছেলেমেয়েগুলোর দিকে একটু নজর কর এবার।"

বিন্দু টিকা আনিয়া কলিকায় ভাঙ্গিয়া দিতে দিতে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর ভালর দিকেই যেন নিশ্চিন্তি হতে পারি কাকা; সব কথাগুলাই কেমন যেন অমঙ্গল—অমঙ্গল ঠেকছে কাণে···"

মুরারি ডাক্তার হাসি মুখে বাহির হইয়া আসিলেন; বলিলেন, "কই?—ব্যাপার তো কিছুই দেখলাম না, বুকে একটু সর্দ্দি বসেছে, তারই তড়াসে···"

বিন্দু ব্যস্ত ভাবে বলিল, "সেরে যাবেন তো কাকা?"

"সেরে যাবে না তো যাবে কোথায় বল?—কি, হয়েছে কি খুড়োর? ভাবিস নি রে পাগলী—বুড়ো শীগ্‌গির নড়ছে না। এখন আরও দিন কতক মেয়ে-জামাইয়ের সেবা খেয়ে তবে·

"তাই আশীর্ব্বাদ কর কাকা"—হাসিতে মেয়ের গালে চোখের অশ্রুবিন্দু কয়টি ঝরিয়া পড়িল। দুয়ারের কাছে জামাইয়ের মুখের দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না; না করিয়া ভালই করিল

[২]

চিকিৎসার মত চিকিৎসা আরম্ভ হইল। মুরারি ডাক্তারের ঐ গুণ; সাবু তোয়ের করা থেকে দাগে দাগে ঔষধ খাওয়ান পর্য্যন্ত সবই প্রায় নিজের হাতে। বিন্দু মৃদু আপত্তি করিল, কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "তুই সেদিনকার মেয়ে, হাওয়ার কাপড় পরে ঐ জামতলায় পুতুল খেলা করতিস, তুই রুগী সেবার কি বুঝবি? শেষকালে মেরে ফেল বুড়োকে।"

অবশ্য এ কথার পর আর কোন মেয়েই অগ্রসর হইতে পারে না। সে যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিয়া, রোগীর মাথায় হাত বুলাইয়া, হাত পা টিপিয়া মুমূর্ষু পিতার সেবার সাধ মিটাইতে লাগিল।

সমস্ত দিন জোর চিকিৎসার পর সন্ধ্যার সময় রোগীর পরিবর্ত্তন দেখা দিল; অবশ্য খারাপের দিকে। একেবারে নিঝুম মারিয়া পড়িয়া না থাকিয়া রোগী মাঝে মাঝে চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং কথার মধ্যে একটু একটু অসংলগ্নতা আসিতে লাগিল।

বিন্দুর কান্না দেখিয়া মুরারি ডাক্তার আদরের ধমকানি দিয়া বলিলেন, "অসুখ হয়েছে, একটু আধটু বেফাঁস না বলে কি তোর বাপ এখন রুক্মিণী-হরণের কথকতা করবে আশা করেছিস? কচী খুকীর বাড় হলি যে তুই বিন্দি··"

বাহিরে আসিয়া জামাই,তারিণী খুড়ো প্রভৃতির সামনে নিজের বুকের উপর দুইটা মুঠা রাখিয়া হাসিয়া ঈষৎ চাপা গলায় বলিলেন, "দুটো বুকই সর্দিতে ঝাঁঝরে গেছে।" সঙ্গে সঙ্গে মুঠার মধ্যে হইতে দুই বুড়া আঙুলকে মুক্ত করিয়া নাড়িয়া বলিলেন, "আশা বড় একটা নেই, দেখে নিও আমার কথা।"

জামাই চিন্তিত ভাবে বলিল, "আজ রাত্তিরটা···"

মুরারি ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও যে বিন্দু হলে দেখছি বাবাজী,—রাত কাটবে না কি রকম? পরেশ দা'কে চেন না—এখন ক'রাত বুঝবে ও। দাদার আমার ঐ শুকন হাড়ে ভেল্কি খেলে...তোমরা সেদিনকার ছেলে, কিন্তু আমি তো জানি, তারু খুড়ো তো জানে।···কোন ভাবনা নেই, আমি ওদের সেবা-সমিতির দু'জন ছেলেকে বলে এসেছি·

বিন্দু বাপের বিছানা হইকে উঠিয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "না, আমি কখনই তাদের আসতে দেব না। ও অপয়ারা একবার ঢুকলে না নিয়ে বেরোয় না।

এমনি সবাই সোনার ছেলে স্বীকার করি, কিন্তু সেবা করবার জন্যে রোগীর ঘরে ঢুকলে···"

জামাই বিরক্ত কণ্ঠে বলিল, "পালা করে জাগতে হবে।"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর হইল, "আর পালা করতে হবে না, আমি একাই জাগব। না, কখনও আমি ঢুকতে দোব না ওদের···"

মুরারি ডাক্তার বলিল, "ওই করে তুইও সুদ্ধ পড়, আমি দুটো নিয়ে নাজেহাল হই। বাপের তা হলে খুব সেবা হবে!"

বিন্দু চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে ভাঙা গলায় বলিল, "আমি কিন্তু দু'জনের বেশী আসতে দোব না।"

অবশ্য দু'জনই আসিল না। বুড়ো পরেশ চক্রবর্ত্তীর অসুখ, তায় আবার মুরারি ডাক্তার দেখিতেছে—এক দিনেই নিউমোনিয়ায় দাঁড় করাইয়াছে, পাড়ায় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বারোয়ারীর চণ্ডীমণ্ডপে দলাদলির নেতারা অনেক ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছে, আজ রাত্রি হইতে পাড়ার সখের যাত্রাপার্টি কীর্ত্তনের মহলা দিবে—শ্রাদ্ধ-বাসরের জন্য। বয়স্থারা বলিতেছে, "আহা, লোকটা ছিল ভাল গো, দোষে গুণে। মেয়ে কাজ কি রকম করে দেখা যাক্।"

ছেলেদের সখের সেবা-সমিতি। দু'জনকে বলা হইয়াছিল, ওপরপড়া হইয়া চারজন আসিল। নিজেরাই ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাই দুইয়া খানিকটা দুধ জোগাড় করিয়া রাখিল। তাহার পর সমস্ত রাত তাসে চায়ে, হল্লায় কাটাইয়া দিল। অবশ্য সেবা ঔষধপত্র চালাইল বিন্দু আর মুরারি ডাক্তার মিলিয়া। বিন্দু একবার বলিলও।

মুরারি ডাক্তার একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, দুধের ছেলে, ওরা আবার সেবা করবে! একটা আমোদ; আমোদের বয়সই যে এটা।"

সকালে জামাই জাগিয়া উঠিয়া দেখিতে আসিলে বলিলেন, "আমি বললাম না তোমায় কালকে? আজ সকালেই একটা টাল গেছে, অবিশ্যি বিন্দিকে বুঝতে দিই নি; কিন্তু আর বসে থাকা চলে না, হাতে যেটুকু আছে করে কর্ম্মে দেখতে হবে তো? আমি আসছি···হ্যাঁ হ্যাঁ চা হয়ে গেছে খাওয়া, হীরের টুকরো ছেলে সব—কোন্ ভোরে গাই দুইয়ে, চা করে, খাইয়ে তবে অন্য কথা।··· আমি এই এলাম বলে, ওষুধের সব বলে দিয়েছি বিন্দুকে। কিছু ভাবতে হবে না তোমায়, তুমি বরং তার কাকার সঙ্গে পরামর্শ করে ও দিককার যোগাড়যন্ত্র কর গে।"

দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই সেবা-সমিতির ছেলে চারটি আসিয়া দাড়াইল। রাত্রি-জাগরণের ফলে মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ, মাথার চুল ফুলিয়া ফাঁপিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া রহিয়াছে। একজন আগাইয়া বলিল, "আমাদের কি এখন আর কোন কাজ আছে মুরারি কাকা?"

মুরারি ডাক্তার ঘুরিয়া বলিলেন, "বিস্তর কাজ; কাজের তো এখন সবই পড়ে। তবু আবার নিজের শরীরও দেখতে হবে তোরা এক কাজ কর্, দুজন থাক্, দুজন চট্ করে দুটো ডুব দিয়ে মুখে কিছু দিয়ে চলে আয়,—পালাপালি করে।"

জামাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, "কাল সমস্ত রাত ছোঁড়াগুলো একটু চোখ বোজে নি গা! ওদের এই সব সময়ে একটু কাছে কাছে থাকাই তো দরকার। হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে কোথা দিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলে—একবার কি বুঝতে পেরেছিলে বাড়ীতে রোগী রয়েছে একটা।"

কয়টা দিন হইতে ভবিষ্যতের গোলাপী স্বপ্নের মধ্যে দিব্য নিদ্রাটি হইতেছে। জামাই বলিল, "রামঃ, আমার তো আপনাকে দেখে তখন মনে পড়ল শ্বশুরঠাকুর অসুখে পড়ে।"

ছেলে কয়টি প্রশংসায় একটু লজ্জিত হইল। একজন একটু বেশী অগ্রণী, বলিল, "না, কাজ থাকে তো সবাই থেকে যাই। নাওয়া খাওয়া—সে তো পরের কথা।"

একজন একটু রুগ্ন গোছের; একটু যেন নিরাশার সহিত বলিল, "এখনই নেয়ে নেব?—তা হলে আজকে আর নাওয়ার দরকার হবে না, মনে করছেন না কি?"

কথাটা কেহ বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। অগ্রণী ছেলেটি বলিল, "ও বলছে—ভগবান না করুন—পরেশ জ্যেঠা আমাদের আজই

ছেড়ে যান তো আর একবার নাইতে হবে কি না।·· ··· গোবিন্দের আবার ম্যালেরিয়া দেখা দেয় কি না মাঝে মাঝে।"

মুরারি ডাক্তার উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, জামাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একবার দূরদৃষ্টিটা দেখ! আমেরিকায় জন্মালে এ সব ছেলে প্রেসিডেণ্ট হত।...আজ সে ভয় নেই, তুই নেয়ে নিগে যা।···দেখেছ, কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেল। আমি চলি। ঠিক, আসল কথাই ভুলে যাচ্ছিলাম—আগে তোদের একজন সঙ্গে আয় দিকিনি আমার, একলা সামলাতে পারব না।···হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম,—বাবাজী, তুমি আর বিন্দি নেয়ে-টেয়ে তোয়ের হয়ে থেক।"

ঘণ্টা দুয়েক পরে ফিরিলেন; সেবা-সমিতির ছেলেটির হাতে মালসায়, কলসীতে পূজার নানা রকম সরঞ্জাম। নিজের গায়ে একটা নামাবলী, একটা সাজিতে কিছু ফুল। সঙ্গে পুরোহিত—অভয় ভট্‌চাজ।

তারু খুড়ো আসিয়াছিলেন—পাড়ার আরও দু'একজন বৃদ্ধ, বর্ষীয়াণ ব্যক্তি। মুরারি ডাক্তার বাড়ীতে ঢুকিয়াই হাসিয়া বলিলেন, "এই যে তারু দা এসেছ। অভয়পদকে ডেকে নিয়ে এলাম। স্বস্ত্যেনটা করিয়ে দিই। শেষকালে বুড়ো বলবে—মুরারিকে ডাকা হল অথচ সস্ত্যেনটা করিয়ে দিলে না। বুড়ো বয়সে শুধু কতকগুলো অখাদ্য কুখাদ্য খাইয়ে দিলে।···কৈ গো বিন্দু···"

নটবর ঘোষাল বলিল, "কি রকম বুঝছ তা' হলে?"

বিন্দু দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অলক্ষিতে মুরারি ডাক্তার নটবরের দিকে একবার বুড়া আঙুলটা নাড়িলেন; তাহার পর বিন্দুকে শুনাইয়া একটু গলা চড়াইয়া বলিলেন, "বুঝছি তো ভালই। ওষুধ চলুক না। তবে কি জান?—বলে, ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—ওষুধেই যদি সব করত রে দাদা, তবে আর কুইন্ ভিক্টোরিয়া মরে যেত না। নে বিন্দু, দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না মা, তাড়াতাড়ি যোগাড় করে দে দিকিন একটু, তুমিও লেগে যাও অভয়পদ—তোমার তো আবার মেইল ডে আজ; আটটা বত্রিশের গাড়ীটা ধরতে হবে।"

অভয়পদ ডেলি-প্যাসেঞ্জার, পুরোহিত, কলিকাতায় মার্চেণ্ট আফিসে কাজ করে। সকাল থেকে সব কাজের মধ্যেই তাহার ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া পড়িবার চিত্রটি মনে সুস্পষ্ট থাকে বলিয়া, সে সর্ব্বদাই খুব ত্রস্ত। বিন্দু ঠাঁই করিয়া দিলে পূজার সরঞ্জাম সব দোকান-সাজান করিয়া সাজাইয়া আচমন করিয়া বসিয়া গেল।

পরেশ চক্রবর্ত্তী নিঝুম হইয়া পড়িয়া ছিলেন, মুরারি ডাক্তার গিয়া হাতটা তুলিয়া ধরিয়া একবার নাড়ীটা পরীক্ষা করিল, বুকটা দেখিল, তাহার পর ঔষধের শিশি তুলিয়া ধরিয়া একবার দাগ দেখিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তারু খুড়ো, আরও দু'একজন অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি রকম হে?"

বিন্দু পূজার কাছে বসিয়াছিল, প্রশ্নে সেও মুরারি ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল। ডাক্তার বোধ হয় রসিকতা করিতে যাইতেছিল, সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আবার রকম কি? অভয়পদর হাতে গিয়েছে আর ভাবনার কি আছে? আমি এতটা সামলে নিয়ে এলাম আর ও, কি যে বলে···একটু হাত চালিয়ে নাও হে অভয়; দাদার মাথায় ফুলটা ছুঁইয়ে দাও·

বিন্দু ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "মুরারি কাকা?"

"এই দেখ বিন্দি, তুই ছেলেমানুষ হলি যে! পূজার দিকে মন দে দিকিন্। বলে—শান্তি স্বস্ত্যেন হল আত্মার শান্তির জন্যে আর তুই কি ন আগে ফলটা দেখ। দৈব বিশ্বাস করিস না, করিস না? অভয়পদর শেষ হক, দেখবি খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে চাঙ্গা হয়ে উঠবে। এ আমাদের প্রত্যক্ষ করা, একা তোর বাবারই তো স্বস্ত্যেন করালুম না, সেই পাশ করেছি অবধি যারই নাড়ী ধরেছি······"

বোধ হয় হুঁস হইল; হঠাৎ থামিয়া গিয়া তারু খুড়োর হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া দুটো টান দিয়ে বলিলেন, "তোমার সেই সনাতন রক্ষিতের কথাটা মনে আছে তো খুড়ো।—সব ঠিকঠাক, নিয়ে যাবে গঙ্গার তীরে, বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে; তারেশ পুরুত স্বস্ত্যেন করে উঠল। 'যাক অন্তত দেহটাও তো শুদ্ধ হবে।' বলে কপালে ফুলটা ছুঁইয়ে বললে—'তোল, তা' হলে'— সব ধরাধরি করতেই রুগী একেবারে মারমুখো হয়ে

উঠে বসল, বলে—'কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস আমায় সব পাঠশালার ছেলের মত চ্যাংদোলা করে শুনি!' মস্ত রাগী লোক, ভয়ে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত! তিন দিন পড়ে ছিল; ভিড় করে পাড়ার লোকে এসে জুটেছিল—যে যেখানে পারলে সটকান দিলে। জয়হরি পায়ের দিকে ধরেছিল, লাফ দিয়ে পালাবে—দরজায় মাথা কেটে এক হুলুস্থূল কাণ্ড···বলে, স্বস্ত্যেনের গুণ নেই?···"

ঘরের মধ্যে দুই তিন জন বর্ষীয়সী আর সেবা-সমিতির ছেলে দুইটি বসিয়া ছিল। হঠাৎ একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "মুরারি কাকা, শীগ্‌গির আসুন একবার

"অভয়, তুমি উঠ না যেন, বিন্দুও বোস, ও কিছু নয় আমরা দেখছি।"

সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল, বিন্দুও একটু দোমনা থাকিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া ঘরের মাঝে গিয়া উপস্থিত হইল।

রোগী উঠিয়া বসিয়াছে, বিকারের ঘোরে চক্ষু রক্তবর্ণ, সেবা-সমিতির ছেলে দুইটির দিকে ঠায় চাহিয়া আছে। একটু পরে বার কতক কি বিড়বিড় করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি চায় ওরা? কাকে চায়?"

ছেলে দুইটি ঘর থেকে সনাতন রক্ষিতের গল্প শুনিয়া ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল। একজন বলিল, "আজ্ঞে, আমরা কিছু চাই না তো; সুধু প্রাণপণে, না খেয়ে-দেয়ে, রাত জেগে সেবা করতে···"

"আমি যাব না, যাব না আমি; যাও তোমরা, তোমাদের হাতে কি ও?"

ছেলে দুইটি ভয়ে ভয়ে মুরারি ডাক্তারের দিকে হাত একটু বাড়াইয়া বলিল, "কিছু তো নেই আমাদের হাতে।" একজন বলিল, "ওঁর হাতের কাছ থেকে সাবুর জামবাটিটা সরিয়ে নিন্ না···"

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "তোরা একটু বাইরে চলে যা দিকিন।···ঘোর এসেছে খুড়োর একটু···আর যত বলি তোরা বাবরি চুলগুলো ছেঁটে ফেল···"

রোগীর ঘোর কিন্তু কাটিল না। সে ক্রমে সব মাথাতেই বাবরি এবং সব হাতেই কি একটা দেখিতে লাগিল। প্রায় মিনিট পনের প্রলাপ বকিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। মুরারি ডাক্তার মাথা নাড়িয়া তারু খুড়োর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এর পরের টালটা আর সামলাতে পারবে না, এই বলে দিলাম তোমায়, খুড়ো দেখে নিও··· জামাই কোথায় গেল? এস হে ফর্দ্দটা একবার করে নাও দিকিন, আর জয়নালকে বল, বাঁশ টাঁশ কেটে নিয়ে আসুক···।"

[৪]

দাহকার্য্য সমাধা করিতে ভোর হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "এদের সব সঙ্গে করে নিয়ে যাও জামাই—নিম, লোহা আমি সব জোগাড় করে রেখে এসেছিলাম, সুদাম ময়রাকেও বলে দিয়েছি—মিষ্টি পৌছে দিয়েছে নিশ্চয়। আমি একটু বাগ্দীপাড়াটা ঘুরে আসি।"···

জামাই বলিল, "কোন কেস্ টেস্ আছে না কি? তা একটু জল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে আসবেন—সমস্ত রাত জাগা মেহনৎ···"

"এই দেখ, বুদ্ধি দেখ ব্যাটার আমার! বলে 'কেস'! আমার কি আর এ কটা দিন 'কেস' দেখবার ফুরসৎ আছে, না জল খাওয়া নিয়ে থাকলেই চলবে? কুল্যে তেরটি দিন হাতে। পরাণে বাগ্দীর ষাঁড়টা সম্বন্ধে পাকা করে আসি একেবারে, অবশ্য কথা হয়ে রয়েছে। যেদিন দাদাকে দেখতে যাই, সেই দিনই পরাণে বাড়ী বয়ে এসেছিল কি না; বলে—দাদাঠাকুর, শুনলাম আপনি গোসাইপাড়ার পরেশ ঠাকুরকে হাতে করে নিয়েছেন, আমার ষাঁড়টারও গতি করে দিতে হবে এই মোহাড়ায়, জামাইঠাকুর বের্ষোৎসর্গ না করে তো পাকতে পারবেন না।···সস্তায় ছাড়বে, তবুও একবার পাকা করে আসি। বাগ্দীর মন তো।"

মুরারি ডাক্তার যখন পরেশ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ফিরিলেন, তখন প্রায় নয়টা হইয়া গেছে। বিধিমত তেতো মিষ্টি খাইয়া ঘট ঘট করিয়া খানিকটা জল পান করিয়া বলিলেন, "পরাণের কাণ্ডটা দেখলে তারু খুড়ো! সেদিন

ওপর-পড়া হয়ে বলে এল তো? আর আজ স্বচ্ছন্দে বললে কি না—'দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম বুঝি পরেশ ঠাকুর এ যাত্রা টি'কে গেলেন। তাই ও পাড়ার জনার্দ্দন ঠাকুরের জন্মে কথা দিয়ে ফেলেছি।'...পণ্ডিতপাড়ার জনার্দ্দন হালদার গো। সেদো ডাক্তার দেখছে...ওরা বোধ হয় হাতে দু একটাকা বায়না গুঁজে দিয়েছে, জেতে বাগ্দী তো—কথা উল্টে দিলে। তা, আমিও বলে এলাম, 'কথা দিয়ে কথা রাখলি না পরাণে, দেখিস্ জনার্দ্দন খুড়ো ডেংডেঙিয়ে সেরে উঠে তোকে কলা দেখাবে, এই প্রাতঃ-বাক্যে শাপ দিয়ে গেলাম'

তারু খুড়ো বলিলেন, "ঘোর কলি হয়ে দাঁড়াল। চার পো। তাইতো ভাবছি—পরেশ দাদা দিব্যি গেল—পুণ্যিবান লোক···"

মুরারি ডাক্তার মুখ বাঁকাইয়া কুলকুল করিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "আর দেরীর কথা যে বললি—দেরীটা হয়েছে কোথায় শুনি? পরশু সকালে দাদাকে হাতে নিয়েছি, আজ সকালে···"

হঠাৎ চৈতন্য হওয়ায় থামিয়া গিয়া ক্রুদ্ধভাবে মুখটা গোঁজ করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

তারু খুড়ো বলিলেন, "তা হলে উপায়?"

"উপায় মজাদীঘির হাট, চার কোশ পথ হেঁটে যেতে হবে এই বুধবার, উপায় তো নেই; পরেশ দা ভাববে মুরারির হাতে গেলাম, বৃষোৎসর্গটাও একটু চেষ্টাচরিত্তির করে করিয়ে দিতে পারলে না। কিন্তু সময় কৈ? আমি তো সেই কথাই ভাবছি—সময় কৈ। মাঝখানে আবার একটা চতুর্থীর হাঙ্গাম আছে।·· কৈ গো বিন্দু!...এই দেখ, তুই কাঁদতে বসলি। সামনে দু-দুটো কাজ, আর এইটে তোর কাঁদবার সময় হল?···তারু খুড়ো।"

'তারু খুড়ো একটু প্রশ্রয়ের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সময় তো নয়; কিন্তু শোক, সে তো আর সময় অসময় মানবে না···স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনকে কি বলেছেন?"

তামাক টানিতে লাগিলেন।

বিকাল বেলা মুরারি ডাক্তার, সুদাম ময়রা, গণেশ মুদী, অভয় ভট্চায প্রভৃতি কয়েক জনকে লইয়া প্রবেশ করিলেন, উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "কৈ, জামাই কোথায় গেলে? গিন্নীকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একটু কুমোরপাড়ায় চলে গিয়েছিলাম—জলটল একটু মুখে দিলে বিন্দু?···দুটো বাতাসা খেয়ে একটু জল খেয়েছে?··· আজ ওর বেশী কি পারে বাবাজী? মেয়ের প্রাণ তো? তুমি খানিকটা কাগজ আর কালিকলম নিয়ে এস তো, ফর্দ্দগুলো সেরে ফেলা যাক।"

ক্রমে ক্রমে তারু খুড়ো, নবীন ঘটক, ঘোষাল মশাই, হারুপণ্ডিত প্রভৃতি পাড়ার মাতব্বরেরা আসিয়া জুটিল। নানারকম মতামত, তর্ক, কেচ্ছাকাহিনীর মধ্য দিয়া অশেষ রকম আকার পরিবর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চতুর্থী আর শ্রাদ্ধের তালিকা দুইটা প্রস্তুত হইল। মুরারি ডাক্তার কাগজ-কলম ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, "নাও, বাবাজী এইবার একটু তামাকের জোগাড় কর দিকিন। একটা যেন বোঝা নেমে গেল।"

একটু খোসগল্প চলিল—পরেশ চক্রবর্ত্তীর জীবন লইয়া খানিকটা আলোচনা—জামাইয়ের শ্বশুরের প্রতি অচলা ভক্তি (যা কখনই ছিল না), জনার্দ্দন যদি মরে সে যেন পরেশ চক্রবর্ত্তীর ওপর না টেক্কা দেয়, শত্রুপক্ষ যেন বলিতে পারে—জামাইয়ে ছেলেতে ঢের তফাৎ—না, সে কেহই হইতে দিবে না,—গ্রামের বদনাম তো!

পিছনে যে যাহা বলুক, মুরারি ডাক্তারেরও প্রশংসার বন্যা ছুটিল, "কে করে আজকালকার দিনে শুনি? নিজের ভিজিট পকেটস্থ করলেই নিশ্চিন্তি···"

মুরারি ডাক্তার বলিল, "সমাজ আমার, স্বস্ত্যেন, শ্রাদ্ধ শান্তি এ সব করবে কি সিবিল সার্জ্জেন জেলা থেকে এসে?"

হারাণ পণ্ডিত লোকটা একটু কটুভাষী, তবে মিষ্ট করিয়া বলে, হাসিয়া বলিল, "বাঁচালে তো আর শ্রাদ্ধ করতে হয় না ভায়া···"

দলের সমস্ত প্রশংসার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি ছিলই, সুযোগ পাইয়া সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তারু খুড়া সামলাইয়া লইবার জন্য বলিলেন, "বাঃ, বলবে না? সুবাদে ওর নাতি হয়, ঠাট্টা করবে না?"

কিন্তু সামলাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না, ওসব কথা মুরারি ডাক্তারের এক কান দিয়া ঢোকে অপর কান

দিয়া বাহির হইয়া যায় তা ভিন্ন ওসব কথা ভাবিবার সময়ই বা কোথায় ?

চতুর্থীটা বেশ ভালভাবেই সম্পন্ন হইল। সবাই বাহবা দিল মুরারি ডাক্তারের। জামাই কৃতজ্ঞতার সহিত হাত জোড় করিয়া বলিল, "কাকা, আপনি না থাকলে, কি যে হত! আমার তো এই অবস্থা!"

মুরারি ডাক্তার বলিলেন, "দাদার কাজ দাদা নিজে করে নিচ্ছেন, আমার আর কি এ দিকে মন আছে বাবাজী? বৃষটা না এনে ফেলতে পারলে…বেটা বাগ্দীর পো কি ভীষণ ফেরে ফেললে যে। হঁ্যা বাবাজী, আমি সব জন মজুর বলে দিয়ে এসেছি—কাল সকালেই এসে পড়বে, দাঁড়িয়ে চারি দিকে পরিষ্কার টরিষ্কার করিয়ে নেবে, আমিও এসে পৌছুব, তবে আমার আবার একবার ন' গাঁয়ের চৌধুরীদের বাড়ী যেতে হবে—শামিয়ানা একটা চাই তো, বৃষোৎসর্গ ব্যাপার, খেলা নয় তো, সময় বুঝে রোদ্দুরের তেজটা দেখছ তো। হঁ্যা…রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ তিনটি দিন বাকি—বুধবার দিন মজাদীঘির হাট—চারটি কোশ পথ…বলছিলাম তুমি যদি ও ব্যাপারটা সেরে নিতে…"

জামাই মিনতির স্বরে বলিল, "আজ্ঞে আমার অবস্থা তো দেখছেনই—শেষে…"

"তা তো বুঝছি। যাব, আর করা যায় কি।… আজ আবার পেনো কুমোর এসেছিল, তার মাগটা পড়ে কি না। বললাম—'তুই কি ঠাট্টা করছিস পেনো? খুব ফুরসৎ দেখছিস আমার।' যাব, আর ষাঁড় কেনা তোমার কর্ম্মও নয়, বাবাজী…"

ষাঁড়েরও খুব তারিফ হইল। মুরারি ডাক্তারের পছন্দ, কিছু নয় তো নিজের হাতেই দশ বারটা ষাঁড় কিনিয়াছে. কিন্তু ষাড়ের প্রশংসা শুনিবার ফুরসৎই বা কোথায় মুরারি ডাক্তারের। একটা দিন ছিল না, সব ওলটপালট। সে সব সামলাইতেই একটা দিন গেল। শামিয়ানা আসে নাই, আবার যাইতে হইবে দেড় ক্রোশ পথ।

বলিলেন, "তা হলে তুমি নেমন্তন্নটা সেরে নাও জামাই বাবাজী, দুটো দিন লাগবে।"

জামাই বলিল, "আমায় অবস্থা তো দেখছেনই কাকা, তার ওপর এই নিদারুণ শোকটা যাচ্ছে…দুটো পা হাঁটতে গেলেই ভির্মি লাগবার মত হচ্ছে।"

"থাক তবে, একটা কাটিয়ে উঠতে উঠতে আর একটা না সুরু হয়। কোন রকমে সেরে নিতেই হবে…দেখ কাণ্ড, কেত্তনের কথাটা ভুলেই গেছলাম। সিদু চপ-ওয়ালীকেই কাল দিই বায়না পাঠিয়ে, হুগলীতে গিয়ে বাছাই করে আনবার তো আর সময় নেই। তবু আসরটা একেবারে খালি যাবে না…"

… … …

মহাসমারোহে শ্রাদ্ধকার্য্য চলিয়াছে। এদিকে বৃষোৎসর্গ—ওদিকে কীর্ত্তন—সভায় পণ্ডিতদের অনুস্বার বিসর্গের টঙ্কার—বাড়ীর উঠানে চাঁদোয়া খাটান হইয়াছে—তাহার একপ্রান্তে ভিয়েনের আয়োজন। গ্রামের মাতব্বরেরা সেইখানে জটলা করিতেছে। চারিদিক তদারক করিয়া মুরারি ডাক্তার উপস্থিত হইলেন। কাঁধে ফেলা গামছাটার কোণ দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "সন্দেশের পাকটার দিকে নজর রেখে যেও সুদাম। দেখো যেন সমুদ্র পেরিয়ে এসে গোষ্পদে না ডুবতে হয়…"

সুদাম বাঁ হাতে হুঁকা টানিতে টানিতে ডান হাতে একটা কাঠের হাতা দিয়া ছানা মাড়িতেছিল, বলিল, "সুদাম ময়রা কি মরে গেছে বাবাঠাকুর?…হঁ্যা, এ যা বলেছেন একটা কথার মত কথা, সমুদ্র পেরোনই বটে। আমি সেই কথাই তো তারু ঠাকুরকে বলছিলাম, বলি, হাতযশ বলি তো একে, যে দিকটা দেখ যেন গম্‌গম্ করছে, আর এই বাড়ীই তো আগেও ছিল…"

মুরারি ডাক্তার পাশ থেকে একটা কড়িবাঁধা হুঁকা তুলিয়া লইয়া, ক্ষেত্র ঘোষের হুঁকা হইতে কলিকাটা বসাইয়া দিলেন। তার পর তারু খুড়োর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আত্মপ্রশংসার মত হয় তাই বলি নি, তবে সুদাম নেহাৎ না কি কথাটা তুললে…দক্ষিণপাড়ার নিবারণ গো—মামা মারা যাওয়া অবধি সম্পত্তিটির লোভে আজ বোধ হয় ছয় সাত বছর ধরে তিথির কাকের মত বসে আছে… বলে 'মুরারি মামা আজ মাসখানেক ধরে রাঙা মামী পড়ে, না এদিক না ওদিক, আর তো কষ্ট চোখে দেখতে পারি না'…ঝুলো ঝুলি…বললাম 'দাঁড়াও বাপু, একটি যা হাতে নিয়েছি সেইটিই সামলে নিতে দাও আগে…' এই যে বাবাজী, পরিবেশনের লোকের অভাব হচ্ছে। চল, চল আসল কাজটা তো হল পরিবেশন…বলে মধুরেণ…"

দেওয়ালের আড়ালে গিয়া পড়ায় আর বাকীটা শোনা গেল না।

"যদি ও তবে" মূলক সুসমাচার

যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আমাদের উৎপাত সহ্য করেন, যদি তোমরা এই সুসমাচার শ্রবণ কর, যদি—, যদি—, যদি— ; তাহা হইলে —ঐ শান্তি ও স্বাধীনতা উড়িয়া আসিবেই আসিবে।

জীববিবর্ত্তনের ইতিহাস

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

আধুনিক যুগে বিবর্ত্তন (evolution) সম্বন্ধীয় মতবাদ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক মহলে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্ত্যে এই সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা মনুষ্যচিত্তে প্রাচীন কালেও জাগরিত হয়। ঐ সময়েও কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই বিষয়ে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস (Heraclitus) অত্যন্ত অস্পষ্টরূপে এই বিষয়ে তাঁহার ধারণা প্রকাশ করেন। থালেস-(Thales)-এর ধারণা ছিল যে, জল হইতেই বিবর্ত্তন দ্বারা সমস্ত জীবের উদ্ভব হইয়াছে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে বলা চলে যে, গৌতম বুদ্ধের মতে সর্ব্বপ্রকার জীবই প্রকৃতপক্ষে এক। উচ্চতম জীব, অর্থাৎ মনুষ্য সুকৃতির ফলে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয় ও দুষ্কৃতির ফলে নীচ জন্ম প্রাপ্ত হয়। নীচতম জীবও সুকৃতির ফলে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং মনে হয় যে, জীব-বিবর্ত্তন সম্বন্ধে গৌতম বুদ্ধেরও ধারণা ছিল। ইহা তাঁহার ধর্ম্মমতের সহিত বিশেষরূপে জড়িত ছিল, পৃথক বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে প্রচারিত হয় নাই। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ আছে কি না, জানা নাই। সুতরাং উহার আলোচনা এখানে করিব না।

প্রাণহীন বস্তু হইতেই যে জীবনের উদ্ভব হয়, পুরাকালে ইহা নিরাপত্তিতে মানুষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক ইহা অস্বীকার করেন। পাস্তার (Pasteur) কতকগুলি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাণহীন বস্তু হইতে প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নহে। আরিষ্টটল্ (Aristotle) বিশ্বাস করিতেন, নীল নদীর কর্দ্দম হইতে কুমীরের জন্ম হয়। এইরূপ উদ্ভট ধারণা সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে বোধ হয় আর কেহ প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতর ব্যক্তি ছিলেন না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সেই কালেও তিনি স্পঞ্জকে (sponge) এক প্রকার জীব বলিয়া বুঝিতে পারেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, আদিম প্রাণী অত্যন্ত সরল গঠন ও কোমল দেহবিশিষ্ট হইবে এবং উহা হইতেই একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করিয়া বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে। রোমক কবি ও দার্শনিক লুক্রেশিয়াস (Lucretious) তাঁহার একটি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বৃষ্টি ও সূর্য্যতাপের প্রভাবে মৃত্তিকা হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। সিসিলির দার্শনিক এম্পেডক্লেস (Empedocles) বলিয়াছেন যে, বহু জীবই জীবন-সংগ্রামে অকৃতকার্য্য হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগের ডারউইনের (Charles Darwin) মতবাদের সহিত এই উক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। লুক্রেশিয়াসের পরে বহু কাল যাবৎ বিবর্ত্তন সম্বন্ধে আর কেহই মতামত প্রকাশ করেন নাই। তাহার পর ইমানুয়েল কাণ্ট (Immanuel Kant) এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া সৌর-জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক মতবাদ প্রকাশ করেন। এই মতবাদ নীহারিকাবাদ (nebular hypothesis) নামে পরিচিত। বিবর্ত্তনও তিনি এই মতবাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। বহু-প্রাণীর কঙ্কালের গঠন-পদ্ধতি ও আরও কয়েকটি বিষয়ে ঐক্য দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সকল প্রাণীর উৎপত্তি একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে হইয়াছে। কাণ্ট-এর সমসাময়িক ফরাসী মনীষী ব্যুফঁ (Buffon) মেরু-মহাসাগরের জলে স্বতঃই জীবের বিবর্ত্তন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। যে সকল জীব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহাদের সম্বন্ধে ব্যুফঁর মত এই ছিল যে, গর্দ্দভ এবং অশ্ব একই পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত এবং সেইরূপ বানর ও মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষও এক। বহু জীবদেহে প্রাচীন অঙ্গাবশেষ (vestigial organs—যে সকল অঙ্গের চিহ্ন আছে, কিন্তু কোন ব্যবহার নাই) দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর জন্য পৃথিবীর জলভাগ ও স্থলভাগের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বের অবস্থায় যে সকল প্রাণী যেরূপভাবে জীবনযাপন করিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহাদের আর সেরূপভাবে থাকা সম্ভব হয় না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে অভ্যাসেরও পরিবর্ত্তন করিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে অবয়বেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। আবহাওয়া ও খাদ্য-পরিবর্ত্তনও

জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে। বুর্ফঁ এই তিনটিকেই বিবর্ত্তনের কারণ স্বরূপ উল্লেখ করেন। বুর্ফঁর পূর্ব্বে ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মাত্র বিবর্ত্তনের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কেহই ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। এই বিষয়ে বুর্ফঁ প্রথম চেষ্টা করেন, কিন্তু কতকগুলি অস্পষ্ট সাধারণ উক্তি ব্যতীত বিবর্ত্তনের কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত কারণ তিনি দেখাইতে পারেন নাই।

বুর্ফঁর একজন বিশেষ ভক্ত, ইর‍্যাজমাস ডারউইন (Erasmus Darwin) তাঁহার পরবর্ত্তীগণের সংগৃহীত তথ্যগুলি একত্রিত করেন। তিনি নিজেও কতকগুলি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করেন। ব্যাঙাচি যত বড় হইতে থাকে, উহার অবয়বও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হয় ও শেষে লেজ খসিয়া গিয়া ব্যাঙে পরিণত হয়। 'নিউ ফরেষ্ট'-এ (New Forest) অত্যন্ত দ্রুতগামী অশ্ব পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অশ্বগুলির সঙ্গমদ্বারা উৎপন্ন অশ্বগুলি যে কিরূপ দ্রুতগামী হইয়াছে, তাহা ঘোড়দৌড়ের অশ্ব দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ভিন্ন প্রদেশের অশ্বের সঙ্গম দ্বারা অতি সুন্দর অবয়ববিশিষ্ট অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রকারেই নানা-জাতীয় কুকুরও উৎপন্ন হইয়াছে, কোনটি বা অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট, কোনটি বা পশুশিকার করিতে পারদর্শী, কোনটি বা সর্ব্বাঙ্গে দীর্ঘলোমাবৃত ইত্যাদি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে সকল মেষ পাওয়া যায়, তাহাদের শরীরে লোম থাকে। কিন্তু শীতপ্রধান-দেশবাসী মেষগুলির শরীরে লোম থাকে না। উহাদের দেহ ঘন পশমাবৃত হয়। জল-বায়ুর প্রভাবই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। অভ্যাসের প্রভাবেও অবয়বের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহা দেখা গিয়াছে যে, যাহারা মস্তকোপরি ভার বহন করিতে অভ্যস্ত, তাহাদের ঘাড় যথেষ্ট চাপ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যাহাদের ঐরূপ অভ্যাস হয় নাই, তাহাদের দৈহিক শক্তি ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক হইলেও ভার-বহন-ক্ষমতা অনেক কম। বৈজ্ঞানিক মতে একশ্রেণীভুক্ত ভিন্ন প্রকার জীবের সঙ্গমে নূতন প্রকার বর্ণসঙ্করের উদ্ভবও সম্ভব হইয়াছে, যথা, অশ্ব ও গাধার সঙ্গমে অশ্বতরের সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর জীবদেহের গঠন-পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সাদৃশ্য ইরাজমাস ডারউইন লক্ষ্য করেন। এই সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, সকল জীবই একটি আদিম প্রাণী হইতে বিবর্ত্তনদ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। সাধারণ বানর, উচ্চতর বানর, যথা, সিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং ও গরিলা এবং মানুষের কঙ্কাল, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অবয়বের গঠন পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইরাজমাস ডারউইন ক্রমোন্নতি দেখিতে পান ও এই জন্যই সিদ্ধান্ত করেন যে বিবর্ত্তনের দ্বারাই বানর হইতে মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে।

তাঁহার মৃত্যুর পর জার্ম্মান পণ্ডিত লামার্ক (Lamarck) এই তত্ত্বই প্রচার করেন। লামার্কই আধুনিক বিবর্ত্তন-বাদের প্রতিষ্ঠাতা। লামার্কের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৭৯৪-৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যখন ইরাজমাস ডারউইন বিবর্ত্তনবাদ প্রচার করেন তখন জার্ম্মানীতে গ্যাটে (Goethe) এবং ফ্রান্সে জ্যফ্রয় হিলেয়ার (Geoffroy Saint Hilaire) এই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন। লামার্কের মতে মনুষ্যাদি সকল জীবই অন্যান্য নিম্নতর প্রাণী হইতে উৎপন্ন ও বিবর্ত্তন একটি বিশেষ নিয়মানুযায়ী হইয়াছে। ইহা কোন অলৌকিক ঘটনার ফল নহে। কতকগুলি জীবের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায় যে, তাহাদের শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে ও মনে হয়, ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া একই জীব হইতে ঐ জীবগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা লক্ষ্য করিয়াই লামার্ক তাঁহার ক্রমবিবর্ত্তনবাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রাকৃতিক প্রভাব, ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জীবের সঙ্গম দ্বারা নূতন শ্রেণীর জীবোৎপত্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহারই লামার্কের মতবাদের কারণ। সকল জীবই যদি ক্রমশঃ উন্নতিপ্রাপ্ত হইয়া উচ্চতর জীবে পরিণত হইয়া গিয়া থাকে, তবে নিম্নশ্রেণীর অবস্থান সম্ভব হয় না, কিন্তু নিম্নতর প্রাণীও যে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সুতরাং আধুনিক যুগে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী স্বতঃসম্ভূত হইয়াছে, ইহাই লামার্ক সিদ্ধান্ত করেন।

অভাববোধই প্রাণীচিত্তে প্রথমে অনুভূত হয় ও তৎপরে অবয়বের যেরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে ঐ অভাবপূরণ হইতে পারে, সেইরূপ পরিবর্ত্তনই হয়। এই চিন্তা করিয়া লামার্ক সিদ্ধান্ত করেন যে, জীবের অবচেতন মনের ইচ্ছাপূরণের জন্যই অবয়বের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। একশ্রেণীর জীব হয়ত যেরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইলে তাহার সুবিধা হয়, সেইরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

প্রাপ্ত হইয়া সেগুলির ব্যবহার দ্বারা উহা সক্রিয় রাখে এবং উহার সন্তান-সন্ততিগণও উত্তরাধিকারসূত্রে ঐগুলি প্রাপ্ত হয়, অন্য শ্রেণীর জীব হয়ত সেই প্রকার অঙ্গপ্রতঙ্গ পছন্দ করে না, সুতরাং কালক্রমে ঐ শ্রেণীর জীবের সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি লুপ্ত হইয়া যায়। জিরাফের অত্যধিক দীর্ঘ গলা প্রাপ্ত হওয়ার এই ব্যাখ্যা লামার্ক দিয়াছেন যে, উহারা যে সকল জঙ্গলে বাস করে, তথায় বৃক্ষগুলি অত্যন্ত উচ্চ, সুতরাং বৃক্ষপত্র আহার করিতে হইলে গলা দীর্ঘ হওয়া প্রয়োজন। খাদ্যসংগ্রহের সুবিধার জন্য জিরাফের মনে দীর্ঘ গলা পাইবার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছিল ও এই ইচ্ছাপূরণের জন্য উহাদের গলা পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া এখন যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ দীর্ঘ হইয়াছে। এই প্রকারেই অর্দ্ধ-দণ্ডায়মান বানর হইতে কালক্রমে সম্পূর্ণ-দণ্ডায়মান মনুষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। পিপীলিকাভুক্ প্রাণীর জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া এখন অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে সর্পের পূর্ব্বপুরুষগণের চারটি পা ছিল, কিন্তু গুঁড়ি মারিয়া চলা, স্বল্প-পরিসর স্থানের ভিতর দিয়া গতায়াত ও ঝোপের ভিতর লুকাইবার অভ্যাসবশতঃ উহাদের শরীর অত্যন্ত সরু ও লম্বা হইয়াছে ও এই অবস্থায় পা থাকিলে কোন ব্যবহারে লাগিবারই সম্ভাবনা নাই বরং অসুবিধারই কারণ, সেইজন্য পাগুলি লুপ্ত হইয়া আধুনিক সর্পের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ লামার্কের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন যে, জীবদেহের সকল প্রকার পরিবর্ত্তনই আকস্মিক এবং সে পরিবর্ত্তন যে সকল জীবের হয়, তাহারাই বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয় ও সন্তানোৎপাদন করে এবং কালক্রমে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও অপরগুলি লুপ্ত হইয়া যায়।

লামার্কের পরে চার্লস্ ডারউইন (Charles Darwin) জীববিবর্ত্তন সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে যে সকল প্রাণী জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়াছে, তাহারাই জীবিত থাকিয়া সন্তানোৎপাদন করিতে সক্ষম, সুতরাং যোগ্যতম জীবেরাই এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকে। যে সকল জিরাফের গলা দীর্ঘ, তাহারাই জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়াছে, কারণ তাহাদের পক্ষে খাদ্যসংগ্রহ সহজ হইয়াছে। নাতিদীর্ঘ গলাবিশিষ্ট জিরাফগুলি খাদ্যাভাবেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং এখন কেবল দীর্ঘগলাবিশিষ্ট জিরাফই দেখিতে পাওয়া যায়।

ডারউইন এবং ওয়ালেস (Wallace) একই সময়ে জীববিবর্ত্তন সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ইহা দেখা গিয়াছে যে, একই শ্রেণীর জীবের মধ্যেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভেদ আছে। সন্তানসন্ততিগণও উত্তরাধিকারসূত্রে ঐগুলি প্রাপ্ত হয়। যে জীবগুলির পরিবর্ত্তন জীবনধারণের সুবিধার দিকে হয়, সেইগুলিই জীবিত থাকে ও সন্তানোৎপাদন করে, অতএব পুরুষানুক্রমে সেই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হইতে থাকে। পরিবর্ত্তন, উত্তরাধিকার ও জীবনধারণের নিমিত্ত সংগ্রাম, এই তিনটিই বিবর্ত্তনের কারণস্বরূপ ডারউইন উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিনটি কারণের সমষ্টিকে ডারউইন 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (natural selection) আখ্যা দিয়াছেন।

একই শ্রেণীর দুইটি জীব কখনও সর্ব্ববিষয়ে একই প্রকার হয় না। একই পিতামাতার দুইটি সন্তান সকল বিষয়ে এক প্রকার হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরিবর্ত্তন একটি সর্ব্বজনীন ব্যাপার। পরিবর্ত্তনের দুইটি কারণ পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সন্তানে বর্ত্তন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব। মাতাপিতার প্রজনন-কোষস্থিত জীবপঙ্ক (protoplasm) হইতে সন্তানের উৎপত্তি হয়। এই জীবপঙ্কই মাতাপিতার বৃত্তিগুলি সন্তানের মধ্যে বহন করিয়া আনে। লামার্কের মত এই যে, প্রজনন-কোষের জীবপঙ্ক সকল প্রকার বৃত্তিই বহন করিয়া আনে। ডারউইনের মতে পিতৃমাতৃদেহের সকল অঙ্গ হইতেই গুণবাহী কণা প্রজনন-কোষে উপস্থিত থাকে ও সন্তানের মধ্যে সেই জন্যই মাতাপিতার সকল বৃত্তিই সঞ্চারিত হয়। স্যর ফ্রান্সিস গল্‌টন্ (Sir Francis Galton) পরীক্ষা দ্বারা ডারউইনের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। হ্বাইজমান (Weismann) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রজনন-কোষ এই ভাবে উৎপন্ন হয় নাই এবং যে জীবের দেহে উহা অবস্থান করে, তথা হইতে ইহার উৎপত্তি নহে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বিষয়ে ডারউইনের সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হইতেই পারে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ মনুষ্যদেহে কতকগুলি গ্রন্থি আবিষ্কার করিয়াছেন, যেগুলি হইতে রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই সকল গ্রন্থির রস শরীরে অন্য স্থানে যাইবার কোন পথ নাই। রক্ত যখন ঐগুলির ভিতর দিয়া যায়, তখন গ্রন্থি হইতে রস গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব-

শরীরে সঞ্চালন করে। এই গ্রন্থিরসগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধেও আধুনিক পণ্ডিতগণ কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। থাইরয়েড গ্রন্থির (thyroid gland) রস মস্তিষ্কের শক্তিবৃদ্ধির বিষয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পিটুইটারি গ্রন্থির (pituitary gland) রস অস্থিবৃদ্ধির সাহায্য করে। ইহা দেখিয়া জে. টি. কানিংহাম (J. T. Cunningham) বলেন যে, অন্যান্য শরীরযন্ত্রের কোষ সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিতে পারে, তাহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু গল্টন্ ও হ্বাইজমানের পরীক্ষার পরেও ইহা ডারউইনের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে, এরূপ বলা চলে না।

উত্তরাধিকারসূত্রে মাতাপিতার বৃত্তি সন্তানে বর্ত্তন সম্বন্ধে গ্রেগর মেণ্ডেল (Gregor Mendel) বিস্তারিত পরীক্ষা করিয়াছেন। লাল ফুল বিশিষ্ট একটি গাছ ও সেই শ্রেণীরই সাদা ফুলবিশিষ্ট আর একটি গাছ লইয়া উভয়ের সঙ্গম দ্বারা গাছ উৎপাদন করিলে তাহার ফুল গোলাপী বর্ণের হইয়া যায়। এক্ষণে যদি এইরূপে উৎপন্ন গোলাপী ফুলবিশিষ্ট দুইটি বৃক্ষের সঙ্গম ঘটান যায়, তবে উৎপন্ন বৃক্ষের একভাগ সাদা ফুলবিশিষ্ট, দুইভাগ গোলাপী ও এক ভাগ লালফুলবিশিষ্ট হয়। সাদা ফুলবিশিষ্ট গাছগুলির যদি ঐ প্রকার বৃক্ষের সহিত সঙ্গম ঘটান হয় তবে সাদা ফুলবিশিষ্ট গাছই পাওয়া যাইবে। লাল ফুলবিশিষ্ট গাছগুলি সম্বন্ধেও এইরূপই হয়, কিন্তু গোলাপী ফুলবিশিষ্ট গাছগুলির পরস্পর সঙ্গম দ্বারা উপরোক্ত ঐ তিন প্রকার ফুলবিশিষ্ট গাছই সমানভাগে উৎপন্ন হয়। জীব সম্বন্ধেও প্রায় একই প্রকার সিদ্ধান্তই প্রযোজ্য। প্রত্যেক জীবের প্রজনন-কোষই জীবপঙ্ক দ্বারা গঠিত। জীবপঙ্ক অতি ক্ষুদ্র দানারিশিষ্ট। ইহার ভিতরে একাংশ দেখিতে সামান্য কিছু ভিন্ন প্রকার ও বৃত্তের ন্যায়, ইহাকে কেন্দ্রক (nucleus) বলা হয়) এই কেন্দ্রকের ভিতরে অতি সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় বস্তু আছে। এই সূত্রগুলিকে 'ক্রোমোসোম' (chromosome) বলা হয়। রঞ্জক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে কেন্দ্রক ও ক্রোমোসোম দেখা যাইতে পারে। এক শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর প্রজনন-কোষে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রোমোসোম দেখা যায়। দুইটি প্রজনন-কোষে সমসংখ্যক ক্রোমোসোম না থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, ঐ কোষ দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে গৃহীত হইয়াছে। ক্রোমোসোমগুলিই পিতৃপিতামহের বিশেষত্ব সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে বহন করিয়া লইয়া যায়।

জীবন-সংগ্রাম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের একটি বিশেষ অঙ্গ। নিম্ন শ্রেণীর জীবজন্তুর অপত্যসংখ্যা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। একটি কড (cod) মৎস্য বৎসরে ৯০ লক্ষ ডিম্ব প্রসব করে। এই গুলির সমস্তই জীবিত থাকিয়া মৎস্যে পরিণত হয় না। ইহার অধিকাংশই মরিয়া যায়। অধিকসংখ্যক প্রাণীর জন্ম হইলেই স্থানাভাব ও খাদ্যাভাব আরম্ভ হয় এবং এই জন্যই যোগ্যতমগুলি ব্যতীত অন্য সকলগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যে জীবগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী নিজেদের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লইতে সক্ষম হয়, তাহারাই জীবিত থাকিতে সমর্থ হয়। এই পরিবর্ত্তনই জীববিবর্ত্তনের একটি কারণ বলিয়া ডারউইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভ্রূণতত্ত্বেও বিবর্ত্তনবাদের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ফন্ বিয়ার(K. E. von Baer) বহুকাল পূর্ব্বেই দেখাইয়াছিলেন যে, ভিন্ন শ্রেণীর জীবের ভ্রূণের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, যাহা পরিণত বয়সে দেখা যায় না। সম্বন্ধ বিচার করিবার আর একটি উপায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। জীবদেহের রক্ত ও অন্যান্য তরল রসের রাসায়নিক ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া জীবের সম্বন্ধ বিচার করা সম্ভব হইয়াছে। রক্তের রাসায়নিক ক্রিয়া পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখা গিয়াছে যে, উচ্চ শ্রেণীর বানরের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ অতি নিকট, কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর বানরের সহিত সেরূপ নিকট নহে।

বহুকাল হইতেই বিবর্ত্তন সম্বন্ধে ধারণা মনুষ্যচিত্তে জাগরিত হইয়াছে ও অদ্যাবধিও বিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার বহু চেষ্টাই হইয়াছে। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে কোন কারণ নির্দ্ধারণই সম্ভবপর হয় নাই। জীবদেহের বিভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়া এতই জটিল ও একের উপর অন্য যন্ত্রের ক্রিয়া এতই নির্ভরশীল যে, উহাদের প্রত্যেকটির পৃথক ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ অত্যন্ত কঠিন। শারীর বৈজ্ঞানিকগণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও দেহের সকল যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। বর্ত্তমানে জীবদেহের বহু নূতন যন্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে ও ঐ গুলির ক্রিয়া সম্বন্ধেও মনুষ্যের জ্ঞান নিত্যই বর্দ্ধিত হইতেছে। কালক্রমে এই সকল তথ্যসংগ্রহের ফলে বিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হইতে পারে।

আদর্শ শাসন

[শিল্পী—শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

জীবন-চিত্র

বিশ্বকর্ম্মার সংসারধর্ম্ম

—শ্রীবিজনবালা দেবী

দুপুর বেলা। মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে, তার সঙ্গে বাতাস। সকলেই বিছানা লইয়াছে। ঘুমের ঘোরে চট, কম্বল, সার্ট, কাপড়—যে যাহা হাতের কাছে পাইয়াছে, তাই মুড়ি দিয়াই ঘুমাইতেছে।

জানালা-দরজা বন্ধ করিয়া সুরুচি শুইয়া বই পড়িতেছেন। বিশ্বকর্ম্মা ঘুমাইতেছেন। প্রথমটা সোজা হইয়াই শুইয়াছিলেন, ক্রমশঃ শীত বোধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলাকৃতি হইলেন।

সুরুচি নিঃশব্দে উঠিয়া অতি সন্তর্পণে একখানা পশমী কাপড়ে বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ ঘুমটা মাটী করে দিলে!'

সুরুচি সহসা চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'কি ঘুম তোমার। এত আস্তে কাপড়টা গায়ে দিয়ে দিয়েছি, অমনি ঘুম ভাঙ্গল? কি জানি, আমাদের কাণের কাছে ঢাক বাজালেও ঘুম ভাঙ্গে না।'

'তুমি তো কুম্ভকর্ণ, তোমার মত কি সবাই। আঃ কি আরামে ঘুমটা হচ্ছিল! সব নষ্ট করে দিলে।'

'ঘুমোও না, মোটে ত' একটা বাজে—'

'না, আর কি ঘুম হয়। কাজ-কর্ম্ম সেরে ফেলি গে।' আড়ামোড়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন। দরজা খুলিয়া বাইরে অবস্থা দেখিলেন, বৃষ্টি কমিয়াছে; ছাতা মাথায় দিয়া বেশ বাহির হওয়া যায়।

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া পান খাইয়া সিগারেট ধরাইলেন। বলিলেন, 'ছাতাটা কই?'

সুরুচি বলিলেন, 'বারান্দায়।'

সমস্ত বারান্দা বিশ্বকর্ম্মা ছাতা খুঁজিলেন, তারপরে ঘরে আসিয়া দেখিলেন। আবার বারান্দায় গেলেন, 'কই ছাতা? ওরে আমার ছাতাটা কই? ব্যাটারা সব অজ্ঞান। রাতে কি চুরি করতে গিয়েছিল না কি? পড়ে ঘুমোচ্ছে সব। দেখ দেখি আমার ছাতা কোথা গেল।'

সুরুচি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দায় আসিলেন। বারান্দার দরজার কাছেই একটা ছোট বেতের টেবিলে বিশ্বকর্ম্মার দন্তধাবনাদির সরঞ্জাম থাকে, সেই টেবিলটার গায়ে ছাতা হেলানো রহিয়াছে। ছাতার মাথায় বিশ্বকর্ম্মার সদ্য ভিজা গামছাখানা চাপানো।

"নিজেই এখুনি হাতমুখ মুছে গামছা ছাতার মাথায় রেখেছ!—"

সুরুচি বলিলেন, 'এই তো ছাতা—'

'কই দেখিনি তো, ওখানে ছিল, না তুমি কোথা থেকে নিয়ে এলে?'

'নিজেই এক্ষুণি হাতমুখ মুছে গামছা ছাতার মাথায় রেখেছ, আর বাড়ী মাথায় করে তুলেছ! কোন গুণ নাই তোমার—কোন গুণ নেই, তাই আমার কপালে আগুন। কেবল সোরগোল করতে শিখেছ।'

ছাতা মাথায় দিয়া বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইলেন।

বৈকালে ফিরিয়া জলযোগ করিয়া বেড়াইতে বাহির হইবেন, এমন সময় বৃষ্টির বেগ বাড়িল।

ইজি-চেয়ারে শুইয়া ধূম পান করিতে করিতে বিশ্বকর্ম্মা বৃষ্টি ছাড়িবার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হইতেই চারিদিক ঘোর করিয়া মুষল ধারা আরম্ভ হইল।

"আহা, তাই যদি নাহি হবে গো।"

বারান্দায়ও জলের ছাঁট আসিতেছিল। বিশ্বকর্ম্মা ঘরে আসিয়া ডাক দিলেন, 'ওরে হারমোনিয়ামটা দে।'

দুই দিক্ হইতে গিরি ও নীহার ছুটিয়া আসিল। প্রভুর স্বর কাণে যাইবা মাত্র তাহারা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়াই ছোটে, প্রভু যে কি বলিলেন, সেটা বুঝিবার অবসর হয় কম।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'হারমোনিয়ামটা নিয়ে আয়।'

আলো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মা বাজাইতে বসিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা সুকণ্ঠ। মৃদু মৃদু সুন্দর গাহিতে পারেন, কিন্তু উচ্চ কণ্ঠে নয়। হারমোনিয়াম বাজাইতে পারেন না। অনেক মাষ্টার ফেল পড়িয়া গিয়াছে। গান তাঁহার মনে থাকে না, স্বরলিপি একেবারেই না। সা রে গা মা আজও ঠিক করিতে পারেন নাই, এজন্য কালী দিয়া রীডের উপর লিখিয়া লইয়াছেন।

প্রথমটা একচোট সুরে বেসুরে, তালে বেতালে বাজাইয়া বিশ্বকর্ম্মা আপন মনে একটা গান ঠিক করিয়া লইয়া গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সুরুচি রান্নাঘর হইতে শুনিতে পাইলেন—বিশ্বকর্ম্মা গাহিতেছেন—

'কেন বঞ্চিত হব চরণে,
আমি কত আশা করে বসে আছি'—

এমন সময়ে রসভঙ্গ হইয়া গেল! বিশ্বকর্ম্মা উচ্চস্বরে ডাকিলেন, 'ওগো কোথায় তুমি? শীগ্‌গীর এস, শীগ্‌গীর এস—সব মাটী।'

সুরুচি আসিয়া বলিলেন, 'কি, হয়েছে কি?'

'আমার মনে নেই। এর পরে কি বল দেখি? বেশ সুন্দর গাইছিলাম, সব মাটী হয়ে গেল।'

সুরুচি বলিলেন, 'আচ্ছা তুমি গাও, বলে দিচ্ছি।'

বিশ্বকর্ম্মা গাহিলেন—

'কত আশা করে বসে আছি'

সুরুচি বলিলেন—

'পাব, জীবনে না হয় মরণে।'

বিশ্বকর্ম্মা গাহিলেন—

'জীবনে না হয় মরণে।'

বলিলেন, 'তারপর?'

সুরুচি বলিলেন—

'আহা তাই যদি নাহি হবে গো'

বিশ্বকর্ম্মা গাহিলেন,

'আহা সেই যদি নাহি যাবে গো'

সুরুচি বলিলেন, 'এমন করে কি গান হয়। কাগজে লিখে দিচ্ছি।'

একখানা কাগজ পরিষ্কার করিয়া গানটি বলিলেন, 'এই নাও।'

বিশ্বকর্ম্মা বাজাইতে লাগিলেন। ঘরখানি মুখর হইয়া উঠিল। হারমোনিয়মটা সমস্ত শক্তি দিয়া তাঁর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সুরুচি ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

পাশের ঘরে ছেলেরা পড়িতেছিল, তাহারা উঠিয়া বাহিরে গেল।

এ দিকে বিশ্বকর্ম্মার আর এক মুস্কিল হইল। কাগজের দিকে নজর রাখিতে গেলে আঙ্গুল ঠিক পড়ে না, বাজনা বেতাল হইয়া যায়। আবার বাজনার দিকে মন দিলে গান গাহিতে পারা যায় না। একটা লাইন যদি তাল-মান সহ গাহিয়াছেন—ঠিক তার পরের লাইনটি এমনই ভাবে বেঠিক হইয়া যায় যে, বিশ্বকর্ম্মার নিজের কানেই তাহা বেসুরা বাজে।

ঘণ্টাখানেক অক্লান্ত শ্রম করিয়া অবশেষে বিশ্বকর্ম্মা হারমোনিয়ামটা পরিত্যাগ করিলেন। সেটা একটা করুণ তীক্ষ্ণ ধ্বনি করিয়া নীরব হইল।

সুরুচি ঘরে আসিয়া বলিলেন, 'গান হয়ে গেল?'

'নাঃ—ওসব স্বরলিপি-টিপি কিছু না। আমি প্রায় গানটি ধরে ফেলেছিলাম, কিন্তু শেষটায় কেমন বেতাল হয়ে গেল। আর স্বরলিপি দেখে কখনো গান শেখা যায়? একটা গান শিখতে ছ'মাস লেগে যাবে তা হলে। নিজের মনে বাজিয়ে যাবে, গলা মিশে গেলেই গান ঠিক হয়ে আসবে।'

বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গিয়া পাদচারণা করিয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিলেম। বৃষ্টি থামিয়া আধ-জ্যোৎস্নার আলো ফুটিয়াছে।

বেড়াইতে বেড়াইতে খোলা জানালা-পথে ছেলেদের ঘরে নজর পড়িল; ঘরে আলো জ্বলিতেছে—কিন্তু কেহ নাই।

বলিলেম, 'এরা গেল কোথা?'

গিরি বলিল, 'ঐ দিকে বেড়াচ্ছে।'

'লেখাপড়া ছেড়ে বেড়াতে যাওয়া হয়েছে! মাস মাস মাইনে দেওয়া আর বই কেনা, তা ছাড়া আর লেখা-পড়ার সম্পর্ক নেই। এক এক জন যা হবেন, বুঝতেই পারছি—কতকগুলো মূর্খ তৈরি হচ্ছে কেবল।'

ঠাকুর গরমের জন্য কাজের ফাঁকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'রান্না হয়েছে?'

সে বেচারী প্রভুকে দেখিতে পায় নাই। চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'হয়েছে।'

'যাও—খাবার দাও।'

ছেলেরা বেশী দূর যায় নাই, ঘুরিয়া বাড়ীর ভিতর আসিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া আসনে বসিলেন। তাহারা আবার অন্য দিক দিয়া গিয়া নিজেদের ঘরে ঢুকিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ওরা আসেনি এখনও?'

সুরুচি বলিলেন, 'এসেছে।'

'খাবে না? ওদের জায়গা কই?'

'খাবে পরে।'

'আবার পরে কেন? এক সঙ্গে খাওয়াই তো ভাল। ওদের জায়গা দিতে বল!' নিরুপায় কমল-রা আসিয়া বসিল। বিশ্বকর্ম্মার সামনে কেহ সহজে আসিতে চাহে না। তাঁর কাছে বসিয়া খাওয়া—সে যে কত কঠিন তারাই বোঝে।

বিশ্বকর্ম্মা এক একবার চাহিয়া দেখিতেছেন, কমলকে বলিলেন 'খেতে ঐ রকম শব্দ হয়? খেতেও শিখিস নি না কি?'

অতঃপর কমল অচর্ব্বিত অন্ন গিলিতে লাগিল।

ও পাশে বসিয়াছে অহি। বলিলেন, 'খাওয়া হল এর মধ্যে? ভাত নিবি নে?'

'না আর চাই না।'

'কেন? অমন দুটো ভাত আবার খায় কি? অল্প বয়স। দিব্যি খেতে পারবে তা নয়। অন্নপ্রাশনের অন্ন মুখে দিয়ে উঠে পড়েন। চেহারাও হচ্ছে তেমনি, যেন দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে এসেছেন—ঠাকুর, অহিকে ভাত দাও।'

সুশান্ত একটু দূরে বসিয়া ছিল—সে দূরেই বসে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ঠাকুর, ওকে মাছ দিলে না?'

সুরুচি বলিলেন, 'ও মাছ খায় না।'

'মাছ খায় না কেন? বাঙ্গালীর ছেলে মাছ না খেকে

শরীর থাকবে কি করে? কেন রে? এক একজন যেন এক এক সং—'

সুরুচি বলিলেন, 'যার যার পছন্দ মত তো খাবে? ঐ জন্যে তোমার কাছে খেতে বসতে চায় না।'

'কেন, আমি কি ওদের মুখ ধরে রাখি? দেখি একটা কাঁচালঙ্কা দাও।'

কাঁচালঙ্কা ভাঙ্গিয়া লইয়া বলিলেন, 'এ লঙ্কা কে এনেছে?'

'কেন গো—কি হয়েছে?'

'একটু ঝাল গন্ধও নেই। দেখতেই লঙ্কা। এনেছে হাতীশুঁড়ো লঙ্কা তা ঝাল হবে কি? সূর্য্যমুখী লঙ্কা আনেনি কেন? জিনিসপত্র যদি কিনতে শিখে থাকে এখনো।'

সুরুচি রান্নাঘরে গেলেন। বিশ্বকর্ম্মার দুধ ঠাকুরের হাতে পাঠাইয়া বাকী দুধটা ভাগ করিতে যাইবেন।

এমন সময়ে দুধের বাটী ধরিয়াই বিশ্বকর্ম্মা চীৎকার ছাড়িলেন, 'গাধা বেকুবের দল! এমনি করে গরম করে? এ কি খেতে দেওয়া না পুড়িয়ে মারা?'

সুরুচি দ্রুত আসিয়া বলিলেন—'বাব্বা, এক দণ্ড যদি সরেছি—অমনি কুরুক্ষেত্র বেধে যায়! কি হয়েছে?'

'দেখ দেখি আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেল! এই রকম করে গরম করে? ঠাকুরটা এমন মূর্খ—'

'ঠাকুরের দোষ নেই। আমি নিজে গরম করে পাঠিয়েছি। তেমন গরম করেনি যে হাতে ফোস্কা পড়বে, দেখি'—দুধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'এই? এটুকু গরম তোমার সয় না? এ তো একটুও বেশী নয়।'

'আমার হাত কি লোহার যে গরম সইবে? এখন একটু ঠাণ্ডা হয়েছে—তাই হাত দিতে পেরেছ।'

অতঃপর আর কোন গোলযোগ হইল না। সকলের খাওয়া হইল। টেবিলে পান-সিগারেট মশলা আছে—যেটা খুসী খাইবেন। এলাচের খোসা ছাড়াইয়া মুখে ফেলিয়া বলিলেন, 'কি এলাচ! জ্বাল দিয়ে সব নির্য্যাস বার করে নিয়েছে—তাই আনা!'

দারচিনি চিবাইয়া বলিলেন, 'তথা দারচিনি! কি স্বাদ! যেন কাঠের টুক্‌রো চিবোচ্ছি! আচ্ছা তোর পয়সা দিয়ে 'কানা পেয়াদার হাতের মার' খাস কেন ব' দেখি?'

সুরুচি বলিলেন, 'যা চালান আসে তাই তো আনবে?'

'কে বললে এমন ছাই মাটী চালান আসে? অন্য লোক পায় কি করে? এই যে লোকের বাড়ী পান-টান খাই, কি সুন্দর মশলা! আমার পয়সার দুর্দ্দশা এই রকমই হয়।'

'পরের বাড়ীর সব ভাল, নিজের বাড়ীর সব মন্দ, এটা দুনিয়ার নিয়ম, কেবল তোমার নয়। তা নিজে বাজারে গেলেই হয়।'

'আমি গেলে ঢের ভাল জিনিস আনতে পারি।'

'তা জানি, সেই একবার একটা মাছ এনেছিলে— ফুলে যেন বালিশ! এনে তো বললে—'দেখ এসে কেমন লাল টক্‌টকে তাজা মাছ'—হাত দিয়ে দেখি লাল টক্‌টকে বটে, কিন্তু পচা। তোমার বাজার যাওয়া সেই প্রথম, সেই শেষ! আবার গেলে তেমনি কিছু আসবে।'

'আরে হ্যাঁ, যত সব বাজে কথা। আমি ঐ রকম সব আনি কি না?' বলিতে বলিতে বিশ্বকর্ম্মা সরিয়া গেলেন।

একটু পরে বলিলেন, 'দেখি একটা লেবুর রস আর জল। খাওয়াটা একটু বেশী হয়েছে।'

সুরুচি বলিলেন, 'লেবু নেই।'

'লেবু নেই? কেন নেই? যা দরকার কোন দিন তা পাওয়া যাবে না, এ' আমি চিরকাল দেখে আসছি— তোমাদের কাণ্ডখানা কি?'

'তোমার কাণ্ডখানা কি? দু'খানা মাথা হল তোমার জুতোয়—একখানা মাখলে পায়ে। ছিল তো একটা। আর থাকবে কি? এ বেলা বৃষ্টির জন্যে বাজার হয় নি।'

কমল ভাল করিয়া দেখিয়া লইল যে, বিশ্বকর্ম্মা সরিয়া গিয়াছেন কি না; তারপর বলিল, 'আচ্ছা উনি কি করে

. টর পান ? যে দিন যে জিনিষটা থাকবে না ঠিক সেইটিই .স দিন চেয়ে বসবেন।

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'কি জানি, দিব্যদৃষ্টি আছে হয় তো। এমনি তো কোন দিকে লক্ষ্য নেই। কিন্তু ঠিক যেটি নেই সেইটিই চাইবেন। এ আমি সেই ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি।'

'আচ্ছা। সূর্য্যমুখী লঙ্কা কাকে বলে ? সে জানিনে তো !'

'দেখিস নি ? অনেক গাছে লঙ্কা ওপর দিকে খাড়া হয়ে সূর্য্যের দিকে মুখ করে থাকে।'

'তা দেখেছি—আমাদের বাড়ীতেই তো হয়েছিল।'

'সেই সূর্য্যমুখী, সে খুব ঝাল।'

'আর হাতীশুঁড়ো ?'

'যে লঙ্কা পাতার নীচে হাতীর শুঁড়ের মত নীচের দিকে ঝুলে থাকে, আগা একটুখানি বাঁকানো। সে তত ঝাল হয় না।'

'কিন্তু কি করে জানা যাবে ? গাছ শুদ্ধ দেখলে তবে বলতে পারা যায়। এবার লঙ্কাওয়ালাদের বলব যে, বাপু তোমরা গাছ শুদ্ধ উপড়ে এন, আমরা হাতীশুঁড়ো কি সূর্য্যমুখী বেছে নেব।'

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'রকম তাই হয়েছে। খাবেন তো আধখানি, সোর গোল করবেন রাজ্যি শুদ্ধু। আমি যে এত ঝাল খাই, আমার তো মনেও হয় না যে, সূর্য্যমুখী না চন্দ্রমুখী! এতও জানেন!"

"যা দরকার কোন দিন তা পাওয়া যাবে না, এ আমি চিরকাল দেখে আসছি।"

মায়া-ফাঁস

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

মাটির দেয়াল, খড়ের কুটীর,
গোময়ের উচ্ছ্বাস;
সহসা শুনিনু আড়ালে তাহারি
শিশুমুখে কলহাস!
কত প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলি,
প্রাণ-খোলা হেন শুনি নি কাকলী,
এ হাসি হেথায় আসিল কেমনে
ব্যথা যেথা বারো মাস ?

ছেলে কথা বলে মার বাহু-পাশে
ধরিয়া তাহার গেই
আমার গানের পেন্সু স্বরলিপি
সংক্ষেপে তাহা এই :—
মা কি আজ তার হল মহারাণী
'আধলা'র ঠাঁই দিয়েছে 'এক-আনি'
মুড়ির বদলে কিনিতে মিঠাই,—
অন্ধ রে মায়া-ফাঁস!

বিদ্যাসাগর ও তাঁহার বাঙ্গালা গদ্য-ভঙ্গী

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

ঊনবিংশ শতাব্দী বাঙ্গালীর জীবনে নানা দিক্ দিয়া যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা গদ্য রচনার প্রচেষ্টা এই শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য রচনার মূলে যেমন একটা সুপ্রাচীন সংস্কার আছে, গদ্যে তেমন কিছুই নাই। গদ্য নিতান্তই এ যুগের সৃষ্টি। পাশ্চাত্য প্রভাবে ও ইংরাজী-শিক্ষার ফলে বাঙ্গালীর জাতীয়, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবনে এই যুগে যে বিদ্রোহ ও নব-অভ্যুত্থানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই ফলে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য, তথা বাঙ্গালা গদ্যেরও জন্ম হইয়াছে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দকে আধুনিক যুগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।* বিদ্যাসাগরের রচনাকাল ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেরও পরে। বিদ্যাসাগরের রচনার অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই গদ্য-রচনার প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং বিদ্যাসাগর-পূর্ব্ব গদ্য-রচনার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্য-লেখকগণের সহিত তাঁহার যোগসূত্র কোথায় এবং তাঁহার অভিনবত্ব ও নূতনত্ব কোথায়।

১৮০০-১৮৪০, এই চল্লিশ বৎসরে, অর্থাৎ বিদ্যাসাগর-পূর্ব্ব বাঙ্গালা গদ্য-রচনার যে সকল বিভিন্ন প্রচেষ্টা, তাহা প্রধানতঃ মিশনারীদিগের উদ্যোগে। তৎপরে দেশীয় লেখকদিগের লিখিত কয়েকটি পুস্তক এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্য পুস্তক রচনাকে আশ্রয় করিয়া যে গদ্য-সাহিত্য, তাহাই প্রধান। প্রথম যুগের গদ্যরূপের বিভিন্ন প্রচেষ্টা বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে যে অন্যতম আদর্শের স্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত গদ্যের মূলে ভাষাসৃষ্টির জন্য যে শিল্পজ্ঞান প্রয়োজন, তাহার বড়ই অভাব দেখিতে পাই। এই যুগের গদ্যরূপের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, যেন এক উচ্ছৃঙ্খল জনতার একে অন্যকে অনর্থক আঘাত করিতেছে—কেহই অব্যাহতভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই সময়কার লেখকদিগের মধ্যে একমাত্র মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে ভাষা-সৃষ্টির জন্য যে শিল্পজ্ঞান প্রয়োজন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সে জ্ঞানও অর্দ্ধজাগরিত, মৃত্যুঞ্জয় সজ্ঞানে তাহার রূপ দিতে পারেন নাই। তবে মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' হইতেই বোঝা যায় যে, পরবর্ত্তী কালের বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপ সেই বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট, বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য। বিদ্যাসাগরের রচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পূর্ব্বের সেই উচ্ছৃঙ্খল জনতা যেন সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত ও সুসংযত হইয়া উঠিয়াছে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপের সহিত পূর্ব্বযুগের গদ্যরূপের তুলনা করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগরের ভাষা এবং ভাষার এই যে সংস্কার, ইহাই তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি। বিদ্যাসাগরের ভাষার পরিচ্ছন্নতা ও শ্রী দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, গদ্য ভাষা যেন জড়তা ও আড়ষ্টতা ত্যাগ করিয়া মুক্তি পাইল। তাঁহার গদ্যেই প্রথম একটা সুশ্রীরূপ ফুটিয়া উঠিল—ভাষা রসাল, প্রসাদগুণসম্পন্ন, স্বচ্ছন্দ ও সুনমনীয় হইয়া উঠিল। গদ্য ও পদ্যের মত তাল দিয়া ছন্দের সঙ্গে থামিয়া থামিয়া চলিতে পারিলে যে, তাহা সুখশ্রাব্য ও সুখপাঠ্য হয়, বিদ্যাসাগর তাহা সর্ব্বপ্রথম বুঝিয়াছিলেন।

এই উপযুক্ত স্থানে থামিবার রীতিটি না জানা থাকায় বিদ্যাসাগর-পূর্ব্ব গদ্য বড়ই দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। একাধিক বাক্য চলিয়াছে তো চলিয়াছেই—কোথাও যে থামিবার তাগিদ আছে, সে জ্ঞান লেখকের নাই। ফলে দীর্ঘবাক্যের সূত্রের পিছনে ধাওয়া করিয়া অর্থ করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিত। বিদ্যাসাগরের সহজ ভাষাজ্ঞানের নিকট এই দুর্ব্বোধ্যতা ধরা পড়িয়াছিল, তাই তিনি এক একটি বাক্যের পর যেখানে থামিতে হইবে, সেইখানে ছেদচিহ্ন দিয়া গদ্যকে সুখপাঠ্য ও সুখবোধ্য করিয়া তুলিলেন। এই ছেদচিহ্ন ব্যবহার করাতেই গদ্যের ছন্দ ও তাল পাঠকের কাছে সহজে

* History of the 19th. Century Bengali Literature, Dr. S. K. Dey

ধরা পড়িল এবং ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর তখন কমা-চিহ্ন ব্যবহারেরও প্রয়োজনীয়তা বুঝিলেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার রচনার মূলে সংস্কৃত ভঙ্গীর যে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান, তাহাই তাঁহার রচনাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপের মূলে সংস্কৃত ভাষা-ভঙ্গীর যে গাম্ভীর্য্যমূলক ও ওজোগুণান্বিত আদর্শ ছিল, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তিনি বাঙ্গালা গদ্যভাষার এক সাধুরূপ সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সংস্কৃত রীতিকে আশ্রয় করা সত্ত্বেও তাঁহাদের রচনাকে প্রকৃত বাঙ্গালা রূপ দান করিতে পারেন নাই—যেমন মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের এই কৃতকার্য্যতার কারণ, ভাষা-সম্পর্কে তাঁহার এক সহজ বোধশক্তি (instinct)। ইহা তাঁহার ছিল বলিয়াই বাঙ্গালা গদ্যরূপের একটি সজীব রূপ তিনি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। সংস্কৃত রীতিকে আশ্রয় করিয়া অত্যধিক সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহারের জন্য অনেকেই তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। এই অভিযোগই সাধারণতঃ 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' নামে পরিচিত। কিন্তু বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিতান্তই অমূলক। বিদ্যাসাগরের রচনা সম্পূর্ণ রূপে বাঙ্গালা রীতি অনুযায়ী। আপাত-দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের রচনাতে যে সংস্কৃত রূপ দেখা যায়, তাহার কারণ, সেই যুগে গদ্য-রচনার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল।

গদ্যের গাম্ভীর্য্য (dignity) ও মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনিবার্য্য কিছু সংস্কৃত বাচন-ভঙ্গীর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, সংস্কৃত বাচন-ভঙ্গীর প্রভূত আশ্রয় লইয়াও তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী অনেকের গদ্য যেরূপ দুর্ব্বোধ্য ও আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার পক্ষে সেইরূপ হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অনেক লেখকের নিকট যাহা পরধর্ম্ম বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার একান্ত স্বাভাবিক ভাষাজ্ঞান ছিল বলিয়াই তাহা পারিয়াছিলেন। তিনি গদ্যরূপের আরও ক্ষিপ্রতা কিংবা লঘুতার আশ্রয় দিতে না পারিতেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার আদর্শ, অর্থাৎ যে শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে তিনি গদ্য-রচনা আরম্ভ করেন, সেই আদর্শ তাহা হইলে পদে পদে ব্যাহত হইত। সংস্কৃত ভাষা-রূপের মধ্যে, অর্থাৎ সংস্কৃত style-এর মধ্যে যে classical dignity আছে, তাহা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ভাষা-রূপের সেই বিমুগ্ধ কল্পনা লইয়াই তিনি বাঙ্গালা গদ্যের রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন;—সেই জন্যই স্বেচ্ছায় তিনি বাঙ্গালা গদ্যের মধ্যেও সংস্কৃত শব্দ ও ভঙ্গী ব্যবহার করিয়া একটা সাধু ও বলিষ্ঠ গদ্যরূপ সৃষ্টি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অপর পক্ষে কথ্য ভাষার ছাঁচও তাঁহার ভাষার মধ্যে পাওয়া

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)।

যায়, কিন্তু তাহা কোথায়ও লঘুত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। কয়েকটি অতি-পরিচিত নমুনা হইতেই স্পষ্টভাবে ব্যাপারটা বুঝা যাইবে:—"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি, এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরপটল সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়।"[১]

"একে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর রাত্রি সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা তাহাতে আবার ঘনঘটা দ্বারা গগনমণ্ডল

১। সীতার বনবাস।

আচ্ছন্ন হইয়া মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, আর ভূত-প্রেত চতুর্দ্দিকে ভয়ানক কোলাহল করিতেছিল[২]।"

"যদি ক্লান্তবোধ হইয়া থাকে আমার গলদেশে ভুজলতা অর্পণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম কর[৩]।"

উপরি উক্ত অংশগুলি তাঁহার পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় প্রথম সংস্করণের যে যে স্থানে কোন প্রয়োজন নাই, সেইরূপ অনর্থা অপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত শব্দ বা দীর্ঘ সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার তিনি তুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তাঁহার রচনার মধ্যে সংস্কৃত সমাসবহুল পদের আধিক্য থাকাতে ভাষা মন্দ-গতি হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহার সহজাত শিল্পপ্রবৃত্তি দ্বারা যখনই ইহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার ভাষা অপূর্ব্ব সরলতার আশ্রয় গ্রহণ করিল। কথামালা হইতে তাঁহার ভাষা যে কিরূপ সরলতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। "একদা এক দোকানে মধুর হাঁড়ি উল্‌টিয়া গেল।" বেতাল অথবা সীতার বনবাসে বিদ্যাসাগর এখানে দোকানের পরিবর্ত্তে বিপণি অথবা আপণে লিখিতেন, উল্‌টিয়া গেল না লিখিয়া অধোমুখে নিপতিত হইল, অথবা বিপর্য্যস্ত হইল লিখিতেন। কথামালা হইতেই তাঁহার ভাষা সরল হইয়া আসিয়াছে। সরল ভাষা যখন তিনি ব্যবহার করিয়াছেন (গল্প, কাহিনী ইত্যাদি বর্ণনায়), তখন তাঁহার ভাষা সরল হইলেও কোথায়ও হাল্কা বা তরল হইয়া পড়ে নাই, আবার প্রয়োজনবোধে বর্ণনার সময় (১ ও ২ দ্রষ্টব্য) যখন তাঁহাকে গুরু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে, তখনও তাঁহার ভাষা জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে নাই।

চলতি ভাষার রীতিকে সুন্দর ও মসৃণ করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এই ভাষার আদর্শ পাওয়া যায় লোকের মুখের কথার মধ্যে। কিন্তু সাধুভাষার একটা রূপ গড়িয়া তোলা অপেক্ষাকৃত কঠিন; যথাস্থানে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা, শব্দগুলিকে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা অনুসারে বাক্যের মধ্যে সন্নিবেশিত করা, সমস্ত গদ্যপ্রবাহের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ-গতি স্থাপন করা, এইগুলি মাত্র তিনিই পারেন, যাঁহার মনে একটা সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ আছে। বিদ্যাসাগরের এই শিল্পজ্ঞান ছিল বলিয়াই তিনি বিশৃঙ্খল, বিসদৃশ বাঙ্গালা গদ্যকে কলাবন্ধনের দ্বারা বাঁধিয়া সৌষ্ঠবপূর্ণ ও বলিষ্ঠ গদ্যরীতি সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই বিদ্যাসাগরকে বাঙ্গালা গদ্যের আদিশিল্পী বলা চলে।*

বিদ্যাসাগর-রচিত সাহিত্য সমালোচনা করিতে হইলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য সৃষ্টি করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, প্রথমতঃ গদ্যভাষা সৃষ্টি করা এবং দ্বিতীয়তঃ জাতীয় ভাষায় জাতির শিক্ষাবিস্তারই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং সেই প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁহার গদ্য-রচনার সূত্রপাত।

সাহিত্যসৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি মোটেই সচেতন ও সজ্ঞান ছিলেন না। মাতৃভাষায় শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রসার এবং তজ্জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা, ইহাই তাঁহার মূল অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপের মধ্যে যদি কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার সজ্ঞান সৃষ্টি নয়—প্রমাণ, তাঁহার রচনার মধ্যে মৌলিক সাহিত্যের অভাব।

বিদ্যাসাগরের রচনার মূলে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের তাগিদ থাকাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনুবাদেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং এই অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টি তাঁহার মানস প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ধারাতেই মুক্তিলাভ করিয়াছে। এখানে মনে হইতে পারে যে, বিদ্যাসাগরের মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, বিদ্যাসাগরের সে ক্ষমতা ছিল, তবুও তিনি যদি তাঁহার ভাষা-শক্তির অদ্ভুত ক্ষমতা ভাষাসৃষ্টির জন্য প্রয়োগ না করিয়া মৌলিক সৃষ্টিতে মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করিতেন।

অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টি বিদ্যাসাগরের মানসপ্রকৃতি অনুযায়ী স্বাভাবিক হইয়াছে। বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্য তাঁহার মৌলিক রচনা অপেক্ষা অনুবাদ সাহিত্য দ্বারাই অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়াছে। অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টিতে সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরের যে অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই বাঙ্গালা গদ্যের কিছু উন্নতি হইয়াছে।

এই অনুবাদ-সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র

২। বেতাল পঞ্চবিংশতি। ৩। সীতার বনবাস।

* চারিত্রপূজা। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "A mere primer maker"। কথাটার মধ্যে ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া সত্য আছে, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের ধারা ও তাহার ক্রমবিকাশ ও ক্রম-পরিণতিকে বিচার করিয়া দেখিলে শুধু তাঁহাকে 'mere primer maker' বলিয়া এক পাশে অপাংক্তেয় অবস্থায় ফেলিয়া রাখা চলে না। বিদ্যাসাগরকে বাঙ্গালা গদ্যরূপের ক্রম-পরিণতির ইতিহাসের মধ্যে অপাংক্তেয় হিসাবে ত্যাগ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র যে-ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়াইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিশ্লেষণ ও বিচার করার মধ্যে একটা মস্ত ফাঁক থাকে।

বিদ্যাসাগরের যাহা কিছু দান, তাহা ভাষা-সম্পর্কে, যাহা কিছু সার্থকতা, তাহা বাস্তবিক primer maker হিসাবে, কিন্তু primer maker হিসাবে বিদ্যাসাগরকে পাইলেও তাহাতে তাঁহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং বিদ্যাসাগরের নিজেরও বোধ হয় primer maker অপেক্ষা সাহিত্যিক দাবীর অভিমান ছিল না। এই primer maker-এর বাঙ্গালা গদ্যের একটা সুষ্ঠুরূপ সম্মুখে পাইয়াছিলেন বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গদ্য ভাষার রূপ দিবার জন্য একটি আদর্শও পাইয়াছিলেন। ইহা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভাবান্ স্রষ্টা বিদ্যাসাগরের ভাষারূপের আদর্শ সম্মুখে না পাইলেও আপনার প্রতিভাবলে স্বীয় ভাষারূপ সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষা আদর্শরূপে সম্মুখে পাওয়াতে তাঁহার পথ কিঞ্চিৎ সুগম হইয়াছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগরের ভাষার আদর্শের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে বাণীরূপ দান করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগরের যুগে কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হইলেও মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। ইহা এই যুগের একটি প্রধান বিশেষত্বের অন্যতম। এই সময়ে শুধু গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা জন্মিয়াছে এবং গদ্যরূপ যে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালার একটি প্রধান বাহন হইয়া উঠিবে, তাহার উদ্ভব ও পরিণতির আভাস এই সময় হইতেই পাওয়া যায়। সুতরাং এই যুগকে গদ্যের একটি পরীক্ষা যুগ (experimental age) বলা চলে। প্রকৃত গদ্য-সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল আরও অনেক পরে, অর্থাৎ বঙ্কিমের সময়। কিন্তু বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের (১৮৪০-৬০) গদ্য-ভাষা-সৃষ্টির চেষ্টায় বিদ্যাসাগরকেই বিশিষ্ট নেতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই সময়ে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি না হইলেও গদ্যভাষা একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেই গদ্যরূপকে আশ্রয় করিয়াই পরবর্ত্তী কালের মৌলিক রচনার পথ সুগম হইয়া উঠিয়াছিল—কেন না ভাষা না হইলে সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রকৃত গদ্যরচনার ক্ষমতা বিদ্যাসাগরের ছিল, তাঁহার কল্পনায় ও প্রকৃতিতে কোন উচ্চ কল্পনা বা ভাববিলাস ও বাষ্পাচ্ছন্নতা কোন দিনই স্থান পায় নাই—জীবনের বাস্তব প্রত্যক্ষের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি ছিলেন যাহাকে বলে খাঁটি prose man, সেই জন্যই তাঁহার হাতে গদ্যভঙ্গী একটা বলিষ্ঠ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এইখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিভিন্নতা বঙ্কিমের মানস-প্রকৃতি ছিল কাব্যময়—অতি-প্রাকৃতিক ও প্রাকৃত সকলই তিনি গ্রহণ করিতেন, তাই তিনি কবি ও স্রষ্টা এবং তাঁহার গদ্যও তাঁহার মানস-প্রকৃতি অনুসারে কাব্যময়। বঙ্কিমের সার্থকতা যেমন সাহিত্যসৃষ্টিতে, তেমনই বিদ্যাসাগরের সার্থকতা গদ্যভাষা-সৃষ্টিতে।

বিদ্যাসাগরের ভাষা দিয়া একটি বলিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রস্তরমূর্ত্তি প্রস্তুত করা চলে মাত্র, সে মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয় প্রাণ আছে; কিন্তু তাহা ভ্রম। শিল্পচাতুর্য্য এত পরিপূর্ণ, কিন্তু আসলে প্রাণেরই অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র সেই মূর্ত্তির মধ্যেই প্রাণসঞ্চার করিয়া বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছেন। ভাব-ভাবনা ও আপনার কল্পনাকে রূপ দিবার জন্য বঙ্কিমকে বিদ্যাসাগরের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইয়া আপনার ভাষা সৃষ্টি করিয়া লইতে হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ-সাহিত্য-সৃষ্টি যেমন সাহিত্য-রচনার দিক্ হইতে মৌলিক সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তেমনই তাঁহার গদ্যভাষাও তাঁহারই মানস প্রকৃতি অনুযায়ী খাঁটি গদ্যরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টি ও ভাষাসৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ রচয়িতার বিশিষ্ট মানসভঙ্গী অনুযায়ী ঠিক যেমন সাহিত্য ও ভাষাসৃষ্টি হওয়া উচিত, তেমনই হইয়াছে। বিদ্যাসাগর-রচিত সাহিত্য ও ভাষাতে আমরা খাঁটি বিদ্যাসাগরকেই পাইয়াছি। এখন প্রধান কথা, বিদ্যাসাগরের রচনার সাহিত্যিক মূল্য কি এবং তাঁহার রচনার সার্থকতা কোথায়? সাধারণতঃ আমরা বিদ্যাসাগরের যে সকল রচনার সহিত পরিচিত, তাহা সমস্তই সংস্কৃত, কিংবা

ইংরেজী ভাষা হইতে অনূদিত, সুতরাং এই সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই অনুবাদ-সাহিত্যের মাপকাঠিতেই করিতে হইবে।

কেবলমাত্র ভাষান্তর করিতে পারিলেই অনুবাদ হয় না, সাহিত্যসৃষ্টি তো দূরে থাকুক। প্রথমেই দেখিতে হয়, এক ভাষার অন্তঃপুর হইতে সেই অন্তঃপুরচারিণী অন্য ভাষার অন্তঃপুরে তাহার আবহাওয়া, জীবন-প্রণালী ও সমাজ-জীবনের সহিত মিলিয়া চলিতে পারে কি না—এক অন্তঃপুর হইতে অন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহার আড়ষ্টতা কাটিয়াছে কি না—সে রসিকা ও প্রাণবতী হইয়া উঠিতে পারিয়াছে কি না। বিদ্যাসাগরের অনুবাদ এই পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার কথামালা এক ভাষার অন্তঃপুর হইতে অন্য ভাষার পুরচারিণীদিগের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের ভাষাতেই তাঁহাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিবার সহজ অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কথামালাকে আমরা সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই দেখিতে অভ্যস্ত, কিন্তু এই সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া কথামালাকে দেখিলেই সহজে বিদ্যাসাগরের অনুবাদ করিবার অসামান্য প্রতিভাকে বুঝা যাইবে। কথামালার রচনারীতি সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালা রচনা ও বাক্‌ভঙ্গী অনুযায়ী—ইহাই পুস্তকের একটি প্রধান বিশেষত্ব। গল্পগুলির যথাযথ আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় নাই—অনুবাদ মূলানুগামী না হইয়াই জমাট বাঁধিয়া উঠিয়া গল্প হইয়া উঠিয়াছে। কথামালা বিদ্যাসাগরের রচনার গুণে সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে—মূলকে অনুসরণ না করিয়াও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সাহিত্য-বিচারে পংক্তি-ভোজনের অধিকার পাইয়াছে। বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক তাঁহার সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অনেকে অনুবাদ করিবার সময় সংস্কৃত শব্দ ও বাক্‌রীতিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, কেন না, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ ও বাক্যযোজনার অন্তরালে বাঙ্গালা ভাষারীতির বিরুদ্ধাচরণ অনেকাংশে লুক্কায়িত রাখা সম্ভব হয় এবং তাহার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অজ্ঞতাকে এড়াইয়া যাওয়া সহজ হয়। বিদ্যাসাগর জীবনের কোন ব্যাপারেই ফাঁকিকে প্রশ্রয় দেন নাই, এই ব্যাপারেও নিজে সংস্কৃতরীতিতে অভিজ্ঞ হইয়াও এই কথামালার রচনায় সংস্কৃত রচনাকে গ্রহণ না করিয়া সহজ সরল বাঙ্গালা রীতি প্রয়োগ করিয়া অতি সহজেই গল্পকে জমাইয়া তুলিয়াছেন। ভাষার অনাড়ম্বর রূপের মধ্য দিয়াও যে সাহিত্যকে রূপ দেওয়া যায়, এই কথামালার মধ্য দিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদে বিদেশীয় চরিত্র ও বিদেশী সমাজ অতি সহজেই বাঙ্গালীর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে—পরবর্ত্তী কালের অনুবাদ-সাহিত্যের সহিত এইখানেই বিদ্যাসাগরের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগরের রচনার যাহা কিছু সাহিত্যিক মূল্য এবং সার্থকতা, তাহা এই অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যেই।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপের মধ্যে বিভিন্ন ভঙ্গী দেখা যায়। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা অনুসারে বিভিন্ন ভঙ্গী বিদ্যাসাগরের রচনার একটি বিশেষত্ব। সীতার বনবাসের গদ্য হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসের গদ্য ভিন্ন প্রকৃতির। সীতার বনবাসে কল্পনা ও কবিত্বের অবসর থাকায় গদ্য সহজেই একটু কাব্যময় হইয়া উঠিয়াছে। সীতার আলেখ্যদর্শনে "গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী তপোবন ও জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণ-গিরি" প্রভৃতির বর্ণনামূলক ভাষা একটু আবেগচঞ্চল। সীতার বনবাসের প্রসাদগুণসম্পন্ন মাধুর্য্যমণ্ডিত ভাষাকে সাহিত্যিক রচনা আখ্যা দিলে অন্যায় হয় না। বেতাল ও ও ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতিতে ভাষার যে একটা স্বচ্ছন্দ গতি, তাহাতে তিনি যে নিতান্ত সংস্কৃতপন্থী ছিলেন না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এই সকল পুস্তকের গল্প বলার ভঙ্গী হইতে মনে হয়, যেন উপন্যাসকারের প্রচ্ছন্ন প্রাণ ভাষা ও রচনার মধ্যে প্রবাহিত। অপরপক্ষে বাঙ্গালার ইতিহাস, বহু বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি পুস্তকের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাঙ্গালা ইতিহাসের ভাষা নিতান্তই প্রবন্ধের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রভৃতিতেও বিষয়-বস্তু অনুরূপ বিচার ও বিতর্কমূলক ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামমোহনের বিচার ও বিতর্কমূলক সাহিত্য যেখানে শুধু নীরস উপদেশ ও নীতিকথাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের রচনা সেই অবস্থাতেই বিচার-বিতর্কের মধ্যে রসের ভিয়ান দিয়া তাহাকে রসে উত্তীর্ণ করিয়া লইয়া আপনার অপরিসীম সাহিত্যিক নৈপুণ্য দেখাইয়াছে।

কিন্তু বোধোদয় 'সুকুমার-মতি বালকদিগের জন্য অতি সরল ভাষায়' লিখিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেখানে তিনি শোচনীয় রূপে ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের প্রায় প্রত্যেকটি রচনাই যে সাহিত্যগুণপেত, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব ও অনুকারী পরবর্ত্তী লেখকদের রচনা আলোচনা করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গীর ইতিহাস ও তাহার ক্রমবিকাশের মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্থান কোথায়, আমরা শুধু বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য তখন প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে ব্যস্ত, কাজেই সেই সময়ে সাহিত্য-রসিকতার সন্ধান নাই বলিয়া যদি কেহ অভিযোগ করেন, তবে সে অভিযোগ নিরর্থক হইবে।

নাইন্টি নাইন……নট আউট……

প্রথম দর্শক (কৃষক)—এডা কিবা খেলা মামু? বুইঝ্‌বার পারতাম না ক্যান্!—হা-ডু-ডু ত' না?

দ্বিতীয় দর্শক (প্রজা)—কিয়ের হা-ডু-ডু, ছাহস্‌ না জবরদস্ত খেলুড়? খেলুড়গো যান্ চিনি চিনি ঠ্যাক্‌তিছে!

শাকী

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

পাত্র-পাত্রী

চাষী—

চাষীর—{ স্ত্রী, মাতা, ঠাকুর্দ্দা, কন্যা }

প্রতিবাসী, গ্রামের পঞ্চায়েৎ, নারী, রাখাল বালক, পল্লী-বালিকা।

শয়তান-রাজ—নরকের সম্রাট্, নরকের মন্ত্রী।

নারকীয়—বিলাসী-দূত, উকীল দূত, ভদ্রলোক-দূত, ব্যবসায়ী-দূত, চাষী-দূত প্রভৃতি।

শাকী, বিলাস-দূতী, প্রহরী, দ্বাররক্ষী প্রভৃতি।

প্রথম অঙ্ক

(স্থান—এক পল্লীগ্রামের কৃষকের বস্তীর এক প্রান্তে উন্মুক্ত প্রান্তর, মাঝে মাঝে ঝোপ আছে—চাষী লাঙ্গল দিতেছে। সূর্য্যাস্তের ম্লান রশ্মি স্থানটিকে আলোকিত করিয়াছে)

চাষী। রোদ পড়ে এল, বলদদের খুলে দি, তারা বিশ্রাম করুক। (বলদকে) বাবা, আর একবার ঘোর—ব্যস্, তার পর তোদের ছুটী আমারও ছুটী। ক্ষিধেও লেগেছে, ভাগ্যিস ফুলীর মা বুদ্ধি করে খানকতক রুটী তৈরী করে দিয়েছিল। গুড়ও খানিকটা দিয়েছে—খেয়ে বাঁচা যাবে। (বলদকে) ঘোর বাবা আর একটু, তারপর তোদের খেতে দেব, আমিও খাব। ভগবানের দয়াতে এ বছর চাষ ভালই হবে বলে মনে হচ্ছে।

(দূরে একটি ঝোপের মধ্য হইতে নারকীয় চাষী-দূত মুখ বাড়াইয়া)

নারকীয় দূত। কি আশ্চর্য্য মানুষ এই চাষী। চাষ করতে করতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে গিয়েছে, তাও ভগবানকে বেটা ভোলেনি। দাঁড়াও বেটা, তোমার "ভগবানের দয়া" বলা বার করছি। এখনই ভগবানকে গালাগালির ঠেলায় অস্থির করবি—হুঁ, ঐ গাছের তলায় খাবার রেখেছ, না?

(ঝোপ হইতে বাহির হইয়া সাবধানে গাছের নিকটে গিয়া খাবারের পাত্র হইতে রুটী ও গুড় লইয়া পুনর্ব্বার ঝোপের মধ্যে প্রবেশ)

চাষী। (বলদকে খুলিয়া দিয়া) যাক, ভগবানের দয়াতে আজকের কাজ শেষ হল। বড়ই ক্ষিধে পেয়েছে, যাই, ফুলীর মা আজ ভাল মেজাজেই রুটী করেছিল। রুটী ভালই হয়েছে (গাছের নিকট গিয়া পাত্র শূন্য দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য, খাবার কোথায় গেল, সরা খালি, কেউ এখানে নেই, অথচ কে নিলে—দেখি তো। কুকুর-টুকুর নিয়ে গেল? উঁহু কুকুর নয়, মানুষই হবে, দেখি ও দিকে—(প্রস্থান)।

নারকীয় দূত। (ঝোপের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া) খোঁজ্ বেটা খোঁজ্,—"ভগবানের দয়া"!—খোঁজ্, এ বারে ভগবান কি করে দেখ্ বেটা। এই ঝোপে রুটী-গুড় আমার কাছে রয়েছে (অদৃশ্য)।

(চাষীর প্রবেশ)

চাষী। তাই তো। কেউ নেই, অথচ খাবারও নেই। নিশ্চয়ই কেউ নিয়েছে।

নারকীয় দূত। (ঝোপের ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া) এই বারে বেটা ভগবানকে গাল পাড়বে নিশ্চয় (অদৃশ্য)।

চাষী। বড় ক্ষিধে পেয়েছিল, খাওয়া হল না। যাক, এত ক্ষিধে পায় নি যে, না খেলে এখনই মারা যাব। যে নিয়ে গিয়েছে, তার হয় তো বেশী দরকার ছিল। আহা তার পেট ভরেছে তো, ভগবান তার মঙ্গল করুন, ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন। যাই, বলদদের নিয়ে বাড়ী ফিরি—ফুলীর মা মুড়ী দেবে খেতে (প্রস্থান)।

নারকীয় দূত। শয়তান-রাজ, তুমি সিংহাসনে বসে আমার উপর কেবল চোখ রাঙাচ্ছ। তুমি কেবল আমাকে বল যে, তোমার নরকে চাষী-প্রজা একেবারেই বাড়ছে না। প্রত্যহ কত ভদ্রলোক, নানান রকমের লোক, ব্যবসাদার, মেয়েমানুষ তোমার নরক-রাজ্যের প্রজার বৃদ্ধি করছে, কেবল চাষীরাই তোমার রাজ্যে প্রজা হচ্ছে না! প্রভু, সিংহাসন থেকে নেমে একবার এসে দেখে যাও—এই হতভাগার খাবার চুরি করলাম, ক্ষিধেতে প্রায় আধমরা

হয়েছে, বাড়ী ফিরে গেল এই কথা বলে যে, ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন। একটা কটূক্তি পর্য্যন্ত করল না। যাদের ভগবানের উপরে এত বিশ্বাস, তাদের নরকের রাজ্যে কি করে যে টেনে নিয়ে যাব, তা তো বুঝতে পাচ্ছি না। যা হোক, প্রভুর কাছে এই সংবাদ দিতে হবে, এই রুটী আর গুড় নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে (ধরণীর মধ্যে প্রবেশ)।

দ্বিতীয় অঙ্ক

স্থান—নরক, নরক-রাজের সভা।

(সিংহাসনে শয়তান-রাজ উপবিষ্ট। নিম্নে একটি টেবিলে কতকগুলি খাতা লইয়া মন্ত্রী দণ্ডায়মান। বিভিন্ন দ্বারে দ্বার-রক্ষী দণ্ডায়মান। শয়তান-রাজের বাম পাশে পাঁচটি নারকীয় দূত বিভিন্ন পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান। বিলাসী-দূত—দক্ষিণ পার্শ্বে শয়তান-রাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান। বামপার্শ্বে দ্বারের সম্মুখে প্রধান দ্বাররক্ষী বিপুল চাবুক হস্তে দণ্ডায়মান)

বিলাসী-দূত। (হাত জোড় করিয়া) প্রভু, এই তিন বৎসরে আপনার রাজ্যে আড়াই ক্রোর প্রজা হয়েছে—তারা সকলেই এখন প্রভুর ক্রীতদাস—তবে এই কাজের জন্য আমার কন্যা শাকীরই প্রধানতঃ কৃতিত্ব।

শয়তান-রাজ। বটে—শাকী কোথায়, শাকীকে ডাক।

(শাকী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুন্দরী, বিলাসের প্রতিমূর্ত্তি)

শয়তান-রাজ। আয় বেটী এদিকে আয়—(শাকী নিকটে গেল; শাকীকে কাছে লইয়া আদর করিয়া) খুব ভাল কাজ হয়েছে বেটী। বাঃ মন্ত্রী, কি বল, কাজ খুবই ভাল হয়েছে বলতে হবে?

মন্ত্রী। (হাত জোড় করিয়া) হ্যাঁ প্রভু।

শয়তান-রাজ। মন্ত্রী, আজকে আমি বড়ই পরিশ্রান্ত, এখনও কি অনেক কাজ বাকী আছে? কাদের কার্য্য-বিবরণী এসেছে; আর এখনও কারা কার্য্য-বিবরণী দেয় নি বল তো?

(মন্ত্রী আঙ্গুলে সংখ্যা গুণিয়া যে দূতের নাম করিতেছেন, সেই দূত সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইতেছে)

মন্ত্রী। প্রভু, নারকীয় ভদ্রলোক-দূত এই তিন বৎসরে ২৮৩৪টি প্রজা সংগ্রহ করেছে, নারকীয় ব্যবসাদার-দূত ৯৬৪৮, নারকীয় রাজকর্ম্মচারী-দূত ৩৬৪৫, নারকীয় বিবাহিত-রমণী-দূত ১৮৬৩১, নারকীয় অবিবাহিত-যুবতী-দূত ১৭৪৩৮, দুইজন নারকীয় দূত এখনও কোন বিবরণী প্রেরণ করেন নি। নারকীয় উকীল-দূত ও চাষী-দূত—

শয়তান-রাজ। তাদের কার্য্য আজই সমাধা করা যাক। তাদের ডাক।

(প্রধান প্রহরী চাবুক দুলাইয়া ও সমগ্র সভাটি চাবুকের শব্দে প্রকম্পিত করিয়া হাঁক দিলেন—উকীল-দূত! চাষী-দূত!)

(প্রথমে উকীল দূতের প্রবেশ)

শয়তান-রাজ। তুমি এখনও কোন কার্য্য-বিবরণী দাও নি কেন? কি রকম কাজ হয়েছে?

উকীল-দূত। প্রভু, আমি যা কার্য্য করেছি, তা এই অপূর্ব্ব নরক-রাজ্য সৃষ্টি হবার পর কখনও হয় নি।

শয়তান-রাজ। বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে কত সংখ্যা—তোমার প্রজার তাই বল।

উকীল দূত। প্রভু, আমার প্রজার সংখ্যা ১৩৪০।

শয়তান-রাজ। মোটে ১৩৪০!

উকীল-দূত। (হাত জোড় করিয়া) প্রভু, সংখ্যা দেখে চিন্তিত হবেন না—অতি শিক্ষিত বুদ্ধিমান চতুর এরা, আমার প্রজা আপনার রাজ্যে যে কোন প্রজাকে পরাজিত করতে পারে, আমি তাদের প্রভু এক নূতন পন্থা দেখিয়ে দিয়েছি।

শয়তান-রাজ। কি রকম?

উকীল-দূত। প্রভু, আগে বিচারকের কাছে উকীল থাকত এবং লোকদের ঠকাত। এখন প্রভু, আমার নূতন ব্যবস্থাতে উকীলরা যে বেশী টাকা দেবে, তার মামলাই তারা চালাবে, আর একটি নব পন্থা বার করেছি, যেখানে সত্যিকারের কোন মামলা-মোকদ্দমা নেই, তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সেখানে মামলা সৃষ্টি করবে। এই কাজ প্রভু, উকীলরা চালাতে পারলে আপনার নরকে অতি অল্প সময়ে অসম্ভব প্রজা বৃদ্ধি হবে। নারকীয় দূতের অনেক কার্য্য উকীলরা কমিয়ে দেবে।

শয়তান-রাজ। বটে! আচ্ছা, আমি নিজে একবার তোমার সঙ্গে যাব দেখতে কি রকম কাজ হচ্ছে। এখন তুমি বিশ্রাম করতে পার। (উকীল-দূতের প্রস্থান)।

প্রধান প্রহরী। চাষী-দূত—

(চাষী-দূতের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ ও সিংহাসনের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ও কয়টি পোড়া রুটী ও গুড় মাটীতে রাখিয়া)

চাষী-দূত। প্রভু, আমাকে এই কাজ থেকে বিদায় দিন। আমায় অন্য কাজ দিন। এ কাজ আমি পারব না।

শয়তান-রাজ। অন্য কাজ! দাঁড়াও সোজা হয়ে। পাগলের প্রলাপ শুনতে চাইনে। বল এই সপ্তাহে নরকের কত প্রজা চাষীদের মধ্যে সংগ্রহ করেছ।

চাষী-দূত। (হাত জোড় করিয়া) প্রভু, একজনও নয়—

শয়তান-রাজ। কি? একজনও নয়! পৃথিবীতে গিয়ে কেবল সময় নষ্ট করেছ, এক জনও নয়—প্রহরী—

চাষী-দূত। প্রভু, আমার যা বক্তব্য, তা অনুগ্রহ করে শুনে আমায় শাস্তি দেবেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি প্রভু, কিছুতেই কিছু হয় নি, শেষ অবধি এক চাষীর রুটী চুরি করলাম, সে আহার না করে কর্ম্মক্লান্ত দেহে ফিরে গেল, আমার ভাল হোক্—এই কথা বলে—

শয়তান-রাজ। তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছিনে। এমন ভাবে বল যার মানে বুঝতে পারা যায়।

চাষী-দূত। কেন প্রভু? ঠিকই তো বলেছি। এক চাষী লাঙ্গল দিচ্ছিল, সন্ধ্যার একটু আগে হাল থেকে বলদ খুলে দিয়ে খাবার খেতে গেল, ক্ষিধেতে অস্থির, আমি তার খাবার চুরি করলাম, সে কিছু খেতে পেল না, এই দেখুন প্রভু, এই তার রুটী-গুড়, সে আমাকে গালাগালি দিল না; কোন রকম কটূক্তি করলে না, সে বললে ভগবান আমার মঙ্গল করুন—

শয়তান-রাজ। এ তো একজনের কথা, আর সব?

চাষী-দূত। সকলেই এই রকম চাষীদের মধ্যে, সবই ঐ এক ধরণের—

শয়তান-রাজ। তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি দূত, তুমি আমার সম্মুখে খালি হাতে এলে কি করে? তোমার লজ্জা করছে না? তুমি নরকে শুধু বসে বসে অন্ন ধ্বংস করবে এই ভেবেছ, তা হবে না। প্রত্যেক দূতই তাদের কার্য্য সুন্দর ভাবে করছে, কেউ দশ হাজার, কেউ বিশ হাজর, কেউ দুই ক্রোর প্রজা বাড়িয়েছে, আর তুমি শূন্য হস্তে এসেছ, আর সঙ্গে করে এনেছ খান দুই পোড়া রুটী!

চাষী-দূত। শাস্তি দেবার আগে আমার কথা শুনুন প্রভু। ভদ্রলোক, জমীদার, ব্যবসাদার, নারী—এদের নরকের প্রজা করা খুব সহজ। ভদ্রলোককে পদবী, জমীদারকে জমীদারী দিলেই তারা প্রভু, নরকে যাবার জন্যে সব কাজই করবে; ব্যবসাদারকে ব্যবসায়ে লাভের প্রবৃত্তি জাগিয়ে দিলেই সেও সহজে নরকের প্রজা হবে; নারীকে টাকা ও গহনা দিলে, ভাল খেতে দিলে তারাও সহজে আপনার রাজ্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করবে। কিন্তু প্রভু, চাষী, কৃষক—এদের নরকের রাজ্যে টেনে আনা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। তারা সকাল থেকে রাত্তির পর্য্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে; ভগবানের নাম করে প্রভাতে কাজ আরম্ভ করে। বিশ্রামের সময় ভগবানের নাম করে নিদ্রা যায়। এদের নরকে আনা সহজ নয়, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেও বিফল হয়েছি। এত করেও আপনাকে তুষ্ট করতে পারলাম না—

শয়তান-রাজ। আঃ, কেবল কথা, কথা! কাজ নেই, কেবল বাক্যাড়ম্বর। ব্যবসায়ী, জমীদার, ভদ্রলোক, রমণী—সকলকেই আমার দূত রাজ্যের প্রজা করতে সক্ষম হয়েছে কেন? তারা সব নূতন উপায় উদ্ভাবন করেছে। উকীল-দূত এক অপূর্ব্ব নূতন কৌশলের সাহায্য নিয়েছে, আর তুমি খানকতক পোড়া রুটী চুরি করে এনে তাই দেখিয়ে মহা গবেষণা আরম্ভ করেছ। তুমি নিজের কার্য্যে অবহেলা করায় চাষীদের এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, তাদের শেষ আহার্য্য চুরি করলেও তারা ভগবানের বিধান বলে মেনে নেয়। এই ভাব তাদের নারীদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করছে। চাষীকে আমার রাজ্যে টেনে আনতে না পারলে নরকের রাজ্য জগতে স্থাপিত হবে না দূত। চাষী, কৃষক জগতের মানবজাতির প্রাণ, তাদের সর্ব্বনাশ না করতে পারলে ভগবানের প্রভাব জগৎ থেকে কখনও নিষ্প্রভ হবে না। চাষীকে দলে দলে নরকে নিয়ে আসতেই হবে। চাষীদের মধ্যে তোমার বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে জাল ফেলতে হবে। উপায় উদ্ভাবন কর—

চাষী-দূত। প্রভু, কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

শয়তান-রাজ। তবে কার দ্বারা সম্ভব? আমি তোমার কাজ করব?

চাষী-দূত। আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

শয়তান-রাজ। হবে না? আচ্ছা—প্রহরী, কোড়া—কোড়া—

(প্রধান প্রহরী বিরাট চাবুক লইয়া চাষী-দূতকে প্রহার করিল)

চাষী-দূত। উঃ উঃ—

শয়তান-রাজ। নূতন উপায় বেরিয়েছে?

চাষী-দূত। আমার দ্বারা হবে না প্রভু—

শয়তান-রাজ। আরও কোড়া—

(পুনর্ব্বার চাষী-দূতকে প্রহার)

চাষী-দূত। রক্ষা করুন প্রভু, উপায় বেরিয়েছে।

শয়তান-রাজ। প্রহরী! (প্রহার বন্ধ হইল) কি উপায় বল।

চাষী-দূত। উপায় উদ্ভাবন করেছি প্রভু, তবে কি ভাবে কাজ করব, তা এখনও ঠিক করতে পারি নি, আমাকে দিন কতক চাষীদের সঙ্গে কুলী-মজুরের ছদ্মবেশে কাজ করবার ক্ষমতা দিন প্রভু, আর শাকীকে আমার সাহায্য করতে আজ্ঞা করুন।

শয়তান-রাজ। বিলাসী-দূত, শাকীকে কিছুদিন চাষী-দূতের সঙ্গে কাজ করতে দিতে কোন আপত্তি আছে তোমার?

বিলাসী-দূত। না প্রভু।

শয়তান-রাজ। বেশ শাকী, তুই চাষী-দূতের সঙ্গে তার কথা মত কাজ করতে প্রস্তুত আছিস?

শাকী। হ্যাঁ প্রভু।

শয়তান-রাজ। বেশ চাষী-দূত, তোমায় সময় দিলাম তিন বৎসর। এর মধ্যে তুমি কি কাজ করেছ তা আমি নিজে দেখব, যদি এই সময়ের মধ্যে কার্য্য ভাল না হয়, তোমায় ঐ জলন্ত কুণ্ডে পুড়িয়ে মারব, বুঝেছ?

চাষী-দূত। তিন বৎসরে প্রচুর চাষী-প্রজা এ রাজ্যে অনেক আসবে প্রভু।

তৃতীয় অঙ্ক

(স্থান—পল্লী। দূরে গোলাবাড়ী, পর্ব্বত দৃশ্যমান্, তিন খানা গরুর গাড়ী সম্মুখে পূর্ণ। চাষী, চাষী-দূত—মজুরের ছদ্মবেশে। শাকী— সামান্য চাষী-রমণীর ছদ্মবেশে)

চাষী। হ্যাঁ রে রামা, আর ফসল রাখবি কোথায়, দুই গোলাবাড়ীই ভরে গেল যে—

নারকীয় দূত। শাকী, এখনও একটা গোলা খালি আছে না?

শাকী। হাঁ দাদা।

নারকীয় দূত। যায়গা হবে হুজুর।

চাষী। শাকী, তুই চল আমার সঙ্গে।

(চাষী-দূতের শাকীর সহিত প্রস্থান)

নারকীয় দূত। যাক, চাষী-মুনিবের আসতে এখন দেরী হবে, এখন এই ছদ্মবেশ খুলে একটু হাওয়া খাওয়া যাক। (নারকীয় বীভৎস রূপ প্রকাশিত হইল) প্রায় তিন বছর শেষ হয়ে এল, এইবার আমার প্রভুর কাজ পরিদর্শনের সময়, শস্য প্রচুর হয়েছে, যা প্রয়োজন তার চেয়ে ঢের বেশী। এখনও চাষীকে দুই একটা জিনিষ শেখাতে হবে, শাকী বড় ভাল বুদ্ধি দিয়েছে প্রভু, এবার তুমি পোড়া রুটী নিয়ে যাবার অপরাধ ক্ষমা করবে। (দূরে লোক দেখিয়া) আঃ, আবার চাষীর বন্ধু আসছে (ছদ্মবেশ পরিধান)।

(প্রতিবেশীর প্রবেশ)

প্রতিবেশী। কি রে রামা, কেমন আছিস?

নারকীয় দূত। আজ্ঞে কর্ত্তা, আপনার আশীর্ব্বাদে এক প্রকার ভালই আছি।

প্রতিবেশী। তোর মুনিব কোথায়?

নারকীয় দূত। গোলা-বাড়ীতে গিয়েছেন।

প্রতিবেশী। রামা, তোর মুনিবের কি বরাত বল তো। এত ফসল হয়েছে যে, দুটো গোলাবাড়ীতে ধরছে না, আমরা সকলেই তোর মুনিবের এই ফসল দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি। দুই বছরই পর পর এমন সুন্দর ফসল হতে আমরা কখনও দেখি নি। তোর মুনিবকে কে যেন বলে দেয় যে, কি রকম বছর পড়বে, গত বছর প্রায় অনাবৃষ্টি। তোর মুনিব জলার কাছে ভাল করে লাঙ্গলও দিলে না, বীজ ছড়িয়ে দিলে, কি সুন্দর ফসল হল। এবারে অতিবৃষ্টি—পাহাড়ের ওপর চাষ করল, কি সুন্দর ফসল হল—অন্য সকলের ফসল জলে পচে গেল, আর তোদের কি সুন্দর ফসল হয়েছে রামা—

(চাষীর প্রবেশ)

চাষী। এই যে শ্যাম, কি খবর ভাই, ভাল আছ ?

প্রতিবেশী। ভাল আছি ভাই, এই তোমার লোককে বলছিলাম যে, তুমি কি করে বুঝতে পার কোন্ বছর কোথায় বীজ দেবে, চাষ করবে, সকলেই তোমাকে হিংসে করছে, কি ফসল হয়েছে, দশ বছর খেয়েও ফোরাতে পারবে না।

চাষী। আমার কিছু এতে বাহাদুরী নেই ভাই। এই রামারই কেরামতি—আর বছর জলাতে বীজ দেবার জন্যে কি গালই দিয়েছিলাম, এ বছরেও পাহাড়ের ওপরে বীজ দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট গাল দিয়েছি, কিন্তু ও যা বলে তাই হয়।

প্রতিবেশী। তোমার লোক যেন আগের থেকেই বুঝতে পারে, এ বছর কি রকম হবে! প্রচুর ফসল হয়েছে ভাই—(খানিকক্ষণ চুপ করিয়া) আমাকে এক মণ সরষে দিতে পার ? আমার ফুরিয়ে গিয়েছে, আসছে বছর দেব।

চাষী। বেশ ভাই নিয়ে যাও—

(নারকীয় দূত ইঙ্গিতে নিষেধ করিল)

চাষী। না, না—ভাই, তুমি সরষে নিয়ে যাও।

প্রতিবেশী। বড় উপকার করলে ভাই, আমি ছালা নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

চাষী। (স্বগতঃ) এখনও পুরানো ধারা ভুলতে পারে নি, এখনও দান করতে আনন্দ পায়, আমার কথা শুনছে না, আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর চাষী, তোমার দানের ইচ্ছে একেবারে লোপ পাবে।

(চাষী দূরে একটা গরুর গাড়ীর উপর বসিয়া)

চাষী। হ্যাঁ রে রামা, ভাল লোক বিপদে পড়েছে, তাকে সাহায্য করতে মানা করছিস্ কেন ? ধার চাচ্ছে, ফিরিয়ে দেবে।

নারকীয় দূত। হুঁ, দেওয়া এক জিনিষ আর ফিরে পাওয়া আর এক জিনিষ। যখন ধার দেওয়া হয়, তখন তা পাহাড়ের উপর থেকে একটা ভারী জিনিষ নীচে ছেড়ে দেওয়া, আর ধার আদায় করা একটা ভারী জিনিষকে টেনে পাহাড়ে তোলা, এই রকমই বুড়োরা বলে।

চাষী। নাই বা ফিরে পেলাম—এত ধান করব কি ? তিন বছরও যদি কিছু না হয়, প্রচুর থাকবে, এত ধান হলে কি—

নারকীয় দূত। এত ধান হবে কি ? আমি এই ধান থেকে এমন জিনিস তৈরী করব, যা তোমাকে জীবনভর আনন্দ দেবে।

চাষী। কি জিনিস ? কি করবি ?

নারকীয় দূত। এক রকম রস তৈরী করব, সরবতের মতন, এক পানীয়—এই রস যখন আপনি দুর্ব্বল, তখন আপনাকে সবল করবে, যখন খুব ক্ষুধা, তখন পান করলে ক্ষুধা চলে যাবে, যখন কিছুতেই ঘুম হচ্ছে না, একটু খেলেই ঘুমোতে পারবেন, যখন মন বড়ই খারাপ, এই রস আপনাকে আনন্দ দেবে। যখন আপনি ভয় পাবেন, এই পানীয় আপনাকে সাহস দেবে।

চাষী। যত সব বাজে কথা।

(এই সময়ে শাকী আসিয়া উপস্থিত হইল)

চাষী। হ্যাঁ শাকী, তুই এই রস খেয়েছিস ? তোর দাদা যা বলেছে।

শাকী। হ্যাঁ দাদা, বড় সুন্দর খেতে—ভারী মিষ্টি, আমি আপনাকে তৈরী করে দেব।

চাষী। সত্যি ? কিন্তু এ রস কি থেকে তৈরী হবে রামা ?

নারকীয় দূত। ঐ ধান থেকে—

চাষী। কিন্তু ভগবান ধান দিয়েছেন, তার থেকে চাল করে আমাদের খাওয়ার জন্যে, এর থেকে রস করে খেলে পাপ হবে না তো ?

নারকীয় দূত। শোন কথা! পাপ হবে, জীবন আনন্দের জন্যে প্রভু ? আনন্দ করবেন, তাতে পাপ!

চাষী। তুই তো সামান্য মজুর রামা, খুব পরিশ্রম করতে পারিস সেটাও সত্যি, কিন্তু এত জ্ঞান কোথায় পেলি ?

নারকীয় দূত। প্রভু, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি।

চাষী। এই রস পান করলে শক্তি পাওয়া যাবে, সত্যি ?

নারকীয় দুত। একটু অপেক্ষা করুন প্রভু, একবার পান করলেই বুঝতে পারবেন।

চাষী। এই রস কি করে তৈরী করতে হয়?

নারকীয় দুত। অতি সহজে হয় প্রভু।—একটা তামার পাত্র ও দুটো লোহার পাত্র হলেই রস তৈরী হবে।

চাষী। খেতে কি রকম হবে?

নারকীয় দুত। একেবারে মধু প্রভু, একেবারে মধু। একবার আপনি পান করুন, আর জীবনে কখনও ছাড়তে পারবেন না।

চাষী। সত্যি? তা হলে যাই ঐ শ্যামের কাছেই। ওর কাছে তামার পাত্র পাওয়া যাবে।

(প্রস্থান)

নারকীয় দুত। শাকী, তোমার মাথা ভারী পরিষ্কার, কি বুদ্ধিই দিয়েছ—!

শাকী। বোঝ, বোঝ। এ বারে প্রভু নরকের সিংহাসনই না তোমায় দিয়ে দেন—

(উভয়ের ভূগর্ভে প্রবেশ)

চতুর্থ অঙ্ক

(গোলাবাড়ীর এক অংশ। মধ্যে একটি তামার পাত্র ও আর একটি পাত্র বসান আছে। নিকটে একটি চুলো জ্বলিতেছে)।

নারকীয় দুত। শাকী, দেখ, ঠিক হয়েছে তো?

শাকী। হ্যাঁ দাদা, দেখ না।

চাষী-দুত। দেখি, (পান করিয়া) হ্যাঁ হুজুর।

(চাষী উঁচু হইয়া বসিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছিল)

চাষী। কি আশ্চর্য্য জিনিষ! এ কি, জল বেরিয়ে আসছে কেন?

নারকীয় দুত। জল নয় প্রভু, ঐ রস পানীয়।

চাষী। ঐ রস আমি ভেবেছিলাম ধানের মতন হলদে হবে। তা নয় তো? একেবারে জলের মতন।

নারকীয় দুত। কি সুন্দর গন্ধ!

চাষী। তাই তো—খেয়ে দেখি—

নারকীয় দুত। দাঁড়ান হুজুর, আমি সরাতে দিচ্ছি (অল্প দিয়া) এই নিন।

চাষী। (পান করিয়া) বাঃ বেশ তো—কিন্তু এইটুকু খেয়ে—আর একটু দাও তো—(পুনর্ব্বার গ্রহণ ও পান) বড় সুন্দর—ওরে ফুলী—ফুলী আয় তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়—

(ফুলীর মার প্রবেশ)

ফুলীর মা। কি হয়েছে? তুমি অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

চাষী। দেখ্ কি সুন্দর জিনিষ তৈরী হয়েছে, এক ভাঁড় খা।

শাকী। খাও দিদি, খাও।

ফুলীর মা। কি গন্ধ বাবা! খেলে কিছু হবে না তো?

চাষী। খা, খা, কিছু হবে না।

ফুলীর মা। তাই তো, বেশ মিষ্টি।

চাষী। (স্বর একটু মদিরা-জড়িত) সুন্দর! চমৎকার! রামা বলছে, এই রস পান করলে সব কষ্ট চলে যায়, যুবা বুড়ো হয়—থুড়ি—বুড়ো যুবা হয়, আমি মোটে দুই ভাঁড় খেয়েছি, দেখ্‌ছিস ফুলীর মা, তাতেই কেমন আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। রোজ খেলে আমার বয়স কমে যাবে। ওরে ফুলীর মা, কাছে আয়, (জড়াইয়া) তোকে কি ভালবাসি রে!

ফুলীর মা। ছাড় ছাড়, তোমার কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে?

(ছাড়াইয়া)

চাষী। ফুলীর মা, তুই বলছিলি যে রামা এই রকম করে ফসল নষ্ট করছে—দেখছিস তো!

ফুলীর মা। তোমার যখন মেজাজ এত ভাল হয়েছে, তখন তোমার মারও মেজাজ ভাল হবে এই রস খেলে। আমাকে আর সব সময় গাল দেবে না।

চাষী। হ্যাঁ যা, মাকে ডেকে নিয়ে আয়। ঠাকুর্দ্দাকেও ডেকে নিয়ে আয়, ঠাকুর্দ্দাকে বল - তাকে আর বুড়ো থাকতে হবে না। যা যা।

চাষী। (পান করিতে করিতে) রামা, প্রথমে মাথা হালকা হয়েছে, জিবও হালকা হয়েছে, পায়েতে এসে পৌছেছে, নিজে নিজেই পা নাচছে, ওরে রামা, আমার

নাচতে ইচ্ছে করছে। (নাচিতে আরম্ভ) রামা মাদল বাজা।

(রামা মাদল বাজাইতে লাগিল। ফুলীর মা আসিয়া মাদলের বাজনা শুনিয়া নাচে যোগ দিল। এক বৃদ্ধা রমণী ও এক অতি বৃদ্ধ বলশালী পুরুষ,—চাষীর ঠাকুর্দ্দা, প্রবেশ করিল।)

ঠাকুর্দ্দা। ব্যাপার কি? হাঁ রে, তোরা সব পাগল হয়েছিস না কি? সকলে কাজকর্ম্ম করছে, আর তোরা নাচ আরম্ভ করে দিয়েছিস!

বৃদ্ধা রমণী (চাষীর মাতা)। ফুলীর মা, তোর আক্কেল কি রকম বল তো, এখনও উনুনে আগুন পড়েনি, ঘর-দোর সব অপরিষ্কার, আর এখানে সব নাচা হচ্ছে!

চাষী। মা দেখ, কি সুন্দর জিনিষ আমরা তৈরী করেছি। আমরা বুড়োকে যুবা করে দিতে পারি, মা তুমি একটু খাও, আর বুড়ী থাকবে না।

মা। বলিস কি রে—কিন্তু খেলে মরে যাব না তো—

চাষী। না মা, খাও না, এতে আরও বেশী বাঁচবে, খাও।

মা। (পান করিয়া) তাই তো, বড় মিষ্টি—কিন্তু বুকের মধ্যে একটু জলছে যে।

চাষী। ও কিছু নয় মা—আর একটু খেলে সেরে যাবে।

ফুলীর মা। নাও মা, খাও। কেমন, ভাল লাগছে না?

মা। তাই তো রে, বড় ভাল লাগছে। আমারও যে নাচতে ইচ্ছে করছে, ফুলীর মা! ওরে আমার বয়স কমে যাচ্ছে। (শ্বশুরকে) বাবা, তুমি একটু খাও, বুড়ো থাকবে না।

(ঠাকুর্দ্দা ঘৃণার সহিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া দূরে একটা কাঠের উপর বসিল)

চাষী। আমার ভয়ানক নাচতে ইচ্ছে করছে। ফুলীর মা এই দিকে আয়।

(ঠাকুর্দ্দা ইতিমধ্যে মদের পাত্রের নলটি খুলিয়া দিয়াছে। সব মদ পড়িয়া গিয়া পাত্র শূন্য হইয়াছে)

চাষী। (দেখিয়া) ও কি করলে ঠাকুর্দ্দা! অত বুড়ো হয়ে বেঁচে থাকা কেন। বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। অত খানি রস নষ্ট করলে!

ঠাকুর্দ্দা। এ যে অতি সর্ব্বনেশে জিনিষ! ভগবান তোকে ভাল ফসল দিয়েছেন, নিজে খাবার জন্যে, আর দশ জনকে খাওয়ার জন্যে। কিন্তু তুই এই ফসল থেকে নরকের পানীয় করেছিস, এই রস থেকে কিছু ভাল হবে না। এই কাজ আর কখনও করিস নে। করলে তোর সর্ব্বনাশ হবে, জগতের সর্ব্বনাশ হবে। তুই ভাবছিস, এ সরবৎ। এ সরবৎ রস নয়—পানীয় নয়—আগুন—তোদের পুড়িয়ে মারবে—এই দেখ!

(ঠাকুর্দ্দা চুল্লী হইতে এক জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া পতিত মদের উপরে ধরিল, কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতে লাগিল। সকলে ভীত হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল।)

পঞ্চম অঙ্ক

(কুটীরের অভ্যন্তর। নারকীয় দূত একাকী, তাহার বীভৎস রূপ প্রকাশিত হইতেছে)

নারকীয় দূত। ফসল প্রচুর হয়েছে, এত শস্য হয়েছে যে, তা রাখবার স্থান নেই। ও যখন মদের আস্বাদ পেয়েছে, তখন আবার খেতে চাইবে। আর এক জালা তৈরী করে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। তবে এবারে আর শুধু শুধু মদ নষ্ট করছিনে। যখন কোন কাজ সমাধা করতে হবে, তখন এই মদের সাহায্য নিতে হবে। আজকে গ্রামের পঞ্চায়েৎকে নিমন্ত্রণ করতে বলেছি। আজ তাদের এই পানীয় দেব। চাষীকে আজ পরামর্শ দিয়েছি, সম্পত্তি ভাগ করিয়ে নিতে। পঞ্চায়েৎরা তাই আসছে। সম্পত্তি ভাগের মধ্যে চাষীই সব পাবে, ঠাকুর্দ্দার ভাগে পড়বে শূন্য। তাই করতে হবে। আমার তিন বছরের কাজ আজ সম্পূর্ণ হবে। এখন শয়তান-রাজ এসে কাজ দেখুন, আমার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।

(কুটীরের সম্মুখে হঠাৎ ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হইল, ধুম ও আগুন গহ্বর হইতে দেখা দিল—তৎপরে ধীরে ধীরে শয়তান-রাজের আবির্ভাব হইল)

শয়তান-রাজ। চাষী-দূত, সময় পূর্ণ হয়েছে রুটী নিয়ে গিয়ে যে পাপ করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে? চাষীদের আমার প্রজা করতে সক্ষম হয়েছ?

চাষী-দূত। প্রভু, সম্পূর্ণ সফল হয়েছি। আপনি দূরে ঐ পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে কার্য্য পরিদর্শন করুন।

শয়তান-রাজ। আচ্ছা আমি ঐ স্থানে যাচ্ছি।

(শয়তান-রাজ অদৃশ্য হইল, চাষী-দূত ছদ্মবেশ ধারণ করিল— দূরে চাষী ও পাঁচ জন পঞ্চায়েতের প্রবেশ)

প্রথম পঞ্চায়েৎ। তোমরা কি আর রস তৈরী করেছ ?

নারকীয় দূত। হ্যাঁ প্রভু।

(চাষী, ফুলীর মা ইত্যাদির দ্রুত প্রবেশ)

চাষী। এখানে শীগ্‌গির মাদুর পেতে দে—মাদুর পেতে দে। ভাঁড় নিয়ে আয় শীগ্‌গির গোটা কতক, তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়, বড় মোটা হয়ে পড়েছি।

(ফুলীর মা আসিয়া মাদুর পাতিয়া দিল ও আট দশটা ভাঁড় একটি পাত্রে লইয়া আসিল)

দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ। তোমরা আরও এই রস তৈরী করেছ ? এ পানীয় সুন্দর।

নারকীয় দূত। বেশী এখন প্রস্তুত নেই প্রভু, যে রকম দরকার তাই প্রস্তুত রেখেছি।

তৃতীয়। প্রথমবারের চেয়ে ভাল হয়েছে বোধ হয়।

নারকীয় দূত। অনেক ভাল।

চতুর্থ। তুমি এ সুন্দর পানীয় কোথায় প্রস্তুত করতে শিখলে ?

নারকীয় দূত। অনেক যায়গায় ঘুরতে হয়।

পঞ্চম। এ মজুর অনেক বিষয় জানে দেখছি।

চাষী। প্রভু আপনারা এ বারে এই রস পান করুন।

(ফুলীর মা, চাষী ও নারকীয় দূত মদ পরিবেশন করিতেছিল। ফুলীর মা প্রথম পঞ্চায়েৎকে ভাঁড় দিল।)

প্রথম। (পান করিয়া) ফুলীর মা, কি সুন্দর জিনিষ তৈরী করেছে তোর চাকর রামা! খেতে না খেতে শরীরের মধ্যে কি একটা স্ফুর্ত্তি আসে—না ?

(নারকীয় দূত ইতিমধ্যে দূরে পাহাড়ের নিকটে গিয়া শয়তান-রাজকে বলিতেছে)

নারকীয় দূত (শয়তান-রাজকে)। প্রভু, এইবার ভাল করে লক্ষ্য করুন এইবার আমি গিয়ে ফুলীর মাকে হঠাৎ একটু ঠেলা দেব। সুরার পাত্র পড়ে যাবে দেখুন। যে ব্যক্তি নিজের শেষ খাবার অন্যে খেয়ে ফেললে বিরক্ত হত না, সে ঐ সামান্য সুরার জন্য কি করে দেখুন।

(ফুলীর মা ভাণ্ড লইয়া যাইতেছিল, অপর দিক হইতে চাষী-দূত হঠাৎ আসাতে ধাক্কা লাগিয়া সুরার ভাণ্ড হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল)

চাষী। ফুলীর মা, তুই একেবারে গোল্লায় গিয়েছিস। দাঁড়া তোকে ভাল করে শেখাচ্ছি কি করে ঐ জিনিষ নষ্ট না করিস। ভাল করে শেখাচ্ছি—হতভাগী—(দূতকে) বেটা রামা, তুই এত অসাবধান। তোকে চাবকে লাল করছি, দাঁড়া বেটা, এখানে তুই ঘুরে বেড়াচ্ছিস কি জন্যে, বেরো—(ফুলীর মা পানীয় বিতরণে ব্যস্ত)।

(নারকীয় দূত শয়তান-রাজের নিকটে উপস্থিত হইল)

নারকীয় দূত। লক্ষ্য করছেন প্রভু। আগে এই কৃষকই নিজের শেষ আহারও ক্ষুধার্তকে দিতে দ্বিধা বোধ করত না। আর আজ সামান্য পানীয়ের জন্য স্ত্রীকে কটূক্তি করতে কুণ্ঠিত হল না। আমাকে দূর করে দিলে।

শয়তান-রাজ। সুন্দর, অতি সুন্দর। আমি প্রীত হয়েছি দূত—

নারকীয় দূত। প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আরও কিছুক্ষণ পানীয় এদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করুক, দেখবেন কি হয়, এখন এরা প্রত্যেকে মধুর আলাপ করছে, পরে পরস্পর পরস্পরকে তোষামোদ আরম্ভ করবে।

চাষী। (পঞ্চায়েৎদের) আপনারা আমার সকলেই বন্ধু। আমার ঠাকুর্দ্দা দীর্ঘকাল বেঁচে আছেন ও আমি তাঁকে এই দীর্ঘকাল খাওয়াচ্ছি। এখন তিনি আমার খুড়োর সঙ্গে আছেন, আর আমাকে বলছেন সম্পত্তি বিভাগ করে দিতে। তাঁর অংশ তিনি খুড়োকে দেবেন। আমার অবস্থা আপনারা বিবেচনা করুন। আপনারা পল্লীর জ্ঞানী লোক, সমাজের মাথা, আপনাদের ছেড়ে কাজ করা আর নিজের মাথাটা রেখে কাজ করা একই কথা। সারা গ্রামে বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানে আপনাদের সমকক্ষ কেউ নেই। (প্রথম পঞ্চায়েৎকে) বলুন না আপনি, সকলে পল্লীতে বলে কি না যে আপনার মতন জ্ঞানী কেউ নেই, বলুন সত্য কি না। (দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎকে) আপনাকে যে আমি নিজের বাপের চেয়ে বেশী ভালবাসি, সে কথা পল্লীতে কারুর জানতে বাকী নেই। (তৃতীয় পঞ্চায়েৎকে) আপনার কথা কি বলব, আপনি কখন অন্যায় দেখতে পারেন না। (চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চায়েৎকে)

তোমাদের কি বেশী আর বলব ভাই, তোমরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু।

প্রথম পঞ্চায়েৎ। তুমি বড় ভাল লোক। ভাল না হলে জ্ঞানী হয় না। তুমি আমার সম্বন্ধে যা বললে তা সত্যি হলেও তোমার মতন ভাল লোকও যে গ্রামে নেই এ কথাও সত্যি।

দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ। জ্ঞানী এবং হৃদয়বান, সেই জন্যেই ভালবাসি।

তৃতীয় পঞ্চায়েৎ। আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি তোমার দিকে।

চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চায়েৎ। সত্যিকারের বন্ধু—সত্যিকারের বন্ধু।

নারকীয় দুত। (দূরে) প্রভু, শুনতে পাচ্ছেন। কি মধুর সব কথা বলছে। অসাক্ষাতে একজন আর একজনের সুখ্যাতি করে না। সমস্ত মিথ্যা কথা। পানীয়ের কি মধুর গুণ দেখছেন প্রভু!

শয়তান-রাজ। অতি উত্তম পানীয় দূত, আমি বড়ই প্রীত হয়েছি। মিথ্যা যখন বলছে, তখন নরকের প্রজা হবেই।

(নারকীয় দুতী শাকীর পানীয় হস্তে প্রবেশ)

শাকী। (প্রথম পঞ্চায়েৎকে) আপনি আর একটু খাবেন?

প্রথম পঞ্চায়েৎ। বাঃ খাসা দেখতে তো। তোমার নাম কি—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

চাষী। ওর নাম শাকী, ও আমার মজুরের বোন; বড় ভাল মেয়ে। এই সুন্দর সরবৎ প্রভু এরই তৈরী।

শাকী। আপনি একটু খান না।

প্রথম পঞ্চায়েৎ। খাব তো, লাগছেও বেশ, কিন্তু বেশী খাওয়া হবে না তো।

শাকী। ওতে কিছু হবে না।

(সকলে পানীয় গ্রহণে ব্যস্ত)

চতুর্থ পঞ্চায়েৎ। তোমার এ পানীয় সত্যিই চমৎকার। আমি তোমার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

চাষী। (বক্তার হাত ধরিয়া) ভাই, একটা ব্যবস্থা করে দাও।

দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ। বেয়াদবী কম নয় তো, তুমি ব্যবস্থা করবে আমাদের মত না নিয়ে। জান, এই পঞ্চায়েতের কাজ করতে করতে আমার চুল পেকে গেল।

চতুর্থ পঞ্চায়েৎ। বুড়ো হলেই লোকে বোকা হয়ে যায়। এখন আমাদের কথা শুনেই কাজ করা উচিত।

চাষী। এ কথা···

তৃতীয় পঞ্চায়েৎ। বাস্তবিক, এ বেয়াদবী সহ্য করা সম্ভব নয়। চাষী, তুমি ওর কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছ, ভেবেছ কি—পঞ্চায়েৎ যে ডেকেছ, তার জন্যে খরচ করতে তুমি বাধ্য। তোমার দরকারের জন্য ডেকেছ, গরজ তোমার, ভেবেছ কি—ঐ ছোকরা পঞ্চায়েতকে দিয়ে আমাদের অপমান করাচ্ছ। ব্যবস্থা করবেন উনি!

দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ। বাস্তবিক বড় অপমান হচ্ছে আমাদের। আমি চললাম (উত্থান)।

চাষী। (হাত ধরিয়া) চলে যাবেন না, আমার ব্যবস্থা না করে।

দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ। না, না, বড় বেয়াদবী হচ্ছে, গ্রামের যাঁরা বৃদ্ধ পঞ্চায়েৎ, তাদের এ অপমান। তুমি ভেবেছ বুঝি যে, আমাদের ঐ পানীয় খাইয়ে মাথা কিনে রেখেছ। পাজী, ধাপ্পাবাজ!

চাষী। গালাগালি দাও কেন? তোমার ব্যবস্থা না দিয়ে যাবার কি অধিকার আছে?

দ্বিতীয় পঞ্চায়েৎ। (চাষীর ঘাড় ধরিয়া) বেটা এই অধিকার (পরে প্রহার)।

চাষী। মরে গেলাম—উঃ।

প্রথম পঞ্চায়েৎ। আহা, ঝগড়া করছ কেন? আমরা ব্যবস্থা করে দিয়ে যাব।

শাকী। একটু পানীয় দেব প্রভু?

প্রথম পঞ্চায়েৎ। দে একটু।

দূরে নারকীয় দূত। প্রভু, এদের মধ্যে হিংসা, লোভ এসে উপস্থিত হয়েছে, এখনই এরা পশুর মতন হিংস্র হবে।

শয়তান-রাজ। সুন্দর সুরা তৈরী করেছ, চমৎকার কাজ করছ। এই যুবা, আর তার সঙ্গে আছে নারী শাকী। চমৎকার ব্যবস্থা।

অঙ্ক

(স্থান—পল্লীর একটি পথ। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে কৃষকের কুটীর। পথের এক প্রান্তে পাহাড়ের কাছে ঠাকুর্দ্দা ও দুই জন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আছে। পথের মাঝখানে পল্লীর বালক-বালিকা মাদল ও মেঠো বাঁশী বাজাইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছে। কৃষকের কুটীর হইতে অতিরিক্ত মদ্যপানের নিমিত্ত গোঙানির শব্দ শোনা যাইতেছে। এই কুটীর চাষীর—এই কুটীর হইতে বৃদ্ধ প্রথম পঞ্চায়েৎ শাকীকে ধরিয়া বহির্গত হইল, সে মদিরা-জড়িত স্বরে শাকীকে কি বলিতে চেষ্টা করিতেছে। চাষী তাহাকে টানিয়া কুটীরের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। মাদল ও বাঁশীর শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে।

ঠাকুর্দ্দা। মেদো, কি হল বল দেখি। এই পূজো-পার্ব্বণে পল্লীতে কত উৎসব হত; রাখালরা কেমন মনের আনন্দে তাদের মেঠো সুরে বাঁশী বাজিয়ে সময় কাটাত, চাষীরা সব দলে দলে কাজ-কর্ম্ম সেরে স্ত্রী-পরিবার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গল্প-গুজব করত, ভগবানের নাম করত—কি ছিল আমাদের সোনার পল্লী—কি হয়েছে, ভাব দেখি।

মেদো। ঐ দেখ না, তোমার নাতির ঘরে পঞ্চায়েৎরা ঢুকলেন। ঐ যে শাকী বলে মেয়েটা, ঐ মজুরটার বোন, ঐ তাকে নিয়ে পঞ্চায়েৎরা কি চালানই চলাচ্ছে। সরবৎ বলে কি এক রকম রস সকলকে খাওয়াচ্ছে, আর তারা কি রকম হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর্দ্দা। ও সরবৎও নয়, রসও নয়, সুরা—বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ।

(কুটীরের সম্মুখ দিয়া ঠাকুর্দ্দা ও বৃদ্ধেরা আসিতেছে। এই সময়ে টলিতে টলিতে চাষী কুটীর হইতে বাহির হইল)

চাষী। (মদিরা-জড়িত স্বরে) দেখ ঠাকুর্দ্দা, পঞ্চায়েতের বিচারে তুমি সম্পত্তির কিছুই পাবে না। সব সম্পত্তি আমার।

(পঞ্চায়েৎদের শাকীর সহিত আগমন)

তৃতীয় পঞ্চায়েৎ। (মদিরা-জড়িত স্বরে) বুড়ো, তুমি সম্পত্তির কিছুই পাবে না। সব সম্পত্তি তোমার নাতির।

ঠাকুর্দ্দা। ভগবানের যদি সেই ইচ্ছা হয় তো তাই হোক।

চতুর্থ পঞ্চায়েৎ। (শাকীকে কাছে লইয়া টলিতে টলিতে) ওরে শাকী, তোকে নিয়ে যে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। (নাচিতে চেষ্টা ও পতন)

ঠাকুর্দ্দা। চল হে, এ পাপপুরী থেকে বেরিয়ে পড়া যাক। (ঠাকুর্দ্দা ও বৃদ্ধদের প্রস্থান)

চাষী। ফুলীর মা, ফুলীর মা। শাকী, ওরে আমায় আর একটু ঐ সরবৎ দে। অমৃত।

(কুটীরের অভ্যন্তর হইতে মদিরা-জড়িত গোঙানীর শব্দ শ্রুত হইল। এই সময়ে দ্বিতীয় ও পঞ্চম পঞ্চায়েৎ সুরাপাত্র হস্তে সুরাপান করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কিছুক্ষণ পরে সুরার পাত্র হাত হইতে পড়িয়া গেল ও উভয়েই টলিতে টলিতে অগ্রসর হইতে ধরাশায়ী হইল)

চাষী। শাকী, শাকী (শাকী নিকটে আসিল) যা, আর একটু সরবৎ নিয়ে আয়।

শাকী। খান, এই নিন (সুরা প্রদান)

চাষী। শা···কী···কি···সু···

(টলিতে টলিতে কুটীরে দিকে অগ্রসর—রাস্তার ধারে পড়িয়া গিয়া মুখ পাঁকে গুজিয়া গেল। সে গোঙাইতে গোঙাইতে পাঁক খাইতেছিল।—স্থানটি হঠাৎ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সম্মুখে ধরণী দ্বিধাবিভক্ত হইল। সেই গহ্বর হইতে অগ্নির শিখা দেখা গেল। অগ্নির শিখাতে স্থানটি লাল হইয়া গেল। ধূম ক্রমশঃ অদৃশ্য হইল। সেই লাল আলোর মধ্যে দেখা গেল চাষী খানায় পড়িয়া সানন্দে পাঁক খাইতেছে। গহ্বরপার্শ্বে শয়তান-রাজ, শাকী ও নারকীয় দূতকে দেখা গেল।)

নারকীয় দূত। প্রভু, আপনি তুষ্ট হয়েছেন? যে চাষী তার শেষ আহারও হাসি মুখে দিয়ে বলত, ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন, সেই চাষী - দেখুন, ঐ খানায় পড়ে শূয়রের মতন পাক খাচ্ছে, সুরার কি মহিমা!

শয়তান-রাজ। আচ্ছা দূত, সুরা কি দিয়ে তৈরী বলতে পার? বাঘ, শেয়াল ও শূয়োরের রক্ত মিশিয়ে কি সুরা তৈরী হয়?

নারকীয় দূত। প্রভু, যত দিন চাষী তার যা প্রয়োজন ছিল, তাই পেয়েছে, তত দিন সে লোককে দিয়েছে নিজে না খেয়ে। কিন্তু প্রভু, সেই প্রয়োজনের অধিক ফসল পেয়েছে, এত ফসল সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। তখনই তার মধ্যে ইন্দ্রিয় তাড়না করে ঐ যা আপনি বললেন প্রভু, শেয়াল বাঘ ও শূয়োরের প্রবৃত্তি জাগিয়েছে। মানুষের মধ্যে যে পাশবিক প্রবৃত্তি আছে, তাকেই জাগ্রত করেছে। আর তারই ইন্ধন যোগাচ্ছে ঐ সুরা।

শয়তান-রাজ। চমৎকার কাজ হয়েছে। দূত, (পৈশাচিক অট্টহাস্য করিয়া) দেখ দেখ, চাষী কি আনন্দে ঐ পাক খাচ্ছে। আজ যখন জগতের প্রাণ চাষীকে নরকের প্রজা করতে পেরেছি, তখন আর ভয় নেই দূত; ভগবানের রাজ্যের অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে। সমগ্র জগতে শয়তানের বিজয়-ভেরী বেজে উঠেছে। সুরাই তার বৈজয়ন্তী। চল দূত, চল শাকী। নরকে বিরাট উৎসবের আয়োজন করি গে। *

(শয়তান-রাজ নারকীয় দূত ও শাকী সহ ধরণীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল)

* ঋষি টলষ্টয়ের নাটিকা অবলম্বন।

আলোচনা

মহাভারত

ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার মহাভারত অতি কূটভাবে লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ কূট অর্থে পরিপূর্ণ থাকায় সাধারণে ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সহজে সক্ষম হন না। ফলে তাঁহারা ইহার গল্পাংশটুকুই গ্রহণ করেন। তৎকালের ইতিহাস, দেশ-বিদেশের নাম, ভারতবর্ষের সেই সময়ে যে সকল নৃপতিবৃন্দেরা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ও কর্ম্ম-তৎপরতা, আমরা সমুদয়ই এই মহাভারত গ্রন্থে পাই। ভারতবর্ষের অন্তর্গত রাজ্যের ও নগর ইত্যাদির ভৌগোলিক অবস্থান এবং সেই সেই স্থানে যাইবার পথনির্দ্দেশ, এমন সুন্দর ভাবে তিনি তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উত্তরাখণ্ডের দুর্গম গিরিপথ, নরনারায়ণের স্থান, ব্যাসদেবের আশ্রম, মন্দাকিনী আদি নদীর বর্ণনা, গিরি-নির্ঝরের দৃশ্য পাঠ করিয়া বিমোহিত হইতে হয়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পর্ব্বতাবলী, হ্রদ, তদ্দেশের অধিবাসীদিগের চরিত্র, নীলাচলের বিবরণ, এমন সুন্দরভাবে প্রকটিত করিয়াছেন, যেন পাঠকের সম্মুখে সেইগুলি পরিদৃশ্যমান হয়। ইহা ত হইল এক দিকের কথা। যদি ইতিহাস খোলা যায়, আমরা দেখিব, পূর্ব্বেকার হস্তিনাপুর, উজ্জয়িনী নগর, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কুরুক্ষেত্র এখনও সেকালের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা আমাদের মনের উপর অঙ্কিত করিয়া দিতেছে ও মনে হয়, যেন আমাদের সম্মুখে সেই সকল যুদ্ধাদি ঘটিতেছে। ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিলে দেখিব, সকলই সত্য ঘটনা।

মহাভারত গ্রন্থে জ্যোতিষের কথা এত বেশী ব্যবহার হইয়াছে—যেমন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি হইতেছেন পুরন্দর, অমাবস্যা-প্রাপ্ত এই নক্ষত্রে যুদ্ধ সামগ্রী, রথ ইত্যাদি প্রস্তুত করণের বিশিষ্ট সময়, মঘা নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা অনিবার্য্য, কিন্তু দীক্ষাদি ক্রিয়া এই নক্ষত্রেই প্রশস্ত ; কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ যোদ্ধারা মঘা নক্ষত্রেই যাত্রা করিয়াছিলেন, যেন মৃত্যুকেই বরণ করিবার জন্য। আবার দীক্ষাদির সময়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মঘা নক্ষত্রই প্রশস্ত দিবস।

আমরা মন্ত্র-আচরণ ও দীক্ষা-প্রণালী যদি আলোচনা করি, দেখিতে পাই, আদি পর্ব্বে পূর্ণাভিষেক, সভাপর্ব্বে ক্রমদীক্ষাভিষেক, বনপর্ব্বে সাম্রাজ্যাভিষেক, বিরাটপর্ব্বে মহাসাম্রাজ্যাভিষেক ; উদ্যোগপর্ব্বে (উৎ-উত্তম + যোগ = উত্তমযোগ) যোগদীক্ষাভিষেকের কথা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভীষ্মাদি পর্ব্বে ক্রিয়ার পরাবস্থার বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। গীতোপনিষদ এই ভীষ্মপর্ব্বেরই অঙ্গ। ষটচক্রটি কতবার কতপ্রকার উদ্দেশ্যেই বর্ণিত করিয়াছেন বলা যায় না—যে সকল বর্ণ বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় না, যেমন রক্তবর্ণ ইত্যাদি, তাহাও তিনি দ্রব্যনির্দ্দেশ দ্বারা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, যেমন তাম্রস্থলী, ইহা হইতেছে স্বাধিষ্ঠান চক্র।

আমরা আদিপর্ব্বে পূর্ণাভিষেকে দেবীর রূপ ও বর্ণ ; সভাপর্ব্বে তারা দেবী বা একজটা দেবীর বর্ণনা, বনপর্ব্বে ত্রিপুরাদেবীর ও বিরাটপর্ব্বে অর্দ্ধাম্বিকেশের এবং উদ্যোগপর্ব্বে একজটেশ্বরের বর্ণনা দেখিতে পাই। উত্তর-কুরুর বর্ণনা ও কূটস্থ চৈতন্য ও প্রণবের বিবরণ বনপর্ব্বে ব্যাসদেব বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। দেহপিণ্ডে সুরধুনীর স্থান ও তথাকার মর্ত্তলোকে তাঁহার কুলুকুলুরবে আগমন সমস্তই তিনি ইঙ্গিতে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন।

যোগী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন, যখন তিনি দেখেন জরাসন্ধ বধ, শিশুপাল বধ, কিরাত অর্জ্জুনের যুদ্ধ, নিবাত কবচদিগের সহিত সংগ্রাম, কীচক বধ ইত্যাদি তাঁহার সাধের যোগের প্রক্রিয়ার সঙ্কেত।

জ্ঞানী দেখেন যে, সঞ্জয়ের বাক্য, বিদুরের উপদেশ, সনৎসুজাতের রহস্য ব্যাখ্যা, চিরজীব মার্কণ্ডেয়ের উপদেশাবলী, ধার্ম্মিক বকের প্রশ্ন এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তর তাঁহার মনকে বিভ্রান্ত করিয়া দেয় ; আবার এই সকলের পর যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় কর্ম্মযোগ ও অন্যান্য যোগের বিষয় অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন, তখন তাঁহার মন যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহা তিনি জানিতেই পারেন না ; এক অপূর্ব্বভাবে মুগ্ধ হইয়া যান।

যোগসাধনায় কত দূর ক্রিয়া করিলে পতনের ভয় থাকে ও কোথায় উপস্থিত হইলে পতনের ভয় থাকে না, তাহাও তিনি গীতায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

যিনি রাজা, তিনি রাজনীতি শিক্ষা করিবার জন্য শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের উপদেশাবলী পাঠ করিলে কূটরাজনীতিজ্ঞ ও অর্থনীতিজ্ঞ হইতে সক্ষম হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দেখিতে পাই, কি ভাবে পূর্ব্বেও বিদেশী সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত নগরে আধুনিক প্রথার ন্যায় সন্ধ্যা-আইন জারি হইত, এবং যুদ্ধকালে কি ভাবে পানীয় পয়ঃপ্রণালী সকল কূট বিষদ্বারা দূষিত করিয়া রাখা হইত, এবং যিনি সমর-সচিব, তাঁহাকে কখনই অর্থসচিবের কর্ম্ম করিতে দেওয়া হইত না—ইত্যাদি।

ধর্ম্মোপদেশ সম্বন্ধে আমরা এই গ্রন্থে আদি হইতে অন্ত অবধি প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি ছত্রে তাহা সরলভাবে বা কূটভাবে ব্যক্ত হইতে দেখিতে পাই। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই যে কর্ম্মের প্রবৃত্তি বা ফলের নিবৃত্তি বর্ত্তমান ছিল, তাহা বহু স্থলে ইঙ্গিতে বা স্পষ্টভাবে ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন এবং এই শ্রীকৃষ্ণই যে স্বয়ং প্রণব এবং স্বধা, স্বাহা ইত্যাদি তাঁহার নারায়ণী-সেনা, তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে গেলে বা বিচার করিতে গেলে আমরা দিশাহারা হইয়া যাই।

মনে হয়, শ্রীভগবানের সরল বিশ্বাস ও আনন্দ সাধকের মনে আনাইবার জন্যই মহাভারতের পর তাঁহার ভাগবত গ্রন্থ রচনা। এই ভাগবতে সকল বিষয়ই সরলভাবে লিখিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে, কূটভাবে তিনি তাঁহার মনের কথা ব্যক্ত করিলেও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ কূট অর্থ ব্যাখ্যা করিবার লোক অতি অল্প, ইহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞানী ও কর্ম্মীদিগের জন্য মহাভারত, ভক্তিগত প্রাণ ভক্তদিগের জন্য ভাগবত। পন্থা বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য এক। যোগীর নিকট দুইই সমান। যোগের ব্যাখ্যা উভয়েতেই বর্ত্তমান।

সময়ান্তরে মহাভারতের কতক কতক অংশ আলোচনা করিবার ও কূট বা অন্তর্নিহিত অর্থের সমাধান করিবার প্রয়াস পাইব।

—শ্রীশরদিন্দু রায়

অবাস্তব ও বাস্তব

—শ্রীঅমূল্যচরণ মজুমদার

গ্রামের প্রান্তে ছোট একটি মেটে-বাড়ী। মালিকের মতই মলিন, হতশ্রী, দারিদ্র্যের তীব্রতা যেন সর্ব্বাঙ্গে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। গা ঘেঁসে উঠেছে গ্রামেরই এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের নূতন ঝকঝকে তকতকে পাকাবাড়ী। পাশাপাশি বেশ দেখায় বাড়ী দুটিকে—একটা রূপধরা পরিহাসের মত। মেটে-বাড়ীর মেয়েটি পাশের বাড়ীর তরুণ কণ্ঠের সম্মিলিত কলহাস্যে হঠাৎ চমকে উঠে শিশুটিকে বুকে চেপে ধরল—অথচ একটু আগেও এই রকম শব্দ তার কানে ভেসে এসেছে, চমক লাগার মত আকস্মিকতা এই উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে নেই। কিন্তু চমক তার নিজের মনে আছে,—একদিন এই রকম প্রাণ খুলে হাসবার ক্ষমতা তারও ছিল, মেঘের ছায়াহীন জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত।

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে সে জানালাটা বন্ধ করে দেয়। পাছে তাদের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস পাশের বাড়ীর আনন্দকে এতটুকু নিষ্প্রভ করে দেয়। বাহিরে চাঁদনী রাতের রূপালী আলো বন্ধ জানালায় আছাড় খেয়ে খেয়ে ফিরে যেতে থাকে। সমস্ত ঘরখানা যেন অন্ধকারে থমথমে হয়ে ওঠে। বুকের জমাট আঁধারই যেন মূর্ত্তি ধরে নেচে বেড়ায় চারিধারে। স্বামীর হাতখানা নিজের মুঠোর ভিতরে নিয়ে কমলা একটা নিঃশ্বাস টেনে বলে—'আর কিছু দিন সময় নিলে না কেন?'

একটু পাশ ফিরে তার স্বামী উত্তর দেয়,—'একটা মাস সময়ের জন্য বাবুর পা পর্য্যন্ত ধরেছি। কিন্তু সে পাওনাদার, আমার মত কত জন রোজ দুবেলা তার খোসামোদ করছে। সে আমার মুখের 'পরেই স্পষ্ট বললে—অমন কত জন দিনরাত আমার হাতে পায়ে ধরছে। অত মায়া করতে গেলে আমাদের ব্যবসা ছেড়ে হরিনামের মালা নিয়ে বৈরাগী সেজে ভিক্ষে করতে হবে।'

'কালই বোর্ডে নালিশ করবে?'

'হ্যাঁ! এতদিন করেনি শুধু বাপ-দাদার আমল থেকে ওর দোকানেই জিনিষ নেওয়া হয় বলে। কিন্তু ধার দিয়ে খাতির করা আর কতদিন চলে?'

কমলা একটু থেমে বলে,—'জমিজমা কি কিছুই আর নেই?'

'রতনচকে দু'বিঘে জমি ছিল; আমার ধারণা ছিল, সেটুকু বোধ হয় আমাদেরই আছে। কিন্তু দেবেনবাবু পরশু বলছিলেন,—ওটা না কি আমার বি-এ এক্জামিনের ফি দেবার সময় বাঁধা রেখে বাবা তাঁর কাছ থেকে পঁচাত্তর টাকা নিয়েছিলেন। ওটা তাঁকেই লিখে দিতে হবে—উদ্ধারের তো আর কোনই আশা নেই।'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে—'বাবা যে কত আশা করে প্রতিদিন দারিদ্র্যের কত নিষ্ঠুর আঘাত সয়েও আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন; তাঁকে অনেকে নিষেধ করেছে, কত লোক বুঝিয়ে বলেছে, সব শেষ করে' যে ছেলের পেছনে চালছ, শেষে কি ভিক্ষে করবে? তিনি হেসে জবাব দিতেন, ভগবান করুন, সত্যেন আমার মানুষ হোক, আমাদের আর তখন ভাবনা কি? কিন্তু কমল! তিন বছর কি প্রাণপাত চেষ্টাই না করেছি—কিন্তু একটি পয়সাও আমি বাবার হাতে তুলে দিতে পারিনি। বুড়ো বয়সে খাটতে খাটতে তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠেছে। কত আশা করে ছেলেকে লেখাপড়া শেখালেন, আর তাঁর সে আশা—উঃ কমল!—মা বাবা আমার কতবড় ব্যর্থতা বুকে নিয়ে যে গেছেন!' সত্যেনের চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে ওঠে, বুক ঠেলে উঠে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। পরম স্নেহে স্বামীর চোখদুটি মুছিয়ে দিয়ে কমল বলে, 'কি করবে বল?—তুমি তো আর চেষ্টার ত্রুটী করনি! ও সব কথা মনে করে আর অযথা অশান্তি এন না।'

সত্যেন একটু থেমে বলে, 'কমল! ভাবছি এখানে আর থাকব না। এমন করে অসহায়ের মত শুকিয়ে মরবার চেয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। কলকাতা যাব। কত লোক তো সেখানে করে খাচ্ছে,—আমার কি কিছুই জুটবে না?'

কমল আশা দিয়ে বলে—'কেন জুটবে না,—নিশ্চয়ই জুটবে। তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার অত ভেঙে পড়লে

চলবে কেন? বাঁচতে তো হবেই—। তারপর আমাদের মন্ত্র আছে, ওকে তো আর চোখের সামনে না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারা চলবে না।'

'তাই যাব কমল! কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই, দুঃখ ক'রো না। আচ্ছা! কিছু দিনের মত কি তুমি হালসা গিয়ে থাকতে পার না? আমি একা গেলে যেখানে যেমন ভাবেই থাকি—কিছু আসে যায় না, কিন্তু তোমাকে নিয়ে গেলে যা হোক অন্ততঃ একটু আশ্রয় চাই তো?'

কমলের চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে,—'তুমি তো সবই জান? নিতান্ত ভিক্ষা মেলে না বলেই মা ভিক্ষে করতে পারেন না, তার উপর অত বড় একটা আইবুড়ো মেয়ে তাঁর ঘাড়ে। এক বেলা এক মুঠো ভাত, তাও কোনও দিন মেলে, কোনও দিন মেলে না। আমার বিয়েতে সব জমিজমা, এমন কি বাড়ীখানা পর্য্যন্ত দেনার দায়ে গেছে। সেজ কাকা দয়া করে একটু স্থান দিয়েছেন মাথা গুঁজবার, না হলে কি যে হত তাই ভাবি।'

সত্যেন হাসে। জীবনভরা ব্যর্থতা যেন নিজেকে কঠিন বিদ্রূপ করতে শিখিয়েছে। বলে,—'কমল, তোমার বাবা তাঁর যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে লেখাপড়া-জানা ছেলে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন, মেয়ে সুখে থাকবে বলে। তিনি যখন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, বাবা তাঁকে কিছুই গোপন করেননি। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, বিষয়-আসয় আমি চাইনে, ছেলের পেটে যদি বিদ্যা থাকে, মেয়ে আমার দুটো ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাবে না। বাবারও হয়তো সেই ভরসাই ছিল; আমি ভাবি ভাগ্যে তোমার বাবা আজ বেঁচে নেই, না হলে তাঁর এ ভুলের মাশুল বুঝি তাঁকে জীবন দিয়ে দিতে হত। তাই হয় কমল! মানুষ নিজের দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে নিজেকে এমনি নির্ভুলই মনে করে।'

কমল বাধা দিয়ে বলে,—'বাবা কোনও ভুল করেন নি। আমার মত স্বামী-সৌভাগ্য ক'জনের হয় শুনি? এততেও যদি তাঁর ভুল হয়েছে মনে করি, তা হলে আমার নরকেও স্থান হবে না। আমার কি এমন কষ্ট শুনি?'

সত্যেন হেসে ওঠে—'বেশ কমল, বেশ! তোমাদের এই জন্যই এত প্রয়োজন। মেয়েরা যেন তাদের বুকভরা স্নেহ দিয়ে পুরুষদের সব ভুলিয়ে দিতে চায়। এততেও যদি তুমি সুখে আছ, তবে এ দেশের সব মেয়েরাই রাজরাণী এ আমি দিব্যি করে বলতে পারি।'

কমল বলে—'তা নয়তো কি? আচ্ছা থাক্, সে চিন্তা সেই মেয়েদের পরেই ছেড়ে দাও। আর অতীত নিয়ে তো আমাদের চলবে না। বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কারবার। শোন, এখনও আমার দুগাছি চুড়ি আছে, আর খোকার কপালের সেই চাঁদখানা; ওতে তো কিছুদিন সামলান চলবে। এর মধ্যে তুমি কি আর কিছুই করতে পারবে না? তা খুব পারবে। আমি মা লক্ষ্মীকে মানত করেছি—'

সত্যেন লাফিয়ে উঠে বলে,—'দেখ কমল, ও সব ঠাকুর দেবতার নাম আমার সামনে কর না। সেকেলে সব পণ্ডিতদের ওসব ছিল মানুষ ঠকানোর ফন্দী। আজ তিনটি বছর বুড়ো বাপ মাকে দুটো মুখের গ্রাস তুলে দিতে চেয়ে, যেখানে যত ঠাকুর দেবতা দেখেছি, মাথা ঠুকে ঠুকে মাথা ফুলিয়ে ফেলেছি, কিন্তু তাঁদের একমুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারি নি কোনও দিন। ও সব ভুয়ো ধাপ্পাবাজী!'

কমলের বুকটা ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে, স্বামীর মুখ দু'হাতে চেপে ধরে আর্ত্তস্বরে বলে ওঠে—'চুপ-চুপ! ছি! অমন কথা মুখে আনতে নেই—ওতে অপরাধ হয়। ঠাকুর-দেবতা না থাকলে বেঁচে আছি কি করে?'

সত্যেন যেন ক্ষেপে ওঠে,—'হ্যাঁ বেঁচে আছি!—ছাই বেঁচে আছি। অমন বেঁচে কুকুর বেড়ালও আছে। বেঁচে আছি হ্যাঁ—; দেখি দেশলাইটা—'

সাতটি মাস কেটে গেছে। এই সাতটি মাসে তাদের চোখ বেয়ে নেমেছে সাত সমুদ্রের জল। কত চাকরীর উমেদারী—কত জনের কত হিতোপদেশ কিছুতেই কোনও ফল হয় না। এদিকে পুঁজিও কমে নিঃশেষ হয়। শেষে সামান্য যা কিছু সম্বল ছিল, তাই জমা দিয়ে সত্যেন আরম্ভ করে মাছের ব্যবসা। রাত তিনটায় উঠে সাত মাইল পথ হেঁটে গিয়ে মাছ আনতে হয়; সমস্ত দিন বাজারে বিক্রী করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরে। সামান্য যা কিছু মেলে—তাই

দিয়ে এক বেলা কোনও রকমে চলে। কিছুদিন তাও অতি কষ্টে চলল। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস! না পারে সে এই কঠোর পরিশ্রম করতে, না জানে সে ব্যবসা করার ছোট-বড় নিয়ম কানুন, মাথাটা তার ঠাসা হয়ে আছে অবাস্তব অদ্ভুত কল্পনায়। একদিন ব্যবসা যায় ফেল হয়ে, আবার সুরু হয় চাকুরীর উমেদারী।

সেদিন রাত নটায় বাসায় ফিরতেই সত্যেন শুনতে পায় বাড়ীওয়ালীর মধুর কণ্ঠ···"আচ্ছা বৌ! তোমার কি-রকম আক্কেল গা! চৌবাচ্চার ভেতরে ভাত ফেলেছ! এখন জল কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? টাকা দেওয়া নেই, পয়সা দেওয়া নেই—এদিকে নবাবী তো ষোল আনা দেখতে পাই। চার মাসের বাড়ীভাড়া বাকী, দুবেলা যে দূর দূর ছাই ছাই করি—ঘেন্নাও কি নেই? আজ আসুক বিশে—ও মুখের কথার কাজ নয়—ঝাঁটা মেরে বিদেয় না করলে যাবার পাত্তর তোমরা নও।"

কমল শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। সে কি করেই বা বলবে, আজ তাদের চাল বাড়ন্ত বলে রান্নাই হয় নি—চৌবাচ্চায় তারা ভাত ফেলতে যাবে কি!

সত্যেন বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়ীওয়ালীর শব্দ যখন যায় থেমে—চোরের মত ধীরে ধীরে গিয়ে ঘরে ওঠে।

কারও মুখেই কোনও কথা জোগায় না কিছুক্ষণ!······

তৈল-প্রদীপে আজ তিন দিন তেল পড়ে নি—তাই ঘরে আলোর কোনও বালাই নেই। তাতে কোনও অস্বস্তিও নাই। এ সব তাদের সয়ে গেছে।

"কমল! একটু খাবার জল"—বলেই সত্যেন ছেঁড়া মাদুরখানা টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

সমস্ত দিন মুখে একটি দানা নেই—শুধু জল দিতে কমলের চোখ দুটো জলে ভরে আসে, তবুও দিতেই হয়। এই তার বিধিলিপি! উপায় কি?

"কমল, সেদিন কাপড়গুলো সবই দিয়ে দিয়েছ?"

কমলের স্বরটা যায় কেঁপে, বলে "হ্যাঁ,—শুধু যে দুখানা একেবারে পুরাণ—তাই শেলাই করে কোনও রকমে পরছি"—এগিয়ে এসে স্বামীর চুলের মাঝে সস্নেহে আঙ্গুলগুলি দেয় বুলিয়ে···সত্যেন বলে,—"শোন কমল! এইবার তোমরা তোমাদের পথ দেখ, আমার যা করবার কালই করব। আজই একটা কিছু করতাম। কিন্তু মনে পড়ে গেল—তোমার মুখ—তোমার পরম নির্ভরশীল অন্তর—আর মন্থর কথা—তাই একবার শেষ দেখা দেখে নিতে এলাম, আর জানিয়ে দিতে এলাম যে, আমার আশা আর ক'র না। কি করব! কোনও উপায়ই যে আর নেই কমল!"

কমলের বুকে কথাগুলো কেটে কেটে বসে। সে দুহাতে স্বামীর মাথাটা টেনে কোলে তুলে নিতেই চমকে ওঠে। এ কি, এ যে রক্ত! কপাল কেটে গেল কি করে?

সত্যেন ধমক দিয়ে ওঠে। "চুপ, কতক্ষণ ও রক্ত পড়বে—কতক্ষণ থাকবে। বাইরে যেটুকু দেখছ—তাতেই আঁৎকে উঠছ? প্রতি মুহূর্ত্তে বুক থেকে কত রক্ত নিঙড়ে বেরুচ্ছে—তার খবর রাখ? থাক,—ওর জন্য আর অত মায়া করতে হবে না। আমি ভাবি বুকটা ফেটে কেন রক্তের নদী বয়ে যায় না? বেশ হত, একদিনেই সব চুকে যেত।" কমল দুহাতে ক্ষতস্থান চেপে ধরে কেঁদে ওঠে..."ওগো!—কেমন করে, এমন সর্ব্বনাশ হল?—কে করলে?"

সত্যেন বিদ্রূপ করে ওঠে, "কে করলে, শুনবে? কত লোকে বলে,—না হয় মুটেগিরি করে খাব। তারা জানে না যে বলায় আর কাজে কত প্রভেদ! আমিও যখন কলেজে পড়ি, তখন কত ভিখারীকে অমন উপদেশ দিয়েছি। কমল, নিতান্ত নিরুপায় হয়ে শেষে কাল থেকে তাই সুরু করেছি।"

কমল চমকে ওঠে,···"কি সুরু করেছ,—মুটে-গিরি?—"

—"হঁ্যা! কিন্তু পসার হ'ল না, অত শক্তি আমার শরীরে নেই, কাল একটি মোটও আমায় কেউ দেয়নি। কেন দেবে? হিন্দুস্থানী মুটে বোঝা বয় বেশী—পয়সা নেয় কম। আজ বহু কষ্টে একটি ভদ্রলোককে হাতে পায়ে ধরে রাজী করি। সে বললে, এই ব্যাটা পারবি তো? তোর যে রোগা-পটকা চেহারা। আমার কিন্তু বাপু ট্রেন ধরতে হবে। আমি বললুম, হ্যাঁ বাবু! খুব

পারব। বাবু বলতে হয় কমল, নইলে ব্যবসা চলে না। তা হোক ও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। ছেঁড়া জামা-টাকে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে মোট নিয়ে চললাম। বাবু চললেন আগে।"……তাকে হাঁপিয়ে উঠতে দেখে কমল স্বামীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে,—"থাক।" সত্যেন সজোরে শ্বাস টেনে বলে, "শোন কমল, তোমার ঠাকুর-দেবতার অসীম দয়ার কথা। মাণিকতলা থেকে শেয়ালদহ—পয়সা দেবে কটা জান কমল—চারটে। তা হোক, তবুও তো এ বেলা দুটো চাল সিদ্ধ করে' নেওয়া চলত! পথ প্রায় শেষ করে এনেছি; কিন্তু কাল থেকে পেটে কিছু নেই- মাথাটার ভেতর কেমন করে উঠল—সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল—তারপর সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। সংজ্ঞা ফিরে পেলুম—সেই ভদ্রলোকটির জুতোর আঘাতে। চেয়ে দেখি—" একটা আর্ত্তনাদ করে কমল দু'হাতে স্বামীর মুখ চেপে ধরে—"ওগো!—তোমার দুটি পায়ে পড়ি—তুমি চুপ কর। আমি আর শুনতে চাইনে।"

পরদিন সকালে উঠেই ছেঁড়া জামাটা কাঁধে ফেলে বেরোতেই বাড়ীওয়ালী কণ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ মিশিয়ে বলে, "কি? নবাব-পুত্তুরের কি ভিক্ষেয় বেরনো হচ্ছে? বলি এ সব ছল-চাতুরী করে ক'দিন চলে? কেমন ধারা মিন্‌সে তুমি! মাগ ছেলেকে ভাত দিতে পার না—গলায় দড়ি জোটে না তোমার? যাক্ বাপু! এখনও ভালয় ভালয় বলছি, তোমার জিনিষপত্তর যা আছে—নিয়ে একেবারেই যাও। এ বাড়ীতে আর একটা দিনও তোমার স্থান হবে না। বেহায়া—বে-আক্কেল কোথাকার! অমন লক্ষ্মী বউ তাই, তেমন বউ হলে উঠতে বসতে লাথি ঝাঁটা মারত—।"

সত্যেনের মাথায় হঠাৎ খুন চেপে যায়। একটা ইঁট তুলে তেড়ে আসে। কমল দৌড়ে এসে দু'হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলে, "ছি! কি করছ? তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর কেলেঙ্কারী কর না।"—সত্যেন কমলের গলাটা ধরে মারে এক ধাক্কা,—কমল ছিটকে পড়ে যায়। সত্যেন বেরিয়ে যায়—বকতে বকতে।

বাড়ীওয়ালীর হাত দুটি ধরে' কমল বলে—"আজকের দিনটি আমাদের দয়া কর দিদি! কাল সকালেই যেখানে হয় চলে যাব।"

বাড়ীওয়ালী কি ভেবে বলে—"দয়া আমি করতে পারি বাছা! কিন্তু তোমার ঐ সোয়ামী মিন্‌সে যদি ফের একটা কথা বলে, তবে কিন্তু আমি এই বাঁ পা দিয়ে গুণে গুণে সাতটা লাথি তার মুখে মেরে তবে ছাড়ব।"

কমলের সমস্ত শরীর ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

সত্যেন চলেছে পথ বেয়ে। দিশেহারা। জীবনের বোঝা ওর হয়ে ওঠে ভারী, মূল্যও তাই হয়ে আসে হালকা। বাড়ী ফিরবে না মনে করতেই ওর বুকটা কেঁপে ওঠে।…কমল হয় তো…এখনও পথ চেয়েই বসে আছে। মন্টু হয় তো বলছে—মা! বাবা কই? কমল হয় তো বলছে, আসবে বাবা—এক্ষুনি আসবে। একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস টেনে আবার চলে…চারিদিকে চেয়ে চেয়ে…যদি কোনও সন্ধান মেলে…এমন তো কত শোনা যায়…।

কত কি ভাবতে ভাবতে সে চলেছে। বেলাও এসেছে শেষ হয়ে। কত লোক ছুটাছুটি করে বাড়ী চলেছে। সারাদিন খেটেছে—এখন স্বস্তি চাই, শান্তি চাই। চলতে চলতে দেখে একস্থানে বেশ ভিড় জমছে। একজন বলছে—'তা আজ-কালকার দিনে পাঁচ টাকাই বা কোথায় পাওয়া যায় শুনি। মাথা ভাঙলে পাঁচটি পয়সা মেলে না।' সত্যেন জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে কি হচ্ছে মশাই?'

একজন বলে—'একজন মাষ্টার চাই থার্ডক্লাস আর ফোর্থক্লাসের দুটি ছেলেকে পড়াতে হবে—মাইনে পাঁচ টাকা।'

সে যেন আবার আশার আনন্দে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। 'আচ্ছা দেখুন, দরখাস্ত করতে হবে কি?'

ভদ্রলোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,'তবে কি তোমার মুখ দেখে দেবে। কেন বাজে বকছ বল তো! গ্রাজুয়েট চাই হে, গ্রাজুয়েট চাই।' অত কথা তার কানে যায় না। কল্পনায় কত কি রং চড়ে যায় এর মধ্যেই। যাক বাড়ী-ওয়ালাকে তো থামান যাবে। আর এক বেলা না হক, একদিন পর একবেলা তো দুটি ভাত জুটবে। তারপর ধীরে ধীরে…হয় ত একদিন চারিদিক গুছিয়ে

নিয়ে নিজের অবস্থা সে স্বচ্ছল করে তুলতে পারবে, কোন দিকে তার কোন অভাব থাকবে না।

একে একে সবাই দরখাস্ত দাখিল করে একটা করে সভক্তি নমস্কার করে'—বুঝি বা তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতার মানত করতে করতে চলে যায়। সকলের শেষে সে এসে একটা নমস্কার করে দাঁড়ায়। ভদ্রলোকটি একবার তার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে প্রশ্ন করেন—'তোমার আবার কি?' সে বলে—'আজ্ঞে আমিও একজন প্রার্থী'—

'বেশ তো—য়্যাপ্লিকেশন রেখে যাও'—চোখে মুখে তাঁর একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে ওঠে।

'আজ্ঞে আমি বড়ই গরীব—তাই বলছিলুম কি, যদি আমাকেই প্রোভাইড করতেন—তবে—'

'বি-এ পাস করেছ?—সার্টিফিকেট আছে? নিয়ে এস কাল—।'

'যদি আপনি আশা দেন তবে আজই—; আপনাকে আর কি বলব—আজ দুদিন উপবাসী বাড়ীতে—'

বাধা দিয়ে তিনি বলেন—'থাক থাক, তোমার মূল্যবান জীবনী আমার না শুনলেও চলবে।'

পাশে বসে ছিল তার মেয়ে। সে বোধ হয় সত্যেনের মুখ দেখে একটু মমতা বোধ করে, অনুযোগ দিয়ে বলে, 'বাবা! কেন মিছামিছি এ সব করছ! যা সত্যি তাই কেন বলে দাওনা?

ভদ্রলোকটি একটু হেসে বলেন—'দেখ হে ছোকরা! মাষ্টার আমার দরকার নেই। আমার ছোট ভাই তার কোন এক বন্ধুর সঙ্গে বাজী রেখে ঐ মাষ্টারীর জন্য ক'জন গ্রাজুয়েট প্রার্থী আসে, তাই দেখবার জন্যই ঐ বিজ্ঞাপন দেয়। ছোট ভাই একটা কাজ করেছে, কি করব?—আর এ সব ছেলে তো কত জায়গাই ঘুরছে, এতে আর এমন কি আসবে যাবে! কি বল হে?' ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে থাকেন। সত্যেনের বিশ্বাস হয় না—তবে সার্টিফিকেট দেখতে চাইবে কেন—

বলে, 'সত্যি আমি গ্রাজুয়েট—আজই সার্টিফিকেট এনে দেখাতে পারি।'

ভদ্রলোকটি একটু বিরক্ত হয়ে ওঠেন—'তোমাকে তো সবই বললুম—এর পরে তো আর কোনও কথা চলে না।'

সে যেন কেমন হয়ে যায়—বলে, 'তবে যে সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন?'

তিনি বলেন—'তা দেখালে তোমায় আর মান খোয়া যেত না—কতজনকেই তো দেখাচ্ছ?'

সত্যেন মন্থরপদে হাঁটিতে হাঁটতে ভাবে···এরা মানুষ না কি? মানুষের দৈন্য নিয়ে যারা খেলা করে—তাদেরও কি মানুষের মতই হৃদয় আছে? টলতে টলতে রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে গঙ্গার ধারে—একটু বিশ্রাম করবে।

অপেক্ষাকৃত একটু নির্জ্জন স্থানে এসে সে বসে। ভাবে, গত জীবনের কত ছোট-খাট কথা। একবার তার এক বন্ধু তার কাছে যা কিছু ছিল, সব দিয়ে কোন এক জুয়াচোরের কাছে থেকে কিনেছিল আধ সের সোনা। তখন তার কি দিল-দরিয়া মেজাজ। কিন্তু এ্যাসিডে যখন সোনাটাকে খাটি করতে যায়—তখন সোনার পাত্রটির সাথে সাথে তার বুকখানা হয়ে গিয়েছিল শূন্য।

সেও তো তাই করেছে—বাপ-মায়ের বুকের রক্ত শুষে'—তাদের যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে, এতদিন যে রত্ন সে অপহরণ করেছে, আজ বাজারে তার মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। সব ঝুটো, মেকী।

ভাবতে ভাবতে তার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ কখন যে গাঢ় সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে—সে টেরও পায় নি। ভোরের দিকে ঘুম ভাঙ্গতেই তাড়াতাড়ি উঠে সে বাড়ীর দিকে ছোটে। কতক্ষণ ঘুমিয়ে কেটে গেছে। কমল হয়তো সারারাত জেগে জেগে কত কেঁদেছে। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। অনশনক্লিষ্ট দেহখানা থর থর করে কাঁপে —তবুও সে ছোটে প্রাণপণে। কমল হয়তো ভেবে ভেবে সারা হয়ে গেল।

বাসার কাছে এসে যখন পৌছয়, তখন সকাল হয়ে গেছে। বাসার সামনেই তাদেরই পরিচিত ঘর-কন্নার জিনিষগুলি দেখে তার বুকটা আশঙ্কায় দুলে ওঠে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দাওয়ায় বসে।

বাড়ীওয়ালী অতি কষ্টে গলাটা একটু মিঠে করে বলে—'আমার নূতন ভাড়াটে জুটেছে—ঘরটি এখন খালি করে' না দিলে তো আর চলে না। তোমাদের বললেও যাবে না। তারা হয় তো আজই এসে পড়বে। তাই বিশেকে দিয়ে জিনিষগুলি বের' করে দিয়েছি, এখন একটা জায়গা বাসা দেখে চলে যাও। ঘরখানা তো আমার আবার পরিষ্কার করতে হবে—নইলে টাকা দেবে কেন লোকে? টাকা নেব অথচ যত্ন আত্তি করব না—তেমন স্বভাব আমার নয়'—বলেই ঝাঁটাগাছা আর এক বালতী জল নিয়ে বাড়ীওয়ালী ঘরে ঢোকে।

মন্তু বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে।

ছেলেকে দুহাতে বুকে টেনে নিয়ে সত্যে উঠে দাঁড়ায়, মৃদুস্বরে বলে—'কমল, চল যাই।'

কমল বলে—'চল'। কোথায় যেতে হবে সে প্রশ্ন করে না।

অন্তঃপুর

তরু দত্তের নারী-জগৎ

—শ্রীপ্রিয়লাল দাস

মানব-জগতের গুলিস্তাঁয় অগণিত শিশু-ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। জাতীয় জীবনে শিশুদের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসিয়া জারমান মনীষিগণ সর্ব্ব প্রথমে এই শিশু-উদ্যানের (kinder-garten) প্রতি শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তদবধি পৃথিবীর নানা স্থানে বিদ্যাশিক্ষার প্রণালীতে শিশু-উদ্যান সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। শিশুগণকে কবি ও উপন্যাস-লেখকগণ উপেক্ষা-ই করিয়া গিয়াছেন। এ দেশে দুই একজন ব্যতীত অপর কোনও কবি বিশেষভাবে কাব্য-সাহিত্যে শিশুকে স্থান দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলেও বালকত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, শিশুর মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বাঙ্গালী কবিরা প্রায়-ই উদাসীন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অথচ, বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে গৃহস্থের অন্তঃপুরে কতটা বাৎসল্য-প্রেমের অমৃত-ধারা সিঞ্চিত হইলে তবে শিশু-পুষ্পের কুঁড়ি স্ফুটনোন্মুখ সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া বিদ্যাপীঠের সীমাবদ্ধ একটুখানি উদ্যানের কাচের ঘরে রক্ষিত হইয়া থাকে! নারী-উদ্যানের যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন, নারীর শৈশবাবস্থা সম্বন্ধে চর্চ্চা করিয়াছেন? মনে হয়, তরু দত্ত নারী-জগৎকে তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি নারী-পুষ্পের কুঁড়িটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। সেই কুঁড়ির বর্ণনা অমিত প্রতিভাশালী ফরাসী কবি ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) কবিত্বময় ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তরু দত্ত কর্ত্তৃক ইংরাজী পদ্যে অনূদিত এই কবিতার নাম—"খুকী জিনের প্রতি।" (To Little Jeanne)। কবিবর হুগো উনবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের উল্লেখে "ভয়ঙ্কর বৎসর" নামে যে কবিতা-পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতা স্থান পাইয়াছে। পিতামহ হুগো তাঁহার একবৎসর-বয়স্কা পৌত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"আমার যাদুমণি, গতকল্য তোমার এক বৎসর বয়স হইয়াছে; তুমি বেশ আনন্দেই অস্ফুট কলগানে দিন কাটাইয়া দিতেছ; এই রূপেই নবজাত পক্ষী-শাবক পত্রাচ্ছাদিত বাসায় তাহার ভাবহীন চোখ-দুটি মেলিয়া সমীরণের আদরে দুলিতে দুলিতে কলরব করিয়া থাকে, আর গায়ে পালখের উদ্গম অনুভব করিয়া আনন্দিত হয়। জীন, তোমার মুখখানি প্রস্ফুটোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি। ঐ যে চিত্র-সম্বলিত বৃহদাকার পুস্তকগুলি রহিয়াছে, তুমি উহার চিত্রগুলিকে কেমন আঁকড়াইয়া ধর, আবার কখন বা নষ্ট করিয়া ফেল; ঐ পুস্তকে উৎকৃষ্ট কবিতাবলী আছে, কিন্তু তোমার মুখখানির সহিত তাহাদের তুলনা হয় না, তোমার সৌন্দর্য্যের আধখানাও তাহাদের নাই! আমি যেমন আমার প্রাপ্য চুম্বন আদায় করিতে তোমার দিকে যাই, তোমার গণ্ডদেশ অমনই গ্রীষ্মকালের হ্রদের মত ঊর্ম্মিমালায় ভরিয়া উঠিয়া হাসির সাথে নৃত্য করিতে থাকে; তোমার চোখে বিকাশোন্মুখ ভাবের ছায়া এমন সুন্দর, এতই সারগর্ভ তত্ত্বে ভরা যে, তাহার তুলনায় সকল দেশের ও সকল যুগের সু-বিখ্যাত কবিদের রচনা নগণ্য। ইহা যেন জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নবৎ অদ্ভুত ও অস্পষ্ট! স্বর্গবাসী দেবদূতের চিন্তাধারার ন্যায় পবিত্র। জীন, তুমি যখন এখানে রহিয়াছ, ভগবান এখান হইতে বেশী দূরে অবস্থান করিতে পারেন না।

"আঃ! তোমার বয়স মাত্র এক বৎসর। যাদুমণি আমার, এই এক বৎসর যেন একটা যুগ। চারিদিকের দৃশ্যে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, তোমার মুখে যে গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কারণ পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত তুমি সামঞ্জস্য

রক্ষা করিতে চাও বুঝি? ওঃ, মানব-জীবনে স্বর্গানুভূতির মুহূর্ত্ত! আমরা সুখের লাগিয়া উন্মাদ হই, কিন্তু যাহাদের জীবন-পথে ছায়াপাত হয় নাই, কেবল তাহারাই সুখী। যখন তাহারা পিতামাতাকে বাহুর বন্ধনে ধরিয়া রাখে, তখন তাহারা মনে করে যে, সারা জগৎটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, আর অনুভব করে যে, বিপদ হইতে তাহারা রক্ষিত হইতেছে। তোমার শিশু-আত্মা যখন তোমার স্নেহময়ী জননী অ্যালিসের ক্রোড় হইতে তোমার পিতা চার্লসের অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়ে, আর এই ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে হাসি-কান্না ও স্বপ্নময় ছবি তোমার ভিতরে ফুটাইয়া তুলে, তখন মনে হয় যে, তোমার পিতামাতার বাৎসল্য-প্রেমই তোমার সর্ব্বস্ব, আর সেই প্রেম-ই তোমার সুদূরপ্রসারী চক্রবালকে রামধনুর রঙে রাঙাইয়া তুলে। তোমার জগৎ, তোমার স্বর্গ হইতেছে একজন, যিনি তোমাকে সাঁঝের বেলা কোলে রাখিয়া দোল দেন, আর অপর একজন, যিনি এই দৃশ্য দেখিয়া মৃদু হাসি হাসিতে থাকেন। তোমার শৈশব-জীবন সেই মুহূর্ত্তে, পুষ্প-জীবনে সূর্য্যালোকের ন্যায়, তোমার সামনে তাহাদের মূর্ত্তির আলোকে আলোকিত হইয়া ওঠে। কি শুভাশিসে ভরা বিশ্বাস! তোমার জীবন তোমার পিতামাতার জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, আর ইহাই ত তোমার জীবনের সত্য ঘটনা। আমি একপাশে দাঁড়াইয়া আছি,—তোমার পিতামহ; তবে, তোমার খেলার সাথী হইতে আমার বিরক্তি নাই, তোমার গোলামি অথবা হুকুমের দাস হইতেও আমি রাজী; কিন্তু আমি চাই যে, তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ের এক কোণে তোমার একটা ক্রীড়ণকের মত রাখিয়া দিবে, আর তাহাতেই আমি পুলকিত হইব; তুমি আসিয়াছ, আমি চলিতেছি; আমি রাত্রির জন্য অপেক্ষা করিতেছি, আর ইতিমধ্যে তোমার জীবনে আলোর উন্মেষ দেখিয়া সেই আলোকে অভিবাদন করিতেছি, পূজা করিতেছি।

"তোমার খেলার আনন্দ আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আমি আর কিছু চাই না, আমার সব পরীক্ষা যখন শেষ হইয়া যাইবে, তখন রৌদ্র ও প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যরাশির মাঝে তোমার হাসি-মাখা ক্রীড়ারত দেহের ছায়া আমার কবরের উপর পড়িবে, ইহা-ই আমার জীবনের অভিলাষ। আঃ! আমার নবাগত অতিথি, তুমি ফ্রান্সের দুর্দ্দিনে জন্মিয়াছ * * * প্যারী নগরীর যখন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে, তখনও তুমি হাসিতেছ। ও আমার যাদু জীন্! সে যখন রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছে, তখনও তুমি বনের মৌমাছির মত কলরব করিতেছ, তরবারির ঝনঝনা ও কামানের গর্জ্জনের মধ্যে তুমি জাগিয়া উঠিয়াছ, আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছ, যেন কোথাও কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই; আর যখন আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকি, জীন্, আর যখন আমি তোমার আধ আধ কথা শুনি, আর তোমার হাত দু'খানি যখন ধীরে ধীরে আমার মাথার উপর দিয়া যায়, তখন আমার মনে হয়, যেন কাল-বৈশাখীর ভীষণতায় পূর্ণ মেঘ সকল কোথায় পলাইয়া যাইতেছে, আর ভগবান যেন তাঁহার পবিত্র সিংহাসন হইতে বিপদের বেড়া-জালে ঘেরা নগরের রাণার মস্তকে একটি শিশু-কন্যার হাত দিয়া শান্তির আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়া দিতেছেন।"

খোকা-খুকীর বহু উৎকৃষ্ট চিত্র-পুরুষ কবিরা অঙ্কিত করিয়াছেন। তরু দত্ত তাঁহার নারী-জগতের চিত্রশালার জন্য ভিক্টর হুগোর রচিত খুকী জীনের চিত্রখানি বাছিয়া লইয়াছেন। এই শ্রেণীর চিত্রে আমরা পিতা বা মাতার বুক-ভরা বাৎসল্য-প্রেম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা-লাভের যেমন সুবিধা পাই, তেমনই চিত্রকরের শিল্পের মূলে তাঁহার যে মনস্তত্ত্ব আছে তাহারও পরিচয় পাই। ফ্রান্সের সাহিত্য-সংসারে হুগোর ন্যায় শিশু-চিত্রের মারফত অপর কেহ "শিশুরা কোথা হতে আসে, কোথা যায়?"—এই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ মার্কিণ সমালোচক মিঃ হাডসন (Hudson) রোমান্টিক কবিদের মধ্যে হুগোকে শিশু-চিত্রের ভিতর দিয়া জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে অতি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনার জন্য বিশিষ্ট স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হুগো কিন্তু কোনও তত্ত্বের খাতিরে জীনের চিত্র রচনা করেন নাই। তরু দত্তও কোনও তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই চিত্র নির্ব্বাচন করেন নাই। জীনের চিত্রে আমরা স্বাভাবিক বাৎসল্য-প্রেমের প্রভাব অনুভব করি। এতদ্ব্যতীত, এই চিত্রে আমরা পারিপার্শ্বিক কোলাহলময় জগতের মাঝে খোকা-খুকীদের নির্ব্বিকার ভাব লক্ষ্য করি। তরু দত্ত কুমারী হইলেও নারী-হৃদয়ের বাৎসল্য-প্রেম সম্বন্ধে একটা সংস্কার লইয়া তিনি যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই প্রেমের জগৎ-জোড়া প্রভাব কোনও কবি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "শিশু" নামক কাব্য-গ্রন্থে বাঙ্গালীর ঘরের ছেলেমেয়েদের বৈচিত্র্যময় যে সকল চিত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের তুলনা কম দেশের কাব্য-সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। পারুল দিদি, বিম্ববতী, বাবলা রাণী প্রভৃতি চিত্রে আমরা বাঙ্গালার নারী-জগতের অন্তর্গত শিশু-উদ্যানে আধ-ফোটা কমল কলির যে সংবাদ পাই, তদপেক্ষা মনোহর কোনও কিছু কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক চিত্রের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড রোমাণ্টিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, তত্ত্বদর্শীর প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। বিদেশী কাব্য-গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা পদ্যে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অনূদিত কয়েকটি সুন্দর কবিত্বময় রচনাও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাধারে রক্ষিত হইয়াছে। ভিক্টর হুগোর চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের চিত্রের প্রভেদ এই যে, ফরাসী কবি ভীষণ বিপ্লবের ধ্বংসকারী অগ্নিশিখার উত্তাপে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিলেও তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃপুরের বাৎসল্য, প্রেমের উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আর বাঙ্গালী কবি শান্তিপূর্ণ ইংরাজ রাজত্বে তাঁহার বাৎসল্য-প্রেমকে মনের সুখে আদর-আব্দারে পরিবর্দ্ধিত করিবার বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন। এই পবিত্র বাৎসল্য-প্রেমের উপর যখন ট্রাজেডির ছায়াপাত হইয়াছে, হুগো তখন শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। কবির তুলিকা কন্যার মৃত্যুতে যে মর্ম্মন্তুদ করুণ চিত্র রচনা করিয়াছে, তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয়, যেন আমরা কন্যাহারার হাহাকারমিশ্রিত প্রলাপোক্তি শুনিতে পাইতেছি। তরু দত্তের নারী-জগৎ পিতৃ স্নেহের গভীরতা কতটা অনুভব করে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি, কবি কর্ত্তৃক ইংরাজি পদ্যে অনূদিত হুগোর একটি মাত্র কবিতা পাঠ করিয়া। এই মর্ম্মস্পর্শী কবিতার নাম "তাঁহার কন্যার মৃত্যুতে" (On the Death of His Daughter.)—

"ওঃ! প্রথমটা আমি পাগলের মত দুর্দ্দমনীয় হইয়াছিলাম, তিন দিন আমি পাষাণ-ফাটা অশ্রু বিসর্জ্জন ও অভিসম্পাত করিয়াছিলাম; তোমাদের আশাপূর্ণকারী ভগবান যাহাদেরকে ছাড়িয়া যান! আমার মত পিতামাতাদেরকে সঙ্গহীন করিয়া দেন! আমি যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তোমরা কি তাহা করিয়াছ? তোমরা কি আমার অনুভূতির সবটা জান? তোমরা কি তোমাদের মাথাগুলি দেয়ালে আছড়াইয়া ভাঙ্গিতে চাহিয়াছিলে? তোমরা কি আমার মত প্রকাশ্যভাবে বিপ্লবী হইয়াছিলে? আর যে হাত খানা বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাকে বিদ্রূপের সহিত যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলে? আমি ব্যাপারটা আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি নাই; আমি একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম,—চাহিয়াছিলাম একটুখানি আলোর আশায়। ভগবান্ কি এই রকম দুর্ঘটনায় সম্মতি দেন? আর গ্রাহ্য-ই করেন না যে, আমাদের অন্তরাত্মা নিরাশায় ভরিয়া যায় যাক্? মনে হইয়াছিল, যেন সবটাই একটা ভীষণ দুঃস্বপ্ন, সে ত কখনও রশ্মিরেখার মত আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না; হাঃ! ঐ যে তার-ই হাসি পাশের ঘরে! ওঃ,—না, সে কখনও কবরে মৃত হইয়া থাকিতে পারে না। ঐখান দিয়া সে ভিতরে আসিবে—এই দরজা দিয়া সে এখানে আসিবে, আর আগেকার মত তার পদবিক্ষেপ আমার কর্ণে সঙ্গীত ঢালিয়া দিবে।

"ওঃ! আমি অনেকবার বলিয়াছি—চুপ,- সে কথা কহিতেছে, স্থির হও,—তার-ই হাত চাবিটা ধরিয়াছে, আর ঘোরানোর শব্দ করিয়াছে! অপেক্ষা কর—সে আসিতেছে! আমি নিশ্চয় শুনিব—যাও আমাকে ছাড়িয়া—বাহিরে চলিয়া যাও, সে যে আছে এই বাড়ীতে, কোথাও, নিঃসন্দেহ।"

ভিক্টর হুগোর রচিত এই কবিতার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা বাঙ্গালী কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্যে শুনিতে পাই। কন্যা-হারা, পত্নীহারা বড়াল কবিও শোকে অধীর হইয়া প্রথমটা দেবতায় অবিশ্বাস করিয়াছিলেন। বিপত্নীক জীবনের প্রথম কয়েক দিন তিনি-ও হুগোর মত মৃতার অস্তিত্ব বাটীর সর্ব্বত্র আভাসে অনুভব করিয়াছিলেন।

> "এখানে আঁধারে যেন ভাসে তার রূপ-কণা!
> মূরছিয়া পড়ে দেহ, আকুলিয়া উঠে মন,—
> শয়নে, তৈজসে বাসে কাঁপে তার পরশন।" (১)

রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কন্যাহারা হুগো ও পত্নীহারা অক্ষয়কুমার বড়ালের ন্যায় আত্মহারা হইয়া পড়েন নাই। রবীন্দ্রনাথের "শিশু" নামক কাব্য-গ্রন্থে এমন একাধিক কবিতা স্থান পাইয়াছে, যাহা পাঠ করিলে মনে হয়, কবিতাগুলি কবির বিশেষ পরিচিত কোনও বালিকার মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। এই সকল পদ্যময় রচনায় কবির কাতর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে প্লাবিত করিয়া

(১) মল্লিখিত "এষার কবি" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কবিকে কতকটা শান্ত করিয়াছে। হুগো ও অক্ষয়কুমারের শোক বেগবান নদীর মত কবি-হৃদয়ের ক্ষতমুখে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অন্তরের অন্তরতম স্থানে অতলস্পর্শ গভীরতা সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কারণে তাঁহারা ঘুলাইয়া গিয়া ভগবানের বিরুদ্ধে বিপ্লবী হৃদয়ের ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। "গৃহ-দেবতা"কে সম্বোধন করিয়া কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে মনে হয় যে, অন্তর্বিপ্লবে অক্ষয়কুমারের মন হইতে কিয়ৎকালের জন্য হিন্দু-ধর্ম্মের সারতত্ত্ব ভগবদ্‌ভক্তিও লোপ পাইয়াছিল।

"ত্যজ গৃহ, যাও নিজ স্থান।
আমি আর পূজিব না, হৃদয়ে যে পারিব না
তোমা মত হইতে পাষাণ!
গেছে সুখ, গেছে প্রীতি, আছে বুক-ভরা স্মৃতি,
যাবে দিন করি তার ধ্যান।" (১)

কন্যার মৃত্যুতে পিতার অবস্থা যে কি হয়, তাহা তরু দত্ত তাঁহার অগ্রজার মৃত্যুতে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই জন্যই তিনি হুগোর প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার নিমিত্ত ইংরাজী পদ্যে আলোচ্য কবিতাটি অনূদিত করিয়াছিলেন। নারী-জগতের উপর মৃত্যুর নির্ম্মম অত্যাচার পুরুষ-কবির হৃদয়কে কি রূপ ব্যথিত করে, তাহার বহু প্রমাণ তরু দত্ত ফ্রান্সের কাব্য-ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। হুগোর চিত্রাধার হইতে তিনি আর-ও দুইখানি পারিবারিক চিত্র বাছিয়া লইয়াছেন। একখানির নাম—"মাতামহী", ও অপরখানির নাম—"আমার পৌত্র-পৌত্রীদের প্রতি"। প্রথম চিত্রে (The grandmother) হুগো তাঁহার মাতামহীর মৃতদেহ দেখিয়া বলিতেছেন,—

"নিদ্রা যাইতেছ তুমি? জাগো, তুমি যে আমাদের মায়ের মা! আমরা তোমাকে ভালবাসি—আর কাহাকেও ভালবাসি না—আমাদের আর কোনও মাতামহী যে নাই! তুমি যখন নিদ্রা যাইতে, আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, তোমার ওষ্ঠ কম্পিত হইত, কারণ তোমার নিদ্রা ছিল ভগবানের নিকট প্রার্থনা,—এখন একটু ক্ষমাশীল হও, আর্দ্র-চিত্ত হও! কিন্তু এ কি, আজ সন্ধ্যাকালে তুমি এমন পাষাণময়ী ম্যাডোনার মত কেন? যদিও তুমি আমাদের সামনে রহিয়াছ, আমরা যেন তোমার সঙ্গহীন হইয়াছি। কেন তোমার ললাট আজ এতটা নত হইয়াছে? আমরা কি দোষ করিয়াছি যে, তুমি আজ আমাদেরকে আলিঙ্গন করিতেছ না? * * * নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তুমি জাগো,—ওঃ, একটি কথা কও! * * * ভগবন্! হাত দুটি কত ঠাণ্ডা! একটিবার চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখ! * * * হায়! তুমি কথার উত্তর দিতেছ না—এই নীরবতায় আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় হইতেছি। * * *"

দ্বিতীয় চিত্রে (To my grandchildren) কবি তাঁহার নাতি-নাতিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—"লোকে তোমাদেরকে ইহার পরে বলিবে, তোমাদের ঠাকুর-দাদা তোমাদেরকে জানুর উপর রাখিয়া কেমন নাচাইতেন ও আনন্দিত হইতেন; তোমাদেরকে কত আদর করিতেন * * * হায়! জন্মাবধি কত নিরানন্দের মধ্য দিয়া তিনি চলিয়াছিলেন * * * আর কেমন করিয়া তিনি গোলাপ ফুল ফুটিবার সময়ে তোমাদেরকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন * * * যে সময়ে প্যারী নগরীর উপর গোলা বর্ষণ হইতেছে * * * কেমন করিয়া তিনি তোমাদের জন্য পুতুল ও খেলনা সংগ্রহ করিতে ঘর হইতে বাহিরে গিয়াছিলেন * * * আর তোমরা ঐ সব কথা শুনিয়া শোকাভিভূত চিত্তে ছায়াঘন গাছের তলায় গিয়া চিন্তা করিতে থাকিবে।"

ফরাসী দেশে গার্হস্থ্য প্রেমের লীলাভিনয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্যই যে তরু দত্ত ভিক্টর হুগোর রচিত আলেখ্য-চিত্র কয়খানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। কবি তাঁহার নিজের জীবনেও এই প্রকার অভিজ্ঞতা লাভের যথেষ্ট অবসর পাইয়াছিলেন। তরু দত্ত ও তাঁহার পিতামাতা খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতামহ ও মাতামহী ছিলেন হিন্দু। তাহা হইলেও, তাঁহারা তরু ও তাঁহার পিতামাতাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন,—

"গতকল্য প্রাতঃকালে সাড়ে এগারটার সময় আমার মা তাঁহার সেই বেদনায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন; গতকল্য দিনরাত তিনি অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিয়াছিলেন। আমার মাতামহ ও মাতামহী গতকল্য তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ও সমস্ত রাত্রি আমাদের বাটীতে ছিলেন; মাতামহী সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন * * * আর মাতামহ ও আমি ঘুমাইয়াছিলাম। * * * মাতামহী এক্ষণে বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন; তিনি পুনরায় বিকালে আসিবেন; ব্যারামের সময় তাঁহার পরিচর্য্যা অমূল্য, তিনি এতই সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ও যত্নশীলা।" ( )

২৬শে এপ্রিল তারিখের পত্রে তরু দত্ত মিস্ মার্টিনকে লিখিয়াছিলেন—"আমি ইচ্ছা করি, আপনি আমার মাতামহীকে জানিতেন, এমন দয়াবতী, শান্ত স্বভাব-বিশিষ্টা ও স্নেহশীলা

(১) "এবার কবি" দ্রষ্টব্য।

(২) Life and Letters of Taru Dutt, by Harihar Das.

আর একজনও মহিলা পৃথিবীতে জন্মান নাই। আমরা যখন তাঁহাকে দেখিতে যাই, তাঁহার প্রেমপূর্ণ মুখমণ্ডল যেন আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে! আমি ইচ্ছা করি, তিনি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন। অনেকে, যাহারা নিজেদেরকে খৃষ্টান বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু যাহাদের চরিত্র খৃষ্টানদের মত নয়, তাহাদের তুলনায় তিনি কত ভাল! আমার মাতামহী আমাকে কত ভালবাসেন, আর আমার জন্য নিজেকে কতখানি গর্ব্বিতা মনে করেন! তিনি মনে করেন যে, আমার চেয়ে অধিকতর সুন্দরী, বেশী সৎ ও সর্ব্বপ্রকার গুণের আধার আর একটি মেয়ে কোনও কালে পৃথিবীতে জন্মায় নাই! আমি যদি তাঁহার সাথে এক সপ্তাহ বাস করি, তাহা হইলে তিনি আদর দিয়া আমাকে মাটী করিবেন! আর তিনি আমার পিতার জন্যও নিজেকে গৌরবান্বিতা মনে করেন। আপনি জানেন না যে, হিন্দুর ঘরে শাশুড়ীরা সাধারণতঃ জামাইদের সহিত বাক্যালাপ করেন না। এটা খুব মজার কথা নয় কি? আমার মাতার যখন অসুখ হইয়াছিল, তখন তিনি আমাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন ও দুই দিন আমাদের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন ও পর পর দুই রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দিয়াছিলেন।" (২)

তরু দত্তের পত্র হইতে উদ্ধৃত উপরোক্ত ছত্রগুলি পাঠ করিয়া বেশ বুঝা যায়, কেন তিনি হুগোর রচিত "মাতামহী" শীর্ষক কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের নারী-জগতেও মাতামহী যে বাৎসল্য-প্রেমের মূর্ত্তিমযী দেবীরূপে সেখানকার কবিদের হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন, এই সংবাদে তরু দত্ত নিশ্চয়ই সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। হুগোর রচিত আলেখ্য-কবিতা যে বঙ্গদেশের মহিলা-কবির হৃদয়ের তারগুলিকে স্পর্শ করিয়াছিল, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ দেশের কানায় কানায় ভরা স্নেহের নদীর একপারে পুরুষরা ও অপর পারে নারীরা আজন্ম ঠাকুর-মা ও দিদি-মার যুক্তরাজ্যে বাস করিয়া আসিতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র শিশু-জগৎ স্মরণাতীত সময় হইতে ঠাকুর-মা ও দিদি-মার মুখে ঘুম-পাড়ানীর গান শুনিয়া আসিতেছে। কত সুয়োরাণী-দুয়োরাণীর গল্প, বিম্ববতীর কথা, পারুল দিদি ও সাত ভাই চম্পার ইতিহাস, সূর্য্যি মামা ও শিবঠাকুরের বিয়ের ছড়া শুনিতে শুনিতে যে আমরা শিশু-জীবন কাটাইয়া দিয়াছি, তাহা বলা যায় না। ভিক্টর হুগো হইতে তরু দত্ত উপরোক্ত যে কয়টি কবিতা গ্রহণ করিয়া তাঁহার "কবিতা গুচ্ছে" সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি পিতামহ হুগো তাঁহার পৌত্রীর উদ্দেশে রচনা করিয়াছিলেন। আর একটি তাঁহার মাতামহীর উদ্দেশে রচিত হইয়াছিল। একটি কবিতায় নারী-উদ্যানের কুঁড়ি ও অপরটিতে সদ্য বৃন্তচ্যুত শুষ্ক পুষ্পের বর্ণনা আছে। সব কয়টি কবিতাতেই হুগোর পারিবারিক স্মৃতি জাগিয়া রহিয়াছে। তরু দত্তের স্মৃতিও "মাতামহী" শীর্ষক কবিতাটির সহিত বিজড়িত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য তরু দত্তের কাব্য-জগতে আমরা তাঁহার নিজের মনের অনেক কথা ও গার্হস্থ্য-জীবনের বহু সংবাদ আভাসে পাই। বাস্তবিক, কবিতার ভিতর দিয়া কবি-বিশেষের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুবিধা আমরা যে নিশ্চয়ই লাভ করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কবিকে তাঁহার কাব্যে খুঁজিতে হয়, কবির জীবন-চরিতে আসল কবিকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

তরু দত্তের উপর ভিক্টর হুগোর প্রভাব খুব বেশী বলিয়া মনে হয়। "কবিতা গুচ্ছে" হুগোর রচিত কবিতার সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এতদ্ব্যতীত, হুগোর "লা মিজারেবল্" নামক সুবৃহৎ পুস্তক ও অন্যান্য বহু গদ্য ও পদ্যময় রচনা যে তরু দত্ত পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ আমরা মিঃ হরিহর দাসের লিখিত কবির জীবনীপাঠে জানিতে পারি। হুগোর দেশাত্মবোধের পরিচয় যে সকল পদ্যময় রচনায় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি তরু দত্ত ইংরাজী পদ্যে অনূদিত করিয়া "কবিতা গুচ্ছে" রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা এ স্থলে তরু দত্তের নারী-জগতের উপযোগী চিত্রগুলি বাছিয়া লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এই কবিতাগুলির ছত্রে ছত্রে বাৎসল্য-প্রেমের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, করুণ রসেরও সেইরূপ আস্বাদ পাওয়া যায়। বাৎসল্য-প্রেমে সিক্ত ভিক্টর হুগোর কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের মন স্মৃতিময় হইয়া উঠে। "বাঙ্গালা নাটক নভেল পড়িয়া, থিয়েটারের গান, প্রণয়-সঙ্গীত, ধর্ম্মের জ্যাঠামি, রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের মন হইতে শৈশবের স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। আমরা মনে করি, যেন সমস্ত সংসার আমাদের মত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। মাতৃস্নেহের কথা স্মরণ করাইয়া গার্হস্থ্য-প্রেমের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইবার জন্যই বোধ হয় "শৈশব সন্ধ্যা" নামক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> "রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক
> সন্ধ্যা, শয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।" (৩)

"শিশুর হৃদয়ের কাহিনী ভিক্টর হুগো ও রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনও কবি মনোযোগের সহিত পাঠ করেন নাই। শিশুর একটুখানি হৃদয়ের মধ্যে সে যে কত মতে কত প্রকার আশার, আনন্দের, সৌন্দর্য্যের স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে তাহা কেহ বুঝে না।" (৪)

(২) Life and Letters of Taru Dutt, by Harihar Das

(৩) মল্লিখিত "রবীন্দ্রনাথ" নামক গ্রন্থ, পৃঃ ১০৩ দ্রষ্টব্য।

(৪) ঐ পৃষ্ঠা ১০১ দ্রষ্টব্য।

পুস্তক ও পত্রিকা

কাশীরামদাস-মহাভারত।—সটীক, সচিত্র ও বিশুদ্ধ (দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ)। গ্রন্থকার—কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর বি-এ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান্ পাবলিসিং হাউস; ২২।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৭৲ (সাত) টাকা।

সমালোচনার জন্য আমরা একখানি "কাশীরামদাস-মহাভারত" উপহার পাইয়াছি। ইহা রূপে ও গুণে, উভয় দিকেই চিত্তাকর্ষক। উৎকৃষ্ট কাগজ, উৎকৃষ্ট কালী ও উৎকৃষ্ট অক্ষর। এই সঙ্গে আবার উৎকৃষ্ট সিল্ক-ক্লথের বাইণ্ডিং। ইহাতে ১০১ খানি তিন-রঙের এবং ২ খানি এক-রঙের সর্ব্বশুদ্ধ ১০৩ খানি মনোহর চিত্র আছে। এই গ্রন্থের পত্র-সংখ্যা ১৬৫০। কবিতা-সংখ্যা ৪০,২৭২। অধ্যায়-সংখ্যা ৬৮৪। গুণের ত কথাই নাই। প্রথমতঃ, ইহাতে ৩২টি নূতন 'উপাখ্যান' আছে। এই সকল উপাখ্যান অন্য কোন মুদ্রিত কাশীরামদাস-সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ণবাবু ইহা হাটবেড়িয়া লাইব্রেরী ও কলিকাতা-ইউনিভার্সিটী লাইব্রেরীর প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উপদেশগুলি অতি জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়স্পর্শী। পাঠক-মহাশয়গণ 'উদ্যোগ-পর্ব্বে' ইহা দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ, ক্রমে ক্রমে কাশীরামদাসের পাঠ পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছে। শ্রীরামপুরের সুপ্রসিদ্ধ পাদরী কেরি-সাহেবে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, মধুসূদন শীল ও তাঁহার ১৩ জন পণ্ডিত এবং গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য),—এই কয়েক জন মিলিয়া কাশীরামের বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে,—তাঁহারা অনেক নূতন বিষয়ও ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তৎপরে বটতলার কবিগণও নানাবিধ পরিবর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এইরূপে ক্রমে ক্রমে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া কাশীরাম দাসের মহাভারত "বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। তৃতীয়তঃ, পূর্ণবাবু একটি সুবিস্তৃত 'ভূমিকা দিয়াছেন। এই 'ভূমিকা'য় অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। কাশীরাম দাসের বিস্তৃত জীবন-চরিত পাঠ করিয়া তাঁহার জীবনের অনেক তথ্য আমরা অবগত হইলাম। 'কাশীরামদাসের মহাভারত-রচনার প্রবৃত্তির কারণ', 'কাশীরামদাস-মহাভারতের বিশেষত্ব', 'কাশীরামদাস-মহাভারতের রচনা-কাল,' ইত্যাদি বিষয় পূর্ণবাবু তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন। চতুর্থতঃ, কাশীরামদাসের অন্যান্য সংস্করণে যে সকল দুষ্ট ও হাস্য-জনক পাঠ আছে, এবং যাহাদের কিছুতেই অর্থ করা যায় না, পূর্ণবাবু তাহা দেখাইয়া দিয়া নিজগ্রন্থে শিষ্ট ও সমীচীন পাঠ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই প্রাচীন পুঁথি হইতে এই সকল বিশুদ্ধ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া গেল। যেখানে সম্পাদক বাবুদের 'ঋতুস্নান' করা উচিত ছিল, শ্লীলতার খাতিরে তাঁহারা সেখানে 'গঙ্গাস্নান' করিয়াছেন। যেখানে 'কেশব-রচিত' এই সাধু ও শিষ্ট পাঠ ছিল, সম্পাদক বাবুরা সেখানে 'কেশব-চরিত' এই হাস্য-জনক পাঠ দিয়া বসিয়াছেন। যে স্থানে 'ঔশীনর' (শিবিরাজ) পাঠ ছিল, সে স্থানে তাঁহারা 'উশীনর' (শিবিরাজের পিতা) লিখিয়াছেন। সম্পাদক বাবুরা 'হিল্লোল' ও 'কল্লোল' শব্দের অর্থগত পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন, "হিল্লোল কল্লোল করে, প্রভাসের জল।" ইহার অর্থ হয় না। পূর্ণবাবু প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধার করিয়া এই সুন্দর পাঠ দিয়াছেন, "হিল্লোলে কল্লোল তুলে প্রভাসের জল।" সুগ্রীবের স্ত্রীর নাম 'রুমা'। তাঁহারা 'রুমা' না লিখিয়া 'উমা' লিখিয়া বসিয়াছেন। আরও একটি হাস্য-জনক কথা আছে। কোন কোন সম্পাদক-বাবু পাঠ দিয়াছেন, "কাশীরাম কহে প্রভু নীলসেনারূঢ়। দক্ষিণে অনুজানুজ সম্মুখে গরুড়।" কোন কোন সম্পাদক-বাবু আবার টীকায় লিখিয়াছেন, "নীলসেন নামে একজন রাজা ছিলেন এবং কাশীরামদাস তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতেন।" এখন দেখা যাক্ 'অনুজানুজ' শব্দের অর্থ কি?

অনুজা। অনুজ = অনুজানুজ। এই পাঠ রাখিলে ইহার অর্থ হয় যে, সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণের অনুজা, এবং বলরাম শ্রীকৃষ্ণের অনুজ। কিন্তু বস্তুতঃ বলরাম, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ছিলেন। সম্পাদক বাবুরা এই কবিতাটিতে দুইটি সাংঘাতিক ভুল করিয়াছেন। পূর্ণবাবু, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র একখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে এই অর্থ-সঙ্গত বিশুদ্ধ পাঠ দিয়াছেন, "কাশীরাম কহে প্রভু নীল শৈলারূঢ়। দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড়॥" এইরূপ ভূরি ভূরি দুষ্ট পাঠ দিয়া সম্পাদক-বাবুরা কাশীরামদাসের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-মহাশয়-গণকেও সুপথ হইতে কুপথে লইয়া গিয়াছেন। পূর্ণবাবু তন্নতন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক স্বীয় গ্রন্থে শিষ্ট ও অর্থ-সঙ্গত পাঠ দিয়াছেন। পঞ্চমতঃ কাশীরামদাস যেখানে মহর্ষি বেদব্যাসের বিরুদ্ধ কথা লিখিয়াছেন, পূর্ণবাবু সেইখানেই তাহা ধরিয়াছেন, এবং "সংস্কৃত-মহাভারত" হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া ফুটনোটে তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। একটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া গেল। কাশীরামদাস লিখিয়াছেন, "একলক্ষ আটাইশ সহস্র নন্দন।" অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের একলক্ষ আটাইশ হাজার (১,২৮,০০০) পুত্র ছিলেন। কিন্তু পূর্ণবাবু, শ্রীমদ্-ভাগবত, শ্রীধর-স্বামী ও পরাশর হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের একলক্ষ একষট্টি হাজার আশি (১,৬১,০৮০) পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাবতীয় কাশীরামদাস-সংস্করণে ব্যাসকূটের অনুবাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ণবাবু, কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি হইতে কাশীরামদাস-কৃত অনেকগুলি ব্যাসকূটের অনুবাদ পাইয়া তাহা নিজ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পূর্ণবাবুর "উদ্যোগ-পর্ব্ব" অতি জ্ঞানগর্ভ ও উপাদেয়। ইহাতে এরূপ এক একটি কবিতা আছে যে, তাহা পড়িলে হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপস্থিত হয়। যেখানে কাশীরামদাসের কবিতা একটু কঠিন বলিয়া বোধ হয়, পূর্ণবাবু তাহার অতি সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। যেখানে দুর্ব্বোধ শব্দ আছে, সেখানেও তিনি তাহার বিশদ অর্থ দিতে ক্ষান্ত হন নাই। প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠেই তিনি প্রচুর টীকা-টিপ্পনী দিয়াছেন। যেখানে মূল সংস্কৃত-মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া দিলে কাশীরামদাসের পাঠ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, তিনি সেখানে শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহা বিশদ-রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পূর্ণবাবুর অনন্ত পরিশ্রম ও দুর্জ্জয় অধ্যবসায় দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তাঁহার এই সংস্করণের মত অন্য কোন সংস্করণ অদ্যাবধি আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। আকারে অতি বৃহৎ ও ওজনে অত্যন্ত ভারী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশক মহাশয়গণ ইহা দুই খণ্ডে বাঁধাইয়া পাঠক মহাশয়গণের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কি সম্পাদক, কি প্রকাশকগণ, সকলকেই আমরা অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি। এরূপ অমূল্য গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দু-নরনারীর গৃহে থাকা উচিত।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামে আসিয়া সহরের আসল রূপটা এতদিনে যেন জহরের চোখে ধরা পড়িল—সহর একটা বিরাট আশ্রম, তাপসদের আড্ডাখানা। ধ্বংসের তপস্যা করিতে মানুষ সহরে যায়, ছোট বড় অপমৃত্যুর লোভে মানুষ সহরে বাস করিতে ভালবাসে। জীবন বিস্বাদ হইলে মানুষের আসে বৈরাগ্য, জীবন বিষাক্ত হইলে মানুষের আসে সহুরে জীবনের লোভ।

সহরে যারা যাইতে পারে না, গ্রামে যাদের বঞ্চিত বন্দী জীবন যাপন করিতে হয়, নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তারা গ্রাম্য জীবনেও আনিবার চেষ্টা করে যতখানি পারে সহুরে ভাব। সহরবাসী সকলের মত গ্রামবাসীরাও সকলে জানিয়া শুনিয়া এটা করে না, মানুষের অত বিবেচনা-শক্তি নাই, না সহুরে মানুষ, না গ্রামের মানুষ। না জানিয়া না বুঝিয়া মূর্খের মত নিজকে, নিজের ভবিষ্যৎ বংশধরকে তিল তিল করিয়া বিনাশ করিয়া ভাবে জীবন-যাপন করিতেছি—যথা নিয়মে, যুগধর্ম্ম অনুসারে,—সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বিধানের জোড়াতালি দেওয়া ফাঁদে পড়িয়া থাকার প্রয়োজন মিটানর গভীর নিরানন্দে।

গ্রামের মানুষ দেখিয়া, মাটি দেখিয়া, গাছপালা দেখিয়া মাঠের ফসল দেখিয়া, গরু ছাগল কুকুর-বিড়াল দেখিয়া, জহরের কেবল মানুষের জন্যই মনটা কেমন করিয়া ওঠে, একটা অদ্ভুত যন্ত্রণা-বোধের সঙ্গে তার মনে হয়, বাঁচিবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে আসিয়াছে,অথচ মানুষ যেন বাঁচিতে চায় না। সহর ও গ্রাম কোথাও মানুষের জীবন-যুদ্ধের নিয়ম, সঙ্কেত, ও কৌশলগুলি জানিবার বা শিখিবার ইচ্ছা নাই, জীবনের আসল উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়া সকলে নেহাৎ অনিচ্ছার সঙ্গে একটা উদ্ভট খাপছাড়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে।

বাঁচিবার উপায় ও পথ থাকিতে তাহা গ্রহণ না করার আর কি মানে হয়?

কিন্তু কি সে উপায় ও পথ? সে নিজেও তো তার সন্ধান জানে না!

নিজের চিন্তার এইখানে যেন একটা ফাঁদ পাতা আছে—বড় কবির জীবন-দেবতার মত কৌশলী মন-ধরা জীবন-ব্যাধের। নিজের মনটাকে জহর কত বড় মনে করে, কিন্তু চিন্তার এই ফাঁদে পড়িয়া মনটা তার করিতে থাকে চড়ুই পাখীর মত কিচির মিচির!

বীরেশ্বর গম্ভীর মুখে পরিহাসের সুরে ডাকেন, 'জহরবাবু!'

'আজ্ঞে, বলুন।'

'আজ্ঞে বলুন! জীবনে তো তোমার মুখে কখনো আজ্ঞে বলুন শুনিনি দাদু!'

জহর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, 'গাঁয়ে এসে শিখেছি।'

'আর কি শিখেছিস গাঁয়ে এসে?'

'শিখেছি যে বেঁচে থাকতে হলে আধপেটা খেতে হয়, ঝগড়া মারামারি করতে হয়, খাবার পয়সা দিয়ে বিলাসিতা, নেশা আর পাপ করতে হয়—'

বীরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'থাম শালা, থাম। তাইতো বলি, তোকে স্বদেশী রোগে ধরেছে! তুই দেশের লোকের ভাবনা ভাবছিস! আমি এ দিকে ভাবছিলাম, যার জন্যে ভেবে ভেবে কাহিল হচ্ছিস, সে ছুঁড়িটা কে। দেশশুদ্ধ লোকের জন্য দরদ দিয়ে তুই যে বুকটা ফাটিয়ে ফেলছিস, তা কি জানতাম। এই জন্য তুই লীলাময়ের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করেছিস!'

'দেশের কথা ভাবাটা অন্যায় না কি?'

'তোর পক্ষে অন্যায়।'

'কেন? দেশের কথা ভাববার অধিকার আমার নেই?'

বীরেশ্বর তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'না।'

জহরও তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

'তোরা যত দেশের কথা ভাববি, দেশের তত সর্ব্বনাশ হবে বলে, বিনা চিকিৎসায় যত রোগী মরে, হাতুড়ের চিকিৎসায় তার চেয়ে ঢের বেশী মরে বলে। ভাবতে জানিস তুই, ভাবতে শিখেছিস? মন তোর সুস্থ, স্বাভাবিক? আজ পর্য্যন্ত এমন একটা কাজ তুই করেছিস, যাতে প্রমাণ হতে পারে, একটা দিনের জন্যও তোর পক্ষে অতি সাধারণ, কিন্তু খাঁটি মানুষের বাচ্চা হয়ে থাকা সম্ভব? কবিতা লিখতে চাস লেখ, প্রেম করতে চাস কর, বিদ্বান হতে চাস হ,' দেশের জন্যে কেঁদে কেঁদে আর খ্যাপার মত আবোল-তাবোল কাজ করে নাম করতে চাস কর,—কিন্তু খবর্দ্দার দেশের কথা ভাবিস না। তোদের মনে হল জল, দেশের ভাবনা হল তেল, —তোদের মনে ও ভাবনা মিশ খাবে না। আজ হোক কাল হোক তোরা চুলোয় যাবিই, দেশের ভাবনা যারা ভাবতে পারবে তারা একদিন উদয় হবেই, হয় ত দু'একজন এর মধ্যেই হয়েছে,—দেশের ভাবনাটা ভাববার বরাত তাদের হাতেই ছেড়ে দে। দেশের গায়ে বিষফোঁড়ার মত উঠেছিস, স্বদেশীয়ানার মলম দিয়ে নিজেকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করিস না, দোহাই তোর, পেকে উঠে ফেটে যা, দেশের একটু খারাপ পুঁজরক্ত বেরিয়ে যাক।'

ধরিতে গেলে বীরেশ্বরের এটা বক্তৃতা বৈ কি। কথাগুলিতে জ্বালা আছে, উত্তেজনা আছে, তবু সুরটা যেন তামাসার, মুখখানা বীরেশ্বরের শান্ত অথচ গম্ভীর। জীবনে জহর কোনদিন বীরেশ্বরকে এ ভাবে এ ধরণের কথা বলিতে শোনে নাই। খানিকক্ষণ অভিভূতের মত সে বীরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজেকে কেমন মনে হইতে লাগিল ছেলেমানুষ, অনভিজ্ঞ, অপবিত্র।

'আমি একা তো বিষফোঁড়া নই?'

বীরেশ্বর যেন সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'তা হলে আর দেশের ভাবনা কি ছিল ভাই? দুটো একটা বিষফোঁড়ায় দেশের কি আসে যায়?'

জহর চুপ-চাপ খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, 'বিষফোঁড়ার তো চিকিৎসা দরকার? উচিত তো চিকিৎসা করা?'

'ফোঁড়াটা যাতে শরীরে বসে যায়, সেই চিকিৎসা? তার চেয়ে চিকিৎসা না হওয়াই ভাল। জানিস জহর, পাপীকে দিয়ে পুণ্য কাজ করাতে নেই,—তাতে পাপটাও ক্রমে থাকে, পুণ্য কাজটাও নষ্ট হয়।'

'কিন্তু সবাই যদি পাপী হয়, আর পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হয়, তা হলে তো মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার!'

'পাপীকে যদি পাপ ছাড়া আর কিছু করতে দেওয়া না হত, মানুষের ভবিষ্যতে তা হলে ডে-লাইট জ্বলে উঠত।'—বীরেশ্বর হঠাৎ হাসিলেন, মৃদু ক্ষোভের হাসি। কথার মারপ্যাঁচের মজাটা তিনি জানেন, বাঁদরের মত মানুষকে নাচানর এমন কৌশল আর নাই, মানুষকে বাঁচানর এমন উপায়ও আর নাই। কিন্তু কেবল কথার মারপ্যাঁচে নয়, জোর করিয়া কেহ কিছু বলিলেই এই তেজস্বী নাতিটি তার বিচলিত হইয়া দ্বিধা সন্দেহে দোল খাইতে আরম্ভ করে, এমনই সে মহাপুরুষ! অথচ নিজের সম্বন্ধে কত বড় ধারণাই সে আত্মপ্রতারণার রসে দিনের পর দিন বাড়াইয়া আসিয়াছে! আমিত্ব-বোধের বন্যায় কোথায় যে ভাসিয়া গিয়াছে তার আমিত্ব!

দোতালার বারান্দায় বসিয়া বীরেশ্বর জহরের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, নীচের তলায় যে ঘরে জহর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরের সামনে অঙ্গনে একটা খেঁকি-কুকুর তাড়াতাড়ি কি যেন একটা অখাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতেছিল। কুকুরটার খাওয়া দেখিতে দেখিতে বীরেশ্বরের হাসির ক্ষোভটুকু মিলাইয়া গেল। জহর মুখ খুলিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহাকে সে সুযোগ না দিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'পাপের ক্ষয় হয় প্রায়শ্চিত্তে—পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি জানিস জহর? পাপ! পাপ করার চেয়ে বড় শাস্তি পাপীর আর কিছু আছে! এক যুগে হোক, একশ যুগে হোক, পাপ করে করে পাপীর পাপ ক্ষয় হয়ে যায়। বিষফোঁড়া উঠে উঠে দেশের বিষও একদিন ক্ষয় হয়ে যায়!'

জহর হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, 'আপনি মহাপাপী দাদু।'

'কিসে জানলি?'

'দেশের কথা নিয়ে কবিত্ব আর তামাসা করছেন।'

সীতা পিসীমাও বলেন, 'তুই যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছিস জহর।'

নিজের কথাটাই আরও স্পষ্ট করিবার জন্য আবার বলেন, 'মুখখানা কি রকম শুকনো দেখাচ্ছে তোর।'

একটা ঢোঁক গিলিয়াই চোখ নামাইয়া লজ্জার সঙ্গে বলেন, 'তোর সঙ্গে এ সব কথা বলা অবশ্য আমার উচিত নয়, তবু, না বলেই বা কি করি বল? তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না জহর। যে কীর্ত্তি করেছিল মেয়েটা, ও যে গেছে ভালই হয়েছে। আমি জানি, আমার কথা শোন্, তরঙ্গের জন্য মন খারাপ করিস না।'

জহর একটু কড়া সুরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, মন খারাপ করব না। কিন্তু তরঙ্গ কি কীর্ত্তি করেছিল শুনি?'

'আমি তা বলতে পারব না বাপু।'

সীতা পিসীমার ভারি একটা মজার খেলা জুটিয়াছে। নানা ছলে একে একে সকলকেই তিনি জানাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তরঙ্গের সম্বন্ধে তিনি একটা ভয়ঙ্কর কথা জানেন, কিন্তু কথাটা যে কি, তা তিনি বলতে পারবেন না বাপু। তরঙ্গের কথা ভাবিয়া মনটা হয়ত সীতা পিসীমার সত্যই খারাপ হইয়া যায়, চোখে জলও দেখা দেয় মাঝে মাঝে, কিন্তু কি করিবেন, এত বড় একটা নাটকীয় ব্যাপারকে ঠিকমত কাজে লাগাইতে না পারিলেই বা তার চলিবে কেম! এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য তাঁর যে, তরঙ্গের একটা গভীর রহস্যময় গোপন কথা এ জগতে কেবল তিনিই জানেন, আর কেহ জানে না! ভাবিলেও সীতা পিসীমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে।

তরঙ্গকে কড়িকাঠে বাঁধা দড়িতে ঝুলিতে দেখিয়াও তাঁর সে রকম শিহরণ জাগে নাই।

জহরের সঙ্গেই নানা ছুতায় তরঙ্গের কথা আলোচনা করিবার জন্য সীতা পিসীমার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। জহরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাটাও যেন তাঁর স্মরণ থাকে না। 'মরে তরঙ্গ বেঁচেছে জহর। ছুঁড়ি যদি বেঁচে থাকত --' এই ধরণের আলাপ আরম্ভ করিয়া জহরের মুখে বেদনার ছায়াপাত হইতে দেখিলে সীতা পিসীমার মন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়। জহরের জন্য অকস্মাৎ তাঁর হৃদয়ে মমতার যে, বন্যা দেখা দেয়। জহরকে কষ্ট দিয়া জহরকেই মমতা করার এই উগ্র অনুভূতির স্বাদ তাঁকে পাইতে হয় বটে, কিন্তু কি করিবেন তিনি, জীবনের সাধারণ সহজ অনুভূতিতে সাধ যে তাঁর মেটে না, তৃপ্তি যে তিনি পান না।

শেষ পর্য্যন্ত সীতা পিসীমার হাত এড়াইবার জন্যই জহর পালাইয়া যায় কলিকাতায়।

একটা বড় সভায় জহরের অবশ্য বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, মার জন্য একটা বক্তৃতার সুযোগ সে নষ্ট করিয়াছে, এবার যথাসময়ে কলিকাতায় সে চলিয়া আসিতই। কিন্তু বক্তৃতার কয়েকটা দিন দেরী ছিল। সীতা পিসীমা যেভাবে তাকে মমতা করিয়া আনন্দ সংগ্রহ করিতেছিলেন, গ্রামের বঞ্চিত নরনারীকে তেমনই ভাবে মমতা করিয়া সেও তেমন আনন্দই অনুভব করিতেছিল। সীতা পিসীমা পিছনে না লাগিলে আরও কয়েকটা দিন গ্রামে সে থাকিত।

বক্তৃতা দিবার কায়দা সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সুরে সুর মিলাইয়া উঁচু-নীচু গলায় সে চমৎকার বলিতে পারে। অনেক হাততালিও পায়। কয়েকবারের অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শ্রোতাদের বালক কল্পনা করিয়া ভয় আর লজ্জা ত্যাগ করিতে পারিলেই দেখা যায়, বলাটা অতি সহজ।

জহর চলিয়া যাওয়ার দুদিন পরেই হঠাৎ অনুপমের সঙ্গে সাধনা গ্রামে আসিয়া হাজির হইলেন। জহরের মার মত তাঁরও না কি দেশে আসিবার জন্য মনটা কেমন করিতেছিল, সকলে দেশে আসিয়াছে শুনিয়া তাই দু'একটা দিনের জন্য বেড়াইতে আসিয়াছেন।

কিন্তু সাধনার ভাব দেখিয়া মনে হইল, দেশের জন্য তাঁর মন কেমন করে নাই, কয়েকদিন বীরেশ্বরের কাছে আসিয়া থাকিবার জন্যই মন কেমন করিয়াছিল। কলিকাতার বাড়ীতে শ্বশুরের কাছে গিয়া থাকিবার তাঁর উপায় নাই, স্বর্গীয় স্বামীর নিষেধটা স্পষ্টভাবে অবহেলা করিতে সাধনার তেজস্বিতা আর আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানে বাধে। তবে দেশের কথা আলাদা। দেশের বাড়ীর কথা স্বামী কিছু বলিয়া যান নাই, কিছুদিন আগে পুরানো কলহ-বিবাদের কথা ভুলিয়া নিজের বাড়ীতে গিয়া থাকিবার জন্য বীরেশ্বরের নিমন্ত্রণটা রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিবার সঙ্গেও দেশের এই বাড়ীতে আসার কোন অসামঞ্জস্য নাই।

'অনুকে নিয়ে বড় ভাবনায় পড়েছি বাবা।'

অনুপমকে দেখিলেই বোঝা যায়, তার জন্য ভাবনায় পড়া তার মার পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নয়

বীরেশ্বর বলিলেন, 'আস্তে আস্তে হয়ত সব ঠিক হয়ে যাবে মা।'

'দিনরাত বসে বসে কি যেন ভাবে, আর নয় ত পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। নাওয়া-খাওয়ার দিকে নজর নেই, রাতে ঘুমোয় কি না সন্দেহ,—কি রকম চেহারা হয়েছে দেখেছেন তো?'

বীরেশ্বর নীরবে সায় দিলেন।

চাপা আর্ত্তনাদের সুরে সাধনা বলিলেন, 'পাগল-টাগল হয়ে যাবে না তো?'

'পাগল বলেই তো এ রকম করছে।'

সাধনার সবটুকু আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মানুষটা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকাতর অনুনয়ের সুরে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'আপনি কিছু করুন বাবা ওর জন্যে, আমি হার মেনেছি। আপনি ছাড়া কেউ ওকে সামলাতে পারবে না। এত অশান্তি আমার আর সহ্য হয় না বাবা, তরঙ্গের মত আমিও শেষে গলায় দড়ি দিয়ে বসব।'

অনুপমও এই বাড়ীতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যে ঘরটিতে জহর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ঘরেই। দোতলার এই বারান্দা হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত গ্রামের কাঁচা ঘরবাড়ী দেখা যায়, মাঝে মাঝে দুটি একটি ছোটবড় দালান। ঘর-বাড়ীগুলির অধিবাসীদের কারও মনে শান্তি আছে কি না সন্দেহ, গ্রামের আবহাওয়াটি কিন্তু বড়ই শান্ত। শান্তিপূর্ণ শ্রীহীনতা চারিদিকে এমন ভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে যে, অনভ্যস্তের রীতিমত অস্বস্তি বোধ হয়। আজ আবার কোথা হইতে একটা পচা গন্ধ নাকে আসিয়া লাগিতেছিল—বায়ু আজ হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। এতদিন বাতাস কেবল বদ্ধ ঘরের ভাপসা বাতাসের মত ছিল—এমন কটু পীড়াদায়ক গন্ধ বহিয়া আনে নাই।

বীরেশ্বর ম্লান মুখে বসিয়া বসিয়া ভাবেন। অনুপমকে বুঝাইয়া শান্ত, সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ করিবার ক্ষমতা কি তাঁর আছে? এ পাগলামী অনুপমের কোনদিন কমিবার নয়,—কেবল এখন যে বাড়াবাড়ি দেখা দিয়াছে, সেটুকু ধীরে ধীরে কমিয়া যাইবে, যদি আবার বাড়াবাড়ি করিবার নূতন কোন কারণ না ঘটে। কি বলিবেন তিনি অনুপমকে? নিজের জীবনের ইতিহাস বীরেশ্বরের টুকরা টুকরা মনে পড়িতে থাকে—অন্যভাবে তিনিও জীবনে অনেক পাগলামী করিয়াছেন। অসাধারণ অবস্থায় কখনও কখনও কোন একটি বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া পাগলামী তাঁর এমনি বাড়াবাড়িতেও পরিণত হইয়াছে অনেকবার,—অন্য সময় নানাভাবে নানা উপলক্ষে নানা বিষয়ে কমবেশী প্রকাশ পাইয়াছে। তবে রামলাল, শ্যামলাল, গীতা, জহর, অনুপম এদের মত এতখানি বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত তিনি ছিলেন না। তাঁর সময়ে পারিপার্শ্বিকতার যাঁতায় এমন ভীষণভাবে মানুষ নিষ্পেষিত হইত না, মানুষের জীবন এমন ভাবে গুঁড়া হইয়া যাইত না।

জহর ও অনুপমের ছেলেমেয়েরা না জানি কি রকম হইবে?

অনুপমের সঙ্গে কথা বলিয়া বীরেশ্বর দেখিলেন, তাকে কিছু বোঝানো অসম্ভব। সে এমন ধীর, স্থির ও অন্যমনস্ক যে, কোন কথাই এক রকম তার কানে যায় না।

তা ছাড়া সে ভয়ঙ্কর নির্লজ্জও হইয়া পড়িয়াছে।

'তরঙ্গ আমার সব দিক্ দিয়ে সর্ব্বনাশ করে গেছে দাদামশায়।'

কথা বলিবার সময় লজ্জায় অনুপম মাথা তুলিতে পারে না, কিন্তু বীরেশ্বরের মনে হয় এমন নির্লজ্জ মানুষ জীবনে তিনি আর দেখেন নাই।

তা হোক, ছেলে অনুপম ভাল—পড়াশোনায়। সাধনা যেমন আশা করিয়াছিলেন, আর অনুপম যেমন কল্পনা করিয়াছিল, সে রকম না হইলেও পরীক্ষার ফলটা তাহার ভালই হইয়াছে দেখা গেল। তরঙ্গের জন্য কিছুদিন সে যে রকম হইয়া গিয়াছিল, সে হিসাব ধরিলে এ একটা রীতিমত বাহাদুরী বলিতে হইবে বৈ কি।

জহরের মার গাঁয়ে থাকার সখ মিটিয়া যাওয়ার পর সকলে আবার সহরে ফিরিয়া আসিলে, ছেলের পরীক্ষার ভাল ফল হওয়া উপলক্ষে সাধনা একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। বীরেশ্বরকে এক ফাঁকে বলিলেন, 'আপনার কথাই ঠিক হল বাবা, নিজে নিজেই আস্তে আস্তে বেশ সামলে উঠেছে।'

অনুপম সাধনার বিশেষ অনুরোধে বীরেশ্বরকে একটু ঘটা করিয়াই প্রণাম করিল। বীরেশ্বর মনে মনে কোন আশীর্ব্বাদ

করিলেন কি না বোঝা গেল না, মুখে শুধু বলিলেন, 'ঠিক মত প্রণাম করতে কোথায় শিখিলি রে শালা?'

সীতা পিসীমা কিন্তু অনুপমের শরীর ভাল হইয়াছে আর পাগলামী কমিয়াছে দেখিয়া যেন বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া গেলেন।

তাঁর কেবলই মনে হইতে লাগিল, অনুপম যেন ফাঁকি দিয়াছে, তাঁকে ঠকাইয়াছে। ভারি একটা অন্যায় কাজ করিয়াছে অনুপম। একেবারে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। তরঙ্গ না অনুপমকে অত বড় একটা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল? কয়েকমাসের মধ্যে এ ভাবে তরঙ্গকে অনুপম ভুলিয়া যায় কোন্ সাহসে? সংসারে কি ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত বলিয়া কিছু নাই? সীতা পিসীমার বিশেষ কষ্ট হয় এইজন্য যে, তিনি যে-রকম কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, সে-রকম কিছুই ঘটিল না। অনুপম গোপনে ক্রমাগত অশ্রুপাত করিবে, সকালে দেখা যাইবে বালিশটা তার ভিজিয়া চপ্ চপ্ করিতেছে, প্রকাশ্যে থাকিয়া থাকিয়া অনুপমের চোখ ছল ছল করিবে,দিন দিন শুকাইতে শুকাইতে সে হইয়া যাইবে কাঠ, চালচলন ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া প্রতিনিয়ত মনে হইতে থাকিবে, আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই বুঝি সে গেরুয়া পরিয়া হইয়া গেল সন্ন্যাসী! তার বদলে এ কি খাপছাড়া কাণ্ডকারখানা অনুপমের! কিছুদিন জ্বরে ভুগিয়া মানুষ যেমন ভাল হইয়া ওঠে, সে যেন তেমনই ভাবে ধীরে ধীরে গা ঝাড়া দিয়া উঠিতেছে!

বাড়ীতে লোকজন আসায় অনুপমের সত্যই বেশ ভাল লাগিতেছিল। সকলের সঙ্গে সস্মিতমুখে সে কথাবার্ত্তা বলে, পাড়ার কয়েকটি বন্ধুশ্রেণীর ছেলের সঙ্গে হাসিতামাসা করে, তাদের সঙ্গে খাইতে বসিয়া একপেট খায়, বিকালের দিকে কারও অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেই বাড়ীতে ছোট-খাট একটি গানের আসর বসায়। মনে হয়, বাড়ীতে যেন উৎসবের আমেজ লাগিয়াছে।

সাধনার মুখে হাসি ফোটে। সীতা পিসীমার বুক ফাটিয়া যাইতে থাকে।

কেমন এমন হইল? কেন অনুপম তাঁকে পাশে বসিয়া গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধরা গলায় বলিবার সুযোগ দিল না যে, তরঙ্গ অনেক করিয়া তাঁকেই দেখিতে বলিয়া গিয়াছে, অনুপম যেন ভয়ানক মুষড়াইয়া না যায়, খাপছাড়া কিছু না করে? হায়, তরঙ্গ যে নাটকীয় কাজের ভার তাঁকে দিয়া গিয়াছে, সেটা করিবার সুযোগ বুঝি অনুপম আর তাঁকে দিল না!

সন্ধ্যার সময় সীতা পিসীমার আর সহ্য হয় না। মানুষের পক্ষে প্রায় অব্যবহার্য্য অস্বাস্থ্যকর যে ঘুপচির মত ঘরটির মধ্যে তরঙ্গ সখ করিয়া বাস করিত, অনুপমকে সেইখানে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তিনি বলেন, 'আর তো তোমায় না বলে থাকতে পারছি না অনু।'

'কি পিসীমা?'

পাড়ায় কোথায় শাঁখ বাজে, পর পর তিনবার।

'তরঙ্গ যা লিখে রেখে গিয়েছিল—চিঠির যেটুকু আমি পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, তাতে। তুই কতবার জানতে চেয়ে-ছিলি, বলি নি,—বলতে পারি নি। আজ তোর মুখ দেখে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে অনু।'

অনুপম বিবর্ণ হইয়া যায়। আবছা অন্ধকারে তার মুখের ভাব-পরিবর্ত্তন যতটুকু চোখে পড়ে, তাতেই সীতা পিসীমার বুক দুড় দুড় করে।

অনুপম প্রশ্ন করিবে, এই প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন। অনুপম কিন্তু চুপ করিয়া থাকে, তরঙ্গের চিঠির গোপন রহস্য জানিবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে না।

অগত্যা সীতা পিসীমা নিজেই বলেন, 'তরঙ্গ জহরকে ভালবাসত।'

অনুপম তবু চুপ করিয়া থাকে।

'জহরের জন্যই তো তোদের বাড়ী ছেড়ে হঠাৎ ও বাড়ীতে চলে গেল।'

তরঙ্গের হৃদয়ের গোপন রহস্য ব্যক্ত করিলেন, কথাটা যে সত্য তার প্রমাণও দিলেন, তবু অনুপম একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত করিয়া উঠিল না দেখিয়া সীতা পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ অনুপমকে ঠেলিয়া দিয়া তরঙ্গের সেই চোরাকুঠি হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিতে গিয়া পায়ে পা জড়াইয়া তিনি গেলেন পড়িয়া। গড়াইতে গড়াইতে অর্দ্ধেকটা সিঁড়ি নামিয়া সিঁড়ির বাঁকের মুখে রেলিংএ তিনি আটকাইয়া থাকিলেন।

সীতা পিসীমা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবেশী আর একটি বাড়ীতে শাঁখ বাজিল। পাড়ায় তিন চারটি তে আজও শাঁখ বাজাইয়া সন্ধ্যার বন্দনা হয়। [ক্রমশঃ

বন্দেমাতরম্

—শ্রীভানু মজুমদার

বন্দি মা তোমায়,
বন্দি মা তোমায়,
স্বদেশ-জননী গো, তুমি যে তনুময়ী !

তোমার প্রাণমাঝে
কত যে ভাষা আছে
তুমি যে কত ভাবে কত যে মনোময়ী !

উদার কায়া তব
শোভিত অভিনব
ক্ষরিছে রসধারা চেতনা গুঞ্জনে,

হিঁদু ও খৃষ্টান,
কত মুসলমান,
তোমারি তনুরূপে জড়িত তব সনে।

তোমারে নমি যবে
নমি যে এই সবে,
নমি যে পশু-পাখী উদার নীলাকাশ,

ফসল-ভরা জমি,
ভূধর নদী নমি,
শিল্প-শোভা যত—তোমার পরকাশ।

নমি যে বনলতা
মধুর শ্যামলতা,
নমি যে ধেনুচরা মাঠের মেঠো গান,

নমি যে ভাটিয়ালী
বাউল বৈকালী
লহরী কীর্ত্তন স্বদেশী সুর তান।

বিদ্যা মনীষিতা
প্রণমি সকলি তা'
শ্রী আর শোভনতা তোমার আছে যাহা,

জীবন সরসিজে
শ্রীমান্ রূপে সেজে
তোমারি জনে জনে ভজনা করে তাহা।

তোমারে রূপে নমি
তোমারে ভাবে নমি
ভঙ্গী ভাষা নমি তোমারি প্রাণ স্বর।

নমি না বাধা যত
নিঠুর বাধাহত
স্বার্থে খণ্ডিত বিভেদী লোভাতুর।

মতো বিদ্বেষী
মিথ্যা মায়া বেশী,
সে রূপ তব নহে, তাহাতে নাহি বল,

তোমার পূজাছলে
তোমা সে পায়ে দলে
তোমারি তনুমাঝে সে রোগ—চঞ্চল।

বন্দেমাতরম্
বন্দেমাতরম্
গাওরে জনে জনে যেথান কর মায়,

রূপের মাঝে সে যে
রয়েছে দেখ সেজে
পূজারী দাও পূজা, এ তনু-মহিমায়।

তোমারও কায়া আছে,
আমিও কায়া মাঝে
প্রাণের মাঝে নাচে ভাবের মধুরূপ,

সে রূপ প্রকাশেতে
ভঙ্গী আসে সাথে
রূপের আঙিনাতে গড়ে সে কতরূপ !

—এ যে মা তব হাসি
দেখিনু রূপরাশি
বন্দেমাতরম্—বন্দি জননী তা'।

ভকতি জনে জনে
বিতর মনে মনে,
শকতি, সুধাবাহী তব এ প্রাণ গীতা।

বাহুতে বাহুতে যে
শক্তিরূপে সেজে
তুমি গো দশ দিকে ছড়িয়ে আছ মাতা,
তোমারি হৃদি হতে
নিয়ত ভাব-স্রোতে
উঠিছে নরলোকে মুক্তি-গীতি-গাথা।
—মায়েরে না চিনিতে
মায়ের পূজা দিতে
পাইলে অধিকার দিবে সে পীড়া মায়,
মায়ের নাম করি
পূজার ডালা ভরি
ফুলেতে চন্দনে পূজিবে আপনায়।

মায়ের মহিমারে
যে কভু বুঝে না রে
ভকতি-হারা সে যে কেবলি দেখে মাটি,
রূপে যে শিহরিয়া
উঠে রে তার হিয়া
কি রসে দেখিবে সে এ রূপ পরিপাটি!
বন্দেমাতরম্
বন্দেমাতরম্
বন্দেমাতরম বল রে সবে ভাই,
বল হে খৃষ্টান,
হিন্দু মুসলমান,
মন্ত্রসাধনা যে এমন হয় নাই।

সংবাদ ও মন্তব্য

ওয়েলিংটন স্কোয়ার

সতের বৎসর পূর্ব্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে যেখানে ভারতের জাতীয় মহাসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনাস্থল কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঠিক সেই স্থানটিতে নবনির্ম্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপগৃহে সতের বৎসর পরে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর শুক্রবার বেলা ২টা ১০ মিনিটের সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯২০ সালের পূর্ব্বে ১৯১৭ সালে আনি বেসাণ্টের সভানেত্রীত্বে এই ওয়েলিংটন স্কোয়ারেই কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই কংগ্রেসেই সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

*

দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই হইয়াছে, গান্ধীজী খদ্দর পরিয়াছেন, চরকা ঘুরাইয়াছেন, লবণ-কর রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, জেলে গিয়াছেন, খালাস পাইয়াছেন—কত কি। শেষ অবধি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের শকটে কংগ্রেসকে জুতিয়াছেন। অথচ দেশের অবস্থার দিকে চাহিলে কে বলিবে, এই সময়ের মধ্যে দেশের অবস্থায় সামান্য মাত্র উন্নতি দেখা দিয়াছে। উপরন্তু যে দিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই দুর্গতির সীমা নাই। অন্নাভাব ও অর্থকৃচ্ছ্রতা বাড়িয়াছে। অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অশান্তির অন্ত নাই। শিক্ষার নামে কুশিক্ষা বিতরণ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—দেশবাসীর দৃষ্টিতে সদসৎ ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছে। আধুনিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া দেশবাসী আজ সমস্ত নীতিকে ভুলিয়া বসিয়াছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ার সমস্তই নীরবে দেখিয়া যাইতেছে! ধন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ার!

অন্ন-সমস্যা

১১ই কার্ত্তিক সন্ধ্যায় কলিকাতা অ্যালবার্ট হলে নিখিল-বঙ্গ মহিলা কর্ম্মীসঙ্ঘের উদ্যোগে যে মহিলা-সভার উদ্বোধন হয়, তাহাতে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—বর্ত্তমানের প্রধান সমস্যাই হইল অন্ন সমস্যা এবং এই সমস্যার সমাধানে মহিলাদের সংযোগিতা একান্ত ভাবে প্রয়োজনীয়। তাই তিনি মহিলাদিগকে গৃহ ছাড়িয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করেন।

*

এই আহ্বানে জীবিকার্জ্জনে অক্ষম বাঙ্গালী স্বামীদের (এবং অধিকাংশই তাই) কোন আপত্তি থাকিবার কথা নহে। কেন না, কংগ্রেসের পতাকাতলে গৃহিণীরা গিয়া জুটিলে বাড়ীভাড়ার হাত হইতে তাঁহারা অব্যাহতি পাইতে পারেন। আর অন্ন-সমস্যার সমাধান তো সহজেই হইয়া গেল, কেন না যাঁহাদের জন্য অন্ন, সেই অন্নপূর্ণারাই যখন গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন তখন তো সমস্যাটা জল হইয়া গেল। কমলা দেবী নিরতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী! অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহার এই প্রস্তাব অনুযায়ী এক দল ভলাণ্টিয়ার যদি প্রদেশে প্রদেশে ঘর ভাঙ্গাইবার জন্য নিয়োগ করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা দ্রুত নিষ্পন্ন হইতে পারে।
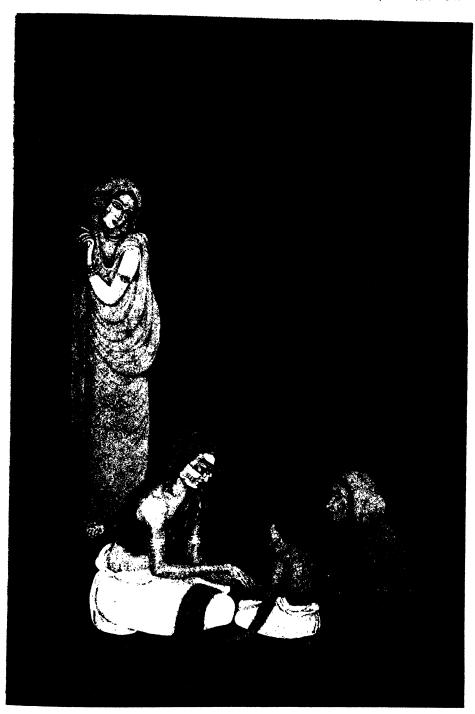
কোষ্ঠিবিচার

[শিল্পী— শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

অগ্রহায়ণ—১৩৪৪

৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

কৃষির ও কৃষকের সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তার স্বরূপ

কৃষি-কার্য্য এবং কৃষকগণকে লইয়া বর্ত্তমান মনুষ্য-সমাজ কোন্ কোন্ সমস্যায় উপনীত হইয়াছে, ঐ সমস্যা-সমূহের গুরুত্ব কতখানি, ঐ সমস্যাসমূহের কোন্‌টি আগে সমাধানযোগ্য এবং কোন্‌টি পরে সমাধানযোগ্য তৎ-সম্বন্ধে আমরা একাধিক সন্দর্ভ আমাদের পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। আমাদের ঐ সমস্ত সন্দর্ভ যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারা আমাদের কথাগুলি একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেক মানুষের চিন্তার অথবা সাধনার বিষয় প্রধানতঃ চারিটি, যথা :—

(১) আর্থিক প্রাচুর্য্য ;

(২) শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য ;

(৩) মনের স্থিরতা ;

(৪) বুদ্ধির উৎকর্ষ।

এই চারিটি বিষয়ের উন্নতি ছাড়া কেহ কেহ আত্মার উন্নতি অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা নামক আর একটি পঞ্চম বিষয়ের উন্নতির কথাও বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, গত আড়াই হাজার বৎসর মধ্যে যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদ ছাড়া আর কেহ যে আত্মা অথবা আত্মার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। শাক্যসিংহ অথবা যীশুখৃষ্ট অথবা নবী মহম্মদ যে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে মানব-সমাজকে কি কি উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও আজকাল যথাযথ ভাবে বুঝিবার উপায় নাই।

আত্মা কাহাকে বলে, তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া লইয়া নিজ দেহাভ্যন্তরে আত্মার কার্য্য প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই উহার উন্নতির অথবা নামকোয়াস্তে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন প্রয়োজন নাই। আত্মা কি, তাহা না বুঝিতে পারিলে অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের সম্যক্ স্বাস্থ্য লাভ করা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য লাভ না করিতে পারিলে মনের স্থিরতা সম্পাদন করা এবং মনের স্থিরতা সম্পাদন না করিতে পারিলে বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা, এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ লাভ করিতে না পারিলে প্রকৃত অর্থের প্রাচুর্য্য সম্যক্ ভাবে

সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, আর্থিক প্রাচুর্য্য প্রভৃতি যে চারিটি বিষয় প্রত্যেক মানুষের সাধনার বস্তু, সেই চারিটির কোনটি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে না পারিয়া সম্যক্ ভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় না এবং তজ্জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতি সমাজের কল্যাণের জন্য সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বস্তু বটে—কিন্তু উহা পৃথক্ ভাবে সাধনা করিবার কোন বিষয় নহে।

আর্থিক প্রাচুর্য্য প্রভৃতি যে চারিটি বস্তু মানুষের সাধনার অথবা কামনার প্রধান বস্তু তাহা একদিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পাদন না করিতে পারিলে যেরূপ লাভ করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার অন্যদিকে আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না।

প্রজ্বলিত জঠরাগ্নিতে যাঁহার প্রাণ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, যিনি শীতক্লিষ্ট হইয়াও বস্ত্রাভাবে নিজকে নগ্ন রাখিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, বর্ষার বারিধারায় যিনি সিক্ত হইয়া ক্লেশানুভব করিতেছেন, যাঁহার মাতা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী ও দুহিতা অর্থাভাবে যথোপযুক্ত পরিমাণে স্ব স্ব লজ্জা-নিবারণে অসমর্থ, যাঁহার প্রাণোপম সহোদর-সহোদরাগণ, অথবা প্রাণাধিক সন্তানগণ, অথবা আদরের প্রতিবেশী, আত্মীয় ও বন্ধুগণ অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাবাদিতে প্রপীড়িত হইয়া—অজ্ঞানের তমসায় উপার্জ্জনের নামে সর্ব্ববিধ প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইতে হয়, তাঁহার পক্ষে যাদৃশ সুস্থিরতা লাভ করিতে পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তাদৃশ সুস্থিরতা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় কি?

কাজেই মানুষের যাহা যাহা কাম্য, তাহা লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বাগ্রে আর্থিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ন্যূনপক্ষে যাহা যাহা না হইলে মানুষের জীবন ধারণ করা অসম্ভব হয়, উহা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করার নাম আর্থিক প্রাচুর্য্য। আর্থিক প্রাচুর্য্য না হইলে, মানুষের যাহা কাম্য তাহা লাভ করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু যাঁহারা আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিবার নামে ধনের উপাসনা করাই (mammon worship) জীবনের একমাত্র কার্য্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, যাঁহারা ধনলাভের জন্য নিজেকে বিক্রয় করিয়া কোন মানুষের অথবা খেয়ালের দাসত্ব করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহাদের পক্ষেও কোন কাম্যবস্তু সম্যক্ ভাবে লাভ করা সম্ভব হয় না।

মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন, তাহার গবেষণায় নিযুক্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য সর্ব্বপ্রথমে কৃষক যাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে বাধ্য না হইয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছলভাবে কৃষিকার্য্যে লাভবান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন।

কোন্ কোন্ পন্থায় মানুষ তাহার আর্থিক অভাব দূর করিতে সক্ষম হয়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অর্থাভাব দূর করিবার উপায় সর্ব্বসমেত পাঁচটি, যথা—

(১) কৃষিকার্য্য, (২) শিল্প, (৩) বাণিজ্য (ওকালতী ও ডাক্তারী প্রভৃতি পেশাকে বাণিজ্যান্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিতে হইবে), (৪) পশুপালন, (৫) চাকুরী অথবা নফর-গিরী।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত পাঁচটি ব্যবসায়ের দ্বারা মানুষের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে পঞ্চম উপায়ে, অর্থাৎ চাকুরী দ্বারা অর্থাভাব দূর করিবার প্রয়াসী হইলে উহা যতই উচ্চপদের হউক না কেন, মানুষ শরীর, ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য, মনের স্থিরতা এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয় এবং ক্রমে ক্রমে প্রায়শঃ মনুষ্যাবয়বে এক একটি মানুষ অমানু-ষোচিত-ভাবাপন্ন হইয়া পড়েন এবং তাঁহারা যে এতাদৃশ হীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহারা খেতাব প্রভৃতির মোহে বুঝিতে অক্ষম হইয়া থাকেন। যখন মনুষ্যসমাজে উপরোক্ত সরকারী ও বে-সরকারী বেতনভুক্ চাকুরীয়াগণ সমাজের অনুকম্পার পাত্র না হইয়া অধ্যাপক, প্রফেসর, মন্ত্রী, মেম্বর, জজ, এঞ্জিনিয়ার, কেমিষ্ট প্রভৃতি নামে সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হন,

তখন ভারতীয় ঋষিগণের ভাষায় শূদ্রের রাজত্ব চলিতেছে, ইহা বুঝিতে হয় এবং তখন মানুষকে নিদারুণ দুঃখ ও উচ্ছৃঙ্খলার তাড়নার জন্ম প্রস্তুত হইতে হয়। এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, চাকুরীর দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে মানুষের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু উহা কখনও কোন প্রকৃত মনুষ্যত্বাকাঙ্ক্ষী মানুষের কাম্য হওয়া সঙ্গত নহে এবং বেতনভুক চাকুরিয়া মানুষের বুদ্ধি ও পরিকল্পনা কখনও সমাজের হিতকর ও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

মানুষের অর্থাভাব দূর করিবার যে পাঁচটি উপায় বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে একদিকে—চাকুরী যেরূপ কখনও মানুষের কাম্য হওয়া সঙ্গত নহে, সেইরূপ আবার সমাজে স্বাধীন কৃষিকার্য্য—কৃষকের পক্ষে যাহাতে লাভজনক হয়, তাহার ব্যবস্থা না হইলে শিল্প ও বাণিজ্য অথবা পশু-পালনে কখনও সম্যক্ সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। কারণ, একদিকে যেরূপ কৃষিজাত কাঁচামাল না হইলে কোন শিল্পে অগ্রসর হওয়া অথবা কোন পশুকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার সমাজে লাভজনক কৃষিকার্য্য বিদ্যমান না থাকিলে ক্রয়ক্ষম ক্রেতার অভাব হইয়া পড়ে।

কাজেই আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বাগ্রে কৃষক যাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্যে লাভবান্ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এক কথায়, মনুষ্যসমাজ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে, কৃষি ও কৃষক-সমস্যাকে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ব-প্রধান সমস্যা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

আজকালকার মনুষ্যসমাজের বেতনভুক্ শূদ্রভাবাপন্ন কর্ণধারগণ প্রায়শঃ উপরোক্ত কৃষি ও কৃষক-সমস্যার গুরুত্ব যে সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন—তাহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না বটে—কিন্তু বহু দৈনিক সংবাদপত্র-মারফৎ এতৎসম্বন্ধে কিরূপ চিন্তার ধারা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে, কৃষি ও কৃষক-সমস্যা যে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত রহিয়াছে, তাহাও বলা চলে না।

কৃষি ও কৃষক-সমস্যা যে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত রহিয়াছে, তাহা আজকালকার ভাবুকগণের কথা শুনিলে মনে করা চলে না বটে, কিন্তু ঐ ভাবুকগণের ভাবধারায় এতৎ-সম্বন্ধে কোন সারবত্তার সাক্ষ্যও পাওয়া যায় না।

গত ২০।২৫ দিনের মধ্যে কৃষি ও কৃষক-সমস্যা সম্বন্ধে কি কি কথা শুনা গিয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিলে আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে

এই ২০।২৫ দিনের এতৎসম্বন্ধে দৈনিক সংবাদপত্রে যে যে কথা শুনা গিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) বন্যার কারণ।

(২) কৃষি-ঋণ-পরিশোধের পন্থা।

"বন্যার কারণ কি" এতৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে বিহার প্রদেশে "Behar Flood Conference" নামক সভায়। এই সভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, নদীর পার্শ্ববর্ত্তী যে সমস্ত বাঁধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই বন্যার প্রধান কারণ।

আমাদের মতে, এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক ও বালকোচিত।

যে যে নদীর পার্শ্বে যে যে বাঁধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোন্‌টী কবে দেওয়া হইয়াছে, ইহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বন্যার প্লাবন হইতে নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের রক্ষার জন্যই এক একটি বাঁধ রচনার পরিকল্পনা সৃষ্টি হইয়াছিল—অথবা এক কথায় বন্যার প্লাবন দেখা গিয়াছিল বলিয়াই বাঁধ দিবার প্রয়োজন অনুভব করা হইয়াছিল। কাজেই বাঁধগুলিকে কোন ক্রমেই বন্যার প্লাবনের কারণ বলা চলে না, পরন্তু প্লাবনকেই বাঁধ গুলির কারণ বলিতে হইবে।

বন্যার প্লাবনের কারণ কি, তাহা যথাযথভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র কারণ নদীর গভীরতার ও প্রশস্ততার হ্রাস। কোন একটি অট্টালিকার ছাদের উপর বর্ষণের ফলে যে জলসঞ্চয় হয়, তাহা যাহাতে অনায়াসে পরিষ্কার হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে যেরূপ কোন ন্যূন আয়তনের ব্যাসসংযুক্ত (minimum diameter) নলের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে পাহাড়ের উপর এবং নিকট-

বর্ত্তী জনপদসমূহে যে পরিমাণের জল সঞ্চিত হয়, তাহা যাহাতে অনায়াসে পরিষ্কার হয়, তজ্জন্য নদীসমূহের একটা ন্যূন পরিমাণের গভীরতা ও প্রশস্ততার প্রয়োজন হইয়া থাকে, যে আয়তনের ব্যাস (diameter) সংযুক্ত থাকিলে ছাদের জল অনায়াসে পরিষ্কৃত হইতে পারে, তাহা না থাকিয়া তদপেক্ষা কম আয়তনের ব্যাসসংযুক্ত নল থাকিলে ছাদের জল ছাদের উপরিস্থিত দেওয়াল (parapet) উপছাইয়া পড়া (overflow) যেরূপ অনিবার্য্য, সেইরূপ যাদৃশ প্রশস্ততা ও গভীরতা থাকিলে নদীর পক্ষে পাহাড়ের ও নিকটবর্ত্তী জনপদের জল অনায়াসে পরিষ্কার করা সম্ভব হইতে পারে, নদীতে তদপেক্ষা কম প্রশস্ততা ও গভীরতা বিদ্যমান থাকিলে নদীর জল উপছাইয়া পড়া অথবা বন্যার প্লাবন হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। কতদিন হইতে এক একটি প্রদেশে এতাদৃশ পরিমাণে বন্যার প্লাবন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশে নদীতে বার মাস জল থাকিত, ততদিন পর্য্যন্ত সেখানে কোন বন্যার প্লাবনের কথা শুনা যায় নাই এবং নদীর জল যতই কমিয়া যাইতেছে, অর্থাৎ প্রশস্ততা ও গভীরতা যতই হ্রাস পাইতেছে ততই বন্যার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে।

কাজেই যুক্তি অনুসরণ করিলে বলিতে হইবে যে, প্রতি বৎসর নদীর প্লাবনে যাহাতে কৃষিকার্য্যের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তাহা করিতে হইলে যাহাতে নদীতে বার মাস জল থাকে, নদী খনন করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কি করিলে কৃষক ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত কথার মধ্যে দুইটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা :—

(১) কৃষকগণ যাহাতে তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিবার সময় পায় এবং উত্তমর্ণগণ যাহাতে কৃষকদিগকে ঋণ পরিশোধ করিবার তাগিদ না দিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা (moratorium bill) ;

(২) কৃষকগণের ঋণভার যাহাতে সম্ভব হইলে সম্পূর্ণভাবে, নতুবা অন্ততঃপক্ষে আংশিকভাবে তাহাদের স্কন্ধ হইতে গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে হস্তান্তরিত হয়, তাহার ব্যবস্থা।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দুইটি উপায়ের কোনটিতেই কৃষক তাহার ঋণভার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না, পরন্তু উহার ফলে দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যায়পরতা ও অশান্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অন্নবস্ত্র প্রভৃতি সর্ব্ববিধ খরচাদি বাদে কৃষক যাহাতে কিছু উদ্বৃত্ত করিতে পারে, অথবা তাহার আয়ের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা আবিষ্কার না করিয়া কেবলমাত্র কিস্তিবন্দীর সময় বাড়াইয়া দিলেই কি কৃষকের পক্ষে তাহার দেনা পরিশোধ করা সম্ভব হইতে পারে?

অন্যদিকে ভবিষ্যতে যাহাতে কৃষকের দেনা করিবার প্রয়োজন না হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে কেবলমাত্র বর্ত্তমান দেনা—গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে স্থানান্তরিত করিলেই কি কৃষক তাহার ঋণমুক্ত হইতে পারিবে?

কবে এবং কেন ভারতীয় কৃষক ঋণদায়ে আবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, একদিন ছিল যখন সমগ্র কৃষক সর্ব্বতোভাবে ঋণমুক্ত ছিল চল্লিশ বৎসর আগেও কৃষকগণের মধ্যে অনেকেই নির্দ্দায়িক ছিল এবং তখন যাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের ঋণের পরিমাণ বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই শতাংশের একাংশ অপেক্ষাও কম ছিল।

যখন সমগ্র কৃষক সর্ব্বতোভাবে ঋণমুক্ত ছিল, তখন কৃষির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তখন সর্ব্বত্রই জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এখনকার তুলনায় চারিগুণেরও অধিক ছিল, অর্থাৎ এক্ষণে যে-জমী হইতে বিঘাপ্রতি মাত্র তিন মণ ধান্য পাওয়া যায়, সেই জমী হইতে ১২ মণেরও অধিক ধান্য পাওয়া তখন সম্ভব হইত। তখন কৃষকের প্রত্যেক ব্যবহার্য্য জিনিষ এখনকার তুলনায় আট ভাগের একভাগ অপেক্ষাও সস্তা ছিল। এক্ষণে যে-ধুতি ১৷৷০ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে, তখন সেই ধুতি ৵০ আনা অথবা ৶০ আনায়, যে ধান এক্ষণে প্রতিমণ ২৲ টাকায় বিক্রয় হয়, তখন সেই ধান ।০ আনায় বিক্রয় হইত।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি তখন চারিগুণেরও অধিক থাকায়, কৃষকগণ বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস পরিশ্রম করিয়াই স্ব স্ব জমী হইতে যে পরিমাণ ধান্য পাইত, তদ্দ্বারা স্ব স্ব পরিবারের খোরাক নির্ব্বাহ হইয়া প্রচুর ধান্য উদ্বৃত্ত হইত। সর্ব্ববিধ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য তখন অতিশয় সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত বলিয়া নামমাত্র মজুরী হারে মজুর পাওয়া সম্ভব হইত। কাজেই কৃষিকার্য্যের খরচ তখন অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ ছিল। একে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অনেক বেশী, তাহার পর আবার সর্ব্ববিধ দ্রব্যের সুলভতাবশতঃ কৃষিকার্য্যের খরচ ও তিন বেলার খোরাকি ধান্য বাদেও কৃষকের পক্ষে অনেক ধান্য উদ্বৃত্ত করা সম্ভব হইত এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করা অনায়াসসাধ্য হইতে পারিত।

এক্ষণে একে ত' উৎপন্ন শস্যের হার (¼) এক-চতুর্থাংশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর প্রায় প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্যের হার প্রায় আটগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে একে ত' জমী হইতে যে পরিমাণ শস্য হয়, তদ্দ্বারা প্রায়শঃ এক বেলার সাংবৎসরিক খাদ্য হওয়া ক্লেশসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং কৃষককে বাধ্য হইয়া পেটের দায়ে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর আবার জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকের ঋণ ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে।

ভারতের মোটা মোটা কপ্‌চানেওয়ালা অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, পাট, তুলা এবং ধান প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই কৃষকের অবস্থার উন্নতির ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে। এই পণ্ডিতগণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, যখন পাট, তুলা ও ধান্যের দাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হারে উপনীত হইয়াছে, তখন কৃষকের ঋণও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে দেখা গিয়াছে।

অধুনা প্রায় সমগ্র কৃষকজাতি যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে জমী হইতে তাহারা যে পরিমাণ ফসল পাইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তাহাদের প্রায়শঃ সারা বৎসরের এক বেলারও খোরাক হয় না। ফলে, মহাজনের পূর্ব্ব ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হওয়া তো দূরের কথা, প্রায়শঃ তাহারা এক বেলার খোরাকে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়া থাকে এবং তৎসত্ত্বেও জমিদারের খাজনা, মহাজনের সুদ এবং অত্যাবশ্যকীয় অন্যান্য ছোটখাট দ্রব্য ক্রয় করিবার বাবদ, তাহাদের ঋণের পরিমাণ দাউ দাউ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার পর আবার সভ্যতা ও শিক্ষার নামে তাহাদিগকে যে-সমস্ত কু-দৃষ্টান্ত দেখান হইতেছে, তাহার ফলে তাহাদিগের মধ্যে নিষ্প্রয়োজনীয় খরচের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই অশান্তির মাত্রাও সমধিক বাড়িয়া চলিতেছে।

কাযেই যাহাতে কৃষকগণ কৃষিকার্য্যের দ্বারা অন্ততঃপক্ষে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, লজ্জা-নিবারণের জন্য সারা বৎসর মাথাপিছু অন্ততঃপক্ষে চারিখানা ধুতি পায়, রৌদ্রবৃষ্টির হস্ত যাহাতে এড়াইতে পারে, তদ্রূপ একটা আশ্রয় পায়, সভ্যতা ও শিক্ষার নামে যে সমস্ত কু-দৃষ্টান্তের ফলে তাহাদের মধ্যে অপচয়ের স্পৃহা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সমস্ত কু-দৃষ্টান্ত তাহাদের মধ্যে যাহাতে প্রবেশ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সম্পাদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আর যাহাই করা যাউক না কেন, তাহাতে কৃষকের ঋণভারের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় না।

কি করিলে কৃষকের ঋণভার-লাঘব হইয়া পুনরায় তাহারা স্বচ্ছল অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি।

কাযেই, ঐ সম্বন্ধে এই সংখ্যায় কোন বিস্তৃত আলোচনা করিব না।

আমাদের মতে যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার ও সভ্যতার নামে কতকগুলি কু-শিক্ষা ও চরিত্রহীনতা যাহাতে বিস্তৃতি লাভ না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আর যাহাই করা যাউক না কেন, তদ্দ্বারা কৃষককে ঠকাইয়া তাহার ভোট লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহার অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে না।

যে সমস্ত অধর্ম্মের প্রতীকগণ ধর্ম্মাধিকরণে স্থান পাইয়া মানবসমাজকে শিক্ষা ও সভ্যতার নামে বিপথ-

গামী করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহারা আর কতদিন আমাদিগের কথার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার প্রচেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে পারেন, তাহা পাঠকগণ লক্ষ্য করুন।

একতার প্রয়োজনীয়তা এবং ঐক্য-বন্ধনের উপায়

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বে বাংলা-দেশে যে ঐক্যান্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, ঐ আন্দোলনকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের এই সন্দর্ভ রচিত হইতেছে। আমাদের মতে নবাব বাহাদুরের এই আন্দোলন অতীব সময়োচিত হইয়াছে। আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা তলাইয়া বুঝিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে বাংলার সমস্যা, ভারতবর্ষের সমস্যা ও সমগ্র মানবজাতির সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায় প্রধানতঃ কি কি, তাহা স্মরণ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের সমস্যা ও তাহার পূরণের উপায় প্রধানতঃ কি কি, তাহা আমরা মাসিক ও সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রীতে একাধিক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধসমূহ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের সমস্যা প্রধানতঃ চারিটি, যথা—

(১) স্বাধীনভাবে কৃষি-কার্য্য করিয়া কৃষকের পক্ষে লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়শঃ অল্প হইতে অল্পতর হওয়ায় কৃষক, কুটীরশিল্পী ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের আর্থিক দুরবস্থা।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণের বেকার ও নৈরাশ্যোৎপাদক অবস্থা।

(৩) বণিক্, শিল্পী এবং উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়িগণের আর্থিক অবস্থার ক্রমিক পতন।

(৪) সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি, স্বাবলম্বন, দীর্ঘ-যৌবন এবং দীর্ঘায়ুর হ্রাস।

বাংলার ও বাঙ্গালীর সমস্যা প্রধানতঃ কি কি, তদ্বিষয়ে সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র ভারতবর্ষ ও ভারত-বাসীর পক্ষে যে চারিটি সমস্যার কথা উপরে বলা হইয়াছে, বাঙ্গলার ও বাঙ্গালীর প্রধান সমস্যাও ঠিক ঠিক ঐ চারিটি। শুধু যে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর এবং ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর সমস্যা উপরোক্ত ঐ চারিটি তাহা নহে, সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ডের ও ইংরাজের, জার্ম্মানীর ও জার্ম্মানগণের, মার্কিন ও মর্কিনবাসিগণের এমন কি সমগ্র মানবজাতির প্রত্যেক প্রদেশেই প্রায়শঃ ঐ একই রকমের চারিটি সমস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, সমগ্র মানবজাতির প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই যে প্রধানতঃ উপরোক্ত চারিটি সমস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বুঝিতে পারেন না। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাদের নিজ নিজ সমস্যাসমূহের বাস্তব রূপ ও কারণ কি কি, তাহা বুঝিতে পারেন না বটে এবং তাহা যথাযথভাবে তাঁহারা বুঝিতে পারেন না বলিয়া কোন দেশেই ঐ সমস্যাসমূহের আমূল নিরাকরণ করা সম্ভবযোগ্যও হইতেছে না বটে, কিন্তু প্রত্যেক দেশেই যে, সমস্যাসমূহ ক্রমশঃই ঘোরাল হইয়া পড়িতেছে এবং প্রত্যেক দেশেই যে, মানুষ উহার সমাধান-কল্পে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত প্রধান চারিটি সমস্যার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার পন্থা কি কি তৎসম্বন্ধে আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, ঐ সমস্যাসমূহ হইতে সম্যক্ ভাবে রক্ষা পাইতে হইলে দেশের মধ্যে সর্ব্বসমেত দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং ঐ দ্বাবিংশতি ব্যবস্থার মধ্যে প্রথমতঃ কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভযোগ্য হয় এবং দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) রক্ষিত হয় তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

এক কথায়, প্রত্যেক প্রদেশের অথবা প্রত্যেক দেশের সমগ্র অধিবাসি-সংখ্যার সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও স্বাস্থ্যপ্রদ আহার, বিহার ও ব্যবহারের জন্ম যাহা যাহা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা যাহাতে সম্যক্ পরিমাণে ঐ প্রদেশে অথবা ঐ দেশে উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থায় সর্ব্বাগ্রে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে এবং তাহার পর ঐ ঐ আহার, বিহার ও ব্যবহারের জিনিষ যাহাতে প্রত্যেক মানুষ স্ব স্ব জীবনরক্ষণোপযোগী পরিমাণে পাইতে পারে এবং মানুষের যোগ্যতানুসারে উহার পরিমাণের তারতম্য সংঘটিত হইয়া বিতরণের ব্যবস্থা হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

মানুষ বর্ত্তমান কালে যে যে সমস্যায় নিপতিত হইয়াছে, সেই সমস্ত সমস্যা যাহাতে সমূলে নিরাকৃত হয়, তাহা করিতে হইলে যে, সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত ভাবে কৃষি-সমস্যা ও দ্রব্যমূল্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং তাহা না করিয়া আর যাহাই করা যাউক না কেন, তদ্দারা যে, প্রকৃত সমস্যার কোনরূপ সমাধান করা সম্ভব হইবে না, তাহা মানুষ এখনও পর্য্যন্ত তাহার আধুনিক শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, আগামী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে মনুষ্যসমাজের অনেকেই উপরোক্ত সত্য বুঝিয়া উঠিতে পারিবে। তখন দেখা যাইবে যে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর সমস্যাসমূহ নিরাকৃত করিবার জন্যই যে সর্ব্বাগ্রে উপরোক্ত কৃষি-সমস্যা ও দ্রব্যমূল্য-সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হইবে, তাহা নহে, মনুষ্যসমাজের প্রত্যেক প্রদেশে কোন সমস্যা যাহাতে মানুষকে বিব্রত করিতে না পারে, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ দুইটি সমস্যার যাহাতে সমাধান করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভযোগ্য হয় এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) রক্ষিত হয়, তাহা করিতে হইলে কোন্ কোন্ কার্য্যে সর্ব্ব প্রথমে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কৃষিকার্য্য যাহাতে কৃষকের পক্ষে লাভযোগ্য হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টায় হস্তক্ষেপ না করিয়া, দারিদ্র্য-সমস্যা-সমাধানের নামে "হরিজন" আন্দোলন করাই হউক, আর শ্রমজীবীর মজুরীবৃদ্ধির আন্দোলন করাই হউক, অথবা খাজনাহ্রাসের আন্দোলন করাই হউক, আর শিল্পোন্নতির চেষ্টা করাই হউক, তদ্দারা কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণেও আসল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইবে না। আমাদের এই প্রাথমিক কথার সত্যতা অনেকেই হয়ত এক্ষণে স্বীকার করিবেন না এবং যথাযথভাবে উহার তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ঠকিয়া ঠকিয়া অদূরভবিষ্যতে যে এই কথা মানুষের বুঝিবার যোগ্য হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে হইলে কি কি করা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ক সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র উপায় দেশাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক নদী ও খালের পঙ্কোদ্ধার করা। কোন্ কোন্ প্রয়োগযোগ্য উপায়ে দেশাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক নদী ও খালের পঙ্কোদ্ধার করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কৃষি ও কৃষক-সমস্যা আমূলভাবে সমাধান করিতে হইলে যাহাতে দেশাভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক নদী ও খালসমূহের প্রত্যেক অংশ বার মাস জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাদৃশভাবে গভীর করিয়া ঐ নদী ও খালসমূহের পঙ্কোদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে রেল-মোটর প্রভৃতি স্থলযানের প্রচারোদ্দেশ্যে সেতু প্রভৃতির অত্যধিক বিস্তারবশতঃ উহা করা সহজসাধ্য নহে। পরন্তু নদী ও খালসমূহের পঙ্কোদ্ধার যথাযথভাবে করিতে হইলে রেল ও মোটর গমনাগমনের রাস্তাসমূহ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইতে পারে। একদিকে মানবসমাজকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহাতে রেল ও মোটর গমনাগমনের রাস্তাসমূহের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন পর্য্যন্ত আবশ্যকীয় হইতে পারে, অন্যদিকে আবার রেল ও মোটর গমনাগমনের রাস্তাসমূহের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিতে গেলে বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্য-

যুগের মূলধনের বিনাশসাধন কল্পনাতীত পরিমাণে করিতে হইবে। একমাত্র ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া ছাড়া এই উভয় সমস্যা হইতে রক্ষা পাইবার অন্য কোন উপায় নাই। ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইলে কি উপায়ে এই উভয় সমস্যা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। সন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমরা এক্ষণে আর উহার পুনরুল্লেখ করিব না।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যাদৃশভাবে নদী ও খালসমূহের পঙ্কোদ্ধার করিবার প্রয়োজন, কেবলমাত্র যে তাহার জন্য ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা আছে তাহা নহে, যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সমতা (parity) রক্ষিত হয়,তজ্জন্যও মনুষ্যসমাজে একতা একান্ত প্রয়োজনীয়।

আজকাল বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপভাবে হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় কত মূল্যে সাধিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যে দ্রব্য বিক্রয়োপযোগী করিতে হয়ত একজন মানুষের পাঁচমাস পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সেই দ্রব্য পাঁচ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে, আর যে দ্রব্য একজন মানুষ তাহার এক মাসের পরিশ্রমে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, সেই দ্রব্য পঁচিশ টাকায় বিকাইয়া যাইতেছে। ইহারই নাম দ্রব্যমূল্যের অসমতা (want of parity)। দ্রব্যমূল্যে সমতা (parity) বিদ্যমান থাকিলে, যে দ্রব্য একজন মানুষের পাঁচমাসের পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা যদি পাঁচ টাকায় বিকায় তাহা হইলে যে-দ্রব্য ঐ একজন মানুষের একমাসের পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার জন্য এক টাকার অধিক অথবা অল্প হওয়া সঙ্গত নহে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যে অসমতার বিদ্যমানতা-বশতঃ কতকগুলি অসৎ মানুষ যথোপযুক্তরূপে পরিশ্রম না করিয়া, যথোপযুক্ত পরিমাণে যোগ্যতা লাভ না করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সমারোহের সহিত জীবন ধারণ করিতে পারিতেছে, আর কতকগুলি মানুষ সাধক পুরুষের মত রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে অহরহ কঠোর পরিশ্রম করিয়াও তিন বেলার স্থানে এক বেলার খাদ্য মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেছে। দ্রব্যমূল্যের অসমতা-বশতঃ, যে মানুষগুলি আজকাল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছেন,তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজে বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহারাই এক্ষণে আমাদের সমাজের কর্ণধার। বাস্তবিকপক্ষে যদি কোন বুদ্ধিজীবী মানুষ বর্ত্তমান সমাজে বিদ্যমান থাকিতেন, অথবা প্রকৃত বুদ্ধি কুত্রাপি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের মতে এই অগণিত মনুষ্যগণকে এতাদৃশ সমস্যায় বিব্রত হইতে হইত না। যে বুদ্ধির ফলে অস্ত্রোপচার সুসাধিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, সেই বুদ্ধির সার্থকতা কোথায়? এইরূপ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত বুদ্ধি, অথবা প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, অথবা প্রকৃত শিক্ষা এখন আর মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান নাই। অথচ, আধুনিক সমাজের কর্ণধারগণ কখনও বা বুদ্ধিজীবী নামে, কখনও বা জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক নামে, কখনও বা শিক্ষিতের নামে শ্রমজীবীর কার্য্যের পারিশ্রমিক যেখানে এক টাকা,সেইখানে তাঁহাদের স্বীয় পারিশ্রমিক ১০ টাকা অথবা ততোধিক হারে নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন। এক কথায়, যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই আমাদের ভক্ষক অথবা নাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের অসমতা যাহাতে প্রতিরুদ্ধ হইয়া সমতার প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা করিতে গেলে যাঁহারা আজকালকার বিভিন্ন আন্দোলনের নেতা, তাঁহাদের স্বার্থে প্রকারান্তরে হস্তক্ষেপ করা হইবে এবং যে-সমস্ত পাপাত্মাগণ "মহাত্মা" নামে বিকাইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্য কোথায়, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়া পরোক্ষভাবে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। অথচ, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যে যে অসমতা বিদ্যমান রহিয়াছে,তাহা তিরোহিত করিতে না পারিলে মনুষ্যসমাজে অধুনা ধনের যে অসমান বিতরণ (irregular distribution) বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন উপায়ে কিছুতেই নিবারিত হইবে না।

আমাদের গবর্ণর ও প্রিমিয়ারগণ ২।৪টি ফাঁকা পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন করিয়া আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা ও আশা আমাদিগকে দেখাইতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন পরিকল্পনাই যে সমীচীন নহে এবং জমীর স্বাভাবিক

উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় ও বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যে যাহাতে সমতা থাকে, তাহা না করা পর্য্যন্ত যে, অন্য কোন উপায়ে জনসাধারণের আর্থিক সমস্যা দূর করা সম্ভব নহে, তাহা অদূরভবিষ্যতে প্রমাণিত হইবে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, এক দিকে ধনের অসমান বিতরণ বন্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য-মূল্যের মধ্যে সমতা (parity) প্রতিষ্ঠিত করা একান্ত প্রয়োজনীয়, আর অন্য-দিকে উহা করিতে হইলে যাঁহারা আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের ঐ অযথা নেতাগিরি চূর্ণ করিতে হইবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই উভয় সমস্যা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় জনসাধারণের ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া।

উপরোক্ত কারণের জন্যই আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, হিন্দু-মুসলমান, খৃষ্টান এবং ইংরাজ, ভারত-বাসী, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী ও বেহারী নির্ব্বিশেষে মিলিত না হইতে পারিলে কি ইংলণ্ডের সমস্যা, অথবা কি ভারতবর্ষের সমস্যা, অথবা কি বাঙ্গালার সমস্যা, কোন স্থানের কোন সমস্যাই সম্যক্ ভাবে সমাধান করা সম্ভব হইবে না।

প্রকৃতির ইতিহাস বলিতে কি বুঝায় এবং তাহা কি করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্যজাতির সমস্যাগুলি ক্রমশঃ অতি ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং মনুষ্যসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই গত ৬০।৭০ বৎসর হইতে মানুষের মধ্যে যাহাতে একতা স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা প্রাকৃতিক কারণবশতঃ প্রত্যেক দেশেই স্বতঃই আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু মানুষের কুশিক্ষা ও কুজ্ঞানের ফলে ঐ একতার স্বাভাবিক প্রযত্ন দলাদলিতে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষেও উপরোক্ত প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, ইংরাজ ও ভারতবাসীর মিলিত চেষ্টায় কংগ্রেসের নামে জনসাধারণের মিলন-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু কতকগুলি নেতার কুশিক্ষা ও কুজ্ঞানের ফলে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের মিলন-মণ্ডপ হইতে মুসলমান ও খৃষ্টান, ইংরাজ ও শৃঙ্খলাপ্রিয় ভারত-বাসী ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং যে গান্ধী-জহওরলাল কোম্পানী ও কবিগুরুসম্প্রদায় বর্ত্তমানে আমাদের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের ভবিষ্যৎ আশার স্থল ঐ যুবকবৃন্দের বরেণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। মোটের উপর কু-জ্ঞান ও কু-শিক্ষার ফলে যাঁহারা আমাদিগকে গরল বিতরণ করিতেছেন, তাঁহাদের ঐ গরল আমরা অমৃত বলিয়া ধরিয়া লইতেছি এবং প্রকারান্তরে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করিতেছি।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ঐক্যবন্ধন একান্ত প্রয়ো-জনীয় বটে, কিন্তু উহা একেবারেই সহজসাধ্য নহে।

কালের গতি অথচ প্রকৃতির ইতিহাস পড়িলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে মিলনের জন্য যে পবিত্র মিলন-মণ্ডপ, প্রকৃতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইংরাজ ও ভারতবাসী মহাপুরুষের দ্বারা কংগ্রেস নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা যে পরবর্ত্তী সয়তান-প্রবৃত্তিসম্পন্ন-ব্যক্তিগণ কলুষিত করিয়াছেন, এই সত্যটুকু আজকালকার জনসাধারণ এখনও বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু ঐ প্রকৃতিরই কার্য্যচক্রের ফলে অদূরভবিষ্যতে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে মানুষ তাহা বুঝিতে পারিবে। মানুষ তখন দেখিতে পাইবে যে, বর্ত্তমান কলুষিত কংগ্রেসের পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে এবং উহা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সহজ কথায় বলিলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান কংগ্রেসের কর্ণধারগণ প্রায়শঃ আত্ম-প্রচার ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার অভিলাষী হইয়া কোনরূপ যোগ্যতা বিন্দুমাত্র পরিমাণেও অর্জ্জন করিবার আগেই দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অযোগ্যতার ফলে তাঁহারা জনসাধারণের কোন প্রকৃত সমস্যা কিঞ্চিৎ মাত্র পরিমাণেও সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন না। পরন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন না বলিয়া জনসাধারণকে বাজে কথায় প্রতারিত করিতে চেষ্টা করিতে থাকিবেন।

ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে ৪।৫ বৎসরের মধ্যে যিনি আজ 'মহাত্মা' বলিয়া জন-সমাজে প্রচারিত, যাঁহার পদধূলি আজ কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিণামদর্শী মানুষের আকর্ষণীয় তিনি যে প্রকৃত পক্ষে মহাত্মা নহেন, পরন্তু

আত্ম-প্রচারকারী ও আত্ম-প্রতিষ্ঠাভিলাসী এবং তাঁহার দ্বারা যে এতাবৎ ভারতবাসীর অপকার ছাড়া কোনরূপ উপকার সাধিত হয় নাই—তাহা মানুষ বুঝিতে পারিবে এবং তখন তাঁহার চালিত ঐ কলুষিত মিলন-মণ্ডপের উপর মানুষের অশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

সেই সময় যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের ঐ অগণিত মূক জনসাধারণের ব্যথা কোথায়, তাহা মরমে মরমে বুঝিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা ঐ অগণিত মূক জনসাধারণের গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া 'চাষার ছেলে' হইয়াও আধুনিক গভর্ণমেণ্টের ও সমাজের পরিচালনা-প্রণালী ও তাহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের প্রয়োজন হইবে।

ইহারই জন্য প্রধানতঃ যাঁহাদিগকে লইয়া নবাব বাহাদুর তাঁহার আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে হয়, নবাব বাহাদুরের এই আন্দোলন সময়োচিত হইয়াছে।

কি করিলে ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐক্যবন্ধনের চেষ্টা যাহাতে ফলবতী হয়, তাহা করিতে হইলে প্রথমতঃ যে যে কারণে অনৈক্যের উদ্ভব হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহা দূরীভূত করা একান্ত: প্রয়োজনীয় এবং দ্বিতীয়তঃ যে যে কার্য্যে জনসাধারণের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রহিয়াছে, সেই সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

কোন কোন্ কারণে গত ২০ বৎসর হইতে ভারতবাসীর মধ্যে দলাদলি ক্রমশঃ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ তথাকথিত স্বাধীনতার লালসা ও ইংরাজ-বিদ্বেষের বৃদ্ধি।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত স্বত্ব রহিয়াছে এবং তাহার লালসা কোনরূপে নিন্দনীয় হইতে পারে না। এই ভাবধারাটি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মস্তিষ্কপ্রসূত। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা দিয়া থাকেন, একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, সেই সংজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে ভ্রম-প্রমাদযুক্ত এবং ঐ সংজ্ঞা ভ্রম-প্রমাদযুক্ত বলিয়াই পাশ্চাত্ত্য দেশে সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা ঘোরাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রত্যেক প্রদেশে চাকুরীজীবী পরমুখাপেক্ষীর সংখ্যা তাঁহাদের মোট লোকসংখ্যার তুলনায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সমষ্টিগত ভাবেও প্রত্যেক দেশের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের কাঁচামালের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ, উহাঁরা নিজদিগকে স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন এবং এই স্বাধীনতারক্ষার নামে মনুষ্য-রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইহা কি ঘোর মূর্খতা ও প্রকৃতপক্ষে অসভ্যতার পরিচয় নহে ?

ভাষাবিজ্ঞানানুসারে স্বাধীনতা (স্ব-এর অধীনতা) বলিতে কি বুঝায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের কাম্য বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় কাহারও উপর কোনরূপ বিদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, মানুষ কখনও সমষ্টিগত অথবা রাষ্ট্রগত ভাবে স্বাধীন হইতে পারে না ; এবং সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্য-ক্ষম ব্যক্তির হস্তে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা নিপতিত হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম।

স্বাধীনতা-সম্বন্ধীয় আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি সহজবোধ্য করিতে হইলে আরও বিস্তৃতভাবে উহার আলোচনার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধে উহা করা সম্ভব নহে।

আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া উঠা সহজসাধ্য হউক আর না-ই হউক, ভাষাবিজ্ঞানানুসারে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা লাভ করিয়া রাষ্ট্রগত ভাবে মানুষ যে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হইতে পারে না, ইহা মানুষ স্বীকার করুক আর নাই করুক, ভারতবর্ষে যেদিন হইতে স্বাধীনতা অথবা স্বরাজের দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে ইংরাজ-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই দিন হইতেই যে কংগ্রেসের পবিত্র মিলন-মণ্ডপ হইতে ইংরাজ ও মুসলমানগণের দূরতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

১৯৩৫ সালের সংস্কৃত আইনের Provincial

Autonomy দেখিলে রাষ্ট্রগত প্রাদেশিক উন্নতির গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে বটে, ঐ সংস্কৃত আইনানুসারে কার্য্য করিলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ সংস্কৃত আইনের দ্বারা ভারতবাসীকে যে কোনরূপ "স্বাধীনতা" দেওয়া হয় নাই—তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরন্তু চিন্তার ধারা পরিবর্ত্তন না করিয়া এক্ষণে ভারতবাসিগণ যেরূপ ভাবধারাতে চলিয়াছেন, সেই ভাবধারা চলিতে থাকিলে তাঁহাদের পরাধীনতা-নিগড় যে আরও দৃঢ়তর হইবে, তাহার সাক্ষ্য ভবিষ্যৎ প্রদান করিবে।

বর্ত্তমানে, স্বাধীনতা বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝা যায়, তাহাতে ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভ করার অপর নাম ইংরাজকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করার চেষ্টা। ভারতবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভ করিবার নামে ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হওয়া অবধি ভারতবাসিগণ যাহাতে সর্ব্ব-সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হইয়া অধিকতর বলশালী না হইতে পারে— তাহার চেষ্টাও অপর পক্ষ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের গত এক শত বৎসরের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের পক্ষ হইতে স্বাধীনতা লাভ করিবার নামে ইংরাজকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের মধ্যে কোন সম্প্রদায়গত নির্ব্বাচন অথবা সম্প্রদায়গত কোন অধিকারের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং ততদিন পর্য্যন্ত সম্প্রদায়গত দলাদলিও এত তীব্রতা লাভ করিতে পারে নাই। অথচ, বর্ত্তমান স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে ভারতবাসিগণের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা নিকটবর্ত্তী হওয়া তো দূরের কথা, ঐ স্বাধীনতা হইতে ক্রমশঃই তাহাদিগকে অধিকতর দূরে অপসারিত হইতে হইতেছে।

এক কথায়, বর্ত্তমান স্বাধীনতার আন্দোলন, ভারতবাসী জনসাধারণের পক্ষে কোনরূপ হিতকারী হয় নাই, পরন্তু অনিষ্টকারী হইয়াছে।

কাযেই, উহা পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিলে ভারতবাসীর পক্ষে কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। পরন্তু, স্বাধীনতার আন্দোলন ও ইংরাজ-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে সমভাবে ইংলণ্ডের, ইংরাজের, ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বর্ত্তমান সমস্যাসমূহ তিরোহিত হইতে পারে, তদুচিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ভারতবাসী জনসাধারণের ঐক্যবন্ধনের আশা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

ভারতবাসিগণের ঐক্যবন্ধনের সম্ভাবনা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে হইলে এইরূপ ভাবে প্রধানতঃ যে যে কারণে ভারতবাসিগণের অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দূর করিয়া লইয়া যে যে কার্য্যে জনসাধারণের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রহিয়াছে, সেই সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ কার্য্যে জনসাধারণের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, অন্তরীণদিগের মুক্তিতে, অথবা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনে, অথবা খদ্দরের প্রচলনে, অথবা স্বহস্তে সূতা কাটায় ভারতবর্ষের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিদ্যমান নাই, পরন্তু উহা কোন কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধী এবং তাহাতে প্রকারান্তরে মনে মনে দলাদলির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। খাদ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশে বুদ্ধিমানের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। যাঁহারা ছাগদুগ্ধে জীবনধারণ করিবার অন্যতম উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃত মনুষ্যোপযোগী প্রকৃষ্ট বুদ্ধি অর্জ্জন করা সম্ভব নহে এবং দলাদলি সম্বন্ধে উপরোক্ত সত্য তাঁহাদের পক্ষে বুঝিয়া উঠাও সম্ভব নহে বটে, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের উদ্ভব হইয়া অন্ততঃ পক্ষে মানসিক দলাদলি বৃদ্ধি পাওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বাস্তব সত্য। নিম্নলিখিত কার্য্যে যে জনসাধারণের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

(১) যাহাতে জনসাধারণের আর্থিক প্রাচুর্য্য হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(২) যাহাতে জনসাধারণ চাকুরী না করিয়া স্বাবং-

জনে আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

(৩) যাহাতে জনসাধারণের কাহারও মানসিক অশান্তি না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৪) যাহাতে জনসাধারণের কাহারও মানসিক অসন্তুষ্টি না হয় এবং প্রত্যেকের মানসিক অসন্তুষ্টি দূর হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৫) যাহাতে জনসাধারণের কাহারও অকালবার্দ্ধক্য না হয় এবং প্রত্যেকের অকালবার্দ্ধক্য দূর হয় তাহার ব্যবস্থা।

(৬) যাহাতে জনসাধারণের কাহারও অকালমৃত্যু না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

উপরোক্ত ছয়টি ব্যবস্থায় যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা যে, উপরোক্ত ছয়টি ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, তাহা আধুনিক কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তকে পাওয়া যায় না।

কাজেই বলিতে হইবে যে, যে ছয়টি ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যে ছয়টি ব্যবস্থা সম্পাদিত করিতে পারিলে মানুষের ঐক্যবন্ধন অটুট হইতে পারে, সেই ছয়টি ব্যবস্থার জ্ঞান আধুনিক মনুষ্যসমাজে সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান নাই এবং তাহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজকে গবেষণার দ্বারা আবিষ্কার করিতে হইবে।

আমাদের মনে হয়, নবাব বাহাদুর যদি ঐ ছয়টি ব্যবস্থার জ্ঞান আবিষ্কার করিবার জন্য ছয়টি পৃথক্ পৃথক্ কমিটী গঠিত করিতে পারেন এবং ঐ ছয়টি কমিটী যদি তাঁহাদের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে একদিকে যেরূপ ভারতবাসী জনসাধারণের ঐক্যবন্ধন সুনিশ্চিত হইবে, অন্যদিকে আবার ভারতবাসী সমগ্র বিপন্ন মনুষ্যসমাজকে প্রকৃত মুক্তির উপায় দেখাইয়া দিয়া তাহাদিগের মনোরাজ্যে প্রকৃত সম্রাটের স্থান লাভ করিতে পারিবে।

আমাদের কথা আর কতদিন মানুষে না বুঝিয়া থাকিতে পারিবে?

দেশের কাজ ও সভাসমিতি

গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য তিনটি সভা হইয়া গিয়াছে। একটি—লক্ষ্ণৌ-এ মুসলেম লীগের অধিবেশন, দ্বিতীয়টি—বহরমপুরে মুসলমানদিগের অধিবেশন এবং তৃতীয়টি—কলিকাতায় কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন। এই তিনটি সভায় যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে—অথবা যে সমস্ত কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান অবস্থায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের অথবা ভারতবাসীর কোন উপকার হইবে, কি না, অথবা কতখানি উপকার হইবে, তাহার আলোচনা করা আমাদের সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। মনে রাখিতে হইবে, উপরোক্ত তিনটি সভা হইতে গৌণ ভাবে ভারতবর্ষ অথবা ভারতবাসীর কোন উপকার হইবে কি না, অথবা কতখানি উপকার হইবে, তাহার আলোচনা করা এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে। পরন্তু, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য সাক্ষাৎভাবে কোন উপকার হইবে কি না, অথবা কতখানি উপকার হইবে, তাহার আলোচনা করা; কারণ, কর্ম্ম-দর্শন অথবা কার্য্য-দর্শন (Philosophy of কর্ম্ম) অনুসারে গৌণভাবে কোন না কোন উপকার না হয়, এমন কোন কার্য্য নাই এবং রোগী যখন মুমূর্ষু, তখন গৌণভাবে তাহার কোন উপকার সাধনার্থ তাহাকে কান ঔষধ দেওয়া চিকিৎসা-নিপুণতার পরিচয় নহে।

ঐ তিনটি সভা হইতে দেশের ও দেশবাসীর কোন উপকারের আশা করা যায় কি না, অথবা কতখানি উপকারের আশা করা যায়, তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদের মতে, প্রথমতঃ, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের ও দেশবাসীর অভাব-মোচনের জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, দ্বিতীয়তঃ, দেশের ও দেশবাসীর অভাব-মোচনের জন্য যে যে কার্য্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা

সাধন করিবার উপায় কি কি, তৃতীয়তঃ, যে যে উপায়ে দেশ ও দেশবাসী তাঁহাদের বর্ত্তমান অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তাহার সহায়ক, অথবা তদ্বিরুদ্ধ কোন কার্য্য, অথবা তাহার আলোচনা উপরোক্ত তিনটি সভায় গৃহীত হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের ও দেশবাসীর অভাবমোচনের জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হইলে কোন্ কোন্ অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক-সংখ্যক দেশবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম ব্যাপকতার সহিত নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সন্ধানে যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। কোন্ কোন্ অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক দেশবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম ব্যাপকতার সহিত নিপীড়িত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বত্র প্রায় সমস্ত স্তরের মানুষ নিম্নলিখিত তিনটি অভাবে অল্পাধিক পরিমাণে জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যথা :—

(১) অর্থাভাব ;

(২) স্বাস্থ্যাভাব ;

(৩) মানসিক শান্তির অভাব।

পাঠক, বর্ত্তমান ভারতবর্ষে অর্থাভাব, অথবা স্বাস্থ্যাভাব, অথবা মানসিক শান্তির অভাবশূন্য মানুষ আপনি কয়জন দেখিয়াছেন ?

সমাজ যাঁহাদিগকে ধনিক স্তরের বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া থাকে, সেই মহা-মহারাজা, মহারাজা, রাজা, জমীদার, মহাজন, শিল্প ও বাণিজ্যের মালিকগণ, জজ, মন্ত্রী প্রভৃতি চাকুরীয়াগণ, বড় বড় উকীল, ব্যারীষ্টার ও ডাক্তারগণের বিভিন্ন অবস্থার কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, একে ত' ইহাঁদের সংখ্যা দেশের সমগ্র লোক-সংখ্যার তুলনায় অতীব নগণ্য, বোধ হয় শতকরা ৪½ জনও হইবেন কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, তাহার পর আবার ইহাঁদের সমগ্র সংখ্যার শতকরা ৯৯½ জনেরই ঋণভার প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাস্তবতঃ ইহাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, মূল্যবান্ মোটরগাড়ী ও দাস-দাসী আছে বটে, কিন্তু ব্যাঙ্কার অথবা মহাজনের তাড়নায় বিন্দুমাত্রও বিব্রত নহেন, এমন ব্যক্তির সংখ্যা ইহাঁদের মধ্যে অতীব অকিঞ্চিৎকর। ইহাঁদের মধ্যে কতজন অর্থাভাব বশতঃ হতাশ্বাস হইয়া পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আত্মহত্যা করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সংখ্যাও একান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে। ইহাঁরা প্রায়শঃ অর্থাভাবে যেরূপ ক্রমশঃই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন, সেইরূপ স্বাস্থ্যাভাবও ইহাঁদের মধ্যে অন্যান্য স্তরের লোকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকতর ব্যাপক। ইহাঁদের মধ্যে খুব কম পরিবারই পাওয়া যাইবে, যেখানে জ্যেষ্ঠ সহোদরকে কনিষ্ঠের মৃত্যুর জন্য, অথবা পিতাকে পুত্রের মৃত্যুর জন্য, অথবা স্বামীকে সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুর জন্য, অথবা নিজেকে অজীর্ণ কিংবা বহুমূত্রাদি কিংবা রক্তচাপের রোগের জন্য বিব্রত হইতে হয় না।

যাঁহাদিগকে আমরা মধ্যবিত্ত বলিয়া থাকি, সেই জোতদার, মধ্যবিত্ত মহাজন, মধ্যবিত্ত শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রোফেসর প্রভৃতি মধ্যবিত্ত চাকুরীয়াগণ, মধ্যবিত্ত উকীল, ব্যারীষ্টার ও ডাক্তারগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে, পুঁটি মৎস্যের লম্ফনের মত, বাস্তবতঃ ইহাঁদের অনেকেরই চালচলন দেখিলে উহাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাচুর্য্য ভোগ করিতেছেন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইহাঁরা প্রায়শঃ চির-প্রবাসী ভাড়াটিয়া-গৃহবাসী। ইহাঁদের শতকরা ৯৯ জনের মৃত্যুর পর স্ত্রীকন্যার ভরণপোষণের যে ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে, তাহা প্রায়শঃ হৃদয়-বিদারক। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা জীবদ্দশায় স্ব স্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহাও প্রায়শঃ ঋণদায়ে আবদ্ধ থাকে। জগতে যে সমস্ত ভীষণ ভীষণ দণ্ডনীয় অপরাধ ঘটিয়া থাকে, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার শতকরা নব্বইটি এই মধ্যবিত্তগণের দ্বারাই সম্পাদিত হয় এবং তাহার মূলে অর্থাভাবের, অথবা কাম-ক্রোধাদির তাড়না বিদ্যমান থাকে।

মধ্যবিত্তগণের মধ্যে স্বাস্থ্যাভাব ও শক্তির অভাবের তাড়নাও যথেষ্ট, তাহা মধ্যবিত্তগণের মৃত্যুহার ও মৃত্যুর বয়স পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে।

এতাদৃশ ভাবে সমগ্র মানব-সমাজকে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও মানসিক শান্তির অভাব এতাধিক পরিমাণে নিপীড়িত করিতে সক্ষম হইতেছে কেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে

দেখা যাইবে যে, অর্থাভাবের মুখ্য কারণ, প্রথমতঃ, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীন কৃষিকার্য্যে লাভবান্ হওয়ার অক্ষমতা, তৃতীয়তঃ, প্রয়োজনাধিক শিল্প-বাণিজ্য-প্রবণতা এবং পরিশেষে বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির নামে একটা প্রতারণামূলক কুজ্ঞানের পরিকল্পনা।*

স্বাস্থ্যাভাবের কারণ কি, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ "স্ব" বস্তু কি তাহার আমূল জ্ঞানের, অথবা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞানের অভাব। বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান বিদ্যমান নাই বলিয়া ফিজিওলজি ও অ্যানাটমীর নামে প্রায়শঃ কতকগুলি কাল্পনিক কথা চলিয়া যাইতেছে এবং মানুষের রোগ নির্ণয় করা, কোন্ খাদ্য ও পানীয় সর্ব্বতোভাবে দোষ-মুক্ত, তাহা স্থির করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষের এতাধিক শান্তির অভাবের কারণ কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব এবং দ্বিতীয় কারণ, প্রকৃত মনস্তত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের অভাব।

বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের ও দেশবাসীর অভাব মোচনের জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, অর্থাভাব দূর করিতে হইলে, প্রথমতঃ, যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে হইবে ও তজ্জন্য দেশের সমগ্র নদী ও খাল-গুলিতে যাহাতে বার মাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে এবং এতদর্থে সমগ্র নদীগুলিকে উৎপত্তি-স্থান হইতে সাগর-সঙ্গম-স্থানাবধি উহার বালুকাস্তর পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে ধনের অসমান বিতরণ যাহাতে অসম্ভব হয়, তদ্ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে এবং এতদর্থে কৃত্রিম মুদ্রা, অর্থাৎ ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা করিতে হইলে বর্ত্তমান ডাক্তারগণের পাশ্চাত্ত্য অ্যানাটমী ও ফিজিওলজি এবং তৎসঙ্গে উহাদের ফিজিক্স্ ও কেমেষ্ট্রী যে সর্ব্বতোভাবে অবিশ্বাসযোগ্য, তাহা যেমন মনুষ্যসমাজকে বুঝাইবার জন্য একদিকে চেষ্টা করিতে হইবে, সেইরূপ আবার সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য অ্যানাটমী, ফিজিওলজী, ফিজিক্স্ ও কেমেষ্ট্রী কিরূপ ভাবে মনুষ্যসমাজ পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তজ্জন্য গবেষণার প্রয়োজন হইবে।

মানসিক শান্তির অভাব দূর করিবার জন্য কোন্ কোন্ কার্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইবে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সম্যক্ ভাবে দূরীভূত করিতে না পারিলে মানসিক অশান্তি কোন ক্রমেই দূরীভূত করা সম্ভব হয় না। কাজেই মানবসমাজের মানসিক অশান্তির কারণসমূহ যাহাতে বিনষ্ট হয়, তাহা করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে;

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যে কি বস্তু এবং উহা কি করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে ও শিখাইতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, মানুষের ধরম্ ও ধর্ম্ম যে কি বস্তু, এবং উহার অস্তিত্ব মানবদেহে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় কি, তাহা শিক্ষা করিতে হইবে এবং মানুষ যে মানুষ, মানুষে মানুষে বাহ্যতঃ পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ যে কোন পার্থক্য নাই, ইহা যাহাতে মানুষ বুঝিতে পারিয়া মানবধর্ম্মের সার্থকতা অনুভব করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

দেশ ও দেশবাসীর অভাব-মোচনের জন্য যে যে কার্য্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উপরে দেখান হইল, তাহা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় সাধন করিবার উপায় কি কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, ঐ জন্য সর্ব্বাগ্রে সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণ যাহাতে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, একদিকে যেরূপ তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞান যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য ও উহা যে বস্তুতঃ কু-জ্ঞান-প্রসূত, তাহা যাহাতে নেতৃবর্গ বুঝিতে পারিয়া আত্মপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তজ্জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

---

* মানবসমাজে, তথা ভারতবর্ষে এতাধিক অর্থাভাবের উদ্ভব হইল কেন, এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে পরিজ্ঞাত হইতে চাহেন তাঁহারা বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

কাজেই, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন সভার কার্য্য যথাযথ ভাবে নির্ব্বাহ হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে ঐ সভায় প্রথমতঃ, সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের ঐক্যবন্ধনের হানিকর কোন কার্য্য অথবা কোনরূপ আলোচনা সংঘটিত হইয়াছে কি না এবং দ্বিতীয়তঃ, নেতৃবর্গ যাহাতে আত্ম-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তদনুরূপ কোন কার্য্য অথবা কোন আলোচনা শুনা গিয়াছে কি না, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

লক্ষ্ণৌ-এর মুসলেম লীগের অধিবেশনে যে যে কার্য্য ও আলোচনা স্থান পাইয়াছে, তন্মধ্যে মিঃ জিন্না ও ফজলুল হকের বক্তৃতা এবং নিম্নলিখিত রিজলিউসন (প্রস্তাব)-সমূহ উল্লেখযোগ্য :—

(১) বিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দায়িত্বপূর্ণ গবর্ণমেণ্টের পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার প্রচেষ্টা মূলনীতি (creed)-স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ;

(২) লীগের সংগঠন-সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনের প্রস্তাবসমূহ, যথা,—

(ক) এক টাকার পরিবর্ত্তে লীগের সভ্য হইবার চাঁদা দুই-আনা হারে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ;

(খ) আগে যেরূপ জনসাধারণ সাধারণ ভাবে লীগ কাউন্সিলের মেম্বর নির্ব্বাচন করিতেন, তাহা না করিয়া জিলা-লীগ হইতে প্রাদেশিক লীগ এবং প্রাদেশিক লীগ হইতে নিখিল ভারতবর্ষীয় লীগের সভ্য নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব ;

(গ) লীগ-কাউন্সিলে সভ্যসংখ্যা ৩১০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪৬৫টি করিবার প্রস্তাব, ইত্যাদি ;

(৩) উর্দ্দূকে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা-রূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ,

(৪) "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত যাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত না হয়, তাহার প্রস্তাব।

ইহা ছাড়া, স্যার ওয়াজির হুসেন এবং মিঃ ইয়াকুব হোসেনকে লীগ হইতে তাড়াইয়া দেওয়ার পরিকল্পনা লক্ষ্ণৌ মুসলেম লীগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য্য।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের ও দেশবাসীর বিবিধ অভাব দূর করিতে হইলে যে যে কার্য্য ও ব্যবস্থা প্রয়োজন, তাহা সাধন করিবার জন্য যাদৃশ ঐক্যবন্ধন ও নেতৃবর্গের আত্মপরীক্ষার প্রচেষ্টার আবশ্যকতা আছে বলিয়া উপরে দেখান হইয়াছে, তাহার কোন সাক্ষ্য উপরোক্ত চারিটি প্রস্তাবে পাওয়া যায় কি না, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্ণৌ মুসলিম লীগে দেশবাসী জনসাধারণের ঐক্যবন্ধনের প্রচেষ্টা হওয়া তো দূরের কথা, উহাতে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশবাসী জনসাধারণের দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যান্তর্গত দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্টের স্থলে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করায় পরোক্ষভাবে বৃটিশারগণের প্রতি বিদ্বেষ দেখান হইয়াছে এবং ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে হইলে বৃটিশারগণের যাহাতে ভারতবর্ষ অথবা ভারতবাসীর উপর কোনরূপ প্রভুত্ব বিদ্যমান না থাকে তাহা করিতে হইবে। ভারতবর্ষ অথবা ভারতবাসীর উপর বৃটিশারগণের যে প্রভুত্ব বিদ্যমান আছে, তাহা যাহাতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, বৃটিশারগণকে ছোট করিয়া তদনুরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, বৃটিশারগণের সহিত যে শত্রুতার কার্য্যে নিমগ্ন হইতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। তখন, ভারতবাসিগণ যাহাতে প্রবল না হইয়া হীনবল হয় এবং তাহাদের মধ্যে যাহাতে অধিকতর দলাদলির উদ্ভব হয়, তাহার চেষ্টা করা বৃটিশারগণের পক্ষে স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কাজেই, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে যে দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া অনিবার্য্য, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

এইস্থানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে যদি বৃটিশারগণের সহিত শত্রুতা করা অনিবার্য্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা না করিয়া ভারতবাসিগণের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে কি প্রকারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, দেশের ও দেশবাসীর উপর প্রভুত্ব অর্জ্জন করিবার উপায় দ্বিবিধ।

ব্রিটিশারগণের যে প্রভুত্ব দেশের ও দেশবাসীর উপর বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা যাহাতে বজায় থাকে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের নির্দ্দেশমত উপায়ে সহায়তা করিয়া

তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ও প্রকল্পিত ব্যবস্থায় যে দেশের ও দেশবাসীর কোন অভাবই যথাযথ ভাবে মোচন করা সম্ভব নহে, তাহা বৃটিশারগণকে ও দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা এবং যে যে ব্যবস্থায় দেশের ও দেশবাসীর প্রত্যেক অভাবটি সম্যক্ ভাবে দূরীভূত হইতে পারে, গবেষণার দ্বারা তাহার নির্দ্ধারণ করা—আমাদের মতে—বর্ত্তমান অবস্থায় দেশ ও দেশবাসীর উপর প্রভুত্ব অর্জ্জন করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট উপায়।

ইহা ছাড়া, ব্রিটিশারগণের হাত হইতে শারীরিক বল, অথবা চাতুরী, অথবা ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত ব্যবস্থার উপর তাঁহাদের যে প্রভুত্ব বিদ্যমান আছে, তাহা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করা—প্রভুত্ব অর্জ্জন করিবার অন্যতম উপায়।

১৯০৬ সাল হইতে কংগ্রেস উপরোক্ত দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু, তাহাতে যে কোন ফলোদয় হয় নাই, পরন্তু দেশের মধ্যে দলাদলি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই নয়নগোচর হইবে। এই দ্বিতীয় পন্থাটি আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতা লাভ করিবার একটি পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহার দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

প্রথমোক্ত পন্থানুসারে কার্য্য করিলে ব্রিটিশারগণের সহিত কোন শত্রুতা অথবা বিবাদ-বিসংবাদ করিবার কোন হেতু থাকে না। উহাতে ইংরাজ ও ভারতবাসীর পরস্পরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতা সাধন করিতে হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় যে এখনও ভারতবাসীর পক্ষে পাশ্চাত্যগণকে অনেক কিছু শিখাইবার আছে এবং উহাদ্বারা এখনও যে ভারতবাসিগণের পক্ষে পাশ্চাত্য মানুষগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের মনোরাজ্যের উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করা সম্ভব, তাহা শুনিলে হয় ত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পণ্ডিতগণ তাঁহাদের বিদ্যার অকৃতকার্য্যতা শুনিয়া যতই শিহরিয়া উঠুন না কেন, পাশ্চাত্য মানুষগণ গত ১৫০ বৎসর ধরিয়া যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতকগুলি পরীক্ষা মাত্র সাধন করিয়াছেন, তাহাতে যে মানবজাতির কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই, পরন্তু সমাজের বিকৃত গঠন ও খাদ্যাদির অভাবের জন্য সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে, তাহা এক ভারতবর্ষের গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানী ছাড়া প্রায় প্রত্যেক দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মানুষটি খাদ্যাদির অভাব হইতে মুক্ত হইয়া কাহারও চাকুরী না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সামাজিক কোন্ সংগঠন অবলম্বন করিলে মানুষের পক্ষে প্রকৃত শিক্ষা সহজসাধ্য ও অনায়াসলব্ধ হইয়া শান্তি ও সন্তুষ্টির সহিত দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মস্তিষ্ক যে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন্ কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক দেশের মানুষ প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা বলশেভিজম্, কমিউনিজম্, ফ্যাসিজম্, নাৎসিজম্, সোস্যালিজম্ প্রভৃতি আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাদগুলি তলাইয়া বিশ্লেষণ করিতে পারিলে প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ পক্ষে উপরোক্ত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কোন সমীচীন ব্যবস্থা ৫।৭ বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত না হইলে মানবজাতির ধ্বংস এত প্রকট হইয়া পড়িবে যে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এতাদৃশ ব্যবস্থার আবিষ্কার করা, প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের খেলা। ঐ ব্যবস্থা আধুনিক পাশ্চাত্য দেশের কোন দেশেই কোন ভাষায় পাওয়া যাইবে না বটে, উহা যে বেদে অথবা বাইবেলে অথবা কোরাণে লিখিত আছে, তাহাও আজকাল-কার টিকিধারী পণ্ডিতগণ অথবা পাদ্রীগণ অথবা মৌলভীগণ বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইতে প্রমাণ করা সম্ভব নহে বটে, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত অথবা হিব্রু অথবা প্রাচীন আরবী ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানবজাতিকে তাহার টলটলায়মান অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইবে কি প্রকারে, তদীয় ব্যবস্থা ঐ তিনখানি গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং উহা বেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণের সহায়তা সাধনা ব্যতীত আধুনিক

জগতের বিকৃত মস্তিষ্কপ্রসূত পরীক্ষার দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব নহে।

আমাদের কথা হয়ত অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না এবং কেহ কেহ হয়ত একটু মুচকি হাসি হাসিয়া লইয়া ঐ স্ব স্ব প্রবীণতার দাবী উস্‌কাইয়া লইতে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না, কিন্তু অদূরভবিষ্যৎ যে আমাদের উপরোক্ত উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সমগ্র মানবজাতিকে প্রবুদ্ধ করিবে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

প্রাচীন সংস্কৃত অথবা প্রাচীন হিব্রু অথবা প্রাচীন আরবী ভাষা—এই তিনটি ভাষার যে কোনটি যথাযথভাবে শিক্ষা করিয়া বেদ অথবা বাইবেল অথবা কোরাণ, এই তিনখানি গ্রন্থের যে কোন গ্রন্থ ভাষার প্রকৃতিজাত অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, মানবজাতির বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রকারের সমস্যার যথাবিহিত সমাধান করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু মানবের ভাষার যে বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী ভাষা ঠিক ঠিক ভাবে জানা যাইতে পারে তাহা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বর্ত্তমান কালে পাওয়া যাইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে এবং যাঁহারা ভারতবর্ষের মাটী, জল ও বায়ুতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে কখনও উহা আয়ত্তাধীন করা সম্ভব হইবে কি না, তাহাও সন্দেহের যোগ্য। আলোকাধারে ও তাহার বিভিন্ন স্থানের অবস্থানের তারতম্যানুসারে যেরূপ গৃহের ঐ ঐ স্থানের দীপ্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ সূর্য্যের ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থানের তারতম্যানুসারে ঐ ঐ দেশের মানুষের মস্তিষ্কের ও প্রজনন-শক্তির তারতম্য হওয়া স্বভাবের নিয়ম। কাজেই, যাহা ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে সম্ভব, তাহা গ্রেট-ব্রিটেনের লোকের পক্ষে সম্ভব না-ও হইতে পারে, আবার যাহা গ্রেট-ব্রিটেনের লোকের পক্ষে সম্ভব, তাহা ভারতবর্ষের লোকের পক্ষে অসম্ভব-যোগ্য হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ ইংরাজীপড়া টিয়া-পাখীর দলের অদ্ভুত নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত খাঁটি ভারতবর্ষীয়-ভাবাপন্ন মানুষে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রথম পন্থা যে কি, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত মানবজাতির প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হওয়া তো দূরের কথা, যে যে পন্থায় সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক মানুষের খাদ্যাদির অভাব দূর হইতে পারে, তাহা পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইবে না।

আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি ভাবিয়া দেখিলে, মুসলেম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের প্রথম প্রস্তাবটি যে কোন রকমেই দেশের ও দশের কল্যাণজনক নহে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

লীগের প্রথম প্রস্তাবটি যেরূপ দেশবাসিগণের মধ্যে অনৈক্যের উৎপাদক হইবে, তাহার সংগঠন-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি তাদৃশভাবে অনিষ্টকর হইবে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সাধারণ ভাষা-সম্বন্ধীয় তাহার তৃতীয় প্রস্তাবটি অস্বাভাবিক এবং ঐ জাতীয় মনোবৃত্তিতেও মানুষের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যাঁহারা মানবজাতির ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্যমাত্রও লক্ষ্য করিবার অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে স্থানের দূরত্বানুসারে ভাষার পার্থক্য হওয়া অনিবার্য্য এবং সমগ্র পৃথিবী, অথবা সমগ্র দেশ তো দূরের কথা, কোন একটি সমগ্র প্রদেশের সমস্ত মানুষ ঠিক ঠিক এক ভাবে কোন ভাষা ব্যবহার করে না। কাজেই সমগ্র দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি মাত্র ভাষা প্রচলন করিবার চেষ্টা করা স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্য। তাহাতে কোন সুফল উদয় হওয়া সম্ভব নহে। ইহা যে আজকালকার তথাকথিত ভাষাবিদ্‌গণ বুঝিতে পারেন না, উহাই বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিজ্ঞানের অকৃতকার্য্যতার সাক্ষ্য। যাঁহারা প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞানের 'ক' 'খ' শিখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, বিভিন্ন প্রদেশের সমগ্র মানুষের মধ্যে একটি মাত্র ভাষা সর্ব্বতোভাবে এক রকমে প্রচলিত করিতে পারা সম্ভব-যোগ্য নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের অথবা বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, প্রত্যেক ভাষাটি যাহাতে প্রত্যেক মানুষ বুঝিতে পারে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা সম্ভব। যাঁহারা জন্মকাল হইতে উর্দ্দু ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে মারাঠী ভাষা অথবা ইংরাজী ভাষা অথবা ফরাসী ভাষায় ঠিক ঠিক ভাবে

কথা কওয়া, অথবা যাঁহারা জন্মতঃ ইংরাজী-ভাষী, তাঁহাদের পক্ষে উর্দ্দু অথবা মারাঠী প্রভৃতি ভাষায় ঠিক ঠিক ভাবে কথা কওয়া সম্ভব নহে বটে, কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে প্রত্যেকের পক্ষে অপরের ভাষা সঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।

কাযেই, লীগের অধিনায়কগণ যদি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটিমাত্র ভাষার প্রচলন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া, যে উপায়ে বিভিন্ন ভাষাভাষিগণের ভাষা সকলের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগের নিকট সানন্দে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতাম।

তাঁহারা হয় ত বলিবেন যে, তাঁহারা যেরূপ উর্দ্দুকে সমগ্র ভারতবাসীর ভাষারূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, সেইরূপ কংগ্রেসপন্থিগণও হিন্দীকে সমগ্র ভারতবাসীর ভাষারূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কাজেই, তাঁহারা কংগ্রেসপন্থিগণের অপেক্ষা কোন ক্রমেই অধিকতর নিন্দনীয় হইতে পারেন না।

মুসলেম লীগের অধিনায়কগণ যে কোন ক্রমেই কংগ্রেস-নেতৃবর্গের তুলনায় অধিকতর নিন্দনীয় নহেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ যেরূপ অজ্ঞতাবশতঃ দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, মুসলেম লীগের অধিনায়কগণও যে ঠিক ঠিক তাহাই করিতেছেন, ইহা সপ্রমাণিত হইলে লীগের অধিনায়কগণের পক্ষে কোনরূপ গৌরবের কারণ ঘটিবে কি?

"বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত যাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত না হয়, ইহাই লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের চতুর্থ প্রস্তাব। এই প্রস্তাবেও দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা আছে। একমাত্র "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতকে লক্ষ্য না করিয়া কোন সঙ্গীতই যাহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীতরূপে গৃহীত না হয় এবং জাতীয় উন্নতির গবেষণার জন্য যে সমস্ত পবিত্র অধিবেশন হইবে, তাহাতে যাহাতে কোনরূপ তীব্র রঙ্গ অথবা তীব্র রসের স্থান না হয়, তাহার প্রস্তাব যদি লীগ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে আমাদের মতে লীগের অধিনায়কগণ দূরদর্শিতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেন।

কোনরূপ গভীর গবেষণার কার্য্য কিরূপ ভাবে সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কোনরূপ তীব্র রসের বস্তু আস্বাদন করিলে, অথবা কোনরূপ তীব্র রসের কবিতা পাঠ করিলে,অথবা কোনরূপ তীব্র রসোৎপাদক ভাবে কোন গান গাহিলে, ঐ তীব্র রসবশতঃ হৃদয় এতাদৃশ ভাবে আন্দোলিত হয় যে, ঐ রসেই উহা আপ্লুত হইয়া পড়ে এবং অন্য কোন কার্য্যের, অথবা চিন্তার সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইহারই জন্য সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ প্রাচীন কালে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মালোচনায় তীব্র রসোৎপাদক সঙ্গীত ও বাদ্য নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমানগণের মধ্যে এখনও ঐ প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুর ধর্ম্ম অথবা মানবধর্ম্মাবলম্বিগণের পূজা ও উৎসব কি বস্তু, তাহা যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মুসলমানগণের উপাসনাকালে সঙ্গীত ও বাদ্য যেরূপ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ, মানব-ধর্ম্ম অথবা মানব-ধর্ম্মাবলম্বিগণের উৎসব-কালে ঢক্কা, কাঁসর ও ঘণ্টানিনাদে উৎসবের কথা জনসাধারণকে জানাইয়া দিবার নির্দ্দেশ রহিয়াছে বটে, কিন্তু কি উৎসবকালে, অথবা কি পূজাকালে, সর্ব্বত্রই কোনরূপ রসের তীব্রতা উৎপাদক কোনরূপ সঙ্গীত, অথবা বাদ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

সম্-গীত ও সঙ্গীত এই দুইটি শব্দের অর্থে পার্থক্য কোথায়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কোন্ শব্দ কোন্ স্পর্শের দ্যোতক, তাহা ঠোঁট বন্ধ করিয়া জিহ্বার দ্বারা নিজে নিজে অনুভব করার নাম "সম্-গীত", আর ঠোঁট খুলিয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কোন রসের উদ্ভব করার নাম "সঙ্গীত"। "সম্-গীতে" আত্মতত্ত্বজ্ঞানার্জ্জন করিবার সহায়তা হয়, আর "সঙ্গীতে" কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহারই জন্য সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষগণ আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের, অথবা ব্রাহ্মণের পক্ষে "সম্-গীত" একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু "সঙ্গীত" সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা মনুসংহিতায় প্রবেশলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন যে, ঐ গ্রন্থের উপদেশানুসারে সঙ্গীত ও নৃত্যরত ব্রাহ্মণগণ অপাংক্তেয়।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তদনুসারে সঙ্গীত ও নৃত্য

কোন গভীর গবেষণার কার্য্যে যে নিষিদ্ধ, তাহা বুঝিতে হইবে বটে, কিন্তু উহা যে সর্ব্বত্র এবং সমস্ত স্তরের মানুষের পক্ষেই নিষিদ্ধ, তাহা নহে। যাঁহারা স্বভাবতঃ বদ্ধ, তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নহে, সেই শূদ্রগণের পক্ষে বরং উহা প্রশংসনীয়।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, তীব্ররসোৎপাদক কোন সঙ্গীত অথবা বাদ্য যে কেবলমাত্র মনুর ধর্ম্ম, অথবা কোরাণের নির্দ্দেশ অনুসরণকারিগণের জন্যই কোন গভীর গবেষণা-কালে নিষিদ্ধ ছিল, তাহা নহে, উহা বাইবেলের অনুসরণকারিগণের জন্যও একদিন নিন্দনীয় ছিল।

উপরোক্ত নির্দ্দেশের সার্থকতা কোথায়, তাহা না বুঝিতে পারায় মনুর ধর্ম্মাবলম্বিগণ যেমন নির্দ্দেশকে বিকৃত করিয়া দেবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য-সময়ে সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রচলন করিয়াছেন, সেইরূপ বাইবেলানুসারিগণের উপাসনার সময়ে সঙ্গীত ও বাদ্যের প্রচলন যে প্রাচীন হিব্রুভাষায় লিখিত প্রকৃত বাইবেল সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

যিনি "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতের প্রণেতা তিনি আমাদের মতে কালের সৃষ্টি : এবং মানবসমাজের প্রত্যেকের সম্মানার্হ। তাঁহার প্রচারিত ভাব খুব ব্যাপকভাবে বুঝিবার মত কাল এখনও মনুষ্যসমাজে উপস্থিত হয় নাই। তাই তাঁহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের সহিত অপর কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল বাঁদরের প্রণীত গ্রন্থের তুলনা করিতে বর্ত্তমান কালের যুবকগণ কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইহারই জন্য প্রকৃত বিদ্যার রাজ্যে প্রকৃত মানুষের এত অভাব অনুভবের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের মনে হয়, তাঁহার ঐ "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীতও গানের যোগ্য নহে। উহাও নিভৃতে অনুভব করিবার যোগ্য। কি করিয়া ঐ তথাকথিত সঙ্গীত নিভৃতে অনুভব করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, উহা হইতে যে ফলোৎপাদন করা সম্ভব হয়, উহাকে গান করিলে সেই ফল কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না। নিভৃতে অনুভব করিতে পারিলে বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" হইতে যাদৃশ অমৃত লাভ করা সম্ভব হয়, সঙ্গীতের দ্বারা তাহা হইতে পারে না বলিয়াই এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ঐ মন্ত্রের তথাকথিত উপাসনা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই। পরন্তু, যে অন্নাভাব ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রায়শঃ অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া পড়িতেছে, ভারতবাসী যে-মাতা, ভগ্নী, সহধর্ম্মিণী ও দুহিতাগণকে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখিয়াছিল, শিক্ষা ও চাকুরীর নামে তাহারা সেই মাতা, ভগ্নী প্রভৃতিকে প্রকাশ্যভাবে অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় নফরের কার্য্যে নিযুক্তা করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

আমাদের মনে হয়, কালের যে দুর্ল্লভ জ্ঞান-স্পর্শ "বন্দে মাতরম্"-এর প্রবোচক, তাহা সম্যক্ ভাবে জাগ্রত থাকিলে কি বঙ্কিমচন্দ্র, অথবা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন মনীষী উহা উচ্চৈঃস্বরে গাহিবার পদ্ধতির অনুমোদন করিতে পারিতেন না। আমাদের দৃষ্টিতে, কাল তাঁহার চিরন্তন প্রথা অনুসারে আবার মানুষের দুঃখ কি করিয়া দূরীভূত হইবে, তদ্বিষয়ে সাড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের ও "বন্দেমাতরম্"-এর মত কালের সৃষ্টি দেখা যায়।

কাল তাঁহার চিরন্তন প্রথানুসারে মানুষের দুঃখ দূর করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন বটে, কিন্তু মানুষ তাহার পাপবশে কালের ইঙ্গিত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না এবং প্রতিনিয়ত গরলকে অমৃত ও অমৃতকে গরল বলিয়া গ্রহণ করিয়া যাইতেছে এবং তাহারই জন্য রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মত বিভ্রান্তকারী মানুষ ও গীতাঞ্জলির মত অর্থহীন ও কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলাহীন রচনা মনুষ্যসমাজে শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন ও হইতেছে।

আমাদের মনে হয়, "বন্দে মাতরম্"কে গভীর অর্থযুক্ত করিয়াছেন স্বয়ং কাল, আর উহাতে সুর সংযোগ করিয়া উহার অমৃতোদ্ভবকারিত্ব নষ্ট করিয়াছেন মানবসমাজের পাপাবিষ্টতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের মত কোন উচ্ছৃঙ্খল তথাকথিত কবি।

উপরে মুসলেম লীগের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা দেখান হইল, তাহা হইতে বলা যাইতে পারে যে, লক্ষ্ণৌ-এর মুসলেম লীগে যে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার তিনটি যেরূপ ভারতবাসীর ঐক্যবন্ধনের বিঘ্নকর, অন্যদিকে আবার উহার কোনটিই নেতৃবর্গের আত্ম-পরীক্ষার সহায়ক নহে।

কাযেই, মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ-অধিবেশনের কার্য্য যে কোন ক্রমেই বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের কোন প্রকৃত কার্য্য করিতে হইলে যাহা করা উচিত, তাহার সহায়ক হয় নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে, শুধু যে মুসলেম লীগের কার্য্যই বিপরীত পথাবলম্বী হইয়াছে তাহা নহে, বহরমপুরে মুসলমানগণের এবং কলিকাতার নিখিল ভারতবর্ষীয় কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহারও প্রত্যেক কার্য্যটি সমান ভাবে বিভ্রান্তিকর ও সমানভাবেই নিন্দনীয়।

আমরা আর কত দিন ঘুমাইয়া রহিব?

আকাশ প্রদীপ

—শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হে নর-দেবতা রাম—ভারতের আদর্শ মানব—
রেখে গেছ কর্ত্তব্যের কি মহান্ কীর্ত্তি অভিনব
এইখানে, এই তীর্থে—জগতের এ মহা-ভারতে
মিলাইয়া সকলেরে এক নামে এক পুণ্য-ব্রতে।
জীবনের পাত্রখানি মহত্ত্ব-সুধায় পূর্ণ করি
ক্ষমায় দয়ায় ত্যাগে অফুরন্ত মধুচক্র গড়ি
রেখে গেছ এইখানে—যুগে যুগে নিখিলের তরে
তোমার সম্পদে আজো মানবের গেহ উঠে ভরে।
নিখিলের নরনারী সুখে-দুঃখে হায় নিশিদিন।
আঁখিজলে ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে তোমারে নবীন।
রেখেছে অমর করি প্রতি দিবসের প্রতি কাজে।
বসাইয়া একেবারে মরমের সিংহাসন মাঝে।
সত্যের প্রদীপ জ্বালি সংগোপনে গহনে প্রান্তরে।
পূজারীরা প্রতিদিন পূজে তোমা আপন অন্তরে।
জীবনের কোন কাজে কোনদিন কর নাই ছল,
কর্ত্তব্যে পর্ব্বত সম ছিলে তুমি অচল অটল।
হ'ক সে কঠিন যত—তবু তুমি সে কঠিন কাজে,
কর নাই কোন দ্বিধা ঝাঁপ দিতে আগুনেরো মাঝে।
বীর্য্যেরে করেছ তুমি প্রতি কাজে ক্ষমায় সুন্দর।
মিথ্যারে করেছ ঘৃণা—সত্য ছিল চির-সহচর।
স্নেহে কে কোমল এত, ঐশ্বর্য্যে কে চির-উদাসীন?
বিপদের মাঝে কে রে বজ্রসম এমন কঠিন?
শত্রুরে করেছ ক্ষমা পদে পদে তুমি মহাবীর,
সর্ব্ব বিপদের মাঝে সর্ব্বক্ষণ তুমি ছিলে স্থির।
ছোটরে করনি ঘৃণা কোন দিন তুমি অহঙ্কারে।
মিথ্যা দিয়ে ভেদ করি দেখ নাই ছোট করে তারে।
ক্ষুদ্রতারে চিত্তে তব কোন দিন দাও নাই স্থান,
সকল বিরোধ হ'তে মুক্ত ছিলে তুমি মহীয়ান।
'ব্রহ্মে'রে দেখনি কভু দূর ক'রে এ সংসার হ'তে,
সমন্বয় করেছিলে তাই তুমি সর্ব্ব মতে মতে।
সিংহাসন ছিল তব—হে রাজর্ষি—তপস্যার স্থান,
জীবনের সর্ব্বকর্ম্ম 'ব্রহ্মে' তুমি করেছিলে দান।
তোমারে বাঁধিতে তাই পারে নাই কর্ম্ম-মায়া-ফাঁদ,
প্রতি কার্য্যে প্রতি বাক্যে লভিয়াছ মুক্তির আস্বাদ।

একবিংশ বার যুদ্ধে করিল যে ক্ষত্রকুল ক্ষয়।
বীর্য্যে সে পরশুরামে হেলায় করিলা তুমি জয়।
আশাপথ চেয়ে থাকা শবরীর সে মধুর নিশা,
প্রেম দিয়া তুমি তাঁর মিটাইলে সর্ব্ব-প্রেম-তৃষা।
পাষাণও পেয়েছে প্রাণ তোমার চরণ-স্পর্শে জানি,
মুছে যায় তব নামে জীবনের সর্ব্ব পাপ-গ্লানি।
'ভয়ে শিলা জলে ভাসে'—সত্যেরে যে পেয়ে সত্যময়,
কোন অসম্ভব তাঁর কাছে—কখনও অসম্ভব নয়।
কীর্ত্তিরে চাহনি তুমি কীর্ত্তি তব ফিরিত পশ্চাতে,
মহিমার শুভ্র রাখী জয়-লক্ষ্মী বেঁধে দিত হাতে।
শ্রেষ্ঠ-পিতা শ্রেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ-পুত্র তুমি ধরণীর,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা তুমি, পতি তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।
তোমারে পেয়েছি মোরা জীবনের সর্ব্ব দিক দিয়া,
তাই তব পুণ্য নামে ভরে ওঠে নিখিলের হিয়া।
অন্তরের প্রেম দিয়া পলে পলে হে চির-প্রেমিক,
রচিলা যে অপরূপ স্বর্ণ-সীতা করে ঝিক্‌মিক্—
আলো করা তাঁরি রূপে—সেই তব সোনার প্রতিমা,
সেই নিরুপমা—রেখে গেছে নারীত্বের যে মহা-মহিমা
জীবনের প্রতি কাজে—নাহি হবে ওরে নাহি হবে
কোন দিন লুপ্ত তাহা যত দিন এ জগত রবে।
আজিও সরযূ ওই কুল কুল গায় অবিরাম,
কোথা সীতা, কোথা, সীতা কোথা সেই সীতাপতি রাম।
কোথা সীতা, কোথা সীতা, কাঁদে যত জগতের নারী,
কোথা রাম, কোথা রাম, কোথা গেলে আমাদের ছাড়ি।
আছে সে অযোধ্যা আজো, নাহি শুধু অযোধ্যার রাম,
আছে শুধু পুণ্য-স্মৃতি, আছে শুধু সেই পুণ্য-নাম।
হে সম্রাট্—তোমার সাম্রাজ্য গেছে কাল-স্রোতে ভেসে,
হয় তো বা আছ তুমি অন্য নামে অন্য কোন দেশে।
নূতনের মাঝে তবু সেই তুমি সেই পুরাতন,
আজো আছ সুখে দুঃখে বুকে বুকে আমাদের ধন।
ভুলি নাই—ভুলি নাই—তুমি শুধু আমাদের রাম,
তোমারে পেয়েছি তাই পূর্ণ আজি সর্ব্ব মনস্কাম।
নয়নের মণি তুমি, ললাটের তুমি পুণ্য-টিপ,
ভারতের নীলাকাশে মহিমার আকাশ-প্রদীপ।

ভূমিকম্প

—শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

হঠাৎ যে কি হইয়া গেল প্রথমটা বুঝিতে পারিলাম না। এবং যাহা হইয়া গেল তাহা হইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বোধ হয় অজ্ঞানই হইয়া ছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরিয়া পাইলাম, তখন সর্ব্বাঙ্গে একটা অদ্ভুত অবর্ণনীয় মৃদু বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। দু'একটা জায়গায় ছালচামড়া উঠিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু বুঝিলাম, ভগবানের কৃপায় অথবা অন্য কোন কারণে কোথাও হাড় ভাঙে নাই বা মচকায় নাই। মাথায় কিসের চোট লাগিয়া একটা জায়গা ফুলিয়া গিয়াছিল। রক্ত ঝরিতেছিল কি না, তাহা অন্ধকারে ভাল করিয়া বুঝিতে পারছিলাম না।

ব্যাপারটা এমন বিশ্রী রকম আকস্মিক ভাবে হইয়া গিয়াছিল যে, ওই ধরণের ব্যাপারে অনভ্যস্ত আমার মাথার ভিতরে এক মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্ত্তমান অবস্থার ঠিক আগেকার অবস্থাটা খুব পরিষ্কারভাবে মনে করিতে পারিতেছিলাম না। কেবল ভাসা-ভাসা ভাবে মনে পড়িতেছিল, কি যেন একটা কাজে একটা অতি পুরাতন দোতলা আধভাঙ্গা দালানের একতলার একটা ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম।

যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেখানকার কাঁপুনি তখন ভাল করিয়া থামে নাই। ব্যাপারটা ক্রমে যখন বোধগম্য হইল, তখন গায়ের রক্ত হিম হওয়া কাহাকে বলে, তাহা বুঝিলাম। ভূমিকম্পে দালানটা নামিয়া পড়িয়াছে পাতালের দিকে এবং জীবন্ত সমাধিলাভের সম্ভাবনাই আমার বেশী। উপরে একটু ফাঁক ছিল বাতাস আসিবার, সেই জন্য নিঃশ্বাস ফেলিবার বাতাস পাইতেছিলাম। ভয় হইতেছিল, কোন সময় ঐ ফাঁক-টুকু কোন রকমে পাছে বন্ধ হইয়া যায়, কারণ তাহা হইলেই দম আটকাইয়া ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে হইবে।

উদ্ধারের কোন উপায় দেখিলাম না; মনে হইল মৃত্যু অনিবার্য্য। স্বপ্ন দেখিতেছি কি না তাহা পরীক্ষা করিবার যতগুলি প্রচলিত ও অপ্রচলিত নিয়ম মনে আনিতে পারিলাম, সবগুলিই কাজে লাগাইয়া দেখিলাম যে, আমার দুরবস্থাটা স্বপ্ন নহে, কঠোর সত্য।

ভাবিতে লাগিলাম—হায়! আমি আজ যে ভাবে মাটীর তলায় চলিয়া আসিলাম, সেই ভাবেই হয়তো অতীতের গৌরব গুলি—যাহা আজকাল মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হইতেছে—মাটীর তলায় প্রবেশ করিয়াছিল!

ভাবিতে লাগিলাম, সীতাদেবীর ছিল বটে বুকের পাটা; এমন সাংঘাতিক জায়গায় তিনি সাধ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন!

ভাবিতে লাগিলাম—এখনকার সভ্যতা যখন অতীত হইয়া যাইবে, সেই সুদূর ভবিষ্যতে মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে প্রত্নতাত্ত্বিক খনকগণ হয়তো আমার দেহ পাইবেন। দেহ তো নয়, শুধু কঙ্কাল। আমার কঙ্কাল দেখিয়া হয়তো তাঁহাদের মনে জাগিবে, কত কল্পনা। কিন্তু কি করিয়া তাঁহারা জানিবেন আমার নাম ছিল রণেশ ঘোষ? কি করিয়া তাঁহারা জানিবেন যে, পাতাল-প্রবেশের আগের দিন পর্য্যন্ত স্কটীশ চার্চ্চ কলেজে ক্লাশ করিয়াছিলাম?

হঠাৎ চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। সবে মাত্র চিন্তা করিতে সুরু করিয়াছি নিজের একাকীত্বের কথা, এমন সময় পিছন হইতে কে যেন কহিল, "ম্যাচিস্‌ আছে বাবু?"

চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইলাম। কিন্তু যাহার দিকে ফিরিলাম, অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না। নামমাত্র যে আলোটুকু ছোট একটু ফাঁকের মধ্য দিয়া পাতালপ্রবিষ্ট ঘরের ভিতরে আসিতেছিল, তাহা অন্ধকারটাকে একটু স্বচ্ছ করিতেছিল মাত্র। সেই স্বচ্ছ অন্ধকারে ম্যাচিস্‌-প্রার্থী লোকটিকে দেখিলাম, একটী ছায়ামূর্ত্তির মত। লোকটার কথা বলিবার ভঙ্গী এবং বিশ্রী কণ্ঠস্বরে আমার পিত্ত জ্বলিয়া গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবিয়া মস্ত সান্ত্বনা পাইলাম যে, এই ভয়ানক বিপন্ন অবস্থায় আমার একজন সঙ্গী রহিয়াছে, লোকটা যেমনই হোক না কেন, তবু মানুষ তো; এমন অবস্থায় ভেদাভেদ না ভুলিয়া উপায় নাই।

লোকটার ম্যাচিস প্রার্থনায় নিরাশার মধ্যেও যেন ক্ষীণ আশার আলো দেখিতে পাইলাম। লোকটা কি ম্যাচিসের সাহায্যে কোন উদ্ধারের উপায় করিবে না কি? পর মুহূর্ত্তেই আমার এই ক্ষীণ আশার আলো নিভিয়া গেল।

লোকটা আমার নৈরব্য দেখিয়া আবার বলিল "আপনার কাছে ম্যাচিস্ আছে বাবু? আমার বিড়িটা একটু ধরাব। ছেলো বটে আমার নিজের কাছে, কিন্তু হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে টাল সামলাতে পারলুম না—স্‌সালার ম্যাচিস্ যে কোথায় ছিট্‌কে পড়ে গেল ক্যা জানে?"

এই ভয়াবহ মৃত্যু-ভবনে লোকটার প্রধান চিন্তা কি না বিড়ি ধরান! বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অন্য সময় হইলে হয় তো হাসিয়া ফেলিতাম, কিন্তু হাসিবার মত মনের অবস্থা যেন ছিল না। মৃত্যুকে যে এমন আশ্চর্য্য অবহেলার চোখে দেখিতে পারে, সে হয় পশু, না হয় দেবতা। দুয়ের মধ্যে লোকটাকে কি মনে করিব?

আমার দ্বিতীয় বারের নৈঃশব্দ্য লক্ষ্য করিয়া লোকটা তৃতীয়বার প্রার্থনা জানাইয়া কহিল, "থাকলে দিন না বাবু মেহেরবাণী করে। এম্‌নি স্‌সালার অভ্যেস হয়ে গেছে যে, বিড়ি না ফুঁকে দু'দণ্ড চুপচাপ বসে থাকতে জান হাঁফিয়ে ওঠে।"

আর চুপ করিয়া থাকা ভাল নয় দেখিয়া এইবার বলিলাম, "কি বললে? ম্যাচিস্? না, ম্যাচিস্ তো নেই আমার কাছে।" বাস্তবিকই আমার কাছে দিয়াশলাই ছিল না।

আমার নেতিবাচক জবাব শুনিয়া বেচারা যে আশাভঙ্গের নিদারুণ বেদনা বোধ করিল, তাহা এই অন্ধকারেও বেশ বুঝিতে পারিলাম।

"তা হলে আমার সেই ম্যাচিসটাই দেখি পাওয়া যায় কি না। আর খানিকক্ষণ বিড়ি না টেনে থাকতে হলে আমি স্‌সালার ঘড়কু ব্যাপারী আর বাঁচব না।" বলিয়া সে অন্ধকারে তাহার হারান ম্যাচিস্ এমন ভাবে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, যেন পরশ-মণি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

বলিলাম, "তোমার নাম বুঝি ঘড়কু ব্যাপারী?"

ম্যাচিস্ খুঁজিতে খুঁজিতে লোকটা কহিল "আজ্ঞে, হাঁ৷ বাবু। বান্দার নাম ঘড়কু ব্যাপারী।...কিন্তক্ আড়াই কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল বাবু, ঘড়কু ব্যাপারী এমন জব্দ কোনো দিন হয় নি।...ম্যাচিস্‌টা যে স্‌সালার কোথায় পালান।...আমি তো ভাবলুম আমার ভিরমি লাগল না কি! ভারি লজ্জা লাগল। ভিরমি লাগবে জেনানা লোকের—মরদের ভিরমি? ছি! ছি! ছি! তারপর বাবু বুঝলুম ভিরমি আমার লাগে নি।"

ভিরমিটা যে তাহার নহে, জননী বসুন্ধরার, এই জন্য ঘড়কু ব্যাপারীকে যেন অত্যন্ত আনন্দিত মনে হইতে লাগিল। এত বিপদের মধ্যেও লোকটার সান্নিধ্যে উদ্ভট ধরণের আনন্দ পাইলাম। প্রাণ যদি যায় সেও ভাল, তবু ভিরমি লাগার অপমানে যেন অপমানিত না হয়! অদ্ভুত লোক!

বলিলাম, "আচ্ছা ব্যাপারী, তোমার ভয় করে না?" ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "ভয়? কিসের ভয় বাবু?"

বলিলাম, "মরণের ভয়?" ঘড়কু অদ্ভুত হাসি হাসিল। বলিল, "ওসব ভয়-ডর করে কিচ্ছু লাভ হয় না বাবু। ভয় করলে ভি মরতে হবে, না করলে ভি মরতে হবে।...কিন্তু ম্যাচিস্ যে কোন্ জাহান্নামে গেল! পেলে একবার বেটাচ্ছেলেকে—আপনার ভয় করছে না কি বাবু?"

ভয় যে সত্যই করিতেছিল, তাহা অস্বীকার করিয়া বিশেষ কিছু লাভের সম্ভাবনা অথবা তাহা স্বীকার করিলে কোন লজ্জার কারণ ছিল না। কাজেই বলিলাম, "ভয় হচ্ছে, হয়তো আর উপরে উঠতে পারব না।"

কথাটা বলিয়াছিলাম অতিশয় করুণ স্বরে—ইচ্ছা করিয়াই আমার কণ্ঠস্বরকে করিয়াছিলাম যথাসম্ভব করুণ। কারণ আশা করিয়াছিলাম, আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য অন্ততঃ ঘড়কু ব্যাপারী কিছু ভরসার কথা বলিবে। নিরাশার মাঝখানে কাহারও মুখে আশার বাণী শুনিলে সে বাণী বিশ্বাস না করিলেও মনে অনেকটা শান্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আমাকে ভয়ানক দমাইয়া দিয়া ব্যাপারী দেশলাই খুঁজিতে খুঁজিতে বলিল, "তা একরকম মন্দ বলেন নি বাবু। আবার সেই রকম আর একটা কাঁপুনি সুরু হলেই হয় তো আরো নীচে চলে যেতে পারি।...কিন্তু তার আগে বিড়িটা যে শেষ করা চাই। গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।"

খানিক পরেই বোধ আমার মানসিক দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া তাহার সহানুভূতির উদয় হইল। সে বলিল, "আপনি ভাববেন না বাবু। কিচ্ছু ডর করবেন না। কাঁপুনি যে ফের সুরু

হবে, এমন তো মালুম হচ্ছে না। ভলান্টিয়ার ব্যাটারা দেখবেন ঠিক টেনে তুলবে, সুধু একটু সবুর করে থাকুন।"

বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "বল কি, ব্যাপারী ?"

ব্যাপারী দেশলাই খুঁজিতে খুঁজিতে কহিল, "হক্ কথা বলছি বাবু। ও ছোঁড়ারা একবার খবরটা পেলেই হয়। খন্তা, শাবল, কুড়ুল, কোদাল—সব নিয়ে ছুটে আসবে। মাথায় একবার খেয়াল চেপেছে কি—ব্যাস্! তখন আর ছোঁড়াদের হুঁস থাকে না।"

দেশলাইটাকে আর একবার একটা কঠোর অভিশাপ দিয়া ব্যাপারী কহিল, "আপনি ভলান্টিয়ারী করেন নি বাবু?"

বলিলাম যে, ও কর্ম্ম কোন দিন আমা দ্বারা সম্ভব হয় নাই। ঘড়কু ব্যাপারী অধীর ভাবে দিয়াশালাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভলান্টিয়ারদের উল্লেখে একটু ভরসা পাইতেছিলাম। প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, ব্যাপারীর কথা যেন সত্য হয়। প্রিয় প্রসঙ্গটি আবার তুলিলাম।

বলিলাম, "সত্যি সত্যি ভলান্টিয়াররা আসবে মনে কর ব্যাপারী ?"

"আলবাৎ আসবে, বাবু।" বেশ একটু জোরাল ভাবেই ঘড়কু বলিল। "আপনি বুঝছেন না বাবু, আমাদের বাঁচবার যত সখ, তার চাইতে আমাদের বাঁচাবার সখ যে ভলান্টিয়ার পাগলাদের ঢের বেশী। ও ব্যাটারা এতক্ষণে ঠিক ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। যত সব মাথা-পাগলার দল

আমি বলিলাম, "মাথা-পাগলার দল ? কেন, লোকের প্রাণ বাঁচান কি পাগলামীর কাজ না কি ? লোকের সেবা করা, উপকার করা—সে যে মস্ত ধর্ম্ম।"

ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "রেখে দিন বাবু ধম্মো ওসব ধম্মো ফম্মো কিচ্ছু নয়—সব ফাঁকি। ওতে কি লাভ হয় বলুন তো! লোকের প্রাণ গেলেই আমার কি, থাকলেই বা আমার কি! কিন্তু স্যালার ম্যাচিসকে আমি খুঁজে বার করবই করব, তবে আমার নাম ঘড়কু ব্যাপারী।... আপনার মনে নেই বাবু, সেই যেবার স্যালারা ঠিক করলে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেবে ? আরে বাপু, আমরা খাচ্ছি তো খাচ্ছি, তাতে তোদের কি ? তোদের বাপের পয়সায় খাচ্ছি ? আমাদের পয়সায় আমাদের যা খুসী খাব। ও স্যালাদের জন্যেই অনেকে নূতন করে মদ খাওয়া ধরল বাবু।"

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "কি করে ?"

ব্যাপারী বলিল, "জেদ্ করে। এই আমার কথাই ধরুন না, আমি তো মদ খেয়ে খেয়ে জালাতন হয়ে ঠিক করলুম আর মদ ছোঁব না। মাইরি বলছি বাবু, মিছে কথা কয় কোন্ স্যালা ? যেমনি ঠিক করলুম, অমনি স্যালার ভলান্টিয়ার দেখি মদের পেছনে লেগেছে। মদের দোকানে কি না বলে ?—ইয়ে আরম্ভ করেছে।"

বুঝাইয়া দিলাম যে 'ইয়ে'র জায়গায় হইবে 'পিকেটীং।' খুসী হইয়া ব্যাপারী কহিল, "আজ্ঞে হাঁ, আপনারা লেখাপড়া জানা লোক, আপনাদের এ সব মনে থাকে। আমাদের কি আর—আপনার বুঝি সিগেট্ ফিগেটের অভ্যেস নেই বাবু?"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন ?"

ব্যাপারী কহিল, "থাকলে সঙ্গে একটা ম্যাচিস্ থাকত হয়তো।......হাঁ, ঐ ভলান্টিয়ার ব্যাটাদের কাণ্ড দেখে আমার আর মদ ছাড়া হল না। ভাবলুম, বেড়ে মজা পাওয়া গেছে। তামাসা করে মদ খেতে লাগলুম। এক স্যালা ভলান্টিয়ার আমায় মদের দোকানে ঢুকতে বারণ করতে এসে এমনি রাম-লাথি খেয়েছিল বাবু, যে কি আর বলব!"

বলিলাম, "ছিঃ ব্যাপারী! ও তোমার ভারী অন্যায় হয়েছিল। তোমাদের ভালর জন্যেই তো মদ খেতে ওরা বারণ করেছিল।"

দেশালাই খুঁজিতে খুঁজিতে ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "ভালর জন্যে, না হাতী। আমরা গরীব-গরবা মানুষ, এক আধটা নেশা-টেশা না করে কি করে থাকি বলুন ? পেটে ভাল করে যখন দানা দিতে পারতুম না, তখন নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকতুম, সস্তা মদ খেয়ে। এ কি কম সুবিধে ? আর ঐ যে মেথরগুলো রাত থাকতে উঠে গাড়ী নিয়ে বেরোয়, পায়খানার ময়লা সাফ করতে, মদ না খেলে অমন নোংরা কাজ ক'দিন করতে পারবে ? হুঁঃ! ভালর জন্যে, না হাতী! অত যদি দরদ হয়ে থাকে তো ভলান্টিয়াররা টানুক না দুদিন ময়লার গাড়ী। ও সব স্যালাদের আমার জানা আছে বাবু। আপনার ভাগ্যি যে, আপনি ভলান্টিয়ার নন্—ঘড়কু ব্যাপারী ভলান্টিয়ারদের দু'চোখে দেখতে পারে না।"

আমার সৌভাগ্যের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। ঘড়কু দেশালাই খুঁজিতে লাগিল।

অদ্ভুত ঘড়কু! নিশ্চিত নির্ম্মম মৃত্যুর ঘন অন্ধকারে সে বিড়ি ধরাইবার জন্য তাহার হারান দিয়াশলাই খুঁজিতেছে! আমার মনে হইতে লাগিল—হায়! আমিও যদি ঘড়কু ব্যাপারীর মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম!

কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর নিশ্চিত আভাস পাইয়াও কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, সে মরিবে। ভীষণ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আমি বাঁচিবার আশা করিতে লাগিলাম। সে যেন মরণ-সিন্ধু-তীরে দাঁড়াইয়া জীবনের জয়-গান।

বলিলাম, "কিন্তু এখন উপায় কি করা যায় বল তো ব্যাপারী?"

ব্যাপারী বলিল, "উপায় কিছু করবার নেই বাবু। যা করবার তা ভলাণ্টিয়াবরাই করবে। আমাদের চাইতে ওদেরই বেশী মাথাব্যথা কি না।......ম্যাচিস্‌টা কি আর মিলবেই না না কি? একটা হেরিকেন লণ্ঠন থাকলে ভাল হত।"

হঠাৎ ঘড়কু ব্যাপারী আনন্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। প্রশ্ন করিলাম, "কি হল ব্যাপারী?"

ঘড়কু ব্যাপারী কহিল, "পাওয়া গেছে বাবু এতক্ষণে। স্যালার সাধ্যি কি, ঘড়কু ব্যাপারীকে এড়িয়ে থাকে? এবার ধরিয়ে ফেলি চট্‌পট্ বিড়িটা। নইলে ফের যদি হঠাৎ ভুঁইয়ের ঝিমুনি সুরু হয়, তা হলে বিড়ি স্যালাকে আর ফোঁকা যাবে না।"

মাত্র একটি কাঠি ছিল সম্বল। এই কাঠিটি যদি কোন প্রকারে বিফলে যায়, তাহা হইলে আর বিড়ি ধরান হইবে না। কাজেই বিড়িটা ঠোঁটে চাপিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ রাখিয়া—পাছে নিঃশ্বাস লাগিয়া কাঠির আগুন নিভিয়া যায়—অতি সাবধানে ঘড়কু ব্যাপারী কাঠিটা জ্বালিল। এতক্ষণ ধরিয়া যে গভীর কৌতূহল মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিলাম, তাহা এইবার ক্ষণিকের জন্য মিটিল। দেশলাইয়ের কাঠির স্বল্প প্রদীপে ঘড়কু ব্যাপারীর মুখ দেখিতে পাইলাম। মুখ দেখিয়া সৌন্দর্য্য বা কৌৎসিত্যের কথা মনেই আসিল না। শুধু একটি জিনিষ এত গভীরভাবে লক্ষ্য করিলাম যে, তাহা আমার সারা মন জুড়িয়া রহিল। সে মুখের পরম নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া হিংসা হইতে লাগিল ঘড়কু ব্যাপারীর উপর। বাঁচিবার তো কোন আশাই দেখিতেছি না—ভলাণ্টিয়াররা আসিয়া যে উদ্ধার করিবে, তাহা গাঁজাখুরী কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়, ঘড়কু ব্যাপারীও মরিবে, আমিও মরিব; কিন্তু আমি মরিতেছি তিলে তিলে এবং ঘড়কু ব্যাপারী হয় তো মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বাঁচার আনন্দ পরম নিরুদ্বেগে ভোগ করিবে।

বিড়ি টানিতে টানিতে ব্যাপারী বলিল, "আর একটা কাঁপুনি সুরু হবেই, কি বলেন বাবু?"

ভয় পাইয়া কহিলাম, "না না, তা হবে কেন? দেখছ না একেবারে থেমে গেছে?"

ব্যাপারী কহিল, "কিন্তু হওয়া যে বড্ড দরকার বাবু। এম্নি করে কদ্দিন বসে থাকব? যা হবার ঝট্‌পট্ হয়ে যাক্। আমি ঘড়কু ব্যাপারী—বুঝলেন বাবু?—বরাবর ঝট্‌পট্ ভালবাসি। একেবারে পাঞ্জাব মেল—গরুর গাড়ী নয়।"

বলিলাম, "কেন, তুমি যে বললে ভলাণ্টিয়ার—"

হাসিয়া বিড়িটা ঠোঁট হইতে সরাইয়া ব্যাপারী কহিল, "আপনিও যেমন! ও ব্যাটারা কবে তক্ আসবে তার কি কোন ঠিক আছে? ততদিন কি আর আমরা টিকে থাকব?"

এমন সময় বাস্তবিকই আবার কাঁপুনি সুরু হইল। সে কাঁপুনিটা আমার, না পৃথিবীর, তাহা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ব্যাপারী বলিল, "যা ভেবেছি, তাই সুরু হল। বিড়িটাকে আর শেষ করতে দেবে না, দেখছি।"

বলিয়া চূড়ান্ত একটা কিছু হইয়া পড়ার আগে বিড়িটা শেষ করার উদ্দেশ্যে সে বিড়িতে একটা প্রচণ্ড টান দিল। কিন্তু বিড়িটা তাহার আর শেষ করা হইল না, কারণ কয়েক সেকেণ্ড পরেই আমরা দুজনেই ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়িয়া মারা পড়িলাম।

মারা না পড়িলে গল্পটা বলিবার সাহস হইত কি না সন্দেহ। ঘড়কু ব্যাপারীর নামে গল্প বলিতেছি টের পাইলে তাহার হাতেই আমাকে মারা পড়িতে হইত।

শিক্ষা-সংস্কার
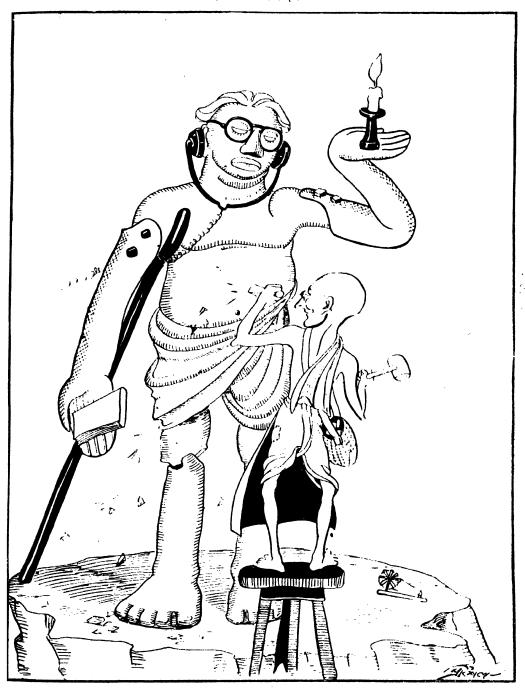
কিছু দিন পূর্ব্বে ওয়ার্দ্ধায় যে শিক্ষা-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে গান্ধীজী তকলি দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনের কথা বলিয়াছেন। উপরের চিত্রে শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থার মূর্ত্তি দেখান হইয়াছে—হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ, কান সমস্তই তাহার কৃত্রিম। যন্ত্রের মত যদি বা তকলি ঘুরাইবার ব্যবস্থা হয়—এ শিক্ষার কৃত্রিমতা কি তাহাতে ঘুচিতে পারে!

ডেমোক্রেসীর প্যাঁচ

নি[illegible]ভোটদাতা। (কনষ্টবলকে)—ভোক্ত না জানি,—ভোটই দিমু। কিন্তু জিগাই, কারে ভোট দিমু, ক্যান্ ভোট দিমু, কইবার পারেন

প্যারিস হইতে কোপেনহেগেন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

সকাল বেলায় প্যারিস ছাড়িলাম। সারাটা ফরাসীদেশ অতিক্রম করিয়া বৈকালের দিকে লুক্‌সেম্‌বুর্গ পৌছাইলাম। এটি একটি ছোট স্বাধীন রাজ্য, সহরটি ছোট হইলেও বেশ সুন্দর। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে একটি ব্রিজের উপর দিয়া যাইতে হয়। এ ব্রিজটির নীচে নদী নাই, দুইটি পাহাড় জোড়া দেওয়া হইয়াছে এই ব্রিজের দ্বারা। পাহাড়ের উপরে ও গায়ে পুরাতন সহর। রাজবাড়ীর কাছে গিয়া দেখিলাম, একটা চত্বরে খুব লোকের ভীড়, পুলিশ পাহারাদিও রহিয়াছে, ভাবিলাম, গ্র্যাণ্ড ডাচেস্ বাহির হইবেন বুঝি। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া জানিলাম, ফায়ার ব্রিগেডের এক্‌সারসাইজ হইবে, তাই দেখিতে লোক জমিয়াছে।

লুক্‌সেম্‌বুর্গ হইতে রাইন নদী তীরস্থ জার্ম্মানীর কোবলেন্‌জ্ Koblenz সহরে আসিলাম। সারাটা পথ মোজেল নদীর ধার দিয়া গাড়ী আসিল। রাইন ও মোজেলের এই অংশ পাহাড়ে দেশ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রতি ইঞ্চি জমিতে আঙ্গুরের চাষ। রাইন ও মোজেল ওয়াইন জার্ম্মানীতে সুপ্রসিদ্ধ। "ন তজ্জলং যন্ন সুচারু-পঙ্কজং, ন পঙ্কজং তন্ন যদলীনষট্‌পদং—"সেই রূপ যেখানেই নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, সেখানেই পাহাড়, যেখানেই পাহাড়, সেখানেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র, বেশ সুন্দর দৃশ্য! নাইন্‌জ হইতে কোবলেন্‌জ পর্য্যন্ত রাইন নদীর দৃশ্য জার্ম্মানীর প্রধান সৌন্দর্য্যের মধ্যে অন্যতম। নদীর দুই তীরে পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে গায়ে আঙ্গুর ক্ষেত ও মাথায় মাথায় পুরাতন ক্যাস্‌ল্। রাইনল্যাণ্ড জার্ম্মানদের রোমাণ্টিক স্বর্গ—Rhein, Wein und Liebe, অর্থাৎ রাইন, ওয়াইন ও প্রেম!

কোবলেন্‌জ হইতে রাইনের ধার দিয়া আসিলাম ক্যোল্‌ন্ সহরে। এ পথ টুকু রাইনের দু ধার দিয়া রেলপথ গিয়াছে। পথে বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি-সহর ছোট বন Bonn দেখিলাম, ভারতীয়ের কাছে এই বন্ পণ্ডিত ইয়াকোবির নামের সঙ্গে সংযুক্ত। বুড়া ইয়াকোবির বয়স এখন নব্বই পার হইয়াছে, কাণে প্রায় শুনিতে পান না, স্মৃতি-শক্তিও লোপ পাইয়াছে, নিজের অত যে জীবনব্যাপী পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা সে সব ভুলিয়া গিয়াছেন, লোকজনও চিনিতে পারেন না। এ জন্য বহু ইচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে দেখা ও আলাপের বাসনা ছাড়িতে হইল।* ক্যোল্‌ন্ সহরটিও বেশ চমৎকার, এখানকার বৃহৎ গির্জ্জাটির কথা জার্ম্মানীর সবাই জানে। স্বাভাবিক দৃশ্যাদিতে রাইনল্যাণ্ডই

কোপেনহেগেনের টাউন-হল।

জার্ম্মানীতে শ্রেষ্ঠ, লোকজনও এখানে বেশ হাসিখুসী, সানন্দ প্রকৃতির।

ক্যোল্‌ন্ হইতে আসিলাম আমার পুরাতন হামবুর্গে। এক বৎসর পরে পরিচিত স্থানগুলি ও লোকজনের সঙ্গে আবার দেখা হইয়া ভালই লাগিল।

হামবুর্গ হইতে উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া ডেন্‌মার্কের বৃহৎ অংশ ভেদ করিয়া পৌছাইলাম কোপেনহেগেনে। এগার ঘণ্টার রাস্তা। দেশটা সাগর-ময়, অর্থাৎ ইহার অধিকাংশই দ্বীপপুঞ্জ। একটা জায়গায় স্বল্পপরিসর স্থির সাগরের উপর ব্রিজ বাঁধিয়া দেওয়া হই-য়াছে, আর একটা জায়গায় ট্রেন ছাড়িয়া ঘণ্টা খানেক

* সম্প্রতি ভারততত্ত্ববিদ্ হারম্যান ইয়াকোবির মৃত্যু হইয়াছে। বঃ সঃ

ষ্টিমারে সাগর পার হইয়া ওপারে আবার ট্রেনে উঠিতে হইল। এই ষ্টিমারের এক তালায় থ্রু-ট্রেনের কয়েকখানি গাড়ীও পার হয়। যাত্রীরা সবাই উপরে ডেকে গিয়ে বসে। স্থির নিশ্চল নীলবর্ণ সাগর নীচে, আশে পাশে দ্বীপরেখা দেখা যাইতেছে, ডেকের উপরই রেস্তরাঁ, বৈকালিক জলযোগে নিরত যাত্রীদের কাছে আহার্য্যাংশ পাইবার লোভে মন্থরগামী ষ্টিমারের রেলিং ঘেঁসিয়া চলিয়াছে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা সামুদ্রিক গল্ পাখী। মালার মত পংক্তিবদ্ধ লঘুদেহ উড্ডীয়মান পাখীগুলি মনে করায় "শ্রেণীবন্ধাৎ বিতন্বস্তিঃ অস্তম্ভং তোরণস্রজম্—!"

ডেমোক্র্যাটিক ডেনমার্ক দেশে ট্রেনে সাধারণত শুধু থার্ড-ক্লাসের গাড়ী থাকে, বিদেশগামী থ্রু-ট্রেনে ছাড়া ফার্ষ্ট সেকেণ্ড ক্লাস মিলে না। আমার এ ট্রেনটায় সেকেণ্ড ক্লাস ছিল না, তাই সেকেণ্ডের টিকিটে ফার্ষ্টে চড়িয়া আসিলাম। এখানে, ও পরে দেখিলাম, নরওয়ে ও সুইডেনেও ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে মাথা ও পিঠের জন্য কুশন ঝুলান থাকে, লোকেরা অত্যধিক ধূম্রসেবী বলিয়া থুথু ফেলিবার পিকদানি থাকে ও করিডারে কাঁচের জারে জল ও গেলাস থাকে। এ জল কেহ কখন খায় বলিয়া মনে হইল না, আস্বাদ করিয়া দেখিলাম অনেক দিনের বাসি জল। থার্ড ক্লাস গাড়ীতেও এ দেশে গদি আঁটা। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন, তিনটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশেই দেখিলাম, রেল-কর্ম্মচারীরা অতি ভদ্র, সবাই ইংরাজী কিছু বলে। এ দেশে ইংরেজদের প্রভাব খুব, দেশগুলি ইংলণ্ডের সঙ্গে বহু সম্বন্ধবদ্ধ। ডেনমার্ক দ্বীপময়, কৃষি-প্রধান, প্রায় সমতল দেশ, সাগর ছাড়া আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছু নাই। কোপেনহেগেনে পৌছাইয়া আড্ডা করিলাম একটি ইউনিভার্সিটির প্রবীণ ছাত্রদের জন্য ছোট একটি কলেগিউম অর্থাৎ হষ্টেলে। এখানকার মাগিষ্টার অর্থাৎ এম-এ পাশ একটি ছাত্রের সঙ্গে প্রাহায় আলাপ হইয়াছিল, তাঁহারই অতিথিরূপে কলেগিউমে স্থান পাইলাম। কোপেনহেগেনের স্থানীয় নাম ক্যোবেন্‌হাউন্ Kœbenhavn।

এখানকার ইউনিভার্সিটি ও আমার কলেগিউমটি মধ্যযুগের বাড়ী, প্রকাণ্ড উঠানের চারিধারে বাড়ী। প্রাঙ্গনের দেওয়ালে আইভি-লতা ছাইয়া আছে, মধ্যে বাগান, বেশ সেকেলে ভাব। ইউনিভার্সিটি ও রয়েল লাইব্রেরির ভারতীয় পুঁথিসংগ্রহ দেখিলাম। লাইব্রেরিয়ান পুঁথির আলমারির চাবি একদিনে সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ও পুঁথিগুলি কেহ চাহে নাই, চাবিগুলির জন্য বড়কর্ত্তার কাছে আবেদন করিতে হইবে। এখানে অন্য ইউরোপীয় দেশগুলির মত শুধু প্রাথমিক শিক্ষাই বেতনহীন নয়, মাধ্যমিক শিক্ষায়ও প্রায় মাহিনা লাগে না, আর ইউনিভার্সিটির শিক্ষা একেবারে নির্ম্মূল্যে হয়। ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের নাম লেখান প্রভৃতিরও হাঙ্গামা নাই, ক্লাসে যে কেহ বসিয়া প্রোফেসারের লেকচার শুনার অধিকারী। পালি-পণ্ডিত ডিনেস্ আণ্ডারসেন এখানে প্রথম সংস্কৃতের প্রোফেসার ছিলেন। তাঁহার ঝোঁক ছিল পালির উপর। এখন তাঁহার ছাত্র পাউল টুক্‌সেন সংস্কৃতের প্রোফেসার হইয়াছেন। ইঁহার বাড়ীতে একদিন চা খাইলাম। সপত্নীক টুক্‌সেন সম্প্রতি দ্বিতীয়বার ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ঝোঁক ভারতীয় দর্শনের উপর, যোগদর্শন সম্বন্ধে অনেক লেখা প্রকাশ করিয়াছেন। মাস কয়েক আগে ডেনমার্কের রাজার জুবিলি উৎসব হইয়া গিয়াছে, স্থানীয় পণ্ডিতবর্গের অনেকে সেই উপলক্ষ্যে একটা নূতন লেখা ছাপাইয়া রাজাকে উৎসর্গ করেন। টুক্‌সেন দেখাইলেন, তাঁর জুবিলি-লিপি, বৌদ্ধদর্শনে রিলেটিভিটি-বাদ সম্বন্ধে। ইনি আণ্ডারসেনের কাছে পড়িবার পর শ্যামদেশে গিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তাঁর শ্যামদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু পালি-শিক্ষকের ছবি দেখাইলেন। আমি বলিলাম, "আপনি আমাদের দেশের পণ্ডিতের কাছে পালি শিখিয়াছেন, আর আমরা আজকাল পালি পড়া আরম্ভ করি আপনাদের আণ্ডারসেনের 'পালি-রীডার' দিয়া।"

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ বিলাতে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক রূপে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। কন্টিনেণ্টে দেখিলাম, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের বইয়েরও বেশ নাম আছে। জার্ম্মান সাহিত্যের অধ্যাপক হামারিকের বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। হামারিক-পত্নী বলিলেন, "প্যারিসে P. E. N. ক্লাবের সম্মেলন

উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, নামটা তাঁর মস্ত বড়, "খাকৃরা—" বা ঐ রকম একটা কিছু! তাঁর দুরুচ্চার্য্য নামটা মনে থাকে না বলিয়া আমরা তাঁর কথা বলিতে হইলে তাঁকে "কৃষ্ণমূর্ত্তি" বলিয়া উল্লেখ করি।" (মাদ্রাজের অবতার কৃষ্ণমূর্ত্তির নাম এ দেশে সুপরিচিত)। চেহারার বর্ণনাদি শুনিবার পর বুঝিলাম, শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কথা বলিতেছেন। অধ্যাপক-পত্নী খুব আমুদে লোক। পরে P. E. N. সম্মেলনের ছবি দেখাইলেন, দেখিলাম অমিয় বাবুই বটেন, হামারিক-পত্নী বলিলেন, অমিয় বাবুর মুখশ্রীতে তাঁহারা যীশুখ্রীষ্টের মুখের আভাস পাইতেন। প্রোফেসর হামারিক অতি ভদ্রলোক ও প্রবীণ অধ্যাপক বলিয়া এখানে লোকের মান্যাস্পদ, কিন্তু ভাবগতিক তাঁর একেবারে কাছা-খোলা রকমের। ছাত্র-মহলে শুনিলাম, তিনি কোন এন্‌গেজমেণ্ট করিলে তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া যান। ঠিক করিলেন, ভুলিয়া যান বলিয়া এন্‌গেজমেণ্টের খাতায় নোট করিয়া রাখিবেন, কিন্তু কাজের সময় সেই খাতা দেখিতেও ভুলিয়া যান! বিদায়ের সময়ে অধ্যাপক-পত্নী বলিলেন, তাঁর একটি অনু-রোধ আছে, যদি কিছু মনে না করি, তাঁর ছোট ছেলেটির অসুখ বলিয়া বিছানায় শুইয়া আছে, ছেলেটির বড় ইচ্ছা আমাকে একটু দেখে। গেলাম সদলে উপরের ঘরে। ছোকরাটি শুইয়া আছে, একটি সমবয়সী পাশে বসিয়া, মা বলিলেন, "এরা দুইজন ভারি অন্তরঙ্গ বন্ধু, যতক্ষণ একত্র থাকে একটাও কথা বলে না, শুধু দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া অবিরাম হাসে।" ছোকরাকে কাতুকুতু দিয়া আরও খানিক হাসাইলাম। তার পাশে দেখিলাম একটা ব্যাঞ্জো, ছেলেটি বাজাইতে পারে। বলিলাম, আমাকে দেখা তো হইল, এবার তোমার বাজনা একটু শুনাইয়া দাও আমাকে। ছেলেটি মায়ের অনুমতি পাইয়া বাজনা শুনাইল। ভিয়েনায় প্রোফেসার গাইগারের বাড়ীতে যখন গিয়াছিলাম, তখন তাঁরা দুঃখ করিয়াছিলেন, তাঁদের মেয়েটির অসুখ, সে বড়ই দুঃখিত যে আমাকে দেখিতে পাইল না। আসিবার সময়ে মেয়েটির ঘরের সামনে দিয়া করিডার পার হইতে হয়, মেয়েটি ঘর হইতে উচ্চ কণ্ঠে মা-বাপকে এ-কথা ও-কথা বলিয়া অতিথির কাছে নিজ অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছিল।

কলেগিউমে ছাত্ররা একটি ছোট শুইবার ঘর ও একটি বড় বসিবার ঘর পায়। তিনতলা বাড়ী, প্রত্যেক তলাতেই একটি ছোট রান্নাঘর, কফির পাত্র ও ছুরি, কাঁটা, কাপ প্রভৃতি সরঞ্জাম সহ। ছাত্ররা নিজ নিজ প্রাতরাশ ও সান্ধ্যভোজ এখানে বানাইয়া লয়, তাহাদের বান্ধবীরা অনেক সময়ে আসিয়া রান্নায় সহায়তা করে। ব্যবহারের
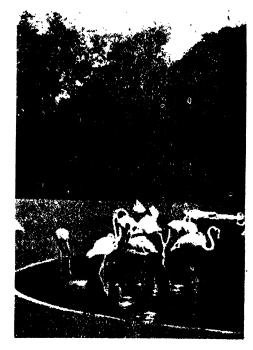
কোপেনহেগেন : পার্কের একটি কোণ।

সব বাসন-পত্র আবার রান্নাঘরে রাখিয়া আসিতে হয়, এক-জন ঝি আছে, সে দিনে দুবার বাসন-পত্র ধুইয়া দিয়া যায়। নীচের তলায় ছোট লাইব্রেরি ও পাঠাগার, টেবিলের উপর একটি মোটা খাতা, তাহাতে ছাত্রেরা নিজ নিজ মন্তব্য লিখিতে পারে। অনেকে ইহাতে কবিতা লেখে ও নানা রকম মজার ও হাসির কথা অন্যদের গোচর করে। কলেগিউমের কর্ত্তা নামে একজন প্রোফেসার, কিন্তু দেখাশুনা করে কলেগিউমেরই একজন ছাত্র। পরিদর্শক ছাত্রটি একদিন তার ঘরে কফি খাওয়াইল। বেশ ধীর,

বিনীত ও বুদ্ধিমান এই ডেনরা, স্বল্পভাষী ও অতি সহজেই অন্যের ভাব গ্রহণে সমর্থ। ডেনদের প্রতিবাসীরাজ্যের লোকরা ডেনদের একটু সন্দেহের চক্ষে দেখে, কারণ এরা না কি বড় চতুর। মধ্য-ইউরোপে ঠাট্টা প্রচলিত আছে যে, জু'রা ধড়িবাজ ব্যবসায়ী বটে, কিন্তু একজন গ্রীক দশ-জন জু'এর সমান ও একজন আর্ম্মেনিয়ান দশজন গ্রীকের সমান। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোক বলে, একজন ডেন দশ-জন আর্ম্মেনিয়ানের সমান! দেখিলাম খুব বুদ্ধিমান লোক এরা। ছাত্ররা কাজকর্ম্ম খেলাধূলা আমোদ খুব করে, আড্ডা ও বাজেতর্ক মধ্য-ইউরোপে যাও বা আছে, এখানে তাও নাই। ছাত্রদের ঘরে সবারই দেখিলাম, ঘরের কোণে একটা ট্রের উপর পাইপ-সংগ্রহ, সবারই গোটা চার পাঁচ পাইপ থাকে। পাইপ, সিগার ও সিগারিল্লোর এখানে খুব প্রচলন। মধ্য-ইউরোপে যুবকরা পাইপটাকে [illegible] মনে করে, আর সিগার বুড়াদের জন্য, সিগারেট-টাই ফ্যাশানেবল। জার্ম্মাণীতে যুবকের মুখে সিগার দেখিলে অন্য যুবকরা বলে, "কি হে! ভারিক্কে ক্যাপিটালিষ্ট হইয়ে করে হইতে?" স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশে বিলাতের [illegible], সিগারেটটা proletarian, কিন্তু পাইপটার পিছনে একটা মস্ত tradition আছে। মজা হইয়াছিল [illegible] প্রাহার প্রোফেসার ষ্টাইনের সঙ্গে বসিয়া কাজ করিতে। প্রোফেসারের পাইপটার সুখ্যাতি করিলাম, প্রোফেসার বলিলেন, "এটা আপনার ভাল লাগিয়াছে? আচ্ছা দেখুন এটা কেমন!" বাহির হইল আলমারি হইতে আর একটা, তারপর দেরাজ হইতে, টিপয় হইতে, বইএর সারির পিছন হইতে, আলমারির মাথা হইতে বাহির হইতে লাগিল, নানা দেশীয় নানা আকৃতির পাইপ! গতিক দেখিয়া বলিলাম, "যথেষ্ট হইয়াছে প্রোফেসার। পাইপের মিউজিয়ম আপনার আর একদিন দেখিব, আজ আরও একটু কাজ করা যা'ক আসুন।"

কলেগিউমে ছাত্ররা বিনা ভাড়ায় এত আরামে এত নির্বাধায় থাকে, কিন্তু কোথাও একদিন এতটুকু গণ্ডগোল দেখিলাম না। এত সুবিধা পাইলে আমাদের দেশের বাবাজীরা অষ্টপ্রহর কমন-রুমে, ঘরে ও বাগানে যে আড্ডা ও তর্কের বারোয়ারি আখড়া করিতেন, তা সহজেই অনু-মেয়।

কোপেনহেগেন সহরটা এমন বৃহৎ নয়, তা ছাড়া ইহার চারিপাশে সমুদ্র, মধ্যে মধ্যে সমুদ্র খালের মত হইয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে, সহরের যে-দিকেই যাওয়া যায়, খানিক পরে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয় সাগর-পারে। সাগরের জল শান্ত, ও পারে সুইডেনের তীর-রেখা ক্ষীণ দেখা যায়। সাগরের ধারে ধারে সুদীর্ঘ উপকূল ব্যাপিয়া স্নানের জায়গা ও আনুষঙ্গিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা, এই অংশের নাম Danish Reviera। সাইক্ল চড়িয়া কয়েকজনে গিয়াছিলাম একদিন সাগরে স্নান করিতে, স্নানের পর সাইক্লে লম্বা চক্র দিলাম সহরের বাহিরের জায়গাগুলির মধ্য দিয়া। ফিরিবার সময়ে এখানকার চিড়িয়াখানার মধ্য দিয়া আসিলাম, বিস্তীর্ণ জায়গায় খোলা মাঠের মধ্যে পালে পালে হরিণ চরিয়া বেড়াই-তেছে। আজকাল সব দেশেই চিড়িয়াখানার খোলা জায়গায় পশুপক্ষীদের স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

একটি যুবক একদিন তাঁর মোটর বাইকের পিছনে চড়াইয়া ঘণ্টা চারেক ঘুরাইলেন, অনেক বন, গ্রাম ও পুরাতন রাজপ্রাসাদ ঘুরিয়া আসা গেল। বেড়াইবার পর তাঁর ফিয়াঁসের বাড়ী সান্ধ্যাহারে লইয়া গেলেন। এই মহিলাটি একটি সোনারূপার দোকানের ম্যানেজার, অনেক ভারি ভারি সোনারূপার চাদর দেখাইলেন। একটি পরিবারের নামে হাম্বুর্গ হইতে পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম, ইহাঁদের একটি মেয়ে মোটরে একদিন দেশের কিয়দংশ ঘুরাইলেন। কোপেনহেগেন হইতে মাইল চল্লিশ উত্তরে সাগরকূলে পুরাতন ক্রোনবোর্গ Kronborg নামক রাজপ্রাসাদ। সেক্স্‌পীয়ারের হ্যামলেট নাটকের ক্রিয়াস্থল এই পুরাতন প্রাসাদ। কিছুদিন আগে একদল ইংরেজ অভিনেতা এখানে রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় হ্যামলেট অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। এই প্রাসাদের গর্ভ-গৃহে সৈন্যদের আবাসস্থল ছিল, অর্দ্ধালোকিত বহু সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া সে-সব দেখিলাম। একটি বৃহৎ মূর্ত্তি এখানে যেন বসিয়া ঘুমাইতেছে, প্রবাদ, উনি ডেনমার্কের ভাগ্য-দেবতা, যতদিন উনি নিদ্রিত থাকিবেন, ততদিন দেশের কোন বিপদ হইবে না, বিপদ হইলেই ইনি কুম্ভকর্ণত

ত্যাগ করিবেন! এই প্রাসাদের পাশেই যে সমুদ্র, সেটা সাঁতরাইয়া আধঘণ্টায় পার হওয়া যায়, ওপারে সুইডেন। এই প্রাসাদটি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রাসাদ মেয়েটি মোটরে ঘুরাইলেন। আমি বলিলাম, "আপনাদের ডেমক্রাটিক দেশ তবু রাজার এত প্রাসাদ কেন? পার্লামেণ্ট এগুলি কাড়িয়া লয় না কেন?"

"কাড়িয়া লইয়া কি করিব?"

"কেন, মিউজিয়ম, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি। আপনাদের তো কৃষিপ্রধান দেশ, এই বড় বড় বাড়ীগুলিতে কৃষি-কলেজ কতকগুলি স্থাপিত হইতে পারিত।"

মেয়েটি হাসিয়া বলিলেন, "ও সবই আমাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।" বাস্তবিক স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি যাবতীয় উন্নতির জন্য ষ্টেট্ ও পাবলিক দান এত আছে যে, এ বিষয়ে কোন অভাব নাই ইহাদের। রাজা এ দেশগুলিতে আছেন বটে, কিন্তু রাজাকে এ দেশের লোকে ইংলণ্ডের মত লোকোত্তর একটা কিছু মনে করে না, এ দেশের রাজারাও ইংলণ্ডের মত বহু অনুষ্ঠান, বহু প্রাচীন ভড়ং পরিবেষ্টিত হইয়া থাকেন না। সম্প্রতি অভিষেক লইয়া কি হৈ-চৈ-ই করিল ইংরেজরা! রাজা যেন একটা না জানি কি পরম অদ্ভুত জিনিষ! এ লইয়া পার্লামেণ্টে সম্প্রতি আপত্তি হইয়াছে, প্রস্তাব করা হইয়াছে, রাজা মহাশয় যেন নিজের জীবনযাত্রা সেকেলে ভড়ং বাদ দিয়া একালানুযায়ী সরল করেন। ইংলণ্ডে রাজা পথে বাহির হইলে লোকগুলা 'আদেখলে'র মত রাস্তায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। ডেনমার্কে রাজা সাধারণ লোকের মত পথে ঘোড়ায় বা মোটরে বাহির হন, লোকে টুপি তুলিয়া সাধারণ লোকের মত রাজাকে সম্মান দেখায়, "Good morning King" বলে। রাজা-প্রজার নিকট সম্পর্ক দেখাইবার জন্য ডেনমার্কের ডাক-টিকিটে ছবি আছে, রাজা অশ্বপৃষ্ঠে পথে বাহির হইয়াছেন, তাঁর পিছনে কোন রক্ষী নাই, দুটি রাস্তার ছোকরা সাইকেলে তাঁর পিছনে আসিতেছে।

এই পরিবারে আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। বাপটি ফুলের

রাজপ্রাসাদের একটি হল।

ব্যবসায়ী, রাজবাড়ীতে ফুল জোগান, যাকে বলে Florist by Royal Appointment। মা দেখিলাম, খুব উচ্চ-শিক্ষিতা মহিলা, বহু বিষয়ের চর্চ্চায় যোগ দিলেন। মেয়েটি আমাকে মোটরে ঘুরাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "আপনি হাত দেখিতে পারেন? তবে আমার বোনের সঙ্গে আপনার হাম্বুর্গে দেখা হইয়াছিল।" আমি ঠিক চিনিতে পারিলাম না, বাড়ীতে আসিয়া বোনকে দেখিয়া মনে পড়িল, হাম্বুর্গে ষ্টুডেণ্টেন হাউসে দেখিয়াছি। হাম্বুর্গে ষ্টুডেণ্টেন হাউসে বিদেশী ছাত্ররা একটা টেবিলে একত্র আহার করিতেন, একদিন বিদেশী বিভাগের কর্ত্তা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, কয়েকটি মেয়ের ইচ্ছা হইয়াছে

হাত দেখাইবেন। একটি সুইডিশ ও একটি ইংরেজ মেয়ের হাত দেখিয়া সাধারণ দুচারটা কথা বলিয়াছিলাম। এখানে বোনটি বলিলেন যে, সেই সুইডিশ মেয়েটি তাঁর বান্ধবী, সে তাঁকে বলিয়াছিল যে, আমি তাঁর হাত দেখিয়া কয় ভাই-বোন ও সমগ্র ভূত-ভবিষ্যৎ না কি সঠিক বলিয়া দিয়াছি। এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা অস্বীকার করিয়াও নিস্তার পাইলাম না। দুই বোনে ধরিলেন, তাঁদের হাত দেখিতে হইবে। বোনটির হাতে দেখিলাম, বড় মনশ্চাঞ্চল্যের ছায়া, বলিলাম "আপনার একটা বড়ই উদ্বেগ যাইতেছে।" মেয়েটি ব্যাপার স্বীকার করিলেন ও পাশ ঘুরিয়া পরিবারের সঙ্গে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন, নিশ্চয় একটা কিছু ঘটিয়াছে, বুঝিলাম।

হ্যামলেটের রঙ্গভূমি : ক্রোনবোর্গ প্রাসাদ।
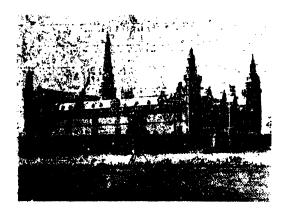
কলেগিউমে যাঁর অতিথি ছিলাম, তিনি তাঁর বন্ধু-সমাজকে এক সন্ধ্যার কফিতে ডাকিয়াছিলেন ও জানাইয়াছিলেন, আনুষঙ্গিক থাকিবে ভারতীয় হালুয়া! সদলে রান্নাঘরে গিয়া সকলের সামনে হালুয়া বানাইতে হইল, সকলেরই ইচ্ছা, ভারতীয় ভক্ষ্য প্রণয়নের গুপ্ত রহস্যটি জানিবেন। খাইয়া সকলেই খুব খুশী, বলিলেন, নিজেরাও চেষ্টা করিবেন বাড়ীতে বানাইতে। দুঃখের বিষয়, এখানে মোটা সুজি মিলে না, মধ্য-ইউরোপে সর্ব্বত্র পাইয়াছি, কিন্তু এখানে বড় বড় দোকান ঘুরিয়া যাহা মিলিল, তাহা এত মিহি যে, ময়দা বলিয়াই মনে হয়। এই সম্মেলনে যাঁরা আসিয়াছিলেন, তাঁরা সকলেই আবার প্রতিদানে নিজ নিজ পরিবার বা বন্ধুসমাজে নিমন্ত্রণ করিয়া বহু লোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়াছিলেন।

ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী, ইস্কুলের শিক্ষক, ইউনিভার্সিটির লেকচারার প্রভৃতি। একটি ভদ্রলোক এখানকার এস্কিমো-তত্ত্বের অধ্যাপকের সহকারী। ইনি গ্রীনল্যাণ্ডের একজন পাদ্রীর ছেলে, জাতিতে ডেনিশ, কিন্তু প্রতিপালিত হইয়াছেন গ্রীনল্যাণ্ডে ও বিবাহ করিয়াছেন একটি এস্কিমো মেয়েকে। আমার বড় ইচ্ছা হইল, এস্কিমোদের দেখিব, তাই এঁর বাড়ীতে সম্মেলন হইল এখানকার অনেকগুলি শিক্ষিত এস্কিমো যুবক-যুবতীদের। ইনি ডেন হইলেও এস্কিমোদের মধ্যে নিজেকে গণনা করেন, ইংরেজি ও জার্ম্মানও অল্প বলিতে পারেন, অন্য এস্কিমোরা নিজেদের ভাষা ছাড়া শুধু ডেনিশ্ জানে। এস্কিমোরা দেখিতে খর্ব্বকায় ও জাপানীদের মত। গ্রীণ-ল্যাণ্ড দেশটা আকারে প্রায় ভারতের দেড় গুণ, এ কথাটা আগে খেয়াল হয় নাই, কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্রে দুটা দেশ একত্র দেখিলেই এ কথা স্পষ্ট হয়। এত বড় ভূখণ্ডের অধিকাংশই চিরতুষারে আবৃত, লোকের বসতি বা চাষবাস অসম্ভব, দক্ষিণ দিকের সাগরতীরের কাছাকাছি জায়গা-গুলিতে প্রায় হাজার কুড়িক এস্কিমোর বাস। জীবিকা এদের মাছ ধরিয়া ও হরিণ বা ভালুক শিকার করিয়া। জীবনধারণের প্রধান উপাদান শিল ও ওয়ালরাসের মাংস, শিলের চর্ব্বিতে আলো ও আগুন জ্বালা হয়। শিলের দাঁতের গড়া গহনা দেখিলাম। শিক্ষিত এস্কিমোরা ডেনমার্কের প্রতি প্রসন্ন নয়, ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের দেশটা আটকাইয়া ফেলিয়াছে, কোন বিদেশীকে বিশেষ অনুমতি বিনা যাইতে দেওয়া হয় না, গ্রীনল্যাণ্ডের ব্যবসাও সরকারের একচেটিয়া, অর্থাৎ এস্কিমোরা সব জিনিষ, মাছ, পশুলোম, চামড়া প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করিতে বাধ্য ও গবর্ণমেণ্ট তাহা বাহিরে বিক্রয় করেন। এস্কিমোরা খৃষ্টান হইলেও সমাজবন্ধন ওদের খুব স্বাধীন ও শ্লথ আছে শুনিলাম।

পিশ্চানিতে যে সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, তাঁর বাড়ীতে একদিন লইয়া গেলেন। শীতকালে ইনি থাকেন কাগজখানার অপিসের সামনের একটা বাড়ীতে,

আর এখন গ্রীষ্মের সময় আছেন সহরের মাইল পনর বাহিরে সাগরের ধারে একটা বাসায়। ইনি এখানকার Ekstra Bladet নামক সান্ধ্য কাগজের প্রধান সম্পাদক। "এক্‌সট্রা ব্লাডেট" Politiken নামক প্রাভাতিক কাগজের ভগ্নী। দুইখানা কাগজই স্যোশাল ডেমোক্রাট পার্টির এবং দেশে দুখানা কাগজেরই খুব সুনাম শুনিলাম, বিশেষতঃ "একস্‌ট্রা ব্লাডেটে"র। যত রকম মডার্ণ উন্নতির পৃষ্ঠপোষণ ও সব রকমের দুষ্টামি ও ভণ্ডামি দমনের বড় উদ্যোক্তা এই কাগজখানা। কোথাও অন্যায় কিছু হইলেই লোককে বলিতে শুনিয়াছি, "লেখো একখানা চিঠি "এক্‌স্‌ট্রা ব্লাডেট্"কে!" ভারত-হিতৈষিণী শ্রীমতী এলেন হোরুপ "পোলিটিকেন" কাগজের বোর্ড অব্ ডিরেকটারদের এক জন। ইনি এই কাগজখানায় ভারতীয় জাতীয়তার স্বপক্ষে ও বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান কর্ত্তৃপক্ষের বিপক্ষে মধ্যে মধ্যে লেখেন। জেনীভা হইতে "ইণ্ডিয়ান প্রেস" নামে ইনি একখানা ছোট কাগজ বাহির করিয়া ভারতের খবর এ দেশে প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বছর কয়েক কাগজের সম্পূর্ণ ব্যয়-ভার নিজে বহন করিয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন, কংগ্রেস বা অন্য ভারতীয় ন্যাশানালিষ্টরা তাঁর কাজে সহায়তা করিবেন। এখন ইনি ভারতীয়দের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়লাভে বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন, কারণ গান্ধীবাদী ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলের কেজো বুদ্ধি এত কম যে, কেহ তাঁহার প্রয়াসে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্বেও কোনও আগ্রহ দেখান নাই। কোন উৎসাহ, কোন সহায়তা ইনি ভারত হইতে পান নাই, ভারতীয় ধনুর্দ্ধররা বিদেশী প্রোপাগাণ্ডার কোন প্রয়োজনীয়তা দেখেন না বা বুঝেন না, সম্পূর্ণ নিজ বাহুবলেই ঢাল-তলোয়ারহীন এই নিধিরাম সর্দ্দারেরা দেশ উদ্ধার করিবেন। "যস্য নাস্তি স্বয়ংপ্রজ্ঞা, মিত্রোক্তং ন করোতি যঃ—" তাহাদের ভাল কে করিবে!

বিয়ার কোম্পানী-প্রতিষ্ঠিত মিউজিয়মের "সম্রাটাগার"।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার তিনটি দেশেই দেখিলাম, খবরের কাগজের ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুব উঁচু, বড় আকার, ভাল কাগজ, ভাল ছাপা, বহু পাঠ্য বিষয়, ছবি প্রভৃতি। ইংরেজি কাগজে যারা অভ্যস্ত তাদের এটা ভালই লাগে, বিশেষতঃ কন্টিনেণ্টের খর্ব্বাকৃতি বদ-ছাপা কাগজগুলি দেখিবার পর। "এক্‌স্‌ট্রা ব্লাডেট"-এর ফরেন-এডিটার একদিন ইন্‌টারভিউ করিলেন। কলেগিউমের ছেলেরা একদিন বলিলেন, "কাগজে আপনার ছবি বাহির হইয়াছে!' ইণ্টারভিউএর শিরোনামা দেখিলাম, লেখা হইয়াছে "জলন্ত ভারতীয় ন্যাশনালিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনালিজমের পক্ষপাতী"! সম্পাদকের বাসায় যে দিন গিয়াছিলাম, সে দিন তাঁর ছোট মেয়েটি সাগরতীরে খেলা করিতে করিতে ঘরে আসিয়া কাগজে কি একটু লিখিয়া বাপের হাতে দিল। বাপ
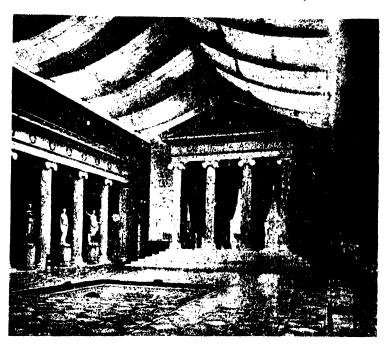
বলিলেন, তিনি সম্পাদক বলিয়া তাঁর মেয়ে তাঁর কাছে খবর বেচিয়া পয়সা লয়, আজকার খবর এই যে, পাড়ার অমুক বাড়ী হইতে ভাড়াটেরা চলিয়া গিয়াছে! খবরের দাম স্বরূপ দু-আনা পয়সা তৎক্ষণাৎ মেয়েটি বাপের কাছে আদায় করিয়া সাগরতীরে আইসক্রীম কিনিতে দৌড়িল! Carlsberg নামক এখানকার একটি বিয়ারের কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। এটি দেখিলাম, অতি বৃহৎ ব্যাপার এবং ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার স্থাপয়িতা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দেশকে দান করিয়া গিয়াছেন, বৃহৎ কারখানায় বৎসরে বহু লক্ষ টাকা লাভ হয় এবং সে টাকা কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয়। স্থাপয়িতার ছেলে এখন কোম্পানীর ডিরেক্টর, বাঁধা মাহিনা পান, কিন্তু লাভের অংশ সমস্তটাই দানে যায়। ডেনমার্কের লোকে বলে, "ছেলেকে পয়সা দিয়া যাইও না, কাজ দিয়া যাইও!" এই কোম্পানী একটি চমৎকার আর্ট-মিউজিয়ম দেশকে দান করিয়াছেন, এখানকার বৃহৎ সংগ্রহের মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগিল "সম্রাটাগার" নামক হলে প্রাচীন রোমান সম্রাটদের মূর্ত্তিসংগ্রহ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যে সম্রাটদের প্রকৃতি ও কার্য্যাবলী বইয়ে পড়া থাকে, রোমান শিল্পীর নিপুণ হাতে গড়া তাঁহাদের জীবন্ত মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যেন প্রাচীন যুগ মূর্ত্ত হইয়া উঠে—সেই অগষ্টস্, সেই হাড্রিয়ান, সেই মার্কাস অরেলিউস প্রভৃতিরা। দেখিয়াছিলাম রোমান শিল্পীর হাতের realistic শক্তি বার্লিন মিউজিয়মে রক্ষিত জুলিয়াস সীজারের কাল-পাথরের মূর্ত্তিতে—সেই, চতুর, দুষ্ট, ধুরন্ধর মেধাবী সম্রাটের প্রকৃতির প্রত্যেকটি বিশিষ্টতা যেন ধরা দিয়েছে প্রাণবান্ পাথরে!

এই বিয়ার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা তাঁর বাড়ীটি উইল করিয়া গিয়াছেন দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের বাসের জন্য। যে বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন-সমিতি দ্বারা যোগ্য বিবেচিত হন, তিনি যাবজ্জীবন ইহাতে বাসের জন্য অধিকারী, তাঁহার মৃত্যুর পর আবার অন্য বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচিত হন। ডেনমার্কের বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কলাচর্চ্চার খরচ বহন হয় এই বিয়ার কোম্পানীর দত্ত লক্ষ লক্ষ টাকায়।

নিখিল-বিশ্ব যুদ্ধ-প্রতিরোধীদের সম্মেলন International War Resisters' Congress হইল এবার কোপেনহেগেনে। একদিন বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম বিলাতের লর্ড পন্‌সন্‌বি সভাপতি ছিলেন ও হাউস অব কমন্‌সের লিবারেল নেতা জর্জ্জ ল্যান্সবেরি বক্তৃতা করিলেন।

ডেনমার্কের ফরেন-মিনিষ্টারের সঙ্গে একদিন দেখা করিয়াছিলাম। লীগ অফ্ নেশন্‌স্ সম্বন্ধে ইনি উৎসাহী, লীগের একজন মান্য গণ্য সভ্য। লীগ সম্বন্ধে আলাপ হইল ইঁহার সঙ্গে।

সহরের বাহিরে একটি চাষার ও একটি গোয়ালার বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম! অবস্থা খুব ভাল ইহাদের, বাড়ী-ঘর আমাদের দেশের বড়লোকের মত। গোয়ালার বাড়ীতে টাটকা মাখন ও পনির খাইলাম, চাষার বাড়ীতে গরু-শূয়র দেখিলাম। শূয়রগুলিকে এখানে অতি পরিচ্ছন্ন-ভাবে রাখা হয়, dirty pig কথাটা ডেনিশ শূয়রের প্রতি প্রযুজ্য নয়। দুই বাড়ীতেই দেখাশুনার পর ওয়াইন ও বিস্কুটে বসিতে হইল, এটা এ দেশের অতিথি অভ্যর্থনার নিয়ম। চাষার মেয়েটি সহরে ডাক্তারি পড়িতেছেন।

কলেগিউমে যাঁর অতিথি ছিলাম, তাঁর দুই দাদার বাসায় এক সন্ধ্যায় কফি খাইলাম, এক দাদা ছুতার ও অন্য দাদা কারখানার মজুর। সাধারণ শিক্ষা এ দেশে এত উঁচু ও আর্থিক উপার্জ্জন এত ভাল যে, কথাবার্ত্তায় ও পারি-পার্শ্বিকে এম-এ পাশ করা ভাইটি দাদাদের বাসায় বিন্দু-মাত্র অস্বস্তি বোধ করিলেন না। খাটিয়া খাইতে হয় যাহাদের তাহাদের সকলেরই এখানে অবস্থা খুব ভাল, উঁচু রোজগার, সুসজ্জিত বাড়ীঘর, তা ছাড়া রোগ-বীমা, বেকার-বীমা, বার্দ্ধক্য-পেন্‌শন্ প্রত্যেকটি লোকের আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আরাম, অবকাশ সকলের ভোগ্য। মেয়েদের পরিচ্ছদ ভারি নয়নাকর্ষক এখানে, মধ্য-ইউরোপের মত চটক্‌দার নয়, কিন্তু মার্জ্জিত রুচি ও সৌষ্ঠববোধের চায়ক। আর একটি দ্রষ্টব্য, কোপেনহেগেনে রাস্তার অগণ্য সাইকেলের স্রোত! রাস্তা ভরিয়া সাইকেল চলিয়াছে, অপিস-দোকান আরম্ভ ও ছুটির সময় সাইকেলের ভীড়ে রাস্তা পার হওয়া দায়।

ডেনমার্কের প্রধান বিদেশে রপ্তানীর পণ্য হইতেছে, হ্যাম, মাখন ও ডিম। ইংলণ্ড আগে ডেনমার্কের প্রধান

খদ্দের ছিল, এমন কি প্রায় সমুদয় রপ্তানী ব্যবসাটা ইংলণ্ডে চলিত। এখন ইংলণ্ড ডোমিনিয়ন হইতে বেশীর ভাগ উৎপন্ন আমদানী করিতেছে, তাই ডেনমার্ককে অন্য খদ্দের খুঁজিতে হইতেছে। এখন জার্ম্মানী এখানকার বড় খদ্দের। ডেনিশ মাখন, ডেনিশ গবর্ণমেণ্ট মার্কা মারিয়া দেন, গবর্ণমেণ্টের মার্কায় গ্যারাণ্টি থাকে যে, এ মাখন ভেজালহীন সরেশ জিনিষ। জার্ম্মানীতে দেখিয়াছি, প্রত্যেকটি ডিমের উপর ষ্ট্যাম্প মারা থাকে, কোন্ দেশ হইতে আসিতেছে এবং ওজন অনুসারে ক, খ বা গ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ডিমের দাম নির্ণীত হয়। ডেনমার্কের মত সুমিষ্ট গাঢ় ও সুগন্ধ দুধ ইউরোপের কোথাও দেখিলাম না। দুধ এখানে সর্ব্বত্রই ডেয়ারি হইতে বিশোধিত হইয়া পোয়া, আধসের ও একসেরি বোতল বন্ধ হইয়া বাড়ীতে বাড়ীতে বা দোকানে যোগান দেওয়া হয়। বোতলের মুখ সীল করা থাকে ও তাহাতে যে দিনের যোগান, তার তারিখ ছাপা থাকে। লণ্ডনে দেখিয়াছি, দুধের বোতল ঘণ্টা দুই রাখিয়া দিলেই বোতলের প্রায় তৃতীয়াংশ গাঢ় ক্রীমে ভরিয়া উঠে, লণ্ডনের দুধের স্বাদ-গন্ধও ভাল। কন্টিনেণ্টের দুধের রকম সে তুলনায় নিকৃষ্ট মনে হয়, ক্রীম যা জমে, তা অতি সামান্য। প্রাহার ডেয়ারির কর্ত্তারা কিন্তু বলিলেন যে, তাঁহাদের দুধে যে ক্রীম জমে না, তার কারণ দুধের সারবত্তা কম বলিয়া নয়, ক্রীম জামাটা নিরোধ করিবার জন্য বিশেষ যন্ত্রে তাহা ঘাঁটিয়া সমস্ত দুধের সঙ্গে তাহা মিশাইয়া ফেলা হয়। এ দেশের মাখনে জল, লবণ বা অন্য কোনরূপ প্রিজারভেটিভ সংযোগ করিবার রীতি নাই, আমরা দেশে যে টিনের মাখন ব্যবহার করি, তাহার প্রায় ৪০% প্রিজারভেটিভ। এ দেশের মাখন ষোল আনা নিরেট শক্ত মাখন।

"সেন" নাম দেখিয়া এ দেশে লোক জিজ্ঞাসা করে, ইহার অর্থ কি, কারণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার, বিশেষত ডেনমার্কের, প্রতি তিন জনের মধ্যে একজনের নামের অন্তে "সেন" থাকে, ইহার অর্থ "পুত্র"। যার নাম ছিল আদিতে "জন", তার ছেলে হইল জন্সন্—ডেনিশ ভাষায় Jensen। Jensen ও Hansen প্রভৃতি নাম এখানে এত সাধারণ যে, টেলিফোন বইয়ের তো কি কথা, ডেনিশ Who's Whoতেই দেখিলাম, এই নামের লোকের তালিকা চল্লিশ কলম ব্যাপিয়া।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকে বহুভোজী, বহু ধূমপায়ী ও বহু মদ্যসেবী। রেস্তরাঁতে আহার্য্যের দাম বেশ চড়া, কিন্তু পরিমাণ ও প্রকারে বহু। কন্টিনেণ্টে লোকে ব্রেকফাষ্টটা রুটি মাখন জ্যাম ও কফিতেই পর্য্যাপ্ত মনে করে, আর এই উত্তর দেশে তার সঙ্গে পরিজ, দুধ, ডিম, ঠাণ্ডা মাছ ও হ্যাম-বেকন পর্য্যন্ত চালায়। দুপুরে ইহারা খায় সামান্য, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আবার ভূরি-ভোজন করে। মদ্য ও কফিও খুব খায়, দুঃখের বিষয় মদ্যটা কড়া জাতের হয়।

কোপেনহেগেন নিউ জামের "নদীমাতা"—ভাটিকানে রক্ষিত "নীলনদে"র অনুকরণে।

মধ্য-ইউরোপে লঘু বিয়ার ও লঘু ওয়াইন চলিত, দক্ষিণ-ইউরোপে দ্রাক্ষা আরও ভাল জন্মে বলিয়া ওয়াইনই বেশী চলে। বিয়ার বা ওয়াইন পরিমাণে অনেক পান করিলেও নেশা বা প্রকৃতি-বিপর্য্যয় হয় না। উত্তর দেশে কিন্তু দ্রাক্ষা জন্মে না বলিয়া ওয়াইনের দাম চড়া। ইদানীং বিয়ার চলিতেছে, কিন্তু আসল পানীয় বহু প্রস্থে কড়া হুইস্কি, ব্রাণ্ডি (এর নাম এ দেশে কোনিয়াক্ cognac) ও নানাবিধ উগ্র লিকার। কফি এ দেশে বড় চমৎকার বানায়। সিগার ও পাইপ লোকের মুখ-ছাড়া প্রায়ই হয় না।

ডেনরা আজকাল শান্তিবাদী ও যুদ্ধবিগ্রহ-বিরোধী। ডেনমার্কের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ আগে জার্ম্মানীর অধীন ছিল, ভার্সাই-সন্ধির ফলে তাহা ডেনরা ফিরিয়া পাইয়াছে, কিন্তু লোকের ভয় যে,হিটলার আবার তাহা জার্ম্মানীর অংশভুক্ত

সাগর-তীরের মৎস্যকন্যা।

করিবার মতলবে আছেন। ডেনদের একটা কারণে আমার বেশ ভাল লাগিত, তাহা এই যে, এককালে ইহারা আমাদের মনিবদের দেশ জয় ও শাসন করিয়াছিল। ইংলণ্ডের রাজা ক্যানিউট ডেন ছিলেন। এখানে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা যে ইংলণ্ড জয় করিয়াছিলে, কিসের বলে বা কি গুণে তাহা পারিয়াছিলে?" অন্য প্রাচীন ও আধুনিক বিজেতাদের এ প্রশ্ন করিলে "সভ্যতার বল," "ঐশ্বরিক বিধান," "শ্বেতব্রত" প্রভৃতি কত না শুনিতে হইত! কিন্তু স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোক সত্যবাদী, ইহারা সরলভাবে বলিল, "আর কিছুরই দ্বারা নয়, যাহাতে এ পর্য্যন্ত এক দেশ অন্য দেশকে চিরকাল জিতিয়া আসিয়াছে, তাহাতেই, অর্থাৎ একমাত্র পাশবিক গায়ের জোরে লুটতরাজ করিয়া জিতিয়াছিলাম!"

একদিন মোটর বোটে করিয়া কোপেনহেগেনের বন্দরটি ঘুরিলাম, এমনই সুশিক্ষিত ও পটু ইহারা যে, ছইটি ছোকরা সিঁড়ি ও লোকজন নামান, উঠান, টিকিট কাটা প্রভৃতি সমস্ত কাজ নিঃশব্দে পালন করিয়া চলিল।

সুন্দর সহরটি কোপেনহেগেন! কত সুন্দর বাগান, কত মূর্ত্তি, কত নীল, শান্ত হ্রদোপম সাগরের জল, সহরের মধ্যে ও চারিধারে! বড় সাগরের ধারে সুদীর্ঘ Langelinie নামক বেড়াইবার রাস্তা! সব চেয়ে স্নেহাকর্ষণ করে এই সমুদ্রপার্শ্বের পথের ধারে জলের মধ্যে একখণ্ড বৃহৎ পাথরের উপর বসিয়া সুগঠিত নগ্নদেহে জনতায় উপেক্ষা করিয়া সাগরের দিকে মুখ করিয়া একাকিনী বসিয়া আছে "The Little Mermaid" নামক যে শান্ত মৎস্য-কন্যাটি! নতনেত্রা ঈষদ্ধাস্যোদ্দীপ্তাননা এই বালিকাটি সকলকে উপেক্ষা করিয়া ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে লোকচলাচলহীন এই জলের ধারে একা বসিয়া কি ভাবে, কে জানে!

দেব, দেবতা ও দেবী

...অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে অংশটি অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সেই অংশটিকে ঐ ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিষয়ক দেবতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন. আর যে যে অংশ কেবল মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেই সেই অংশকে তাঁহারা দেব নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রত্যেক অঙ্গের প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্যশক্তি যে যে অব্যক্ত শক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই অব্যক্ত কার্য্যশক্তি ঋষিগণের ভাষায় এক একটি দেবী বলিয়া আখ্যা লাভ করিয়াছে।...

চিত্র-চরিত্র

মাইকেল মধুসূদন

—শ্রীঅমিত রায়

বিশপ্‌স কলেজের নিকটে গঙ্গার তীরে একটি যুবক। যুবকের পরিধানে নূতনতম ফ্যাশানের সাহেবী পোষাক। যুবক নিঃসঙ্গ, নীরব। একখানি জাহাজ সমুদ্রের দিকে যাইতেছে—যুবকের লক্ষ্য সেইদিকে। সে ভাবিতেছে, এ জাহাজ যায় কোথায়? বোধ করি সেই ইংলণ্ডে! ডেকের উপরে সাহেব, মেম পাদচারণা করিতেছে; যুবক ভাবিতেছে, তাহারা কত সুখী! সে জাহাজের নাম পড়িতে চেষ্টা করিল, Cand···পর্য্যন্ত চোখে পড়িল, আসন্ন অন্ধকারে বাকি অক্ষর পড়া গেল না। যুবক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—"আঃ, আমি যদি ইংলণ্ড যাইতে পারিতাম।" যুবকের নাম মাইকেল এম. এস. ডাট্‌. এস্কোয়ার, বিশপ্‌স কলেজের ছাত্র।

মধুসূদন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, জাহাজ গঙ্গার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল; নদীর পরপার অস্পষ্ট হইয়া আসিল। তিনি খৃষ্টান হইয়া বিলাতের পথে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছেন? জর্ডান ও টেম্‌স যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তিনি কেবল গঙ্গা পার হইয়াছেন। বিলাত নিকটে আসিল না, ভারতবর্ষ বহুদূরে গিয়া পড়িল; ইংরেজ কই নিকটে আসিল, হিন্দুরাই বহুদূরে গেল; আত্মীয়স্বজন পর হইল, পাদ্রীরা আপন হইল না। মাঝে মাঝে রেভারেণ্ড বাঁড়ুয্যে মহাশয় আসেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি বাইবেল ও কড়িকাঠের মধ্যে নিঃশেষে বিভক্ত, অন্যদিকে মন দিবার অবকাশ তাঁহার থাকে না। কাজেই মধুসূদন এখন হিন্দু পিতার অর্থে বিশপ্‌স কলেজের ছাত্র হইয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম ও ঋণের চর্চ্চা করিতেছেন।

মধুসূদন নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। মনটা ভাল ছিল না। কলেজে একটা গণ্ডগোল চলিতেছিল। দেশীয় খৃষ্টানদের পরিধেয় পোষাক অকৃত্রিম খৃষ্টানদের পোষাক হইতে ভিন্ন। তিনি এই কু-সংস্কারের প্রতিবাদ করে রামধনুর রঙ্‌কে পরাজিত করে, এমন একটা বিচিত্র পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন—তাহাতে গোলমাল আরও জটিল হইয়া উঠিল।

তিনি ঘরের জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন; শানাই-এর সুরে পূরবীর রেশ। খানসামাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কিসের বাঁশী? সে দেশীয় খৃষ্টান, দেখিয়া অত্যন্ত উপেক্ষার স্বরে বলিল—কিছু না সাহেব, হিন্দু লোকদের দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের বাজনা। অকৃত্রিম বিদেশী পোষাকপরা কৃত্রিম হিন্দু হৃদয়ের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই বাঁশীর করুণ আলাপ শুনিলেন। এক কানে শানাই-এর সুর, অন্য কানে ব্যঙ্গ কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

> I've broken Affection's tenderest ties
> For my blest Saviours sake!

মধুসূদনের ইচ্ছা সেই সুর আর একটু শোনেন, কিন্তু মাইকেল সশব্দে জানালা বন্ধ করিয়া একটানে বাইবেল খুলিয়া বসিলেন—বাইবেলের পাতার ফাঁক হইতে কোলের উপরে খুলিয়া পড়িয়া গেল—একখানা মোটা অঙ্কের বিল—অপরিশোধিত।

সেদিন আহারের সময়ে আর এক গোলযোগ ঘটিল। মধুসূদন মদ্য চাহিলেন, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীদিগকে দিতেই মদ ফুরাইয়া গিয়াছে। মধু বলিলেন, মদ চাই-ই; ভাণ্ডারী বলিল—মদ নাই-ই। তখন তিনি ক্রোধে গেলাস প্লেট আছড়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকবার পাদচারণা করিয়া পুস্তকের আলমারির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বায়রণের গ্রন্থাবলী টানিয়া লইতে গিয়া দেখেন—সে স্থান শূন্য। বইখানা কয়েকদিন হইল অন্যত্র গিয়াছে—পুরাতন পুস্তকের দোকানে। বিরক্ত হইয়া জানালা খুলিয়া দিলেন—কানে আসিল সেই শব্দ—দশমীর চাঁদের আলোয় বিসর্জ্জনের বাদ্য। চাঁদের আলো তির্য্যক

ভাবে আসিয়া পড়িল টেবিলের উপরে, শূন্য বোতলের উপরে কৌতূহলী ইঙ্গিত—শূন্য মদের বোতল। মধুসূদন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় পাদচারণা করিতে লাগিলেন। বিসর্জ্জনের বাদ্য ও শূন্য মদের বোতল!

*

মধুসূদন খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাঁহার উক্ত কার্য্যে উৎসাহদাতা বন্ধুগণ একে একে অন্তর্হিত হইলেন, এবং তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পৌত্তলিক পিতার অর্থে বিশপ্‌স্ কলেজে ভর্ত্তি হইতে হইল। রাজনারায়ণ দত্ত পুত্রের উপর বিরূপ হইলেও তাঁহার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ আর না অন্ধকার হয়, সেইজন্য পুত্রের শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে লাগিলেন। পিতার নিয়মিত একশত টাকা ছাড়া, জাহ্নবীদেবী মাঝে মাঝে লুকাইয়া মধুসূদনকে টাকা দিতেন। এই পৈতৃক অর্থ প্রাপ্তি সম্বন্ধে মধুসূদনের কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে আমাদের বিশ্বাস, তন্মধ্যে হাস্যরসের অনেক উপাদান মিলিত।

মধুসূদন বিশপ্‌স্ কলেজে ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার আর্থিক বা পরমার্থিক কোন উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি না, বরঞ্চ বিপরীত তথ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু মধুসূদনের ভাবী কবি-জীবনের উপরে এই কয়েক বছরের শিক্ষার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। মধু পণ্ডিত ও কবি ছিলেন, একাধারে তিনি পণ্ডিত-কবি; সারা জীবন ধরিয়া তিনি পাণ্ডিত্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মত বহু ভাষাবিদ্ লোক সেকালে কম ছিল। যে প্রশস্ত পাণ্ডিত্যের উপরে তাঁহার ক্লাসিকাল প্রতিভার প্রতিষ্ঠা, বিশপ্‌স্ কলেজে সেই ভিত্তিপত্তনের সূত্রপাত। তিনি এই সময়ে গ্রীক, লাটিন ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন; ফরাসী তিনি আগেই শিখিয়াছিলেন। আর একটি জিনিষ তিনি শিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, না শিখিয়া উপায় ছিল না, পরবর্ত্তী জীবনে তিনি "জ্ঞানোন্নতি বিধায়িনী সভার" সভ্যদের মুখে যে অদ্ভুত বাংলা বুলি দিয়াছিলেন—সেই বাংলা এই সময়ে শেখা।

'একদিন কলেজের গির্জ্জায় এক পাদরী সাহেব বাংলা ভাষায় আমাদের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময়ে বলিয়াছিলেন—আমরা অদ্য তাম্বু ফেলিলাম, কল্য উঠাইয়া লইলাম এবং অন্য স্থানে তাম্বু গাড়িলাম।' এই বিলাতি বাংলা শুনিয়া মাইকেল উপাসনালয়ে হাসিয়াছিলেন। বিশপ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাকে পরে হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মধুসূদন বলেন—"ওরূপ বিলাতি বাংলা শুনিলে হাস্য সংবরণ করা যায় না।"

মধুসূদন নিজে বাংলা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, 'পৃথিবীকে' 'প্রথিবী' লিখিতে পারেন—কিন্তু ঐরূপ অদ্ভুত বাংলা শুনিলে তাঁহার মধ্যেকার আর্টিষ্ট আত্মসংবরণ করিতে পারে না—হাসিয়া ওঠে।

বাহির হইতে যেমনই দেখা যাক্, মধুসূদন মনে মনে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করিতেছিলেন—এই মানসিক নিঃসঙ্গতার অনুভূতি প্রতিভাবান্ পুরুষদের একটি লক্ষণ। খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণের পরে হইতেই এই একাকীত্ব তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, বিশপ্‌স্ কলেজেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। একখানি পত্রে তিনি গৌরদাসকে লিখিতেছেন:—

"আমি একাকী! লোকের সাহচর্য্য আমার আবশ্যক। তুমি কি আজিকার দিনটা আমার সঙ্গে কাটাইতে পারিবে? আমি নিশ্চিত জানি তুমি পারিবে না, কিন্তু তুমি আমার বন্ধু বলিয়াই কর্ত্তব্যের খাতিরে তোমাকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমার কাহারও সাহচর্য্য একান্ত আবশ্যক।"

মধুসূদনের জীবনে যে কয়েকটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে, বিশপ্‌স্ কলেজ হইতে হঠাৎ মাদ্রাজ গমন তন্মধ্যে একটি! এই আকস্মিক কার্য্যের কারণ কি? তাঁহার জীবনীকারেরা পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য বলিয়া এই ঘটনাকে পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি এমন মনোমালিন্য যাহাতে পিতা খরচ দেওয়া বন্ধ করিলেন?—খৃষ্টান হইবার পরেও তিনি তো খরচ দিতে অসম্মত হন নাই! মধুর চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যই কি রাজনারায়ণ দত্ত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে এই কাজ করিয়াছিলেন? মাদ্রাজ যাইবার এমন কি জরুরি প্রয়োজন ছিল, যাহাতে সরকারী চাকুরীর জন্যও তিনি কয়েক মাস অপেক্ষা করিতে পারিলেন না! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহ তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিল না; এমন কি গৌরদাসও নয়—যে গৌরদাসের নিকটে কোন কথা তিনি গোপন করিতেন না! মাদ্রাজে যাইবার তাঁহার উদ্দেশ্য কি? আর্টিষ্ট মধুসূদন কি মনে মনে বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, তিনি অদ্ভুত খাপ-ছাড়া হইয়া উঠিয়াছেন, নূতন জীবনের মধ্যেও তিনি স্থান পান নাই, পুরাতন পরিবেশের মধ্যেও তিনি অসঙ্গত। এই প্রক্ষিপ্ত জীবনকে চুকাইয়া দিবার জন্যই দেশত্যাগ? না মাদ্রাজ গিয়া বিলাতের পথে এক পা অগ্রসর হইয়া তাঁহার থাকিবার ইচ্ছা?

কথা ও সুর

—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

গান বলে যা চলছে, তাতে কয়েকটি সুর স্বীকার করে নিলে অনেক বাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি হয়। গানের সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে, যা কণ্ঠ দ্বারা গীত হয়। গান শব্দটি প্রাচীন ও মধ্য-যুগের গীতশাস্ত্র-রচয়িতা, আধুনিক গায়ক ও সাধারণ লোকে এই অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

প্রাচীন গান ও আধুনিক গানের আলাপে অনেক সময় অর্থশূন্য কথার মিশেল থাকে। সেই জন্য রাগের বিস্তারে তোম, না, তা, তারে, দানি ইত্যাদি অর্থহীন কথার ব্যবহার হয় এবং সঙ্গীত-শাস্ত্রে ও চলিত কথাবার্ত্তায় একে গানের মধ্যেই ফেলা হয়। যেখানে অর্থপূর্ণ কথা দিয়ে গান হয়, সেখানেও অর্থহীন কথার ফোড়ন থাকে। প্রাচীন বৈদিক সঙ্গীতেও এই রকম অর্থশূন্য কথার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কীর্ত্তনে, এমন কি বাউল ও কবিওয়ালার গানেতে মাঝে মাঝে 'তা, না, না'র গুঞ্জন শুনতে পাওয়া যায়। আমেরিকার রেড্-ইণ্ডিয়ানরা সম্পূর্ণ অর্থহীন কথা দিয়ে গান গাইতে পারে।* আমি হিমালয়ে পাহাড়িয়া-দের মাত্র দু একটি স্বরবর্ণের আশ্রয়ে গান করতে শুনেছি এবং তাদের সমাজে একেই গান গাওয়া বলে।

কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিক বলেন যে, সুরের ভাবা কথার ভাষার পূর্ব্বগামী, অর্থাৎ মানুষ কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করার পূর্ব্বে সুর দিয়ে নিজের আবেগ প্রকাশ করেছে। কথিত ভাষায় যে সুরের ভাষার প্রভাব এখনও লোপ হয় নি, তার প্রমাণ ভাষায় আবেগ-প্রসূত বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ, দুঃখসূচক অব্যয় পদগুলির (inter-jections) ব্যবহার। সুতরাং দেখা যায় যে, কথা ছাড়া জটিল ও সহজ গান জগতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুর ছাড়া গানের কোন অর্থ বা অস্তিত্ব থাকে না, অতএব গানে সুরই প্রধান উপাদান। গানের মধ্যে কথা-প্রধান গান ও সুর-প্রধান গান এই দুটি ভাগ স্বীকার করে নিলে ক্ষতি নেই। আমরা প্রথমে কথা-প্রধান গানের আলোচনা করব।

গানেতে যে কথা ব্যবহৃত হয়, তা কাব্য-গন্ধি, সুতরাং কাব্যে কথার প্রকৃতি প্রথমে আলোচ্য। কথার স্বাতন্ত্র্য ও স্বারাজ্য ভাষায় চরম পরিণতি লাভ করেছে এবং কাব্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত। ভাষাতে কোন বাক্যের (sentence) অর্থগ্রহণ করতে হলে পদগুলি (word) পরপর এমন কাল-ব্যবধানে উচ্চারিত হওয়ার দরকার, যেন মানে বুঝতে কোন কষ্ট না হয়। 'দেবদত্ত যাইতেছে', এই বাক্যেতে 'দেবদত্ত' ও 'যাইতেছে'র মধ্যে যদি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়, তা হলে বাক্যের অর্থসঙ্গতিতে বাধা পড়বে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা বাক্যের এই প্রকৃতিকে 'আসত্তি' বা 'সংনিধি' (ইংরাজী—rule of proximity) বলেছেন। তা ছাড়া কবিতায় উপযুক্ত সময় ব্যবধানে পদ উচ্চারণ করায় ধ্বনি-মাধুর্য্য আসে। কোন একটি কবিতার কয়েক লাইন নেওয়া যাক।

> হের ক্ষুদ্র নদীতীরে—
> সুপ্তপ্রায় গ্রাম। পক্ষীরা গিয়েছে নীড়ে।
> শিশুরা খেলে না; শূন্য মাঠ জনহীন,
> ঘরে ফেরা শ্রান্ত গাভী গুটি দুই তিন
> কুটীর অঙ্গনে বাঁধা, ছবির মতন
> স্তব্ধপ্রায়। গৃহকার্য্য হল সমাপন,—
> কে ওই গ্রামের বধূ ধরি বেড়াখানি
> সম্মুখে দেখিছে চাহি, ভাবিছে কি জানি
> ধূসর সন্ধ্যায়।
>
> —অমনি নিস্তব্ধ প্রাণে
> বসুন্ধরা, দিবসের কর্ম্ম অবসানে,
> দিনান্তের বেড়াটি ধরিয়া, আছে চাহি
> দিগন্তের পানে; ধীরে যেতেছে প্রবাহি
> সম্মুখে আলোকস্রোত—অনন্ত অম্বরে
> নিঃশব্দ চরণে;......... ('সন্ধ্যা'—চিত্রা)

এই কবিতায় পদগুলি সন্নিহিত রয়েছে এবং এমন ভাবে সন্নিবিষ্ট রয়েছে যে, তাদের গানের কথার মত বিচ্ছিন্ন করে

* Jesperson. Language—its nature, development and origin. p. 435.

পড়লে কাব্যগত বিশিষ্ট ধ্বনি-মাধুর্য্য, ছন্দ ও অর্থসঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হবে। এ ছাড়া কবিতার নিজস্ব একটি সুর আছে এবং উল্লিখিত কবিতাংশকে গাইবার চেষ্টা করলে কাব্যের দিক্ দিয়ে অত্যন্ত শ্রুতিকটু মনে হবে।

গানেতে আমরা কেবল পদগুলিকে কাব্যোপযোগী সময়ান্তরাল থেকে চ্যুত করি না, পদের অক্ষরগুলিও (syllable) স্বস্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের যে কোন গানের লাইন বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি আরও প্রাঞ্জল হবে। 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে' এই লাইন গানে এসে দাঁড়িয়েছে 'এসো নী+প | বনে+++ | ছায়াবীথি | তলে,' অর্থাৎ 'নীপবনের' 'নী' এবং 'নে'-র পর এক ও তিন মাত্রা সময় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তাঁর অন্যান্য গানে পদগুলি এবং তাদের অক্ষর চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট প্রভৃতি মাত্রা বর্দ্ধিত দেখা যায়। এইখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গানে পদের অন্তিম অক্ষরের উচ্চারণ-কাল বাড়ানর চেয়ে পদমধ্যস্থিত অক্ষর টানা অর্থগ্রহণে অধিক বাধার সৃষ্টি করে, কারণ পদগুলি বিশ্লিষ্ট হলেও তার বাক্য-নিরপেক্ষ আলাদা একটা অর্থ থাকে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন অক্ষরে পদ পর্য্যবসিত হলে মানে বোঝা শক্ত হয়, কারণ অক্ষরগুলি স্বতন্ত্র ভাবে সম্পূর্ণ অর্থহীন, অর্থাৎ 'নীপবনে'-র 'নে'-র উচ্চারণ-কাল বাড়ানর চেয়ে 'নী', 'প', 'ব'-র উচ্চারণ-কাল বৃদ্ধি করা অর্থগ্রহণে বেশী বাধা দেবে, কারণ 'নী', 'প', 'ব'-র স্বতন্ত্র ভাবে কোন অর্থ নেই। কবিতায় কথার ও অক্ষরের ফাঁক এ রকম যথেচ্ছা বাড়ানর কোন সুবিধে নেই। সুতরাং কাব্যের ধ্বনি-মাধুর্য্য থাকে না এবং কবিতাকে (বা গদ্য-কবিতাকে) যদি কাব্য-রসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে স্বীকার করা হয়, তা হলে দেখা যায় যে, কবিতার কথার রস গানের সুর-মিশ্রিত কথায় পাওয়া যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ যথাসম্ভব তাঁর গানে পদ-বৃদ্ধি পরিহার করে চলেছেন, তবু এ কথা স্বীকার্য্য যে, কথার ধ্বনি-মাধুর্য্য, অর্থসঙ্গতি তাঁর কবিতায় যত শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, তাঁর গানের গীতকথায় তা পারেনি। ওস্তাদী বিলম্বিত লয়ের গানে এই শব্দান্তরাল এত বহুল ও দীর্ঘ যে, তাকে সম্পূর্ণ অর্থ-নিরপেক্ষ বললেও অত্যুক্তি হয় না। (তালের জন্য কথার স্বভাবের যে পরিবর্ত্তন হয়, তা বারান্তরে আলোচ্য)।

এইবার সুরের দিক্ দিয়ে দেখা যাক। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, ভাষায় ও কাব্যে কথার একটা সুর আছে, কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয়ে তা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু গানে যখন কথা আসে, এ সুর তাকে ছাড়তে হয় ও সম্পূর্ণভাবে গানের সুরের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। কথা ও সুরের মিতালি একেবারে থাকে না এমন নয়, যেমন প্রশ্নসূচক বাক্যে:—উদাহরণ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের 'কেন বাজাও কাঁকন কণকণ কত ছল ভরে' গানের লাইনে 'কেন'-র জায়গায় যে গানের সুরের টান আছে, তার কিছু পরিমাণে কথার টানের সঙ্গে মিল দেখা যায়, কিন্তু আবৃত্তি করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে, মিলের চেয়ে প্রভেদ কোন অংশে ন্যূন নয়। হিন্দি ঠুংরিতেও এই রকম চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক জায়গায় এ মিল দেখা যায়। 'নীপবনে' গানটিতে 'নীপবনে', ছায়াবীথি,' 'স্নান,' 'নব-ধারা-জলে' ইত্যাদি কথাগুলির ব্যঞ্জনা প্রকাশ করবার কোন নির্দ্দিষ্ট সুর-সঙ্গতি নেই; প্রতিভা থাকলে রচয়িতা নানাভাবে তা প্রকাশ করতে পারেন, কিন্তু একাধারে শব্দ ও সুর-চয়নে প্রতিভা সংসারে দুর্লভ। বস্তুতঃ সুর এ বিষয়ে নিতান্ত নিষ্করুণ, কথাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আনার চেষ্টা তার অত্যন্ত প্রবল। রবীন্দ্রনাথ উচ্চসঙ্গীতের সুরের বিস্তার, তান, গমক, মিড় বাদ দিলেও 'সারিগম' দিয়ে গান লিখতে বাধ্য হয়েছেন। যে ভৈরবী রাগ উচ্চসঙ্গীতে নানা ভাবে বিস্তৃত ও অলঙ্কার-ভূষিত হয়ে দেখা দেয়, সে তাঁর গানে অল্পবিস্তর নিরাভরণা হয়ে এলেও স্বরলিপির দৌত্যে সে ভৈরবী রাগের গানই থাকে। সুতরাং রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও কথা উচ্চারণ ও সুরের দৃষ্টিতে ক্ষুণ্ণ হয়ে গৌণ হয়ে পড়ে, সংযত সুর-সমৃদ্ধিই তার সৌন্দর্য্যের মুখ্য কারণ। তিনি যদি মিষ্টি সুর তৈরি করতে না পারতেন—যে সুর স্বচ্ছন্দে কথা বাদ দিয়ে গাওয়া যায় ও গাইতে ভাল লাগে—তা হলে কথার অপর্য্যাপ্ত সমারোহ নিয়েও তাঁর গানকে অনেকদিন সঙ্গীত-জগৎ থেকে বিদায় নিতে হত। সুতরাং প্রবন্ধের আরম্ভে কথা-প্রধান গান বলে একটা শব্দ তৈরি করলেও সত্য সত্য তার কোন ভিত্তি নেই, গান চিরদিনই সুর-প্রধান।

এ কথার সত্যতা আরও উপলব্ধি করিতে পারি গায়ক

গায়িকাদের বয়স বিবেচনা করলে। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান বয়স্ক লোকের সহজে বোধগম্য না হলেও অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা সেগুলি গেয়ে লোকের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়। এটা ঠিক যে, গায়ক গানের মানে না বুঝে যদি রসসৃষ্টি করতে পারে, তা হলে বুঝতে হবে গানের প্রাথমিক উপাদান সুর, কথা নয়। বর্ত্তমানে কলিকাতার রাস্তাঘাটে 'অছুত কন্যা' টকির হিন্দিগান 'বনকে চিড়িয়া' লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে দেখা যায়। গানটির কথাতে যে খুব কাব্যরস আছে, এমন নয় এবং যারা গায়, তারা যে গানের মানে বেশ বোঝে, এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ মিষ্টি সুর কথাকে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে চলেছে। 'আলিবাবা'র গানগুলি কাব্যরসাত্মক নয়, তা সত্ত্বেও তাদের জনপ্রিয় হতে বাধে নি।

তবু গানে কথার যে একেবারে মূল্য নেই, এমন কেউ বলবে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনায় কথার মূল্য গৌণ হলেও তার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্ভ্রম থাকা দরকার। কথাগুলির অর্থ যাতে স্ফুট হয়, এই কারণে তিনি সুরের বিস্তার ও কিছু অলঙ্কার বর্জ্জন করেছেন। কথার প্রতি এই মমতা না থাকলে তিনি কবি হতে পারতেন না। সুতরাং তাঁর গানে তাঁর নির্দ্দেশ সর্ব্বতোভাবে মানা উচিত এবং তাঁর গানে ওস্তাদী তানালাপের সর্ব্বপ্রথম প্রতিবাদ বোধ হয় আমি ১৩৩৮-এর পরিচয় পত্রিকায় করি। এককালে ইটালীয়ান অপেরায় (কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতযুক্ত অভিনয়) গায়করা কথার বিকৃতি ঘটানতে Gluck তাঁর Alceste অপেরার (১৭৬৭ খৃঃ) ভূমিকায় লেখেন—

> "I endeavoured to restrict the music to its proper function, that of seconding the poetry by enforcing the expression of the sentiment and the interest of the situations without interrupting the action or weakening it by superfluous ornament...... I have not thought it right to hurry through the second part of a song, if the words happened to be the most important of the whole, in order to repeat the first part four times over; or to finish the air where the sense does not end in order to allow the singer to exhibit his power of varying the passage at pleasure".

গায়কের পক্ষে যদি এ কথা বলা যায় - নিজেকে যদি সুরে ছেড়ে দিতে না পারা গেল তবে গান করে সুখ কি! উত্তর এই—ভারতীয় উচ্চসঙ্গীতে তার যথেষ্ট অবকাশ আছে। যদিচ অপেরায় কথার মর্য্যাদা রেখে কবিতার সাহায্য করার সাক্ষী Gluck করেছেন, অধিকাংশ য়ুরোপীয় গীত-রচয়িতা কথার প্রতি অত্যন্ত অকরুণ।

এ পর্য্যন্ত আলোচ্য বিষয় থেকে এই বোঝা যায় প্রকৃত কাব্যরসের সন্ধান গানে খোঁজা নিষ্ফল। তার জন্য কাব্যসাহিত্যের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায় নেই। গানে কথা বিকৃত হবেই। কারণ কথার শুদ্ধতার মানদণ্ড রয়েছে ভাষায় ও ভাষার অন্তর্গত কাব্যে। এই কারণে Greening Lamborn সাহেব সাহিত্য আলোচনার অবসরে বলেছেন

> "The practice of 'setting' poems as songs is a very different matter. If that can be justified at all, it is not on the ground that it illustrates and emphasizes the beauty of poetry; a poem, such as 'Crossing the Bar', has its own music of the *speaking* voice, and was never conceived as *sung* sound nor meant to be translated into it; to my mind there could be no worse example of 'wasteful and ridiculous excess', it is at least as bad as to paint a lily. I understand that Shelley's 'West Wind' has been set as a song. I hope, I may never hear it."

ভারতীয় ওস্তাদেরা ভজন প্রভৃতি ধর্ম্মসঙ্গীত গাইতে চান না, এ রকম একটা অখ্যাতি আছে। ধর্ম্ম-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, শুধু কথার দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না, গায়কের জীবনযাত্রার ধারায় ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তার নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। ভজন জনতার কোলাহলে গাইবার জন্য সৃষ্ট হয়নি, ভক্ত সাধু সন্ন্যাসী এগুলি নির্জ্জনে একলা বা ভক্তিপ্রবণ শ্রোতাকে

শোনাবার জন্য গাইতেন। ওস্তাদী গানের আসরে লোকে ধর্ম্মানুশীলনের জন্য আসে না, সেখানে যায় সঙ্গীত-চর্চ্চার জন্য, সুতরাং এখানে ভজন গাওয়ার কোন অর্থ হয় না। ওস্তাদী গানে দেব, দেবী, ঈশ্বরের আরাধনা নেই তা নয়, কিন্তু সুরের কসরতে তারা মাত্র কয়েকটা বিশ্লিষ্ট স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে পরিণত হয়; কিন্তু ভজন যে এ শ্রেণীর গান নয়, এটা যে ওস্তাদরা বোঝেন, তাতে তাঁদের সুবুদ্ধির প্রশংসাই করা উচিত। তবু আমার জীবনে সব চেয়ে ভাল ভজন শুনেছি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের কাছে, গেয়েছিলেন সঙ্গীতরত্ন নাসিরুদ্দিন খাঁ। তাঁর ঘরে একান্তে কয়েকজন শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। গায়কের নিতান্ত নির্লোভ, নির্ভীক, সাত্ত্বিক জীবন, তাঁর জ্ঞান, অত্যন্ত সুললিত হিন্দি ও সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ ভজনের যোগ্য আবেষ্টন সৃজন করেছিল এবং নিজে চূড়ান্ত ওস্তাদী জানতেন বলে ওস্তাদীপনা ভজন গাইবার সময় সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতে পেরেছিলেন। গানের কথাগুলিতেও তেমন গুরুত্ব ছিল না। যত ছিল যিনি গাইছেন তাঁর ব্যক্তিত্বে। তারপর আজকাল জুয়াচুরি ও মিথ্যার আশ্রয় না নিলে সংসারে চলা ও জীবিকা-নির্ব্বাহ যখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে, তখন ভজন গাইবার প্রকৃত অধিকারী ক'জন আছেন বলা শক্ত।

আর একটা কথা এই সম্পর্কে বলা যেতে পারে, গানের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নেই। অধিকাংশ গায়ক আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিশেষ উৎসুক নয় এবং পৃথিবীতে অনেক সাধু মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, যাঁরা গান গাইতে জানেন না। সুতরাং গায়কের বা ধার্ম্মিক লোকের ভজন বা অন্য কোন ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইতে হবে, এমন কোন বাধ্য-বাধকতা থাকতে পারে না। সঙ্গীত-চর্চ্চা আধ্যাত্মিকতার চেয়ে জীবনের নিম্নস্তরে অবস্থিত, যদিও স্তরগুলি পরস্পর সম্বন্ধশূন্য নয়। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কয়েক লাইন তুলে দিলে কথাটি আরও সুস্পষ্ট হবে ;—

> "The mind of man is not only a vital and physical, but an intellectual, aesthetic, ethical, psychic, emotional and dynamic intelligence ·····Mind has not the clue to the whole reality of life. The clue must be sought in something greater, an unknown something above the mentality and morality of the human creature." *Essays on the Gita*, vol II p 458-58.

এইবার উচ্চসঙ্গীতে এসে দেখা যাক, কথা ও সুরের আপেক্ষিক অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে। পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, গানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে কথা কেমন করে ক্ষুণ্ণ হয়। উচ্চ-সঙ্গীতে এই শব্দবিকৃতির বাহুল্য ঘটেছে। 'এসো নীপবনে ছায়াবীথিতলে'র 'নী'তে যদি এক মিনিট লম্বা তান মারা যায়, 'ব'তে গমক আরম্ভ হয়ে শেষ হয় 'নে'তে সুদীর্ঘ মিড়ে, 'ছায়াবীথি'র 'ছা'তে তবলিয়া তালবারণের কসরত আরম্ভ করেন ও 'ছায়া'র যদি বার দশেক 'ছায়া', 'ছায়া', অনুক্রমে নানা সুরে পুনরাবৃত্তি ঘটে (যা কাব্যে একেবারে অসম্ভব) অনুমান করা কঠিন নয় বেচারী 'নীপবনে' ও 'ছায়া-বীথি' ততক্ষণ সুরের দাপটে দিশেহারা হয়ে মা-ভারতীর অঞ্চলে মুখ লুকিয়েছে। এরই নানা লঘু ও গুরু সংস্করণের নাম হল বর্ত্তমান রেডিয়ো-প্রোগ্রামের 'ক্লাসিকো-মডার্ণ' বাংলা গান। এ রকম গানে কথার কোন মর্য্যাদা রাখা দূরে থাকুক, অর্দ্ধেক কথা বোঝাই দুষ্কর হয়। ২০।২৫ বৎসর-ব্যাপী বাংলা গানের গায়কের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, এ প্রকার গানে কাব্যত্ব পরিবেশন আর অসাধ্য-সাধন একই কথা। হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতে গায়ক এর চেয়ে আর এক ধাপ ওঠেন। গত জ্যৈষ্ঠের প রি চ য়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, এখানে সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে। যে কথা 'উ'তে আরম্ভ হয়, সে মধ্যবর্ত্তী 'অ' (ইংরেজী cut'র 'u'র ন্যায়) কে আশ্রয় করে 'আ'তে উত্তীর্ণ হয়, 'ই'ও এ প্রকারে 'এ'র সাহায্যে 'আ'র দিকে আসবার চেষ্টা করে। মুসলমান গায়কেরা বিশেষ করে ধ্বনি-বৈচিত্র্য দেখান এবং এই বৈচিত্র্য মিষ্টি লাগার বৈজ্ঞানিক কারণ হচ্ছে বিভিন্ন স্বরবর্ণ মুখে বিভিন্ন ধ্বনি-উৎপাদক স্বরকক্ষের সৃষ্টি করে। সুতরাং যে কথা পূর্ব্বে অর্থপূর্ণ ছিল, সে শেষটা দাঁড়ায় প্রায় অর্থশূন্যের পর্য্যায়ে। এটা যে গায়কের অবহেলা বা অমনোযোগের দরুণ হয় তা নয়, কারণ বৈদিক সঙ্গীতে

দেখা যায়, প্রত্যেক সামের কয়েকটা (একটি থেকে তিন চারিটি) সাঙ্গীতিক সংস্করণ আছে। গানেতে কথার অক্ষরগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়ে অকারণ দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে পড়ে, কিন্তু সামগরা এই অবোধ্য সংস্করণগুলি সযত্নে রক্ষা করেন। সায়ণ তাঁর সামবেদ-ভাষ্যে সামগানে এগুলি যে প্রয়োজনীয়, তা শবরস্বামীর উক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী একাদশ শতাব্দীর প্রাচীন বাংলা গান 'চর্য্যাপদে' কথার যে বিকৃতি হয়, এ কথার উল্লেখ করেছেন (রূপশ্রী,পূজাসংখ্যা, ১৩৪৪)। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে অধিকাংশ গায়ক ও গীত-রচয়িতা কথার বিষয়ে বেশ উদাসীন, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং এর যে একটা কারণ আছে, এবং সুরের বিস্তারের ধর্ম্মই যে এই কারণ, এ সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নয়।

এই শব্দ-বিকৃতি অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে আশ্রয় পেয়েছে হিন্দি ব্রজভাষায় রচিত রাগাশ্রয়ী গান গুলিতে। হিন্দি গান গত চার পাঁচশ বছর প্রধানতঃ ব্রজভাষায় রচনার দরুণ অনবরত ঘষা-মাজার ফলে ভাষাটি উচ্চসঙ্গীতের অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। ব্রজ-ভাষাকে কিছু পরিমাণে কৃত্রিম বললেও চলে, কারণ ঠিক এই ভাষার হিন্দুস্থানে চল্ নেই। কিন্তু সঙ্গীতের দিক্ থেকে এ ভাষা এত সুললিত যে, ওস্তাদী গান রচনা এবং সুর বিস্তার করতে হলে সুর-রসিকের এর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। বাংলা, মারাঠী, গুজরাটী, এমন কি আধুনিক হিন্দিও এ ভাষার স্থান পূর্ণ করতে পারে নি। কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ এবং লঘু-গুরু বিচারের অভাব এর কারন নির্দ্দেশ করেছেন, ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ আরও কারণ বার হবে। ক্লাসিকো-মডার্ণ বাংলা গান হিন্দি গান হতে পারল না বলে দুঃখ করার প্রয়োজন নেই (য়ুরোপেও ভাষাগত বৈষম্যের জন্য ইংরাজী গান ইটালীয়ান বৈশিষ্ট্য পায়নি এবং গায়করা প্রায়ই তিন চারিটি ভাষায় গান করেন), সে যদি নিজের কোন বিশিষ্ট ধারার সৃষ্টি করতে পারে, সঙ্গীতের পক্ষে সেটা লাভই দাঁড়াবে। বর্ত্তমানে অপরিমিত ভাবে হিন্দি সুর থেকে এবং পরিমিত ভাবে ইংরাজি সুর থেকে গ্রহণ করে বাংলাগান গড়ে উঠছে। এখন চলেছে নানা পরীক্ষার যুগ, সেটা এক কালে কেটে গেলে এই ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হবে, তবে এই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও ঐশ্বর্য্য বহুল পরিমাণে থাকবে সুর-বৈচিত্র্যে, কথার মিষ্টত্বে নয়। উচ্চসঙ্গীতে কথার তুচ্ছতা থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে শব্দ-বিকৃতি অনিবার্য্য, সেখানে কবিত্বের অবতারণা করে লাভ কি? কাব্য-রস উপভোগের স্থান গান নয়, তার জন্য কাব্য-সাহিত্যের প্রসারিত ক্ষেত্র রয়েছে। সুর যেটুকু কথার প্রতি মমতা প্রকাশ করে, তাতে কোন কাব্য-রসিকের রসতৃপ্তি হওয়া সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়।

এই বার কথার মায়া ছাড়িয়ে সুরের রাজ্যে আসা যাক, যেখানে সুর, কথাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করেছে। হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে, তার সুরে, ষ্টাইলে, কারু স্বর-বিন্যাসে, সূক্ষ্মান্তর স্বরপ্রয়োগে, যদিও কারণটা অত্যন্ত মামুলি। বাংলা সাহিত্যের কথা নিয়ে দীর্ঘ সাধনার ইতিহাসের ন্যায় হিন্দুস্থানী গান কয়েক শতাব্দীর সুর-চর্চ্চার প্রমাণ তার ধ্রুপদ, খেয়ালে মজুদ রয়েছে। সুরের যথেচ্ছাচারিতা হিন্দুস্থানী গানে পূর্ণ অবকাশ পায় বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। কাব্যসাহিত্যে যেমন কথা, কণ্ঠসঙ্গীতের আলাপে, তরানায় ও যন্ত্রসঙ্গীতে সুর তেমনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। রাগের আলাপে ও তরানায় তেরে, তা, না, তোম, দানি, ওদে, নেতে, দাম, দিয়া, য়ললী, তদীয়ালা, ধেতে, দেরে, ললা, দিতিলি প্রভৃতি সম্পূর্ণ অর্থহীন শব্দ ব্যবহৃত হয়। বাংলা দেশে কেউ কেউ যেন বলতে চেয়েছেন যে, রাগের আলাপ যন্ত্রসঙ্গীত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কথাটি অত্যন্ত অভিনব ও অদ্ভুত (পূর্ব্বাচার্য্যগণ ও গায়কদের মত ও সিদ্ধান্ত সমেত আলাপের বিস্তারিত আলোচনা লেখকের 'Problems of Hindustani Music'এ দ্রষ্টব্য)। এ অদ্ভুত মতের সমর্থন দূরে থাকুক, উল্লেখ পর্য্যন্ত কোথাও নেই।

সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখা যায়, কণ্ঠসঙ্গীত আগে পরিণতি লাভ করে। যন্ত্রসঙ্গীত প্রথমে কণ্ঠসঙ্গীতের অনুকরণে রচিত হয়, পরে কণ্ঠসঙ্গীতের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। য়ুরোপে যন্ত্রসঙ্গীত এখন স্বাধীন, আমাদের দেশে এখনও যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতের অনুগত হয়ে চলেছে। রাগালাপ যদি যন্ত্রসঙ্গীত থেকে আসত, তা হলে রাগ ভাল

করে শিখতে হলে প্রত্যেক আলাপ-গায়কের যেতে হত যন্ত্রীর কাছে, কিন্তু যন্ত্রসঙ্গীত জীবনে একবার না শুনেও অনায়াসে বড় আলাপ-গায়ক হওয়া যায়। কিন্তু হয় ঠিক উল্টো, প্রত্যেক বড় যন্ত্রীরই যন্ত্রসঙ্গীতে পটুতা লাভ করতে হলে গান শিখতে হয় ভাল করে, এ কথা সর্ব্বজন-বিদিত। আমার মনে হয়, এ ভ্রান্তির কারণ হচ্ছে, কোন কোন গায়কের কণ্ঠে কখনো কখনো বীণাবাদনের অনুকৃতি শোনা যায়, যদিও এ প্রণালীর আলাপের আলাপ-গায়কের মধ্যে প্রবল বিরোধী দল দেখা যায়। কিন্তু কণ্ঠে কি যন্ত্রের কোন যথার্থ অনুকরণ সম্ভব? বীণার তন্ত্রী বা তারে, এবং মানুষের কণ্ঠে ধ্বনি-উৎপাদন এক নয়। অর্থহীন শব্দও কণ্ঠ থেকে উদ্ভূত হলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আশ্রয় নিতে হবে এবং তারের যন্ত্রে ধ্বনির প্রকৃতি বর্ণাত্মক নয়, এ কথা ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় সঙ্গীতসারে (৮৬৮ পৃঃ) তবলার বোল সম্বন্ধে বলে গিয়েছেন। "তা, দিং, থা, কি ইত্যাদি বাক্যের বোলগুলি যে বাদকদিগের কল্পিত,তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেহেতু কেবল ধ্বন্যাত্মক নাদ হইতেই বাদ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ধ্বন্যাত্মক নাদ হইতে তা, থা, গি ইত্যাদি বর্ণাত্মক নাদ কখনই সম্ভবে না"। তরানাতে আলাপের শব্দগুলির মধ্যে 'নেতে, তা, দ্বিম্, য়লন্, ধেতে, তদীয়ালা' প্রভৃতি শব্দের বীণাধ্বনির সঙ্গে কি বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য আছে? যদি সামান্য অনুকৃতি ধরেই নেওয়া যায়, তাতেই বা কি প্রমাণ হয়? কেউ যদি গলায় বাঁশীর সুরের অনুকরণ করে, তবে কি বুঝতে হবে, সে বংশীধ্বনি থেকে গান শিখেছে? উৎপত্তি ও অনুকৃতির প্রকৃতি এক নয়। ভারতে যন্ত্র-সঙ্গীত-সম্পর্ক-লেশ-শূন্য আলাপীর এখনও অভাব হয়নি (প্রয়োজন হলে আমি গেয়ে দেখাতে পারি)।

উপসংহারে বক্তব্য যে, কেবল গানে নয়, ভাষাতেও একটা সুর লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক কথার মানে তার বলবার সুর থেকে ধরা হয়। গানে এই সুর সংস্কৃত ও পরিমার্জ্জিত হয়ে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। কথানিবদ্ধ সঙ্গীতে সুর তত বিস্তৃত বা অলঙ্কৃত হতে পারে না এবং সুর-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চসঙ্গীতে কথার বিকৃতি ঘটতে আরম্ভ করে। অবশেষে অর্থশূন্য কথার সাহায্য নিয়ে আলাপে সুর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপত্ব পায়। সুতরাং উচ্চসঙ্গীতে বিশেষ করে এবং অন্য সঙ্গীতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কথা কাব্য-সাহিত্যের ধর্ম্ম থেকে চ্যুত এবং এ কারণে কাব্য-রসের স্ফূর্ত্তি গানে সম্ভব হয় না।

সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর আবাহন

— শেলী

অদৃশ্য শক্তির ছায়া ভীতিমাখা পৃথিবী উপর
ভেসে চলে যায়,
নিদাঘ বাতাস মত ফুলে ফুলে দিয়ে যায় ভর
চঞ্চল পাখায়,
হৃদয়ে হৃদয়ে আসে অন্তর পরশি' চলি যায়,
ক্ষণতরে দেখা দেয় আবার সে কোথায় মিলায়,
চাঁদের জ্যোছনা মত ঢালি দেয় রূপের ঝরণা
পর্ব্বত উপর;
সন্ধ্যার রাগিণী যথা রঙে সুরে হয় আভরণা
প্রিয় প্রিয়তর,
বসন্ত নিশীথে যথা নক্ষত্রের পাশে মেঘমালা,
লুপ্ত গীতি স্মৃতি যথা, রহস্যের আবরণে ঢালা।

মানবের রূপ, চিন্তা যাহে শোভে তোমারি কিরণ
তোমারি সে আলো
সৌন্দর্য্যের লক্ষ্মী তুমি পূত করি' ফেলিয়া চরণ,—
আর নাহি জ্বালো,—
রাখিয়া মোদের যাও অশ্রুনদী, অনিযুক্ত, একা।
সূর্য্যের কিরণে কেন নাহি সদা ইন্দ্রধনু লেখা
অই শৈলনদী পাশে; যাহা কিছু দৃষ্টিমাঝে মেলে
কেন সে হারায়;
ভয়, স্বপ্ন, মৃত্যু, জন্ম পৃথিবীর 'পরে শুধু ফেলে
বিষাদের ছায়;
কেন আছে অভিপ্রায় মানুষের অন্তর মাঝারে
প্রেম তরে, ঘৃণা তরে, আশা মাঝে নিরাশার ধারে;

আসে নাই কোন বাণী মহান্ জগত হ'তে এর
ঋষি, কবি কাছে :
দৈত্য, স্বর্গ, প্রেত নাম তাই শুধু ব্যর্থ উদ্যমের
নিদর্শন আছে ;
শক্তিহীন মন্ত্রগুলি অপারক মোহন মায়ায়,
বিচ্ছেদ আনিতে শক্তি নাহি তার যাদুর প্রভায়
যাহা শুনি যাহা দেখি সংশয়, সন্দেহ, চঞ্চলতা।
আনি তব আলো',—
বীণাযন্ত্রে সুর যথা নিশা বায়ে স্তব্ধ নীরবতা,—
সত্য, শ্রীরে ঢালো
জীবন-অশান্ত-স্বপ্নে,—নীহারিকা যথা বিতাড়িত
পর্ব্বত উপর হতে, চন্দ্রালোক নদীতে নিশীথ।

প্রেম, আশা, আত্ম-শ্রদ্ধা ক্ষণিকের আসিয়া অতীত
মেঘের মতন।
মানব অমর হত, সর্ব্বশক্তিমান, তার চিত
করিয়া যতন
ভরি' দিতে অজানিতে, ভক্তি-ভয়ে যেমন তোমার।
দূত তুমি করুণার প্রেমিকের নয়ান আসার
জোয়ার ভাঁটায় খেলে ; চিন্তারাশি সঞ্জীবিত কর'
মানবের তুমি,
স্তিমিত প্রদীপে যথা অন্ধকার! নাহি নাহি সর
তব ছায়া চুমি' :
যেয়ো না যেয়ো না তুমি মৃত্যু পাছে অন্ধকারে ভরে,
জীবন ভয়ের মত, চিরকাল স্তব্ধতায় মরে।

কৈশোর বয়সে আমি খুঁজিয়াছি ভূত প্রেত তরে,
দিব্য বাণী আশে,
ভীতির চরণ ক্ষেপে বনমাঝে তারালোকে ভরে,
গুহা, ভাঙা বাসে।
ডাকিয়াছি ভীতিমাখা নাম ধ'রে ছোট বেলাকার,
দেখি নাই তাহাদের, শুনি নাই বাণী যে তাহার ;

যখন ভাবিতেছিনু গভীরেতে জীবনের কথা
সেই শুভক্ষণে
বাতাস প্রণয় করে প্রাণবন্ত যে আনে বারতা
পাখী, প্রস্ফুটনে,
তখন তোমার ছায়া অকস্মাৎ পড়ে মোর 'পরে,
চীৎকারিনু, তালি দিনু আনন্দেতে দুই হাত ভরে!

শপথিয়া বলিয়াছি শক্তি মোর দিব তব পায় :
দিই নাই তাহা?
সজল নয়নে আমি এখনও স্পন্দিত হিয়ায়
ডাকি প্রেতছায়া
নীরব কবর হ'তে প্রত্যেকেরে : হিংসা-করা রাতে,
পাঠকার্য্যে, প্রেমানন্দে নিরীক্ষিত কুঞ্জে মোর সাথে
অধিক জাগিয়াছিল : জানে তারা আনন্দ সে ভালে
দেয় নাই জ্যোতি
আশা ভাতি—দিবে তুমি অন্ধ দাসত্বরে মুক্তিমালে,
ওগো তুমি অতি
অপরূপ সুন্দরতা, দিবে আনি চির আকাঙ্ক্ষিত
বাক্যের প্রকাশ পারে অকথিত বন্দনাতে গীত!

প্রশান্ত গম্ভীরতর দিন হ'ল মধ্যাহ্নের পর :
ঐক্য এক রাজে
শরৎ ঋতুর মাঝে, দীপ্তিমাখা উজ্জ্বল অম্বর,
নিদাঘের মাঝে
অশ্রুত ইহার সুর, অদর্শিত চিত্র মধু রাগে,
যেন কভু হবে না ক' যেন কভু হয় নাই আগে!
প্রকৃতির সত্য মত তব শক্তি উদাস যুবকে
দাও নামাইয়া,
সম্মুখ জীবনে মোরে শান্তি দিতে, তব উপাসকে,
প্রীতি রূপ নিয়া
যে তোমার, সৌন্দর্য্যের দেবী, যারে, মন্ত্রে দিলে বেঁধে,
নিজের করিতে ভয়, বিশ্বলোকে প্রেম দিতে সেধে।
—অনুবাদক—শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

জোড়াদীঘি বনাম রক্তদহ

[১৩]

চৌধুরী বাড়ীর প্রকাণ্ড আঙিনা লোকে ভরিয়া গিয়াছে; দশ দিন হইল ক্রমাগত প্রজার দল আসিতেছে; বিভিন্ন পরগণা হইতে, দূরের গ্রাম হইতে, কাল রাত্রে শেষ দল আসিয়া পৌছিয়াছে। ইহারা সকলেই চৌধুরীদের প্রজা। কিন্তু প্রজা বলিয়াই ইহাদের আহ্বান করা হয় নাই, ইহাদের অধিকাংশ বিখ্যাত লাঠিয়াল, অনেকেই বিখ্যাত শড়কিবাজ।

চৌধুরীদের জমিদারির মধ্যে দুইটি পরগণা লাঠিয়াল ও শড়কিবাজের জন্য বিখ্যাত। জোড়াদীঘি হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে শুকান গাড়ি পরগণা—এখানকার প্রজারা বিখ্যাত লাঠিয়াল; ইহাদের মত দুর্দ্দান্ত, পরাক্রান্ত লাঠিয়াল উত্তর-বঙ্গে কম আছে। আবার জোড়াদীঘি হইতে দশ ক্রোশ পূবে চলনবিলের মধ্যে বিখ্যাত শড়কিবাজদের বাস; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একবার নবাবের ফৌজকে আক্রমণ করিয়া হঠাইয়া দিয়াছিল। সে অনেকদিনের কথা, নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে নৌকায় করিয়া একদল নবাবী ফৌজ মুর্শিদাবাদ হইতে বড়ল নদী দিয়া, চলনবিল হইয়া ঢাকা যাইতেছিল। নিজামতী নৌ-বাহিনী চলনবিলে আসিয়া পৌছিলে শড়কিওয়ালাদের সঙ্গে সামান্য কারণে বিবাদ বাধিয়া ওঠে। ফৌজের সঙ্গে শড়কিওয়ালাদের একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়—অধিকাংশ নৌকা ডুবিয়া যায়—অনেকে ডুবিয়া মরিল, অনেকে শড়কির ঘায়ে মরিল, অধিকাংশ প্রাণভয়ে পালাইল। নবাবের কানে এই খবর পৌছিলে তিনি এই ভীরু সৈন্যদলকে তাড়াইয়া দেন, তাহাদের অধ্যক্ষের কান কাটিয়া ছাড়িয়া দেন, এবং এই শড়কিওয়ালাদের চলনবিলের মধ্যে পাঁচ খানি গ্রাম জায়গীর দান করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ কি ভাবে জনপ্রিয় হইতে হয় জানিতেন। কালক্রমে শড়কিওয়ালাদের উত্তর পুরুষ অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িলে তাহারা চৌধুরীদের অধিকারে আসে—কিন্তু এখনও ইহাদের যে প্রতাপ আছে, আর নাম তো শীঘ্র লোপ হইতে চায় না, তাহাতে সকলেই ইহাদের ভয় করিয়া চলে।

চৌধুরীদের আহ্বান পাইয়া শুকানগাড়ির লাঠিয়াল ও চলনবিলের শড়কিওয়ালা সদলবলে আসিয়াছে,—অনেকদিন তাহারা এমন দাঙ্গা করিবার সুযোগ পায় নাই—তাহাদের সকলেরই ধারণা হইয়াছে কলির চার পোয়া পুরিয়া আসিতেছে, নতুবা বাহুবল প্রকাশের সত্যযুগ চলিয়া যাইবে কেন!

আজই দলবল লইয়া রক্তদহের জমিদার বাড়ী আক্রমণ করিতে রওনা হইতে হইবে। আলিবর্দ্দী অতিশয় ব্যস্ত ভাবে এ দিকে ও দিকে ঘুরিতেছে; আঙিনার একপাশ দিয়া প্রজার দল বসিয়া গিয়াছে, তাহারা পেট ভরিয়া দই চিড়া ও সন্দেশ খাইয়া লইতেছে; যাহাদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, তাহারা কাছারীতে গিয়া নিজ নিজ মর্য্যাদা অনুসারে পারিশ্রমিকের টাকা গুনিয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতেছে; স্বয়ং দর্পনারায়ণ দেওয়ানজীর পাশে বসিয়া টাকা দিতেছেন।

এমন সময়ে আলিবর্দ্দী আসিয়া দর্পনারায়ণকে সেলাম করিয়া বলিল—দাদাবাবু, এ দিকের কাজ সব শেষ হয়েছে। দর্পনারায়ণ খুসি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সকলের খাওয়া হয়েছে।

আলিবর্দ্দী বলিল—আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছি।

—বেশ। দেওয়ানজী, সকলে বখশিস পেয়েছে?

দেওয়ানজী ক্রম-বর্দ্ধমান সুদীর্ঘ ফর্দ্দের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—নাম তো অনেকগুলো দেখছি, কত লোক হবে রে আলিবর্দ্দী।

আলিবর্দ্দী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—তা শুকানগাড়ি আর চলনবিলের দুই দল ধরলে শ' পাঁচেক হবে বই কি। দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দীকে বলিল—আচ্ছা তুই

গাঁয়ে সকলকে তৈরি হতে বল—আমরা আসছি। এই বলিয়া সে উঠিতে যাইবে, এমন সময়ে তিনু পাটনি ও শ্রীকান্ত ছুতোর আসিয়া দর্পনারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিল—দাদাবাবু, আমাদের একটা দরখাস্ত আছে।

দর্পনারায়ণ হাসিয়া বলিল— আজ আর নারে; ফিরে এসে হবে।

ইহা শুনিয়া তাহারা হাসিয়া বলিল—তা হয় না দাদাবাবু! ফিরে এসে আর দরখাস্ত করে' কি হবে?

—আচ্ছা তবে বল—বলিয়া দর্পনারায়ণ পুনরায় ভাল করিয়া বসিল।

তাহারা দুই জনে আরম্ভ করিল—দাদাবাবু, এ কি তোমার বিচার! রক্তদহের বদমাইসেরা এসে আমাদের গাঁয়ের অপমান করে' গেল—আর আমরা কিছু করতে পারব না!

দর্পনারায়ণ যেন একটু বিরক্তই হইল বলিল—তোরা কি চোখ বুঁজে থাকিস না কি? সেই জন্যেই তো চলেছি।

শ্রীকান্ত বলিল—কিছু যদি মনে না কর দাদা বাবু, তবে বলি—এ লোকজন তো তোমার! তোমাকে অপমান করেছে, তার জন্যে তুমি চলেছ! কিন্তু আমাদেরও তো অপমান হয়েছে, আমরা কি করলাম। এ বার দর্পণারায়ণ একটু খুসি হইল, জিজ্ঞাসা করিল—তোরা কি করতে চাস্?

দুইজন একসঙ্গে বলিল—আমরাও তোমার সঙ্গে যাব!

—তোরা দুইজন দিয়ে আর কি বেশি ফল হবে।

এবার শ্রীকান্ত একা বলিল—আমি একা মানে? গাঁয়ে কি পঁচিশ ঘর ছুতোর নেই!

তিনুও হটিবার লোক নয়, সে বলিল—জোড়াদীঘির জেলেদের মাছ খেয়ে আট দশখানা গাঁয়ের লোক মানুষ! এ গাঁয়ে কত ঘর জেলে আছে মনে কর দাদাবাবু!—তার পরে একটু থামিয়া নিজেই নিজের কথার উত্তর দিল —পঞ্চাশ ঘর!

দর্পনারায়ণ তাহাদের কথা শুনিয়া বলিল—বেশ, বুঝ-লাম তোরা অনেক লোক। কিন্তু তোদের অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?

—নেই?—তিনু পাটনী গর্জ্জন করিয়া উঠিল! আমরা ঢাল তলোয়াল বুঝিনে! মাছমারা 'কুচ' দিয়ে—বুঝলে না দাদাবাবু, এই এমনি করে ছুঁড়ে—এই বলিয়া সে ছুঁড়িবার ভঙ্গী করিল! কিন্তু আর কোন কথা বলিল না—তাহার ধারণা তাহার ভঙ্গীই যথেষ্ট; কথায় আর কি বেশি প্রকাশ করিবে?

তিনু থামিলে শ্রীকান্ত আরম্ভ করিল—আচ্ছা দাদাবাবু, মানুষ বেশি শক্ত, না বাহাদুরী কাঠ?

—কেন রে?

—তাই বল না আগে! সে প্রশ্ন করিল বটে, কিন্তু উত্তরের জন্য না থামিয়া বলিল—আমরা ছুতোর কাঠকাটা আমাদের ব্যবসা, আর মানুষকে কিছু করতে পারব না? তবে যদি রক্তদহের ব্যাটারা কাঠের চেয়েও শুকনো হয় —সে আলাদা কথা! এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ দেরী হইতেছে দেখিয়া বলিল—আচ্ছা তোরা যা। তৈরী হয়ে সব আয়। হাতিয়ার পত্তর সঙ্গে নিস্।

এই বলিয়া সে তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়া বৈঠক-খানায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, সেখানে রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ ছাড়া বাণীবিজয় উপস্থিত। তাহাকে লক্ষ্য দর্পনারায়ণ বলিল—পণ্ডিতমশায় আপনি তো যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে?

বাণীবিজয় বলিল—বাবু সাহেব (দর্পনারায়ণ যদিও তাহার ছাত্র, তবু সে জমিদার; কাজেই সে ভাবিয়া ভাবিয়া এই সংশোধনটি আবিষ্কার করিয়াছে; বাণীবিজয় প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, সে অযথা অর্থ ও পরমার্থকে মিশাইয়া ফেলিয়া জটিলতার সৃষ্টি করে না)। রণবিদ্যায় অবশ্য আপনার নৈপুণ্য আছে, কিন্তু একটি বিষয়ে অবহিত হওয়া আব-শ্যক। গ্রাম অরক্ষিত রেখে আপনারা যাচ্ছেন, কাজেই আমাকে অবস্থান করতে হ'ল।

দর্পনারায়ণ বলিল—উত্তম বলেছেন, তা হলে আপনার উপরে গ্রামের ভার দিয়ে যাচ্ছি।

বাণীবিজয় বলিল—অবশ্যই কর্ত্তব্য পালন করব, কারণ গীতাতেই সেইরূপ আদেশ আছে। কিন্তু স্মরণ রাখবেন আমি একক।

দর্পনারায়ণ বলিল—তা হ'লে একা থেকেই বা কি করবেন ?

রঘুনাথ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—পণ্ডিত মশায় আপনি একাই একশ ! ভেবে দেখ মেজদা, কৌরবরা নারায়ণী সেনা নিয়েছিল, কিন্তু অর্জ্জুন নিয়েছিল একা নারায়ণকে। বাণীবিজয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দর্পনারায়ণ ও তাহার দুই ভাই বৈঠকখানার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আঙিনার লোকদের দেখিতেছে, এমন সময়ে দেউড়ির বাহিরে তুমুল ঢাকের শব্দ উঠিল। ব্যাপার কি ? সকলে জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে রমেশ হাড়ি, (পাঠক বোধ হয়, এই নেশা-খোর লোকটাকে ভোলেন নাই) তাহার দল লইয়া অনেক গুলা ঢাক ও জয়ঢাক বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ করিল। হঠাৎ সম্মুখে দর্পনারায়ণকে দেখিয়া ঢাক রাখিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল-প্রণাম হই দাদাঠাকুর। এই বলিয়া সে উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু খানিকটা উঠিয়াই আবার পড়িয়া গেল।

কেহ কেহ বলিল—বেটা নেশা করেছে।

রমেশ মাটিতে মুখ রাখিয়াই বলিল—ও কথা বলনা বাবা। এই বলিয়া উঠিতে গিয়া আবার পড়িল—উঁহু এখনো শেষ হয় নি ! একে জমিদার, তায় বামুন, তায় আবার লড়াই করতে চলেছেন। ওরে মধু !—এই বলিয়া সে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল; তোরা কি কচ্ছিস্ !

মধু বলিল, তাহাদের প্রণাম করা শেষ হয়েছে।

—আচ্ছা তবে আমাকে টেনে তোল। মধু ও বিধুর আকর্ষণে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, ঢাক ঘাড়ে তুলিয়া রমেশ বলিতে আরম্ভ করিল—বাবা এতবড় ব্যাপার আর সিদ্ধি-গণেশকেই ভুলে গেলে। বাজনা ছাড়া কাজ হয়! বরঞ্চ দুটো বর্শা, শড়কি, ঢাল তলোয়ার কম করে নাও। কিন্তু জয়ঢাক না হলে চলবে কেন ? তবেই তো নাম জয়ঢাক। উহুঁ, তোমরা যেন বাবু বিশ্বাস করছ না। বাজা তো বাজা একবার—এই মধু, এই বিধু।

পিতার আদেশে মধু, বিধু ও অন্য সকলে ঢাক ও জয়ঢাকে কাঠি দিল। বিকট বাজনায় আঙিনা প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রমেশ, যে-রমেশ প্রণাম করিতে গিয়া বিনা সাহায্যে উঠিতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, সে অতবড় একটা ঢাক ঘাড়ে করিয়া বিষম লাফালাফি সুরু করিল, অথচ পড়িবার নামটি পর্য্যন্ত করিল না।

দর্পনারায়ণ তাহাদের থামাইয়া দিয়া বলিল—কি, তোরা সঙ্গে যাবি এই তো ?

রমেশ বলিল—না।

—তবে কি আবার ?

রমেশ জনতাকে দেখাইয়া বলিল—এরা আমাদের সঙ্গে যাবে। আমরা যাব আগে আগে বাজাতে বাজাতে, এরা আসবে পিছনে। কিন্তু যখন লড়াই আরম্ভ হবে, এরা যাবে আগে, আমরা থাকব পিছনে এবং আড়ালে।

—আড়ালে কেন রে ?

—বল কি দাদাবাবু ! শড়কি লেগে ঢাক ফুটো হয়ে গেলে বাজাব কি ?—কি বলিস রে ? এই বলিয়া সে তাহার দলের দিকে তাকাইল। সকলেই দৃষ্টিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

দর্পনারায়ণ বলিল—আচ্ছা তবে চল।

অনুমতি পাইয়া রমেশ ও তাহার দল বল পুনরায় বিকট উৎসাহে বাজাইতে আরম্ভ করিল।

দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —আলিবর্দ্দী সব তৈরি তো ? আলিবর্দ্দী সম্মতি জানাইলে কি ভাবে যাত্রা করিতে হইবে দর্পনারায়ণ তাহা বুঝাইয়া দিতে লাগিল।

—সকলের আগে যাবে শড়কিওয়ালাদের দল ; তারপরে যাবে লাঠিয়ালেরা ; তুই থাকবি শড়কিওয়ালা ও লাঠিয়ালদের মধ্যে। আমরা তিনজন ঘোড়ায় চড়ে যাব লাঠিয়ালদের পরে। আর আমাদের পরে আসবে গাঁয়ের ছুতোর আর জেলের দল।

আলিবর্দ্দী জিজ্ঞাসা করিল—আর রমেশদের বাদ্যভাণ্ড।

—বেশ, তারা যাবে সকলের আগে। বাজনা কিন্তু থামতে দিস্ নে !

আলিবর্দ্দী হুকুম পাইয়া দলের মধ্যে গিয়াছে, এমন সময়ে পুনরায় দেউড়ির বাহিরে রাম-শিঙার তীব্র

ধ্বনি শোনা গেল। সকলে জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল—এ আবার কি ?

এমন সময়ে প্রকাণ্ড এক রাম শিঙা বাজাইতে বাজাইতে আব্বর প্রবেশ করিল—হাতে তাহার সেই দাঁড়-কাক। তাহাকে দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল—তাহার নিজের হাসি সকলকে ছাপাইয়া শোনা গেল।

আব্বরকে দেখিয়া রমেশ হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল বলিল—দুষমণ, দাদাবাবু, দুষমণ!

দর্পনারায়ণ ধমক দিয়া বলিল—চুপ কর! তারপরে তাহাকে ইসারায় কাছে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল—তুই যাবি সকলের আগে শিঙা বাজাইতে বাজাইতে।

আদেশ শুনিয়া রমেশ বিরক্ত হইলেও আপত্তি করিতে পারিল না।

এই সব আয়োজনে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। তখন সেই ছোট সৈন্য-বাহিনী দেউড়ি অতিক্রম করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিল।

প্রথমে শ'দুই শড়কিওয়ালা মাল-কোঁচা মারিয়া কাপড় পরা; বাঁ হাতে ছোট একখানি করিয়া বেতের ঢাল—ডান হাতে দীর্ঘ শড়কি, তাহার তীক্ষ্ণ ফলা রৌদ্রে চকচক করিতেছে।

শড়কিওয়ালাদের পরে প্রায় শ'দুই লাঠিয়াল। পাকা বাঁশের কালো লাঠি তাহাদের হাতে; খালি গায়ে শীতের রোদ পিছলিয়া পড়িতেছে। এই দুই দলের মাঝে পঞ্চা-শোত্তীর্ণ আলিবর্দ্দীর সরল, সমুন্নত, বলিষ্ঠ দেহ; এক হাতে তাহার লাঠি, অপর হাতে বন্দুক।

লাঠিয়াল-বাহিনীর পরে তিনটি ঘোড়াতে রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও দর্পনারায়ণ; দর্পণারায়ণ মাঝখানে। তাহাদের প্রত্যেকের কোমরবন্ধে তলোয়ার—এক হাতে বন্দুক, অপর হাতে ঘোড়ার লাগাম।

সব শেষে চলিয়াছে গাঁয়ের ছুতোর, জেলে ও অন্যান্য লোক। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের স্থিরতা নাই; যে যাহা পাইয়াছে, লইয়াছে; কাস্তে কুড়ুল, কোদাল, লাঠি, বর্শা-কুচ, শাবল, খোন্তা, লাঙল, জীর্ণ তলোয়ার, ঢেকির মুগুর পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই; জনতার অসংখ্য হাতে জনতার উপযুক্ত অস্ত্র! অনেকে শুধু হাতেই চলিয়াছে, লুট-তরাজ তাহাদের ইচ্ছা, কাজেই অস্ত্র বহিয়া হাতকে বেহাত করা কিছু নয়।

আর সকলের আগে চলিয়াছে রমেশ হাড়ির ঢাক, জয় ঢাক ও ডঙ্কা। বাজনার তালে তালে পা ফেলিয়া শড়কি-ওয়ালাও লাঠিয়ালেরা চলিয়াছে; জনতা যেমন খুসি পা ফেলিতেছে; আর মাঝে মাঝে ঢাকের বাজনাকে ছাপাইয়া উঠিতেছে আব্বরের শিঙ্গার শব্দ। মূক বালকের মনের তীব্র ইচ্ছা যেন এতদিন পরে ওই তীব্র শব্দের মধ্যে রূপ পাইয়াছে।

জোড়াদীঘির রাস্তা দিয়া এই দীর্ঘ জনতা হিংস্র, দীর্ঘ, চঞ্চল সরীসৃপের মত রক্তদহের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে জনতার কোলাহল কমিয়া আসিল—বাজ-নার শব্দও ক্ষীণ হইয়া আসিল—কেবল মাঝে মাঝে আব্বরের শিঙ্গার শব্দ দ্বিগুণিত বেগে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহার যেন ক্ষীণতা নাই। সে শব্দ শ্মশানের ইঙ্গিত বহিয়া বুকের মধ্যে গিয়া চমকাইয়া তুলিতে লাগিল। মূক যখন মুখর হয়—তখন এমনিই হয়।

সৈন্যবাহিনী জোড়াদীঘি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে হঠাৎ গ্রামখানা অত্যন্ত নীরব ও ম্লান বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

[১৪]

সেদিন নারিকেল কাড়াকাড়িতে রক্তদহের পরাজয়ে ইন্দ্রাণী সেই যে শয়নঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তারপর হইতে তাহার মনের চাঞ্চল্য কমে নাই। সমুদ্রের উপরে তরঙ্গের আন্দোলন হয়, ভিতরে শান্ত; ইন্দ্রাণীর ঠিক বিপরীত; তাহার আন্দোলন যা কিছু সব ভিতরে, বাহিরে তাহার শৈল-গাম্ভীর্য্য।

সে অনেকদিন পরে আর একবার নিজের জীবনের মানসচিত্রখানা সম্মুখে মেলিয়া দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। মানুষের জীবনের বর্ত্তমান-টা অত্যন্ত অশরীরী, তাহার প্রেতোপম দেহ ধরা-ছোঁয়া যায় না; কিন্তু অতীতের দিকে তাকাইলে দেখা যায় সেখানে বর্ত্তমানের কঙ্কাল স্তূপীকৃত। এত কঙ্কাল ওই সূক্ষ্মশরীরীর মধ্যে ছিল!

সে নিজের ইচ্ছার, স্বভাবের বিরুদ্ধে পরন্তপকে বিবাহ করিয়াছিল; ভাবিয়াছিল, সে আর কিছু না হোক, বীর পুরুষ; কিন্তু প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল অভীষ্টের দিকে তাহার বীরবর এক পদও অগ্রসর হইল না। শুধু তা-ই নয়, চাঁপার হাতে কি দারুণ অপমানের সে কারণ হইয়া উঠিয়াছে! সে স্বচক্ষে গভীর রাত্রে, ফুলের মালা গলায় তাহাকে চাঁপার শয্যায় নিদ্রিত দেখিয়াছে! প্রতি রাত্রে তাহার মত্ত বীভৎসতা দুরূহ অভীষ্টের খাতিরে সহ্য করিয়াছে!

পরন্তপ যখন প্রতিহিংসার জন্য একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করিল না, তখন সে নিজে রক্তদহের লোকদের দিয়া জোড়াদীঘিকে নারিকেল কাড়াকাড়িতে আহ্বান করিয়াছিল; তাহার বড় ভরসা ছিল, জোড়াদীঘি পরাজিত হইবে, কিন্তু সেখানেও জোড়াদীঘিরই জয়!

যেদিকে সে তাকায়, চাঁপা, পরন্তপ, দর্পনারায়ণ, নিজের মন, এই চারি সত্তা জতুগৃহের চারি দেয়ালের মত দাহ্য পদার্থে পূর্ণ; একদিকে আগুন ধরিয়া যাইতেই চারিদিকে অগ্নিসন্তাপ আরম্ভ হইল। মনের মধ্যে এ কি জহর ব্রত! শত শত অগ্নিশিখা কোন্ সহস্রবাহু দৈত্যের অসংখ্য তপ্ত অঙ্গুলির মত তাহাকে তীব্র যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল! বাহিরের আগুন জলে নেভে, কিন্তু মনের আগুন! মরিলে? কিন্তু ইন্দ্রাণী তো মরিতে রাজি নয়। বিশেষ, মানুষের মৃত্যু আছে, ইন্দ্রাণীর মত জন্ম-পাষাণীর আবার মৃত্যু কেমন করিয়া সম্ভব?

কিন্তু হঠাৎ সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল—অতর্কিতে, অভাবিত ভাবে। শ্লেষ-রসিক বিধাতা এমন কত বিস্ময় মানুষের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখেন!

পরন্তপ যে প্রতিমা বিসর্জ্জনের এমন একটা মতলব আঁটিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ইন্দ্রাণী জানিত না। বিজয়ার গভীর রাত্রে পরন্তপ যখন সিক্ত বস্ত্রে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল—ইন্দ্রাণী ভাবিয়াছিল অতিরিক্ত মদ্যপানে কোথাও জলে পড়িয়া গিয়া এমন ঘটিয়াছে। কিন্তু সব ঘটনা শুনিয়া সে স্বামীর পদতলে মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল—সে প্রণাম কেবল বিজয়া-দশমীর বাহ্য সংস্কার নয়, এমন ভক্তিভরে প্রণাম ইন্দ্রাণী কোন মানুষকে এর আগে আর করে নাই। এক মুহূর্ত্তে পরন্তপ তাহার চোখে লোকাতীত বীরত্বে ভূষিত হইয়া দেখা দিল—নিজেকে বীরপত্নী বলিয়া সে গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল।

তারপর হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিল; দিনের মধ্যে যাহাদের দু'চার মুহূর্ত্ত ছাড়া দেখা হইত না, এখন তারা সর্ব্বদা এক সঙ্গে থাকে, একত্র বসিয়া মন্ত্রণা করে। তাহাদের এই ঘনিষ্ঠতা এত আকস্মিক, এত স্বভাব-বিরুদ্ধ ও এতই সম্পূর্ণ যে, স্বয়ং চাঁপা ঠাকুরাণী ভয় পাইয়া গেল। তবে কি তাহার কৌশল ব্যর্থ হইল! ইন্দ্রাণীর মনকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য বিবাহের দ্বার দিয়া যে নকল প্রেমের গিল্টি করা লোহার শিকল সে গড়িয়া তুলিতেছিল; যে শিকলে সে-দিনের রাত্রির ঘটনার সে একটি মাত্র গ্রন্থি আঁটিয়া দিয়াছিল, তাহা কি এমন করিয়াই ব্যর্থ হইতে চলিল! পরন্তপ তাহার আয়ত্তাতীত হইয়া যায় ভাবিয়া সে ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল না। সংসারের পথ বড় বিচিত্র, পরম শত্রুদ্বয়েরও পথ মাঝে মাঝে এক জায়গায় আসিয়া কিছুক্ষণের জন্য মিশিতে পারে; আর সান্নিধ্য না ঘটিলে শত্রুতা সাধন করিবে কি উপায়ে! গলা টিপিয়া মারিতেও যে কণ্ঠালিঙ্গন আবশ্যক। সত্য কথা বলিতে কি, জীবনের পথে ইন্দ্রাণী ও পরন্তপের গতি কিছু কালের জন্য সমান্তরাল ভাবে চলিয়াছে; সমান্তরাল পথ ঘনিষ্ঠ হইলেও নিতান্তই পর, কোন কালেই তাহারা মিলিবে না। স্বামী স্ত্রী ক্রমেই নিকটতর হইতে ও চাঁপা ক্রমেই ভীততর হইতে লাগিল।

কিছুকাল এমনই চলিল।

[১৫]

ইন্দ্রাণী ও পরন্তপের মন্ত্রণার ফলে কি হইল, পাঠক তাহা খানিকটা জানেন। বিজয়া-দশমীর ঘটনার কয়েক দিন পরে জোড়াদীঘির লোক আসিয়া রক্তদহের হাট লুট করিয়া গেল; তার পরে দুই মাস ধরিয়া এই অঞ্চলে যে লুট-তরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি ও অগ্নিকাণ্ড চলিয়াছে, তাহার কিছু কিছু আভাস পাঠকদের দিয়াছি।

অগ্রাণ মাসের শেষে একদিন পরন্তপ সংবাদ পাইলে

জোড়াদীঘির চৌধুরীরা বহু শড়কি ও লাঠিয়াল লইয়া তাহাদের বাড়ী শীঘ্রই লুটিতে আসিবে। তখনই রক্তদহের প্রজাদের সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল; যেখানে যত জানাশোনা লাঠিয়াল, শড়কিওয়ালা ছিল, তাহাদের ডাকিয়া পাঠান হইল; রক্তদহে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

এ দিকে পরন্তপ লোকজন লইয়া জমিদার-বাড়ী আক্রান্ত হইয়া যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

সে কালের অধিকাংশ জমিদার-বাড়ীর ন্যায় রক্তদহের জমিদার বাড়ীও অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। তাহার দুই দিকে বেষ্টন করিয়া বড়ল নদী, নদী ও বাড়ীর মাঝে এত সামান্য স্থান যে যেখানে বেশি লোক দাঁড়াইতে পারে না; কাজেই সে দিক হইতে আক্রমণের বড় ভয় নাই, দক্ষিন দিকটাতে একটা বড় দীঘি পরিখার মত বাড়ীটাকে রক্ষা করিতেছে: কেবল পশ্চিম দিকে উচ্চ প্রাচীর ছাড়া অন্য কোন বাধা নাই; এই দিকেই বড় একটা মাঠ; পাঠক এর পরিচয় আগে পাইয়াছেন। পশ্চিম দিকই বাড়ীর দেউড়ি।

পরন্তপ অন্য তিন দিকের জন্য তত চিন্তিত না হইয়া পশ্চিম দিকটা সুরক্ষিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইল: দেউড়ির পরেই প্রকাণ্ড আঙ্গিনা, আঙ্গিনার তিন দিকে কাছারী, তোষাখানা ও বৈঠকখানা; সে অস্থায়ী ভাবে কাছারীর সেরেস্তা অন্দরমহলে পাঠাইয়া দিয়া এই আঙ্গিনাটাকে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিল। দেউড়ির প্রকাণ্ড কাঠের দরজা নূতন করিয়া মেরামত করা হইল; প্রাচীরের উপরের খানিকটা গাঁথনি ভাঙিয়া ফেলিয়া কাচের টুকরা বসাইয়া দিয়া নূতন করিয়া গাঁথা হইল; আর প্রাচীরের বাহিরের দিকে এক মানুষ গভীর করিয়া দীর্ঘ গড়খাই খনন করিয়া দিল।

ক্রমে দূরদূরান্তর হইতে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালারা আসিয়া পৌছিতে লাগিল। পরন্তপ বিশেষভাবে এই দিক হইতেই আক্রান্ত হইবে ভাবিয়া প্রতিরোধের ব্যবস্থায় লাগিয়া গেল। কাছারী, বৈঠকখানা ও তোষাখানার দোতালা ও তেতালা ছাদের উপর শড়কিওয়ালাদের স্থান হইল; লাঠিয়ালেরা আঙ্গিনায় থাকিবে; যদি জোড়াদীঘির লোক দেউড়ি ভাঙিয়া প্রবেশ করে, তখন তাহারা ঠেকাইবে; কিংবা রক্তদহের আক্রমণের সময় আসিলে লাঠিয়ালের দল বাহির হইয়া পড়িবে।

বৈঠকখানার ছাদের উপরে রাশীকৃত খান ইট সংগৃহীত হইল; ভাঙা ইটও যথেষ্ট, বরঞ্চ বেশিই; কারণ অর্দ্ধ-সভ্য ভাঙা ইট তর্কযুদ্ধে অধিক দূর যায়; খেজুরের কাঁটা, ঝামা ইট, ভাঙা শিশি-বোতল স্থানে স্থানে জমা করা হইল; অন্য তিন দিকেও এই সব বাঙ্গালী অস্ত্রের ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু তুলনায় অনেক কম।

পরন্তপ ও বেলা সব পরিদর্শন করিয়া ফিরিতে লাগিল। লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালাদের আহারের ও বাসের স্থান নির্দিষ্ট হইল; কে কোন্ সময় কোথায় দাঁড়াইবে তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইতে লাগিল; আর দেউড়ি হইতে বাড়ীর অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা দীর্ঘ দড়ির সঙ্গে গোটা কয়েক ঘণ্টা বাঁধিয়া সতর্ক করিয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের সুস্থ সবল লোকদের পরন্তপ নিজের সৈন্যদলে গ্রহণ করিল; সে জানিত যে, অন্যান্য শিশু ও স্ত্রীলোকদের উপরে কোন অত্যাচার হইবে না।

সব শেষে এতগুলি লোকের এক মাস চলিতে পারে এই মত চাল, ডাল, সর্ব্বপ্রকার আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া পরন্তপ জোড়াদীঘির সৈন্যবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

একদিন, দুইদিন, চারদিন যায়—জোড়াদীঘির লোকদের দেখা নাই; সকলেই কেমন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে দূরে ঢাকের বিকট শব্দে ও শিঙার তীক্ষ্ণ ধ্বনিতে রক্তদহ চমকিত হইয়া উঠিল; ছাদের উপরে সকলে উঠিয়া দেখিল, দূরে গ্রামের প্রান্তে অসংখ্য লোক; ম্লান আলোকে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে যত লোক তাহার বেশি প্রতীয়মান হইল। পরন্তপের আদেশে প্রকাণ্ড দেউড়ি সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল; লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালারা ছাদের উপরে যে যাহার স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। অত বড় বাড়ীখানা হইল নিস্তব্ধ, নির্জ্জন আর জোড়াদীঘির সৈন্যবাহিনী বহু ঢাকের বিকট শব্দে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল,

আর রক্তদহ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সেই শব্দ শুনিতে থাকিল।

[১৬]

পরদিন প্রাতঃকালে ছাদের উপর হইতে পরন্তপ দেখিল, বহুশত লোক তাহার বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর-পূব দিকে বেশি লোক নাই, কারণ সে দুই দিক নদীর দ্বারা সুরক্ষিত; দক্ষিণ দিকটাতে দীঘি—কাজেই সে দিকেও লোক কম, কেবল দীঘির পরপারে গোটা দুই বড় তাঁবু খাটানো হইয়াছে, অনুমানে বুঝিল ও দুটি- দর্পনারায়ণের জন্য; পশ্চিম দিকে ফাঁকা মাঠ—সেই খানেই লোকের বেশি ভিড়।

পরন্তপও এইরূপ হইবে অনুমান করিয়া সেই ভাবেই ব্যবস্থা করিয়াছে; তাহারও অধিকাংশ লোকের ব্যবস্থা এই কাছারীর আঙিনাতে। বাড়ীতে যে কয়েকটা বন্দুক ছিল, সেগুলি একত্র করিয়া দেউড়ি রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিল, কেবল নিজের কাছে একটা রাখিল।

তার পরে সে বেঙা ও অন্যান্য সর্দারদের ডাকিয়া কি ভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে, সেই উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমেই সে বেঙাকে চারিদিকে ঘুরিয়া পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত করিল।

বেঙা বলিল—মোতির মা বলেছিল, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে; এত বড় একটা লড়াই আরম্ভ হ'ল—কিন্তু বেঙা চৌকিদার সেই চৌকিদার।

পরন্তপ বলিল পাঁচজন লোক পাঁচটি বন্দুক লইয়া দেউড়ির কাছে থাকিবে; পালাক্রমে তাহারা হাত বদল করিবে। অযথা গুলি ছুঁড়িতে নিষেধ করিয়া বলিয়া দিল, জোড়াদীঘির লোক যখন দেউড়ি আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিবে, তখন দরজার ও প্রাচীরের ফাঁক দিয়া গুলি করিয়া সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে। সে বলিল—এই কাজটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কাঠের দেউড়ি ভাঙা তেমন কঠিন নয়, আর দেউড়ি ভাঙিয়া ফেলিলে রক্তদহের পরাজয় সুনিশ্চিত। পরন্তপ তাহাদের আশ্বাস দিল, তাহারা যদি দেউড়ি আটকাইয়া রাখিতে পারে—তবে সে জোড়াদীঘির অন্য আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ভার লইতেছে। ইতিমধ্যে রক্তদহের আরও সে আসিবার কথা; তাহারা আসিয়া জোড়াদীঘির লোকদের আক্রমণ করিলে, তখন জমিদার বাড়ীর লোকেরাও দেউড়ি খুলিয়া দিয়া জোড়াদীঘির সৈন্যদের উপরে পড়িবে; দুই দলের পেষণে জোড়াদীঘির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে।

যাহারা বন্দুক দিয়া দেউড়ি রক্ষার ভার পাইয়াছিল, তাহারা প্রাণপণে দেউড়ি রক্ষা করিবে। তখন পরন্তপ অন্যান্য লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল—যতক্ষণ জোড়া-দীঘিরা শড়কি, বা অন্য কোন অস্ত্র দিয়া আক্রমণ করিবে, তোমরা ছাদের আলিসার আড়ালে আত্ম-গোপন করিয়া থাকিবে অযথা আত্মপ্রকাশ করিয়া বিনষ্ট হইও না। ওদের লোক যদি প্রাচীর বাহিয়া উঠিতে চেষ্টা করে, তবেই খেজুরের কাঁটা, ইট, বা শড়কি ছুড়িয়া তাহাদের প্রতিরোধ করিবে।

পরন্তপ আঙিনায় দাঁড়াইয়া লোকজনের সঙ্গে এই সব কথা বলিতেছিল হঠাৎ কতগুলো উড়ো শড়কি আসিয়া নিকটে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জোড়াদীঘির ঢাক ও শিঙা বাজিয়া উঠিল। সকলে বুঝিল, জোড়াদীঘি আক্রমণ করিয়াছে; তাহারা সরিয়া গিয়া ছাদের উপরে ও ঘরের মধ্যে আশ্রয় লইল; বন্দুকধারীরা অতি সাবধানে দেউড়ি রক্ষায় মন দিল।

জোড়াদীঘির লোকেরা পশ্চিম দিক হইতে উড়ো শড়কি ছুড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এগুলি ছুড়িবার একটু বিশেষ রীতি আছে; উড়ো শড়কি দীর্ঘ হয় না—আকারে অনেকটা ধনুকের তীরের মত, সম্মুখে খানিকটা তীক্ষ্ণ ফলা। দুই সারি লোক দাঁড়াইয়া যায়; একদল সম্মুখে; একসারি পিছনে; পিছনের লোকেরা বসিয়া থাকে; সম্মুখের দল দাঁড়াইয়া; যাহারা বসিয়া থাকে, তাহারা শড়কি খানা লইয়া সম্মুখের লোকের ডান পায়ের কাছে দেয়—আর সে বুড়ো ও মাঝের আঙুলে চাপিয়া শড়কি ধরিয়া বেগে সম্মুখে নিক্ষেপ করে; অভ্যস্ত পায়ের বেগে নিক্ষিপ্ত শড়কি ধনুশ্চ্যুত তীরের মত শত্রুর উপরে গিয়া পড়ে—মানুষের উপর গিয়া পড়িলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া ফেলে।

প্রায় একশ লোক এই ভাবে শড়কি নিক্ষেপ করিতেছে, এক শ লোক শড়কি যোগাইয়া দিতেছে আর রাশি রাশি শড়কি গিয়া রক্তদহের জমিদার বাড়ীর ইতস্তত পড়িতেছে—ভয়ে কেহ বাহির হইতে পারিতেছে না।

প্রায় এক ঘণ্টা এইরূপ চলিলে জোড়াদীঘির একদল লাঠিয়াল গিয়া দেউড়ির উপরে পড়িল, অমনি পরন্তপের শিক্ষা অনুযায়ী একসঙ্গে পাঁচটি বন্দুকের আওয়াজ হইল: ধোঁয়া সরিয়া গেলে দেখা গেল, জোড়াদীঘির একজন লাঠিয়াল নিহত ও তিন চার জন আহত হইয়াছে। নিহত ও আহতদের উঠাইয়া লইয়া আক্রমণকারীরা সরিয়া গেল।

দুপুরের সময় দুই দলই আহারাদিতে ব্যস্ত থাকায় আক্রমণ বন্ধ রহিল; বিকালের দিকে আবার আক্রমণ আরম্ভ হইল; কিন্তু কোন পক্ষেরই বিশেষ যে একটা ফল লাভ তাহা ঘটিল না। রাত্রিতে দুই পক্ষই ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, কেবল কয়েকজন করিয়া প্রহরী জাগিয়া থাকিল।

[১৭]

তিন চার দিন এই ভাবে চলিল,কিন্তু কোন পক্ষের জয় পরাজয় ঘটিল না, বরঞ্চ উভয় পক্ষের মধ্যে তুলনায় জোড়া-দীঘিরই ক্ষতির পরিমাণ বেশি বলিয়া মনে হইল।

তাহারা প্রত্যেক দিন একবার করিয়া দেউড়ি আক্রমণ করিয়াছে, আর প্রতি বারে অনেক কয়জন লোক হতাহত হইয়াছে। দর্পনারায়ণ বুঝিল, এ ভাবে হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়া চলিলে সকলে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে, এবং পরন্তপকে সাজা না দিয়াই ফিরিতে বাধ্য হইতে হইবে।

তখন সে অন্য উপায় চিন্তা করিল। আলিবর্দ্দীকে ডাকিয়া বিশ পঁচিশখানা মই সংগ্রহ করিতে হুকুম দিল এবং বলিয়া দিল, এই সব মই দেয়ালে লাগাইয়া একসঙ্গে বিশ পঁচিশ জন করিয়া লোক দেয়াল টপকাইয়া ভিতরে পড়িবে। সে হিসাব করিয়া আলিবর্দ্দীকে বুঝাইয়া দিল—এই উপায় অবলম্বন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একশ লাঠিয়াল বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়িতে পারিবে।

বিকাল-বেলার দিকে মই সংগ্রহ হইল। পশ্চিম দিকের দেয়ালের উত্তর দিকে মই লাগান হইল; সেখানে বাছা বাছা পঁচিশজন লাঠিয়াল লাঠি লইয়া উপস্থিত হইল; দেয়ালের দক্ষিণ অংশে রমেশ ঢাড়ির বাজনা জোরে বাজিয়া উঠিল; বাড়ীর মধ্যের লোক সেই দিক হইতে আক্রমণ হইবে ভাবিয়া সেখানে গিয়া প্রস্তুত হইল; এ দিকে মই বাহিয়া লাঠিয়ালেরা উঠিয়া প্রথম দল বাড়ীর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু ততক্ষণে রক্তদহের লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া যথাস্থানে আসিয়া হাজির হইল; পরন্তপ বন্দুকধারীদের ডাক দিল: প্রাচীরের উপরে দ্বিতীয় দলের মাথা যেমনই জাগিয়া উঠিয়াছে, একসঙ্গে পাঁচ বন্দুকে মৃত্যু উদ্গীরণ করিল; অধিকাংশ লোক আহত হইয়া বাহিরে পড়িয়া গেল; তারপর আর কেহ মই বাহিয়া উঠিতে সাহস করিল না। তখন রক্তদহের বহুশত লোক মিলিয়া জোড়াদীঘির প্রথম দলের বিশ জনের উপরে পড়িয়া অধিকাংশকে নিহত করিল; দু'এক জনকে কৃপাপরবশ হইয়া প্রাণে মারিল না। অতঃপর বাড়ীর ভিতরে আসিয়া পড়িলে কি দশা হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য মৃতদেহগুলি প্রাচীর পার করিয়া তাহারা বাহিরে ফেলিয়া দিল। জোড়াদীঘির লোকেরা রক্তদহের নৃশংসতায় শিহরিয়া উঠিল।

সে রাত্রে দর্পনারায়ণের তাঁবুতে দর্পনারায়ণ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও আলিবর্দ্দীকে লইয়া মন্ত্রণা-সভা বসিল। দর্পনারায়ণ বলিল—দেখ, আমরা আজ চার পাঁচ দিন ধরে এসেছি, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। শুধু তা-ই না, আমাদের হতাহতের সংখ্যা প্রতিদিন বেড়ে চলছে বেশী দিন আর লোকদের ধরে রাখা যাবে না, এখন উপায় কি?

রঘুনাথ বলিল—মেজদা কথাটা তুলে ভালই করেছ। আমি তোমার তাঁবুতে আসবার সময় লাঠিয়ালদের মধ্য দিয়ে আসছিলাম—অন্ধকারে ওরা আমাকে চিনতে পারেনি। ওদের কথা কিছু কিছু কানে গেল। যা শুনলাম খুব আশার কথা নয়।

আলিবর্দ্দী তাহার কথার সূত্র ধরিয়া বলিল—ছোটবাবু ঠিকই বলেছেন; এ রকম ভাবে চললে লাঠিয়ালেরা আর বেশি দিন থাকতে চাইবে না। কাজেই যা করতে হয় তাড়াতাড়ি করা দরকার।

দর্পনারায়ণ বলিল—সব জিনিষটাকে আমি ভেবে দেখেছি; প্রথমত, আমরা ওদের না হারিয়ে ফিরতে পারি না; দ্বিতীয়ত, হারাবার ব্যবস্থা দু'এক দিনের মধ্যেই করতে হবে। এখন কি করে' এ সম্ভব বল।

বিশ্বনাথ এতক্ষণ কথা বলে নাই, চুপ করিয়া শুনিতেছিল—এবার সে বলিল—দেখ শড়কি বা লাঠি দিয়ে মানুষ মারা যায়, কিন্তু দেয়াল ভাঙ্গা যায় না; বন্দুক দিয়েও দেয়াল ভাঙ্গা অসম্ভব। অথচ দেয়াল না ভাঙ্গতে পারলে ওদের কিছু করা যাবে না।

রঘুনাথ—কিন্তু দেয়াল ভাঙ্গা কি করে সম্ভব! মজুর লাগিয়ে দিয়ে—?

বিশ্বনাথ—দেয়ালের খানিকটা অংশ বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি না?

কথাটা অত্যন্ত সহজ হইলেও কাহারও মনে হয় নাই। এতক্ষণে একটা উপায় পাওয়া গিয়াছে ভাবিয়া সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

আলিবর্দ্দী বলিল—সহজ বটে দাদাবাবু, কিন্তু তা'তে যে পরিমাণ বারুদ লাগবে, তত বারুদ কোথায়?

এ কথাটাও খুব সহজ, কিন্তু কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

তখন সকলে মিলিয়া স্থির করিল, দেয়াল উড়াইয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই; এ কাজ আবার প্রচুর বারুদ না হইলে সম্ভব নয়, অতএব একজনকে বারুদ আনিতে এখনই নাটোরে পাঠানো আবশ্যক। দর্পনারায়ণের আদেশে তখনই দুই জন ঘোড়সোয়ার টাকা লইয়া নাটোর অভিমুখে রওনা হইয়া গেল। কিন্তু সকলেই বুঝিল, তাহারা দুই দিনের আগে ফিরিতে পারিবে না।

এমন সময়ে জোড়াদীঘি হইতে একজন ঘোড়সোয়ার দেওয়ানজীর জরুরি চিঠি লইয়া আসিল। চিঠি পড়িয়া সকলে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। উদ্বেগের কথাই বটে। দেওয়ানজী লিখিতেছেন—"আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাইলাম রক্তদহের প্রায় দুই তিন শত লাঠিয়াল ইদোউড়ি হইতে আসিতেছে। তাহারা দুই চার দিন মধ্যেই রক্তদহ পৌছিবে। তাহাদের পৌছিবার পূর্ব্বেই যাহা কর্ত্তব্য করিবেন নতুবা পরাজয় সুনিশ্চিত!"

চিঠি পড়া হইলে সকলে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল; প্রত্যেকে নিজের নিজের চিন্তার সূত্র ধরিয়া চলিতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ সকলের আগে কথা বলিল—অতএব দেখা যাচ্ছে আমাদের হাতে দুই তিন দিন সময় আছে। এর মধ্যে যদি ওদের হারাতে পারি ভাল—নতুবা আর দেরি হলে ওরাই আমাদের হারাবে। তখন ভিতরের লোকও বাইরে আসবে। দুই দলের চাপে, বাড়ী থেকে এতদূরে, আমাদের প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে উঠবে।

এমন সময়ে রমেশ দুই ছেলে সঙ্গে লইয়া তাঁবুতে প্রবেশ করিল। রমেশ একে বৃদ্ধ, তাতে আবার কিঞ্চিৎ কিম্ভূত কিনাকার, তাহার প্রবেশকে কেহ অনধিকার প্রবেশ মনে করিত না।

দর্পনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল—কি রে রমেশ, এত রাত্রে কি মনে করে?

রমেশ জোড় হাত করিয়া বলিল—হুজুর নালিশ আছে।

—কার বিরুদ্ধে?

রমেশ গদগদ হইয়া বলিল—ভগবানের বিরুদ্ধে।

সকলে বুঝিল—রমেশ কিছু বেশি নেশা করিয়াছে।

রমেশ বলিল—হুজুর, ভগবান্ কেন আমাকে লেজ দিল না?

বিস্মিত দর্পনারায়ণ বলিল—সে কি রে?

রমেশ কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া বলিল—সে আবার কি? আমাকে এতদিন দেখছ—বল আমার লেজ আছে কি নাই?

বিশ্বনাথ বলিল—থাকলেই ঠিক হত।

রমেশ নিজের চিন্তার সায় পাইয়া সগর্ব্বে বলিল—তবে? কিন্তু লেজ ছাড়া কি এসব কাণ্ড হয়?

—কি কাণ্ড আবার?

—কি যে বল দাদাবাবু! লঙ্কাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, রামায়ণ পড়নি! এই বলিয়া সে বসিয়া পড়িয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি দাদাবাবু, ভোর রাত্রের স্বপ্ন, মিথ্যা হবার নয়, যে আমার লেজ গজিয়েছে, আর তাতে সাড়ে বত্রিশ গজ কাপড় জড়িয়ে—ওই যে দেখছ—ওই যে—এই বলিয়া সে এক দিকে আঙ্গুল তুলিয়া দেখালে—সবাই সে দিকে তাকাইল, কিন্তু রমেশ তাহাদের ভুল ভাঙিয়া দিয়া বলিল—নাঃ,এ যে তাঁবুর মধ্যে তাই দেখা যাচ্ছে না—ওই যে জমিদার বাড়ী ওর মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড করে বেড়াচ্ছি। আগুন, আগুন, দাউ দাউ করছে। এই বলিয়া সে পুত্রদ্বয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল— কি বলিস্ রে মধু—কি বলিস্ রে বিধু ?

তাহারা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বিশ্বনাথ বলিল—তোরা বাপ-বেটা মিলে একসঙ্গে স্বপ্ন দেখেছিস না কি ?

রমেশ বলিল—স্বপ্ন কেন ? এই দেখ না—এই বলিয়া সে তাহার চাদরের অর্দ্ধদগ্ধ প্রান্ত দেখাইল।

তাহার কথায় তিন জনে হাসিতে লাগিল। রমেশ বলিল তা জানি তোমরা কি জন্য হাসছ ! ভাবছ বেটা কল্কের আগুনে পুড়িয়ে এখন গল্প বলতে এসেছে।

কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিল- তা তোমাদের আর দোষ দিই কেন ? সবাই ওই কথা বলছে !

এই বলিয়া সে ছেলেদের দিকে ফিরিয়া বলিল—চ রে মধু, চ রে বিধু, এরা কেউ বিশ্বাস করবে না !

একটু থামিয়া আবার বলিল—করবে করবে, যখন দাউ, দাউ, চারদিকে লঙ্কাকাণ্ড !

পুত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিল সবগুলো ঢাক সঙ্গে নিস্—আর লম্বা লম্বা দড়ি সঙ্গে নিস্ !

তারপর নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে বলিতে তাঁবু হইতে বাহির হইয়া গেল—বাবাঃ লেজ নেই বলেই কি আমি বানরের অধম ! বানরের থাকবার মধ্যে তো বেশি একটা লেজ ! আচ্ছা দেখাই যাক্।

রমেশ বাহির হইয়া গেলে দর্পনারায়ণরা নিজের নিজের তাঁবুতে গিয়া শয়ন করিল !

রাত্রি তখন গভীর। শত্রু মিত্র সকলেই সুপ্ত। কেবল রমেশরা তিন জন জাগ্রত। তাহারা পাঁচ সাতটা ঢাক ঘাড়ে করিয়া নীরবে রক্তদহের প্রাচীরের অন্ধকারে নির্জ্জন এক অংশে গিয়া দাঁড়াইল। তার পরে একটার উপরে আর একটা ঢাক সাজাইয়া সিঁড়ির মত তৈয়ার করিয়া প্রাচীরের প্রায় সমান করিল। ঢাকগুলি যাহাতে পড়িয়া না যায়, সেই জন্য একটার সঙ্গে আর একটা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল।

এই রকমে উদ্যোগ-পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে প্রথমে রমেশ ঢাকের সিঁড়ি বহিয়া প্রাচীরের উপরে গিয়া বসিল; তার পরে রমেশ উঠিল, তার পরে মধু উঠিল, তার পরে বিধু উঠিল ! সকলে প্রাচীরের উপরে আসিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা সেই ঢাকের সিঁড়ি টানিয়া তুলিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরের দিকে স্থাপন করিল। তখন আবার আগের মত পর্য্যায়ক্রমে সিঁড়ি বাহিয়া তিন জনে নামিয়া গেল নামা শেষ হইলে ঢাকের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল।

রক্তদহের জমিদার বাড়ী রমেশের অপরিচিত নয়, মাঝে মাঝে সে বাজনা বাজাইতে আসিয়া থাকে। যে দিকটায় তাহারা নামিয়াছিল, সে দিকটা নির্জ্জন ; সেখানে কাছারীর পাশে একটা অপরিষ্কার গলির মত আছে ; লোকজন বড় কেউ সেখানে আসে তাহারা তিনজনে ঢাকগুলি লইয়া সেখানে গেল—দেখিল, ছোট একটা অন্ধকার ভগ্নপ্রায় কুঠরি আছে ; তিন জনে সেই কুঠরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঢাক গুলি রাখিয়া বসিয়া পড়িল। তাহারা হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, কিছুক্ষণ জিরাইয়া লইয়া রমেশ বলিল—কাল রাত পর্য্যন্ত এখানে লুকিয়ে থাকতে হবে। তার পরে কাল রাতে হবে লঙ্কাকাণ্ড।

বিধু বলিল—খাব কি ? রমেশ বলিল—ওই ছোট ঢাকটা কাট তো ! এই বলিয়া সে একখানা ছুরি ফেলিয়া দিল। ঢাকের চামড়া কাটিতেই ভিতর হইতে চিঁড়া, মুড়ি, পাটালি গুড় বাহির হইয়া পড়িল।

রমেশ নিজের বুদ্ধিতে আত্মপ্রসাদ [illegible] করিয়া বলিল—খুব খা আর ঘুমো, কিন্তু সাবধান কথাবার্ত্তা বলিস্ নে, কি বাইরে যাস্‌নে। তা হলে আমি আর বাঁচাতে পারব না !

এই বলিয়া সে শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—দেখ যখন আমার নাক ডাকবার শব্দ হবে, আমাকে জাগাস্ নে, আমার মুখটা ফাঁক করে এক টুকরো গুড় পুরে দিবি ! বুঝলি ! ভুলিস্ নে ! তোরা পালা করে জেগে থাক্। আমি একটু চোখ বুজলাম ! এই বলিয়া সে ঘুমাইতে আরম্ভ করিল—মধু বিধু পালা করিয়া জাগিয়া রহিল।

[ক্রমশঃ

হিটলার ও আধুনিক জার্ম্মানি

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হিট্‌লার জার্ম্মানির প্রধান রাষ্ট্রসচিবের (Chanceller) পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তদবধি জার্ম্মানির ইতিহাসে এক সুস্পষ্ট নবযুগের আরম্ভ হইল। মহাযুদ্ধে পরাজিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে জার্ম্মানি এতদিন বিশ্বের কৃপাপাত্র হইয়া কোনও প্রকারে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছিল এবং ভার্সাই সন্ধির অবিচার সম্বন্ধে কখনো নরম ভাবে, কখনো বা গরম ভাবে অহিংস প্রতিবাদ জানাইতেছিল, সেই জার্ম্মানির রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের পুরোভাগে হিটলারকে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া সমগ্র য়ুরোপ আতঙ্কগ্রস্ত হইল। বলা বাহুল্য যে, এই আতঙ্কের মুখ্য কারণ, হিটলারের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব ও তীব্র বৈপ্লবিক মতবাদ। অতএব বর্ত্তমান জার্ম্মানিকে বুঝিতে হইলে এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে হয়।

হিটলারের চরিত্র এমন অদ্ভুত ও জটিল যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আগে হইতে কিছু আন্দাজ করা চলে না; কারণ পূর্ব্বাপর সঙ্গতি রাখিয়া কাজ করা হিটলারের মোটেই স্বভাবসিদ্ধ নহে; কিন্তু সাধারণের পক্ষে খুব দোষের কথা হইলেও এই অব্যবস্থিতচিত্ততা হিটলারকে একদিকে এক প্রচণ্ড শক্তি দিয়াছে এবং অপরদিকে তাঁহাকে বিরুদ্ধপক্ষদের ভীষণ আতঙ্কস্থল করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ জার্ম্মান নরনারীর নিকট হিটলার দেবতুল্য ব্যক্তি এবং ভক্তির ও ভালবাসার পাত্র; হিটলারের নামে তাহারা আনন্দে গদগদ হয় ও জাতীয়তার এক প্রবল প্রেরণা অনুভব করে। কিন্তু অন্য বহু জার্ম্মান নরনারীর নিকট হিটলার এক ক্ষুদ্র উপহাস্য ব্যক্তি; একজন তুচ্ছ বুজরুগ ও মিথ্যাবাদী হট্টনেতা (demagogue)। এই বিরোধী ভাবদ্বয়ের উৎপত্তির কারণ কি এবং হিটলারের অসামান্য শক্তির উৎসই বা কোথায়? হিটলারের জীবনের আটচল্লিশ বছরের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর যে পাওয়া যাইবেই এমন কথা বলা যায় না, তবু তদর্থে চেষ্টার প্রারম্ভে মোটামুটি ভাবে তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে হয়ত খানিক সুবিধা হইতে পারে।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান সীমান্তের নিকটবর্ত্তী কোন অষ্ট্রিয় গ্রামে হিটলার জন্মগ্রহণ করেন। হিটলারের পিতা আলোইস হিটলার (Alois Hitler) স্বকীয় পিতা-মাতার অবিবাহিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তবে তাঁহার জন্মের পাঁচ বছর পরে সেই পিতামাতার বিবাহ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হিটলারের পিতা নিজের চল্লিশ বৎসর বয়সের আগে ঐ দম্পতির বৈধ সন্তান বলিয়া স্বীকৃত হন নাই। হিটলারের নামের বিশুদ্ধ জার্ম্মান বানান ছিল Hiedler, কিন্তু নিরক্ষর চাষা-শ্রেণীর হিটলার-পিতামহ নিজকে বলিত Huettler. এই নাম হইতেই জার্ম্মান রাষ্ট্রনায়কের হিটলার নামের উৎপত্তি। হিটলারের ভগিনী পৌলা (Paula) অবশ্য পিতামহের বিশুদ্ধ নাম Hiedlerই ব্যবহার করে। হিটলারের পিতা আলোইস্ প্রথমে জুতা-মেরামতের কাজ করিতেন এবং তিনি তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী আনা (Anna) ছিল তাঁহার অপেক্ষা চৌদ্দ বছরের বড়। এই মহিলার নিজস্ব কিছু অর্থসম্পদ ছিল। এই স্ত্রীর মৃত্যুর ছয় সপ্তাহের পর আলোইস্ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন কিন্তু এই স্ত্রী এক বছর মাত্র টিকিল। বৎসরান্তে তাহারও মৃত্যু হইল। তিন মাস অপেক্ষা করিয়া আলোইস তৃতীয় পক্ষকে ঘরে আনিলেন। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীই হিটলারের জননী ক্লারা (Klara)। এই মহিলা আলোইসের এক দূর সম্পর্কীয় ভগিনী এবং দশ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গৃহে পরিচারিকার কর্ম্ম করিত। কিছু দিন ঐ কর্ম্ম করিয়া সে ভিয়েনায় পলাইয়া গেল এবং পুরা দশ বছর ঐ সহরে থাকিয়া প্রায় বিশ বছর বয়সে সে আবার নিজ গ্রামেই ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘকাল সে কি ভাবে, কোথায় ছিল, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, হিটলারের পিতা তখন দ্বিতীয় বার বিপত্নীক হইয়াছিলেন ও নির্ব্বিচারে ক্লারাকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন। হিটলারের পিতার প্রথম পক্ষের দুই সন্তান, এক পুত্র ও এক কন্যা। কন্যা আঞ্জেলা (Angela) এখনো বর্ত্তমান। সে এক সময়ে ভিয়েনায় পাচিকার কর্ম্ম করিত। হিটলার

তাহাকে জার্ম্মানীতে আনিয়া নিজ গৃহকর্ত্রীর (housekeeper) কাজ দিয়াছেন। হিটলারের মায়ের হিটলার ছাড়া আর দুই সন্তান। তাহার মধ্যে কুমারী পৌলা অজ্ঞাত, অখ্যাত অবস্থায় ভিয়েনায় বাস করিতেছে। স্থানীয় নাৎসীরা তাহাকে একটা কেষ্ট-বিষ্টু করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু বেচারী এত শান্তিপ্রিয় যে, ঐ সব দিকে ভিড়ে নাই।

প্রথমা স্ত্রীর উৎসাহে হিটলারের পিতা লেখা-পড়া শিখিয়াছিলেন এবং জুতা-মেরামত ব্যবসা ছাড়িয়া স্ত্রীর টাকার জোরে শুল্ক-পরিদর্শকের কাজ পাইয়াছিলেন। কাজেই তৃতীয় পক্ষের সন্তান হিটলারের শিক্ষা-লাভ অসম্ভব হয় নাই।

হিটলারের পিতা অত্যন্ত বদরাগী ও উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। মদের দোকানে বসিয়া মদ খাইতে খাইতে হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মারা যান। তাঁহার বিশ্বাস ছিল হিটলার দুর্ব্বল এবং অলস-প্রকৃতির স্বপ্ন-বিলাসী এবং তাঁহার কখনো কিছু হইবে না—এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কখনো কখনো রাগিয়া হিটলারকে বেশ প্রহারও করিতেন; এই সব কারণে পিতার প্রতি হিটলারের একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল। তাহারই ফলে পিতার চরিত্রের ঠিক বিপরীত হইল তাঁহার চরিত্র; অর্থাৎ পিতা ছিল মদ্যপায়ী, হিটলার মদ্য স্পর্শও করেন না; পিতা তিন তিন বার দ্রুত বিবাহ করিয়াছিল, কিন্তু হিটলার কোন স্ত্রীলোককে ভালই বাসেন নাই, বিবাহ ত দূরের কথা; মাতার প্রতি হিটলারের অতিশয় দৃঢ় অনুরাগ ছিল। জননীই তাঁহাকে উচ্চাভিলাষের প্রেরণা দিয়াছিলেন। কারণ, এই মহিলা ক্রমাগত তাঁহাকে তাঁহার হতভাগ্য পিতার চেয়ে পৃথক্ চরিত্রের হইবার উপদেশ দিতেন। সেই উপদেশই হিটলারকে পরোক্ষভাবে তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কার্য্যের দিকে চালনা করিয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই উচ্চাভিলাষ পোষণ করিলেও হিটলার দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ঠিক সুশিক্ষিত (cultured) লোক বলা যায় না। জ্ঞানচর্চ্চার ব্যাপারে তাঁহার মুসোলিনীর মতও অনুরক্তি নাই এবং ইতালির ডিক্টেটরের মত সুশিক্ষিত ত তিনি নহেনই। তিনি পড়াশুনা মাত্রও করেন না। যে ভার্সাই সন্ধিপত্র তাঁহার জীবনের উপর ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সেই সন্ধিপত্রখানাও তিনি হয়ত কখনো আদ্যোপান্ত পড়েন নাই। বিদ্বান্ লোকদের হিটলার পছন্দ করেন না। দেশ-ভ্রমণও তিনি কখনো করেন নাই। এমন কি যুদ্ধের সময় ব্যতীত কখনো জার্ম্মানির বাহিরেও যান নাই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা দুই চার কথা ফ্রেঞ্চ ছাড়া তিনি কোনও বিদেশী ভাষা জানেন না।

হিটলার নিজে ত পড়েনই না, এমন কি, বই কেনার সখও তাঁহার নাই। তাঁহার অন্যান্য অভ্যাসও বিচিত্র। বেশ-ভূষার কোন পারিপাট্য তিনি পছন্দ করেন না। খাদ্য, পানীয় এবং বন্ধুত্ব্যার সম্বন্ধেও তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি মদ্যপান এবং ধূমপান করেন না; তাঁহার নিকট কাহারও ধূমপান করাও তিনি পছন্দ করেন না। নিরামিষ আহারেই তাঁহার একমাত্র রুচি। কাফি কখনো কখনো খান মাত্র, কিন্তু সর্ব্বদা নহে। এই সব কারণে অনেকে হিটলারকে তপস্বী (ascetic) পুরুষ বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা তাহা নহে। তাঁহার ভোগস্পৃহা সংযত বটে, কিন্তু তাই বলিয়া হিটলার 'তপস্বী' নহেন। তিনি নিরামিষ আহার করিলেও সেই খাদ্য একজন বহু বেতনের সুদক্ষ পাচক কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। হিটলার সাদা-সিধে ভাবে জীবন যাপন করেন বটে, কিন্তু মিউনিকে তাঁহার ফ্ল্যাট রাজকীয় পারিপাট্য ও আড়ম্বর সহকারে সজ্জিত।

জার্ম্মান-সীমান্তে পিতৃভূমির দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ-দণ্ডায়মান হিটলার।

হিটলার কোন ব্যায়াম করেন না, কিন্তু সঙ্গীতের তিনি পরম ভক্ত। বিখ্যাত জার্ম্মানসঙ্গীতরচয়িতা বাগনেরের (Wagner) প্রভাব তাঁহার জীবনের উপর অতি সুস্পষ্ট। কাজ করিয়া রাত্রিতে যখন তিনি ক্লান্ত হন, তখন তাঁহার বন্ধুস্থানীয় কোন সঙ্গীতজ্ঞকে ডাকিয়া পিয়ানো বাজাইতে বলা হয়। বাজনা শুনিতে শুনিতে তিনি নিদ্রা লাভ করেন। হিটলারের কোন ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ বন্ধু নাই। আগেই বলা গিয়াছে, নারীজন সম্বন্ধে হিটলারের কোন আকর্ষণ নাই। এহেন লোকের যে অর্থ-সঞ্চয়ের প্রতি কোন আসক্তি থাকিবে না, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। হিটলার রাষ্ট্র হইতে কোন বেতন গ্রহণ করেন না, অথবা, এই অর্থ তিনি দুর্ঘটনার (accident) আহত শ্রমিকদের উপকারের জন্য ব্যয় করেন। দেখা গিয়াছে যে, হিটলারের আত্মজীবনীর (Mein Kampfe) উনিশ লক্ষ কপি বিক্রী করিয়া ১৯৩৫ সালের শেষে হিটলার এক লক্ষ ষাট হাজার পাউণ্ড পাইয়াছিলেন। এ সমস্তই তিনি নাৎসী দলের কাজে ব্যয় করিয়াছেন। এই বদান্যতার ব্যাপারে হিটলার পাশ্চাত্য সমস্ত রাজনীতি-পরিচালকদের উপরে।

হিটলার যেমন ত্যাগী হইয়াও তপস্বী নহেন, তেমনই ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়াও তিনি ধার্ম্মিক নহেন। রোমান ক্যাথলিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইলেও হিটলার আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না। জার্ম্মান রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়াই তিনি রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্টাণ্ট ও ইহুদী এই তিন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি তীব্র নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়া দেন। এই নির্য্যাতন ধর্ম্মবিশ্বাসমূলক নহে পরন্তু রাজনীতিক। মোটামুটি এই সকলই হইল দোষে গুণে গড়া হইলেও হিটলারের চরিত্র অপেক্ষাকৃত ভাল। অন্য সাধারণ রাষ্ট্র-পরিচালকদের মতই হিটলার প্রতি বন্ধুজনের বিশ্বাস-ঘাতক, নৃসংশ, মিথ্যাভাষী। কিন্তু জার্ম্মানীর মত সুশিক্ষিত ও সুসভ্য রাষ্ট্র কিরূপে হিটলারের মত অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকের নেতৃত্বকে স্বীকার করিয়া লইল, তাহা একটি বিস্ময়কর রহস্য। ভিয়েনার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ষ্টেকেল (Dr. Steckel) ইহার এক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—প্রত্যেক নরনারীই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন লোকের বা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ (authority) মানিয়া চলিতে চায়। ইহাকে সংক্ষেপতঃ 'প্রভুত্ব-গ্রন্থি' (authority complex) বলা যায়। আগের দিনে ইহার চরিতার্থতা হইত পিতামাতার বা শিক্ষকের শাসনে বা ধর্ম্ম-গুরু বা ধর্ম্ম-পুস্তকাদির অনুশাসনে। কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পরিবার, বিদ্যালয় ও ধর্ম্মসংঘ ইহাদের, সকলেরই প্রভাব শিথিল হইয়াছে। তাহার ফলে একের পর এক করিয়া 'ডিক্টেটরের' উদয় হইয়াছে। হিটলার এবং মুসোলিনীর দল আধুনিক য়ুরোপের নরনারীর পিতৃ-প্রভুত্বের আস্বাদন-লিপ্সাকে চরিতার্থ করিতেছেন। কাজেই জার্ম্মান নরনারীর বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

কিন্তু হিটলার ঠিক সকল জার্ম্মান নরনারীর আহ্বানে রাষ্ট্রের প্রধান আসন পান নাই। বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ হিটলারকে প্রধান সচিবের পদ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মনোনীত রাজতন্ত্রী শ্লাইখের (Schleicher) যখন ঐ সচিবের কার্য্য চালাইতে অক্ষম প্রতিপন্ন হইলেন, তখন তিনি হিটলারকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। হিটলার জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মিলিয়া এক সম্মিলিত (coalition) মন্ত্রিমণ্ডল গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার পার্লামেণ্টারি সংখ্যাবাহুল্য (majority) না থাকায় তিনি নির্ব্বাচক মণ্ডলীর শরণাপন্ন হইবার সংকল্প করিলেন এবং তৎপূর্ব্বে প্রচলিত নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করিয়া প্রুশিয়ার সমাজতন্ত্রী শাসনযন্ত্রকে ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং নাৎসীদল হইতে লোক বাছিয়া তাঁহাদিগকে জার্ম্মানির কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগে বসাইয়া দিলেন। ফোন পাপেন (Von Papen) সর্ব্বময় অধিকার প্রাপ্ত প্রুশিয়ার কমিশনার নিযুক্ত হইলেন। এই সকল বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া হিটলার নূতন নির্ব্বাচনের আয়োজন করিলেন। এই নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল কোনও গতিকে পার্লামেণ্টারি সংখ্যা-বাহুল্য (majority) লাভ করা। যেহেতু মন্ত্রিসভার ১১ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিল নাৎসী, আর ৮ জন জাতীয়তাবাদী দলের, এ জন্য হিটলার রাষ্ট্র-সভায় নিজ অনুবর্ত্তীদের সংখ্যা বাড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন। যে জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে মিলিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বিরোধই দাঁড়াইল প্রধান হইয়া। ও দিকে হিণ্ডেনবুর্গ তখনো হিটলারকে অবিশ্বাস করিতেন। এই

রূপ গুজব রটিল যে, হিটলার জোর করিয়া হিণ্ডেনবুর্গকে পদচ্যুত করিতে চান। এ সকল কারণে নাৎসীদের ভয় হইল যে তাহারা নির্ব্বাচনে হারিয়া যাইবে। কেবল একটিমাত্র উপায়ে তাহাদের জিতিবার সম্ভাবনা ছিল। রাষ্ট্র-সভায় মোট আসন ছিল ৬০০ শত। ইহার মধ্যে ১০০ আসন ছিল কম্যুনিষ্টদের। নাৎসীদের ছিল ২৫০-এর কাছাকাছি। কিন্তু তাহাতে সংখ্যা-বাহুল্য ঘটে না। দেখা গেল কম্যুনিষ্টদের ১০০ আসন হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিলে জয়লাভ হইতে পারে।

এমন অবস্থায় আসন্ন নির্ব্বাচনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ১৯৩৩ অব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্ম্মান রাষ্ট্র-সভার (Reichstag) ভবনে আগুণ ধরিল। প্রায় বিশ লক্ষ মার্ক মূল্যের কাচ ও স্থাপত্যকার্য্য ভস্মসাৎ হইল এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস হইল জার্ম্মান সাধারণতন্ত্রের সমস্ত চিহ্ন। কিন্তু এই শোচনীয় অগ্নিকাণ্ড নাৎসীদলের বিজয়লাভে বিশেষ সাহায্য করিল। নাৎসীরা সঙ্গে সঙ্গে রটাইয়া দিল যে, সমগ্র জার্ম্মানীকে বলশেভিক করার যে এক বিরাট ষড়্যন্ত্র চলিতেছিল, পূর্ব্বোক্ত অগ্নিকাণ্ড তাহার অন্যতম প্রমাণ। অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গেই রাইকষ্টাক গৃহ হইতে মারেন্থস ফান দের লুবে (Marenus Van der Lubbe) নামক জনৈক ওলন্দাজকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ ব্যক্তি দুই বৎসর পূর্ব্বে হল্যাণ্ডের কোন কম্যুনিষ্ট যুবক দল হইতে নিজ অকর্ম্মণ্যতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য বিতাড়িত হইয়াছিল। প্রকাশ্য আদালতের বিচারে এই ফান দের লুবেকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, কিন্তু যে সকল লোক তাহার সহকারী সন্দেহে ধৃত হইয়াছিল, তাহাদের আর কাহারও অপরাধ প্রমাণ হয় নাই এবং বিচারকালে নাৎসীদলের অনেক চাতুরী ও মিথ্যা ষড়্যন্ত্রের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই জন্য নাৎসী-বিরোধী জার্ম্মানরা কিছুতেই অগ্নিকাণ্ডের সরকারী বিবরণীতে বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। তাহাদের বিশ্বাস যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাইয়া ছিল নাৎসীরা নিজেই। ফান দের লুবেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করায় এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছে। কারণ, ফান দের লুবের বিচারের পূর্ব্বে অগ্নিপ্রদানের অপরাধে কাহারও প্রাণদণ্ড হইত না। কিন্তু ফান দের লুবে ছিল একটি অকর্ম্মণ্য 'বেয়াক্কেলে' লোক। পাছে জীবিত থাকিয়া সে সত্য ঘটনা লোক-সাধারণের মধ্যে প্রচার করে, এই ভয়ে নাৎসীরা নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া, সেই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে সংঘটিত ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছিল, ইহাই নাৎসী-বিরোধীদলের সিদ্ধান্ত। সে যাহাই হৌক, বিচার অনেক বিলম্বে হইয়াছিল। অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দায়িত্ব কম্যুনিষ্টদের উপর চাপাইয়া নাৎসীরা প্রচণ্ড ভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিল। প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গ সমস্ত নাগরিক স্বাধীনতা স্থগিত করিয়া দিলেন।

হিটলার একটি বালককে আদর করিতেছেন।

চরমপন্থী খবরের কাগজগুলি তাঁহার আদেশে বন্ধ করা হইল। নাৎসীদল নিজ সুবিধামত লোককে গ্রেপ্তার ও তাহাদের খানাতল্লাস করিল, সভাসমিতিতে ও লেখা ছাপায় বাধা দিল। মোট কথায় জার্ম্মানিতে একপ্রকার 'মার্শাল ল' জারী হইল। কম্যুনিষ্টরা যে দেশদ্রোহী দস্যুশ্রেণীর লোক এবং তাহাদের সাহায্যে জার্ম্মানীতে রুশিয়ার প্রভাব আসিতেছে, এই কথা নাৎসীরা ভয়ানক ভাবে প্রচার করিল। এইরূপ উত্তেজনার অবস্থায় জার্ম্মান নরনারী ভোট দিতে গেল। ফলে নাৎসীরা রাষ্ট্রসভায় ২৯৮টি আসন দখল করিল এবং তাহাদের খুব সুবিধা হইয়া গেল। জাতীয়তাবাদী

দলের সহযোগিতায় তাহারা সংখ্যাবাহুল্য (majority) করিয়া লইল। কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিগণকে নানা অজুহাতে দূরীভূত করিয়া দেওয়ায়ও নাৎসীদলের শক্তি বাড়িয়া গেল। অচিরে (২৩শে মার্চ্চ) রাষ্ট্রসভা হিটলারের হাতে চারি বৎসরের জন্য সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিল। এই কর্ত্তৃত্বের অর্থ চারি বৎসরের ভিতর হিটলার রাষ্ট্রসভাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ দায়িত্বে যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রসভা বেশ ভাল ছেলের মত ৯৪ ভোটের বিপক্ষে ৪৪১ ভোট দিয়া উহার সমস্ত ক্ষমতায় জলাঞ্জলি দিল। কেবল সোশ্যালিষ্টরাই এই ব্যাপারে বিরুদ্ধতা করিয়াছিল। এইরূপে জার্ম্মানী অবশেষে স্বৈরাচারী শাসকের অধীন হইল!

রাষ্ট্র-সভার গৃহ ভস্মীভূত হওয়ার পর কয় সপ্তাহ ধরিয়া সমগ্র জার্ম্মান জাতির উপর এক সার্ব্বজনীন উন্মত্ততার ঝড় বহিয়া গেল। কৃষ্ণ, রক্ত ও স্বর্ণ বর্ণের সাধারণতন্ত্রের পতাকা সর্ব্বত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বদলে অতীত সাম্রাজ্যের রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের পতাকা (কখনো কখনো নাৎসী স্বস্তিকচক্র অন্যের পার্শ্বে বা উপরে স্থাপন করিয়া) উত্থিত করা হইল। সাধারণতন্ত্রের পোষক ও অনুকূল বা অন্য উদারনৈতিক সভা ও সঙ্ঘসমূহ নিষিদ্ধ হইল। অপরদিকে কটা রঙের-জামা (brown shirt) পরা নাৎসী 'ঝটিকা-বাহিনী' ও কালো জামা পরা বিশেষ রক্ষীদল সর্ব্বত্র পুলিশের সঙ্গে মিশিয়া কখনো কখনো তাহাদের কর্ত্তব্য নিজ হস্তে লইতেছিল। কম্যুনিষ্ট, সোশ্যালিষ্ট ও নানা শ্রেণীর উদার-নৈতিকগণ সরকারী আদেশে, অপরাধ করিতে পারেন এই অজুহাতে বন্দী হইলেন। এই ক্ষেত্রে জনতা সরকারী আদেশের বহির্ভূত অনেক বাড়াবাড়ি করিল। বহু ব্যক্তি তাহাদের রাষ্ট্রীয় মতামত ও জাতিধর্ম্মের জন্য প্রহৃত ও নিহত হইলেন। এই সকল ব্যাপারের কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। হিটলারের শাসনতন্ত্র এই সকল জনতার কাজে কোন প্রকাশ্য উৎসাহ দেখায় নাই; তবে উহা দমন করিতেও ইহা কোন ইচ্ছা বা চেষ্টা করে নাই। যে সকল লোক সাহস করিয়া দুষ্কর্ম্মকারিগণের বিরুদ্ধে পুলিশের নিকট নালিশ করিতে গিয়াছিল, পুলিশ তাহাদিগকে সন্দেহভাজন চরিত্রের লোক বলিয়া গ্রেপ্তার করিল। হিটলারের দক্ষিণহস্ত ক্যাপ্টেন গ্যোরিং (Goering) প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিলেন যে, জনতা যদি ইহুদীদের দোকান লুঠ করে, তবে পুলিশ তাহাদিগকে বাধা দিতে বাধ্য নহে। পয়লা এপ্রিল তারিখে হিটলার ইহুদী দোকানসমূহকে বয়কট করিয়া শাস্তি দেওয়ার ফতোয়া বাহির করিলেন। যে হেতু তাহারা না কি সরকারের বিরুদ্ধে নৃশংসতার অপবাদ রটাইতেছিল! বয়কট একদিন ব্যাপী হইয়াছিল। তাহাতেই ইহুদীরা বুঝিল যে, তাহাদের অবস্থা কত শোচনীয়। রাষ্ট্রসভার গৃহদাহের ব্যাপারের পরে প্রায় ত্রিশ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইহাদের অধিকাংশকে অল্পদিনের জন্য অন্তরীণ বাসে রাখা হয়। নাৎসীদের মতে তাহাদের কৃত বিপ্লবে অতীতের অন্যান্য বিপ্লবের তুলনায় কম প্রাণনাশ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল; কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন বিপ্লবই এত নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নাই। জার্ম্মান সাধারণতন্ত্র বিনা ধস্তাধস্তিতে হিটলারের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

নিজ ক্ষমতা দৃঢ় করিয়া হিটলারের প্রধান কাজ হইল, সমগ্র জার্ম্মান জাতিকে নিবিড় ভাবে একীভূত ও সংবদ্ধ করা। সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের প্রত্যেক অঙ্গকে নবগঠিত শাসনতন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত করার চেষ্টা সুরু হইল।

নাৎসী দল ছাড়া আর সকল রাষ্ট্রীয় দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল এবং আইন হইল যে, যে-কেহ নূতন দল গঠন করিবে, তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জার্ম্মানীর প্রদেশসমূহে হিটলারের মনোনীত শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইল এবং সপারিষদ তাহাদিগকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। সকল প্রাদেশিক প্রতিনিধিদের লইয়া যে উচ্চতর আইন-সভা (Council of State) ছিল, তাহা হিটলার তুলিয়া দিলেন। আত্ম-স্বাধীনতাভিমানী জার্ম্মানীর উপরাষ্ট্রসমূহ কেন্দ্রীয় জার্ম্মান সরকারের শাসনসৌকর্য্যমূলক বিভাগ মাত্রে পরিণত হইল।

বলা বাহুল্য, এইরূপে কেন্দ্রীভূত জার্ম্মানীর শক্তি বৃদ্ধি হইল। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এই ব্যাপারে ফরাসীদের আতঙ্কবৃদ্ধি। জার্ম্মানী তাহাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বাতিল করিয়া এক কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন হওয়ায় উহার যে শক্তিবৃদ্ধি হইল, তাহা হয়ত আমাদের দেশে লোকে ভাল বুঝিবে না, কারণ আমাদের দেশে প্রভিন্সিয়াল অটোনমী চালাইতে ব্রিটিশ শাসকরা কোনও বাধা পান নাই। বাহ

জার্ম্মানরা একেবারে নির্ব্বোধ জাতি নহে। হিটলারকে যে জার্ম্মানী সমর্থন করিয়াছে, তাহার পশ্চাতে ছিল তাহার ভার্সাই সন্ধির অপমানের দুঃখ ও শক্তিহীনতার দৈন্যবোধ। তাই এ ক্ষেত্রে উদারতায় পরাজয় ঘটিল পদে পদে। ট্রেড-য়ুনিয়নগুলির নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া ও য়ুনিয়নের সঞ্চিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করিয়া সেগুলিকে ভাঙিয়া দেওয়া হইল। তৎ-পরিবর্ত্তে নাৎসী-চালিত শ্রমিকসংঘসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রমিক-গণ অপেক্ষা ধনিকগণকে একটু বেশি খাতির দেখান হইল। কিন্তু কোম্পানীগুলির ইহুদী বা নাৎসী-বিরোধী ডিরেক্টরকে এবং বণিক-সভাসমূহের তাদৃশ সভ্যকে বিদায় দিতে হইল। দেশময় যত প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে নাৎসী প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল অথবা তাহা-দিগকে তজ্জাতীয় নাৎসী প্রতিষ্ঠান বিশেষের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইল। ধর্ম্ম সম্প্রদায় চালিত ক্লাব বা আড্ডাগুলির অস্তিত্ব রাখা হইল না। রোমান ক্যাথলিকরা তাহাতে চটিলেন। হিটলার জনসাধারণের জ্ঞানবিধান ও প্রচার বিভাগ নামক এক নূতন বিভাগের সৃষ্টি করিয়া উহার মন্ত্রিপদে ডাঃ গোয়েবল্‌সকে (Dr. Goebbles) নিযুক্ত করিলেন।

হিটলার নিজে নামে মাত্র রোমান ক্যাথ-লিক এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ হয় রোমান ক্যাথলিক, নয় প্রটেষ্টাণ্ট। নির্ব্বাচনে সুবিধা-লাভের জন্য তিনি, 'কম্যুনিষ্টদের হাতে ধর্ম্ম গেল' এই রব তুলিয়া দিলেন। তাঁহার একদল অনুবর্ত্তী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মকে ইহুদীর সৃষ্ট মনে করিয়া তাহার বদলে প্রাচীন টিউটনিক পৌত্তলিকতার পুনঃ প্রচারের পক্ষপাতী বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব কম। নাৎসীদের সরকারী মত এই যে, জার্ম্মানীর রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই সম্প্রদায়ই নিজে-দের জার্ম্মান জাতীয় সংঘের (Church) অন্তর্ভুক্ত হউক এবং বিশুদ্ধ আর্য্য-রক্তের জার্ম্মানরাই কেবল ঐ সকলের কর্ত্তৃপক্ষ হউক। প্রটেষ্টাণ্টদের ঐ রূপ সংঘ স্থাপিত হইয়াছে। মুলের (Mueller) নামক এক ব্যক্তি উহার সর্ব্বময় কর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ক্যাথলিকগণ এবং ছোট ছোট প্রটেষ্টাণ্ট দলসমূহকে বলা হইয়াছে, যদি তাহারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে লিপ্ত না হয়, তবে তাহাদিগকে নাড়াচাড়া করা হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ব্যাপারেও এই হস্তক্ষেপের জন্য হিটলারের শাসনতন্ত্রকে এক ভয়ানক বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের লোপ, রাষ্ট্রীয় দলসমূহের উৎসাদন, ট্রেড-য়ুনিয়ন ও খবরের কাগজগুলিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে মিলাইয়া যত বিরুদ্ধতা না হইয়াছিল, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়া হিটলারকে তদপেক্ষা অনেক বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এই জন্য বহু ধর্ম্মযাজক পদচ্যুত, কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ হইলেও তাঁহাদের তীব্র সমালোচনার গতি মন্দীভূত হয় নাই। মোটের উপর হিটলার সর্ব্বাপেক্ষা বেশি বাধা পাইয়াছেন ধর্ম্মপ্রচারকগণের নিকট।

বক্তৃতামঞ্চে হিটলার।

নাৎসী আন্দোলনের গোড়ার দিকে ইহুদীদিগের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিলেও ক্রমে ক্রমে তাহা শান্ত হইয়া আসিয়া-ছিল, কিন্তু তাহার বদলে সমস্ত ইহুদীজাতিকে জার্ম্মান রাষ্ট্র হইতে উৎসন্ন করিবার এক প্রণালীবদ্ধ নীতি অনুসৃত হইতে আরম্ভ হইল। এমন আইন হইল, যাহার সংজ্ঞায়, ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষের মধ্যে যাহার কেহ ইহুদী ছিল বা আছে, সেই ইহুদী বলিয়া গণ্য হইল। কাজেই জার্ম্মানীর ছয় লক্ষ ইহুদীর সহিত তাহার দুই তিন গুণ নরনারী ইহুদীরক্তসম্পর্কিত

এই অজুহাতে বিজাতীয় বলিয়া গণ্য হইল। যুদ্ধের পূর্ব্বে নিযুক্ত হয় নাই বা যাহারা যুদ্ধে যোগ দেয় নাই, অথবা যাহাদের পিতা বা ভ্রাতা যুদ্ধে হত হয় নাই, এমন ইহুদীরা সরকারী কার্য্য হইতে বিতাড়িত হইল। আইন-ব্যবসায়, চিকিৎসা ও শিক্ষাদানাদি কর্ম্মে সমগ্র দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে ইহুদীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করা হইল। সংবাদপত্র পরিচালনার কাজ হইতে ইহুদীদিগকে প্রায় একেবারে বিতাড়িত করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতিগত হারাহারি ভাগের নীতি অনুসৃত হইল। এমন কি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমহলে এত তীব্র ইহুদী-বিদ্বেষ ছিল যে, তাহারা দাবী করিল

হিটলার ও হিণ্ডেনবুর্গ (করমর্দ্দনরত)।

যে, ইহুদীগণের পক্ষে জার্ম্মান ভাষায় লেখা নিষিদ্ধ হউক এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহারা হিব্রু ভাষার ব্যবহার করুক। ললিতকলা ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার ক্ষেত্রেও এ বিদ্বেষবুদ্ধি অনুপস্থিত ছিল না। ইহুদী সঙ্গীতজ্ঞ এবং অভিনেতৃগণ রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসারিত হইল এবং প্রসিদ্ধ ইহুদী বৈজ্ঞানিকগণকে চিকিৎসালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় করা হইল।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ইহুদীগণকে কমাইবার চেষ্টা হইল না। কিন্তু জনসাধারণের বিরুদ্ধতার ফলে অনেক ব্যবসায়ী ইহুদী সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। কিন্তু ইহুদী নয়, এমন ডিরেক্টর, অধ্যক্ষ আদি নিযুক্ত করিয়া অনেকে ব্যবসায় বাঁচাইল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় না দেখিয়া প্রায় সত্তর হাজার ইহুদী জার্ম্মানী ত্যাগ করিল এবং সাত শত ইহুদী আত্মহত্যা করিয়া দুর্দ্দশা এড়াইল।

জার্ম্মানীতে ইহুদীদের উপর এই অত্যাচার জগৎময় প্রচারিত হইল। কোন কোন দেশে নাৎসী-শাসন সম্বন্ধে লোকের কেবল এইটুকুই জানা হইয়াছিল যে, ইহা ইহুদীগণকে নির্য্যাতন করে। অন্যান্য দেশের ইহুদীরা জার্ম্মান পণ্য বর্জ্জন করায় জার্ম্মানীর বহির্ব্বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল এবং আর্থিক দুর্গতি বাড়িল। কিন্তু কেবল ইহুদীরাই যে নাৎসী-শাসনে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল তাহা নয়। সোশ্যালিষ্ট, স্বাধীনতাবাদী ও উদারনীতিক এমন নাৎসী-বিরোধী রাজতন্ত্রী অনেক যোগ্য ব্যক্তি (যাঁহাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লোক একাধিক আছেন) নাৎসীদের অত্যাচারে জার্ম্মানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মিতব্যয়ের অজুহাতে ১৯৩৪ সাল হইতে জার্ম্মানীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা ১৫,০০০ পনর হাজারের উপর হইতে পারিবে না, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মাত্র এক-দশমাংশ, অর্থাৎ দেড় হাজার মাত্র মেয়ে হইতে পারিবে। ইহার উপর সংবাদপত্রসমূহকে যুদ্ধকাল অপেক্ষা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইল এবং বলশেভিক ও ফাসিস্তদের মত রাজনৈতিক কারণে অনেক দেশত্যাগী ব্যক্তির ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল, যে হেতু তাহারা 'নাৎসীদে'র অত্যাচার-কাহিনী বাহিরে রটাইয়াছে। স্বনাম-খ্যাত গণিতজ্ঞ আইনষ্টাইন আমেরিকায় নাৎসীদের সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জার্ম্মানীস্থিত ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু বিবিধ অত্যাচার ও দুষ্কার্য্য করিলেও নাৎসীরা জার্ম্মাণ নরনারীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোন কার্য্যই করে নাই এইরূপ মনে করিলে ভুল করা হইবে। অত্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট না হইলেও নাৎসীদের আর্থিক পুনর্গঠনের (economic reconstruction) একটা আদর্শ ছিল, ইহা অনেকটা ফাসিস্ত ইতালীর অনুকরণমূলক। ইহার মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা পাইবে, কিন্তু জাতীয় স্বার্থের জন্য তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর বিদ্যার্থীকে শ্রমিক শিবিরে

(labour camp) যোগ দান করিতে, সামরিক কুচকাওয়াজ করিতে এবং কায়িক শ্রম শিক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ জার্ম্মান রক্তের চাষিগণের অনুকূলে ভূমি আইনের এমন সংশোধন করা হইয়াছে, যাহাতে তাহারা সহজে ভূমি ছাড়িতে ইচ্ছুক না হয়। কোন কোন স্থলে বড় বড় জমিদারীগুলির মালিকেরা স্বেচ্ছায় সেগুলিকে ছোট ছোট নিষ্কর চাষীর জোতে পরিণত হইতে দিয়াছেন। যে সকল বিশুদ্ধ রক্তের জার্ম্মান নারী চাকরী ছাড়িয়া বিবাহে ইচ্ছুক, জার্ম্মান সরকার তাহাদিগকে বিবাহের যৌতুক দান করিয়াছেন; ফলে পুরুষদের বেকারের সংখ্যা কমিয়াছে। এই রূপে এবং আরও অন্যান্য উপায়ে নাৎসীরা বেকারের সংখ্যা কমাইয়াছে। তবে এই সংখ্যা কম হইবার আর এক কারণ বিতাড়িত ইহুদী আদির স্থলে অন্যান্য লোকের কর্ম্মপ্রাপ্তি। কাজেই উহা একেবারে অবিমিশ্র মঙ্গল নহে।

যদিও নাৎসীদের স্বরাষ্ট্র ব্যাপারে হিংসা এবং নৃশংসতার অন্ত ছিল না, বৈদেশিক নীতিতে নাৎসীরা স্পেনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অসাধারণরূপে সংযম দেখাইয়াছে। অবশ্য হিটলার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ও জাতিসংঘ, এই দুয়ের নিকট ফ্রান্স ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তির সমান অস্ত্র-শস্ত্রাদি রাখিবার দাবী করিলেন এবং দাবী না মিটাইলে উক্ত দুই সভা ত্যাগ করিবেন এরূপ ভয় দেখাইলেন এবং প্রকাশ্য ভাবে ইহাও ঘোষণা করিলেন, যদি মিত্র শক্তিবর্গ (Entente Allies) অস্ত্রাদি যথেষ্ট পরিমাণে না কমান, তবে ভার্সাই সন্ধিপত্রের লিখিত মত জার্ম্মানী নিরস্ত্র অবস্থায় থাকিতে ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাধ্য থাকিবে না; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও অষ্ট্রিয়া বা পোলিশ 'করিডর' বলপূর্ব্বক দখল করিবার জন্য তাঁহার কোন চেষ্টা দেখা গেল না। এমন কি নিজের আত্মজীবনীতে অনেক রণোৎসাহমূলক কথা বলিলেও হিটলার য়ুরোপীয় শান্তির পক্ষে ওকালতী করিলেন এবং সকলকে জানাইলেন যে, জার্ম্মানী অপর সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী রক্ষা করিয়া শান্তিতে থাকিতে চায়। এতদ্ব্যতীত পোল্যাণ্ডের সহিত জার্ম্মানী দশ বৎসর স্থায়ী এক শান্তি-রক্ষার চুক্তি করিয়া ফেলিল

কিন্তু নাৎসীদের মিঠা কথায় য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রীয় চালকগণের মন ভিজিল না। ফ্রান্স জার্ম্মানীর অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যাদি বৃদ্ধির আয়োজন দেখিয়া জার্ম্মানীকে অবিশ্বাস করিল। যে ব্রিটেন যুদ্ধ-বিরতির পর প্রায় দশ বৎসরের উপর জার্ম্মানীর পক্ষে সহানুভূতি দেখাইতেছিল, সেই ব্রিটেনও জার্ম্মানীর কাণ্ডকারখানায় অসন্তুষ্ট হইল। জার্ম্মান কম্যুনিষ্টদের নির্য্যাতনে রাশিয়া এত অসন্তুষ্ট হইল যে, সে বিপ্লবের পরে ফরাসীদের দ্বারস্থ হইল এবং সন্ধিপ্রণয়নে বৈদেশিক শক্তির বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হইল এবং জাতিসংঘেও যোগদান করিল। ইতালী পূর্ব্ব হইতে অষ্ট্রিয়ায় নাৎসীদলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটু সন্দিগ্ধ ছিল। অষ্ট্রিয়া এত কাল জার্ম্মানীর সহিত সদ্ভাব রাখিলেও হঠাৎ জার্ম্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ভয়ে ইতালির সঙ্গে মিত্রতা করিতে বাধ্য হইল। মোটের উপর যুদ্ধকালে জার্ম্মানী যেমন একঘরে হইয়াছিল, তদপেক্ষা বেশী একঘরে হইল নাৎসী প্রভুত্বের আরম্ভে।

হিটলার ও হিণ্ডেনবুর্গ একত্রে মোটরে বাহির হইয়াছেন।

কিন্তু এরূপ একঘরে হইয়াও নাৎসীরা সার (Saar) দখলের ব্যাপারে বিজয়-গৌরবের ভাগী হইয়াছে। মহাযুদ্ধান্তে সার প্রদেশ ভার্সাই-সন্ধির সর্ত্তানুসারে জার্ম্মানী

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জাতিসংঘের অধীনে এই সর্ত্তে শাসিত হইতেছিল যে, ১৯৩৫ সালে জনমত লইয়া নির্দ্ধারিত হইবে যে, (১) সার জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইবে, (২) না, ফরাসীদেশে প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইবে, (৩) অথবা জাতি-সংঘের শাসনাধীনই থাকিবে। সার অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই জার্ম্মান, কাজেই অন্য কোন কারণ না ঘটিলে ইহাদের জার্ম্মানীর সঙ্গে পুনরায় যুক্ত হইবার প্রস্তাবই সমর্থনের কথা, কিন্তু এমন অন্য কারণ ছিল, যাহাতে সারের লোকেরা জার্ম্মানীতে ফিরিয়া আসা পছন্দ নাও করিতে পারিত। যথা, সারের অধিকাংশ লোক ছিল রোমান ক্যাথলিক অথবা সোশ্যালিষ্ট দলভুক্ত; তাহারা নাৎসী-শাসনের প্রতি মোটেই শ্রদ্ধাশীল ছিল না। এতদ্ব্যতীত বহু উদার মতাবলম্বী ব্যক্তি এবং ইহুদীসম্প্রদায়ের লোক নাৎসীদের নির্য্যাতনের ফলে নির্ব্বাসিতের মত সারে বাস করিতেছিল; ইহারা ভোটের অধিকার পাওয়ার মত দীর্ঘকাল সারে না থাকিলেও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তথায় প্রচারকার্য্য চালাইতে সমর্থ ছিল, আর আর্থিক স্বার্থের দিক দিয়া সার অঞ্চল লোরেইন প্রদেশের সহিত যুক্ত ছিল। এই লোরেইন ছিল ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত। এতদ্ব্যতীত সারে কথা বলিবার ও খবরের কাগজ প্রকাশের স্বাধীনতা জার্ম্মানী অপেক্ষা বেশী ছিল। এই সব কারণে জনমত গ্রহণ করিলে জার্ম্মানদের সার পুনঃপ্রাপ্তি সম্ভব হইবে কি না, এ সম্বন্ধে হিটলারের যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। এ জন্য তিনি ফ্রান্সের সঙ্গে আপোষে চুক্তি করিয়া সার দখলের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তিনি নব্বই কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যে (যাহা অংশতঃ কয়লা দ্বারা শোধ হইবে) ফ্রান্স হইতে সারের কয়লার খনিগুলি কিনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। এ সকল ব্যর্থ হইলে জার্ম্মানী সার অঞ্চলের লোকদের ভোট পাওয়ার জন্য বিস্তর অর্থ ও প্রপাগাণ্ডা আরম্ভ করেন। কার্য্যকালে দেখা গেল, নাৎসীদের আশা সফল হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালেও জাতীয় ভাবের (national sentiment) স্থান অন্য সকল চিন্তার উপরে। সারে ভোটের সংখ্যা নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইল :—

জার্ম্মান শাসনের পক্ষে	৪,৭৭,১১৯
জাতি সংঘের "	৪৬,৫১৭
ফরাসী "	২,১২৪

এই ঘটনার পরে জার্ম্মান প্রাপ্ত-বয়স্ক নরনারীরা বহু ভোট দিয়া নাৎসী গবর্ণমেণ্টের জাতিসংঘ ত্যাগ ও তৎসম্পর্কিত পররাষ্ট্র নীতি (foreign policy) এবং শাসন-পদ্ধতিকে সমর্থন করিল। নাৎসীদের নীতি সমস্ত জার্ম্মানীর সমর্থন লাভ করিয়া থাকিলেও নাৎসীদলের মধ্যে ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষমূলক অন্তর্বিবাদ চলিতেছিল এবং ঠিক এই সময়ে কয়েকজন নাৎসীদলের চরমপন্থী লোক এই দাবী করিল যে, নাৎসী স্বেচ্ছাসৈনিক দলের (Nazi militia) সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সৈন্য-বাহিনীকে মিশাইয়া দেওয়া হউক এবং রাজতন্ত্রীদের লৌহ-শিরস্ত্রাণ দল (Steel-helmet) নামক স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক। প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গ ইহাতে ভয়ানক আপত্তি করিলেন এবং এ ক্ষেত্রে হিটলার নিজেও রক্ষণশীলদের মতের অনুবর্ত্তন করিলেন। নাৎসীদলের চরমপন্থী অংশ ইহাতে চটিল। হিটলার যে জার্ম্মানী হইতে খৃষ্টধর্ম্মকে নির্য্যাতন করিলেও একেবারে বিলুপ্ত করিবার উৎসাহ দেখাইলেন না এবং ইহুদীদিগের প্রতি অত্যাচারও একটু শিথিল করিলেন, তাহাতে নাৎসীদলের চরমপন্থিগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইল। কিন্তু হিটলারের ভয়ে কেহ প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছিল না। নিজদলের লোকদের এরূপ অসন্তোষ দেখিয়া হিটলার শঙ্কিত হইলেন, পাছে তাঁহার শত্রুরা এই দলকে হাত করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব লোপ ঘটায়। তখন এই অবস্থার প্রতীকারকল্পে তিনি গোয়েরিং (Goering) এবং অপর কয়েকজন বিশ্বাসভাজন অনুবর্ত্তীর সাহায্যে অসন্তুষ্ট নাৎসীগণকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের অভিনয় পূর্ব্বক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন হঠাৎ ৭৭ জন বিদ্রোহী নাৎসীকে যুগপৎ ধৃত ও নিহত করা হইল। তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, তাহারা কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র-শক্তির সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিল। কিন্তু তাহাদের অপরাধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জার্ম্মানীর বাহিরে এক তীব্র চাঞ্চল্য ও সমালোচনার সৃষ্টি করিল। হিটলার রাষ্ট্র-সভার এক বক্তৃতায় এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করিলেন, কিন্তু ষড়্‌যন্ত্রের কোন খুঁটিনাটি প্রমাণ দিতে পারিলেন না। এই ব্যাপার হিটলারের বিরুদ্ধপক্ষ বা বিরুদ্ধ মতের লোকদের নিরস্ত করিল বটে এবং হিটলার হয়ত সর্ব্বশক্তিমান

বলিয়া গণ্য হইলেন, কিন্তু বেশ বুঝা গেল যে, ক্ষমতাশালী নাৎসীদল দলাদলি ও মতভেদ দ্বারা কিরূপ সংহতিহীন।

সে যাহাই হোক, ১৯৩৪ অব্দের গ্রীষ্মকালে তিনটি ঘটনা য়ুরোপ মহাদেশকে আলোড়িত করিয়াছিল:—ইহাদের প্রথম, জার্ম্মানীতে বিদ্রোহী নাৎসীদের হত্যাকাণ্ড। দ্বিতীয়, অষ্ট্রিয়াতে নাৎসীদের অভ্যুত্থান এবং তৃতীয়, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবুর্গের পরলোকগমন। বৃদ্ধ প্রধান-সেনাপতি প্রেসিডেণ্ট প্রাচীন জার্ম্মানীকে নবীনের সঙ্গে একত্র সংহত রাখিবার শেষ বন্ধন ছিলেন। অনেক রক্ষণশীল জার্ম্মান তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সাধারণতন্ত্রের কার্য্যকলাপকে নির্বিচারে সমর্থন করিত। যদিও তিনি ভিতরে ভিতরে বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরোধী এবং রক্ষণশীল ছিলেন, তিনি প্রকাশ্যে প্রধান রাষ্ট্র-সচিবের কার্য্যকলাপ সমর্থন করিতেন। কেহ কেহ ভাবিলেন যে, হিণ্ডেনবুর্গ মারা গেলে তাঁহার সেনাবাহিনী হিটলারের বা অন্য কোন প্রেসিডেণ্টের প্রতি কোন আনুগত্য দেখাইবে না। কিন্তু হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুতে কোন গোলমাল বাধিল না। হিটলার নিজেই রাষ্ট্র-সচিব ও প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা হস্তগত করিয়া বসিলেন। প্রেসিডেণ্ট পদ হিণ্ডেনবুর্গের সঙ্গে সঙ্গে 'কবর'স্থ হইল। মুকুটধারী রাজার ন্যায় হিটলার সেনাবাহিনীকে নিজের প্রতি আনুগত্যস্বীকারের শপথ গ্রহণ করাইলেন এবং বিপুল সৎকারে রাষ্ট্রসভার নিকট অতীত প্রেসিডেণ্টের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দিলেন। তাহার পরেই জনমত গ্রহণ করিয়া তিনি জার্ম্মান রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় নেতা (Fuehrer) ও শাসক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। জার্ম্মান ইতিহাসের অতি-আধুনিক পর্ব্ব শুরু হইল।

বর-প্রাপ্তি

(কঠোপনিষৎ)

—শ্রীনন্দীপ্রসাদ রায়

রাজমন্ত্রী। বৎস, ত্যজি অনশন,
পাদ্য, অর্ঘ্য আমন্ত্রণ করিয়া গ্রহণ,
নিবারিয়া পথ-শ্রান্তি শীতল ব্যজনে
অপেক্ষিয়া রহ হেথা সুস্থ, শান্ত মনে।
গত হয়ে গেল এবে ত্রি-দিবা-রজনী,
নাহি ফিরে ধর্ম্মরাজ।

নচিকেত করি নমস্কার,
হে দেবতা! অনুরোধ তব পালিবার
শকতি নাহিক মোর। মানস চঞ্চল;
যে কার্য্যে এসেছি হেথা, না হলে সফল
নাহি ইচ্ছা, নাহি শক্তি করিতে গ্রহণ
তব দত্ত অন্ন-জল স্নেহ-সম্ভাষণ—
ক্ষম মোরে।

রাজমন্ত্রী। নিতান্তই হয়ে উপবাসী
চাহ যদি থাকিবারে, রাজপুরে আসি
শীতল-মলয়-তৃপ্ত বিশ্রাম-আগারে
রহ অপেক্ষিয়া।

নচিকেতা। দেববর ক্ষম মোরে!
নাহি কিছু প্রয়োজন পশি' রাজপুর,
লক্ষ্য না লভিয়া, সেথা করি শ্রান্তি দূর
অলসতা সঙ্গে ঢলি' করিতে বিশ্রাম।
আশীর্ব্বাদ কর যেন পূরে মনস্কাম,
যেন পূজ্য ধর্ম্ম-রাজে করিতে দর্শন
নাহি ঘটে অন্তরায়। আনন্দে মগন
পরিপূর্ণ তৃপ্তি লয়ে আছি দ্বার-দেশে,
করিও না ক্ষোভ তাহে।

রাজমন্ত্রী। বালকের বেশে
পরিপূর্ণ দৃঢ়তার মূর্ত্ত প্রতিচ্ছবি,
করি আশীর্ব্বাদ, বৎস, ত্বরা সিদ্ধি লভি'
ফিরে যাও নিজালয়ে। আসিছেন ফিরে
ধর্ম্ম-রাজ। এস রাজা, নমি নতশিরে!

যমরাজ। মঙ্গল হউক তব। কে এই বালক?

নচিকেতা। প্রণমি চরণে, দেব, ধর্ম্মের পালক!
নচিকেতা নাম মোর, রাজশ্রবা-সুত।
পিতা মোর হ'য়ে পুণ্য-যজ্ঞ-কর্ম্মে রত
দান করে বহু গাভী, বহু রত্ন, ধন।
শীর্ণ-কায়, শক্তিহীন করিয়া দর্শন
দত্ত গাভী-দলে, চিত্ত হইল বিকল।
কহিলাম, "পিতা, যদি দিতেছ সকল
রাজ-ভাণ্ডারের যত হীনতম ধন,
মোরে তুমি কার করে করিছ অর্পণ?"
পিতা কহিলেন রোষে রক্ত-নেত্রে, "তোরে
সমর্পণ করিলাম যম রাজ করে।"
সে কথা শুনিয়া মোর ক্ষুদ্র চিত্ত-দলে
শ্রদ্ধা আসি মাথা তুলি' দাঁড়াল সবলে।
অবহেলা করে পিতা, হীন আমি এত!
মন কহে, "অসম্ভব," কহে, "তোর মত
বালক রয়েছে যত অবনীর 'পরে,
তার মাঝে হীন তুই কেন হবি ওরে?
অনেকের চেয়ে তুই শ্রেয়ঃ-তর প্রাণী;
অনেকের মাঝে তোরে শ্রেয়ঃতম জানি।
সব লোকে মিলে যদি হীন কহে, তবু
সে কথায় কর্ণপাত না করিস্ কভু।"
আপনার শক্তি-পুঞ্জে হয়ে সচেতন
ভাবিলাম, পিতা যদি করিলা অর্পণ
যম-রাজ করে মোরে, আমা হ'তে তাঁর
হ'তে পারে বহু কার্য্য। বিশ্বাস আমার
আনিয়াছে মোরে তাই তব সন্নিধানে।

রাজমন্ত্রী। দীর্ঘ তিন দিবা-নিশি রহি' অনশনে
অপেক্ষা করেছে বসি' তোমার লাগিয়া,
যবে না[illegible] রাজপুরে।

যমরাজ। প্রণমিয়া
কহি তোমা, পূজনীয় হে অতিথি-বর,
তিন রাত্রি ছিলে মোর গৃহে অনাহার,
প্রীত তাই তব প্রতি। যথা ইচ্ছা তব
তিন বর মাগি' লহ, প্রদান করিব
হৃষ্টমনে।

নচিকেতা। মহারাজ, যবে যাব ফিরে
নিজালয়ে, পিতা যেন আলিঙ্গনে ঘিরে,
ভুলি' মোর অপরাধ, তাজি' ক্রোধ-ভার।
ঘুচে যেন যায় তাঁর মনের সন্তাপ
আমা লাগি'। এই চাহি দেব!

যমরাজ তাই হবে।
দ্বিতীয় প্রার্থনা কি বা কহ, বৎস।

নচিকেতা। যবে
ছিনু মর্ত্ত-পুরে, শুনিয়াছি স্বর্গদেশে
নাহি জরা, নাহি মৃত্যু; সর্ব্বনাশা-বেশে
ভুলিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সেথা নাহি ঘুরে।
কহ, দেব, অগ্নি পূজি' সেই স্বর্গ-পুরে
কিরূপে প্রবেশে সবে।

যমরাজ। শুন দিয়া মন,
কহিতেছি অগ্নিতত্ত্ব, গূঢ় বিবরণ।

* * *

পুনঃ বর দিনু এই, তোমার নামেতে
এ অগ্নি বিখ্যাত হবে সকল জগতে।
চাহ শেষ বর।

নচিকেতা। কেহ বলে মৃত্যু-পারে
দেহ-ত্যাগ করিয়াও আত্মা বাস করে।
কেহ বলে, মিথ্যা কথা; জীব দেহনাশে
জীবের সকল কিছু মিলায় শূন্যেতে।
এই চিরন্তন দ্বিধা, মনের সংশয়
কর দূর, এই মোর শেষ অনুনয়।

যমরাজ। দেবতাও করি' থাকে দ্বিধা এ কথায়;
অতীব দুর্জ্ঞেয় ইহা। ধারণা না হয়

শুনিয়াও বহুবার এই আত্মকথা।
চেও না জানিতে ইহা; শুন, নচিকেতা,
অন্য বর মাগ তুমি।

নচিকেতা। দেবতাও যাহা
নাহি পারে বুঝিবারে, কত গুরু তাহা!
তোমা সম জ্ঞানবান্ গুরু লাভ করি'
তাহা যদি না শিখিনু, এত কষ্ট বরি'
বৃথা তব সঙ্গলাভ। কি চাহিব আর?
পরলোক-কথা মোরে কহ সবিস্তার।

যমরাজ। নচিকেতা, জগতের মানুষ যা চায়,
চাহি যাও, দিব আমি সকলি তোমায়।
স-সাগরা ধরণীর অধিপতি হয়ে,
শতবর্ষ-জীবী পুত্র, পৌত্রদের লয়ে,
রথ, অশ্ব, সৈন্য, গজ, অফুরন্ত ধন,
যুবতী রমণী সহ হৃদয়-বন্ধন
যত দিন ইচ্ছা তব বাঁচিতে ধরায়,
চাহ যদি, দিব আমি সকলি তোমায়।
নচিকেতা, শুধু তুমি চেও না জানিতে
মরণ-রহস্য-কথা!

নচিকেতা। অনিত্য জগতে
ধন, জন, দীর্ঘ আয়ু,—কিবা মূল্য তার?
ঐশ্বর্য্য-আনন্দ-ময় দৃশ্য আজিকার,
কে বলিবে, রবে পরদিন? যার তরে
বিষয়ের প্রয়োজন জীবনের ঘরে,
সেই মত্ত ইন্দ্রিয়ের সব বীর্য্য, বল
কালক্রমে হয়ে যায় অবশ, অচল।
অনন্তকালের স্রোতে ধরার জীবন,
হউক সে যত দীর্ঘ, ঐশ্বর্য্য-মগন,
সীমাবদ্ধ তবু সে যে, বুদ্বুদ-আকার
অসীম সাগর-জলে। কিবা মূল্য তার?
ধর্ম্মরাজ, ক্ষণ-জীবী কোন্ মর্ত্ত্য-বাসী
ভাগ্য-বলে মৃত্যু-জয়ী দেব-পাশে আসি'
সংসারের ভোগ-সুখ নিত্য নহে জানি,'
হীন মর্ত্ত্য জীবনেরে তুচ্ছ নাহি মানি'
সুখের অস্তিত্ব পারে করিতে কল্পনা
তার মাঝে? দেব, মোর শুধু এ প্রার্থনা,
তব রাজ্য, অশ্ব, রথ থাক্ তব কাছে,
নাহি চাহি কোন সুখ সংসারের মাঝে।
শুধু বুঝাইয়া দাও, মৃত্যু পরপারে
আত্মা বাস করে কি না। সংশয়-আঁধারে
দাও জ্বালাইয়া শুধু জ্ঞানের আলোক;
নাহি চাহি অন্য বর।

যমরাজ। জ্ঞানার্থী বালক,
প্রীত আমি তব প্রতি! মানুষের কাছে
জীবনের দুটি পথ দুই দিকে রাজে।
প্রকৃত কল্যাণ যাহা, "শ্রেয়ঃ" তারে কয়;
বড় সে দুর্গম পথ, সর্ব্বগম্য নয়।
আপাত-মধুর পথ, "প্রেয়" নাম তার;
সেই পথে মানি লয় জীবনের সার
অধিকাংশ জীব। লয়ে বর্ত্তমান সুখ
সকলে হইয়া থাকে কল্যাণ-বিমুখ।
সংসারের ভোগ-মদে মত্ত নাহি হয়ে,
সব ত্যাগি,' সংযমের মুক্ত ধ্বজা লয়ে
অতি অল্প জন পারে অধ্যাত্মের পথে
করিবারে বিচরণ। বৎস, কোন মতে
মুগ্ধ মর্ত্ত্য-বাসীদের শ্রেষ্ঠ কাম্যধন
পারিল না তব পদ করিতে স্খলন
জ্ঞান-লিপ্সু বৈরাগ্যের তীক্ষ্ণ, ক্ষুর-ধার
পথ হ'তে। গূঢ় আত্ম-তত্ত্ব শুনিবার
যোগ্য তুমি। মলিন, দুর্ব্বল, মুগ্ধ মন
নাহি পারে উচ্চতত্ত্ব করিতে গ্রহণ।
প্রাণ-প্রিয়তর তাত, শুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান
কহিতেছি, শান্ত মনে কর অবধান।

আধুনিক বাংলার কাল্‌চার্‌

—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রথমেই যদি বলি, আধুনিক বাংলার culture নাই তবে হয়ত প্রবন্ধ জমিবে না, কিন্তু সত্য কথাই বলা হইবে। আশ্বিনের বঙ্গশ্রীতে শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের "বাংলার আধুনিক কাল্‌চার্‌" পড়িয়া আমার সেই বিশ্বাস দৃঢ়তরই হইয়াছে। বাংলার culture-এর অস্তিত্ব প্রমাণকল্পে নানা যুক্তি দিয়া তিনি বলিতেছেন—

> "আমাদের নব cultureকে বিলেতি culture বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।"

ইহাতে স্বীকার করা হইতেছে—অধুনা আমাদের কোনও culture নাই, যা আছে সে বিলেতি culture, বাংলার culture নহে।

প্রমথবাবু বলিয়াছেন এবং আমরাও সকলেই জানি culture-এর বাংলা নাই। বাংলায় জিরাফ্‌ নাই বলিয়াই যেমন জিরাফের বাংলা নাই, তেমনই বাংলার culture নাই বলিয়াই culture-এর বাংলা নাই ইহাই সম্ভব। জিরাফ্‌ সম্বন্ধে বিলেতি পুঁথি পাঠ করিয়া বাংলায় প্রবন্ধ লেখা যাইতে পারে, পল্লীগ্রামের uncultured লোকদের দেখাইবার জন্য আলিপুরের বাগানে একাধিক জিরাফ্‌ আমদানি করিয়া জিয়াইয়া রাখাও চলিতে পারে, কিন্তু তাহাতে 'বাংলার জিরাফ্‌' সত্য বস্তু হইয়া উঠে না।

বাংলার culture বলিতে অবশ্য বাঙ্গালীর cultureই বুঝিতে হইবে,—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার মাটীর culture বুঝিলে চলিবে না। এই বাঙ্গালী বলিতে চিরদিন বঙ্গদেশবাসী ও বঙ্গভাষাভাষী বুঝায়। অধুনা শুনা যায় ও অনুভব করা যায় যে, বাঙ্গালীর মধ্যে শতকরা ৫৫ জন মুসলমান ও ৪৫ জন হিন্দু। এখন "আধুনিক বাংলার culture" বলিতে গিয়া তাহার ৫৫ জনের কথা ভুলিয়া বা চাপা দিয়া ৪৫ জনের কথা বলিলে বাংলার culture-এর কথা বলা হইবে কি না?

শ্রদ্ধেয় প্রমথবাবু একেবারে 'শেষ কথা' বলিয়া দিয়াছেন—

> "বাংলাদেশে যিনি সংস্কৃত-সাহিত্য-দর্শন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তাঁকে আমি cultured বল্‌তে প্রস্তুত নই।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—

> "রামমোহন যে culture-এর আবাহন করেছিলেন, সে culture-এর শতদল পদ্ম হচ্ছেন বাংলার রবীন্দ্রনাথ!"

সে শতদল কোথায় প্রস্ফুটিত হইয়াছে? না—আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির অন্তরে, যে-অন্তর 'রামমোহন সম্পর্কে নানা অলীক ধারণার জঞ্জালে মিথ্যা কথার আঁস্তাকুড় হয়ে রয়েছে'; এ culture যে শতকরা ৪৫ জনের culture, সমগ্র আধুনিক বাংলার culture নহে, ইহা সুস্পষ্ট। প্রমথবাবুর প্রবন্ধের শিরোনামা ছিল "বাংলার আধুনিক কাল্‌চার্‌।"

কিন্তু দোষ culture-এর নহে, জিরাফের নহে, প্রমথবাবুর ত' নহেই। দোষ হইতেছে বাংলার। আধুনিক বাংলায় হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, তপশীলভুক্ত ও তপশীলমুক্ত জাতি আছে, কিন্তু বঙ্গদেশ বাঙ্গালীদ্বারা অধ্যুষিত নহে। সুতরাং এখন বাঙ্গালীর বা বাংলার culture, কবন্ধের শিরঃপীড়ার ন্যায় অলীক হইতে বাধ্য। দেশে cultured লোক নাই, তাহা নহে; কিন্তু ৪৫ জনের অন্তর-আঁস্তাকুড় হইতে culture-এর যে শতদল-পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিল, তাহাকে 'বাঙ্গালীর আধুনিক culture'এর প্রতীক্‌ বলা চলে না; তাহার মূলে দেশী 'উপনিষদের বাণী' ও ফুলে 'বিলেতি মুক্তির বাণী' থাকিলেও নয় এবং আছে বলিয়াই নয়। আর প্রমথবাবুর মতে যে ৪৫ জনের অন্তর হইল আঁস্তাকুড়, তাহা শতদল ফুটিবার উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু আঁস্তাকুড়ের আবার culture কি? পুনরায় তিনি বলিতেছেন—

> "বর্ত্তমানে বাংলাদেশে যতটা culture আছে, আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে আর কোথাও ততটা নেই।"

এ culture তবে বোধ হয় agri-culture-এর কথা।

আমার বক্তব্য অধুনা বাংলাদেশে বাঙ্গালী বলিয়া একটী জাতি না থাকায় 'আধুনিক বাঙ্গালীর culture' সম্পর্কে কোনও আলোচনা উপস্থিত চলিতে পারে না। যাঁহারা বাঙ্গালী বলিতে ৪৫ জনের কথাই বুঝেন, এবং ভাবেন বাকী ত' মুসলমান, তাঁহাদের অবশ্যই একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি আছে। অপরপক্ষে যাঁহারা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না যে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিলে ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিবে কি না এবং বাংলাদেশে বাস করিতেছি ও বাংলাভাষায় কথা কহিতেছি বলিয়াই ৫৫ জনের পক্ষে আদৌ বাঙ্গালী হইবার প্রয়োজন আছে কি না, তাঁহাদের uncultured বলিবার সাহসই বা কোথা হইতে সংগ্রহ করি! তবে বাঙ্গালীর আধুনিক culture কোন্‌টা?

প্রত্যেক culture-এর থাকে দুটী অভিন্ন অংশ। উপরের অংশ পত্রপুষ্পফলে সুশোভিত, আর নিম্নের অংশ মৃত্তিকার তলে তলে সহস্র শিকড় প্রেরণ করিয়া আপনার প্রাণরস আহরণ করে। জংলী গাছের ন্যায় স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাঁওতালী আনন্দে বাড়িয়া উঠিলেও তাহাকে আমরা culture বলি না; আবার মরুভূমির মধ্যে অতি কষ্টে যে তৃণ বেদুইনী পন্থায় আপনার ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরও culture-এর কথা উঠে না। প্রত্যেক culture-এর মূল থাকিবে মাটীর গভীর তলে। আর বাহিরে চলিবে কর্ষণ, সেচন। প্রকৃতির সস্নেহ সহায়তা ও মানুষের সানন্দ প্রয়াস উভয়ে মিলিয়া cultureকে সৃষ্টি করে, বর্দ্ধিত করে। মূল হইতে ফুল পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে থাকিবে একটা অব্যাহত রসধারা, একটী সম্পূর্ণ সঙ্গতি। যাহার নিম্নে রসের জোগান দিবার জন্য উর্ব্বর অতীত নাই, অথবা থাকিলেও যে তাহাকে অস্বীকার করিয়া সেখানে রস-সংগ্রাহী জীবন্ত শিকড়জাল বিস্তার না করে, সে culture নামের মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য নহে। উপরের ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করিয়া আলোক বাতাস গ্রহণ করিবার সুপ্রচুর শক্তি যাহার শাখা-প্রশাখায় নাই, তাহাকেও culture বলা যায় না। সমগ্র আধুনিক বাঙ্গালীর এমন কোনও সাধারণ অতীত নাই, যেখান হইতে তাহার culture নির্ব্বিরোধে ও স্বাভাবিক নিয়মে আপনার রসধারা আকর্ষণ করিবে। এখানে প্রকৃতি তাহার বিরোধী। পূত ভাগীরথি-ধারায় প্রাচীন হিমালয়ের প্রস্তর ক্ষয়িত হইয়া বাংলায় যে পলিমাটীর স্তর উৎপন্ন হইতেছিল, তাহার উপর আরবের সুপবিত্র বালুরাশির আমদানি চলিতেছে। ফলে বাঙ্গালীর অতীত একান্ত অনুর্ব্বর হইয়া উঠিল। আরবের বালু আসিল, আরবের খর্জ্জুরপ্রীতি আসিল, কিন্তু আরবের খর্জ্জুর আসিল না। বাংলার আঁটা ও আরবের বালুতে যে খর্জ্জুর ফলিতে লাগিল, তাহার শস্যসম্পদ যেমন সামান্য, তাহার কণ্টক-সম্ভার তেমনই অসামান্য।

আধুনিক বাঙ্গালীর অতীতের স্তরে স্তরে বিরোধ ও বর্ত্তমানের শিরায় শিরায় বিদ্বেষ। প্রভাতে যাহার ফুলে ৪৫ জনে মাল্য রচনা করে, সন্ধ্যায় তাহার মূলে ৫৫ জনে কুঠার চালায়। একের যাহা কল্পতরু, অপরের তাহা আগাছা। বাঙ্গালী কবি যোগ দেয় আনন্দমঠের অগ্ন্যুৎসবে, প্রস্তাব করে শিক্ষায়তন শ্রীহীন হউক, প্রচার করে বন্দেমাতরম্ ধর্ম্মধ্বংসী! ৪৫ জন বাঙ্গালীর অন্তর-আঁস্তাকুড়ের বিকশিত শতদল-পদ্ম অবান্তরভাবে বলিয়া উঠেন—'চিরকাল জলে বাস করায় গলদা-চিংড়ি সম্বন্ধে মতামত দিবার অধিকার আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গলদা-চিংড়ি মোটেই মৎস্যপর্য্যায়ে স্থান পাইতে পারে না বলিয়া সম্প্রতি যে আপত্তি উঠিয়াছে, তাহা বৈজ্ঞানিক হিসাবে ঠিক হইলেও মৎস্য ভাবেই আমি উহাকে দীর্ঘদিন আস্বাদন করিয়া আসিতেছি, সুতরাং উহা একটি শ্রেষ্ঠ মৎস্য। তথাপি নিরপেক্ষচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে গলদাচিংড়ি বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে উহার মুড়াই বুঝায়, কারণ ঘিলুই বল, আর দাঁড়াই বল, উহা উক্ত মুড়ার সহিত সংযুক্ত। সেহেতু সম্প্রতি-সমুত্থাপিত আপত্তিটা ল্যাজা সম্বন্ধে গ্রাহ্য হইবার আপত্তি কি? অতএব গঙ্গার গলদাচিংড়ির ল্যাজার দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া উহার মুড়াকে স্বচ্ছন্দে ভারত মহাসাগরে বিচরণ করিতে দেওয়া হউক, ইহাই আমার উপদেশ।'

হায় আধুনিক বাঙ্গালীর culture ও তাহার শতদল-পদ্ম!

অবশ্য শতকরা ৪৫ জনের culture সম্বন্ধে মুগ্ধচিত্তে প্রবন্ধ লিখিলে সকল ল্যাঠা চুকিয়া যায়। ব্যাস, বাল্মিকী,

হইতে আরম্ভ করিয়া ভাস, কালিদাস, চণ্ডিদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত একটা মনগড়া কৃষ্টিধারার সৃষ্টি করিয়া তাহাকে বাঙ্গালীর culture বলিয়া ঘোষণা করার সুবিধা অনেক। কিন্তু দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া, নাক চোখ কান বুঁজিয়া কিরূপে তাহাকে আধুনিক বাঙ্গালীর culture বলিয়া চালাইয়া দিব? দেশে অনেকগুলি cultured লোক থাকিলেই সে দেশের culture আছে বলিয়া বুঝায় না। ব্যাবহারিক জীবনে নানা বিভেদ থাকা সত্ত্বেও সেই cultured লোক-দের মধ্যে আদর্শের সাম্য, স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য থাকা চাই; আর চাই দেশের uncultured জনসঙ্ঘ সেই cultureকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিবে। নচেৎ সমস্ত লোক cultured হইলে তবে দেশের culture আছে স্বীকার করা হইবে, এমন কথা বলা হইতেছে না। অধিকাংশ বাংলা দেশবাসী যে culture-কে স্বকীয় বলিয়া স্বীকারই করিল না, বরঞ্চ তাহার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, তাহাকে আধুনিক বাংলার culture বলি কি করিয়া? বাঙ্গালীর আধুনিক সমস্যাই হইতেছে এই culture-এর সমস্যা; একাংশ যাহাকে প্রাণস্বরূপ বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, অপরাংশ তাহাকেই বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করে। বর্ত্তমানে এই সংঘর্ষে, আমরা যাহাকে 'বাঙ্গালীর culture' বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, তাহার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে; যেহেতু সমগ্র বঙ্গদেশবাসী তাহাকে আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করিল না। বাঙ্গালী হিন্দুর cultureকে আধুনিক বাঙ্গালীর culture বলিয়া যত জোরে ঘোষণা করা হইবে, প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মে সংঘর্ষ ততই বাড়িয়া চলিবে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, বটবৃক্ষ খেজুরগাছকে আত্মসাৎ করিয়াই সগৌরবে ছায়া দান করিতেছে। হিন্দু-বাঙ্গালীর culture যদি বটবৃক্ষ হইত, তবে অবস্থা স্বতন্ত্র হইতে পারিত। সে ছিল শিউলি গাছ; রাত্রির অন্ধকারে ফুল ফুটাইয়া অরুণোদয়ের পূর্ব্বে ঝরাইয়া দিয়াই সে আনন্দ-লাভ করিত। ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদানো ছিল তাহার বৈশিষ্ট্য। কীর্ত্তনে নামিয়া কাঁদে তাহার চৈতন্য, বক্তৃতামঞ্চে উঠিয়া কাঁদে তাহার দেশবন্ধু। তাহার বিদ্যাসাগরও দয়ার সাগর। সে cultureএর একটা প্রধান বাণী—'মেরেছ বেশ কোরেছ হরি বলে' নাচ ভাই!' এ হেন শিউলি গাছের মূলে বাড়িয়া উঠিল খেজুরের চারা। সেই চারা আজ বাধা চাড়া দিয়া শিউলি গাছকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। শিউলি গাছে খেজুর গাছে জোড়-কলম বাঁধিবার যে ধস্তাধস্তি তাহাই আধুনিক বাংলার স্বরূপ; কোনও শতদল-পদ্মে তাহার culture বিকশিত হইয়া উঠে নাই। সত্য বটে এই জোড়-কলমের একাংশে এখনও নিষ্ফল ফুল ফুটিতেছে, আর অপরাংশে আঁটীসার ফল ফলিতেছে। কিন্তু ইহাকে যদি একটা জাতির culture বলিতে হয়, তবে তাহার বাংলা প্রতিশব্দ প্রমথবাবুর প্রস্তাবিত "বৈদগ্ধ্য" হইলেই ভাল হয়। কিছু-পূর্ব্বে দুটা গাছকে যথাসম্ভব দুঠাঁই করিয়া পুঁতিবার একটা রাজকীয় ব্যবস্থা শিউলি গাছেরই পছন্দ হয় নাই। সুতরাং শিউলি-খেজুরের জোড়-কলম আরও জোর করিয়া বাঁধা হইল। সেই জোড়-কলম বজায় রাখিবার চেষ্টা হই-তেই না কি ভারত স্বাধীনতার পথের সন্ধান পাইয়াছে। হয়ত ভারত স্বাধীন হইবে, কিন্তু বাংলায় ৪৫ জনের cultureএর মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছে সেই চেষ্টা হইতেই। U. P. গুজরাটের সাহায্যে সে culture ফিরিবে কি?

তথাপি এ কথা সত্য—বাংলার খেজুর গাছের সার্থকতা কাঁটায় বা ফলে নহে, তাহার রসে; আর সে রস ঝরাইতে পারে গাছ-শিউলি নয়, মানুষ-শিউলি। অদূরভবিষ্যতে সে-মানুষ কি জন্মিবে না, যে বাংলা খেজুর গাছের আরবী খেজুর ফল ফলাইবার দুঃস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া নিষ্ঠুর আঘাতে তাহার কণ্ঠ হইতে রসের ঝরণা ঝরাইবে? সে শিউলির আগমনের পথ ত' আজিও অন্ধকার। হয় ত' বাংলার মাটি শেষ পর্য্যন্ত খেজুর গাছকেও ঝরাইবে এবং কাঁদা-ইবে। কেবল সাথে সাথে ঝরিবার এবং কাঁদিবার জন্য সেই মানুষ-শিউলির আগমন-কাল পর্য্যন্ত গাছ-শিউলি টিকিবে কি না, ইহাই আধুনিক বাংলার প্রধান প্রশ্ন।

বাংলার culture সম্বন্ধে প্রবন্ধ যে শেষ পর্য্যন্ত agriculture-এই পরিণত হইল, তাহার কারণ আর কিছু নহে, অধুনা বাংলার culture বলিতে যদি কিছু থাকে, তাহা ওই agriculture। বিগত যুগের হিন্দু বাঙ্গালীর culture সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে অবশ্য agriculture না হইতে পারিত।

মহাচীনের পূর্ব্বকথা

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

আজ জাপানের সঙ্গে চীনের যে যুদ্ধ বেধেছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলার আগে চীনের পূর্ব্বকথা কিছু বলা দরকার। কারণ, জাপানের স্পর্দ্ধার সঙ্গে সেই শোচনীয় ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও উর্দ্ধকাল থেকে বিদেশী স্বাধীন জাতিগুলির দ্বারা চীনকে নিজের নিজের পণ্যের উৎকৃষ্ট বাজারে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। সকলেরই লক্ষ্য চীনের কাঁচামাল নিয়ে তার ঘাড়ে তাদের "পাকা" মাল চাপান। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ফ্রান্স দখল করলে চীনের দক্ষিণে আনাম, জার্ম্মাণী চীনের উত্তরে কিয়াওচৌ, আর রুশ জাপানে যুদ্ধ বেধে গেল মাঞ্চুরিয়া নিয়ে। ফলে জাপান একটি থাবায় কোরিয়াকে মাঞ্চুরিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে, আর দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ার উৎপন্ন দ্রব্যের উপর প্রভাব বিস্তার করলে। পরাজিত হয়ে রাশিয়া চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে দখল করেই সন্তুষ্ট রইল। এই রেলপথ উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার ভিতর দিয়ে ভ্লাডিভষ্টক পর্য্যন্ত গেছে। কিন্তু সকলের চেয়ে সেরা জায়গা দখল করলে বৃটেন। চীনের জনপদ এবং বাণিজ্য প্রধানতঃ তিনটি বড় নদীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে,—সি-কিয়াং, ইয়াংসি-কিয়াং এবং পীত নদী। হংকং জয় করে বৃটেন ক্যাণ্টনের বাণিজ্য হস্তগত করলে। আর চীনা বন্দরে দুর্গনির্ম্মাণের অধিকার লাভ করে সাংহাই বাণিজ্যের বড় অংশে এবং ইয়াংসির নৌ-বাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করলে। শানটুং প্রদেশ (লোক-সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি) দখলে থাকায় পীত নদীতে জার্ম্মানীর ক্ষমতা রইল বটে, কিন্তু শানটুং-এর একটি বন্দর বৃটেনের হাতে। তা ছাড়া জার্ম্মান ও রুশীয় প্রভাবের

বিরুদ্ধে জাপানের সঙ্গে চুক্তি করে বৃটেন ১৯০২ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত উত্তর-চীনেও আপন প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখলে।

সন্ধির মূল্য

কিন্তু মহাচীনের স্থানে স্থানে বিদেশী শক্তিপুঞ্জ এই যে একটি একটি করে ঘাটি বসালে, এ সবই সন্ধির বলে। সুতরাং এই সব জায়গার উপর তাদের "ন্যায়সঙ্গত" অধিকার সম্বন্ধে আইনে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু এই সব সন্ধির অধিকাংশই সঙ্গীনের গুঁতোর জোরে আদায় করা হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, বৃটিশ বণিকদের জন্য চীনে আফিং বিক্রির অধিকার আদায় করতে বৃটেন ১৮৪২ সালে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। বস্তুতঃ ১৮৪২ থেকে ১৯১৪ পর্য্যন্ত চীনের বৈদেশিক সম্পর্কের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই বোঝা যায় যে ভাবে চীনের রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক অধিকার একটি একটি করে বিদেশীদের হাতে গিয়ে পড়ল। চীনের বাণিজ্য তারা নিজেদের সুবিধা মত নির্দ্দিষ্ট করলে, এবং সেই বাণিজ্যের আবার চীনকে দেওয়া ঋণের সুদ বাবদ ... নিতে লাগল। জাহাজ এবং ষ্টীমার একটিও চীনের ... টাকায় বিদেশী-দের ... হাতে; চীনা ... তারা প্রচুর লাভ করতে লাগল। এমন কি চীনের রাজস্ব কি-ভাবে ব্যয়িত হবে, তাও বৈদেশিক বিশারদ-সঙ্ঘকে না জানিয়ে স্থির করার উপায় ছিল না।

১৯১৯ সালে প্যারিস শান্তি-বৈঠকে চীন এই দুর্গতির কথা সবিস্তারে জানালে। মার্কিন প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফার বড় গলায় ঘোষণা করেছিলেন, "The removal, as far as possible, of all economic barriers and the establishment of an equality of trade conditions…a free, open-minded and absolutely impartial adjustment of colonial claims…in the interests of the populations concerned." কিন্তু কার্য্যকালে শান্তি-বৈঠক কবুল জবাব দিলে, এ সব বিষয়ে বিচারের ক্ষমতা বৈঠকের নেই। চীন শানটুং ফিরে চাইলে। তাও না। বললে, চীন মহাযুদ্ধে যোগ দিলে একেবারে শেষ সময়ে, ১৯১৭ সালে। সুতরাং জার্ম্মানীর হাত থেকে শানটুং প্রদেশও ফিরে পেতে পারে না। শানটুং পেলে জাপান। রিক্তহস্তে চীন ফিরে এল।

ডাঃ সান ইয়াট্‌-সেন

এ অপমান দুর্ব্বল চীনকে মুখ বুজেই সইতে হল। সত্য কথা বলতে গেলে, চীনে তখন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত শাসন-সরকারও ছিল না। ১৬৪৪ থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত মাঞ্চুবংশ রাজত্ব করেন। তারপরে দুর্ব্বল ও অক্ষম রাজা যখন কিছুতেই চীন-সংস্কারে মনোযোগী হলেন না, বিদেশী প্রভাবও প্রতিরোধ করতে পারলেন না, জনসাধারণ তখন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করলেন ডাঃ সান ইয়াট-সেন। অদ্ভুত-কর্ম্মা সান হংকঙে মেডিকাল কলেজে পড়বার সময় থেকেই বিপ্লবী। ১৮৯৫ সালে চীন থেকে নির্ব্বাসিত হয়ে তিনি জাপান, হনলুলু ও ইউরোপের নানাস্থানে বিপ্লবীসঙ্ঘ গঠন করতে লাগলেন। পিকাডিলিতে একবার তাঁকে গুম করাও হয়েছিল। বহু বার বহু কৌশলে তিনি প্রাণরক্ষা করেন। ১৯১১ সাল থেকে তিনি চীনের অবিসংবাদী নেতারূপে গৃহীত হলেন।

কিন্তু ১৯১১ সালের বিপ্লবেও আকাঙ্ক্ষিত ফল মিলল না শাসনদণ্ড মাঞ্চুরাজার হাত থেকে স্খলিত হয়ে জনৈক রাজকর্ম্মচারীর হাতে গিয়ে পড়ল। ১৯১৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন। তাঁদের আখ্যা হল War-lords বা সমর-দেবতা উত্তর-চীনের রাজধানী পিকিঙে একটা নামমাত্র শাসন-সরকার রইল বটে, কিন্তু সমর-দেবতারা যে কোন সময়ে এসে রাজকোষের উপর কর ধার্য্য করতেন। ডাঃ সান ইয়াট-সেনের জাতীয় দলের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হল দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টনে। এর নাম হল, কুওমিনটাং। প্যারিসের শান্তি-বৈঠকে সর্ব্বপ্রথম উত্তর ও দক্ষিণ-সরকার একযোগে কাজ করেন।

প্যারিস বৈঠকে জাপানের অন্যায় লাভে জনমত

কুওমিনটানের প্রতি আকৃষ্ট হল। মহাযুদ্ধের সময় চীনে অর্থনৈতিক শোষণ আরও সুগম করবার জন্য জাপান চীনকে তার একবিংশ দাবী (twenty-one demands) গ্রহণ করতে বাধ্য করে। একমাত্র কুওমিনটানই এই দাবী প্রতিরোধ করে। ১৯২১ সালে ডাঃ সান ঘোষণা করলেন, সন্ধিসূত্রে বিদেশীরা যে সমস্ত স্থান ও সুবিধা লাভ করেছে, তার অবসান করতে হবে। চীন-শাসনের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে একমাত্র চীনাদের হাতে।

রুশীয় সাহায্য

মোটামুটি তিনটি নীতি ডাঃ সান প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন,—জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও ধন-সাম্য। চীনে তখন যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাতে তাঁর এই আদর্শের পথে বিঘ্ন ছিল অনেক। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে গঠিত এই তিনটি নীতি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের সহানুভূতি আকর্ষণ করবে। তিনি আমেরিকা, বৃটেন এবং জাপানের কাছে সাহায্য-ভিক্ষাও করেছিলেন। আমেরিকা সরাসরি এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেছিল। বৃটেন এবং জাপান ডাঃ সানকে তো সাহায্য করেইনি, বরং তাঁর প্রতিপক্ষদেরই সাহায্য করেছিল। গ্রেট বৃটেন করেছিল ইয়াংসি তীরভূমির সমর-দেবতা উপি ফুকে, আর জাপান করেছিল মাঞ্চুরিয়ার সমর-দেবতা চ্যাং-সো লিনকে। চীন, শেষ ভরসা রাশিয়ার দ্বারস্থ হল। ইউরোপে নির্ব্বাসনকালে ডাঃ সানের সঙ্গে অনেক রুশীয় বিপ্লবীর পরিচয় হয়েছিল, যাঁরা এখন রাশিয়ার কর্ণধার। চীনা ও রুশীয় বিপ্লবের মধ্যে অনেক সামঞ্জস্যও ছিল। উভয়েই সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ-নীতির এবং সুপ্রাচীন সামাজিক ধনবৈষম্য ও অকর্ম্মণ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল। লেনিনের সঙ্গে সানও একমত ছিলেন যে, বিপ্লবের তিনটি স্তর-বিভাগ। প্রথম, সামরিক স্তর,—সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রাচীন ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে হবে। দ্বিতীয়, শিক্ষানবিশী স্তর,—জনসাধারণকে রাষ্ট্র-শাসনে সুশিক্ষিত করতে হবে। তৃতীয়, গণতন্ত্র,—রাষ্ট্র-নায়কগণ জনসাধারণের হাতে শাসনভার সমর্পণ করবেন। চীন-বিপ্লবের অসুবিধা এই ছিল যে, কুওমিনটানের হাতে সামরিক শক্তি ছিল না,—১৯১১ সালেও ছিল না, ১৯২১ সালেও না।

অনেক আলোচনার পরে রাশিয়া চীনের সাহায্য করতে সম্মত হল। ১৯২৪ সালে সোভিয়েট এজেন্ট মাইকেল বোরোডিনের তত্ত্বাবধানে রুশীয় আদর্শে কুও-মিনটানের সামরিক সংগঠনের কাজ আরম্ভ হ'ল। হোয়াম-পোয়াতে একটি সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। তার ৪০ জন শিক্ষকের মধ্যে সবই রাশিয়ান। প্রিন্সিপ্যাল

সান ইয়াট সেন (যৌবনে)।
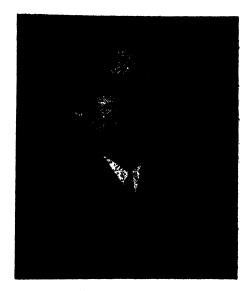
হলেন চিয়াং কাই-সেক। কুওমিনটান-বাহিনীর সাহায্যে দক্ষিণ-চীনে জাতীয় দলের শাসন বহু পরিমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

সমর-দেবতা

সমর-দেবতা সুপ্রতিষ্ঠিত হল দক্ষিন-চীনে,—কোয়ানটুং প্রদেশে, যার রাজধানী ক্যাণ্টন। সমর-দেবতাদের মধ্যে উত্তর-চীনে তখন কাড়াকাড়ি হানাহানি চলেছে। সংখ্যায় এঁরা প্রায় এক ডজন। কিন্তু দু'জনই বিশেষ প্রবল। জাপানের সাহায্যপুষ্ট মাঞ্চুরিয়ার শাসন-কর্ত্তা চ্যাং-সো-

লিন, এবং বৃটেনের সাহায্যপুষ্ট ইয়াংসি তটবর্ত্তী ভূভাগের অধীশ্বর উ পি-ফু।

চ্যাং সো-লিনের রাজধানী ছিল মুগডেন। ১৯০৪ সালে রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যে যুদ্ধ বাধে, তাতে তিনি সৈন্য দিয়ে জাপানকে সাহায্য করেছিলেন। পরে তিনি চীন সরকারের চাকরী নিলেও জাপানের কাছ থেকেও বরাবর মাসহারা পেতেন। মাঞ্চুরিয়ার এই শক্তিমান পুরুষকে হাতে রাখায় জাপানের স্বার্থ ছিল। মাঞ্চুরিয়ার কৃষকদের কাছ থেকে এবং মহাপ্রাচীরের ওপারে

খৃষ্টান জেনারেল, ফেং য়ু-শিয়াং।
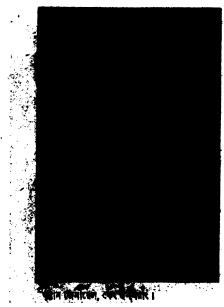
লুণ্ঠতরাজ করে এই অশিক্ষিত সমর-দেবতা অর্থ সংগ্রহ করল। এই ভাবে ১৯২০ সালে তিনি পিকিংএর অধীশ্বর হয়ে বসলেন।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী উ পি-ফু মস্ত বড় বিদ্বান ছিলেন। পিকিং থেকে হাংকাও পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের তিনি ছিলেন অধীশ্বর। তিনিও লুণ্ঠতরাজ করে অর্থসংগ্রহ করতেন। ১৯২২ সালে পিকিং নিয়ে চ্যাং আর উ'র মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ হল, তাতে চ্যাং হেরে মাঞ্চুরিয়ায় ফিরে গেল।

এই যুদ্ধজয়ের জন্য বেশী কৃতিত্ব উ'র সেনাপতি ফেং য়ু-শিয়াংএর। খৃষ্টান সেনাপতি ফেঙের সৈন্যদলে সৈনিক কঠোরতা ছিল অসামান্য। ইনি সৈনিকদের নিয়মিত মাইনে দিতেন এবং তাদের মধ্যে কোন প্রকার অনাচারের প্রশ্রয় দিতেন না। লুণ্ঠতরাজ একদম নিষেধ ছিল।

উ ফেঙের হাতে পিকিঙের শাসনভার দিলেন। ১৯২৪ পর্য্যন্ত ফেং বিশ্বস্ত রইলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে চ্যাং সো-লিন পুনরায় পিকিং আক্রমণ করলে ফেং চ্যাঙের পক্ষাবলম্বন করলেন। পরাজিত হয়ে উ পালিয়ে গেলেন। ফেং কিন্তু চ্যাঙেরও প্রভুত্ব মানলেন না। পিকিং-এর ছত্রপতি হয়ে বসলেন, এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর শাসন-ব্যবস্থা অনেকটা কুওমিনটানের মত। রাশিয়ার সঙ্গে মিতালীও পাতালেন। কিন্তু ১৯২৬ সালে চ্যাং এবং উ একযোগে তাঁকে আক্রমণ করলেন। ফেং পূর্ব্বাহ্নেই মস্কো পলায়ন করলেন।

জাতীয় অভিযান

১৯২৫ সালে মার্চ্চ মাসে ডাঃ সান ইয়াট-সেন পরলোক গমন করেন। এই সময় কিছু পরিমাণে অসন্তোষ যে কুওমিনটানে দেখা দেয়নি তা নয়। কিন্তু প্রথমত, প্রিয়তম নেতার মৃত্যুশোকে, দ্বিতীয়ত, সাংহাই-এর শ্রমিক-ধর্ম্মঘটে সে অসন্তোষ মাথা তুলতে পারলে না। এই ধর্ম্মঘটে বৃটিশ পুলিশের গুলিতে প্রায় দেড়শো চীনা শ্রমিক হতাহত হল। চীনাদের মধ্যে বৃটিশ-বিদ্বেষ ধূমায়িত হয়ে উঠল। এবং প্রায় ৩০ হাজার চীনা হং কং ত্যাগ করে ক্যাণ্টনে চলে এল।

১৯২৬ সালে চিয়াং কাই-সেকের নেতৃত্বে জাতীয় বাহিনী উত্তর চীনে অভিযান আরম্ভ করলে। উ'র সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে তারা অচিরেই হ্যাংকাও অধিকার করলে। কুওমিনটানের কর্ত্তৃপক্ষ রাজধানী ক্যাণ্টন থেকে হ্যাংকাওতে উঠিয়ে আনলেন। ওদিকে চিয়াং চললেন নানকিং ও সাংহাই-এর দেশীয় অঞ্চল অধিকার করবার জন্য। সাংহাইতে তখন ধর্ম্মঘট প্রবল আকার ধারণ করেছে। আট সপ্তাহের মধ্যেই শ্রমিকদের বেতন দেড়গুণ বেড়ে গেছে। জাপানী কারখানার মালিকেরা তাদের কাছে মাথা নীচু করেছেন, এবং বৃটিশ সিগারেট কোম্পানী কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। শক্তিমত্ত চীনারা নগরে

নগরে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে কুচকাওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। প্রবাসী বিদেশী অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছে। যে কোন মুহূর্ত্তে চীনারা এসে তাদের আক্রমণ করতে পারে। বৃটিশের গান-বোট অবশ্য তৈরী। কিন্তু তাঁরা যুদ্ধ না করে সন্ধি করলেন এবং হাংকাও ও কিউ-কিয়াঙের সমস্ত সুবিধা (concession) জাতীয় সরকারের অনুকূলে ত্যাগ করলেন। ইয়াংসি নদীর কর্তৃত্বভারও জাতীয় সরকারের হাতে এল। ইতিমধ্যে মস্কো থেকে কেং ফিরে এসে কুওমিনটানে যোগ দিলেন।

গৃহ-বিরোধ

এই পর্য্যন্ত বেশ চলল। তার পরেই কুওমিনটানে ভাঙ্গন ধরল, যে-ভাঙ্গন এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল।

বিরোধ বাধল বণিকের সঙ্গে শ্রমিকের। বণিকরা চাইলে বাণিজ্যের প্রসার, শ্রমিকরা চাইলে ধনসাম্য। হ্যাংকাও গভর্ণমেণ্ট তখন বোরোডিন, ইউজেন চেন ও মাদাম সান্ ইয়াট-সেনের হাতে। এঁরা সকলেই বিদেশীর সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার অপেক্ষা ধন-সাম্যেরই পক্ষপাতী। কিন্তু চিয়াং-কাইসেক বণিক ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দলে। তাঁর হাতে বিপুল সৈন্যদল। তিনি ১৯২৭ সালে নানকিঙে এসে গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করে হ্যাংকাও শাখাকে উড়িয়ে দিলেন।

এই ব্যাপারে চিয়াংএর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু হ্যাংকাও দলে একতার একান্ত অভাব ছিল। এই তথ্য চিয়াং-এর অবিদিত ছিল না।

১৯২১ সালে মস্কোতে তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত একটি চীনা কমিউনিষ্ট দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এঁরা কুওমিনটানেরই সদস্য। কিন্তু এরা স্বীকার করতেন যে, কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সময় আসে নি। এখন শুধু জাতীয় আন্দোলনের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক শক্তির উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। বোরোডিন জানতেন, চীনের বিপ্লব বুর্জ্জোয়া আন্দোলনের ফল। তিনি বলতেন, "The only Communism possible in China is the Communism of poverty, a lot of people eating rice with chop-sticks out of an almost empty bowl."

কিন্তু ১৯২৭ সালে ষ্টালিন মিঃ রায় নামে একজন ভারতবাসীকে পাঠালেন হ্যাংকাওতে, বোরোডিনের সঙ্গে পরামর্শ না করেই। রায়ের উপর কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বভার রইল। আর আদেশ রইল কুওমিনটান দখল করে অবিলম্বে গণবিপ্লব চালাবার। বোরোডিন, ইউজেন চেন এবং মাদাম সান ইয়াট-সেন প্রতিবাদ জানিয়েও কিছু করতে পারলেন না। চীনা কমিউনিষ্ট দল রায়ের আদেশই মেনে নিতে লাগলেন। চিয়াং এই অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে হ্যাংকাও দখল করলেন। বোরোডিন, জেনারল বুচার এবং অন্যান্য রাশিয়ানরা পলায়ন করলেন ইউজেন চেন এবং মাদাম সানও মোটরে করে

মাদাম সান ইয়াট সেন।

মঙ্গোলিয়ার ভিতর দিয়ে মস্কো পলায়ন করতে বাধ্য হলেন।

জাতীয় সরকার

১৯২৭ সালের শেষাশেষি চিয়াং জয়লাভ করলেন এবং নিজেকে ডাঃ সান ইয়াট-সেনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করলেন। এবং সেই উত্তরাধিকারিত্ব প্রমাণ করবার জন্য ডাঃ সানের শ্যালিকার পাণিগ্রহণ করলেন, তাঁর শ্যালক মিঃ টি. ভি. সুংকে অর্থ-সচিব নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ত পুত্র সান ফোকে আপন পার্শ্বচর করে নিলেন। এই বিবাহের জন্য তাঁকে তাঁর তৃতীয়া স্ত্রীকে

বর্জ্জন করে ধর্ম্ম গ্রহণ করতে হল। ১৯২৭ সালের জুন মাসে তিনি পিকিং অধিকার করে তার নূতন নামকরণ করলেন পেইপিং (উত্তরের শান্তি)। নানকিন হল নূতন রাজধানী, এবং তিনি হলেন চীনের প্রেসিডেণ্ট। বাইরে থেকে মনে হল, এইবার চীনে গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু একতা তখনও অনেক দূরে। মাঞ্চুরিয়ায় চ্যাং সো-লিন এবং তাঁর পুত্র চ্যাং সিউ-লিয়াং তখনও কার্য্যতঃ স্বাধীন। উত্তর-পশ্চিমে ৩০ লক্ষ ডলার ঘুষ দিয়ে কেং ইউ-সিয়াংকে কোনক্রমে শান্ত করা হয়েছে! আর দক্ষিণ ও মধ্য-চীনে কমিউনিষ্টের তাণ্ডব চলেছে।

মাদাম চিয়াং কাই-সেক।

চিয়াঙের শক্তি বণিক ও ভূম্যধিকারীদের সহানুভূতি ও সমর্থনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের খুসী করার জন্য তিনি অনেকগুলি ট্রেড-ইউনিয়ন ভেঙে দিলেন, এবং জমি বাজেয়াপ্ত করাও বন্ধ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, **"At present we do not fear the oppression of peasants and workers by the landlords and capitalists, but rather reverse"**, এই নীতি যে বিদেশী শক্তিপুঞ্জের সমর্থন পাবে, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরা অবিলম্বে নানকিন সরকারকে স্বীকার করে নিলেন, এবং চিয়াঙের সঙ্গে নানা প্রকার সন্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ হতেও দ্বিধা করলেন না।

নূতন সন্ধিতে বেলজিয়াম, বৃটেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ স্বীকার করলেন যে, চীনে তাঁরা যে সব স্থান অধিকার করে আছেন, সেগুলো ধীরে ধীরে ছেড়ে দেবেন। বিনিময়ে চীন তাঁদের চীনে জায়গা কেনবার অধিকার দেবে, এই অধিকার ইতিপূর্ব্বে তাঁদের ছিল না।

ধনিকদের সঙ্গে চিয়াঙের আপোষের ফলে অনেকগুলি চীনা শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে, সাংহাইতে অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হল। এদের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার দেখে বিদেশীরাও তাদের বাণিজ্য-নীতির বদল করলে। আগে তারা চীনে কাপড় এবং অন্যান্য পাকা মাল পাঠাত। এখন থেকে তারা প্রচুর পরিমাণে যন্ত্র-পাতি রপ্তানী করতে আরম্ভ করলে। বস্তুতঃ পক্ষে ১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে বৃটিশের যন্ত্রপাতি রপ্তানী প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেল।

চিয়াং অতঃপর বিদেশী শক্তিপুঞ্জের কাছ থেকে, বিশেষ করে জাপান আর আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করতে লাগলেন। এই সময় জাপানকে খুসী করবার জন্য তিনি এমন একটা কাজ করে বসলেন, যার ফলে তাঁকে অনুতাপ করতে হল। রাশিয়ার কাছ থেকে চাইনীজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে কেড়ে নেবার জন্য তিনি চ্যাং সিউ-লিয়ানকে উৎসাহিত করলেন। যুদ্ধে চ্যাঙের শোচনীয় পরাজয় হল। চিয়াংকেও যথেষ্ট অপদস্থ হতে হল।

চিয়াঙের সঙ্গে কারবার করা কঠিন। কিন্তু অত্যন্ত দাম্ভিক, রুক্ষভাষী এবং কর্তৃত্ব-প্রয়াসী চিয়াঙের কাছ থেকে কি ভাবে কাজ আদায় করতে হয়, ধনিক সম্প্রদায় এবং বিদেশীয় বণিক সম্প্রদায় তা শিখে নিয়েছিল। কিন্তু কৃষক ও মজুরদের দুঃখের সীমা রইল না। ট্যাক্স অত্যন্ত বেড়ে গেল, বেতন কমে গেল এবং সৈন্যদের উৎপাতও গেল অসম্ভব রকম বেড়ে। সুতরাং নানকিন সরকারের প্রতিপত্তিতে এবং নানকিন সহরের সমৃদ্ধিতে তাদের কোন উপকার হল না।

সোভিয়েট চীন

কুওমিনটানের চরমপন্থীরা ইতিমধ্যে চিয়াং কাইসেক ও নানকিন সরকারের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। ১৯৩১ সালের মে মাসে তাঁরা ক্যান্টনে একটা নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী গভর্ণমেণ্ট গঠন করলেন। এতে যোগ দিলেন ডাঃ সান ইয়াট-সেনের পুত্র সান ফো এবং ইউজেন চেং। আর যোগ দিলেন বিক্ষুব্ধ সমর-দেবতা। এর নাম হল দক্ষিণ-পশ্চিম পলিটিক্যাল কাউন্সিল। কিন্তু নানা দল-বিরোধের জন্য এই গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই নানকিন গভর্ণমেণ্টের মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারল না। চিয়াং কাই-সেক এদের উচ্ছেদের জন্য নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত করলেন। কমিউনিষ্টরা তথাপি মরেও মরল না। প্রতি বৎসর তরুণ চীনারা দলে দলে মস্কো গিয়ে শিক্ষা লাভ করতে লাগল। এবং চীনে ফিরে এসে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা করতে লাগল। এই সোভিয়েট বা কমিটির দ্বারা শাসন-পদ্ধতি পার্লামেণ্ট প্রথার চেয়েও অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। কৃষকদের দুর্ভিক্ষ ও বন্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সোভিয়েট যথেষ্ট চেষ্টাও করতে লাগল। সুতরাং মধ্য-চীনের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যে সোভিয়েট শাসন প্রবর্ত্তিত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত মস্কো থেকে প্রায় দশ কোটী চীনা ছাত্র সোভিয়েট পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করে এসেছিল।

তথাপি ছ' বৎসরের বেশী সোভিয়েট শাসন টিকে থাকল না। কিন্তু এই অল্পকালে রাজ্যশাসনের যে দক্ষতা তাঁরা দেখিয়েছিলেন, তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। এঁদের নিজেদের মুদ্রা বিল, ব্যাঙ্কনোট পদ্ধতি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, স্কুল, হাসপাতাল, এমন কি নিজেদের সৈন্যদল পর্য্যন্ত ছিল। ইয়াংসি নদীর উভয় তীরে দেড়শত মাইল-ব্যাপী এই রাজ্য কিন্তু স্থায়ী হল না।

সোভিয়েট শাসন রইল না বটে, কিন্তু কমিউনিষ্ট দল কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও বা প্রকাশ্য ভাবে রইল। এদের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-সেককে যে কতবার যুদ্ধ যাত্রা করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একদিকে ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট এবং অন্যদিকে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট, এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-সেককে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। এবং হয়ত আরও দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকতে হত। কিন্তু জাপান চীন আক্রমণ করলে। চীনের স্বাধীনতা বিপন্ন হল। ক্যাণ্টন গভর্ণমেণ্ট এবং কমিউনিষ্ট দল আর গৃহবিরোধে নিমগ্ন থাকা সঙ্গত বোধ করলে না। বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় চীনের ছোট বড় সকল দল আত্মকলহ বিস্মৃত হয়ে চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে সম্মিলিত হল। চীন-জাপান যুদ্ধের সকল ক্ষতির মধ্যেও এই লাভ উপেক্ষণীয় নয়।

বিজন পল্লী

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

আঁখি মেলি' হেরি প্রতিটী প্রভাত
রাতি সে ঘোর বা শুক্ল,
পল্লীর গায়ে রূপ ঝ'রে পড়ে
মন এর প্রতি ঝুঁকল।

স্মরি সম্পদ সমীরে সলিলে,
'ঠি কেহ কাঙাল বলিলে,
কল্পনা করি সুখময় দিন,—
দুখের রজনী চুকল।

নগরীরে দেখি' কল কোলাহল
বিজন আমার পল্লী,
উদার সুষমা তবু দেখি তা'র
বেড়ি তরুলতাবল্লী।

কাঞ্চন ধান, রজত তটিনী;
শুনি পায়ে বাজে মণি-কিঙ্কিণী,—
মনে বলি যেতে শ্মশানের দিকে
কী বিলাস দেশে ঢুকল!

জীবন-চিত্র

পূজার বাজার

—শ্রীবিজনবালা দেবী

বিশ্বকর্ম্মা বেড়াইতে যাইবেন।

সুরুচিকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখি একটা জামা—'

সুরুচি একটা ধোয়া পাঞ্জাবী আনিয়া দিলেন।

'ওটা নয়, ওটার ঝুল দেখছ? যেন সেমিজ। ওটা কাটতে পাঠাতে হবে।'

সুরুচি আর একটা আনিলেন।

'এটা? ওটা তো ছোট, বোতাম পরানো যায় না, কত দিন ধরে পরা ছেড়ে দিয়েছি—'

সুরুচি তৃতীয়টা আনিলেন।

'এইটে আনলে শেষে? কি রকম হাতা আঁট্ দেখতে পাচ্ছ না? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই।'

চতুর্থটা আসিল।

'এই আলখাল্লাটা? ছি ছি, বিশ্রী তৈরি করেছে। দুটো জামার কাপড় একটাতে দিয়েছে। এ সব-গুলোই দোকানে পাঠাতে হবে কাটতে।'

সুরুচি নিরুত্তরে বাহিরে গিয়া বসিলেন।

ইতিমধ্যে নীহার আসিয়া উপস্থিত। নীহারের কথা পরে বলিব। এক কথায় সে বিশ্বকর্ম্মার বাহন। সে গরদ-মটকা-সংক্লথ-আদ্দির এক গাদা জামার স্তূপ আনিয়া দিল।

তখন বিশ্বকর্ম্মা বাছিয়া একটা পরিধান করিলেন এবং বেড়াইতে গেলেন।

সুরুচি উঠিয়া আসিয়া দেখিলেন, কতকগুলি জামা খোলা, কতকগুলির ভাঁজ ভাঙ্গা, দু'একটা গায় দিয়া আবার খোলা হইয়াছে। নীহার সে সব গুছাইয়া ভাঁজ করিয়া বাক্স-বন্দী করিল।

পোষাক-পরিচ্ছদে বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত বিলাসী। নূতন কোট, শার্ট, পাঞ্জাবী, ফতুয়া সর্ব্বদা দোকান হইতে তৈরি হইয়া আসিতেছে, কিন্তু দু'চার দিন পরেই—কতকগুলি খুঁত প্রতি জামাতেই বাহির হয়, যথা—

কলার বড়—

কলার ছোট—

হাতা আঁট—

হাতা ঢিলে—

ঝুল বড় বেশী—

ঝুল খাটো—

ছাঁট বিশ্রী—

এ সব কিছু আবিষ্কার করিতে না পারিলে, সোজা সুজি—'দেখতে যাচ্ছে তাই।'

সব চেয়ে ভাল দর্জ্জীই সমস্ত পোষাক তৈরি করিয়া দেয়। আর আফিসের পোষাক ও অন্যান্য সুট সব কলিকাতার সাহেব-বাড়ীর।

এবার পূজায় জামা-কাপড় কিনিতে বিশ্বকর্ম্মা কলিকাতা যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। সুরুচি বারণ করিয়াছেন।

বেড়াইয়া আসিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'দেখ, তুমি তো রাগ করলে জামা দিতে গিয়ে। আবার, কলকাতা যেতেও বারণ করছ। জামার অর্ডার দিয়ে না এলে চলে দেখছ? একটাও ভাল জামা নেই।'

'ও কোন দিন থাকবে না। আর বছর কলকাতা থেকে এত গুলো জামা পছন্দ করে তৈরি করে আনলে, দুটো একটা ছাড়া আর সব অপছন্দ হল, একে তাকে দিয়ে দিলে। আসল কথা বাঙ্গালী দোকানের ছাঁট তোমার পছন্দ হয় না—সে যত বড় দোকানই হোক। তার চেয়ে এখানেই তৈরি কর। যতবার ইচ্ছে কাটাবে। কলকাতায় দিলে তা হবে না। একবারেই যাবে।'

বিশ্বকর্ম্মা সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, 'ওদের কাপড় জামা—'

'সব এখানেই হবে।'

বিশ্বকর্ম্মা তথাপি নিরস্ত হইলেন না। বলিলেন, 'তোমার সাড়ী ব্লাউজ আনব!'

'দরকার নেই।'

'কি পরবে তবে পূজার দিন?'

'অনেক সাড়ী আছে—তাই পরব।'

'নূতন পরতে হয় যে?'

'তবে এমনি একখানা এখান থেকেই কিনো।

'না—না, তোমার ভাল সাড়ী জামা নেই। দু'শো টাকার সাড়ী জামা আনব।'

'ইস্ বড্ড টাকা সস্তা হয়েছে, না? ঐ টাকার শ্রাদ্ধ করতে যাওয়া, বুঝতে পেরেছি, কিছু আনতে হবে না তোমার।'

'আমি আলবাৎ আনব।'

'আমি নিশ্চয়ই বাধা দেব।'

'বটে? স্বামীর ইচ্ছায় তুমি বাধা দিতে চাও? মহাপাপ হবে জান?'

'হোক।'

বিশ্বকর্ম্মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'তুমি বুঝছ না, পূজার সময় কোথাও—'

'আমি বেশ বুঝেছি কলকাতা কেন যেতে চাও। রাজ্যের জিনিষ কিনে অনর্থক কতকগুলো টাকা নষ্ট করে আসবে, আর যা আনবে তাও পছন্দ হবে না, একে তাকে দিয়ে দিতে হবে। তার চেয়ে পুরী কি ভুবনেশ্বর বেড়িয়ে এস, সময় সার্থক হবে।'

'তবে চল তাই যাই।'

'এবার আমার যাওয়া হয় না। সবাইকে ফেলে কি করে যাই? আর সব শুদ্ধ যাওয়াও অত্যন্ত খরচ। তুমি যাও, বেড়িয়ে এস।'

একা একা বিশ্বকর্ম্মা কোথাও যাইতে নারাজ। সুতরাং আবার পূর্ব্বের সুর ধরিলেন, 'কলকাতা না গেলে চলে না। জুতো নেই। একটা চেষ্টারফিল্ডের অর্ডার দিতে হবে, সামনে শীত আসছে। একটা বড় ট্রাঙ্কের কথা বলেছিলে; আরও সব খুঁটিনাটি অনেক জিনিষ কিনতে হবে। ঘড়িটা সারানো দরকার, চশমাটা বদলে আনতে হবে। দিদির তসর আর মেজ-বৌয়ের মটকা কত দিন থেকে কিনতে বলেছে। দেখ দেখি কত দরকার! আমি না গেলে হয় না। এক দিনেই ঘুরে আসব। ছুটী পেয়েছি,—যাই। কি বল?'

'জুতো তোমার উনিশ জোড়া; পুরোনো পাঁচ জোড়া বাদ দিলেও চৌদ্দ জোড়া রয়েছে। আর সব এখান থেকেই অর্ডার দিয়ে আনানো যায়। যাক্, এত যখন ইচ্ছে—যাও, ঘুরে এস।'

কোথাও যাইতে হইলে বিশ্বকর্ম্মার আহার-নিদ্রা বন্ধ। এ চিরন্তন অভ্যাস। ষষ্ঠীর দিন তিনি যাত্রা করিলেন।

সুরুচি বলিলেন, 'এমন দিনে বাড়ী ছেড়ে যেতে আছে? আগে যেতে হয়—নইলে নয়।'

'আজ সন্ধ্যায় যাচ্ছি, কাল সন্ধ্যায় ফিরব, এক দিনের বিরহ সইতে পারবে না?'

'বোধ হয় না।'

আহার নাম মাত্র। সুরুচি বলিলেন, 'ট্রেনের এখন দু'ঘণ্টা দেরি—এখুনি এত তাড়া যে খেতে পারলে না?'

'আমার পেটের অবস্থাটা ভাল নয়। পথে ঘাটে একটু সাবধান থাকাই ভাল, বুঝলে না?'

বিশ্বকর্ম্মা রওনা হইলেন।

পর দিন সন্ধ্যার পর আসিয়া পৌছাইলেন বোঝা গেল—সমস্ত দিনটা কলিকাতার দোকানে ঘুরিয়াছেন।

'দেখ, কি সব এনেছি, নীহার!'

'দেখব পরে, আগে খেয়ে দেয়ে নাও।'

'না না আমি খেয়েছি। তুমি দেখ আগে। নীহার বাক্সটা খোল, ঐ নূতন ট্রাঙ্কটা।' বিশ্বকর্ম্মা নিজেই সব খুলিয়া দেখাইতে লাগিলেন।

কাপড়চোপড় সকলেরই বেশ ভাল আসিয়াছে। সুরুচির জন্য একখানা লালপাড় মটকার সাড়ী, একখানা মিহি দেশী ভাল সাড়ী, একটি খুব দামী বেনারসী ব্লাউজ ও একখানি তেমনি দামী সাড়ী। তবে ব্লাউজ গোলাপী রংয়ের—সাড়ীর রং গাঢ় হল্‌দে।

সুরুচি বলিলেন, 'এই কি আমি পরব?'

'কেন? সুন্দর রং—সুন্দর সাড়ী। পর দেখি—কেমন হয়?'

সুরুচি বলিলেন, 'আগে খাওয়া-দাওয়া হোক, পরে দেখা যাবে।'

পর দিন দু'জন প্রতিবেশীকে সুরুচি সাড়ী ও ব্লাউজ বিক্রী করিয়া দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'তুমি পরবে না?'

'আচ্ছা, ঐ রং কি এ বয়সে আমি পরতে পারি? ঐ ছেলেমানুষী রং?'

'তোমার চেয়ে ঢের বড় মেয়েরা এই রকম সাড়ী পরে বেড়ায় দেখে এলাম।'

'তা পরুক, আমি পারি নে।'

'আচ্ছা, আবার যাচ্ছি শীগগিরই, এবার তোমার পছন্দ-মত রং আনব।'

'আর না। তোমার কিছু আন নি?'

'সময় পেলাম কই? সাড়ী পছন্দ করতেই দিন গেল।'

'না হয় একদিন থেকে আসতে? নিজের একটি জিনিসও আনলে না?'

'চলে এলাম, একদিন থেকে এলে বেশ হত।'

'বারণ করলাম যেতে, শুনলে না, কতকগুলো টাকা নষ্ট করে এলে।'

পর দিন দর্জ্জী ডাকিয়া নূতন জামার অর্ডার ও পুরানোগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দিবার জন্য দেওয়া হইল। সুরুচি বলিলেন, 'থাক্ ওগুলো আর দিয়ে কাজ নেই, ছেলেরা পরবে। ছাঁটতে ছাঁটতে জন্ম উদ্ধার হয়ে এল। দর্জ্জীর আর ধোবার দেনা কোন কালে শোধ হবে না। দোকান থেকে আসছে আর ধোবাবাড়ী যাচ্ছে! কি পছন্দই পেয়েছ? দুনিয়ার লোকের পছন্দ হয়, তোমার হয় না! কেবল বদল হচ্ছে, কেবল বদল হচ্ছে! বাড়ীর মানুষগুলো যে কেন এত কাল বদলাও নি, তাই ভাবি। নেহাৎ দায়ে পড়ে, বোধ হয়।'

যে প্রতিবেশীর কাছে সাড়ীখানি বিক্রী করা হইয়াছিল, তাঁহার স্ত্রী একটু ভাল মানুষ গোছের। কাপড়খানা কার, কোথা হইতে আনা হইল, এ সব বৃত্তান্ত জানা দরকার মনে করেন না। স্বামী আনিয়া দিয়াছেন এই যথেষ্ট। দিন কয়েক পর তিনি একদিন বেড়াইতে আসিয়াছেন। সুরুচি বলিলেন, 'আপনি খুব হল্দে রং ভাল বাসেন, না? কাপড়ের পাড় সব হল্দে, আর পূজোর কাপড়ও দেখছি হল্দে।'

'এ দিদি উনি ভাল বাসেন। যা এনে দেন পরি। এই দেখুন না, কে একজন বাবু তাঁর বৌয়ের জন্যে এই সাড়ীটি কলকাতা থেকে এনেছিলেন, তা তাঁর বৌ পছন্দ করলেন না, তাই উনি কিনে নিয়েছেন আমার জন্যে।'

সুরুচি চমকিত হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেই লাল জরির পাড় চওড়া আঁচলা হল্দে সাড়ীটিই বটে। অত্যন্ত হাসি পাইল। হাসি চাপিয়া বলিলেন, 'আপনার পছন্দ হয়েছে?'

'নাঃ।'—এবার আর হাসি রাখা গেল না। বলিলেন, 'তা কি করবেন পরুন। কিন্তু এবার থেকে আর নিজের পছন্দ ছাড়া সাড়ী নেবেন না। পুরুষমানুষ কি সাড়ী পছন্দ করতে পারেন? ওঁদের কোট প্যাণ্ট কি আমরা পছন্দ করে দিই? তবে কেন উঁদের পছন্দ মত জিনিষ আমরা পরতে যাব?'

মফঃস্বল-যাত্রা

বিশ্বকর্ম্মা মফঃস্বল যাইবেন।

'ওগো শুনছ?'

'যাই।'

'কি করছ তুমি?'

'গিরির জ্বর হয়েছে, বার্লী খেতে চায় না, তাই রুটি চিঁড়ে ভাজছি।'

'এঃ নবাবী! বার্লী খাবেন না! রেখে দাও ও সব।'

একটু পরে সুরুচি আসিয়া বলিলেন, 'কেন ডাকছ?'

'আমি মফঃস্বল যাব।'

'এই সেরেছে! কখন?'

'একটা দুটোর সময়।'

উদ্যোগ আরম্ভ হইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'প্রত্যেক বারই একটা না একটা ভুল হয়। আর অসুবিধার এক-শেষ হয় আমার।'

'সবাই মিলে গোছালে হয়?'

'সবাই মিলে গণ্ডগোল হয় শুধু, কাজ কিছু হয় না। এবার সব দেওয়া হয় যেন।'

বেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার তাগাদা এবং ব্যস্ততা বাড়িতে লাগিল। এমন প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা হুজুগ আছেই; তার উপর মফঃস্বল যাইবার দিন, কি জরুরী কাজে আফিসে যাইবার দিন সবার হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। কমল যতক্ষণ পারিল চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু এ ত' আর আটটার গাড়ীতে যাত্রা নয় যে, তিনি চলিয়া গেলে তবে উঠিবে। আবার কখন বেলা পর্য্যন্ত শুইয়া থাকার জন্য তর্জ্জন করিবেন কে জানে? অগত্যা ধীরে ও নিঃশব্দে উঠিল এবং ঘড়ীটি লইয়া ষ্টেশনে চলিয়া গেল।

নীহার পরিয়া যাইবার পোষাক ঠিক করিয়া সুট্‌কেশ গুছাইতেছে। সুরুচি পথের টিফিন তৈরিতে নিযুক্ত। গিরি জুতা ব্রাসে লাগিয়া গিয়াছে। ঠাকুর রান্না শেষ করিয়া মফঃস্বলের চাল-ডাল বাঁধিতে ব্যস্ত। আরদালীরা লণ্ঠন, ওয়াটারপ্রুফ, ছাতা ও ঘটির কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাহাদের বিপদই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মফঃস্বলে বাড়ীর কাহাকেও না পাইয়া সমস্ত ঝাল নীহার ও তাহাদের উপরই বর্ষিত হয়।

প্রত্যুষে ক্ষৌর-কর্ম্ম ও স্নানান্তে বিশ্বকর্ম্মা বাড়ীতেই আছেন—সব বিষয়ের তত্ত্ব লইতেছেন। ঘরে, বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এক ডোজ ঔষধ খাইলেন (হোমিওপ্যাথি)। বাহিরে কে ডাকিল তা শুনিয়া আসা হইল। চেয়ারে বসিয়া মুখে আর একবার স্নো মাখিলেন। ডাকের চিঠি আসিল, পড়িতে পড়িতে সিগারেট ধরাইলেন। কে কি করিতেছে বা দিতেছে তাও দু'এক নজর দেখা হইতেছে। কাঁচি দিয়া গোঁফের অগ্রভাগ একটু ছাঁটিয়া ফেলিলেন। সর্দ্দির ভাব হইয়াছে (শেষ-রাত্রির ঠাণ্ডায়), এক টিপ নস্ত লইয়া বারান্দার চেয়ারে গিয়া বসিয়া খানিক হাঁচিয়া আসিলেন। পিতলের ছোট্ট চিমটাটা দিয়া কানের উপরের দু'একটি পাকা চুল তুলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, 'চিমটাটা বাক্সে দিয়ে দে'। গোঁফের মাঝে একটি পাকা চুল নজরে পড়িল, সেটি তুলিতে গিয়া দু'টি শক্ত কাঁচা গোঁফ উঠিয়া আসিল, —'উঃ-উঃ' বলিয়া চিমটাটা সুখেনের লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিলেন। সুরুচি পান সাজিয়া টেবিলে রাখিতে আসিতে-ছিলেন,—তাঁহাকে বলিলেন, 'একটু চুণ এইখানে দাও তো—নইলে ফুলে উঠবে।' তার পর আয়নায় মুখ দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া খাবার টেবিলে বসিয়া বলিলেন, 'খেতে দাও।'

খাইতে বসিয়াও একটু স্বস্তি নাই। 'ওরে কাপড় চোপড় বেশী করে দিবি, দু'একদিন বেশী থাকতে হলেই সব ময়লা হয়ে যায়। তেলের শিশি দিয়েছিস? সাবান দিস্‌নি না কি? সে আমি জানি, প্রতিবারই একটা না একটা ভুল করবি—'

সুরুচি বলিলেন, 'সব দেবে।'

'ওরা ঐ রকমই দেয়। চাল বেশী করে দিতে বল। যা বাঁচে ফিরে আসবে। ঐ যে দোবে মিশির, ওরা এক-বারে একসের চালের ভাত খায়। সেবার চাল কম পড়ে-ছিল বাজারে না কি কিনেছিল।'

সুরুচি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—'এত জিনিস দেয়, তবু কম পড়ে?'

'প্রায়ই তো পড়ে। ঠাকুর, আমার কিছু চাইনে। তুমি বীরেনকে খেতে দাও আগে।'

সুরুচি বলিলেন, 'মোটরে যাবে?'

'হাঁ—ট্রেনে গেলে মাইল দুই আবার হাঁটতে হয়।'

'তবে তাড়াতাড়ি করছ কেন? এ তোমার ইচ্ছা মত যাওয়া'

'না—তাড়াতাড়ি কি!'

এক একজনকে এক একটা আদেশ বা উপদেশ দিতে-ছেন, পলে পলে অনুযোগ ও তিরস্কার! খাবার দিকে মন নাই। এক ডাল দিয়াই খাওয়া শেষ করিয়া ফেলিলেন।

'এ কি, এ সব খাবে না? এই ডিমটুকু খেয়ে ফেল। ডাল দেখতে যা বিশ্রী হয়েছে, তাই খেয়ে ফেললে? খেতে বসে ভুলে যাও? ঠাকুর তোমায় আমি ঢের দিন বলেছি, এমন আধ-সিদ্ধ ডাল দিয়ো না বাবুকে।'

'আর দিয়ো না, আর কিছু দিয়ো না আমায়। নীহার, কটা বেজেছে দেখ্—'

সুরুচি রাগিয়া বলিলেন, 'কেন খাবে না? এত যত্ন করে রেঁধেছি, সব পড়ে থাকবে?'

'তুমি রেঁধেছ না কি? আগে বলনি কেন? দাও দাও, সব টিফিন-ক্যারিয়ারে দিয়ে দাও। পথে খাব।'

'পথের জন্যে যা দিয়েছি, তাই ঢের।'

'দিয়েছ? বেশী করেই দিয়ো। সঙ্গে লোক জুটে যায় কি না। গিরি কেমন আছে?'

'একটু ভাল আছে।'

'খেয়েছে কি?'

'চিড়ে-ভাজা।'

'কেন, হর্লিকস্ ফুড্ দিলে হত না?'

'চিড়ে ভাজছিলাম বলে বললে নবাবী, হর্লিকস্ দিলে বলতে বাদসাহী—'

'আর শোন, বাড়ীতে টাকা পাঠাতে ভুলো না যেন। দাদা লিখেছেন, বড্ড দরকার।'

'আজই পাঠাব।'

'আর একটা চিঠি লিখে দিয়ো যে—'

'চিঠি তুমি এসে লিখো।'

'আর ঐ শেয়ারের টাকাটাও আজই পাঠিয়ে দেবে। ক'দিন ধরে চিঠি এসেছে; শেষে কি সব টাকাটাই যাবে?—ব্রজবন্ধুর কাছে একটা চিঠি লিখে দাও যে, পূজোর আগেই আমার টাকা শোধ করে দিতে হবে। আর বিনয়কে লিখো যে, আমি মফঃস্বল গেলাম—ফিরে এসে তার চিঠির জবাব দেব।'

'কেন গো—তুমি কি ছ'মাসের জন্য যাচ্ছ? যাকে যা লিখতে হয় এসে লিখো। টাকা আমি পাঠিয়ে দেবো।'

মুখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, 'পান বেশী করে দাও—অনেকটা পথ যেতে হবে। নীহার! বিছানার সব দিবি। গায় দেবার একটা কিছু দিতে ভুলে যাসনে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে। পাতলা চাদরে হয় না। সেবার ভারি কষ্ট হয়েছিল।—'

কাপড় জামায় একটা সুটকেশ বোঝাই। চাল ডাল মশলা, ঘি-তেল, চায়ের সরঞ্জাম, গ্লাস, ডিস-পেয়ালা, হাঁড়ি কড়াতে একটা টিনের বাক্স পরিপূর্ণ। বেডিংটা মোটা। এ' ছাড়া টিফিন-ক্যারিয়ার, ফলের ঝুড়ি, জলের পাত্র, আলো।

এটাচি-কেসটা দেখাইয়া বলিলেন, 'এটা খোল, দেখি কি দিয়েছিস।'

নীহার খুলিয়া দেখাইল, তার মধ্যে আছে—আয়না, চিরুণী, ব্রাস, স্নো, বাম, ক্রীম, পাউডার, টুথ ব্রাস ও পেষ্ট, —শেভিং সুট, কাঁচি, চিমটা, ছুরি—মশলার ছোট শিশি, সিগারেটের টিন, দেশলাই, নস্য, সাবান;—হোমিওপ্যাথির বাক্স ও এনোস ফ্রুট-সল্ট, অমৃতাঞ্জন, ওরিয়েন্টাল বাম, মার্কলাইজড্ ওয়াক্স ও টর্চ্চ লাইট।

সুরুচি বলিলেন, 'বাবা! একি মনোহারী দোকান?'

নীহার বলিল, 'ও লাগে মা লাগে। মফঃস্বলে কিছুর দরকার হলে পাওয়া যায় না।' একটা সূতার গুলি সূঁচ শুদ্ধ সে দিয়া দিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'হুঁ—উনি বাড়ীতে মজা করে থাকবেন, উনি কি বুঝবেন মফঃস্বলের অসুবিধেটা!'

সুরুচি বলিলেন, 'আচ্ছা নীহার, মফঃস্বলে এত বেশী করে সব নাও, তবু কম পড়ে কেন? দশদিনের জিনিষ দুদিনের জন্যে দিই, তবু কুলোয় না? কর কি?'

নীহার নিম্ন স্বরে বলিল, 'অনেক লোক আসে মা. বাবু বলেন, এঁরা খাবেন। তাঁদের জন্যেও রান্না হয় তো। ডাকবাংলায় সব সময়ই দু'একজন লোক থাকেই।'

সুরুচি বলিলেন, 'তাই বল। তা চেনা অচেনা সব?'

'না না, এখান থেকে এই সব আলাপী বাবুরাও মফঃস্বল যান তো? তা এক সঙ্গেই সব খাওয়া হয়। বাবু একা হলে সবই প্রায় ফিরে আসত'—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'যাক, আর কি বাকী রইল?'

সুরুচি বলিলেন, 'আর কিছু নেই। তুমি বিশ্রাম কর একটু!'

'ঠিক—ঠিক। কি পরে যাব—'সেটা ঠিক হয়নি।'

নীহার বলিল—'শর্ট-শার্ট রেখেছি—'

'আচ্ছা, ঐ পরে যাব, না ধুতি? কোন্‌টা ভাল হয় বল?'

সুরুচি বলিলেন, 'গরমে ধুতিই ভাল।'

'দে, তবে এগুলো বাক্সে দিয়ে দে,—ধুতি-চাদর বার করে রাখ। টিকিট-কার্ড-লেফাফা-প্যাড?— চিঠিপত্র লিখতে হলে?'

'সব দিয়েছি।'

অতঃপর বিশ্বকর্ম্মা শয়ন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির হইল, বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া পড়িলেন। কাপড় জামা পরিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'না গো, এ ভাল হল না! সুন্দর পাঞ্জাবীটা ধুতিখানা ধূলোয় একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, বুঝলে? দাও ঐ গুলোই দাও।'

শর্ট-শার্ট আবার বাহির হইল। ধুতিখানা বাক্সে ঢুকিল।

হঠাৎ বিশ্বকর্ম্মার চোখে পড়িল—বাগানের বেড়ায় গামছাখানা রহিয়াছে। বলিলেন, 'দেখলে? গামছা দেয়নি। এই রকম প্রত্যেক বার একটা না একটা ভুল করবেই—আর আমার অসুবিধের একশেষ হয়। আমি না দেখতাম যদি—'

সুরুচি বলিলেন, 'গামছা একখানা মফঃস্বলের বাক্সেই থাকে, আয়না চিরুণী সবই ত' প্রস্তুত করে রেখেছি।'

'সে গামছাটা বড্ড মোটা,—এইটে দিয়ে দাও।'

'তা বলনি কেন? আর একখানা পাতলা আনতাম।'

নীহার বলিল, 'গামছা শুকোতে দিয়েছি, নিয়ে যাব।'

জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠিল। মণিব্যাগে টাকা দিয়া সুরুচি বলিলেন, 'কত দিন হবে?'

'পরশু সকাল বেলা আসব।'

'মোটে দেড়টা দিনের জন্য এই আয়োজন? গাড়ী যে বোঝাই হয়ে গেল!'

'পথে ঘাটে সব রকমই সঙ্গে থাকা ভাল। না হলে বড় কষ্ট হয়।'

ওয়াটার-পক্স, ছাতা-ছড়ি গাড়ীতে দিয়া নীহার ও আরদালী ড্রাইভারের কাছে বসিল। বিশ্বকর্ম্মা টুপি হাতে করিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তবে এখন আসি, কেমন? সাবধানে থেক, বুঝলে?'

'তুমিই সাবধানে থেক,—কিছু হারিয়ে বা ফেলে এস না, সেইটি দেখো।'

ইতি বিশ্বকর্ম্মার মফঃস্বল-যাত্রা পর্ব্ব শেষ।

পূজারিণী

—শ্রীঅনিলময় বন্দ্যোপাধ্যায়

তারে আমি দেখিয়াছি গাঢ় অন্ধকারে
অস্পষ্ট ছায়ার মত—স্তব্ধ, শান্ত, সঘন তন্দ্রায়—
ধীর পায়ে, অদৃশ্য সজ্জায়, আসিতে গোপনে মোর দ্বারে
হিমাপ্লুত কণ্ঠে তার সঙ্গীত মুখর ছিল অশ্রুত ভাষায়,
নয়নে অধরে লেগে রহস্যের শ্বেত কম্প্র গতি!
তমিস্রার বক্ষ ভেদি' তনু তার প্রচ্ছন্ন লীলায়
চেয়েছিল দিতে বুঝি অন্তরের অমূল্য প্রণতি
সঞ্চয়ের শেষ অর্ঘ্য শুচিশুভ্র অনন্ত শ্রদ্ধায়।

দ্বিধা-ম্লান অপূর্ণ হিয়ার ব্যথাতুর অপ্রকাশ বাণী
আসিয়া ফিরিয়াছিল ক্ষণে ক্ষণে হিমোষ্ঠ সীমায়,
স্পন্দমান সে বাসনা কুণ্ঠা টুটি হয়ে অভিমানী
ফুটেছিল ইঙ্গিতের অন্তহীন মূর্ত্ত আকাঙ্ক্ষায়!

উচ্ছ্বসিতা এ যে পূজারিণী নয়-নয় এ তো মৃত্যু নয়
বিনম্র প্রেমের স্পর্শে দেবতায় চায় পরাজয়!

মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃসংস্কার

—শ্রীহরিদাস মিত্র

ভূমিকা

বৈদিক যুগে বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছ এবং অনার্য্যের বাসভূমি ছিল। ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গার মর্ত্ত্যে আনয়ন নানাভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হয়ত আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে সভ্যতা বিস্তারের কাহিনী উহার সহিত জড়িত। বস্তুতঃ, প্রাচীন পীঠস্থান ও তীর্থসকল যে কতকাল হইতে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইতিহাস, পুরাণ এবং তন্ত্র-শাস্ত্রোক্ত বহুসংখ্যক পীঠ ও তীর্থ উপবঙ্গে অধিষ্ঠিত আছে। পালি (বৌদ্ধ) এবং প্রাকৃত (জৈন) শাস্ত্র সকলের মত অনুসারে—বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় এবং তীর্থঙ্করদিগের অনেকের কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রচার হয়। ধন-ধান্য, শৌর্য্য-বীর্য্য, শিল্প-সাহিত্য-সম্পদে, জ্ঞান এবং সাধনার গৌরবে, স্মরণাতীত কাল হইতে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মধ্যবঙ্গ ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিল। গঙ্গা, যমুনা, ভৈরবাদির অসংখ্য শাখা-প্রশাখা দ্বারা বিভক্ত, সীমাবদ্ধ এবং পরিকল্পিত উপবঙ্গ, একটী প্রকাণ্ড বকদ্বীপ (বকচঞ্চুবৎ দ্বীপ)। উহাও অসংখ্য ক্ষুদ্রতর দ্বীপের সমষ্টি মাত্র। বিশেষজ্ঞগণের মতে, মধ্য-বঙ্গই গ্রীকবিবরণসমূহে উক্ত গঙ্গারিডি (গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গা-রাঢ়ী শব্দের বিকৃতি) এবং প্রাচীন লিপি এবং চৈনিক পরিব্রাজকগণের বর্ণিত সমতটের অংশবিশেষ। উত্তর কালে উহাই বগড়ী (ব্যাঘ্রতটী ?) নামে পরিচিত হয়।

জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, এমন কি মুসলমানী ও খ্রীষ্টীয় বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন উপবঙ্গে বর্ত্তমান। বিশেষজ্ঞগণ সে সকলের কতক কতক আলোচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান লেখকও অতিসংক্ষেপে, মধ্যবঙ্গের কিছু ঐতিহাসিক বিবৃতি, পরিশিষ্টরূপে, এই সন্দর্ভ বা প্রবন্ধসহ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশেষতঃ যে অঞ্চলের বিষয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা, উহা মধ্যবঙ্গের এক প্রধান মর্ম্মস্থান,—যশোহরস্থ বহু অংশ এবং খুলনা, নদীয়া, ফরিদপুরের কিয়দংশ লইয়া গঠিত। উপবঙ্গের ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতে এই অংশের দান অসামান্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু নানা নৈসর্গিক কারণে এবং অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় এই সকল পল্লী-অঞ্চল এক্ষণে বিধ্বস্তপ্রায়।

মধ্যবঙ্গস্থ পল্লী-অঞ্চলের করুণ কাহিনী, দেশীয় এবং বৈদেশিক—সহৃদয়, মনীষী এবং বিশেষজ্ঞবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাষ্পাকুল ভাষায়, অনবদ্য গদ্যে এবং পদ্যে শাসক এবং দেশবাসিগণের নিকট, সেই দুঃখের কথা বহুবার আসিয়া পৌঁছিয়াছে –

> "কি দেখিছ চাহি চাহি ?—
> আর যে সে দিন নাহি—
> ধন-জন-ফল-পুষ্প ভরা নিরন্তর —
> গৌড়ের সুযশঃ হরি,
> জননী যশোরেশ্বরী
> সাজাইয়া দিয়াছিলা মম কলেবর !
> খুলনা আমারি সঙ্গে,
> মিশি ছিল এক অঙ্গে,
> আজ যদি গেছে দূরে—তবু নহে পর,
> কতই গৌরবে বিধি
> ভরি দিলা মম হৃদি,
> সেই 'রত্ন প্রসবিণী,' আমি যশোহর।"

(কবিকুললক্ষ্মী শ্রীমতী মানকুমারী বসু কর্ত্তৃক রচিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের নবম অধিবেশনে পঠিত 'আবাহন' পদ্য হইতে। স্থান—যশোহর, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।)

> "প্রাচীন যশোহরের স্বাস্থ্য, ধন, দান, জ্ঞান, শৌর্য্য, বীর্য্য, ভক্তি, প্রেম যুগপৎ মানসপটে সমুদিত হইয়া হর্ষে ও বিষাদে যশোহরবাসীকে অদ্য এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে বিহ্বল করিতেছে।
>
> ভৈরব আর ভীতি প্রদান করে না। মধুমতী আর মধু বর্ষণ করে না। যে চিত্রা গগনস্থ চিত্রাতারার ন্যায় শোভা পাইত, সে এখন হীনপ্রভা। যে নবগঙ্গা

স্বীয় স্বচ্ছ সলিল হেতু পতিতপাবনী ভাগীরথীর সমাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে এখন শুষ্কপ্রায়া। হরপ্রিয়ার ন্যায় দীনবন্ধুর বাল্যসখী হরিপ্রিয়া যমুনাও এখন শৈবালপূর্ণা। মধু ও শিশিরের বাল্যসহচরী কপোতাক্ষা এখন কাকাক্ষীতে পরিণত হইয়াছে। যশোহরের ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া যে মধু 'গুড়' নামে অভিহিত হইত, এবং যে 'গুড়' সমগ্র গৌড় প্রদেশের নামকরণ করিয়াছিল, ও যাহা শর্করায় পরিণত হইয়া সুগার্ নাম ধারণ করিয়া অন্যদেশবাসিগণের মধুর-রসাস্বাদনের সহায় হইত, সে গুড় দেশ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্য তাহার পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্বগৌরব, হৃদয়ে জাগরিত হইতেছে।

ভারতবর্ষ এক সময় মধুময় ছিল—মধু বাতা ঋতায়তে। [ইত্যাদি সব্যাখ্যা]

কর্ম্মবশে ভারতবর্ষ এইক্ষণে মধুহীন, বঙ্গও মধুহীন, যশোহরও মধুহীন। মধুমতী আর মধুমতী নাই, মধুস্দন কবি ও গায়ক উভয়েই গিয়াছেন, তাঁহাদের আসন শূন্য।"

[নবম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বেদান্তবাচস্পতি রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম-এ বি-এল মহাশয়ের অভিভাষণ। স্থান যশোহর। বঙ্গাব্দ ১৩২৩]

আলোচ্য অঞ্চলের বিশিষ্ট জাতি (এবং ক্ষয়িষ্ণু) বর্ণ-সকলের পরিচয়

বাসভূমির প্রাকৃতিক সংস্থান এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত, জাতি-সন্নিবেশের বিভিন্নতার কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হয় নাই। অন্যদিকে, কতদূর কি প্রকার মানুষের প্রকৃতিগত এবং স্বভাবসিদ্ধ বৈষম্যের উপর ভিত্তি করিয়া, বিভিন্ন বর্ণসকলের সৃষ্টি এবং স্ব স্ব (গুণ ও কর্ম্মানুসারে) উপযোগ্য বৃত্তিসমূহের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহারও এ পর্য্যন্ত যথোচিত সমাধান বা নির্ণয় হয় নাই।

এক্ষণে উপবঙ্গের অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রাকৃতিক সংস্থানাদির বিষয় বিচার করিলে নাবারোহণে দক্ষ, নৌ-মৎস্য-জীবী, মৃগয়া-পটু, শূকর, নকুল, উদ্বিড়াল, কচ্ছপ, গাধা, সর্পাদির পালক এবং গ্রাহক বা বন্ধ-বন্ধন-কারী জাতি সকলকেই, উপবঙ্গের প্রাচীনতম অধিবাসী ধরিতে হইবে। বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও, আচার-ব্যবহার, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদিতে নিকৃষ্টতম জাতি সকল উহাদের মধ্যেই দেখা যায়। উহাদের মধ্যে অনেকগুলি জাতি আজিও বন্য বা যাযাবর-প্রকৃতি সম্পন্ন। ঐ সকল নিকৃষ্টতম জাতিই উপবঙ্গে সংখ্যা-গরিষ্ঠ। আবার, উপবঙ্গ বা বৃহত্তর বঙ্গের সভ্যতা-গঠনে তাহাদের দানও নিতান্ত সামান্য নহে।

কিন্তু ঐ সকল বর্ণের সামাজিক বা সাংসারিক অবস্থা প্রায়শঃ হীন। ইহাদের স্বতন্ত্র ধোপা, নাপিত, পূজক, পুরোহিত নাই। উচ্চতর বর্ণের অনেক অধিকার হইতে উহারা বঞ্চিত। পরিচ্ছন্নতা, প্রসাধন-কর্ম্ম, বেশ-বিন্যাস, উহাদের দৈনন্দিন জীবনের হয়ত আবশ্যক অঙ্গ নহে। ঠাকুর-দেবতা এবং পরলোকের বিষয়ে ধারণাও সুস্পষ্ট নহে, বরং মন্ত্র ও ভূত-প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাসই প্রবল। তথাপি উহারা সরল, অকপট প্রকৃতি বিশিষ্ট।

কৃষিজীবী, কারুশিল্পী এবং পণ্যজীবী বর্ণসকলের সৃষ্টি বা উদ্ভব, নিশ্চয় উত্তরোত্তর কালে হইয়াছে। জন-সমাজের নব নব প্রয়োজনে, নূতন নূতন শিল্প, ব্যবসায়, পণ্যের পরিকল্পনা, উন্নতি ও আবিষ্কার হয়। গীতবাদ্যাদি কলা এবং চারুশিল্প সকল উন্নতিশীল সভ্যসমাজের সৃষ্টি।

কৃষি, ব্যবসায়, শিল্প, সেবা ও মনোরঞ্জন যাহাদের উপজীবিকা, তাহারাও ঐরূপ সমাজের সৃষ্টি। বৃত্তি, আচার, ব্যবহার, প্রকৃতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতিতে ঐ সকল বর্ণ মধ্যমস্থান অধিকার করে। উহাদের কোন কোনটীর জল অনাচরণীয় এবং অন্ন গ্রহণীয় নহে। পূজক, পুরোহিত, ধোপা, নাপিত অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহারাও হয়ত সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে উচ্চতর বর্ণসকলের অনাচরণীয়। বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন বিবিধ উচ্চতর বর্ণসকলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সামাজিক রীতি, নীতি, ধর্ম্মবিশ্বাস এমন কি বিদ্যা-বুদ্ধিতে, হয়ত তাহারাই শ্রেষ্ঠ।

আলোচ্য অঞ্চলের—মগু, মৎস্ত, মাংস, চর্ম্ম-বিক্রেতা অধিকাংশ বর্ণ-ই প্রধানতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, অসি (আয়ুধ) ও মসীজীবী এবং যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনকারী জাতি-বর্ণ-সকল প্রধানতঃ শাক্ত বা বৈষ্ণব, কদাচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে শৈব। নৃত্য, গীত, বাদ্য, কারুশিল্পজীবীদের অনেকেই ম্লেচ্ছাচারী বা ম্লেচ্ছ-সংস্পৃষ্ট।

এক্ষণে এতদঞ্চলের বর্ণ ও জাতি-বিভাগ এবং গুণ-কর্ম্মানুসারে জীবিকা বা বৃত্তিসকলের ব্যবস্থা আলোচনা করা যাউক।

(সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের ব্যাখ্যা)

V চিহ্নিত জাতিগুলি ক্ষয়িষ্ণু।

ঘ চিহ্নিত জাতিগুলি স্থিতিশীল। হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

০ চিহ্নিত জাতিগুলি দ্রুতবর্দ্ধনশীল।

ɑ চিহ্নিত নিম্ন-জাতিগুলির পৃথক্ ব্রাহ্মণ, পরামাণিক আছে।

অ চিহ্নিত নিম্ন জাতিগুলির পৃথক্ ব্রাহ্মণ নাই।

এ চিহ্নিত জাতিগুলির শিল্প বা বৃত্তি অধুনালুপ্ত।

Ɔ চিহ্নিত জাতিগুলি মুসলমান ধর্ম্মী।

H চিহ্নিত জাতিগুলি মুসলমান সংশ্লিষ্ট।

I চিহ্নিত জাতি পূর্ব্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন।

X চিহ্নিত জাতি শাক্ত।

T চিহ্নিত জাতি শৈব।

W চিহ্নিত জাতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

জাতিসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি ও বিশেষ পরিচয়

উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর প্রদেশ হইতে আগত জাতিসমূহ :

(ইহারা প্রধানতঃ নীলকরদের কর্তৃক আনীত)

		যশোহরে	খুলনায়
ওঁরা (ওড়াওন)	শ্রমিক	৯৮৫	৩৭১
ভূমিজ	শ্রমিক	১২৮৮	
সাঁওতাল (বুনা)	শ্রমিক	১০৪৫	১৭০৫

বিহার, উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশ হইতে আগত :

	যশোহরে	খুলনায়
চামার (চর্ম্মকার)	২৬৬৯	৫৪০২
দোসাদ (চর্ম্মকার সম্পর্কিত)	৫৪	৯৬
মেথর (ময়লা-পরিষ্কারক)	৮২	১৭৮
পাশী (তাড়ি-প্রস্তুতকারী)	১৩৩	৪২
মাল্লা (নৌ-জীবী)	২৯	১১৪

মধ্যে মধ্যে আগন্তুক যাযাবর জাতিসকল :

X II মালবৈদ্য সাপুড়ে। ভাষা বাংলা। ধর্ম্মে মিশ্র হিন্দু-মুসলমান।

X শিয়ালখেগো। ভাষা হিন্দুস্থানী। ধর্ম্মে হিন্দু।

Ɔ ইরাণী। ভাষা রোমাণি। ধর্ম্মে মুসলমান।

Ɔ কলু। বৃত্তি তৈল-প্রস্তুত ও বিক্রয়। সংখ্যা যশোহরে ২,৮২৬ খুলনায় ২,৭৩৮।

এ V কাচারু[১]। একমাত্র ভূষণায় কয়েকঘর।

এ কাগজি[২]—কাগজের কেন্দ্র ছিল ভূষণা; ধোপাদি (নওয়াপাড়া ষ্টেশনে) গ্রামের সাদা কাগজের খ্যাতি ছিল।

অ V কাওরা (প্রাচীন কর্ত্তার। বৃত্তি—শিবিকা বহন, কচ্ছপ ধরা, শূকর-পালন ও বিক্রয়, কচিৎ ঘোড়ার সহিস। ব্রাহ্মণ নাই। জল অনাচরণীয়, উৎপীড়িত জাতি। সংখ্যা, যশোহরে ২০৬০; খুলনায় ১৫০৭।

I ɑ X W কপালী—পাট ও শণের তন্তু হইতে গুণ এবং চট ও থলে নির্ম্মাণ ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। এক্ষণে আদা, হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি কৃষিকার্য্যে ইহারা বিলক্ষণ পটু। ভদ্র নদের ধারে, ভরতভায়নার (প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তি)

১। কাচারু জাতি—ইহাদের জল আচরণীয় ছিল না। ইহারা কাচ নির্ম্মাণ করিত এবং ইহাদের দত্ত,দাস ও দে উপাধি ছিল। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে জেসুইট প্রচারকগণ এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

২। "প্রাচীনকাল হইতে ভূষণা নানাবিধ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ...৪০ বৎসর পূর্ব্বেও যশোহরের উত্তরাংশে যাহা কিছু লেখাপড়া সব ভূষণাই কাগজে হইত।... সেখানে এখনও কামার ও কাচারু নামক (কাচের চুড়ী প্রস্তুতকারী অনাচারণীয়) এক জাতীয় কয়েক ঘর লোক বাস করিতেছে। তাহাদের প্রধান ব্যবসায় রাশি রাশি তামার মাদুলী প্রস্তুত করিয়া গৃহাগত ব্যাপারীর নিকট বিক্রয় করা। মুকুন্দরামের সময় ভূষণা সর্ব্বশ্রেণীর লোকের একটী প্রধান সমাজ হইয়াছিল।" এখনও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং কামার, কুমোর প্রভৃতি নবশাখগণের এক এক সম্প্রদায়কে ভূষণাই পটী বা থাক বলে। স্বর্ণবণিকদের মধ্যে কাঁসারীদের মধ্যে মামুদাবাদি শ্রেণী আছে। মামুদপুরের শ্রেণী শ্রেষ্ঠ।

নিকটস্থ ১৪।১৫ খানি গ্রামে প্রধান কেন্দ্র এবং ভৈরব নদের ধারে বাঘুটীয়াগ্রামের উত্তরে চারিখানি গ্রামে ইহাদের বাস আছে। নলদী পরগণায় এতদ্ব্যতীত অন্যবিধ কপালী সমাজ আছে। ইহারা কৃষিব্যবসায়ী ও ধর্ম্মমতে বৈষ্ণব। শাক্ত যে কতকাংশে না আছে, তাহা নহে; তবে সংখ্যায় অল্প। ইহারা কাহারও দাসত্ব করে না। অনাচরণীয় হইলেও ইহারা নবশাখ তুল্য সদাচারী। ইহাদের গুরু পুরোহিত সকলই স্বতন্ত্র সংখ্যা, যশোহরে ১৮৬৯৯; খুলনায় ১১৭২৪।

V ম কামার—বৃত্তি লৌহদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ। কালী, শীতলাদি শাক্ত দেবীপূজায় পশু-বলিদান ধর্ম্ম। প্রধান কেন্দ্র কালীগঞ্জ; যশোহর। কামারদিগের মামুদপুরিয়া শ্রেণী এবং ভূষণাপট্টি সম্প্রদায় ও নলদিপট্টি সমাজ আছে। সংখ্যা, যশোহরে ১২৯৭৫; খুলনায় ৭৯৮৪।

M L W কায়স্থ— এপর্য্যন্ত অনেক কায়স্থ, মুখ্যতঃ মসীজীবী হইলেও বৃত্তিতে অসিবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-রাঢ়ীয়; উত্তর-রাঢ়ীয়; বঙ্গজ; বারেন্দ্র। ।। যশোহর-খুলনার দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ, বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয়। পুরন্দর বসু খাঁ (মাহিনগর সমাজের ১৩ পর্য্যায়ের কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই (একযায়ী) করেন, তদবধি ১৩ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত ১৩টী পর্য্যায়ের একযাই হইয়াছে। যেস্থানে প্রকৃত রাজ মুখ্যকুলীনের বাস, উহাই সমাজ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। বাঘুটীয়া ও জঙ্গলবাঁধাল, বিভাগাদি (ভৈরবতীরে) এবং কুমিরা (কপোতাক্ষীতীরে) প্রধান সমাজ। তৎপরে পাঞ্জিয়া, বিদ্যানন্দ কাটি, মির্জ্জানগর, বোধখানা, রাড়ুলি কাটিপাড়া, মাগুরা, সাগরদাঁড়ি, হরিশঙ্করপুর, খাজুরা, কুড়িগ্রাম প্রভৃতি বিখ্যাত সমাজ। কায়স্থেরা অনেকে উপবীত লইয়াছেন। V উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের প্রধান কুলীনবংশ চাঁচড়ার রাজপরিবার ও রামনগরের জমিদারগণ। রাজা সীতারাম এই সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সংখ্যা, যশোহরে ৫০৩৫৮; খুলনায় ৪৭৩৪৪।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থকুলের সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন। ○ বঙ্গজ কায়স্থগণের একটী প্রধান সমাজ প্রাচীন যশোহরে স্থাপিত হয়—এখন তাহা খুলনা ও ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। আধুনিক যশোহরে বঙ্গজের বসতি ইতনা প্রভৃতি স্থানে (মধুমতী, কালীগঙ্গা তীরে) কয়েকঘর আছেন। কুলীনদিগের মধ্যে, (ইছামতীকূলে) টাকী শ্রীপুরে এবং বাগেরহাটের নিকটবর্ত্তী (ভৈরব-তীরে) হাবেলী পরগণায় বাস করিতেছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয়গণ এখনও স্থানিক রাজোপাধি ভূষিত হইয়া নূরনগর, কাটুনিয়া, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪ পরগণার মধ্যবর্ত্তী পুঁড়া-খোড়গাছিতে বাস করিতেছেন।

V বারেন্দ্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্তরাংশে শৈলকূপী অঞ্চলে (নবগঙ্গাতীরে) প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও সেখানে কয়েক শাখা বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবনা ও রাজসাহী অঞ্চলে উঠিয়া গিয়াছে।

V ।। ।। পীরালী কায়স্থ—যশোহর খুলনাস্থ চেঙ্গুটীয়া পরগণায় দেখা যায়। ইহাদের পরামাণিক ও ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র।

এতদ্ভিন্ন যশোহর, খুলনা প্রভৃতিতে বিশেষ বৃত্তিধারী কয়েক শ্রেণীর কায়স্থ দেখা যায়। ভাণ্ডাররক্ষা, গৃহকর্ম্মে পরিচর্য্যায় পটু।

ভাঁড়ারি (ভাণ্ডাগারী ভাণ্ডারী ?) কায়স্থ—পাঞ্জিয়া, রুদাঘরায়।

ঘরামি- গৃহনির্ম্মাণে পটু। সেনহাটীতে।

মাঝি—নৌ-চালনায় দক্ষ। রায়েরকাটিতে।

রাজমিস্ত্রী—ইষ্টক-গৃহ-নির্ম্মাণে পটু—ফরিদপুর°, খুলনা।

চেঙ্গুটীয়া পরগ মধ্যে দক্ষিডিহিস্থ পীরালি কায়স্থগণ অনেকে উৎকৃষ্ট রাজমিস্ত্রী। তজ্জন্য উহাদের কাহারও কাহারও রাজ উপাধি।

K কাঁসারি—বৃত্তি কাংস্য-তৈজসপাত্র নির্ম্মাণ, বিক্রয়। কাঁসারিদের মধ্যে মামুদাবাদি শ্রেণী আছে। এ দেশে বর্ত্তমান কেশবপুরের দুই মাইল উত্তরে মূলগ্রাম প্রধান

(৩) 'এক সময়ে ফতেয়াবাদের স্থপতিকুল বাঙ্গালার নানা স্থানে মঠ ও অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিত। জপসাবাসী কায়স্থজাতীয় রাজমিস্ত্রিগণ এ বিষয়ে বিশেষ পটু ছিল। ফতেয়াবাদের কারিকরদিগের নিকট এই রাজদের পূর্ব্বপুরুষ শান্তিরাম যে শিক্ষালাভ করে।'

কেন্দ্র। এক্ষণে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ কাঁসারি ইহার অধিবাসী। তাহারা সকলেই কাঁসা-পিত্তলাদি ধাতুদ্রব্যের ব্যবসায়ী।

V D কাহার বৃত্তি—শিবিকাবহন ও সেবাকর্ম্ম।

V H কা'নৃ, কিন্নর—বৃত্তি নৃত্য-গীত-ব্যবসায়। সম্ভবতঃ ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হইতে আসে। যাদবপুরের দক্ষিণে একমাত্র উলসীগ্রামে ১৪।১৫ ঘর আছে। তন্মধ্যে আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত হাটগাছা-কালনায় কয়েকঘর মাত্র কিন্নর আছে, উলসীর সঙ্গে তাহাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ হয়। সুকবি মধুসূদন এবং কিন্নর বা ঢপ সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক মধু কা'ন উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি ইঁহারা এক্ষণে আংশিকরূপে অহিন্দু-আচারী।

W কুরি (মোদক)—বৃত্তি মিষ্টান্ন-প্রস্তুত ও বিক্রয়।

O M কুমোর বৃত্তি—প্রতিমা ও মৃন্ময় পাত্র গঠন। সংখ্যা যশোহরে ১৪,৫৪১ ; খুলনায় ১৪,২৭০। যশোহরে কুমারদিগের ভূষণা শ্রেণী আছে। কালিয়া-বেন্দা, সেনহাটি এবং রাটাযোড়ের কুমারগণ প্রতিমাগঠনে ও চিত্রে বিশেষ পটু। আলাইপুরের জালা এবং জয়নগরের কোলা মৃৎ-শিল্পে প্রসিদ্ধ।

O D W কৈবর্ত্ত—চাষী, জেলে, মাহিষ্য। সংখ্যা যশোহরে ৩৭,৪১৮ ; খুলনায় ৩২,৭৩১ ; বৃত্তি চাষ এবং ভৃত্যকর্ম্ম। যশোহরের উত্তরে ও পশ্চিমে কয়েক স্থানে কৈবর্ত্তগণ রাজত্ব করিতেন।

জেলে, মেছো—সংখ্যা যশোহরে ২৬,০৬১ ; খুলনায় ৪,৫২৪। বৃত্তি মৎস্য ধরা ও বিক্রয়।

V কোরা—এই অতি বিশিষ্ট জাতি কেবলমাত্র যশোহর সহরের সন্নিকটে চাঁচড়া রাজধানীতে কয়েক ঘর আছে। সংখ্যা ১০৮ মাত্র। ইঁহাদের বৃত্তি ডাকের সাজ প্রস্তুত। তজ্জন্য এক সময়ে যশোহরের বিশেষ খ্যাতি ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোরা জাতি ক্ষয়িষ্ণু এবং শিল্পও মরণোন্মুখ। ইহারা আপনাদিগের উদ্ভব 'কোটাল' বংশ হইতে বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেকে দ্বারবানের কার্য্য করিত। কেহ কেহ চাপড়াশি।

V খণ্ডিকার—বৃত্তি হস্তিদন্ত, হরিণ ও মহিষশৃঙ্গজাত দ্রব্যনির্ম্মাণ। প্রতাপাদিত্যের প্রাচীন যশোরের নিকটবর্ত্তী গড়-মুকুন্দপুর ইহাদের কেন্দ্র[৪]।

M ক্ষত্রিয়—V পঁয়ার (পরমার) V চৌহান (চাহমান)। ইহাদের অধিক অংশই, চাঁচড়া ও নলডাঙ্গা রাজাদের দ্বারা আনীত এবং তাহাদেরই আশ্রিত। এখন কেহ কেহ ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীর অবস্থা লাভ করিয়াছেন।

চাঁচড়া, যশোহর এবং নলডাঙ্গা, নহাটা প্রভৃতিতে ইঁহাদের বাস।

I W গন্ধবণিক—'বৈশ্যদিগের মধ্যে গন্ধবণিকেরাই বাণিজ্য ব্যবসায়ে দেশ-বিদেশে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিলেন; পরে সে ধর্ম্মের বিলোপসাধন ও শৈবধর্ম্ম প্রচারিত হইলে ইঁহারা শিবভক্ত হইয়া পড়েন।' যশোহরের উত্তরাংশ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের নিকটবর্ত্তী সাঁকোর বণিকদিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে।

O গাড়াল (প্রাচীন গরুড়)—বৃত্তি চিঁড়া প্রস্তুত ও বিক্রয়। প্রধানতঃ, ঝিকরগাছা (ঝিঙ্গের গাছা) বাজারে বহু সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী গাড়াল বাস করে।

M গাড়ুলে—বৃত্তি কুম্ভীর, গোধা, শুশুক, উদ্বিড়াল প্রভৃতি মরিয়া চর্ম্ম ও বসাগ্রহণ। নৌ-মৃগয়াজীবী এই অতি বিশিষ্ট জাতি সুন্দরবনের উপকণ্ঠে, এবং খুলনা জেলার মধ্যে দেখা যায়। ছোট নৌকা হইতে ইহারা সূত্রবদ্ধ ভল্লদ্বারা শিকারের জন্তুকে আঘাত করিয়া আবদ্ধ করে এবং ক্রমশঃ শক্তিহীন হইলে কুম্ভীরাদি শিকারকে হত্যা করে। সংস্কৃতে গারুড়ি শব্দের অর্থ বিষবৈদ্য। প্রাচীন ভাষা কাব্যে (ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসকৃত মনসা-মঙ্গলে) শঙ্কর গারুড়ি নামক, সর্পবিদ্যায় চতুর ব্যক্তির কথা পাওয়া যায়। এই সকল কারণে, গারুড়ি জাতিকে প্রাচীন মনে হয়। এবং মালবৈদ্য, সাপুড়ে জাতির অন্যতম শাখা বলিয়া বিশ্বাস হয়।

O M I গোয়াল—সম্ভবতঃ গোপ হইতে। সদ্গোপ বৃত্তি—কৃষি ও ভৃত্য-কর্ম্ম। সম্ভবতঃ গোপ হইতে এক্ষণে স্বপেশ

৪। 'মুকুন্দপুরের খন্দিকারেরা এখন আর পর্যাপ্ত হাতীর দাঁত পায় না, তবুও হরিণ ও মহিষের শিং দিয়া নানাবিধ সুন্দর আসবাব দ্রব্য তৈয়ার করে।'

শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। দাগো' গোয়ালা—বৃত্তি গরুর চিকিৎসা; বৃষকে চক্রাদি তপ্ত চিহ্নের দ্বারা ভূষিত করা। ইহারা অব্যবহার্য্য। জেলা যশোহরে অনেক দাগো' গোয়ালা আছে। ম M সাধারণ গোয়ালাদের বৃত্তি—দুগ্ধ, দধি, মাখন, ঘৃত, ননী, সরের উৎপাদন, ও বিক্রয়। গো-পালন। গোয়ালাগণ বর্দ্ধিষ্ণু বলিষ্ঠ জাতি। প্রধান কেন্দ্র মহাকালি (চেঙ্গুটিয়া ষ্টেশন), দেয়াড়া (কুমীরার নিকট)। কালিয়া মাখমের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। (ফরিদপুর) মহারাজপুরের দধি অতি বিখ্যাত। যশোহর সহর হইতে বেজেরগচ্ছা পর্য্যন্ত,অঞ্চলজাত দুগ্ধ অতি সুস্বাদু। কালিয়া, রায়গ্রাম, যশোহরে দুগ্ধ অতি সুলভ। যশোহর ও সিঙ্গিয়ার দুগ্ধজাত খাবার প্রসিদ্ধ।

১। চাঁড়াল (চান্দাল, নমঃশূদ্র)—সংখ্যা, যশোহরে ১,৭৪,১০৭; খুলনায় ২,৬৪,৭৬৪। ব্রাহ্মণ, পরামাণিক, ধোপা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্দ্ধিষ্ণু, বলবান উদ্যমী জাতি। একাদশাহে শ্রাদ্ধ। বৌদ্ধযুগে চণ্ডালশ্রেণী সাধক ছিলেন। নমঃশূদ্ররা ও প্রাচীন চণ্ডালগণ পৃথক জাতি। শেষোক্ত জাতি শ্মশানালয়ে বাস এবং দণ্ডিত ব্যক্তিদের বন্ধন-বধ কার্য্য করিত। বর্ত্তমান নমঃশূদ্ররা কৃষিজীবী। হংস, শূকরপালনও ইহাদের অন্যতম বৃত্তি। সম্ভবতঃ ইহারা বরেন্দ্র ভূমি হইতে আগত।

৮ ছুতার (প্রাচীন সূত্রধর) ঘ ম—বৃত্তি--কাষ্ঠদ্রব্য নির্ম্মাণ এবং শ্রাদ্ধের যূপ খোদাই। দ্রুত ক্ষয়িষ্ণু জতি। ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। ভৈরবকূলে স্থানে স্থানে ছুতাররা হুঁকার নৈচা তৈয়ারী ব্যবসা করে।

১ জিয়ানি—এই জাতি মৎস্যজীবী, নমঃশূদ্রদেরই বিশেষ একটি থাক। আচার-ব্যবহারাদি তদ্রূপ। খুলনার অপর পারে বেলফুলিয়া পরগণায় সাতশত ঘর জিয়ানির বাস। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় জাল-যোগে ইহরা মৎস্য এবং বল্লমদ্বারা কচ্ছপ শীকার করে

১ জেলে; ঘ N রাজবংশী, পাড়ুই। কৈবর্ত্ত দ্রষ্টব্য। পৃথক্ ব্রাহ্মণ আছে। ত্রিশ দিনে মরণাশৌচান্ত। সংখ্যা, যশোহরে ৩,৭৮৮; খুলনায় ২৪,৩৫০। কোচদিগের মধ্যে রাজবংশী শ্রেণী আছে।

৮ ১ জোলা (কারিকর)—ধোপাখোলা, বেজের-ডাঙ্গা, ফুলতলা ষ্টেশনের নিকট বহু জোলার বাস। বৃত্তি গামছা, মশারি প্রভৃতি বয়ন। সংখ্যা, যশোহরে ৩১,৬১৩; খুলনায় ৩,৪৮৪।

৮ ১ ঝাড়ুদার—হাড়ি দ্রষ্টব্য। অতি ক্ষয়িষ্ণু জাতি, নির্ম্মূলপ্রায়। বৃত্তি আবর্জ্জনা পরিষ্কার। আস্তাকুঁড়, হাটবাজার এবং ধনী লোকদের বাটিতে ঝাড়ু দিবার জন্য এতদ্দেশে দুই এক ঘর করিয়া চাকরাভুক ঝাড়ুদারের বসতি করান আছে।

৮ ঘ। ডোম—ব্রাহ্মণ নাই। পূর্ব্বে বৌদ্ধযুগে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। বৃত্তি শূকর-পালন। প্রধান কেন্দ্র যশোহর সহরের উপকণ্ঠ। তালশাঁস বিক্রয় অন্যতম বৃত্তি। সংখ্যা যশোহরে ৬১৭; খুলনায় ১৫১।

ঘ N তাঁতী—বৃত্তি বস্ত্রবয়ন। সংখ্যা, যশোহরে ৬০৪০; খুলনায় ১,৩০৫। ঝিকরগাছা, যশোহর, ধোপাখোলা, বেজেরডাঙ্গা, ফুলতলা, দৌলৎপুরের আশে পাশে অনেক বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সিদ্ধিপাশা ও বাপা মহিনগর (জেলা যশোহরে), বাকসা (সাতক্ষীরা মহকুমা মধ্যে) প্রধান প্রস্তুত-কেন্দ্র। কেশবপুরের নিকটস্থ মধ্যকুল (সায়রের) হাটে প্রতি শুক্রবারে কাপড়ের হাট বসে। উহাতে প্রতি হাটে একদিনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার দেশী তাঁতের কাপড় বিক্রয় হয় এবং প্রধানতঃ ধোপাখোলা ষ্টেশন হইতে কলিকাতার পরপারে হাওড়ার হাটে, বা চেতলার হাটে বিক্রয় হয়।

৮ তাঁতীদের ক্ষীরতাঁতী নামক থাক আছে। বৃত্তি—আদা হলুদ প্রভৃতি কৃষি উৎপাদন। এ শ্রেণী যশোহরের দক্ষিণস্থ গ্রাম সকলে পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে নির্ম্মূল-প্রায়।

১ তাম্বুলি N (প্রাচীন তাম্বলী)—পূর্ব্বে পানের বিক্রয় ইহাদের বৃত্তি ব্যবসায় ছিল। এক্ষণে অনেকেই নানা ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা ও রাণাঘাটে প্রভূত ধনসম্পন্ন অনেক তাম্বলী পরিবার আছেন। তাম্বলী জাতিরই একটি শ্রেণী বারুই (প্রাচীন বারুজী, বারুজীবিগণ ১) দ্রষ্টব্য। ইহারা পান উৎপাদন এবং অন্যান্য কৃষিকর্ম্ম আনুষঙ্গিক রূপে করেন।

v তীয়র, তিয়র, (প্রাচীন তীবর)—সংখ্যা, যশোহরে ৪৬৬ ; খুলনায় ৩,৩২২। ইহারা মৎস্যজীবী ধীবর জাতীয়। খুলনা কলারোয়া থানার মধ্যে এক তীয়র রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুর্গ প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে।

০ তেলি—কুণ্ডু উপাধিক একশ্রেণী মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। তাহাদের স্ত্রীলোক চিড়া তৈয়ারি করে। নড়াইল চিড়ার জন্য বিখ্যাত।

চক্করে (চক্রী)—সংখ্যা, যশোহরে ৭,৫৩৮ ; খুলনায় ৫,৯১৭। তেলিগণ ঘানিগাছ চালান এবং তৈল প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করেন বলিয়া নিকৃষ্টতর শ্রেণী হিসাবে বিবেচিত। তিলিগণ তৈল বিক্রয় করেন (প্রস্তুত নহে) এবং অন্যান্য ব্যবসায় করেন।

v ɒ দাই (প্রাচীন ধাত্রী, ধর্ত্তার)—বৃত্তি নাড়ীচ্ছেদ ও প্রসূতিচর্য্যা। তৈল নিষ্কাসন। কোথাও কোথাও ভাণ্ড বাদন।

v ɑ ধোপা (প্রাচীন রজক)—বৃত্তি বস্ত্র ধৌতকরণ। সংখ্যা, যশোহরে ৩,৭১৮ ; খুলনায় ২,৪৯৩। বস্ত্র রঞ্জন করে বলিয়া এই ধোপাদিগকে রজক নাম দেওয়া হয়। কেহ কেহ উৎকৃষ্ট রংরেজের কার্য্য জানে। এক্ষণে নিজেদের সভা-সুন্দর আখ্যা দেয়।

০ চাষাধোপা, ɑ (প্রাচীন কৃষিরজক ɴ) বৃত্তি—কৃষিকার্য্য। কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উচ্চতর শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উন্নতিশীল ও বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে। চব্বিশ পরগণা ধানকুড়িয়ায় অনেক সঙ্গতিপন্ন চাষাধোপা আছেন। সম্ভবতঃ ময়লা কার্য্য করেন বলিয়া, দাই ও ধোপাগণের এমন কি (পরামাণিক) নাপিতদের বংশবৃদ্ধি নাই। বিশেষতঃ বাঙ্গালী ধোপা জাতি অতি ক্ষয়িষ্ণু।

ɑ নট্টনর (প্রাচীন নট)—বৃত্তি—বাদন, গীত। এ জাতির মধ্যে বরিশালে অনেক বিখ্যাত বায়েন আছেন। খুলনা, ফরিদপুরে এ জাতি আছে। যশোহরে নাই।

০ নমঃশূদ্র—ɑ ꟻ ɴ (চাঁড়াল দ্রষ্টব্য)।

০ ɒ নলো, নলে—বৃত্তি নলকর্ত্তন ও তদ্দ্বারা চাটাই, দরমা, মলুয়া প্রভৃতির নির্ম্মাণ। মাগুরা মহকুমার নান্দোয়ালি নলজাত দ্রব্যনির্ম্মাণের বড় কেন্দ্র।

v নাপিত, পরামাণিক, নরসুন্দর—ꟻ ɴ সংখ্যা যশোহরে ১৬,৮৯৭ ; খুলনায় ১৯,৬৬৫। বৃত্তি ক্ষৌরকর্ম্ম ও দেবপূজা নির্ব্বাহে সাহায্য। নাপিতদের মধ্যে মামুদাবাদি শ্রেণী আছে।

০ মধুনাপিত, ময়রা ɴ—বৃত্তি মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ। এই জাতি মাত্র ৩।৪ শত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে।

০ ɒ নিকারী—বৃত্তি মৎস্য বিক্রয় এবং এবং রৌদ্র, লবণাদি দ্বারা মৎস্যরক্ষা। ইহারা নিজেরা মাছ কদাচ ধরে না। কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। নোনা ইলিস মাছ প্রস্তুত ও বিক্রয়, এবং বরফ দিয়া গল্দা চিংড়ি প্রভৃতি মাছ চালান, ইহাদের একচেটিয়া ব্যবসায়। জাতিতে ইহারা মুসলমান। প্রায় সকলেই সঙ্গতিপন্ন। ভৈরব নদ প্রভৃতির কূলে অনেক নিকারীর বাস।

v পাটনি ɑ ɴ—পূজক ব্রাহ্মণ আছে। বৃত্তি নদী পার হইবার খেয়া দেওয়া। সংখ্যা যশোহরে ১,৬৮২ ; খুলনায় ১,০৬৩।

v ɪɪ পটুয়া—বৃত্তি প্রতিমা এবং গৃহাদিতে চিত্রকর্ম্ম। বৃত্তি উৎসন্ন হওয়ায়, এই জাতি দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ভৈরবকূলে দেয়াপাড়া, রামনগরে অনেক পটুয়া বংশ ধ্বংস পাইয়াছে। নাম এবং বৃত্তিতে হিন্দু হইলেও, এক্ষণে ইহারা মুসলমান সংশ্লিষ্ট।

০ পুঁজ ɑ—বৃত্তি, আদা হলুদ লঙ্কা প্রভৃতির উৎপাদন ও কৃষিকর্ম্ম। সংখ্যায় অল্প হইলেও, ইহারা সেনহাটি প্রভৃতিতে সমৃদ্ধিশীল জাতি। সম্ভবতঃ ইহারা পোদদিগের এক জাতীয়।

০ ɑ পোদ ɪ ɴ পদ্মরাজ ব্রাত্যক্ষত্রিয়—সংখ্যা যশোহরে ৮৫৩৪ ; খুলনায় ১,৮২,৫২৬। যশোহর খুলনায় নমঃশূদ্র ও পোদগণ মিলিয়া, সমগ্র হিন্দু জনসংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ। সম্ভবতঃ পোদ জাতি পুলিন্দ বা প্রাচীন পৌণ্ড্রক বা পুণ্ড্র জাতি হইতে উদ্ভূত। কৃষিজীবী (চাষী) ও ধীবর (মৎস্য ব্যবসায়ী) উভয়বিধ পোদই আছে। পোদরা সকলেই পরিশ্রমী এবং সমৃদ্ধিযুক্ত। খুলনার দক্ষিণাংশে বহু চাষী পোদের বাস। পোদগণ সুন্দরবনেরই প্রধান আবাদকারী জাতি।

n ফকির—বৃত্তি ভিক্ষা। এতন্মধ্যে কতকগুলি শ্রেণী কিছু উন্নত। প্রাচীন দরবেশ, আউলিয়া সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। ঘোড়া এবং বাজপক্ষীও কোন কোন সম্প্রদায় পালন করিয়া থাকে। বাগেরহাটের খানজাহান খালির দরগায় একটী ফকিরদের আস্তানা আছে।

v ন্ন I বাউরি—বৃত্ত পাল্কিবহন এবং জলজ উদ্ভিজ্জাদির উত্তোলন। ইহাদের পৃথক্ ব্রাহ্মণ নাই। সম্ভবতঃ বাতুল ও বাউল, এবং বাউরি ও বাঠুরীগণ একই জাতি, বর্ণ বা সাধক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং বৌদ্ধযুগে ইহারা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। সংখ্যা যশোহরে ৪৯০; খুলনায় ১৬২।

v ০ বাজাদার, নাগরাশী—বৃত্তি বিবাহে উৎসবে বাদ্য করণ এবং শামুক, জঙ্গ হইতে চূর্ণ প্রস্তুত করণ। তালপাখা শামুকের চূর্ণকে ইহারা 'বাহার' বলে।

v ন বাইতী—বৃত্তি বিবাহে উৎসবে বাদ্যকরণ এবং শামুক জঙ্গ হইতে চূর্ণ প্রস্তুত করণ।

ıк বৈষ্ণব—বৃত্তি ভিক্ষা এবং নাম প্রচার। জাতি বৈষ্ণব, সংযোগী বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মধ্যে আছে। যশোহর, খুলনা—যবন হরিদাস, শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণব আচার্য্যগণের জন্মভূমি হইবার গৌরব লাভ করিয়াছে। সংখ্যা যশোহরে ৪,৭৯৪; খুলনায় ৫,৬৬০।

০ বারুই, বারোই, বারুজী, বারজীবী—বৃত্তি পান প্রস্তুত ও বিক্রয় এবং আনুষঙ্গিক কৃষি-কর্ম্ম। বারুইগণ তাম্বুলি জাতির একটি নিকৃষ্ট শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। যশোহর-খুলনায় নবশাখের মধ্যে বারুজীবী বা বারুই জাতির সংখ্যা অধিক। ইহাঁরা অতি উন্নতিকামী জাতি। অর্থে ও বিদ্যায় ইহাঁরা হীন নহেন। সংখ্যা যশোহরে ১৩,৩৭৩; খুলনায় ১৫,০৩৫।

v ন ম বাগ্‌দি (প্রাচীন বাগতীত) বাগদী—বৃত্তি মৎস্যবিক্রয়, পাল্কীবহন ও স্থলবিশেষে শূকর রক্ষণ, কৃষি ও ভৃত্যকর্ম্ম। মনসা দেবী ইহাদের প্রধান দেবতা। সংখ্যা যশোহরে ২০৮৯৩; খুলনায় ৭,৭৫৩।

v ম বুনো—ইহারা প্রধানতঃ নীলকরদের কর্ত্তৃক ছোট-নাগপুর হইতে আনীত। এক্ষণে অনেকটা হিন্দু ভাবাপন্ন।

v ন ম বেহারা, রমনী কাহার—বৃত্তি পাল্কীবহন, পাইক (পদাতিক) বরকন্দাজের কার্য্য, সেবাকর্ম্ম। এই অতি সাহসী প্রভুভক্ত জাতিটী দ্রুত ক্ষয়শীল। ইহারা যেমন বলবান তেমনই নিরীহ ছিল। তিন চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে ইহারা শৈব ছিল, জেসুইট পাদ্রিগণের গ্রন্থে জানা যায়।

ıı ম ı ব্রাহ্মণ—বৃত্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, ইষ্টমন্ত্র দান। যশোহর-খুলনায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ সমধিক প্রবল, v বৈদিক ও বারেন্দ্রের সংখ্যা স্বল্প। তন্মধ্যে বারেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম v। খুলনার বুড়ন পরগণায়, যশোহরের মাগুরা মহকুমায় এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ-প্রধান বড় বড় সেনহাটি প্রভৃতি গ্রামে দুইচারি ঘর প্রধান বারেন্দ্র বংশ আছেন।

এ দেশে বৈদিকরা অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক। যশোহর-খুলনা রাঢ়ীয় কুলীনদিগের প্রধান স্থান। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) কুলীন, (২) শ্রোত্রিয়, (৩) ভঙ্গকুলীন, (৪) বংশজ।

শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে কুশারিগণ বহুকুলীনের আশ্রয়-দাতা। ইহাদেরই একাংশ পিরালি সংস্রবদোষে কলি-কাতার প্রসিদ্ধ 'ঠাকুর'বংশে পরিণত।

কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতীপুরুষ, যশোহর-খুলনার কুলীন ও শ্রোত্রিয় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা বলিবার নহে।

'সাতশতী' বংশীয় ও 'পরাশর'-গোত্রীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশ যশোহর-খুলনায় আছেন। যবন হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বুড়ন পরগণায় ভোটকলাগাছি গ্রামে পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত কানোজিয়া হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণ যশোহর-খুলনায় বাস করিতেছেন। সম্ভবতঃ মানসিংহের সময়ে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এ দেশে আসেন।

v রামাইৎ ব্রাহ্মণ, তঙ্গিদার ব্রাহ্মণ—বৃত্তি দেবাইয়া ভিক্ষা এবং শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ। ইহারা বিভিন্ন প্রদেশগত। হয়ত রাম মন্ত্রের উপাসক ছিলেন। এই শ্রেণী অতি ক্ষয়িষ্ণু।

v ভাট ব্রাহ্মণ—বৃত্তি শ্রাদ্ধ, বিবাহে উৎসবে শ্লোকা-বৃত্তি ও দানগ্রহণ।

v আচার্য্য ব্রাহ্মণ—বৃত্তি চিকিৎসা, জ্যোতিষগণনা, প্রতিমাগঠন ও নির্ম্মাণ, চিকিৎসা।

v অগ্রদানী ব্রাহ্মণ—বৃত্তি শ্রাদ্ধে প্রথম স্বর্ণাদি দান গ্রহণ।

v ıı পীরালী ব্রাহ্মণ-চেঙ্গুটীয়া পরগণায় বাস, মুসলমান সংস্রব দুষ্ট।

v ıı ভাটলাই ব্রাহ্মণ—লেখকের বাসভূমি। ভাটলা পরগণার আদি রায়োপাধিক ব্রাহ্মণ জমীদার ছিলেন। মিথ্যা কলঙ্কে পতিত হন। এক্ষণে উৎসন্নপ্রায়।

বুভুক্ষা-দানব ও কংগ্রেসের রেকর্ড-ভঙ্গ

যেখানে কোটি কোটি নর-নারীর জীবন-মরণের সমস্যা, সেখানে গ্রামোফোনের রেকর্ড-ভঙ্গ করা লইয়া কংগ্রেসের কলহের সৃষ্টি এই চিত্রের [illegible]

নারী-সমিতি

—শ্রীঅমলা দেবী

[৭]

মাস খানেক পরে সময়—বেলা তিনটা ; সুনীতির শয়নকক্ষে বিজলী একটা চেয়ারে উপবিষ্টা। তাহার সম্মুখে কিছু দূরে মেজেতে মাদুর পাতিয়া একরাশ ছেলেদের জামা লইয়া সুনীতি মেরামত-কার্য্যে নিযুক্তা।

বিজলী কহিল, "তোমাদের সব খবর ভাল ত সুনীতি!"

সুনীতি নিরুৎসুক কণ্ঠে কহিল, "এক রকম চলে যাচ্ছে দিদি। তোমরা বেশ ভাল ছিলে?"

—"আমরা?" বিজলী ক্ষীণ হাসিল। তারপর গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমি ভাল ছিলাম না—"

সুনীতি বিজলীর পানে তাকাইল; কহিল, "ভাল ছিলে না? কি হয়েছিল?"

গম্ভীর ভাবেই বিজলী জবাব দিল, "কেন তুমি জান না? কাশী যাবার পর দিনই অসুখে পড়ি; খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল, মা না কি ওঁকে যেতে লিখেছিলেন, উনি জবাব দেন নি—"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ঠাকুরপো তোমাকে কিছু বলে নি?"

সুনীতি কহিল, "না দিদি, বলেন নি ত!"

বিজলী অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

সুনীতি কহিল, "বিশ্বাস কচ্ছ না? সত্যি বলেন নি। তবে তোমার রাঁচী হতে চলে যাওয়ার খবর পেয়েছিলুম—",

—"কার কাছে পেলে?"

—"মিসেস্ গাঙ্গুলী বলছিল—"

—"মিসেস্ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কোথায় দেখা হল?"

—"দেখা করতে যেতে হয়নি, নিজেই এসেছিল। আর শুধু আমার বাড়ী নয়, সহরের সকলের বাড়ী; গাঁটের পয়সা খরচ করে পরের উপকার করতে মিসেস্ গাঙ্গুলীর জোড়া দেখি নি—"

—"কথাটা বুঝতে পারলুম না সুনীতি! মিসেস গাঙ্গুলী কি উপকার করেছে আমার?"

—"সারা সহর তোমার সুনাম ছড়িয়েছে; তার সৌরভে বড় ঠাকুরপো ক'দিন বাইরে বেরুতে পারেন নি—"

উৎকণ্ঠিত ভাবে বিজলী কহিল, "কুৎসা রটিয়েছে, না? কি বলেছে?"

—"বলেছে অনেক কথা, আমার কাছে নেই বা শুনলে; শোনাবার লোকের অভাব হবে না। কিন্তু কি ব্যাপার বল দেখি? এই সে দিন এত আপ্যায়িত করে নিয়ে গেল, তারপর এক মাসের মধ্যে এমন কি ঘটল যে, ভদ্র-সমাজে তোমার মুখ দেখাবার পর্য্যন্ত উপায় রাখছে না—"

—"কি জানি, সুনীতি! সত্যি বলছি, আমি তাঁর কোন অপকার করি নি, বরং উপকার করবারই চেষ্টা করেছি। সুবিমল বাবুর সঙ্গে ওর বড় মেয়ে রেবার বে' দিতে চেয়েছিল; আমিও সুবিমলকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু সে বললে যে, তার বিয়ে একটি মেয়ের সঙ্গে ঠিক হয়ে গেছে; বে যদি করে ত তাকেই করবে, নইলে জীবনে বিয়েই করবে না। তা' আমি কি করি ভাই! ও আমার কাছে চাকরী করে বলে জোর করে তার বে' দেবার আমার ক্ষমতা নেই—"

—"ওঃ এই ব্যাপার। ও তো ঠিক উল্টো বলছিল—"

—"কি বলছিল?"

—"বলছিল, সুবিমলবাবু না কি রাজী হয়েছিলেন, তুমিই না কি বেঁকে দাঁড়াও, শেষে রাতারাতি সুবিমলবাবুকে নিয়ে রাঁচী থেকে কানপুরে পালিয়ে যাও। সেখানে না কি ⋯ ⋯ আর্য্য-সমাজী মতে তোমাদের বে' হয়ে গেছে, ও এক বাবুর চিঠিতে জানতে পেরেছে—"

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বিজলী কহিল, "তাই না কি! এই কথাও বলেছে! কি সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ ভাই! কি মিথ্যাবাদী! ও খুব ভাল করে জানে, আমরা মায়ের

কাছে গেছি, মায়ের চিঠি পর্য্যন্ত ওকে আমি দেখিয়েছিলুম। ... ... কিছুক্ষণ নিঃশব্দে সুনীতির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, "এতক্ষণে আমি সব বুঝতে পেরেছি, কেন আমি এসেছি শুনেও সমিতির অন্য মেয়েরা কেও আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি, আমি তাদের বাড়ী গেলেও আমাকে এড়াবার চেষ্টা করেছে—"

কৃত্রিম উদ্বেগের সহিত সুনীতি কহিল, "তাই না কি! ভারী মুস্কিল ত? তা' হলে তোমার সমিতির কি হবে?"

—"সমিতি থাকবে, আমি থাকব না। যাদের আমার উপর বিশ্বাস নেই, তাদের সম্পর্ক আমার সহ্য হবে না—"

—"বড় ঠাকুর কিন্তু বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন নি দিদি!"

—"ওঁর ওকালতি আর ক'র না, সুনীতি! উনি সকলের আগে বিশ্বাস করছেন, না হলে এত বড় অসুখের খবর পেয়েও একবার দেখতে যেতে পারলেন না? ... ... কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হয়তো আমি অন্যায় করেছি; তবু আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওঁকেও অন্যায় করতে হবে! যদি মরে যেতাম, তা হলে কাউকে না দেখেই আমাকে চলে যেতে হত—"

বিজলীর গলা ধরিয়া আসিল, চোখে আসিল জল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল।

সুনীতি কহিল, "কি করে যাবেন, দিদি! ওঁর নিজের যে খুব অসুখ হয়েছিল, আমরা সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—"

বিজলী উদ্বেগের সহিত কহিল, "কি হয়েছিল!"

—"হঠাৎ একদিন রাত্রে অচৈতন্য হয়ে যান, দুদিন জ্ঞান হয় নি...ওঃ সে রাত্রির কথা ভুলিব না! মিস্ মুখার্জ্জীর ফোন পেয়ে আমরা গেলাম—"

বিজলী প্রশ্ন করিল, "মিস্ মুখার্জ্জী কে?"

—"ছেলেদের নূতন গভর্ণেস, তুমি তো ওকে চেন, তোমাদের সমিতিতে আগে চাক্‌রী করত,—তারপর শোন দিদি! গিয়ে দেখি, বড় ঠাকুরকে চাকর-বাকরেরা ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়েছে। কোন জ্ঞান নেই, ক্ষীণ নিশ্বাস ছাড়া জীবনের কোন লক্ষণ নেই, উনি ডাকলেন, কোন উত্তর নেই; যেন আমাদের কাছ হতে অনেক দূরে চলে গেছেন, আমাদের ডাক ওঁর কাণে পৌছুচ্ছে না। উনি কেঁদে ফেললেন, আমি বললাম,—তুমি ডাক্তার, তুমি এমন করলে চলবে কেন? উনি বললেন—আমার যে হাত পা আসছে না। আমি টেনে ওঁকে টেলিফোনের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তারদের উনি খবর দিলেন; সবাই এল, এমন কি যাদের ডাকা হয় নি, তারাও এল। সহরের বড়, ছোট সব্বাই খবর পাবামাত্র দলে দলে খবর নিতে আসতে লাগল।...ভগবান বড় ঠাকুরকে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন, দিদি! কিন্তু বুঝতে পেরেছি, বিপদ না এলে মানুষের ঠিক দাম বোঝা যায় না—"

বিজলী নীরস কণ্ঠে কহিল, "কার দাম তুমি বুঝতে পারলে?"

—"বুঝলাম, বড় ঠাকুরের, আমরা ভাবতাম, উনি আমাদেরই, কিন্তু সেদিন বুঝলাম, উনি সহরের সকলের—যদি তুমি সেদিন দেখতে দিদি! তুমিও বুঝতে পারতে, সহরের সবাই ডাক্তারবাবুকে কি রকম ভালবাসে—"

বিজলী চুপ করিয়া রহিল।

সুনীতি বলিতে লাগিল, "আর চিনলাম মিস্ মুখার্জ্জীকে, ও-রকম সেবাপরায়ণা মেয়ে—আজ পর্য্যন্ত দেখি নি—নূতন এসেছে, তবু যা' সেবা করলে নিজের মেয়ে থাকলেও ও রকম করতে পারত না—বোধ করি তুমিও পারতে না, দিদি!"

একটা আঘাত সামলাইয়া লইয়া বিজলী শুষ্কমুখে কহিল, "শুধু সেবা কেন, আমি কিছুই তো করতে পারিনে ভাই! আমার কথা বাদ দাও—"

সুনীতি কহিল, "সত্যি, দিদি! নিজের আত্মীয়ের চেয়ে বেশী সেবা করেছে; চাকুরী করছে বলে কর্ত্তব্য হিসেবে নয়, মনে হল, যেন সত্যিকার স্নেহ, দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে করেছে—আশ্চর্য্য মেয়ে!..... তা ছাড়া ছেলেদেরও খুব স্নেহ করে—নিজের হাতে তাদের খাওয়ায়, পরায়, নিজের কাছে নিয়ে শোয়, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখে। ছেলেরাও তেমনি ওকে পেয়ে বসেছে, এক মিনিট কাছ ছাড়া হতে চায় না—"

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে বিজলীর বুক হইতে বাহির হইয়া গেল। হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে কহিল, "ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে তোমরা এখন নিশ্চিন্ত হয়েছ—কি বল? তা হলে…এক কাজ কর না ভাই! লক্ষ্মী মেয়েটিকে ছেলেদের মা করে দাও না—"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমাদেরও ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছে, তবে এ সব কাজে তাড়াতাড়ি করা ভাল নয় দিদি! আরও দিন কয়েক দেখা যাক্, যদি দেখি বড় ঠাকুরের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা সত্যি ওর আছে, তা হলে শেকল পরাতে দেরী হবে না—"

—"যোগ্যতার আর কি বাকী আছে, ভাই! ছেলেদের স্নেহ করে, ওঁকে শ্রদ্ধা করে—"

বাধা দিয়া সুনীতি কহিল, "শুক্‌নো শ্রদ্ধায় তো স্বামীর মন ভরে না দিদি!"

মৃদু হাসিয়া বিজলী কহিল, "আর কি চাই? ভালবাসা? দেউলিয়া হবার পর নূতন করে কারবার করতে গিয়ে বেশী লাভের আশা না করাই ভাল সুনীতি! তা'ছাড়া ভালবাসা তুমি চিনবে কি করে? লক্ষণ মিলিয়ে ওর কি অস্তিত্ব ঠিক করা যায়?"

—"যায় বৈকি দিদি! বুকের দেউলে যখন ভালবাসার দীপ জ্বলে, তখন তার আলোতে দেহ ও মন এমনি ঝলমল করে ওঠে যে, মানুষের চোখ তা' এড়ায় না দিদি!"

বিজলী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দীপ হয়তো জ্বলে ভাই! কিন্তু তার আলো এত ক্ষীণ যে বাইরের লোকের চোখে দূরে থাক, নিজের চোখেই পড়ে না। নইলে দেখ নি—আজন্মের ভালবাসা এক মিনিটে মরীচিকার মত উবে যায়।" আবার বিজলী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, যেন সে নিজের অন্তরের মধ্যে তলাইয়া গেল, তারপর কি যেন খুঁজিয়া দেখিয়া আসিয়া কহিল, "আবার যাকে ভালবাসি না বলে মনে হয়, সেই একদিন শ্রাবণের মেঘের মত একমুহূর্ত্তে সমস্ত জীবনকে ছেয়ে ফেলে—"

এমন সময়ে বাহিরে জুতার শব্দ শোনা গেল।

বিজলী একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল, মুখে একটু অপ্রতিভ ভাব; কহিল, "তোমার উনি বোধ করি আসছেন ভাই!"

—"এলেই বা দিদি! তুমি তো কাছে অপরিচিতা নও?"

—"কি জানি কেন লজ্জা করছে—"

—"লজ্জা কিসের দিদি! আমি যে তোমার ছোট বোন, এতো কোন অবস্থাতেই ছাটা যাবে না—"

অজিত ডাক্তার কক্ষে প্রবেশ করিল। সুনীতি অভ্যাস মত মাথায় হাত দিল। অজিত কহিল, "এই যে, বৌদিদি!" জিব কাটিয়া কহিল, "sorry! কি বলে address করব বুঝতে পারছি না—" বলিয়া লজ্জিত ভাবে মাথা চুলকাইতে লাগিল। বিজলীর মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। মুখ নীচু করিয়া কহিল, "যা খুসী বল ঠাকুরপো! শুধু অপমান কর না—"

আঁৎকাইয়া উঠিয়া অজিত কহিল, "অপমান করছি? সত্যি না—করলেও আমি ইচ্ছা করে করিনি, আপনার দিব্যি বলছি—আপনার নূতন পদবী আমরা এখনও জানতে পারি নি—" অত্যন্ত অনুশোচনার সহিত কহিল, "আমার অনিচ্ছাকৃত অন্যায়কে দয়া করে মাপ করবেন—"

সুনীতি ধমক দিয়া কহিল, "কি সং হচ্ছে?"

বিস্মিত কণ্ঠে অজিত কহিল, "সং? কোথায়?"

সুনীতি উষ্মার সহিত কহিল, "হয়েছে! আর চালাকি করতে হবে না; ঐ চেয়ারটাতে বসে পড়; দিদি কি বলছেন শোন—ওঁরা কানপুর যান নি, মিসেস গাঙ্গুলী মিথ্যে রটিয়েছে—"

—"যান নি? ঠিক করেছেন! দিল্লী, দিল্লী যাবার কি দরকার? আজকাল বাড়ীতে বসেই অতি সহজেই এ সব কাজ হাঁসিল করা যাচ্ছে। তুমি একটি fossil বলে এ সব কিছু জান না—শোন—ধর তুমি আমাকে ত্যাগ করতে চাও—"

রুষ্ট কণ্ঠে সুনীতি কহিল, "চুপ কর! আমি শুনতে চাইনে—"

—"আরে! শুনে রাখ না, আখেরে কাজে লাগবে; হাওয়া যে রকম বইছে, কাউকে বিশ্বাস নেই—শোন—প্রথমে তুমি কোন মসজিদে গিয়ে মুসলমানী হবে, তারপর তুমি আমাকে মুসলমান হতে নোটীশ দেবে, তারপর, আমি

অস্বীকার করলে—অস্বীকার আমি করবই—আমাকে তালাক দেবে, তার পর দিন কয়েক পরে, শুদ্ধি করে, নাম বদ্‌লে ঘরে ফিরে এসে, ড্যাং ড্যাং করে যাকে ইচ্ছে তাকে বিয়ে করবে। তারপর, আমি যদি একটু চুলবুল করি তো' ভগবান আমাকে রক্ষা করুন—আইনের ডাঙ্গসে আমার মাথা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে—"

এমন সময়ে বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। অজিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিল, "ঐ দাদা এলেন বুঝি, আমি চলি, একটা কলে যেতে হবে—"বিজলীর পানে তাকাইয়া কহিল, "পারেন তো আমাকে মাপ করবেন; সত্যি আমার কোন দোষ নেই—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুনীতি উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া কহিল, "মিস-মুখার্জ্জি ছেলেদের নিয়ে এসেছে, দেখছি—" তারপর বাহিরে যাইতে উদ্যত হইতেই বিজলী শুষ্কমুখে কহিল, "আমি ভাই অন্য কোন ঘরে গিয়ে বসি, কি বল?" সুনীতি কহিল, "না দিদি! আমি ওদের ওঁর ঘরে নিয়ে যাচ্ছি—" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুনীতি বাহির হইয়া যাইতেই, বিজলী উঠিয়া জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইতেই ডাঃ মজুমদারের বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ তাহার চোখে পড়িল—পরিধানে দামী, বিলাতী সুট, কেশে সদ্য প্রসাধনের চিহ্ন—ছেলে মেয়েকে বলিতেছেন, "ওরে, তোদের কাকীমাকে তৈরী হয়ে থাকতে বল গে—সিনেমা যেতে হবে—এক্ষুনি আমরা ফিরে আসছি—কতক্ষণ লাগবে হে, অজিত?"

অজিত কহিল, "ঘণ্টা খানেকের বেশী নয়—"

স্বামীর এরূপ সজ্জা বিজলী জীবনে দেখে নাই। ইহার জন্য কতদিন কত অনুরোধ ও অনুযোগ সে করিয়াছে, স্বামী কোন দিন কর্ণপাত করে নাই। নিজে পছন্দ করিয়া পোষাক তৈয়ারী করিয়াছে, স্বামী কোনদিন তাহা অঙ্গে তোলেন নাই। একসঙ্গে কয়বার বেড়াইতে গিয়াছে, বিজলী আঙ্গুল গণিয়া বলিয়া দিতে পারে। এক সঙ্গে সিনেমায় যাওয়া দূরের কথা, বহু সাধনা করিয়াও কোন দিন বিজলী তাহার স্বামীকে কোন বান্ধবীর বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারে নাই.........অথচ এখন?......পরাজয়ের গ্লানিতে ও ঈর্ষ্যায় বিজলীর বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকে। চোখে ঘনাইয়া আসে অশ্রু; যে পুরুষকে সে বহু চেষ্টা করিয়া 'বাগ্ মানাইতে পারে নাই, তাহাকেই আর একজন মেয়ে মানুষ অনায়াসে পোষ মানাইয়াছে, ইহার প্রমাণে কোন্ নারীর নারীত্বকে না ধিক্কার দেয়?

মোটর চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই সিঁড়িতে শিশুদের কলকণ্ঠ ও জুতার শব্দ শোনা গেল। মিস মুখার্জ্জি ও ছেলেরা আসিতেছে। মিস মুখার্জ্জি এখানে সম্মানিত অতিথি; যে সংসারকে সে স্রোতের মুখে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে, তাহারই হাল ধরিবার জন্য ইহারা তাহাকে আরাধনা করিতেছে। আর সে? অনাবশ্যক, অনাত্মীয়া। মৌখিক ভদ্রতা বাঁচাইয়া কোন মতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিলে, ইহারা বাঁচে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসকে বিজলী কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারে না।

ক্ষণু বোধ করি পিছাইয়া পড়িয়াছে। মিস মুখার্জ্জি ডাক দেয়, 'ক্ষণু!' নীচে হইতে চিলের মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ক্ষণু সাড়া দেয়, "যাচ্ছি, মাসীমা!" দুপদাপ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসে, খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে—

ছেলেদের আনন্দ-স্বর তীরের মত আসিয়া বিজলীকে বিঁধিতে থাকে, স্মরণ করাইয়া দেয়, ছেলেমেয়েরও তাহাদের মাকে ভুলিতে দেরী হয় নাই।

বিজলীর মনে হয়, সে যেন শীতান্তের ঝরাপাতা, ধূলায় পড়িয়া নবোদ্গাতার নব ঐশ্বর্য্যের পানে তাকাইয়া আছে—

কণ্ঠস্বর ও জুতার শব্দ আগাইয়া আসে। বিজলী পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার আড়ালে গিয়া আত্মগোপন করে, ভয় হয়, পাছে ইহারা তাহাকে দেখিয়া ফেলে—ইহাদের দৃষ্টিতে হয় ত অবহেলা থাকিবে, হয় ত থাকিবে ভাগ্য-বিড়ম্বিতার প্রতি কৃপণ করুণা—সে দৃষ্টি বিজলী সহ্য করিতে পারিবে না—

দরজার অন্তরাল হইতে বিজলী দেখিতে পাইল, প্রশস্ত বারান্দা দিয়া উহারা চলিয়াছে—এক পাশে মনু, মাঝখানে মিস্ মুখার্জ্জী, তাহার এক হাত মনুর কাঁধের উপরে আর এক পাশে সুনীতি। দরজার কাছে আসিয়া সুনীতি ঘরের দিকে তাকাইল, তাহা দেখিয়া মিস্ মুখার্জ্জী

— মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাহারা চলিয়া গেল—ক্ষণু বোধ করি আবার পিছাইয়া পড়িয়াছে।

অল্পক্ষণ পরেই ক্ষণু আপনার মনে বকিতে বকিতে খুট খুট করিয়া দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ডলি-পুতুল, তাহারই সহিত তাহার বাক্যালাপ চলিতেছে। ক্ষণু কহে—কি বলছ খুকু! তুমি দিদিমার ঘরে যাবে? না—না তুমি ভারী দুষ্টু, মেয়ে! এক্ষুনি তুমি দিদিমার জিনিস-পত্তর নষ্ট করবে—দিদিমা রাগ করবে, তোমাকে দুম দুম করে মারবে— ···" বলিয়া ক্ষণু বলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিজলী দরজার আড়াল হইতে বাহির হইয়া ডাকিল, "ক্ষণু!"

ক্ষণু চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া তাকায়, মাকে দেখিয়া অপ্রত্যাশিত আনন্দে মুখখানি শরতের রৌদ্র-স্নাত প্রভাতের মত ঝল্ মল্ করিয়া ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই অভিমানের কালো মেঘ উজ্জ্বল আনন্দটীকে ঢাকিয়া ফেলে, ক্ষণু মুখ ফিরাইয়া লয়, ঠোঁট ফুলিয়া ওঠে, দুই চোখ হইতে তাহার দুইটি মুক্তাবিন্দু খসিয়া পড়ে। বিজলী গাঢ় স্বরে ডাকে, "ক্ষণু! আমার কাছে আয়! আসবি নে?" ক্ষণু মুখ ফিরাইয়া দুইটি সজল, কালো ডাগর চোখ মায়ের পানে রাখিয়া অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহে, "না! তুমি ত আমাকে ভাল বাস না—"

কোন্ ঋষি না কি বাক্যোচ্চারণ দ্বারা কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ক্ষণুর এই কয়েকটি কথা ঠিক তেমনই বিজলীর চারি পার্শ্বে রাশি রাশি গাঢ় কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া সমস্ত বাহ্য জগৎ হইতে তাহাকে এক নিমেষে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সুন্দরতর জীবনের আকাঙ্ক্ষা, মহত্তর মানবতার স্বপ্ন, সেই বাষ্পসমুদ্রে কোথায় তলাইয়া গেল, কেবল সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মর্ম্মকোষে বসিয়া যে মাতা যুগ যুগ ধরিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছে, পালন করিয়াছে, এবং সদা-জাগ্রত আশঙ্কায় ও উদ্বেগে রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া অভিমানাহতা কন্যার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কঁদিতে লাগিল।

[৮]

মিস্ মুখার্জ্জী চলিয়া যাওয়ার পর হইতে বিজলীর মেয়ে-স্কুলটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে হরিচরণেরও কৃতিত্ব কম ছিল না। কারণ মিস্ মুখার্জ্জি চলিয়া যাইবার পরও দুই চারি জন মেয়ে স্কুলে আসিতেছিল। কিন্তু হরিচরণ তাহাদিগকে ধমক দিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, স্কুল উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সত্বেও এ বাড়ীতে আসিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের পাগুলি আস্ত থাকিবে না।

সুনীতির বাড়ী হইতে ফিরিবার পরদিন সকালে, বিজলী হরিচরণকে ডাক দিয়া কহিল, "স্কুল-ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে রাখ, আজ হতে স্কুল বসবে—"

হরিচরণ মাথা চুলকাইয়া কহিল, "এজ্ঞে, আবার ও ফ্যাসাদ কেন দিদিমণি। বেশত, এজ্ঞে, চুকে বুকে গেছে; সারাদিন ঘ্যানর্ ঘ্যানর্ এজ্ঞে বাড়ীতে কাকপক্ষী বসবার যো নেই—"

—"ওঃ তাই না কি! তোমার দিবানিদ্রার অসুবিধে হয় বুঝি—তা যেখানে সারাদিন আড্ডা দাও, সেখানে চাকরী করলেই পার, এখানে কষ্ট পাবার দরকার কি?"

বাড়ীর ঝি তরঙ্গিণী, বিজলী এ বাড়ীতে পদার্পণ করিবামাত্র জানাইয়াছে—"বাড়ীর একটি জিনিসও দেখতে পেতে না, দিদিমণি! ভাগ্যে আমি ছিলাম, আর ছিল আমার এই দুটো পোড়া চোখ। হরিচরণ কি একদণ্ড বাড়ীতে থাকত? দুটো নাকে, মুখে, চোখে গুঁজে দশটার সময় বেড়াতে যেত, ফিরত রাত দশটায়। তারপর সারারাত্তির মোষের মত ঘুম। দিন রাত চোখে পাতায় করতে পারি নি, দিদিমণি!—"

হরিচরণ বুক চিতাইয়া চোখ পাকাইয়া কহিল, "এজ্ঞে কে বললে তোমাকে? তরী বুঝি? মাগীর, এজ্ঞে, মাথা ভাঙ্গব আমি—"

নীরস কণ্ঠে বিজলী কহিল, "বীরত্ব ফলিয়ে কাজ নেই হরি দা!···তা'ছাড়া ও তো মিছে কথা কথা বলে নি—"

—"এজ্ঞে নাই বা হল মিছে কথা, বেশ করেছি গেছি। জামাইবাবু এজ্ঞে মর মর, ওখানে যাব না তো, কি এখানে তরী মাগীর, এজ্ঞে, মুখে মুখ দিয়ে দিনরাত্তি এজ্ঞে, বসে থাকতে হবে—"

বিজলী ধমক দিয়া কহিল, চুপ! অসভ্য কোথাকার! বুড়িয়ে মরতে যাচ্ছে এখনও কথা কইতে শিখলে না?"

হরিচরণ একেবারে নিবিয়া গেল। মুখ চুণ করিয়া কহিল, "এজ্ঞে কি করেছি আমি যে ধমকাচ্ছ? আমি তো শুধু বলেছি…"

—"হয়েছে! যাও, যা বলেছি এখনই কর গিয়ে—"

হরিচরণ কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া নিরীহের মত ধীরপদে ঘরের বাহিরে আসিল। কিন্তু বিজলীর চক্ষের আড়াল হইবামাত্র তাহার মেরুদণ্ড খাড়া হইয়া উঠিল, মুখে ফুটিল ভ্রুকুটী এবং মুষ্টিবদ্ধ হস্তখানি শূন্যে উত্তোলিত হইয়া তরঙ্গিণী নাম্নী শত্রুর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া হরিচরণ অনুতপ্ত কণ্ঠে খবর দিল—"চাবিটা যে, এজ্ঞে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—দিদিমণি!"

বিজলী রুষ্টকণ্ঠে কহিল, "চাবিটাও হারিয়েছ? বেশ করেছ। যাও দরওয়ানকে দিয়ে তালা ভাঙ্গিয়ে ফেল—যাও! দশটার আগে সব ঠিক করে রাখা চাই—"

হরিচরণ একবার দিদিমণির পানে ম্লান-নেত্রে চাহিয়া হতাশের মত বাহির হইয়া গেল।

পাড়ায় একটি গৃহস্থ বিজলীর খুব অনুগত ছিল। গৃহকর্ত্তা সওদাগরী অফিসের কেরাণী—নাম লক্ষ্মীকান্ত, পঞ্চাশটি টাকা বেতন পান, কিন্তু বেপরোয়াভাবে ডজন-খানেক পুত্রকন্যার জন্ম দিয়াছেন। বাজারে নানা প্রকারের দোকানে নানা অঙ্কের দেনা; কিন্তু বাড়ীওয়ালার দেনাটা একদা মর্ম্মান্তিক হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ, উক্ত ভদ্রলোক একদিন সকালে লোকজন লইয়া আসিয়া লক্ষ্মীকান্তবাবুর বাক্স, প্যাঁটরা, বিছানা, হাঁড়ি, কলসী টান মারিয়া বাড়ী হইতে রাস্তায় আনিয়া ফেলে এবং বাড়ীর লোকগুলিকেও বাহির হইবার জন্য টানাটানি করিতে থাকে। সোরগোল কান্নাকাটি পড়িয়া যায় এবং প্রতিবেশীরা চারিদিকে জড় হইয়া যথারীতি মজা দেখিতে থাকে। এমন সময়ে বিজলী হরিচরণের কাছে খবর পাইয়া বাড়ীওয়ালাকে ডাকিয়া পাঠায় এবং তাহার সমস্ত দেনা মিটাইয়া দিয়া হতভাগ্য কেরাণী পরিবারটিকে অপমানের হাত হইতে রক্ষা করে। সেইদিন হইতে এই পরিবারটি যেমন বিপদ আপদে বিজলীর কাছ হইতে সাহায্য পায়, তেমনই কাজে অকাজে সর্ব্বদা বিজলীর অনুপন্থী হইয়া থাকে। এই পরিবারের গুটিকয়েক মেয়ে লইয়া বিজলীর মেয়ে-স্কুল আবার আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছিল।

হরিচরণকে বিদায় দিয়া বিজলী একবার পাড়ার সকলের সহিত দেখা করিয়া মেয়েদের আবার স্কুলে পাঠাইতে অনুরোধ করিবার জন্য বাহির হইল। প্রথমেই লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতে হাজির হইল। অন্ধকার, সরু, অপরিচ্ছন্ন গলির মধ্যে ছোট, অস্থিচর্ম্মসার, জীর্ণ, বাড়ী; সামনে এক ফালি রোয়াক। সেখানে দাঁড়াইয়া দুটি উলঙ্গ ছেলে কাগজের ঠোঙ্গা করিয়া মুড়ী চিবাইতেছিল। বিজলীকে দেখিয়া তাহার একমুখ মুড়িশুদ্ধ হাঁ করিয়া ফ্যালফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল—তাহারা বিজলীর স্কুলের ছাত্র নহে। বিজলী একজনকে কহিল, "খোকা, তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন?"

খোকারা দুইজনেই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বাড়ীতে নাই। বিজলী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের মা?"

আবার ঘাড় দুইটি নাড়িয়া জানাইল, "আছে—"

"একবার বাড়ীতে খবর দাও না?" বিজলী বলিল।

ছেলে দুইটি একসঙ্গে হুড়মুড় করিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহাদের মাকে জানাইল, "মা, সেই মাষ্টারনী এসেছে—"

মা-টি বুঝি গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা ছিলেন, হাঁক দিয়া কহিলেন, "কে এসেছে বললি?"

ছেলেরা কহিল—"ঐ যে গো, দিদিদের স্কুলে পড়াত?"

দরজার পরেই অন্দরমহলের আব্রু-রক্ষার জন্য একটি তালি-দেওয়া চটের পর্দ্দা ঝুলিতেছে; বিজলী ঘরে ঢুকিয়া পর্দ্দার কাছে দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে লক্ষ্মীকান্তবাবুর লক্ষ্মীটি পর্দ্দাটা ঠেলিয়া মুখ বাড়াইয়া একমুখ হাসিয়া কহিলেন, "ওমা! আমাদের মা এসেছে! এস মা আমার, এস!" বলিয়া উঠানে লইয়া গিয়া হাঁক দিলেন, "ওরে অনি, মনি, খেঁদি, বিন্দি, নেপি, টেঁপি—আয় দেখবি কে এসেছে—" বলিতেই পনের হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত বয়সের একদল ছেলেমেয়ে একটা ঘর হইতে হুড়মুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বড় মেয়েটি আসিয়া বিজলীকে নত হইয়া প্রণাম করিতেই, একসঙ্গে সকলে

বিজলীর পায়ের উপরে আসিয়া পড়িল বিজলী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

গৃহিণী কহিলেন, "ওরে তোরা মাথা ঠুকে ঠুকে মায়ের পায়ে ব্যথা ধরিয়ে দিবি যে! ওরে অনি, মাকে একটা বসতে কিছু দে দিকি!"

বারান্দায় একটা মাদুর ছিল, অনিলা মেয়েটি সেইটি পাতিবার উপক্রম করিতেই গৃহিণী ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পাশেই একটি চটের আসন ছিল, অনিলা সেইটি পাতিয়া দিল। বিজলী আসন গ্রহণ করিল, ছেলে-মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল এবং তাহাদের মা অদূরে বসিয়া কহিলেন, "কবে এলে মা?"

বিজলী কহিল, "পরশু এসেছি; আপনার মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে না—"

গৃহিণী কহিলেন, "ইস্কুল! ইস্কুল ত তোমার বন্ধ হয়ে গেছে মা!"

বিজলী বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "বন্ধ হয়ে গেছে? কে বললে?"

—"ঐ যে একজন ফরসা মত মোটা-সোটা মেয়ে মানুষ, খুব বড়লোকের বৌ, পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে এসে বলে গেলেন, তোমার ইস্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, তাই ওঁরা নূতন করে ইস্কুল করেছেন, মেয়েদের যেন ওখানেই পাঠান হয়। সেই থেকেই ত' এই স্কুলেই যাচ্ছে সব; আমাদের পাড়ার মেয়েদের ওঁরা খুব সুবিধে করে দিয়েছেন, মাইনে লাগে না, গাড়ী করে যাওয়া আসা করে।"

—"আমাদের স্কুল ত' বন্ধ হয় নি, মাসীমা! আমি দিন কয়েক ছিলাম না বলেই এই গোলমাল হয়েছে।"

—"কি করে জানব মা! ওরা সব কত কি বলতে লাগল, তুমি না কি এখান থেকে চলে গেছ, আর ফিরবে না, বাড়ী-টাড়ী সব বিক্রী করে দেবে"—

বিজলী ম্লান হাসিয়া কহিল, "এই সব বল ছিল বুঝি! কিন্তু আমি ত আবার ফিরেছি মাসীমা।"

—"ফিরবে বৈ কি মা! তা' না হলে আমরা কার মুখ চেয়ে বাঁচব!"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল, "তা হলে আপনার মেয়েদের আমার ওখানে আজ পাঠিয়ে দেবেন, বলুন?"

গৃহিণী ঢোক গিলিয়া কহিলেন, "তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে আবার বলতে হবে হবে কেন, মা!··· তা ছাড়া এও ত' তোমার বাড়ী, তুমি না থাকলে কবে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হত!"

—"ও কথা বাদ দিন—আজ তা হলে মেয়েদের পাঠিয়ে দেবেন!"

গৃহিণী ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "কি জান মা! উনি বললেন, মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন। কি হবে না লেখাপড়া শিখে? গরীবের মেয়ে, চিরদিন পরের বাড়ীতে দাসী-বিত্তি করে কাটবে, এখন থেকে কাজকর্ম, রান্নাবান্না শিখুক যে, আখেরে কষ্ট পেতে হবে না—"

—"এখন থেকে নেহাৎ পশুর মত করে রেখে দেবেন?"

—"যাদের মা পশু, তারা পশু ছাড়া কি হবে, মা! আমার এমনি ভাবে কেটেছে, ওদেরও এমনি ভাবে কাটবে, ওদের মেয়েদেরও তাই। জনকয়েক সহরে বাবুর মেয়ে, ইংরেজী শিখে, জুতো পরে, পুরুষের গা ঘেঁসে ট্রামে, বাসে, বেড়াতে পারলেই যে, আমাদের অদেষ্ট বদলে যাবে তা নয়। হাঁড়ি ঠেলা আর বাসন মাজা, সেই আমাদের থাকবে, ছোটবেলায় বাপ, মা, বিয়ের পর স্বামী, আর বুড়ো হলে ছেলেদের ধমক আমাদের এক কোঁটাও কমবে না—"

বিজলী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কহিল, "আপনারা যখন স্থির করেছেন, পড়াশুনা বন্ধ করে দেবেন, তখন আর কথা কি; আমি তা হলে উঠি—"

গৃহিণী মিনতি করিয়া কহিলেন, "কিছু মনে ক'র না, মা! তোমার কথা রাখতে পারছি না—। তুমি হয় ত ভাববে, ভারী নেমকহারাম এরা, কিন্তু কি করব মা! মেয়েটা বড় হয়েছে, পাড়ায় একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা চলছে, সকলের চেষ্টায় একটু সুবিধেও মনে হচ্ছে, এখন একটু এদিক-ওদিক হলে হয়ত সব ভেঙ্গে যাবে—"

বিজলী নীরস কণ্ঠে কহিল, "কি দরকার মাসীমা! এ-দিক ওদিক করে? পাড়ায় সকলের মন যুগিয়ে চলাই

তো ভাল—আচ্ছা! বলিয়া উঠিয়া চলিতে লাগিল। গৃহিণী পিছনে পিছনে গেলেন, একটু পরে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কি মা পাড়ায় আর কারও বাড়ী যাবে?"

বিজলী কহিল, "যাব বৈ কি মাসীমা!"

গৃহিণী কহিলেন, "গিয়ে কাজ নেই, মা! পাড়ার লোকদের মনের ভাব তোমার ওপর ভাল নয়; হয় তো দুঃখ দেবে, তার চেয়ে বাড়ী যাও মা! রোদও অনেকটা হয়ে গেছে—"

—"তাই হবে, মাসীমা! আমি চললুম, আপনি যান—" বলিয়া বিজলী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গৃহিণী উঠানে পা দিতেই পাশের বাড়ীর গৃহিণী দোতলার বারান্দা হইতে হাঁক দিয়া কহিলেন, "ওই খেরেস্তানী মাগী কখন ফিরল গা' অনির মা!"

—"কি করে জানব মা!"

—"কি বলতে এসেছিল গা?"

—"মেয়েদের ওর ইস্কুলে যেতে বলতে এসেছিল—"

—"তুমি কি বললে?"

—"বললুম—আমরা মেয়েদের পড়া বন্ধ করে দিয়েছি—"

—"শুধু তাই কেন, বাছা! বলতে হত, ভদ্রলোকের মেয়ে এত ফেলনা নয় যে, যার তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে হবে—ছুঁচো মুখ বুঁচো করে পালিয়ে যেতে পথ পেত না। তা' তোমাকে বলি বাছা! ও মাগী যদি তোমার বাড়ী যাওয়া-আসা করে, তা' হলে তোমার মেয়ের বে' দেওয়া শক্ত হবে—"

গৃহিণীর বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল; কহিলেন, "আসতে বারণ করেই দিয়েছি মা! আর এ মুখো ও হবে না, তুমি দেখে নিও—" তারপর ছেলে-মেয়েদের ডাকিয়া কহিলেন, "এই! তোরা কাপড়-চোপড় ছেড়ে ঘরে ঢুকবি, কি জানি খেরেস্তান না কি হয়েছে—" অনিলাকে ডাকিয়া কহিলেন, "চটের আসনটা কেচে শুকোতে দিগে—যা!" [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

মরিতে দাও

—শ্রীরমণী চক্রবর্ত্তী

আমারে মরিতে দাও আজিকার এই স্তব্ধ রাতে,
আমারে ডুবিতে দাও মৃত্যুগামী তারকার সাথে,
সীমাহীন নীল শূন্যে;—আমি আর চাহি না বাঁচিতে,
কামনা-পঙ্কিল এই পুরাতন জীর্ণ পৃথিবীতে।
চতুর্দ্দিকে শুনি মোর অবিশ্রান্ত অশ্রুর উৎসব,
মানুষের স্বার্থ লাগি' জিঘাংসার শোণিত আহব;
চলিয়াছে নিশিদিন যুগ হতে যুগান্তর ধরি,
মানুষের বেদনায় নীল হল অতন্দ্র শর্ব্বরী।
মানুষের বেদনায় নীল হল সমুদ্র আকাশ,
নক্ষত্র-লিখনে লেখা তাহারি করুণ ইতিহাস।
এ পৃথিবী ছেড়ে আমি চলে যাব মরণের পারে,
শুভ্র চন্দ্রালোকে স্নাত জনহীন সিন্ধুর কিনারে।
যেথা নাই মানুষের ক্লেদপূর্ণ বিষাক্ত হৃদয়,
সেথা আমি চলে যাব—নিষ্প্রেম এ পৃথিবীতে নয়

বিজ্ঞান-জগৎ

পৃথিবীর রূপ :
: অন্য জ্যোতিষ্ক হইতে

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

বহুকাল হইতেই জল্পনা চলিতেছে যে, অন্য গ্রহে কোন বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বহু লোকের এবং তাঁহাদের মধ্যে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরও, ধারণা ছিল যে, অন্ততঃ মঙ্গল গ্রহে বুদ্ধিমান জীব বর্ত্তমান। এমন কি, অনেক বৈজ্ঞানিক মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীদের নিকট হইতে বেতারে সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে এরূপ অনুমানও করেন। বর্ত্তমানে অবশ্য কোন বৈজ্ঞানিকই বিশ্বাস করেন না যে,অন্য গ্রহে জীবের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে এই ধারণা এখনও দূরীভূত হয় নাই।

সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে কয়টি গ্রহ পরিভ্রমণ করে তাহার অধিকাংশ অতি অল্প আয়াসেই শুধু চোখে দেখা যায়। স্পষ্টতর ভাবে দেখিতে হইলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। চন্দ্র আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট প্রতিবেশী, অবশ্য চন্দ্র যে গ্রহ নহে, পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র, তাহা বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা দূরবীণ দিয়া চন্দ্রের দেহ দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই চন্দ্রের বন্ধুর গাত্র নিরীক্ষণ করিয়াছেন। চন্দ্রের দেহ যেরূপ স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, কোন গ্রহের দেহ ভাল দূরবীণ সাহায্যেও তত স্পষ্ট দেখা যায় না; কারণ চন্দ্রে বাতাস বা জলীয় বাষ্প নাই, সুতরাং দৃষ্টি প্রতিহত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই কিন্তু সকল গ্রহই অল্পবিস্তর পরিমণ্ডল-বিশিষ্ট।

গ্রহের মধ্যে মঙ্গলই সর্ব্বাপেক্ষা মেঘমুক্ত, প্রায় নির্ম্মেঘ বলিলেই চলে। সুতরাং, ইহার প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের অনেকাংশে জ্ঞাত। মঙ্গলের রক্তবর্ণ আকৃতি বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন,এই রক্তবর্ণের জন্য মঙ্গলকে বিলাতী শাস্ত্রমতে রণদেবতা Mars কল্পনা করা হয়। সংস্কৃতে মঙ্গলের বহু নামের একটি, 'অঙ্গারক'-এর জন্য উহার রক্তবর্ণই দায়ী।

বৃহস্পতি সকল সময়েই অত্যন্ত ঘন মেঘে আবৃত্ত থাকে, সুতরাং তাহার দেহ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। শনির বলয়সমন্বিত বিচিত্রদর্শন আকৃতি একবার দেখিলে ভুলা যায় না।

পৃথিবী হইতে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের দৃশ্য : দক্ষিণে পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যালোকের প্রভাব দেখা যাইতেছে।
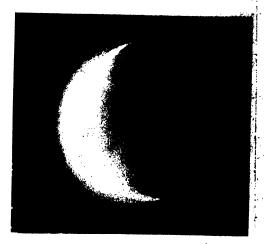
যদি অপর কোন গ্রহে কোন জীব থাকে তাহা হইলে তাহাদের চক্ষে পৃথিবী কিরূপভাবে প্রতীয়মান হইবে ইহাই এখন আমাদের আলোচ্য। প্রথমতঃ, পৃথিবীর আকার কিরূপ বৃহৎ দেখাইবে তাহা অতি সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। কারণ,কোন বস্তুর আয়তন এবং বস্তুটি কতদূরে অবস্থিত তাহা জানা থাকিলে সামান্য জ্যামিতি-জ্ঞানের প্রয়োগ করিলেই উহার আকার কত বড় দেখাইবে সহজেই নির্ণয় করা চলে। দ্বিতীয়তঃ, অন্য গ্রহ হইতে পৃথিবীর আকার গোলাকার দেখাইবে অথবা চন্দ্রের কলার ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যাইবে ইহাও নির্ণয় করা সহজ।

আমরা সকলেই জানি যে, গ্রহেরা নিজেরা আলো দেয় না, সূর্য্যের আলো প্রতিফলিত করিয়া থাকে মাত্র। পৃথিবী একটি গ্রহ, কাজেই ইহাও সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত করিবে। কিন্তু কি পরিমাণ আলো প্রতিফলিত করিবে এবং সুতরাং পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য অন্য গ্রহ হইতে কিরূপ প্রতীয়মান হইবে তাহা একটি জটিল সমস্যা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ঘন মেঘে আচ্ছন্ন গ্রহ হইতে শতকরা প্রায়
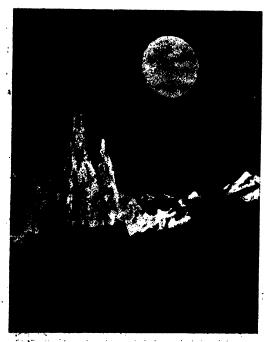
চন্দ্র হইতে পৃথিবী কিরূপ দেখাইবে তাহার বিজ্ঞানসম্মত চিত্র : হাওয়ার্ড রাসেল বাট্লার অঙ্কিত।

৫০ ভাগ আলো প্রতিফলিত হয় এবং স্বচ্ছ নির্ম্মেঘ গ্রহ বা উপগ্রহ, যেমন মঙ্গল বা চন্দ্র, হইতে শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ পর্য্যন্ত আলোক প্রতিফলিত হয়। পৃথিবীর পরিমণ্ডল স্থানে স্থানে মেঘাবৃত এবং স্থানে স্থানে স্বচ্ছ,সুতরাং মোটামুটি হিসাবে পৃথিবীর আলোক প্রতিফলনের ক্ষমতা উপরের সংখ্যা দুইটির মাঝামাঝি হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

এই অনুমান সঠিক কিনা এবং পৃথিবীর আলোক প্রতিফলনের পরিমাণ কত তাহা পূর্ব্বে নির্ণীত হইতে পারে নাই। সম্প্রতি ষ্ট্রাসবুর্গ বীক্ষণাগারের জ্যোতির্ব্বিদ ডক্টর দাঁজ এই বিষয়ে তাঁহার দশ বৎসরের গবেষণার ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষার মোটামুটি বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে।

বহু প্রাচীন কাল হইতেই লোকে লক্ষ্য করিয়াছে যে, কৃষ্ণপক্ষে যখন চাঁদের সরু ফালি দেখা যায় তখন চাঁদের বাকি অংশ ঈষৎ আলোকিত অবস্থায় দেখা যায়। চন্দ্রের উজ্জ্বল অংশে সূর্য্যের আলো পড়ে কিন্তু অবশিষ্ট অংশে যে অল্প আলোক পড়ে তাহা পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত সূর্য্যালোক। এখন চন্দ্রের বিভিন্ন অংশের আলোকের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করিতে পারিলে পৃথিবীর সূর্য্যালোক প্রতিফলনের ক্ষমতা কিরূপ নির্ণয় করা যায়। সমস্ত আকাশে চন্দ্রালোক ব্যপ্ত থাকায় চন্দ্রের অনুজ্জ্বল অংশের স্বল্প আলোকের পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দাঁজ'র পূর্ব্বে জনৈক মার্কিন বৈজ্ঞানিক 'ভেরী' এ সম্বন্ধে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

আলোকের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপক যন্ত্রকে 'ফোটোমিটার' বলা হয়। দাঁজ তাঁহার কাজের জন্য একটি নূতন ধরণের ফোটোমিটার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার যন্ত্রে, চন্দ্রের দুইটি আলোকিত অংশের দুইটি বিভিন্ন প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করা হয়। উজ্জ্বল অংশের আলো যে ছিদ্রের ভিতর দিয়া যন্ত্রে প্রবেশ করে সেই ছিদ্রের আয়তন ক্রমশঃ কমাইয়া দুইটি প্রতিবিম্বের ঔজ্জ্বল্য সমান করা হয়। ছিদ্রের আয়তন হইতে অতি সহজেই দুইটি আলোকের তুলনামূলক ঔজ্জ্বল্য নির্ণয় করা যায়।

আলোকের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করা সহজ হইয়া গেল কিন্তু আরও সমস্যা থাকিয়া গেল। পৃথিবী হইতে যে আলোক চন্দ্রের উপর পড়িতেছে তাহা সোজাসুজিই পড়িতেছে এবং সেই পথেই ফিরিয়া আসিতেছে, সুতরাং চন্দ্র পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত আলোকে সম্পূর্ণ আলোকিত হইতেছে কিন্তু সূর্য্য হইতে যে আলোক চন্দ্রের উপর পড়ে তাহা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে পড়ে। পূর্ণিমার সময়ে সূর্য্য পৃথিবীর পিছনে থাকে এবং চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হয়, কিন্তু অমাবস্যার কাছাকাছি সূর্য্য থাকে বিপরীত দিকে অর্থাৎ চন্দ্রের পিছনে। পিছন হইতে আলোক পড়িবার ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠে যে সকল বন্ধুরতা আছে তাহার

ছায়া পড়ে। এই ছায়াগুলি, চোখে না দেখা যাইলেও সমস্ত আলোকের ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশে কমাইয়া দেয়। দাঁজ

পৃথিবী হইতে বৃহস্পতি এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন দেখা যায়।
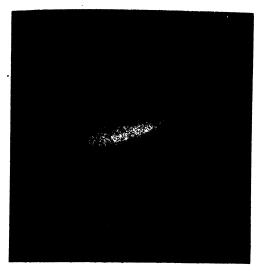
তাঁহার পরীক্ষার ফলে ছায়ার প্রভাবও পরিমাপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, পূর্ণিমা হইতে মাত্র ৩০° দূরে অবস্থিত হইলে চন্দ্রের আলোক পূর্ণিমার আলোকের অর্দ্ধেক হইয়া যায়। অষ্টমীর সময় চন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য হইয়া যায় সিকি এবং কৃষ্ণা চতুর্থীতে মাত্র ১/১৫ ভাগ। চন্দ্রের আলোকিত অংশ যখন অধিক উজ্জ্বল থাকে তখন এই কারণেই পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত আলোক দেখিতে পাওয়া যায় না কারণ, চন্দ্রালোকের তুলনায় এই 'মর্ত্ত্যালোক' বা *earth-shine* অত্যন্ত অল্প; কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিকে যখন চন্দ্রালোক ক্ষীণ থাকে তখনই মাত্র ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

মর্ত্ত্যালোকের পরিমাণও চন্দ্রের কলার সহিত হ্রাস বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে মর্ত্ত্যালোকের ঔজ্জ্বল্য অষ্টমী তিথির মর্ত্ত্যালোকের দ্বিগুণ। ইহা হইতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অমাবস্যা তিথিতে মর্ত্ত্যালোকের ঔজ্জ্বল্য অষ্টমী তিথি অপেক্ষা পাঁচগুণ উজ্জ্বলতর হইবে।

দাঁজঁর পরীক্ষা ও গণনা হইতে দেখা যায় যে, চন্দ্র হইতে পৃথিবী দেখিতে পাইলে দেখা যাইবে যে, পূর্ণিমার সময় সূর্য্য হইতে চন্দ্রে যে পরিমাণ আলোক পতিত হয় পৃথিবী হইতে তাহার ৯০০০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র পড়িবে। অর্থাৎ সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে যতখানি আলোক পতিত হয় তাহার শতকরা ৩৯ ভাগ আলোক প্রতিফলিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীর আলোক প্রতিফলনের ক্ষমতা শতকরা ৩০—৩৫ ভাগ হওয়া সম্ভব।

চন্দ্র হইতে পৃথিবীর আয়তন কিরূপ দেখাইবে এবং তাহার ঔজ্জ্বল্য কিরূপ হইবে তাহার হিসাব পাওয়া গেল। এখন বাকি রহিল, বর্ণের প্রশ্ন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মঙ্গল রক্তবর্ণ গ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহ হইতে অন্য বর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণের আলোক অধিকতর পরিমাণে পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছায়। পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত আলোক সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে লাল আলোকের অত্যন্ত স্বল্পতা আছে। সুতরাং পৃথিবী অন্য গ্রহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নীলবর্ণের বলিয়া বোধ হইবে। শ্বেতবর্ণের সূর্য্যালোক প্রধানতঃ লাল, নীল ও পীত বর্ণের মিশ্রণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, সুতরাং লাল বর্ণের আলোক কম প্রতিফলিত হইলে নীল বর্ণের আলোক অধিকতরভাবে প্রতিফলিত হইবে এবং ফলে পৃথিবীর বর্ণ নীল বলিয়া বোধ হইবে। পৃথিবীর বর্ণ নীল হইবার আরও একটি কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আকাশের নীল বর্ণ সকলেই দেখিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে

আবহতত্ত্বে ক্যামেরার ব্যবহার : ক্যামেরার প্লেটটি গোল। ছবিটি মাথার উপর তুলিয়া ধরিলে আলোকিত বেলুন স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

আকাশের কোন বর্ণ নাই। বায়ুমণ্ডলস্থ বাতাসের অণুগুলি লাল আলোক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় এবং সেইজন্য

আকাশের বর্ণ নীল বলিয়া বোধ হয়। এরোপ্লেন বা বেলুনে অনেক উচ্চে উঠিলে ঊর্দ্ধাকাশে কোন বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু নীচের দিকে বেশ নীলবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী যেন একটি নীল আচ্ছাদনে আবৃত রহিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর আলোক প্রতিফলন ক্ষমতা আকাশের অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। নির্ম্মেঘ আকাশ থাকিলে অল্প এবং মেঘ থাকিলে অধিক পরিমাণে আলোক প্রতিফলিত হয়। সুতরাং বৎসরের সকল সময়ে মর্ত্ত্যালোকের পরিমাণ এক থাকে না, যে সময়ে মেঘের প্রাদুর্ভাব বেশী হয় সেই সময়ে আলোকও অধিক পরিমাণে প্রতিফলিত হয়। দাঁজ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, আগষ্ট মাস অপেক্ষা ফেব্রুয়ারী মাসে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ আলোক বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া আটলান্টিক বা অন্য কোন মহাসাগর হইতে যখন আলোক প্রতিফলিত হয় তখন জলের প্রতিফলন ক্ষমতা জমী অপেক্ষা অধিক হওয়ার দরুণ আলোক বৃদ্ধি পায় এবং চন্দ্র হইতে বোধ হইতে পারে যে, ঐ স্থানে অত্যন্ত মেঘ করিয়াছে।

এখন বিভিন্ন গ্রহ হইতে পৃথিবীকে কিরূপ দেখাইবে তাহার আলোচনা করা যাক। বৃহস্পতি হইতে পৃথিবীকে সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটেই ১২° ডিগ্রির মধ্যেই দেখা যাইবে। পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্য হইবে ১·৫ ক্রমের নক্ষত্রের মত, প্রায় মিথুন রাশিস্থিত পুনর্বসু-দ্বিতীয় নক্ষত্রের মত (ইং Castor) উহা ঔজ্জ্বল্যে এবং বর্ণে দেখিতে হইবে। সন্ধ্যার পর বৃহস্পতি হইতে শুধু চোখে পৃথিবী খুব সম্ভব দেখা যাইবে না কিন্তু বৃহস্পতির বহু চাঁদের একটি যখন সূর্য্যগ্রহণ ঘটাইবে তখন পৃথিবী বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যাইবে।

মঙ্গল হইতে পৃথিবীকে, পৃথিবী হইতে দৃষ্ট বৃহস্পতির মত উজ্জ্বল দেখাইবে। শুক্র যেরূপ সন্ধ্যায় বা প্রত্যুষে সন্ধ্যাতারা বা শুকতারা রূপে দেখা যায়, মঙ্গল হইতে পৃথিবীও সেইরূপ ভাবে দেখা যাইবে, তবে শুক্র যেরূপ উজ্জ্বল দেখায় মঙ্গল হইতে পৃথিবী ততখানি উজ্জ্বল দেখাইবে না।

পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখাইবে শুক্র হইতে। শুক্র পৃথিবী হইতে যেরূপ উজ্জ্বল দেখায়, পৃথিবী শুক্র হইতে তাহার সাড়ে ছয়গুণ অধিক উজ্জ্বল দেখাইবে। অন্য কোন গ্রহ হইতে পৃথিবীকে এত সুন্দর দেখাইবে না। শুক্র হইতে আমাদের চাঁদকে দেখাইবে বৃহস্পতির মত উজ্জ্বল। শুক্র হইতে পৃথিবী এবং চন্দ্রকে একটি যুগ্ম নক্ষত্র বলিয়া বোধ হইবার সম্ভাবনা আছে কারণ উহাদের দূরত্ব হইবে মাত্র আধ ডিগ্রি। নীল পৃথিবী এবং তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমান পীত চন্দ্রের পরিভ্রমণ কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকেই বুঝা যাইবে।

যাঁহারা সিনেমায় '*A Journey to the Planets*', '*Just Imagine*' প্রভৃতি ছবি দেখিয়াছেন তাঁহাদের মনে থাকিতে পারে যে, দূর হইতে পৃথিবীকে একটি ঘূর্ণায়মান ভূগোলক বা গ্লোবের মত দেখান হইয়াছে। ইহাতে সকল দেশ এবং মহাদেশ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। উপরে যাহা বলা হইল তাহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, এই প্রকার পরিকল্পনা নিতান্তই ভুল। এখানে চন্দ্র হইতে পৃথিবী কিরূপ দেখাইবে তাহার একটি কাল্পনিক অথচ বিজ্ঞানসম্মত ছবি দেওয়া হইল; ছবিটি হাওয়ার্ড রাসেল বাট্‌লার নামক মার্কিন চিত্রকরের আঁকা। ছবিতে মেরু অঞ্চলে এবং পৃথিবীর নিরক্ষ-বৃত্তের নিকট মেঘ দেখা যাইতেছে। আটলান্টিক মহাসাগর এবং আফ্রিকার পশ্চিম অংশে ঝটিকার সূচনাও দেখা যাইতেছে।

আবহ-তথ্য-নিরূপণে ক্যামেরা

বর্ত্তমানে বহুসংখ্যক বিমান রাত্রে যাতায়াত করিতেছে, সুতরাং রাত্রের আবহ অবস্থা জানা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বাতাসের বেগ এবং দিক্ নির্ণয় করা এইজন্য বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে। আমেরিকার মাসাচুসেটস্ ইন্‌স্টিটুট অব্ টেক্নোলজী, বাতাসের বেগ এবং দিক্ মাপিবার জন্য ফটোগ্রাফিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। সাধারণ ক্যামেরায় আকাশের সমস্ত অংশের ছবি তোলা যায় না, কিন্তু এই নূতন ক্যামেরায় আকাশের সমস্ত অংশ অর্থাৎ পুরা ১৮০° ডিগ্রি দূরে অবস্থিত বস্তুর ছবি একসঙ্গে তোলা সম্ভব হইয়াছে।

ক্যামেরাটি ব্যবহার করিবার সময়ে একটি বেলুন উঠান হয় এবং উহাতে একটি ফিউজের সহিত বিভিন্ন দূরে ম্যাগ্নেসিয়াম লাগান থাকে। এই ফিউজটি জ্বালাইয়া দিয়া

বেলুনটি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ক্যামেরাটি জমীতে বসান থাকে। বেলুন ছাড়িয়া দিলে নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পরে ম্যাগ্নেসিয়াম (কালী পূজার সময় যে তথাকথিত 'বিজলী' তার জ্বালান হয় তাহা এই ম্যাগ্নেসিয়াম ধাতুর তার ব্যতীত কিছুই নহে) জ্বলিয়া উঠিয়া আকাশ আলোকিত করে এবং ক্যামেরার সমস্ত আকাশের ছবি উঠিয়া যায়। ক্যামেরার প্লেটটি সাধারণ ক্যামেরার মত চারকোণা না হইয়া গোলাকার। প্লেটের পরিধি দিকচক্রকাল রেখার নির্দ্দেশ করে। ক্যামেরার অবস্থান, বেলুনের উর্দ্ধবেগ, এবং প্লেটের উপর বেলুনের অবস্থান হইতে বাতাসের দিক্ ও বেগ নির্ণীত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বেলুনের মধ্যে একটি বাতি বসাইয়া থিয়োডোলাইট সাহায্যে তাহার অবস্থান নির্ণয় করা হইত কিন্তু বাতির ক্ষীণ আলোক ও তারার সঙ্গে অনেক সময় গোলমাল হইয়া যাইত। কিন্তু আলোচ্য পদ্ধতিতে সে সকল অসুবিধা নাই। অধিকন্তু এই কাজের জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষিত কোন লোকের আবশ্যক হয় না।

পরমাণু ভাঙিবার বৃহত্তম যন্ত্র

পরমাণু ভাঙিবার জন্য সমগ্র বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী সংপ্রতি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রায়ই নূতন নূতন পরমাণু ভাঙিবার যন্ত্রের সংবাদ পাওয়া যায়। সংপ্রতি জার্ম্মানীতে এইরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে, বর্ত্তমানে পরমাণু ভাঙিবার ইহাই বৃহত্তম যন্ত্র। বেলিনের কাইজার ভিল্‌হেলম ইন্‌সটিটুট অব ফিজিক্স ইহা লইয়া প্রাথমিক পরীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত যন্ত্রটি একটি জানালাবিহীন প্রকাণ্ড উঁচু ঘরের মধ্যে অবস্থিত। ৫০ ফুট উচ্চ দুইটি ইলেকট্রোড হইতে ৩০ লক্ষ ভোল্ট চাপে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা হইতেছে।

পরলোকে লর্ড রাদারফোর্ড

গত ১৯শে অক্টোবর তারিখে ৬৬ বৎসর বয়সে লর্ড রাদারফোর্ডের মৃত্যু হইয়াছে। ৩০ বৎসরেরও অধিক রাদারফোর্ড বৈজ্ঞানিক-সমাজে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করা মাত্র কঠিন নহে, বোধ হয় অসম্ভব। গত পূজা-সংখ্যায় যখন আমরা রাদারফোর্ডের বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলাম তখন আমরা ভাবিতেও পারি নাই যে, তিনি এত হঠাৎ দেহত্যাগ করিবেন। আমরা আগামী ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনের সভাপতিরূপে তাঁহাকে দেখিবার আশা করিতেছিলাম।

বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সমস্ত জাগতিক ব্যাপারের নূতন রূপ ও নূতন দিক্ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন রাদারফোর্ড তাঁহাদের অন্যতম। বিজ্ঞান কংগ্রেসে, এক দ্রব্যের অন্য দ্রব্যে রূপান্তর সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা ছিল। বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁহার স্থান

পরমাণু ভাঙিবার যন্ত্রের দুইটি দৃশ্য:
মধ্যে যন্ত্রটির অবস্থান-গৃহ।
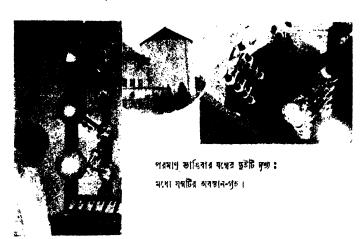
অধিকার করিবার জন্য সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ও গণিতবিদ্ স্যর জেমস্ জীনসকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। স্যর জেমস্ এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্ণেস্ট রাদারফোর্ডের জন্ম হয় ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নিউজিল্যাণ্ডে। তিনি নিউজিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. এস্‌-সি. পরীক্ষায় পাশ করিয়া স্কলারশিপ লইয়া ক্যাম্‌ব্রিজে পড়িতে আসেন এবং ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত গবেষণাগার ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে থাকেন। ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে ছাত্রাবস্থায় তিনি যে সকল গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহাতেই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ

করেন। ইহার পরে অধ্যাপকরূপে তিনি মন্ট্রিলের ম্যাক্‌গিল ও পরে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। শেষে তিনি ক্যাম্‌ব্রিজের পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্যাভেণ্ডিশ অধ্যাপক হন।

রাদারফোর্ডের খ্যাতির প্রধান কারণ তেজোবিকিরণ সম্বন্ধে গবেষণা। মাদাম্ ও পিয়ের ক্যুরির রেডিয়াম আবিষ্কারের পরে তেজোবিকিরণ সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও ততোধিক জল্পনা বৈজ্ঞানিক মহলে চলিতে থাকে। প্রথমে তেজোবিকিরক পদার্থ সমূহের স্বরূপ কি,তাহা বৈজ্ঞানিকদের অত্যন্ত চিন্তান্বিত করিয়া তুলে। রাদারফোর্ডের চেষ্টায় তেজোবিকিরণ ও এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থের আনুষঙ্গিক রূপান্তরের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেন। পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল

রাদারফোর্ড (১৮৭১-১৯৩৭)।

যে, প্রত্যেক মূল পদার্থই একটি বিশিষ্ট দ্রব্য, তাহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না,কিন্তু তেজোবিকিরণের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে বৈজ্ঞানিকেরা বাধ্য হন। রাদারফোর্ড দেখান যে, সমস্ত মূল পদার্থ মাত্র দুইটি মূল উপাদান ইলেকট্রন ও প্রোটন সাহায্যে গঠন করা যায়। (গত আশ্বিন-সংখ্যার 'বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক রূপকথা'য় এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে)। বস্তুতঃ রাদারফোর্ড ও তাঁহার শিষ্যবর্গের গবেষণায় আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের কাঠামো আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। রাদারফোর্ডের বহু শিষ্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। নীলস বোর, মোজলী, গাইগার, অ্যাসটন, ডারউইন, চ্যাড্‌উইক প্রভৃতি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ রাদারফোর্ডের শিষ্য।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নাইট উপাধি এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লর্ড উপাধি পান। তিনি 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন' এবং সুবিখ্যাত বিজ্ঞান পরিষদ 'রয়াল সোসাইটির' সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু পরিষদ ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নানাপ্রকার উপাধি ও সম্মান লাভ করেন। তিনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানতপস্বী রাদারফোর্ডের মৃত্যুতে আধুনিক বিজ্ঞানের যাহা ক্ষতি হইল তাহা সহজে পূরণ হইবে না।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের জুবিলি অধিবেশন এই বৎসর কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইবে। ইহাতে যোগদান করিবার জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক কলিকাতায় আসিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম দেওয়া হইল।

ডক্টর অ্যাস্টন্—ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক বেলি—লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়।
ডক্টর লিদিও চিপ্রিয়ানি—রয়্যাল বিশ্ববিদ্যালয়; ফ্লোরেন্স, ইতালী।
ডক্টর ক্রাউথার—রোহামষ্টেড পরীক্ষাগার, হার্পেনডেন।
অধ্যাপক এল্. এফ. দ্য বোফোর্ট—আম্‌ষ্টারডাম্।
অধ্যাপক এল্. ডিল্‌স্—বের্লিন।
অধ্যাপক ডনান্—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক এডিংটন—ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক আইক্‌ষ্টেট্—ব্রেস্‌লাউ।
স্যার লিউইস ফারমোর।
অধ্যাপক ফিশার—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক রাগ্‌লস্ গেট্‌স্—কিংস্ কলেজ, লণ্ডন।
অধ্যাপক লেনার্ড জোন্স—ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক য়ুঙ—ৎসুরিশ্ বিশ্ববিদ্যালয়।
অধ্যাপক ষ্ট্রাউব—মুন্‌শেন্ বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক আইন্‌ষ্টাইন্ শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারিবেন না এইরূপ জানাইয়াছেন।

বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকগণ ১৬ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে পৌঁছিবেন ও তথায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করা হইবে।

তৎপরে তাঁহারা হায়দ্রাবাদ, অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি, আগ্রা, দিল্লী, দেরাদুন, কাশী, টাটানগর, দার্জ্জিলিং, প্রাচীন গৌড়, পোর্ট ক্যানিং প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিবেন। ৩রা হইতে ৯ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলিবে। এই সময়ে সাধারণের জন্য সন্ধ্যা প্রায় ৬॥০ ঘটিকায় সেনেট হাউস বা টাউন হলে ৫টী বক্তৃতার আয়োজন হইবে। স্যার আর্থার এডিংটন "ছায়াপথ এবং তাহার পরপারে", সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অধ্যাপক এফ. এ. ই. ক্রু "মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক রহস্য" ও অধ্যাপক এচ. জে. ফ্লোর "সভ্যতার বিভিন্ন স্তর" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। ডক্টর অ্যাস্টন্‌ও সম্ভবতঃ একটি বক্তৃতা দিবেন। সভার অধিবেশনান্তে সকলেই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজ, কোলার স্বর্ণখনি, ব্যাঙ্গালোর ভ্রমণ করিয়া ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাই হইতে য়ুরোপ যাত্রা করিবেন।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম দিবস অধিবেশনের পর ১৩টি শাখায় বিভক্ত হইবে। অধিবেশনের সাধারণ সভাপতির পদ অধ্যাপক জীনস্ অলঙ্কৃত করিবেন। বিভিন্ন শাখার সভাপতি পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান—ডক্টর সি. ডব্লিউ. বি. নর্ম্যাণ্ড।
রসায়ন—অধ্যাপক এস. এস. ভাটনগর।
ভূতত্ত্ব—মিষ্টার ডি. এন. ওয়াদিয়া।
ভূগোল ও ভূমিতি—ডক্টর এম. এ. ফিরন।
উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব—অধ্যাপক বীরবল সাহনী।
প্রাণীতত্ত্ব—অধ্যাপক জি. মাথাই।
কীটতত্ত্ব—মিষ্টার এম. আফজল হোসেন।
নৃতত্ত্ব—ডক্টর বি. এস. গুহ।
কৃষিবিজ্ঞান—রাও বাহাদুর টি. এস. ভেঙ্কটরমণ।
চিকিৎসাবিজ্ঞান—স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।
পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান—স্যর আর্থার অল্‌ভার।
শারীরবিজ্ঞান—ডক্টর আর. এন. চোপরা।
মনোবিজ্ঞান—ডক্টর গিরিন্দ্রশেখর বসু।

শ্মশানে

—শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখেছ কি তুমি শ্মশানের মাঝে বহ্নিশিখা,
লক্ লক্ করি উঠিতেছে সদা ঊর্দ্ধ মুখে ;
—ভেবেছ কখন, কোথা রবে তব অট্টালিকা
স্পন্দন যবে সহসা থামিবে তোমার বুকে ?
শ্মশানের রূপ দেখিয়াছি আমি, তোমরা শোন,
সেথায় জ্বলিছে নিশি দিনমান—লেলিহ চিতা,
দিনের বেলায় শৃগাল হয়তো ফিরিছে কোন,
—অকালে সেথায় ঝরিছে কতই অপরাজিতা !
পার্শ্বে বহিয়া চলেছে গঙ্গা কল্লোলিয়া
ছল ছল তার ঢেউ এসে লাগে ঘাটের পারে,
সদ্য-বিধবা শ্বেত বাসখানি হস্তে নিয়া
হয়ত কাঁদিছে,—ঝরঝর তার অশ্রু ঝরে।
যদি যাও তুমি সেই সে বিজন শ্মশান-ভূমে,
দেখিবে সেথায় শকুনি উড়িছে মাথার 'পরে,
দেখিবে আকাশে ঘনায়েছে মেঘ চিতার ধূমে,
আর সে চিতায় আহুতি দিতেছে নারী ও নরে।
সেথায় নাচিছে জটাজাল মেলি পাগ্‌লা ভোলা
থাকি থাকি তার মরণ বিষাণ বাজিছে শুধু ;
—তীরের উপরে আছাড়ি পড়িছে ঢেউয়ের দোলা
বৈশাখী তাপে বিরাট শ্মশান করিছে ধূ ধূ !
রাজার কুমারী হয়ত আসিবে একদা প্রাতে
শ্মশানের মাঝে, ঘুমাতে বুঝি বা গভীর ঘুমে,
পথের ভিখারী শয্যা রচিবে তাহারি সাথে,
শিল্পী কবিরা নীরবে পুড়িবে শ্মশান-ভূমে !
নীরবে পুড়িবে বারাঙ্গনার ক্লিন্ন দেহ
বৈজ্ঞানিকের মস্তক হবে ভস্মীভূত,
—এ শ্মশান-ভূমে বড় ছোট আর নাহিক কেহ
বিপ্রের পাশে শয়ন লভিবে চামার-সুত !

*

* *

তোমরা দেখনি শ্মশানের মাঝে বহ্নিশিখা,
দেখনি কেমনে নাচিতেছে সদা পাগ্‌লা ভোলা,
—আপনার মনে তোমরা গড়িছ অট্টালিকা,
ভাবনি, কেমনে সহসা আসিবে মরণ-দোলা।

চিরপ্রবাসী

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

খাইতে বসিয়া যে কথাটি মনে হইয়াছিল, আফিসে আসিয়া সে কথাটি ভুলিতে পারিল না। বরং বারংবার কথাটি ঘুরিয়া ফিরিয়া ভ্রমর-গুঞ্জনের মতই সারাক্ষণ সমস্ত চিন্তার মাঝে গুণ গুণ করিতে লাগিল। কথাটি ভাবিতে বেশ এবং চিন্তাতেও আরাম। কর্ম্মক্লান্ত দেহ ও মনের উপর ক্ষণিকের জন্য আনন্দ-শিহরণ জাগাইয়া দেয়। লিখিতে লিখিতে এক সময় হাত হইতে কলমটি রাখিয়া, বিনয় সোজা হইয়া চেয়ারে বসিল।

কথাটি এই—কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিলে কেমন হয়।

এই কথাটি এক বৎসর পূর্ব্বেও মনে হয় নাই। মেসে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে দিন কাটিয়া যাইতেছিল, শুধু শনিবারটির জন্য ব্যাকুল প্রতীক্ষা। আজ খাইবার সময় বলাইবাবু যেন কাহাকে বলিতেছিলেন—"আর পারা যায় না। বয়স তো হচ্ছে—রোজ এই ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়ে শরীর টেঁকে না। [illegible] সারা জীবন যদি কাটালেম, একটু আনন্দই যদি না পেলাম, তবে ঘর-সংসারই বা কিসের জন্যে!"

পাশে হরেনবাবু সোৎসাহে কহিলেন, "যা বলেছ দাদা, জীবনই বৃথা। মেসের এই ডাঁটা-চচ্চড়ি খাও, আফিসে কলম পেশো, বড় বাবুর গালাগাল খাও, আর ফিরে এসে দেখো কড়িকাঠ। ভোর হতেই দেখ নকুল-দার এয়া ভুঁড়ি আর আধ হাত গোঁপ। এতে মেজাজ ঠিক থাকে—!"

নকুলবাবু শুধু মাত্র কটাক্ষ করিলেন। আহারের সময়টিতে কথা বলেন না। কিন্তু রাত্রে ইহার শোধ তুলিতে ভুলিবেন না।

বলাইবাবু খাইতে খাইতে কি যেন ভাবিতেছিলেন। খাওয়া শেষ করিয়া আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বলিলেন, "এই অল্প মাইনের কোন কিছু ভাবা যায় না—"

হরেনবাবু যেন ফাটিয়া পড়িলেন, "চলবে না? লোকে চালাচ্ছে না। তুমি পাও দেড় শ' টাকা। লোকে পঞ্চাশ টাকায় ছেলে-বউ নিয়ে কলকাতায় রয়েছে। এই তো আমার পিসতুতো শালা, সে মাইনে পায় পঞ্চাশ, কিন্তু তার চলছে না? দিব্যি তেতলার উপর একটা শোবার ঘর আর একটা রান্নাঘর। সামনে খোলাছাদ, গরম কালে তোফা শোয়া চলে। টবে আবার ফুলগাছ লাগিয়েছে—একটা ছোট-খাট বাগান বললেই হয়। আফিস থেকে এসে দুজনে দিব্যি চা খাচ্ছে, গল্প করছে। বেশ চমৎকার আছে। মন থাকলেই হয়; হবে না আবার—!"

কথাগুলি বিনয়ের মনে তোলপাড় করিতে লাগিল।

সত্যি আর ভাল লাগে না। প্রিয়জনের নিকট হইতে চিরকাল এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া কতদিন থাকিবে? হারানবাবু কথাই ঠিক। মেসের এই ডাঁটা-চচ্চড়ি খাইয়া মানুষ কতদিন বাঁচিতে পারে? আর তা ছাড়া, পৃথিবীর সমস্ত গোলমাল ও অশান্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিরালায় দুই প্রাণীর একটি ঘর, ইহা ভাবিতেও আরাম। তেতলার উপর একটি রান্নাঘর আর একটি শোবার ঘর, সামনে একখানি খোলাছাদ। সেখানে গোটা কতক ফুলের গাছ—এই বেলী, রজনীগন্ধা আর গোলাপ। আফিস্ হইতে ফিরিয়া সেই ছোট্ট বাগানে দুই জনে বসিবে—সে আর লাবণ্য! একখানি মাদুর পাতিবে, সামনে চায়ের সরঞ্জাম। দুই জনে বসিয়া বসিয়া গল্প করিবে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাকালে পাতলা ফুটফুটে জ্যোৎস্না দেখা দিবে। অগণ্য নক্ষত্রের মাঝে একখানি চাঁদ দেখা দিবে। মিষ্টি বাতাসের মাঝে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিয়া, লাবণ্যের কুঞ্চিত কেশ শাড়ীর আঁচলের উপর ছড়াইয়া পড়িবে।

বিনয় আফিস ভুলিয়া সব ভুলিয়া, একখানি মনোরম স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। মাদুরের উপর দুই জনে যেন কাত হইয়া শুইয়াছে। লাবণ্যর হাত ওর হাতে ধরা, পায়ের সহিত পায়ের খেলা চলিতেছে। গাছ হইতে বেলী ফুল তুলিয়া ওর চুলে গুঁজিয়া দিতেছে। ফুল গুঁজিয়া দিবার সময়, তাহার মাথাটি ওর বুকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়াছে। একটি হাত দিয়া লাবণ্যকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—ওর চুলে বেশ একটি মিষ্টি সুগন্ধ।

কিছুক্ষণ পর লাবণ্য কহিল, "এবার ছাড়, রাত হচ্ছে না ?"

সে কিন্তু ছাড়িল না। এক সময় জোর করিয়া ছাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে লাবণ্য উঠিয়া গেল। সে সেইখানে মাদুরের উপর শুইয়া পরিল। ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে, সাদা ধপ ধপে জ্যোৎস্না—ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় !

গায়ে হাত দিয়া সতীশবাবু কহিলেন, "কি হচ্ছে, মুখ-কমলের ধ্যান না কি ?"

সচকিত হইয়া বিনয় কলম চালাইতে থাকে। হঠাৎ তাহার মনে হয়—আচ্ছা, সতীশবাবু তাহার মনের কথা বুঝিলেন কি করিয়া ?

আফিসের শেষে বিনয় সতীশবাবুকে কহিল, "আচ্ছা, আপনি জানলেন কি করে ?"

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া সতীশবাবু কহিলেন, "কি সম্বন্ধে ?"

—"এই আমি যে তার কথা ভাবছিলাম।" হো হো করিয়া হাসিয়া সতীশবাবু কহিলেন, "দাদা ও সব আমরা জানতে পারি ; চিরকাল যারা বিদেশে পড়ে থাকে, তারা ঐ চিন্তাই করে থাকে। তা ছাড়া যাদের 'উনি' একবারে নোতুন, তারা মুখকমল চিন্তা ছাড়া আর কি করতে পারে। আমাদের ভাই সে সব বয়স গিয়েছে। এককালে সে সব 'রোমান্স' ছিল ; এখন ভাই লটারী-টিকিটের নম্বর স্বপ্ন দেখি।"

রাত্রে হারাণবাবুকে কথাটা বলিতেই, তিনি ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সব দিক বেশ করে ভেবে দেখেছ তো ? এতে সামান্য দুঃখ-কষ্টও আছে। সকালে উঠে বাজার করতে হবে, বিকেলে ফিরবার মুখে টুকিটাকি জিনিষপত্র কিনে আনতে হবে। বউয়ের অসুখ হলে নিজেকে রাঁধতে হবে। আমি তোমায় নিরুৎসাহ করছিনে।"

ইহাতে বিনয় থামিল না। ঘর-সংসার করিতে গেলে ছোটখাট দুঃখ-অশান্তিকে এড়াইয়া চলিলে চলিবে না। ও সব ভাবিলে কখনই বাসা কোনকালে হইয়া উঠিবে না। কিন্তু যে রঙিন তুলিকায় সে সোণার স্বপ্ন আঁকিয়াছে, তাহা তো হরেনবাবুকে বলা যায় না। সে টুকুর মূল্য কে দিবে ?

মেসের ম্যানেজার হইতেছেন যতীনবাবু। যতীনবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বিনয়বাবু, আপনি বোধ হয় শশাঙ্কবাবুর কথাটা ভুলে যান নি। একদিন তিনি আপনার মতই বাসা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন—শেষে বাসাও হল। দুচার মাস বেশ সুখে শান্তিতেই কাটতে লাগল। শেষে আজ বউয়ের অসুখ—কাল ছেলের অসুখ, নিত্য নানা হাঙ্গামা সুরু হল। নিজেকে বাজার করতে হয়েছে, রাঁধতে হয়েছে, উনুন ধরাতে হয়েছে, এই সব নানান্ ঝামেলা। তার উপর বউয়ের সঙ্গে দিনরাত খিটিমিটি লেগে গেল। রাত্রে বেড়িয়ে আসতে একটু দেরী হয়েছে, অমনি নানান্ জিজ্ঞাসা। কোথাও হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে রাত হয়েছে, অমনি বউয়ের জেরা। তারপর বাসা তুলে দিয়ে আবার যে-কে-সেই। তাই বলছি এমনটি যেন না হয়।"

হরেনবাবু কহিলেন, "শশাঙ্কবাবুর মত সকলের অবস্থা হবে, তার কি কোন মানে আছে ? না—বিনয়, যদি বাসা করার ইচ্ছা হয়ে থাকে—বাস্ করে ফেল।"

যতক্ষণ না ঘুম আসে, বিনয় কথাটা ভাল ভাবে ভাবিল। শেষে বাসা করাটাই স্থির হইল। এক বৎসর হইল, তাহার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু একদিনও লাবণ্যের সহিত ভাল ভাবে তাহার কথা হইল না। শনিবার বৈকালের ট্রেনে, নানা জনের নানা ফরমাস কিনিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ট্রেনে উঠে। রাত্রি আটটার সময় বাড়ীর ষ্টেসনে ট্রেণ থামিলে কোন মতে ক্লান্ত শরীর লইয়া বাড়ী পৌঁছায়। লুচী খাওয়ার পর ক্লান্ত চক্ষু আপনিই মুদিয়া আসে। কখন লাবণ্য আসিয়া বিছানায় ঘুমায় তাহা জানে না। ভোরে দেখে বিছানা খালি, লাবণ্য উঠিয়া গিয়াছে। সকাল, দুপুর, বৈকাল, গল্পে ও আড্ডায় কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় ইহার উহার ফরমাস্ কাগজে টুকিয়া লইতে হয়। শেষে অনেক রাত্রে সকলের খাওয়া শেষ হইলে লাবণ্য আসে, সামান্য দু একটি কথা হইবার পর কখন ঘুমাইয়া পড়ে, জানিতে পারে না। এমন করিয়া মাসের পর মাস চলিয়া যাইতেছে! তাহাদের জীবনের আনন্দময় সময়টুকু নানা কাজে ও অকাজে, নানা মিথ্যা কোলাহলের মধ্য দিয়া কোথায় যেন পলাইয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া যদি জীবনের এই সময়টুকু নষ্ট হইয়া যায়, তবে বাঁচিবার কি প্রয়োজন ? রূঢ় বাস্তব—রূঢ় সত্য

তো অপেক্ষা করিতেছে—তবুও আজ এই মধুর দিনগুলির স্বপ্নভরা ক্ষণের মাঝে সেই রূঢ় দিবসের ছায়া কেন আসিয়া পড়ে ?

এক সময় বিনয় ঘুমাইয়া পড়ে। আজ শুক্রবার, মাঝে মাত্র আর একটি দিন। বাড়ী যাইয়া বাবা-মার নিকট কি ভাবে কথাটী বলা যায়, ইহা চিন্তার বিষয়। সোজা-সুজি বলা সম্ভব নয়। আচ্ছা, পত্রে জানাইলে কেমন হয়! না, সে ভাল হইবে না। শনিবার রাত্রে খাইতে বসিয়া কথাটী তুলিতে হইবে। মায়ের অমত নিশ্চয়ই হইবে না।

শনিবার আসিল। নানা লোকে নানান্ জিনিষের ফরমাস দিল, কাহার উল, কাহার জুতা, কাহার বা কাপড়। বিনয় মায়ের জন্য একজোড়া কাপড় কিনিল—সেই সঙ্গে কিছু ভাল চা লইতেও ভুলিল না। জিনিষপত্র সব কেনা হইবার পর—হঠাৎ কি মনে হইতেই, একটি বেলফুলের মালা কিনিয়া, কলাপাতায় মুড়িয়া ছোট এট্যাচি-কেসে রাখিয়া দিল। বাসে উঠিয়া বসিয়া আপন মনেই বিনয় হাসিল। রাত্রে—মালাটী লাবণ্যের গলায় পরাইয়া দিবার সময় তাহার ঘন-পল্লব-ভারাতুর চঞ্চল নয়নদুটী কেমন উজ্জল হইবে—এই ভাবিয়া বিনয় খুসী হইয়া উঠিল—বিনয়ের দুই চোখে অফুরন্ত স্বপ্নের ছায়া ক্ষণে ক্ষণে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রে খাইবার সময় বিনয় কহিল, "মেসের যা ডাল—গলার ভেতর গেলে বমি আসে।" মা কহিলেন, "কেন ভাল, দেখে ঠাকুর রাখলেই হয়। সে তো আর মিনি পয়সায় কাজ করে না।"

—"কিন্তু মা হাজার পয়সাই দেওয়া হোক—তোমাদের মত কি রান্না করতে পারে। মাছের ঝোল যা রাঁধে—তাতে সাঁতার দেওয়া যায়। সে অতি বিশ্রী—না নুণ না ঝাল। শরীর আর টেঁকে না—"

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

—"এই যে সেদিন অসুখ হয়েছিল—ঠাকুর এমনি সাবু তৈরী করল, সে আর মুখে দেওয়া যায় না—"

—"অসুখ? কই লিখিস নি তো?"

"এমনি লিখলাম না—তোমরা আবার ভাববে।"

মা কহিলেন, "ম্যালেরিয়া জ্বর তো? তা আর হবে না, এ দেশের বাতাস যার গায়ে লেগেছে, তাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে না কি? কুইনিন একদিন অন্তর খাস—আর টক্ ভাজাভুজি এসব খাবি নে। আর আমাদেরও কি শরীর ভাল। আমার সেই বাতের ব্যথা—ওঁরও শরীর খারাপ। ছেলেপুলে সব জ্বরে সর্দ্দিতে খুন হয়ে গেল। ও বৌমা—চিনির কৌটোটা দিয়ে যাও। বৌমার শরীর ভাল নয়। বেয়াই মশায় এই মাসে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ মাসে আর হয় না—কে কাকে দেখে, এই সব অসুখ বিসুখ।"

বিনয় আহার শেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে আসিয়া জানালার কাছে চেয়ারটী টানিয়া বসিয়া পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল। মায়ের মনের কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। বৌমা না থাকিলে সংসার অচল। কিন্তু মা তাহার ব্যথা বুঝিল না। কেন, পিসিমাকে আনিয়া রাখিলেই তো হয়। সংসারের সকল ভার তিনিই লইতে পারেন।

বিনয় আর সে দিন ঘুমাইয়া পড়িল না। লাবণ্যের সহিত একটি পরামর্শ করিতেই হইবে। সংসারের সকল কাজ শেষ হইলে লাবণ্য আসিয়া ঘরে দাঁড়াইল।

বাহিরে সুন্দর জ্যোৎস্না, আর মিষ্টি বাতাস।

এক হাত দিয়া লাবণ্যকে বেষ্টন করিয়া কহিল, "কাজ শেষ হল?"

হাসিয়া লাবণ্য বলিল, "হল, রাত্রের মতন।"

বিনয় দুই হাত দিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া কহিল, "তোমার জন্যে একটা জিনিষ এনেছি।

—"কি?"

—"আচ্ছা বল তো কি? তবে বুঝব।"

লাবণ্য ছেলেমানুষের মত আধ আধ ভাবে কহিল, "বা রে তা আমি কি জানি। আচ্ছা দাঁড়াও বলছি। বলব? একটা হাতী—"

লাবণ্য নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিল। বিনয় চকিতের মধ্যে পকেট হইতে মালাগাছটি বাহির করিয়া তাহার গলায় পরাইয়া কহিল, "এই দেখ।"

লাবণ্য চকিত হইয়া কহিল, "ও হরি, মালা! আমি ভাবলাম কি জানি কি হবে—তা বেলফুল তো বাগানে আছে। কলকাতা হতে বয়ে আনার দরকার কি?"

—"কি জন্যে?" বিনয়ের মুখ একটু ম্লান। "সাধ হল তাই নিয়ে এলাম—"

কি যেন ভাবিয়া লাবণ্য বলিল, "আচ্ছা এর দাম কত?"

তাচ্ছিল্য সহকারে বিনয় কহিল, "কত আর? আনা চারেক।"

সবিস্ময়ে লাবণ্য বলিল, "চার আনা! অনর্থক চার আনা পয়সা নষ্ট!"

বিনয় চুপ করিল। কোন কথা কহিল না।

—"কি, চুপ করে রইলে যে—রাগ হল না কি?"

বিনয় তথাপি কথা কহিল না। বিনয়ের নিকট হইতে সরিয়া যাইয়া কুঁজো হইতে জল ঢালিতে ঢালিতে লাবণ্য কহিল, "কি জানি বাপু—কিসে যে এত রাগ। কি? সারা রাত বসে থাকবে না কি? ঘুমুবে না?"

বিনয়ের মনে হইল, সমস্ত সুর কাটিয়া যেন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সুন্দর জ্যোৎস্নার উপর কোথা হইতে, এক-রাশ কাল মেঘ আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া অন্ধকার করিয়া দিল। ইহার মধ্যে লাবণ্য শুইয়া পড়িয়াছে—তাহারই এক পাশে বিনয় শুইয়া পড়িল।

জানালা দিয়া সুন্দর জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িতেছে। সেই দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, এক সময় সে দেখিল, লাবণ্য ঘুমাইতেছে। এক ঝলক জ্যোৎস্না লাবণ্যের মুখে পড়িয়াছে—মুখটি বড় করুণ—কতকগুলি চুল কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—ঘন-পল্লব-ভারাতুর আঁখি দুটি মুদিত।

বিনয় তাহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকাইয়া রহিল। অবশেষে হাত দিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইয়া কহিল, "শুনছ, ওগো শুনছ? কলকাতায় বাসা করতে চাই, তোমার কি মত?"

ঘুমের মাঝে একবার মৃদু শব্দ করিয়া, লাবণ্য পাশ ফিরিয়া শুইল। অগত্যা বিনয়ও ঘুমাইবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

রবিবার রাত্রে বিনয় লাবণ্যকে বাসার কথা বলিল।

সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া লাবণ্য কহিল, "বাসা? কোথায়, কলকাতায়? চালাবে কি করে?"

বিনয় ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "সে ভাবনা ভাবতে হবে না।"

লাবণ্য কহিল, "কিন্তু বাসা করলে তো বড় বাড়ী চাই। সেখানে ভাড়া শুনতে পাই তো অনেক।"

বিনয় পরিহাস করিয়া কহিল, "কেন, ছোট বাসায় তোমায় ধরবে না না কি?"

—"বা রে, সকলের জায়গা ছোট বাসায় হবে কি করে?"

হতাশ হইয়া বিনয় কহিল, "না-না, শুধু তুমি আর আমি—"

লাবণ্য অবাক হইয়া কহিল, "কেন বাবা, মা, ঠাকুরপো?"

—"না, মা, বুঝতে পারলে না—বাবা, মা, বাড়ীতেই থাকবেন। আমি মাঝে মাঝে এখানে আসব। পিসিমাকে এনে রাখলেই হবে।"

লাবণ্য চিন্তিত হইয়া কহিল, "যা ইচ্ছে কর। কিন্তু বাবাকে মাকে বলেছ?"

বিনয় কহিল, "বাবাকে বলি নি, তবে মাকে এক রকম বলেছি।"

বিনয় কলিকাতায় আসিয়া বাসা খুঁজিতে লাগিল। যেমনটি মনে মনে ভাবিয়াছে, ঠিক তেমনটি তাহার দরকার। তেতলার উপর রান্নাঘর, শোবার ঘর, আর সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা খোলাছাদ, এ তাহার চাই। আর কোন লোক থাকিলে চলিবে না—দুই প্রাণীতে নীড় বাঁধিবে! তাহারা গান করিবে, হাসিবে, গল্প করিবে। কোনরূপ বাধা থাকিবে না বা তৃতীয় ব্যক্তির জন্য অশান্তি উপভোগ করিতে হইবে না। বিনয় নূতন সংসারের একটা ফর্দ্দ পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছে। একখানি দৈনিক বাংলা কাগজও কিনিতে হইবে—দুপুরে কাগজ লইয়া লাবণ্য কাটাইয়া দিবে।

এখানে ওখানে অনেকগুলি বাড়ী দেখা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনটির ভাড়া বেশী, কিংবা ঠিক মনোমত হয় না। যাই হোক, অনেক চেষ্টার পর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে গলির মধ্যে একটি বাসার সন্ধান পাওয়া গেল। মেসের হরেনবাবু একটি বাসার সন্ধান দিলেন। ভাড়া অল্প, আর যেমনটী সে চাহিয়া-ছিল, হুবহু তেমনি। দোতলায় হরেনবাবুর এক আত্মীয় থাকেন। সব দিক দিয়া ইহাই ভাল। লাবণ্যর দুপুর বেলাটী ভালভাবেই কাটিয়া যাইবে।

শনিবার আসিতে আর মাত্র দুটী দিন। সে দিন আফিস হইতে আসিয়া দেখিল, তাহার নামে একখানি চিঠি। চিঠি লাবণ্য দিয়াছে। জামা-কাপড় না ছাড়িয়া চিঠি লইয়া বারান্দায় আসিতেই যতীনবাবু কহিলেন, "এঃ, খামের চিঠি দেখছি—শ্রীমতীর বুঝি? বেশ আছ দাদা।"

মৃদু হাসিয়া বিনয় পত্র খুলিল—

শ্রীচরণেষু:—

তোমার কলকাতা যাবার পর দিন হতে বাবার অসুখ হয়েছে। মায়ের বাতের ব্যথাও খুব বেড়েছে। এ শনিবারে আসবার সময় অবশ্য করে কিছু আঙুর আর বেদানা নিয়ে আসবে। ঠাকুরপোর পায়ের মাপ পাঠাইলাম। এক জোড়া জুতো অবশ্য আনবে—ছেঁড়া জুতো পড়ে স্কুলে যেতে পারে না। বাজে খরচ সব বাদ দিও। কলকাতায় বাসা করা হবে না। মা, বাবাকে এখানে ফেলে কোন্ লজ্জায় কলকাতায় যাব? মা সে দিন বাবাকে তোমার বাসার কথা বলেছিলেন। ছিঃ, আমি লজ্জায় মরে যাই। প্রণাম নিও।

ইতি লাবণ্য।

বিনয় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে তাকাইল। তার পর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে তক্তাপোষটীর উপর বসিয়া জুতো খুলিতে খুলিতে হাঁক দিল, "ঠাকুর এক গ্লাস জল দাও।"

আলোচনা

"প্রাক-চৈতন্যযুগের বাংলার ভক্তিধর্ম্ম"

শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় পূর্ব্বোক্ত শীর্ষক এক প্রবন্ধ বিগত আশ্বিন মাসের বঙ্গশ্রী পত্রিকায় লিখিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ প্রবন্ধে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী সম্বন্ধে বহুকথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার প্রভাব এবং তচ্ছিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর কুলীনগ্রামের উপর প্রভাব অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কয়েকটি কথা আলোচিত হইয়াছে।

মাধবেন্দ্র পুরীর পরিচয় সম্বন্ধে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই, তবে তিনি যে বাঙ্গালী, তাহা শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিতটে শ্রীগোপাল মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বঙ্গীয় পূজক আনয়নের ব্যাপারেই অনুমিত হয়। আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ শ্রীআশুতোষ হাটী মহোদয় বলেন যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় পুরীপাদকে শ্রীহট্ট জেলার পুর্ণিপাট নামক গ্রামের অধিবাসী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

তাহা অসম্ভব নহে, তবে এ কথাও সত্য যে, নিশ্চয়ই তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বেই শ্রীহট্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গের কোনও স্থানে গঙ্গাতীরে, খুব সম্ভবতঃ শ্রীল শিষ্য ঈশ্বরপুরীরই আবাসের সান্নিধ্যে কোনও স্থানে বসতি স্থাপন করেন; পশ্চিমবঙ্গের উপর তাঁহার প্রভাব হইতে এটা অনুমান করা যায়।

সম্প্রতি (১৩৪১ সালে) আমি একখানি চারিশত বৎসরের পুরাতন বৈষ্ণব গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে অনেক রহস্যের উপর আলোকসম্পাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরী সম্বন্ধেও নূতন তথ্য উহাতে আছে, তাহা লিপিবদ্ধ করাই এই প্রবন্ধলিখনের উদ্দেশ্য। তৎপূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে।

গ্রন্থের নাম "সিতাগুণকদম্ব" এবং গ্রন্থকার শ্রীবিষ্ণুদাস আচার্য্য। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের দুই স্থানে এই বিষ্ণুদাসের নাম আছে, (১ম) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শাখাবর্ণন প্রসঙ্গে, (২য়) শ্রীক্ষেত্রে রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যদেবের নর্ত্তনপ্রসঙ্গে। শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় স্ব-সম্পাদিত চরিতামৃতের পাদটীকায় এই বিষ্ণুদাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং মাণিক্যডিহি (নদীয়া) নামক স্থানের গোস্বামিগণ ইঁহারই বংশধর। কালনা হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীমদনগোপাল গোস্বামিপ্রমুখ পঞ্চজন পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত চরিতামৃতের পাদটীকায়ও অনুরূপ কথাই লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া, গোবিন্দদাসের করচা, কবি কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস এবং প্রেমবিলাসেও এই বিষ্ণুদাসের উল্লেখ আছে। আমি উক্ত গ্রন্থখানি বিষ্ণুদাসের বংশধর মাণিক্যডিহির গোস্বামি-প্রভুদিগের গৃহ হইতেই আবিষ্কার করিয়াছি।

গ্রন্থখানি পুঁথির আকারে ৩০ পাতা বা ষাইট পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উহাতে ৭টী অধ্যায় আছে। বহু স্থানে সংস্কৃত শ্লোক প্রদত্ত হইয়াছে। সেগুলি সবই লিপিকার প্রমাদে পরিপূর্ণ। বিদগ্ধমাধব হইতে গৃহীত ৫টী এবং শ্রীমদ্ভাগবত হইতে উদ্ধৃত ২টী শ্লোকের পাঠোদ্ধার করিয়াছি। বাকীগুলির পাঠোদ্ধার এখনও করিতে পারি নাই। বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের পাঠোদ্ধার বহুকষ্টেই করিয়াছি, তবে একস্থানে অর্দ্ধপঙ্ক্তি একেবারে মুছিয়া যাওয়ায় তাহার আর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার অদ্বৈত-গৃহিণী সিতাদেবীর বিবরণ দিয়াছেন। "সিতা" শব্দে সর্ব্বত্রই হ্রস্ব ইকার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তাহার কারণও গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন—

"ভাদ্রমাসে সিতপক্ষে জন্মচতুর্দ্দশীতে
সেই হেতু সিতা নাম বিদিত জগতে"

গ্রন্থকার গ্রন্থখানি লিখিতে ১৪৪৩ শকে অদ্বৈতাচার্য্যের জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হন। গ্রন্থ অবশ্য পরে লেখা হইয়াছিল, কারণ, ১৪৫৪ শকে রচিত বিদগ্ধমাধবের শ্লোক উহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় বিদগ্ধমাধবের উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত। প্রথম অধ্যায়ের স্থানে স্থানে বিদগ্ধ-মাধবের মর্ম্মানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে। তা ছাড়া ১৪৫৫ শকের শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের বর্ণনাও উহাতে রহিয়াছে।

লোচনদাস ঠাকুর মহাশয় স্বীয় চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে এই গ্রন্থের কিছু অংশ লইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকারের উপরও এই গ্রন্থের প্রভাব দেখা যায় এবং তাহা হওয়াও বিচিত্র নহে, কারণ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের বাসস্থান ঝামটপুর এই গ্রন্থকারের শেষ বসতিস্থান মাণিক্যডিহি হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে, আর লোচনের লীলানিকেতন শ্রীখণ্ডও এ স্থান হইতে ১০।১২ মাইলের অধিক নহে। তা ছাড়া এই গ্রন্থকার যে শ্রীখণ্ডে গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 'নরোত্তম বিলাস' হইতে পাওয়া যায়।

আসল গ্রন্থখানি বহুচেষ্টা করিয়াও পাইলাম না। যাহা পাইলাম, তাহা বাংলা ১১৯৬ সালের ৫ই ভাদ্র তারিখে বৃহস্পতিবারে দুর্গাপুর নিবাসী শ্রীগোরাচাঁদ শর্ম্মা কর্তৃক লিপিবদ্ধ এক নকল পুঁথি। নকল হইলেও ১৪৮ বৎসর পূর্ব্বের নকল; উহাতে যে সকল নূতন তথ্য আছে, তাহার বিবরণ দিয়া আমি ১৩৪২, ১৩৪৩ ও ১৩৪৪ সালে "হিন্দু" নামক সাপ্তাহিকে কয়েকটী প্রবন্ধ লিখি।

প্রবন্ধগুলির নাম—(১) বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (২) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণ ও বৈষ্ণব সমাজে মতভেদ (৩) বিষ্ণুদাস আচার্য্য (৪) শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী (৫) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব, এবং (৬) বঙ্গালী ও নন্দিনী।

এতদ্ব্যতীত (৭) বংশাবলী নির্ণয় নামক প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকার আফিসে পাঠাইয়াছি—এখনও ছাপা হয় নাই। আর (৮) ঈশান নাগর শীর্ষক প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহা পুনরায় লিখিতে হইবে।

১৩৪১ সালে ঐ গ্রন্থের এক নকল আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়কে দিই। তিনি ঐ গ্রন্থের প্রশংসা করেন। তারপর ১৩৪৩ সালে সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ গ্রন্থের এক নকল লইয়া গ্রন্থখানি আমায় প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, প্রসিদ্ধ ভাগবত-বক্তা শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী, বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের সঙ্গে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি এবং ঐ গ্রন্থপ্রাপ্তির কথা পত্রযোগে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সিংহ ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়দ্বয়কে জানাইয়াছি।

ঐ গ্রন্থে গ্রন্থকার বিষ্ণুদাস অদ্বৈতাচার্য্যের গঙ্গাতীরে আগমন উপলক্ষে যে আত্মবিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই প্রকার :—

"তবে কতোদিনে গোসাঞি আইলা গঙ্গাতীরে
উপনীত হৈল আসি মাধবেন্দ্র ঘরে।
বিষ্ণুপুরে মাধবেন্দ্র আচার্য্য আলয়।
বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাঁহার তনয়।
কুলিয়ার নিকটেতে বিষ্ণুপুর গ্রাম
পূর্ব্বে সপ্তমুনি যাঁহা করিলা বিশ্রাম।"

প্রথমেই দেখা যাউক, এ কোন্ কুলিয়া। বৈষ্ণব সাহিত্যে ২টী কুলিয়ার উল্লেখ আছে (১) কোলদ্বীপ কুলিয়া—প্রাচীন নবদ্বীপের সন্নিকটে, আর (২) কাঁচড়া পাড়ার (কাঞ্চন পল্লী সেনশিবানন্দের আবাসস্থান) সন্নিকটে অনতিদূরেই কুমারহট্ট যেখানে শ্রীল ঈশ্বর পুরী এবং শ্রীরাম পণ্ডিতের আবাস ছিল। পয়ারের শেষ পঙ্‌ক্তি "পূর্ব্বে সপ্তমুনি যাঁহা করিলা বিশ্রাম" কোন্ কুলিয়া তাহা বলিয়া দিতেছে। কেন না—ভক্তিরত্নাকরে সপ্তঋষির প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—

"গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে
দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেই স্থানে।
যত্র স্থিতি তাহা অতি প্রসিদ্ধ আছয়
সপ্তঋষি ঘাট বলি অদ্যাপিও কয়।"

সুতরাং বুঝা গেল যে, কুমারহট্ট ও কাঁচড়াপাড়া কুলিয়ার সমীপে গঙ্গাতীরে বিষ্ণুপুর নামক গ্রামে সপ্তমুনি বিশ্রাম করিয়াছিলেন এবং ঐ বিষ্ণুপুরেই বিষ্ণুদাসের পিতা মাধবেন্দ্র আচার্য্যের বাড়ীতে অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীহট্ট হইতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে, কুমারহট্ট ও কুলিয়ার নিকটে গঙ্গাতীরে ঐ বিষ্ণুপুর গ্রাম এখনও রহিয়াছে।

অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই, কে এই মাধবেন্দ্র আচার্য্য? বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত-পুত্র মাধব আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ-জামাতা মাধবাচার্য্য, শ্রীগদাধর-জনক মাধব মিশ্র প্রভৃতি কয়েকজন "মাধবের" নাম পাওয়া যায়, কিন্তু মাধবেন্দ্র আচার্য্য নামে কোনও প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অথচ গ্রন্থকার "বুদ্ধিহীন মূঢ় আমি যাঁহার তনয়" বলিয়া যে ভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পিতা মাধবেন্দ্র আচার্য্য যে প্রখ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। এই মাধবেন্দ্র আচার্য্যের বাড়ীতেই অদ্বৈত আচার্য্য আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইঁহার গৃহের সমীপে কুমারহট্টে শ্রীঈশ্বর পুরী বাস করিতেন। আমরা জানি, অদ্বৈতাচার্য্য ও ঈশ্বর পুরী উঁহারা উভয়েই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ইহা হইতেই আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, উক্ত মাধবেন্দ্র আচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরী ভিন্ন আর কেহই নহেন। তিনি স্বীয় পুত্রকে অদ্বৈতের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন এবং পরে অদ্বৈত-পত্নী সিতাদেবী বিষ্ণুদাসকে দীক্ষা দেন। গুরুপুত্রকে দীক্ষাদান বৈষ্ণব-শাস্ত্রে নূতন নহে। আচার্য্য রামানুজ স্বীয় গুরু-পুত্র সৌম্য নারায়ণকে দীক্ষা দেন। চরিতামৃতেও দেখা যায় :—

"কি বা বিপ্র কি বা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়,
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"

আর বোধহয় গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীবর্গ সে কালে জ্ঞান ও বিদ্যাবত্তার জন্য আচার্য্য বলিয়াই পরিচিত হইতেন এবং এই জন্যই ভক্তমাল গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় মধুসূদন আচার্য্য নামে উল্লিখিত হইয়াছেন।

সম্প্রতি বিমানবাবুর প্রবন্ধ পড়িয়া আমার অনুমান আরও সুদৃঢ় হইয়াছে। পুরী উপাধিধারী ব্যক্তিও যে গৃহী হইতে পারে, তাহা তিনি অদ্বৈতের পূর্ব্বপুরুষ সাকুতিনাথ পুরীর উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং প্রাণতোষিণী তন্ত্রের বচন—

"জ্ঞাততত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতিঃ
পরব্রহ্ম পদে নিত্যং পুরি নামা স উচ্যতে,"

উল্লেখ করিয়া যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধিই যে পুরী হইতে পারে, তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মাধবেন্দ্র পুরী আদৌ গৃহস্থ ছিলেন এবং তিনিই বিষ্ণুদাস আচার্য্যের জনক। তাঁহারই গৃহে অদ্বৈতাচার্য্য আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই আবাসস্থলীর সন্নিকটে তাঁহার শিষ্য ঈশ্বর পুরী বাস করিতেন।

"সিতাগুণকদম্বে" দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুর হইতে অদ্বৈতাচার্য্য ভাগবত ধর্ম্ম প্রচার করিতে শান্তিপুর যান এবং তথাকার বিদ্বৎ-সমাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় বসতি স্থাপন করেন। এখানে সিতাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুকাল তাঁহার গৃহে থাকিয়া মদন গোপালের সেবাদি করিতেন এবং পরে সিতাদেবীর আদেশে কুলীনগ্রামে গিয়া বাস করেন এবং রামানন্দ বসুর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হন।

এইবার বিমানবাবু যে কুলীনগ্রামের মালাধর বসুর উপর শ্রীল ঈশ্বর পুরীর প্রভাবের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কারণও কতকটা বুঝা যাইতেছে।

বিষ্ণুদাস পরে শ্রীক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে কিছু দিন থাকিয়া গৃহে আগমন করেন এবং গোবিন্দের সেবা প্রকট করেন। মদন-গোপালের অনুকরণে তিনি ঐ মূর্ত্তির নাম নবনী-গোপাল রাখেন এবং ঐ মূর্ত্তি এখনও তাঁহার বংশধরগণের গৃহে পূজিত হইতেছেন।

—শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী

বাঙ্গালীর জীবিকা ও অর্থ-সমস্যা

—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

বাঙ্গালীর জীবিকা ও অর্থ-সমস্যা আজ নিদারুণ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে একটি বিশেষ জেলায় এই সমস্যা কি প্রকারে দেখা দিয়াছে, তাহার আলোচনা হইতেই ব্যাপক ভাবে বাঙ্গালা দেশের এই সমস্যার রূপ পরিস্ফুট হইতে পারে, এই ভরসা করিয়া নোয়াখালী জিলার সম্বন্ধে এই সমস্যান্তর্গত আলোচনা এখানে উপস্থিত করা হইল।

নোয়াখালী জেলার অবস্থা ও অবস্থিতি সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে (কার্ত্তিক সংখ্যা দ্রষ্টব্য) আলোচনার একটি আভাস দেওয়া হইয়াছিল। উহাকেই পরিস্ফুট করিবার জন্য এই প্রবন্ধে আরও কিছু বিষয়-বস্তু ও আলোচনার অবতারণা করা হইলেও, যে-সমস্যার কথা ইহার মুখ্য আলোচ্য, তাহার ইঙ্গিত আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই দিয়াছি।

অর্থ ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ ও বিনিময়ের ব্যাপারে নোয়াখালী জেলার অধিবাসিগণ শ্রম-শিল্পী, ব্যবসায়ী, আর্ফিসিয়ানা, চাকুরীজীবী, দিন-মজুর, রাজস্ব-গ্রহণকারী ও কৃষিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত থাকিয়া গ্রাসাচ্ছাদনের উদ্যোগ করিয়া থাকে।

উপরোক্ত শাখাভুক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের কিছু না কিছু ভূমি-স্বত্ব আছে। যাহারা দিনমজুরের দলে, তাহাদের অতিরিক্ত ভূমি না থাকিলেও অন্ততঃ স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকিবার মত গৃহোপযোগী সামান্য কিছু নিজস্ব ভূমি আছে। ইহা ছাড়া আর একটি শ্রেণী আছে – তাহাদিগকে নিঃসম্বল, গৃহহীন ও ভূমিহীন দিন-ভিখারী বলা চলে। তাহারা সারাদিন ভিক্ষা করিয়া কিছু সংগ্রহ করে ও অনির্দ্দিষ্ট অথবা যে কোন নির্দ্দিষ্ট পরাশ্রয়ে সাময়িক আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে।

ভিক্ষুক বংশ

এই ভিখারী-শ্রেণী নিতান্ত কম নহে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের সরকারী বিবরণীতে দেখা যায়, তখন নোয়াখালীতে ভিখারীসংখ্যা ছিল সতের হাজার। আশঙ্কা করা যায়, এই কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভিখারীসংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ভিখারীদের অধিকাংশই দিন-মজুর শ্রেণীর বেকারদল। মজুরশ্রেণীর লোক-সংখ্যা যখন বাড়িয়া যায় ও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ মজুরী জুটিয়া উঠে না, তখনই গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে এই পথকে অধিকতর উপযোগী মনে করিয়া তাহারা ভিক্ষায় বাহির হয়। আবার যে সকল দিন-মজুর ও শ্রমিকশ্রেণীর লোক নদীসন্নিহিত উপকূল-ভূভাগে বাস করে, তীরভূমির ভাঙনের সময় তাহাদের বাসের ভূমিটুকুও যখন নদীগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই নদী-ভাঙা সর্ব্বহারার দল বাহির হয় ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া।

দিন-মজুর শ্রেণীর লোকের চিত্ত-বিকাশের সুযোগ-সুবিধা নাই। একে তো তাহারা মানুষের সীমায় অতি নগণ্য ; তাহার উপরে যখন তাহারা একেবারে নিঃস্ব ও গৃহহারা হয়, তখন তাহারা যে মনোবৃত্তিতে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে থাকে, উহা দেখিলে তাহাদিগকে মানবীয় বৃত্তির বহির্ভূত বলিয়াই মনে হয়। সঙ্কটপূর্ণ জীবিকার দায়কালে আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আত্মসম্মানের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া এই শ্রেণীর লোক দ্বারা সাধারণতঃ এই ভাবে কেবল লোকসংখ্যা বৃদ্ধিকর একটা ক্রমবর্দ্ধমান ভিক্ষুকবংশ স্থাপনার সহায়তা ব্যতীত দেশের আর কোন উপকার সাধিত হয় না।

স্বাস্থ্য-সংস্থান

স্বাস্থ্য-বিভাগীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ জনসাধারণের স্বাস্থ্য-উন্নয়নের জন্য নানা রকম কল্যাণ কামনা করিতেছেন। আমাদের দেশের প্রত্যেক লোকের দৈহিক গঠন ও উপযুক্ত স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের জন্য সাধারণ ভাবে অনাড়ম্বর খাদ্য-গ্রহণের উপযোগী নিয়মাবলী-সম্বলিত উপদেশপূর্ণ বর্ণনাপত্রও প্রচারিত হইয়াছে। তদনুযায়ী দেখা যায়, প্রত্যেক লোকের প্রত্যহ দুই বেলাতে খাওয়া উচিত, লাল আটা ছয়

ছটাক, ঢেঁকিছাটা চাউল এক পোয়া, ডাল দুই ছটাক, তরকারী ছয় ছটাক, সরিষার তৈল অর্দ্ধ ছটাক, গুড় প্রায় দুই তোলা, মাছ আধ পোয়া, দুধ আধ পোয়া, লবণ অর্দ্ধ ছটাক, লেবু যথা প্রয়োজন। ইহাই হইল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যকীয় খাদ্য-তালিকা।

নোয়াখালীর বর্ত্তমান বাজার-দর হিসাবে এই পরিমাণ সামগ্রীর সম্যক্ মূল্য মোটামুটি সতের পয়সা ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায়, প্রত্যেক লোকের একান্ত আবশ্যক খাদ্যবস্তুর জন্য প্রতি বৎসরে প্রায় ৯৬৲ টাকা খরচের দরকার। ইহার উপরে ফল-ফলারি খাওয়ারও না কি প্রয়োজন আছে। স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, মোটামুটি আহার্য্যের দিকে আবশ্যকীয় খরচের ইহাও একটা দিক্।

তাহার পরে সাদাসিধা ধরণে সামান্য ভদ্রভাবে থাকিতে হইলেও কিছু পোষাক-পরিচ্ছদেরও আবশ্যক। ঐ দিক দিয়া এক জন লোকের এক বৎসরের জন্য অন্ততঃ কাপড় পাঁচ খানি, গামছা দুই খানি, গেঞ্জি বা ফতুয়া দুইটি, জুতা এক জোড়া ও র‍্যাফার এক খানি দরকার। খুব কম করিয়া মূল্য ধরিলেও এই সকল সামগ্রী ক্রয় করিতে এগার টাকার কম কিছুতেই পড়ে না। তাহা হইলে শুধু খাদ্য ও পরিধান বাবদেই বার্ষিক জনপিছু মোটামুটি ১০৭৲ টাকা খরচের হিসাব দেখা যাইতেছে। ইহার উপরে আছে বিছানার সরঞ্জাম আদি। এ দিকে ঘর করিয়া বাস করিতে গেলে গৃহ, আসবাব পত্র, থালা বাসনাদি বিবিধ তৈজসপত্র না হইলেও চলে না। তারপরে সমাজে বাস করিতে গেলে পূজা-পার্ব্বণ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও উৎসবাদির বিচিত্র রকম খরচ খরচারও দায় আছে। সরকারী রাজস্ব, ভূস্বামীর প্রাপ্য, জলকর, পথকর, আয়কর, পুলিশ, চৌকীদারী টেক্স, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ডাক ও বিচার বিভাগীয় বিচিত্র খরচের সূত্রও আছে। মোটের উপরে খাওয়া, পরা, বাস করা ও চলাফেরা সংক্রান্ত উপাদান সংগ্রহের ও উৎপাদনের হাজার রকম অত্যাবশ্যক প্রয়োজনে অর্থের কত দরকার, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

এই নিত্য-প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কুলান হইয়া যদি অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে, তবেই মানুষের মনে বিচিত্র ভোগ-বিলাসপূর্ণ অপরিমিত ব্যয়বাহুল্যের চিন্তা বা কল্পনা আসিলেও আসিতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের অনটন থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিলাসভোগের সুযোগ বা অবকাশ কোথায়? যেখানে পরিমিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে পাওয়াই অবস্থার দুর্বিপাকে দুর্ঘট, সেখানে বিলাস তো দূরের কথা, সামান্য আনন্দ কিংবা শান্তিও মানব-মনে থাকিতে পারে না। আবার বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মানুষকে সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া শান্তির সহিত সমাজ-জীবন যাপন করিয়া বসবাস করিতে হইলে শুধু খাওয়া ও পরার খরচ হিসাব করিয়াই পরিমিত প্রয়োজনীয়তার অঙ্ক সমাধান করিলে চলে না। এই নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ পাইবার জন্যই অভাবের তাড়নায় মানুষ সর্ব্বত্র আজ অশান্ত ভাবে নানা অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে—নোয়াখালীও তাহা হইতে বাদ পড়ে নাই।

আর্থিক সঙ্কট আজকাল নোয়াখালী জেলার জনসাধারণের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই বিকট রূপে দেখা দিয়াছে। নিম্নে একটু হিসাবের অঙ্কপাত করিয়া বিষয়টি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা যাক। শুধু অত্যাবশ্যক খাদ্য ও পরিধেয় বাবদ প্রত্যেক লোকের বার্ষিক মোটামুটি ১০৭৲ টাকা খরচের হিসাব ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আয়-ব্যয়

নোয়াখালী জেলার লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৯ শত। এই সমগ্র লোকসংখ্যাকে মানুষের স্তরে দেখাইতে হইলে খাওয়া-পরার দিক দিয়া উপরের প্রাথমিক স্তরের হিসাব সকলের জন্যই প্রযোজ্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। সেই হিসাবে দেখা যায়, নোয়াখালীতে খাদ্য ও পরিধেয় বাবদে বার্ষিক মোটামুটি খরচ করা দরকার ১৮ কোটি ২৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৯ শত। অন্য বহুবিধ খরচের হিসাব না করিয়া ইহার সহিত কেবল মাত্র বার্ষিক ভূমি-রাজস্বটা (১৯১৭ সনের সরকারী বিবরণী অনুসারে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৩ শত ৬৫ টাকা) যোগ দিয়া সাধারণ ভাবে আমরা দেখিতে পাই, হিসাবের অঙ্ক মোট ১৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৮১ হাজার ২ শত ৯৮ টাকায় গিয়া দাঁড়ায়।

ব্যয়ের কথা বলা হইল, এইবার আয়ের কথা বলা যাক।

নোয়াখালী জেলাতে ধান, ডাল, তিল, তিসি, সরিষা, তরকারী, পাট, ইক্ষু, ও তুলা প্রভৃতির চাষ হয়। অর্থের হিসাবে উহা হইতে প্রতি বৎসরে মোট ৭ কোটি ৪১ লক্ষ ৬৬ হাজার ১ শত ৩৪ টাকা অধিবাসীর হাতে আসে (Commercial Museum chart)। পূর্ব্ববর্ণিত ব্যয়ের হিসাব এই আয়ের হিসাবের সঙ্গে অনুপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, প্রতি বৎসরে সমগ্র অধিবাসীর তহবিলে ১০ কোটি ৮৯ লক্ষ ১৫ হাজার ১ শত ৬৪ টাকার অকুলান হয়।

খাওয়া-পরা এবং দেয় রাজস্ব ব্যতীত অত্যাবশ্যক ব্যয়, যথা—গৃহস্থালী ব্যয়, শিক্ষা ব্যয়, পারিবারিক ও সামাজিক নানা ব্যয়-বহর চুকাইবার জন্য প্রত্যেক অধিবাসীর প্রতি বৎসরে অন্ততঃ মোটামুটি ৩০৲ টাকার কমে চলে না। এই সকল বাবদে সমগ্র জেলার হিসাব কষিলে ৫ কোটি ১২ লক্ষ ১ হাজার ৫ শত ৭০ টাকা দেখা যায়। অতএব পূর্ব্ববর্ণিত খরচ-অকুলান অর্থের সঙ্গে এই অর্থের অঙ্কও যোগ দিয়া মোটামুটি নোয়াখালী জেলার অধিবাসিগণের প্রতি বৎসরের অকুলান অর্থের হিসাব দাঁড়াইল ১৬ কোটি ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭ শত ৩৪ টাকা।

এই যে কিঞ্চিদধিক ষোল কোটি টাকার সমস্যা, ইহার সমাধান করিতে হইলে বর্ত্তমানে ভূমিজাত শস্যোৎপাদিত অর্থ ছাড়াও আরও অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জনের প্রয়োজন। এই অত্যাবশ্যক প্রয়োজন-নিষ্পত্তির জন্য অধিবাসীরা যে নিশ্চেষ্ট, তাহা নহে। বিভিন্নমুখী কর্ম্ম-স্রোতে মানুষ অর্থের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দেখা যায়, দারিদ্র্য ও দুঃখকে খুব কম লোকেই ঠেলিয়া উঠিতে পারিয়াছে। ঋণভার স্কন্ধে দুর্ব্বহ হইয়া ঝুলিতেছে না, এমন সাধারণ গৃহস্থ ও মধ্যবিত্ত পরিবার সমগ্র নোয়াখালী জেলায় আছে কি না সন্দেহ।

সরকারী হিসাবের তালিকায় দেখা যায়, নোয়াখালীতে মোট গৃহসংখ্যা ৩ লক্ষ ৪ হাজার ৪ শত ৭৪। এই সংখ্যাকে মোটামুটি পরিবার-সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যার হার পাঁচ হইতে ছয় জন করিয়া হয়। ইহার মধ্যে শিশু, বালক-বালিকা, স্ত্রী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অশক্ত প্রভৃতিকে বাদ দিয়া উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি নির্দ্ধারিত করিতে হইলে প্রতি পরিবারে আনুমানিক এক কি দুই জনের বেশী ধরা চলে না; এতদনুযায়ী নোয়াখালীতে মোটামুটি যদি ছয় লক্ষ উপার্জ্জন ক্ষম ব্যক্তি থাকে, তাহা হইলে উহাদের প্রত্যেকের প্রতি বৎসরে জমির আয় ছাড়া অতিরিক্ত অন্ততঃ ২৬৭ হইতে ২৭০ টাকা অতিরিক্ত উপার্জ্জনের প্রয়োজন। তাহা না হইলে, হয় ঋণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে, না হয় মানুষের জীবিকার পথে কায়িক ও মানসিক স্বাস্থ্যপ্রদ অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া মানুষের স্তর হইতে নীচু হইয়া কোন রকমে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকাকেই সম্বল করিতে হইবে। তাহাই বা কতদিন? তদুপরি এইরূপ বাঁচিবার পদ্ধতিতে সমাজ-সামাজিকতা, শিক্ষা, সভ্যতা ও মানবোচিত আচার-ব্যবহার সমস্তই অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের অস্থিরতায় বানচাল হইয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে বর্ত্তমান সময়ে নোয়াখালীর অধিবাসীদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারকে বাদ দিলে অপরাপর প্রায় সকলের মধ্যে জীবিকানির্ব্বাহের যে ধারা চলিত দেখা যায়, উহাতে না আছে কোন আদর্শের বালাই, না আছে কোন প্রয়োজনীয়তার পরিমাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কায়ক্লেশে চলি গোছের স্বল্পাহার ও স্বল্পাচ্ছাদনকে পরিগ্রহ করিয়া নীরোগ স্বাস্থ্য, আয়ু ও উৎসাহহীন হইয়া অধিবাসীদিগকে দিন কাটাইতে হইতেছে।

নৈতিক অবস্থা

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, উপরে যে হিসাবাদির অবতারণা করা হইল, তাহা শুধু স্থানীয় আর্থিক অবস্থাকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই ঐ ভাবে প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে উপরোক্ত হিসাব মত—সকল পরিবার ও ব্যক্তির অংশে উপরি হারে ধরাবাঁধা জমিও নাই, তেমন আয়ও নাই। কোথাও কাহারও হাতে অনেক বেশী জমি, কাহারও অধিকারে সামান্য, আবার কেহ বা একেবারে রিক্ত। এইভাবেই প্রয়োজনীয়তা, উপার্জ্জন ও অবস্থা ইতস্ততঃ বিভিন্ন চেহারায় দেখা দিয়াছে।

জীবিকা-সমস্যার এই উৎকট অসামঞ্জস্যে কি নীতি, কি ধর্ম্ম, কি অপরাপর কর্ত্তব্যবোধ ও সদাচরণ সমস্তই যেন অসামঞ্জস্যের অসন্তুষ্টিতে মলিন হইয়া উঠিয়াছে। যে শ্রেণীর মধ্যে মর্য্যাদাবোধ ও অত্যাবশ্যক প্রয়োজন-বোধের চেতনা আছে, অথচ উহাকে জীবনে সফল করিবার কোন উপায় নাই, সেই শ্রেণীর লোকের মনের প্রসন্নতা-হানি অধিকতর করুণভাবে দেখা দিয়াছে। শুধু ত্যাগ, সংযম আর শাস্তিমূলক নীতিপাঠ নিঃস্ব ও অসমর্থের কাছে হয় ব্যঙ্গ হইয়া দেখা দিতেছে, না হয় নীতির আবরণে দুর্নীতির অভিনব ভদ্রপথ জীবনে সহজ আচরণীয় সুযোগ-সম্মতরূপে গৃহীত হইতেছে।

প্রাচুর্য্যের অশান্ত উচ্ছ্বাসকালে ত্যাগ ও সংযম যে ভাবে যতটা কার্য্যকরী হয়, অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অভাবকালে তাহা ততটা কার্য্যকরী হইতেছে না। নীতি ও আদর্শ মানুষেরই জন্য। জীবনযাত্রায় জনসাধারণ এখন মানুষের স্তর হইতে নামিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেহ ও মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব অধিবাসীবৃন্দের মনকে অশান্ত ও অবনমিত করিয়া রাখিয়াছে

ভূম্যধিকারীর অবস্থা

নোয়াখালীতে ছয় হাজার রাজস্ব-গ্রহণকারী বা ভূম্যধিকারী শ্রেণীর লোক আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নামে মাত্র তালুকদার। সামান্য কয়েক ঘর প্রজার নিকট হইতে ঊর্দ্ধসত্বে সত্ববান হিসাবে সামান্য কিছু টাকা খাজানা সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা লভ্যাংশ পাইয়া থাকেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের দিন চলে না। উপজীবিকার জন্য তাঁহাদেরও উপার্জ্জনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। ভূম্যধিকারিত্বের দিক্‌টা নিতান্ত গৌণভাবে উপার্জ্জনের সহযোগী পন্থারূপেই তাঁহাদের কাছে প্রতীয়মান হয়।

যাঁহাদের একমাত্র তালুকদারীর আয়ের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের সংসার ঋণদায়ে জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে। নিয়মিত খাজানা আদায় হইতেছে না। কোন কোন মহালে পাঁচ সাত বৎসরের খাজানাও বহু প্রজার কাছে অনাদায়ী রহিয়াছে। কোথাও কোথাও তদূর্দ্ধ কালের অনাদায়ী খাজানার সংবাদও পাওয়া যায়; অথচ তালুকদারকে বৎসর বৎসর সরকারী বা জমিদারী রাজস্ব নিয়মিত দাখিল করিতেই হইতেছে; তাহা না হইলে সম্পত্তি রক্ষা চলে না। অতএব হয় ঋণ করিয়া রাজস্ব দিতে হইতেছে, না হয় কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে রাজস্ব-পরিমাণ অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া তাহা দাখিল করিতে হইতেছে। তারপরে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য হয় ঋণ, না হয় সঞ্চয়-ক্ষেত্রে পূর্ব্ব-সঞ্চিত অর্থ-ব্যয়, নতুবা জীবিকা-নির্ব্বাহের মামুলী খরচের ভার কমাকমি করিয়া অন্য কোন সহযোগী উপার্জ্জনের পথ গ্রহণ করিতে হইতেছে।

ইহা ছাড়া কেবল ভূম্যধিকারিত্বের আয়ের উপরই স্বচ্ছন্দভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে, এইরূপ তালুকদার শ্রেণীর লোক খুব মুষ্টিমেয়। থাকিলেও তাঁহারা দুর্দ্দিনের ঘনঘটা দেখিয়া আপন আপন ঘর সামলাইবার জন্য খুব কঠোর ও সুচতুরভাবে হুঁসিয়ার হইয়া উঠিয়াছেন। পরার্থে কিছু করিবার সহজ মনোবৃত্তি এখন খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। সর্ব্বত্রই সন্দেহ, অবিশ্বাস ও নিষ্প্রয়োজনীয় চাণক্যতা বুদ্ধিকে ও মনকে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিতেছে।

শিক্ষার দায়

জীবিকার আদর্শবিচারে আহার্য্যগ্রহণের দিক্ দিয়া অত্যাবশ্যক যাহা, তাহা সহর ও পল্লীতে একই ধরা যাইতে পারে। কেবলমাত্র মূল্যহিসাবের বেলায় উহার তারতম্য লক্ষিত হয়। তাহা সহর হইতে পল্লীতে অপেক্ষাকৃত কমই বলিতে হইবে। কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ ও অপরাপর আসবাবপত্র ও চাল-চলনের দিক্ দিয়া সহরে আবহাওয়া পল্লীশ্রীকে দিনের পর দিন মলিন করিয়া তুলিতেছে। পল্লী-জীবনে আবশ্যক পোষাক-পরিচ্ছদের একটা সাধা-সিধা ধরণ আছে। পল্লীবাসীর মধ্যেও আটপৌরে ও পোষাকী পরিচ্ছদের ব্যবহার আছে। তাহাদেরও গৃহে আসবাবপত্রের প্রয়োজন ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান, যাহা না থাকিলে

নয়, তাহা আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে সহরে বহ্বাড়ম্বরীয় রুচিবিকার যখন প্রবেশ করে, তখন সেই পোষাকী রুচি-কর আদর্শের খোরাক যোগাইতে যোগাইতে এত বেশী ব্যয়-বাহুল্য ও বিলাসের দিকে মন আকর্ষিত হয় যে, তাহারই পরিণতিতে পল্লীর সুখ যাইতে থাকে, শান্তি যাইতে থাকে ও সত্যকার শ্রী-সম্পদ নষ্ট হইতে থাকে।

ঘর-দোর, আবশ্যক আসবাবপত্র ও বসন-ভূষণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও বাগানবাড়ী সাজাইয়া গুছাইয়া সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করা এক কথা,আর আড়ম্বরের সহিত কাজে, অকাজে অর্থব্যয় করিয়া বড়লোকী ভাব দেখানো অন্য কথা। দরিদ্রের রিক্ত করতলে আধ পয়সা পড়িবে না, অপরের প্রয়োজনীয় হিতের জন্য মন উঠিবে না, এমন কি ভিখারীকে এক মুষ্টি তণ্ডুল দান করিতেও যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচারবুদ্ধি শতমুখী হইয়া মস্তিষ্কে সজাগ হইয়া উঠিবে; অথচ নিজের বিলাস-ব্যসনে রুচিবিকারগ্রস্ত বড়লোকী ব্যয়-বাহুল্যের অন্ত নাই। সহরে আবহাওয়ায় বিগড়ানো-মনা বাক্যবিন্যাস-শিক্ষাপ্রাপ্ত পল্লীমায়ের দুর্ভাগা সন্তানগণ শিক্ষা ও নব-সভ্যতার চমকপ্রদ বাক্‌চাতুর্য্যে পল্লীর সহজ জীবনে দিনের পর দিন যে আদর্শের স্থাপনা করিয়া চলিয়াছে, উহার ফল অত্যন্ত ভয়াবহ।

অর্থের দিকে মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। শিক্ষা কিরূপ হইল না হইল, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে, অথচ বিদ্বান বলিয়া চাপড়াশ থাকিলেই তাহার দিকেই সাধারণতঃ দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণ শ্রেণীর লোকের ইহা একটা স্বাভাবিক মোহ।

পল্লীর ধনবানের ছেলেরা যখন সহর হইতে বিদ্যার চাপড়াশ লইয়া ঘরে ফিরে, তখন তাহাদের মূল্য বাড়ি যায়। তাহাদের প্রতি পল্লীবাসীর মনে স্বভাবতঃই এক অকারণ শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়। ইহা হইতেই তাহাদে চাল-চলন ও আচার-ব্যবহার আস্তে আস্তে পল্লীবাসী সহজ জীবনে সংক্রামিত হইতে থাকে। পল্লী-সমাজে উপর শিক্ষিতের ও ধনবানের দায়িত্ব কতখানি, তাহা শিক্ষা আধুনিক শিক্ষা-জীবনে অনেকটা দুর্লভ হইয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের শিক্ষা ও ধনের অপব্যয় ও অমিতব আর্থিক, নৈতিক ও ব্যাবহারিক দিকে পারিপার্শ্বিক সাধারণ শ্রেণীর মানুষের সহজ জীবনকে অনেকাংশে সঙ্কটময় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, একদিকে অর্থসমস্যা মিটাইবার জন্য যে-শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষাই অপর দিকে অর্থসমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে নোয়াখালী জিলার প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভূত তথ্যের সাহায্য লইলেও পাকে প্রকারে, বাঙ্গালা দেশের সকল জিলারই অবস্থা অনুরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যত দিন যাইতেছে, ততই এই ভীষণ সমস্যা ভীষণতর হইতেছে। দেশীয় নেতাগণের দেশবাসীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতার জন্যই এই সমস্যা আজিও পর্য্যন্ত দেশীয় পত্রিকাসমূহে সম্যক্ গুরুত্ব লাভ করে নাই। এই সকল পত্রিকায় সর্ব্বদা কারণে অকারণে কাল্পনিক সমস্যাসমূহকে যেরূপ তীব্র ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়, তাহার শতাংশের একাংশও বাঙ্গালী জীবনের এই সর্ব্বাধিক বাস্তব সমস্যার তীব্রতা প্রচারে স্থান পায় না।

ইহার কি কোন উপায়ই নাই?

স্বাধীনতা

সম্যক্‌ভাবে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের মধ্যে যাহাতে সর্ব্বসাধারণের ক্ষুধার জ্বালা, ব্যাধির যাতনা, বিবাদ ও বিসংবাদের অশান্তি ও অসন্তুষ্টি অন্ততঃপক্ষে কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস পাইয়া উত্তরোত্তর যাহাতে উহা সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক সাহিত্যিক গোষ্ঠী

(রাজকৃষ্ণ, তারাশঙ্কর ও রামগতি)

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করিতে না পারিলেও তাঁহার সমস্ত সাহিত্যিক প্রতিভা যে গদ্যভাষা ও রীতি উদ্ভাবনে নিঃশেষিত হইয়াছিল, সে গদ্যভাষা যে-সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সাহিত্যের উপযোগী গদ্যভাষা সৃষ্টি করিয়া তিনিই সাহিত্যের সৌধনির্ম্মাণের ভিত্তি স্থাপন করেন। গদ্যভাষা-রূপের যে একটা বলিষ্ঠ সাহিত্যিক সম্ভাবনা আছে, তাহা বিদ্যাসাগরের রচনাতেই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ হইয়াছে। গদ্যরূপকে সাহিত্যিক রূপ দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, সমসাময়িক অনেক লেখকের প্রাণে ও মনে গদ্যের সেই রূপটি ধরাইয়া দিয়া, সকলকে গদ্যরীতিতে দীক্ষিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সমসাময়িক অনেক লেখক তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গদ্য-রচনায় মন দেন।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ, তারাশঙ্কর ও রামগতির নামই অগ্রগণ্য। ইহাঁদের মধ্যে এক রাজকৃষ্ণ ব্যতীত কেহই বাঙ্গালা গদ্যের এত অধিক চর্চ্চা করেন নাই, যাহাতে আমরা ইহাঁদের গদ্যরূপ হইতে একটি বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গী ও রীতি আবিষ্কার করিতে পারি। ইহা সত্ত্বেও ইহাঁরা যতটুকু চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা যে বিদ্যাসাগরী ভঙ্গীকে কিছুদিন সচল অবস্থায় রাখিয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়।

প্রথম, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'টেলিমেকস' ফরাসী কাব্যের প্রথম ছয় সর্গের ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে রচিত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ নিখুঁত বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত। এখানে রাজকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের রীতিকে সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিয়াছিলেন এবং "বিদ্যাসাগর মহাশয় পুস্তকের আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।" কাজেই তাঁহার রচনায় বিদ্যাসাগরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বর্ত্তমান।

দ্বিতীয়, তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যাসাগরের রীতি অবলম্বন না করিলেও, পরোক্ষভাবে তাঁহার সম্মুখে রচনার আদর্শ স্বরূপ বিদ্যাসাগরের রীতিই বর্ত্তমান ছিল। 'কাদম্বরী' রচনায় সংস্কৃত শব্দের অত্যধিক ব্যবহারে ও সমাসশিল্পে তারাশঙ্কর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন এবং সেইজন্যই বিদ্যাসাগরী রীতি অপেক্ষা তাঁহার রীতি একটু বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু কাদম্বরী রচনায় তারাশঙ্কর মূল কাদম্বরীর শব্দ, ঝঙ্কার, শব্দচিত্র যথাযথ অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়াই ভাষাকে এত কৃত্রিম করিয়া তুলিয়াছেন, নতুবা তাঁহার 'রসেলাস'-এর রচনা-রীতি অনেকাংশে বিদ্যাসাগরী রীতির অনুরূপ। সুতরাং দেখা যায়, কাদম্বরী রচনায় তারাশঙ্কর নিজস্ব ভিন্ন রীতি অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিলেও বিদ্যাসাগরী রীতিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কিন্তু কাদম্বরীর রচনা-রীতি কৃত্রিম হইলেও ইহার মধ্যেই তারাশঙ্করের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী বর্ত্তমান এবং এই বিশিষ্ট ভঙ্গীর জন্যই গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্করের নাম উল্লেখযোগ্য; নতুবা তাঁহার রসেলাস-এর রচনারীতি কাদম্বরীর ন্যায় কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ঘেঁষা হইলেও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত।

তৃতীয়, রামগতি ন্যায়রত্নের 'রোমাবতী'ও বিদ্যাসাগরী রীতিতে রচিত। ইহার ভাষা সংস্কৃত-ঘেঁষা এবং ভাষার মধ্যে একটি স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি আছে।

এই সকল সমসাময়িক বিভিন্ন লেখকগণের রচনারীতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইঁহাদের রচনার আদর্শ 'বিদ্যাসাগরী' হইলেও, বিদ্যাসাগরের রীতির প্রকৃত রূপটি ইহাঁরা ধরিতে পারেন নাই। ইহাদের রচনায় গদ্যের যে রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আড়ষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য এবং সংস্কৃত বহুল,—'কাদম্বরী' ও 'রোমাবতী' ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত পদবিন্যাসের রীতি আশ্রয় করিয়াও বাঙ্গালা গদ্যের যে সাধু ভঙ্গীটি সুকৌশলে প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন, এই সকল লেখকগণ তাহা পারেন নাই। তাঁহাদের সেই প্রতিভা ছিল না—নতুবা এই লেখকগণ বিদ্যাসাগরের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গদ্যরীতির আদর্শ সম্মুখে

পাইয়াও তাহার অনুসরণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা গদ্যের শৃঙ্খল-মুক্তির সুযোগ এই লেখকগণেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। বিদ্যাসাগরের রীতির প্রকৃত ও যথাযথ উত্তরাধিকারী যদি তাঁহারা হইতে পারিতেন, তবে এই লেখকদের হস্তেই বিদ্যাসাগরী রীতির যথেষ্ট সৌকর্য্য সাধন সম্ভবপর হইত। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন স্বেচ্ছায় সংস্কৃত রীতি এবং বাঙ্গালা রীতি, উভয়কেই একটা সমন্বয়ের পথে আনিয়া বাঙ্গালা গদ্যরীতি আবিষ্কার করিয়া, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতির রচনা-রীতির উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন—এই লেখকগণ তেমনই বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির প্রাণস্পন্দনের সন্ধান না পাইয়া বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত আবরণটাকেই গদ্যের বলিষ্ঠ গঠন মনে করিয়া তাঁহাদের রচনারীতিকে সংস্কৃত-ঘেঁসা করিয়া বিদ্যাসাগরের রীতিকে অত্যন্ত আড়ষ্ট করিয়া তুলিলেন। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যরূপকে আড়ষ্টতা হইতে মুক্ত করিতে যতটুকু অগ্রসর করিয়াছিলেন, ইহাঁরা সেই গদ্যরূপের পায়ে সংস্কৃত গুরুভার শৃঙ্খল পরাইয়া তাহাকে ততটুকু অচল করিয়া তুলিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রবহমান গদ্যরীতি ইহাঁদের হাতে পড়িয়া কিছুকালের মত স্রোতোহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং তখনই সেই গদ্যরীতির নাম 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' নামে কলঙ্কিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই রীতি একেবারে অচল হইয়া গেল এইরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই—কেন না, বাঙ্গালা গদ্যরীতির ক্রমবিকাশের ধারাকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যরীতি অতিশয় সরল রেখায় ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরীতি বিদ্যাসাগরের গদ্যে সঞ্চালিত হইয়াছে এবং তাহার পরে বিদ্যাসাগরের রচনারীতি কেমন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যভাষার 'থেই' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি এই লেখকগণ সংস্কৃত অলঙ্কারের শৃঙ্খল দিয়া ভাষাকে ভারগ্রস্ত না করিয়া বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপকে আরও প্রাঞ্জলতার পথে আনিতে পারিতেন, তবে নিঃসন্দেহে বলা যাইত যে, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের রীতিকে যোগ্য শিষ্যের মত অব্যাহত রাখিয়া মুক্তির পথে লইয়া চলিয়াছেন।

ইহাঁদের ভাষা যে তৎকালীন পাঠকসমাজকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ—নবপ্রচলিত তৎকালীন 'আলালী' ভাষার সার্ব্বজনীন প্রশংসায় ও সমর্থনে। তাঁহাদের সংস্কৃতবহুল ভাষায় অনেকে প্রীতিলাভ করিলেও, সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট ইহা কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এই সুযোগে 'আলালে'র আবির্ভাব সময়োপযোগী ও শিক্ষিত ব্যক্তির প্রসংশার যোগ্য হইয়াছিল। এই বিষয়ে আমরা টেকচাঁদ ও কথ্যভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় বিস্তৃতভাবে বলিব।

এই লেখকদের রচনা সম্বন্ধে বলা চলে, ইহাঁদের ভাষায় যেমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, তেমনই রচনাতেও কোন মৌলিকত্বের আভাস নাই। তখন পর্য্যন্তও অনুবাদ-সাহিত্যই রচিত হইতেছিল।

সেই যুগে নীতিপ্রচার ও সমাজসংস্কারই গ্রন্থরচনার আদর্শ ছিল। রসেলাস-এর অনুবাদ হইতেই এ কথা বুঝা যায়।

স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা

আজকাল, কোন দেশ যখন একমাত্র নিজ দেশের মানুষের দ্বারা শাসিত হয়, তখন ঐ দেশকে স্বাধীন বলা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ভাবে দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চাকুরীজীবী, পরমুখাপেক্ষী অথবা পরাধীন হইলেও স্বাধীনতার আধুনিক সংজ্ঞানুসারে ঐ উপরোক্ত দেশকে স্বাধীন বলিয়া আখ্যাত করিতে আজকাল রাজনৈতিক ধুরন্ধরগণ কোন সঙ্কোচ অথবা কুণ্ঠা বোধ করেন না। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা এখন আর স্বাধীনতা কথাটির ব্যবহার হইতে উপলব্ধি করা যায় না।

পুস্তক ও পত্রিকা

যৌনজ্ঞান—শ্রীসুনীলকৃষ্ণ মিত্র এম-এস-সি ; বি-এল প্রণীত ও নৈহাটি অরবিন্দ রোড হইতে শ্রীসুনীলকৃষ্ণ মিত্র প্রকাশিত। মূল্য ২॥০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬+২৩৫+১৮।

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "জনমত, সামাজিক শাসন, ধর্ম্মের অনুশাসন, রাষ্ট্রীয় আইন প্রভৃতি বিধিব্যবস্থার দ্বারা সর্ব্বদেশেই যৌন-বিষয়ক আলোচনার চতুর্দ্দিকে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। যৌন বিষয়ক সামান্যতম উল্লেখও শিষ্টতা, দীনতা এবং সুরুচির বহির্ভূত বলিয়া মনে করা হয়।" এ কথা সত্য...। পৃথিবীর সকল দেশেই যৌন-সমস্যাকে সঙ্গোপনতার অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে—বর্ত্তমান যুগের গোড়া হইতেই শুধু মানুষ মানুষের এই অতি প্রয়োজনীয় দিক্‌টার কথা আলোচনা করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে এ বিষয়ের বহুল আলোচনা হইয়াছে এবং এ দেশেও ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক প্রচলিত। যৌন-সমস্যা মানুষের জীবনের প্রবল এবং জটিল সমস্যা, ইহাকে অশ্লীল বলিয়া উড়াইয়া দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। খাদ্য পানীয় হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের জীবনের বহুবিধ সমস্যার সম্পর্কে যেমন বহুল আলোচনা হইয়া থাকে, এ সমস্যাটির সম্বন্ধেও সতর্কতার সহিত সেইরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। এই ভারতবর্ষেই দেখা গিয়াছে, প্রাচীন ঋষিগণ এ সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। জনগণের উপকারার্থে তাঁহারাও যৌন-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন। লেখক এই গ্রন্থখানিতে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত প্রাচীন ঋষিগণের বাণী উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন। গ্রন্থকার যৌন-সমস্যা আলোচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা অকপটে দেখাইয়াছেন এবং সমাজ তদ্দ্বারা যে কি প্রকারে লাভবান হইবে, তাহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে আমরা তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

খুব অল্পদিন হইল, রতিশাস্ত্র', 'কামশাস্ত্র', প্রভৃতি চটকদার নামে বাংলা ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর যৌন-বিষয়ক গ্রন্থের অপ্রতুলতা নাই। কিন্তু ইহার অধিকাংশই 'অকেজো', অবাঞ্ছিত এবং অশ্লীল—সস্তায় মানুষের মন ভুলাইবার একটা মিথ্যা ভড়ং মাত্র। সেইজন্য বহুদিন হইতে বঙ্গভাষায় একখানি বিজ্ঞানসম্মত পুস্তকের অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছে—লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সে অভাব বহুল পরিমাণে দূরীভূত করিয়াছেন।

লেখকের ভাষা ও আলোচনা সাবলীল ও মার্জ্জিত—রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠোপযোগী। যৌন-সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাইয়া লেখক ইহার প্রত্যেকটী দিক্ অতি সতর্কতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের জীবনে যেখানে অজ্ঞতা আছে, ভীরুতা আছে এবং সমস্যা আছে—সেইখানেই নিপুণভাবে তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যৌন-সম্পর্কে আলোচনা করিতে বসিলে অনেক সমস্যা অনেকের মনে উঠে—কিন্তু তাহার সমাধানের চেষ্টা অন্ধকারেই বিলীন হইয়া যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক সে সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া চিন্তাশীল লোকের খোরাক যোগাইয়াছেন এবং সেই সকল সমস্যার দিকে সমাজের দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। আবার অন্য একটি বৈশিষ্ট্যও পুস্তকখানিকে প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছে। পুস্তকখানিতে যৌন-সমস্যার বৈজ্ঞানিক দিক্‌টা শুধু বিতর্কমূলক আলোচনায় পর্য্যবসিত হয় নাই। লেখক প্রত্যেক ব্যক্তির নিত্য-প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিরও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তকখানি মানুষের দৈনন্দিন অভাব মিটাইবে এবং সকল শ্রেণীর ব্যক্তির উপকারে আসিবে। "যৌনজ্ঞান" পুস্তক একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক উপাদান যথেষ্ট আছে, অন্যদিকে তেমনই কার্য্যকরী জ্ঞানও যথোচিতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট চিত্তাকর্ষক।

—শ্রীসুশীলকুমার বসু।

ধর্ম্ম-সমন্বয় ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ—শ্রীতারকচন্দ্র মজুমদার। মূল্য—॥০ আনা। ডবল ক্রাউন ষোল-পেজী ৪ ফর্ম্মা। অ্যান্টিক কাগজে ছাপা।

পুস্তিকাখানিতে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ধর্ম্মমতকে প্রাঞ্জল ও সহজ-বোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

টাকার কথা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—**শ্রীঅনাথগোপাল** সেন। মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য—১॥০ টাকা। ডবলক্রাউন ষোল-পেজী ২২৪ পৃষ্ঠা। সুদৃশ্য ছাপা ও বাঁধাই।

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমরা ইহার প্রথম সংস্করণের সমালোচনা করিয়াছিলাম। মাত্র দেড় বৎসর কালের মধ্যে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইয়াছে, ইহাই বইখানির জনপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয়। বর্ত্তমান-সংস্করণে পাঁচটি নূতন পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হইয়াছে। লেখক তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ 'রাজধানী বনাম অর্থনীতি'তে বলিয়াছেন:—স্বাধীনতা জিনিষটা আপনা হইতে মুহূর্ত্তে সকল অকল্যাণ অপনোদন করিতে পারে না। এই জিনিসটার এমন কোন সম্মোহন শক্তি নাই। দেশের প্রতিভা ও যোগ্যতা স্বাধীনতাকে সুপথে পরিচালিত করিতে পারিলেই তবে অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও অভাব আস্তে আস্তে ঘুচিবে।

দেবযানী (চার অঙ্ক নাটক)—শ্রীমুরারিমোহন সান্যাল। বুক কোম্পানী লিঃ, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। মূল্য—১৲ টাকা।

দেবযানী কাহিনী লইয়া রচিত নাটক।

আবর্ত্ত—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতী ভবন, ২৪১৫ এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—২৲ টাকা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ২২০ পৃষ্ঠা। সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ বাঙ্গালা সাহিত্যে চিন্তাশীল প্রবন্ধ-লেখক হিসাবে নাম করিয়াছেন। স্বীকার করিতে বাধা নাই, এই বই পড়িবার আগে তাই যথেষ্ট আশঙ্কাই ছিল যে, তাঁহার হাতে রস রচনা জমিবে কি না। বই পাঠে সেই আশঙ্কা ঘুচিয়াছে এবং এমন সন্দেহ হইতেছে যে, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মূলতঃ রস-রচনাকার, প্রবন্ধ-রচনাটা তাঁহার ইহারই জন্য শিক্ষা-নবিশী মাত্র। অবশ্য আবর্ত্ত পাঠ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালা উপন্যাস পাঠকের ভাল লাগিবে কি না বলা কঠিন, কেন না, কোন বিশেষ সু-তারের রান্না তারিফ করিবার জন্য রসনার যেরূপ প্রস্তুতি দরকার, আবর্ত্ত পাঠ করিবার পূর্ব্বেও রস-রচনা বুঝিবার সেই স্তরে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। ভোক্তামাত্রেই ভোজন-বিলাসী নহেন উপন্যাস-পাঠক মাত্রেরই সত্যকার রসদৃষ্টি আছে, এ কথা বলা চলে না। সুতরাং আবর্ত্ত যাঁহাদের ভাল না লাগিবে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিবার নাই। বর্ত্তমান শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোরাজ্যে তাহার সংস্কার ও সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রবৃত্তি, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনী এবং ঐতিহ্যের প্রভাব সমস্ত মিলিয়া যে আল্পনা রচনা করিয়াছে, তাহা কোথাও অত্যন্ত সুনিপুণ, কোথাও একেবারে কাঁচা, কোথাও অর্থহীন, কোথাও রহস্যময়, কোথাও শ্রদ্ধেয়, কোথাও বিরক্তিকর। আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী মনের সেই ঠাসবুনানি লইয়াই আবর্ত্ত গভীর ও উচ্ছ্বসিত,। সেই মনের নিকট সংস্পর্শে না আসিলে, আবর্ত্তন ভাল লাগিবার কথা নহে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত বাঙ্গালী মনের 'বাসনা' যাঁহার না আছে, তাঁহার এই বই হয়ত ভাল লাগিবে না, কিন্তু তাহাই ইহার বৈশিষ্ট্য। আবর্ত্তের পাঠককে সেই বৈশিষ্ট্যই সর্ব্বাগ্রে বিস্মিত করে। আমরা ধূর্জ্জটিপ্রসাদের পরবর্ত্তী পুস্তকের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

নদীপথে—শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। ভারতী ভবন, ২৪১৫ এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

ছুটিদিনের ছুটিতে লিখিত কয়েক খানি পত্রসমষ্টি।

রামধনু—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী বি-এস্-সি লিখিত ও চিত্রিত। মূল্য ছয় আনা। সুন্দর ছাপা বাঁধাই, সুদৃশ্য কভার।

শিশুদিগের পড়িবার মত বাঙ্গালা ভাষায় লেখা বইয়ের মধ্যে ইহার স্থান উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

ফাঁকি

—শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

··তনুর তীরে দেখিছ না কি কামনা মায়ামৃগ
কাজল চোখে দিতেছে হাতছানি,
ব্যাধেরও বাণ পিছুতে কাঁপে জানিয়ো মরমী গো,
তাহারে ল'য়ে কাননে কাণাকাণি।
সাগর কভু তোমার চোখে হবে না সীমাহারা
এখানে নয়, ওখানে নয়, কোথাও স্রোতোধারা
গভীর ভাবে বলিতে পারে এখানে মোর সারা···
বৈরাগী কে কহিয়া গেল বাণী॥

বাদল বেলা কাটিল, তবু রজনী কাটেনা কো
নীরব নত ভরিল বেদনাতে,
ওঠে না চাঁদ, ধূসর তারা ওঠে না লাখো লাখো
মনের ছায়া আসন সেথা পাতে।
কুটিরে কার সারেঙ্ কাঁদে, সমীর ছল ছল,
তটিনী হতে দেবতা কোন্ ডাকিছে, চল চল,
সুদূর কোন্ ফাগুন যেন কহিছে, বল বল
ভুবন ছেড়ে চলেছ কার সাথে ?

কী কথা আজ কহিতে চাই, বলিতে নাহি পারি
ভুবনে যেন হারায়ে গেছে বাণী,
কহিতে কিছু হয় না কথা, বুঝিয়া নেয় নারী
নয়নে জল, মুখেতে : জানি জানি।
নীরবে আমি লিখিনু তার চোখের পাতে পাতে,
আজিকে আমি বেঁধেছি বুক ঊষর বালুকাতে,
জীবনে যত করেছি ভুল, আজিকে এই রাতে
তোমারি সাথে রাখিয়া যাব, রাণি॥

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

"···যে চণ্ডীপাঠ করতে পারে সেও সাধারণ লোক, যে জুতা সেলাই করতে পারে সেও সাধারণ লোক, কিন্তু যে চণ্ডীপাঠও করিতে পারে জুতা সেলাইও করিতে পারে, তার অসাধারণ প্রতিভায় মানুষ মুগ্ধ হয়ে যায়। মোহ মানুষকে এই ভাবে আক্রমণ করে। মানুষের মনে থাকে বিকার এবং চিরন্তন বা সাময়িক রীতিতে পরিচালিত জগতে আপাত-বিপরীতের সমন্বয় মানুষকে সহজে কাবু করে ফেলে। চণ্ডীপাঠ করতে জানে বলে কারও জুতা সেলাই করতে না জানার কোন কারণ নেই, তবু চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্য্যন্ত যে জানে, আমাদের কাছে সে মহাপুরুষ : মানুষকে দেবতা বলে পূজা করাটা আমাদের কাছে কঠিন নয়, মানুষকে পশু বলে ঘৃণা করাটা আরও সহজ, কিন্তু মানুষকে মুখে চণ্ডীপাঠ করে হাতে জুতা সেলাই করতে দেওয়া আমাদের কাছে সৃষ্টি-ছাড়া খাপছাড়া ব্যাপার।

"এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার যে, এ বিষয়ে আমরা একটা চল্‌তি ব্যঙ্গ সৃষ্টি করে ভাষায় ব্যবহার করি। আমরা ব্যঙ্গ-প্রিয় জাতি। আপনারা জানেন, সেই ব্যঙ্গই সবচেয়ে জোরালো হয়, যে ব্যঙ্গে আপাত-বিপরীতের সমন্বয়টা খুব স্পষ্ট—আকাশ বললে যখন পাতাল বুঝায়, তখন ব্যঙ্গটা ক্ষীরের মত জমাট বাঁধে। ভিখারীকে রাজা বলার চেয়ে বড় ব্যঙ্গ আর কি আছে? একজন চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই পর্য্যন্ত জানে বললে সোজাসুজি অর্থটা দাঁড়ায় এই যে, লোকটা জানে না এমন কাজ নেই, কিন্তু আমরা কি তাই বোঝাতে চাই? আমরা বোঝাতে চাই যে, লোকটা কিসসু জানে না! এখন স্কুলে কলেজে আমরা যে শিক্ষা পাই, তাও অনেকটা চণ্ডীপাঠ থেকে জুতা সেলাই করতে শখার মত, অথচ আশ্চর্য্য এই—"

শ্রোতারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে না, প্রাণপণে হাততালি দেয়। কলেজের প্রকাণ্ড হলটা হাততালির আওয়াজে গমগম করিতে থাকে। ছেলেদের মধ্যে যাদের স্নায়ু একটু বেশী দুর্বল, তারা রোমাঞ্চও অনুভব করে। তাদের কলেজের একজন এক্স-ষ্টুডেণ্ট এমন সুন্দর বলিতে পারে ভাবিয়া কতগুলি তরুণ বক্ষই যে ব্যথিত গৌরবে ভরিয়া যায়!

কিন্তু হাততালিতে অনুপমের যেন চমক্ ভাঙ্গে। কলেজে পুরাতন ছাত্রদের বাৎসরিক মিলনোৎসবে যোগ দিবার কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না, দুটি উৎসাহী ছেলের টানাটানিতে আসিয়াছে। কলেজের ছেলেদেরই কবিতা পাঠ, ক্যারিকেচার, মাসল কণ্ট্রোল ইত্যাদি দিয়া যে মিলন-সভায় নিমন্ত্রিতদের 'এণ্টারটেন' করা হইয়াছে, সেই সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিবারও কোন ইচ্ছা তাহার ছিল না, সেই উৎসাহী ছেলে দুটির ঠেলাঠেলিতেই 'কিছু' বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চণ্ডীপাঠ আর জুতা সেলাই করা সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা তার ছিল না, স্কুল-কলেজের শিক্ষার সমালোচনা করার কথাও সে ভাবে নাই। ও সব বলা রীতি নয়,—কলেজ-জীবনের স্মৃতি সে জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না, আজ এই মিলনোৎসবে যোগ দিতে পারিয়া গভীর আনন্দে মুখে আর ভাল করিয়া কথা সরিতেছে না,—জড়াইয়া জড়াইয়া এই ধরণের কিছু বলিলে শোনাইতও ভাল, নিয়ম রক্ষাও হইত।

তার বদলে এসব সে কি বলিতে আরম্ভ করিয়াছে? আবোল-তাবোল কথাগুলি শুনিয়া ছেলেরাই বা এত খুসী হইল কেন? অভিযোগের ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু বলিলেই বোধ হয় ছেলেদের ভাল লাগে—খেইহারা রসাল নিন্দা আর সমালোচনা!

কথাটা অনুপমের অসম্ভব মনে হয় না। যে ধরণের গান, কবিতা পাঠ, ক্যারিকেচার আর মাসল্ কণ্ট্রোল সকলের হাততালি আদায় করিয়াছে!

কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, প্রফেসর ও নিমন্ত্রিত বয়স্ক ভদ্রলোকেরা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছেন বুঝিতে পারিয়াও অনুপম কিন্তু থামে না, বেশ করিয়া কলেজের শিক্ষা আর কলেজে শিক্ষিত ছেলেদের একচোট গালাগালি দেয়। শুনিয়া ছেলেদের সে কি উল্লাস! একপাশে জন ত্রিশেক মেয়ে বসিয়াছিল, তাদের মধ্যেও অনেকের চোখদুটি উত্তেজনায় ছল ছল করিতে থাকে, আনন্দের আতিশয্যে ঠোঁট চাপিয়া হাসিতে ভুলিয়া যাওয়ায় কারও কারও অসমান নোংরা দাঁতগুলিও আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে।

সেই হইল সূত্রপাত। পরদিন দুটি সমিতি অনুপমকে সদস্য করিয়া লইল। একটি সমিতির নাম 'দি ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেক্‌শন অব এভরিবডিজ রাইটস ইনক্লুডিং ষ্টুডেন্টস', অপরটির নাম 'শিক্ষা সমাজ ও সাহিত্য সংস্কার সমিতি'। প্রথমটির প্রেসিডেণ্ট একজন অল্পবয়সী অধ্যাপক, অন্ততঃ চেহারা দেখিলে মনে হয়, বয়স ভদ্রলোকের বেশী নয়। একটা বিলাতী উপাধি আছে, কিন্তু সবজান্তার নিবিড় বিনয়ে সর্ব্বদা টইটম্বুর হইয়া থাকেন। ছাত্র এবং ছাত্রীদের বড় ভালবাসেন, তাদের সমস্ত সভাসমিতি উৎসব অনুষ্ঠানে হাজিরও থাকেন। প্রকৃত পক্ষে অধিকাংশ সভা-সমিতি উৎসব অনুষ্ঠানের গোড়াপত্তনের সময় ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে পরামর্শের জন্য ছুটিয়া আসে।

জন দুই ভক্ত ও সমিতির সদস্য এবং ছাপান প্যাম্ফলেট, কার্ড ইত্যাদি অস্ত্র লইয়া নিজেই অনুপমকে আক্রমণ করিতে তাঁর বাড়ীতে আসিয়া হাজির হন। অমায়িক হাসি হাসিয়া বলেন, 'আমি দি ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেক্‌শন অব এভরিবডিজ রাইটস ইনক্লুডিং ষ্টুডেন্টস-এর প্রেসিডেণ্ট সরসীলাল ভাদুড়ী।'

শুনিলে মনে হয়, তাঁর জগদ্বিখ্যাত নামটি যদি এ পর্য্যন্ত অনুপমের কানে না পৌছিয়া থাকে, অনুপম যে জগতে সবচেয়ে অপদার্থ লোক, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন।

বসিতে বলিয়া ভদ্রতা করার উপায় ছিল না, কারণ ভদ্রলোক আগেই বসিয়াছিলেন। অনুপম তাই বলে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমাকে আমাদের এসোসিয়েশনের মেম্বার হতে হবে।'

'বেশ।'

দ্বিতীয় সমিতিটীর সম্পাদক একটি ছাত্র। নাম ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্ত্তী, বয়স বছর চব্বিশ, চেহারা আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর। সর্ব্বদা ক্রুদ্ধ হইয়া আছে, কিন্তু ক্রোধটা যে কাহার বা কিসের উপর নিজেও ভাল বোঝে না, অপরকেও বুঝাইতে পারে না। বুঝাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিলেই ক্রুদ্ধ মুখখানি তাহার ক্রোধে একেবারে টকটকে লাল হইয়া যায়।

'আপনারাও যদি আমাদের সমিতিতে যোগ না দেন, যদি দশ জনের মত কেবল নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করাটাই জীবনে একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে করেন—'

অনুপম বলে, 'আমি কি বলেছি যোগ দেব না?'

কিন্তু এত সহজে ব্রহ্মানন্দের ক্রোধের উপশম হয় না। সহজে কেন, কিছুতেই হয় না।

'আপনি না বলতে পারেন, আপনার মত অনেকেই বলে। লেখাপড়া শিখে কোন রকমে একটা চাকরী বাগিয়ে বিয়ে-টিয়ে করে ঘর-সংসার করাটাই যেন মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য!'

'আপনি বিয়ে করেছেন?'

'আমি? আমি বিয়ে করব!'

ব্রহ্মানন্দের মুখ দিয়া কথা সরে না।

এই ভাবে অনুপমের জীবনের গতিও জহরের জীবনের গতির সঙ্গে একাভিমুখী হইয়া গেল। জহর যাত্রা আরম্ভ করিল একেবারে প্রকাশ্য রাজপথে,—স্বেচ্ছায়। অনুপম যাত্রা আরম্ভ করিল সরু গলিতে—পরের ইচ্ছায়। জহরকে ভিড়ের মধ্যে নিজের পথ করিয়া লইতে হইল ধাপ্পাবাজির জোরে,—অনুপমকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল একদল ছেলেমানুষের নির্ব্বোধ উচ্ছ্বাস।

কিন্তু দেখা গেল, অনুপমের পশার জমিতেছে তাড়াতাড়ি, জহর যেখানে আর দশজন মহাপুরুষের সঙ্গে বিচরণ করিবার অধিকার লাভের জন্য প্রাণপাত করিতেছে, বিনা চেষ্টায় অনুপমও আগাইয়া চলিয়াছে সেইখানেই। ছেলেরা অনুপমকে পছন্দ করে, ছাত্রছাত্রী-মহলে তার নাম ছড়াইয়া

পড়িতেছে। যে কোন অনুষ্ঠানই হোক, ছেলেরা তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়। কিছু বলিতে হয় অনুপমকে। কি যে সে বলে ভাল বোঝা যায় না, কারণ, যা মনে আসে তাই সে বলিয়া যায়। কিন্তু স্কুলে মাষ্টার আর কলেজে প্রফেসরদের বাখ্যামূলক লেকচার শুনিতে অভ্যস্ত ছেলেদের কাছে তার ঈষৎ ভয়ে ভয়ে আবোল-তাবোল কথা বলাটাই মনোহর লাগে। অনুপমের দাঁড়ানোর ভঙ্গী, কথা বলার সময় মুখ ছাড়া হাত প্রভৃতি শরীরের বাড়তি অঙ্গগুলি লইয়া অস্বস্তি বোধ করিবার ভঙ্গী, মাঝে মাঝে নাকের ডগা চুলকান, এ সব দেখিয়া ছেলেদের একটা গভীর মমত্ববোধ জাগে। অনুপমকে মনে হয় ঘরের লোক। ছাত্রীরা সাধারণতঃ মুচকি মুচকি হাসে, তবে কারও কারও মধ্যে বাৎসল্যের সঞ্চারও হয়।

অন্ততঃ আশালতার যে হয় তাতে সন্দেহ নাই।

পছন্দসই ছেলে দেখিলে একদিন, খুব বেশী দিন আগের কথা নয়, তার শুধু প্রেমেরই সঞ্চার হইত। কিন্তু একবার শুধু একটু অসাবধানতার জন্য, তাও বড় বেশী দিনের কথা নয়, মাতৃত্বের পথে মাস তিনেক আগাইবার সুযোগ পাওয়ার পর, বাৎসল্য ভিন্ন আর কিছুই সে অনুভব করিতে পারে না।

নিজে যাচিয়া সে অনুপমের সঙ্গে পরিচয় করিল।

'আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনার মধ্যে এমন কিছু আছে, আজকাল মানুষের মধ্যে যা খুঁজেই পাওয়া যায় না। সরলতা, তেজ, আদর্শে অনুরাগ, ন্যাচুরেল পোইজ—'

মনে হয়, বুঝি অনুপমের পিঠ চাপড়াইয়া দিবে!

'একদিন আসবেন আমাদের বাড়ী? আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করতাম।'

'নিশ্চয় যাব।'

'আজকেই চলুন না? এখনও আটটা বাজেনি।'

অনুপম মুখে বিষাদের ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আজ? আজ আমায় মাপ করতে হবে। বাড়ীতে মার শরীর ভাল নয়—'

আশালতা দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'মার শরীর খারাপ? যান যান শীগগির বাড়ী যান। আমিও রইলাম আপনিও রইলেন, একদিন গেলেই হবে'খন আমাদের বাড়ী। মাকে ফেলে কি করে যে এলেন!'

সাধনার জ্বর হইয়াছিল। সামান্য জ্বর। দুপুরে একবার শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিকালে আবার উঠিয়াছেন। অন্যদিন অনুপম কিছুই বলিত না, আজ সদ্য সদ্য আশালতার ব্যাকুলতা কানে বাজিতেছিল কি না, তাই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, 'জ্বর গায়ে উঠেছ যে?'

'ঘরের কাজ করবে কে?'

'ঝি আসে নি?'

'ঝি রাঁধবে না কি?'

'বললাম একটা ঠাকুর রাখ—'

'নবাবের মত কথা বলিস্ না অনু।'

বোঝা গেল জ্বর যত না হোক, সাধনার রাগ হইয়াছে অনেক বেশী। রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল, নিজের জন্য সাধনা বার্লি জ্বাল দিতেছিলেন।

অনুপম একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, 'নিমিকে কয়েকদিনের জন্য এনে রাখলে হত না?'

সাধনা বলিলেন, 'তুই কি ভাবিস বল্ তো? এখানে এনে রাখবার জন্য আমি নিমির বিয়ে দিয়েছিলাম, না?'

এ কথার কোন জবাব নাই, কারণ কথাটার পিছনে আরও অনেক কথা আছে। সাধনার বার্লি জ্বাল দেওয়া হইয়া গেলে অনুপম নিজেই একটা আসন পাতিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

ভাত বাড়িয়া দিয়া সাধনা বলিলেন, 'আজ কত বছর বাইরে থেকে একটি পয়সা ঘরে আসে নি, কখনও ভেবে দেখেছিস অনু? উনি টাকার গাছ পুঁতে রেখে যান নি।'

অনুপম নীরবে খাইয়া যায়।

'এ ভাবে নষ্ট করবার মত সময় কি তোর আছে অনু? জহরের সাজে, তার ঠাকুর্দা বড়লোক, তোর সাজে না। আরও পড়তে চাস্ পড়, ভবিষ্যতে যাতে উন্নতি হয় এমন কিছু করতে চাস কর, আমি যে ভাবেই হোক চালিয়ে যাব। একটা মাষ্টারী খালি আছে, তাই না হয় করব ক'বছর। কিন্তু তুই যদি এরকম উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াস্—'

সাধনা ঢোঁক গিলিয়া বলেন, 'হাত গুটোস নে, খা। জ্বর গায়ে রেঁধেছি, না খেয়ে উঠলে ভাল হবে না বলে রাখছি।'

সেদিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া অনুপম অন্ততঃ হাজার বার নিজের মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে আর উদ্দেশ্য-হীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। পরদিন বিকালে সে যে ভাল জামা-কাপড় পরিয়া আশালতার বাড়ীতে গেল, সেটা ঠিক উদ্দেশ্যহীন ঘুরিয়া বেড়ানর পর্য্যায়ে পড়ে না। আশা-লতার বাড়ীতে যাওয়াও তো একটা উদ্দেশ্য।

'আজ আপনি আসবেন ভাবতেও পারি নি।'

আশালতা যেন একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এ রকম ব্যাকুল ভাবে তার কাছে যারা ছুটিয়া আসে, তাদের কাছে আশা করার যে কিছু নাই, অনেক অভিজ্ঞতায় আশালতার এটুকু জ্ঞান জন্মিয়াছে। বাঁধা পড়িবার মত ভদ্রতাজ্ঞান যাদের থাকে, একদিন সভায় কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হইলে পরদিনই তার বাড়ী গিয়া হাজির না হইবার মত ভদ্রতা-জ্ঞানও তাদের থাকে। চোর-ডাকাত ছাড়া সুযোগ পাওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ সুযোগ গ্রহণ করার প্রতিভা সরল, আদর্শে অনুরাগী, ন্যাচুরেল পোইজ্-বিশিষ্ট মানুষ কোথায় পাইবে?

তবু, আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি আশালতা করিল না। বাড়ীখানা ছোট। ছোট বসিবার ঘরখানাতে মোটামুটি একটু আধুনিকতা আমদানী করিতে গৃহকর্ত্তার যে প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে, সেটা বেশ বোঝা যায়। কারণ, পুরাতন সোফাটিতে বসিলে জানালার ফাঁক দিয়া অন্দরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ে, সেখানে বাড়ীর লোকের আর্থিক অবস্থা ঢাকিবার কোন প্রচেষ্টাই নাই।

জানালার ফাঁকটুকু কে যেন এক ফাঁকে বন্ধ করিয়া দিল।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের এ সব ফাঁকি অনুপমের জানা আছে, সে বিচলিত হয় না। সারা বছর যে বাড়ীর মেয়েরা ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া বাসন মাজে, ঘর লেপে আর রান্না করে এবং অবসর সময়ে পরস্পরের চুলের অরণ্য হইতে উকুন বাছিয়া নখ দিয়া টিপিয়া টিপিয়া মারে, সেই বাড়ীর মেয়েরা ঠাকুর দেখিতে যাওয়ার সময় অতি জমকালো সাড়ী অতি জমকালো ভাবে পরিয়াছে দেখিলে যেমন অস্বাভাবিক মনে হয় না, গরীবের বাড়ীতে বাহিরের ঘরের এই সস্তা বড়লোক-ঘর ভাবও তেমনই অনুপমের খাপছাড়া ঠেকে না। ইহাই নিয়ম, ইহাই প্রথা।

'আপনার মা কেমন আছেন?'

'মা? মা ভাল আছেন।'

অনুপম একটু বিস্ময়ের সঙ্গে আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। মুখখানা বড় গম্ভীর আশালতার।

তার সঙ্গে পরিচয় একদিনের, তার মাকে এখনও সে চোখেও দেখে নাই। তার মার জন্য আশালতার এই আশ্চর্য্য দুর্ভাবনার কারণটা অনুপম ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

কিন্তু আশালতার মুখের গাম্ভীর্য্য ক্ষণস্থায়ী। অন্যমনে বিষাদের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্বাসটা টানিবার সময়েই সে অপূর্ব্ব কৌশলে হাসিয়া ফেলে, 'একটা কথা ভাব-ছিলাম।'

তারপর প্রতি সপ্তাহে এক এক ধাপ করিয়া আশালতার সঙ্গে অনুপমের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে থাকে, ধাপ-গুলি অনুপমের অপরিচিত। কিসের সিঁড়ি বাহিয়া কোথায় উঠিতেছে সে বুঝিতে পারে না, কিন্তু সেই জন্যই উঠিতে যেন আরও মজা লাগে।

আশালতা তার সঙ্গে আলাপ করে নানা বিষয়ে,—সমাজ, ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, কিছুই বাদ যায় না। এই সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে একটি দুটি করিয়া সে প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করে।

'এবার কি করবেন ভাবছেন?'

অনুপম ভাসাভাসি ভাবে জবাব দেয়, 'কি আর করব, চাকরী-বাকরী খুঁজছি।' শুনিয়া আশালতা খুসী হইতে পারে না।

'আরও পড়ুন না? এখন চাকরী করলে তো কেরাণী-গিরি না হয় মাষ্টারী। বরাবর ভাল রেজাল্ট করে আসছেন, ফিউচারটা নষ্ট করবেন না।'

আরও সপ্তাহখানেক অনুপম আসল অবস্থাটা গোপন করিয়া রাখে, তারপর কেন যে সব কথা খুলিয়া বলিয়া ফেলে, নিজেই বুঝিতে পারে না।

আশালতা গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ ভাবে। ভাবিতে ভাবিতেই অনুপমের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া চাহিয়া দেখে এবং একটি বিস্কুট নিজের হাতে তার মুখে তুলিয়া দেয়।

'আপনার ঠাকুর্দ্দা আপনাদের ত্যাগ করেন নি, আপনার বাবাই আপনার ঠাকুর্দ্দাকে ত্যাগ করেছিলেন, না?'

অনুপম নীরবে সায় দিয়া যায়।

'আপনার ঠাকুর্দ্দা এখন আর আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন না? সাহায্য করতে চান না?'

'চাইলে কি হবে? মা রাজী নন।'

আশালতা নিজের হাতে আর একখানা বিস্কুট অনুপমের মুখে তুলিয়া দেয়।

'আপনি যদি আপনার ঠাকুর্দ্দার কাছে গিয়ে পড়ার জন্যে টাকা চান, দেবেন না?'

'দেবেন, কিন্তু—'

'এমনি যদি টাকা চান, দেবেন না?'

'দেবেন, কিন্তু—'

'আপনি যদি গিয়ে বলেন, ঠাকুর্দ্দা, আমি বিলেত যাব আমায় হাজার দশেক টাকা দিন, এক সঙ্গে নয়, মাসে পাঁচ সাত শো করে দিন,—তিনি দেবেন?'

'দেবেন, কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'মা জানতে পারলে আমার মুখ দেখবেন না।'

আশালতা মৃদু হাসিয়া বলিল, 'মা কখনও ছেলের মুখ না দেখে থাকতে পারে? আপনি বড্ড ছেলেমানুষ।'

অনুপম ঘাড় উঁচু করিয়া বলে, 'মার মনে আমি কষ্ট দিতে পারব না। তা ছাড়া বাবা মরবার সময় যা বলে গেছেন, তারও তো একটা দাম আছে? আমি বরং সারাজীবন কেরাণীগিরি করব, তবু ঠাকুর্দ্দার টাকা নিয়ে—'

আশালতা শান্তভাবে বলে, 'ছি, তাই কি আপনি পারেন? আপনাকে চিনি আমি। মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে জীবনে বড় হওয়ার চেয়ে কেরাণীগিরি অনেক ভাল।'

অনুপমের মুখে একটা কাল মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল, সে মেঘ কাটিয়ে যায়। পকেটে রুমাল খুঁজিতে খুঁজিতে আশালতা নিজের আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিয়া চকিতে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাওয়ায় নিজেকে সে কৃতার্থও মনে করে।

সপ্তাহ দুই পরে একদিন ছাত্র-সমাজের এক সাধারণ সভায় আশালতার সঙ্গে হাজির হইয়া সে দেখিতে পায়, বক্তৃতামঞ্চে ছোট বড় চেনা অচেনা নেতাদের মধ্যে জহরও বসিয়া আছে।

ছাত্র-সভা হইলেও ধরিতে গেলে এটা প্রকাশ্য জনসভা। এখানে কিছু বলিবার সাহসও অনুপমের ছিল না, সাধও ছিল না। ব্রহ্মানন্দের পাল্লায় পড়িয়া তাকে কিছু বলিতে হইল। ব্রহ্মানন্দ তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিয়া দিল যে, আলোচ্য বিষয়ে শিক্ষা-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কার সমিতির মতামত সুবিখ্যাত ছাত্র-নেতা শ্রীযুক্ত অনুপম বাবু সভায় ব্যাখ্যা করিবেন। ঘোষণা করিয়া আরক্ত মুখখানা অনুপমের মুখের কাছে আনিয়া চাপা গলায় সে বলিল, 'আপনার পদবীটা ভুলে গেছি।—বসে রইলেন যে? উঠুন, বলুন কিছু?'

অনুপম ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে বলিল, 'আপনি সমিতির প্রেসিডেন্ট, আপনিই বলুন না?'

ব্রহ্মানন্দ ক্রোধে আরও লাল হইয়া বলিল, 'আমি বলতে পারলে কি আপনাকে বলতে বলতাম? শীগগির উঠুন।'

বলাটা ভাল হইল না অনুপমের। নিজের ভাঙ্গা ভাঙ্গা থামা থামা কথা শুনিতে শুনিতে নিজের কান দুইটা তাহার গরম হইয়া উঠিতে লাগিল। দু'একবার মনে হইল সভার ভিতর হইতেও যেন দুই চারিটা টিটকারী কানে আসিয়া বাজিতেছে। শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্য-সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য আর আদর্শ সম্বন্ধে যা মনে পড়িল, কয়েক মিনিটের মধ্যে কোন রকমে তাই অতি দুর্ব্বোধ্য ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সে থামিয়া গেল।

বসিতে গিয়া দেখিল, আশালতার পাশে তার আসনটি ব্রহ্মানন্দ বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। কি যেন সে

বলিতেছে আশালতাকে, আশালতা মুগ্ধ বিস্ময়ে তার সুন্দর মুখখানার দিকে চাহিয়া আছে। খানিক তফাতে বসিয়া অনুপম বিবর্ণ মুখে দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল। রাগে দুঃখে অভিমানে তার মনে হইতে লাগিল, যে কোন উপায়েই হোক তরঙ্গ আজ মহাশূন্যের যেখানে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া আছে সটান সেইখানে চলিয়া যায়।

অনুপমের মুখ দেখিয়া আশালতা ব্রহ্মানন্দের দিকে আরও খানিকটা ঝুঁকিয়া আরও নিবিড়ভাবে আলাপ জুড়িয়া দিল।

অনুপম উঠিয়া চলিয়া যাইবে ভাবিতেছে, এমন সময় বক্তৃতা দিতে উঠিল জহর। কি চমৎকার বক্তৃতাই জহর দিল! কি হাততালিটাই থাকিয়া থাকিয়া সভায় উঠিতে লাগিল!

উঠুক, আশালতা অনুপমকে আগেই মারিয়া ফেলিয়াছে, এগুলি শুধু খাঁড়ার ঘা। তবু, মরা মানুষও যে খাঁড়ার ঘায়ে এত কষ্ট পাইতে পারে, তা কি অনুপম জানিত! তাদের বাড়ীতে চিলেকোঠার ঘরে সন্ধ্যার ঘনায়মান আবছা অন্ধকারে সীতা পিসীমা তরঙ্গ ও জহরের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, অনুপমের মনে পড়িয়া যায়। সেই জহর এমন চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে? তাও আবার সেই সভায়, যেখানে খানিক আগে অতি সাধারণ কয়েকটা কথা বলিতে গিয়া সে লোক হাসাইয়াছে! অনুপমের মনে হয়, এত ভাল করিয়া বলা যেন তাকে অপদস্থ করার জন্য জহরের ইচ্ছাকৃত বাহাদুরী।

সভা ভাঙ্গিলে আশালতা অনুপমকে বলিল, 'চলুন, আমরা যাই।'

ব্রহ্মানন্দ বলিল, 'বাড়ী যাবেন তো? চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।'

আশালতা শুষ্কস্বরে বলিল, 'কিছু মনে করবেন না ব্রহ্মানন্দ বাবু, আমাদের একবার মার্কেটে যেতে হবে।'

ব্রহ্মানন্দ বলিল, 'আমিও তো মার্কেটে যাব।'

আশালতা বলিল, 'আমরা একজনদের বাড়ী হয়ে যাব—আপনার সঙ্গে যেতে পারছি না।'

কারও বাড়ী নয়, মার্কেট নয়,—মাঠ। ব্রহ্মানন্দকে প্রত্যাখ্যান করার মৃত-সঞ্জীবনীতেও অনুপমের মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইতেছে না দেখিয়া আশালতা বলিল, 'এস, একটু বসি।'

একটা গাছের নীচে আবছা অন্ধকারে অনুপমের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল, 'তুমি বড্ড ছেলেমানুষ।'

সুতরাং দিন দশেক পরে আশালতার সঙ্গে অনুপমের বিবাহ হইয়া গেল।

অনুপম কিছুদিন অপেক্ষা করার কথা বলিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'একটা চাকরী বাকরী ঠিক করে নিই আগে?'

আশালতা বলিয়াছিল, 'হবে, হবে, সব হবে।'

কি যে হইবে জানিলে অনুপম হয়ত ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, কিন্তু বিপদটা ঠেকাইতে পারিত কি না সন্দেহ।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ভারত শাসনে ইংরাজের ভুল

...ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থাতেই ইংরাজের সর্ব্বপ্রধান ভুল রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরাজের প্রধান ভুল রহিয়াছে বলিয়াই ভারতবর্ষে যাঁহারা যত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বেশীর ভাগ মানুষ ইংরাজের সহিত তত অধিক কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ভারতীয় সামাজিক ওলট পালট করিয়া ভারতবাসী জনসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিবার পথ কণ্টকিত করিতেছেন।...

প্রাদেশিক ঐক্য ও ভাষার প্রভাব

শ্রীসুশীলকুমার বসু

ভারতবর্ষের উন্নতি ও শক্তিলাভের পক্ষে তাহার অখণ্ড ঐক্য অপরিহার্য্য। কিন্তু, এই ঐক্যের পথে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা, ভাষার অনৈক্য প্রভৃতি নানা অন্তরায় আছে। এই সকল অন্তরায়ের মধ্যে অনেকগুলির ভিত্তি নিতান্তই কৃত্রিম ও কাল্পনিক; রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রয়োজন ও আন্দোলনের চাপে ইহারা আপনা হইতেই লুপ্ত হইবে বা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। কিন্তু, প্রাদেশিক বিভাগের সীমার সহিত প্রাকৃতিক বিভাগের সীমারেখা কোন কোন ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে বলিয়া নিজ প্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যেক প্রদেশবাসীর মনে একটা খণ্ড ঐক্যের বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঐক্যের কেন্দ্রগুলি বৃহত্তর ঐক্যের পথে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাধা সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য নানা দিক্ দিয়া, বিশেষ করিয়া শাসন-বিভাগের জন্য থাকিয়া যাইবে বলিয়া প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধও থাকিয়া যাইবে। কোন বিশেষ প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার উপর, আর্থিক ব্যবস্থার উপর, শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর, সমৃদ্ধি বা দারিদ্র্যের উপর সেই প্রদেশের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে বলিয়া এবং অন্য কোন প্রদেশের এই সকল ব্যাপারের সহিত কোন প্রদেশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই বা থাকিবে না বলিয়া, প্রত্যেক প্রদেশবাসীর নিজ প্রদেশ সম্বন্ধেই শুধু সচেতন থাকা অনেকটা স্বাভাবিক হইবে। কিন্তু কোন প্রদেশের পক্ষে এই সকল সুবিধা পাওয়া এবং রক্ষা করার জন্য যে নিখিল ভারতের ঐক্য এবং বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংযোগ, ঐক্য ও মৈত্রী অপরিহার্য্য, সে কথাটা কতকটা পরোক্ষ হওয়ায় লোকে তাহা ভুলিয়া থাকিবে এবং প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় পরিণত হইবে। তাহার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে মৈত্রীর পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ও সহযোগিতার পরিবর্ত্তে প্রতিযোগিতার ভাব গড়িয়া উঠি[illegible] ইহা ভারতবর্ষের ঐক্যের পথে, তাহার উন্নতি ও শক্তিলা[illegible] পথে প্রতিবন্ধক হইবে।

এই প্রাদেশিক বিদ্বেষ ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিয়াছে। ইহার উৎপত্তি ও বৃদ্ধির ইতিহাস প্রদান করা এখানে সম্ভব না হইলেও সংক্ষেপে এ কথা বলা যাইতে পারে যে, অর্থনীতিক প্রতিযোগিতা হইতেই ইহার আরম্ভ হইয়াছে এবং এই প্রতিযোগিতার তীব্রতাই এই বিদ্বেষকে তীব্র করিয়া তুলিতেছে। সকল প্রদেশেই অর্থকষ্ট ও কর্ম্মাভাব রহিয়াছে, অথচ প্রায় প্রত্যেক প্রদেশেই অন্য কোন না কোন প্রদেশের লোক কোন না কোন বিশেষ কর্ম্মে পারদর্শিতার ফলে কর্ম্মের দুই একটি ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আছেন এবং অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজ প্রদেশে লইয়া যাইতেছেন। নিজ প্রদেশের লোকেরা কর্ম্মাভাবে বসিয়া আছে ও অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতেছে, আর তাহাদের মুখের অন্ন অন্য প্রদেশের লোকেরা গ্রাস করিতেছে, এ অবস্থা লোকে সহজে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এখান হইতেই প্রত্যেক প্রদেশ সেই প্রদেশবাসীর জন্য—এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, এই কারণ হইতেই নানা প্রদেশে বাঙ্গালা-বিদ্বেষ (বাঙ্গালীরা সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী শিক্ষাকে গ্রহণ করেন এবং বড় চাকরি প্রভৃতি লইয়া ভারতের, বিশেষ করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারতের সব প্রদেশে ছড়াইয়া পড়েন এবং সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করেন) এবং বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার আন্দোলনের উৎপত্তি।

এই প্রাদেশিক মনোভাব আরও বর্দ্ধিত হইয়া একটা সমস্যার আকারে যাহাতে দেখা দিতে না পারে, ঐক্যের বোধ নষ্ট করিয়া দিতে না পারে, তাহার জন্য একদিকে যেমন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে যে মৌলিক একত্ব রহিয়াছে এবং সকল প্রদেশেরই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য যে ঐক্যের প্রয়োজন রহিয়াছে, সে বিষয়ে লোককে সচেতন রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনই অন্যদিকে প্রদেশগুলির মধ্যে যাহাতে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, ব্যবধানের কারণগুলি দূরীভূত হয়, সকলেই সকলের শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি জানিবার সুযোগ পায়, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিতে

পারে, তাহার জন্যও সর্ব্ববিধ চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল কারণে প্রাদেশিক মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অনেক-গুলি যে-কোন অবস্থায় থাকিয়া যাইবে এবং সম্ভবতঃ প্রাদেশিকতাকে স্থায়ী ও বর্দ্ধিত করিতে সাহায্য করিবে। বিভিন্ন প্রদেশের শাসন-বিভাগ পৃথক্ থাকিবে, কোন কোন বিষয়ে স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকিবে, এক প্রদেশে অন্য প্রদেশবাসীর অর্থোপার্জ্জন লইয়াও কিছু কিছু ঈর্ষার ভাব থাকিয়া যাইবে। কিন্তু আবার প্রাদেশিক ভেদের মূলে যে সব কারণ আছে, তাহার কোন কোনটির সাহায্যে এই ভেদ দূর করিবার কার্য্যও অগ্রসর হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবধানের কারণগুলি বিশ্লেষন করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার মধ্যে ভাষার ব্যবধানই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ও শক্তিশালী। এই ভাষাই আবার সংযোগ স্থাপনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপায় হইতে পারে। প্রাদেশিক সীমানা অনেক ক্ষেত্রে ভাষার সীমানাকে অনুসরণ করিয়া নির্ণীত হইয়াছে: যেখানে তাহা হয় নাই, সে ক্ষেত্রে বিভাগ অস্বাভাবিক হইয়াছে এবং ভাষার সীমানা অনুসরণ করিয়া প্রদেশগুলির পুনর্গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। ভারতীয় জনমতের ইহা একটি বিশেষ দাবী।

বর্ত্তমান রাজনীতিক প্রদেশ-বিভাগের পূর্ব্বে ভাষার সীমাই প্রকৃত পক্ষে প্রাদেশিক সীমা ছিল এবং ভাষাকে কেন্দ্র করিয়াই বাঙ্গালী, উড়িয়া, হিন্দুস্থানী, মারাঠী প্রভৃতি জাতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক একটা বিশেষ ভৌগোলিক সীমাই এক একটা ভাষার অধিকারের সীমা। নানা বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক কারণে ভারতের কোন কোন স্থানে একাধিক ভাষার প্রচলন থাকিলেও ভারতের প্রধান ভাষাগুলি অনেকটা ভৌগোলিক সীমা অনুসরণ করিয়াছে। যে সকল অঞ্চলে একাধিক ভাষার প্রচলন আছে, সে সব স্থানে ভাষাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রদেশবাসীরা বিভিন্ন জাতি বা দলে বিভক্ত হইয়াছেন। সামাজিক কারণে এক ভাষাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে যে সকল উপ-বিভাগ আছে, বহুবিধ অবস্থার চাপে পড়িয়া তাহা যত শিথিল হইবে, ভাষার ভিন্নতাই তত দলের বা জাতির ভিন্নতার একমাত্র কারণ ও লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ভাষার পার্থক্যই মানুষ ও মানুষের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান গড়িয়া তুলে। ভাষা না জানিলে একজন আর একজনের মনের কথা জানিতে পারে না, তাহার সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতে পারে না, তাহার আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির সঠিক ব্যাখ্যা জানিতে পারে না, মানুষের জীবনের উপর যাহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী সেই চিন্তা ও ভাবধারার সন্ধান জানিতে পারে না, কাজেই, একে অপরকে পর মনে করিতে শিখে।

একদল বাঙ্গালী, একদল হিন্দুস্থানী, একদল উড়িয়া এবং একদল মাদ্রাজী যদি একত্রিত হন, তবে কেহ কাহারও কথা বুঝিবেন না—প্রত্যেক দল অন্য প্রত্যেক দলের খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি স্থূল কাজগুলি লক্ষ্য করিতে পারেন, কিন্তু কোন দলই অন্য কোন দলের মানসিক ও বুদ্ধিগত সূক্ষ্মতার বিষয় কিছু জানিতে পারেন না এবং তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইতে পারেন না। অন্যদের পার্থক্যের পাশে নিজেদের ঐক্য বেশী করিয়া চোখে পড়ে এবং তাহাও আবার অপরকে পর মনে করিতে শিখায়। এইরূপে ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে পরিচয়ের যোগসূত্র কিছু গড়িয়া উঠিতে পারে না। অন্যদিকে যাঁহারা এক ভাষায় কথা বলেন, তাঁহারা পরস্পরের সহিত আত্মীয়তা অনুভব করেন, একই ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় একই চিন্তা ও ভাবধারার প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া উঠেন।

দেখা গেল, প্রাদেশিকতার মূলে ভাষার প্রভাব অনেকখানি রহিয়াছে। ভাষার ভিন্নতা নষ্ট হইলে যে, এই বিচ্ছিন্নতার ব্যবধানও নষ্ট হইতে পারে, আমাদের সমসাময়িক ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ আছে। ভারতের সকল প্রান্তের লোকের মধ্যেই যে একটা ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়াছে, আমরা যে অনেকটা এক জাতিতে পরিণত হইয়াছি, আমাদের মধ্যে যে একই চিন্তা ও ভাবধারা কার্য্য করিতেছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। একযোগে এক কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার জন্য যে ঐক্যের ও সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন হয়, তাহাও যেন কতকটা পরিমাণে আমরা লাভ করিয়াছি। যাঁহাদের কথা শুনিয়া কাজ করিতেছি, যাঁহাদের কথায় আমরা প্রভাবিত হইতেছি, যাঁহাদের কথায় আমরা গুরুত্ব দিতেছি, তাঁহারা আর প্রাদেশিক নেতামাত্র নহেন। আমরা এক ব্রিটীশ শাসনের অধীন রহিয়াছি, সকলেরই দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগ

প্রায় এক ধরণের, ইহা আমাদের এক হইবার অনেকখানি কারণ হইয়াছে। কিন্তু, আমাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে এই বোধ জাগিবার পূর্ব্বেও আমাদের এক হওয়া যে সম্ভব হইয়াছে—তাহাও ইংরাজী ভাষার সহায়তায়। আজ যে নিখিল ভারত সভা-সমিতি সম্মেলন সম্ভব হইতেছে, নিখিল ভারতের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলা যাইতেছে, ভারতের সর্ব্বত্র তাহার নির্দ্দেশ মানিয়া একই সময়ে একই কাজ করা সম্ভব হইতেছে, তাহাও এই ইংরাজী ভাষার প্রসাদে। ভারতের সকল প্রদেশের নেতারা একত্র সমবেত হইয়া যুক্তিতর্ক ও আলোচনাদি করিয়া একটা বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন, তাহাও সকলেই ইংরাজী জানেন বলিয়া। ভারতের যে কোন প্রদেশের বড় নেতাদের সারগর্ভ বক্তৃতা, মূল্যবান্ উপদেশ এবং প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশ ভারতের সকল প্রদেশের লোকেই জানিতে পারিতেছেন। সকল প্রদেশের ইংরাজীতে লিখিত পুস্তক-পত্রিকাদি সকল প্রদেশের সকল ভাষার লোকের কাছেই যাইতেছে এবং তাহা সমগ্র ভারতের সাধারণ সম্পদ্ হইয়া আছে। প্রাদেশিক ভাষায় দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাব অতিশয় অল্পদিনের কথা। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলি সবই (এবং এখনও প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলি) ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। এ সকলের প্রভাবে আমাদের রাজনীতিক জীবন ও সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপরও ইহারা যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নগণ্য নহে। নীরবে ও অলক্ষ্যে হইলেও ইহা আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়িয়া তুলিয়াছে। ইংরাজীতে প্রকাশিত যে সকল সাময়িক পত্রিকা আমাদের গভীর চিন্তা ও ভাবের বাহন হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতের কৃষ্টিগত ঐক্যকে দৃঢ় করিয়াছে। এক প্রদেশের ছাত্রেরা সহজে অন্য প্রদেশে পড়িতে যাইতে পারিতেছেন, এক প্রদেশের শিক্ষিত লোকেরা অন্য প্রদেশে যাইয়া সেখানকার ইংরাজী-শিক্ষিত লোকদের সহিত অবাধে মিশিতে পারিতেছেন। সমগ্র ভারতের ঐক্যসাধনে এ সকলের মিলিত ফল কম সহায়তা করে নাই।

আমরা যদি প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা বিবেচনা করি, তাহা হইলেও দেখিতে পাইব যে, একদিকে ব্যাবহারিক জীবনে এক ভাষার অভাব এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছিল (তাহার অন্যান্য প্রবল কারণও সব অবশ্য ছিল), আবার অন্যদিকে কৃষ্টিগত ঐক্য যে কতকটা রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা একই সংস্কৃত ভাষা সকল প্রদেশের কৃষ্টির বাহন ছিল বলিয়া। ব্যাবহারিক জগতে সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ছিল না বলিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে লৌকিক সংযোগ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছিল এক প্রদেশের লোকের সহিত আর এক প্রদেশের লোকের কিছুমাত্র সংযোগ ছিল না। কিন্তু, তাহা হইলেও ভারতের সকল প্রান্তের লোকের মধ্যে ঐক্যের একটা ক্ষীণধারা প্রবাহিত ছিল, যাহা ভারতের বাহিরের লোকদের হইতে তাঁহাদের সকলকেই স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল। সকল প্রদেশেরই কিছু কিছু লোক সংস্কৃত শিখিতেন এবং সংস্কৃত হইতে গৃহীত ও অনূদিত প্রাদেশিক ভাষার পুরাণ, কাব্য, কাহিনী প্রভৃতিতে তাঁহাদের চিত্ত পুষ্ট হইত। কাজেই, পরস্পর হইতে দূরে থাকিয়া এবং পরস্পরের নিকট অপরিচিত থাকিয়াও ইঁহারা কতকটা এক থাকিয়া গিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার এই প্রভাব না থাকিলে ভারতবাসীদের মধ্যে বর্ত্তমান ঐক্য-প্রতিষ্ঠা হয়ত আরও কষ্টকর হইত।

শুধু মাত্র ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত হইতেই দেখা গেল যে, ভাষার পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে, আবার যেখানে অন্য সর্ব্ব প্রকার বিচ্ছিন্নতা ছিল, সেখানে ভাষার প্রভাব ঐক্যের ধারাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে ঐক্য যখন আমাদের উন্নতির পক্ষে, শক্তির পক্ষে, এমন কি বাঁচিবার পক্ষে অপরিহার্য্য এবং এই ভিন্নতাকে গড়িয়া তুলিবার ও পোষণ করিবার মত কতকগুলি কারণ যখন থাকিয়াই যাইবে, তখন মানুষের ঐক্যবিধানে ভাষার এই প্রভাবের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

অবশ্য, এ দিকে আমাদের রাষ্ট্রনীতিক নেতাদের দৃষ্টি পূর্ব্ব হইতেই পড়িয়াছে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা হিন্দীকে সকল ভারতের পক্ষে সাধারণ ভাষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সমগ্র ভারত যদি একটা ভাষাকে সাধারণ ভাষা বলিয়া কার্য্যতঃ মানিয়া লয় এবং সকলে বা অধিকাংশ লোকে ইহা শিখিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা

বর্ত্তমানে আমাদের ঐক্যের পথকে সুপ্রশস্ত করিবে কি না, তাহা গভীর চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু, সহজে যে লোকে তাহা করিতে চাহিবে না, এবং প্রত্যেক প্রদেশের লোকের মাতৃভাষা-প্রীতি যে ইহার পথে অনেকটা বাধা জন্মাইতেছে, তাহাও কয়েক বৎসরের হিন্দী চালাইবার চেষ্টার মধ্যে দেখা যাইতেছে। হিন্দী সকল প্রদেশ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে যে কাজ হইবে, বর্ত্তমানে ইংরাজীর সাহায্যে তাহা অবশ্য অবশ্য অনেক পরিমাণে হইতেছে, যদিও হিন্দী বেশী লোকে শিখিবে বলিয়া এবং শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে বলিয়া এই কাজ হয় তো আরও ভাল ভাবে হইতে পারে। কিন্তু, পূর্ব্ব হইতেই প্রাদেশিক ঈর্ষা রহিয়াছে বলিয়া এবং অনেকে সাধারণ ভাষা হিসাবে ইংরাজীর ব্যবহারই অধিকতর উপযোগী ও লাভের মনে করেন বলিয়া হিন্দী চালাইবার চেষ্টার দ্বারা পুরাপুরি সফলতা পাইতে হয় অনেক দেরী হইবে, না হয় কখনই পাওয়া যাইবে না। কাজেই, ঐক্যের উপর ভাষার অসামান্য প্রভাবের কথা মনে রাখিয়া শুধু মাত্র হিন্দী চলিতে পারে কি না, সেই চেষ্টা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা আমাদের পক্ষে উচিত হইবে না। বরং, সাধারণ ভাষার কাজ ইংরাজীর উপর ছাড়িয়া দিয়া যদি এই প্রকার চেষ্টা করা হইত যে, স্কুল-কলেজে প্রত্যেক ভারতীয়কে নিজের মাতৃভাষা ব্যতীত আর একটি প্রধান ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে যেমন একদিকে প্রত্যেক প্রদেশেরই এক এক দল লোক অন্যান্য সব প্রদেশেরই ভাষা শিখিতেন এবং তাহার মধ্য দিয়া যোগাযোগ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইত, তেমনই অন্যদিকে এই ব্যবস্থায় কোন প্রদেশেরই লোকের ক্ষুব্ধ হইবার কারণ থাকিত না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে ভাবে, চিন্তায় ও কর্ম্মে যে সংযোগ আছে তাহাও এইরূপ পরস্পরের ভাষাশিক্ষার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে ও রক্ষিত হইতেছে। আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি অন্ততঃ এমন কথাও বলিতেন যে, হিন্দী যাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, সব প্রদেশের এমন সব লোকই ভারতের সাধারণ ভাষা হিসাবে হিন্দী, শিখিবার চেষ্টা করিবেন এবং যাঁহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাঁহারা অন্ততঃ এক কোটি লোকের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, এমন যে কোনও একটি ভারতীয় ভাষা (হিন্দী ব্যতীত) শিক্ষা করিবেন, তাহা হইলে অ-হিন্দী-ভাষীদের ক্ষুব্ধ হইবার কারণ কমিয়া যাইত এবং প্রকৃতপক্ষে সকলের প্রতিই অনেকটা সমান অপক্ষপাত আচরণ করা হইত। ইহাতে হিন্দী-ভাষীরাও অন্যান্য প্রদেশবাসীদের সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে পারিতেন।

অন্ধকারে

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

দিক্ দিগন্ত ভরে রাজে শুধু স্তব্ধ অন্ধকার,
অস্ফুট যত মাধুরীর চলে চুপিসারে অভিসার।
যতেক সুষমা একীভূত করে অন্ধকারের বুকে
কোন্ সে আদিম তিয়াসী কাঁদিছে আতুর গভীর দুখে!
ক্রন্দনে উঠে ফুটে
কবিতার নব-অভিনন্দন অন্ধকারের পুটে॥

অস্ফুট এই প্রকাশ আভাসে বেদনার তটতলে
এ কী একাকার! আঁধার আলোক হাতে হাত বাঁধি মিলে!
ধরণীর মহা রহস্য মধু পিয়ে অঞ্জলি ভরি,
অমার আঁধারে ছুটিছে তরণী রাকারে লক্ষ্য করি!
জ্বালিয়া জীবন-ধূপ
তব মিলনের পথে ছুটে চলি, হে আমার অপরূপ!

শিক্ষার অপচয়

—শ্রীসন্তোষকুমার দে

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার যে ঘোর অপচয় হইতেছে, সে-বিষয়ে গত কয়েক বৎসর হইতে বিশেষ আলোচনা চলিতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের এড়ুকেশন-কমিশনার শিক্ষার অপচয় বিষয়ে দেশবাসীর প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাহার পর দেশের অনেক শিক্ষা-বিশারদ এ-বিষয়ে বহু বাদানুবাদ করিয়াছেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ফল হয় নাই। না হউক, তবু এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টির বারংবার আলোচনা করিতে কোন দোষ নাই।

শিক্ষার এই অপচয়ের প্রধান কারণ মনে হয়, শিক্ষাদান বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যহীনতা। শিক্ষাদান বা শিক্ষালাভের একটা উদ্দেশ্য থাকা উচিত; কিন্তু আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে, কোন একটা লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শিক্ষাদান করা হয়, বা ছাত্রেরাও কোন একটা উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তাহা মনে হয় না। ছাত্রেরা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া আই-এ অথবা আই-এস-সি ক্লাসে ভীড় করিয়া ভর্ত্তি হয়; তারপর পাশের পর, যথানিয়মে বি-এ অথবা বি-এস-সি পড়িবার জন্য দৌড়ায়; বি-এ বা বি-এস-সি পাশ করার পর, একটু বিচারের অবকাশ মেলে—ল' পড়িবে, না পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হইবে? তাড়াতাড়ি যা হয় একটা স্থির করিয়া ফেলিয়া, ল' অথবা পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া যায়। তারপর পাশ বা ফেল। পাশ করিলে, ভাবনা কি করিবে? ফেল করিলে নিশ্চিন্তমনায় আবার দুই চারিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। ল' পাশ করিবার পর নিয়মমত দিনকতক অশথতলা দর্শন করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে কেরাণী, মাষ্টারী, ইন্‌সিওরেন্সের দালালী, যা হয় একটা কিছু পাইবার জন্য দরখাস্ত লিখিতে লিখিতে হাত ব্যথা হইয়া গেলে, অদৃষ্টকে এবং শেষে ইউনিভারসিটিকে গালি পাড়িতে থাকে। এম-এ অথবা এম-এস-সি পাশ করিলেও এই নিয়মের ব্যতিক্রমের কোন আশা দেখা যায় না।

প্রতি বৎসর এই যে হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বাহির হইতেছে, ইহারা যায় কোথায়? মাষ্টারী বা কেরাণী-গিরি আর কত মিলিবে? ... উপার্জ্জন পাইবার পথ ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কোন্ আশায় মগ্ন হইয়া ছাত্রেরা এই পাগলের মত পরিশ্রম করিতেছে, আর অভিভাবকেরাই বা কি উদ্দেশ্যে কষ্টার্জ্জিত অর্থের এই ভাবে অপব্যয় করিতেছেন? বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই বা কি উদ্দেশ্যে বৎসরের পর বৎসর ডিগ্রিদানরূপ পুণ্যকর্ম্ম যথানিয়মে পালন করিয়া আসিতেছেন? আজ সে কথা গভীরভাবে ভাবিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

এই যে জন-শিক্ষা, যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রথমে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ত' (অর্থাৎ কেরাণীকুলের সৃষ্টি*) আশাতিরিক্তভাবে সফল হইয়াছে। তবে এখনও সেই উদ্দেশ্য লইয়া চলিলে হইবে কেন? ডিগ্রির পিছনে ছুটিবার পূর্ব্বে ছাত্রকে ভাবিতে হইবে, এত অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে তাহার লাভ কি হইবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও ভাবিবার সময় আসিয়াছে, বৎসরে বৎসরে এত উপাধি বিতরণ করিয়া সত্যই তাঁহারা দেশের অজ্ঞতা দূর করিতে পারিতেছেন কি না, দেশের কল্যাণ হইতেছে কি না? এতগুলি শিক্ষিত যুবকের অর্থোপার্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি না? বিদ্যার সহিত অর্থোপার্জ্জনের সম্বন্ধ নাই, বা বেকার-সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একেবারেই নাই, এ কথা বলিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যৎ ভালমন্দের বিচার না করিয়া, দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে উপাধি বিতরণ সম্ভবতঃ সভ্য জগতের কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ই করেন না; কাজেই আমাদের দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি যদি বলেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করাই আমাদের কর্ত্তব্য, শিক্ষা সমাপনান্তে ছাত্রেরা চাকুরী পাইবে কি না, সে চিন্তা আমাদের নয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের চিন্তাশক্তিতে ঘুণ ধরিয়াছে। জানি, দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বলি-

* "The production of clerks was the chief purpose for which the system was originally elaborated."

F. F. Monk, *Educational Policy in India.*

বেন, জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানের চর্চ্চা-করিতে হইবে, বিদ্যা বণিক-বৃত্তি নয়, বিদ্যার যা উদ্দেশ্য—চরিত্র সংগঠন, হৃদয়ের বৃত্তিগুলির সম্যক্ উন্নতি সাধন, তাহা সফল হইলেই হইল। আদর্শ হিসাবে কথাগুলি হয়ত নিখুঁত হইতে পারে, উপাধি-বিতরণ সভাতেও হয়ত এই সব কথা বলিয়া ছাত্রদের উৎসাহিত করা চলিতে পারে ; কিন্তু জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত যে সমস্ত যুবক, তাহাদের কি এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব শুনান চলে? যাঁহারা জীবনে কখনও অর্থকষ্টে পড়েন নাই, বা যাঁহারা জীবন-সংগ্রাম সহজেই জয়লাভ করিয়া সমাজে আপন আসন করিয়া লইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মুখে এ-কথা শোভা পায়—সাধারণে এ কথা বলিতে পারে না, শিক্ষাকর্ত্তারা ত পারেনই না, কারণ তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক।

এ অবান্তর কথা থাক্। আমাদের ভাবিবার বিষয় এই যে, প্রতি বৎসর পাইকারী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইতে যে গ্র্যাজুয়েট বাহির হইতেছে, ইহাতে দেশের উপকার কি হইতেছে? যাহারা তক্‌মা লইয়া বাহির হইতেছে, তাহাদেরই বা এই পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে কি লাভ হইতেছে? তাহারা কি সকলেই গ্র্যাজুয়েট হইবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে? তাহারা কি শুধু জ্ঞানের জন্যই এই কৃচ্ছ্রসাধনে ব্রতী হইয়াছিল—না অন্য কোন মূল উদ্দেশ্য ছিল? সে কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। যে উদ্দেশ্য লইয়া শতকরা ৯৯ জন ছাত্র অধ্যয়নে রত হয়, তাহা সকলেই জানেন; কিন্তু তাহা সফল হইবার কি কোন আশা আছে? তাহা নাই ও থাকিতে পারে না, এ কথা সকলকেই অতি দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রভূত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের পর যে-নৈরাশ্য এবং অনুশোচনা যুবকদের বা তাঁহাদের অভিভাবকদের ভোগ করিতে হয়, তাহার ফলাফল শিক্ষা-কর্ত্তাদের ও সরকারের আর না ভাবিয়া থাকিবার উপায় নাই।

দেশব্যাপী এই যে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্নাভাব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের যে নৈতিক অবনতি আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই নৈতিক অধঃপতন ব্যক্তি-বিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা সমাজ-দেহে বিসর্পিত হইয়া উঠিবে এবং তাহার চিহ্ন রাজনৈতিক ডাকাতি ও সন্ত্রাসবাদে প্রকাশ পাইবে। সন্ত্রাসবাদের কারণ স্বদেশপ্রেম বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। ইহা অতি স্থূল শারীরিক ক্ষুধা হইতে—তৈল-তণ্ডুল-লবণ-ইন্ধন-চিন্তা হইতেই জন্মিয়াছে। গোটাকতক বোমা ফুটাইয়া বিশাল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিতে পারিবে বলিয়া সন্ত্রাস-বাদীরা যে বিশ্বাস করে, এ কথা কিছুতেই মনে হয় না। ক্ষুধার তাড়নাতেই তাহারা এইরূপ ভীষণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্নাভাব ঘটিলে, তাহারা যে-কোন বৃত্তির দ্বারা জীবিকার্জ্জনে লজ্জা বোধ করে না; কিন্তু উচ্চ-শিক্ষিত ও ভদ্র সম্প্রদায় বেকার হইলে, যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে প্রথমতঃ লজ্জা বোধ করে (কারণ দেশের শিক্ষিত লোকে পরিশ্রমের মর্য্যাদা বুঝে না); দ্বিতীয়তঃ, শারীরিক পরিশ্রম করিবার শক্তি ও সামর্থ্য না থাকায় যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করাও সম্ভবপর হয় না। তখন ভাবিতে থাকে, দেশ পরাধীন বলিয়াই বিদেশীদের তাহাদের উপর কোন সহানুভূতি নাই, তাই কোনরূপ কার্য্যের ব্যবস্থা হইতেছে না,—ফলে গভর্ণ-মেণ্ট ও সমস্ত ইংরাজ জাতির উপর ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেই ক্রোধ সন্ত্রাসবাদে আত্মপ্রকাশ করে। ভারত-বাসীর আত্মসম্প্রসারণের পথ অতি সংকীর্ণ, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; সেরূপ চেষ্টা হইলে, হয়ত বেকার-সমস্যা এত কঠিন আকার ধারণ করিত না এবং করিলেও, তাহার প্রতিকারের চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে হইত। কিন্তু একবারও ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ হয় না কি যে, ভারতবর্ষের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ 'ঢালাও' হিসাবে প্রতি বৎসর গ্র্যাজুয়েট তৈয়ারি করিবার ব্যবস্থা করিলে, কোন স্বাধীন দেশও ইহাদের সকলকে চাকুরি দিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে না এবং উপ-নিবেশহীন স্বাধীন জাতিদের মধ্যেও বেকার-সমস্যা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে? অনেক শিক্ষিত যুবক আবার সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, বলশেভিকবাদ প্রভৃতি বহুবাদের আলোচনা করিয়া শিক্ষা-সমাপনান্তে যখন উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, তখন দেশের ধনী সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের সমস্ত আক্রোশ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ভাবে, ইহারা রক্তশোষক, জোর-জবরদস্তি করিয়া এই সম্প্রদায়ের হাত হইতে অর্থ কাড়িয়া লইতে পারিলে কোন দোষ নাই; কাজেই ডাকাতি প্রভৃতি হীন কার্য্যে রত হয়। মোটের

উপর, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্নাভাব হইলে, তাহাদের অসন্তোষ নানা আকারে রূপান্তরিত হইয়া উঠে এবং তাহার ফল সমাজের, বা সরকারের কাহারও পক্ষে ভাল হয় না।

এই অবস্থায় উপায় কি? শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া শিক্ষার পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে না। একমাত্র উপায় হইল, শিক্ষার আমূল সংস্কার ও সুলভ-ডিগ্রি-বিতরণ বন্ধ করা। যাহারা ডিগ্রি পাইবার উপযুক্ত নয়, পরীক্ষা সহজ হওয়ায় তাহারা ডিগ্রি পাইতেছে। ইহাতে তাহাদের নিজের কিছুই লাভ হইতেছে না, শুধুই জীবন-সংগ্রামকে অনর্থক কঠোর করিয়া তুলিতেছে। ডিগ্রি থাকায় বৃথা মোহ আসিয়া যুবকদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতেছে—দোকানদারি কি ছোট-খাট ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে লজ্জা বোধ করিতেছে; স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতাও জন্মাইতেছে না, উপরন্তু অনুপযুক্ততা সত্ত্বেও ডিগ্রি পাওয়ার জন্য অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের (বহির্ভারত) কাছে নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহার শিক্ষা হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে। শুধু তাই নয়, প্রাথমিক শিক্ষা হইতে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সহজ ও নির্দ্ধারিত আদর্শের অনুরূপ না হওয়ায়, শিক্ষার অপচয় অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল আলোচনা করিলে, ইহার সত্যতা সহজেই ধরা পড়িবে।

উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়সমূহের উপরের চারিশ্রেণীর ৫,৫৩,০০০ ছাত্রের মধ্যে ৩,১৪,০০০ ছাত্র ১৮ বৎসরের পূর্ব্বে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য স্কুল হইতে অনুমতিই পায় না—পাস করা ত' দূরের কথা।

১৯৩৩ সালে আই-এ ও আই-এস্-সি ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৮০,০০০। ইহাদের মধ্যে মাত্র ১৭,৯০৫ জন, আই-এ বা আই-এস্-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিল; আবার এই ১৭,৯০৫ জন উত্তীর্ণ ছাত্রের মধ্যে ৪৬·৪ জন চার বৎসর বা তদূর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াও ডিগ্রী-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই (যদিও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রি-পরীক্ষা য়ুরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি-পরীক্ষা অপেক্ষা অনেক নিম্নস্তরের)।

প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নয়। এ স্থলে কয়েক বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের হিসাব দেওয়া হইল:—

বৎসর	ছাত্রসংখ্যা	শ্রেণী
১৯২৮	৮,৮৫,৪৩২	প্রথম
১৯২৯	৩,৪১,৩৫০	দ্বিতীয়
১৯৩০	২,৪৬,৪২১	তৃতীয়
১৯৩১	১,১২,৭৮৯	চতুর্থ
১৯৩২	৯৪,০৩০	পঞ্চম

ইহার পরবর্ত্তী সময়ের হিসাবও আশাপ্রদ নয়। দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে বালিকার সংখ্যা ২৬,০০,০০০। ইহাদের মধ্যে এক-পঞ্চমাংশের কম বালিকা দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৌছায়। প্রথম শ্রেণীর প্রতি এক-শত বালিকার মধ্যে মাত্র ১৩০ জন চতুর্থ শ্রেণীতে পৌছায়। অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৮৭ জন বালিকা নিজেদের সময় ও সাধারণের প্রদত্ত অর্থ নষ্ট করিতেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেদের শিক্ষায় অপচয়ও প্রায় এইরূপ। সমগ্র ভারতবর্ষের হিসাব করিলে দেখা যায়, অপচয়ের পরিমাণ শতকরা ৭৪।

এই সব অযোগ্য ছাত্রদের যে-পরিমাণ সময় ও উৎসাহ পরীক্ষা-পাস রূপ বৃথা কার্য্যে নষ্ট হইতেছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, গভর্ণমেন্টের অর্থব্যয়ের (যাহা সাধারণের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে আদায় হয়) বিষয় ভাবিয়া দেখিলেও নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে হয়। উচ্চ-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাথাপ্রতি গড়পড়তা সরকারী ব্যয় বার্ষিক ৫০৲ টাকা; তাহা হইলে এই ৩১,৪,০০০ জন অযোগ্য ছাত্রকে শিক্ষা দিবার বৃথা চেষ্টায় পাটিগণিতিক হিসাবে অপব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩১৪,০০০×৫০ অর্থাৎ ১৫৭ লক্ষ টাকা। কলেজে জনপ্রতি গড়পড়তা সরকারী ব্যয় ২০০৲ টাকা। এই হিসাবে সেখানেও প্রভূত অর্থের অপব্যয় হইতেছে। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশে এই অপব্যয় কোন রকমেই অনুমোদন করা চলে না।

এই যে এতগুলি ছাত্র অযোগ্যতা সত্ত্বেও বৃথাই অর্থ ও সময় ব্যয় করিতেছে, ইহাতে তাহাদেরও কোন উপকার হইতেছে না, পরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের যথেষ্ট অপকার হইতেছে। অযোগ্য ছাত্রের সংখ্যা যোগ্য ছাত্র অপেক্ষা অধিক হওয়ায়, বুদ্ধিমান্ এবং যোগ্য ছাত্রগুলির উপর বিদ্যালয় বা শিক্ষকেরা

এবং ২০ নম্বর পাইলে, দ্বিতীয় ও প্রথম বিভাগ বলিয়া ধরা যাইবে।

কৃষ্টিবৃত্তি-বিভাগ

এই বিভাগে কৃষ্টি ও বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা, দুইটাই এক সঙ্গে চলিবে। কৃষ্টিমূলক বিষয়গুলির উপর জোর কম দিয়া বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির উপর অধিক জোর দিতে হইবে, কাজেই প্রথমোক্ত বিষয়গুলির পঠন-পাঠন বা পরীক্ষার মান শেষোক্ত বিষয়গুলির ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর না হইলেও চলিবে।

বৃত্তিবিভাগ

এই বিভাগে কৃষ্টিমূলক বিষয় একেবারেই থাকিবে না; তবে বৃত্তিবিষয়ক প্রসঙ্গগুলির আলোচনা ও পঠন-পাঠনের জন্য যেটুকু কৃষ্টিমূলক বিষয়ের অবতারণা প্রয়োজন, ততটুকু করিতে হইবে। তবে, ভাবিবার বিষয়, যাহাকে vocational subjects বলা হয়, তাহা বার বৎসরের বালকদের শিখান সম্ভব বা উচিত কি না। আমার মনে হয়, নয়; সেই জন্য ইহাকে vocational বলিলেও, কার্য্যতঃ ইহাকে pre-vocational বলিয়া ধরিতে হইবে। কাঠ, কাগজ, মাটি, চামড়া, লোহা, পিতল, তামা প্রভৃতির কাজ যতটুকু সম্ভব, শিক্ষা দিতে হইবে।

সাময়িক বিদ্যালয়

যদি সম্ভব হয়, আয়োজনাত্মক বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর, এক বৎসর ছাত্রদের সাময়িক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উচ্চ-বিদ্যালয়

উচ্চ-বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ থাকিবে। একটি কৃষ্টি-বিষয়ক, অপরটি বৃত্তি-বিষয়ক। পঠনকাল দুই বৎসর। এই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাই প্রবেশিকা বা matriculation বলিয়া গণ্য হইবে।

(ক) কৃষ্টি-শাখা

বর্ত্তমানের আই-এ ও আই-এস্-সির পাঠ এই পরীক্ষার সহিত জুড়িয়া দিতে হইবে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ছাত্রেরা একেবারে বি-এ অথবা বি-এস্-সি শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। আয়োজনাত্মক বিদ্যালয়ের কৃষ্টিশাখা হইতে যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই এই শাখায় ভর্ত্তি হইতে পারিবে এবং এই শাখার ছাত্রেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এস্-সি প্রভৃতি উচ্চ-শিক্ষার জন্য অনুমতি পাইবে।

বৃত্তিশাখা

আয়োজনাত্মক বিদ্যালয়ের কৃষ্টি-বৃত্তি ও বৃত্তি-বিভাগ, এই দুই শাখা হইতেই উত্তীর্ণ ছাত্রেরা এই শাখায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে এবং দুই বৎসরের পর, পরীক্ষান্তে তাহারাও ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট্ পাইবে। এই শাখায় শর্ট-হ্যাণ্ড, বুককিপিং, দর্জ্জীর কাজ, খেলনা-তৈয়ারি, আসবাবপত্র-তৈয়ারি, বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জন প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে। ছাত্রদের ইচ্ছামত বিষয় নির্ব্বাচন করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়

এই স্থলে শিক্ষাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—(ক) কৃষ্টিশাখা, (খ) উচ্চ শিল্প-বিজ্ঞান শাখা(Higher technical and industrial section), (গ) বিশেষ শাখা।

(ক) কৃষ্টি-বিভাগ

এই শাখায় বি-এ বা বি-এস্-সি পর্য্যন্ত পড়ান হইবে, কিন্তু পঠনকাল সাধারণের জন্য তিন বৎসর হইবে; কিন্তু যাহারা অতিরিক্ত পাঠ্য, অর্থাৎ কোন বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা (honours) লইবে, তাহাদের জন্য চারি বৎসর।

(খ) উচ্চ শিল্প-বিজ্ঞান বিভাগ

ম্যাট্রিকের বৃত্তিশাখা হইতে ছাত্রেরা এই শাখায় আসিতে পারিবে এবং তিন বৎসর বা চার বৎসর পরে ইহাদেরও বি-এস্-সি ডিগ্রি দেওয়া যাইতে পারে।

(গ) বিশেষ বিভাগ

এই বিভাগে চিকিৎসা, কৃষি-বিজ্ঞান, পূর্ত্ত-বিদ্যা প্রভৃতি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা থাকিবে। পাঠ্যকাল সাধারণের পক্ষে পাঁচ বৎসর। ইহার পর যাঁহারা নিজ নিজ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে বা specialised হইতে চাহিবেন, তাঁহাদের আরও এক বৎসর অধিক কাল পড়িতে হইবে। প্রবেশিকার কৃষ্টি-বিভাগের ছাত্রেরা মাত্র এই বিভাগে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে।

এম-এ বা এম-এস-সির জন্য পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ না থাকিলেও চলিতে পারে। ছাত্রেরা কোন অধ্যাপকের অধীনে কার্য্য করিয়া, এক বৎসর পরে আপনাপন গবেষণার ফল (thesis) দাখিল করিয়া, উপযুক্ত মনে হইলে, ডিগ্রি পাইতে পারে।

শিক্ষা-পদ্ধতির এইভাবে পুনর্গঠন করিলে, শিক্ষার উন্নতি হইবে এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রের অত্যধিক ভার কমিয়া যাইবে। ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক হইলে, তাহার মধ্যে অনেক অনুপযুক্ত ছাত্র আসিয়া পড়ে; কাজেই তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও সুচারুরূপে করা সম্ভব হয় না। উচ্চ-শিক্ষালাভেচ্ছু ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহা ঠিক শিক্ষানুরাগের চিহ্ন নয়। ছাত্রেরা অন্ধভাবে গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে মাত্র। জোর করিয়া এতগুলি ছাত্রের পাঠেচ্ছা বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে না এবং তাহাতে লাভও নাই; তবে সমস্ত ছাত্র যাহাতে এক ছাঁচের শিক্ষা, অর্থাৎ cultural education না পায় এবং যাহাতে তাহারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অধিকতর উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা শিক্ষাকর্তাদের একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিলে, যে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হইবার সম্ভাবনা। এ কথা বলিতে চাহি না যে, পরিকল্পনাটি একেবারে নিখুঁত, বা ইহার কোনরূপ অদল-বদল করা চলে না, বা সকলেরই ইহা মনঃপূত হইবে। বর্ত্তমানে শিক্ষা-সংস্কারের কথা উঠিয়াছে, যাহাতে শিক্ষা-কর্ত্তাদের এইদিকে দৃষ্টি পড়ে, সেইজন্য ইহা উপস্থাপিত করা গেল।

এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিলে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেকার-ভাবনা একেবারে ঘুচিয়া যাইবে, এ কথা বলিতেছি না; কারণ বর্ত্তমানে দেশের বেকার-সমস্যা যে একেবারে ঘুচিতে পারে, তা বলিয়া মনে হয় না; তবে এখনকার মত এতটা প্রবল বা ইহার অপেক্ষা আরও তীব্র হইবে বলিয়া মনে হয় না। অনেকে বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা পাইয়া চাকুরির পরিবর্ত্তে কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন বা কলকারখানা স্থাপনের দ্বারা অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। বেকার-সমস্যার সমাধান না হইলেও, শিক্ষার অপচয়-নিবারণ হইবে, এ কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে। দরিদ্র দেশের পক্ষে ইহা কম লাভের কথা নয়।

পরিশেষে আরও একটি বলিবার কথা আছে। নিত্যনূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা শিক্ষার উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রত্যেক প্রদেশের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় চাহিবার অধিকার আছে, একথা স্বীকার করি; কিন্তু ইহাতে যে শিক্ষার উন্নতি সাধন হইবে, বা সেইসব প্রদেশের নূতন করিয়া কিছু উপকার হইবে, এ কথা বিশ্বাস করি না—যদি না এই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, প্রত্যেকে এক একটি আদর্শ লইয়া কাজ করে। ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একই ছাঁচের সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির প্রতিচ্ছবি। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনাপন বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত, যাহা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকিবে না, এবং যার জন্য ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে ছাত্রেরা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতে বাধ্য হইবে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যর হরিসিং গৌরও কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছেন :-

> The reconstruction of the educational system of India must have as its primary aim the elimination of duplication. The indiscriminate manufacture of B. A.'s and L. L. B's must be put an end to. At present graduates are being produced on a competitive basis and this is a sheer waste. A university should concentrate on one or two subjects for which it has special facilities or special endowments. Students from other parts of India must come to this University for study of these particular subjects.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খুব পুরাতন, ভারতের বাহিরে ইহার নাম আছে এবং উচ্চ সাহিত্য-বিজ্ঞানে যতগুলি শাখা-প্রশাখার-পঠন পাঠনের ব্যবস্থা আছে, তাহা অন্য কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাই; কাজেই cultural subjects ইহার বৈশিষ্ট্য হইতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে কল-কারখানা যথেষ্ট আছে, কাজেই উচ্চাঙ্গের শিল্প-বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা ইহার বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। মাদ্রাজ সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত এবং ভাল বন্দরও আছে, নৌ-বিদ্যা এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়-শিক্ষার ব্যবস্থা এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের করা উচিত। ব্রহ্মদেশ তৈল ও কাষ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ হওয়ায়, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় তৈল ও কাষ্ঠঘটিত বিষয় শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারে। মোট কথা, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত; কারণ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত বিষয়ে সুচারুভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে না এবং করিবার দরকারও হয় না। এইরূপ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অনর্থক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকিবে না এবং একই বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য নূতন করিয়া অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইবে না।*

* ইহা আমাদের শিক্ষা-সংস্কারসম্পর্কীয় মতামত নহে, তাহা আমাদের নিয়মিত পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।—বঃ সঃ।

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড

—শ্রীরমেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ইংরাজী ১৮৮৪ সালের কথা। অষ্টাদশ বর্ষীয় এক বলিষ্ঠ যুবক কর্ম্মমুখর বিশাল লণ্ডন নগরীর পথে পথে কর্ম্মের সন্ধানে ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, কাজ তাহাকে একটা যোগাড় করিতেই হইবে। একটি মাত্র শিলিং যুবকের সম্বল—এই এক শিলিং সম্বল লইয়া লণ্ডনের মত সহরে নিজেকে যে কতদূর অসহায় বলিয়া মনে হয়, যাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই তিনি তাহা কল্পনাও করিতে পারিবেন না। বড় হইবার অদম্য আশা প্রাণে লইয়া যুবক আসিয়াছে স্কটল্যাণ্ডের একটি ছোট্ট গ্রাম লসিমাউথ হইতে।

দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলে বড় হইবার কোন পথই সহজগম্য ভাবে উন্মুক্ত থাকে না। সুতরাং একটি দরিদ্র শ্রমজীবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিবার দরুণ, গ্রাম্য বিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভ করা ব্যতীত জ্ঞানান্বেষী যুবকটির গত্যন্তর ছিল না। গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকের যতখানি বিদ্যা ছিল, অল্প দিনের মধ্যেই তাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়া যুবক ভাবিল,—জীবনে কিছু করিতে হইলে এই ক্ষুদ্র গ্রামে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। প্রাণ যাহাদের বৃহত্তর জীবনের জন্য আকুল—কোন বাধাবিঘ্নই পারে না তাহাদের অভীষ্টলাভের পথকে দুর্গম করিয়া তুলিতে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া দরিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবার অনেক দুঃখ। সকল দুঃখকষ্টকেই অগ্রাহ্য করিয়া মাত্র একটি শিলিং পকেটে লইয়া যুবক লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইল। লণ্ডনে পরিচিত কেহই নাই—আসিয়াই আশ্রয় মিলিল না। তাহাকে পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিতে হইল কাজের সন্ধানে। ঘুরিতে ঘুরিতে দেহ যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন হইয়া আসে—যুবক আসিয়া দাঁড়ায় কোন রেস্তোরাঁ বা হোটেলের সম্মুখে। পকেটে একটি মাত্র শিলিং—এ কথা মনে হইলেই আর সেখানে ঢোকা হয় না। যুবক আসিয়া ঢোকে কোন সাধারণ পাঠাগারে —যেখানে পয়সা না দিয়াই বই পড়িতে পারা যায়। পড়িতে পড়িতে যুবক তন্ময় হইয়া যায়—ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা আর মনে থাকে না। এইভাবে মনের ও পেটের উভয় ক্ষুধাই মিটিয়া যায়।

বহু ঘোরাফেরা ও চেষ্টার পর একটি আফিসে যুবকের কেরাণীগিরির কাজ জুটিল। বেতন সপ্তাহে সাড়ে বারো শিলিং। লণ্ডনের মত সহরে এই বেতনে অতি সাধারণ ভাবেও থাকা চলে না। যুবক যাহা বেতন পাইত, তাহাতে মধ্যাহ্নের আহার জুটিত না। যখন আহারের সময় হইত, কোন লাইব্রেরীতে বই পড়িয়া যুবক ক্ষুধাকে ফাঁকি দিত। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যুবক যখন একটি ছোট্ট টেবিলের উপরে ঝুঁকিয়া একাগ্রমনে হিসাব মিলাইত, তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিল যে, এই কেরাণী-যুবকই একদিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীরূপে সুবিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য পরিচালনা করিবে!

এই যুবকের নামই মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। পরবর্ত্তী জীবনে ইনিই দুইবার ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কেরাণীর কাজ করিবার সময় ম্যাকডোনাল্ড বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন—অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করেন। এই ভাবে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং বৈজ্ঞানিক হইবার আশারও সেইখানেই অবসান হইল। বৈজ্ঞানিক হইবার ব্যর্থ চেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি কিছুদিন রাজনীতি লইয়া পড়াশুনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ই তিনি সমাজতন্ত্রবাদের ভক্ত হইয়া পড়েন।

শারীরিক স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হইলে কয়েকবছর পরে ম্যাকডোনাল্ড বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় পার্লামেন্টের একজন উদারনৈতিক সদস্যের প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাজ পাইলেন। প্রায় চারি বৎসর তিনি এই কাজ

করেন। এইখানেই তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যের হাতেখড়ি হয়।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ফেবিয়ান সোসাইটীতে যোগদান করেন। এই সময়ই আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া ম্যাকডোনাল্ড স্বতন্ত্র শ্রমিক দল গঠন করেন। শ্রমিক দলের নেতাগণ ১৮৯৫ সালে ম্যাকডোনাল্ডকে সাদামটন হইতে পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনপ্রার্থী রূপে দাঁড় করান। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। ইহার পর আরও একবার ব্যর্থ চেষ্টার পর তৃতীয় বারের চেষ্টায় ১৯০৬ সালে লিসৃষ্টার হইতে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সময়েই তিনি লর্ড কেলভিনের এক আত্মীয়ার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। ইতিমধ্যে তিনি সাংবাদিক বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তৎকালীন জগতের অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হন। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রথম আমেরিকায়, ১৯০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায়, ১৯০৬ সালে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে এবং ১৯১০ সালে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন।

লেবার রিপ্রেজেন্টেশন কমিটীর মারফতেই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বৃটেনের শ্রমিক আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস থাকিলেও ইহাঁদের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশের ইতিহাস দীর্ঘ নয়। গত শতাব্দীর শেষ ভাগেও শ্রমিকদের রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপ আরম্ভ হয় নাই। ১৮৯৯ সালেই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পার্লামেন্টের ভিতরে শ্রমিক দলের কার্য্যাবলী চালাইবার জন্য প্রথম একটি কমিটী গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কমিটীর নামকরণ হয়, লেবার রিপ্রেজেন্টেশন কমিটী—মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এই কমিটীর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে স্বতন্ত্র শ্রমিক দল অল্পদিনের মধ্যেই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ১৯০৬ সালে শ্রমিক দলের ২৯ জন প্রতিনিধি পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন—তন্মধ্যে মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড অন্যতম। ১৯১১ সালের মধ্যেই ম্যাকডোনাল্ড ক্রমশঃ সভায় শ্রমিক দলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই ভারতের সহিত মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের কিছু যোগাযোগ ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে, ১৯১০ সালে তিনি একবার ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি ভারতীয় ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ভারতীয় ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ থাকার দরুণ তিনি ১৯১৩ সালে পুনরায় রয়াল কমিশনের সভ্য রূপে ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। এই ভাবে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি "অ্যাওয়েকেনিং অব ইণ্ডিয়া" (ভারতের জাগরণ) নামক একটি পুস্তক রচনা করেন।

১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্ট ম্যাকডোনাল্ড বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতির উপর হাউস অব কমন্সে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং যুদ্ধে যোগদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করেন। ইহার পর শ্রমিক দলের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ডও শ্রমিক দলের নেতার পদ পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণও যুদ্ধে যোগদানের স্বপক্ষে ছিল—সেই কারণে ম্যাকডোনাল্ড দেশবাসীর অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া পড়েন। ইহার ফলে ১৯২২ সালের পূর্বে তিনি আর পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের জনসাধারণ যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জনপ্রিয়তা পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

১৯২৩ সালে ১৯১ জন সহকর্মী সহ মিঃ ম্যাকডোনাল্ড পুনরায় পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। পার্লামেন্টে প্রবেশ করিয়া তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতির সেবার জন্য শ্রমিক দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবে। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী উদারনৈতিক সদস্যগণের সমর্থনে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক প্রস্তাব আনয়ন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। পরদিনই সম্রাট মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ইংলণ্ডে প্রথম শ্রমিক মন্ত্রিসভা গঠিত হইল—মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইলেন, ইংলণ্ডের ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিল। শ্রম-

জীবীর পুত্র ইহার পূর্ব্বে আর কোনদিন প্রধান-মন্ত্রী হয় নাই। কিন্তু এই মন্ত্রি-সভার অল্পদিনের মধ্যেই পতন ঘটে।

১৯২৯ সালে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ও তাঁহার পুত্র মিঃ ম্যাল্কম ম্যাকডোনাল্ড উভয়েই পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। ঐ বৎসর ৪ঠা জুন তারিখে মিঃ বল্ডুইন পদত্যাগ করিলে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

১৯৩১ সালে বৃটেনে ভীষণ অর্থ-সঙ্কট দেখা দেয়। এই সময়ে জার্ম্মানীকে ঋণ দেওয়া লইয়া মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদল এতদিন নিজেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইয়াও কেবলমাত্র উদারনৈতিকদের সমর্থনে টিঁকিয়া ছিল। এই ব্যাপারে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড স্বয়ং শ্রমিকদলের বিরুদ্ধে যান, উদারনৈতিকগণও তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে ম্যাকডোনাল্ড মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সেই সময় মিঃ বল্ডুইনের চেষ্টায় জাতীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা হয়। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। শ্রমিকদল ম্যাকডোনাল্ডকে "দলত্যাগী বিশ্বাসঘাতক" আখ্যায় ভূষিত করে। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন যে, তিনি দেশের হিতের জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

এই সময় ভারতীয় সমস্যা আলোচনার্থ গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হয়। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বৃটিশের পক্ষে আলোচনা চালান। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচনে সিহাম কেন্দ্র হইতে তিনি বহু ভোটাধিক্যে পুনরায় পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া পুস্তকাদি রচনা করিয়াছিলেন। অতএব শ্রমিকদল যখন মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিল, তখন অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, এইবার ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিবে। কিন্তু মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া সুর বদলাইয়া ফেলিলেন। এই সময় ভারতীয় কংগ্রেস প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে। সেই সময়ই মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ভারতের বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থের মধ্যে অনৈক্য-স্থাপনের চেষ্টা করেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে তিনি একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহাতে ভারতকে সুবিধা প্রদানের কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ভারতীয় নেতারা অভিযোগ করেন যে, সকল কথাই তিনি এমন ভাবে ঘুরাইয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃত পক্ষে এই সকল কথার কোন অর্থ হয় না। ইহা প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের সময়ের কথা।

ইহার পর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। তখন শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ভাঙ্গিয়া জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ভারতের পক্ষ হইতে আলোচনা চালাইবার জন্য গান্ধীজী বৈঠকে যোগদান করেন। সেই সময় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যে বিবৃতি প্রদান করেন, তাহাতেই বর্ত্তমান ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

১৯৩২ সালে তিনি লোজানে সমর-ঋণ সংক্রান্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯৩৩ সালেন জুন মাসে আন্তর্জ্জাতিক আর্থিক সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। এই ভাবে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি ঘটে। বিশ্রামলাভের জন্য চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে তিনি কানাডা গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৯৩৫ সালের জুন মাসে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়া লর্ড প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে তাঁহার পরাজয় ঘটে। কিন্তু মিঃ বল্ডুইনের চেষ্টায় একটি উপ-নির্ব্বাচনে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং মন্ত্রিসভায়ও প্রবেশ করেন। অতঃপর মিঃ বল্ডুইন পদত্যাগ করিলে তিনিও পদত্যাগ করেন।

ইহার পর হইতেই তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য ১৯৩৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর তিনি জাহাজযোগে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ১০ই নভেম্বর তিনি পরলোকে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

"সোস্যালিজম্ এণ্ড সোসাইটি," "সিণ্ডিক্যালিজম্," "পার্লামেণ্ট এণ্ড রিভলিউসন," "অ্যাওকেনিং অব ইণ্ডিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার এবিতে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সমাধির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি জানাইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন তাঁহার স্বগ্রাম লসিমাউথেই সমাধি দেওয়া হয়। ইহা হইতে মনে হয় যে, শ্রমজীবী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রথম বয়সে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষায় যত ব্যাকুলতার সহিতই লণ্ডনে ছুটিয়া আসুন না কেন এবং জীবনে তিনি যত সাফল্যই লাভ করিয়া থাকুন না কেন, ক্ষুদ্র গ্রাম লসিমাউথের আকর্ষণ তাহার হৃদয় হইতে কোনদিনই মুছিয়া যায় নাই।

প্রমোদ-প্রতিক্রিয়া

কেহ যেন মনে না করেন, ইহা এ. আই. সি. সি.-র বন্দেমাতরম্-বিরোধী প্রস্তাবের প্রতিবাদ-সভার দৃশ্যবিশেষ।

একত্র করা প্রয়োজন, তেমনই শাসক জাতি ও দেশবাসীর স্বার্থেরও একত্ব-বোধের প্রয়োজন। শাসক জাতি ও দেশবাসীর সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতেই কেবল এই মিলন সম্ভব।

নূতন শাসনতন্ত্রের দ্বারা ভারতীয়গণ কি পাইয়াছে এবং কি না পাইয়াছে, সেই দ্বন্দ্ব যাহাতে দেশবাসী ভুলিয়া কি উপায়ে ব্রিটিশ জাতি ও ভারতবাসী উভয়ে মানবজাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিতে পারে, লর্ড ব্রাবোর্ণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত, তাহারই নির্দ্ধারণ। ব্যাপক ভাবে দেখিলে বুঝা যাইবে যে, যে-সকল সমস্যার দ্বারা ভারতবাসী বর্ত্তমানে পীড়িত, সেই সকল সমস্যা ইংরাজ জাতিকেও অল্পাধিক বিপন্ন করিয়াছে। এই সমস্যাসমূহ হইতেছে বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী অন্নাভাব কিংবা অর্থকৃচ্ছ্রতা, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, ও পরমুখাপেক্ষিতা। আপাতদৃষ্টিতে হয় তো কোন দেশ অপর কোন দেশ অপেক্ষা এই সকল সমস্যা হইতে কিঞ্চিৎ মুক্ত, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে ধরা পড়িবে যে, ইহার কোন একটি সমস্যা হইতে পৃথিবীর কোন দেশেরই আজ অব্যাহতি নাই। আমরা বহু প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, এই সকল সমস্যা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসারতা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে হইবে এবং অতঃপর প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে হইবে। কি ভাবে, কি পদ্ধতিতে ইহা করা সম্ভব, তাহাও আমরা বহু প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ইহারই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন ভারতবাসী ও ইংরাজজাতির সম্পূর্ণ ও আন্তরিক সহযোগিতা। বর্ত্তমানে এ দেশের নায়কবৃন্দের অদূরদর্শিতার জন্য এই সহযোগিতার ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। যাহাতে এই নায়কবৃন্দ তাঁহাদের খেয়াল ও খুসীর জন্য এবং তাঁহাদের কল্পিত অবাস্তব স্বাধীনতাভিলাষের জন্য দেশবাসী জনসাধারণের কল্যাণের পথ চিররুদ্ধ না করেন, আমরা লর্ড ব্রাবোর্ণকে সেই দিকে অবহিত হইতে দেখিলে খুসী হইব। মুষ্টিমেয় পরানুকরণপ্রয়াসী ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দকে তিনি যেন দেশবাসী জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে দেখিতে না চেষ্টা করেন, তাঁহার নিকট আমাদের এই নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইতেছি। তাঁহার শাসনকাল সাফল্যমণ্ডিত হউক্।

সর্প ও রজ্জু

গত ৪ঠা নবেম্বর লণ্ডনে লর্ড ব্রাবোর্ণ ও লেডী ব্রাবোর্ণের সম্মানার্থে আহূত এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়া লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছেন, মায়া যেমন মানুষের রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটায়, তেমনই ভারতের সম্বন্ধে বৃটেনের সদিচ্ছাকেও ভারতীয়গণ খারাপ মতলব বলিয়া ভুল করিতেছেন।

*

তাহা হয় তো করিতেছেন, কিন্তু অন্যপক্ষে বৃটিশ জাতির কর্ণধারগণের অসীম সদিচ্ছা সত্ত্বেও বৃটিশ জাতির জনসাধারণের অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে উন্নতির দিকে যাইতেছে বলিয়া মনে করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক বহু হেতুতে রেডিয়ো-গ্রামোফোন-ব্রিজ ইত্যাদি-র বিস্তার সত্ত্বেও ক্রমশঃই অবনত হইতেছে, তাহার মূলে কাহাদের 'মায়া' কাজ করিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে লর্ড জেটল্যাণ্ড ভাল করিতেন। ভারতীয় তথাকথিত মায়াবাদ কেবল ভারতবর্ষের মাটিতেই বিষবৃক্ষ রোপণ করে নাই, ভারত মহাসাগরের জলে তাহার বীজাণু ভাসিয়া ভূমধ্যসাগর, ইংলিস-চ্যানেল ও আটলাণ্টিকের উপকূলস্থ দেশসমূহেও সর্পকে রজ্জুরূপ দিতে সমর্থ হইয়াছে—অন্ততঃ বর্ত্তমানে পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া সেই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কূটনীতি

গত ১লা নভেম্বর পার্লামেণ্টের কমন্স-সভায় বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদানপ্রসঙ্গে বৃটেনের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ এণ্টনি ইডেন বলিয়াছেন—কূটনীতি হিসাবে আজকাল এক প্রকার বিপজ্জনক নীতি কোন কোন শক্তি অবলম্বন করিতেছেন। কোন বিষয়ে চরম হুমকি ঘোষণা করিয়া এই সকল শক্তি বলিতেছেন যে, ইহাই শান্তি-স্থাপনের কার্য্য। বৃটেন কোন দিন এইরূপ নীতি গ্রহণ করিবে না। জগতে শান্তির প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটেনের যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা সে সর্ব্বদাই করিতে প্রস্তুত থাকিবে, কিন্তু কাহারও হুকুম মত কিছু করিতে বৃটেন প্রস্তুত নহে।

*

লর্ড জেটল্যাণ্ড এই সভায় উপস্থিত থাকিলে মিঃ এণ্টনি ইডেনকে বুঝাইতে পারিতেন যে, যাহাদের হুমকির উল্লেখ করিয়া মিঃ ইডেন এই কথা বলিয়াছেন, তাহাদের হুমকির পশ্চাতের মনোভাবটা হুমকির নহে, সুতরাং রজ্জুকে তিনি

সর্পভ্রম করিতেছেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারত ঘুরিয়া গিয়াছেন, মিঃ ইডেনের সে ভাগ্য হয় নাই, তাই বোধ করি তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন না। যে নাতি হইতে তাহারা লম্ফ দিতেছে, সেই নীতিরই মাস্‌তুতো ভাই ঐ নীতি, যে-নীতিতে মিঃ এণ্টনি ইডেন বলিয়াছেন—'কাহারও হুকুম মত কিছু করিতে বৃটেন প্রস্তুত নহে'। উভয়েই কূটনীতি। 'নীতি'কে যাহারা 'কূট' করিয়াছে, তাহারা সর্ব্বদাই রজ্জুকে সর্প করিয়া তুলিতেছে। ইহাই আমাদের বক্তব্য।

বৃটেনের সমৃদ্ধি

> ১২ই নভেম্বর তারিখে এডিনবার্গে ইউরোপের শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা শীর্ষে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন অনেক কথার মধ্যে একটি কথা বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল শিল্পপ্রধান দেশ অপেক্ষা বৃটেনকেই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

এই সমৃদ্ধির হেতুটা কি, তাহা কিন্তু মিঃ চেম্বারলেন বলেন নাই। ইংলণ্ড কেন, যদি মন্টিনিগ্রোর ন্যায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেশও কৃষিপ্রধান ভারতকে 'লেজুড়' হিসাবে লাভ করিত, তাহা হইলে সেই মন্টিনিগ্রোর প্রধান মন্ত্রীও এমন কথা বলিতে পারিতেন। জার্ম্মানী, ইটালী ও জাপানের সেই 'লেজুড়ে'র আকাঙ্ক্ষাই তো আজ দেশে বিদেশে আগুন ছড়াইতেছে। শিল্পসমৃদ্ধি কথাটাই যে সোনার পাথরের বাটি—শিল্প দ্বারা সমৃদ্ধি গঠিত হয় না, হয় কৃষির দ্বারা। ইউরোপ যে দিন এই কথাটি বুঝিতে পারিবে, সেই দিনই ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তৎপূর্ব্বে নহে।

ধর্ম্মের তাৎপর্য্য

> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টেফানোস নির্ম্মলেন্দু ঘোষ লেকচারার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে গত ১৭ই নবেম্বর হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্যর রাধাকৃষ্ণন কতকগুলি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই বক্তৃতার প্রথমটির বিষয় ছিল—ধর্ম্মের তাৎপর্য্য।

*

আমরা স্যর রাধাকৃষ্ণনের এই 'ধর্ম্মের তাৎপর্য্য' শীর্ষে বক্তৃতাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া একটি জ্ঞান লাভ এই করিলাম যে, বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি অর্জ্জন করিতে হইলে দুইটি বিদ্যা আয়ত্ত হওয়া প্রয়োজন: (১) যে-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবে বলিয়া প্রচার করা হইবে, সে সম্বন্ধে কিছুই না বলা; (২) পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তিকে নিজের অপেক্ষা নির্ব্বোধ ভাবিবার চতুরতা। ধন্য স্যর রাধাকৃষ্ণন এবং ধন্যতর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ধন্যতম অবশ্য মৃত ষ্টেফানোস নির্ম্মলেন্দু ঘোষের নামে যে-টাকাটা তাঁহার পিতা দিয়াছিলেন, সেই টাকা খরচ করিবার শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা! কেন না এই টাকা না থাকিলে আমরা 'ধর্ম্মের তাৎপর্য্য' যে অর্থ, তাহা বুঝিতে পারিতাম না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

> গত ১৬ই নভেম্বর তারিখে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কাউন্সিল অব উইমেন-এর বাৎসরিক সদস্য-সংগ্রহ সভায় বক্তৃতা দিয়া মিসেস সরোজিনী নাইডু বলিয়াছেন যে, নারীজাতির আত্মোৎসর্গের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে ধরিলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কোন পার্থক্য করা চলে না।

একটু পার্থক্য আছে বৈ কি মিসেস্ নাইডু! ও দেশে উঁহারা অগ্নি সাক্ষী করিয়া বিবাহ করে না এবং উঁহাদের দেশের পুরুষদের মধ্যে এ দেশের পুরুষদের ন্যায় অগ্নিমান্দ্য এখনও দেখা যায় নাই।

১১০০ শত

> গান্ধীজীর সহিত বাঙ্গালার গবর্ণর স্যর জন অ্যাণ্ডারসনের ও মন্ত্রিমণ্ডলের বহু আলাপ-আলোচনার পর ১৪০০ জন অন্তরীণের মধ্যে ১১০০ জনের মুক্তি ঘোষিত হইয়াছে।

*

গান্ধীজী এই কার্য্যে যে-তৎপরতা দেখাইয়াছেন, তাহার প্রশংসা করেন নাই কে? আমরা কিন্তু বুঝিতে পারি না যে, যেখানে ৩৫ কোটী নরনারীর অন্ন-সমস্যার প্রশ্ন প্রতিদিন জটিল হইতে জটিলতর হইতেছে, যেখানে কোটি কোটি কৃষকের একবেলার একমুষ্টি অন্ন পাইবার সম্ভাবনাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, যেখানে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক উত্তরোত্তর দায়িত্বহীন আন্দোলনকারীদের শিকার হইয়া পড়িতেছে, যেখানে সর্ব্বোচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তির অবস্থার সহিত সর্ব্বনিম্ন পদারূঢ় ব্যক্তির অবস্থার মূলতঃ কোন বৈষম্য নাই—সেখানে সরকার কর্ত্তৃক ১১০০ শত রাজবন্দীর মুক্তিপর্ব্বে ক্রীড়ণক হিসাবে ব্যবহৃত হইবার মধ্যে গান্ধীজীর সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বের দাবী কতটুকু অর্জ্জিত হইল? ঘরের ছেলেরা ঘরে ফিরিবে, ইহা

অবশ্যই সুসংবাদ। কিন্তু যে-ঘরে তাহারা ফিরিবে, সে-ঘর যে বর্ষার জলে কি বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে, সে-ঘরে যে দুইমুষ্টি অন্নের সংস্থান নাই—সে কথা কি মনে পড়ে না? এবং মনে পড়ে না কি যে, যে-বিষাক্ত আবহাওয়া এই সকল সোনার চাঁদ ছেলেকে বিষাক্ত করিয়াছিল, সেই বিষাক্ত আবহাওয়া আরও কত ছেলেকে দিনের পর দিনই বিষাক্ত করিতেছে? সর্পকে না মারিয়া যে-ঘরে একদিন শিশুকে সাপে কামড়াইয়াছিল, ভাগ্যক্রমে শিশু বাঁচিয়াছে বলিয়াই সেই ঘরেই তাহাকে নিশ্চেস্তে শোয়াইতে পারে কোন্ জননী?

গান্ধী-মাহাত্ম্য

গত ২৩শে কার্ত্তিক বেলা ১০ ঘটিকার সময় তেকালা (নদীয়া) নিবাসী অমূল্যকুমার সাহা গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, অভাবের তীব্র তাড়নাই তাহার আত্মহত্যার কারণ। সংসারে তাহার দুই ছেলে, মা, এক বিধবা ভগ্নী এবং তিনটি মেয়ে। অমূল্য রাণাঘাটের কোন ধনী ব্যবসায়ীর দোকানে চাকুরী করিয়া কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। আজ ৩।৪ মাস তাহার সে চাকুরীও ছিল না।

*

এগারশত রাজবন্দীর নিষ্কৃতির জন্য গান্ধীজীকে যাঁহারা কৃতিত্বের মাল্যদান করিয়াছেন, ইচ্ছা করে, তাঁহাদিগের বুকের উপর তপ্ত লৌহশলাকা দিয়া এই সংবাদটি ছাপিয়া দিতে। দিনের পর দিন এমনই করিয়া কত ১১০০ শত ছেলে হয়তো বিন্দুমাত্রও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হইয়া, সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও শক্তি সত্ত্বেও এবং রাজবন্দী হইবার সকল সুযোগ অবহেলা করিয়াও কেবল একমুষ্টি অন্নের জন্য, একখানি বস্ত্রের জন্য (চাকুরী না থাকিলে বর্ত্তমান সভ্য জগতে যাহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই সহজলভ্য নহে) নিজেকে নিজেরই হাতে মারিয়া ফেলিতেছে—গান্ধীজীর এই অষ্টাদশবর্ষ ব্যাপী নেতৃত্বের ফলে যাহাদের সংখ্যা দিনের পর দিনই স্ফীত হইতেছে, গান্ধীভক্ত স্বাধীনতা-রূপ মাকাল-ফল-লোভী সেই পাষণ্ডদের কর্ণে তরল অগ্নিস্রাবী লৌহে এই সংবাদটি গলাইয়া দিতে ইচ্ছা করে, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে, ক্ষুধার কি জ্বালা, যে দুর্ব্বিষহ জ্বালার হাত হইতে স্বাধীনতা লাভ করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।—হায় রে দেশপ্রেম, হায় রে স্বাধীনতা!

ঈস্‌টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

বড়দিন ও নববর্ষের ছুটি উপলক্ষে ঈস্‌টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৫ই ডিসেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর কাল পর্য্যন্ত বলবৎ ৬৬ মাইল বা তদূর্দ্ধে প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর টিকিট ১⅓ ও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ১½ ভাড়ায় পাওয়া যাইবে। যথারীতি অবাধ-ভ্রমণের টিকিটেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণী ৬০৲; দ্বিতীয় শ্রেণী ৪০৲; মধ্যম শ্রেণী ১৫৲ এবং তৃতীয় শ্রেণী ১০৲ টাকা।

"लक्ष्मीस्त्वं धान्यरूपासि प्राणिनां प्राणदायिनी"

পৌষ—১৩৪৪
৫ম বর্ষ, ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

স্বাধীনতা ও শ্যামাপ্রসাদ বাবু

পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক কন্‌ভোকেশন-সভায় কনভোকেশন-বক্তৃতা দিবার জন্য এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শ্যামাপ্রসাদ বাবুকে যে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহা সংবাদানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ অবগত আছেন।

গত ২৭শে নভেম্বর শ্যামাপ্রসাদ বাবু ঐ আমন্ত্রণ রক্ষণোপলক্ষে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বক্তৃতা হইতে আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে হইয়াছে যে, তাঁহার মুখ্য বক্তব্য পাঁচটী,

(১) মনুষ্য-জীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য।
(২) ভারতবর্ষের সভ্যতার অতীত ইতিহাস।
(৩) ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ।
(৪) ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা।
(৫) ভারতবর্ষীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য।

পদগৌরবে যাঁহারা শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সমকক্ষ, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা গত বার তের মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সভায় সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত বক্তৃতার সহিত তুলনা করিলে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর আলোচ্য বক্তৃতাটীকে প্রশংসা করিতে হয়, কারণ উহাতে ছাত্র ও যুবকদিগের প্রয়োজনীয় একটা কিছু পন্থা নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা আছে। এতাদৃশ চেষ্টা প্রথম আজকালকার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বক্তৃতায় বা লিখনে প্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আধুনিক খ্যাতনামা লেখক ও বক্তাগণের প্রবন্ধ ও বক্তৃতা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, কোনটীতে বা গুরুগিরির আস্ফালন ("হরিজন"কে উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে), কোনটিতে বা অন্তঃসারশূন্য অর্থহীন পদবিন্যাসের ঝঙ্কার ও নির্বিরাম সমাসের পাঁয়তাড়া ("আনন্দবাজার পত্রিকা"কে উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে), কোনটিতে বা সঙ্গতাসঙ্গত যুক্তি মিলাইয়া লোকপ্রিয় হইবার প্রয়াস ("অমৃতবাজার পত্রিকা"কে উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাইতে পারে), কোনটিতে বা প্রায়শঃ অসার বাক্যবিন্যাসে মুরুব্বিয়ানার চাল ("ষ্টেটসম্যান্"কে ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে), আর কোনটীতে বা টীয়া-পাখীর মত কচ্‌কচানি (জওহরলাল পণ্ডিতের বক্তৃতা-সমূহকে ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে), পরিস্ফুট হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ঐ প্রবন্ধ এবং বক্তৃতা পাঠ করিয়া উহার মধ্যে চিন্তাশীল প্রয়োগযোগ্য কোন কার্য্যপন্থার নির্দ্দেশ

আছে কি না, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানপ্রয়াসী হইলে প্রায়শঃ বিফল-মনোরথ হইতে হইবে। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে উপরোক্ত বিভিন্ন রচনা হইতে আমরা প্রমাণিত করিতে পারিব।

আমাদের ছাত্র ও যুবকগণের চালক বলিয়া যাঁহারা নিজ-দিগকে জাহির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অধিকাংশ রচনার সহিত তুলনা করিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবুর আলোচ্য বক্তৃতা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে ঐ বক্তৃতাটীর প্রশংসা করিতে হয় বটে এবং শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃতাসমূহের সহিত তাঁহার আলোচ্য বক্তৃতা তুলনা করিলে, ইহাতে অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহার মধ্যে সারপদার্থ কতখানি আছে, তৎসম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে বসিলে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে কার্য্যকারণের ভাব মিলাইয়া চিন্তাশক্তির অভাবগ্রস্ত, তিনি যে প্রয়োজনীয় অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন নাই এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁহার অনবধানতা যে বিদ্যমান আছে, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ঐ বক্তৃতাটীতে যাদৃশ চিন্তার ধারা পরিলক্ষিত হয়, তাদৃশ চিন্তার ধারা ভারতবর্ষের আধুনিক ভাবুকগণের ভিতর প্রায়শঃ বিদ্যমান আছে বলিয়াই আমাদের মতে যে-ভারতবর্ষে একদিন শতকরা ৯৯ জন মানুষ স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যেখানে একদিন অন্নাভাব বলিয়া কোন অভাবের কথা প্রায়শঃ শ্রুত হইত না, যেখানে প্রৌঢ়াবস্থার শেষ সীমা পর্য্যন্ত চক্ষুর রোগ, অথবা কর্ণের ব্যাধি প্রায়শঃ অপরিজ্ঞাত ছিল, সেইখানে আজ শতকরা ৯৯ জন মানুষ নফরগিরির জন্য লালায়িত, অর্থাভাবে জর্জ্জরিত এবং বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে চক্ষু ও কর্ণের রোগে বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। সংক্ষেপতঃ, আমাদের মতে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর এই বক্তৃতা আত্মসম্মাননিষ্ঠ স্বাধীনতা-প্রয়াসী কোন ভারতীয় ছাত্রের শ্রবণের অথবা পাঠের অযোগ্য।

আমরা কেন এতাদৃশ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখযোগ্য কি কি বলিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার বক্তব্যে অসঙ্গতি কোথায়, তৃতীয়তঃ আমাদের বুদ্ধি অনুসারে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য কি কি, তাহা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

মনুষ্যজীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতবাদ

মনুষ্য-জীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য কি কি হওয়া উচিত, তাহা বলিতে বসিয়া তিনি এক জন খ্যাতনামা বৃটিশ "পিয়ারে"র মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ মতবাদের প্রথম কথা :—

"One of the aims is that natives should be free from alien domination."

অর্থাৎ, বৈদেশিক প্রভুত্ব হইতে যাহাতে জাতি মুক্ত হয়, তাহা করা একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

জাতিগঠনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ মতবাদের অপর কয়টী কথা :—

(১) জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন হইয়া, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, স্বাধীনভাবে কথা কহিতে এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তদুচিত ব্যবস্থা করা।

(Within the nation the individual should be free, free to think, worship, speak and act as he would.)

(২) বন্ধন, দারিদ্র্য, পরিশ্রমাধিক্য, অথবা পরিবেষ্টন বশতঃ উন্নতির বিঘ্ন-কর যে-সমস্ত নিষেধের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সমস্ত নিষেধ দ্বারা যাহাতে কোন মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আবদ্ধ না হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(Men should no longer be bound down from birth to death by the hampering restrictions that come from bondage, poverty, overwork and environment.)

যাহাতে উপরোক্ত স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই যে জাতিগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ইহা বুঝাইয়া দিয়া, ঐ উপরোক্ত মতবাদের রচয়িতা স্বাধীনতার সংজ্ঞা বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন :—

(১) স্বাধীনতা একটি একক অথবা সরল ধারণা নহে। ইহার উপাদান চারিটি, যথা :—

(ক) জাতীয়, (খ) রাষ্ট্রীয়, (গ) ব্যক্তিগত, (ঘ) অর্থগত।

(Liberty is not a single and simple conception. It has four elements—national, political, personal and economic.)

(২) যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন দেশে, প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে, সমতামূলক বিধি ও নিষেধের প্রত্যাহার-সম্পন্ন সমাজে বাস করিতে পারেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যাইতে পারে। সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে হইলে অর্থনীতি-পরিচালনায় যাহাতে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার্জনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং উপযোগিতানুসারে উন্নতির পন্থা যাহাতে সুগম হয়, তাহা করা একান্ত কর্তব্য।

(The man, who is fully free, is one who lives in a country, which is independent; in a state, which is democratic; in a society, where the laws are equal and restrictions at a minimum; in an economic system in which national interests are protected and the citizen has the scope of a secure livelihood, an assured comfort and full opportunity to rise by merit.)

মনুষ্য-জীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তৎ-সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই মতবাদের বক্তব্য তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, তদনুসারে স্বাধীনতা লাভ করাই কি জাতিগত, অথবা কি ব্যক্তিগত জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং ঐ স্বাধীনতা লাভ করিবার উপকরণ ষোলটি, যথা :—

(১) দেশের বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদ,
(২) স্বাধীন চিন্তা,
(৩) স্বাধীন কথা,
(৪) স্বাধীন কার্য্য,
(৫) দারিদ্র্যের অবসান,
(৬) পরিশ্রমাধিক্যের অবসান,
(৭) নিষেধের (restriction) যথাসম্ভব অবসান,
(৮) জাতীয়-উন্নতি,
(৯) রাষ্ট্রীয় উন্নতি,
(১০) ব্যক্তিগত উন্নতি,
(১১) আর্থিক উন্নতি,
(১২) প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য,
(১৩) সমতামূলক বিধিসম্পন্ন ও নিষেধবর্জিত সমাজ,
(১৪) অর্থগত জাতীয় স্বার্থসমূহের সংরক্ষণ,
(১৫) প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকা নির্বাহের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা,
(১৬) উপযোগিতানুসারে উন্নতির তারতম্যের ব্যবস্থা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতবাদ

ভারতবর্ষের সভ্যতার অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :

(১) ভারতীয় ইতিহাসের মহিমান্বিত পদবিক্ষেপে আমাদের সভ্যতার যে মৌলিক লক্ষণসমূহের অভিব্যক্তি রহিয়াছে, তাহা চিহ্নিত করিতে আমার লোভ উপস্থিত হইয়াছে।

(I feel tempted to trace some of the fundamental features of our civilisation in the majestic march of Indian history.)

(২) ভারতবর্ষকে জগতের সংক্ষিপ্ত-সার বলা হইয়া থাকে।

(India has been styled an epitome of the world.)

(৩) সহিষ্ণুতা, বিশ্বজনীনতা, বিদ্যানুরাগ এবং মানব-প্রেমের জন্য ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে বিখ্যাত।

(From time immemorial, it has been known for its toleration and catholicity, its love of learning and love of men.)

(৪) প্রকৃতি-দেবী ভারতবর্ষকে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ ও দোদুল্যমান সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া এখানে একদিকে যেরূপ ঐক্যের নিদর্শন অঙ্কিত করিয়া-

ছেন, সেইরূপ আবার স্থানে স্থানে ফাঁক রক্ষা করিয়া একটি একটি করিয়া বহিরাক্রমণের ও নূতন নূতন আদর্শপ্রবেশের সুবিধা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাতে তাহার বহির্বেষ্টনীর সহিত অসামঞ্জস্যের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ অনৈক্যের সৃষ্টি হইতেছে।

(Nature, while imposing on her the stamp of unity by encircling her with lofty mountains and roaring seas, left gaps through which successive waves of invasion swept into the interior and brought ideals and ways of life that did not always fit in with the environments.)

(৫) ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রকৃতির হস্ত দ্বারা পর্ব্বত ও জঙ্গলের বিসদৃশ চিহ্নসমূহ যাদৃশভাবে অবস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মনে হয়, যেন ভারতবর্ষে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ জাতীয় জীবনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক অন্তরায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

(In the interior itself, the hand of nature has drawn lines by rock and wood that proved serious impediments in the way of developing a common national life.)

(৬) এতৎসত্ত্বেও সর্ব্বসময় ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধন কবি ও দেশ-প্রেমিকের স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া ঐতিহাসিক বাস্তবতা পরিগ্রহ করিয়াছিল এবং ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে একমাত্র পেরিক্লিজ-এর গ্রীস অথবা এলিজাবেথের ইংলণ্ডের সহিত তুলনোপযোগী কার্য্যতৎপরতার অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছিল।

(Inspite of these......there were times when the political unification of the country ceased to be a mere dream of poets and patriots and came near a historical reality, resulting in an outburst of activity in the domain of religion, literature, science and art, comparable to that of the Greece of Pericles or the England of Elizabeth)

(৭) কেবল বর্জ্জনের নিমিত্ত বর্জ্জন করিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ আনন্দানুভব করেন নাই, তাঁহারা গ্রহণে ও উন্নতির চেষ্টায় আস্থাবান্ ছিলেন।

(The ancient Aryans did not revel in destruction for its own sake, they believed in assimilation and improvement.)

(৮) ভারতীয় ঔজ্জ্বল্য কোনক্রমেই ক্ষণস্থায়ী হয় নাই।

(That splendour was by no means ephemeral)

(৯) যখনই যে বৈদেশিকের আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই ভারতবর্ষ তাহাকে মুক্তহস্তে তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা কিছু, তাহা প্রদান করিয়াছে।

(Whenever the stranger stood in need of spiritual solace, she ungrudgingly gave of her best.)

(১০) (ভারতবর্ষীয় উপদেশানুসারে) অহিংসায় এবং ত্যাগে সুখলাভের একমাত্র পন্থা বিদ্যমান রহিয়াছে।

(The only way to happiness lies in non-violence and renunciation.)

(১১) নবম দফাকথিত আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা দিবার অভ্যাস ভারতবর্ষীয়গণের এখনও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই।

(That tradition is not altogether dead even now.)

ভারতবর্ষের সভ্যতার অতীত ইতিহাসসম্বন্ধীয় শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপরোক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার মতে ভারতবর্ষীয় সভ্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টি বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

(১) ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস গৌরবের উপযোগী।

(২) সহিষ্ণুতা, বিশ্বজনীনতা, বিদ্যানুরাগ এবং মানব-প্রেম লইয়া ভারতীয়গণের বৈশিষ্ট্য।

(৩) প্রাকৃতিক কারণেই ভারতবর্ষে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ জাতীয়তা ভারতবর্ষে প্রায়শঃ অসম্ভব হইয়া আসিতেছে।

(৪) যদিও ভারতবর্ষীয়গণের পরস্পরের দ্বন্দ্ব-কলহ

প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ অনিবার্য্য, তথাপি ভারতবর্ষে সময় সময় রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধন দেখা গিয়াছে এবং যখনই রাষ্ট্রীয় ঐক্যবন্ধন সম্ভবযোগ্য হইয়াছে, তখনই ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয়গণ উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(৫) ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয়গণ যাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেই উন্নতি একমাত্র পেরিক্লিজ-এর গ্রীস অথবা এলিজাবেথের ইংলণ্ডের সহিত তুলনার যোগ্য।

(৬) ভারতবর্ষীয়গণ প্রত্যেক যুগেই জগতের অন্যান্য জাতিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

(৭) উন্নতির জন্য বর্জ্জন ও গ্রহণ, এই দুইটি কার্য্যেই ভারতবর্ষীয়গণ প্রয়োজনানুসারে আশ্রয় লইতেন।

(৮) প্রাচীন ভারতীয়গণের মতবাদানুসারে অহিংসা এবং ত্যাগ সুখলাভের একমাত্র পন্থা।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতবাদ

ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য :—

(১) কৃষ্টি ও চিন্তার আবাসরূপে ভারতবর্ষীয়গণ যে এতাদৃশ উন্নতিলাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া পরাধীনতার উদ্ভব হইল কেন, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

(It may be asked that if such has been the greatness of India as a home of culture and thought, why is it that she has lost her political independence and has become a subject nation ?)

(২) যে বিশ্বজনীনতা এবং বিশ্বপ্রিয়তা লইয়া ভারতীয় সভ্যতার চিরন্তন নবীনতা, সেই বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বপ্রিয়তার মধ্যেই কি রাষ্ট্রীয় অবনতির বীজ লুক্কায়িত ছিল ?

(Would it true to say that the catholicity an universal sympathy, which contributed so much to the everlastin freshness of India's civilisation, conce l in them the germs of her political downfall ?)

(৩) যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় আবহাওয়াই কি দৃঢ়কায় আর্য্য, তুর্কী এবং আফগানদিগের পর পর পতনের কারণ ?

(Is it then her climate that deteriorated the sturdy Aryan, Turk and Afghan in turn ?)

(৪) আবহাওয়া অথবা কৃষ্টি ভারতীয়গণের পতনের কারণ নহে।

(It is not the climate, it is not the culture.)

(৫) ভারতবর্ষের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তগুলিতে ভারতবাসিগণ দলাদলিতে বিভক্ত এবং বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, ভারতবর্ষ প্রধানতঃ পাতিত্য লাভ করিয়াছিল।

(India fell mainly because her people were at the critical hour divided and disorganised.)

(৬) এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, যদিও কালের চাপ ও ঝটিকা সত্ত্বেও আমাদের কৃষ্টি বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি (ঐ অনৈক্যসম্ভূত দলাদলির জন্য) আমরা পরাধীন হইয়া রহিয়াছি।

(Thus although our culture has survived the storm and stress of time, we find ourselves in the strange tragic position of the representatives and exponents of an ancient civilisation yet alive but in bondage.)

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতবাদ

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) গত দেড়শত বৎসরে ভারতবর্ষে বিভিন্ন দিক্‌ হইতে উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।

(During the last century and a half, we have witnessed the progress of India in various directions.)

(২) নিশ্চলতা, শান্তি এবং শৃঙ্খলা প্রায়শঃ পুনরায় দেখা দিয়াছে।

(Stability, peace and order have been generally restored.)

(৩) যে আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতার বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া অভূতপূর্ব রকমে মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই বিজ্ঞানের কার্য্যগুলি এই প্রাচীন দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

(The benefits of science, which have revolutionised civilisation and have affected the lives of men and nations to an unprecedented extent have penetrated into this great and ancient land leading to considerable material progress.)

(৪) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় নজর প্রসারিত করিবার, দেশ-প্রেমের বুদ্ধি দৃঢ়মূল করিবার এবং রাষ্ট্রীয় জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করিবার সহায়তা হইতেছে।

(Western education has helped to broaden our outlook, deepen the sense of patriotism and lay the foundation of a political consciousness.)

(৫) সমগ্র হিন্দুস্থানের এক কোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা ও সমতার পরিকল্পনাসমূহ আস্তে আস্তে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং আমরা ভারতবর্ষীয় জাতীয়তার ক্রমবিবর্দ্ধমান জীবনীশক্তি লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

(Ideas of liberty and equality have slowly but steadily percolated from one corner of Hindusthan to another and we witness the ever-increasing vitality of Indian nationalism.)

(৬) অনুসন্ধিৎসার একটা প্রবৃত্তি ভারতবাসিগণের মন দখল করিয়া বসিয়াছে এবং চিন্তা ও কার্য্যতৎপরতার রাজ্যে তাঁহারা তাঁহাদের উপযোগিতা সপ্রমাণিত করিয়াছেন।

(A spirit of inquisitiveness has captured the minds of Indians, who have proved their worth in various domains of thought and activity.)

(৭) বহু সামাজিক দুষ্কর্ম্মের মূল উৎপাটিত হইয়াছে এবং জন-সাধারণ যাহাতে অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং মহত্ত্বসম্পন্ন জীবন অতিবাহিত করিতে পারে সাধারণতঃ তাহার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে।

(Many social evils have been uprooted and there is a general desire for uplifting the masses, so that they may live more useful and noble lives.)

ইংরাজগণের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে উপরোক্ত উন্নতিগুলি যে ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইয়া, এই সময়ে আমাদিগের কোন্ কোন্ অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা শ্যামাপ্রসাদ বাবু উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :—

(১) সৃষ্টিক্ষম ভারতবর্ষীয় বিদ্যাসমূহ (creative Indian arts) সাধারণতঃ বিনষ্ট হইয়াছে।

(২) দেশীয় শিল্প (Indian industries) অবনতি প্রাপ্ত হইয়া অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) ভারতবর্ষের গ্রামসমূহের স্বাস্থ্য ও সুখ সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্যের উদ্ভব হইয়াছে।

(৪) ভারতবাসীর শতকরা ৯০জন নিরক্ষর ও মূর্খ হইয়া পড়িয়াছে।

(৫) নিজেদের দেশ রক্ষণোপযোগী শিক্ষা লাভ করিতে ভারতবাসিগণ এখনও সক্ষম হয় নাই।

(৬) উপরোক্ত ১ম দফা হইতে ৬ষ্ঠ দফা পর্য্যন্ত যে অভাবগুলির কথা বলা হইল, তাহা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নানারূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই এবং যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করা না

যায়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার আধ্যাত্মিক অথবা অর্থনৈতিক কোন অভাবই সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হইবে না।

(I do not forget that in recent times efforts are being made to meet some of our vital needs. But no reforms of a radical character in any field of activity will ever be possible nor can India rise to her full stature spiritually and economically until and unless she takes her rank among the free nations in the world.)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতবাদ

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু নিম্নলিখিত কথাগুলি বলিয়াছেন :—

(১) ছাত্রগণ যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতার জ্ঞানবিষয়ে অনুসিক্ত হইতে পারে, তাদৃশভাবে তাহাদিগকে এই দুইটি বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

(Let them train the alumni in a worthy manner, saturate them with lessons of Indian History and civilisation.)

২) একতাপ্রবৃত্তি, বিচারশক্তি, সামর্থ্য, নির্ভীকতা ছাত্রগণের মধ্যে অনুপ্রবেশিত করিতে হইবে।

(Instil into them unity and reason, strength and dauntlessness.)

(৩) নিপুণতা এবং জ্ঞানের জন্য অনুপ্রাণিত হইয়া ছাত্রগণ যাহাতে একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থভাবে সহচরবৃন্দের কার্য্যে যোগদান করে, তদুপযোগী শিক্ষা তাহাদিগকে দিতে হইবে।

(Inspire them with skill and knowledge and teach them to apply themselves devotedly and unselfishly to the service of their fellowmen.)

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর স্বাধীনতাবাদ ও বিভিন্ন পাঁচটী বক্তব্য বিষয়ে পরস্পর অসংগতি (incongruities)

আলোচ্য বক্তৃতায় উপরোক্ত যে পাঁচটী বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ বাবু তাঁহার মতবাদ শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়াছেন, তাহার পরস্পরের মধ্যে যেরূপ অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক বিষয়ে যে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও স্থানে স্থানে পরস্পর বিরোধিতা দেখা যাইবে।

এইরূপ তাঁহার নিজের কথাগুলির মধ্যে এক দিকে যেরূপ পরস্পর-বিরোধিতা পরিলক্ষিত হইবে, সেইরূপ আবার তিনি যে কথাগুলি উপদেশস্বরূপ অথবা ইতিহাস-স্বরূপ শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই কথাগুলি সমীচীন অথবা সত্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলেও বিফল মনোরথ হইতে হইবে।

মনুষ্য-জীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য কি হওয়া কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু বিখ্যাত ব্রিটিশ 'পিয়ারে'র যে মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই মতবাদানুসারে "জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে, স্বাধীন ভাবে কথা কহিতে এবং স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে," তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপদেশানুসারে উপরোক্ত ব্রিটিশ 'পিয়ারে'র মতবাদ যেরূপ পালনীয়, সেইরূপ আবার ভারতবর্ষের কৃষ্টির ও অতীত সভ্যতার ইতিহাস শিখিতে বসিয়া এই সভ্যতার ও কৃষ্টির প্রতি শ্যামাপ্রসাদ বাবুর যে অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে, তদনুসারে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ও কৃষ্টির মূলসূত্র যে সর্ব্বথা সম্মাননীয় ও পালনীয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

মনুসংহিতায় বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় সূত্রগুলি যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ও কৃষ্টির মূলসূত্র, তৎসম্বন্ধে কোন মতপার্থক্য থাকিতে পারে না। এই সূত্রগুলি তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, তদনুসারে ব্রাহ্মণগণ যাদৃশ স্বাধীন চিন্তা, অথবা স্বাধীন কথা কহিবার, অথবা স্বাধীন কার্য্য করিবার ক্ষমতা এবং অধিকার লাভ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অথবা শূদ্রগণ তাদৃশ

স্বাধীনতা লাভ করিবার সক্ষমতা এবং অধিকার প্রাপ্ত হন না। সেইরূপ আবার, ক্ষত্রিয়গণ যাদৃশ স্বাধীনতা লাভ করিবার সক্ষমতা এবং অধিকার পাইয়া থাকেন, বৈশ্যগণ অথবা শূদ্রগণ তাদৃশ স্বাধীনতার সক্ষমতা ও অধিকার লাভ করেন না। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির মূলসূত্রানুসারে যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের স্বাধীনতাতেই এতাদৃশ বৈষম্য বিদ্যমান আছে, তাহা নহে, পরন্তু পিতা ও গুরু যাদৃশ স্বাধীনতার অধিকারী হইয়া থাকেন, পিতা ও গুরুর জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের সম্মুখে পুত্র ও শিষ্য তাদৃশ স্বাধীনতা ও অধিকার কখনও লাভ করিতে পারেন না। ইহা ছাড়া বয়োজ্যেষ্ঠ ও বয়ঃকনিষ্ঠ, বালক ও যুবক, যুবক ও প্রৌঢ়, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ, পণ্ডিত ও মূর্খ, সুস্থ ও অসুস্থ, পুরুষ ও স্ত্রী, সংযতেন্দ্রিয় ও অসংযতেন্দ্রিয়, ইহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের স্বাধীনতার মাত্রার মধ্যে বৈষম্যের উপদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত ব্রিটিশ 'পিয়ারে'র মতবাদ সমীচীন অথবা মনু-সংহিতার মতবাদ সমীচীন, তাহার বিচার না করিলেও দুইটি মতবাদ যে পরস্পর-বিরোধী এবং উহাদের উপদেশ যে একসঙ্গে পালন করা সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কাযেই, উপরোক্ত ব্রিটিশ 'পিয়ারে'র মতবাদকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির মূলসূত্রকে জড়াইয়া ধরিতে হইবে, নতুবা প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির মূল-সূত্রকে অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া জাহির করিয়া তাহার আদ্য-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে। একসঙ্গে 'ডুড় ও টামাক্ থাইটে' গিয়া গদাধরচন্দ্র যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, আমাদের শ্যামাপ্রসাদ বাবুর প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ এবং তৎসঙ্গে ব্রিটিশ 'পিয়ারে'র গুরুত্বকে মানিয়া লওয়া কি তদনুরূপ নহে ?

শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে পাঁচটি বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই পাঁচটি বিষয়ের বক্তব্যের পরস্পরের মধ্যে যে কেবল উপরোক্ত একটি মাত্র অসঙ্গতি বিদ্যমান আছে, তাহা নহে, তাঁহার বক্তব্যগুলি অদলবদল ও মিশ্রিত (permutation and combination) করিয়া ধরিলে যত সংখ্যা পাওয়া যায়, প্রায় ততগুলি অসঙ্গতি তাঁহার বক্তৃতায় বিদ্যমান আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতবর্ষের পরাধীনতার কারণ কি, তৎসম্বন্ধীয় গবেষণায় "অনৈক্য"ই (want of unity) এই পরাধীনতার কারণ বলিয়া তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কাযেই, তাঁহার উপদেশানুসারে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে অনৈক্য যাহাতে দূর হয়, তাহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

অথচ, মনুষ্য-জীবনের জাতিগত ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য কি হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় তিনি বলিতেছেন, "জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে, স্বাধীন ভাবে কথা কহিতে এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ চিন্তা করিতে, কথা কহিতে এবং কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে কি দেশের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তা, বিভিন্ন কথা ও বিভিন্ন কার্য্যের উদ্ভব হইয়া বিভিন্নতারই বৃদ্ধি পায় না ? এবং, তাহা কি একতার পরিপন্থী নহে? আধুনিক জগতের মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক কেন্দ্রেই যে একতা হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইতেছে এবং দ্বন্দ্ব ও কলহ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় কি ? আধুনিক জগতের এই ক্রমবিবর্দ্ধমান দ্বন্দ্ব ও কলহের মূলে যে শ্যামা-প্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত ব্রিটিশ 'পিয়ারে'র মতবাদানুরূপ স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা অনুমান করা অলীক হইবে কি ?

কাযেই, এক মুখে একতার বার্ত্তা এবং প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন কথা, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন কার্য্যের বার্ত্তা কি গদাধর চন্দ্রের "ডুড় ও টামাক" থাওয়ার অনুরূপ নহে ?

ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃখজনক কি কি আছে, তাহার আলোচনায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু আমাদিগকে শুনাইতেছেন যে, "দেশীয় শিল্প অবনতি-প্রাপ্ত হইয়া প্রায় অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িয়াছে।" তাঁহার এই দুঃখের কথা কাহারও প্রাণে স্থান পাইলে শিল্পের যাহাতে পুনরুদ্ধার হয়, তাহা করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, ইহা বলাই বাহুল্য।

শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে তাহার সংগঠনে যে একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) একান্ত প্রয়োজনীয়,

এবং এই নিয়মানুবর্ত্তিতানুসারে যে শ্রমজীবিগণকে তাহাদের পরিচালকগণের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে কোন মতপার্থক্য ঘটিতে পারে না। শ্রমজীবিগণ যাহাতে তাহাদের পরিচালকগণের আদেশানুসারে কার্য্য করে, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করিয়া, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে যে নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার ফলে যে, কোন শিল্প সংগঠন করা অসম্ভবপর হইয়া পড়ে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

কাযেই একসঙ্গে শিল্পের পুনরুদ্ধারের কথা আর জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন ভাবে কথা কহিতে এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার কথা কওয়া ও গদাধরচন্দ্রের একসঙ্গে "ডুড ও টামাক" খাওয়ারই অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আবার দেখুন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত, তাহার আলোচনায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু বলিতেছেন, "ছাত্রগণ যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতার জ্ঞান বিষয়ে অনুসিক্ত (saturated) হইতে পারে, তাদৃশভাবে তাহাদিগকে এই দুইটী বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

কোন বিষয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হইলে যে তদ্বিষয়ে অনুসিক্ত হওয়া যায় না, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। কাযেই ছাত্রগণ যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতার জ্ঞানবিষয়ে অনুসিক্ত হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষের ইতিহাস সর্ব্বতোভাবে গৌরবময় এবং ভারতীয় সভ্যতার সূত্র সম্পূর্ণভাবে পালনীয়, তাহা যে তাহাদিগকে সম্যক্ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। উপরোক্ত যুক্তিটির সঙ্গতি স্বীকার করিয়া লইলে ছাত্রগণ যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতার জ্ঞান-বিষয়ে অনুসিক্ত হয়, তাহা করিবার প্রয়াসী হইয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে ভারতীয় সভ্যতার সূত্রের বিরোধী কোন কথা তাহাদিগকে পালন করিবার উপদেশ দেওয়া চলে না।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, স্বাধীনভাবে কথা কহিতে এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাদৃশ কোন ব্যবস্থা ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির মূলসূত্রের প্রণেতা মনু-সংহিতার উপদেশ-বিরুদ্ধ।

কাযেই, একসঙ্গে "ছাত্রগণ যাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সভ্যতার জ্ঞান-বিষয়ে অনুসিক্ত হয়", তাহা করার কথা কওয়া এবং জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন ভাবে কথা কহিতে এবং ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার কথা কওয়াও গদাধরচন্দ্রের "ডুড্ ও টামাক" খাওয়ার পরিকল্পনারই অনুরূপ।

শুধু যে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর স্বাধীনতার কথার সঙ্গেই অপরাপর বিষয়ের কথার অসঙ্গতি আছে তাহা নহে, প্রত্যেক কথাটির পরস্পরের মধ্যে যে অসঙ্গতি বিদ্যমান আছে, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা সপ্রমাণিত করিতে পারিব।

অবশ্য, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, আধুনিক প্রগতির কালে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ বাবুই যে "ডুড্ ও টামাক" একসঙ্গে সমাবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নহে, এ সময়ে যে-কেহ যুবকগণের সভায় করতালি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বক্তৃতা যে ঐরূপ অথবা ততোধিক অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে।

আমাদের মতে, ছাত্রগণ যদি এইরূপ ভাবে যাহা গরল, তাহাকে অমৃত বলিয়া মনে না করিতেন, যাঁহারা 'পাপাত্মা' তাঁহাদিগকে 'মহাত্মা' বলিয়া মনে না করিতেন, যাঁহারা প্রকৃত ভাবে টীয়া-পাখীর মত পক্ষিজাতীয়, তাঁহাদিগকে মনুষ্যজাতীয় বলিয়া মনে না করিতেন, যাঁহারা বস্তুতঃ মূর্খ, তাঁহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মনে না করিতেন, যে-সমস্ত কথা অবজ্ঞার যোগ্য, সেই সমস্ত কথাকে শ্রদ্ধার যোগ্য বলিয়া গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ঐ প্রাণোপম দুলালবৃন্দকে বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে উচ্চতম উপাধিগুলি লাভ করিয়াও নফরগিরি করিয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য এত লালায়িত হইতে হইত না।

এ সম্বন্ধে শুধু যে ছাত্র ও যুবকগণেরই একমাত্র কর্ত্তব্য আছে, তাহা নহে। সমাজ হইতে প্রতারণা সমূলে বিনষ্ট করিতে হইলে যাহা গরল, তাহা যাহাতে অমৃতের মত প্রতিভাত না হইতে পারে, যাঁহারা পাপাত্মা, তাঁহারা যাহাতে মহাত্মা নামে বিকাইতে না পারেন, যাঁহারা স্বীয় খ্যাতি ও

দল-পুষ্টির জন্য লালায়িত, তাঁহারা যাহাতে নিঃস্বার্থ দেশ-প্রেমিকের আসন লাভ করিতে না পারেন, যাঁহারা চিন্তাশক্তির অভাবগ্রস্ত হইয়া সদসদ্ বিচার না করিয়া কথায় কথায় অপরের কথা টীয়া-পাখীর মত উদ্গীরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে ভাবুক বলিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে না পারেন, যাঁহারা বস্তুতপক্ষে জড়ের মধ্যে চৈতন্যের উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রকৃত পাণ্ডিত্য লাভ করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহারা একমাত্র কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অথবা কোন মূর্খ-সঙ্ঘের কোন উপাধির বলে যাহাতে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে না পারেন, মূর্খ যাহাতে পণ্ডিতের পদ না পান, যে-সমস্ত কথা অবজ্ঞার যোগ্য সেই সমস্ত কথা যাহাতে শ্রদ্ধার যোগ্য না হয়, তদ্বিষয়ে প্রযত্নশীল হওয়া প্রত্যেক সমাজ, গভর্ণমেণ্ট ও তাহার অধিনায়ক-বৃন্দের কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের অভিমত।

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য-বিষয়ক যে মতবাদ শ্যামাপ্রসাদ বাবু প্রচার করিয়াছেন, তাহার অসঙ্গতি, অসমীচীনতা এবং তদ্বিষয়ক আসল সত্য

মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশন-বক্তৃতায় যে মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রথম কথানুসারে—প্রত্যেক দেশের মানবসমাজ যাহাতে বিদেশীয় মানবসমাজের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথানুসারে—জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে স্বাধীন হইয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে, স্বাধীনভাবে কথা কহিতে এবং স্বাধীনভাবে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়।

তৃতীয় কথানুসারে—মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে তাহার চালচলনে যে সমস্ত নিষেধ মানিতে বাধ্য হয়, সেই সমস্ত নিষেধের পরিমাণ ও মাত্রা যাহাতে যথাসম্ভব অল্প হয়, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

চতুর্থ কথানুসারে—দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যাহাতে প্রজাতান্ত্রিক হয়, দেশের সামাজিক পরিচালনা যাহাতে সমতামূলক বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থনৈতিক পরিচালনা যাহাতে জাতির স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক হয়, প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে অনায়াসে স্বীয় জীবিকার্জ্জন করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে এবং উপযোগিতার তারতম্যানুসারে যাহাতে অর্থোপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তাহার আয়োজন করিতে হয়।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত চারিটি কথার পরস্পরের মধ্যে অসঙ্গতি বিদ্যমান আছে।

উপরোক্ত প্রথম কথানুসারে প্রত্যেক দেশের মানবসমাজ যাহাতে বিদেশীয় মানবসমাজের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে, অথবা মুক্ত থাকিতে পারে, তাহা করিতে হইলে সমগ্র মানবসমাজ যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, কর্ম্ম-ক্ষমতায়, বুদ্ধি-শক্তিতে, মানসিক শক্তিতে এবং দৈহিক শক্তিতে সমতুল্য হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তাহার কারণ, ব্যক্তিগত ভাবে যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্মশক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মানসিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠতর, তিনি যেরূপ সর্ব্বদাই হীনতর শক্তিসম্পন্ন মানুষের উপর প্রভুত্ব অথবা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়া থাকেন, সেইরূপ উপরোক্ত বিভিন্ন শক্তিতে যে-দেশের মানবসমাজ অন্য কোন দেশের মানবসমাজের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর হইবে, সেই দেশের মানবসমাজ যে হীনতর শক্তি-সম্পন্ন দেশের উপর প্রভুত্ব করিবে, তাহা কোনক্রমেই নিবারিত হইতে পারে না

কিন্তু, প্রাকৃতিক কারণে সর্ব্বদেশের মানবসমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মানসিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তিতে সর্ব্বসময়ে সর্ব্বতোভাবে সমতুল্য থাকিতে পারে না। কাল ও অবস্থানবশতঃ বিভিন্ন শক্তির তারতম্য প্রতিনিয়ত ঘটিয়া থাকে। আধুনিক জগতে প্রকৃত শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি বিলুপ্ত রহিয়াছে বলিয়া মানুষ এখন আর শক্তির তারতম্য-বিষয়ক উপরোক্ত কথাটী উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না বটে, কিন্তু ঐ কথাটী যে প্রকৃত ভাবে সত্য এবং তাহার সত্যতা যে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, তাহা ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের বেদ ও তন্ত্র-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে প্রমাণিত করিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি উপরোক্ত পাঁচটী শক্তির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি এই তিনটী যমজ ভাইয়ের মত, একটি অপরটিকে ছাড়িয়া

থাকিতে পারে না। মনুষ্যসমাজে যখন এই তিনটী শক্তি প্রকৃত ভাবে পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তখন মানসিক শক্তি এবং শারীরিক শক্তিও দেবভাবাপন্ন হইয়া থাকে। তখন মানসিক ও শারীরিক শক্তির পশুত্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং মানসিক ও শারীরিক শক্তির পশুত্ব সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া, যে দেশের মানবসমাজ তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরাকাষ্ঠা লাভ করে, সেই দেশের মানবসমাজের প্রভুত্ব কোন দেশের মানবসমাজের পক্ষেই অসহনীয় হয় না, পরন্তু বরণীয় হইয়া থাকে। তখন মানবসমাজে এক দেশের উপর অপর দেশের নৈতিক প্রভুত্ব সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজ সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হইয়া যায়। আমাদের মতে, বেদ, বাইবেল ও কোরাণ এক্ষণে মানুষ যে অর্থে বুঝিয়া থাকে, উহা প্রায়শঃ প্রকৃত পক্ষে সঙ্গত নহে ; তাহার কারণ, প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু এবং প্রাচীন আরবী, এই তিনটী মৌলিক ভাষা এখন আর কেহ যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন না। একদিন ঐ তিনটী ভাষা এবং ঐ তিনখানি গ্রন্থ ভারতবর্ষের মানুষ সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিতেন এবং জগতের সর্ব্বত্র মনুষ্যসমাজকে উহা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তখন মানুষের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান বলিয়া কোন ধর্ম্মগত জাতিবিভাগ ছিল না, পরন্তু তখন মানুষের মধ্যে "মানব" নামক একটি মাত্র জাতি বিদ্যমান ছিল। এই সময়ের ভারতবর্ষ জ্ঞান, কর্ম্ম ও বুদ্ধি-শক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাৎকালিক ভারতীয়গণের চেষ্টায় জগৎ হইতে মন ও শারীরিক শক্তির পশুত্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলপ্ত হইয়াছিল এবং তাৎকালিক ভারতবর্ষীয় মনুষ্যসমাজের প্রভুত্ব অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ আদরের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে মনুষ্যসমাজ হইতে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহার জন্য মানসিক ও শারীরিক শক্তির দেবভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে পশুভাব প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। মানুষের প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে দেশের মানুষ এক্ষণে মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্, সেই দেশের মানুষ উপরোক্ত মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তির দ্বারা অন্যান্য দেশের হীনবল মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হইতেছে। ঐ মানসিক ও শারীরিক শক্তির দেবভাব নষ্ট হইয়া তন্মধ্যে পশুভাব প্রবিষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান কালের প্রভুত্ব অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজ হাহাকারে বিদীর্ণ হইতেছে।

কাযেই দেখা যাইতেছে, মানবসমাজে একটি দেশের উপর অপর দেশের প্রভুত্ব অনিবার্য্য এবং এই প্রভুত্ব কাল ও অবস্থাভেদে কখনও বা মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক, আর কখনও বা অমঙ্গলজনক। মানুষের পক্ষে কখনও এই প্রভুত্ব সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া সর্ব্বদেশের মানবসমাজের সর্ব্বতোভাবে সমতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য, যাহাতে মানুষ প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তিতে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া মানসিক শক্তি ও দৈহিক শক্তির পশুত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং তাহার প্রভুত্ব যাহাতে সকলের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তাহার চেষ্টা করা।

অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রথম কথাটি, মনুষ্যজাতির বাস্তব অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অধিকন্তু, ঐ চেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে, কোন একটি দেশ, অপর কোন একটি দেশীয় প্রভুত্ব হইতে কখনও কখনও মুক্ত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু জগতের সমস্ত দেশ সর্ব্বদা কখনও অপর দেশের প্রভুত্ব হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, তাহা হইলে আমরা আগেই দেখাইয়াছি, প্রত্যেক দেশের মানব-সমাজ যাহাতে বিদে-

শীয় মানব-সমাজের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে, অথবা মুক্ত থাকিতে পারে, তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক মানুষ যাহাতে সমান পরিমাণের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মানসিক শক্তি এবং দৈহিক শক্তি লাভ করিতে পারে, তাহার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মানসিক শক্তি এবং দৈহিক শক্তিতে সমগ্র জগতের মানবসমাজ যাহাতে সমতুল্য হয়, তাহা করিতে হইলে, প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে উপরোক্ত পাঁচটি শক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করে, তাহার চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনুষ্যতত্ত্ব যাঁহারা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একে ত' দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষটীর পক্ষে উপরোক্ত পাঁচটি শক্তির প্রত্যেকটীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাকাষ্ঠা লাভ করা সম্ভব হয় না, তাহার পর আবার কোন একটি মানুষ যাহাতে কোন বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে, সেই মানুষের মধ্যে বিকৃতির কার্য্য কতখানি আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রকৃতির কার্য্য কতদূর পর্য্যন্ত অটুট আছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার পরীক্ষা-কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। মনুষ্যতত্ত্ব সম্যক্ ভাবে অবগত হইতে পারিলে আরও জানা যাইবে যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রকৃতি এবং বিকৃতি, এই উভয়েরই কার্য্য বিদ্যমান আছে এবং সমগ্র মানবসমাজের পরস্পরের মধ্যে যে সমতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা মানুষের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির কার্য্য-বশতঃ, আর পরস্পরের মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান থাকে, তাহা মানুষের আভ্যন্তরীণ বিকৃতির কার্য্যবশতঃ। "ইচ্ছা" ও "জ্ঞান" এই দুইটি কথার মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জানা যাইবে যে, আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির কার্য্যবশতঃ মানুষ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে এবং বিকৃতির কার্য্যবশতঃ মানুষের সদসৎ ইচ্ছার উদ্ভব হয়। কোন বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানুষের বিভিন্ন "ইচ্ছা" সমূহ যাহাতে সম্পূর্ণ ভাবে সংযত হয়, তাহা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন মানুষ যাহাতে কোন বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে, সে যাহাতে তৎসম্বন্ধীয় বিধি ও নিষেধগুলি পালন করিতে বাধ্য হয়, এবং স্বীয় ইচ্ছানুরূপ স্বাধীন ভাবের চিন্তা, স্বাধীন ভাবের কথা ও স্বাধীন ভাবের কার্য্য যাহাতে তাহার পক্ষে অসম্ভব হয়, তাহা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিদ্যার্থী যুবককে যদি ব্যক্তিগত ভাবে সম্যক্ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সে যে পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া তাহার কামলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যুবতীর প্রণয়-প্রয়াসী হইবে এবং তজ্জন্য সে যে তরলমতি হইয়া পড়িবে এবং তখন কোন বিষয়ের চরম জ্ঞান লাভ করা যে তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে, ইহা বুঝা কি বড়ই কঠিন?

কাজেই যুক্তি অনুসরণ করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত দেশের মানুষ সর্ব্বতোভাবে কখনও অপর কোন না কোন দেশের কোন না কোন বিষয়ের প্রভুত্ব সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে সক্ষম হয় না এবং কোন একটি দেশ যাহাতে অপর কোন একটি দেশের প্রভুত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে ঐ দেশের মানুষগুলি যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মানসিক শক্তি এবং দৈহিক শক্তিতে সক্ষমতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। ঐ ব্যবস্থা করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়া প্রত্যেক মানুষ যাহাতে বিধি ও নিষেধ পালন করিতে বাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থার দিকে মনোযোগী হইতে হয়।

অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে মতবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় কথা দুইটি একে ত' অসমীচীন, তাহার পর আবার উহারা পরস্পর-বিরোধী, কারণ কোন দেশে মানুষের গুণাগুণ বিচার না করিয়া প্রত্যেক মানুষ যাহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে, ঐ দেশে উচ্ছৃঙ্খলতার বিস্তৃতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং উচ্ছৃঙ্খলতা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিলে প্রয়োজনীয় পঞ্চবিধ শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা অসম্ভব এবং ঐ প্রয়োজনীয় পঞ্চবিধ শক্তির উৎকর্ষ-সাধনে অক্ষম হইলে অপরের প্রভুত্বাধীন হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

মানুষের ব্যক্তিগত চাল-চলনে যাহাতে নিষেধের মাত্রা ও সংখ্যা যথা সম্ভব অল্প হয়, তাহা লইয়া আলোচ্য মতবাদের তৃতীয় কথা। কোন দেশের মানুষ যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি, মানসিক শক্তি ও দৈহিক শক্তিতে বলীয়ান্ হয়, তাহা করিতে হইলে যে মানুষের আভ্যন্তরীণ বিকৃতির কার্য্য যাহাতে সংযত হইতে পারে এবং তজ্জন্য যে কতকগুলি নিষেধ ও বিধি সর্ব্বাগ্রে পালনীয়, তাহা আমরা উপরে দেখাইয়াছি।

কাযেই, আলোচ্য মতবাদের তৃতীয় কথাটী যে অসমীচীন এবং উহা যে প্রথম কথাটীর সহিত অসঙ্গতি-সম্পন্ন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উদ্ধৃত মতবাদের চতুর্থ কথাটি মানিয়া লইলে দেশের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টির জন্য আগ্রহান্বিত হইতে হয়—

(১) প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।
(২) সমতামূলক বিধির দ্বারা সামাজিক পরিচালনা।
(৩) জাতির স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক অর্থনৈতিক পরিচালনা।
(৪) প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকার্জ্জন ও তৎসম্বন্ধীয় স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধতা।
(৫) ব্যক্তিগত উপযোগিতার (efficiency র) তারতম্যানুসারে উপার্জ্জনের তারতম্য।

বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই পাঁচটি কথার মধ্যেও অনেক অসমীচীনতা এবং অসঙ্গতি বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (Democratic Government-এর) সংজ্ঞা সম্বন্ধে জগতের কোন্ ভাবুক কি বলিয়াছেন, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, "প্রজাতন্ত্র", "গভর্ণমেণ্ট" এবং "প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট," এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ কথাগুলির মধ্যে কোনরূপের অসামঞ্জস্য নাই, এমন একটি সংজ্ঞাও পাওয়া যায় না। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এখানে বিশদ ভাবে বিভিন্ন ভাবুকের অসামঞ্জস্য কোথায়, তাহা দেখাইয়া দিতে পারিব না।

বিভিন্ন ভাবুকগণের কথায় আর যাহাই পাওয়া যাক্ না কেন, গভর্ণমেণ্ট যে প্রজার হিতার্থে (for the people) এবং অল্পবুদ্ধি বশতঃ সাধারণ প্রজাগণ যে কাহার দ্বারা অথবা কোন্ উপায়ে তাহাদের প্রত্যেকের হিত সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে কুত্রাপি কোন মতদ্বৈধ পরিলক্ষিত হয় না।

উপরোক্ত দুইটি কথা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রজাদিগের হিতের জন্য গবর্ণমেণ্ট সংগঠিত হইতে পারে বটে, কিন্তু রাজ্য-পরিচালনার শিক্ষা ও সাধনার সহায়তায় যাঁহারা তৎসম্বন্ধে নিপুণতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই, তাদৃশ সাধারণ প্রজাগণের দ্বারা কোন গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতে, অথবা উহা পরিচালনাক্ষম মানুষের নির্ব্বাচন সাধিত হইতে পারে না। প্রজাতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট (Democratic Government) বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, তাহা আমাদের মতে সোনার পাথরের বাটী; কোন্ উপায়ে জনসাধারণের হিত সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে প্রকৃতভাবে কোন প্রকৃষ্ট শিক্ষা ও সাধনার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়াও যাহাতে সমাজের মধ্যে মুরুব্বীয়ানা করা ও পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হইতে পারে, তজ্জন্য কতকগুলি হীন-প্রবৃত্তিসম্পন্ন আত্ম-প্রতারক লোক এই সোনার পাথরের বাটীর কথা আধুনিক জগতের মধ্যে চালাইয়া দিয়াছেন এবং মানবসমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন। যে শিক্ষা ও সাধনা থাকিলে মানুষ দৃঢ়তার সহিত জনসাধারণের আনুগত্য দাবী করিতে পারে, সেই শিক্ষা ও সাধনা এবং তৎসম্পন্ন মানুষ এখন আর মানবসমাজে বিদ্যমান নাই বলিয়া সাধারণ প্রজাদিগের দ্বারাই গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইবে, এই ভাণ করিয়া প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের নামে প্রকৃত কোন সাধনার পরিশ্রম গ্রহণ না করিয়া কতকগুলি মানুষ প্রজাদিগকে লুটিয়া-পুটিয়া নিজেদের উদর পূর্ত্তি করিতেছে এবং নিজদিগকে জাহির করিতেছে।

আমাদের মতে, অদূরভবিষ্যতে জগতের মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, প্রজার প্রকৃত হিত কেবলমাত্র শিক্ষা ও সাধনা-সম্পন্ন প্রকৃত রাজার দ্বারা সাধিত হইতে পারে এবং যতদিন

পর্য্যন্ত মানবসমাজে তাদৃশ রাজা পরিদৃষ্ট না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের কথা চলিতে থাকিবে বটে, কিন্তু প্রকৃত সাধনাসম্পন্ন রাজার উদ্ভব হইলে আধুনিক প্রজাতন্ত্রের অধিনায়কগণ যে প্রায়শঃ চরিত্রহীন, পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, কুচক্রী এবং মানুষের অহিতকর, তাহা পরিস্ফুট হইবে।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিতে পারিলে প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের কথা যে অসমীচীন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

তর্কের খাতিরে যদি অনুরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, একসঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট, সমতামূলক বিধির দ্বারা সামাজিক পরিচালনা এবং ব্যক্তিগত উপযোগিতার তারতম্যানুসারে উপার্জ্জনের তারতম্য ব্যবস্থিত হইতে পারে না।

একসঙ্গে সমতা ও তারতম্যের পরিকল্পনা যে গদাধরচন্দ্রের "ডুট্ ও টামাকে"র পরিকল্পনার অনুরূপ, তাহা বুঝা কি বড়ই কঠিন?

সমতামূলক বিধির দ্বারা সামাজিক পরিচালনার পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত অথবা যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের তথাকথিত চেহারা, অথবা তথাকথিত বংশ, অথবা তথাকথিত পদানুসারে কাহাকেও শ্রদ্ধেয় অথবা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ বটে, কিন্তু গুণ ও কর্ম্মক্ষমতানুসারে সমাজের মধ্যে সম্মানের তারতম্য হওয়া অনিবার্য্য এবং ঐ তারতম্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। চিন্তা করিয়া দেখিলে আরও দেখা যাইবে যে, যিনি সমাজের মধ্যে গুণ ও কর্ম্মক্ষমতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন, তিনি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া কাহারও নিকট হইতে কোন বিশেষ শ্রদ্ধার দাবী করেন না বটে এবং এই হিসাবে যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মক্ষমতার উপাসক অথবা সাধক, তাঁহাদের পক্ষে সমাজমধ্যে নিজেদের কোন বিশেষ সম্মান দাবী করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে বটে, কিন্তু সমাজের অপরাপর সকলে যাহাতে তাঁহাদিগকে সম্মান দেখাইতে বাধ্য হয়, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষ সাধিত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

কাযেই সম্পূর্ণভাবে সমতামূলক বিধির দ্বারা সামাজিক পরিচালনার ব্যবস্থা যে অসমীচীন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

দেশের অর্থনৈতিক পরিচালনা (economic administration) কেবলমাত্র ঐ দেশের স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক হওয়া উচিত, অথবা সমগ্র মানবসমাজের স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক হওয়া সঙ্গত, তদ্বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, কোন দেশের স্বার্থ বলিতে কি বুঝায়, তাহা আগে ঠিক করিতে হইবে। কোন্ কোন্ বিষয় লইয়া কোন দেশের অথবা কোন মানবসমাজের স্বার্থ, তাহা ঠিক করা একটি বৃহৎ ব্যাপার এবং তাহা এখানে সম্ভবযোগ্য নহে। কোন দেশের অথবা কোন মানবসমাজের স্বার্থ বলিতে আর যাহাই বুঝা যাক্ না কেন, যাহাতে দেশের মধ্যে কোনরূপ উপদ্রব না ঘটে, তাহা যে দেশের অন্যতম স্বার্থ, তদ্বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাহাতে সমগ্র মানবজাতির অর্থাভাব দূরীভূত হয়, তাহা না করিয়া যদি শুধু কোন একটি মাত্র দেশের অর্থাভাব দূর করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য দেশে যে অর্থাভাব থাকিতে পারে এবং ঐ অর্থাভাব বশতঃ অর্থাভাবগ্রস্ত দেশের পক্ষে যে অর্থের প্রাচুর্য্যসম্পন্ন দেশে আসিয়া উপদ্রব করা সম্ভবযোগ্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে।

বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে সমগ্র মানবসমাজের অর্থাভাব দূর হয়, তাহার চেষ্টাই মানুষ একদিন করিয়াছিল এবং তখন ঐ চেষ্টা সফল হইয়াছিল বলিয়াই সমগ্র মানবসমাজ নিরুপদ্রব হইতে পারিয়াছিল। তাহার পর ঐ বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের উপদেশ মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই যে-দেশে উহার বিস্মৃতি যত অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, সেই দেশে তত অধিক পরিমাণে ও তত আগে আর্থিক অভাব উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই দেশের মানুষ তত অধিক পরিমাণে অন্যান্য দেশের মধ্যে গিয়া তত অধিক পরিমাণে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করি-

য়াছে। মানবজাতির যথার্থ ইতিহাস যখন আবার প্রতিভাত হইবে, তখন দেখা যাইবে যে, বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ সম্বন্ধে সমধিক বিস্মৃতি সর্ব্বাগ্রে ইয়োরোপে ঘটিয়াছে এবং তাহারই জন্য ইয়োরোপীয়গণ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাধিক অর্থাভাবগ্রস্ত হইয়া 'হা-অন্ন হা-অন্ন' করিয়া কখনও বা চোরের মত, কখনও বা ভিক্ষুকের মত এবং কখনও বা দস্যুর মত অন্যান্য দেশের মধ্যে উপদ্রব ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে যে দেশে ইয়োরোপীয়গণ অর্থাভাবগ্রস্ত হইয়া উপরোক্ত ভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সেই সেই দেশে বেদ, বাইবেল ও কোরাণের উপদেশ আংশিক ভাবে বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হওয়ায় সেই সেই দেশের মানুষও কিরূপে সমগ্র মানবজাতির অর্থাভাব দূর করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারই ফলে তাঁহারাও ইয়োরোপীয়গণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছেন না।

কাযেই সমগ্র মানবজাতির আর্থিক স্বার্থের দিকে নজর না রাখিয়া কেবলমাত্র কোন একটি দেশের স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক অর্থনৈতিক পরিচালনার পরিকল্পনা যে সমীচীন নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

গুণ ও কর্ম্মক্ষমতানির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, কোন দেশে তাদৃশ কোন ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত কি না, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও কার্য্যক্ষমতাসম্পন্ন হইলে যাহাতে দেশের প্রত্যেক মানুষ অনায়াসে জীবিকার্জ্জন করিতে পারেন, দেশের মধ্যে তাদৃশ প্রাচুর্য্য ও যথাযথ বণ্টনের ব্যবস্থা প্রত্যেক দেশেই হওয়া সঙ্গত বটে, কিন্তু যাঁহাদের চরিত্র কলঙ্কিত ও যাঁহাদের কার্য্যক্ষমতা নিন্দনীয়, তাঁহাদের জীবিকার্জ্জনে যাহাতে ক্লেশ উপস্থিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজনীয়। নতুবা, সচ্চরিত্র ও কার্য্যক্ষমতার প্রকৃষ্টত্ব সম্বন্ধে মানুষ আস্থাহীন হয় এবং তখন অসচ্চরিত্রতা ও পরিশ্রমবিমুখতা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ প্রত্যেকের পক্ষেই জীবিকার্জ্জন করা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। বর্ত্তমান মনুষ্যজগৎ ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে গুণ ও কর্ম্মক্ষমতার দিকে দৃষ্টি না করিয়া প্রত্যেক নাগরিকের জীবিকা যাহাতে অনায়াসলব্ধ হয়—তাহার ব্যবস্থা যে অসমীচীন, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সর্ব্বশেষে ব্যক্তিগত উপযোগিতার (efficiencyর) তারতম্যানুসারে যাহাতে মানুষের উপার্জ্জনের তারতম্য হয়, তাদৃশ কোন ব্যবস্থা মানবসমাজগঠনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি না, তৎসম্বন্ধে বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানবসমাজ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এক্ষণে ঐরূপ ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু মানুষ যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-ক্ষমতা ও বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রকৃত ভাবে লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে, ঐ সম্বন্ধে গবেষণারত এবং ঐ গবেষণালব্ধ উপদেশ মনুষ্যসমাজে বিতরণে প্রবৃত্ত দুইটী সম্প্রদায়ের প্রয়োজন। উন্নতিপ্রয়াসী সমাজ যাহাতে গঠিত হয়, তাহা করিতে হইলে উপরোক্ত দুইটী সম্প্রদায় যাহাতে অর্থলোভী না হয়, অথচ তাহাদের অর্থের অভাবও যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কাযেই, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নতিপ্রয়াসী সমাজ যাহাতে গঠিত হয়, তাহা করিতে হইলে অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যাহাতে ব্যক্তিগত উপযোগিতার তারতম্যানুসারে উপার্জ্জনের তারতম্য ঘটে, তাহার ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু কোন কোন মানুষ যাহাতে উপার্জ্জনলোভী না হয়, অথচ এবংবিধ মানুষের অর্থাভাবও যাহাতে না ঘটে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, শ্যামাপ্রসাদ বাবু মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে মতবাদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক কথাটীতে অল্লাধিক অসমীচীনতা বিদ্যমান আছে এবং তদনুসারে উহা কোন চিন্তাশীল মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত প্রয়োজনসাধনের জন্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, তাহা হইলে মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত।

আমরা এতৎসম্বন্ধে বঙ্গশ্রীতে বিভিন্ন সন্দর্ভে নানা রকম ভাবে উহার আলোচনা করিয়াছি।

আমরা এতাবৎ ঐ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে,"মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত", এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় প্রদান করা সম্ভবযোগ্য নহে, কারণ সমগ্র মানবসমাজের সমস্ত মানুষ সর্বতোভাবে সমতুল্য নহে, লোকতঃ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে বলিয়া প্রথমতঃ সমস্ত মানুষের উদ্দেশ্য এক রকমের হয় না এবং উহা এক রকমের হইতে পারে না। যে ছাত্র সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, সে যাহাতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে, আবার যে ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে, সে যাহাতে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে, তাহাই তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র যদি স্তরে স্তরে উন্নীত হইবার উদ্দেশ্যে কার্য্য না করিয়া একেবারে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে অধৈর্য্য এবং অকালপক্কতা প্রবিষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। ইহা ছাড়া প্রাকৃতিক কারণবশতঃ সপ্তম শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রই যে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত উন্নীত হয় না, অথবা উন্নীত হইতে পারে না, তাহাও প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

মনুষ্যতত্ত্বের যে অংশ জানা থাকিলে, মানুষের মধ্যে মূলতঃ কয়টি শ্রেণী আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, আধুনিক ইয়োরোপীয়গণ মনুষ্যতত্ত্বের সেই অংশ অদ্যাবধি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই এবং তাহারই জন্য তাঁহাদের কোন দার্শনিক অথবা পণ্ডিত কোন্ মানুষের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাবিধি যে কি হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। মানুষের শিক্ষা, সাধনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইয়োরোপে গত ১৫০ বৎসর হইতে একে একে কতকগুলি পরীক্ষা চলিতেছে এবং ঐ পরীক্ষাসমূহের প্রত্যেকটি নিষ্ফল হইতেছে। ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভাবুক, তাঁহারা আমাদের এই কথাগুলি অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন এবং স্বীকার করিবেন। আমাদের দেশের অনুকরণপ্রয়াসী তথাকথিত পণ্ডিতগণ ঐ কথাগুলি না বুঝিতে পারিয়া আমাদিগের যুবকদিগকে গত ৭০।৮০ বৎসর হইতে বিপথে চালিত করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে দেশ যে কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় যাইয়া পৌছিতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে যে-বুদ্ধির প্রয়োজন, সেই বুদ্ধি পর্য্যন্ত আমাদের কৃতবিদ্য যুবকগণ লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এই তথাকথিত পণ্ডিত, নেতা ও মনোরাজ্যে নফরস্বরূপ আধুনিক কাগজওয়ালাগুলির উপদেশ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ঋষিগণের উপদেশ কি ছিল, অথবা বেদ, বাইবেল ও কোরাণের কথা এতৎসম্বন্ধে কি কি, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

বেদ, বাইবেল ও কোরাণ যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ মূলতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণীর মানুষ দৈহিক শ্রমে খুবই পটু বটে,কিন্তু তাঁহারা কোন্‌টি সুন্দর, কোন্‌টি কুৎসিত, কোন্‌টি ভাল অথবা কোন্‌টি মন্দ, তাহা চূড়ান্তভাবে অপরের বিনা সাহায্যে স্থির করিতে সক্ষম হন না। এই শ্রেণীর মানুষ নিজেরা যথেষ্ট পরিমাণে কায়িক শ্রম করিতে পারেন বটে, কিন্তু কি করিয়া শ্রমাভ্যাস করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে অপরকে শিক্ষা দিতে কখনও সক্ষম হন না।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা নিজেরা যথেষ্ট পরিমাণে কায়িক শ্রম করিবার অভ্যাস অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন না। ইহাঁরা প্রচুর পরিমাণে কায়িক শ্রম করিতে পারেন না বটে, কিন্তু কোন্‌টী সুন্দর, কোন্‌টী কুৎসিত, কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তৎসম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে পারেন। এতাদৃশভাবে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ মানসিক শ্রমে ব্যাপৃত থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও অপরের বিনা সহায়তায় কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তৎসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, তৎসম্বন্ধে অপর কাহারও নিকট হইতে উপদেশ পাইলে সেই উপদেশ তাঁহারা সহজেই আয়ত্ত করিতে পারেন এবং ঐ উপদেশ তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর মানুষকে শিখাইতে সক্ষম হন।

তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা শারীরিক অথবা মানসিক কোন শ্রম অথবা সাধনা অত্যধিক পরিমাণে অথবা অনেকক্ষণ ধরিয়া করিবার সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু নিজদিগকে শারীরিক এবং

মানসিক বলে বলীয়ান্ করিতে সক্ষম হন এবং অপরে শারীরিক অথবা মানসিক কার্য্যগুলি যথাযথ ভাবে করিতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিতে পারদর্শী হইয়া থাকেন। ইহাঁরা নিজদিগকে শারীরিক এবং মানসিক বলে বলীয়ান্ করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু কি করিলে যে শারীরিক ও মানসিক বল যথাযথ ভাবে সম্যক্ ভাবে মনুষ্য-সমাজের হিতার্থে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহা স্থির করিবার জন্য বুদ্ধির যাদৃশ উৎকর্ষের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাদৃশ উৎকর্ষ তাঁহারা কখনও লাভ করিতে সক্ষম হন না। তাদৃশ বুদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা অপরের মুখাপেক্ষী থাকিতে হয়।

চতুর্থ আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, তাঁহারা যেমন বুদ্ধিমান্ সেইরূপ স্থিরমনাঃ। ইহাঁরা বুদ্ধির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উৎকর্ষসাধনে সক্ষম হইয়া থাকেন।

সমগ্র মনুষ্যসমাজ গুণ ও কর্ম্মশক্তির তারতম্য বশতঃ যে মূলতঃ উপরোক্ত চারিশ্রেণীতে বিভক্ত, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর মানুষ যাহাতে শারীরিক শ্রমে সুপটু হন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলে যে ফলোদয় হইতে পারে, সেই ফলোদয় তাঁহাদিগকে বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায় ব্যাপৃত করিলে কখনও হওয়া সম্ভব হয় না, কারণ ইহাঁরা স্বভাবতঃ শারীরিক-শ্রমক্ষম।

কোন্‌টি সৎ এবং কোন্‌টি অসৎ, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া যাঁহারা শারীরিক শ্রমে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে উহা কিরূপে শিখাইতে হয় এবং তাঁহাদের কার্য্য কিরূপ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলিকে শিখাইলে যে ফলোদয় হইতে পারে, উহাঁদিগের অন্য কোন শিক্ষায় সে ফলোদয় হইতে পারে না, কারণ স্বভাবতঃ ইহাঁরা এই কার্য্যের নিপুণতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শারীরিক ও মানসিক বল বৃদ্ধি করিয়া সমাজের শারীরিক শ্রমের কার্য্য, লোকশিক্ষা প্রভৃতি মানসিক শ্রমের কার্য্য যথাযথভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে কি না, তাহা কি করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে নিপুণতা লাভ করা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কারণ তাঁহারা স্বভাবতঃ ঐ ক্ষমতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন করিয়া মানুষের সমাজ-গঠনে ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তায় কোন্ দ্রব্য ও কার্য্যটি ভাল ও কোন্ দ্রব্য ও কার্য্যটি মন্দ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবংবিধ সিদ্ধান্তে চূড়ান্তভাবে কিরূপ ভাবে উপনীত হইতে হয়, তৎসম্বন্ধীয় সাধনায় নিপুণতা লাভ করা চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কারণ এই শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতঃ উপরোক্ত ভাবের ক্ষমতা লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

মনুষ্য-সমাজের মধ্যে উপরোক্ত চারিটি শ্রেণী-বিভাগের কথা ও তাঁহাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য-সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া মানুষের মধ্যে কেহ ছোট ও কেহ বড় বলিয়া আখ্যাত হইতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে এতাদৃশ মনোভাবের উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ স্বভাবতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত বটে, কিন্তু এই চারি শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীটিকে ছোট এবং কোন শ্রেণীটিকে বড় বলিয়া অভিহিত করা চলে না, কারণ সমাজ-গঠনে এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্যই সমান ভাবে প্রয়োজনীয়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজে যে চারি শ্রেণীর মানুষ বিদ্যমান আছে, তাহার কোন্ শ্রেণীর মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত ভাবে কি হওয়া উচিত, তাহা উপরোক্ত ভাবে স্থির করিয়া লইয়া কি উদ্দেশ্যে সমাজ গঠিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষের আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পরিপূর্ণ হয়, অথচ মানুষের জীবন ও যৌবন যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয়, কোন শ্রেণীর মানুষের যাহাতে জীবনধারণোপযোগী অর্থের অভাব না হয়, ঐ অর্থের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে যাহাতে কোন শ্রেণীর মানুষের কাহারও নকরগিরি করা অনিবার্য্য না হয়, অথচ যাহাতে উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্ভব না হইতে পারে, যাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষ সন্তুষ্ট থাকিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহাই যে সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বস্থানে সমাজগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

মনুষ্য-জীবনের ব্যক্তিগত ও জাতিগত গঠনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, আমরা এখানে উপরোক্ত ভাবে তাহার সূত্র মাত্র নির্দ্ধারিত করিয়া সন্তুষ্ট থাকিব, কারণ স্থানাভাব বশতঃ এই সন্দর্ভে উহা বিশদ ভাবে আলোচিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা উহা বিশদ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে আমরা অথর্ব্ববেদ ও স্মৃতি, অথবা বাইবেল অথবা কোরাণ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিবার উপযোগী হইবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি।

আমাদিগের কথায় যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, তাঁহাদিগের পক্ষে বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত "ভারতের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধ অধ্যয়ন করিলে কথঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্তি লাভ করা সম্ভবযোগ্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার অতীত ইসিহাস-সম্বন্ধীয় মতবাদে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর অসমীচীনতা ও অসঙ্গতি এবং তৎসম্বন্ধীয় আসল কথা

ভারতবর্ষের সভ্যতার অতীত ইতিহাসের আলোচনায় শ্যামাপ্রসাদ বাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রথম কথা, "ভারতবর্ষকে জগতের সংক্ষিপ্তসার বলা হইয়া থাকে"। শুধু শ্যামাপ্রসাদ বাবুই যে ভারতবর্ষকে জগতের সংক্ষিপ্তসার (epitome) বলিয়াছেন, তাহা নহে, একাধিক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষকে উপরোক্ত বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন। কিন্তু কেন যে ভারতবর্ষের এই বিশেষণ, তাহা কেহই পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা সাধারণতঃ কয়েকটী বৈচিত্র্যের জন্য ভারতবর্ষকে এই বিশেষণ দিয়া থাকেন। যে যে বৈচিত্র্যের জন্য ভারতবর্ষকে তাঁহারা এই বিশেষণ প্রদান করেন, সেই সেই বৈচিত্র্য যে জগতের কোন্ দেশে নাই, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। হিমালয়ের মত অত বড় পর্ব্বত, অথবা গঙ্গার মত তাদৃশ নদী হয়ত আর কোন দেশে নাই, কিন্তু কোন না কোন রকমের পর্ব্বত অথবা নদী বিদ্যমান নাই, এমন কোন "দেশ" প্রায়শঃ জগতের কুত্রাপি দেখা যাইবে না। আমাদের মতে, ভারতবর্ষের যে অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য আছে—তাহা ঠিক, কিন্তু সেই বৈশিষ্ট্য যে কোথায়, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণের অপরিজ্ঞাত। পরন্তু, যে যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষকে 'জগতের সংক্ষিপ্তসার' বলিয়া থাকেন, সেই সেই বৈশিষ্ট্য প্রকৃত পক্ষে অসার।

এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর দ্বিতীয় কথা, "ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস গৌরবের উপযোগী"। ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস যে গৌরবের উপযোগী, তাহা শ্যামাপ্রসাদ বাবু স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা যে কতখানি গৌরবের, তৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে পরিষ্কার ভাবে কিছুই বুঝান নাই।

ভারতবর্ষের উন্নতিপ্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর অন্যতম কথা—"ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয়গণ যাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই উন্নতি একমাত্র পেরিক্লিজ-এর গ্রীস অথবা এলিজাবেথের ইংলণ্ডের সহিত তুলনার যোগ্য"।

উপরোক্ত পূর্ব্ববর্ত্তী কথার সহিত পরবর্ত্তী কথাটি মিলাইয়া লইয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মতানুসারে, ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পক্ষেত্রে ভারতবাসিগণ কতখানি উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে বসিলে বলিতে হয় যে, পেরিক্লিজ-এর সময় গ্রীকগণ, অথবা এলিজাবেথের সময় ইংরাজগণ ঐ ঐ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, ভারতবাসীর উন্নতিও ততখানি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

"ধর্ম্মজ্ঞান" অথবা "ধর্ম্ম-কার্য্য" সম্বন্ধে গ্রীক ও ইংরাজগণ কতখানি পর্য্যন্ত উন্নতি এতাবৎ করিতে পারিয়াছেন, তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহাঁরা যে ধর্ম্মাবলম্বী, তাহার মূল গ্রন্থ বাইবেলে ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-কার্য্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই বিস্তৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ দুইটি জাতি পরবর্ত্তী কালে প্রাচীন হিব্রুভাষা ভুলিয়া যাওয়ায় বাইবেলের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কথাই কার্য্য-কারণের যুক্তিসঙ্গত ভাবে বুঝিতে সক্ষম হন না। ধর্ম্ম-কার্য্য বুঝা ত' দূরের কথা, ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ভাষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত বাইবেল ছাড়া ইহাঁদের অপর কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। ইয়োরোপের

ইতিহাস, ভাবুকের মত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, খ্রীষ্ট জন্মাইবার অন্ততঃ এক হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্ব বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুনরায় খ্রীষ্ট জন্মাইবার ৩।৪ শত বৎসর পর হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়গণ ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা না বুঝিতে পারিয়া অনেকেই ধর্ম্মের নামে অনেক অধর্ম্মের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রাচীন ইয়োরোপে যতদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে অন্নাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর উদ্ভব হইতে পারে নাই।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে পেরিক্লিজ-এর সময় অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে এলিজাবেথের সময় ইউরোপে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মূঢ়তাই বিদ্যমান ছিল এবং তজ্জন্যই ইউরোপীয়গণকে অন্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণ পেরিক্লিজ অথবা এলিজাবেথ-এর সময় যে উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই, তাহার অপর প্রমাণ ঐ ঐ সময়ে লিখিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তিহীন গ্রন্থের অভাব এবং ধর্ম্মকার্য্য-সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ লইয়া মত-দ্বৈধ। যখন কোন উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তখন তাহা লইয়া কোন মত-দ্বৈধ হইতে পারে না, কারণ নির্ভুল সত্যে না পৌঁছিতে পারিলে কোন বিষয়ক উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছে, ইহা বলা চলে না এবং নির্ভুল সত্য লইয়া কোন মতপার্থক্য থাকিতে পারে না। তিন ও দুই-এর যোগে কি হয়, তৎসম্বন্ধীয় নির্ভুল সত্য মাত্র একটি এবং তাহা যখন মানুষের বিদিত থাকে, তখন তৎসম্বন্ধে মানুষের মধ্যে প্রায়শঃ কোন মত-পার্থক্যের উদ্ভব হয় না, আর যখন ঐ সম্বন্ধে মানুষের ভ্রমের উদয় হয়, তখন অসংখ্য মতবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যদি বলা যায় যে, প্রত্যেক জিজ্ঞাসার নির্ভুল উত্তর মাত্র একটি, আর উহার উত্তর যখন ভ্রমযুক্ত হয়, তখন অসংখ্য হইয়া থাকে এবং তদনুসারে যখনই কোন বিষয়ে অসংখ্য মতবাদের উদ্ভব হয়, তখনই ঐ বিষয়ের নির্ভুল সত্য মানুষ ধরিতে পারে নাই, ইহা বুঝিতে হয়, তাহা হইলে পাঠকগণ আমাদিগের সহিত একমত অবলম্বন করিতে পারিবেন না কি?

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প-সম্বন্ধীয় নির্ভুল সত্য কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া, উহার উন্নতি পেরিক্লিজ-এর গ্রীস অথবা Elizabeth-এর ইংলণ্ডের সময় কিরূপ হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক তথাকথিত পণ্ডিতগণের মতবাদানুসারে ঐ দুইটী সময়ে গ্রীক ও ইংরাজগণ উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত আছে বটে, কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহা সত্য নহে। যখন ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প-বিষয়ে কোন দেশ উল্লেখযোগ্য কোন সত্যে উপনীত হয়, তখন অন্ততঃপক্ষে তৎপরবর্ত্তী দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দেশের মানুষ কোন বিষয়ে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য দুঃখের হস্তে নিপতিত হইতে পারে না, ইহা প্রাকৃতিক সত্য। অস্ত্রোপচার ঠিক হইয়াছে, অথচ রোগী মরিয়া গিয়াছে (operation has been successful and the patient has died peacefully), ইহা যেরূপ অস্ত্রোপচারের সঠিকতা সম্বন্ধে একটি প্রহেলিকা, সেইরূপ একটি দেশ কোন সময়ে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে উন্নতির পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছিল, অথচ তৎপরবর্ত্তী দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই ঐ দেশের মানুষ নানারূপ দুঃখে হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিল, ইহা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে উপরোক্ত উন্নতি-বিষয়ক মতবাদ সন্দেহের চক্ষে দেখিতে হয়।

পেরিক্লিজ-এর কার্য্যকালের ৫০-৬০ বৎসরের মধ্যেই যে Peloponnesian যুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে যে এথেন্স এর পতন সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। যদি বাস্তবিক পক্ষে পেরিক্লিজ-এর গ্রীস—ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প সম্বন্ধে কোন প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে Peloponnesian যুদ্ধে এথেন্সবাসিগণের যে হীন মনোবৃত্তি দেখা গিয়াছিল, তাহা সম্ভব হইত কি? তাৎকালিক Æschylus, Sophocles, Euripides, Anaxagorus, Zeno, Protagoras, Socrates, Myron, Phidias, Herodotus, Hippocrates, Pindar, Empedocles এবং

Democritus-এর বিভিন্ন-বিষয়ক পাণ্ডিত্যের কথা ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে সমস্ত মতবাদ ঐ ঐ পণ্ডিতগণের বলিয়া প্রচারিত আছে, তাহার প্রত্যেকটি যে ভ্রম-প্রমাদে পরিপূর্ণ, তাহা প্রয়োজন হইলে প্রমাণিত হইতে পারে।

সেইরূপ আবার এলিজাবেথ-এর সমসাময়িক সেক্সপীয়র প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিতগণ আধুনিক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যশোলাভ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন গ্রন্থই যে মানবসমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে হিতকর নহে এবং তাহার কোনখানিতেই যে কোন মূল সত্য শৃঙ্খলিত ভাবে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি বলিতে প্রকৃত যাহা বুঝায়, তাহা লাভ করা বাস্তবিক পক্ষে যদি ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে ঐ সময়েই ইংরাজগণকে অন্নের সন্ধানে এ-দেশে ও-দেশে বাহির হইবার প্রয়োজন হইত না এবং তিনশত বৎসর যাইতে না যাইতেই আবার ইংরাজ-প্রভুত্বের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইবার আশঙ্কা ঘটিত না।

ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় ভারতবর্ষের ঘাটে মাঠে এবং ভারতীয় ঋষিগণের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় ঋষিগণ ঐ উন্নতি সাধিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষ কতকগুলি দ্বিপদ পশু এবং ভাবসঙ্কর পাপাত্মার আবাসভূমি হইলেও ভারতবাসিগণকে অদ্যাবধি ইয়োরোপের মত ব্যাপক ভাবে অন্নসংস্থানের জন্য নফরবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, অথবা প্রতারণাবৃত্তি, অথবা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা ভাবসঙ্কর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্নসংস্থানের জন্য নফরবৃত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন এখনও সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হন নাই এবং অদূরভবিষ্যতে ঐ ভাবসঙ্কর যে পাপাত্মাগুলি মহাত্মা প্রভৃতি নামে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের অধিনায়কত্ব পদদলিত করিতে পারিলে আবার ঋষির জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হইবে এবং তখন পুনরায় ভারতবর্ষ যে সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ জ্ঞানে সমগ্র জগতের শীর্ষস্থানীয় এবং অতুলনীয়, তাহা প্রমাণিত হইবে। ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ে বেদ, বাইবেল ও কোরাণের জ্ঞান যে অতুলনীয় এবং ঐ তিনখানি গ্রন্থ যে ভারতবর্ষে রচিত, তাহা ঐ ঐ গ্রন্থ হইতেও প্রমাণিত হইতে পারে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানের বিলুপ্তিবশতঃ আজ তাহা সম্ভবযোগ্য নহে। কাযেই, আমাদিগকে আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে।

ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের উন্নতি পেরিক্লিজ-এর গ্রীসের মত অথবা এলিজাবেথ-এর ইংলণ্ডের মত হইয়াছিল, ইহা বলিলে ভারতবাসিগণ ঐ সম্বন্ধে নির্ভুল সত্যে উপনীত হইতে পারেন নাই এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মূঢ়তা বিদ্যমান ছিল, প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয়।

একসঙ্গে, ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গৌরবময় বলিয়া জাহির করা এবং প্রকারান্তরে তাহার ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প-জ্ঞানকে মূঢ়তামিশ্রিত বলা কি অসঙ্গতি-প্রকাশক নহে? কার্য্য-কারণের সংযুক্তি অনুসারে ঐতিহাসিক মতবাদ গঠন করিলে যে বিদেশীয়গণ যে যে জ্ঞানে যাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাঁহাদিগকে তাদৃশ উন্নতিতে বিভূষিত বলিয়া জাহির করিলে কি একসঙ্গে চাটুকারিতা ও কার্য্য-কারণসঙ্গত চিন্তাশক্তির অভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না? ছাত্রদিগের পক্ষে এতাদৃশ উভয়বিধ শিক্ষাই কি সর্ব্বনাশকর নহে? এতাদৃশ উপদেশ যে-সমস্ত বক্তৃতা অথবা প্রবন্ধে বিদ্যমান থাকে, তাহা কি ছাত্রদিগের শ্রবণের, অথবা পাঠের অযোগ্য নহে?

ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর তৃতীয় কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষে আজকাল যে অনৈক্য অথবা দলাদলি বিদ্যমান আছে, তাহা প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ। ইহা ছাড়া আরও বুঝিতে হয় যে, ঐ প্রাকৃতিক কারণ বশতঃ অনেক দিন হইতে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ

জাতীয়তা ভারতবর্ষে প্রায়শঃ অসম্ভব হইয়া আসিতেছে এবং তাহার জন্যই ভারতবর্ষ পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে।

এতাদৃশ মতবাদ যে কেবল শ্যামাপ্রসাদ বাবু পোষণ করেন, তাহা নহে, আজকালকার ইংরাজীশিক্ষিত ডি. লিট্. প্রভৃতি উপাধিধারী তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই ঐ ধারণার বস্তুতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

একটু চক্ষু মেলিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ধারণা সমীচীন নহে। দলাদলি যে একমাত্র অধুনা ভারতবর্ষেই বিদ্যমান আছে, তাহা নহে। জগতের প্রত্যেক দেশের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা কার্য্য-কারণের সংযুক্তি অনুসারে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, জগতের ইতিহাসে এমন একদিন ছিল বলিয়া অনুমান করা যায় বটে, যখন সমগ্র মনুষ্যসমাজের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি একরূপ ছিল না বলিলেও চলিতে পারে, কিন্তু অন্ততঃপক্ষে গত তিন হাজার বৎসর হইতে জগতের প্রত্যেক দেশেই দলাদলি তীব্রভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং প্রত্যেক দেশের ঐক্যবন্ধনও বস্তুতঃপক্ষে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যেক দেশেই দলাদলির মাত্রা ও সংখ্যা যে তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে, তাহাও কোন সত্যবাদী দ্রষ্টা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

জঙ্গল ও পর্ব্বতের যে প্রাকৃতিক সমাবেশ দেখিয়া উহাকেই ভারতবর্ষের অনৈক্যের কারণ বলিয়া শ্যামাপ্রসাদ বাবু নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদেশেই বিদ্যমান আছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের মতে মুখ্যতঃ মানবসমাজের অনৈক্যের জন্যই মানুষ ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য মানুষকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় বটে, কিন্তু ঐ দুঃখকষ্ট ও পরমুখাপেক্ষিতা অথবা পরাধীনতা যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই বিদ্যমান আছে, তাহা নহে, উহা জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। প্রকৃতি ও বিকৃতি-সম্বন্ধীয় দর্শনে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতি অথবা প্রাকৃতিক কোন অভিব্যক্তি কখনও মনুষ্যসমাজের অনৈক্যের অথবা পরাধীনতার কারণ হইতে পারে না। মনুষ্যসমাজে যে অনৈক্য দেখা যায়, তাহার একমাত্র কারণ, মানুষের নিজ নিজ বিকৃতি ও অজ্ঞাত কার্য্য।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা যে অত্যন্ত কষ্টের, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি বটে, কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষই যে দুঃখকষ্ট পাইতেছে, তাহা নহে। জগতের অন্যান্য দেশের অধিকাংশ মানুষ ভারতবাসিগণের অধিকাংশ অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখকষ্ট পাইতেছে। ভারতবাসিগণের দুঃখকষ্টের মুখ্য অথবা গৌণ কারণ যে ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব, ইহা আমরা স্বীকার করি না। আমাদের মতে ইংরাজীশিক্ষিত যে ব্যক্তিগণ ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বকে ভারতবর্ষের দুঃখকষ্টের কারণ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা মূর্খ ও কাপুরুষ। ইংরাজের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের পরিবর্ত্তে ঐ ভাবসঙ্কর ভারতীয়গণের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বে যে ভারতবাসীদিগকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইবে, তাহার সাক্ষ্য অদূরভবিষ্যতে পাওয়া যাইবে। আমাদের মতে রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে ভারতবাসিগণের দুঃখকষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ব্যতীত কখনও উহার অবসান হইবে না। পরন্তু, সমগ্র মানবসমাজের দুঃখকষ্টের কারণ কি, তাহা নির্ণয় করিয়া উহা দূর করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যেরূপ কর্ণ ধরিয়া টানিলে মাথা আপনা হইতেই নিকটবর্ত্তী হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বও আপনা হইতেই ভারতবাসিগণের করতলগত হইয়াছে।

ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর চতুর্থ কথা—"ভারতবর্ষীয়গণ প্রত্যেক যুগেই জগতের অন্যান্য জাতিকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন"।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপরোক্ত কথা হইতে মনে হইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ভারতবর্ষ যাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইংরাজীশিক্ষিত তথাকথিত পণ্ডিতগণের মধ্যে এই মতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কুমারিলভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, সায়ণাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে উপরোক্ত মত-

বাদের সমর্থন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঋষিগণের প্রণীত মূল গ্রন্থে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে আজকাল বাষ্পশক্তি, বৈদ্যুতিক শক্তি ও চৌম্বক শক্তি বলিয়া অভিহিত করা যায়, অথবা যে বিজ্ঞানকে আজকাল পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয়-বিজ্ঞান প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইতে প্রায়শঃ কোন-বিষয়ক জিজ্ঞাসার, অর্থাৎ 'why'-এর উত্তর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ঋষিগণের লিখিত গ্রন্থ হইতে প্রত্যেক-বিষয়ক প্রত্যেক জিজ্ঞাসার অতি পরিস্ফুট জবাব পাওয়া সম্ভব হয়।

যদি ভারতবর্ষে জড়বিজ্ঞানের কোন উন্নতিই সাধিত না হইত, তাহা হইলে, ভারতবর্ষের পক্ষে সমধিক আর্থিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইত না। যদি ভারতবর্ষে আর্থিক উন্নতিই না থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপীয়গণ একাদশ শতাব্দীতে অন্নাভাবে জর্জ্জরিত হইয়া ভারতবর্ষে গমনাগমনের পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য অত ব্যাকুল হইত কি?

কাযেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, এতদ্বিষয়ক শ্যামা-প্রসাদ বাবুর চতুর্থ কথাও সমীচীন নহে এবং ভারতীয় ঋষিগণ যে কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাত্রই লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে, জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তাঁহাদের জ্ঞান নির্ভুল ভাবে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন্ শ্রেণীর সমাজগঠনে মনুষ্যসমাজে প্রত্যেকে অর্থাভাব, পর-মুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একমাত্র ভারতীয় ঋষি ছাড়া আর কাহারও ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতীয় ঋষির ঐ জ্ঞান বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত বলিয়া মানুষ আজকাল দুঃখসমুদ্রে এতাদৃশ হাবুডুবু খাইতেছে।

এতদ্বিষয়ক শ্যামাপ্রসাদ বাবুর পঞ্চম কথা—"উন্নতির জন্য বর্জ্জন ও গ্রহণ, এই দুইটি কার্য্যেই ভারতবর্ষীয়গণ প্রয়োজনানুসারে আশ্রয় লইতেন"।

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপরোক্ত কথাটি পরবর্ত্তী ভারতীয়-গণের পক্ষে প্রয়োগযোগ্য বটে, কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ যে অপর কোন-দেশীয় কোন মানুষের কোন জ্ঞান গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন, ইহার কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। পরন্তু, তাঁহারা যে যুগের মানুষ, সেই যুগে জগতে অপর সকলেই যে তাঁহা-দিগকে শিক্ষা-গুরু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা অপর কোন-দেশীয় আর কাহাকেও তাঁহাদের শিক্ষাগুরুর পদে বরণ করেন নাই, ইহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ বাবুর শেষ কথা—"প্রাচীন ভারতীয়গণের মতবাদানুসারে অহিংসা এবং ত্যাগ সুখ-লাভের একমাত্র পন্থা।"

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর উপরোক্ত উক্তিও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। পরবর্ত্তী নিবন্ধকারগণের মধ্যে কাহারও কাহারও কথায় উপরোক্ত মতবাদের কথঞ্চিৎ সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত সংস্কৃত জানা থাকিলে অহিংসা এবং ত্যাগের দ্বারা যে সুখ-লাভ হইতে পারে, এতাদৃশ কথা ভারতীয় ঋষিগণ-প্রণীত কোন মূল গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ভারতীয় ঋষির মূল বেদ ও দর্শনানু-সারে দুঃখপ্রপীড়িত হইয়া মানুষ দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হইবার জন্য উৎসুক হয় বটে, কিন্তু সুখান্বেষী হইলে কখনও দুঃখের হাত হইতে মুক্ত হওয়া অথবা সুখ লাভ করা সম্ভব হয় না। তাঁহাদের মূল গ্রন্থের কথানুসারে দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়ার প্রধান উপায়, সুখান্বেষণ না করিয়া মানুষের প্রাণে সুখদুঃখের প্রবৃত্তির কেন উদ্ভব হয়, তাহা পারিপার্শ্বিক জগতে ও নিজ দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করি-বার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া।

প্রকৃত সংস্কৃত-ভাষানুসারে, "অহিংসা" এবং "ত্যাগ", এই দুইটী পদের যে অর্থ আধুনিক বাংলা ভাষায় প্রচলিত, সেই অর্থে ঐ দুইটী পদ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না। আধুনিক বাংলা ভাষায় যে অর্থে "অহিংসা" এবং "ত্যাগ", এই দুইটী পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদনুসারে "অহিংসা" এবং "ত্যাগে"র কথা মুখে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কখনও কার্য্যতঃ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। কাজেই, "অহিংসা" এবং "ত্যাগ" সুখলাভের পন্থা বলিয়া ধরিয়া লইলে প্রকৃতভাবে

সুখ লাভ করা অসম্ভবযোগ্য হয় এবং তাহা আলেয়ার আলো, অথবা হেঁয়ালি হইয়া পড়ে। ঋষিগণের বিচারকার্য্যে অথবা মতবাদে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রবিষ্ট হইতে পারিলে তাঁহাদের প্রত্যেক কথায় ও উপদেশে যাদৃশ বিজ্ঞাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহারা কুত্রাপি এতাদৃশ হেঁয়ালির ব্যবহার করিয়াছেন, ইহা মনে করা যায় না।

আমাদের মতে, শ্যামাপ্রসাদ বাবু ও তাঁহার সমশ্রেণীর ব্যক্তিবৃন্দ প্রায়শঃ ঋষিদিগের মূল গ্রন্থে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই এবং তজ্জন্য ভ্রান্ত মতবাদগুলি ঋষিগণের মতবাদ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। প্রধানতঃ ইহারই জন্য এই মানুষ-গুলি প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া প্রকৃত মানুষের অনুকম্পার যোগ্য হইয়া থাকেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস কি ছিল, তৎ-সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে কয়টী কথা বলিয়াছেন, তাহার কোনটী যে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা আমরা উপরে দেখাইলাম। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে যে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ বাবু-ই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, তাহা নহে। ঋষিদিগের মূল গ্রন্থ পড়িয়া তন্মধ্যে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে হইলে যে সাধনার প্রয়োজন, সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংগঠন কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস বলিয়া যে সমস্ত গ্রন্থ বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী ভাবসঙ্কর তথাকথিত পণ্ডিতগুলি প্রচার করিয়াছেন, সে সমস্ত গ্রন্থের কথা-গুলি প্রায়শঃ অবিশ্বাসযোগ্য। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে যে সমস্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন, কেবলমাত্র তাহাই যে অবিশ্বাসযোগ্য তাহা নহে, তাঁহাদের লিখিত মিশর, ব্যাবিলন, এসিরিয়া, গ্রীস ও রোম প্রভৃতির যে কোন প্রাচীন ইতিহাস কার্য্যকারণের সংযুক্তির সহিত মিলাইয়া অধ্যয়ন করিলে সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত হইতে হয়।

প্রাচীন ইতিহাস-সম্বন্ধীয় আধুনিক ঐতিহাসিকগণের এতাদৃশ অকৃতকার্য্যতার কারণ কি, তাহার সন্ধান-প্রয়াসী হইলে আধুনিক ইতিহাস প্রণয়নের ইতিহাস (History of History and Historian)-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

আধুনিক ইতিহাস প্রণয়নের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এমন কি দুইশত বৎসর আগেও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত Neibuhr এর কার্য্যকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আধুনিক জ্ঞানগর্ব্বী ইউরোপীয়গণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস বিদ্যমান ছিল না এবং কোন প্রাচীন দেশের ইতিহাস সঠিক ভাবে প্রণয়ন করিতে হইলে যে, ঐ দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে কোন গ্রন্থ ছিল কি না, সর্ব্বাগ্রে তাহার খবর লইয়া যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থের খবর পাওয়া যায়, তাহার প্রত্যেকখানির মূলভাগে সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন হয়, এই সত্যটুকু পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

কোন দেশের বিস্তৃত ইতিহাস যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে, সেই দেশের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের মূলভাগে সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হইবার প্রয়োজন হয়, কাম ও লোভের দ্বারা বিক্ষত আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইতিহাস-সম্বন্ধীয় এই প্রাথমিক সত্যটুকু পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই যাঁহারা কখনও বেদাঙ্গের সহিত পরিচিত হইয়া মূল সংস্কৃত ভাষা পরিজ্ঞাত হন নাই, সংস্কৃত ভাষায় ঋষিগণের প্রণীত কয়খানি গ্রন্থ আছে এবং কোন্ গ্রন্থ কোন্-বিষয়ক, তাহা যথাযথভাবে বুঝিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, তাঁহারা পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা অথবা পাণ্ডিত্য যদি জগতে বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আধু-নিক জগৎ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের সমশ্রেণীর ঐতিহাসিকগণকে ঐতিহাসিক বলিয়া মানিয়া লইতে, অথবা তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ ছাত্রগণকে অসঙ্কোচে উদরস্থ করিতে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রকারান্তরে বিপথগামী করিতে কুণ্ঠা বোধ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। মৃত ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করা সাধারণতঃ আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবিত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের নাম করিয়া আমরা বলিতেছি যে, ঐ শ্রেণীর ঐতিহাসিক-

গণের লিখিত ইতিহাস যে কত ভ্রান্তিপূর্ণ এবং উহা ছাত্রগণের পক্ষে যে কি বিষময়, তাহা প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে আমরা লোকসমক্ষে প্রমাণিত করিব।

আধুনিক মানব-সমাজের শিক্ষা-বিভাগে প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি যদি প্রকৃত সম্মান বিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মতে উপরোক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রেণীর ঐতিহাসিক, যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত না জানিয়া, বেদ প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত মূলগ্রন্থের মূলভাগে প্রবিষ্ট না হইয়া ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়া থাকেন এবং যাঁহারা শ্যামাপ্রসাদ বাবুর মত ভ্রান্ত ইতিহাসের ভ্রান্তি পরীক্ষা করিবার অযোগ্যতা সত্ত্বেও উহা শিক্ষার্থী ছাত্রগণের সমক্ষে প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা শাস্তি প্রাপ্ত না হইয়া সসম্মানে উচ্চপদস্থ হইতে এবং সমাজের মধ্যে বিচরণ করিতে পারিতেন না।

অনেকে মনে করেন যে, প্রাচীন কালে ইতিহাস প্রণয়নের প্রথা বিদ্যমান ছিল না। যাঁহারা যাজ্ঞবল্কীয় বিভিন্ন গ্রন্থে অথবা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে মানবসমাজ ইতিহাসের আলোচনা করিয়া আসিতেছে এবং ইতিহাস-রচনার মূলসূত্র কি হওয়া উচিত, তাহা ঋষিগণের সমসাময়িক মানবসমাজ যেরূপ অভ্রান্ত ভাবে পরিজ্ঞাত ছিল, তাহা আধুনিক Wolf, Boeckc, Muller, Eichhorn, Savigny, Grimm শ্রেণীর ঐতিহাসিক অথবা তৎশিষ্যগণ জানিতে পারেন নাই।

যাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক, অথবা ভাষাবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক নামের অযোগ্য, তাঁহারা ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ্ বলিয়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আধুনিক মানবসমাজের তথাকথিত শিক্ষিতগণ প্রায়শঃ মনে করেন যে, আধুনিক কালে সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে এবং আগেকার কালে মানুষ অসভ্য ছিল।

যে সময়ে বেদ, বাইবেলের ও কোরাণের মত গ্রন্থ রচনা করিবার সক্ষমতা মানুষ লাভ করিতে পারিয়াছিল, সেই সময়ের মানুষগুলিকে সভ্য ও ভাষাবিদ্ না বলিয়া আধুনিক কোন মানুষকে সভ্য ও ভাষাবিদ্ বলিলে যে সভ্যতা ও ভাষাবিজ্ঞানকে অপমানিত করা হয়, তাহা মানুষ কবে বুঝিবে? পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এত বড় অসত্য কথা প্রচার করিয়াও যে, সম্মান লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহা কি বর্ত্তমান মানবসমাজের পক্ষে ধিক্কারের যোগ্য নহে? তথাকথিত আধুনিক ঐতিহাসিকের অত্যাচারে আমরা যে কতখানি বিভ্রান্ত হইয়াছি, তাহা আমাদের মতে, অন্তত পক্ষে ভারতবাসিগণের পক্ষে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা উচিত। তখন দেখা যাইবে যে, যে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ্‌গণের চেলাগণকে বঙ্গশ্রী বরাবর আক্রমণ করিয়া আসিতেছে, তাহারাই প্রধানতঃ আমাদের শিক্ষিতসমাজের আত্মপ্রতারণার মূল।

অপর তিনটি বিষয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীনতার কারণ, ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ বাবু যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পরীক্ষা করিলেও সমান রকমের অসঙ্গতি ও অসমীচীনতা উপলব্ধি করা যাইবে। স্থানাভাব বশতঃ আমরা এখন আর উহার আলোচনা করিব না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্যামাপ্রসাদ বাবুর এই বক্তৃতাও অমৃতবাজার ও "আনন্দবাজার" পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের প্রশংসা লাভ করিতে পারিয়াছে। যাহার প্রত্যেক কথাটিতে অসঙ্গতি ও অসমীচীনতা অঙ্কিত রহিয়াছে বলিয়া পরিষ্কার দেখা যায়, তাহা যখন কোন সম্পাদকের প্রশংসার যোগ্য হয়, তখন সেই সম্পাদককে কি মনে করিতে হয়, তাহা পাঠকগণ বিচার করুন।

'হা হতোস্মি' বলিবার এই কি প্রকৃষ্ট সময় নহে?

শিক্ষা-সংস্কার আইন ও হক মন্ত্রিসভা

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Secondary Education (অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষা) সংস্কার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে কতকগুলি নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে চলিয়াছেন, বলিয়া দৈনিক কাগজওয়ালাগণ কয়েকদিন হইতে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। অমৃতবাজার ও আনন্দবাজার প্রভৃতি কয়েকটি দেশীয় তথাকথিত জাতীয় সাংবাদিকগণের পরিচালিত কাগজ উপরোক্ত শিক্ষা-সংস্কার-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলির

বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ প্রতিবাদ যে কেবলমাত্র উপরোক্ত কাগজওয়ালাগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে তাহা নহে, পরন্তু উহার গণ্ডী নাগরিকদিগের মধ্যে পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে অ্যালবার্ট-হলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে নাগরিকগণেরও একটি প্রতিবাদ-সভা কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। ঐ সভায় যে কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষার (অথবা কু-শিক্ষার) ধুরন্ধরগণের মধ্যে অনেকেই সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু ঐ সভাটিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট অথবা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুগৃহীত নাগরিকগণের সভা না বলিয়া কলিকাতার সাধারণ নাগরিকের সভা কি করিয়া বলা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবগুলিকে নাকোচ করিবার জন্য উপরোক্ত সভায় যে যে যুক্তি দেখান হইয়াছে, তন্মধ্যে তিনটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম—গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত মাধ্যমিক শিক্ষার বোর্ড স্বাধীন নহে, অর্থাৎ উহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয়—উহা সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয়—ঐ প্রস্তাবানুসারে শিক্ষার পরিচালনা সমগ্রভাবে আমলাতন্ত্রের মুঠার মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা বিদ্যমান আছে।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথাকথিত মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে ছাত্রগণের শিক্ষার উদ্দেশ্য যে সুসিদ্ধ হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু আমাদের মতে হক্ সাহেবের পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কোন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিনায়কবৃন্দের কোন প্রতিবাদ করিবার যুক্তিসঙ্গত অধিকার নাই। আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা বুঝিতে হইলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনায় কে অথবা কোন্ পদস্থ ব্যক্তি কতদিন হইতে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। উহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কেহ বা পুরুষানুক্রমে এবং কেহ বা পদানুক্রমে গত ৩০।৭০ বৎসর হইতে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন এবং উহা কখনও বা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদস্থ ব্যক্তির এবং কখনও বা কোন বিশেষ পরিবারের প্রকারান্তরে জমীদারীরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ যাঁহারা ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কৃতবিদ্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়শঃ কেহই কোন না কোন রূপের নফরগিরি না পাইলে, অথবা রামের ধন শ্যামকে কি করিয়া দিতে হয়, যে নরহন্তা তাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া কি করিয়া সাব্যস্ত করিতে হয়, তাহার যুক্তিতে অথবা তাহার ষড়্যন্ত্রে নিপুণতা লাভ করিতে না পারিলে উদরান্নের পর্য্যাপ্ত সংস্থান করিতে পারেন না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সৃষ্টি অবধি অদ্য পর্য্যন্ত যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে কৃতবিদ্য হইতে পারিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই যে জাতীয় ধনের (national wealth-এর) সৃষ্টি (creation) অথবা বণ্টন (distribution) কি করিয়া করিতে হয়, অথবা প্রকৃত বুদ্ধির প্রকৃত উৎকর্ষ সাধনের উপায় কি, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। মনে রাখিতে হইবে যে, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে যাঁহারা সাফল্য লাভ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাঁহারাই পরবর্ত্তী কালে গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন কার্য্য-পরিচালনার ভার পাইয়া থাকেন। যদি কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তামূলক হইত, তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গতভাবে একে ত' গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা উত্থাপন করা সম্ভবযোগ্য হইত না, তাহার পর আবার সমাজের মেদ, অস্থি ও মজ্জার সহিত তুলনীয়, ঐ কৃতবিদ্য যুববৃন্দকে অন্নসংস্থানের জন্য এক দুয়ার হইতে অন্য দুয়ারে ঘুরিয়া ফিরিয়া হতাশ্বাস হইয়া আত্মহত্যা-কামী অথবা এক একটী অধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলার প্রতিমূর্ত্তিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে হইত না। "ফলেন বৃক্ষঃ পরিচীয়তে"—এই বাক্যের সত্যতা মানিয়া লইলে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

বর্ত্তমান শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতি যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছে এবং তদনুসারে উহার বর্ত্তমান পরিচালকগণের যোগ্যতা ও পরিচালনা-পদ্ধতি যে সম্পূর্ণভাবে প্রশ্নযোগ্য হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কাযেই, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সংস্কারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে যোগদান করা জনসাধারণের পক্ষে কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে।

কাগজওয়ালাগণের, অথবা নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য অভিযুক্ত করিয়া হিন্দু জনসাধারণের পোষকতা সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের লেখা ও কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই কাগজওয়ালাগণ ও ঐ নেতৃবৃন্দ যাদৃশ পরিমাণে সাম্প্রদায়িকতার বিষ উদ্গীরণ করিয়া দেশের ও দশের যত অধিক পরিমাণে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, গভর্ণমেণ্টের উপর তাদৃশ সর্ব্বনাশের দায়িত্ব কোন ক্রমেই আরোপিত হইতে পারে না।

কোন "অপকর্ম্ম" চাপা দিবার উদ্দেশ্যে যদি জনসাধারণের মধ্যে ঢাক পিটাইয়া দেওয়া হয় যে, "ওগো, আমার অমুক যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অমুক অমুক আলোচনা করিতেছে, তোমাদিগকে তাহাদিগের গর্দ্দানা লইতে হইবে", তাহা হইলে ঐ অপকর্ম্ম চাপা দেওয়ার পরিবর্ত্তে যেরূপ উহার প্রচারকার্য্যে ইন্ধন যোগান হয়, সেইরূপ উপরোক্ত কাগজওয়ালাগণ ও নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইতেছেন।

গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত শিক্ষাসংস্কারের দুষ্টতা দেখাইবার জন্য অ্যালবার্ট-হলের সভায় প্রধানতঃ যে তিনটী কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে যদিও তিনটি বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে উহা মাত্র একটি। বিশ্ব-বিদ্যালয় বর্ত্তমানে যেরূপভাবে হিন্দুদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, সেইরূপভাবে পরিচালিত না হইয়া গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে মুসলমান অথবা অন্য কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথাকথিত স্বাধীনতা লোপ পাইবে এবং বাংলায় শিক্ষা দুষ্ট হইয়া যাইবে—ইহাই ঐ নেতৃবর্গের মূলকথা বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই কথাগুলি সম্পূর্ণ অসার।

"স্বাধীনতা"র একটা কাল্পনিক সংজ্ঞা প্রদান করিলে, কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান পরিচালনাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীন বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু শব্দ ও ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝিতে হয়, তদনুসারে যে প্রতিষ্ঠান হইতে বছর বছর কতকগুলি নফরবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের উদ্ভব হওয়ার সহায়তা হইয়া থাকে, তাহাকে কোন ক্রমেই স্বাধীন বলা যাইতে পারে না। কাযেই, একে ত' যাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কারও কোন কারণ নাই, পরন্তু যে পরিচালনায় গত নব্বই বৎসরের মধ্যে উহার স্বাধীনতার রাস্তা সুগম হওয়া তো দূরের কথা, উহা ক্রমশঃই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে, সেই পরিচালনা সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তনযোগ্য, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, তথাকথিত হিন্দুগণের নব্বইবৎসরব্যাপী পরিচালনায় বাঙ্গালীর শিক্ষা উন্নত হওয়া ত' দূরের কথা, উহা ক্রমেই দুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তথাকথিত কৃতবিদ্য মানুষগণের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অধর্ম্মপ্রবণতা, বিদ্যা-বিষয়ে প্রবঞ্চনা (অর্থাৎ পড়াশুনা ও সাধনা না করিয়া, প্রকৃত পণ্ডিত না হইয়া পণ্ডিত বলিয়া আত্মপ্রচারের চেষ্টা), অবৈধভাবে কুমারী ও পরস্ত্রীলোলুপতা, অস্বাস্থ্য, অকালবার্দ্ধক্য, অকালমৃত্যু ও নফর-প্রবৃত্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে—তখন এতাদৃশ হিন্দুগণের হস্ত হইতে যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা সরাইয়া লওয়া সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে কোন বাঙ্গালীর কোনরূপ অনিষ্ট হইবে, ইহা বলা কোনক্রমেই চলে না।

পরন্তু, এত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পরিচালনায় বাঙ্গালীর শিক্ষার দুষ্টতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে—সেই পরিচালনার পরিবর্ত্তন হইলে বাঙ্গালী জাতির কথঞ্চিৎ উপকার সাধিত হইলেও হইতে পারে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে হক সাহেবের মন্ত্রিসভাকে মনে রাখিতে

হইবে যে, তাঁহারা যদি রামের হস্ত হইতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনা শ্যামের হস্তে প্রদান করেন, অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার ক্রম, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষকের নির্ব্বাচন, গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, পরীক্ষা-পদ্ধতি এবং উপাধি-প্রদান-পদ্ধতির কোন পরিবর্ত্তন সাধন না করেন, তাহা হইলে আজ যে যুক্তিবলে রামকে নিন্দনীয় বলিয়া স্থির করা হইতেছে, কিছুদিন বাদে সেই যুক্তি দ্বারাই শ্যামকেও নিন্দনীয় বলিয়া জাহির করিতে হইবে।

সুশিক্ষার ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যে-শিক্ষায় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব, শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং মানসিক অশান্তির হাত এড়াইতে পারে ও তদনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিধি রচিত হইতে পারে, সেই শিক্ষার দর্শন (philosophy) ও সূত্র (fundamental principles) বেদ, বাইবেল ও কোরাণ —এই তিনখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একদিন মানুষ ঐ তিনখানি গ্রন্থ যথাযথভাবে বুঝিতে পারিত এবং উহার নির্দ্দেশানুসারে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিধি রচনা করিয়াছিল। তাহার ফলে একদিকে যেরূপ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষ দৈহিক ও মানসিক দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, সেইরূপ আবার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থানেও মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ একরূপ অবসান প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন মানুষের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান ও মুসলমান বলিয়া কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়গত ভেদ বিদ্যমান ছিল না। তখন সর্ব্বত্র সমগ্র মনুষ্য-সমাজের মধ্যে 'মানবধর্ম্ম' নামে একটি মাত্র ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল

যে বুদ্ধি অথবা সাধনার দ্বারা বেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণ, অথবা ঐ তিনখানি গ্রন্থ যে তিনটি ভাষাতে লিখিত, সেই মৌলিক তিনটি ভাষা (অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী) সম্যক্ ভাবে বুঝা সম্ভব হইতে পারে, সেই বুদ্ধি ও সাধনায় সর্ব্ব-সময়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা মানুষের পক্ষে সমান ভাবে সহজসাধ্য হয় না। ইহার কারণ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে প্রাচীন ঋষিগণের কয়েক পৃষ্ঠা উল্টাইতে হইবে। পৃথিবী ও সূর্য্য প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে বলিয়া উহাদের পরস্পরের দূরত্ব প্রতিক্ষণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। কখনও বা পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হইতেছে, আবার কখনও বা উহাদের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

পৃথিবী ও সূর্য্য যে প্রতিনিয়ত ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে, তাহা মানুষ শুনিয়াছে বটে, কিন্তু আজকালকার মানুষ উহা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু, বেদের সাধনায় কথঞ্চিৎ পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলে পৃথিবী ও সূর্য্য যে কত বেগে কোন্ দিকে কখন কিরূপ ভাবে ঘুরিতেছে, কিরূপ ভাবে দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিন ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব-যোগ্য হয়। যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হয়, তখন পৃথিবীর মানুষের ও অন্যান্য জীবের বুদ্ধিশক্তি ও প্রসারিণী শক্তি যাদৃশ প্রখর থাকে, তাদৃশ প্রখরতা ঐ দূরত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বিদ্যমান থাকে না। কারণ, সূর্য্যের তেজ সমস্ত বুদ্ধি ও প্রসারিণী শক্তির মূলাধার এবং পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্বের তারতম্যের সহিত সূর্য্যতেজের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ যেরূপ যথাযথভাবে বেদ, বাইবেল ও কোরাণ এবং উহার মূল ভাষা তিনটি বুঝিতে সক্ষম হয়, পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ঐ সক্ষমতা বিদ্যমান থাকে না। যখন ঐ ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন বেদাদি গ্রন্থ ও তাহার ভাব বুঝিবার ঐ সক্ষমতা প্রায়শঃ বিলুপ্ত হয়। প্রত্যেক বার হাজার বছরে এক একবার করিয়া পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতা-প্রাপ্ত হইতেছে।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে উপরোক্ত কথাগুলি স্থান পায় নাই বটে, কিন্তু ঐ কথাগুলি এক দিকে যেরূপ ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ আবার ঐ কথাগুলির সত্যতা যে কিরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহাও ঐ ঐ গ্রন্থে দেখান হইয়াছে। আজকালকার মানুষ আজ আমাদিগকে উপহাসাস্পদ বলিয়া মনে করিলেও করিতে পারেন বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে

আমাদের উপরোক্ত কথায় যে চিন্তার সামগ্রী আছে, তাহা অনেক মানুষ বুঝিতে পারিবে।

পৃথিবী ও সূর্য্যের ঘূর্ণায়মানতা সম্বন্ধে উপরোক্ত রহস্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া কেন যে আজকাল বিভিন্ন দ্রব্য হইতে বৈদ্যুতিক অথবা বাষ্পীয় তেজ পাওয়া সম্ভব হয় এবং কেনই বা যে উহা পাঁচ শত বৎসর আগে উপরোক্ত দ্রব্য হইতে পাওয়া সম্ভব হইত না, এবংবিধ রহস্যগুলি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বুঝিতে পারেন না এবং তাহার ফলে বৈদ্যুতিক ও বাষ্পীয় তেজের কোন্ ব্যবহার যে মানুষের ইষ্টপ্রদ এবং কোন্ ব্যবহারই বা যে অমঙ্গলপ্রদ, তাহা স্থির করিতে পারেন না। এইরূপে এই বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানের নামে কু-জ্ঞানের দ্বারা মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

এখন হইতে কিঞ্চিদধিক বার হাজার বৎসর আগে পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পতা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তখন জগতের প্রায় সর্ব্বত্র বেদ, বাইবেল ও কোরাণ বুঝিবার মত মানুষ দেখা গিয়াছিল এবং তখন মানুষের মধ্যে প্রকৃত সুশিক্ষাও প্রচারিত হইয়াছিল। উহার ছয় হাজার বৎসর পরে আবার পৃথিবী ও সূর্য্যের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং বেদাদি গ্রন্থ বুঝিবার মত মানুষেরও অভাব ঘটিয়াছিল। তখন আবার জগৎ হইতে সুশিক্ষা ও সাধনার বিলুপ্তি সম্ভাবিত হইয়াছিল। ইহার পর আবার সূর্য্য ও পৃথিবীর ব্যবধান ক্রমশঃই অল্পতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ও প্রসবিনী প্রবৃত্তিও বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই প্রাকৃতিক কারণে গত একশত বৎসর হইতে পুনরায় মানুষ শিক্ষা ও সাধনার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে এবং এই সময়ে শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে পুনরায় নানারূপ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। উপরোক্ত পরীক্ষাগুলি প্রধানতঃ স্থান পাইয়াছে ইয়োরোপে। বর্ত্তমান জগতের অন্যান্য দেশের মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়গণের বুদ্ধি অনেকাংশে প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু বুদ্ধির যে প্রকৃষ্টতা লাভ করিতে পারিলে "অব্যক্ত" ও "জ্ঞ"-সম্বন্ধীয় বেদ, বাইবেল ও কোরাণ সম্যক্ ভাবে বুঝিয়া লইয়া সুশিক্ষার দর্শন (philosophy) ও সূত্র (fundamental principles) সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে, বুদ্ধির সেই প্রকৃষ্টতা প্রাকৃতিক কারণবশতঃ ইয়োরোপে বাস করিলে অথবা ইয়োরোপে জন্মগ্রহণ করিলে লাভ করা সম্ভব হয় না। ইহার প্রাকৃতিক কারণ কি, তাহা এখানে বিশদ ভাবে বুঝান সম্ভব নহে, কারণ তাহা অতি বিস্তৃত। সংক্ষেপতঃ মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের কোন দেশ যে স্বভাবতঃ অত্যন্ত গরম, আর কোন দেশ যে অত্যন্ত ঠাণ্ডা হয়, তাহার কারণ দুইটি, যথা :—কাল (time) এবং স্থান (space)। সূর্য্য ও পৃথিবীর ঘূর্ণয়ন লইয়া কালের অভিব্যক্তি, আর সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থানের তারতম্য লইয়া অবস্থান অথবা স্থানের অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। যে দুইটি কারণে পৃথিবীর কোন একটি দেশ স্বভাবতঃ অত্যন্ত গরম আর কোন একটি দেশ স্বভাবতঃ অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া থাকে, সেই দুইটি কারণবশতঃ কোন একটি দেশের মানুষের বুদ্ধি যাদৃশ প্রকৃষ্টতা লাভ করিতে পারে, অপর একটি দেশের মানুষের বুদ্ধির তাদৃশ প্রকৃষ্টতা সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

উপরোক্ত কারণে, ইয়োরোপীয়গণের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সমস্ত পরীক্ষা নিষ্ফল হইয়াছে এবং যে যে দেশ অথবা যে যে ব্যক্তি তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ও সাধনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা তাঁহাদের অনুকরণে সমাজ-গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নানারূপ দুঃখসমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন এবং যে বুদ্ধি থাকিলে স্বীয় অবস্থা যথাযথ ভাবে বুঝা সম্ভব হয়, সেই বুদ্ধির অভাববশতঃ ইঁহাদের অবস্থা যে হীন হইতে হীনতর হইতেছে, তাহা পর্য্যন্ত ইঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন না। গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত নেতৃবৃন্দ ও আনন্দবাজার শ্রেণীর কাগজের পরিচালকবৃন্দ এতাদৃশ হীন বুদ্ধির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কাজেই, বাঙ্গালা দেশে যাহাতে সুশিক্ষার প্রচার হয়, তাহা করিতে হইলে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার ক্রম, শিক্ষার পদ্ধতি, শিক্ষকের নির্ব্বাচন, গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, পরীক্ষা-

পদ্ধতি, উপাধিপ্রদান-পদ্ধতি প্রভৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে নূতন করিয়া স্থির করিতে হইবে।

হক্ সাহেবকে জানিতে হইবে যে, শিক্ষা-সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্ত্য পরীক্ষাগুলি যে সম্পূর্ণ ভাবে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা আমাদের ইংরাজ লাট-বে-লাটগণ ভারতীয়গণের সম্মুখে স্বীকার করুন আর না-ই করুন, তাঁহারা যে প্রকৃত শিক্ষার দর্শন ও সূত্র সম্বন্ধে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন, ইহা ধ্রুব সত্য।

যথাযথ ভাবে অগ্রসর হইলে হক্ সাহেবের পক্ষে প্রকৃত সুশিক্ষার দর্শন ও সূত্র পুনরায় আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে এবং তখন তিনি একদিকে সমগ্র ভারতবর্ষের ও অন্যদিকে সমস্ত জগতের ধন্যবাদাই হইতে পারিবেন।

সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে সুশিক্ষার দর্শন ও সূত্র নিজে নিজে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায় বটে, কিন্তু যাহারা কোন না কোন সংস্কারে জর্জ্জরিত এবং সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে অন্যের অনুকরণ প্রয়াসী, তাঁহাদিগকে ঐ সূত্র ও দর্শন অপর কেহ শিখাইতে পারে না।

আমরা হক্ সাহেব ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সাফল্য কামনা করিতেছি।

কলিকাতা কর্পোরেশন সংস্কারের পরিকল্পনা ও বাঙ্গালা কংগ্রেস

হক্ সাহেবের মন্ত্রিসভা যেরূপ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালনার সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে, সেইরূপ তাঁহারা কলিকাতা কর্পোরেশন-সংস্কারেও হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারের বিরুদ্ধে যেরূপ তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্রগুলি সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে নাচিয়া উঠিয়াছেন, সেইরূপ কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কারের বিরুদ্ধেও ঐ একই অজুহাতে তথাকথিত কংগ্রেসপন্থী কাগজগুলি তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের অভিমতানুসারে হক্ সাহেবের মন্ত্রিমণ্ডলী যে শ্রেণীর সংস্কার কলিকাতা কর্পোরেশনের পরিচালনায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা পরিগৃহীত হইলে একে ত' কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িকতা অধিকতর মাত্রায় স্থান পাইবে, তাহার পর আবার কর্পোরেশন হইতে কংগ্রেস ও হিন্দুদিগের প্রভুত্ব চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইবে।

কর্পোরেশনের পরিচালনা-সংস্কারার্থে যে সমস্ত নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহাতে কলিকাতার নাগরিকদিগের অথবা জনসাধারণের সাধারণ ভাবে কোন হিত সাধিত হইবে কি না, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবগুলি বিশদভাবে গভর্ণমেণ্টের মুখ হইতে শুনা না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের মতে বিচার করা সম্ভব নহে এবং বিচার করা সঙ্গত নহে।

কর্পোরেশনের সংস্কারার্থে যে সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে, তাহা নাগরিকদিগের হিতকর অথবা অহিতকর হইবে, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু কর্পোরেশন হইতে বর্ত্তমান তথাকথিত কংগ্রেসের আধিপত্য অথবা তথাকথিত হিন্দুদিগের আধিপত্য বিদূরিত হইলে কলিকাতার নাগরিকদিগের যে কোনরূপ ক্ষতি হইবে, ইহাও মনে করা চলে না।

যিনি হিন্দু, তিনি হিন্দুর আধিপত্য দাবী না করিলে 'কালাপাহাড়' হইয়া যাইবেন, আর যিনি মুসলমান, তিনি মুসলমানের আধিপত্য দাবী না করিলে স্বজাতিবিদ্রোহী হইবেন—এতাদৃশ সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচারকের মত বিচার করিতে বসিলে আমাদের মতে বলিতে হইবে যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার নাগরিকদিগের স্বার্থ যথাবিহিত ভাবে রক্ষা করিতে হইলে আজকাল যে হিন্দুগণ ইহার পরিচালনায় ব্রতী আছেন, তাঁহাদের ও তথাকথিত কংগ্রেসের আধিপত্য যাহাতে খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় এবং অপর কেহ নূতন ভাবে যাহাতে উহার

পরিকল্পনায় ভার পাইতে পারেন, তাহার চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য। কলিকাতার অস্বাস্থ্য যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তদনুসারে বাসের পক্ষে এই সহর যে ক্রমশঃই অযোগ্য হইতে অযোগ্যতর হইয়া পড়িতেছে, কলিকাতার সম্পত্তি হইতে আয়ের হার যে ত্রিশ বৎসরের আগেকার অবস্থার তুলনায় ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে, কলিকাতার সম্পত্তি ক্রয় ও বিক্রয়ে এখন যে প্রায়শঃ লাভবান্ হওয়া যায় না, কলিকাতায় প্রকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য যে, ক্রমশঃই দুর্লভ হইয়া অস্বাস্থ্যকর খাদ্যের সুলভতা বৃদ্ধি পাইতেছে, এখানে স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয় জল সরবরাহ যে ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে, ন্যায়সঙ্গত ভাবে ট্যাক্সের হার কমিয়া যাইবার কারণ থাকা সত্ত্বেও উহা কমিয়া যাওয়া তো দূরের কথা, প্রতিক্ষণে উহা বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা যে বিদ্যমান রহিয়াছে, এতাদৃশ সত্যগুলি সম্বন্ধে কোন সত্যপ্রিয় বিচারক্ষম মানুষ অস্বীকার করিতে পারেন না। কলিকাতার নাগরিকগণের উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্য যে, যাঁহারা কর্পোরেশনের সভ্য হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী, তাহাও স্বীকার করিতে হয়।

কাযেই, বলিতে হইবে যে, কংগ্রেস ও কর্পোরেশনের তথাকথিত হিন্দু সভ্যগণ, যাঁহারা এতাবৎ কর্পোরেশন-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্থলে যাহাতে কোন নূতন ব্যক্তিসঙ্ঘ এই কার্য্যভার পাইতে পারেন এবং যাহাতে এই নূতন ব্যক্তিসঙ্ঘের কার্য্যক্ষমতার পরীক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইলে, তাহাতে কলিকাতার নাগরিকগণের অধিকতর স্বার্থহানির আশঙ্কা অমূলক এবং তদ্বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থপর ঐ নাগরিকগণের কোন আন্দোলন চালাইবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ বিদ্যমান নাই।

কর্পোরেশনে যাহাতে মুসলমানগণের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়, তাহা করিলে যে কর্পোরেশনের কার্য্যে নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাব স্থান পাইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। যে সমস্ত হিন্দু কর্পোরেশনের কাউন্সিলার রূপে বিরাজিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যেই অনেকেই যে কর্পোরেশন যাহাতে গুণাগুণনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের আত্মীয়-কুটুম্ব অথবা আশ্রিত স্তাবক হিন্দুগণের জীবিকার্জ্জনের স্থান হয়, তজ্জন্য কার্য্যতঃ সর্ব্বদাই ব্যাকুলতা দেখাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে অস্বীকার করা যায় না। কার্য্যতঃ মুসলমানগণের বিরোধিতা করিয়া গুণাগুণনির্ব্বিশেষে হিন্দুর চাকুরী ও আধিপত্যের জন্য কোনরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে হিন্দুগণের পক্ষে যদি সাম্প্রদায়িক ভাবের পরিচয় না দেওয়া হয়, তাহা হইলে মুসলমানগণের পক্ষে এইরূপ কার্য্যের জন্য সাম্প্রদায়িকতার দায়িত্ব কোন্ যুক্তিবলে চাপান যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদের মতে বহুদিন হইতে কলিকাতার হিন্দুগণের দ্বারা কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক ভাব অনুবিদ্ধ রহিয়াছে এবং তাহার প্রধান প্রযোজক আনন্দবাজার পত্রিকার মত কয়েকটী কাণ্ডজ্ঞানহীন, দ্বেষ ও কলহ প্রভৃতি পশুপ্রবৃত্তিসম্পন্ন তথাকথিত জাতীয় সংবাদপত্র।

এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব যে জাতীয় জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশকর, তাহা যাঁহারা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু, তাঁহারা হিন্দুনেতা ও সাংবাদিকগণ যাহাতে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা না কহিতে পারেন, এবং যাঁহারা মুসলমান, তাঁহারা মুসলমান নেতা ও সাংবাদিকগণ যাহাতে হিন্দুদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা না কহিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিলে এতাদৃশ সাম্প্রদায়িকতা অল্পতা প্রাপ্ত হইতে পারে। নতুবা সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পাওয়া এবং আমাদের সর্ব্বনাশ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া থাকিবে।

জমিদারের মালিকানা-স্বত্ব ও লর্ড ব্র্যাবোর্ণ

গত ৮ই ডিসেম্বর বাংলার নূতন লাট লর্ড ব্র্যাবোর্ণ ও তাঁহার পত্নীকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন ও বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স প্রভৃতি কয়েকটি সভার পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন্ নামক জমীদার-সভার পক্ষ হইতে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার উত্তরে লাট সাহেব মুখ্যতঃ যাহা বলিয়াছেন, তাহা দেশের কথার ভাবুকগণের পক্ষে মনোযোগের যোগ্য।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েসন যে অভিনন্দন দিয়াছেন, মুখ্যতঃ তাহার বক্তব্য :—প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে চলিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়, সেই সমস্ত পরিবর্ত্তন সম্পাদিত হইলে বাংলার জমীদারগণের মালিকানা-স্বত্ব প্রকারান্তরে নষ্ট হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত কথার উত্তরে লাট সাহেব যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটী কথা উল্লেখযোগ্য :—

(১) এই প্রদেশের রাষ্ট্রীয় গঠনে যে সমস্ত প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গঠনেও বিভিন্ন রকমের অসমীচীন পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা হইয়াছে বলিয়া আপনারা যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, উহার জন্য আমি আপনাদিগকে সমবেদনা জানাইতেছি।

(I sympathize with your feelings of apprehension that the drastic changes that have taken place in the political structure of the province may involve a risk of ill-considered changes in its social and economical structure also).

(২) অসমীচীন পরিবর্ত্তনের বর্জ্জন ও সর্ব্বরকমের পরিবর্ত্তনের নিবারণ—এই দুইটী কার্য্যের মধ্যে যে তফাৎ বিদ্যমান আছে, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(You should be wise to draw a distinction between the avoidance of ill-considered change and the prevention of change of any kind).

(৩) সম্পত্তির মূলনীতির সমর্থন করিতে যাওয়া এবং ঐ সম্বন্ধীয় ছোট-খাট ঠিক-ঠাকের কার্য্যে বাধা প্রদান করা এক কথা নহে।

(There is a distinction between upholding the principle of property and adopting the attitude that re-adjustments affecting property cannot be countenanced).

(৪) যতদিন পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্ত প্রচারিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আইনের ভিত্তি যে শিথিল হইয়া পড়িতেছে, এতাদৃশ কোন ধারণা পোষণ করা অপেক্ষা উন্নতিকর বিধানের সাফল্যের অধিকতর পরিপন্থী আর কিছু হইতে পারে না।

(Few things can be more dangerous to the success of progressive measures than an impression that the foundations of law are being undermined before the legislature has pronounced its judgment).

বাংলার নূতন লাট সাহেব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাগণকে এবং সেই সঙ্গে সমগ্র বাংলার সংবাদপত্র-পাঠী জনসমাজকে যে সমস্ত কথা শুনাইয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য অথবা অপ্রশংসার যোগ্য, তৎসম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদের মতে, বাঙ্গালার অগণিত মূক জনসাধারণ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সেই হৃদয়বিদারক অবস্থা হইতে তাহারা যাহাতে রক্ষা পায়, তদুচিত কার্য্যের উদ্দেশ্যে গবর্ণরের প্রধান কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত, তাহার সন্ধান আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে।

বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার কারণ কি, তৎসম্বন্ধে যতই মতভেদ থাক না কেন, বাংলার অগণিত মূক জনসাধারণ যে অন্নাভাবে, অস্বাস্থ্যে ও অশান্তিতে জর্জ্জরিত এবং বাংলার তথাকথিত মস্তিষ্কবান্ মানুষগুলি গত ৬০।৭০ বৎসর হইতে আইনের কচ্‌কচি, কথা ও আজগুবি পরিকল্পনার প্রবাহে যাদৃশ নিপুণতা দেখাইয়া আসিতেছেন, প্রকৃত কার্য্যে অথবা কার্য্যকারণসঙ্গত পরিকল্পনায় যে তাহার সহস্র ভাগের একাংশের নিপুণতাও দেখাইতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে কোন মতপার্থক্য

থাকিতে পারে না। এই ৬০।৭০ বছরের মধ্যে বাংলার ভাবুকগণ আর কি কি কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, মসী ও বাগ্‌যুদ্ধনিরত ঐ পণ্ডিতগণ বারংবার একই আইনের নানা রকম ভাবের ভাঙ্গন ও গঠনকার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন বটে, এবং কোন দোষের দায়িত্ব তাঁহাদিগের নিজেদের স্কন্ধে না লইয়া বরাবর কাপুরুষের মত ঐ দায়িত্ব তৃতীয় ব্যক্তির স্কন্ধে চাপাইতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের ফলে জাতীয় জীবনের মেদ ও অস্থিরূপী যুবকবৃন্দ কোন প্রকৃত দায়িত্বভার নিজেদের স্কন্ধে লইবার সক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পরের উপর অথবা তথাকথিত স্বাধীনতার অভাবের উপর দায়িত্ব-ভার চাপাইয়া ক্রমশঃই কাপুরুষ হইতে কাপুরুষতর হইয়া পড়িতেছেন এবং অগণিত মূক জনসাধারণের অবস্থাও উত্তরোত্তর হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে।

এতদবস্থায় বাংলার গভর্ণরের কর্ত্তব্য কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে বলিতে হইবে যে, যখন দেশের জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার কার্য্যভার তাহাদিগের প্রতিনিধিগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, তখন ঐ প্রতিনিধিগণ যাহাতে আইনের কচকচি ও কথার প্রবাহ হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিরত হইয়া কার্য্য-কারণসঙ্গত ভাবে লোকহিতকর কার্য্যের পরিকল্পনা ভাবিতে ও তাহা কার্য্যপ্রসূ করিতে যত্নবান্ হন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে গভর্ণরের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। সম্যক্ ভাবে বিশ্লেষণ করিবার মত বুদ্ধির দ্বারা বাংলার ব্যাবস্থাপক সভার সভ্যবৃন্দের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাঁরা প্রায়শঃ এক একটি কথার ঝুড়ি এবং কথার দ্বারা উহাঁদের অধিকাংশই নিরীহ জনসাধারণকে প্রতারিত করিতে সুপটু। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, উহাঁদের অনেকেই কথায় কথায় নানারূপ কার্য্য পরিকল্পনার প্রসবকার্য্যে সুপটু বটে, কিন্তু ঐ পরিকল্পনাসমূহের শতকরা ৯৯.৯টি কার্য্যকারণসঙ্গত চিন্তাশক্তির ও কার্য্যনিপুণতার সম্যক্ অভাবের পরিচায়ক।

কাজেই, নূতন আইন অনুসারে উপরোক্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবৃন্দের দ্বারা জনহিতকর কার্য্যসমূহের পরিকল্পনা ও কার্য্য যাহাতে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইলে উহাঁদের বাক্যবাগিশী বিদ্যা যে সম্পূর্ণভাবে নিন্দনীয়, তাহা ঐ সভ্যবৃন্দকে ও জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে।

অথচ, লাট সাহেব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অভিনন্দনের উত্তরে যে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা লইয়া চিন্তা করিলে উহার কোনটির মধ্যেই বাক্যবাগিশী বিদ্যা যে নিন্দনীয়, তাদৃশ কোন ভাবের বিদ্যমানতা তো দূরের কথা, ঐ বাক্যবাগীশগণের তথাকথিত প্রস্তাবগুলি যে মূলতঃ তিনি সমর্থন করিবেন, প্রকারান্তরে তাহারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

লাট সাহেবের প্রথম কথায়, তাঁহার মতে নূতন আইনের দ্বারা দেশের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক গঠনের অপরিসীম পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা অবশ্যম্ভাবী, ইহা বুঝিতে হইবে কি না, তাহা আমরা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। নূতন আইন পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিয়াছি, তদনুসারে বলিতে হয় যে, কোন প্রদেশের গবর্ণর যদি কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন অথবা কর্ত্তব্যসম্পাদনে অপটু কিংবা অলস না হন, তাহা হইলে ১৯৩৫ সালের নূতন রাষ্ট্রীয় গঠনের আইনের ফলে ভারতের কোন প্রদেশে সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক গঠনে কোনরূপ অসমীচীনতা প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় নূতন ব্যবস্থায় গবর্ণরকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যদি কোন প্রদেশে সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক গঠনে কোনরূপ অসমীচীনতা প্রবেশ লাভ করে, তাহা হইলে ঐ প্রদেশের গবর্ণর যে তাঁহার পদের অযোগ্য, ইহা আমাদের মতে নিঃসন্দেহে বুঝিতে হইবে। ইহার কোন বিরুদ্ধ মতবাদ কোন প্রদেশের কোন গবর্ণর পোষণ করিলে তিনি ঐ বিরুদ্ধ মতবাদ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে।

গভর্ণরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, যদিও বাংলার জমীদারী-স্বত্ব-বিষয়ক মূল নীতির কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে না, তথাপি তৎসম্বন্ধীয় ছোটখাট পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে।

ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের বেদ, স্মৃতি এবং শিল্প-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন গ্রন্থে কৃষি-বিষয়ে কি নীতি অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, এখনই বা কোন্ নীতি অনুসৃত হইতেছে এবং ঐ জমীর স্বত্ব সম্বন্ধে কি কি পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব ও বাদানুবাদ চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের নূতন লাট সাহেব যে, ভারতীয় কৃষিনীতির ইতিহাস যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া তৎসম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

জনসাধারণ যাহাতে অন্নাভাব হইতে রক্ষা পাইয়া সুস্থ শরীরে জীবন ধারণ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে কৃষির সুব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য এবং ঐ কৃষির সুব্যবস্থার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের প্রয়োজন, ইহা ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের একাধিক গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে কার্য্যতঃ কি ব্যবস্থা ছিল, তাহা বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যথাযথভাবে অনুমান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, শিল্প ও বাণিজ্য ভারতে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সমগ্র সমাজের জীবনধারণ মূলতঃ কৃষির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য যে এবংবিধ উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল, তাহারও মূল কারণ কৃষির সম্যক্ সাফল্য।

কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে, কৃষি-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রধান প্রয়োজন চারিটী :—

(১) কৃষি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অর্থাৎ কোন্ ব্যবস্থায় জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট থাকিতে পারে ; কোন্ জমীতে কোন্ শস্যের বীজ কখন কি ভাবে বপন করিলে এবং কোন্ পদ্ধতিতে অগ্রসর হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফসল ঐ জমী হইতে পাওয়া সম্ভব হইতে পারে ; মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির তারতম্যানুসারে ভূমিখণ্ডের স্বাভাবিক বিভাগ কিরূপ হওয়া উচিত ; কোন্ শস্য কোন্ জীবের কিরূপ ব্যবহারে লাগিলে জীবের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের উদ্ভব হইতে পারে, এবংবিধ উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ।

(২) কৃষি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান যাহাতে প্রত্যেক কৃষক পরিজ্ঞাত হয় ; জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট রাখিতে হইলে যে যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা যাহাতে সম্পাদিত হয় ; কৃষি-বিজ্ঞানানুসারে যে বীজ যে সময়ে যে জমীতে যে ভাবে বপন করা ও কৃষিকার্য্যে যে ভাবে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, সেই বীজ সেই সময়ে সেই জমীতে সেই ভাবে যাহাতে বপন করা হয় এবং সেই ভাবে যাহাতে কৃষি-কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায় ; যে ভাবে ভূমিখণ্ড বিভক্ত হইলে স্বাভাবিক বিভাগ অটুট থাকে ; যে শস্য যে জীবের যেরূপ ব্যবহারে জীবের স্বাস্থ্য অটুট থাকে, জীব যাহাতে সেই শস্য সেইরূপ ভাবে ব্যবহার করে ; কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য যেরূপ ভাবে আদান-প্রদান করিলে সমাজের মধ্যে কোনরূপ প্রতারণা প্রবিষ্ট না হইতে পারে, সেইরূপ ভাবে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আদান-প্রদান যাহাতে সম্পাদিত হয়, প্রত্যেক কৃষকের প্রতি এবংবিধ উপদেশ ও শিক্ষা।

(৩) কৃষি-সম্বন্ধীয় শ্রমজীবী, অর্থাৎ কৃষকের কার্য্য।

(৪) উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কার্য্য যাহাতে নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা।

একটু তলাইয়া ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ কার্য্য ও ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও তাহাতে সফল হইলে কোন দেশে কৃষিকার্য্য করিয়া কেহ লোক্‌সানগ্রস্ত অথবা জীবনধারণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারে না। অন্যপক্ষে, ঐ চতুর্ব্বিধ ব্যবস্থা ও কার্য্যের কোনটীতে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অনবধানতা প্রবিষ্ট হইলে মানুষের দুর্দ্দশাপন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতের কৃষি-কার্য্যে প্রধান যে যে ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা সম্যক্ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে একদিন ভারতবর্ষে যে উপরোক্ত চারিটী ব্যবস্থা হুবহু বিদ্যমান ছিল, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

উপরোক্ত চারিটি ব্যবস্থার প্রথমটি—উপলব্ধি ও বিশ্লেষণপ্রসূত জ্ঞান-বিজ্ঞানাত্মক। যাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, ভারতবর্ষে তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক, অথবা সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া অভিহিত করা হইত।

দ্বিতীয়টি—বিজ্ঞানজাত সত্যগুলির উপদেশ ও লোক-শিক্ষামূলক। যাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে "বুদ্ধিমানের দাস অথবা অনুসরণকারী" অথবা সংস্কৃত ভাষায় "বৈশ্য" বলিয়া অভিহিত করা হইত।

তৃতীয়টি—শারীরিক শ্রমমূলক। যাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে শ্রমজীবী অথবা সংস্কৃত ভাষায় "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত করা হইত।

চতুর্থটি—রক্ষণমূলক। যাঁহারা ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহাদিগকে "রাজা" অথবা সংস্কৃত ভাষায় "ক্ষত্রিয়" বলিয়া অভিহিত করা হইত।

ভারতীয় কৃষিনীতির ইতিহাসের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে উপরোক্ত ব্রাহ্মণাদি চারি শ্রেণীর মানুষ কৃষি-সম্বন্ধীয় চারি শ্রেণীর স্ব স্ব কর্ত্তব্য যথাযথ-ভাবে সম্পাদিত করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনরূপ অভাব-অভিযোগ দেখা যায় নাই এবং সমস্ত জগৎ ভারতবর্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে, প্রথমতঃ "ব্রাহ্মণ", তাহার পর "ক্ষত্রিয়" এবং ক্রমশঃ "বৈশ্য" পর্য্যন্ত স্ব স্ব কর্ত্তব্যনির্ব্বাহে উদাসীন হইয়া পড়েন, কিন্তু তখনও "শূদ্র"গণ পূর্ব্বসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কৃষিকার্য্য এরূপ ভাবে সম্পাদিত করিতে পারিতেন এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যসমাজের জীবিকা-নির্ব্বাহ একরূপ ভাবে সম্পাদন করা সম্ভবযোগ্য হইত। যখন ব্রাহ্মণাদি তিন শ্রেণীর মানুষের কর্ত্তব্যে অবহেলা আরম্ভ হইয়াছিল, তখন নামে উঁহারা বিদ্যমান ছিলেন এবং তখনও কৃষকগণের নিকট হইতে উঁহারা সম্মান আদায় করিতেন। এই সময়ে প্রধানতঃ উপরোক্ত ব্রাহ্মণাদি তিন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছিল। ইহাঁরা এতাবৎ কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধীয় কোন কর্ত্তব্যই যথাবিহিত ভাবে সম্পাদন করেন নাই বলিয়া ভারতের কৃষিকার্য্য এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভারতীয় কৃষিকার্য্যের মূলনীতি রক্ষা করিতে হইলে জমীদারগণ যাহাতে রক্ষা পান, তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ যাহাতে পুনরায় কৃষি-বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং অপর আর এক শ্রেণীর মানুষ যাহাতে কৃষকগণের প্রতি উপদেশ ও শিক্ষার কার্য্যে ব্যাপৃত হন, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য যাহাতে কোনরূপে সংহারমূলক না হইয়া সংরক্ষণমূলক হয় এবং কৃষকগণ যাহাতে বিলাসী না হইয়া প্রকৃত পক্ষে শ্রমের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহে প্রযত্নশীল হন, তাহা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তাহা না করিয়া, যাঁহাদের মতানুসারে চলিলে জমীদার ও কৃষকের মধ্যে কলহের ও অসদ্ভাবের সৃষ্টি হয়, যে ঐশ্বর্য্য প্রত্যেকের কাম্য, অথচ শ্রমের দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারিলে যাঁহাদিগের কার্য্যের ফলে বিপন্ন হইতে হয়, তাঁহাদিগের মতবাদ অনুসরণ করিলে কোন ফলোদয় হইবে না।

পাশ্চাত্ত্য দেশে যে যে বিজ্ঞান, কৃষির বিজ্ঞান, শিল্পের বিজ্ঞান, বাণিজ্যের বিজ্ঞান, অথবা অর্থবিজ্ঞান নামে চলিতেছে, সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটীকে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান বলা চলে না এবং উহার প্রত্যেকটী কুজ্ঞানে পরিপূর্ণ। আমাদের মতে এই কুজ্ঞান-সম্বন্ধীয় তথাকথিত বিজ্ঞানই মানুষের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের অভিমত যে যুক্তিযুক্ত, তাহা আমরা একাধিক প্রসঙ্গে প্রমাণিত করিয়াছি এবং প্রয়োজন হইলে উহা পুনরায় প্রমাণিত করিব।

মোটের উপর, আমাদের নূতন লাট যে ভারতের, তথা বাংলার কৃষি-বিষয়ক আসল মূলনীতি পরিজ্ঞাত নহেন এবং বর্ত্তমানে যে নীতিতে কৃষিকার্য্য পরিচালিত হইতেছে, অথবা তৎসম্বন্ধে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহা যে আমাদের ভারতের কৃষিকার্য্য-সম্বন্ধীয় আসল মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

অবশ্য ইহাও বলিতে হইবে যে, শুধু লর্ড ব্র্যাবোর্ণ কেন, জগতের অনেকেই কৃষিবিষয়ক ভারতবাসীর আসল মূলনীতি পরিজ্ঞাত নহেন। কৃষিবিষয়ক ঐ আসল মূলনীতিকে ভারতীয় ঐশ্বর্য্যের রহস্য (secrets of Indian wealth)

বলা যাইতে পারে। ঐ রহস্য এখন আর প্রায়শঃ কেহ পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া মানবসমাজ এতাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

আজকাল যে সমস্ত সংস্কার লইয়া সাধারণতঃ মানুষ গভর্ণররূপে ভারতের শাসনকার্য্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া ভারতের ঐশ্বর্য্যের উপরোক্ত রহস্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এবং তাহা কাযে লাগাইতে পারিলে শুধু ভারতবাসীকে কেন, সমগ্র মানব-সমাজকে বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

আমাদের লর্ড ব্র্যাবোর্ণ কি তাহা পারিবেন? অথবা তিনিও স্যর জন আণ্ডারসনের মত আগামী পাঁচ বৎসরে প্রতিভার অপব্যবহারের আর একটি দৃষ্টান্ত আমাদিগকে দেখাইয়া যাইবেন?

সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞানের নমুনা ও আনন্দবাজার পত্রিকা

কোন পাড়ার কোন ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন যেরূপ ঐ পাড়ার পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বরকমের কলহ যাহাতে অবসান প্রাপ্ত হইয়া সকলে মিলিয়া যাহাতে অগ্নি-নির্ব্বাপণ-ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা জনহিতৈষী মানুষের একান্ত কর্ত্তব্য, সেইরূপ মনুষ্যসমাজে যখন সর্ব্বত্রই অন্নাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব অল্পাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, তখন সর্ব্বরকমের বিদ্বেষ যাহাতে নির্ম্মূলতা প্রাপ্ত হইয়া জগতের প্রত্যেক দেশস্থ মানুষ যাহাতে পরস্পরের অন্নাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূরীকরণের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা করা জনহিতৈষীর অন্যতম কর্ত্তব্য, ইহা বলাই বাহুল্য। এতদবস্থায় যাঁহারা কোন সমাজের চালক, অথবা মাননীয়, তাঁহারা লোকহিতৈষণার নামে কোন অন্যায় কার্য্যে উদ্যোগী হইলে ঐ কার্য্য যে অন্যায়, তাহা যুক্তি দ্বারা সময় সময় দেখাইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যাহাতে অযথা কাহারও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের উদ্ভব হইতে পারে, তাদৃশ কোন কার্য্য করা কোন লোকহিতৈষী মানুষের কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না।

অথচ, আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, আমাদের সংবাদ-পত্রগুলি প্রায়শঃ যাহাতে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলনের আশঙ্কা থাকে, তাহা না লিখিয়া তাঁহাদের সম্পাদকীয় দায়িত্ব সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না।

বাঙ্গালার বহুজনাদৃত "আনন্দবাজার" পত্রিকায় আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

আমাদের কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা দেখাইবার জন্য গত ১৯শে অগ্রহায়ণ হইতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব।

ঐ সমস্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় দেখা যাইবে যে, কোন প্রবন্ধটিতে ইংরাজ-বিদ্বেষের, কোনটিতে বা মুসলমান-বিদ্বেষের, কোনটিতে বা জমাদার-বিদ্বেষের চিহ্ন প্রকট রহিয়াছে। কোনরূপ বিদ্বেষ অথবা কোনরূপ অযৌক্তিকতা-মুক্ত কোন একটি প্রবন্ধও পাওয়া যাইবে না।

রবিবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ তারিখের আনন্দবাজারের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দুইটী। একটীর নাম "ভারতে এত শান্তি" এবং অপরটীর নাম "নালমূর্ত্তির অপসারণ"।

'ভারতে এত শান্তি'-শীর্ষক প্রবন্ধে আপাতদৃষ্টিতে লর্ড লোথিয়ানের একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া তাহা সমালোচনা করা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। লর্ড লোথিয়ান নয়া শাসনতন্ত্রের কার্য্যপ্রণালীপরিদর্শনার্থ সম্প্রতি ভারতে আসিয়া বলিয়াছেন, "ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে অনন্যসাধারণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। আমার মনে হয়, বোম্বাইয়ে একখানিও বোমারু বিমান নাই; অথচ ইয়োরোপের যে কোন সহরের একশত মাইলের মধ্যে অন্তত পাঁচশত বোমারু বিমান রহিয়াছে। অতএব ভারতে আসিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। এখানে সবই কেমন শান্তিপূর্ণ ও আনন্দদায়ক।" আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনা "ভারতে এত শান্তি"-শীর্ষক প্রবন্ধে করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু,

লর্ড লোপিয়ানের উক্তির ভ্রমাত্মকতা যে-কোথায়, তাহা সমগ্র প্রবন্ধের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতে যে অশান্তি আছে, তাহা দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে বটে এবং এই বর্ণনায় ছেলেমানুষেরা প্রবীণ ব্যক্তির মুখ হইতে রুচিবিরুদ্ধ কথা শুনিলে যেরূপ ভ্যাংচাইতে থাকে, সেইরূপ ভ্যাংচাইবার চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় বটে, এবং ভারতের অশান্তি ইউরোপের অশান্তি অপেক্ষা অধিক, এতাদৃশ একটা মন্তব্যের প্রচেষ্টার প্রয়াসও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোন্ যুক্তিবলে যে ভারতের অশান্তিকে ইয়োরোপের অশান্তির তুলনায় অধিক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, অথবা কি করিলে যে ভারতের অশান্তি দূর হইতে পারে, তাহা দেখাইবার কোন চেষ্টা সমগ্র প্রবন্ধের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, কোন দেশের প্রকৃত অবস্থা বিচার করিতে হইলে যে লেখাপড়া, অথবা সাধনা, অথবা অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়,তাহা উপরোক্ত প্রবন্ধের লেখক কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অর্জ্জন করিতে পারেন নাই এবং কেবল মাত্র ছেলেমানুষের মত মুখ ভ্যাংচাইয়া সাম্প্রদায়িক দলাদলির প্রবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করিতে শিখিয়াছেন।

"নীলমূর্ত্তির অপসারণ" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির প্রথম বাক্য, "পরাজিত জাতিকে পদানত করিয়া রাখিবার জন্ম বিজয়ীরা যে সহজ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা হইল পরাধীনতা ও তাহার প্রতিকারের অসামর্থ্যের কথাটা অবিরত স্মরণ করিতে তাহাকে বাধ্য করা।"

এই প্রবন্ধটীর মুখ্য বক্তব্য নিম্নলিখিত চারিটি কথা বলিয়া প্রতীয়মান হয়:—(১) ভারতবাসিগণ যে পরাধীন, তাহা তাহারা সর্ব্বদা যাহাতে স্মরণ রাখিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটিশারগণ এতাবৎ বহু কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, (২) নীলমূর্ত্তি ঐ শ্রেণীর কার্য্যের অন্যতম, (৩) কংগ্রেস-পরিচালনায় ব্রিটিশারগণের ঐ শ্রেণীর কার্য্য বিলুপ্ত হইবে, (৪) ব্রিটিশারগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া কংগ্রেস-পন্থীদের বিরুদ্ধে এই কারণে খড়্গহস্ত হইবেন।

ভারতবাসিগণের পরাধীনতা যাহাতে তাঁহাদের স্মরণ-পথে সর্ব্বদা অঙ্কিত থাকে, তজ্জন্য ব্রিটিশারগণ অনেক কার্য্য করিতেছেন বলিয়া যে অভিযোগ এই প্রবন্ধের লেখক বৃটিশারগণের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কোন্ কোন্ কার্য্য হইতে প্রমাণিত হইতে পারে, অথবা কি কি কারণে যে ঐ ঐ কার্য্যকে আর কোন সদভিপ্রায়মূলক না বলিয়া উপরোক্ত অভিসন্ধি-মূলক বলিতে হইবে, তাহার উল্লেখ সমগ্র প্রবন্ধের কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

উপরোক্ত কারণে ঐ প্রবন্ধটীকে এক দিকে যেরূপ অযথা কলহপ্রিয়তার দোষে দুষ্ট বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে, অন্যদিকে আবার উহার প্রথম বাক্যটীকে লক্ষ্য করিলে উহাকে আত্ম-সম্মান-জ্ঞানহীনতার নিদর্শনও বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত প্রথম বাক্যটি লক্ষ্য করিলে বলিতে হইবে যে, "আনন্দবাজার"-সম্পাদকের যে কেবল মাত্র আত্মসম্মানজ্ঞান নাই, তাহা নহে, দাম্ভিকতাবশতঃ সমগ্র ভারতবাসীকে মিথ্যা অপমানসূচক বাক্য বলিতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন না। ভারতবাসীকে "পরাজিত জাতি" বলিয়া অভিহিত করিলে কি সমগ্র ভারতবাসীকে অযথা অপমানিত করা হয় না? ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পাদকটির যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, ভারতবাসীকে কোনদিন কোন জাতি পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই এবং এই সম্পাদকের মত কার্য্যকারণের কাণ্ডজ্ঞানহীন আধুনিক কোন কোন ব্রিটিশ ধুরন্ধর ভারতবাসীকে পরাজিত জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-গণের মধ্যে এমন অনেক গ্রন্থকার পাওয়া যাইবে, যাঁহারা ভারতবর্ষকে 'পরাজিত' বলা তো দূরের কথা, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সম্মানসূচক বাক্যই ব্যবহার করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের তথাকথিত রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কারণ প্রধানতঃ দুইটী:—

(১) ভারতবর্ষের সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৯৫ জনের আর্থিক প্রাচুর্য্য ও স্বাবলম্বন বশতঃ রাষ্ট্রবিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য;

(২) ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবিগণের বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে পতন ও দুষ্টতা এবং তদ্বশতঃ তাঁহাদিগের প্রতারণা-প্রবৃত্তি, অধার্ম্মিকতা ও চরিত্রহীনতার ক্রম-বিবর্দ্ধন

তোতাপাখীর মত ইতিহাস না পড়িয়া, কার্য্য-কারণের সঙ্গতভাবে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র ভারতবাসীকে কোন বিষয়ে পরাজিত করা অন্য কোন জাতির পক্ষে সম্ভব নহে এবং অদ্যাবধি কোন দিন কোন জাতি এই ভারতবাসিগণকে প্রকৃতপক্ষে পরাজিত করিতে সক্ষম হয় নাই। উপরোক্ত বুদ্ধিজীবিগণের প্রতারণা-প্রবৃত্তি, অধার্ম্মিকতা ও চরিত্রহীনতা বশতঃ তাঁহাদেরই কাহারও না কাহারও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁহাদের স্থলে এক জাতির পর আর এক জাতি করিয়া সাময়িকভাবে ভারতবাসীর তথাকথিত রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে এতাবৎ ভারতবাসী জনসাধারণের কেহই কোন ভ্রূক্ষেপ করে নাই, কারণ কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহায়তা ব্যতীতও তাহারা এতদিন প্রায়শঃ স্বাবলম্বনে সন্তুষ্টি ও শান্তির সহিত দীর্ঘ যৌবন ও দীর্ঘ জীবন উপভোগ করিতে পারিত। আপাতদৃষ্টিতে ভারতবর্ষ আজকাল রাষ্ট্রীয় ভাবে পরাধীন বটে, কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর শতকরা ৯৫ জন ঐ পরাধীনতা অনুভব করেন না। যেদিন তাহারা ঐ পরাধীনতা অনুভব করিতে বাধ্য হইবে, সেই-দিন একমাত্র ধার্ম্মিক ও সাধনানিরত মানুষ ছাড়া, পান-ভোজন অথবা ভোগবিলাসে রত কোন মানুষ তাহা-দিগকে পরাধীন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না।

২১শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার যে দুইটি প্রধান প্রবন্ধ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্থান পাইয়াছে, তাহার একটির নাম "বিমান-আক্রমণে আত্মরক্ষা" এবং অপরটীর নাম "ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মকথা।"

ভারতবর্ষ যদি জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ভারতবাসীর অবস্থায় কি ভীষণতার উদ্ভব হইবে এবং ঐ ভীষণ অবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহার আলোচনা মুখ্যতঃ প্রথম প্রবন্ধটীর বক্তব্য। এতাদৃশ আলোচনায় কোন্‌টী ভ্রমাত্মক এবং কোন্‌টী যুক্তিসঙ্গত, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ থাকা অবশ্যম্ভাবী। কাযেই, ঐ ঐ সম্বন্ধে আনন্দবাজারের অভিমতের মূল্য কতখানি, তাহার কোন বিশদ আলোচনা আমরা করিব না। আমাদের মতে, আনন্দবাজারের এই-বিষয়ক প্রত্যেক প্রস্তাবটী যে কোন বুদ্ধিমান্‌, সমর-কৌশল-জ্ঞানাক্ত গভর্ণমেণ্ট ও মানুষের হস্তে নিপতিত হইবে, তিনি তাহা অবিলম্বে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। "আনন্দবাজার"-সম্পাদকের এতাদৃশ অনধিকার-চর্চ্চা মুখ্যতঃ উপেক্ষণীয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যেও অযথা ইংরাজ-বিদ্বেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

ঐ প্রবন্ধের একস্থানে লেখা হইয়াছে, "শতবর্ষ নিরস্ত্র ও আত্মরক্ষার দায়িত্বহীন ভারতবাসীকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে রক্ষিত ও আশ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে পলায়ন ছাড়া এ দেশের লোক আর কিছু বা ভাবিতে পারে?"

সম্পাদক বাহাদুরের উপরোক্ত বাক্যটি লক্ষ্য করিয়া মনে হয়, যেন ভারতবর্ষে চিরদিন প্রত্যেক ঘরে ঘরে আগ্নেয় ও বাষ্পীয় অস্ত্র ব্যবহারের প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং কেবলমাত্র গত একশত বৎসর হইতে ইংরাজগণের প্রভুত্ববশতঃ ভারতবাসিগণ ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

শ্রীমান আনন্দবাজারের সম্পাদকটিই যে কেবলমাত্র এতাদৃশ কথা বলিয়াছেন, তাহা নহে, যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সহিত কথঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিচিত না হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপরোক্ত মতবাদের সমর্থন করিয়া থাকেন।

অথর্ববেদ ও মনুসংহিতা যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন্‌ শ্রেণীর মানুষ কিরূপ ভাবে শিক্ষা ও সাধনানিরত হইলে মানুষের সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত দুঃখের অবসান হইতে পারে, তাহার আলোচনা যেরূপ ঋষিদিগের ঐ দুইখানি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, সেইরূপ আবার সঙ্ঘগতভাবে কোন্‌ সাধনা ও শিক্ষা-সংগঠন দ্বারা মানুষ তাহার সঙ্ঘগত দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার সূত্রও ঐ দুইখানি গ্রন্থে লিপি-বদ্ধ হইয়াছে।

ঐ সূত্রের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আগ্নেয় ও বাষ্পীয় অস্ত্র জল ও বায়ুর অবিশুদ্ধতা উৎপাদন করিয়া নিরীহ মানুষের প্রাণঘাতক হইতে পারে বলিয়া, মানব-সমাজের কেহ যাহাতে উহার ব্যবহারে লিপ্ত না হয়, তাদৃশ শিক্ষা বিস্তার করাই ঋষিগণের প্রথম কথা। এই শিক্ষাসত্ত্বেও যদি কেহ আগ্নেয় ও বাষ্পীয় অস্ত্র ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার হস্ত, পদ, অথবা চক্ষু কি করিয়া এক মাইল দূর হইতে বায়ুর কম্পনের সাহায্যে বায়ুকে কোনরূপ দূষিত না করিয়া নিশ্চল ও শক্তিহীন করা যায়, তাহার অভ্যাস ঋষিগণের দ্বিতীয় কথা।

এই সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতীব বিস্তৃত এবং তাহা বিশদভাবে এখানে আলোচনা করা সম্ভব নহে। বেদ, বাইবেল অথবা কোরাণ, এই তিন খানি গ্রন্থের যে কোনখানিই ধরা যাক না কেন, তাহাতে দেখা যাইবে যে, আগ্নেয় ও বাষ্পীয় অস্ত্র সর্ব্বথা পরিত্যজ্য এবং মানুষকে অযথা হত্যা করার প্রবৃত্তি নিন্দনীয়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে, জনসাধারণকে রক্ষার ভার জ্ঞান-হীন কামলোভাতুর মানুষের হাতে যাহাতে কোনক্রমে না দেওয়া হয়, পরন্তু ঐ দায়িত্ব যাহাতে বুদ্ধিমান্ মানুষগণ গ্রহণ করেন, এবং ঐ কার্য্যে বুদ্ধিমান্ মানুষগণ যাহাতে কোনরূপ প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার না করিয়া যথাসম্ভব একমাত্র বুদ্ধির ব্যবহার করেন, তাহার উপদেশ ঐ তিন-খানি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

এক দিন যে বেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণের উপদেশ মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকেই পালন করিত, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে একদিন প্রত্যেক দেশের জন-সাধারণ যে অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহারকে নিন্দনীয় মনে করিত এবং আগ্নেয় ও বাষ্পীয় অস্ত্রের ব্যবহার যে সম্যক্ ভাবে বর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কাযেই, কেবলমাত্র ইংরাজ-রাজত্ব হইতে ভারতবাসী জনসাধারণ নিরস্ত্র হইয়া রহিয়াছেন, অথবা কেবলমাত্র ইংরাজগণই যে ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করিয়াছেন, অথবা কামলোভাতুর জনসাধারণকে নিরস্ত্র করিলেই যে কোন দোষ করা হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা চলে না।

পরন্তু, এতাদৃশ মিথ্যাকথার প্রচার যে ইংরাজ-বিদ্বেষের পরিচায়ক, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মকথা" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটির বক্তব্য যে কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি যে কি ছিল, তৎসম্বন্ধে যে, লেখক সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহার পরিচয় যেরূপ ঐ প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে, সেইরূপ আবার কোন ঐতিহাসিক কথার সত্যতা ও অসত্যতা বিচার করিতে হইলে যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়, সেই সাধারণ জ্ঞান (common sense) পর্য্যন্ত যে লেখকের নাই, তাহার সাক্ষ্যও উহাতে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবন্ধে এক সঙ্গে স্যর রাধাকৃষ্ণন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও বিবেকানন্দ স্বামীর ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞানের স্তাবকতা করিতে লেখক প্রযত্নশীল হইয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি কি ছিল, তাহা মৌলিক ভাবে জানিতে হইলে যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার আসল জ্ঞান লাভ করিয়া ঋষিপ্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থের মূলভাগ অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হয় এবং ঐ সৌভাগ্য যে কি স্যর রাধাকৃষ্ণন, অথবা কি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, অথবা কি বিবেকানন্দ স্বামী লাভ করিতে পারেন নাই এবং তদনুসারে উহাঁদের কাহারও ভারতীয় সংস্কৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যে সম্যক্ ভাবে বিশ্বাস-যোগ্য হইতে পারে না, ইহা পর্য্যন্ত যে লেখক বুঝিতে পারেন না, তাহার পরিচয় উহাতে রহিয়াছে।

প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে লেখক একটি 'আকাট' ছেলেমানুষ, এই হিসাবে তাঁহাকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধেও তাঁহার পাশ্চাত্ত্য-বিদ্বেষ জাহির হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের একস্থানে লেখক স্যর রাধাকৃষ্ণনের নিম্ন-লিখিত কথাটি উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া-ছেন :—

"শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া বহু আক্রমণ, বহু দুর্গতি এবং বহু অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রাচ্যের সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে; কিন্তু পশ্চিমের কোন সভ্যতাই সহস্র বৎসর অতিক্রম করিতে পারে নাই।"

প্রকৃত ভাবুকের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে অথবা প্রাচীন

সংস্কৃত, কিংবা প্রাচীন হিব্রু, কিংবা প্রাচীন আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়া বেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণের মূলভাগে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ কথা বিন্দুমাত্রও সত্য নহে।

প্রকৃত ভাবুকের দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন প্রাচ্যে যেরূপ বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয় শ্রেণীর মানুষই ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়ানুগ ছিল, সেইরূপ পাশ্চাত্ত্যেও সেই দিন বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ধর্ম্মভীরুতা ও ন্যায়ানুগতা বিদ্যমান ছিল। তাহার পর পাশ্চাত্ত্যের বুদ্ধিজীবী মানুষগণের মধ্যে যখন উচ্ছৃঙ্খলতা ও শঠতার উৎপত্তি হইয়াছে—ঠিক সেই সময়েই প্রাচ্যের বুদ্ধিজীবী মানুষগণের মধ্যেও উচ্ছৃঙ্খলতা ও শঠতার উদ্ভব হইয়াছে। পশ্চিমের তথাকথিত পণ্ডিতগণ যেরূপ গত আড়াই হাজার বৎসর হইতে জড়ের ভিতর চৈতন্যের উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহা প্রায়শঃ প্রত্যক্ষ না করিয়া অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয়, অথবা যে সমস্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, সেই সমস্ত গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত প্রায়শঃ না জানিয়া, অথবা সেই সমস্ত সাধনায় প্রায়শঃ অভ্যস্ত না হইয়া, নিজদিগকে পণ্ডিত বলিয়া জাহির করিয়া থাকেন, গত আড়াই হাজার বৎসর হইতে সেইরূপ প্রাচ্যের পণ্ডিতগণও প্রায়শঃ একই ভাবে মানবসমাজকে প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন।

পণ্ডিতগণের উপরোক্ত অনাচার-সত্ত্বেও প্রাচ্যের শ্রমজীবিগণের মধ্যে এখনও যেরূপ ধর্ম্মভীরুতা, সরলতা ও ন্যায়ানুগতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, পশ্চিমের শ্রমজীবিগণের মধ্যেও ঐ ধর্ম্মভীরুতা, সরলতা ও ন্যায়ানুগতা একেবারে বিদ্যমান নাই, তাহা বলা চলে না।

প্রাচীন সংস্কৃত, কিংবা প্রাচীন হিব্রু, অথবা প্রাচীন আরবী ভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া বেদ, অথবা বাইবেল, অথবা কোরাণের মূলভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কাল ও অবস্থানবশতঃ বিভিন্ন দেশের সভ্যতায় কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু সমগ্র মানবসমাজের সভ্যতায় মৌলিক সমতাও অনেকাংশে সর্ব্বদাই বজায় থাকে।

কাজেই, প্রাচ্যের সভ্যতা দাঁড়াইয়া আছে, আর পশ্চিমের কোন সভ্যতাই সহস্র বৎসর অতিক্রম করিতে পারে নাই, ইহা বলা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। পরন্তু, ইহাও পাশ্চাত্ত্য-বিদ্বেষের, অথবা স্বকীয় প্রাচ্য দাম্ভিকতার পরিচয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার তারিখে যে দুইটি প্রবন্ধ আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভ শোভিত করিয়াছে, তাহার একটির নাম "নানাকনের পতন", অপরটির নাম "শিক্ষা-বিলের প্রতিবাদ"।

এই দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেও দেখা যাইবে যে, প্রথমটিতে ইংরাজের ক্ষমতা সম্বন্ধে মিথ্যা কথা প্রচারের চেষ্টা রহিয়াছে এবং দ্বিতীয়টিতে মুসলমানগণ যাহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রভুত্ব না পান ও উহা যাহাতে হিন্দুগণের হাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য সচেষ্টতার সাক্ষ্য বিদ্যমান আছে।

২৩শে অগ্রহায়ণের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রধান দুইটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটির নাম "কর্পোরেশনে সাম্প্রদায়িক রাজত্ব" এবং অপরটির নাম "আবার প্যাক্টোপবেশন ?"

উহার প্রথমটিতে মুসলমান-বিদ্বেষের চিহ্ন এবং দ্বিতীয়টিতে গভর্ণমেণ্টকে ভীতি-প্রদর্শনের সাক্ষ্য পরিলক্ষিত হইবে।

যে সংগঠনে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রভুত্ব মুসলমানগণের হস্তে নিপতিত হইতে পারে, সেই সংগঠন যাহাতে প্রবর্ত্তিত না হয়, তজ্জন্য অনেক ওকালতি উপরোক্ত প্রথম প্রবন্ধটিতে পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু হিন্দুগণের হস্তে কর্পোরেশনের প্রভুত্ব থাকিলে করদাতা জনসাধারণের যে কি লাভ হইতে পারে, আর উহা মুসলমানগণের হস্তে হস্তান্তরিত হইলেই বা যে তাহাদের কি লোকসান হইতে পারে, তাহার একটি কথাও সমগ্র প্রবন্ধ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইবে না।

যে দুইটি প্রবন্ধ ২৪শে অগ্রহায়ণের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভ অলঙ্কৃত করিয়াছে, তাহার একটির নাম

"কংগ্রেস ও কিষাণ সভা" এবং অপরটির নাম "যুক্তপ্রদেশে সঙ্কট-সম্ভাবনা ?"

ঐ দুইটি প্রবন্ধের কোনটি হইতেই তাহার মুখ্য বক্তব্য যে কি, তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে।

উহার প্রথমটিতে জমীদার ও প্রজার মধ্যে মনোমালিন্যের উদ্ভব করার উপযোগী অনেক মনোভাবের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হইবে, আর দ্বিতীয়টিতে কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে বিরোধিতায় উল্লাসের অভিব্যক্তির অভিনয় রহিয়াছে।

২৫শে অগ্রহায়ণে আনন্দবাজারের সম্পাদক মহাশয় যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন, তাহার একটির নাম "সাম্রাজ্যবাদের সঙ্ঘর্ষ" এবং অপরটির নাম "শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট কি আসন্ন ?"

পশুবলের নিকৃষ্টতা লইয়া উপরোক্ত প্রথম প্রবন্ধটির আরম্ভ, আর উহার সমাপ্তি সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের কথায়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসে সম্পাদক মহাশয়ের উল্লাসের চিহ্ন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাতে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের ফলে মানুষের অদৃষ্ট কোথায় দাঁড়াইবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায় না। এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেক গরম গরম কথা স্থান পাইয়াছে, কিন্তু প্রবন্ধের বক্তব্য যে কি এবং ঐ বক্তব্যের উদ্দেশ্যই বা যে কি, তাহা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না।

ইহাতে একদিকে যেরূপ জাপান-বিদ্বেষের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবে, অন্যদিকে আবার ইংরাজ-বিদ্বেষের চিহ্নও সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

"শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট কি আসন্ন ?" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি পূর্ব্বদিনের "যুক্তপ্রদেশে সঙ্কট-সম্ভাবনা ?" শীর্ষক প্রবন্ধটির অনুরূপ।

উপসংহারে আমরা পাঠকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, এতাদৃশ অযৌক্তিকতা, অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষমূলক সন্দর্ভ বিতরণ করিয়াও যদি পাঠকসমাজের আদর লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে নেতৃবর্গের মধ্যে যুক্তিপ্রবণতা, জ্ঞান, এবং ন্যায়পরায়ণতার উপর শ্রদ্ধা জাগ্রত হইবে কিরূপে ?

আবার বলি, খররূপী সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাপিত করিতে হইলে একদিকে যেরূপ দাম্ভিকতা, শঠতা ও অধার্ম্মিকতা ও সর্ব্বরকমের প্রতারণা যাহাতে অস্তমিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ যাহাতে বিদূরিত হয় এবং সমগ্র সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে মিলনের প্রবৃত্তি যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

যে যাহা নয়, তাহাকে তাই বলিয়া অভিহিত করিলে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হওয়া কি স্বাভাবিক নহে ?

জগতের ইতিহাস

জগতের ইতিহাস তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে হয় ত গ্রীক জাতির অভ্যুদয়ের আগে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গ্রীক জাতির অভ্যুদয়-কাল হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত জগতে যে যে জাতির ও দেশের পরিচয় পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষ ও চীন ছাড়া আর কোন দেশে আর্থিক স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায় না।

পাশ্চাত্য জাতিসমূহ তাঁহাদের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অভিমানে অন্ধ, কিন্তু যাঁহাদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য পরের নিকট হাত পাতিতে হয়, অথবা পরের উৎপন্ন বস্তু সঞ্চয় করিবার জন্য কৌশলের ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহাদের সভ্যতার ও বিজ্ঞানের সার্থকতা কোথায় এবং তৎসম্বন্ধে অভিমানেরই বা যুক্তি কি, তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে কাহারও পক্ষে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয় কি ? আর্থিক স্বাধীনতা প্রত্যেক মানুষের আরাধ্য, অথচ জগতের অন্য কোন জাতি তাহা লাভ করিতে না পারিলেও চীন ও ভারতবর্ষ তাহা পারিয়াছিল, ইহা কি চীন ও ভারতবর্ষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয় নয় ?

বাংলার আধুনিক কালচার

—শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গশ্রীর কর্ত্তৃপক্ষ বাঙলার আধুনিক কালচার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করেছেন। সে-অনুরোধ রক্ষা করতে আমি তৎপর হয়েছি বটে, কিন্তু গোড়া থেকেই বলে রাখছি যে, একটি প্রবন্ধে আমার সকল মন্তব্য প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। বিষয়টি গুরুতর, সে-সম্বন্ধে মাল-মশলা ছড়ান, এবং আমার অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নি। যে-সব প্রমাণের ওপর আমার মতামত স্থাপিত হয়েছে, তাদের নিদর্শন দেওয়া এ ক্ষেত্রে অনুচিত। যদি কেউ চান, তবে আমি দিতে পারি। নতুন তথ্য পেলে আমার মত পরিবর্ত্তিত হবে। ইতিমধ্যের সিদ্ধান্ত আমি লিখছি।

বাঙলা কালচার স্বর্গ থেকে ঝরে নি যে-কালে, তখন তার উৎপত্তিস্থল এই পৃথিবীরই কোনো এক স্থানে। স্থানের পরিসর সমগ্র বাঙলায় বিস্তৃত। বাঙলা দেশের মধ্যে বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি পলিটিক্যাল প্রদেশের একাধিক অংশ পড়ে বটে, কিন্তু বাঙলা কালচারের মধ্যে মাগধী-কালচার আনা যুক্তিসঙ্গত নয়, যেমন যমুনা, কুশী, ঘর্ঘরাকে ভাগীরথীর শাখা বলা অন্যায়। বরঞ্চ, এই বলাই সঙ্গত যে, বাঙলা কালচার ভারতীয় পরিশীলনেরই অঙ্গ। প্রথমে, বাঙলা কালচার তার ন্যায়শাস্ত্রে, তার গানে, তার দর্শনে, তার ধর্ম্ম ও সামাজিক নানা প্রকার আচরণে ভারতের ভিন্ন কালচারের কাছেই ঋণী ছিল। দ্রাবিড়ী, আর্য্য, বৌদ্ধ, মুসলমান, মগ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ-সভ্যতার দানগুলি মিলে মিশে, আমরা যাকে বাংলার বৈশিষ্ট্য বলি, তার সৃষ্টি করেছে। অবশ্য মূল্যের গুরুত্ব লঘুত্ব আছে এবং সেই জন্যই তার রূপের বিশেষত্ব। বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্বে (ও প্রথম কালে) বাংলার কি ছিল, কেউ জোর করে কিছু বলতে পারে না। জাতি (race) হিসেবে আমরা মূলে দ্রাবিড়ী ছিলাম, এখনও মূলে তাই। কিন্তু দ্রাবিড়ী সভ্যতা অন্যত্র যে-সব লক্ষণ দেখিয়েছে, তাদের পরিণত রূপ বাংলায় ফোটে নি। দ্রাবিড়ী কথার প্রয়োগে পণ্ডিতবর্গ আপত্তি করেন জানি, কিন্তু সেটা নাম নিয়েক। মোট কথা এই : আমরা পরান্নভোজী, তবে পরান্নেও পেট ভোরে, এবং খানিকটা পুরেছে। বাংলা কালচার সৃষ্টি-ছাড়া জিনিস নয়, তার ছকটার 'জমিন্' ভারতীয়, ফুল ও জরির কাজ বিদেশী। নানা সূতোর সংযোগে এর একটা রূপ খোলে—তারই নাম দিয়েছি বাঙলার কালচার—ওরফে, বাঙলার বৈশিষ্ট্য। দুটি কথার অর্থ এক, এই লোকের ধারণা। অবশ্য বাঙলার কালচার অন্য দেশে ছড়িয়েছে সকলেই জানে, কিন্তু সে-বিস্তার আমার বিষয় নয়।

গড়ন ভিন্ন রূপ কল্পনা করা যায় না। মড়ার গড়ন থাকতে পারে, কিন্তু তার রূপ অলৌকিক। গড়ন থাকে জীবন্তের। অবশ্য জীবনে বাল্য, যৌবন, জরা সবই আছে, কিন্তু এমন অবস্থা নেই, যেখানে আচার নেই। এক হিসেবে, কালচার আচার। আচার অর্থে মানসিক চিন্তা-ধারা, দৃষ্টি-ভঙ্গী, attitudes, এবং ব্যবহারিক, লৌকিক, সামাজিক দুইই বোঝায়। এখন, বাঙলার ঐতিহাসিক, অর্থাৎ ভারতের মধ্যযুগ থেকেই আমরা এই আচার-ব্যবহারে দুটি স্তর দেখতে পাই : বড়মানুষদের ও গরীবদের। আজকার যে-আচার উচ্চ-সমাজে চলিত, কিছুকাল পরে সেই আচার নিম্ন-সমাজেও চলছে দেখি বটে, কিন্তু আচারে ও ব্যবহারে মোটামুটি পার্থক্যটা সত্য কথা। যতটা পার্থক্য ভিন্ন দেশে, অবশ্য ততটা নয়। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি দশকর্ম্মে সমাজের সকল বিভাগ সমান নয়, আমরা জানি। সে-জন্য জাতিবিচারকে (caste-system) দায়ীও করি, কিন্তু তলিয়ে দেখলে আমরা বুঝি যে, এই জাতিবিভাগে ওঠা-নামা চলত, অর্থাৎ মনু-বর্ণিত জাতি-বিভাগ অনুসারে আচার-পার্থক্য সব সময় অটুট থাকত না। নিম্নজাতি পয়সার জোরে প্রতিপত্তি লাভ করে উচ্চতর জাতির আচার অনুকরণ করছে, তার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায় আমাদের সমাজে। ইংরেজ আমলে প্রধানতঃ শিক্ষার দরুণ এই সামাজিক circulation কিংবা mobility বেশী

দ্রুত হয়েছে এই মাত্র। অতএব জাতিবিচার দিয়ে বাঙলার কালচার ব্যাখ্যা করা যথার্থ ও সর্ব্বাঙ্গীন নয়। এই ওঠা-নামার বিপক্ষেই দেবীবরের মেল-বন্ধন। কনৌজ থেকে সদ্‌ব্রাহ্মণ আনার গল্প পূর্ব্বতন কালের। সেটি গল্প বলে ছেড়ে দিলে চলবে না—কেন গল্প তৈরী হয় ও লোকে বিশ্বাস করে, তার কারণ খুঁজতে হবে। সেই কারণ হল এই—মধ্যযুগ (অর্থাৎ আমাদের বৈশিষ্ট্যের প্রায় আদিম কাল) থেকেই বাঙলার ব্রাহ্মণ-পছন্দ সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়েছিল। সুবর্ণ-বণিক সমাজের উত্থান সম্বন্ধে একটি পৌরাণিক গল্প আছে—অনেক সুবর্ণ-বণিক এখনও তা বিশ্বাস করেন, সেন-বংশীয় এক রাজা যুদ্ধের জন্য নগরের শ্রেষ্ঠ ধনীর কাছে টাকা ধার চান, পান নি, সেই পাপে রাজা তাঁকে সমাজ-চ্যুত করেন। তাঁর ব্যবসা ছিল সোনা-রূপার।

সব চেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, বাঙলার চিন্তাধারা, ধর্ম্মাচার, এমন কি দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যেও একটা ভীষণ পার্থক্য আছে। মানসিক আচারের তিন চারটি উপাদান লক্ষ্য করি—বৈষ্ণবী, তান্ত্রিক, বৈদান্তিক, পৌত্তলিক ও অপৌত্তলিক। সকলেই বোধ হয় স্বীকার করবেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম উচ্চ-জাতির মধ্যে ততটা প্রচার লাভ করে নি, যতটা করেছে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে। খাস নবদ্বীপে চৈতন্যের সময়েও, পরেও, এখনও ব্রাহ্মণ-সমাজ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিরূপ। ভট্টপল্লীতেও তাই। ব্রাহ্মণরা তন্ত্র-সাধনাই করেন, দর্শনে তাঁরা সাধারণতঃ বেদান্তকেই বেছে নিয়েছেন। তাঁদের মতে তন্ত্র ফলিত-বেদান্ত মাত্র। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, তান্ত্রিক-বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কাছে নিম্নশ্রেণীরই ধর্ম্ম, কেবল নিম্ন-জাতির নয়। পৌত্তলিক ও পৌরাণিক প্রায় একই কথা। একমাত্র বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক ছাড়া সকল বাঙ্গালী হিন্দুই পৌত্তলিক ও পৌরাণিক। সমগ্র ভারতবাসী হিন্দুই তাই, বাঙ্গালী-হিন্দুর বৈশিষ্ট্য তার পৌরাণিকতায় বৌদ্ধধর্ম্মের অধিক সংযোগে।

অথচ এই বৌদ্ধধর্ম্মই শেষকালে অপৌত্তলিক সমাজের খোরাক জুগিয়েছিল। কেবল নেড়া-নেড়ি, আউল-বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া-পন্থী প্রভৃতি গণ্ডীতে বিভক্ত হয়েই এই সমাজের নিম্নশ্রেণীরা শান্তি পান নি, পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর অবশিষ্টাংশ ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিছুকাল আগেও বাঙালী মুসলমান অ-পৌত্তলিক ছিলেন না। উত্তর-ভারত ও ভারতবর্ষের বাইরে থেকে জনকয়েক খানদানী মুসলমান এ-দেশে বসবাস করেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা ও প্রভাবে বাঙলার মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধের পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত হন নি। গত শতাব্দীর ওহাবী আন্দোলন ও রাজকীয় ঘাত-প্রতিঘাতেই বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণ অপৌত্তলিক মনোভাব অর্জ্জন করেছেন। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের ও পাঞ্জাব-উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানের মনোভাব তুলনা করলে বাঙলাদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব চোখে পড়ে। আমার বক্তব্য এই, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ও ইসলাম, যারা গরীব তাদের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম ছড়িয়ে পড়ে। যাঁরা রাজ-দরবারে থাকতেন, তাঁদের মধ্যে উচ্চজাতির হিন্দু কেউ কেউ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে রাজার ধর্ম্ম গ্রহণ করতেন অবশ্য, স্বার্থের জন্য ও ভয়ের চোটে, কিন্তু সহর ও গ্রামবাসী উচ্চশ্রেণীর বিত্তশালী বরাবরই পৌরাণিক ও পৌত্তলিক ছিলেন জোর করে বলা যায়। ইংরেজ আমলেও তাই—মাইকেল, কৃষ্ণমোহন, লালবিহারী, রামবাগানের দত্তবাড়ি, কালিচরণ, সকলেই অবশ্য সমাজের ওপরতলার জীব, কিন্তু তাঁদের পর থেকে যাঁরা খৃষ্টান হন, তাঁরা নিম্নজাতির ও আর্থিক সঙ্গতি হিসেবে নিম্নস্তরের।

এই থেকে প্রমাণ হয়:—বাঙলার সমাজে একটা পৌরাণিক তথা পৌত্তলিক ধারা আছে, তার সঙ্গে নিবিড় যোগ আছে তন্ত্র-সাধনার ও বেদান্তের, সেই ধারা উচ্চ ও মধ্যবিত্তশালীর শ্রেণী দিয়ে বইছে, অন্য ধারাগুলি স্বল্প-বিত্তশালীর মধ্যেই প্রবাহিত। অতএব, চিন্তাধারাও ঐ খাত বেয়েই চলেছে। আর প্রমাণ হয়—ধর্ম্ম-আন্দোলন, ও জনগণের ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের প্রাথমিক হেতু আর্থিক ও ও সামাজিক প্রতিপত্তির বৈষম্য। আমাদের সমাজে ধর্ম্ম রক্ষা করেছেন ব্রাহ্মণ ও তাঁর শাঁসাল শিষ্য সম্প্রদায়, ধর্ম্মের বহুতা বজায় রেখেছেন ব্রাহ্মণেতর জাতি, অর্থাৎ, যারা গরীব বলে পুরোহিত ডাকতে পারে না অতএব যাদের পৌরোহিত্য করা অশাস্ত্রীয়, আর রেখেছেন মুসলমানেরাই। ধর্ম্ম যদি ভাল হয়, যদি তার জীবন থাকে ও

থাকা উচিত মনে করি, তবে তার পরিবর্ত্তনও কাম। অতএব অ-হিন্দুদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অ-ধার্ম্মিকতা। অবশ্য যদি মধ্য ও উচ্চবিত্তশালী হিন্দুরা প্রতিপত্তি বজায় রাখাটাই বেশী দরকারী মনে করেন, তবে অন্য কথা। কিন্তু সেটা ঠিক ধর্ম্ম নয়। চলাটাই ধর্ম্ম না হতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মটার চলা চাই। সেটা চলে সামাজিক পরিবর্ত্তনের চাপে, যার পিছনে আছে বড়লোক-গরীবলোকের বিরোধ। বাঙলার ধর্ম্মাচার পরিবর্ত্তনে এই হিসেবে বিশেষত্ব নেই, আছে ধর্ম্মপ্রভাবের গুরু-লঘুত্বে।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের ইংরেজী আমলের দৃষ্টান্ত দেওয়া খুবই সহজ। সে-কথা এখন থাক। গরীব-বড়লোকের স্বার্থ-বিরোধের পটভূমিতে আরো অন্য রকমের সূক্ষ্মতর স্বার্থ-সংঘর্ষ চোখে পড়ে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও পুরাতন বাঙলা সমাজে নানান স্তর ছিল। তার ভেতর সদাগর ও শ্রেষ্ঠীর স্তরই ছিল পুরু। মুসলমান রাজত্বকালে রাজস্ব-আদায়ীর (revenue farmer) প্রতিপত্তি বাড়ে, এবং সদাগর-শ্রেষ্ঠীর ক্ষমতা স্বল্পভাবে কমে, কারণ নগদ টাকা রাখা তখন নিরাপদ ছিল না। জমি-স্বত্বই অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জেনে হিন্দু উচ্চশ্রেণীরা জমিদারী সুরু করেন। সেই জন্যই বোধ হয় কায়স্থ-সমাজের অনেক ঘরোয়ানা-বংশের উপাধি নবাবী আমলে রাজস্ববিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মুসলমান-যুগের শেষ দিকে জগৎশেঠের পূর্ব্ব-পুরুষ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন—খাজনা তাঁরাই গ্রাম থেকে এনে সহরে পৌঁছে দিতেন। তেমনই পাটনার সাহু-পরিবার জগৎশেঠের সঙ্গে সিরাজের ঝগড়া ও ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে ভাবের হেতু পুত্রবধূকে নিয়ে নয়—সেটা নাটক-নভেলের জন্য—তার হেতু ছিল পুরাতন ফিউড্যাল-মিলিটারী রাষ্ট্র-তন্ত্রের বিপক্ষে শ্রেষ্ঠীতন্ত্রের বিদ্রোহ এবং বিদেশী শ্রেষ্ঠী-তন্ত্রের সঙ্গে সমান স্বার্থের তাগিদে সম্বন্ধ-স্থাপন। ইংরেজ রাজা হয় পরে, তখন তারা স্বদেশে অর্থাৎ ইংলণ্ডে জমি-

[illegible]

মুঠোর মধ্যে এনেছে। যে-শ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন জগৎশেঠ, তারও এ দেশে স্বাভাবিক পরিণতি ছিল তাই, তার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তাই, অতএব জগৎশেঠকে দেশদ্রোহী বলা চলে না। ঐতিহাসিক নিয়তিতে স্বদেশী শ্রেষ্ঠী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে স্বার্থ-বিরোধ ঘটে, সেটা কিছুকাল পরে। সে জন্য Agency House ও বিদেশী ব্যাঙ্কের কর্ম্মিষ্ঠতাই দায়ী, আর দায়ী গবর্ণমেণ্টের সেই ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করা।

বাঙলায় শেঠের দল ভেঙ্গে গেল। তার বদলে এলেন বেনিয়ান, মুৎসুদ্দী প্রভৃতিরা। ইংরেজ বণিক যখন বাঙলায় এলেন, তখন তাঁদের দেশের লোকে বিশ্বাস করত না, ভাষা বুঝত না। এমন লোকের দরকার হল, যাদের দেশে প্রতিপত্তি আছে, টাকার লেন-দেন আছে, যাদের ওপর বিশ্বাস করে দেশের ব্যবসায়ী মালপত্র বিদেশী জাহাজে তুলে দিতে পারে, টাকা তঞ্চক হবে না, যথাসময়ে বেশী মুনাফা আসবে। বলা বাহুল্য, এ কাজ পুরাতন শ্রেষ্ঠীরই কাজ ছিল। কিন্তু তাঁদের ঘরোয়ানা ভেঙ্গে গিয়েছে, তাই পুরানো কাজে নতুন লোক লাগল। এঁরা ছিলেন বুদ্ধিমান্, বুদ্ধির জোরে ভাষা শিখলেন, ধনী হলেন, ব্যবসা চালালেন। বেনিয়ানদের কর্ত্তব্য-তালিকা পাওয়া গেছে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত কিছুই তা থেকে বাদ নেই, মায়, বিদেশীদের রাত্রিকালে অবসর-বিনোদনের উপায় পর্য্যন্ত। এঁদের ব্যবসা-সংক্রান্ত ঘটকালি কেবল ইংরেজ-কুলেই আবদ্ধ ছিল না। দিনেমার ওলন্দাজ, ফরাসী, সব পুরাতন বিদেশী বণিকই এঁদের সাহায্য নিতে ব্যস্ত হন।

অন্য দেশে এই শ্রেণীর স্বাভাবিক পরিণতি হয় banking কিংবা finance capitalist শ্রেণীতে। বাঙলা দেশে তা হয় নি। তার তিন প্রকার কারণ ছিল। প্রথম প্রকার কারণ—বিদেশী ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। Agency Houses, ও তাদের প্রতিষ্ঠিত তিনটি ব্যাঙ্ক ইংরেজ বণিক খাড়া করলে। যখন তারা পারছে না গবর্ণমেণ্ট বুঝলে, তখন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল হল। দ্বিতীয় প্রকার কারণ: জমির দিকে সমগ্র

...ই অবশ্য ঝোঁকটা

ছিল। বাঙলা দেশে এই 'নতুন' পদ্ধতির নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, যার গূঢ়ার্থ হচ্ছে, আবদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অর্থ-স্রোতকে মাঠের মধ্যে চালিয়ে ও ছড়িয়ে দেওয়া। বোম্বাই অঞ্চলেও স্রোতের মুখ ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল, সত্যকারের

খাল কেটে। সেখানে সে-চেষ্টা সফল হয় নি, কারণ জমি-স্বত্বের বন্দোবস্তটি বাঙলা দেশের মতন পাকা ছিল না। তারপর অবশ্য রেলওয়ে লাইন তৈরী করবার জন্য টাকার দরকার- দেশে টাকা পাওয়া গেল না, টাকা তখন মাটিতে পোঁতা হয়ে গেছে—বিদেশী অর্থ এই বাঘের দেশে আসবে কেন? তাই গবর্ণমেণ্ট সুদ বেঁধে দিলেন। ভারতে বিদেশী ধনাগমের ওপর একটা রিপোর্ট আছে, তার প্রথমেই আমার এক বন্ধুর এই মতামত উদ্ধৃত হয়েছে যে, আজ বিদেশ থেকে টাকা না এলে ভারতবর্ষের কোন প্রকার আর্থিক ও ব্যবসায়ের সদ্‌গতি হত না। ঠিক কথা—তবে গোড়ায় একটু গলদ আছে—দেশের commerce ও finance-capital পূর্ব্বে থেকেই ব্যবসায়ের জন্য জমে গিয়েছিল। সে যাই হোক্, বেনিয়ানরা, স্রফ ও পোদ্দারের দল ফুটতে না পেরে জমিদার হন, এই হল উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-পরিশীলনের পটভূমি। অবশ্য আরেকটি ছোট মুখ ঐ স্রোতের ছিল—আড়তদারী। কিন্তু তখন আর বাঙালী বাবু বিদেশী বণিকের জামিন নন, তিনি তখন দেশের কাঁচামাল বিদেশী বণিকের জন্য চিৎপুর, হাটখোলা, চেৎলা অঞ্চলে গুদোমজাত করেন। গ্রামে অবশ্য অনেক দিন পরেও ইংরেজের সঙ্গে ব্যবসা চালাবার জন্য বাঙালী শ্রেষ্ঠীর প্রয়োজন ছিল। আজ সিরাজগঞ্জ, বাখরগঞ্জ ও নারাণগঞ্জে, গঞ্জে গঞ্জে মাড়োয়ারী-ধনী। বাঙালী ধনী এখন টাকা ধার দেন, জমিদারদেরই বেশী। তারপর, কোলকাতা সহরের বেনিয়ান-মুৎসুদ্দী হয়ে পড়লেন অফিসের বড়-বাবু। প্রথম প্রথম এঁরা অফিস-সংক্রান্ত ব্যাপারে হর্ত্তা-কর্ত্তা হলেন। এই প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষপুঙ্গবদের বর্ণনা দিতে পেরেছেন এক চিত্তরঞ্জন গোঁসাই ও সুকুমার রায়। এঁদের আত্মীয়-স্বজনে অফিস ভরে গেল—এঁদেরই কৃপায় বাঙালী কেরাণী হন। কিন্তু আজ গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর এঁদের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটেছে। শিক্ষিত যুবক কেরাণী হয়ে এঁদের প্রতিপত্তি কমিয়েছে। আজও এক একটি পুরো গ্রাম একজন না একজন পুরাতন বড়বাবুর নাম প্রাতঃকালে স্মরণ করে। নতুন বি. এ. এম.এ-র দল ছাড়া কোন বাঙালীই তাঁদের প্রতি অকৃতজ্ঞ নন। অফিসের বড়বাবুরা গ্রামে হরি-সভা, পূজাপার্ব্বণ, বিধবা-আশ্রম প্রভৃতি নানাবিধ সদনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতেন। এঁরা ছিলেন প্রত্যেকেই নিষ্ঠাবান্ হিন্দু।

তৃতীয় প্রকার কারণ:—ব্যবসায়ী ধনিকশ্রেণীর মুখ ফেরাবার জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের শিক্ষা দিতে সুরু করলেন। গবর্ণমেণ্ট অফিসের নিম্নশ্রেণীর কেরাণী করাই সে-শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, যাঁরা বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি তুলে দিতে চান—কংগ্রেস ও ভারত-বিদ্বেষীর দলে উভয়েই—তাঁরা এই কথা বলেন। আবার কারুর কারুর মতে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্যে ভদ্র করে তোলাই ছিল তখনকার গবর্ণমেণ্টের সাধু মতলব। কিন্তু, মাত্র কার্য্যকারিতার (function) দিক্ থেকে এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোঠাতেই ফেলতে হয়। বণিক-বেনিয়ান-ব্যবসায়ীর দলকে অন্যপথগামী করাটাই ছিল তখনকার আধা-ইকনমিক আধা-পলিটিক্যাল রাজ্য-শাসন পদ্ধতির প্রাথমিক কর্ত্তব্য। বাইরে থেকে দেখতে ফল হল বিপরীত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙালী উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী জমিস্বত্বের দিকে ঝুঁকল, (চাষবাসের দিকে নয়, বাঙলাদেশে এ-দুটো কাজ পৃথক্, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ও পুরানো প্রুসিয়ায় এক), আর শিক্ষার ফলে জমি থেকে বাঙালী উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী সরে এসে সহরের অফিসে প্রবেশ করলে। পরে সেই একই দাঁড়াল, কারণ সহরে বসে জমিস্বত্ব, খাজানা, সেলামী সবই ভোগ করা যায়। গোড়ায় কোলকাতা ছিল বেনিয়ান-মুৎসুদ্দীর লীলাভূমি—পরে শিক্ষিত কেরাণীবাবুদের ক্রিয়াস্থল।

১৮৬০।৭০ সাল থেকেই কোলকাতা সহর বাঙলার মস্তিষ্কে পরিণত হল। ওধারে সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাও হল ভারতের চিন্তাকেন্দ্র। সেই থেকেই বাঙলা গ্রামের, তার ছোট সহরের regional culture-এর সর্ব্বনাশ হয়েছে। আজ কোলকাতা সমগ্র বাঙলার ক্যান্‌সার এবং এই কোলকাতায় বাঙালী বড়লোক ব্যবসাদার কম। যে-সব প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও শিক্ষাপদ্ধতির বালাই নেই, যে-সব অঞ্চলে commerce-capital-এর গতি রুদ্ধ হয় নি, সেই সব প্রদেশের লোক এই সহরের ধনী। এটা মোটেই আফশোষের কথা এক হিসাবে নয়—কারণ ঐতিহাসিক নিয়তির ভাল-মন্দ নেই। আফশোষ এই যে, আমাদের

শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙলা-পরিশীলনের একটি অধ্যায়ের পরিবেশ না বুঝে তাই নিয়ে দম্ভ করেন। আর্থিক দুরবস্থা যত বাড়ছে, ততই আমাদের সাহিত্য, গান, ছবি, বুদ্ধি নিয়ে গর্ব্ব আকাশে পৌঁচচ্ছে। সব বাঙালীর আজ এক রোগ —inferiority complex, যার চিহ্ন, হয় দম্ভ, না হয় অভিমান, কিন্তু সর্ব্বক্ষণই চেচান।

বাঙলার ইদানীংকার কীর্ত্তিকে হেয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়। রামমোহন, বঙ্কিম, রবি ঠাকুর, আশু মুখুয্যে, জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, অবনী ঠাকুর —এই রকম পঞ্চাশ জনের নাম করা যায় যাঁরা, যে-কোন দেশের মহৎ ব্যক্তি গণ্য হতে পারতেন। একশ বছরে বাঙলাদেশে এতগুলি সত্যকারের দিগ্‌গজ জন্মেছেন যে, আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। কিন্তু কি হবে magnolia grandiflora-র মালা গেঁথে! কোথায় রাখব এঁদের! গলায় পরা যায় না যে! এঁরা যে ফুটেছেন সেটা বীজের বাহাদুরী, বাগানের মালীর কেরামতী। গ্রামে গ্রামে এ-ফুল ফোটে? ফুটত যদি, জীবন স্রোতে বহতা থাকত। বহতা নেই বলেই গ্রামে ফোটে ঘেঁটু, যার গন্ধে বাঙলার পল্লীসমাজ আমোদিত।

আশুবাবু খাল কেটেছিলেন, পুরানো খাতের উদ্ধার করেছিলেন, ছেলে-মেয়েদের ডিগ্রী দিয়ে, চাকরী পাবার অসুবিধা করে, চাকরীর হতাশা এনে, চাকরীর প্রতি তাদের বীতশ্রদ্ধ করে, স্বাবলম্বী হবার সুযোগ দিয়ে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর কাজ বুঝলে না, দুঃখ প্রকাশ করলে, ষ্টাণ্ডার্ড গেল! ছিল ত খুব! যা ছিল সেটা ব্যবসা-বন্ধ করবার জন্যই তৈরী হয়েছিল। এই চাকরী-জীবি উচ্চশিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণীকে ভেঙ্গে দেবার দরকার ছিল, social mobility-র গতি দ্রুত করার প্রয়োজন ছিল, এবং তাই করেছিলেন আশুবাবু। বাঙলাভাষার ভেতর দিয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তশ্রেণীকে জনসাধারণের অঙ্গ করাই শ্যামাপ্রসাদ বাবুর কাজ। পারবেন কি না জানি না—এরই মধ্যে ইংরাজী ভাষাজ্ঞান কমে গেল বলে মড়াকান্না উঠেছে! আজ যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিছু কিছু ছড়িয়েছে, আজ যে শিক্ষিতা বঙ্গনারীরা প্রেমপত্রে ইংরিজির ভাষা ভুল বানানে লিখতে চেষ্টা করেন, রবীন্দ্রনাথের গান নাকি সুরেও গেয়ে থাকেন, আজ যে সাহিত্যিকের সংখ্যা ক্রম-বর্দ্ধমান (কোন দোষ নেই সংখ্যার, সংখ্যা গুণে পরিণত হতে পারে সামাজিক সংস্থান বদলালে), তারও কারণ ঐ য়ুনিভার্সিটি অর্থাৎ আশুবাবু। উচ্চশিক্ষিত বড় চাকুরের দল রবি ঠাকুর পড়েন না, বোঝেন না, তাঁর লেখা অপছন্দ করেন। যারা চাকরী না পেয়ে ইনসিওরেন্সের দালালী করে, খবরের কাগজ ও সাহিত্য পত্রিকা চালায়, কংগ্রেস-ভলন্টিয়ারী করে, তারাই রবি ঠাকুরকে পড়ে, বুঝতে চেষ্টা করে। যদি কালচারের 'ক' কোথাও থাকে ত' ওদেরই মধ্যে—এবং তারা য়ুনিভার্সিটিরই ঐ আশুবাবুরই সৃষ্টি। কালচারের 'ক' অবশ্য, বাকী অক্ষরগুলো নয়। কারণ, এই সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে আর বড় বেশী কিছু সম্ভব নয়। এটুকু কর্ত্তার দল কবে বুঝবেন!

সোজা কথা এই—commerce-capital ফুটতে পাই নি বাঙলায়, তার বদলে এসেছে জমিস্বত্বের দিকে ঝোঁক, এসেছে চাকরী ও সেই অনুযায়ী শিক্ষা। Indsutrial capital ফুটবে কি না জানি না। যদিও ফোটে, তবে অন্য দেশের ফলাফল মনে রেখে তাকে সীমার মধ্যে রাখতে হবে। তা নিয়ে এ-প্রবন্ধে আমি কিছু লিখব না। শুধু এই কথা জানাব যে, আমাদের কালচার এত ঠুনকো, এত ব্যক্তি-প্রধান, এত ভাবপ্রবণ যে, তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করাতে মূল্যজ্ঞানে বাধে। তবে জমিন্ কেন ফিনফিনে তাও জানতে হবে—এর বোনাটা যে ফাঁকির ওপর! যে-উদ্দেশ্যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, তার বেশী কিছু পেয়ে গিয়েছি। তা'ছাড়া এর সুতো পাৎলা, তার ওপর মাড়ও পড়ে নি। অর্থাৎ আমাদের কালচার আমাদের সমাজেরই দুর্দ্দশার ছবি, কিন্তু সামাজিক প্রগতির নিয়মের ওপর সেটি প্রতিষ্ঠিত নয়, তার সঙ্গে তাল ফেলে চলতে পারে নি। সেটা নিজের দোষেই হোক, আর পরের দোষেই হোক। এই হিসেবে আমাদের কালচার রিয়ালিষ্টিক নয়—অত্যন্ত রোমান্টিক, দিবাস্বপ্ন, ইচ্ছাপূরণেই নিঃশেষ হতে বসেছে।

ওস্‌লো ও বের্গেন

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

কোপেনহেগেন হইতে চলিলাম নরওয়ের রাজধানী ওস্‌লোতে। কোপেনহেগেন হইতে ট্রেণে উত্তরে ঘণ্টা-খানেক গিয়া হ্যাম্‌লেটের রঙ্গভূমি পুরাতন ক্রোন্‌বোর্গ প্রাসাদের কাছে সমুদ্র-খাল পার হইয়া ওপারে সুইডেনে আসা গেল। তারপর ঘণ্টা আষ্টেক সুইডেনের মধ্য দিয়া গিয়া পরে নরওয়ের সীমান্ত পার হইয়া ওস্‌লো পৌঁছিলাম। কোপেহেগেন হইতে ওস্‌লো প্রায় ১২ ঘণ্টার পথ। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় ফার্ষ্ট ক্লাস বা সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট থাকিলে গাড়ীতে বিনা পয়সায় আগে হইতে সীট রিজার্ভ করিয়া রাখা যায়। ক্রোনবোর্গ হইতে আমাদের ওস্‌লোগামী ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ী কয়েকখানি ষ্টীমারে সাগর-খাল পার হইল। এদেশগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ বলিয়া সীমান্ত পার হওয়ার সময় পাসপোর্ট, আবগারী প্রভৃতির হাঙ্গামা প্রায় নাই বলিলেই হয়। মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলিতে আজ-কাল আবার এক নূতন উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, দেশের বাহিরে সেই দেশের পয়সা অতি অল্পের বেশী সঙ্গে লইতে দেওয়া হয় না, সে জন্য বিশিষ্ট পুলিশ আসিয়া জিজ্ঞাসা-বার্ত্তা, প্রয়োজন হইলে পকেট-পরীক্ষা প্রভৃতি করে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় এ সব হাঙ্গামা নাই।

নরওয়ের জলপ্রপাত।

এই উত্তর-ইউরোপীয় দেশগুলি প্রকাণ্ড, সমগ্র ইউরোপের ম্যাপে দেখিতে যদিও ইহাদের ছোট বলিয়া মনে হয়। অত বড় নরওয়ে রাজ্যের রাজধানী হইলেও ওস্‌লো ছোট সহর। প্রধান রাস্তাটা ষ্টেশন হইতে রাজবাড়ী

পর্য্যন্ত গিয়াছে। ষ্টেশনের বাহির হইয়া ১০ মিনিট গেলেই পার্লামেণ্ট-ভবন, আরও পাঁচ মিনিট আগাইলেই অপেরা হাউস, তারপর দু'মিনিট হাঁটিলে ইউনিভার্সিটির বাড়ী, এখান হইতে পাঁচ সাত মিনিট পরেই রাজবাড়ীর পার্ক। এই সহরের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য, বাকি রাস্তাগুলি, সাধারণ বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট প্রভৃতি। নরওয়ে আগে ডেনমার্কের অধীন ছিল। এত বড় দেশটার প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গ্র্যানাইট পাহাড়ে আবৃত, সেখানে লোকের বসতি বা চাষ-বাসের উপায় নাই। বাকি এক-চতুর্থাংশ বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন, ইহারই মধ্যে, অর্থাৎ সারা নরওয়ের মাত্র ৩° অংশে লোকের বসতি। নরওয়ের প্রধান বিদেশ-রপ্তানি হইতেছে কাঠ ও তক্তা, কাঠের সার হইতে প্রস্তুত কাগজ, এবং তিমি ও অন্যান্য মাছ; তা ছাড়া এ দেশের বহু লোক বিদেশে জাহাজে কাজ করে। দেশ অতি সুসভ্য, সুশিক্ষিত ও অগ্রসর। লোকেরা কর্ম্মঠ, স্বল্পভাষী ও সত্যপরায়ণ। এখানে ও সুইডেনে জলশক্তি বাঁধিয়া এত ইলেক্‌ট্রিসিটি উৎপাদন করা হয় যে, জলের দামে বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রি হয় এবং সব রকম যন্ত্রের কাজ বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত হয়। লোকেরা এখানে ন্যায়পরায়ণ ও সরল প্রকৃতির হয়, মধ্য-ইউরোপের মত সন্দিগ্ধচিত্ত ও দুষ্টবুদ্ধি নয়। ডেনমার্কের মত নরওয়ে সুইডেনেও লেবর গবর্ণমেণ্টের শাসন, প্রজাদের সুখ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির উন্নতির বহু ব্যবস্থা। দারিদ্র্য এ দেশে এক রকম নাই, সবারই কাজ আছে ও ভবিষ্যতের সংস্থান আছে।

পর্ব্বতময় নরওয়ের গ্র্যানাইট পাহাড়গুলি একেবারে সমতল হইতে যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে, আর এই পাহাড়গুলির ফাঁকে ফাঁকে সমুদ্র প্রবেশ করিয়াছে, ইহারই নাম ফিয়র্ড। ওস্‌লো একটি ফিয়র্ডের ধারে। ওস্‌লো ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত প্রবীণ সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন ষ্টেন্ কোনো, ইঁহার নাম ও কাজ ভারততাত্ত্বিক মহলে অতি মাননীয়। ইনি বিশ্বভারতীতে অতিথি-অধ্যাপক হইয়া গিয়াছিলেন। এখানে ইঁহার বাসায় ফোন করিয়া জবাব পাইলাম না, শুনিলাম, ইনি দূরে একটা দ্বীপ কিনিয়াছেন ও সেখানে গ্রীষ্মযাপন করেন। বুড়া ষ্টেন কোনো এখন প্রোফেসারি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জামাই এখন তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত।

ওস্‌লোর একটি পরিবারে [illegible] পরিচয়-পত্র ছিল। মেয়েটি একটি বন্ধুকে সঙ্গে [illegible] মটরে আমার হোটেলে আসিলেন ও সহরের ভিতরে [illegible] হিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া দেখাইলেন। [illegible] সহর বলিয়া ইহার পরিবৃদ্ধি হইতেছে সহর [illegible] হিরে। অবস্থাপন্ন লোকেরা সবাই সহরের বাহিরে ভিলা বানাইয়া বাস করে। সহরের অতি নিকটেই পাহাড়, এই পাহাড়গুলির গায়ে ও মাথায় শীতকালের বরফের উপর স্কেটিং, স্কি-ইং প্রভৃতির অনেক জায়গা দেখিলাম। সহরের বাহিরে মুক্তস্থানে একটা বড় মিউজিয়ম আছে, সেখানে সেকালের নরওয়ের কাঠের

ভাইকিং যুগের নৌকা।
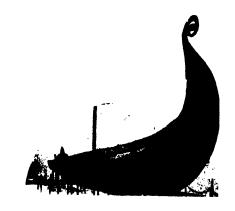
বাড়ীঘর স্বাভাবিক ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মিউজিয়মের একটা বাড়ীতে প্রাচীন যুগের মাটিতে পুঁতিয়া পাওয়া তিনখানি ভাইকিং (viking) যুগের নৌকা রাখা হইয়াছে—ইহাই ওস্‌লোর প্রধান দ্রষ্টব্য। বেড়াইবার পর মেয়েটি তাঁহাদের বাড়ীতে আহারে লইয়া গেলেন। ইঁহার মা পীড়িত হইয়া স্যানাটোরিয়ামে আছেন, বাপ অবস্থাপন্ন ইঞ্জিনিয়ার। ডেনমার্কে লোকে আমাকে বলিয়াছিল, নরওয়ের লোক একটু কাষ্ঠকঠোর হয়, ঠাট্টা-তামাসা বুঝে না, ওদের সঙ্গে একটু সাবধানে রঙ্গ-রহস্য করিয়ো! আমি কিন্তু দেখিলাম, এরা গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু সরল প্রাণে আত্মীয়তা করে, মধ্য-ইউরোপের মত উচ্ছ্বাস বা বাক্যচ্ছটা নাই, কিন্তু সদাশয়তা, ঔদার্য্য ও অন্তরঙ্গতার কার্পণ্য নাই। বাপটি আমাকে কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে আলাপ করিয়া পরখ করি-

লেন, তারপর কি জানি কি দেখিয়া এত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন যে, তাহার বেগ সামলাইতে আমাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এখানে কাগজওয়ালাদের নামে কোপেন-হেগেনের সম্পাদক চিঠি দিয়া দিয়াছিলেন, কাহাকেও কিন্তু পাইলাম না, উইক-এণ্ড বলিয়া সবাই বাহিরে। সাংবাদিক-দের সঙ্গে আমার আলাপের ইচ্ছা শুনিয়া বাপটি ওস্‌লো সহরের বড় বড় কাগজগুলিকে পাঁচ মিনিট অন্তর টেলিফোন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। একে গ্রীষ্মের ছুটি, তাতে উইক-এণ্ড, পাওয়া গেল না কাহাকেও, সব কাগজ হইতেই সংবাদ পাওয়া গেল, সেন মহাশয় পরের বার যখন ওস্‌লো আসিবেন, তখন যেন অনুগ্রহ করিয়া উইক-এণ্ড বাদ দিয়া আসেন!

প্রাক্‌কালের দিগন্তলগ্ন নৈশসূর্য্য—দশ মিনিট অন্তর গৃহীত ফটো।
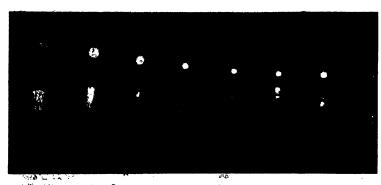
ডেনমার্ক-প্রবন্ধে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লোকের পান-প্রীতির কথা বলিয়াছি, এখানে তাহাতে হাতে হাতে ভুগিতে হইল। পাঠক ক্ষমা করিবেন, একটু মাতলামির গল্প করিব। দেশে থাকিতে মদ্য কি জিনিষ জানিতাম না। ইটালিতে আসিয়া দেখিলাম আহারের সময় লোকে জলের বদলে সাদা ওয়াইন খায়। সঙ্গীদের উপরোধে ভয়ে ভয়ে এক গ্লাস জলের সঙ্গে এক চামচ সাদা ওয়াইন মিশাইয়া খাইতাম। হাম্বুর্গে গিয়া যে দিন এক গ্লাস বিয়ার খাইয়াও কিছু হইল না, তখন ভয় ভাঙ্গিল। তারপর জার্ম্মানিতে বিয়ার, ওয়াইন, লিকার যেখানে দিয়াছে খাইয়াছি, তাহা পরিমাণে অত্যধিক না হইলেও লক্ষ্য করিয়াছি, অন্যদের উপর—অ্যাল্‌কহলের যেটুকু ক্রিয়া হয়, আমার তাহা হয় না। মধ্য-ইউরোপে আসিয়া দেখিলাম, এখানে লোকে আরও বেশী বিয়ার ও ওয়াইন পান করে। একটি বড়লোকের বাড়ী ডিনারে একদিন নানাবিধ ওয়াইনের ব্যবস্থা ছিল। প্রোফে-সর লেস্‌নী ও ভারতীয় জার্ণালিষ্ট নাম্বিয়ারও নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁহারা ধরিলেন, হুইস্কি-সোড়া খাইবেন। নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা খুব খুসী হইয়া হুইস্কি-সোডা পরিবেশনের হুকুম দিলেন। বিদায়ের সময় লেস্‌নী বলিলেন, হুইস্কিটা বেশ ষ্ট্রং ছিল, বেশ ধরিয়াছে! নাম্বিয়ারেরও দেখিলাম তদবস্থা! আমি কিন্তু তেমন অবস্থান্তর টের পাইলাম না। রকম দেখিয়া নাম্বিয়ার বলিলেন, (নিশ্চয় নেশার ঝোঁকে!) "আপনার সঙ্গে আলাপের দিন হইতে আমি আপনাকে লক্ষ্য করিতেছি, আজ সত্যই আমার মনের কথা বলিতেছি, আজ বুঝিলাম আপনার মত লোকই এ দেশে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে।" বহু স্থলে এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হইত, কেন লোকে অ্যাল্‌কহলের ফলে অপ্রকৃতিস্থ হয়। ইচ্ছা ছিল, একদিন দেখিব, অ্যাল্‌কহল কত দূর পর্য্যন্ত পান করিলে মাতলামি আসে।

একদিন একটা ফ্যান্সি-ড্রেস বলে গিয়াছি। ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক টেবিল হইতে একটি ইংরেজ আসিয়া বলিলেন, "আপনিই অমুক? আপনি এখানকার ইংলিশ ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমি সেখানকার শিক্ষক।" দলে লইয়া গিয়া আলাপ করাইয়া দিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে বসিতে হইল ও অনেক বিয়ার পান করা গেল। ইঁহারা বলিলেন, সেখান হইতে আর একটি জায়গায় যাইবেন, দলে একটি ভিয়েনার মেয়ে ছিলেন, তিনি ধরিলেন, আমাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে। গেলাম দলের সঙ্গে। সেখানে অনেক ওয়াইন পান করা হইল। তার পর ইঁহারা মতলব আঁটিলেন, যাইবেন একজনের বাসায়। সেখানে গিয়া আবার লিকার পান চলিল। মেয়েটি প্রায় চৈতন্য হারাইয়াছেন, যুবকরাও প্রমত্ত। লিকারটি ৬০% অ্যাল্‌কহলের! পা টলিতে-ছিল, কফির কাপ মুখে আনিতে হাত অবশ হইয়া গেল,

বুঝিলাম অ্যাল্‌কহলের পূর্ণ ক্রিয়া হইয়াছে এ বার, কিন্তু মানসিক বিকার একটুকুও হইল না। দলের লোকের কাণ্ড-কারখানা ও নিজের হাত-পায়ের অবস্থা বেশ সহজ ভাবে নজরে পড়িল, কোথায় আছি, কি করিতেছি, সে-সব সম্বন্ধেও কাণ্ডজ্ঞান বেশ প্রখর থাকিল। বুঝিলাম অ্যাল্‌কহলের ক্রিয়া আমার শরীরের উপর, মনের উপর বিন্দুমাত্র নয়। ভিয়েনার একটি কাউণ্টেস জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন, তিনি কোষ্ঠি বিচার করিয়া একটা লিপি পাঠাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, এ পক্ষের গূঢ় মনের সহ্য-শক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা না কি অতি সুপ্রকট, এ কথা পড়িয়া অ্যালকহল প্রতিরোধের উদাহরণ মনে আসিল!

যা' হোক, ওস্‌লোতে এঁদের বাড়ীতে আহারের পূর্ব্বে মেয়েটি বলিলেন, একটু ককটেল ইচ্ছা করি কি না।

ফিয়র্ডের একাংশ।

বাড়ীর নীচের তলায় এঁদের ওয়াইন-সেলার, একটা বারের মত করিয়া সজ্জিত। একাধিক ককটেলের পর আহারের সময় বিয়ার ও ওয়াইন। আহারের পর কফির সঙ্গে লিকার ও কনিয়াক চলিল। ভাবিলাম, এখানেই শেষ হইবে, কিন্তু অচিরেই প্রস্তাব আসিল, সেলারে গিয়া একটু হুইস্কি-সোডা সেবা করিলে কেমন হয়! ইতিমধ্যে একজন সম্পাদক শেষটা হাজির হইলেন, বাপ ভারি খুসি, হুইস্কিটা বারে বারে রিপিট করাইলেন। সম্পাদকের কাছে এ দেশের নানাবিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ করিলাম। বৈকালে বাপ বলিলেন, মোটরে আবার সহর দেখাইবেন, চলা গেল সকলে। সহর দেখিয়া ফিয়র্ডের ধারে আসিয়া বলিলেন, তাঁহার একখানা ইয়ট্ (yacht) আছে, দেখিতে হইবে। মোটর-বোটে করিয়া তাঁর সেলিং ইয়টে গিয়া পৌছিলাম, বেশ বড় সুসজ্জিত নৌকা। ইয়টের এক দেরাজ হইতে বাপ বাহির করিলেন, আবার অনেক বিয়ারের বোতল। তারপর বলিলেন, কাছেই ফিয়র্ডের উপর তাঁর ইয়ট-ক্লাবে ডিনার খাইতে হইবে। ডিনারে ভূরিভোজন করা গেল, আনুষঙ্গিক দু'রকম ওয়াইন। কফির পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনিয়াক না লিকার?" রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া মেয়েকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, আমাকে হোটেলে পৌছাইয়া দিবেন। হোটেলের কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন, কাছে একটা আর্টিষ্টদের কাফে আছে, সেটা আমাকে দেখাইবেন। সেখানে গিয়া হুকুম করিলেন, বিয়ার! সেটা শেষ হইলে বলিলেন, ওটা ছিল পরিষ্কার বিয়ার, তা ছাড়া এখানে রঙ্গীন বিয়ারও বেশ হয়, সেটাও চাখিতে হইবে! বহু গল্প, বহু হাস্য-পরিহাস, বহু আলোচনা হইল সমস্তক্ষণ। ফিরিবার সময় বলিলেন, "এখানে মোটরচালকদের পুলিশ সন্দেহ করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত পরীক্ষার জন্য লইয়া যাইতে পারে,

রক্তে যদি সামান্যের বেশী অ্যাল্‌কহল পাওয়া যায়, তবে মোটর-চালকের গুরুতর দণ্ড হয়; আমাকে যদি পুলিশ এখন ধরে তবে আজীবন আমার লাইসেন্স কাড়িয়া লইবে!" আমি মনে মনে ভাবিলাম, "লাইসেন্স তো কাড়িয়া লইবে আপনার, আর এ দিকে যে পরিমাণ গলাধঃকরণ আজ করিয়াছেন, তাহাতে অ্যাক্‌সিডেণ্ট বাধাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণটাও নষ্ট করিবেন!" যা হোক, বাড়ী পৌছান গেল। বিছানায় শুইয়া বুঝিলাম, বসুন্ধরা সত্যই মহাবেগে নিরন্তর ঘূর্ণ্যমানা, বিভিন্ন অ্যাক্সিসে, বিভিন্ন

গ্র্যানাইট পাহাড়ের উপর বিসর্পিত রাস্তা।

অরবিটে বহু সূর্য্যের পিছনে তাড়া করিতেছেন! মদ্যপান করিয়া লোকে আনন্দ অনুভব কেন করে, নিজের অভিজ্ঞতায় এত পান করিয়াও তাহা বুঝিলাম না; আমার মনে হয়, ঔষধরূপে ছাড়া পান করিলে বৃথা স্বাস্থ্য ও পয়সা নষ্ট ছাড়া আর কিছুই লাভ হয় না। মদ্যপানের এই বিবরণ হইতে পাঠক ইউরোপীয় সমাজের রীতি নীতি কিছুটা বুঝিতে পারিবেন।

শুধু তরুণ সমাজে নয়, এ দেশের ও মধ্য-ইউরোপে পারিবারিক চক্রেও এমন অনেক সামাজিক ও স্ত্রী-পুরুষ-ঘটিত বিষয়ের আলোচনার অবতারণা করা হয় এবং তাহাতে মা-বাপ, ভাই-বোন, এমন অবাধে যোগ দেয়, আমাদের ভারতীয় রীতিতে তাহা অনেক সময় শ্লীলতা ও সুরুচির নিয়ম লঙ্ঘন করে। ইহার পিছনে সত্যপ্রিয়তা আছে হয়ত, কিন্তু তাহারও পিছনে আমার মনে হয়, আধুনিকত্ব নামধারী একটা বিকৃতি (perversity) উঁকি দেয়।

ওস্‌লোর গায়ে যে ফিয়র্ড, তাহার উপর বন্দর। সহরের কাছের পাহাড়ের মাথা হইতে আশে-পাশের ফিয়র্ড একটু দেখা যায়।

ওসলো হইতে পশ্চিম-নরওয়ের সাগরকূলে নরওয়ের দ্বিতীয় নগর বের্গেন (Bergen) গেলাম। ১১ ঘণ্টার রাস্তা, সারাটা পথ পর্ব্বতময়। এই রেলপথ বের্গেনের পার্ব্বত্য রেল বলিয়া বিখ্যাত। রাত্রে ওস্‌লো ত্যাগ করিলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময় কণ্ডাক্টার বলিল, সীট-রিজার্ভের টিকিট কিনিতে হইবে। ওস্‌লো-বের্গেন লাইনে সীট-টিকিট কিনিতে সবাই বাধ্য, অন্য লাইনে যে এই টিকিট লয়, সে রিজার্ভ সীট পায়, যে লয় না, বসিবার জায়গা না পাইলে তাহাকে করিডারে দাঁড়াইয়া যাইতে হয়। ওস্‌লো-বের্গেন লাইনে দিনের বেলায় সীট-টিকিটের দাম লাগে না, কিন্তু রাত্রে সেকেণ্ড ক্লাসের সীটের জন্য ৩ শিলিং দাম লাগিল। নরওয়ে-সুইডেনে দেখিলাম, থার্ড-ক্লাস স্লীপিং-কারও থাকে। গাড়ী সারারাত চলিয়া পরদিন সকাল ৯টায় বের্গেন পৌছিবে, লোকের পয়সা আছে বলিয়া সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী

সবাই স্লীপিং-কারে গিয়াছে, আমার কামরায় আমি ভাড়ার উপর মাত্র তিন শিলিং অতিরিক্ত দিয়া সারারাত একা চলিলাম। ভোরের দিকে শীত বোধ হইল, গাড়ীর জানালায় ক্রমাগত আলো-অন্ধকারের বদল হইতেছে দেখিয়া বুঝিলাম, গাড়ী মিনিটে মিনিটে টানেল ভেদ করিয়া চলিয়াছে। গাড়ীর জানালা খুলিয়া দেখিলাম, দুপাশে খালি গ্র্যানাইটের পাহাড়, গাড়ী প্রায় পাহাড়ের মাথা বাহিয়া চলিয়াছে, নীচে কখন উপত্যকা, কখন জল দেখা যাইতেছে। বের্গেন হইতে ওস্‌লো ফিরিবার সময় দিনের গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, তখন দেখিলাম, স্থানটি এ লাইনের উচ্চতম জায়গায়, ইহার পর গাড়ী ক্রমে পশ্চিমে পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিতে থাকে। কোপেনহেগেন ও ওস্‌লোতে ও পরে ষ্টক্‌হলমেও আগষ্ট মাসে বেশ গরমই পাইয়াছিলাম, এখানে পাহাড়ের মাথায় দেখিলাম বরফ জমিয়া, পাহাড়ের গা বাহিয়া কয়েকটি ক্ষীণ স্রোতস্বিনী জমিয়া রজতশুভ্র হইয়া আছে। ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া রেস্তরাঁ-কারে গিয়া প্রাতরাশে বসিলাম। রেস্তরাঁ-কারে যাত্রীদের দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া গাড়ীর দেওয়াল প্রায় সমস্তটা বড় বড় কাঁচের জানালাময়। গাড়ী তখন পর্ব্বতের মাথা হইতে নামিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া চলিয়াছে। এইখানে ফিয়র্ডের মূর্ত্তি ঘণ্টা দুই তিন বসিয়া দেখিলাম।

ফিয়র্ডের একাংশ।

সে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! ইউরোপে আসিবার আকাঙ্ক্ষা কোন্ বাঙ্গালী বালকের না থাকে? কিন্তু ভাবিতাম যে ইউরোপ দেখিলেও মিশরের পিরামিড ও নরওয়ের ফিয়র্ড দেখা ভাগ্যে বুঝি হইয়া উঠিবে না! আজ কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্বপ্ন সফল হইল—"যাহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি!"

কি স্নিগ্ধ-গম্ভীর সে শোভা! "ক্ষিতিরতিবিপুলতরপৃষ্ঠে—" যে কি ভার ধারণ করিয়া আছেন, তাহা এই গ্র্যানাইট পর্ব্বতগুলি দেখিলে প্রতীতি হয়। পাহাড়ের তলদেশে একটু ছোট ছোট গাছপালা, কোথাও তাও নাই, অনেক উঁচু পর্য্যন্ত খাঁজে খাঁজে বিভক্ত শক্ত শক্ত নানা বর্ণের পাথরের স্তূপ। ইহারই গা বাহিয়া চলিয়াছে গাড়ী, আর পাশে, এত পাশে যে, মনে হয়, হাত বাড়াইলেই নাগাল পাইব, নিশ্চল পড়িয়া আছে ফিয়র্ডের নীল জলরাশি! ফিয়র্ডের বুকে, একেবারে রেল-লাইন ঘেঁষিয়া, কোথাও দাঁড়াইয়া আছে মস্ত মস্ত জাহাজ! কোথাও বিস্তীর্ণ,

কোথাও সঙ্কীর্ণ। ফিয়র্ডের চারি পাশে, কাছে, দূরে আবার সেই পুঞ্জীভূত সু-উচ্চ গ্র্যানাইটের স্তূপ! বহু মোড় ঘুরিয়া বাঁকে বাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানামূর্ত্তিতে দেখা দিতেছে শক্তিমান তুঙ্গ-দেহ গ্র্যানাইট পাথরের ক্রোড়লগ্ন ও লীলা-চঞ্চল, কোথাও বিস্তীর্ণ, কোথাও শীর্ণবক্ষ নীলজলরাশির নিবিড় আলিঙ্গন-লীলা। রৌদ্র ও কোমলতার কি মনোরম সঙ্গতি হইয়াছে এখানে! এ কি দেবাদিদেবের অঙ্কশায়িতা উমার রূপ দেখিলাম এখানে? এই বহুযোজনব্যাপী ভূভাগে "বাগর্থাবিবসম্পক্তৌ" দ্রব ও সংঘাত-কঠিনের অচ্ছেদ্য চিরন্তন মিলন ঘটাইয়া প্রকৃতি যেন তাঁহার অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি প্রচার করিতেছেন!

ফিয়র্ডের উপর মেঘের খেলা।

বের্গেন সহর হইতে একটি ফানিকুলার রেলে করিয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া পারিপার্শ্বিক সাগরের শোভা দেখা যায়। বের্গেন একটি বড় বন্দর, সেকালে ইহা ল্যুবেক, হাম্বুর্গ ও ব্রেমেনের সঙ্গে হান্‌জিয়াটিক লীগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বের্গেন ইউরোপের উত্তরতম বৃহৎ নগর।

বের্গেন হইতে দিনের গাড়ীতে ওস্‌লো ফিরিলাম। গ্রীষ্মকালে এ লাইনে টুরিষ্টদের দৈনিক স্রোত হয়, বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে। সে জন্য গাড়ীগুলিতে দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া বড় বড় কাঁচের জানলা থাকে। একদল জাপানী উঠিলেন গাড়ীতে, লণ্ডনের বাসিন্দা, সুশিক্ষিত ও বেশ ইংরেজি বলেন, আচার-ব্যবহারে ওরিয়েন্টাল ভাব একেবারেই নাই। একটি মধ্য-বয়সী জাপানী কিন্তু অন্য বিষয়ে পুরা ইউরোপিয়ানা সত্ত্বেও তন্দ্রাঘোরে সীটের উপর বেশ প্রাচ্যভাবে যুক্তাসন হইয়া বসিয়া চলিলেন। দিনের বেলা দেখিলাম উষান্ধকারে যাহাকে টানেল মনে করিয়াছিলাম, সেগুলি পুরা টানেল নয়, গ্র্যানাইট পাহাড়ের গা ভেদ করিয়া গিয়াছে বটে, তবে আবরণটা কাঠের, প্রবল বাত্যা-তাড়িত তুষারে লাইন শীতকালে অল্পকালের মধ্যেই সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া যায়, তাহা হইতে লাইনকে রক্ষা করিবার জন্য কাঠের খাঁচার মত বানান হইয়াছে লাইনের গায়ে গায়ে। এখানে এত ইলেক্‌ট্রিসিটি সত্ত্বেও বের্গেন-লাইনের গাড়ী চলে ডিজেল ইঞ্জিনে। শুনিলাম, পাহাড় ভাঙ্গিতে বিদ্যুতের চেয়ে ডিজেল ইঞ্জিনের জোর বেশী। ইঞ্জিনটা বেশ নিঃশব্দে তার গুরু-ভার বহন করিল, দার্জ্জিলিং-লাইনের মত ফ্যাচ্‌ফেচে আড়ম্বর করিল না। গাড়ী কোথাও দাঁড়াইবার আগেই কণ্ডাক্টর গাড়ীতে গাড়ীতে বলিয়া গেল, পরের ষ্টেশনে অমুক গাড়ী এত মিনিট থামিবে। আমরা নামিয়া কুফেতে কফি

খাইয়া লইলাম, পাহাড়ের ধারে দৌড়িয়া গিয়া উঁকি দিয়া নীচের উপত্যকা বা জল দেখিয়া আসিলাম। এ সব ছোট পাহাড়ের ষ্টেশনের কাছে ছোট ছোট হোটেল আছে, একটাতে দাম জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রকৃতির দুরলীলার এই ক্ষেত্রে ইচ্ছা করে, নির্জ্জনে কিছুদিন শীতের বরফের মধ্যে কাটাইয়া যাই। শীতকালে এই সব স্থান একেবারে জনহীন হইয়া পড়ে, শুধু উইন্টার স্পোর্টসের জন্য যারা আসে, তারা ছাড়া। সে নির্জ্জনতার বড় শোভা, বড় তৃপ্তি।

নাট্যকার ইব্‌সেন ও বিয়োর্ণসন, ঔপন্যাসিক ক্নুট হামস্থন ও য়োহান বোয়ার প্রভৃতির দেশ হইতে এ যাত্রা বিদায় লইলাম। দুঃখ থাকিল, এ দেশের দুটা দ্রষ্টব্য দেখা হইল না, একটা শীতকালের অন্ধকার আকাশে অরোরা বোরিয়ালিসের বিদ্যুচ্ছটা, আর একটা জুলাই-গ্রীষ্মের সূর্য্য যখন সন্ধ্যায় পশ্চিম গগনে অস্ত না গিয়া সারারাত দীপ্তিমান অবস্থায় দক্ষিণ দিক-চক্রবাল বাহিয়া গিয়া প্রত্যূষে আবার পূর্ব্বগগনে উদিত হয়, তাহার শোভা! এ দৃশ্য দেখা ভাগ্যে আছে কি না, কে জানে!

আনন্দের মুক্তি

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

তাপে তাপে ওই অগ্নিশিখায় বিশ্ব উঠেছে দহি'
ভগ্ন দেউলে কাঁদে আরাধনা অনলের জ্বালা সহি'।
যুগ যুগ ধরি কোটি হাহাকার, ব্যথায় ব্যথায় জমিল পাহাড়,
নিষ্পেষিত এ সৃষ্টির হিয়া বেদনার ভারে ভারে,
মৃত্তিকা, জল, আকাশ কাঁপিয়া উঠিয়াছে হাহাকারে।
মিথ্যার শত অতল পাতালমাঝে,
মানব-মনের আনন্দমণি কেঁদে কেঁদে আজি রাজে!

ওরে ব্যথাতুর, তবু তুই ওঠ্, যদিও এ হাহাকার,
আর দেরী নাই, ওই দেখ ওই খুলিছে উর্দ্ধদ্বার!
দুঃখদাহের পাহাড়ের তল, কেঁদে কেঁদে আজ হ'ল চঞ্চল,
ওরে নারীনর, ওঠ্, আঁখি মোছ—ওই শোন্ দলে দলে,
ওই গাহে কা'রা উত্থান-গান আনন্দমণি-তলে।
দুঃখ-দাহের অতল অন্ধকারে,
ওই যেন কা'র ভৈরব শিঙা বেজে ওঠে বারে বারে।

উদ্দাম কা'র পায়ের দাপট ভেসে আসে যেন কাণে,
কোন্ সে অতলে চিরকিশোরের বাঁশী বাজে কোন্‌খানে।
কোথা যেন বাজে কার ঘন শাঁখ,
গোপনে গোপনে ফাটে মৈনাক,
তারি ফাঁকে ফাঁকে যুগজন্মের দেবেরি চরণ দান,
ওই আসে ওই আঁখির আড়ালে দুখেরি পরিত্রাণ!
কেঁপে ওঠে মহী, জাগে ধূর্জ্জটি ভোলা,
দেবজন্মের সঙ্গীতে নাচি' উঠেছে সৃষ্টিদোলা।

দাঁড়া ওরে তোরা, নবসৃষ্টির হিন্দোলা দোলে আজি,
শত চাপনের অন্ধ গুহায় ছন্দ উঠেছে বাজি'।
যুগধর্ম্মের কুঙ্কুম ভাঙা, বেদনালক্তে ফাগ আজি রাঙা,

আয় গাবি তোরা দুলি' হিন্দোলে নবজন্মের গান,
দুখের পাতালে আনন্দমণি হবে আজি উত্থান।
সে মহামণির মন্দির ঘিরে ঘিরে,
উত্থান-গান গাবি আয় তোরা দোলায়ে সিন্ধুনীরে।

মেঘের অশ্রুসাগরের তলে বেদনার বুক বহি',
সারা সৃষ্টির দুখদাবানলে অঙ্গারসম দহি',—
নবমূর্ত্তিতে সে যে ওই আসে, মিথ্যার শিলা ফাটে সন্ত্রাসে,
ঐ শোন্ ওই ডঙ্কা নাদিছে ধরণীর হাহাকারে;
নিখিল-মনের ক্রন্দনে তাঁর শিঙা বাজে বারে বারে।
শত মন্ত্রের গ্রন্থিতে মারি' টান,
মানবের ভোগে অপমানে আজ গর্জ্জেছে ভগবান।

কর্ম্মশালায় আনন্দ যে রে কেঁদে ওঠে সন্তাপে,
সত্য আজি যে বাহিরিতে চায় ফেটে তাই তাপে তাপে।
দর্পজ্ঞানের অভিমান ঘিরে, হিংসাদ্বেষী-পূজামন্দিরে,
বিলাসীর ভোগে কোটী আনন্দ কেঁদে ওঠে বারে বার,
দীনের ক্ষুধায় জীবনের শিব ছেড়েছেন হুঙ্কার।
অতল পাতালে ওঠে বম্ বম্ ধ্বনি,
ঐ শোনা যায় ডমরুর রব পিণাকের ঝন্‌ঝনি।

শ্রমিকের শ্রমে কাঁদে আনন্দ, কাঁদে মিল, টাঁকশাল,
রেলে এঞ্জিনে ধুমাইয়া বিষ তিলে তিলে হ'ল তাল।
সুখ ডাকে কেঁদে—আনন্দ কই? নন্দী দিয়াছে দুয়ারেমাভৈঃ
ভেদি' হাহাকার, চূর্ণি পাহাড়, দৈন্যের ক্ষুধা ত্রাসে,
আনন্দত্রাণে ত্রাণগুরু বুঝি ঐ আসে ঐ আসে।
আর কি রে ডর মুছে ফেল আঁখিজল,
জেগেছেন শিব জটার বাঁধন করে আজি টলমল।

মুর্শিদাবাদ-বৃত্তান্ত

—শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী

নামোৎপত্তির কাহিনী

মুর্শিদাবাদ বাংলার শেষ মুসলমান রাজধানী। এইখান হইতেই মুসলমানের ভাগ্যরবি চির-অস্তমিত হয় এবং এই স্থানেই বৃটিশের সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয়। সত্য বটে, নবাব মীর কাশিম কিছুকালের জন্য মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বক্সারের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১৭৬৪) পর নবাব মীরজাফর পুনরায় "কোম্পানীর নবাব" রূপে মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করেন। তখন পুনরায় মুর্শিদাবাদ রাজধানী হয় (১৭৬৫)।

নবাবের মৃত্যুর পর (১৭৬৫ খৃঃ অব্দ) তাঁহার তিন পুত্র নাজমউদ্দৌল্লা (১৭৬৫-১৭৬৬), সৈফউদ্দৌল্লা (১৭৬৬-১৭৭০), এবং মোবারকউদ্দৌল্লা (১৭৭০-১৭৯৩) যথাক্রমে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ইঁহাদের সময়েই দেশের শাসনভার (administration) সম্পূর্ণ রূপে ইংরাজগণের হস্তে চলিয়া যায় এবং ইঁহারা গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া রহেন, আর কলিকাতাই মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে বাংলার রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়।

মুর্শিদাবাদে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কর্তৃক রাজধানী স্থাপিত হয়। তখনও পর্য্যন্ত ঐ নগরী মকসুদাবাদ বা মুকসুদাবাদ নামে আখ্যাত ছিল।

এই মুকসুদাবাদ সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী শোনা যায়। কেহ বলেন যে, নানকপন্থী মধুসূদন দাস বা সা নামক সাধুর নামানুসারে ঐ প্রাচীন নগরী মুকসুদাবাদ নামে পরিচিত ছিল। কেহ বলেন, চুনাখালী-নিবাসী মুকুন্দ খাঁর নামানুসারে উহা মুকসুদাবাদ নামে পরিচিত হয়। মুর্শিদাবাদ-কথার লেখক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থে "মৌর সুধাবাদ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে কিরীটেশ্বরীর সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বহরমপুর মহাকালী পাঠশালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর কাব্যতীর্থ মহাশয় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, ঐ নগরী বৌদ্ধযুগে স্থাপিত এবং উহার প্রকৃত নাম মোক্ষদাবাদ। উহাই অপভ্রংশ রূপে মুকসুদাবাদে পরিণত হয় এবং পরে নবাব মুর্শিদকুলীর নামানুসারে উহা মুর্শিদাবাদ নাম পরিগ্রহ করে।

বাস্তবিকই মুর্শিদাবাদ প্রদেশের বৌদ্ধযুগের চিহ্নসমূহ লইয়া আলোচনা করিলে কাব্যতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের কথা

মুর্শিদাবাদ প্রদেশে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ইতস্ততঃ ছড়াইয়া রহিয়াছে। কোনও স্থানে উহা ষষ্ঠীরূপে, কোনও স্থানে উহা অন্য কোনও দেবতারূপে পূজিত হইতেছেন। বৌদ্ধ মতে বজ্রযান নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাঁহাদের সাধনার স্থান ছিল এই জেলার বজ্রাসন নামক স্থান। উহা বর্ত্তমানে বাজারসন বা বাজার সোঁই নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তে পাঁচুন্দী নামক গ্রাম আছে। উহা পূর্ব্বে বীরভূম জিলার মধ্যে ছিল। ঐ গ্রামে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরের চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তি দেখা যায়। উহা বৌদ্ধ যুগের অবসানে নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত এই জেলার গয়সাবাদ ও মহীপাল নামক গ্রামদ্বয়েও অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। গয়সাবাদ নলহাটী-আজিমগঞ্জ শাখা লাইনের বারেলা ষ্টেশন হইতে কিছু দূরে অবস্থিত। মহীপাল ঐ স্থান হইতে আরও কিছু দূরে।

বহরমপুর সহরের অপর পারে খাগড়া-ঘাট রোড নামক রেল-ষ্টেশন। তাহার দক্ষিণে (down) চিরৌটী ষ্টেশন অবস্থিত। ঐ স্থানের সন্নিকটে কর্ণসুবর্ণ বা কানসোনা অবস্থিত। ঐ স্থানের মাটী লাল বর্ণ বলিয়া উহা রাঙ্গামাটী নামে আখ্যাত হয়। কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে (১৩৩৬ সালে) মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঐ স্থানে খননকার্য্য (excavation)

আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ স্থান বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বঙ্গেশ্বর নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্কের রাজধানী বলিয়া ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন।

রাজা শশাঙ্কই স্থাম্বীশ্বর-(থানেশ্বর)-রাজ রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে তাঁহার রাজধানী কান্যকুব্জ বা কনোজে স্থানান্তরিত হয়। শশাঙ্ক অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বেই বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত অব্দ ৫৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে সুরু হইয়াছে। এই জন্য কেহ কেহ (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রভৃতি) অনুমান করেন যে, ঐ অব্দ শশাঙ্কেরই রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে গণিত। তাঁহারা ইহাকে শশাঙ্কাব্দ নামে আখ্যাত করিতে চান। ঐ অনুমান সত্য হইলে ইহা মুর্শিদাবাদবাসীর পক্ষে গৌরবের কথা সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রমতে দক্ষযজ্ঞে সতীদেহ প্রাণহীন হইলে বিষ্ণুচক্রে ঐ দেহ একান্ন অংশে বিভক্ত হয় এবং যে যে স্থানে ঐ অংশ পতিত হয়, তৎ তৎ স্থান পীঠস্থানরূপে পরিচিত হয়, এতদ্ব্যতীত সতীদেহের অলঙ্কারাদি যে যে স্থানে পতিত হয়, তাহা উপ-পীঠ নাম ধারণ করে।

মহাভারতের বনপর্ব্বে তৎকালস্থিত ভারতের তীর্থস্থান-সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে একান্ন পীঠের কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং একান্ন পীঠের ঐতিহাসিক ভিত্তি কতদুর, তাহা বলা সুকঠিন। তাহা হইলেও ঐ পীঠ-স্থানগুলি অর্ব্বাচীন নহে। উহাদের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পর্কও অনুসন্ধানের একটা বিষয়। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ম্লান হইয়া পড়িলে তাহার ধ্বংসস্তূপের উপর গজাইয়াছিল তান্ত্রিকতা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এ কথাটা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক একটি পীঠস্থান মুর্শিদাবাদ জেলায় ডাহাপাড়া গ্রাম হইতে কতকটা দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মূলো পঞ্চাননের কায়স্থ-কারিকায় ঐ পীঠের উল্লেখ আছে। উহার নাম কিরীটকণা এবং দেবীর নাম কিরীটেশ্বরী।

আর একটি উপ-পীঠ ঠিক এ জেলায় না হইলেও এই জেলার প্রান্তেই অবস্থিত। উহার নাম অঙ্গুরীয়ক চণ্ডী। জন প্রবাদ ঐ স্থানে দেবীর অঙ্গুরীয়ক পড়িয়াছিল। উহা "বনডাঙ্গা" নামক গ্রামের মাঠে বাবলা বা দ্বারকা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ঐ স্থানে একটি কুলগাছের তল-দেশে পূজা হয়। কোনও মূর্ত্তি নাই।

জনশ্রুতি মহর্ষি কপিলকে বাংলাদেশের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সাগর-সঙ্গমে কপিল মুনির মূর্ত্তি আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার শাক্তপুর নামক গ্রামের উত্তরপ্রান্তে কপিলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। উহাই না কি মহর্ষি কপিলের আরাধিত লিঙ্গ।

উহা সত্য হউক আর নাই হউক, এ কথাটা সত্য যে, ঐ শিবলিঙ্গ অতি প্রাচীন। পঞ্চাননের কারিকায় উহারও নাম পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা কান্দী নগরের সান্নিধ্যে রুদ্র-দেব বিরাজিত আছেন। অপুত্রক নারীবৃন্দ উঁহার নিকট মানসিক করিয়া থাকেন। ঐ মূর্ত্তি দেখিলে উহা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়াই মনে হয়।

বেল-ডাঙ্গার সন্নিকটে ন-পুখুরিয়া নামক গ্রামে অবস্থিত মা-ডুমনীদেবী ও ডুমনীদহ নামক পুষ্করিণী। ঐ স্থান অতীব প্রাচীন। ঐ স্থানের মূর্ত্তিগুলি বৌদ্ধযুগের। এখানে মৃত-বৎসা জননী পুত্রসন্তানলাভোদ্দেশে মানসিক করিয়া থাকেন। ঐ দেবমূর্ত্তি বৌদ্ধমূর্ত্তি হইলেও দক্ষিণাকালীর ধ্যানে উঁহার পূজা হয়। ঐ দেবতা সবিশেষ জাগ্রত। উঁহার মহিমা সম্বন্ধে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এইস্থানে বিগত ১৩৪০ সালে স্থানীয় হিন্দুগণ দেহের রক্তে পুষ্করিণীর জল রাঙা করিয়া দেবী-মন্দিরের বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত নবদুর্গা-গোলাঘাট গ্রামের জয়মঙ্গলা-দেবীকেও কেহ কেহ হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বলিয়া মনে করেন।

এই সমস্ত প্রাচীন মন্দিরদর্শনে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, হিন্দু ও বৌদ্ধযুগে মুর্শিদাবাদ বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাধনার ক্ষেত্র ছিল।

কেহ কেহ মহাকবি কালিদাসকে এই জেলার "সিংহের গড্ডা" নামক গ্রামের অধিবাসী বলিয়া অনুমান

করেন। কিন্তু এই অনুমানের ভিত্তি এত দুর্ব্বল যে, ইহা পরিত্যাগ করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। প্রাচীন যুগের আরও মন্দির হয়ত ছিল, কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণব্যপদেশে তদীয় অনুচর মোরাদফরাসের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে তাহারা ত্রাণ পায় নাই বলিয়াই মনে হয়। ইহাই হইল মুর্শিদাবাদের প্রাচীন যুগের মোটামুটি বিবরণ।

ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও কৃষির কথা

মুর্শিদাবাদ নগরীর চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগ লইয়া মুর্শিদাবাদ জেলা গঠিত হইয়াছে। নদীয়া জেলা এই জিলার দক্ষিণে অবস্থিত, কিন্তু গঙ্গানদী যেরূপ নদীয়া জিলার পশ্চিম দিকের স্বাভাবিক সীমা-রেখা (natural barrier) হইয়া ঐ জেলাকে বর্দ্ধমান জেলা হইতে পৃথক্ করিয়াছে,... মুর্শিদাবাদ জেলাকে সেরূপ করে নাই। নদীয়া ও বর্দ্ধমানের মত মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের বা মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের কোনও স্বাভাবিক সীমা-রেখা নাই। গঙ্গানদী মুর্শিদাবাদ জেলার অভ্যন্তর দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে এবং সেই কারণে এই জেলা দুইটি অসমান ভূভাগে বিভক্ত হইয়াছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরে এই জেলার কান্দী ও জঙ্গীপুর মহকুমা অবস্থিত এবং পূর্ব্ব তীরে লালবাগ এবং সদর (বহরমপুর) মহকুমা অবস্থিত। সমগ্র জেলার আয়তন দুই সহস্র বর্গ-মাইলেরও অধিক, তন্মধ্যে গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরের ভূ-ভাগের আয়তন পশ্চিম তীরের ভূ-ভাগের আয়তন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

রাজা বল্লালসেন সমগ্র বঙ্গদেশ ও মিথিলাকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন—যথা রাঢ়, বাগড়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা। সাধারণতঃ গঙ্গানদীর পশ্চিমতীরস্থ ভূ-ভাগকেই রাঢ় বলা হয়। সুতরাং বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ ও মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গানদীর পশ্চিমতীরস্থ ভূ-ভাগ প্রাচীন রাঢ়ভূমিরই অন্তর্গত। "গঙ্গারাষ্ট্র" শব্দই ক্রমে অপভ্রংশরূপে "রাঢ়" নামে আখ্যাত হইয়াছে—ইহাই ঐতিহাসিকগণের অনুমান। আর বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের অধিকাংশ ভূ-ভাগ লইয়াই বাগড়ী প্রদেশ

তবেই দেখা গেল যে, গঙ্গানদী মুর্শিদাবাদ জেলাকে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে ভাগ করিয়াছে—একভাগ রাঢ়, আর একভাগ বাগড়ী। এই দুই বিভাগের মৃত্তিকাও বিভিন্ন। পশ্চিম ভাগের মৃত্তিকা অসমান, উচ্চ এবং স্থানে স্থানে লাল আভাযুক্ত। এই মৃত্তিকা "আঁটাল" এবং অনেক স্থলেই কঙ্করাদিতে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে মৃত্তিকা-স্তূপ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত এই অংশে অনেক আছে। তাহার কতকগুলি—যেগুলি একটু বড়, সেগুলি নদী নামে আর কতকগুলি—যেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, "কাঁদর" নামে পরিচিত। গ্রীষ্মকালে এইগুলি বিশুষ্ক হইয়া যায়, আর বর্ষাকালে জলস্রোতে ভরিয়া উঠে। নদীর সংখ্যাল্পতা হেতু এই প্রদেশে পুষ্করিণীর সংখ্যা অধিক। তাহাতে মাছও যথেষ্ট পাওয়া যায়। গাছপালা এই অংশে একেবারেই জন্মাইতে চাহে না। আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ আর বাঁশের ঝাড় এ অংশে বড়ই দুর্লভ। তালগাছ আর স্থানে স্থানে কুলগাছ ও কেয়াফুলের গাছ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তালগাছ যেন এ অংশের একচেটিয়া সম্পত্তি। চূণ, লৌহক্ষার প্রভৃতি মিশ্রিত লালমাটী বৃক্ষাদি জননের পক্ষে অনুকূল নহে বলিয়াই বৃক্ষাদির এ অঞ্চলে নিতান্ত অভাব। যখন ক্ষেত্রে ফসল না থাকে, তখন চতুর্দ্দিক মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতে থাকে। শক্ত (rough) মাটী দিয়া খালি পায়ে চলাফেরা করাও কষ্টদায়ক হয়।

ফসলের বাহুল্য এ অঞ্চলে নাই। আশু বা আউস ধানের চাষ নিতান্ত সামান্য। মুগ, কলাই প্রভৃতি ও অন্যান্য রবিশস্য বা চৈতালি খুব কমই জন্মে। তবে আমন ধান্য, ইক্ষু ও গোল-আলু, এই তিনটি এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আমন ধানের জন্যেই এ অঞ্চলে জমীর এত আদর। এই ধান্য অন্যান্য অঞ্চলে চালান যায়। গোল-আলুও চালান যায়। কচুও এ অঞ্চলে মন্দ হয় না। আক হইতে সাধারণতঃ গুড়ই হয় এবং তাহা অন্যান্য অঞ্চলেও বিক্রীত হয়। বস্তুতঃ আমন ধান, আকের গুড় এবং গোল-আলু রাঢ়ের নিজস্ব সম্পত্তি। ঘাস খুবই জন্মায়, তবে গোবরের নিতান্ত অভাব। যখন জমিতে ফসল থাকে না, তখন অবশ্য গোরু সেখানে চরিতে পায়—কিন্তু

তাহা হইলেও এ অঞ্চলে গোয়ালার সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চল হইতে কম। তবে অল্পস্বল্প গব্যদ্রব্য যাহা পাওয়া যায়, তাহা একেবারে অগ্নিমূল্যও নহে।

তরকারী এবং জ্বালানীকাষ্ঠের এ অঞ্চলে নিতান্ত অভাব। কয়লাই বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সন্দেশ মিষ্টান্ন এ দিকে কম ব্যবহৃত হয়, জলযোগের বস্তু হিসাবে মুড়িরই চলন বেশী।

এ অঞ্চলের একটা বিশেষত্ব এই যে, সকলেরই কিছু না কিছু জমী আছে এবং অনেক ব্রাহ্মণও চাষের কাষ করিয়া থাকেন। ইহা এক পক্ষে ভাল এবং এ দৃষ্টান্ত হইতে চাকুরীজীবীদের অনেক কিছু শিখিবার আছে।

দালান-কোঠা এ অঞ্চলে খুবই কম। মাটী মজবুত বলিয়া মাটীরই দোতালা খুব বেশী। খড় এ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় না। আউড় অর্থাৎ ধান্যের অগ্রভাগ দ্বারা মেটে-ঘর ছাওয়া হইয়া থাকে, তবে আজকাল করগেটেড টিন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। বিলাসিতা এ অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম। বন্যা এ অঞ্চলে কম হয় এবং সময়ে সময়ে হঠাৎ হইলেও দীর্ঘ-কালস্থায়ী হয় না। এ দিকের স্বাস্থ্যকে মন্দের ভাল বলিতে হইবে।

বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব্বসীমা পদ্মা নদী। ইহাই বৈষ্ণবশাস্ত্রে উল্লিখিত বিখ্যাত পদ্মাবতী। ইহার অপর পারে মালদহ এবং রাজসাহী জেলা অবস্থিত। মুর্শিদাবাদের পূর্ব্বে পদ্মার অপর তীরে রাজসাহী ও নদীয়ার কিয়দংশ, দক্ষিণে নদীয়া জেলা ও বর্দ্ধমান এবং পশ্চিমে বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণা জেলা।

সাঁওতাল পরগণা জেলা বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে অবস্থিত, সুতরাং মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত "রাঢ়-ভূভাগ" বিহারের সীমা স্পর্শ করিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার প্রভাবও অনেকটা ইহার উপর পড়িয়াছে।

মুর্শিদাবাদের ঐ সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তায় বিহারের প্রভাব অনেকখানি পরিলক্ষিত হয়।

বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র পলাশী বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমা-প্রান্তে ও নদীয়া জেলার মধ্যে অবস্থিত। উহারই কয়েক ক্রোশ দূরে গঙ্গা নদীর পশ্চিম-পারে, "মুর্শিদাবাদ বাগের" শেষ হইয়াছে এবং বর্দ্ধমান জেলা আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গার [illegible] দিক নদীয়া জেলা। যে স্থলে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বর্দ্ধমান, এই তিন জেলা একত্র হইয়াছে, সেই স্থানে মা[illegible] নামক গ্রাম অবস্থিত। ঐ স্থান এক কালে [illegible] সমৃদ্ধ ছিল এবং এখানে বৈষ্ণব-জগতে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল মা[illegible]নন্দ পুরীর বংশধরগণ প্রায় ৪০০ বৎসর ধরিয়া বাস করি[illegible] আসিতেছেন। ঐ স্থান বর্ত্তমানে নদীয়া জেলার মধ্যে ও পলাশী রণ-ক্ষেত্রের চারি মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। উহা হইতে মাত্র এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্বারবন বা বাবলা নদী গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে এবং ঐ মিলিত জলরাশি চারি ক্রোশ বহিয়া গিয়া কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় অজয়সলিলে কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। লর্ড ক্লাইভ কাটোয়ার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া এই গ্রামেরই উপর দিয়া সসৈন্যে পলাশীর আম্রকুঞ্জে আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবাব মীরকাশিমের সেনা এই গ্রামেরই প্রান্তভাগে ইংরাজ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দীর রাজত্বকালে বর্গীর অত্যাচারও এ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

অতঃপর মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ ভূভাগের কথা।

প্রাচীন মুর্শিদাবাদ নগরী গঙ্গার পূর্ব্ব তীরেই অবস্থিত। অবশ্য পশ্চিম তীরে ইহার যে খানিকটা অংশ ছিল না, তাহা নহে। তাহা হইলেও পূর্ব্বাংশেরই প্রাধান্য বেশী। এই নগরী এখন আর এ জেলার প্রধান নগরী নহে, ইহা নিজেরই একাংশে অবস্থিত "লালবাগে"র নামে পরিচিত হইয়া এখন এই জেলার মহকুমায় পরিণত হইয়াছে। এই স্থান হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত বহরমপুরই এখন জেলার সদর ষ্টেশন। পূর্ব্বে এই নগরী দক্ষিণে বহরমপুর হইতে উত্তরে ভগবানগোলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার আয়তন লণ্ডন সহরেরই তুল্য ছিল, এ কথা লর্ড ক্লাইভ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার কমিটীর সমক্ষে সাক্ষ্য-প্রদান-কালে স্বীকার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, বর্ত্তমান লালবাগ ও সদর, এই দুই মহকুমা গঙ্গার পূর্ব্বতীরে, অতএব বাগড়ী ভূভাগের মধ্যে অবস্থিত এবং সে জন্য ভূতত্ত্ব ও কৃষিতত্ত্বের দিক্ দিয়া এ অঞ্চল

পশ্চিম অঞ্চল হইতে পৃথক্ ত' বটেই, এমন কি আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতেও স্থানে স্থানে পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। এ অঞ্চলের মাটী পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় অসমান বা কাঁকর-মিশ্রিত নহে। মাটী বেশ সমতল এবং কালো, উঁচু নীচু প্রায় নাই-ই বলিলেই হয়। তবে মাটী খুব নরম এবং স্থানে স্থানে বেলেমাটীও দেখা যায়, এ মাটীর উর্ব্বরাশক্তি মন্দ নহে, তবে রাঢ় অঞ্চলে যে প্রকার ধান বা আক জন্মায়, এ অঞ্চলে সে প্রকার জন্মায় না, রাঢ়ের ধানের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে এ অঞ্চলের উর্ব্বরাশক্তির নিকৃষ্টতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। আউস ধানই এ অঞ্চলে বেশী হয়। আমন ধানও হয়, তবে রাঢ়ের তুলনায় কম। স্থানে স্থানে বিল বা "বিলন" জমি (বিলমধ্যস্থ জমি) আছে। এই রূপ একটি বিরাট অঞ্চলের নাম "কালান্তর"। কালান্তরের মাঠে ধান এক প্রকার হয়, তবে সময় সময় পঙ্গপালে শস্য প্রচুর পরিমাণে নষ্ট করিয়া থাকে।

বাগড়ী অঞ্চলের দুইটি বিশেষত্ব আছে, যাহা রাঢ় অঞ্চলে দেখা যায় না। প্রথম, এখানে শস্যের প্রাচুর্য্য না হইলেও রকমারী (variety) আছে। সকল রকমের রবিশস্য, যথা—গম, যব, ছোলা, মুসুরি, খেঁসারি, অরহর, তিল, সরিষা, রাই, মটর, মষিনা ; মুগ, কলাই প্রভৃতি ডাউলের উপযুক্ত শস্য ; ইক্ষু, বিবিধ তৈলোৎপাদক শস্য, যথা—শুয়ার-গুঞ্জা প্রভৃতি ; বরবটী বা বোরা ; তা ছাড়া, ভুট্টা, জৈ, এবং গেমা, ভিরিং প্রভৃতি পশু-খাদ্য যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে। তরকারীর মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, গোল-আলু, লাল-আলু, সাদা-আলু, মাটীর তলের আলু, সরবতী আলু, পটোল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গা, সিম, বেগুন, টম্যাটো, কচু, বিবিধ কুমড়া, লাউ, মুলা প্রভৃতি এবং শশা, পুরুল, বিবিধ প্রকারের মরিচ, বিবিধ প্রকারের লেবু, আমড়া, তেঁতুল, বেল ও কয়েৎবেল, আম ও খেজুর এবং লিচু, জাম প্রভৃতি বেশ জন্মে। বেগুণ ও টম্যাটো এবং তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি রাঢ় অঞ্চলেও নদীর ধারে কিছু কিছু জন্মে।

দ্বিতীয়, এ অঞ্চল বৃক্ষাদি পরিশূন্য নহে। এ দিক্‌টা নিম্নভূমি, বর্ষার সময় প্রায়ই জলে ডুবিয়া যায়। নদীর সংখ্যাও মন্দ নহে, সুতরাং বিবিধ প্রকার বৃক্ষাদি জন্মিয়া এ অঞ্চলকে সুদৃশ্য করিয়া রাখে। নারিকেল গাছ বিশেষ ভাল জন্মে না কেন, না, মাটী লোনা নহে, তবে আম ও কাঁঠাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। মুর্শিদাবাদ আমের জন্য বিখ্যাত। এ অঞ্চলের গুধিয়া, কাঁকস, ভগীরথপুর, ভাবদা, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর, চুনাখালি, লালবাগ, বালুচর, ভগবানগোলা, লালগোলা প্রভৃতি আম্রের জন্যই বিখ্যাত।

মোটামুটি বলিতে গেলে বেলডাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া লালগোলাঘাট পর্য্যন্ত যে ই. বি. আর-এর শাখা-লাইন গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে এবং বহরমপুর সহর হইতে পূর্ব্বদিকে জলঙ্গী হইয়া পদ্মার তীর পর্য্যন্ত ভূভাগে আম্র যথেষ্টই জন্মিয়া থাকে। বিবিধ প্রকার আম্রের মধ্যে কালাপাহাড়, কৃষ্ণভোগ, গোপালভোগ, সিন্দুরিয়া, হিম-সাগর ও ক্ষীরসাপাতি প্রভৃতি আম খুবই উৎকৃষ্ট। আম হইতে আমতা বা আমসত্ব, কাসন, আচার, আমচুর প্রভৃতি প্রস্তুত হয় এবং ঐগুলি বহরমপুর সহরের বাজারেও বিক্রীত হয়।

গবাদি পশুর উপযুক্ত ঘাস এ অঞ্চলে যথেষ্ট জন্মে। সে জন্য এ অঞ্চলে অনেক গোয়ালার বাস। গঙ্গার জল পান গরুর পক্ষে বড়ই উপকারী, এই বিশ্বাস থাকার জন্য ভাগী-রথীর পূর্ব্বতীরে অনেক গোয়ালা বাস করে এবং তাহারা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, ঘৃত, দধি মাখন, ঘোল এবং খোয়াক্ষীর প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিত এবং রেলযোগে কলিকাতায় চালান দিত। মহুলা, সাটুই, বেলডাঙ্গা, রামনগর, পলাশী প্রভৃতি স্থানে এই সব দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাইত। কিন্তু সম্প্রতি অনেক স্থানেই গোয়ালাদের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ গোচরের অভাব। জমী প্রচুর পরিমাণে থাকায় এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত গোচরের অভাব হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি বেলডাঙ্গায় এক মাড়বারী কোম্পানী একটী চিনির কল স্থাপিত করিয়াছেন। আবার রামনগরের প্রাচীন রেশম ও নীলকুঠী এবং তাহার অধীন সমস্ত জমি কিনিয়া লইয়া নব-গঠিত (Sugar and Cane Company) সুগার এণ্ড কেন কোম্পানী রামনগরের অনতি-দূরে পলাশীর রণক্ষেত্রে এক বিরাট চিনির কল স্থাপন করিতেছেন। ইঁহারা প্রজাদের সমস্ত জমি বন্দোবস্ত লইয়াছেন। জমীদারগণের নিকট হইতে বহু জমি, এমন কি গোচরগুলি

পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া সমস্ত জমিতে আখ লাগাইতেছেন। আখে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে পাট এ অঞ্চলে হইত। এখন পাট কম হইতেছে। কেন না ইহাতে অনেক কৃষক ভূমিহারা হইয়া দিনমজুরে পরিণত হইয়াছে, আর গোচরহীন গোয়ালা নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছে। ফলে দেশ হইতে গব্যবস্তু লোপ হইয়া যাবার যোগাড় হইয়াছে। যাঁহারা কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির নেতৃত্বের ভার লইয়া আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদের এ দিকে দৃষ্টি দান করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। গব্যবস্তুর প্রাচুর্য্য এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত ছিল এবং সে জন্য কয়েক প্রকার সন্দেশও এ অঞ্চলে বিশেষ ভাবেই পাওয়া যাইত। অবশ্য এখনও যে না পাওয়া যায়, তাহা নহে। বেলডাঙ্গার মনোহরা, ভগীরথপুরের মোণ্ডা, খাগড়ার ছানার মুড়কী (যাহা বিদেশে খাগড়াই নামে পরিচিত), সাটুই গ্রামের জিলাপী, কান্দীর মতিচুর এবং আজিমগঞ্জের ক্ষীরের বরফি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মুর্শিদাবাদ "নবাবী" দেশ, সুতরাং এতদঞ্চলে বিবিধ প্রকারের সন্দেশ প্রস্তুত হওয়া এবং স্থানীয় লোকের নানা প্রকার মুখরোচক খাদ্যদ্রব্যের রন্ধনে পারিপাট্য মোটেই বিচিত্র নহে।

রাজনৈতিক বিভাগ ; নদী ও পুষ্করিণী, পথ, রেলওয়ে, ষ্টীমার লাইন, রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বকালবর্ত্তী ইতিহাস এবং স্বাস্থ্যকথা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় চারিটি মহকুমা আছে। ঐ চারিটি মহকুমা আবার কুড়িটি থানায় বিভক্ত। সদর বা বহরমপুর মহকুমায় বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, নওয়াদা, হরিহরপাড়া, রাণীনগর, হুরসী, ডোমকল এবং জলঙ্গী, এই আটটি থানা আছে। লালবাগ মহকুমায় লালবাগ (মুর্শিদাবাদ), জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, লালগোলা, সাগরদীঘি এবং নবগ্রাম, এই ছয়টি থানা আছে। জঙ্গীপুর মহকুমায় রঘুনাথগঞ্জ, সুতী এবং সমসেরগঞ্জ, এই তিনটি ও কান্দী মহকুমায় কান্দী, খড়গ্রাম ও ভরতপুর, এই তিনটি থানা আছে। এতদ্ব্যতীত আরও সাতটি থানা ছিল, সেগুলি উঠিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত থানার এলাকাধীনে প্রায় নব্বইটি পোষ্টাফিস আছে। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার সঙ্গে কয়েকবার এই জেলার সীমানা পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে এই জেলা প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে আসিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ইহা রাজসাহী বিভাগের মধ্যে ছিল।

এই জেলায় অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা কিছু অধিক। এই সংখ্যা আনুমানিক ত্রয়োদশ লক্ষ হইবে। খৃষ্টান ও জৈনও এ জেলায় কিছু আছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেকখানি প্রভাব এ জেলায় পড়িয়াছে, তাই হিন্দুদিগের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই বেশী। এই জেলার দক্ষিণ সীমানা পলাশীর রণক্ষেত্র। উহা কর্কটক্রান্তি হইতে খানিকটা উত্তরে অবস্থিত। শীতকালে এ জেলার উত্তরাংশে এবং পদ্মার পরবর্তী লালগোলা প্রভৃতি স্থানসমূহে বেশ শীত অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে বহরমপুর সহরের উত্তাপের পরিমাণ জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রাতঃকালে আমরা ১০০ ডিগ্রী দেখিয়াছি—তবে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগে মধ্যাহ্নকালে সময়ে সময়ে উহার বেশীও উঠিয়া থাকে বলিয়া শুনিয়াছি।

গঙ্গানদী জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মূলস্রোত এ জেলার ছাপঘাটীর মোহনা পর্য্যন্ত আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। মূলশাখা পদ্মা নাম ধারণ করিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে, আর অপর শাখা ভাগীরথী নাম ধারণ পূর্ব্বক সোজা দক্ষিণ দিক দিয়া এ জেলাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এবং নদীয়া জেলার পশ্চিম সীমারেখা হইয়া হুগলী সহরের নিকট হইতে হুগলী নাম ধারণ করিয়া কলিকাতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে।

ইহারই তীরে ধুলিয়ান, গিরিয়া, জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, মহুলা, সাটুই ও শক্তিপুর প্রভৃতি স্থান অবস্থিত। এই নদী বর্ত্তমানে বড়ই দুর্ব্বল। গ্রীষ্মকালে জল খুবই কম থাকে। ইহা আগে কাশিমবাজারের নীচ দিয়া প্রবাহিত ছিল। পরে গতি পরিবর্ত্তন করায় কাশিমবাজার গঙ্গাহীন হইয়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে।

জলঙ্গী নদী এই জিলার পাটিকাবাড়ী প্রভৃতি স্থান-

সমূহের নিম্নদেশ বাহিয়া নবদ্বীপের নিকটে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। ময়ুরাক্ষী ও দ্বারকা, এই দুইটি এ জেলার প্রধান নদী। ময়ুরাক্ষী বীরভূম প্রদেশ হইতে আসিয়া দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ইহা গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ ভূভাগে প্রবাহিত নদী। প্রথম শাখা কোপাই বা কুইএ নামে অপ্রশস্ত দীর্ঘনদীর সহিত ও দ্বারকার সহিত মিশিয়া মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও বর্দ্ধমান জেলাত্রয়ের সঙ্গমস্থানে কল্যাণপুর ও মাণিক্যডিহি নামক গ্রামদ্বয়ের সান্নিধ্যে গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। ময়ুরাক্ষীর সহিত মিশ্রিত দ্বারকা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বাবলা নামে আখ্যাত হয়।

ময়ুরাক্ষীর অপর শাখা কান্দী সহরের নিম্নদেশ বাহিয়া দ্বারকার সহিত মিশিয়াছে। দ্বারকা, ময়ুরাক্ষী ও অজয়, এই তিন নদীর জলস্রোত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া গঙ্গার উপর চাপ দিয়া ভীষণ বন্যার সৃষ্টি করে।

এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণী, শিয়ালমারী, ভৈরব ও কলকলি নদীর নামও উল্লেখযোগ্য। নদী ব্যতীত অনেক পুষ্করিণী, দীঘি (দীর্ঘিকা) এবং বিলও এ জেলায় আছে। আজিমগঞ্জ-নলহাটী লাইনের সাগরদীঘি নামক রেল-ষ্টেশনের সন্নিহিত দীঘিটী খুবই বৃহৎ, ইহার "বকচর"টাও বেশ বড়। মুসলমান আমলে (পাঠানরাজ হোসেন সাহের সময়ে) খাত শেখের দীঘিও প্রসিদ্ধ। ইহা ঐ লাইনেরই বোখরা ষ্টেশনের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। নসীপুর রাজধানী হইতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে রমনা দীঘি নামক এক দীঘি আছে। ইহা হিন্দু আমলে (আদিশূরের সময়ে) খনিত হইয়াছিল বলিয়া জনপ্রবাদ। নসীপুর গ্রাম অতি প্রাচীন। স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার "Aurangzeb" নামক বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থে সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুম্লা যাঁর সহিত বাংলার নবাব সম্রাটের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সাহ সুজা নসীপুরে আসিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত মহেশাল দীঘি ও পুষ্করিণীতে ও বিলগুলিতে মাছ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এক্ষণে রেলযোগে মৎস্য চালান যাওয়ায় মৎস্যের দর আর পূর্ব্ববৎ সুলভ নহে। তবে পদ্মার ধারে লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলে ইলিশ মৎস্য অনেকটা সস্তা।

এ জেলায় বিল এবং "বিলন"জমি বা জলাভূমি অনেক আছে। বিলের মধ্যে বেলডাঙ্গার সান্নিধ্যে স্থিত ভাণ্ডারদহের বিলই সুবৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ। পাঠনবিলও প্রাচীন। তা ছাড়া সোলোর বিল, তেলকরের বিল প্রভৃতি অনেক বিলই এ জেলায় আছে।

বিলে মাছ বেশ ভালই পাওয়া যায় এবং বিলের পার্শ্বস্থ জমিতে ফসলও ভাল হয়। ভাণ্ডারদহের বিল এই জেলারই অন্তর্গত ভগীরথপুর গ্রামের জমীদারগণের অধিকারে আছে। লেখক বাল্যে ভগীরথপুরে থাকা কালে ঐ বিলের মৎস্যের আস্বাদ কিঞ্চিৎ পাইয়াছিলেন। এই জেলায় পথের সংখ্যা মন্দ নহে। পাকারাস্তা কয়েকটা আছে ও কাঁচা রাস্তা ষাইটটীর উপর। দীর্ঘ পথসমূহের মধ্যে কৃষ্ণনগরের দিক্‌ হইতে যে পথ আসিয়া বহরমপুরের ভিতর দিয়া মুর্শিদাবাদ হইয়া ভগবানগোলা গিয়াছে, উহা বাদশাহী সড়ক নামে প্রসিদ্ধ এবং ঐ পথ দিয়াই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা পলাশীর রণক্ষেত্র পলায়ন করেন। ঐ পথ দিয়াই তিনি ভগবানগোলা যান এবং তথা হইতেই পাটনা যাইবার উদ্দেশ্যে নৌকারোহণ করেন। বহরমপুর সহরের ওপারে রাধারঘাট হইতে কান্দী পর্য্যন্ত যে পাকারাস্তা গিয়াছে, উহাতে মোটর সার্ভিস আছে। বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদের মধ্য দিয়া জিয়াগঞ্জ পর্য্যন্ত, খাগড়া হইতে ভগীরথপুর পর্য্যন্ত এবং বহরমপুর হইতে পাটীকাবাড়ী পর্য্যন্তও মোটর সার্ভিস আছে। খাগড়া হইতে ডোমকোল, আজিমগঞ্জ পর্য্যন্তও মোটর যায়। অন্যান্য রাস্তাগুলিতে প্রয়োজন হইলেই মোটর যায়, তবে সাধারণতঃ গোরুর গাড়ী খুবই যাতায়াত করিয়া থাকে।

ই. বি. আর. লাইনের কাটীহার-শাখার পলাশী ষ্টেশনের পর হইতেই মুর্শিদাবাদ জিলার সীমানা আরম্ভ এবং ঐ রেলওয়ে লাইন এই বিভাগের লালগোলাঘাটে পদ্মার ধার পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে।

ই. আই. আর. লাইনের ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া শাখার সালার ষ্টেশন হইতেই মুর্শিদাবাদ জেলা আরম্ভ। ঐ লাইন আজিমগঞ্জ জংসনে আসিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। একটী বারহারোয়ায় গিয়া মিশিয়াছে। ঐ দিকে তিলডাঙ্গা পর্য্যন্ত এই জিলার সীমানা। আর একটী শাখা

নলহাটিতে গিয়া মিশিয়াছে। ঐ দিকের তকীপুর পর্য্যন্ত এ জেলার সীমানা। তিলডাঙ্গার পর সাঁওতাল পরগণা এবং তকীপুরের পর বীরভূম আরম্ভ হইয়াছে।

লালগোলাঘাট হইতে একটা ফেরী-ষ্টীমার প্রত্যহ দুই বার গোদাগাড়ীঘাট পর্য্যন্ত যাতায়াত করে। গোদাগাড়ী-ঘাট হইতে কাটীহার পর্য্যন্ত ট্রেন গিয়াছে। গোয়ালন্দ হইতে পাটনা পর্য্যন্ত যে (Ganges Steamer) গ্যাঞ্জেস ষ্টীমার) যাতায়াত করে, লালগোলাঘাটে তাহারও ষ্টেশন রহিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে লালগোলা হইতে মালদহ, লাল-গোলাঘাট হইতে রাজসাহী হইয়া চারঘাট এবং লাল-গোলাঘাট হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ষ্টীমার সার্ভিস বর্ত্তমানে তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে বর্ষাকালে গঙ্গানদীতে ষ্টীমার যাতায়াত করিত। এক্ষণে কোনও নির্দ্দিষ্ট সার্ভিস নাই। বর্ষাকালে জলঙ্গী নদী দিয়া ষ্টীমার এক্ষণে যাতায়াত করে। উহা নবদ্বীপ ঘাট হইতে এই জেলার ইসলামপুর পর্য্যন্ত যায়।

এই জেলার পূর্ব্বাংশের, অর্থাৎ বাগড়ী অঞ্চলের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নহে। ম্যালেরিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই লাগিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ সদর বহরমপুর হইতে জিয়াগঞ্জ পর্য্যন্ত স্থান অস্বাস্থ্যকর। পশ্চিমাংশের, অর্থাৎ রাঢ় অঞ্চলের স্বাস্থ্য এ অঞ্চল অপেক্ষা অনেক ভাল। পূর্ব্বে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরস্থ ভূ-ভাগ বড়ই স্বাস্থ্যকর ছিল। এখন তাহা না থাকিলেও পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা যে স্বাস্থ্যকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্য ভালই। মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ ঐ দুই জেলার সান্নিধ্যবশতঃ-ই বোধ হয় কতকটা ভাল।

এ জেলায় দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা অনূ্ন কুড়িটি। বহরমপুরের সদর হাসপাতালই অবশ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। লালগোলাধিপতি মহারাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত বিপুল অর্থে ঐ হাসপাতাল পরিপুষ্ট হইয়াছে। জিয়াগঞ্জের হাসপাতালটি মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। বহরমপুর লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ অটো হ্যারী ষ্টার্সবার্গ (Otto Harry Stursberg, D. Phil) তোদের আপ্রাণ পরি মে উহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। দ মাসে মহামান্য বঙ্গের গভর্ণর পর নূতন ভবনের ভিত্তি স্থাপন নাকে লেখক Dr. Stursberg কর্ত্তৃক তাঁহার শিক্ষক হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ উৎসবে যে রাছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, খাগড়াতে প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাধরের নামে একটি আয়ু-র্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিখ্যাত কবিরাজ (৯০ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট নিবাসী) ৺রাজেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়ও তাঁহার স্ব-গ্রামে এই জিলার শ্রীরামপুর নামক স্থানে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনা করিয়াছিলেন। উহা বর্ত্তমানে আছে কি না জানি না। কয়েক বৎসর হইল পাঞ্চজন্যসম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র কাব্য-পুরাণ-তীর্থ মহাশয়ের চেষ্টায় মুর্শিদাবাদে একটি আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই জেলায় ইন্‌স্পেকশন-বাংলো বা ডাক-বাংলোর সংখ্যাও প্রায় কুড়িটি হইবে। ইহাদের সংস্কারাদির ভার জেলাবোর্ডের হস্তে আছে।

এই জেলার আর একটি বিশেষত্ব গঙ্গার বাঁধ। গঙ্গা নদীর পূর্ব্বতীরে একটি বহুদূর-বিস্তৃত বাঁধ দেখা যায়। বন্যার ভয়েই ঐ বাঁধ গঠিত হইয়াছিল।

১৭০৪ অব্দে এখানে রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে এ জেলার দুইটি গ্রামের নাম যুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল. মহাশয় তাঁহার বাংলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তী সেরপুর নামক স্থানে পাঠানেরা সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের নিকট পরাজিত হয়। ঐ সেরপুর বর্ত্তমানে আতাই সেরপুর বা সেরপুর আতাই নামে পরিচিত। উহা কান্দী মহকুমার খড়গ্রাম থানার অধীন। এইখানে প্রতি পৌষ মাসে "দাদাপীরের মেলা" নামে একটি মেলা হয়। কথিত আছে, দাদাপীর গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সময়ের লোক।

স্যর যদুনাথ সরকার তাঁহার 'Aurangeb' নামক গ্রন্থে শাহসুজার সহিত সেনাপতি মীর জুম্লা খাঁর যে রণ-বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, গিরিয়ার প্রান্তরে

তুমুল যুদ্ধ করিয়াও সুজা মীর জুম্লার নিকট পরাজিত হন। উহাই গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ। গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে। ঐ যুদ্ধে আলিবর্দ্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন। তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬৩ অব্দে। ঐ যুদ্ধে নবাব মীরকাশিম ইংরাজগণের কাছে পরাজিত হন। গিরিয়া জঙ্গীপুর মহকুমার গঙ্গাতীরে অবস্থিত। কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও ঐ স্থানে বহু লোকে ধুমধাম করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে যাইত।

রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বেও মুর্শিদাবাদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

শিল্প ও বাণিজ্য

শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যই মুর্শিদাবাদ প্রসিদ্ধ ছিল। ট্যাভারনিয়ার ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্য-প্রধান মুর্শিদাবাদ নগরী দেখিয়া গিয়াছিলেন। নবাবী আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকুঠী কাশিমবাজারে স্থাপিত হয়। পশ্চিম অঞ্চল হইতে বণিক জাতিগণও এই সময়ে মুর্শিদাবাদে আসিয়া নসীপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, মহিমাপুর ও ভগবানগোলায় বসতি স্থাপনা করেন। ইহাঁদের প্রধান ছিলেন জগৎ শেঠ। তা ছাড়া খোজা, আর্ম্মেনীয়ান্ প্রভৃতি খৃষ্টীয় ও ইস্‌লামপন্থিগণও বড় বড় বণিকরূপে সে সময়ে পরিচিত ছিলেন। সে অতীতের কথ অতীতেই মিশাইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের বিপুল বাণিজ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হইয়া যায়। গঙ্গার প্রবাহ মন্দীভূত হওয়া এবং রাজধানীর পরিবর্ত্তন, এই দুইটাই তাহার প্রধান কারণ। কিন্তু তাহা হইলেও বিগত শতাব্দীতে এখানে নীল ও রেশম বাণিজ্য বড়ই চলতি ছিল। জৈনধর্ম্মাবলম্বী কুবের সন্তানগণ জিয়াগঞ্জে ও আজিমগঞ্জে এখনও বসবাস করেন ও বাণিজ্যে প্রধান হইয়া আছেন, কিন্তু নীল একেবারেই গিয়াছে, রেশম কিছু কিছু আছে।

মুর্শিদাবাদের রেশম-শিল্প চিরপ্রসিদ্ধ। এ জেলায় রেশমের বিস্তর কুঠী ছিল। কতকগুলি কুঠী মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী, এণ্ডারসন্ রাইট এণ্ড কোম্পানী এবং লুই পেন কোম্পানী পরিচালনা করিতেন এবং অনেকগুলি দেশীয় ধনিক সম্প্রদায়ের হাতে ছিল।

সাধারণ লোকে রেশমের "খেই" প্রস্তুত করিয়া কুঠীতে বিক্রয় করিত। ইহাতে তাহারা বেশ দু' পয়সা উপার্জ্জন করিত। তাঁতীরাও রেশমের কার্য্য করিত এবং তাহাদের ইহাতে প্রভূত ধনাগমও হইত। রেশমের কৃপায় কাহাকেও জীবিকার জন্য চিন্তা করিতে হইত না। রেশম বেকার-সমস্যাকে মুর্শিদাবাদ জেলার বাহিরে রাখিয়াছিল। একটি প্রচলিত ছড়া আছে "যা না করে পুত্তে, তা করে তুতে", তুতে অর্থাৎ রেশমের কাজে, লোকে যে পয়সা উপায় করিত, তাহার জন্য লোককে কখনও জীবিকার্জ্জন হেতু পুত্রের গলগ্রহ হইতে হইত না। তুঁত (mulberry) রেশমকীট বা পলু পোকার খাদ্য। রেশমকীট প্রতিপালনের জন্য এ জেলায় তুতের চাষ যথেষ্ট হইত। ঐ কীটের লালা হইতেই রেশম জন্মে। রেশমী বস্ত্রাদি সাধারণত চারি প্রকার হয়—(১) গরদ, (২) তসর, (৩) মটকা, ও (৪) কেঠে। এই চারি প্রকার বস্ত্রই মুর্শিদাবাদে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

গনকর মীর্জ্জাপুর, ইসলামপুর চক, চৈওা বৈষ্ণপুর, বেলডাঙ্গা, বামনগর, ভাবদা, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানগুলি রেশমের জন্যেই প্রসিদ্ধ ছিল।

তারপর আসিল জাপান, চীন ও ইটালী দেশের নকল রেশমের (imitation silk) দারুণ প্রতিযোগিতা, ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুর্শিদাবাদের রেশমকুঠীগুলি উঠিয়া যায়। রেশমী মালের রপ্তানীও মন্দীভূত হয়। যাহারা রেশমের কার্য্যে জীবিকানির্ব্বাহ করিত,তাহারা ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমানে রেশমীকুঠী নাই বলিলেই হয়। তবে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থানসমূহের তাঁতীরা তাঁতে রেশমের কার্য্য করিয়া থাকে, এখনও তজ্জন্য এখানে তসর, গরদ, কেটে ও মটকার ধুতি, সাড়ী, থান, চাদর ও গাউন-পিসের উপযোগী সাদা থান পাওয়া যায়। সরকার বাহাদুরের sericulture বিভাগের তিনটি রেশম-ক্ষেত্র এ জেলায় আছে—(১) বহরমপুর (রেল-ষ্টেশনের পার্শ্বে), (২) কুমারপুর (সাটুই নামক গ্রামের সন্নিহিত), এবং (৩) চন্দনপুর

(রামনগরের ভূতপূর্ব্ব নীল ও রেশমকুঠীর কয়েক মাইল উত্তরে)।

এই তিন স্থানে তুতের চাষ এবং রেশমকীট প্রতিপালিত হয়।

রেশম ব্যতীত জিয়াগঞ্জ ও বালুচরে এক প্রকার অতি সুন্দর কাপড় (ধুতি ও শাড়ী) পাওয়া যাইত, তাহা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। নীল রঙের বালুচরী শাড়ী দেখিতে অতি সুন্দর ছিল।

"বালাপোষ" নামক এক প্রকার শীতকালোপযোগী গাত্রবস্ত্র মুর্শিদাবাদে পাওয়া যায়। উহা সাধারণতঃ দেখিতে বেগুনে বা ছাইরং (ash colour) এবং উহার পাড় বেগুনে বা সবুজ। উহা সুতী ও রেশমী দুই প্রকারের হয়। উহার প্রচলন বর্ত্তমানে অনেক কমিয়া গিয়াছে মনে হয়।

নীলের চাষ মুর্শিদাবাদে খুব হইত এবং নীলকুঠীও অনেক ছিল। ঐ সকল কুঠী সাহেবদের দ্বারাই পরিচালিত হইত। সে সময় গোরুর খাদ্য ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, এইটিই ছিল সুবিধা, নতুবা নীলের ব্যাপারে লোকের উপর অনেক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত। এই অত্যাচার-কাহিনীর জলন্ত চিত্র দীনবন্ধু বাবুর নীল-দর্পণে বর্ণিত আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের নীল-বিদ্রোহে মুর্শিদাবাদও যোগ দিয়াছিল। তারপর জার্ম্মানীর নকল নীল (chemical indigo) আমদানী হইয়া এ দেশীয় নীলকে ধ্বংস করে।

মধ্যে জার্ম্মান যুদ্ধের সময় রামনগরের এণ্ড্রারসন্ রাইট অ্যাণ্ড কোং কয়েক বৎসর পুনরায় নীল ও ভিরিং-এর চাষ করিয়াছিল। যুদ্ধান্তে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

নীল উঠিয়া গেলেও রেশম অনেক দিন ছিল। ঐ সময় ইংরেজ-পরিচালিত কুঠীতে কিছু কিছু অত্যাচারও হইত। এই জেলারই এক কুঠীর বিবরণ লইয়া শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় তাঁহার "নায়েব মহাশয়" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে জেলায় নীলকুঠীর অস্তিত্বই নাই। বৈদেশিক পরিচালিত রেশমকুঠীও নাই, মাত্র দেশীয়গণ পরিচালিত দুই একটি রেশমকুঠী আছে। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী জমীদারী-কার্য্যের জন্যে তাঁহাদের কয়েকটি কুঠী কাছারীস্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ কোম্পানী সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নহে। কোন বঙ্গীয় ধনকুবের ও একজন ধনবান্ মাদ্রাজবাসী উহার অংশীদার। এণ্ড্রারসন্ রাইট কোম্পানী নীল ও রেশমের পতনের পর কিছু দিন এ দিক ও দিক করিয়া তাঁহাদের রামনগর কুঠী ও তৎসংলগ্ন ভূ-ভাগসমূহ সুগার এণ্ড কেন কোং (Sugar and Cane Co) কে বিক্রয় করিয়াছেন। ইহাদের কার্য্যকলাপ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের আর দুইটি বস্তু প্রসিদ্ধ। কাঁসার বাসন ও হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য (ivory works)। খাগড়ার বাসন—কাঁসার গেলাস, ডিবা, ডিস প্রভৃতি এবং তাহার উপরে নক্সার কাজ এখনও খাগড়ায় সুন্দররূপে হইয়া থাকে। অনেকগুলি বাসনের দোকান আছে। এ জেলার জগঙ্গী গ্রামেও পূর্ব্বে সুন্দর বাসন পাওয়া যাইত। আজিমগঞ্জের সন্নিকটে বড়নগর নামক স্থানের থালা ও ঘড়া চির প্রসিদ্ধ। এখনও মহিলাগণ বড়নগরের ঘড়া বড়ই পছন্দ করেন।

হস্তিদন্তে প্রস্তুত দ্রব্যের পূর্ব্বে খুবই প্রচলন ছিল। হস্তিদন্তের খড়মের বোলো (বোলুয়া), ছুরির বাঁট, বোতাম, চুড়ি ও ছাতার দামাট এবং নানাপ্রকার ছবি বা খেলনা পূর্ব্বে অনেক প্রস্তুত হইত। এখনও হস্তিদন্তনির্ম্মিত দ্রব্য কিছু কিছু বহরমপুর সহরে তৈয়ার হয় এবং উহার জন্য কয়েকটি কারখানাও বহরমপুরে আছে।

তৈলের কল বহরমপুরে দুইটি আছে। জলের কল এবং বিজলীবাতিও তথায় আছে। বহরমপুরে ও বেলডাঙ্গায় পূর্ব্বে চামড়ার কল ছিল। তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমানে বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, ভগবানগোলা, বেলডাঙ্গা, ভাবদা, ধুলিয়ান প্রভৃতি কয়েকটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। বেলডাঙ্গায় চিনির কল আছে। বেলডাঙ্গার হাট খুব প্রসিদ্ধ—সেখানে গোরু-মহিষ প্রভৃতি বিক্রয় হয়। লালগোলার হাটেও গোরু-মহিষ বিক্রয় হয়। বেলডাঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে কলিকাতায় দুধ ও ছানা চালান যায়। ভগবানগোলা ও ধুলিয়ান ধান্য ও চাউলের ব্যবসায়-স্থান। ভাবদায় কপি, পটল ও পাট

যথেষ্ট রপ্তানি হয়। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ মারোয়াড়ীদের জন্যই বড় বাণিজ্যক্ষেত্র হইয়াছে।

পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ধরিয়া কাশিমবাজারের প্রসিদ্ধ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহার "বাজেটীয়া" বাগানবাড়ীতে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উহা মুর্শিদাবাদের পক্ষে বড়ই গৌরবের সামগ্রী ছিল। লেখক দুইবার প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ঐ প্রদর্শনী বর্ত্তমানে আর অনুষ্ঠিত হয় না।

বর্ত্তমানে পাঁচথুপীর অনতিদূরে "কেশের পাহার" নামক স্থানে প্রতিবর্ষে একটি কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। স্বর্গীয় জমীদার পূর্ণানন্দ ঘোষ মহাশয় উহার প্রতিষ্ঠাতা। "কেশের পাহার" অতি প্রাচীন স্থান। ওখানে একটি বৈষ্ণব আখড়া আছে ও তাহাতে শ্রীশ্রীগোপালজীর সেবা প্রতিষ্ঠিত। মাঘমাসে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী হইতে আট দশদিন যাবৎ স্থায়ী একটি মেলা এখানে বসে। উহার সঙ্গেই ঐ প্রদর্শনীও বসিয়া থাকে।

মুর্শিদাবাদে আরও দুইটি দ্রব্য ভাল পাওয়া যায়—গামছা এবং হুঁকার নল। বিলাসিগণের পক্ষে ঐ নল বড়ই মনোরম।

এ জিলার দুই এক স্থানে সোলার টুপীও (Sola hat) প্রস্তুত হইতেছে, তবে তাহা এ জেলার সীমান্তে নদীয়া জেলার কয়েক খানি গ্রামেই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এ জিলার সৈদাবাদ ও মহুলার মৃৎশিল্পও অতি সুন্দর। ভাল ভাল দেব-প্রতিমা ও মাটীর খেলনা ঐ দুই স্থানের শিল্পীরা প্রস্তুত করে। তাহাদের তৈয়ারী মূর্ত্তিগুলিকে কৃষ্ণনগরে প্রস্তুত মূর্ত্তি হইতে খুব নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। এ জেলার আর একটী ব্যবসায়ের বস্তু লাক্ষা। ইহার উৎপত্তি এ জেলায় পূর্ব্বে খুবই কম হইত। বর্ত্তমানে আর সেরূপ হয় না। জঙ্গীপুর মহকুমায় ইহা কিছু পরিমাণে উৎপত্তি হয়। ধুলিয়ান ইহার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। কুল, পলাশ, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষে লাক্ষাকীট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে লাক্ষা জন্মিলে ঐগুলি বৃক্ষ হইতে কর্ত্তন করিয়া লইয়া সংগ্রহ করা হয়। কুলগাছেই না কি লাক্ষা ভাল জন্মায় এবং সেখান হইতে সংগ্রহ করাই স্বল্প ব্যয়সাধ্য।

শঙ্খের ব্যবসায়ও এ অঞ্চলে কিছু আছে। কান্দী মহকুমায় অন্তর্গত কাগ্রাম নামক স্থানের শঙ্খবণিক বা শাঁখারীরা নানা প্রকার সুন্দর শাঁখা তৈয়ার ও আমদানী করিয়া থাকে। সদর মহকুমার অন্তর্গত জিতপুর, মধুপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহে পাল পদবীধারী এক শ্রেণীর কুম্ভকার আছে। শাঁখা তৈয়ারী ইহাদের ব্যবসায় এবং তাহারা "শাঁখাকাট কোমর" নামে পরিচিত। ইহারা শঙ্খ হইতে শাঁখা ব্যতীত নানা প্রকার সুদৃশ্য বালা, আংটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে এবং তাহাতে বেশ লাভবানও হয়।

সূত্রধর, স্বর্ণকার এবং কুম্ভকারের কার্য্যও এ জেলায় হয়, তবে তাহা উল্লেখ করিবার মত কিছু নহে।

এ জেলায় মুসলমান জাতীয় এক প্রকার তাঁতী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে জোলা কহে। ইহারা সুন্দর সুন্দর লুঙ্গী বা তহ্বন প্রস্তুত করিয়া থাকে। সালার নামক গ্রামে খদ্দরের কাপড় কিছু কিছু উৎপন্ন হয়।

জঙ্গীপুর মহকুমায় কম্বল কিয়ৎপরিমাণে প্রস্তুত হয়। ট্রাঙ্ক এ জেলায় তৈয়ারী হইত। এখন ঐ শিল্প ধ্বংসের পথে। মালাকারেরা সোলার দ্বারা বিবিধ কারুকার্য্য আগে ভালই প্রস্তুত করিত। এখনও ঐ কার্য্য কিছু কিছু হইয়া থাকে। এ জেলার পল্লীগ্রামের মুচিরা এক প্রকার চটী ও জুতা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু চামড়া ট্যান করা (tanned) না থাকায় ঐ জুতা শীঘ্রই বড় শক্ত হইয়া উঠে ও নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ লোকের মধ্যে ঐ জুতার বেশ চলন আছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল, বয়ন ও রঞ্জনবিদ্যা শিক্ষা দিবার ও রেশমশিল্প পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য বহরমপুরে একটী বয়ন-বিদ্যালয় (weaving institute) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে একটী "টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং" (technical engineering) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহা আর নাই। বাণিজ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি "কমার্শিয়াল কলেজ"ও (commercial college) ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের বাণিজ্য জল-পথে নৌকা ও ষ্টীমারের সাহায্যে এবং স্থল পথে রেলওয়ে ট্রেন ও গোরুর গাড়ীর সাহায্যে চলিয়া থাকে। বর্ত্তমানে নদীসকলের দুর্দ্দশা উপস্থিত হওয়ায় বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে এবং জলাভাব হওয়ায় দেশও অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে।

এ জেলার বড়নগরে স্বর্গীয়া রাণী ভবানী মহোদয়ার প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরসমূহে ইটের উপর যে প্রকার কারুকার্য্য দেখা যায়, তাহা সত্যই নয়নানন্দকর। ঐ রূপ কারুশিল্প একেবারেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

প্রবীণ

[শিল্পী - শ্রীঅবনী সেন

জীবন-চিত্র
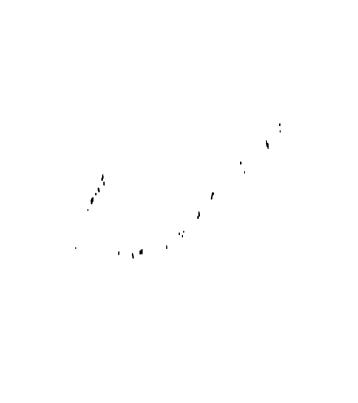
বিশ্বকর্ম্মার বৈরাগ্য

—শ্রীবিজনবালা দেবী

সুরুচি পিত্রালয়ে গিয়াছেন। এক মাস থাকিবার কথা। একুশ দিনের দিন বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'তোর খুড়ীমাকে নিয়ে আয়।'

কমল বলিল, 'চৈত্রমাসের শেষ, এখন কি আসবেন?'

বিশ্বকর্ম্মা চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'না আসেন সেখানেই থাকবেন, আমি আর আনতে পাঠাব না।'

সুরুচি নাই, বাধ্য হইয়া কমলকে বিশ্বকর্ম্মার সহিত কথা বলিতে হয়,—সুখ-সুবিধা দেখিতে হয়। শান্ত ভাবে কমল উত্তর দিল, 'অনেক দিন পর গেছেন,—ক'দিন থাক। বৈশাখ মাসের প্রথমেই গিয়ে নিয়ে আসব।'

বিশ্বকর্ম্মা আর কিছু বলিলেন না, বেড়াইতে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর বলিল, 'মা কি আসবেন না? এমন করে আর পারা যায় না, সব থেকে বিপদ হয় বাবু খেতে বসলে।'

কমল বলিল, 'আর বেশী দিন নেই'।

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কবি বলিয়াছেন, —প্রেমের প্রকৃত বিকাশ মিলনে নহে, বিরহে। সে কথা বোধ হয় অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সুরুচির অভাবে বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির মূল্য কতকটা বুঝিলেন।

'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। ঘর শূন্য, সবই শূন্য। খাইতে বসেন,—মন থাকে কোথায়! বিশ্বকর্ম্মার একা বসিয়া খাওয়া অভ্যাস নাই। সুরুচি আগাগোড়া তাঁর পাতের দিকে নজর রাখেন, বিশ্বকর্ম্মার খাওয়ার দিকে একেবারেই মন থাকে না, সুরুচিই সব দেখেন। যা দরকার, যা চাই,—সুরুচির কথা, অনুরোধ, দুঃখ ও রাগের ভয়েই অনেক কিছু বিশ্বকর্ম্মাকে পাতে লইতে হয়। এখন প্রায় সব পাতে পড়িয়া থাকে, বিশ্বকর্ম্মা দু'মিনিটে উঠিয়া পড়েন। দেখিয়া কমল মনে দুঃখ পায় এবং ঠাকুরের সাহায্যে নিত্য নূতন নানা অদ্ভুত ও বিচিত্র খাদ্য তৈয়ারী করিয়া রাখে।

অফিস হইতে ফিরিয়া আর কোথায়ও বড় বাহির হন না। খোলা হাওয়ায় বসিয়া সিগারেট খান, না হয় তো বিছানায় শুইয়া উর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া গান গাহিতে থাকেন—

'কত আর সব বল—
তোমারি বিরহানল—'

গান এইখানেই থামে, যে হেতু আর জানেন না।

কোন দিন বন্ধু-বান্ধব আসিলে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত তাস খেলা চলে। যে দিন কেহ না আসে, বিশ্বকর্ম্মা রামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়েন। বই চারিখানি বালিশের দু'পাশে সর্ব্বদাই থাকে। সুরুচি প্রায়ই বিশ্বকর্ম্মাকে কথামৃত পড়িতে অনুরোধ করিতেন। বিশ্বকর্ম্মা দু'এক পাতার বেশী পড়িতে পারিতেন না। এক্ষণে তাহা একান্ত সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বই পড়েন,—আর বিবেকানন্দের গানগুলি মুখস্থ করেন। আগে নয়টার অনেক আগে শয্যাগ্রহণ করিতেন—এবং রীতিমত বেলা করিয়া গাত্রোত্থান করিতেন। এক্ষণে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বই পড়েন এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করেন। তারপর প্রাতঃস্নান অভ্যাস করিলেন।

ক্রমে আরণ্যক বাঘ গৃহপালিত হইয়া উঠিল, দুর্দ্দান্ত স্বভাব শান্ত ও নির্ব্বিরোধী হইল (এরূপ নির্ব্বাত নিষ্কম্প অবস্থাকে ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ বলা যায়। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তাহা নয়, আপনারা ভুল বুঝিবেন না। যদিও নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ ও অনুচরগণ ভুল বুঝিয়া দ্বিগুণ শঙ্কিত হইয়াছিল।) এবং মানবের অন্তর-গুহাশায়ী বৈরাগ্য উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল (কবির ভাষায়)।

দুখানা গেরুয়া রংএর আসন ছিল, তা তোলা থাকিত। এক্ষণে বাহির হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা সৌখীন মানুষ, রঙীন সিল্কের লুঙ্গী ব্যবহার করেন। সেগুলি ছিন্নপ্রায় হওয়ায় দুখানা লুঙ্গীর দরকার হইল। আদেশানুযায়ী সাদা লুঙ্গী আনিয়া গেরুয়া রং করা হইল। সেই লুঙ্গী পরিয়া মটকার চাদর গায়ে দিয়া গেরুয়া বর্ণের আসনে বসিয়া সগর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা

মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, এখন সুরুচি আসিয়া দেখুন, তিনি কত পবিত্র ও উন্নত। তাঁহার স্লেচ্ছাচারের জন্ম সুরুচি মনে মনে দুঃখিত, এবার যথার্থ সুখী হইবেন!

একদিন সকাল বেলা বিশ্বকর্ম্মা আদেশ করিলেন, 'ঠাকুর আমায় আতপ চাল, মুগের ডাল, ঘি এই সব দেবে। দুধ বেশী করে নিয়ো। আমি মাছ আর খাব না।'

ঠাকুর নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তান, সবে স্নান করিয়া পাকশালায় যাইতেছিল, সহসা এবংবিধ দুঃসংবাদ পাইয়া কমলের নিকট দৌড়াইল।

দুঃসংবাদই বটে। এক সন্ধ্যা মাছ না হইলে যাঁর বকুনি খাইতে খাইতে বাড়ীর লোকে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, ঘরে প্রতিদিন মাছ মাংস, ডিম স্বত্বেও যিনি মাসের মধ্যে দশ দিন বন্ধুগৃহে নিষিদ্ধ পক্ষীমাংস ভোজনার্থ নিমন্ত্রিত হন, সেই তাঁহার মুখে এমন কথা!

কমলের সেদিন আর পড়া হইল না। সমস্ত দোকান বাজার ঘুরিয়া সে বিশ্বকর্ম্মার নিরামিষ আহার্য্য যোগাড় করিয়া দিল। যথাকালে সম্মুখে খাবার দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া সকলে অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

বিশ্বকর্ম্মা নীরবে খাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'সাত্বিক আহারের কাছে কি আর কিছু? রোজ এই রকম করবে।'

এক দিক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ব্বিরোধী হইতে লাগিলেন, অপর দিক দিয়া অত্যাচার বাড়িতে লাগিল। নিজে তিনি কোথাও বড় যান না। কাজেই তাঁহার ঘরে আড্ডা জমিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাস খেলা ও গল্পের সঙ্গে সঙ্গে চা-খাবার, পান-সিগারেট সব ফুঁয়ে উড়িতে লাগিল। অনবরত হুকুম ও ফরমাসে পরিচারকেরা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। একে ডাকিয়া আনিতে, ওকে পৌছাইয়া দিতে, রন্ধন ও ভোজনের সময় না পাইয়া আরদালীরা বিব্রত হইয়া পড়িল। সর্ব্বত্র আলো জলে,—মশার কামড় সহিয়া সকলে আড্ডা ভাঙ্গিবার অপেক্ষা করে। ইহাতেও নিস্তার নাই। রাত্রি এগারটার সময় বিশ্বকর্ম্মা হঠাৎ হুকুম দেন, পাঁচ জনের খাবার জায়গা দাও। ঠাকুরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এত রাত্রিতে কি দিয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না; উনান নিবিয়া গিয়াছে। না করিলেও নয়। আবার যা-তা করিয়া করিলে চলিবে না, রীতিমত ভাল যোগাড় চাই।

খরচ হইতে লাগিল অজস্র। হিসাব লিখিতে ও মিলাইতে কমল চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। টাকাকড়ি তার কাছেই থাকে। বিশ্বকর্ম্মার নিজের অর্থাদি রাখিবার অভ্যাস নাই। বেতন পাইলে আরদালী আনিয়া সুরুচিকে দেয়। বিশ্বকর্ম্মা প্রয়োজনানুসারে চাহিয়া লন। সুরুচি কোথাও গেলে ছেলেদের হাতে দিয়া যান।

ঠাকুরের বেতন আলাদা থাকিত, তাহা খরচ হইল। তারপর ঠাকুরই কয়েক দিন বাসা-খরচ চালাইল।

অবশেষে নিরুপায় কমল বিশ্বকর্ম্মা বেতন পাইবামাত্র গিয়া সুরুচিকে লইয়া আসিল।

সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সুরুচি বলিলেন, 'তোদের সবার চেহারাই বড় খারাপ হয়ে গেছে।'

কমল বলিল, 'আমরা কি সময় মত খেয়েছি না ঘুমিয়েছি? সারাদিন কেবল উৎকর্ণ হয়ে থেকেছি, কখন কি দরকার হয়!'

'লেখা পড়া ছেড়ে বুঝি এই সব হয়েছে কেবল? তোর ভয় কি?'

'না খুড়ী মা, কাকার মত মানুষ কোন বিষয়ে কষ্ট পেলে ভারি মনে লাগে। আর বেশী দিন তো না, আমরা কেবল ভাবতাম, কবে আপনি আসবেন। একদিন ঠাকুর পিঠে করতে বসল, আমি দেখিয়ে দিতে গেলাম, কিন্তু সে পিঠে আর কড়া ছেড়ে উঠল না—'

'সেকি রে? কি পিঠে?'

'পাটীসাপ্‌টা—'

'আ-কপাল! ঘি না দিয়ে ছেড়েছিলি? তাই ওঠেনি।' সুরুচি হাসিয়া ফেলিলেন, 'এই ক'দিনে পিঠের কি শখ লাগল?'

'ভাবলাম তৈরি করে দি—কিন্তু ফল কিছু হল না।'

কমল নিশ্চিন্ত মনে বেড়াইতে চলিয়া গেল। ঠাকুরও ছুটি পাইয়া অনেক দিন পরে বাহিরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সুরুচি নিজের কাজে মন দিলেন।

পরদিন হইতে বিশ্বকর্ম্মা আবার যে সেই হইলেন।

বিশ্বকর্ম্মার মন্দাগ্নি

অবিরত নিমন্ত্রণ খাওয়ার জন্যই হোক্, বা তাড়াতাড়ি খাইয়া অফিসে দৌড় দেন বলিয়াই হোক্, বিশ্বকর্ম্মার মন্দাগ্নি হইয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আমার এ অসুখ কেবল তোমার জন্যে, সম্পূর্ণ তোমার জন্যে। তুমি সারাদিন কেবল খাবার নিয়েই আছ, কম খেলেও রাগ করবে, তোমায় খুসী করতে গিয়ে আমার এই দশা!'

সুরুচি বলিলেন, 'তাই বুঝি? কোথায় কি সব খেয়ে আস, আর আমার দোষ!'

লক্ষণ গুরুতর। পেটে সর্ব্বদা ঈষৎ বেদনা, বেদনা সহ ঈষৎ জ্বালা। আহারে রুচি নাই, ক্ষুধা মোটে নাই।

সুরুচি বলিলেন, 'দিন কতক সাবধানে থাক। আমি রোজ বলি যে, আস্তে আস্তে খাও নইলে অসুখ করবে। তা তুমি শোন না। খেতে বসে যেন যুদ্ধ কর। সবাই আপিস যায় সাড়ে দশটা এগারোটায়, তুমি ন'টা বাজতেই ছোট—'

সুরুচির হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও বহি ছিল, ঔষধ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সাগুদানার মত বড়ি কয়টি মুখে ফেলিয়া বলিলেন, 'এতে কি হবে! আর ক'টা দাও।'

'তা কি হয়?'

নিয়মে থাকিয়া ও ঔষধ খাইয়া দু'তিন দিনে বেশ ভাল হইয়া গেলেন। বলিলেন, 'বেশ উপকার হয়েছে।'

চতুর্থ দিন প্রাতে উঠিয়া বলিলেন, 'রাত্রে আমার বড্ড হাঁচি হয়েছে, ঠাণ্ডা লেগেছে খুব। জানলা খুলে রেখেছিলে তুমি, তোমার যন্ত্রণায় আর পারা যাবে না! এক পেয়ালা চা দাও।'

সুরুচি বলিলেন, 'চা কি সইবে? পেটের যা অবস্থা।'

'খুব সইবে, ভাল হয়ে গেছি।'

চা পান হইল। বৈকালে বন্ধুগৃহে বেড়াইতে গিয়া অনুরোধে পড়িয়া আর এক পেয়ালা খাইলেন। ফলে পর দিন আবার ব্যাধি বৃদ্ধি পাইল।

সুরুচি যথানিয়মে ঔষধ দিলেন বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, '...জী চিকিৎসা করাব?'

'বিশেষ কিছু নয় তো—এতেই ভাল হবে।'

'না গো, এখানে বেশ ভাল কবিরাজ আছেন, ভাল ঔষধ দেবেন, শীগ্গির সেরে যাবে।'

'তবে আন।'

কবিরাজ আসিলেন। দেখিয়া ঔষধ দিলেন। প্রাতে বটিকা—বেদানার রস—মধু। মধ্যাহ্নে চূর্ণ—লেবুর রস-চিনি। রাত্রে চূর্ণ—উষ্ণ জল সহ সেব্য।

সুরুচি ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিলেন, সেবন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আমার জন্যে তেঁতুলপাতার ঝোল করবে—ডাক্তার বলেছে।'

'ডাক্তারের কাছেও গিয়েছিলে?'

'হাঁ, ওরা একজন গিয়ে ওষুধ আনুক।'

'সেটা আবার কখন খাবে?

'ঘণ্টা খানেক পরে—লাইম-জুসটা আছে না?'

'আছে, কেন?'

'খাবার পর ওটা দিও।'

'এক সঙ্গে কত ওষুধ খাবে?'

'সবই খেতে হয়, কোন্‌টা লেগে যায় ঠিক্ কি?'

অতঃপর পুরা দমে ও পুরা নিয়মে এলোপ্যাথি, হোমিও-প্যাথি, কবিরাজী ও মুষ্টিযোগ চলিতে লাগিল।

সকালে উঠিয়া বিশ্বকর্ম্মা বেদানার রস ও মধুসহ কবিরাজী বড়ি সেবন করেন।

আধ ঘণ্টা পরে স্নান—ঘোলের সরবৎ।

এক ঘণ্টা পরে ডাক্তারি এলোপ্যাথিক ঔষধ এক দাগ।

আরও আধ ঘণ্টা পরে হোমিওপ্যাথিক বড়ি ছয়টি—ইহা গোপনে। কেন না সুরুচি এত ঔষধ-পত্রের মধ্যে হোমিও-প্যাথি খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা জানেন যে, এই ক্ষুদ্র অণুবটিকাগুলির শক্তি অসামান্য।

দুপুর বেলা উচ্ছে-পলতার সুক্ত, কাঁচ কলা ভাতে, মাছের হলুদ ঝোল, তেঁতুল পাতার ঝোল, দই বা ঘোল, কমলালেবু।

আহারান্তে লাইম-জুস এক ডোজ। আধ ঘণ্টা পরে কবিরাজী চূর্ণ। তারপরে একমাত্রা একোয়া টাইকোটিস্ অথবা বাইসুরেটেড্ ম্যাগ্নেসিয়া। শেষে পান, সিগারেট ও শয়ন।

বৈকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ঈশপগুল সহ মিছরীর সরবৎ। সন্ধ্যায় হোমিওপ্যাথিক (গোপনে)। তারপরে চিঁড়ের সরবৎ। কমলালেবু, বেদানা। রাত্রে আহারের পরে কবিরাজী ও টাইকোসোডা ট্যাবলেট।

চিকিৎসার চোটে ব্যাধি পলায়ন করিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ওগো, ভাল হয়ে গেছি।'

'বেশ তো—'

'কিসে ভাল হলাম বল দেখি?'

সুরুচি বলিলেন, 'কি করে বলব? রাত-দিনই ঔষধ খাচ্ছ, কোন্‌টায় ফল হল কে জানে!—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ঐ যে কবিরাজী ঔষধটা,—ঐ সকালেরটা, ঐটাতেই উপকার হয়েছে। রাত্রের ঔষধটাও কিন্তু বেশ ভাল, ওটা আর কিছুই নয়, শুধু ভাস্কর লবণ।'

'তা হবে।'

'ডাক্তারি ঔষধটিও বেশ ছিল—সুন্দর সুগন্ধ। ওতেও হতে পারে।'

'তা পারে।'

'লাইম-জুস যে খাচ্ছি, সেটাও বেশ উপকারী।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর তোমার টাইকো-সোডা ট্যাবলেট যতই গুরুভোজন হোক—একটি খাও, সব জীর্ণ হয়ে যাবে।'

'সম্ভব।'

'তুমি যে ঈশপগুলের সরবৎ দিচ্ছ, ঈশপগুল পেটের পক্ষে ভারি উপকারী, তা জান?'

'কিন্তু যাই বল তোমার ঘোলেই সব চেয়ে কাজ করেছে বেশী। ওটা কিন্তু রোজ দিতে ভুল না—'

'না!'

'তবে হোমিওপ্যাথির কাছে কিছুই নয়—এ' আমি জোর করে বলতে পারি। সেই যে তুমি ঔষধটা দিতে—তাতেই আমার সব চেয়ে ফল হয় বেশী। আমার মনে হয়, হোমিও-প্যাথিটাই ঠিক হচ্ছে, রোজ দু'বেলাই খাচ্ছি কি না?'

সুরুচি চমকিয়া বলিলেন, 'কি বললে? দু'বেলাই খাচ্ছ? ধন্য তুমি!'

'আচ্ছা, চিকিৎসা তো কর, বল দেখি এ ব্যারামের নাম কি?

'—পাকাশয়-প্রদাহ।'

'পারলে না—পারলে না! এই তুমি ডাক্তারি কর? এর নাম গ্যাষ্ট্রাইটীস্‌।'

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার ঐ গ্যাষ্ট্রাইটিসকেই বাংলায় 'পাকাশয়-প্রদাহ' বলে।'

'সত্যি—সত্যি, না বানিয়ে বললে?'

'বানিয়ে বলবার দরকার কি আমার? ইচ্ছা হয়—বিশ্বাস কর—না হয়, না কর।'

কয়েক দিন পরেই আবার পীড়া দেখা দিল। এবার প্রকোপ বেশী। অরুচি অত্যন্ত বাড়িল। ক্ষুধা আছে, কিন্তু পাকস্থলীতে সর্ব্বদা জ্বালাবোধ। সময়ে আকুঞ্চন ও বেদনা। দুই এক দিনেই বিশ্বকর্ম্মা শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

সুরুচি বলিলেন, 'আমার কথা শুনে চল দেখি, সব সেরে যাবে। ওটা মানুষের পেট, মালগাড়ী তো নয় যে, যা ইচ্ছে বোঝাই করলেই হল? সইবে কেন? নাও, এই ওষুধটুকু খাও।'

বিকৃত মুখে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'দাও, কি দেবে—'

ঔষধ খাইয়া বলিলেন, 'কিন্তু বাইসুরেটেড ম্যাগ্নেসিয়াটা যেন বন্ধ ক'র না। ওটা বড় ভাল ঔষধ—চমৎকার গুণ!'

'তোমার তো সারা দিনই গুণ হচ্ছে! যখন যে ওষুধটা খাচ্ছ, তখনই তার গুণ হচ্ছে! কিন্তু দুঃখের বিষয় গুণটা দু'এক বেলার বেশী থাকে না।'

পথ্য ও ঔষধের ভার সুরুচি নিজ হস্তে লইলেন। সমস্ত ঔষধ কমাইয়া মাত্র দুইটিতে দাঁড় করান হইল। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার ফলে কয়েক দিনের মধ্যেই বিশ্বকর্ম্মা নিরাময় হইলেন।

বিশ্বকর্ম্মার কোট

'শোন গো শোন—আজ আবার আমায় সকাল-সকাল অফিস যেতে হবে।'

'আচ্ছা।'

'আমি এখনি স্নান করব, জল গরম করতে বল। ওরে তোরা ওঠ—এত বড় রাত্রি—কত ঘুমাস? জল-টল দে।'

তাড়াতাড়ি সকলে উঠিয়া পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা গিরিকে বলিলেন, 'বুদ্ধিকে ডাক্।' বুদ্ধি নাপিত।

গিরি কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'বুদ্ধির বাড়ী চিনি না।'

ঠাকুর বলিল, 'গোয়ালা-পাড়ার মধ্যে বাড়ী।'

একটু পরে গিরি আসিয়া বলিল, 'বুদ্ধিকে পেলাম না।'

'এত ভোরেও পেলি না? কোথা গেছে?'

'বাজারের দিকে গিয়েছে।'

'বাজারে গিয়ে ডেকে আনতে পারলি না? ফিরে এলি বেটা উল্লুক কোথাকার! যা যেখানে পাস্—ডেকে আন্।'

গিরি আবার ছুটিল।

সুরুচি নীহারকে বলিলেন, 'শীগগির মাছ এনে দাও—'

বিশ্বকর্ম্মা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'মাছ কি হবে? দরকার নেই।'

'খেয়ে যাবে কি দিয়ে তবে?'

'নিরামিষ—মাছ নয়।'

সুরুচি অবাক!—কিন্তু সকাল বেলা আর কথা কাটাকাটি করিলেন না।

গিরি আসিয়া বলিল, 'বাজারে নেই; আর কাকেও ডাকব?'

'নাঃ—মরুক গে—লুঙ্গীখানা দে।'

বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোন নাপিত পছন্দ হয় না।

লুঙ্গী হাতে করিয়া বলিলেন, 'এত ভিজে কেন গো?'

সুরুচি বলিলেন, 'ভিজে?'

'—হ্যাঁ, একেবারে ভিজে।' বলিয়া সেখানা ছাড়িবার জন্য ব্র্যাকেটের কাছে গিয়া একখানা কাপড়ে হাত দিয়াই বলিলেন, 'এ ও যে ভিজে—'

'সারা দিন রোদে শুকোয়। তবু ভিজে?'

'হ্যাঁঃ—শুকোয়! খেয়ে দেয়ে নবাবেরা ঘুমোতে যান, তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড় তুলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে। দুপুর বেলা না ঘুমোলে চলে না, রাত্রে যান চুরি করতে!—ভিজে কাপড় তুলে রেখেছিস কেন রে বদমাইস ব্যাটারা? দে এগুলো রোদে দে।' টান মারিয়া বিশ্বকর্ম্মা কাপড়গুলি ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। 'ব্যাটারা' সেগুলি রৌদ্রে ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

সুরুচি এক খানা কাপড়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'কই ভিজে?'

'ভিজে নয়? জব-জবে ভিজে একেবারে—'

'একটুও না,—কার্ত্তিক মাস, এ হিমের মাসে, এখনকার দিনে এ রকম হবে। তাই ত বলি, কাপড়-চোপড় ওরা বিকালে রোদ থাকতেই তুলে রাখে।'

বিশ্বকর্ম্মা শেভ করিতে বসিলেন। পুরা আধঘণ্টার বেশী সময় লাগিল। একটা ছোট শিশিতে একটুখানি বাম্ হাতের কাছে থাকে—'শেভ' এর পর মুখে মাখেন, নচেৎ বড় জ্বালা করে।

ছিপি খুলিয়া একটুখানি বাম্ হাতে ঢালিয়া মুখে মাখিতে গিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এ কি? এ কিসের গন্ধ? অ্যাঁ—'

সুরুচি কাছে আসিয়া বলিলেন, 'ফুরিয়ে গিয়েছিল—তাই কাল নীহার ঢেলে রেখেছে। বিউটী বাম্ আর ক্যাষ্টর অয়েল দুটো শিশিই এক জায়গায় ছিল—ভুল করে ক্যাষ্টর অয়েল ঢেলেছিল। রং দুটোরই এক রকম, লাল, তখনি ক্যাষ্টর অয়েল আবার ঢেলে বিউটী বাম রেখেছে।'

মুহূর্ত্তে বারুদে অগ্নিসংযোগ!—'কেন, কেন, কিসের জন্য এমন অনিষ্ট করা? প্রত্যেক বিষয়ে আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারা! কে বলেছিল বিউটী বাম ঢালতে? আমি ঢেলে নিতাম। কেবল ক্যাষ্টর অয়েলের গন্ধ! এ রকম যন্ত্রণা কারো সহ্য হয়? চলে যাক্ সবাই বাড়ী ছেড়ে—আমি একা থাকব। তবু এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।'

এ হইল সকলের উদ্দেশ্যে, তারপর লক্ষ্য করিয়া 'কেন তোরা আমার জিনিষে হাত দিতে যাস? যা পারবি না কেন তার মধ্যে আসবি?'

'আচ্ছা—এমন কি হয়েছে, বাথগেটের ক্যাষ্টর অয়েল তো ভালই।'

রুষ্ট ভাবে বিশ্বকর্ম্মা বাম্ মাখিয়া রৌদ্রে বসিলেন। গিরি গায় তেল মাখিয়া দিল। মাথায় নিজেই মাখিলেন। বলিলেন, 'তেলে কর্পূর মিশিয়ে রাখিস্‌নি না কি?'

নীহার বলিল, 'রেখেছিলাম।'

'রেখেছিলি, তবে গন্ধ পাচ্ছি না যে? মাথায় খুস্কি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, কর্পূর দিলে কমে—তো বেটারা কিছুতেই তা দিবি না—'

স্নানান্তে বলিলেন, 'কৈ গো,—খেতে দেবে, না ইচ্ছে নেই?'

আহারে তো বসিলেন—খাইবেন কি দিয়া ? নিরামিষ কোন কালেও মুখে উঠিতে চাহে না। সামনের ভাত নাড়া-চাড়া করিতে করিতে বলিলেন, 'মাছ কি আনা হয় নি ?'

'না—তুমি যে বারণ করলে ?'

'তোমাদের জন্তে ?'

'সে দরকার নেই।'

'—তা বেশ আমার এতেই হবে। দুধ আন।'

আচমনান্তে পোষাক পরিতে পরিতে বলিলেন, 'সাদা কোটটা দে—'

সাদা দু'টি কোট বিশ্বকর্ম্মার ভারি পছন্দ। একটা গিয়াছে ধোপার বাড়ী। অপরটার জন্য বাক্স খুলিয়া নীহার দেখিল, কোট নাই।

এ দিকে পরিচ্ছদ-বিভ্রাট সহজেই মিটিয়াছে, টাই পর্য্যন্ত বাঁধা হইয়া গিয়াছে—এখন কোটটা গায়ে চড়াইয়াই রওনা হইতে পারেন।

বলিলেন, 'কই রে ?'

'দেখছি'—তারপর নিম্নস্বরে 'কোট কই মা ?'

সুরুচি বলিলেন, 'সেটা বাক্সে কোথা পাবে ? সেদিন তো বার করলে—'

দেরী দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা নিজেই পোষাক রাখিবার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, চার পাঁচটা ট্রাঙ্ক খুলিয়া নীহার কোট খুঁজিতেছে।

মুহূর্ত্তে ব্যাঘ্রনাদে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল, 'পোড়া অদৃষ্ট আমার ! কোন দিন সুখ স্বচ্ছন্দতা পাবার যো নেই। একটা জিনিষ যদি চেয়েছ, পঞ্চাশটা বাক্স তোলপাড় করবে। বাক্সে ঘর বোঝাই হয়ে গেছে, তবু যদি শৃঙ্খলতা থাকে।'

ঠিক এই সময় বাহিরে কে ডাকিল, বিশ্বকর্ম্মা বাহিরে গেলেন।

সুরুচি বারান্দায় একটা সেলাই লইয়া বসিলেন।

কোট মিলিল না। সুরুচি বলিলেন, 'বলছি কোট বাক্সে নেই তবু তোরা শুনবি না—শুধু ওলট-পালট করবি ? একবার বেরুলে ধোবা-বাড়ী না গিয়ে কখনো কোন জিনিষ বাক্সে ওঠে না কি ?'

'খুঁজে দেখতে হয় খুড়ী-মা—' নীহারের বিপদ দেখিয়া কমল পড়া ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়াছে।

'খুঁজে দেখতে হয় বলে কি হাঁড়ি-কলসীর ভেতর খুঁজবে ? সম্ভব অসম্ভব নেই বুঝি ?'

'তবে আপনি দেখে দিন।'

'আমি দেখেছি—কোট নেই বাড়ীতে।'

ভীমমূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া বলিলেন, 'পেয়েছিস ?'

অত্যন্ত নত মস্তকে নীহার বলিল, 'না'।

'কেন—কেন পাওয়া যাবে না ? বললেই হল ? নিশ্চয় ধোবার বাড়ী গেছে।'

'ধোবাবাড়ী একটা গেছে—'

'আলবৎ দুটো গেছে—আন্ ধোবার খাতা—'

খাতা খুলিয়া দেখা গেল—একটা কোট গিয়াছে।

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় ঘরের মধ্যে পরিক্রমণ করিতে করিতে বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিতে লাগিলেন, 'নিশ্চয় ধোবার বাড়ী গেছে। ও আমি বিশ্বাস করি না—লেখা হয়নি তাই। ধোবা আসছে, কাপড় নিচ্ছে, হিসাবও নেই, কিতাবও নেই। অর্দ্ধেক কাপড় বোধ হয় লেখাই হয় না। কোটও তেমনি করেই গেছে। কেন যাবে ? কেন এ রকম করে যাবে ? আমি কোট চাই, এক্ষুণি চাই। যেখান থেকে হোক চাই !'

সুরুচি নীরবে সেলাই করিতে লাগিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'বোতাম দ্যাখ্—যদি বোতাম থাকে তবে ধোবাবাড়ীতেই গেছে।'

ভয়ে সকলের হাত পা কচ্ছপের মত গুটাইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'কম্‌লি' তো ছাড়িবে না!—টেবিলের উপর ছোট ছোট কৌটায় কোটের বোতামাদি থাকিত, কমল সবগুলি কৌটা খুলিয়া খুলিয়া দেখিল।

বিশ্বকর্ম্মা জ্বলন্ত চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বলিলেন, 'কি ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্টোপাল্টা না করলে কি কোন ছাইও মিলবে না ? বাড়ী-ঘরে আগুন দিয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হবে আমাকে। কি হল বোতাম—ভাল করে দেখ।'

'দেখেছি, নেই তো খুড়ীমা!—'

সুরুচি শান্তস্বরে বলিলেন, 'ছিল তো ওতেই, কি হল কে জানে! আর বোতাম দিয়েই বা কি হবে ?'

'গেছে! সব গেছে! গোল্লায় গেছে! যমের বাড়ী গেছে!' বজ্রনাদ ছাড়িয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিলেন।

অতঃপর ঘরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়! বিশ্বকর্ম্মা ঘর জুড়িয়া তাণ্ডব আরম্ভ করিলেন, অর্থাৎ কোট খুঁজিতে লাগিলেন।

সে কি অন্বেষণ! অমন কেহ কস্মিন্ কালেও পারিবে না, এ আমি লিখিয়া দিতে পারি।

র‍্যাকেটগুলির কাছে গিয়া টান মারিয়া সার্ট-কোট-গেঞ্জি-পাঞ্জাবী ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। বিছানা-পত্র ওলট-পালট করিয়া ফেলিলেন। টেবিলগুলির উপরকার সব জিনিষ দিয়া পাঁচমিশালী খিচুড়ী পাকাইয়া গেল। আল্‌নার কাপড়-চোপড় ফেলিতে গিয়া সশব্দে আল্‌নাটা গৃহতলে পড়িবার সময়ে নীহারের মাথার এক কোণ ছুঁইয়া পড়িল। একটা বড় এলুমিনিয়মের কৌটা দেখিতে পাইয়া সজোরে সেটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম হইয়া সেটা দূরে উঠানে গিয়া পড়িল। হাতের কাছে যাহা কিছু পাইলেন, সমস্তই ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বীর-দর্পে কোট খুঁজিতে লাগিলেন।

ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় দক্ষ-যজ্ঞ অভিনীত হইতে লাগিল। সকলে সভয়ে সামনে হইতে পলাইয়া গেল। কেবল বারান্দায় বসিয়া সুরুচি পূর্ব্ববৎ সেলাই করিতে লাগিলেন।

এই সময় সশব্দে একখানা ট্রেন চলিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা থামিলেন, চাহিয়া দেখিলেন। তার পর অনুসন্ধান-কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়াই হ্যাট লইয়া দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যদিও এ ট্রেনখানা তাঁহার নহে, সেটার আরও আধ ঘণ্টা দেরী।

গাড়ী দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে পলাতক ভীরুগণ একে একে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। গিরি বলিল, 'বাপ্‌রে বাপ্,—সবশুদ্ধ আজ গিয়েছিলাম।'

ঠাকুর বলিল, 'এই বেলা কোট খুঁজে রাখুন, বাবু ফিরে এলে আর বাঁচাবেন না।'

কমল বলিল, 'সত্যি খুড়ী মা—কোট গেল কোথা?'

সুরুচি বলিলেন, 'কোথায় ফেলে এসেছেন নিজে।'

কমল বলিল, 'মাঝে মাঝে আফিসে ফেলে আসেন, কেরাণীরা পাঠিয়ে দেয়। ফেলে এলে তারা নিশ্চয় পাঠিয়ে দিত।'

'কোথায় ফেলে এসেছেন কে জানে! কত জায়গায় যাচ্ছেন, খুলে রেখেছেন আর মনে নাই। এ তো নূতন নয়? ছাতা ছড়ি চশমা রুমাল রোজই একটা না একটা ফেলে আসা বাবার অভ্যাস। তার জন্যে আবার লোক ছুটছে—'

'তা এটা যেন গেছে। কিন্তু সেটা ধোবাবাড়ী গেছে তার বোতামও তো কৌটায় নেই।'

সুরুচি উঠিয়া কৌটা খুলিয়া কাগজ জড়ানো বোতাম খুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন, 'এই দেখ একটা কোটের বোতাম রয়েছে।'

'কাগজ জড়ানো? কে জানে! তবেই আবার খুঁজে পাইনে।'

'একবার মনে হল উঠে এসে দিই। তা ঘরের মধ্যে যা হচ্ছে!—শুধু শুধু অনর্থ করা সব অভ্যাস। মুখে মুখে হাতে হাতে সর্ব্বদা যোগাড় পেয়ে পেয়ে উনি এমনি হয়েছেন! কি করেছেন কাণ্ডটা! থাক সব এমনি পড়ে, তোলবার দরকার নেই। এসে আবার নিজের কীর্ত্তি দেখুন!'

ততক্ষণ নীহার গৃহ সংস্কারে লাগিয়া গিয়াছে।

কমল বলিল, 'কিন্তু এসেই যে কোটের কথাটি আগে জিজ্ঞেস করবেন — তখন কি বলা হবে?'

'কি জানি? হারাবেন নিজে, দায় পড়বে অন্যের।'

সন্ধ্যা। সপ্তমীর জ্যোৎস্নায় চারিদিক উদ্ভাসিত। সুরুচি বারান্দায় সিঁড়ির পাশের উঁচু ধাপে বসিয়া রহিয়াছেন।

গাড়ীর হর্ণ বাজিয়া উঠিল। একজন আরদালী নিজেদের রন্ধনাদি করিতেছিল, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া গেট খুলিয়া দিল।

নীহার গিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গের আরদালী এটাচি কেসটা তাহার হাতে দিয়া নিজেদের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

ঠাকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই ঘুরিতেছিল। গাড়ী দেখিয়া ফুল-বাগানের এক কোণে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে গুটি গুটি ফিরিতেছিল, বিশ্বকর্ম্মা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'রাত্রে আমার জন্যে রুটি করবে, কিন্তু রুটি কেন তোমরা করতে পার না? হ্যাঁ রে নীহার, তোদের রুটির অমন দশা হয় কেন?'

নীহার বলিল, 'যত্ন করেই তো করি।'

'মাথা মুণ্ডু করিস্,—হিন্দুস্থানী রুটি—সুন্দর করে

করবি। ঠাকুর পশ্চিমে, কিন্তু ব্যাটা কোন কাজের নয়—রুটি করতে জানে না, সে দিন এমন বিশ্রী হয়েছিল কেন?'

'ঘি দিই নি।'

'কেন দিস নি? ঘি না দিলে রুটি হয়?'

নীহার চুপ। তারপর বলিল, 'আপনার পেটের অসুখ কি না, সেই জন্যে! আজ ভাল করে তৈরি করব।'

'আচ্ছা, আমার স্নানের জল ঠিক কর্।'

নীহার হ্যাট, ছড়ি ও এটাচি-কেস লইয়া রাখিতে গেল। ঠাকুর তাহার আড়ালে আড়ালে প্রস্থান করিল।

বিশ্বকর্ম্মা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরুচি দৃষ্টিপাত করিলেন না।

বিশ্বকর্ম্মা আরও কাছে আসিলেন। সুরুচি একবার চাহিয়া দেখিয়া অন্যদিকে চাহিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত কাছে ও ঠিক সামনে আসিয়া সৈনিকের ধরণে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং সামরিক প্রথায় সুরুচিকে অভিবাদন করিলেন।

এবার সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'আহা, কি ভঙ্গী!'

তখন বিশ্বকর্ম্মা বারান্দায় উঠিলেন, বলিলেন, 'আসুন!'

সুরুচি উঠিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা টাই খুলিতে খুলিতে বলিলেন, 'ওগো ওঠ, উঠে এস—বড় পরিশ্রান্ত হয়েছি।'

সুরুচি বলিলেন, 'সামনেই তো টেবিলে সরবৎ রয়েছে।'

পানীয় পান করিয়া বিশ্বকর্ম্মা চেয়ারে গা ছাড়িয়া দিলেন। নীহার জুতা-মোজা খুলিয়া লইল। সুরুচি কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'একটা সিগারেট দাও।'

ধূম পান করিতে করিতে বলিলেন, 'আজ বেশ সু-খবর আছে, বুঝেছ?'

'সারাদিন ধরেই বুঝছি!—নূতন করে কি আর বুঝব?'

'না গো, সত্যি সু-খবর। নগেন বাবুরা তীর্থ-ভ্রমণে যাচ্ছেন। আমাদের যেতে খুব অনুরোধ করলেন। যাবে?'

'তা যেতে পারি, কিন্তু দল বেঁধে কোথাও যাওয়া আমার পছন্দ হয় না। শুধু হৈ চৈ করে দিন কেটে যায়। পিক্-নিক্ কি এমনি বেড়ানো দল শুদ্ধ ভাল। কিন্তু তীর্থ নয়। তীর্থে নিজেরা নিজেদের মত যেতে হয়—'

'কিন্তু পাঁচজনের সঙ্গে যাবার একটা সুবিধাও আছে। আজ তুমি ভেবে দেখ, যা ঠিক কর, কাল তাঁদের বল। আজ আমার শরীরটা বেশ ভাল আছে, এখন আর কিছু দিও না, সকাল সকালই খেতে দিও।'

'তা বেশ, তুমি স্নান কর। নীহার, গরম জলে নুন মিশিয়ে দিয়েছ ত?'

নীহার বলিল,—'দিয়েছি।'

আশ্চর্য্য!—বিশ্বকর্ম্মা কোটের কথা উল্লেখ মাত্র করিলেন না। (জীবন-চিত্র—প্রথম পর্ব্ব শেষ)

অসুন্দর

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

পল্লী-পথে যেতে যেতে গতি সুমন্থর,
করতে নিরিখ শোভার ছবি হেরি' নিরন্তর—
প্রোজ্জ্বল প্রভাত পাছে,
কান্না কত লুকিয়ে আছে,
বাদলে মল্লিকা বনে—চাষীর ভাঙা-ঘর;
বাতাসের এই স্বচ্ছন্দেতে—ম্যালেরিয়া জ্বর।

বেণু-বনে বাঁশীর ধ্বনি শুনতে অভিলাষ?
সুখের কাব্য লিখতে রচি দুখের ইতিহাস।
অরুণ-সাঁঝে বাপের কাঁধে,—
রুগ্ন শিশু চেঁচিয়ে কাঁদে,
ছিন্ন-বাসা মায়ের যে তার হল দেহান্তর:—
সুন্দরেরি মধ্যখানে এ কি অসুন্দর!

বিচিত্র জগৎ

উড়ো-জাহাজে পৃথিবীভ্রমণ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাত বৈমানিক স্যার অ্যালান কব্‌হামের বর্ণনা হইতে:—

আমার কাজের খাতিরে গত পাঁচ ছ' বছরের মধ্যে আমাকে পৃথিবীর নানা স্থানে বেড়াতে হয়েছে।

এই সূত্রে আমাকে ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে যেতে হয়েছে এবং আফ্রিকা মহাদেশের সমস্ত স্থানে আমি গিয়েছি।

বিশাল সিরীয় মরুভূমি পার হয়ে আমাকে কয়েকবার ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে যেতে হয়েছে এবং কিছুদিন পূর্ব্বেও আমি আকাশপথে অষ্ট্রেলিয়া গিয়েছিলাম, ফিরবার পথে রেঙ্গুন, সিঙ্গাপুর ও ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিজ হয়ে আসি।

অথচ ষ্টীমারে চড়ে আমি আটলাণ্টিক পার হয়েছি মাত্র সেদিন, সাদামটন থেকে নিউইয়র্ক গিয়েছিলাম। এখন আমার মনে হয়, আমি এয়ার-প্লেন বা সি-প্লেনে যে-সব জায়গায় গিয়েছি, সে-সব দেশের স্মৃতি আমার মনে অত্যন্ত রমণীয় ও উজ্জ্বল ভাবে বর্ত্তমান আছে। ষ্টীমারে, ট্রেনে বা মোটরে যে-সব জায়গায় গিয়েছিলাম, তার স্মৃতি আমার মনে অত স্পষ্ট নয়।

১৯২৩ সালের প্রথম দিকে আমি আকাশপথে সমগ্র ইউরোপ, ইজিপ্ট, প্যালেষ্টাইন, আলজিরিয়া, মরক্কো এবং স্পেনের ওপর দিয়ে প্রায় বার হাজার মাইল বেড়িয়ে আসি। আমার এক পুরাতন বন্ধু ছিলেন আমার সহযাত্রী, তাঁর সখ ছিল ভ্রমণ ও প্রাচীন সভ্যতার স্থানগুলি পরিদর্শন করা।

এর আগেও আমি বহু হাজার মাইল বেড়িয়েছি, কিন্তু এবারের ভ্রমণটা খুব দীর্ঘ ব্যাপক ধরণের ছিল।

লণ্ডন থেকে আমরা প্রথমে উড়ে যাই প্যারিসে, তারপর ফরাসী দেশের ওপর দিয়ে, রিভিরা উপকূলভাগের উপর দিয়ে ইটালি হয়ে পীসে যাই, সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকা ও ইজিপ্টে যাই।

তারপর আকাশপথের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আমরা আড়াআড়ি ভাবে আফ্রিকা পার হই,—ইজিপ্ট থেকে মরক্কো পর্য্যন্ত। জিব্রাল্টার প্রণালীর ওপর দিয়ে আবার ভূমধ্যসাগর পার হয়ে স্পেন ও ফ্রান্সের পথে লণ্ডনে আসি।

আমার সহযাত্রীটির একটা বিশেষ আগ্রহ এই ছিল যে, প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলি তিনি আকাশ থেকে দেখবেন। এইজন্যই আমাদের ইটালির উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া ও এড্রিয়াটিক সাগরের ওপর দিয়ে করফু পর্য্যন্ত গিয়ে গ্রীসের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে করিন্থ উপসাগর থেকে এথেন্স পর্য্যন্ত যাওয়া।

এথেন্সে আমরা আক্রোপোলিস আকাশের উপর থেকেই দেখি। তারপর কয়েকদিন এথেন্স শহরে অবস্থান করবার অবকাশে পার্থেনন্ ও ষ্টাডিয়াম দেখতে যাই।

আমরা যেদিন এথেন্স ছেড়ে যাই, দিনটা ছিল ভারি সুন্দর, আকাশ মেঘশূন্য নির্মল। ইজিয়ান সাগরের উপর দিয়ে উড়ে আমাদের চোখে প্রথমেই ক্রীট দ্বীপ পড়ল। আমাদের নীচে আইডা পর্ব্বতের তুষারাবৃত শিখর সূর্য্য-কিরণে ঝক ঝক করছিল।

তারপর তিন ঘণ্টা ধরে আর কিছু দেখি না, নীচের দিকে শুধু জল আর জল—ভূমধ্যসাগর। তিনঘণ্টা পরে বহুদূরে নীচের দিকে একটা সরলরেখার মত আফ্রিকার তীরভূমি দৃষ্টিগোচর হল। আমরা যাব সল্লাম নামে জায়গার এরোড্রোমে। দেখলাম, তীরভূমির যেখানে গিয়ে

আমরা পৌছব, সেখান থেকে সল্লাম এক মাইলের মধ্যে।

সল্লাম মরুভূমির সীমান্তে অবস্থিত একটি সামরিক ঘাঁটি। সেদিন রাত্রে আমরা স্থানীয় অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক একটি ভোজে আহূত হই, সেই ভোজ-সভায় উত্তর-পশ্চিম থেকে ২০০ মাইল দক্ষিণে লিবিয় মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত। উক্ত শাসনকর্ত্তা বললেন, সিউয়া পৌঁছতে মোটরে লাগবে দুদিন। আমি প্রস্তাব করলাম, তিনি এরোপ্লেনে যদি যেতে রাজী থাকেন, দু'ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে সেখানে পৌছে দেব।

তিনি আগ্রহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।
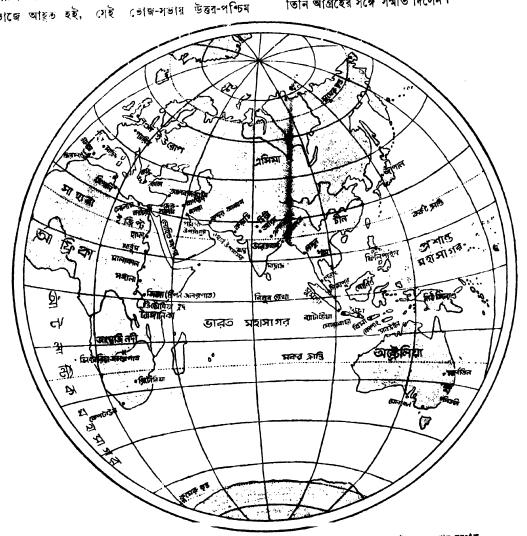
উড়ো-জাহাজে লেখক যে সকল দেশে ও স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহা এই মানচিত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। স্থান সমূহকে বিন্দু-চিহ্নিত করিয়া দেখান হইয়াছে।

ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে মরুভূমির মধ্যে ভ্রমণের কষ্টের কথা বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন যে, সকালবেলাই তাঁকে মোটরে সিউয়া রওনা হতে হবে। আমি ম্যাপ দেখে বুঝলাম, সিউয়া এখান

আমরা পরদিন সিউয়া পৌছে একটা সমতল জমিতে এরোপ্লেন নামালাম, এই জায়গাটাতে পূর্ব্বে একটি লবণাক্ত হ্রদের খাত ছিল—এখন পলি পড়ে পূরে উঠেছে। পূর্ব্বেই টেলিফোনে আমাদের আগমন-বার্ত্তা জানান হয়ে-

ছল বলে একদল আরব উষ্ট্রারোহী সিপাহী আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করছিল। তখনও রাতের অন্ধকার ভাল করে কাটেনি কারণ সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্বেই আমরা

করিন্থ ক্যানেল (আকাশ হইতে)

পৌঁছেছি—চারিদিক ক্রমে ফর্সা হলে আমরা সিউয়ার সেনুসি দুর্গের গঠন-কৌশল দেখবার সুবিধা পেলাম।

মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কোন ইউরোপীয় সিউয়া ঢুকতে পারত না, ঢুকলে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হত—কিন্তু ১৯১৭ সালে সেনুসি জাতিকে জয় করবার পরে ভ্রমণকারীদের পক্ষে সিউয়া নিরাপদ হয়েছে।

পূর্ব্বে এখানে খুব ম্যালেরিয়া ছিল। ব্রিটিশদের চেষ্টায় বর্ত্তমানে সিউয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হয়েছে। এ অঞ্চলের মরুভূমিতে বালি নেই, শক্ত, শুকনো মাটীর মরুভূমি—অনেক স্থানে বিলিয়ার্ড টেবিলের মত সমতল।

সিউয়া থেকে যাত্রা করবার পূর্ব্বে আমি ভবিষ্য বৈজ্ঞানিকগণের সুবিধার জন্য আমার এরোপ্লেন যেখানে নেমেছিল—সেখানে [illegible] নিয়ে একটা বৃত্তাকার রেখা আঁকলাম মাটিতে, এবং আমার এরোপ্লেন যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে [illegible] অক্ষরের মত চিহ্ন আঁকলাম।

স্থানীয় অধিবাসীরা বললেন, এ চিহ্ন এখানে অন্ততঃ বিশ বছর অক্ষত থাকবে—কারণ সিউয়াতে কখনও বৃষ্টি হয় না।

মাটিক বলে একটা স্থানে একটি গভীর সুন্দর হ্রদ আছে—এক সময়ে এটি সমুদ্রেরই অংশ ছিল। [illegible] আছে, অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা এখানে [illegible] করে মাঝে মাঝে বাস করতেন।

তারপর তিনশ মাইল আমরা উড়ে চলি, আমাদের নীচে রুক্ষ অনুর্ব্বর মরু, এক সময় হঠাৎ মরু শেষ হয়ে শস্যশ্যামল ভূমি আরম্ভ হল, আমরা বুঝলাম, নীলনদের মোহানা অঞ্চলে পৌঁছে গিয়েছি।

দূরে দিকচক্রবালে দুটি অস্পষ্ট পাহাড়ের চূড়া দেখা গেল। কয়েক মিনিট পরেই আমরা বুঝলাম, যে দুটি গিজার পিরামিড। দূরে ও নিকটে ক্রমে আরও পিরামিড দৃষ্টিগোচর হল।

আমরা ফারাওদের দেশে পৌঁছে গিয়েছি।

ইজিপ্টের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নীলনদ না থাকলে এখানকার অধিবাসীরা বাঁচতে পারত না। নীলনদের উভয় তীরেই একমাত্র উর্ব্বর ভূমি—বাকী সবটুকুই অনুর্ব্বর মরু।

সওয়ায় বৃটিশ রেসিডেন্টের হেডকোয়ার্টার্স।

কায়রো থেকে নীলনদের উপর দিয়ে লুক্সর রওনা হই। ট্রেনে লাগে সারাদিন, আমরা এলাম চার ঘণ্টায়।

লুক্সর পৌঁছবার আগেই আমরা আমাদের নীচে বড় বড় প্রাচীন মন্দির ও মূর্ত্তি দেখতে দেখতে এসেছি—ইজিপ্টের বহু প্রাচীন গৌরবময় দিনের নিদর্শন। আকাশ থেকে নজরে পড়ল জগদ্বিখ্যাত আবু সিম্বেলের পাষাণ-মন্দির—

আবু সিম্বেলের প্রধান মন্দির।

পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে তৈরী। এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ৬৩ ফুট উঁচু কয়েকটি মূর্ত্তি আছে—প্রত্যেকটি মূর্ত্তি পাহাড় কেটে তৈরী, মন্দিরেরই মত। মন্দিরের অভ্যন্তরে জানালা নেই, পূর্ব্বমুখী প্রবেশ-দ্বার দিয়ে যা একটু সূর্য্যালোক ঢোকে।

লুক্সর থেকে ফিরবার পথে আমাদের এঞ্জিন গেল বিগড়ে। নীচের দিকে চেয়ে দেখি, শুধুই জলসেচনের খাল ও শস্যক্ষেত্র—এমন জমিতে এরোপ্লেন নামান যায় না। ইঞ্জিনের মুখ একটু নীচের দিকে করে আমরা তখন মরুভূমির দিকে ছুটলাম এবং সেখানেই এরোপ্লেন নামালাম।

অনেকগুলি লোক তখনি ছুটে এল আমাদের দিকে—আমার ভয় হল এরা মেসিনটি বুঝি ভেঙে দেবে। আমরা গ্রাম্য পুলিশের কর্ত্তাকে ডেকে বললাম—এদের সরিয়ে দাও, নইলে এরোপ্লেন নষ্ট হবে।

পুলিশের সর্দ্দার তার লোকজন নিয়ে লাঠি হাতে সবাইকে মারতে উঠল। আমি আবার তাদের থামিয়ে শান্ত করি। সে এক ব্যাপার! ইঞ্জিনের ভ্যাল্‌ভ স্প্রিং খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আমরা বহুক্ষণ ধরে সেটি মেরামত করলাম। নিকটস্থ একটা ছোট সহরের শাসনকর্ত্তার গৃহে রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে কায়রো পৌঁছে গেলাম।

কায়রো থেকে প্যালেষ্টাইন যাবার সংকল্প করে আমরা একদিন হেলিওপোলিস্ এরোড্রোম থেকে আকাশে উড়লাম। নীলনদের মোহানার পূর্ব্বপ্রান্ত ধরে আমরা চলেছি ভূমধ্যসাগরের উপকূলের দিকে।

আমাদের নীচে কিছুদূরে গিয়েই পড়ল ধূ ধূ মরু—যত দূর দৃষ্টি যায়, শুধু বালি আর বালি।

হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, পূর্ব্বদিকের মরুভূমির বালির উপর দিয়ে একখানা প্রকাণ্ড ষ্টীমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে।

তারপর আরও কাছে গিয়ে আরব ও আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যস্থ সংকীর্ণ সুয়েজখালের জল নজরে পড়ল। বাঁকাভাবে দেখার দরুণ জলটা প্রথমে দেখতে পাই নি—সুতরাং ষ্টীমারটা জলের ওপর দিয়েই যাচ্ছে তা হলে!

বাইবেলে পড়েছিলাম ইস্রায়েল জাতি মরুভূমি ছেড়ে প্যালেষ্টাইনের উর্ব্বর ভূমিতে এসে বাসস্থান স্থাপন করেছিল। আকাশ থেকে এই পরিবর্ত্তনটা ভারি সুন্দর দেখায়—প্রথমে মরুভূমি, মরুভূমি ছাড়িয়ে ছোটখাট গাছ-পালার জঙ্গল, তার পরে প্যালেষ্টাইনের শ্যামল শস্যক্ষেত্র। তবুও এ কথা আমায় বলতেই হবে যে, প্যালেষ্টাইনের অনেক জায়গাই অনুর্ব্বর পাহাড় ও বালুমাটীর প্রান্তর।

রোমকদের সময়ে উত্তর-আফ্রিকায় যথেষ্ট গম জন্মাত সেই সব জায়গায়-এখন যেখানে শুধু ধূ ধূ মরুভূমি। আরব পশুপালকেরা কোন কোন স্বল্প শস্পাবৃত ভূখণ্ডে ভেড়া-ছাগল চরায়। চাষবাস একেবারেই চলে না। সাহারা পূর্ব্বেকার উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রগুলি বহুদিন আগেই গ্রাস করে ফেলেছে—এখন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে সমুদ্রের উপকূলের দিকে।

বেন্-গাজি থেকে মিসুরাটা পর্য্যন্ত পথ বড় বিপজ্জনক। মিসুরাটা সিদ্রা উপসাগরের ওপারে অবস্থিত; বেন্-গাজি থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৫০০ মাইল। এই ৫০০ মাইলের

মধ্যে সবটাই মরু, পেট্রোল নেবার কোন জায়গা নেই, এরোপ্লেন নামানও নিরাপদ নয়, কারণ দেশটা বর্বর সেন্‌ুসিদের অধিকৃত—এদের সঙ্গে সে সময়ে ইটালি যুদ্ধে ব্যাপৃত।

ইটালীয় বন্ধুরা আমাদের জানালেন যে, যদি আমাদের এরোপ্লেন মাঝ-পথে নামতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে যদি আরবীয় দস্যুরা আমাদের বন্দী করে বা হাত পা নাক কেটে দেয়—এর জন্যে তাঁরা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না।

কিন্তু আমাদের তখন ফিরবার উপায় নেই—মিসুরাটা দিয়ে যেতে হবেই।

আমার নিজের খুবই সন্দেহ ছিল যে, প্রবল বিপরীত বাতাস বইলে সঙ্গের পেট্রোলে কুলোবে কি না।

ফলে এরোপ্লেনের প্রত্যেক ট্যাঙ্ক পুরোপুরি বোঝাই করে তো নেওয়া হলই, আরও কতকগুলি বাড়তি গ্যাসোলিনের টিন চাপান হল। সৌভাগ্যক্রমে এরোড্রোমটা খুব ভাল পাওয়া গিয়েছিল, তাই অত বোঝাই থাকা সত্ত্বেও উড়বার সময় বিশেষ কিছু বেগ পেতে হয় নি। সামনের ককপিট পেট্রোল টিনে এমন ভর্তি যে, আমাদের মিস্ত্রি উড্‌হামসকে কোনরকমে মাথা নীচু করে গুটিসুটি হয়ে সেখানে বসতে হল।

যাতে না নেমে শূন্যপথেই এঞ্জিনের ট্যাঙ্কে পেট্রোল ভর্তি করা যায়, তার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আরবীতে লেখা একখানা পত্রও এই মর্ম্মে নিয়েছিলাম যে, আমরা ইটালীয় সৈনিক নই, আমরা ইংরেজ, দেশ দেখতে বেরিয়েছি—কোনো সামরিক উদ্দেশ্য আমাদের নেই।

সৌভাগ্যের বিষয়, সে চিঠির কোন দরকার হয় নি—নিরাপদেই আমরা মিসুরাটা পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে জিব্রালটার পর্যন্ত [illegible] হয়ে স্পেন ও ফরাসী দেশের উপর দিয়ে লণ্ডনে ফি[illegible] মধ্যে আমরা অবিচ্ছিন্ন [illegible] পাড়ি দিয়েছিলাম।
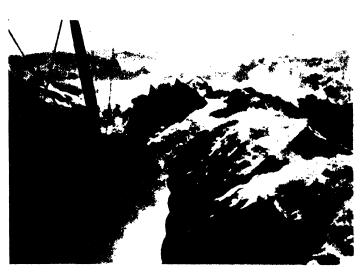
এর পরেই আমাদের [illegible] যে উড়ে যাবার একটা

সুইজারল্যাণ্ড (এরোপ্লেনের অংশ দেখা যাচ্ছে)।

সুযোগ উপস্থিত হল। বিমান-বিভাগের বড়-কর্তা হিসেবে স্যার সেফটন ব্রাঙ্কারের ভারতবর্ষে যাওয়ার দরকার ছিল। তিনি এরোপ্লেনে যেতে চাইলে ট্রেজারী আপত্তি হল যে, এতে খরচ অনেক বেশী পড়ে যাবে, ট্রেজারী তা মঞ্জুর করতে রাজী নয়। অবশেষে বিমান-কোম্পানীর তিনি খরচের খানিকটা অংশ দিতে চাইলে, এতে আর কোন আপত্তি চলে না। আমি এরোপ্লেন নিয়ে যাব ঠিক হল।

সেবার ইংলণ্ডে ভীষণ শীত। নভেম্বর মাসের কুয়াসা ও অন্ধকারের মধ্যে আমরা লণ্ডন ছাড়লাম, সারা ইউরোপের কোথাও সূর্য্যের মুখ বড় একটা দেখা গেল না—প্রথম রৌদ্র দেখলাম পারস্য উপসাগর পৌঁছে।

উপকূল-ভাগের অনেকটা অংশ নিয়ে অদ্ভুত ধরণের পাহাড়। যেন সরু সরু মিনারের চূড়ার সমষ্টি, কোন কোন স্থানে সেগুলির আকৃতি পিরামিডের মত। নীচের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল, আমরা পৃথিবীতে আর নেই, অন্য কোন

মৃত গ্রহের বুকের উপর দিয়ে চলেছি। ও রকম অদ্ভুত গড়নের পাহাড় আমি আর কোথাও দেখিনি।

বন্দরাব্বাসের কাছে কতকগুলি পাহাড়ের রং ভারি চমৎকার। কোনটা রাঙা, কোনটা সবুজ, আবার কোনটা গাঢ়-হল্‌দে রঙের। এই পাথরে অক্সাইড্ আছে বলে বহু প্রাচীন কাল থেকে অক্সাইড্ সংগ্রহের জন্যে ব্যবসায়ীরা আসে। প্রাচীন ফিনীসিয় বণিকেরা এখান থেকে অক্সাইড্ নিয়ে যেত এবং ৪০০ বছর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদের একটা খনি ছিল অর্ম্মুজ্ দ্বীপে।

ভারতবর্ষে সে সময় শীতকাল, আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল।

স্যর সেফ্‌টন ব্র্যান্‌কার করাচী থেকে ট্রেনে নিজের গন্তব্য স্থানে যাবেন। আমরা তাঁকে করাচীতে নামিয়ে দিয়ে যোধপুরের পথে দিল্লী রওনা হই। করাচী ও যোধপুরের মধ্যে থর মরুভূমি পড়ে—প্রথম দিন আমরা মরুভূমি উত্তীর্ণ হয়ে একটা বড় নদীর খাত অনুসরণ করে যোধপুর সহরে পৌঁছবার চেষ্টা করলাম।
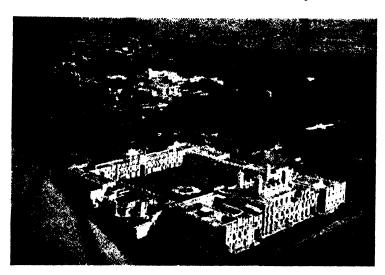
গবর্ণমেণ্ট হাউস কলিকাতা (আকাশ হইতে কেমন দেখায়)।

দূর থেকে দেখি দিক্‌চক্রবালে কতকগুল বড় বড় গাছ দেখা যাচ্ছে এবং সেখানে যেন অনেকগুলি লোক জড় হয়েছে, একটা বড় মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য। কথা ছিল আমরা যোধপুরের মহারাজের অতিথি হব। নিকটেই একটা মিলিটারী ব্যাণ্ড বাজনা বাজাচ্ছে। ব্যাপার কি? একটা এরোপ্লেন নামান দেখতে এত লোক এসে জুটেছে?

প্রায় মাঠে নেমেছি এমন সময় দেখি মাঠের দূর প্রান্ত থেকে দুজন অশ্বারোহী পোলো খেলোয়াড় আমাদের দিকে ছুটে আসছে। হঠাৎ আমার মনে হল, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য এ আয়োজন নয়, এটা পোলো খেলার মাঠ এবং একটা পোলো ম্যাচ চলছে। ভুল বুঝতে পেরে তখনই আবার আকাশে উঠে একটু দূরে মহারাজের নিজের এরোপ্লেনের মাঠে নামিলাম।

আগ্রার জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখবার ইচ্ছা ছিল অনেকদিন থেকেই। শূন্যপথ থেকে আমরা এরোপ্লেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক থেকে এই অপূর্ব্ব সমাধি মন্দিরের ফটো নিলাম।

প্রথমে আমাদের কথা ছিল করাচী পর্য্যন্ত যাওয়ার। কিন্তু ভারতে পৌঁছে আমরা সে চুক্তির কথা ভুলে গেলাম। এতদূর এসে দেশটা ভাল করে দেখতে হবে বৈ কি!

আগ্রা থেকে আমরা গেলাম কল্‌কাতা। কল্‌কাতার ময়দানে নামবার ব্যবস্থা করেছিল স্থানীয় সৈন্যবিভাগ। এরোপ্লেনের অবতরণভূমি সম্বন্ধে দেখলাম তাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। যেখানে তারা আমাদের নামবার ব্যবস্থা করেছিল, সে স্থান সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকেই দেখি লোকের ভিড়। বড় মুস্কিলে পড়া গেল, আকাশে পাক দিয়ে বেড়াতে লাগলাম, নামি কোথায়?

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল ময়দানের পাশে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। মাঠটা অসমতল বটে, সেখানে লোকের ভিড় আদৌ নেই। দর্শকদের কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই আমি এরোপ্লেন নামালাম এই নির্জ্জন ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

কলকাতায় আমরা রইলাম কয়েকদিন। এখান থেকে অরণ্যাবৃত বঙ্গোপসাগরের তীর বেয়ে আমরা গেলাম রেঙ্গুন। ভারত গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল, আমরা বিমান-পথের সুবিধা-অসুবিধা পরিদর্শন করবার জন্য সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যাব। কিন্তু আমরা তাতে সম্মত হতে পারলাম না। এমনিই অনেক দূর এসে গিয়েছি লণ্ডন থেকে। আমাদের এরোপ্লেনখানা একবার মেরামত করা দরকার। এদেশে সে-সব হবে না। আমরা ফিরে যেতে চাই।

সুতরাং তিন মাস প্রবাস-যাপনের পরে বসন্তকালের প্রথমে এক সুন্দর দিনে আমরা ক্রয়ডন্ এরোড্রোমে অবতরণ করলাম।

এইবার আমরা লণ্ডন থেকে কেপটাউন উড়ে যাবার সঙ্কল্প করি। এই যাত্রার জন্য আমি আমার পূর্ব্বের প্লেনখানাই নেব ঠিক হল, কেবল এঞ্জিনটা বদলে সিড্লি-জাগুয়ার শ্রেণীর এঞ্জিন বসিয়ে নিলাম।

এই ভ্রমণের প্রথম অংশে যে জায়গাগুলির উপর দিয়ে গেলাম, সেখানে আমি পূর্ব্বে গিয়েছি—সেই ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, ইজিপ্ট। ইজিপ্ট পার হয়ে সুদানে পৌঁছে নতুন দেশের হাওয়া গায়ে লাগল। নীল নদীর গতি অনুসরণ করে দক্ষিণমুখে যাচ্ছি। দেশীয় জাতিদের নানা গ্রামের উপর দিয়ে চলেছি। নীল নদের ধারে এক জায়গায় বড় জলা। এখানকার লোকে কাপড় পরে না, সভ্যতার বিশেষ কোন ধার ধারে না। এখানে মোঙ্গলা বলে একটা গ্রামে আমাদের নামতে হল। গরম এখানে এত বেশী যে, কোন দৈহিক পরিশ্রমের কাজ করা বড় কষ্টকর। সাদা লোকের সাহায্য নিয়ে আমরা উড়ো-জাহাজের কলকব্জা পরিষ্কার করলাম। এ দেশের জমির উচ্চতা বড় কম, ভূমধ্য সাগরের উপকূল থেকে নীল নদের উপর দিয়ে আমরা ৩০০০ মাইল এসে গিয়েছি—অথচ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এখানকার উচ্চতা মাত্র ১০০০ ফুট।

জিন্জা বলে একটি ছোট শহরের কাছে আমরা বিখ্যাত রিপন জলপ্রপাত দেখলাম। এটাই শ্বেত নীলনদের উৎস। টাঙ্গানিকা ও রোডেশিয়া যাবার পথে অনেক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখেছিলাম বটে, কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত।

আকাশ থেকে দৃশ্যটা কি রকম অদ্ভুত দেখায় বর্ণনা করা আবশ্যক। অনেক দূর থেকে আমরা দেখছি একটা প্রকাণ্ড নদী, প্রায় সওয়া মাইল চওড়া, ধীরে ধীরে প্রান্তরের ও জঙ্গলাবৃত তীর-ভূমির মধ্য দিয়ে বেয়ে আসছে। আসতে আসতে অত বড় নদীটা হঠাৎ যেন একটা মাটীর ফাটলের মধ্যে ঢুকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল। অদ্ভুত!

নদীটা জাম্বেজী নদী এবং যেখানে নদীটা ফাটলে ঢুকল, সেখানটাতেই হঠাৎ একটা সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী খাদে ৪০০ ফুট ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বিশাল জলধারা। এটাই হল বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত। এমট্ বলে একজন ফটোগ্রাফার ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা খুব নীচে এরোপ্লেন নামিয়ে নানাদিক থেকে এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের ফটো

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ব্রিজের দৃশ্য (অ্যালান কবহামের বিমান উপরে দেখা যাইতেছে)।

নিলাম। অনেক দৃশ্যই দেখেছি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমগ্র পৃথিবীতে ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের গম্ভীর সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। আমি তো অন্ততঃ দেখি নি। বহুদূর থেকে মেঘগর্জ্জনের মত গর্জ্জন শোনা যায়।

জলপ্রপাতের ফটো নিতে খুব নীচে প্লেন নামিয়েছি, এমন সময় ইঞ্জিনের মধ্যে এক রকম আওয়াজ শুনে আমাদের মুখ শুকিয়ে গেল। সেখানটাতে জলকণায় কুয়াসা সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই কারবুরেটারে জল ঢুকে গিয়েছে। বড় ভয় হল, আমাদের ঠিক নীচেই ৬২২৫ ফুট গভীর খাদ এবং উন্মত্ত জলরাশি এক দিকে গভীর অরণ্য, এক দিকে খরস্রোতা জাম্বেজী নদী। এরোপ্লেন নামাবার উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা কোথাও নেই।

পাহাড়-বেষ্টিত স্বাভাবিক হ্রদ (স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া

তাড়াতাড়ি এরোপ্লেন উঠিয়ে আমরা লিভিংষ্টোন এরোড্রোমের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে দিলাম। সৌভাগ্যক্রমে উপরে উঠবার কিছু পরেই কারবুরেটারের জল শুকিয়ে গেল বোধ হয়, কারণ ইঞ্জিনের পট্‌পট্ আওয়াজ বন্ধ হল।

আমাদের এই এরোপ্লেন, প্রথম সমগ্র আফ্রিকা লম্বালম্বি পাড়ি দিয়ে কায়রো থেকে কেপটাউনে পৌঁছল। ফিরবার পথে কেপটাউন থেকে লণ্ডন পৌঁছতে ১৫ দিন লেগেছিল।

কৃষকের ব্যথা

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

ধানে ধানে আজ ভরে গেছে মাঠ, তুমি শুধু নাই প্রিয়া!
তোমা তরে আজ চোখে ঝরে জল, ফাটিয়া যেতেছে হিয়া
খাজনার দায়ে রাজার পাইক সে বার নিয়েছে ধরে,
ভয়ে ভয়ে তুমি কেঁদে খুন হ'লে সারাটি রজনী ধরে।
সেই কথা স্মরি' আজি আমি কাঁদি, দাওয়ায় বসিয়া থাকি,
ভাবি আর তুমি আমার ভবনে ফিরিয়া আসিবে না কি!
নূতন ধানের হবে 'জোলামণি' ওপারের বটতলে,
ছেলে-মেয়ে তাই হাসিতে হাসিতে চলিতেছে দলে দলে।
সোণ্টা, নোণ্টা, আলো ও আন্ধি চলিয়াছে হাসিমুখে,
আমি শুধু বসে রহিয়াছি চেয়ে তোমার স্বপনসুখে।
কাল রজনীতে না খেয়ে নোণ্টা ঘুমে পড়েছিল ঢুলে,
জোর করে তাই খাওয়াতে তাহারে এনেছিনু আমি তুলে।
ঘুমের ঢুলেতে চায়নি ক' খেতে মেরেছিনু তাই তারে,
রাত্রে শুইয়া বুকে তুলে নিয়ে ভেসেছিনু আঁখিধারে।
আর যে পারি না সংসার নিয়ে জ্বলে-পুড়ে হনু খাক্,
শুধু ভাবি কবে ও পার হইতে আসিবে শেষের ডাক।

নারী-সমিতি

—শ্রীঅমলা দেবী

[৯]

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিজলী একেবারে তেতালার ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সুবিমল একটা জানালার কাছে ইজি-চেয়ারে শুইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। বিজলী ঘরে ঢুকিতেই কহিল, "কি দিদি! এত সকালেই কোথায় বেরিয়েছিলে?"

বিজলী একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া কহিল, "একবার পাড়ায় দেখা করতে বেরিয়েছিলুম, কিন্তু অভ্যর্থনার বহর দেখে এগুতে ভরসা হল না।"

—"হঠাৎ পাড়ার লোকদের দেখবার ইচ্ছা হল কেন?"

ম্লান হাসি হাসিয়া বিজলী কহিল, "গিয়েছিলুম মেয়ে যোগাড় করতে—"

—"যোগাড় হল?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিজলী কহিল, "না, আমার মত পাপিষ্ঠার হাতে মেয়ে দিলে মেয়েদের পরকাল না কি ঝরঝরে হয়ে যাবে!"

সুবিমল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল। বিজলীও চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সুবিমল কহিল, "দিদি! আপনাকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম, কিছু যদি মনে না করেন তো বলি—"

—"কিছু মনে করবার মত পদ-মর্য্যাদা আমার নেই ভাই। যা' ইচ্ছে তুমি নির্ভয়ে বলতে পার।"

মৃদু হাসিয়া সুবিমল কহিল, "ওঃ, আপনি আগে থেকেই মনে করতে আরম্ভ করলেন, তা হলে আমার বলা হল না।"

বিজলী কহিল, "কি বলবে? চলে যেতে চাও এই তো?"

সুবিমল কহিল, "হ্যাঁ দিদি, চলে যেতে চাই…ধূমকেতুর মত একদিন আপনার আকাশে উঠেছিলাম, সব লণ্ড ভণ্ড করে দিয়ে চলে গেলাম।"

—"না ভাই তোমার কোন দোষ নেই, আমিই ভুল করেছি। মানুষের মূল্য তার sex, জাতি, সমাজ ও ধর্ম্ম নিরপেক্ষ কি না, সেইটাই কতকটা যাচাই করতে চেয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, যারা মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করতে চায়, তারা হয়তো তার ঠিক দাম দিতে পারবে; গভীর লজ্জা ও দুঃখের সঙ্গে বুঝতে পেরেছি, আমাদের সে শিক্ষা হয় নি।"

সুবিমল কহিল, "শুধু আপনারা কেন দিদি! মনুষ্যত্বের দাম কি মানুষ কোথাও কোনদিন দিতে পেরেছে? আমাদের আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা অনেকটা নায়রাজীদের সাহেবীয়ানার মত। আপ-টু-ডেট কাট-এর কোটের নীচে থাকে মোটা পৈতে এবং ফ্যাশনেবল হ্যাটের নীচে লম্বা টিকি। সে যতই মুখে বড় বড় বুলি আওড়াক, ভাল করে খুঁটিয়ে দেখলে দেখতে পাবেন, সেই সনাতন সামাজিক বুদ্ধি অজগরের মত তার সমস্ত মনের গায়ে হাজার পাকে জড়িয়ে আছে। তাই আইনষ্টাইন্ আজ নির্ব্বাসিত, ট্রট্স্কি নিরাশ্রয় আর ইংলণ্ডের রাজা রাজ্যচ্যুত।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ইউরোপ, আমেরিকায় পাক কিছু খুলেছে কি পাক আরও বেড়েছে, তা আমি জানি না, অন্ততঃ মুক্তির জন্য সেখানকার লোকদের চলেছে অবিরাম চেষ্টা। কিন্তু আমাদের পাক আরও শক্ত হয়ে বসে আমাদের শেষ নিঃশ্বাসকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে।"

বিজলী কেমন শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওদের দেশেই কি সত্যি মুক্তির চেষ্টা চলেছে?"

—"তা আমি জানি না দিদি, তবে ওরা বসে নেই; ওদের জনসাধারণ জিজ্ঞাসু হয়েছে। ওদের দেশের মনীষীরা স্বপ্ন দেখছে এক কল্প-লোকের, যেখানে প্রত্যেক মানুষের জীবন সার্থক হয়ে উঠবে, প্রত্যেক মানুষ পাবে তার পুরোপুরি দাম। যুধিষ্ঠিরের মত তারা চলেছে সুদূর যাত্রায়, দুর্গম পথ দিয়ে, দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের পর পাহাড় পার

হয়ে—সঙ্গী পঞ্চভ্রাতা ও প্রিয়তমা দ্রৌপদী প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ধ্যান-নেত্র সেই স্বর্গ-লোকের পানে স্থির হয়ে আছে।—আমাদের দেশে চলেছে তার বিপরীত ক্রিয়া। যারা এ দেশে হৈ চৈ করছে তাদের সকলের কাজ আর কথায় দেখি ওদের প্রতিধ্বনি। সচেতন বস্তু কখনও প্রতিধ্বনির সৃষ্টি করে না—তাই মনে হয়, এ জাত আজ পাষাণ হয়ে গেছে। এরা নিজেরা কিছু করবার শক্তি অর্জ্জন করে নি, করতে চায় নি—সব কিছুতে কেবল ওদের অনুকরণ করে মনে করছে, বহুং কিছু একটা হয়েছে। ওরা আর যাই করুক, এই অনুসরণের, এই প্রতিধ্বনির অচেতনতা হতে ওরা মুক্তি পেয়েছে।"

সুবিমল চুপ করিয়া রহিল। বিজলীও নীরবে ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "তুমি কোথায় যাবে?"

বিষণ্ণ কণ্ঠে সুবিমল কহিল, "স্রোতের কুটো কোথায় গিয়ে ঠেকব, কি করে জানব দিদি!"

বিজলী কহিল, "বিমল, তোমার সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতদিন কিছু জানতে চাইনি—এখন বিদায়ের আগে যদি কিছু জানতে চাই, তুমি কি কিছু মনে করবে?"

—"কিছু মনে করব? না দিদি, কি জানতে চান বলুন

—"তোমার মা বাপ নেই?"

—"না।"

—"বাড়ী-ঘর?"

—"না।

"আত্মীয়-স্বজন?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবিমল কহিল, "বোধ হয় না।"

—"এক এক কথায় জবাব না দিয়ে সব একটু স্পষ্ট করে বল না বিমল!"

সুবিমল বলিতে লাগিল, "আমার বাবা তাঁর এক জমিদার বন্ধুর অধীনে নায়েবী করতেন। আমার বয়স যখন খুব অল্প, তখন বাবা কলেরায় মারা যান। মাকে কয়েক ঘণ্টার বেশী বৈধব্য সহ্য করতে হয়নি। সেই জমিদারই দয়া করে মাতৃপিতৃহীন শিশুকে আশ্রয় দেন। সেইখানে কোন রকমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতা চলে এসে কলেজে ভর্ত্তি হই। জমিদার বাবু কিছু সাহায্য করতেন, বাকী টাকা টিউশানী করে সংগ্রহ করতে হত।…বহু দুঃখে কষ্টে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র সংগ্রহ করে বাংলার তৃণ-গুল্ম-হীন চারণ-ক্ষেত্রে ঘোরাঘুরি করতে আরম্ভ করেছি, এমন সময়ে পশ্চিম-ভারত হতে একটা আগুনের ফিন্‌কি বাংলার বারুদের আড়তে এসে পড়ল। দাউ দাউ করে আগুন উঠল জ্বলে, বাংলা দেশ জোড়া লাগবার পর থেকে যে নেতারা শান্ত-শিষ্টের মত খড় ও জাব খাচ্ছিলেন এবং জাবর কাটছিলেন, তাঁরাই আবার দুই শিং বাঁকিয়ে হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন সেই সঙ্গে সভায় সমিতিতে বক্তৃতা শুনে শুনে আমার মন 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে'—বলে চীৎকার করে উঠল—অতএব মেসে না ফিরে সরাসরি বড়বাজারে গিয়ে নিরুপদ্রবে এবং অহিংসভাবে পুলিশ ঠেঙ্গিয়ে হাজতে গেলাম; বিচারে দু-বছরের জন্যে জেল হয়ে গেল।… জেল থেকে যখন বেরুলাম, তখন দ্বৈত-শাসনের দমকলে আগুন গেছে নিবে, নেতারা কালি-ঝুলি মেখে ইলেকশন-ক্যাম্পেনে মাতামাতি করছেন; কাছে যেতেই বললেন—ভোট যোগাড় করতে পারবে তো চলে এস, নইলে খসে পড়—

সুতরাং খসে পড়লাম। দেশে ফিরে গেলাম, কর্ত্তা-গিন্নী দুইজনেই রাগে গম গম করছেন। প্রথম দিন কিছু বললেন না, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে একজন কর্ম্মচারীকে দিয়ে বলে পাঠালেন,—আমার ছোঁয়াচ তাঁদের সহ্য হবে না। অতএব, আবার খসে পড়তে হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঁ থেকে বেরুলাম। জমিদার-বাড়ীর বাগানের পাশ দিয়ে রাস্তা, বাগানের গেটের কাছে কে যেন চাপা গলায় ডাকল—শোন। চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি অরু, অর্থাৎ অরুণা, জমিদারের একমাত্র মেয়ে। এই মেয়েটির ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না; যত দিন দেশে থাকতাম, এর স্নেহ সদা-জাগ্রত প্রহরীর মত আমাকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকত—সকলের অলক্ষ্যে আমার খাওয়া-দাওয়া, পড়াশুনা, খুঁটিনাটি সব কিছু লক্ষ্য করত—বিন্দুমাত্র অসুবিধে হতে দিত না। তা ছাড়া সে যে কত রকমে কত সাহায্য করত তার ঠিক নেই।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া

থাকিয়া সুবিমল বলিল, "অরু আমায় হাতছানি দিয়ে গেটের ওদিক হতে ডাকলে, কাছে গেলাম।

অরু বলল, এস।

বললাম, যাবার হুকুম নেই।

গেটটা একটু খুলে অরু বাইরে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তার নিশ্বাস আমাকে স্পর্শ করতে লাগল, বক্ষের দ্রুতস্পন্দন আমার কানে এল, নাকে এল তার প্রিয় পুষ্পের সুরভি।

সে বলল, এখনই চলে যাচ্ছ ?

আমি বললাম, হ্যাঁ অরুণা।

সে বলল, আজ রাত্রিটা এখানে থাকা চলে না ?

বললাম, না।

—কোথায় যাবে ?

—জানি না।

—কখন আবার দেখা হবে ?

—জানি না।

অরুণা যেন নিঃশব্দে নিজেকে সামলাতে লাগল। শেষে বলে ফেলল, আমাকে সঙ্গে নেবে ?

আমি বললাম ছিঃ অরুণা! ও কথা বলতে নেই—

অরুণা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগল,—তোমাকে না বলে যে আমার উপায় নেই। এই কথা বলবার জন্যে আমি এই দু'বছর ধরে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। জেলে কত কষ্ট পেয়েছ জানি না, কিন্তু তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী কষ্টে আমার দিন কেটেছে—আজ তুমি অন্ধকারে লুকিয়ে চলে যাচ্ছ, বলছ জীবনে আর দেখা হবে না আর আমি এখনও চুপ করে থাকব ? ··

আমার পায়ের নীচে বসে আমার পায়ে হাত দিয়ে সে বলল—তোমার পায়ে আজ আমি আমার সর্বস্ব দিলাম, আমার নিজের বলতে কিছু রাখলাম না—তুমি নাও। —অন্ধকার রাত্রি—পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বলছিল, সে এই উৎসর্গের নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

আমি তাকে তুলে কাছে টেনে নিয়ে বললাম,—আমি ধন্য হলাম, অরুণা! কিন্তু তোমাকে যে অনেক দুঃখ পেতে হবে—

আমার বুকে মুখ রেখে অরুণা বলল,—তুমি পাশে থাকলে আমার দুঃখ কিসের ?

—অরুণা! পৃথিবীতে আমার স্থান যে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, তোমাকে পাশে রাখা তো কুলোবে না—

সে বলল, নাই বা থাকলাম পাশে; তুমি শুধু আমাকে একবার বল, তুমি আমাকে বুঝেছ—

—বুঝেছি, অরুণা!

—বেশ! আর কিছু চাইনে—বলেই সে গলায় আঁচল দিয়ে আমাকে প্রণাম করল; বলল, আমরা অপেক্ষা করব। ভালবাসা যদি বিচ্ছেদকে অতিক্রম করতে না পারে, তবে তার মূল্য কি? আজ হতে আরম্ভ হল আমাদের ভালবাসার পরীক্ষা।

ওখান হতে চলে এসে বেশীদূর যেতে হল না; কাছেই একটা গাঁয়ে আশ্রয় পেলাম। সেখানে খুললাম একটা পাঠশালা। সেই খবর পেয়ে মাইল খানেক দূরে পুলিশের দারোগার সুখ-শয্যা কণ্টকিত হয়ে উঠল; আমাকে তিনি ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম,—আমার স্বদেশী বাতিক সেরে গেছে। অবশেষে, তাঁর এবং তাঁর সহকারীর একপাল ছেলেমেয়েকে বিনা পয়সায় পড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

এই দারোগার বাড়ীতে আমাদের জমিদার বাবুর যাতায়াত ছিল। অবিশ্যি আমার সঙ্গে একদিনও তাঁর দেখা হয়নি।

মাস ছয় পরে একদিন দেখা হল। অনুতপ্ত কণ্ঠে আমাকে বললেন—বাবা বিমল! তোমার কাকীমা তোমাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছেন, একবার দেখা দিয়ে আসবে চল।—কাকীমার হৃদয়ের হঠাৎ এরূপ বেচাল হওয়ার খবর শুনে বিস্মিত হলাম। বললাম,—আদেশ করেন তো যাব—

—যাব, নয় বাবা! আমার সঙ্গেই একবার চল।

যেতে হল; জমিদার বাবু আমাকে নির্জ্জন বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে বললেন,—ভারী বিপদে পড়েছি, বিমল! তুমি না সাহায্য করলে উপায় নেই—কাকীমার হৃদ্-রোগের কারণটা স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল।

জমিদার বাবু বলতে লাগলেন, এক জমিদারের

ছেলের সঙ্গে অরুর বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে; অরু বলছে, বিয়ে করব না—কারণ কিছু খুলে বলছে না। তোমার কাকীমার বিশ্বাস তুমি বললেই ও রাজী হবে।

আমি বললাম, আমি বললেই যদি রাজী হয় তো চলুন তার কাছে যাই।

—আমি আর যাব না, বাবা! তুমি একা যাও, সে তার ঘরেই আছে।

ছয় মাস পরে আবার অরুণার সঙ্গে দেখা। তপ-ক্লিষ্টা গৌরীর মত দেহ তার শীর্ণ, প্রভাময়, যুঁই ফুলের মত একটি শুভ্রতা তার মুখে, চোখে সেই রাত্রির সেই শুকতারার দীপ্তি। আমাকে দেখে কেমন এক রকম হেসে বলল,—দূত অবধ্য, যা বলতে হবে নির্ভয়ে বলতে পার।

বললাম, বিয়ে করছ না কেন?

খুব মৃদু কণ্ঠে সে বলল, হিন্দুর মেয়ের ক'বার বিয়ে হয়?

আমি নিজেকে শক্ত করে বললাম, না—না, বিয়ে কর, মা-বাপের মনে কষ্ট দিও না—

সে আমার মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, যেন সে ছুরি দিয়ে চিরে চিরে আমার মনটাকে দেখতে লাগল, শেষে বলল, আমি বিয়ে করলে তুমি খুসী হও?

আমি ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

দৃঢ় কণ্ঠে সে বলল, বেশ বাবাকে বল গে, আমি বিয়ে করব।

কাকাবাবুকে বললাম—অরুণার মত হয়েছে—তিনি ভুরি ভুরি আশীর্ব্বাদ করলেন, বললেন, আর একটি কাজ তোমাকে করতে হবে বাবা! কি দরকার পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে; আমি কিছু টাকাকড়ি দিচ্ছি, কল্‌কাতা গিয়ে চাকরী-বাকরীর চেষ্টা কর গে। আমি বললাম, আপনি আদেশ করলে, তাই যাব।—কাকাবাবু যে একদিন আশ্রয় ও আহার দিয়ে বাঁচিয়ে ছিলেন তা' আমি ভুলব কি করে?

কাকাবাবু আমার হাত ধরে মিনতির সহিত বললেন, তোমাকে কিন্তু বাবা, আমায় ছুঁয়ে একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে।—বিস্মিত নয়নে তাঁর মুখের পানে তাকালাম—আর কি চান আমার কাছে? মুখে বললাম,—কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন?

—বেশী কিছু নয়, শুধু এই। এ দিকে কখনও আসবে না, আমার অনুমতি ছাড়া অরুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না।

তাঁর পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম। সেই দিন রাত্রেই চলে এলাম; তারপর পেলাম আপনার কাছে আশ্রয়, পেলাম অজস্র স্নেহ; আবার পথে নামতে হবে, কিন্তু আমার পাথেয় এবার অফুরন্ত।"

বিজলী নিঃশব্দে এই কাহিনী শুনিতেছিল। কহিল, "সে মেয়েটীর বিয়ে হয়ে গেছে?"

মুখ নীচু করিয়া বিমল কহিল, "জানিনে দিদি!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিজলী কহিল, "হয়তো বিয়ে হয়ে গেছে এবং কোন দিক্ দিয়ে কোন বিঘ্ন হয় নি। তোমার কথা হয়তো এতদিন সে ভুলতে পেরেছে, অন্ততঃ ভোলবার চেষ্টা করছে। ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে কোনদিন দেখা হলে, সে যদি তোমাকে চিনতে না পারে, তাতে আশ্চর্য্য হয়ো না বিমল!"

বিমল কিছুই বলিল না, বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিজলী বলিল, "দেহের ক্ষতের মত মনের ক্ষত মিলিয়ে যেতে দেরী করে না, হয়তো একটু দাগ থাকে, কিন্তু তার সর্ব্বোচ্চ দাম একটা হাল্‌কা নিঃশ্বাসের বেশী নয়।"

বিমল তেমই বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিজলী বলিতে লাগিল, "যা' হারিয়ে গেছে তার জন্য হা-হুতাশ করে লাভ নেই। জীবনে যা' আসবার সম্ভাবনা তারই কামনায় করতে হবে একনিষ্ঠ তপস্যা—যেমন বৈশাখের নদী সারা বুকে আগুন জ্বালিয়ে কামনা করে শ্রাবণের বন্যা—শীতের রিক্ত-পত্র গাছ আকাশের দিকে সহস্র বাহু মেলে প্রার্থনা করে সবুজ যৌবন—"

বিমল প্রশ্ন-সঙ্কুল চক্ষে বিজলীর দিকে তাকাইল।

বিজলী কহিল, "আপাততঃ আমাদের মনে হচ্ছে, জীবন আমাদের ব্যর্থ হয়ে গেছে, কিন্তু হয় তো তা' হয় নি। হয় তো, সম্মুখের সুদূর-প্রসারী যাত্রাপথে কোথাও

না কোথাও আমাদের জীবনের অর্থ পড়ে আছে, পথ চলতে চলতে তাকে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।"

সুবিমল বাধা দিয়া কহিল, "দিদি! জামাই-বাবুর জন্যে কি আপনার মন কেমন করছে?"

বিজলী বিস্ময়ের সহিত কহিল, "হঠাৎ এ প্রশ্নের হেতু?"

সুবিমল একটু হাসিয়া কহিল, "আমার তাই মনে হচ্ছে। মোহের মাত্রাধিক্য ঘটলেই লোকে 'মোহ-মুদ্গর' আওড়ায়। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনারও তাই ঘটেছে, অর্থাৎ আপনি যা বলছেন, তা' যেন আপনার নিজের মনকেই বোঝাবার জন্যে বলছেন। আপনার মন যেন শ্রান্ত বলদের মত ঘরপানে পাড়ু হাটতে চাইছে, আপনি তার লেজ মুচড়ে মুচড়ে তাকে আগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন—"

বিজলী গম্ভীর ভাবে কহিল, "তুমি কি বলতে চাও?"

হাসিয়া সুবিমল কহিল, "আমি বলতে চাই, আপনার যদি জামাই বাবুর কাছে ফিরে যাবার ইচ্ছা হয়, আপনার ছোট ভাইকে একবার আদেশ করুন, সে আপনাকে মাথায় করে সেখানে পৌঁছে দেবে।"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া বিজলী কহিল, "তোমার সদিচ্ছার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, ভাই! কিন্তু তোমার জামাই বাবু যখন আমার সতীত্ব প্রমাণ করবার জন্য সাক্ষী-সাবুদ তলব করবেন, তখন? মা বসুমতীর কোলে মুখ লুকিয়ে জানকী নারীত্বের সেই হীনতম অপমান থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার মরণ ছাড়া নিষ্কৃতির কোন উপায় থাকবে না।"

বিমল লজ্জিত ভাবে কহিল, "দিদি! আমাকে মাপ করুন, আমি এতখানি ভেবে দেখিনি—"

বিজলী তিক্ত হাসি হাসিয়া কহিল, "একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য যে একদিন আমার কাছে দাঁড়িয়েছে, তারই কাছে যাব ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বলা যায় না, হয় তো কোনদিন এমন দুর্ম্মতি হতে পারে, কিন্তু তার আগেই আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাব।"

বিমল প্রশ্ন করিল, "চলে যাবেন? কোথায়?"

—"যে দেশে সামাজিক পরিচয় ছাড়াও মানুষ সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, সেই দেশে—"

—"সে দেশ কি কোথাও আছে দিদি?"

—"হয়তো আছে, হয়তো নেই। যদি থাকে সেই-খানে পাব আশ্রয়, যদি না থাকে, সাগরের অতল শয্যা তো কেউ আমার কেড়ে নিচ্ছে না, ভাই!"

দুই জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বিজলী কহিল, "বিমল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?"

বিমল কহিল, "না, দিদি! আর আপনার বোঝা হতে চাইনে। অনেক দুঃখ আমার জন্যে আপনি পেয়েছেন; এর পর আপনি ভারমুক্ত হোন। আমার মত হতভাগ্যকে আপনি ছোট ভাই-এর গৌরব দিয়েছেন, এ দয়া আমি জীবনে ভুলব না, দিদি। আশীর্ব্বাদ করুন, জীবনে এর অমর্য্যাদা কোন দিন যেন না করি; আর আমি কিছু চাইনে দিদি।"

[১০]

দিন কয়েক পরে। বেলা চারিটা। বিজলী তাহার ঘরে জানালার কাছে একটা ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ-শায়িত। হাতে একখানা মাসিকপত্র, কিন্তু সে তাহা পড়িতেছে না; জানালার ফাঁক দিয়া এক টুকরা নীল আকাশ দেখা যাইতেছে, তাহারই দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সে দিন যখন সে বিমলকে বিদেশ-যাত্রার সঙ্কল্পের কথা বলিয়াছিল, তখন তাহার মনের মধ্যে আবেগের উত্তপ্ত বাষ্প ছিল, কিন্তু চিন্তার শীতল কঠিনতা ছিল না। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে কথা বলা হইয়া গেল, তাহার পর হইতেই তাহার মনের মধ্যে মুক্তির হাওয়া বহিতে লাগিল। চারি-দিকের কঠিন দেওয়াল-ঘেরা সঙ্কীর্ণতার মধ্যে তাহার শ্বাস যখন বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সে যেন একটি গবাক্ষের সন্ধান পাইল, যাহার ভিতর দিয়া কোন রকমে মাথা গলাইয়া পার হইতে পারিলে বাহিরে অবাধ, নির্ম্মল বাতাসে সে নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিবে।

বিজলী স্থির করিয়াছে, সে তাহার বাড়ী, গাড়ী এবং নিজের বলিতে যাহা কিছু আছে, সব স্বামীর কাছে

বিক্রয় করিয়া বিদেশে যাইবার অর্থ সংগ্রহ করিবে। স্বামীর কাছে বিক্রয় করিবার কারণ এই যে, তাহার জিনিস তাহার স্বামী ও ছেলে মেয়ে ছাড়া আর কেহ ব্যবহার করিবে, তাহা সে সহ্য করিতে পারিবে না। এই সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা বলিবার জন্য তাহাকে একদিন স্বামীর সহিত দেখা করিতে এবং আরও অনেক কিছু করিতে হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সে কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার সারা সময় এই জানালার কাছে বসিয়া, শুধু নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া, স্বপ্ন দেখিয়া কাটিয়াছে। মুক্ত জীবনের স্বপ্ন, অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। কত সাগর, কত দেশ, কত নদী, বন, গিরি, প্রান্তর, পার হইয়া তাহার মন উড়িয়া গিয়াছে কোন এক অজ্ঞাত তুষারের দেশে, যেখানে সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, বাহিরের বিরোধ তাহার মনুষ্যত্বকে প্রতি মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত করিতে চাহিবে না।

হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করিয়া টেলিফোনে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বিজলী উঠিয়া টেলিফোন ধরিতেই মোটা পুরুষের গলা প্রশ্ন করিল, "কে, বিজলী দেবী ?"

—"হ্যাঁ"

—"আমি ডাক্তার বিজন—"

বিজলী কাঁপা গলায় কহিল, "বুঝেছি, কি দরকার ?"

ডাক্তার কহিল, "ভারি বিপদে পড়েছি, দয়া করে এখানে একবার আসতে হবে—"

বিজলী প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

—"ক্ষণুর খুব জ্বর; হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল; সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন, অথচ সে ভারী কান্নাকাটি করছে, তার মা-এর জন্য; কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছে না। তুমি যদি একটীবার এস তো খুব ভাল হয়। বেশীক্ষণ ধরে রাখব না, মেয়েটা একটু শান্ত হলেই চলে যেতে পারবে—"

বিজলী কহিল, "আমি যাচ্ছি এখনই—"

তাড়াতাড়ি সুবিমলের ঘরে গিয়া বিজলী কহিল, "ভাই, বিমল! তোমাকে একবার আমার সঙ্গে ও বাড়ী যেতে হবে—"

বিমল আশ্চর্য্য হইয়া, তাহার পানে তাকাইয়া কহিল, "কেন দিদি ?"

বিজলী কহিল, "আমার মেয়ে—ক্ষণুর ভারী জর—আমার জন্যে কান্না-কাটি কচ্ছে—কেউ থামাতে পারছে না—আমাকে উনি ডেকে পাঠিয়েছেন—"

মেয়ের শক্ত অসুখ শুনিয়াও বিজলীর মনের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আনন্দের সুর বাজিতে লাগিল। সে মনে মনে কেবলই বলিতে লাগিল, 'আমার মেয়ে আমার জন্যে কাঁদিতেছে, আমি ছাড়া কাহারও সাধ্য নাই, তাহাকে শান্ত করে—'

বাড়ীতে পৌছিয়া বিজলী বিমলকে বসিবার ঘরে বসিতে বলিল। তারপর বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দোতলায় যাইবার সিঁড়ির মুখেই তাহার দেখা হইল, সৌদামিনীর সঙ্গে। সৌদামিনী নীচে নামিয়া আসিতেছিল; বিজলীকে দেখিয়াই মুখ ঘুরাইয়া লইয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, বিজলী একটু হাসিয়া কহিল, "সদু মাসী, চিনতে পারছ না, না কি ?" সৌদামিনী জবাব দিল না; টর টর্ করিয়া কতকটা আগাইয়া গেল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চিনবার কি উপায় রেখেছ, বৌমা! ঘরে বাইরে যে চোখে আগুন ধরিয়ে দিয়েছ! আমার বিজনের মত ছেলেকে ফেলে দিয়ে না কি কোথাকার কে বাউণ্ডুলে—"

বিজলী বাধা দিয়া কহিল, "মিথ্যে কথা, মাসী! শত্রুতা করে সবাই নিন্দে রটিয়েছে—"

সৌদামিনীর কণ্ঠের দাহ এক মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া গেল; স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "মিথ্যে কথা! তাই বল মা! তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক্—" বিজলীর চিবুক ধরিয়া, তাই তো বলি, আমার রাজলক্ষ্মীর মত বৌ, এমন অলক্ষ্মীর কাজ করবে! কখনও আমি বিশ্বেস করিনি, মা! বিজনও করেনি—এমন শত্রুতা তো কখনও দেখিনি! এ কী সব কথা বলা! জিব্ তাদের খসে যায় না কেন ?" বিজলী শত্রুদের জিহ্বাচ্যুতি না হওয়ার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। সৌদামিনী কণ্ঠ মৃদু করিয়া কহিল, "আমি তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড় বৌমা! এতটুকু থেকে বিজনকে মানুষ করেছি, আমার একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে, আমি হাতে ধরে বলছি মা!"

বিজলী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কি বল ?"

সৌদামিনী কহিল, "বল রাখবে ?"

"কি কথা না জানলে কি করে কথা দেব, মাসী !"

সৌদামিনী কহিল, "বিজন বলছিল, তুমি না কি তার ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেছ—বিজন ছেলেমানুষ মা, ছোট থেকে ভারি ভোলা—কাকে কি যে বলে, কি যে করে, কিছু ওর ঠিক থাকে না—ও যদি কিছু অন্যায় করেই থাকে তো ইচ্ছে করে করে নি—ওকে মাপ তুমি কর, মা! লঘু পাপে গুরু দণ্ড দিয়ে এ সংসারকে তুমি ভাসিয়ে দিও না।—"

বিজলী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমাদের সংসারে আমার যে আর জায়গা নেই, মাসী ! তোমরা যে আবার নূতন লক্ষ্মী আমদানী করছ শুনেছি—"

—"ছি ! মা! ও কথা বল না! তোমার সিংহাসন তেমনই খালি আছে, কারও সাধ্য নেই সেখানে বসে। এই যে কণু কাল হতে তোমার জন্যে কান্নাকাটি করছে, কেউ কি থামাতে পেরেছে ? তা' হয় না মা ! তা হয় না ! এক গাছের ছাল কি আর এক গাছে জোড়া লাগে ? পাখী উড়ে যায়, বাসা তারই পথ চেয়ে থাকে। তোমার সংসার তোমারই আছে মা! আশীর্বাদ করি জন্ম জন্ম এই সংসারে তুমি লক্ষ্মী হয়ে থাক—"

ভাবাবেগে সৌদামিনীর চোখে জল আসিল, চোখ মুছিয়া কহিল, "যাও মা ! আর দাঁড়িয়ে থেক না, বিজন ভারি অস্থির হয়েছে তোমার জন্যে—"

শয়নকক্ষের দরজার কাছে আসিয়া বিজলী দাঁড়াইল। ভিতর হইতে কণুর কান্নাভরা স্বর শোনা যাইতেছে, সে বলিতেছে, "কই, বাবা, মা-মণি তো এখনও এল না ?"

বিজন কহিতেছে, "এখনই আসবেন, মা—"

—"না—কই আসছে ? আমাকে তুমি মা-এর কাছে নিয়ে চল, বাবা !" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "না —আমি কিছুতেই খাব না, মা-মণি এলে খাব—আপনি দেখুন না মাসী মা ! মা কতদূরে আসছে—"

আবার চুপ·· তারপর কহিল, "মা-মণি আমার ওপর রাগ করেছে, আমি কাছে যাই নি বলে -তাই হয় তো আসছে না বাবা ! আবার ডাক না !"

বিজন কহিল, "তোমার সঙ্গে তোমার মার কবে দেখা হল, মা ?"

—"সে দিন, কাকীমার ওখানে—আমাকে ডাকলে, আমি গেলাম না—তারপর যখন গেলাম, তখন মা চলে গেছে—মা-এর জন্যে আমার ভারি মন কেমন করছে বাবা ! -"

বিজলী ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। শয্যার উপর কণুর পাশে বিজন দরজার দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া আছে ; জানালার কাছে বাহিরের দিকে তাকাইয়া মিস্ মুখার্জ্জী দাঁড়াইয়া আছে ; কাজেই কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিল না। বিজলী শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই কণু তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এই যে মা-মণি এসেছে—মা-মা তুমি আমার কাছে এস—" বলিয়া দুই হাত প্রসারিত করিল।

বিজন মুখ ফিরাইয়া বিজলীকে দেখিয়া আনন্দোজ্জ্বল মুখে কহিল, "এসেছ !"—বিছানা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তোমার যায়গায় বস, ওখানে আমাদের কারও বসবার সাধ্য নেই, প্রমাণ হয়ে গেছে—"

বিজলী কিছু না বলিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিতেই কণু কহিল, "মা, আমি তোমার কোলে মাথা দেব—"

বিজলী সরিয়া বসিয়া কণুর মাথাটি কোলে তুলিয়া স্নেহ-কোমল হস্তে তাহার রুক্ষ কোঁকড়ান চুলগুলি নাড়িতে লাগিল।

কণু বলিল, "মা, তোমার মুখটি আমার কাছে আন—" আনিতেই কণু তাহার অনতপ্ত কুসুম পেলব ওষ্ঠ দুটি মায়ের অধরোষ্ঠে স্পর্শ করাইয়া কহিল, "মা—আমি কখনও তোমার অবাধ্য হব না—তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না বল "!

বিজলী তাহার মুখে, কপালে, গালে, হাত বুলাইতে বুলাইতে ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কোথাও যাব না, মা ! তুমি ঘুমাও—" কণু মাতৃক্রোড়ের পরম প্রশান্তির মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বিজন তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল ; মিস মুখার্জ্জী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কণুর মাথাটী সন্তর্পণে বালিশে

নামাইয়া দিয়া বিজলী বিজনকে কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস—"

বিজন অস্ফুট কণ্ঠে "বসছি" বলিয়া পাশেই একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

বিজলী কহিল, "ক্ষণুর কবে থেকে জ্বর হয়েছে?"

বিজন উত্তর দিল, "সাতদিন—তোমার সঙ্গে ওর দেখা হবার পরদিন থেকেই—"

—"মনুকে দেখছি নে?"

"কোথায় আছে—আসবে এখনই—"

—"মিস মুখার্জ্জী কোথায় গেলেন?"

—"কি জানি···"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া বিজলী কহিল, "উনিই তো তোমার ভাবী সহধর্ম্মিণী—"

বিজন কহিল, "ছি! ও কথা বল না, বিজলী! মিস্ মুখার্জ্জী আমার ছোট বোনের মত—"

দুইজন চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে বিজন কহিল, "কার সঙ্গে এলে?"

—"সুবিমল বাবুর সঙ্গে—"

নীরস স্বরে বিজন কহিল। "ও: যাঁর সঙ্গে তোমার—"

বাধা দিয়া বিজলী কহিল, "বাজে কথা বল না! বিমল আমার ছোট ভাইয়ের চেয়ে বেশী।"

আবার দুইজনেই নিস্তব্ধ! এমন সময়ে মনু আসিয়া বিজনের পাশে দাঁড়াইল। তাহার দিকে তাকাইয়া বিজলী কহিল, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ? ছোট বোনটার জ্বর হয়েছে, কাছে থাকিস্‌নে?"

মনুর হইয়া বিজন কহিল, "না—ও থাকে তো! দিনরাত বোনটির কাছে বসে থাকে—তুমি আস্‌ছ শুনে পালিয়েছিল—"

মনু বিজনের পিঠে মুখ লুকাইল।

বিজলী ম্লান হাসিয়া কহিল, "আমি আসব বলে পালিয়েছিলি! হ্যাঁ রে মনু! আয়, আমার কাছে আয়—" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল। মনু কাছে আসিয়া বসিয়া বিজলীর কোলে মুখ লুকাইল। বিজলী দুই হাতে তার মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে প্রাণপণে মুখ চাপিয়া রাখিল। বিজলী কহিল, "আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস—একবারও মন কেমন করে না, না?" মনু "হ্যাঁ"সূচক ঘাড় নাড়িল। হাসিয়া বিজলী কহিল, "কি বলছিস? ভুলে গেছিস—না,—মন কেমন করে—ভাল করে বল।" মনু তেমনি মুখ লুকাইয়া রহিল।

বিজন কহিল, "মনু, তোর মাসীমাকে একবার ডেকে আন তো?"

বলিতেই মনু উঠিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিজন কহিল, "কখন ফিরবে?"

বিজলী আনত-মুখে ক্ষণুর মুদ্রিত কমল-কোরকের মত মুখখানিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "তুমি যখন ফিরতে বলবে।"

বিজন খুব কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "সত্যি বলছ, বিজু! তা' হলে তো তোমার ইহকালে ফেরা ঘটবে বলে মনে হচ্ছে না—"

বিজলী মুখ তুলিয়া দুই চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বিজনের দুই চক্ষের উপরে স্থাপিত করিয়া কহিল, "আমি তো ফিরতে চাই নে—"

দৃঢ়মুষ্টিতে বিজলীর দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বিজন কহিল, "আমার বিশ্বাস হচ্ছে না. বিজলী! তুমি সত্যি বলছ?"

বিজলী কহিল. "হ্যাঁ, আমি সত্যি বলছি—ফিরে যেতে আমি চাইনে। এখান থেকে বাইরে গিয়ে অবধি আমি বুঝেছি ক্ষণু-মনু সোনার শেকল দিয়ে আমাকে এমনি করে বেঁধেছে যে তা' ছিঁড়ে চলে যাবার সাধ্য আমার নেই।"

দুই চোখে মিনতি ভরিয়া বিজন কহিল, "ক্ষণু-মনুর জন্যেই থাকতে চাও? আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন নেই?—"

বিজলী নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "তোমাকেও আমার একান্ত প্রয়োজন—প্রাণ-বায়ুর মত তুমি আমার জীবনে সহজ হয়ে ছিলে, তাই কোন দিন তোমার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারিনি। তারপর, যেমনই তুমি আমার কাছ থেকে সরে গেলে, আমার চারিপাশে মরণময় শূন্যতা ছাড়া আর কিছু রইল না, সেই মুহূর্তে সমস্ত চেতনা দিয়ে বুঝতে পারলুম, তোমাকে আমার

কতখানি প্রয়োজন, বুঝলুম—” আনত মুখখানি বিজনের প্রসারিত দুই করতলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “তোমাকে ছেড়ে যাওয়াও আমার সাধ্য নয়।”

বিজলীর মস্তকে চুম্বন করিয়া বিজন কহিল, “তোমাকে ছেড়ে আমিও বাঁচতে পারব না, বিজু! মরে যেতুম, স্বপ্ন ভগবান আমার অদৃষ্টে স্বর্গ-সুখ লিখে রেখেছিলেন, তাই বেঁচে গেছি—” একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “জানি আমি তোমার যোগ্য নই—তোমার উচিত মূল্য দেবার আমার সামর্থ্য নেই—তবু—আমার অক্ষমতার ত্রুটি তুমি ক্ষমা ক’রো।”

বিজলী মুখ তুলিয়া কহিল, “ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলে আমার অপরাধ বাড়িও না। আমিই তোমার যোগ্য নই। তবু তোমাকে আমি বিনা সাধনায় পেয়েছিলুম বলে, তোমার মর্য্যাদা কোনদিন বুঝিনি। কিন্তু আজ অনেক দুঃখ, অনেক গ্লানির ভিতর দিয়ে তোমাকে নূতন করে অর্জ্জন করলুম—আর আমার কোন দিন ভুল হবে না।” তারপর, বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া স্বামীর চরণে প্রণতা হইয়া কহিল, “তোমাকে আমি অনেক অপমান করেছি, অনেক দুঃখ দিয়েছি, দুর্ব্বিনীতার সব অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।”

ঠিক এই সময়ে হরিচরণ ভগ্নদূতের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া প্রথমে ‘হুঁ’ করিল এবং তারপর একগাল হাসিয়া কহিল, “এজ্ঞে জামাইবাবু! এজ্ঞে দিদিমণি!”

বিজন মুখ তুলিয়া চাহিয়া, হাসিয়া কহিল, “এই যে হরিচরণ! এ সময় কোথা থেকে?”

বিজলী হরিচরণের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরিচরণ বিছানার অন্যপার্শ্বে আসিয়া বিজলীর মুখোমুখি দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা শালপাতার ঠোঙ্গা—তাহা খুলিয়া প্রসারিত করিয়া কহিল, “এজ্ঞে, মা’য়ের পেসাদী ফুল—ক্ষণু মাসীর জন্যে—” বলিয়া ফুলটি ক্ষণুর মাথায় ঠেকাইয়া দিল। তারপর, বিজলীর দিকে চাহিয়া বোকার মত হাসিতে হাসিতে কহিল, “এজ্ঞে, তোমার জন্যেও মানৎ করেছি, দিদিমণি! যে—দিদির আমাদের—এজ্ঞে, সুমতি হোক্—জোড়া পাঁঠা, এজ্ঞে, বলি দেব—তো মা আমার, এজ্ঞে, মা’র না আমাকে আগেই বাসনা পূর্ন করেছেন—” বলিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

বিজলী বিজনকে কহিল, “হরি দা’ এখানেই রয়েছে বুঝি?”

বিজন হাসিয়া কহিল, “হাঁ, ও তো এখানেই আছে, যে দিন হতে ক্ষণুর অসুখ সেই দিন হতেই—তুমি জানতে না?”

বিজলী কহিল, “ও কী আমাকে কিছু বলে, না আমাকে খাতির করে? আমি কে না কে—”

হরিচরণ কহিল, “এজ্ঞে, আমাকে তুমি ধমকাও, দিদিমণি! গাল দাও, এজ্ঞে, কান মলে দাও, কিছুটি আমি বলব না—তোমাদের যুগল মিলন দেখে আমার জীবন, এজ্ঞে, সার্থক হয়ে গেছে, দিদিমণি—”

বিজলী ধমক দিয়া কহিল, “কি যা’ তা’ বকছ—”

—“এজ্ঞে, সত্যি দিদিমণি! মা’য়ের ফুল ছুঁয়ে বলছি” —বলিয়া ঠোঙ্গাটি চাপিয়া ধরিল। বিজনের দিকে চাহিয়া কহিল, “জোড়া পাঁঠার দাম—এজ্ঞে—জামাই-বাবুকে দিতে হবে—এজ্ঞে বলে রাখছি—”বলিয়া চলিয়া গেল।

এমন সময়ে মণ্টু আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বিজন কহিল, “তোর মামীমাকে ডাকলিনে?”

মণ্টু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কহিল, “কি করে ডাকব, মামীমা একজন লোকের কোলে মুখ লুকিয়ে বসে আছেন।”

বিজন ও বিজলী দুই জনেই বিস্ময়ের স্বরে কহিল, “সে কী! তুই এখানে বোস দিকি, আমরা কি হয়েছে দেখে আসি—”

বসিবার ঘরে আসিয়া তাহারা দেখিল, মণ্টু যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে।

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের মধ্যে মিস মুখার্জ্জী জানু পাতিয়া, সুবিমলের কোলে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছে, সুবিমল আনত মুখে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছে। তাহারা নিশ্চয়ই সম্প্রতি মাটীর পৃথিবী হইতে বহু ঊর্দ্ধে দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্রালোকে অবস্থান করিতেছে, নহিলে, বিজন ও বিজলী ঘরে প্রবেশ করিলেও তাহারা জানিতে পারিল না কেন?

বিজন কহিল, "মিস মুখার্জ্জী, এ কী ?"

বিজলী কহিল, "সুবিমল, এ কী ?"

নক্ষত্রলোক হইতে পতন ঘটিল। মিস মুখার্জ্জী তড়িৎস্পৃষ্টের মত লাফাইয়া উঠিয়া পিছন ফিরিয়া লজ্জা-রাঙা মুখখানি ইহাদের দৃষ্টির অগোচর করিল। সুবিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া লজ্জিত মুখে বিজলীর দিকে চাহিয়া কহিল, "ও অরুণা—"

বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে বিজলী কহিল, "কে ?"

সুবিমল মুখ নত করিয়া স্পষ্ট স্বরে কহিল, "অরুণা, যার কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিজলী কহিল, "মিস্ মুখার্জ্জীই তোমার অরুণা! ছিঃ ছিঃ! এ কথা আগে বলনি কেন ?" তারপর মিস্ মুখার্জ্জীর সামনে গিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "ভাই অরুণা! তোমার উপরে আমি অনেক অন্যায় করেছি, তুমি আমাকে মাপ কর।" অরুণা বিজলীর পায়ে প্রণতা হইয়া কহিল, "দিদি! তোমার উপরেই আমি অন্যায় করেছি, ছোটবোনকে তুমি ক্ষমা কর।"

বিজলী তাহাকে দুই হাত দিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, "মনে থাকে যেন বোন! আমি তোমার দিদি! আমার কাছে তোমার লজ্জা করতে নেই—" বিমলের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আমি ছোট বোন পেয়েছি, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ফারখৎ—"মুচ্‌কি হাসিয়া, "অবশ্যি যতদিন না নূতন সম্বন্ধটার গিঁট বাধা হয়—প

বিমল ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "জীবনে আমার এক মাত্র সম্বল এত সহজে ছেঁটে দেবেন না দিদি! তা' হলে আমার উপায় কি হবে ?"

বিজন আগাইয়া আসিয়া কহিল, "কোন ভয় নেই ভাই! যাক্ গে তোমার দিদির স্নেহের মুষ্টি-ভিক্ষা, আমি তোমাকে দাদার স্নেহ-ভাণ্ডার খুলে দেব"—বলিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।

সুবিমল বিজনকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমি ধন্য হলাম—দাদা।"

ভাবাবেশ কাটিয়া আসিলে বিজনই প্রথমে কথা কহিল, "কি ব্যাপার আমাকে সব খুলে বল দেখি।

বিজলী কহিল, "বলছি, কিন্তু এখন এবং এখানে নয়। ক্ষণু একা ঘুমুচ্ছে—চল সবাই উপরে গিয়ে বসি।"

* * * *

বিজলী সুবিমলের কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সব বিজনকে বলিয়া, শেষে কহিল, "এখন কি করে এদের মিলিয়ে দেওয়া যায় বল দেখি ?"

বিজন কহিল, "তার জন্যে আর চিন্তা কি ? ওদের এখানে বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাক্। তারপর। বুড়োকে একটা টেলিগ্রাম করে দেব—'অরুণা—এখানে—নিয়ে যান' বুড়ো এসে যখন দেখবে বিয়ে হয়ে গেছে—তখন আর মেয়ে-জামাইকে ফেলতে পারবে না।"

—"বিমল তাতে রাজী হবে না।"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া বিজন কহিল, "রাজী হবে না কেন ? ও তো ভীষ্মদেব নয় ?"

বিজলী কহিল, "বেশ, তুমি ওকে বলে দেখ।"

বিমল ও অরুণা ক্ষণুর ঘরে ছিল। তাহাদিগকে বিজলী ডাকিয়া আনিল। বিজন কহিল, "তোমাদের যদি আমরা এখানে বিয়ে দি, তোমাদের আপত্তি আছে ?"

অরুণা মুখ নত করিল; সুবিমল কহিল, "কাকাবাবুর মত না হলে বিয়ে হতে পারে না।"

বিজন কহিল, "আরে, বিয়ে করে দেখ না, মত হয় কি না।" সুবিমল শুধু ঘাড় নাড়িল।

বিজন কহিল, "কখন একটা প্রতিজ্ঞা করেছ, তাই সারা জীবন মেনে চলেতে হবে না কি! প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাই তো সভ্য মানুষের লক্ষণ! মানুষ যখন এক মুহূর্ত্তের প্রতিশ্রুতি পর মুহূর্ত্তে ভাঙ্গতে পারবে, তখনই তার সভ্যতার চরম বিকাশ হবে।"

বিমল হাসিয়া কহিল, "তা' হোক, দাদা! কিন্তু কাকাবাবু মত না দিলে অরুণাকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" অরুণা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "বাবার বোধ হয় অমত হবে না।"

বিজলী প্রশ্ন করিল, "কি করে জান্‌লে ?"

"আমি আসছি।" বলিয়া অরুণা বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা খবরের কাগজ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার একটা বিশেষ অংশ বিজলীকে দেখাইয়া কহিল, "দেখুন।" বিজলী মনে মনে পড়িয়া কহিল, "কোন চিন্তা নেই! তোমরা শোন, অরুণার বাবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন,—'মা অরুণা, ফিরে এস—তোমার যাকে ইচ্ছা বিয়ে কর—আমাদের আপত্তি নেই—" বিজন হাত বাড়াইয়া কহিল, "দাও তো, দেখি—"

দিন কয়েক পরে, ক্ষণু সারিয়া উঠিলে, বিজনের টেলি-গ্রাম পাইয়া অরুণার বাবা ও মা আসিয়া হাজির হইলেন। এবং আরও কিছু দিন পরে সুবিমলের সহিত অরুণার বিবাহ হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, বিবাহে মিসেস্ গাঙ্গুলী এবং নারীসমিতির অন্যান্য সভ্যারা নিমন্ত্রিতা ও ভুরি-ভোজনে আপ্যায়িতা হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত

হাসির গল্প

—শ্রীরাঘবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রিটায়ার্ড এ. এস. আই. ললিতবাবু আসতেই ছোট গদা চেঁচিয়ে উঠল—এই যে, আসুন ললিতবাবু, আসুন। ভাল করে এক কাপ ডবল-হাফ চা দিতে বল মাষ্টার।

ললিতবাবু কম্ফর্টার আর মঙ্কি ক্যাপ খুলে জুৎ করে বসে জিজ্ঞেস করলেন—তা'পর তোমাদের সব খবর কি?

ছোট গদা বলল—কৈ আর খবর। শীতে আর বাঁচতে দেবে না। এসেছেন যখন একটা হাসির গল্প বলুন—তবু গা'টা একটু গরম হবে।

বীরু পাশ থেকে ফোড়ন দিল—হ্যাঁ, খুব হিউমারাস করে বলবেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে ললিত বাবু বিড়ি ধরিয়েছিলেন। বীরুর কথা শুনে বিড়িটা নামিয়ে বললেন—দেখ, হাসির গল্পের কথা বল, তার মানে বুঝি। আবার ইংরাজি করে হিউমারাস বলা কেন? বাংলায় কি হিউমার আছে—হিউমার কথাটার বাংলা জান?

বীরু অপ্রতিভ হয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, ললিত বাবু বললেন—নেই। হিউমার-এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই—তার কারণ বাংলায় হিউমার নেই। হো হো করে হাসলেই হিউমার হয় না। হিউমার দেবতার শান্তি-জলের মত মাথা পেতে নিতে হয়। ছোট গদা বললে—এ আপনার অন্যায় কথা। আমরা কি হাসতে জানিনে বলতে চান?

ললিত বাবু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—খুব জান। কাতুকুতু দিলেই হেসে ঘর ফাটিয়ে চৌচির করে দেবে।

বীরু কি একটা বলবার জন্যে মুখ খুলতেই গিরীন দা' বললেন—যেতে দাও ও সব কথা। হিউমার মানে যাই হোক—এই ঠাণ্ডার দিনে একটা হাসির গল্প না বললে আপনাকে ছাড়া হবে না ললিতবাবু। তা আপনি রাগই করুন, আর যাই করুন।

আধশেষ বিড়িটা প্লেটের চায়ে নিবিয়ে ললিতবাবু বললেন—গল্প যদি শুনতে চাও—তা' না হয় একটা বলছি, সে জন্য কি!

আর এক কাপ চা হুকুম করে ললিতবাবু আরম্ভ করলেন।

দাক্ষিণাত্যে যাকে তোমরা নবোর দল বলে থাক ডেকান—সেখানে মহিলারোপা বলে একটা করদ রাজ্য অর্থাৎ নেটিভ ষ্টেট—

বীরু বাধা দিয়ে বলল—এ যে বিষ্ণুশর্মা সুরু করে দিলেন!

ধমক দিয়ে ললিতবাবু বললেন—থাম না হে ছোকরা! আগে বিষ্ণুশর্মার যুগের হিউমার আয়ত্ত করে নাও, তারপর আধুনিকের কথা হবে।

—হাঁ, যা বলছিলাম—রাজার তিন ছেলে। বড় ছেলে বক্তৃশক্তি: কি না তার রূপ, কি বা তার কথা। কারও বাড়ীর সামনে দিয়ে মোটর-বাইক করে গেলে, টায়ারের তলায় ছেঁড়া মণিহারের সন্ধান পাওয়া যেত। কলেজে পড়বার সময় ইন্টার-ইউনিভার্সিটি ডিবেট-এ পর পর চার বছর হয়েছিলেন ফার্স্ট; আর তাঁর কথা শুনলে লোকে পুত্র-শোক ভুলে গিয়ে হেসে ফেলত। যেমন বাঁশীর মত গলার আওয়াজ, তেমনি শান-দেওয়া ছুরীর মত কথা। সবাই বলত, হাঁ যুবরাজ বটে।

উদ্ভাবনীশক্তি দাদার ভাই। কিন্তু তার ছিল ধাঁধা-তৈরীর ঝোঁক। সারাদিন টেবিলের পাশে কপাল টিপে ধরে বসে আস্ত একটা পেন্সিল চিবিয়ে ফেলে ধাঁধা বেরুল—

রাঁধিতো খাই, খাইতো গিলিনে—.

কিংবা,

সুখখানি কাল করে শুয়েছিল ঘরে
ঘর থেকে আনি তাকে টেনে বের করে
ফোঁস ফোঁস যত দেখি তেজ তার মুখে
আপন বাসার পরে মরে মাথা ঠুকে।

এ ধরণের গোটাকতক তৈরী হলেই বাস,—চাকরকে ডেকে তখনই সহরের বড় দৈনিক কাগজে পাঠিয়ে দেওয়া হত। তা' বিকেলেই হোক আর রাত দুপুরেই হোক। কাগজেও সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের ছবি শুদ্ধ,—"মেজ রাজকুমারের অদ্ভুত উদ্ভাবনী-শক্তি" হেডলাইন দিয়ে ধাঁধাগুলো স্পেশাল এডিশন-এ

বেরিয়ে যেত। তলায় লেখা থাকত, "মহিলারোপ্যের অধিবাসিবৃন্দের বুদ্ধি-পরীক্ষার সুবর্ণ সুযোগ।"

আর ছোট রাজকুমার, অনেকশক্তি। রাজ্যের সবাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবত—তাইতো! এমন কি করে হয়! শীল্ড ফাইনাল ম্যাচ দেখেও তাঁর মুখ থেকে—বাঃ সেণ্টার-হাফটা তো বেশ খেলে—এর চেয়ে ভাল কথা কেউ কখন শোনেনি। রাজ-সভায় বড় বড় লোকের সঙ্গে 'এবারকার আউস ধানের সম্ভাবনা' কিংবা 'শীতটা বড় চেপে পড়েছে' ছাড়া আর কিছু বলতেন না। লোকের আর দোষ কি? এ শুনলে কার হাসি আসতে পারে?

একদিন রাজা অমরশক্তি তিন ছেলেকে খাস্‌-কামরায় ডেকে পাঠালেন।

পায়চারী করতে করতে বললেন—গৌড়রাজ্যের খবর এসেছে। সেখানকার রাজকন্যার এক অদ্ভুত অসুখ হয়েছে।

উগ্রশক্তি জিজ্ঞেস করলেন—কী অসুখ?

রাজা অন্যমনস্ক ভাবে ডান হাতের আঙুল দিয়ে দাড়ী আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন—বিলিতী অসুখ। গৌড়দেশ আমাদের এদিককার চেয়ে ঢের বেশী উন্নত—তাই সাহেব-ঘেঁসা। ওখানে আজকাল কারও দিশী অসুখ হয় না। রাজকুমারী সব সময়েই কী ভাবছেন—কথা বলেন না—হাসেন না। ডাক্তার, কবিরাজ, হবধৌতিক, ঝাড়-ফুঁক—সব হার মেনেছে। রাজকুমারীকে সিনেমায় লরেল-হার্ডির ছবি দেখানো হয়েছে, লর্ড টেনিসনএর টীমের বিপক্ষে অল ইণ্ডিয়া ইলেভন্‌সে-এর ব্যাটিং দেখান হয়েছে। এ ছাড়া গৌড়-সাহিত্যে যা কিছু হাসির বই লেখা হয়েছে—মায় পাঞ্চের 'চরিভাতি' পর্য্যন্ত তর্জ্জমা করে শুনিয়েও কোন ফল হয় নি। যার কমিক শুনে দেশ শুদ্ধু লোক হেসে গড়াগড়ি দেয়—সে পর্য্যন্ত রাজকন্যাকে একটু হাসাতে পারে নি। রাজা একমাত্র মেয়ের অবস্থা দেখে পাগলের মত হয়ে পড়েছেন। শেষ পর্য্যন্ত গৌড় গবর্ণমেণ্ট থেকে কমিউনিক্‌ বেরিয়েছে—এক মাসের মধ্যে যে রাজকন্যাকে হাসাতে পারবে—তার সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হবে।

বসুশক্তি বললেন—ও—ও।

উগ্রশক্তি বললেন—বেশ কথা।

অমরশক্তি বললেন—আহা বেচারি!

রাজা দাড়ী আঁচড়ান শেষ করে, আগায় বেশ একটি গেরো বেঁধে বললেন—আমার ইচ্ছে তোমরা ক'ভাই গৌড়ে গিয়ে রাজকন্যাকে হাসানর চেষ্টা কর। গৌড়-রাজকন্যা আমাদের ঘরে এলে এ রাজ্যের প্রেষ্টিজ বেড়ে যাবে। বিশেষ করে গৌড়ে আমাদের gun-salute নেই, এ বড়ই আফ্‌শোষের কথা।

বসুশক্তিকে বললেন—তোমার বাক্‌চাতুর্য্যের খ্যাতি আছে। আর উগ্রশক্তি—তুমি—তুমি হয় তো ধাঁধা তৈরি করে মানুষের মনের ধাঁধা খানিকটা বুঝতে পার। কিন্তু অনেকশক্তি—তোমায় কি বলব? ভগবান্‌ তোমার মঙ্গল করুন।

রাজা মনের আবেগে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ছোট ছেলের কোন গুণ নেই মনে হওয়ায় একেবারে আকুল হয়ে পড়লেন। দুঃখের বেগে আনমনে দাড়ীর গেরোটা খুলে ফেলায়—আবার দাড়ীতে জট পাকিয়ে গেল।

বাগানে বেতের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে বসুশক্তি বললেন—চেহারা প্লাস আর্ট—এ আমারই আছে। গৌড়-রাজকন্যা কেমন—কে জানে! বিয়ে করে আনব—এ দেশে আবার ভাল জর্জ্জেট শাড়ী পাওয়া যায় না।

উগ্রশক্তি বললেন—আমার সঙ্গে পেরে উঠবে না, বড় দা। আমার অ্যাপিল হচ্ছে ব্রেনএ। ধাঁধার উত্তর ভেবে বের করতে পারলেই রাজকন্যা একেবারে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠবেন।

অনেকশক্তি বললেন—আমি—

শুনে দু'ভাই এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন। উগ্রশক্তি বললেন—তুই জিজ্ঞেস্‌ করিস—গৌড়দেশে ক' ইঞ্চি বিষ্টি হয়।—তা হলেই রাজকুমারী হেসে ফেলবেন।

অনেকশক্তি ঘাড় নেড়ে বললেন—তা বলব না। আমি রাজকন্যাকে বলব—আমার রূপ নেই, গুণ নেই—কিন্তু বুকে আছে ভালবাসার সমুদ্র। রাজকন্যা যখন বুঝবেন—কত বড় জিনিষ তাঁকে আমি দিতে পারি—তখন অশ্রু সজল হাসি হেসে আমায় বিয়ে করতে চাইবেন। বুঝবেন—এ আমায় কথায় ভোলাতে চায় না—এর কাছে পাওয়া যাবে অবিনশ্বর প্রেম।

আবেগে অনেকশক্তির বাক্‌রোধ হয়ে এল।

সব কথা বসুশক্তির কাণে যায় নি। শেষের টুক্ শুনে বললেন—দূর—এতে আবার কেউ হাসে না কি?

এর পর কিছু দিন ধরে রিহার্স্যাল-এর পালা চলল। বসুশক্তি গম্ভীর-প্রকৃতির লোকেদের সামনে হাসির' গল্প করে নিজের হাসানর ক্ষমতার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিলেন। একদিন প্রধান মন্ত্রীকে বললেন—জানেন মন্ত্রী মশায়—বর্দ্ধমান ফেরৎ একজন লোকের কী হয়েছিল?

খানিকটা আগেই রাজার কাছে বকুনি খেয়ে মন্ত্রীর মেজাজ ভাল ছিল না। তবু রাজপুত্রের খাতিরে বললেন—কী?

—বর্দ্ধমানে সীতাভোগ খেয়ে লোকটির ভারী ভাল লেগেছিল। ইচ্ছে হল তৈরী করে আবার খায়। সে আর তার স্ত্রী সারা রাত ধরে সীতাভোগ তৈরী করল। সকালে উঠে দেখে কর্ম্মভোগ হয়েছে।

সে দিন মন্ত্রী যা হেসেছিলেন—সে রকম না কি চাকরী পাবার পর আর কখনও হাসেন নি।

উগ্রশক্তি সেনাপতিকে বললেন—বলুন তো,

> 'কখনো থাকি কাঁধে গায়ে, কখনো থাকি পাতা,
> ভোরে উঠে সব লোক খায় আমার মাথা।

সেনাপতি মাথা চুলকোতে আরম্ভ করতেই উগ্রশক্তি বললেন—পারলেন না তো—চাদর।

একটু হেসে সেনাপতি বললেন—তাই তো!

উগ্রশক্তি লাফিয়ে উঠে বললেন—হেসেছেন—তা হলে মার দিয়া কেল্লা।

অনেকশক্তি বেচারী—নিজের ঘরে এক বিজ্ঞাপনের মেম সাহেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে—শোবার আগে রোজ এক ঘণ্টা নানা সুরে, নানা ভঙ্গীতে বলতেন—আমার রূপ নেই—গুণ নেই। কিন্তু হৃদয়ে ভালবাসা আছে। সমুদ্রের মত গভীর সেই প্রেম। বল…

তারপর এক শুভদিনে তিন রাজকুমার কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে দেব-দেবী স্মরণ করে—গৌড়রাজ্যে যাত্রা করলেন।

ছোট গদা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—কিসে গেলেন তারা?

ললিত বাবু মুখ-ভঙ্গী করে বললেন—রিক্স করে। দেখ, গল্প শুনতে হলে একটু চুপ করে থাকতে হয়।

গিরীন দা' বললেন—আঃ, সত্যি তোমরা বড্ড ইয়ে হচ্ছ দিন দিন। আপনি বলে যান ললিত বাবু।

ললিত বাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে আরম্ভ করলেন—তিন রাজকুমার গৌড়রাজ্যের প্রাসাদে এসে দাঁড়ালেন, তখন বেলা দশটা।

বসুশক্তি আর উগ্রশক্তি দু'ভায়ের গায়ে জমকাল মখমলের পোষাক—গায়ের রংয়ের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে পোষাকের রং ঠিক করা হয়েছে। মাথায় সোণার কাজ করা পাগড়ী, তাতে ময়ূরের পালক লাগান। গৌড়রাজ্যের সভাসদরা চাপা গলায় বলাবলি করছিল—হাঁ, রাজপুত্তুর বটে।

আর অনেকশক্তি—সে বেচারীর পোষাকের টেষ্ট নেই। তার ওপর আবার plain living-এর theory কে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তাই পরণে মোটা খদ্দরের কাপড়, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, মাথায় গান্ধী ক্যাপ, পায়ে সস্তা স্যাণ্ডাল। সবাই ভাবছিল—এটা আবার কে?

গৌড়রাজ্যের অফিসিয়াল কমিউনিক তিন ভাইকে পড়ে শোনান হল। যিনি রাজকুমারী চিত্রলেখাকে হাসাতে পারবেন, তারই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকে সময় পাবেন পাঁচ মিনিট।

চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। ছুঁচ পড়লে শব্দ শোনা যায়। ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মেহগনি কাঠের বিরাট দরজা খুলে গেল। ঘরের মধ্যে রাজকুমারী সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন—বিষাদময়ী প্রতিমা।

বসুশক্তি গোঁফে চাড়া দিয়ে পাগড়ীটা ঠিক করে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সভাশুদ্ধ লোক বদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। পাঁচ মিনিট মনে হচ্ছিল যেন পাঁচ বছর। ঢং করে ঘণ্টা পড়ে গেল। বসুশক্তি বেরিয়ে এলেন মুখ নীচু করে। সকলের মুখে নিরাশার ভাব ফুটে উঠল। তবে কি রাজকন্যা আর হাসবেন না?

উগ্রশক্তিও ঠিক ঐ রকম করেই বেরিয়েই এলেন। সভার অর্দ্ধেক লোক আস্তে আস্তে উঠে গেল।

এবার অনেকশক্তির পালা। কি আশ্চর্য্য, অনেকশক্তি ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই খিল্‌খিল্ করে হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজা খুলে অনেকশক্তি বললেন—আপনারা সবাই দেখুন, রাজকন্যা হাসছেন।

সত্যিই রাজকন্যা হেসে একেবারে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। রব উঠল, অনেকশক্তি কী জয়—রাজ-জামাতা কী জয়।

গৌড়রাজ অনেকশক্তিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—বাবা, তুমি কি দেবতা! তা না হলে কেমন করে এ অসম্ভবকে সম্ভব করলে।

মুখ নীচু করে অনেকশক্তি সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে কাতুকুতু দিয়ে।

*　　*　　*

সবার হাসি থামলে ললিত বাবু বললেন—দেখলে তো। আগেই বলেছিলাম কাতুকুতু না দিলে তোমরা হাসবে না। আসি তা' হলে মাষ্টার, এক কাপ চা'য়ের দাম নাও—বাকী ক' কাপের দাম বীরু দেবে।

আলোচনা

মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব

শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া বৃষোৎসর্গ উপলক্ষে মহাভারতের বিরাটপর্ব্ব পাঠ করা হয়। কেন ইহা করা হয় তাহার অর্থ জানিতে হইলে, আমাদের ভূতশুদ্ধির বিষয় কিছু জানা আবশ্যক। তাহা না হইলে ইহার কারণ সম্যক্ উপলব্ধি করা যায় না। সেই কারণ ভূতশুদ্ধি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। ভূতশুদ্ধি দ্বিবিধ:—বাহ্যভূতশুদ্ধি ও অন্তর্ভূতশুদ্ধি। বাহ্যভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা যাউক। সাধককে প্রথমে অনন্ত সাগরমধ্যে এক ক্ষুদ্র দ্বীপের উপরে নিজেকে উপবিষ্ট চিন্তা করিতে হয়। এই দ্বীপে একটি বৃক্ষ থাকিবে; বৃক্ষটি হইতেছে কল্পবৃক্ষ বা কল্পতরু। এই কল্পতরুর মূলে সাধক নিজের আসন পাতিয়া লইবেন। বৃক্ষটি পুষ্প-ফলভারাক্রান্ত হইবে। পুষ্পগুলি নানা বর্ণ ও বিভিন্ন গন্ধবিশিষ্ট হইবে; যেমন যুঁই, মল্লিকা, কদম্ব, বেলি ইত্যাদি। ফলগুলিও বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন স্বাদের হইবে, যেমন তিক্ত, কষায়, মিষ্ট ইত্যাদি (উদাহরণস্বরূপ, নিম, জাম আম, কাঁটাল) ইত্যাদি। ঐ বৃক্ষে নানা বর্ণের পক্ষী বসিয়া মনের আনন্দে নানা সুরে হ্রীঁ বীজ গাহিতে থাকিবে। সাধক কল্পনায় পুষ্পের গন্ধ ও বর্ণ অনুভব করিবেন, সেইরূপ ফলের বর্ণ ও স্বাদ গ্রহণ করিবেন, তবেই ক্রিয়া সহজে ফলপ্রদ হইবে।

অনন্তর সাধক চক্ষু নিমীলিত করিয়া নিজের ইষ্ট দেব-দেবীর চিন্তা করিতে থাকিবেন। তৎপর তাঁহার মনে হইবে যে, সত্যই উত্তাল তরঙ্গমালাদ্বারা তাঁহার দ্বীপটী আলোড়িত হইতেছে ও সেই আলোড়নের ফলে তাঁহার কল্পিত বৃক্ষটীও পুষ্প, ফল ও পক্ষিগণ সহ আস্তে আস্তে সাগরজলে একেবারে ডুবিয়া যাইতেছে (না ভাসিয়া); তদনন্তর তাঁহার আশ্রয়স্থল ক্ষুদ্র দ্বীপটিও জলের মধ্যে একেবারে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে। সাধক নিজে কেবল স্বীয় আসনে বসিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকিবেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বিক্ষুব্ধ সাগর শুষ্ক হইলে তাঁহার মনে হইবে, যেন বাড়বানল তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। বাড়বানল এতই প্রবল হইয়া উঠিবে যে, সাগর জলও বাষ্প হইয়া উঠিয়া যাইতে থাকিবে ও তাঁহার নিজের মস্তকের কেশ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, ত্বক্, অস্থি সমুদয়ই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে ও প্রবল বাত্যায় ঐ ভস্মও উড়িয়া যাইবে। অবশিষ্ট আর কিছুই থাকিবে না, কেবল সাধকের কর্ণে (যাহার অস্তিত্ব নাই) হ্রীঁ বীজ শ্রুত হইবে। ইহাই হইল সাধকের স্থূল লয়। গন্ধ (বিভিন্ন পুষ্পের গন্ধ), রস (ফলের বিভিন্ন আস্বাদ), রূপ (পক্ষিগণের বিভিন্ন বর্ণ), স্পর্শ (বাত্যা), শব্দ (পক্ষিগণের বিভিন্নসুরে উচ্চারিত হ্রীঁ বীজ); সাধকের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমুদয়ই শূন্যে লয় হইয়া যাইবে। বাড়বানল প্রবল বাত্যায় লীন হইবে এবং ঐ বাত্যাও শূন্যে লয় হইয়া যাইবে। সাধকের তখন যে কি অবস্থা, সাধক তাহা নিজেই বুঝিতে বা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

অন্তর্ভূতশুদ্ধিতে 'লং' বীজ 'বং'এ লয় করিতে হয় (শিশুপাল বধ), 'বং' বীজ 'রং'এ লয় করিতে হয় (কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, নারায়ণ ও নর একই), 'রং' বীজ 'যং'-এ লয় করিতে হয় (দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনই বিরাট-রাজ্যে লইয়া যাইতেছেন) 'যং' বীজ 'হং'এ লয় করিতে হয় (কীচক শূন্যে পরিণত হইতেছে)। 'হং' হইতেছে শূন্য বা আকাশ ইত্যাদি। অন্তর্ভূতসিদ্ধিই হইতেছে লয়-যোগ।

বিরাটপর্ব্বে (কীচক বধ-পর্ব্বে) আমরা পাই ভীম কীচক বধ করিতেছেন। কীচকই হইতেছে কন্দর্প বায়ু। কীচক নিজের সম্বন্ধে সৈরন্ধ্রীকে বলিতেছে—

> পৃথিব্যাং মৎসমো নাস্তি কশ্চিদন্যঃ পুমানিহ।
> রূপ-যৌবন-সৌভাগ্যৈর্ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ ॥৪৪॥
> সর্ব্বকামসমৃদ্ধেষু ভোগেষনুপমেষিহ।
> ভোক্তব্যেষু চ কল্যাণী কস্মাদ্দাস্যে রতা হ্যসি ॥ ৪৫ ॥
> ময়া দত্তমিদং রাজ্যং স্বামিন্যসি বরাননে।
> ভজস্ব মাং বরারোহে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৪৬ ॥

'হে সুভ্রু! আমি এই সমুদয় রাজ্যের অধীশ্বর ও অপ্রতিম শৌর্য্যশালী, রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। হে কল্যাণি, এরূপ সমৃদ্ধ ভোগ সকল বিদ্যমান থাকিতে তুমি কি জন্য দাস্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ?' ইত্যাদি। অন্যত্র আবার কীচক বলিতেছে—

> 'অকস্মান্মাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
> সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যোঽস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥৪৭॥ (২২ অধ্যায়)।

'আমার অন্তঃপুরচারিণীগণ আমায় এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, "তোমার তুল্য প্রিয়দর্শন পুরুষ এই ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না।" (কারণ ইনি কন্দর্প-সদৃশ সুন্দর ও 'কন্দর্প-বায়ু নামে অভিহিত হন!) এই কীচককে বা কন্দর্পবায়ুকে ভীম শূন্যে (০) পরিণত করেন। কীচকবধ কালে তাঁহার পদদ্বয় মস্তক ও হস্ত সমুদয়ই তাহার উদরমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, ফলে কীচক একটি গোলাকার শূন্যে পরিণত হয়। লোকে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিতে লাগিল,

> 'ক্বাস্য গ্রীবা ক্ব চরণৌ ক্ব পাণী ক্ব শিরস্তথা।'

ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্ত, পদ মস্তকই বা কোথায় গেল। শূন্যের আদিও নাই, অন্তও নাই। ব্যাসদেব কীচক-বধে বায়ুর শূন্যে পরিণত হওয়ার কথাই বলিতেছেন। বায়ুর ১০৮ প্রকার বিকার আছে (চরক); ইহার মধ্যে তিনটি বিকার প্রাণায়ামের দ্বারা আরোগ্য হয় না—খঞ্জত্ব, কুব্জত্ব ও খর্ব্বতা; বক্রী ১০৫ প্রকার বিকার প্রাণায়ামের দ্বারা নষ্ট করা যায়। এই

১০৫ প্রকার বিকারকে ব্যাসদেব বলিলেন ১০৫টী উপকীচক—এই ১০৫ উপ-কীচককেও ভীম সংহার করিলেন—অর্থাৎ তাহাদিগকেও শূন্যে পরিণত করিলেন।

বিরাটরাজের রাজ্য দেহমধ্যে মূলাধার হইতে বিশুদ্ধাখ্য অবধি; তাহার রাজধানী হইল অনাহতের উপরাংশে; অন্তঃপুর হইল বিশুদ্ধাখ্যে. কামিনীগণের নৃত্যশালা হইল মণিপুরের বা নাভিকমলের নিকট ও কীচকের আবাসগৃহ হইল মূলাধারের ঠিক নিম্নেই—এই কন্দর্পবায়ুর উপরই মূলাধার অবস্থিত। জীবাত্মা বায়ুমণ্ডলকে আশ্রয় করিয়াই অনাহতে অবস্থান করেন। জীবাত্মা দেখিতে নির্ব্বাত দীপ-কলিকা সদৃশ। ইনিই সেই পুরুষ (বা শিব) যে পুরুষকে পাইবার জন্য সাধকের প্রকৃতিরূপা চিৎশক্তি হৃদয়-রাসমন্দিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল হন।

আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে পাই—মহাদেবকে পরমপুরুষ বলিতেছেন—

"গচ্ছ বৎস মহাদেব ব্রহ্মভালোদ্ভব ভব।......
ততো রুদ্রাঃ কপালাচ্চ শিবাংশৈকাদশ স্মৃতাঃ॥"

এই বিরাটপর্ব্বে যখন বিরাট-তনয় উত্তর বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুনের সাহায্যে কৌরবদিগকে পরাজয় করেন এবং দূত আসিয়া যখন বিরাট রাজাকে এই সুসংবাদ দেয় ও যখন বিরাট-রাজ এই সুসংবাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে থাকেন, "আমার উত্তর মহারথ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও দুর্য্যোধনাদি কৌরব-গণকে একাই সমরে পরাজিত করিয়াছে," এবং প্রাকারাই কঙ্ক নামে পরিচিত ছদ্মব্রাহ্মণবেশী যুধিষ্ঠির বলিতে থাকেন "বৃহন্নলা যাহার সারথি তাহার যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী" তখন বিরাটরাজ অতীব ক্রোধিত ও কুপিত হইয়া হস্তস্থিত অক্ষ যুধিষ্ঠিরের মুখে নিক্ষেপ করেন এবং যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে শোণিত নির্গত হইতে থাকে ও পাছে ঐ শোণিত ধরাতলে পতিত হয়, এই ভয়ে যুধিষ্ঠির নিজ অঞ্জলিদ্বারা ঐ শোণিত গ্রহণ করেন। পরে তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনী ঐ রুধিরধারা একটি জলপূর্ণ* সুবর্ণপাত্রে ধারণ করেন। ঐ রক্তবর্ণ রুধিরধারাই হইতেছে জীবাত্মা এবং ইহা নির্গত হইতেছে ব্রহ্মরূপী যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে। যুধিষ্ঠিরের অঞ্জলি হইতেছে যেন প্রদীপ এবং রুধিরধারা দাহিকা শক্তিহীন অথচ উজ্জ্বল নির্ব্বাত দীপ-কলিকা সদৃশ। যুধিষ্ঠিরের অঞ্জলি নিবদ্ধ হইয়াছিল বক্ষের নিকট; এই রুধিরকে গ্রহণ করিলেন (বা জীবাত্মার সহিত মিলিত হইলেন) চৈতন্যশক্তিরূপিণী দ্রৌপদী! চিৎশক্তি জীবাত্মার সহিত মিলিতা হইলেন অনাহতে।

অজ্ঞাতবাস কাল শেষ হইলে একদিন বিরাটরাজ সভায় দেখিলেন যে, তাঁহার সিংহাসনে তাঁহারই সভা সদস্য কঙ্ক বসিয়া আছেন, সৈরিন্ধ্রীও তাঁহার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। পাকশালার অধ্যক্ষ বল্লভ, কন্যাদিগের নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নপুংসক বৃহন্নলা, অশ্বশালাধ্যক্ষ গ্রন্থিক ও গো-শালাধ্যক্ষ তন্তিপাল সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছেন। বিরাট কঙ্ককে তাঁহাদিগের এবংবিধ আচরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তাঁহার পুত্র উত্তর, (যিনি পাণ্ডবদিগের পূর্ব্ব-পরামর্শ মত তথায় উপস্থিত ছিলেন) যুধিষ্ঠিরাদি সকলের পরিচয় প্রদান করেন। ইহাই হইল অজ্ঞাতবাসের পর আত্ম-প্রকাশ।

দেহ ত্রিবিধ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। মানব যখন জীবিত থাকেন, তখন তিনি স্থূল দেহ ধারণ করেন। মৃত্যুর পর, তাঁহার এই স্থূল দেহ হইতে বায়ুর সাহায্যে জীবাত্মা নির্গত হইয়া যান এবং এই স্থূল দেহ ভস্মীভূত হইলে পর দেহস্থ পঞ্চভূত শূন্যে বা আকাশে চলিয়া যায়। এই শূন্যে আবাসই হইতেছে পঞ্চতত্ত্বের অজ্ঞাতবাস। এই পঞ্চতত্ত্বকে অকলঙ্কিত রাখিয়া প্রকাশমান করিবার জন্যই যেন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'তুমি দুর্গা-স্তব পাঠ কর:—যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্। নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্দ্ধিনীং ॥ ২ ॥ কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্। শিলাতটে বিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতি গামিনীম্ ॥ ৩ ॥ বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্। দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিণীম্ ॥ ৪ ॥ ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদা শিবাম্। তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্ব্বলাম্ ॥ ৫ ॥ এই যোগমায়া দুর্গাই শিলাতটে নিক্ষিপ্ত হইলে আকাশেই গমন করিয়াছিলেন। আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই মহামায়া দুর্গা। পঞ্চপাণ্ডব বা পঞ্চতত্ত্ব এতদিন বিরাটরাজ্যের বিশুদ্ধাখ্যেই বাস করিতে-ছিলেন। এই বিশুদ্ধাখ্যই হইতেছে দেহাভ্যন্তরে আকাশ; পঞ্চতত্ত্ব চৈতন্যশক্তি যুক্ত হইল আকাশে, পঞ্চপাণ্ডবের দ্রৌপদীর সহিত মিলন হইল বিরাটরাজ্যে। কিন্তু ঐ তত্ত্বগুলি কার্য্যকরী হয় না যতক্ষণ না তাহারা জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়। দ্রৌপদীকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের রুধির গ্রহণ হইতেছে জীবাত্মার সহিত চৈতন্যশক্তির সংযোগ। যখন পঞ্চতত্ত্ব (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) চৈতন্য শক্তি লাভ করিয়া জীবাত্মার সহিত আকাশে মিলিত হয়, তখনই তাহারা সূক্ষ্ম কলেবর প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশমান হয়, বিরাটসভায় যেমন পাণ্ডবেরা প্রকাশমান হইলেন।

মৃত্যুর দশদিন পরে পিণ্ডদানকালে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলেন "এতৎ প্রথমপিণ্ডং শিরঃপূরকমুপতিষ্ঠতাং"। পরে "এতদ্দ্বিতীয়পিণ্ডং কর্ণাক্ষিনাসাপূরকং"। তৃতীয় পিণ্ডে "এতৎ তৃতীয়পিণ্ডং গলাংসভুজবক্ষঃ-পূরকং"। চতুর্থ পিণ্ডে "এতৎ চতুর্থপিণ্ডং নাভিলিঙ্গগুদপূরকং"। পঞ্চম পিণ্ডে—"এতৎ পঞ্চমপিণ্ডং জানুজঙ্ঘাপাদপূরকং"। ষষ্ঠ পিণ্ডে—"এতৎ ষষ্ঠপিণ্ডং সর্ব্বমর্ম্মপূরকং"। সপ্তম পিণ্ডে "এতৎ সপ্তম পিণ্ডং নাড়ীপূরকং"। অষ্টম পিণ্ডে—"এতদষ্টমপিণ্ডং দন্তলোমপূরকং"। নবম পিণ্ডে "এতন্নবম-পিণ্ডং বীর্য্যপূরকং"। দশম পিণ্ডে "এতৎ দশমপিণ্ডং পূর্ণতাতৃপ্ততাক্ষুদ্-বিপর্য্যয়পূরকমিতি বিবেচনা। ইহার পর "এতদেব শ্রাদ্ধতত্ত্বে" ইত্যাদি বলিয়া [illegible] (সহদেব ও নকুল বা পুণ্যতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব) সম্বন্ধে হয়। [illegible] তত্ত্ব ও রসতত্ত্বই বিশেষভাবে স্থূল, সেই জন্য পূর্ণরূপে বলা হয়। সূক্ষ্ম শরীর উৎপাদনার্থে যে জীবাত্মা এতদিনে নিরালম্ব অবস্থায় ছিলেন, তাহাকে সূক্ষ্ম শরীর দিয়া অবলম্বন দিবার জন্যই এই পিণ্ডদান ও ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধমণ্ডপে বিরাটপর্ব্বপাঠ, যাহাতে আর স্থূল শরীর না পাইতে হয়।

সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত না হইলে পর সময়ে সেই শরীর স্থূল শরীরও পাইতে পারে। কারণ-শরীর যাহাতে যুধিষ্ঠিরাদি সকলে প্রাপ্ত হন ও প্রথমে সূক্ষ্ম শরীর কূটস্থ চৈতন্য ও পরে (কারণ শরীরে) পরমব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারেন, তাহারই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কুরুক্ষেত্রে* অর্জ্জুনকে বলিতেছেন বিশুদ্ধাখ্যেই বা আকাশে অবস্থান করিও না, আরও অগ্রসর হও, বিশুদ্ধাখ্যে থাকিলে পতনের ভয় আছে—স্থূল শরীর আবার পাইতে পার, আজ্ঞাচক্রে যদি সকলে মিলিয়া উঠিতে পার, যোগক্রিয়া ত্যাগ না কর, যোগ ও সংযোগভ্রষ্ট বা কূটস্থ চৈতন্যের সহিত সংযোগভ্রষ্ট আর হইবে না, কারণ-শরীর প্রাপ্ত হইয়া ক্রিয়ার পরাবস্থায় উপনীত হইতে পারিবে, পরমব্রহ্মে লীন হইতে পারিবে। মহাসঙ্ক সাধুদিগের সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইতে বিলম্ব হয় না, তাঁহারা নিজেদের শ্রাদ্ধ নিজেরাই করিয়া যান।

শ্রীশরদিন্দু রায়

---

* জল অর্থে জড় (মেদিনী)। যে আধারে জীবাত্মা নাই তাহাই জড়; জড় আধারেই জীবাত্মাকে ধৃত করা হইল। সুবর্ণময় পাত্র হইতেছে অনাহত কমল।

* শুদ্ধ ধর্ম্মক্ষেত্র ও শুদ্ধ কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যস্থলেই যেন দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতেছেন—এই মধ্যস্থলে থাকিলে পতনের বা স্থূল শরীর পুনরায় প্রাপ্তির ভয় আছে, সূক্ষ্ম শরীর প্রাপ্ত হইবার প্রয়াস কর।

রাজসাহী জিলা-পরিচিতি

—শ্রীসুশীল রায়

অবস্থান ও ইতিহাস

বাঙ্গালা দেশের উত্তরাংশ রাজসাহী বিভাগ। এই বিভাগের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় রাজসাহী জিলার অবস্থিতি। আয়তনে ইহা প্রায় ২,৬১৮ বর্গ-মাইল।

সদর থানার নাম রামপুর-বোয়ালিয়া। রামপুর-বোয়ালিয়া গঙ্গানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এই স্থানে গঙ্গা, পদ্মা বলিয়া কথিত হয়। যদিও সদর থানার নাম রামপুর-বোয়ালিয়া, তথাপি উক্ত নামের ব্যবহার আদৌ নাই। এমন কি, সেখানকার অধিবাসিগণও ইহাকে রাজসাহীই বলিয়া থাকে। রাজসাহী জিলার মহকুমা তিনটি :—সদর থানা, রামপুর-বোয়ালিয়া, নাটোর ও নওগাঁ।

এই সূত্রে এই জিলার নাম কেন রাজসাহী হইল, তাহার সম্বন্ধে সামান্য একটু ইতিহাস বলা যায়। রাজা গণেশ মুসলমান বাদশার নিকট হইতে এই স্থান অধিকার করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এই মুসলমান অধিপতির নিকট হইতে রাজ্য জয় করায় তাঁহার নামের সঙ্গে 'রাজসাহ' যুক্ত হইল। সেই হইতে এই জিলা রাজসাহী নামে পরিচিত, প্রচারিত ও অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

সীমা

এই জিলার দক্ষিণ ভাগ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ বেড়িয়া গঙ্গানদী (পদ্মানদী) প্রবাহিত। এই নদী দ্বারা রাজসাহী জিলা, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জিলাদ্বয় হইতে পৃথক্ হইয়াছে। এই জিলার সহিত সংযুক্ত আর যে-সকল জিলা আছে, তাহাদের মধ্যে দিনাজপুর ও বগুড়া ইহার উত্তর দিকে, বগুড়া ও পাবনা পূর্ব্ব দিকে এবং মালদহ ইহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অর্থাৎ কতকগুলি জিলা এবং একটি নদীদ্বারা এই জিলার সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও আরও খুঁটিনাটি করিয়া নজর করিতে গেলে ছোট ও অখ্যাত নদী এবং বিল দিয়া আমরা ইহার সীমা বাঁধিতে পারি। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন নাই। যথাস্থানে নদী ও বিলের কথা বিশদভাবে বলিলে সমস্তই সরল হইয়া যাইবে। *

এই জিলাকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিয়া ফেলিতে পারি :—(১) বরেন্দ্র-ভূমি, (২) নদীধৌত ভূমি অথবা নদী-তীরবর্ত্তী ভূমি (riparian tract), এবং (৩) বিল-প্রধান অংশ।

রাজসাহী বিভাগের মধ্যে বরেন্দ্রভূমি, মালদহ, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া জিলায় বিস্তৃত। এই ভূমির জমি কিঞ্চিৎ রক্তাভ, কঠিন, অথচ বালি ও পাঁক মিশ্রিত, ইহার বহিরাংশের জমিতে বালির মাত্রা বেশী দেখা যায় এবং সেই জমির উদ্ভব অল্পকাল পূর্ব্বে। এই বরেন্দ্রভূমি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বগুড়ার পশ্চিম প্রান্ত, দিনাজপুরের দক্ষিণাংশ এবং রাজসাহীর উত্তর দিক্ এই ভূমির এলাকাবর্ত্তী। কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তে দেখা যায়, এই ভূমি খানিকটা দক্ষিণ দিকে নামিয়া গঙ্গার দিকে কাত হইয়া গিয়াছে, এবং রাজসাহী জিলার গোদাগাড়ী হইতে প্রেমতলী পর্য্যন্ত

---

* রাজসাহী জিলায় বিলের অত্যন্ত প্রাচুর্য্য। যথাস্থানে সবিশেষ উল্লিখিত হইবে।

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ফলে, মালদহের পূর্ব্বাংশ এবং রাজসাহীর পশ্চিমাংশ এই ভূমির মধ্যে পড়িয়াছে। এককালে যে এই স্থান ঘন বনে আচ্ছন্ন ছিল, তাহার প্রমাণরূপে এখন বৃহৎ অতি-বৃদ্ধ বৃক্ষ দেখা যায় এবং তাল ও নারিকেল গাছে এই স্থানের দৃশ্য চমৎকার দেখায়।

রাজসাহী জিলায় বরেন্দ্রভূমি পদ্মাতীরস্থ গোদাগাড়ি হইতে আরম্ভ হইয়া এই জিলার পশ্চিম সীমার কিনারা ঘেঁষিয়া উত্তর মুখে উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহার পর পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া এই জিলার উত্তর দিকের প্রায় সমস্তটুকু স্থান জুড়িয়া লইয়াছে। এইস্থানে স্থানীয় অধিবাসী ছাড়াও সাঁওতাল ও বিহারের অনেক লোক বাস করে।

(২) এই ভাগের মধ্যে সদর-থানা রামপুর-বোয়ালিয়া, চারঘাট ও লালপুর পড়ে। এই অংশের জমি ধূসর ও বালুময়, এখানে নানাজাতীয় শস্য জন্মে। এখানকার জমি অন্য স্থানের অনুপাতে কিছুটা উচু এবং গঙ্গার বিপরীত দিকে এই ভূমি উত্তর দিকে ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। এখানকার জনসংখ্যা বেশী এবং জমিহীন মজুর-শ্রেণীরই বাস বেশী। ইহারা প্রথমে এই অঞ্চলে আসে রেশম-শিল্পে আকৃষ্ট হইয়া, ইহারা ছাড়াও ঢাকা ও ফরিদপুর জিলা হইতে মুসলমান ব্যবসায়ীরাও এখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে, নদীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলেই ইহাদের বাস।

(৩) এই অংশের মধ্যে পড়ে, নওগাঁ, বাগমারা, পুঠিয়া, পঞ্চপুর, নাটোর, বাড়াইগ্রাম এবং সিঙ্গরার দক্ষিণাংশ। এই অঞ্চল জলাটিয়া অর্থাৎ জল ও পাঁকে পঙ্কিল, অজস্র বিলে আচ্ছন্ন এবং ছোট ছোট নদী ও শাখানদীতে জড়িত। এখানকার জমি বালুময়, মাটি কালো এবং সবার চেয়ে বেশী উর্ব্বর, কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী; বিশেষতঃ বর্ষাকালে ও শীতের প্রারম্ভেই ম্যালেরিয়া বেশী দেখা দেয়। মৃত্যুসংখ্যা বেশী, জনসংখ্যা বেশ ঘন।

এই অঞ্চলকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। (ক) যে স্থানে গাঁজা জন্মে; (খ) যে-স্থানে গাঁজা জন্মে না।

(ক) নওগাঁ থানাতেই গাঁজা জন্মে এবং এই স্থান গাঁজার জন্যই প্রসিদ্ধ।

(খ) এই স্থান বিল-প্রধান।

এই জিলার একটা প্রধান বিশেষত্ব যে, এখানকার জমীর স্থানে স্থানে যেন টোল পড়িয়াছে। এই টোলগুলিতে জল জমিয়া বিলের আকার ধারণ করে। জিলার পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, ততই বিলের সংখ্যা দেখা যাইবে বেশী, এবং পূর্বপ্রান্তে পৌঁছিলে দেখা যায় সেখানে প্রায় বিলধারা আচ্ছন্ন। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিলই গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়, এবং বর্ষাকালে অগভীর জলায় পরিণত হয়। বিলসমূহের উৎপত্তির কারণ এক নয়। এমন বিলও আছে, যাহার জন্ম শত শত বৎসর পূর্বের কোন নদী হইতে। নদী নিজ পথে চলিতে চলিতে বিপথে পড়িয়া হারাইয়া নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় একটি বিল গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ বিলের প্রাচুর্য নাটোর নিকট। মান্দা-বিল হইতে নাটোর কাছাকাছি স্থান পর্য্যন্ত এই বিলের শ্রেণী

দেখা যায়। তা ছাড়া, নদীর মাঝে চড় পড়ার দরুন তাহার জল উপচিয়া পারে উঠিয়া পড়াতেও বিলের সৃষ্টি হইয়াছে।
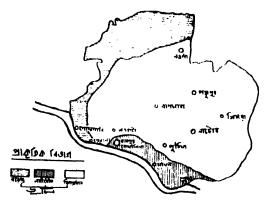
বিলের মধ্যে খ্যাতিতে ও প্রতিপত্তিতে প্রধান চলন-বিল, ইহার আয়তন প্রায় ১৪০ বর্গ মাইল।

আবহাওয়া

ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য এই জিলার তাপ কিংবা বারিপাত কোনটাই অত্যন্ত অধিক নয়। সমুদ্র ইহার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, পূর্ব্বদিকে মনসুন্ এবং বিশালকায় হিমালয় পর্ব্বত ইহার উত্তর সীমা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। গঙ্গার ঠিক কিনারে অবস্থান হেতু এই জিলার পশ্চিম দিকের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এখানকার মাটি অধিকতর আর্দ্র। এই কারণে এখানে দ্বিবিধ নারিকেল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। জিলার পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইলে গঙ্গার উত্তর-পশ্চিম বাতাস সচরাচর সেখানে পাওয়া যায় না। এই বাতাস প্রায়ই দমকা বাতাসের মত আচম্কা দেখা দিয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর পূর্ব্বগামী বাতাস এই জিলার উপর দিয়া বহিয়া যায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাতাসের গতি বঙ্গোপসাগর হইতে উঠিয়া আসে। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই জিলা পরিবর্ত্তনশীল

আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়াছে। নানাদিকের নানারূপ বাত সের গতিবিধির মধ্যেই ইহার অধিবাসীদের বসবাস।†

জন-ঘনত্বর তুলনামূলক স্তম্ভ

স্তম্ভে দেখানো হইয়াছে প্রতিবর্গ মাইলে যদি লোকসংখ্যা পুরাপুরি ৬০০ থাকিত, তাহা হইলে স্তম্ভটি সম্পূর্ণভাবে ভরাট হইত। কিন্তু কোন্ বৎসরে ৬০০ হইতে ঘনত্ব কত কম, তাহার তুলনা পাশাপাশি ছবি দেখিলেই সহজে করা যাইবে।

ফাল্গুন মাসের প্রথম দিকে এখানে গরম আরম্ভ হয়। এই সময়—যাহাকে 'উত্তুরে' বাতাস বলে—সেই বাতাসের গতি থামিয়া যায়। এই 'উত্তুরে' বাতাসই শৈত্য বহন করিয়া আনিয়া থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম বাতাস ফাল্গুনের শেষ দিকে দেখা দেয়, এই সময় ঘূর্ণী-হাওয়া প্রবল হইয়া আবির্ভূত হয়। দখিণা বাতাস কেবল জ্যৈষ্ঠে দেখা যায়। আষাঢ় হইতে আশ্বিনের শেষাবধি মনসুন্ বাতাস এই জিলার উপর বহিতে থাকে। এই সময় রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা অনুভূত হয় ও শীতাগমের সূচনা বোঝা যায়।

শীত হইতে গ্রীষ্মের মধ্যে উত্তাপ সাধারণতঃ ৬০° হইতে ৮৫° ডিগ্রীর মধ্য থাকে। কিন্তু মাঝখানে চৈত্র-বৈশাখে সর্ব্বোচ্চ তাপ ৯৬° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ওঠে। এই হইতেছে সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময় সময় সর্ব্বোচ্চ-তাপ ১০৮° পর্য্যন্ত এবং সর্ব্বনিম্ন ৪২° ডিগ্রী পর্য্যন্তও দেখা গিয়াছে। দৈনিক উত্তাপের নামা-ওঠা রীতিমত লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৈশাখ মাসে দিনের বেলা ১০৬° ও রাত্রে ৭৮° ডিগ্রী প্রায়ই হইয়া থাকে।

বৃষ্টিপাত

কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত বারিপাত খুব সামান্য হয়। কিন্তু ফাল্গুন-চৈত্রে বৃষ্টিপাতের মাত্রা বাড়িয়া যায় এবং মনসুন মাসে অর্থাৎ আষাঢ় হইতে আশ্বিন অবধি মাসিক গড়-পড়তা ১১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে। বৈশাখে এবং আশ্বিনে বারিপাত মাসিক ৫ ইঞ্চি হয়, তাহার কারণ এই সময় ঝড়-ঝঞ্ঝা দেখা দেয় এবং সময় সময় কয়েক দিন-ব্যাপী বর্ষণও দেখা যায়। গড়ে বাৎসরিক বারিপাত রামপুর-বোয়ালিয়ায় প্রায় ৫৫½ ইঞ্চি।

† Himalayan Journals.

আয়তন ও জনসংখ্যা

রাজসাহী জিলার আয়তন—১৯৩১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী—২,৬০৯ বর্গ মাইল। নদী যে-সকল স্থান দিয়া বহিয়া ভূমির অংশ গ্রহণ করিয়াছে, এই আয়তন হইতে সে পরিমাণ ভূমি বাদ দিয়াই এই হিসাব দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ করিবার কারণ, জন-ঘনত্ব হিসাব যাহাতে সূক্ষ্ম ও সুচারু হয়। বিগত কুড়ি বছর আগে এই জিলার জন-ঘনত্ব ছিল ৫৬৮, তারপর মাঝখানে ঘনত্ব বাড়িয়া ৫৭৪-এ উঠিয়াছিল, এখন হিসাব করিয়া পাওয়া গিয়াছে, প্রতি বর্গ মাইলে ৫৭০ জন লোক বাস করিতেছে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি রাজসাহী জিলার তিনটি মহকুমা, সেই তিনটিই সহর নামে কথিত হয়। অন্যান্য স্থানের মধ্যে কোন কোনটায় সহরের উপাদান কিছু কিছু পাওয়া গেলেও, তাহা ঠিক সহর হইয়া উঠিতে পারে নাই। যেমন পুঠিয়া। পুঠিয়ার বাজারের সীমানা দেখিলে কেহ ইহাকে গ্রাম বলিবে না। বাঁধান সড়কে ও লোকের কোলাহলে এক প্রকার সাহরিক আবহাওয়া সৃষ্ট হইয়াই আছে।

জন-সংখ্যার তুলনামূলক স্তম্ভ

এই স্তম্ভ তিনটি দ্বারা দেখান হইয়াছে ১৯১১, ১৯২১, ও ১৯৩১ সালে জন-সংখ্যা কিরূপ কম-বেশী। স্তম্ভ ভরাট হইলে এ-ক্ষেত্রে জন-সংখ্যা পুরা ১৫,০০,০০০ হইত। কিন্তু কোণ ভাঙ্গিয়া দিয়া বুঝানো হইয়াছে, লোকসংখ্যা কোন্-বৎসর ১৫,০০,০০০ হইতে কত কম।

এই জিলায় জনসংখ্যা ১৪,২৯,০১৮। গত কুড়ি বছর আগে যাহা ছিল, তাহা হইতে ৫৩,২৯০ জন কমিয়া গিয়াছে। দশ বৎসর আগে যে হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, তখন এই সংখ্যা এখনকার সংখ্যা হইতে ৬৮,৩২০ জন বেশী ছিল। এত অল্প দিনের মধ্যে লোকসংখ্যা এত কমিবার কারণ একমাত্র অত্যধিক মৃত্যুহার নয়, দেশ হইতে বহুলোক বিদেশে চলিয়া গিয়াছে নানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য। যে হেতু এই জিলা শিল্প-প্রধান নয়, একমাত্র কৃষিকার্য্যে বর্ত্তমানে অত লোকের জীবিকার সংস্থান না হওয়ায় জীবিকানির্ব্বাহার্থে অনেকেই অন্যত্র গমন করিয়াছে।

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[১৮]

পরদিন দর্পনারায়ণ তাহার অসন্তুষ্ট সৈন্য ও সঙ্গীদের মধ্যে এক মাসের বেতন আগাম বিলি করিয়া দিল; যাহারা মরিতে প্রস্তুত তাহারাও অর্থ পাইলে খুসী হয়। অর্থাভাবই অনর্থের মূল; মানুষে বোধ করি শ্লেষ করিয়া বলে, অর্থই অনর্থ।

আজ আর আক্রমণ করা হইল না; নাটোর হইতে বারুদ না আসিয়া পৌছান পর্য্যন্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকা ছাড়া উপায় নাই। দর্পনারায়ণ তাঁবুতে বসিয়া ছিল—এমন সময় আক্কর আসিয়া উপস্থিত হইল।

দর্পনারায়ণ ইসারায় জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি রে?

সে রামশিঙাটি প্রভুর পদতলে রাখিয়া হাতের ভঙ্গীতে বক দেখাইতে সুরু করিল।

দর্পনারায়ণ জানিত—ইহা করুণ রসের চিহ্ন। কিন্তু এই যুদ্ধ-ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ করুণার কারণ সে বুঝিতে পারিল না। তখন আক্কর তাহার সঙ্গী দাঁড়কাকটির মাথায় চড় মারিতে লাগিল; কাকটা যত চীৎকার করে—সেও অবোধ্য ভাষায় তত চীৎকার করে—আর হাত দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইবার ভঙ্গী করে।

দর্পনারায়ণ তাহার ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহার কাছেও আজ ইহা স্পষ্ট হইল না। বিশেষ তাহার মন খারাপ ছিল; সে যেন একটু বিরক্তির সঙ্গেই আক্করকে বিদায় করিয়া দিল। আক্কর বাহিরে যাইবার সময়ে হোঃ হোঃ শব্দে অট্টহাসি হাসিয়া চলিয়া গেল—সেই অনৈসর্গিক হাসি মর্ম্মরের মত কঠিন, তুষারের মত শুভ্র, সোপানাবলীর মত ক্রমোচ্চ।

শীতের দিন দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া আসিল; সন্ধ্যার কিছু আগে আক্কর ঘুরিতে ঘুরিতে রক্তদহের জমিদার-বাড়ীর উত্তর দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। আগেই বলিয়াছি জমিদার-বাড়ীর যে দিকটা অরক্ষিত; কারণ সে দিকে নদী ও বাড়ীর মধ্যে স্থান এত অল্প-পরিসর যে, সেখানে আক্রমণের কোন আশঙ্কা নাই।

আক্কর সেখানে আসিয়া উচ্চ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল: দেখিল, দেয়ালের উপরে ও ছাদে কোন লোক নাই। কিছুক্ষণ পরে সে যাহা খুঁজিতেছিল পাইল: একস্থানে দোতলার গায়ে একটি জানালা আছে; কিন্তু সেটা এত উঁচুতে যে সেখানে উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আক্কর এই জানালাটা দু'দিন আগে দেখিয়া গিয়াছে এবং মনে মনে একটা মৎলব আঁটিয়াছে—আজ প্রভুকে তাহা জানাইবার জন্য তাঁবুতে গিয়াছিল। প্রভু তাহার মনোভাব বুঝিল না বটে, কিন্তু তাহার ধারণা প্রভু তাহার ইসারা বুঝিয়াছে এবং খুসি হইয়া বিদায় দিয়াছে। বোবা হইবার, নির্বোধ হইবার সুবিধাও আছে।

সে সৈন্যদলের মধ্য হইতে দুটি জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল একখানি ভাঙা তলোয়ার আর একটা লম্বা দড়ি। প্রথমে সে তলোয়ারখানাকে কোমরে বাঁধিল; তারপরে দাঁড়কাকটার মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিল। কাকটা অন্য সময়ে চীৎকার করে, এখন চুপ করিয়া রহিল। তখন সে কাকের পায়ে দড়ির একপ্রান্ত বাঁধিয়া সেই জানালার লোহার শিক দেখাইয়া দিল। কাকটা দড়ি লইয়া উড়িয়া গিয়া জানালার কাছে কিছুক্ষণ পাখা ঝটপট করিয়া উড়িল, তারপরে জানালার এক শিকের ভিতর দিয়া গলিয়া আর এক শিক দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া আবার কিছুক্ষণ পাখা ঝটপট করিয়া উড়িল, তারপরে শোঁ করিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া আক্করের হাতে বসিল। আক্কর দড়ির দুই মাথা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল—কাকের পা হইতে দড়ির প্রান্ত খুলিয়া ফেলিল। এখন দড়ি বাহিয়া উঠিয়া জানলা ধরিয়া দাঁড়াইলেই ছাদের উপর ওঠা যাইবে। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদ হইতে বাড়ীর

মধ্যে নামিয়া দেউড়ি খুলিয়া দিবে—প্রভুর কাজ সহজ হইয়া যাইবে। বোবার মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে!

সে চারিদিকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া কাকটাকে ঘাড়ের উপর বসাইয়া লইয়া দুই হাত দিয়া দড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। এতক্ষণ কাকটা চুপ করিয়া ছিল—কিন্তু এইবার উচ্চস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। কি তীক্ষ্ণ উচ্চ সে শব্দ! আব্বর দুর্বোধ্য ভাষায় যত তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিল—ততই সে তীক্ষ্ণতর, তীব্রতর ধ্বনিতে ডাকিতে লাগিল। আব্বর ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতেছে; ক্রমে সে একহাত দিয়া জানালার শিক ধরিল; এইবার এক পা জানালার চৌকাঠের সঙ্গে বাধাইয়া দিল—ছাদ আরও কতটা উঁচুতে দেখিবার জন্য মাথা তুলিয়া উপরে চাহিল—ছাদ বেশী উঁচুতে নয়, কিন্তু ও কি সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের কার্ণিশের উপরে! ও কাহার বিকট মুখ তাহার দিকে তাকাইয়া আছে! তাহার মাথার চুল ও দাড়ি শাদা; চোখ দুটা ছোট আর লাল, মুখে শাদা দাঁতের সারি, না স্থির-বৈদ্যুত হাসি! আব্বর চমকিয়া গেল! তখন তাহার নামিবার উপায় নাই—আর মাথার উপরে ওই অদ্ভুত মুখ! সে মুখ কথা বলে না, কেবল একদৃষ্টে চাহিয়া আছে! আব্বর একহাত দিয়া জানলার শিক ধরিয়া, এক পা জানলার চৌকাঠে বাধাইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে, আর মাথার উপরে, শঙ্কাজনক নৈকট্যে—ওই ভীষণ নারকীয় মুখ!

আব্বর অন্য হাত দিয়া কোমর হইতে তলোয়ারখানা খুলিয়া লইল - এইবার সে নারকীয় মুখ হইতে শব্দ বাহির হইল—সে কি হাসি! আব্বরের হাসির মত তাহা কঠিন, সরল, শুভ্র নয়; এ যেন হাসির রুদ্রাক্ষের মালা বিনি সুতায় গাঁথা; খানিকটা হাসি, খানিকটা নিস্তব্ধতা; আবার এক দমকা হাসি, আবার নিস্তব্ধতা; এ যেন গুঁটি-কাটা হাসি!

হাসি থামিলে মুখ কথা বলিল—ওরে দুষমণ! আবার তলোয়ার বের করা হচ্ছে! বেটা বোবার আস্পর্দ্ধা দেখ!

কথা শুনিয়া বোঝা গেল—ও আর কেহ নয় বেঙা চৌকিদার! পরন্তপ তাহাকে বাড়ী ঘুরিয়া দেখিবার ভার দিয়াছিল; সন্ধ্যাবেলায় যথানিয়মিত ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ কাকের সন্দেহজনক শব্দে এ দিকে আসিয়া শূন্যপানে আব্বরকে দেখিতে পাইয়াছে। আব্বরকে সে ইতিপূর্ব্বে চোখে দেখে নাই, কিন্তু তাহার কথা লোকের মুখে শুনিয়াছে। প্রথমে সে একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, দুষমণ আখ্যাতি যাহার আছে, তাহাকে ওইরকম ভাবে দড়ি বাহিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠিতে দেখিলে কে না ভীত হয়? বেঙা ভাবিতেছিল জানালার শিকে দড়ি বাঁধিল কেমন করিয়া! সে ভাবনা পরে হইবে, আপাততঃ দুষমণকে শিক্ষা দিতে হইবে। সে কার্ণিশের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক হাতে তলোয়ার বাহির করিল।

আব্বর সেই অন্ধকারেও বুঝিতে পারিল—লোকটার হাতের উজ্জ্বল পদার্থ তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নয়। সেও তলোয়ার লইয়া প্রস্তুত হইল। তখন সেই অন্ধকারে, একজন শূন্যে ঝুলিয়া, আর একজন শূন্যে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একজন অদ্ভুত আর একজন কিম্ভূত, দুইজনে তলোয়ার চালাইতে লাগিল। তাহারা কেহই তলোয়ার খেলিতে জানে না, সেইজন্যই তাহাদের আঘাত মর্ম্মান্তিক হইতে লাগিল। যাহারা তলোয়ারে নিপুণ, তাহারা মরিবার আগেও সে নৈপুণ্য একবার না দেখাইয়া পারে না, কিন্তু ইহারা তলোয়ারের শিল্পকলা জানে না, কেবল আঘাত করিতেই জানে! আব্বরের আঘাতে বেঙার শরীর হইতে রক্ত টপ্ টপ্ করিয়া আব্বরের মাথায় পড়িতে লাগিল; আবার বেঙার আঘাতে আব্বরের রক্ত টপ টপ করিয়া শূন্যে পড়িতে লাগিল—মাটিতে বোধ হয় পড়িতে ছিল না, কারণ কাকটা উড়িয়া উড়িয়া তাহা পান করিতে ছিল! আব্বর আঘাত করিল, বেঙা আঘাত করিল, কেহ কাহার আঘাত প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল না—কেবল আঘাত, আর কেবল রক্তপাত! দুইজনেই নিস্তব্ধ!

আব্বরের তলোয়ারখানা বোধ হয় কিছু বেশি লম্বা ছিল, তাই বেঙা-ই অধিক আহত হইতেছিল। রক্তে তাহার গা ভাসিয়া যাইতেছে, মুখ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে; সে দেখিল এমনভাবে বেশিক্ষণ চলিলে তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত। তাই সে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আব্বরের পায়ের উপরে জোরে আঘাত করিল; জানালার চৌকাঠ হইতে পা খসিয়া গেল! সে শূন্যে ঝুলিয়া তলোয়ার

চালাইতে লাগিল। বেঙা আবার ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতে আঘাত করিল; শিক হইতে হাত খুলিয়া গেল; তবু দড়ি ধরিয়া আক্কর লড়িতে লাগিল, কিন্তু বহুক্ষণ লড়িয়া, রক্তপাতে সে ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, বেঙা তাহার মাথায় বার দুই আঘাত করিল; আক্কর আর পারিল না; হাত হইতে দড়ি ফসকাইয়া গেল; একবার এই শেষবার সেই বিকট উচ্চ অদ্ভুত হাসি হাসিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গেল। মাটিতে পড়িয়া একবার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিয়া নিঃসাড় হইয়া গেল। বেঙা ভাল করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মতির মার উদ্দেশ্যে কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। জানালার শিকে বাঁধা দড়িটা খুলিয়া লইবার কথা তাহার মনে হইল না!

আক্করের প্রাণহীন দেহ সেই নির্জ্জন স্থানে পড়িয়া রহিল; মুখে, গায়ে শত ক্ষতচিহ্ন; তাহার চিরসাথী দাঁড়কাকটা সেই ক্ষতস্থানে ঠোঁট দিয়া পরম পরিতৃপ্তি সহকারে রক্তমাংস আহার করিতে লাগিল; এতদিন পরে তাহার মুখে সাড়াশব্দ নাই। আক্করের ওষ্ঠাধরে কিন্তু সেই শব্দহীন হাসির ভঙ্গী; মানুষটির মৃত্যুশোকে মূর্ত্তিমতী হাসি যেন ওষ্ঠাধরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

[১৯]

রমেশ শেষ রাত্রে ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছিল—আর মধু ও বিধু পাশে বসিয়া তাহার নাসিকাগর্জ্জন থামাইবার জন্য তাহার ঈষোন্মুক্ত মুখের মধ্যে পাটালি গুড়ের টুকরা ভরিয়া দিতেছিল। নাক ডাকিতে সুরু করে, এক টুকরা গুড় মুখের মধ্যে পড়ে, নিদ্রিত রমেশ জাগ্রত লোকের মত তাহা দিব্য চুষিতে আরম্ভ করে, নাক ডাকা বন্ধ হয়, গুড় ফুরাইয়া যায়, আবার শব্দ আরম্ভ হয়; আবার গুড় পড়ে। এমনই করিয়া সারা দিনে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে প্রায় আড়াই সের গুড় গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাপ ঘুমাইয়া পড়িলে ছেলেদের ইচ্ছা ছিল গুড়টুকু তাহারা চিড়া দিয়া খাইবে, কিন্তু বাপের নাসিকাধ্বনি থামাইতেই সব টুকু গুড় গেল, তাহারা সারা দিন বসিয়া শুক্‌না চিড়া চর্ব্বণ করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলা যখন গুড় ফুরাইল, তখন নিজের নাকের শব্দে রমেশ জাগিয়া উঠিল; উঠিয়াই তাহার সে কি রাগ!

—বটে, বটে সব টুকু গুড় শেষ করেছিস, বেলা এখনও ..

মধু বিধু বাপের রাগের দৈহিক প্রমাণ অনেকবার পাইয়াছে, সেই জন্য তাহারা ঐক্যতানে বলিয়া উঠিল—না, বাবা, সূর্য্য অনেকক্ষণ পাটে বসেছে রাত প্রায় এক প্রহর!

রমেশ উঁকি মারিয়া দেখিল বাহিরে অন্ধকার। কাজেই সে শান্ত হইয়া বলিল—তা বটে! তোদের দোষ নেই! দেখি চিঁড়ে কিছু আছে, না তাও শেষ করেছিস!

মধু দেখাইয়া দিল—অনেক ছিল। রমেশ বলিল, শুকনো চিঁড়ে তোরা আর খাস্‌নে, ছেলেমানুষ আবার অসুখ করবে, দে।

এই বলিয়া সে চিঁড়ার পুঁটুলী টানিয়া লইয়া নাবালক পুত্রদ্বয়কে অসুখ হইতে বাঁচাইবার জন্যই যেন কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতার মত পরম আগ্রহে খাইতে লাগিল। পুত্রদ্বয় সবিস্ময়ে দেখিল, কথায় শুকনো চিঁড়ে ভেজে না, এ প্রবাদ অপবাদ মাত্র। অল্প সময়ের মধ্যে চিঁড়া অন্তর্হিত হইল। চিঁড়া ফুরাইলে রমেশ একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল—ছেলেদের ফাঁড়া কাটিয়া গেল ভাবিয়া, ক্ষুধা মিটিয়াছে বলিয়া নয়।

এইবার সে কাজের কথা আরম্ভ করিল—বলিল- দেখ আর একটু রাত হোক এখনও দু'চারজন লোক জেগে আছে, মনে হচ্ছে। সকলে ঘুমলে—বুঝলি তখন দেখিস কি মজা হয়। ততক্ষণ এক কাজ কর, ওই ঢাক কয়টার চামড়া কেটে ফেল।

তিন জনে মিলিয়া ঢাকের চামড়া কাটিয়া ফেলিল, ভিতর হইতে শুকনো সোলা, কিছু বারুদ, আলকাত্‌রা মাখানো ন্যাকড়া বাহির হইল; চকমকি আর সোলা বাহির হইল। সে গুলি এক জায়গায় স্তূপাকার করিয়া সাজাইয়া রমেশ বলিল, ওরে বানর দুটো বুঝলি কি হবে, এ গুলো দিয়ে।

তাহাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার বলিল, লঙ্কা কাণ্ড রে, লঙ্কা কাণ্ড! আমি হব হনুমান আর তোরা দুজন আমার বাচ্চা!

মধু ঈষৎ আপত্তি করিল, বাবা হনুমানের তো বাচ্চা ছিল না।

রমেশ বলিল, ওটা শাস্তরের ভুল! বাচ্চা ছিল না তো এত হনুমান এল কোত্থেকে!

তার পরে একটু থামিয়া বলিল, শাস্তর মেনেই চলা ভাল! তোরা দুইজন জাম্বুবান আর অঙ্গদ!

মধু ও বিধু এই নূতন পদমর্য্যাদা অনুসারে গম্ভীর হইয়া বসিল।

ক্রমে রাত নিশুতি হইল, জমিদার-বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া গেল, তখন তিন জনে সেই সব দাহ্য পদার্থ বহন করিয়া বাহির হইল। তাহারা যেখানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা কিছু দূরে কয়েক খানা খড়ের চালা ছিল; তাহাতে সারা বছরের জন্য কাঠখড়ি, লকড়ি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত, সে দিকে লোকজন থাকিবার কথা নয়।

রমেশ, মধু ও বিধু সেই খানে গিয়া লকড়ির তলে, চালের দাহ্য পদার্থও সযত্নে সাজাইয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইয়া ছিল। দাহ্য পদার্থ ও শুক্‌নো কাঠ অগ্নিস্পর্শ মাত্রে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা তিন জনে ছুটিয়া গিয়া সেই গুপ্ত ঘরে আশ্রয় লইল।

আগুন জ্বলিয়া উঠিল, স্তূপীকৃত লকড়ি জ্বলিয়া উঠিল, খড়ের চাল জ্বলিয়া গেল, ক্রমে বাঁশের গাঁঠ ফাটার শব্দে জমিদার-বাড়ী বারংবার চমকিয়া উঠিল।

আগুনের আলোতে, ধোঁয়াতে, বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দে বাড়ীর লোকজন কোলাহল করিয়া জাগিয়া উঠিল। তখন বড় মহামারি পড়িয়া গেল। লোকজন উঠিতেছে, ছুটিতেছে, কোলাহল করিতেছে, কেহ প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছে না—সকলেই পরস্পরকে প্রশ্ন করিতেছে—আগুন? কে লাগাইল? কেমন করিয়া লাগিল? কেমন করিয়া নিভানো যায়? ওরে কর্ত্তাকে ডাক, দেওয়ানজীকে খবর দে! হায়! হায়! ইত্যাদি।

আগুন ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, প্রথমে যেখানে লাগিয়াছিল, সেখান হইতে স্ফুলিঙ্গ ক্রমে অন্যান্য ঘরের চালায় লাগিতে আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে বৃহৎ বাড়ী অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইল।

আগুনের আলোতে, ধোঁয়ায়, বাঁশ ফাটার শব্দে ও লোকের কোলাহলে প্রাচীরের বাহিরে চৌধুরীদের ক্ষুদ্র সৈন্যদল জাগিয়া উঠিল—তাহারাও প্রথমে বুঝিতে পারিল না কেমন করিয়া কি হইল। দর্পনারায়ণরা তিন ভাই ও আলিবর্দ্দী সবিস্ময়ে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছেন। রমেশ হাড়ির পূর্ব্বরাত্রের অভিনয়ের কথা কাহারও মনে পড়িল না।

প্রথমে আলিবর্দ্দী কথা বলিল, সে বলিল, দাদাবাবু, কাজ যেই করুক, আর যেমন করেই হোক, এমন সুবিধে আর হবে না, এই সময় একবার বাড়ীতে ঢুকবার চেষ্টা করলে হয় না!

আলিবর্দ্দীর কথা শুনিয়া সকলেই ঘটনাটাকে অন্য দিক হইতে দেখিতে আরম্ভ করিল। সকলেই স্বীকার করিল—এমন সুযোগ আর আসিবে না। তখনই সৈন্যদলের মধ্যে প্রাচীর ডিঙাইবার হুকুম প্রচার করা হইল। সকলে বখশিস ও লুঠের আশায় প্রাচীর লঙ্ঘন করিবার পন্থা খুঁজিতে লাগিল—আর দর্পনারায়ণরা তিন জন, আলিবর্দ্দী বাছা বাছা এক দল লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালা লইয়া দেউড়ীর কাছে অপেক্ষা করিয়া রহিল। ইতিমধ্যে যদি প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া গিয়া অন্যেরা দেউড়ী না খুলিয়া দিতে পারে, তবে তাহারা দেউড়ী ভাঙিয়া ঢুকিবে।

প্রাচীরের চারিদিকে লোকজন ছড়াইয়া পড়িল; একদল ঘুরিতে ঘুরিতে নদীর দিকে গেল—এ-দিকটায় তাহারা বড় আসে নাই, কাজেই তাহাদের পরিচিত নয়, কিন্তু খুঁজিতে খুঁজিতে তাহারা একটা জানালার সঙ্গে এক গাছা শক্ত দড়ি ঝুলিতেছে দেখিতে পাইল। এ সুবিধা ছাড়িবার পাত্র তাহারা নহে, দড়ি বাহিয়া একে একে তাহারা ছাদের উপর উঠিতে লাগিল; অল্পক্ষণের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক ছাদের উপর গিয়া দাঁড়াইল; তখন তাহারা বিকট ডাক ছাড়িয়া লাঠি, শড়কি লইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া পড়িল; কেহই লক্ষ্য করিল না, দড়ির নিকটেই আব্বরের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল।

দর্পনারায়ণদেরও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না—তাহারা দেখিল বৃহৎ দেউড়ী ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল, যে দেউড়ী ভাঙিবার এত ব্যর্থ চেষ্টা এতদিন তাহারা করিয়াছে। তাহারা বুঝিল, জোড়াদীঘির

লোকেরা দরজা খুলিয়া দিয়াছে; জোড়াদীঘির লোকই বটে, কিন্তু ইহারা কেমন করিয়া এখানে আসিল!

দর্পনারায়ণ বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই, রমেশ! রমেশ দণ্ডবৎ হইয়া বলিল, "আজ্ঞে না দাদাবাবু, আমি হনুমান, এরা দুইজন, নল আর অঙ্গদ!"

—কি বলছিস্ রে?

রমেশ পুনরায় বলিল, "আজ্ঞে এত বড় একটা লঙ্কাকাণ্ড করে ফেললাম তবু বিশ্বাস হল না!" দর্পনারায়ণ দেখিল ইহা কথা বলিবার সময় নয়, বলিল, "আচ্ছা পরে হবে, এখন যা।"

আলিবর্দ্দী ও তাহারা চার জন বন্দুক তলোয়ার লইয়া প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া জলপ্রবাহের মত জোড়াদীঘির লোক জমিদার-বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

রক্তদহের সৈন্যদল এতক্ষণ আগুন নিভাইতে ব্যস্ত ছিল, এখন দেখিল নূতনতর বিপদ; জোড়াদীঘির লোক বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে; তাহারা আগুন ছাড়িয়া আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইল।

পরন্তপ সৈন্যদলকে কাছারীর আঙিনা হইতে সরাইয়া আনিয়া অন্তঃপুরের আঙিনায় সমবেত করিয়া অন্তঃপুর রক্ষা করিবার হুকুম দিল। কিন্তু ঘটনা যেমন দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাতে ভীত, বুদ্ধিভ্রষ্ট রক্তদহের পক্ষে, বেশীক্ষণ আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে। প্রথমে সম্মুখ হইতে, ক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহারা আক্রান্ত হইতেছিল, কারণ জোড়াদীঘির যে সব লোক দেউড়ী দিয়া ঢুকিয়াছিল, তাহা ছাড়া প্রতি মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক লোক নানা স্থানে প্রাচীর ডিঙাইয়া বাড়ীর মধ্যে পড়িতে লাগিল।

দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ করিবার হুকুম দিল; চৌধুরীদের বন্দুক একসঙ্গে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রক্তদহের বন্দুক তাহার প্রত্যুত্তর দিল। কয়েকবার উভয় পক্ষে বন্দুক চলিবার পরে দেখা গেল, কাজের চেয়ে অকাজই বেশী হইতেছে, দুই দলের সৈন্য এমন মিশিয়া গিয়াছে যে, নিজের বন্দুকে নিজের লোক মরিতেছে। তখন লাঠিয়ালরা অগ্রসর হইয়া অন্যদলের উপর গিয়া পড়িল। লাঠির ঠকাঠক্ আওয়াজ ও মাঝে মাঝে লাঠিয়ালদের বিকট চীৎকার ছাড়া আর কিছুই শ্রুত হইল না। যাহার এক ঘা লাঠি লাগিতেছিল, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না—দেখিতে দেখিতে রণাঙ্গন হতাহতে ভরিয়া গেল। রক্তদহ বীরত্বের সঙ্গে লড়িতেছে বটে, কিন্তু ভাগ্য আজ নানা ভাবে তাহাকে বিড়ম্বিত করিতেছে, নৈশযুদ্ধে অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইলে জয়লাভ এক প্রকার অসম্ভব। ক্রমে রক্তদহের দল পিছু হটিতে লাগিল; সংখ্যায় তাহারা আততায়ীর অপেক্ষা অনেক কম, কাজেই সকলেই বুঝিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের আর বাধা দিবার শক্তি থাকিবে না।

দর্পনারায়ণ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও আলিবর্দ্দী চারজন একত্র দাঁড়াইয়া লড়াই দেখিতেছিল। দর্পনারায়ণ বলিল, —আলিবর্দ্দী এত নিরপরাধ লোক মেরে কি লাভ! আমরা তো চাই পরন্তপ রায়কে।

আলিবর্দ্দী বলিল—কিন্তু এরা থাকতে তাকে তো পাওয়া সম্ভব নয়। দাঁড়াও না, দাদাবাবু, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আলিবর্দ্দীর কথাই ফলিল—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রক্তদহের যে মুষ্টিমেয় লোক অনাহত রহিল—তাহাদের প্রাণ লইয়া পলায়ন ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। তখন আলিবর্দ্দী ও দর্পনারায়ণ পরন্তপের সন্ধানে ভিতরে ঢুকিল; জোড়াদীঘির যাহারা সুস্থ ছিল, তাহারা লুঠ-তরাজের জন্য কাছারী ও মালখানার দিকে ছুটিল।

দর্পনারায়ণ এ বাড়ীতে কখনও আসে নাই—কাযেই সব জায়গা পরিচিত নয়, তবু তাহাকে অধিক সন্ধান করিতে হইল না। সে দোতালায় উঠিয়া দেখিতে পাইল, একটি ঘরের মধ্যে পরন্তপ একাকী দণ্ডায়মান। দর্পনারায়ণ প্রবেশ করিয়া বলিল—সে দিনের দেনা শোধ করবার জন্য আজ এলাম।

পরন্তপ বলিল—এই নিন্। এই বলিয়া সে বন্দুক তুলিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। তাহার হাতের কাছেই যে একটা বন্দুক ছিল, দর্পনারায়ণ তাহা লক্ষ্য করে নাই। গুলিটা তাহাকে আঘাত না করিয়া ঘাড়ের কাছে দিয়া চলিয়া গেল।

দর্পনারায়ণ বলিল—এবার আমার পালা। কিন্তু আমি বন্দুকের ভক্ত নই।

পরন্তপ বলিল—তবে কি তলোয়ারের!

দর্পনারায়ণ বলিল—ও সব দিয়ে তো জানোয়ার মারি! কিন্তু আজ আর মারব না! আপনাকে একবার জোড়াদীঘিতে নিয়ে যেতে চাই।

পরন্তপের ক্রোধ শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল—বলিল,— কি জোর করে!

—প্রয়োজন হলে করব বই কি। কিন্তু আশা করি সে অপ্রিয় কাজ করতে হবে না।

পরন্তপ পুনরায় শ্লেষের সঙ্গে বলিল—এখনও দেখছি আপনার প্রিয় অপ্রিয় জ্ঞান লোপ পায় নি। ধন্যবাদ!

দর্পনারায়ণ আলিবর্দ্দীকে ডাক দিল; আলিবর্দ্দীর সঙ্গে আর চার পাঁচজন অনুচর গোটা দুই মশাল লইয়া প্রবেশ করিলে সে বলিল,—আলিবর্দ্দী রায় মশায়কে নিয়ে আমার তাঁবুতে যা। সম্ভ্রান্ত লোক, সব সময়ে সঙ্গে চারজন আরদালী যেন থাকে, আর তুই স্বয়ং থাকবি। আর শীগ্‌গির একখানা পাল্কী জোগাড় কর গে—ওঁকে আমাদের সঙ্গে জোড়াদীঘিতে নিয়ে যেতে হবে। যা। আর আমাকে একটা মশাল দিয়ে যা—আমি পিছে পিছে আসছি।

পরন্তপ দেখিল, আপত্তি করিলে অপমানের আশঙ্কা আছে; কাজেই সে নীরবে আলিবর্দ্দী ও অনুচরদের সঙ্গে রওনা হইল।

তাহারা চলিয়া গেলে দর্পনারায়ণ মশাল লইয়া আপন মনে চলিতে আরম্ভ করিল; অন্তঃপুরের পথ চিনিত না, কাজেই চলিতে চলিতে এক দালান হইতে অন্য এক দালানে আসিয়া উপস্থিত হইল—এতক্ষণ সে নীচের দিকে চাহিয়া চলিতেছিল—এইবার চোখ উঠাইতেই মশালের পীতাভ আলোতে দেখিল, সম্মুখের দরজার দুই চৌকাঠ দুইহাতে ধরিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—ইন্দ্রাণী! উভয়ের চোখো-চোখি হইল। এক, দুই, তিন, পর মুহূর্ত্তেই দর্পনারায়ণের কম্পিত হাত হইতে মশাল পড়িয়া নিভিয়া গেল—সে যে-পথ ধরিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া দ্রুত ফিরিয়া গেল।

এ দিকে জোড়াদীঘির জনতা জমিদার-বাড়ী লুটিয়া, ভাঙ্গিয়া, চুরিয়া, ছিঁড়িয়া, পোড়াইয়া, ফেলিয়া, ছড়িয়া, অনর্থ করিল। যে-যাহার লুটের মাল লইয়া জোড়াদীঘি রওনা হইল, কাহাকেও আদেশ করিবার প্রয়োজন হইল না। দর্পনারায়ণ আট দশখানা গরুর গাড়ী করিয়া নিজেদের হতাহত লোকদের জোড়াদীঘি রওনা করাইয়া দিল এবং ভোর হইবার আগেই পরন্তপকে পাল্কীতে চড়াইয়া নিজেরা ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী রওনা হইল।

রক্তদহের দেওয়ানজী গত্যন্তর না দেখিয়া নাটোরের কালেক্টারকে সংবাদ দিবার জন্য অন্যপথে দ্রুতগামী ঘোড়সওয়ার পাঠাইয়া দিলেন।

আর আব্বরের মৃতদেহ যেখানে পড়িয়াছিল, সেইভাবেই পড়িয়া রহিল। কেহ তাহার সন্ধানও করিল না, কিংবা অভাবও অনুভব করিল না; দাঁড়কাকটা মাংস খাইয়া পেট ভরিলে কোথায় উড়িয়া গেল; আর সব চেয়ে বিস্ময়ের এই যে, বহুদিন পর্য্যন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া রহিল—শিয়াল কুকুরে পর্য্যন্ত খাইবার জন্য কাছে আসিল না। বোধ করি, তাহারা মৃতের হাসির সঙ্গে পরিচিত নয়, কারণ, শেষ পর্য্যন্ত তাহার মুখে অট্টহাসির সেই নীরব ভঙ্গীটা অঙ্কিত ছিল।

[২০]

পরন্তপকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার পরে তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই; দেওয়ানজী অনেকবার খোঁজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার লোক জোড়াদীঘি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে নাই। জোড়াদীঘি ও রক্তদহের মধ্যবর্ত্তী স্থান সম্পূর্ণ অরাজক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি ছিল, কিন্তু ক্রমে সাধারণ লোকও তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন অবস্থা এমন হইয়াছে, যে যাহাকে পারিতেছে, মারিতেছে, লুঠ করিতেছে, বাড়ী-ঘরে আগুন লাগাইয়া দিতেছে, হালের গরু খুলিয়া লইতেছে, মাঠে শস্য পাইলে কাটিয়া লইয়া যাইতেছে। জোড়াদীঘির প্রজারা আর রক্তদহের প্রজার জন্য অপেক্ষা না করিয়া জোড়াদীঘির প্রজার উপরেই অত্যাচার করিতেছে, আবার রক্তদহের বেলাতেও ঠিক সেই অবস্থা।

এহেন অবস্থায় দেওয়ানজীর প্রেরিত লোক যে জোড়াদীঘি পৌঁছিতে পারিবে না, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? তিনি যতগুলি লোক পাঠাইয়াছিলেন, সকলেই মার খাইয়া, লুণ্ঠিত হইয়া ফিরিয়া আসিল। দেওয়ানজী পরন্তপ রায়ের কোন সংবাদ পাইলেন না।

কিন্তু দিন তিন চার পরে সংবাদ গুজব আকারে রটিতে রটিতে শেষে রক্তদহের জমিদার-বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল। দেওয়ানজী শুনিতে পাইলেন, পরন্তপ জোড়াদীঘিতে বন্দী। আরও শুনিলেন, প্রথমে তাহাকে সসম্মানে জমিদার-বাড়ীতে রাখা হইয়াছিল। পরন্তপ তিন চার বার পালাইবার চেষ্টা করেন, শেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে মাটির নিম্নস্থ কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ানজী নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি দুর্ঘটনার পরেই নাটোরে কালেক্টারের কাছে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে লোকও ফিরিয়া আসিল না।

ক্রমে সমস্ত সংবাদ ইন্দ্রাণীর কাছে পৌঁছিল। সে আজ তিন দিন হইল, স্বামীর সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, দেওয়ানজী ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে এ সব দুঃসংবাদ জানিতে দেন নাই; তাঁহার ধারণা ছিল, একেবারে পরন্তপকে উদ্ধার করিয়া ইন্দ্রাণীকে খবর দিবেন। কিন্তু সে আশা নাই দেখিয়া বাধ্য হইয়া ইন্দ্রাণীকে সমস্ত জানাইলেন, এক বিন্দুও গোপন করিলেন না।

গোপন করিবার প্রয়োজনও ছিল না; ঘটনা দুর্ভাগ্যের চরম সীমা পর্য্যন্ত গড়াইবে তাহা সে জানিত। সে দেওয়ানজীকে বিদায় করিয়া দিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নিজের কক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

ইন্দ্রাণী একাকী অনেক দিন পরে নিজের মনটাকে সম্মুখে বিছাইয়া দিয়া ভাবিতেছিল, পরন্তপকে সে কেন উদ্ধার করিতে চায়! পরন্তপের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ? না, এখনও তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই—তাই তাহাকে আবশ্যক? কিংবা নিজের অজ্ঞাতসারে সে স্বামীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইজন্য? ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া এত দুঃখেও তাহার হাসি পাইল।

বহুক্ষণ ধরিয়া সে ভাবিল—কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ তাহার চোখে পড়িল না। একবার জানলার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—বাড়ীর লুণ্ঠিত, দগ্ধ, চূর্ণীকৃত, অরাজক বিশৃঙ্খলা চোখের পীড়াদায়ক, জানালা বন্ধ করিয়া আবার শয্যায় আসিয়া বসিল।

ক্রমে একটিমাত্র পথ, যাহা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না, তাহার চোখে পড়িল। ইহা সব চেয়ে কঠিন, কিন্তু ইহা ছাড়াও যে আর পথ নাই। যে দুইজন লোক তাহার সবচেয়ে বড় শত্রু, যাহারা বারংবার তাহার নারীত্বকে অপমান করিয়াছে, এখনও মনে মনে করিতেছে, তাহাদের হাতেই প্রতিকারের উপায়। চাপা ও বনমালা।

সে ভাবিল দর্পনারায়ণের মাতাকে যদি একখানা চিঠি দেওয়া যায়, তবে হয় তো সে দর্পনারায়ণকে ধরিয়া পরন্তপকে মুক্তি দিতে পারে। আর এ চিঠি চাপা ছাড়া কে জোড়াদীঘিতে লইয়া যাইবে! চাপা স্ত্রীলোক বলিয়া হয়তো পথে কেহ তাহাকে বাধা না দিতেও পারে। একবার সে জোড়াদীঘিতে পৌঁছিলে বুদ্ধি করিয়া চিঠিখানা অন্তঃপুরে জমিদার-পত্নীর হাতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। চাপা বুদ্ধিমতী ও কৌশলী।

ইন্দ্রাণী অনেকবার ভাবিল—দেখিল, ইহা ছাড়া পথ নাই; স্বামীকে উদ্ধার করিতে হইলে, তাহার চরমতম দুই শত্রুর কাছে বিনতি স্বীকার করিতে হইবে।

উপায়টাকে বিশ্লেষণ করিয়া ইন্দ্রাণীর হাসি পাইল; বড় দুঃখের হাসি; বড় শ্লেষের হাসি; নিজের অবস্থা দেখিয়া হাসি; ইন্দ্রাণী বুঝিল, বিধাতা শ্লেষ-রসিক, কেমন করিয়া তিনি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্যকে বাস্তব করিয়া তোলেন; একান্ত অসম্ভবকে পূর্ণ-প্রকট করেন; কেমন করিয়া ঘটনার নাগপাশে শিকারকে মুক্তি দিয়া শিকারীকে বাঁধিয়া ফেলেন; কেমন করিয়া তিনি ইন্দ্রাণীকে দিয়া সবচেয়ে অপমানকর কাজ করাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন।

ইন্দ্রাণী যদি আর দশ জনের মত হইত, তবে হয় তো ইহাতে অনায়াসে রাজী হইত; সে যদি অসাধারণ হইত, তবে হয় তো সম্মত হইত না। কিন্তু সে একেবারে বিশিষ্ট, সে ভালও নয়, মন্দও নয়, সে অদ্বিতীয়, কাজেই সে রাজী হইল; কিন্তু একেবারে বিনা দ্বন্দ্বে নয়, অনেকখানি আত্ম-সংগ্রাম করিবার পরে সে সম্মত হইল।

ইন্দ্রাণী বুঝিল, আর একবার তাহার মাথা নত হইল। চাঁপা প্রস্তাব শুনিয়া মনে মনে হাসিবে, যদিও কাজ করিতে সে অসম্মত হইবে না; আর দর্পনারায়ণের পত্নী সেও হাসিবে, হয় তো সম্মত হইবে না, হয় তো কত বিদ্রূপ করিবে! কিন্তু ইন্দ্রাণীকে তো পৃথিবীর হাসি-কান্নার হিসাব করিয়া কাজ করিলে চলিবে না—সে তো পাষাণী। হিমালয়ের ঘরে একদিন মানবী জন্মিয়াছিল—আর মানুষের ঘরে সে পাষাণী হইয়া জন্মিয়াছে।

ইন্দ্রাণী মনঃস্থির করিল, তারপরে চিঠি লিখিতে ও চাঁপাকে অনুরোধ করিতে উঠিয়া গেল।

[২১]

বাণীবিজয় সেদিন ভোরবেলা টোলের কাছে বসিয়া দাঁতন করিতেছিল, এমন সময়ে চাঁপা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রাণীর চিঠি লইয়া চাঁপার জোড়াদীঘি আসিতে পুরা দুটি দিন লাগিয়াছে; সে পুরুষ হইলে আসিতেই পারিত না, নেহাৎ স্ত্রীলোক বলিয়া কেহ বাধা দেয় নাই, বিশেষ চাঁপার মত স্ত্রীলোক। অনেক কষ্টে, অনেক বাধা এড়াইয়া, অনেক সন্দেহের হাত এড়াইয়া, সে কোনরূপে জোড়াদীঘি পর্য্যন্ত আসিয়াছে—সম্মুখে এখনও সবচেয়ে কঠিন কাজটি; তাহাকে জমিদার-পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পাছে চিঠিখানা খোয়া যায়, এই ভয়ে তাহা সে চুলের খোঁপার মধ্যে গুজিয়া রাখিয়াছে। টোলের গা দিয়া সদর রাস্তা—সে দেখিল, একজন বামুন পণ্ডিত বসিয়া দাঁতন করিতেছে; চাঁপা সহজাত বুদ্ধির বলে বুঝিল—ইহাকে দিয়া কাজ উদ্ধার হইতে পারে। চাঁপা মুচকি হাসিয়া বাণীবিজয়ের দিকে অগ্রসর হইল।

বাণীবিজয় চাঁপাকে আগে দেখে নাই—তবু সাহস করিয়া দন্তধাবনের সঙ্গে সঙ্গে গুণ গুণ করিয়া ধরিল—

"প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু
দিন যাবে আজি ভাল—"

চাঁপা আরও একটু মুচকি হাসিয়া দাঁড়াইল; বাণীবিজয়ের মাথা ঘুরিয়া গেল—তবু সে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিতে সাহস করিল না—যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল—

"কথায় হীরার ধার, হীরা তার নাম
দাঁত ছোলা, মাজা দোলা, হাস্য অবিরাম—"

চাঁপা একটা প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিত মশাই প্রাতঃ প্রণাম। আমার নাম হীরা নয়, চাঁপা।

বাণীবিজয় একটু সাহস পাইয়া বলিল—চাঁপা, চম্পকসুন্দরী! কি চমৎকার নাম!

চাঁপা আর একবার হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিল—ঠাকুর শুধু নামই দেখলে!

বাণী বলিল—নাম কেন, কি মনে হচ্ছে বলবো—'অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদাম গৌরীং'—

চাঁপা বাধা দিয়া বলিল—ঠাকুর আমি মূর্খ মেয়েমানুষ—যা মনে হচ্ছে তা সোজা কথায় বল না—

বাণী সাহস পাইয়া বলিল—বলব, বলব—এই বলিয়া চারিদিকে একবার তাকাইয়া লইল।

চাঁপা বলিল—আর বলতে হবে না ঠাকুর, কেন আর দিনের আলোয় লজ্জা দেবে!

বাণীবিজয় এবার বাস্তবতায় ফিরিয়া আসিল—জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাড়ী কোথায়?

চাঁপা বলিল, অনেক দূরে। আর আমার মত লোকের বাড়ী-ঘরের সংবাদেই বা কি দরকার! গরীব মানুষ চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছি—ঠিক করে দিতে পার?

বাণী হাত নাড়িয়া বলিল, "হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়"—তা বাপু তোমার আবার চাকরীর কি দরকার?

চাঁপা বলিল—তা নইলে চলবে কি করে? শুনেছি এখানকার জমিদার মস্ত লোক; তার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে চল না।

বাণীবিজয় মনে ভাবিল, চাঁপাকে নিজের কাছে রাখিবার সাহস ও সামর্থ্য তাহার নাই। তবে যদি সে জমিদার-বাড়ীতে থাকিয়া যায়, তবে, পরের খরচে প্রেমালাপ চলিতে পারে। তাই সে বলিল, "খুব পারি। এস, আমার ঘরে এসে একটু বিশ্রাম কর, আমি নিয়ে যাব তোমাকে জমিদার-বাড়ীতে।"

চাঁপা বাণীবিজয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা মাদুর পাতিয়া বসিল। বাণীবিজয় যাহা ভয় করিতেছিল,

ঠিক তাহাই ঘটিল। যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা না কি সেখানেই আসন্ন হয়, হঠাৎ, ঝড়ের গতিতে পুঁটি তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, ইহার চেয়ে বোধ করি বাঘের আসাই ভাল ছিল।

সে এক মুহূর্ত্ত উভয়ের দিকে তাকাইয়া বাণীবিজয়ের দিকে অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তবে রে ঠাকুর—

বাণী শঙ্কিত হইয়া বলিল—আহা পুঁটি অলমতি ক্রোধেন (সে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছে, সংস্কৃত ভাষা ক্রোধ উপশমে বিশেষ কাজ করে। কিন্তু আজ কোন ফল হইল না)। বিদেশী মানুষটাকে আশ্রয় দিয়েছি—

পুঁটির উদ্দীপ্ত কণ্ঠ বলিয়া চলিল—বটে! বটে! অতিথিশালা খুলেছ তুমি! আজ তোমারই একদিন কি আমার একদিন।

এই বলিয়া সে চাঁপার দিকে চাহিয়া বলিল, বলি ভাল মানুষের মেয়ে—এ তোমার কেমন ব্যাভার। চাঁপা এ দুঃখের জন্য প্রস্তুত ছিল না—পথে মেয়েমানুষ বলিয়া বিপদ এড়াইয়া আসিয়াছে, এখানে মেয়েমানুষ বলিয়াই বিপদ্! সে কোন উত্তর দিবার আগেই পুঁটি একটান মারিয়া চাঁপার খোঁপা খুলিয়া দিল। ইন্দ্রাণীর চিঠিখানা মাটিতে পড়িতেই পুঁটি তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—বটে, বটে আবার চিঠি লেখাও হয়েছে।

চাঁপা চিঠিখানা কাড়িয়া লইবার জন্য পুঁটিকে আক্রমণ করিল—সে প্রাণপণ বলে চিঠি চাপিয়া ধরিয়া রহিল। দুইজনের ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে চিঠিখানা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইয়াছিল।

ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া বাণীবিজয় ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে গিয়া ভগবান বোপদেবের রচিত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে মনোনিবেশ করিল। হৃদয়াবেগকে প্রশমিত করিতে ব্যাকরণের মত এমন অমোঘ ঔষধ আর নাই।

চাঁপা ও পুঁটির দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল—পুঁটি তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। চাঁপার আজ সম্পূর্ণ পরাজয়, এতদিনে সে তাহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পাইয়াছে। বিজয়ী পুঁটি গৃহত্যাগ করিলে, কিছুক্ষণ পরে বাণীবিজয় চাঁপার খোঁজে ঘরে প্রবেশ করিল—দেখিল চাঁপা নাই। এদিকে ওদিকে সন্ধান করিল—কোথাও তাহার দেখা মিলিল না।

পুঁটি বাহির হইয়া যাইবার পরেই চাঁপাও বাহির হইয়া সোজা রক্তদহের পথ ধরিয়াছিল—চিঠিখানা নষ্ট হওয়াতে তাহার ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। (ক্রমশঃ

চীনের প্রতি

শ্রীকল্যাণকুমার সেন

তুমি তবু চেয়ে রও, মেলি দুই আঁখি
তেমনি অটল রহ, উন্নত ললাটে :
ছিঁড়ে যদি গিয়ে থাকে গৌরবের রাখী,
কাজ নাই রাখি' তারে ধরি বক্ষপটে।

জননীর মত তুমি যে সম্পদ-ধনে
সকলের হাহাকার করিয়াছ দূর ;
সেই প্রেমাপ্লুত ত্যাগ এ নিষ্ঠুর রণে
নিমেষের মাঝে কভু নাহি হবে চুর।

বিচার-বিবেকহীন এ জগত হতে
ন্যায়, ধর্ম্ম, দয়া আজি মুছে গেছে সব ;
ধরণীরে সিক্ত যারা করিছে শোণিতে
বিধাতা তা'দের কাছে মানে পরাভব।
তাদের তরেতে তব এই অপমান
চিরদিন হয়ে রবে কলঙ্ক-নিশান।

বীরভূমের প্রত্ন-কলা সম্পদ্

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

বাঙ্গলা দেশের প্রাচীন ইতিহাসে বীরভূমের মর্য্যাদা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। আধুনিকতার রূঢ়শ্বাস এখনও এ দেশের যে সব অঞ্চলে গভীর ভাবে পায় নাই, সেই অঞ্চলের প্রত্ন-সম্পদ্ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এক সময় এ সব অঞ্চল সকল দিক্ হইতে এক বিরাট সৌন্দর্য্য-লোক রচনা করিয়া বাঙ্গলা দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল।

বীরভূমি সকলদিকেই রত্নপ্রসূ ছিল। নামের দিক্ হইতে বীরজননী বলিয়া এ দেশ বন্দনা পাওয়ার যোগ্য। বস্তুতঃ এক সময় এ জায়গা বীরভোগ্য ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখনও এখানকার নৃত্যকলায় বীরত্বের সেই শ্রী ও ঐশ্বর্য্য প্রস্ফুট হয়।

বীরভূম উত্তর-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধারাবাহী উচ্চনীচ প্রান্তরের তরঙ্গায়িত বিস্তৃতিতে পরিপূর্ণ। এখানকার অজয় নদী বীরভূমের বৈচিত্র্য বাড়াইয়াছে। জেলার উত্তর-পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা, পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ ও বর্দ্ধমান এবং দক্ষিণে বর্দ্ধমান। ছোটনাগপুরের পূর্ব্ব-সীমান্ত এ জেলার অন্যতম সীমা।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বীরভূমের প্রসিদ্ধি ছিল প্রচুর। সে কালে বীরভূমের রাজধানীর নাম ছিল রাজনগর। ইদানীং জেলার প্রধান শাসনকেন্দ্র শিউড়ী সহর। ইহার আয়তন ১৭৫৩ বর্গ-মাইল এবং জনসংখ্যা ৮,৪৭,৫৭০। এ জেলার পূর্ব্বভাগ জলময়। পশ্চিমে মাটির নীচে প্রস্তর-স্তর লক্ষ্য করা যায়। বীরভূমে অজয় নদী প্রধান—তা ছাড়া ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, হিংলা ও দ্বারকা—এই চারটি নদী উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ যখন এ জেলার ভার গ্রহণ করেন (১৭৬৫ খ্রীঃ), তখন এ জেলার আয়তন ছিল ৩৮৫৮ বর্গ মাইল। বিষ্ণুপুর তখন বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমশঃ বিষ্ণুপুরকে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতেও এই অঞ্চলে হিন্দু-শাসন ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহা হিন্দু রাজ্য ছিল, তখন ইহার রাজধানী ছিল রাজনগর। মুসলমান-বিজয়ের পর আসাফুল্লা খাঁর হস্তে এই অঞ্চলের শাসনভার থাকে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ইহা যখন ব্রিটিশের আয়ত্তে যায়, এই অঞ্চলে দস্যুর উপদ্রব ছিল ভয়ানক। পশ্চিমের পাহাড়ে লুক্কায়িত থাকিয়া অসংখ্য দস্যু এই অঞ্চলে উৎপাত করিত। এই অঞ্চলে দস্যুরা দুর্গ নির্ম্মাণ করে এবং রাজকোষে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে। ইহাদের আক্রমণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক কারখানা বন্ধ হইয়া যায়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থানীয় রাজাদের ক্ষমতা প্রবল ছিল, তাহারা কোম্পানীকে সামান্য কর দিত মাত্র।

বীরভূম অঞ্চলের প্রাচীন মন্দির

ইংরাজের পক্ষের কালেক্টার মিঃ সারধরণ দস্যুর অত্যাচার দমন করেন। এই সময়ে স্থানীয় রাজাদের প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়। কিন্তু দস্যুর উপদ্রব মাঝে মাঝে ভীষণ আকার ধারণ করিত।

কালেক্টর কিটিং সাহেবের আমলে দস্যুরা বিষ্ণুপুর ও বীরভূম পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। ইংরাজের সঙ্গে একটা খণ্ডযুদ্ধের পর দস্যুরা কিঞ্চিৎ ভীত হয়। এই অঞ্চলে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বের একটা জীবন্ত ধারা বহুকাল বর্ত্তমান ছিল। অল্পবিস্তর স্বাধীনতার মর্য্যাদাযুক্ত হওয়াতেই বীরভূমের প্রত্নগৌরব যথেষ্ট শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে। শিউড়ী ছাড়া একচক্রাও বীরভূমের একটি বিখ্যাত স্থান। এখানকার বক্রেশ্বর তীর্থ একটা প্রসিদ্ধ জায়গা।

বীরভূমের প্রাচীন রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না। কিংবদন্তী আছে, পশ্চিমের বীরসিংহ ও চৈতন্যসিংহ নামক দুই ভাই বীরভূমে প্রভাব বিস্তার

করেন। এই দুইজনের নামেই দুইটি সহরের যথাক্রমে নামকরণ হইয়াছে বীরসিংহ ও চৈতন্যপুর। বীরসিংহকে এই অঞ্চলের প্রথম হিন্দুরাজা বলা হয়। পালবংশের রাজাদের প্রভাবের চিহ্ন রাজনগরে পাওয়া যায়। সেন রাজাগণও রাজনগরে রাজত্ব করেন।

পরবর্ত্তী কালে পাঠান-শাসন প্রচলিত হইলে (১৭১৮খ্রী) মুর্শিদাবাদের নবাবের সনদ লইয়া বাদিরাজামা এখানকার প্রভু হন। আসদজমাও এখানকার বিখ্যাত শাসক ছিলেন। ১৭৭৭খ্রীষ্টাব্দে আসদজমা খাঁর মৃত্যু হয়। মহম্মদজমা খাঁ তৎস্থলে অভিষিক্ত হন।

বীরভূমে বোলপুর, দুবরাজপুর, মল্লারপুর, রাজনগর প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গা। রাজনগরে বহু প্রত্নকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বীরভূম রেশম ও তসরের জন্য বিখ্যাত। তিল, যব, ও তুঁতে প্রভৃতিও এ অঞ্চলে প্রচুর। কোন কোন জায়গায় লোহার কারবারও আছে। মল্লারপুরের মাটিতে লোহার স্তর পাওয়া গিয়াছে।

বীরভূম প্রত্নসম্পদের জন্য ইদানীং অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শুধু চিত্রকলা বা ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে নহে, রূপকলার নানা বিচিত্র প্রকাশের ভিতরও এ দেশ নিজের উচ্চ স্থান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এ দেশের রায়বেঁশে নৃত্য আবিষ্কার করেন। রায়বেঁশে নর্ত্তকদের বীরোচিত চেহারা ও অঙ্গভঙ্গী শ্রীযুক্ত দত্তকে বিস্মিত করে। এখনও যে জীবন্তভাবে প্রাচীন একটা ধারা অব্যাহত আছে, রায়বেঁশে দেখিয়া তাহার উপলব্ধি হয়। ইহাদের সামরিক ব্যায়ামক্রীড়া অসাধারণ। আধুনিক রায়বেঁশে নটগণ প্রাচীন যোদ্ধা বীরগণের বংশধর, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শুধু নৃত্যকলা নয়, চিত্রকলায়ও বীরভূম হইতে উচ্চশ্রেণীর পট আবিষ্কৃত হইয়াছে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্তে অবস্থিত রামনগর ও সাহোড়া গ্রামের কুটিরের দেওয়াল-চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলার একটা বলিষ্ঠ আদর্শের নমুনাস্বরূপ এখনও বাঁচিয়া আছে। এই গ্রামের প্রতি গৃহের প্রাচীরে আঁকা ছবি সেকালের একটা অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-প্রেরণাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। দত্ত মহাশয়ের মতে, এই গ্রাম বাঙ্গলাদেশের একটা জীবন্ত অজন্তার মত। [illegible], লাল, নীল ও হলদে রং তুলির সাহায্যে প্রযুক্ত হইয়াছে এখানকার দেওয়াল অঙ্কনে। বস্তুতঃ এখানকার এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলার পট, পুঁথির পাটা, রঙীন মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, সোনা ও রূপোর কাজ, কাঁথা প্রভৃতির নৈপুণ্য অসাধারণ। এই সব অঞ্চলের বাউল, ভাটিয়াল, জারি, ঝুমুর গান, [illegible] প্রভৃতি বিশেষ ভাবে অধ্যয়নের যোগ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে শিল্পীরা আধুনিক অর্থনৈতিক সঙ্কটে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাহাদের প্রাচীন ব্যবসায় ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছে। সমাজেও তাহারা নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে এক সময় কৃষ্ণলীলা ও রামলীলার পট দেখাইয়া এবং [illegible] সম্পর্কে গীতি-কবিতার

ফুলজোড়ের ফুল্লেশ্বরী।

আবৃত্তি করিয়া প্রাচীন পটুয়ারা প্রচুর অর্থলাভ করিত, ইদানীং তাহা আর সম্ভব হয় না। কাজেই এই সকল পটুয়ার বংশধরগণ পৈত্রিক ব্যবসা ছাড়িয়া দিতেছে। এসব অঞ্চলের চিত্রকলার উজ্জ্বল সমাবেশ বিশেষ ভোগ্য। শিল্পীদের তুলিকার দক্ষতা অসাধারণ।

ভাস্কর্য্য-ক্ষেত্রে বীরভূমের দান অসাধারণ। মূর্ত্তিকলায়

বীরভূম অভূতপূর্ব প্রতিভা দেখাইয়াছে। বাঙ্গালায় প্রচলিত অনেক দেবমূর্ত্তি এই অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তিটিরই একটা বিশিষ্ট শ্রী ও রূপ-গৌরব আছে। ভাদীশ্বর গ্রামের মনসামূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। দুর্ভাগ্যক্রমে বহু মূর্ত্তিই অযত্নে ও অবহেলায় ভগ্ন ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে—তবুও এখন পর্য্যন্ত এ সব মূর্ত্তির শ্রী

নন্দীগ্রামের সূর্য্য-মূর্ত্তি।

অনির্ব্বচনীয়। সাহার গ্রামের যশোদা-মূর্ত্তির শায়িত সৌন্দর্য্য ও তরঙ্গায়িত দেহ-গৌরব দুর্লভ। বারাগ্রামের সূর্য্য-মূর্ত্তির তুলনা পাওয়া কঠিন। কনারকের সূর্য্যমূর্ত্তির আড়ষ্ট আয়তন ও বিশুষ্ক দৃঢ়তা এই মূর্ত্তিতে নাই—এই মূর্ত্তি একটা জীবন্ত ও জাগ্রত শ্রীতে মণ্ডিত। বাঙ্গলার কমনীয়তা, রসবাহুল্য সমগ্র মূর্ত্তিকে চঞ্চল ও হিল্লোলিত করিয়া তুলিয়াছে। মূর্ত্তিখানি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বক্রেশ্বরের হর-গৌরীর যুগ্মমূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব মানবিকতার দ্যোতক হইয়াছে। অথচ মূর্ত্তিদ্বয়ের তুরীয় ভাব তাহাতে মজ্জিত বা লুপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালী কবি যেমন দেবতাকে মানুষরূপে কল্পনা করিয়া বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই,—তেমনই আত্ম-সমর্পণের ও আত্মাহুতির নিগূঢ় মন্ত্রও বাঙ্গলার ভাবুকদের অজ্ঞাত নয়।

নন্দীগ্রামের দুর্গা-মূর্ত্তির গতিচ্ছন্দ ভারতীয় শিল্পে দুর্লভ। এই মূর্ত্তির ঊর্দ্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গেলেও মূর্ত্তিটির অবয়ব ও অঙ্গ-ভঙ্গী প্রভৃতির তুলনা পাওয়া কঠিন। সমগ্র সৃষ্টিটি একটি উদ্বেলিত হিল্লোল ও দিব্য সৌকুমার্য্যে মণ্ডিত। নারায়ণ-পুরের গরুড়মূর্ত্তিও অতি উচ্চশ্রেণীর রচনা। বীরভূমের ভাস্কর্য্য রূপ-জগতের অতি বহুমূল্য সম্পদ। সূর্য্য-মূর্ত্তির রস-বিজ্ঞান ও উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যা, শ্রীদুর্গার গতিচঞ্চল কারুতা প্রভৃতির সহিত সমতান রক্ষা করিতে পারে, এরূপ রচনা অন্যত্র দুর্লভ। ফুলবেড়ের ফুলেশ্বরী-মূর্ত্তিতে এক অতি-মানবীয় রূপশ্রী উদ্ভাসিত হইয়াছে। এ মূর্ত্তি কঙ্কালসার তান্ত্রিক দেবীমূর্ত্তি। নেপালের দক্ষিণকালী-কল্পনার সহিত এ

নন্দীগ্রামের দুর্গা-মূর্ত্তি।

মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে। সমগ্র মূর্ত্তিটি এক অজানা কল্পনার সহিত যুক্ত। তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিপুল রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশেই এই ধর্ম্মের প্রেরণা জন্মে। প্রায় সমগ্র তন্ত্র-সাহিত্যই বাঙ্গালীর রচনা। ক্রমশঃ বাঙ্গলা দেশ হইতে নেপাল ও তিব্বতে এই বিরাট ধর্ম্ম

ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। চীন ও জাপান পরবর্ত্তী যুগে তান্ত্রিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করে। জাপান চীনদেশ হইতে এই ধর্ম্মের বার্ত্তা লইয়া যায়। এমনই করিয়া সমগ্র এসিয়ায় তান্ত্রিক-ধর্ম্মের বাণী বিস্তৃত হইয়াছিল। ফুলেশ্বরী মূর্ত্তি হিসাবে অতি শ্রেষ্ঠ রচনা। কঙ্কালসার বুদ্ধমূর্ত্তি গান্ধার-

মল্লারপুরের ভৈরব।

শিল্পীরা এক সময় রচনা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে না ছিল প্রাণ, না রসসমাবেশ। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয়, একটা মূর্ত্তির কঙ্কাল মাত্র। কিন্তু এই মূর্ত্তি জীবন্ত, প্রাণময়, ভাবগৌরবে প্রদীপ্ত, অথচ রচনা কঙ্কালসার। বস্তুতঃ এই শ্রেণীর রচনা অতীব দুরূহ। জীবন ও মৃত্যুর অন্তরালে যে কঙ্কালের স্থান, তাহাকে লইয়া একটি দেবী-মূর্ত্তি রচনা করা অতি কঠিন। কিন্তু এই মূর্ত্তিটি দেখিয়া জীবন্ত সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়।

বীরভূমের এই সমস্ত রচনা মূর্ত্তি-শিল্পে বাঙ্গলার গৌরব বাড়াইয়াছে। মল্লারপুরের ভৈরবমূর্ত্তি ধ্যানী-বুদ্ধের মতই স্থিতিশীল। দেখা যাইতেছে, এ সব মূর্ত্তিতে গতি ও স্থিতির ছন্দ অতি অপরূপভাবে ফটাইয়া তোলা হইয়াছে। নিস্পন্দ শবদেহের স্থিতি বা উদ্দাম চাপল্যের মধুর রূপরচনায় এই দুইটি মেরুকে সবল করিয়া এই অঞ্চলের শিল্পোদ্যম প্রাণবান্ হইয়াছে। একান্তভাবে স্থিতি ও গতি উভয়ই অস্পন্দন ও অমার্জ্জিত। ইহার ভিতর রসসম্পর্কের সাহায্যে সংযম ও চাঞ্চল্য উপস্থাপিত করিতে হয়। এই কাজ অতি কঠিন। কারণ কোন কিছু একান্তভাবে স্থিতি বা গতিশীল নয়। অপরদিকে ভাবের অভিব্যক্তি না হইলে দেহ প্রাণহীন মাংসপিণ্ড হইয়া পড়ে। বাঙ্গলার শিল্পী ভাবপ্রকাশে সিদ্ধহস্ত। বীরভূমের বিচিত্র শিল্পসাধনায় ভাস্কর্য্যের একরূপ পরিণতি গৌরবের ব্যাপার। গ্রীক আর্টে ভাবগৌরব সামান্য— এই জন্য শুধু দেহভঙ্গিমাকে আশ্রয় করিয়া

প্রাচীন দেউল (তেলকুপি)।

গ্রীক ভাস্কর্য্য যশঃপ্রার্থী হইয়াছে। প্রাচ্য অঞ্চলে মানসিক ঐশ্বর্য্য ও নানা রসের অবতারণা করিয়া শিল্পী এক নূতন সৌন্দর্য্যসঙ্গমে উপস্থিত হইয়াছে। প্রাক্‌ভারতীয় তান্ত্রিক শিল্পে এই তথ্যটি বারংবার স্বপ্রকাশ হইয়া উঠে।

বীরভূমের স্থাপত্যও এক অপরূপ ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত। তেলকুপির প্রাচীন মন্দিরও যেন একটা সালঙ্কার মূর্ত্তি-

স্থানীয়। মন্দিরের হিল্লোলিত শরীর-গঠন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য ও প্রসাধন দেখিবার জিনিষ। মূর্ত্তির রসপ্রসঙ্গ অনেকে অনুভব করিতে পারে,—কিন্তু একখানি মন্দিরকে একটি গীতি-কবিতার মত সৃষ্টি করার উৎসাহ ভারতের আর কোন জায়গায় হয় নাই। এ দেশে পাকা শিল্পীর আবহাওয়ায় এক অপরূপ রূপচর্চ্চা হইয়া গিয়াছে প্রাচীন-কালে। বিরাটের কল্পনায় শুধু নয়, সামান্যের অবয়বেও জাগ্রত হইয়াছে রূপলক্ষ্মীর অস্খলিত শ্রী। বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে এমনই করিয়া বিস্তৃত হইয়াছিল এক রূপদীপালী। এক সময় এই রূপবেষ্টনী স্পন্দিত হইয়াছিল বাঙ্গলার জনহৃদয়ের আনন্দ-হিল্লোলে।
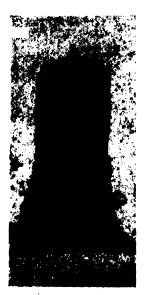
বীরভূম অঞ্চলের প্রাচীন মন্দির।

আজ সে দিন নাই। সব ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে—কেহ এ সমস্ত রচনার খবর জানে না—একটা বিরাট ও নিস্তব্ধ শ্মশান যেন চারিদিকে রচিত হইয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে। এই সমস্ত মূর্ত্তি ও মন্দিরের উপর হঠাৎ যেন যবনিকা পতন হইয়াছে—কাহারও কোন সম্পর্ক যেন ইহাদের সঙ্গে নাই। বীরভূমের প্রসিদ্ধি এ-সমস্ত প্রত্নকীর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যেন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। তেমনই বাঙ্গালার অপরাপর জেলার ইতিহাস হইতেও দেখা যায়, কি অপূর্ব্ব শ্রী ও সম্পদ্ লইয়া একদিন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কোথায় সেই শ্রী, কোথায় সেই সম্পদ্?

নিজেদের জাত্যভিমান না জাগিলে দেশের কোন আশা নাই। আমাদের এই অভিমান জাগাইবার জন্য কোন মিথ্যা কল্পনারও আশ্রয় লইবার প্রয়োজন নাই। দেশের প্রত্যেক গ্রামে, দিকে দিকে সন্ধান করিলে আজিও পর্য্যন্ত এমন সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, যাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিলে অতি সামান্য পরিশ্রমেই প্রমাণিত হইতে পারে—এ দেশের মাটিতেই একদিন মহাজাতি জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছে। সেই মাটি আছে, সেই প্রকৃতিও আছে – অথচ সেই জাতির বংশধরেরা কেবল পরানুকরণপ্রয়াসী হইয়া নিজদিগকে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর করিয়া তুলিতেছে।

এই পরানুকরণ-প্রয়াস দূর করিতে হইলে জাতির শ্রী ও সমৃদ্ধির নিদর্শনসমূহ অচিরাৎ সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। সেই সকল নিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া জাতির পূর্ব্বেতিহাসও যেমন রচিত হইতে পারে, তেমনই বিভিন্ন জাতির সহিত আমাদের আদান-প্রদানের ঐতিহাসিক তথ্যও তাহারই সহায়তায় জানা যাইতে পারে। স্বদেশের ইতিহাসের সহিত বিদেশের রচিত ইতিহাস এইরূপভাবে যুক্ত করিলে কোন্ কারণে একদিন দেশের শ্রী ও সমৃদ্ধি বজায় ছিল, আজ তাহা নাই, তাহাও জানা যাইতে পারে। সেই কারণ জানিলে, তাহার পুনরুদ্ধার এখনও অসম্ভব নহে।

ভারতীয় স্থাপত্য

... এ যাবৎ প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য বলিয়া আমাদের সম্মুখে যাহা ধরা হইয়াছে, তাহা উন্নতশীল ভারতের অথবা পতনশীল ভারতের, তাহা এখনও স্থির করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। পতনশীল জাতির কার্য্য কখনও মানুষের ইষ্টপ্রদ হয় নাই। পরন্তু তাহা জাতির কলঙ্কের পরিচয়। তাহা রক্ষা ত' দূরের কথা, যাহাতে তাহার বিলোপ সাধন হয়, তদনুরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সভ্যতার তিন স্তর (সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা)
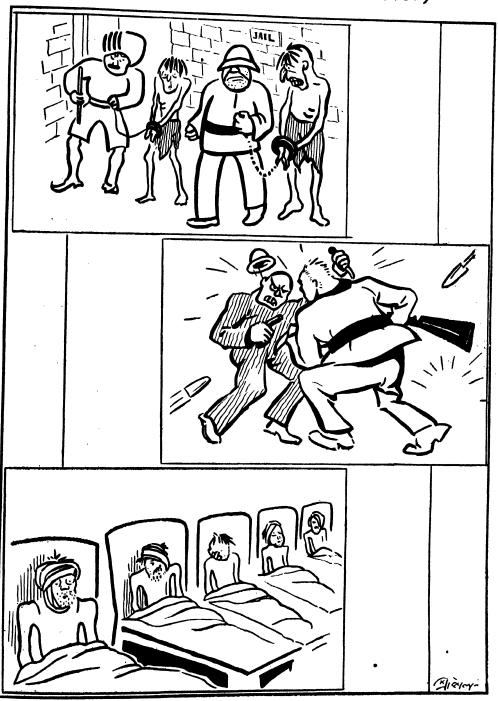
এ যুগের মানুষ একরূপ ভালই আছে, বলিতে হইবে। অন্নাভাবে চুরি করিলে তাহাদিগকে জেলে দিতেছে, অন্নপ্রাচুর্যে মারামারি করিলে তাহাদিগের উদ্দেশ্যে করতালি দিতেছে, পরিশেষে মারামারি করিয়া আহত হইলে তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইতেছে।

নিশীথ নগরী

—ভ্লাডিমির কোরোলেনকো

খ্রীষ্টমাসের প্রথম রাত্রি।

নিস্তব্ধ ধরণীর বুকে সন্ধ্যারাণী ধূসর আঁচলখানি বিছাইয়া দিলেন—নিদাঘতপ্ত ধরণীর উপর রাত্রির শীতলতা নামিয়া আসিল। নৈশ-আকাশে তারাদের মেলা বসিল—সব-কিছুকেই মায়াময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। নৈশ-আকাশের মাঝে ছোট্ট সহরটি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে, যেন সেও গির্জ্জার প্রথম ঘণ্টাধ্বনি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। সহরটি কিন্তু তখনও সুপ্তির কোলে আশ্রয় লয় নাই—কিসের প্রতীক্ষায় সে আজ নিদ্রাহীন। মাঝে মাঝে দুই একটি কর্ম্ম-ক্লান্ত পথিককে দেখা যাইতেছিল—দিনশেষে তাহারা তাহাদের শান্তির আশিসে ভরা কুটিরে ফিরিয়া যাইতেছে। জীবনের যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু সুন্দর, তাহা আজ গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অন্ধকারের নীচে মাঠ ও পথ নিঃশব্দে পড়িয়া আছে—আজিকার এই নীরবতা বড়ই রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছিল।

চাঁদ উঠিয়াছে—তাহার আবছায়ায় নিশীথ-নগরী আরও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছিল। নগর-তোরণে রক্ষীরা নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে চাঁদকে দেখা গেল—তরলিত জ্যোৎস্নায় নিশীথ-নগরী হাসিয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-মগ্ন নগরীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি জাগিয়া উঠিল—তাহার রেশ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নিশীথ-নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। নগরীর অপর প্রান্তে অবস্থিত বিষাদমগ্ন বাড়ীটির বুক চিরিয়া আরও একটি ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল। মিলিত কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত-ধ্বনিও দূর হইতে শুনা যাইতেছিল। সঙ্গীত থামিয়া গেল—তাহার রেশ আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রির নিস্তব্ধতা আবার সব-কিছুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ঘরের বাতি নিভিয়া গেল—কেবল গির্জ্জার উজ্জ্বল আলোক জানালা দিয়া বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

বিষাদমগ্ন কালো বাড়ীটির লৌহকপাট খুলিয়া একদল রক্ষী অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জিত হইয়া বাহিরে আসিল। তাহারা কারাগৃহের প্রাচীরের পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কারাগৃহের অপর দিকের ফটকের সামনে গিয়া দল হইতে একজন বিচ্ছিন্ন হইয়া সেইখানে রহিয়া গেল। সেখানে যে ছিল, সে নিম্নস্বরে আগন্তুককে কি বলিয়া দলের সহিত চলিয়া গেল।

আগন্তুক একজন নবাগত সৈনিক। আজ সে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারা দিবার অধিকার পাইয়াছে। লোকটির চালচলনে গ্রাম্য ভাব পরিস্ফুট। লোকটি অল্পদিন হইল পল্টনে ভর্ত্তি হইয়াছে—সব কিছুই তাহার নিকট কিরূপ রহস্যময় বলিয়া বোধ হইতেছিল। সে ফটকের সম্মুখে বন্দুকহস্তে পায়চারি করিতে লাগিল।

আজ কারাগৃহে নবপ্রাণের সঞ্চার হইয়াছিল। বহুদিন পরে কারাগৃহে আজিকার এই উৎসব। গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি বন্দীদের প্রাণে আশার বাণী বহন করিয়া আনিতেছিল। বন্দীদের ঘরের দরজা খুলিয়া গেল—বন্দীরা সারি বাঁধিয়া গির্জ্জার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। শৃঙ্খল-ধ্বনিতে কারাগৃহের অঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিল। বন্দীর দল গির্জ্জার মধ্যে প্রবেশ করিলে গির্জ্জার লৌহকপাট বন্ধ হইয়া গেল।

কারাগৃহে চারিজন বন্দী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তিনজন তাহাদের নির্জ্জন-বাস হইতে গির্জ্জার সঙ্গীত শুনিবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করিতেছিল। অন্য একটি ঘরে আরও একজন লোক বিছানার উপর শুইয়া ছিল, লোকটি অত্যন্ত অসুস্থ।

কারাগৃহের অধ্যক্ষ আজই কিছু আগে এই লোকটিকে দেখিয়া তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। লোকটির জীবনীশক্তির সবটাই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—বাঁচিবার আশা খুবই কম। সে নির্জ্জীবভাবে নিজের শয্যায় পড়িয়া ছিল।

লোকটির বয়স বেশী হইবে না। সে ভুল বকিতেছিল—বোধ হয় তাহার জীবনের পূর্ব্বস্মৃতি তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল। ভাগ্য-বিড়ম্বিত হইয়া আজ সে মৃত্যুপথে পা বাড়াইয়াছে। সাইবেরিয়া হইতে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া, বহু বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করিয়া সে তাহার গৃহে ফিরিয়া আসিতেছিল। অনাহারে, অর্দ্ধাহারে, বিপদ আপদে একটিমাত্র আশা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল—সে সকল কিছুকে তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিতেছিল, যদি একটিবারও তাহার জন্মভূমির দর্শন পায়, যদি একবার তাহার জন্মভূমির পাখী-ডাকা স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে পায়। কিন্তু হতভাগ্য সে, ভাগ্য-বিড়ম্বিত হইয়া তাহার গৃহ হইতে কিছু দূরে আসিতেই আবার ধরা পড়িল। তখন হইতেই সে এইখানে।

বন্দীর কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। তাহার জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ-নয়নে দীপ্তি ফিরিয়া আসিল। তাহার মনে ঝড় বহিতে লাগিল। আকাশ, বাতাস সকলেই তাহাকে আহ্বান করিতেছিল—সেই অপরিচিত কণ্ঠে। সবই তাহার পরিচিত। যে কণ্ঠস্বর তাহাকে সুদূর তুষারাবৃত সাইবেরিয়াতেও পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, যে স্বরের আহ্বানে সে মৃত্যুকেও গ্রাহ্য না করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল—এ সেই পুরাতন আবাহন-গীতি। মুক্ত বাতাসের স্পর্শ অনুভব করিতে, মুক্ত বিহঙ্গমের সঙ্গীত শুনিতে, সে বাহিরে ছুটিয়া যাইতে চায়। আজিকার এই মদির-মন্দ্র নিশীথ রজনীতে সবাই মুক্ত, সবাই স্বাধীন—কিন্তু সে যে বন্দী, বন্দীর জীবনে পাখীর গান নাই, বাতাসের হিল্লোল নাই, আছে শুধু পরাধীনতার দুর্ব্বিসহ যাতনা।

কি জানি কেন তাহার মনে হইতে লাগিল যে, আজিকার এই নীরব নিশীথে বাহিরের মুক্ত বাতাস তাহার নিরানন্দ কুঠুরীতে মুক্তির অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছে। বন্দী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল—আনন্দে তাহার বুকের স্পন্দন বাড়িয়া গিয়াছে : তাহার সম্মুখে রক্ষীহীন উন্মুক্ত কপাট।

তাহার দুর্ব্বল শরীরে নবশক্তির সঞ্চার হইল। তাহার সকল ব্যথাকে ডুবাইয়া দিয়া একটি মাত্র চিন্তা প্রবল হইয়া উঠিল—সে একা, সম্মুখে তার উন্মুক্ত দুয়ার। সে দাঁড়াইয়া উঠিল—চোখে তার প্রোজ্জ্বল দীপ্তি, মুখে তার আশার আনন্দ।

গির্জ্জার অস্ফুট সঙ্গীত-ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। এক অভূতপূর্ব্ব পুলকে সে পুলকিত হইয়া উঠিল—তাহার চোখে স্বপনাবেশ ঘনাইয়া আসিল। তাহার স্বপ্নজড়িত নয়নে ভাসিয়া উঠিল—রূপসী নিশীথিনী। তাহার জন্মভূমির শ্যামল বৃক্ষ-লতা তাহার কানে কানে কথা কহিতে লাগিল। বন্দী আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল—তাহাকে বহুপথ অতিক্রম করিতে হইবে, সময়ও আর নাই

ও দিকে নবাগত রক্ষী কারাগৃহের সম্মুখে পায়চারি করিতেছিল। সম্মুখে তাহার তুষারাবৃত প্রশান্ত চরিত্রক্ষেত্র। বাতাসে কম্পমান বৃক্ষের মর্ম্মরধ্বনি তাহাকেও উন্মনা করিয়া তুলিতেছিল।

সে প্রাচীরের গায়ে তাহার হস্তস্থিত বন্দুকের উপর ভর দিয়া নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাহার স্বপ্নপূর্ণ অবস্থানের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার গ্রাম্য মন এখনও একেবারে মরিয়া যায় নাই—সম্মুখের উন্মুক্ত জ্যোৎস্না তাহাকে মগ্ন করিয়াছিল, তাহাকে স্বপ্নাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। কত দিন পূর্ব্বেও সে মুক্ত ছিল, তাহার ইচ্ছামত সে কাজ করিতে পারিত, বাধা দিবার কেহ ছিল না, কিন্তু এখন সে পরাধীন, আজিকার আবছায়া-ঘন নীরব রজনীতে তাহাকে কারাগৃহ রক্ষা করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্তে সেও একা—সম্মুখে উদার, প্রশান্ত প্রকৃতি। নিজের গ্রামের মধুস্মৃতি তাহাকে উন্মনা করিয়া সেও স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

সহসা সে তাহার পারিপার্শ্বিক সব-কিছুর উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিল—মাঠ, কারাপ্রাচীর, বন্দুক, ইহারা কারা? কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র, আবার সে অচেতন হইয়া পড়িল, সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রাচীরের উপরে আর একজনের জ্বলন্ত চোখ দুটি দেখা গেল বন্দী প্রাচীরের উপর সম্মুখের স্বপ্নরাজ্যের দিকে চাহিয়া ছিল। ধীরে ধীরে সন্তর্পণে সে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল।

কারাগৃহের সম্মুখে গির্জ্জার দুয়ার খুলিয়া গেল—মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীতে নিশীথ নগরী মুখরিত হইয়া উঠিল। রক্ষীর স্বপ্নাবেশ টুটিয়া গেল—বন্দী তখন রাস্তা ছাড়িয়া মাঠ পার হইবার জন্য দ্রুতপদে চলিতেছে।

বন্দুক সেইদিকে লক্ষ্য করিয়া রক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল—কে যায়? দাঁড়াও!

তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর আসিল না,—তাহার আদেশও কেহ পালন করিল না। রক্ষীর কর্ণে দুইটি কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল—কর্ত্তব্য, দায়িত্ব। বন্দুক ছাড়িবার আগে সে কি যেন চিন্তা করিল।

নিশীথ-নগরীকে মুখরিত করিয়া গির্জ্জা হইতে সম্মিলিত কণ্ঠের সঙ্গীত শুনা যাইতেছিল—তাহার সুদূর প্রসারী মূর্চ্ছনা দূরে দূরান্তরে ধাক্কা খাইয়া ফিরিতে লাগিল। সঙ্গীতের শেষ মূর্চ্ছনা মিলাইয়া গেল—আসিল প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার বুক চিরিয়া মৃত্যু-দানব গর্জ্জন করিয়া উঠিল—তারপর মৃত্যুর কাতর আর্ত্তনাদ!

নিশীথ-নগরী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল

অনুবাদক—শ্রীশিশির চট্টোপাধ্যা

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাদ্রাজ হইতে প্রথম পত্র

কলিকাতার একটি অট্টালিকার কক্ষে বসিয়া গৌরদাস বসাক এক খানা চিঠি পড়িতেছিলেন; পিয়নের কর-লাঞ্ছনে খামখানাতে বিচিত্র পথের ইতিহাস অঙ্কিত। লেখক বলিতেছেন:—

"প্রিয়তম বন্ধু, তুমি আমাকে ভুল বুঝিয়াছ। আমার পক্ষে তোমাকে ভোলা অসম্ভব; তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার জানা-শোনা লোকদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী করিয়া তোমার কথাই মনে হইতেছে। কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে বিরক্তি ও উদ্বেগে আধ-পাগলের মত হইয়াছিলাম। মনে করিও না যে, কেবল তোমাকেই বিদায়-জ্ঞাপক পত্র দিই নাই; দু' তিন জন ছাড়া কাহাকেও আমার মনের কথা বলি নাই। এখানে আসিবার পরে জীবিকা-উপায়ের জন্য প্রথমে খুব চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, বন্ধুবিহীন বিদেশীর পক্ষে ইহা বড় সহজ কাজ নয়। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার বিপদ এক রকম কাটিয়া গিয়াছে: এখন আমি জাহাজের সেই নাবিকের মত, যে ঝড়ের মধ্যে যে-কোন একটা বন্দরে আসিয়া আশ্রয় পাইয়াছে! এই দেখ কেমন একটা উপমা দিলাম!

আমার বিবাহ সম্বন্ধে যে-সংবাদ পাইয়াছ তাহা সত্য। মিসেস্ ডি. জাতিতে ইংরাজ। তাঁহার পিতা এই প্রদেশের একজন নীলকর ছিলেন; আমাদের বিবাহের পথে যথেষ্ট বাধা ছিল; তাঁহার বান্ধবেরা এই বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না।......

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমি একখানা কাব্য লিখিতে সমর্থ হইয়াছি; গ্রন্থকার হিসাবে ইহাই আমার প্রথম রীতিমত আত্ম-প্রকাশ। কাব্যখানা দুই সর্গে সমাপ্ত; নাম, 'ক্যাপটিভ্ লেডি।' ইহাতে বার শত ছত্র ভাল, মন্দ, মাঝারি কবিতা আছে—আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ইহা তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে লিখিত!

আমি ইহা স্থানীয় একখানা কাগজের জন্য লিখিয়াছিলাম; ইহার সম্পাদক, তিনি ভারতবিখ্যাত ব্যক্তি, আমার গুণগান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এখানকার অনেক গুণী লোক, যাঁহাদের মতামতের উপর নির্ভর করা যায়, তাঁহারা গ্রন্থাকারে ইহা ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। কাজেই দেখ, ছাপাখানার দৈত্য-দানবেরা আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বন্ধু, তোমাকে একটি অনুরোধ; এখানে সামান্য কয়েকজন লোককে আমি জানি; কাজেই বই ছাপিবার খরচ উঠাইবার আশা এখানে করিতে পারি না। তুমি কি কয়েক জন গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পার না? তুমি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় পার। দু' টাকা গ্রন্থের মূল্য; আমাদের স্কুল-কলেজের বন্ধুদের মধ্যে হইতেই জন চল্লিশেক সংগ্রহ হইতে পারে। তুমি শীঘ্র আমাকে জানাইবে—কতগুলি বই তোমার দরকার।......এইবার দেখাও তোমার ভালবাসা কত; আমি সত্যই বলিতেছি—বই হইতে লাভ করিবার ইচ্ছা আমার নাই—কেবল ক্ষতি না হয়—ইহাই চাই।......

গৌরদাস, তুমি আমাকে শ্রীরামপুর সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আর কাশীদাসী মহাভারত পাঠাইতে পার না কি? বাংলা ভুলিয়া যাইবার মত হইয়াছে!

পুনশ্চ:—

আফিসে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি; বাসায় ফিরিয়া মিসেস্ দত্তকে তোমার চিঠি দেখাইব—তিনি খুব খুসী হইবেন। মেয়েটি খুব ভাল!"

লেখকের ঠিকানা উল্লেখযোগ্য; মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এসাইলাম; ব্ল্যাকটাউন; তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯।

গৌরদাস পত্র পড়িয়া হাসিলেন—মধুসূদন ঠিক তেমনই আছে, একটুও বদলায় নাই; এমন কি বাংলা ভুলিবার গৌরবও আগের মত! তবু তিনি খুসী হইলেন—অনেক দিন পরে বন্ধুর সন্ধানে।

আমরা খাই কি

—ডাক্তার

"মানুষ খায় কি?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে "মানুষ খায় না কি?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ। প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ্-জগতের এমন কোনও জিনিসের নাম করা শক্ত যা মানুষে খায় না। রূপকের সাহায্য নিলে বলা যেতে পারে, মানুষ পাহাড়-পর্ব্বতও খায়, কারণ সে নুন এবং চুণ দুইই খায়। কথায় আছে "কাকে কাকের মাংস খায় না"। মানুষের বেলায় সে কথা খাটে না— কারণ নরমাংসভোজী লোকের অভাব এ পৃথিবীতে খুব বেশী নেই।

কারলাইল এক জায়গায় বলেছেন "man is an omnivorous biped that wears breeches". বাংলায় এর মানে হয়, মানুষ হচ্ছে সর্ব্বভুক্ দ্বিপদ, যে পাজামা পরে। মানুষের সংজ্ঞা দিতে হলে এর গোড়ার দিকটা সম্বন্ধে তর্ক চলে না। পাজামা সব দেশের লোকে পরে না, কিন্তু মানুষ যে সর্ব্বভূক্, সে কথাটা অবিসংবাদী সত্য। জলচর, স্থলচর, কিংবা খেচর কোন প্রাণী কিংবা স্থলজ এবং জলজ কোনও উদ্ভিদ্ মানুষ বাদ দেয় না। শুধু বাদ দেয় না বললে ভুল হয়, কারণ কাঁচা পাকা ডাঁসা কিংবা রান্না করা জিনিষ ত সে খায়ই—পচা কিংবা জ্যান্ত প্রাণীও সে খায়। মানুষ জ্যান্ত প্রাণী খায় শুনে হয়ত অনেকে ভাববেন, এ ব্যাপারটা অসভ্যদের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তথাকথিত সভ্য জাতি সাহেবরা জ্যান্ত ঝিনুক (oyster) খুব তারিফ করে খান। Oysterএর সঙ্গে শ্যাম্পেন তাঁদের একটা খুব নামজাদা খানা। অতএব দেখা যাচ্ছে, এ রকম ভাবে বলতে গেলে মানুষের খাদ্য-বর্ণনা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়।

কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা বলেন, "মানুষ হাতী-ঘোড়া যা হয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করুক না কেন—আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, তারা জল বাদে মাত্র পাঁচ রকমের জিনিষ খায়। তার শরীরের জন্য জল বাদ দিলে মাত্র এই পাঁচ রকমের জিনিষই দরকার হয়, যথা, প্রোটীন (protein) অর্থাৎ ছানাজাতীয় জিনিষ, ফ্যাট্ (fat) অর্থাৎ স্নেহজাতীয় জিনিষ, কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শর্করাজাতীয় জিনিষ, মিনার‍্যাল সল্টস্ (mineral salts) অর্থাৎ খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিন (vitamines), যার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে "খাদ্যপ্রাণ।" বৈজ্ঞানিক বলেন, এই পাঁচ রকমের জিনিষ প্রয়োজন হয় বলেই মানুষ খায় এবং সেই প্রয়োজনের তাঁরা নিম্নলিখিত রকমে নির্দেশ দিয়েছেন:— ১। শরীরের ক্ষয়পূরণ এবং যাদের শরীরের পূর্ণতা হয় নি তাদের বৃদ্ধির মশলা জোগান; (২) দেহের কার্য্যশক্তি দান; (৩) দেহের তাপসমতা রক্ষা।

প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট আর ফ্যাট—খাদ্যের এই তিনটিই হচ্ছে মুখ্য জিনিষ—এর মধ্যে কোনটা বাদ দিলে শরীরের পক্ষে কাজ চালান শক্ত হয়। কার্বোহাইড্রেটের বদলে ফ্যাট, কিংবা ফ্যাটের বদলে কার্বোহাইড্রেট দিয়ে কাজ চালান যায় বটে, কিন্তু তিনটি জিনিষ যদি উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, তা হলে শরীরের ওপর অত্যাচার একটু কম করা হয়। খাদ্যে ফ্যাট আর কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ দেশভেদে তফাৎ হয়—যেমন এস্কিমোদের দেশে খাদ্যে ফ্যাটের পরিমাণ বেশী, আর আমাদের দেশে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশী।

প্রোটীন ইত্যাদি জিনিষগুলি কি, তার বিশদ আলোচনা করবার আগে কতকগুলি রাসায়নিক ব্যাপার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। আজকালকার এই ইলেকট্রনের যুগে, আমরা এ্যাটম্ অর্থাৎ পরমাণুকে একটা প্রকাণ্ড জিনিষ বলে ভাবতে শিখেছি, কিন্তু ৪০।৪৫ বছর পূর্ব্বে এই এ্যাটমই ছিল মানুষের ধারণায় সব চেয়ে ছোট জিনিষ। ইলেকট্রন্ হচ্ছে এ্যাটমের চেয়ে অনেক ছোট জিনিষ, কিন্তু এ্যাটমই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জিনিষ, যার দ্বারা রাসায়নিক সংমিশ্রণ সম্ভব হয়। এক বা ততোধিক এ্যাটম্ যখন একসঙ্গে সংযুক্ত থাকে, তখন তার নাম হয় মলিকিউল (molecule) অর্থাৎ অণু, আর এই অণুই হচ্ছে ক্ষুদ্রতম জিনিষ, যা' অন্য অণুর

সঙ্গে যুক্ত না হয়েও পৃথক্ ভাবে থাকতে পারে। এক মলিকিউল জলে আছে তিনটি এ্যাটম্, আর এক মলিকিউল লবণে আছে দুইটি এ্যাটম, কিন্তু এমন অনেক মলিকিউল আছে (যেমন প্রোটীন, ফ্যাট, কিংবা কার্ব্বোহাইড্রেট মলিকিউল), যাতে শত শত কেন, সহস্র সহস্র এ্যাটম্ নানাভাবে সাজান আছে। কি-রকম ভাবে সাজান আছে কেউ কখনও চক্ষে দেখে নি, কারণ বর্ণনা শুনে যদিও মনে হচ্ছে, এরা না জানি কি বৃহৎ ব্যাপার, কিন্তু বাস্তবিক ওরা এত ছোট যে, জগতের শ্রেষ্ঠ মাইক্রস্‌কোপ দিয়েও ওদের কিছুই দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিকরা নানা গবেষণা করে এদের সাজানর একটা ধারণা করে নিয়েছেন।

প্রোটীন অর্থে আমরা সাধারণতঃ বুঝি মাংস কিংবা সেই জাতীয় জিনিষ। এর বাংলা নামকরণ হয়েছে, "ছানাজাতীয়" পদার্থ। তার মানে এ নয় যে, কেবল মাংসে এবং ছানাতেই প্রোটীন আছে। চিনি, ঘি, তেল প্রভৃতি গোটাকতক জিনিষ বাদ দিলে—মানুষ যা খায়, প্রায় সব জিনিষেই কিছু না কিছু প্রোটীন আছে। এমন কি অনেক উদ্ভিজ্জ জিনিষে মাংসের চেয়ে বেশী প্রোটীন আছে। যেমন ডা'লে (বিশেষ করে মুশুরীর ডালে) আছে শতকরা প্রায় ২২ ভাগ প্রোটীন আর মাংসে আছে শতকরা ২০ ভাগ।

মাংসে প্রায় শতকরা ২০ ভাগ প্রোটীন থাকে। বাকিটা প্রধানতঃ জল। এখানে মাংস অর্থে মেদশূন্য মাংস ধরা হয়েছে, কারণ মেদের পরিমাণ শরীরের সব জায়গায় সমান নয়। রক্তেও প্রোটীনের পরিমাণ কম নয়। রক্ত আর মাংসেরই দেহ যখন আমাদের, তখন প্রোটীনের এত কদর কেন, বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না।

প্রোটীন নিয়ে গবেষণা বহুদিন ধরে চলছে এবং মনে হয়, এখনও শেষ হতে অনেক দেরী আছে। প্রোটীন এক রকমের নয়, অনেক রকমের। পালং শাকের প্রোটীন আর মানুষের দেহের প্রোটীন যে এক রকম নয়, তা দেখলেই বোঝা যায়। তা ভিন্ন শরীরের মধ্যে যখন সব কোষের ব্যবহারও এক ধরণের নয়, তখন তাদের কাঠামো যে জিনিষের তৈরী, সেটাও এক ধরণের হওয়া সম্ভব নয়। রাসায়নিকরা প্রোটীনকে ভেঙ্গে-চুরে দেখেছেন যে, এর মধ্যে চারটি জিনিষ সব সময়েই বর্ত্তমান—(১) কার্ব্বন, (২) অক্সিজেন, (৩) হাইড্রোজেন, (৪) নাইট্রোজেন। এই চারটি জিনিষ সব সময়েই সব রকম প্রোটীনেই থাকে—এ গুলি বাদে বিভিন্ন রকমের প্রোটীনে আরও কতকগুলি জিনিষ পাওয়া যায়, যেমন—গন্ধক, ফস্‌ফরাস্, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি। মানুষের তিন রকম প্রধান খাদ্যকে অর্থাৎ প্রোটীন, কার্ব্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটকে বিশ্লেষণ করলে কার্ব্বন, অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পাওয়া যায়, কিন্তু নাইট্রোজেন পাওয়া যায় একমাত্র প্রোটীনেই। এই নাইট্রোজেনই হল প্রোটীনের বিশেষত্ব।

প্রোটীনের মূল পদার্থ হল এই চারিটি—কিন্তু যদি প্রোটীনকে শেষ অবধি বিশ্লেষণ না করা হয়, তা হলে পাওয়া যায় কতকগুলি জিনিষ, যার নাম দেওয়া হয়েছে এ্যামাইনো এ্যাসিড (amino acids)। প্রোটীনের বিশেষত্ব যেমন নাইট্রোজেন, এ্যামাইনো এ্যাসিডের বিশেষত্ব তেমনই এ্যামাইনো গ্রুপ (amino group)। এক এ্যাটম নাইট্রোজেন আর দুই এ্যাটম্ হাইড্রোজেন যখন একটি মলিকিউল তৈরী করে (রাসায়নিকরা লেখেন NH_2), তখন তাকে বলা হয় এ্যামাইনো গ্রুপ। এ্যামাইনো এ্যাসিডে থাকে এই এ্যামাইনো গ্রুপ, আর এর সঙ্গে অনেকগুলি এ্যাটম্ কার্ব্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন।

কাউকেও যদি চার রং-এর ২০।২৫ খানি করে ছোট ছোট খেলার ইঁট দেওয়া হয় এবং বলা হয়, সেই গুলি সাজিয়ে, যত রকম আকারের এবং রং-এর সম্ভব হয়, ঘর তৈরী করতে, তা হলে দেখা যাবে, সে অসংখ্য আকারের এবং রং-এর ঘর তৈরী করেছে। কোনও ঘরখানা হয়ত ৪০ খানি ইঁটের, আবার কোনও খানা হয়ত মাত্র ৪ খানি ইঁটের। কোনও ঘরের হয়ত চারখানি দেওয়ালই এক রং-এর, আবার কোন ঘরের সব দেওয়ালই বিচিত্র রং-এর। আমরা যদি এই ইঁটগুলিকে ধরি এ্যামাইনো এ্যাসিড আর ঘরগুলিকে ধরি প্রোটীন—তা হলে মনে হয়, ব্যাপারটা ধারণা করার কিছু সুবিধা হতে পারে। সংসারে এ্যামাইনো এ্যাসিড আছে বহু রকমের, কিন্তু মানুষের শরীরে এদের সংখ্যা মাত্র ২৫ রকমের। সেই ২৫ রকমের

এ্যামাইনো এ্যাসিডের দ্বারা, আমাদের উদাহরণের ঘরের মত, বহু আকার এবং প্রকারের প্রোটীন পাওয়া যেতে পারে। কারণ, এ্যামাইনো এ্যাসিডের সমষ্টিই হচ্ছে প্রোটীন। আমাদের উদাহরণের ঘরের মত প্রোটীনের সংখ্যাও অনেক।

আমরা সাধারণতঃ যে সব জিনিষ খাই, সবই প্রায় পাঁচমিশালী, অর্থাৎ তা'তে প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, খনিজ পদার্থ, জল এবং ভিটামিন সবই থাকে। একেবারে খাঁটী প্রোটীন বলতে বোঝায় ডিমের সাদা ভাগটা আর জিলাটিন্। সাধারণ বাঙালীর খাবারে থাকে চাল, ডাল, তরকারী, আর যাঁদের অবস্থা একটু ভাল, তাঁদের খাবারে থাকে এর ওপর দুই এক টুকরো মাছ এবং সামান্য দুধ। এই সব জিনিষ পাকস্থলী আর অন্ত্রের মধ্যে নানা রকম রসের সংস্পর্শে আসে এবং জীর্ণ হয়। প্রোটীন অন্ত্রের মধ্যে জীর্ণ হ'বার পর শেষ ফল দাঁড়ায় কতকগুলি এ্যামাইনো এ্যাসিড। এই এ্যামাইনো এ্যাসিড হবার পরই তবে রক্ত এদের গ্রহণ করতে পারে এবং রক্তের দ্বারা এরা বাহিত হয়ে যায় শরীরের প্রত্যেক কোষের কাছে। যে কোষের যে ধরণের প্রোটীন দরকার, সেই কোষ সেই প্রোটীনের মূল এ্যামাইনো এ্যাসিডগুলি বেছে নেয় এবং নিজের প্রয়োজন মত প্রোটীন তৈরী করে নেয়। সব প্রোটীন সমান নয়, আবার সব প্রোটীনে সব রকম এ্যামাইনো এ্যাসিড নেই বলেই আমাদের খাদ্যে নানা রকম প্রোটীনের দরকার হয়। জান্তব প্রোটীন হলে এই এ্যামাইনো এ্যাসিডগুলি পাবার সুবিধা হয়, কারণ মানুষের দেহযন্ত্রের সঙ্গে রাসায়নিক হিসাবে অন্য জন্তুর দেহের তফাৎ খুব বেশী নয়। ভেষজ প্রোটীন হ'লে সব সময়ে সব রকমের এ্যামাইনো এ্যাসিড পাওয়া যায় না, আর যাও বা পাওয়া যায়, তার মধ্যে অনেক হয়ত আবার অদরকারী থাকে, সেই জন্য ভাঙ্গা-গড়া এবং ফেলা-ছড়া করতে হয়। সেনেট হাউস ভেঙ্গে সংস্কৃত কলেজ তৈরী করা সহজ, কিন্তু শেয়ালদা ষ্টেশন তৈরী করতে হলে থামের ইঁটগুলি সব বরবাদ হয়ে যায়।

জিলাটিন সম্বন্ধে এই খানে একটা মজার ব্যাপার বলা হয় ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে যে সব জন্তু ব্যবহার হয়, তাদের যে সব অংশ অখাদ্য বলে ফেলে দেওয়া হয়, যেমন হাড়, ক্ষুর, শিং প্রভৃতি—জিলাটিন তৈরী হয় সেই সব জিনিষ থেকে। এ সব জিনিষ অখাদ্য বলে জিলাটিন তৈরী করার খরচ কম, কারণ কাঁচামালের দাম কম। খাদ্য হিসাবে একে ব্যবহার করা যেতে পারে কি না, সেটা লোকের ভাববার কথা হয়ে দাঁড়াল। খাদ্য-মূল্য অনুসন্ধানের আর একটি কারণ হচ্ছে, এর মধ্যে নাইট্রোজেন আছে খুব বেশী (যে জিনিষটার জন্য প্রোটীনের কদর), আর এটা একেবারে নির্ভেজাল প্রোটীন। ১৮১৪ সালে প্যারিসের একাডেমী অব সেঁইন্সে জিলাটিনের খাদ্য-মূল্য গবেষণার জন্য বসালেন এক কমিশন। তাঁরা অনেক মাথা ঘামিয়ে গবেষণা করে বললেন—"প্রোটীন হিসাবে জিলাটিন একেবারে আদর্শ খাদ্য। এ রকম খাদ্য আর বিশ্ব-সংসারে দেখা যায় না।" ব্যস্—আর যায় কোথায়। হাসপাতালের সব রুগীদের তাড়াতাড়ি চাঙ্গা করে দেবার জন্য তাদের যথাশক্তি এই আদর্শ খাদ্য খাওয়ান হ'তে লাগল! রুগীদের দুর্ভাগ্য, তাদের এমন চমৎকার জিনিষ সহ্য হল না এবং বিশেষ একটা কিছু উপকার হল না এই দিয়ে। অসন্তোষ অভিযোগ আরম্ভ হল। কিন্তু সব দেশেই ত সরকারী লাল ফিতার অত্যাচার আছে। দ্বিতীয় কমিশন বসাতে বসাতে ১৮৪১ সাল এসে গেল। তাঁরা ফের গবেষণা করে বললেন—এটা একটা খাদ্যই নয়, একেবারে অখাদ্য! এ অবস্থা সব দেশেই হয়—ঘড়ীর পেণ্ডুলাম দোলে এ পাশ থেকে ও পাশ, মাঝ-পথে থামে না। এখন জানা গেছে, এটা একটা খুব বড় প্রোটীন-খাদ্যও নয় কিংবা একেবারে অখাদ্যও নয়—এতে তিনটি এ্যামাইনো এ্যাসিডের অভাব আছে যথা—tryptrophan, tyrosin আর cystin। সেই জন্য প্রোটীন হিসাবে কেবল যদি জিলাটিন খাওয়া যায়, তা হলে শরীরের সব প্রোটীনের ক্ষয়পূরণ হয় না। এর সঙ্গে খাওয়া উচিত এমন প্রোটীন, যাতে এই তিনটি এ্যামাইনো এ্যাসিড আছে। এই রকম কোনও কোনও এ্যামাইনো এ্যাসিডের অভাব আছে বলেই জনার, মকাই, ছোলা প্রভৃতি এক মাত্র প্রোটীন খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। এদের সঙ্গে অন্য প্রোটীনও খেতে হয়।

প্রোটিনের প্রয়োজন হয় শরীরে নিয়ত যে ক্ষয় হচ্ছে তার পূরণের জন্য, আর যাদের শরীর এখনও পূর্ণতা পায় নি অর্থাৎ অল্পবয়স্করা, তাদের এবং যাদের শরীর রোগে ক্ষীণ হয়েছে, তাদের বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু প্রোটীনের মস্ত একটা অসুবিধা আছে। আজকে যে প্রোটীন খাদ্যে ছিল, তার কাজ হয়ে যাবার পরে অর্থাৎ ক্ষয়পূরণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে, সেটা শরীর ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। উদ্বৃত্ত প্রোটীনের নাইট্রোজেন ভাগ শরীর থেকে বেরিয়ে যায় মল-মূত্রের সঙ্গে, আর বাকী অংশ শরীরে তাপ এবং কার্য্যশক্তির ইন্ধনরূপে ব্যবহার হয়। যদি সঞ্চয় করা সম্ভব হ'ত, তা হলে পৃথিবীতে জলপাইগুড়ীর বাইশ ইঞ্চি পায়ের পাতাওয়ালা লোকের মত লোকের অভাব হ'ত না, কারণ প্রোটীন সঞ্চয় করা মানেই দেহের মাংস বৃদ্ধি করা এবং তা হলে যাদের পয়সার অভাব নাই, তারা অজস্র প্রোটীন খেয়ে পর্ব্বতপ্রমাণ চেহারা করে ফেলতেন। অনন্ত মাংসবৃদ্ধি যখন দেখা যায় না, তখন এ কথাটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অত্যধিক প্রোটীন খাওয়া উপকারের চেয়ে অপকারের কারণই হবে। অপকার যে করবে, তার কারণ হচ্ছে পাকস্থলী যখন খাদ্য পায়, তখন চেষ্টা করে সেটাকে হজম করতে—আবার কেবল হজম করলেই ত' হবে না, তার নাইট্রোজেন বা'র করবার জন্য মূত্রগন্থিকে (kidney) বৃথাই খাটতে হবে। এ রকম অত্যাচার শরীর বেশী দিন সহ্য করতে পারে না এবং ফলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। এ কথাটা সত্য কেবল তাদের বেলাই, যাদের শরীর পূর্ণতা পেয়েছে কিংবা যাদের শরীর কোনও কারণে হঠাৎ ক্ষীণ হয়ে যায় নি।

কার্ব্বোহাইড্রেটের বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে শর্করা জাতীয় পদার্থ। কেবল চিনিই যে কার্ব্বোহাইড্রেট তা নয়, শ্বেতসারও এই জিনিষ। বাঙ্গালীর খাদ্যে ঘি, তেল প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ বাদ দিলে প্রায় সব জিনিষেই কার্ব্বো-হাইড্রেট আছে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে কার্ব্বোহাইড্রেট থেকে কার্ব্বোহাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পাওয়া যায়। তার মানে এ নয় যে, যেখানেই এই তিনটি জিনিষ বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে, তাই কার্ব্বোহাইড্রেট। একটু বিশেষত্ব থাকা দরকার। জলের মলিকিউলে আছে দুই এ্যাটম্ হাইড্রোজেন আর এক এ্যাটম্ অক্সিজেন—বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় H_2O। কার্ব্বোহাইড্রেটে আছে—কার্ব্বন আর এই জলের মলিকিউল। এক বা একাধিক এ্যাটম্ কার্ব্বনের সঙ্গে, এক বা একাধিক জলের মলিকিউল যখন সংযুক্ত থাকে, তখনই তাকে কার্ব্বোহাইড্রেট মলিকিউল বলা যায়।

বাঙ্গালীর খাদ্যে, মাংস, মাছ, ঘি, তেল প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ বাদ দিলে প্রায় সব জিনিষেই কার্ব্বোহাইড্রেট আছে। সাধারণ বাঙ্গালী বেঁচে আছে মুখ্যতঃ কেবল কার্ব্বোহাইড্রেট খেয়ে। আমাদের মুখ্য খাদ্য হচ্ছে চাল—তা'তে আছে প্রায় শতকরা আশীভাগ এই কার্ব্বোহাইড্রেট, আর পাঁচ থেকে সাতভাগ প্রোটীন; ফ্যাটের পরিমাণ চালে নগণ্য।

প্রোটীন যেমন শরীরে জীর্ণ হবার পর এ্যামাইনো-এ্যাসিড রূপ পায়—কার্ব্বোহাইড্রেট তেমনি পাকস্থলী আর অন্ত্রের রসে জীর্ণ হয়ে ডেক্সট্রোজ্ (dextrose or glucose) রূপ পায়; তা সে নতুন গুড়ের পাটালীই হোক্ আর পেশোয়ারী চালের পোলাওই হোক্। এখানে বলে রাখা ভাল, ডেক্সট্রোজ্ (dextrose) আর গ্লুকোজ্ (glucose) একই জিনিষের দুই নাম—কোনও তফাৎ নাই। এই গ্লুকোজ্ অবস্থাতেই কার্ব্বোহাইড্রেট দেহসাৎ হয়, সম্ভবতঃ সামান্য পরিমাণ কার্ব্বোহাইড্রেট গ্যালাক্‌টোজ্ আর লেভুলোজ রূপেও দেহসাৎ হয়।

শরীরে গ্লুকোজের ব্যবহার মুখ্যতঃ ইন্ধনরূপে। এর থেকে আমরা পাই কার্য্যশক্তি আর তাপ। শরীর-গঠন ব্যাপারে এর প্রয়োজন অতি সামান্য, যদিও এর থেকেই শরীরে নিউক্লিইক্ এ্যাসিড তৈরী হয়, আর শিশুর এক-মাত্র কার্ব্বোহাইড্রেট আহার মাতৃস্তন্যের ল্যাক্‌টোজ্-এর থেকেই তৈরী হয়।

প্রোটীন শরীরে ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য জমিয়ে রাখা যায় না—কার্ব্বোহাইড্রেটের বেলায় কিন্তু সে কথা খাটে না। অন্ত্র থেকে রক্তে মিশবার পর গ্লুকোজ প্রথমেই যায় লিভারের (যকৃৎ) ভিতর দিয়ে। সেই সময় প্রয়োজনা-তিরিক্ত গ্লুকোজ লিভারে জমা হয়ে থাকে গ্লাইকোজেন রূপে। এ ভিন্ন মাংসে এবং ত্বকে অনেক পরিমাণে গ্লাই-

কোজেন জমা হয়ে থাকে। কার্ব্বোহাইড্রেট থেকে আবার শরীরের মধ্যে মেদও তৈরী হয় এবং সঞ্চিত হয়। গ্লাইকোজেনরূপে কার্ব্বোহাইড্রেট জমা হয়ে থাকার পরিমাণের একটা সীমা আছে।

সাধারণভাবে ইংরাজী fat (ফ্যাট্) মানে আমরা চর্ব্বিই বুঝি। রাসায়নিকরা কিন্তু ফ্যাট অর্থে বোঝেন সব রকম তৈলজাতীয় (স্নেহজাতীয়) জিনিষ, যেমন চর্ব্বি ঘি, মাখন, সরিষার তেল প্রভৃতি। কার্ব্বোহাইড্রেটের মত ফ্যাটেও কার্ব্বন, অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন আছে, কিন্তু কার্ব্বোহাইড্রেটে যে ভাবে বা পরিমাণে কিংবা জলে যে ভাবে আছে, সেই ভাবে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন ফ্যাটে নেই।

শরীরে ফ্যাটের প্রয়োজন কার্ব্বোহাইড্রেটের মত তাপ আর শক্তির ইন্ধনরূপে। প্রোটীন আর কার্ব্বোহাইড্রেট জীর্ণ হবার সময় অনেক ভাঙ্গাচুরা হয়, কিন্তু ফ্যাট রক্তে পৌঁছায় ফ্যাট রূপেই। রক্ত থেকে যায় শরীরের প্রত্যেক কোষে, যেখানে প্রয়োজনমত কোষ রক্ত থেকে ফ্যাট গ্রহণ করে।

প্রোটীন শরীরে সঞ্চিত হয় না, কার্ব্বোহাইড্রেট সঞ্চয়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ, কিন্তু ফ্যাট সঞ্চয়ের সীমানির্দ্দেশ নাই। শরীর অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফ্যাট সঞ্চয় করতে পারে বলেই মানুষের দেহের ওজনের সীমা পাওয়া যায় না।

এ তিনটি খাদ্য ছাড়া আমরা অনেক খনিজ জিনিষ জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে খ[illegible] জ্ঞাত[illegible] খনিজ জিনিষ খাই, তার মধ্যে নুন আর চূণের কথা সকলেই জানেন। তা ভিন্ন অনেক জিনিষ আমরা না জেনেও খাই, যেমন গন্ধক, ফস্‌ফরাস, লোহা প্রভৃতি। এদের প্রয়োজন শরীরগঠন ব্যাপারে—কার্য্যশক্তি কিংবা তাপসঞ্চারের দিক্ থেকে এদের প্রয়োজন নাই। চূণে আছে ক্যালসিয়াম্ (calcium)—সেটা না থাকলে হাড়ের কাঠিন্য নষ্ট হয়, আর রক্তের হেমোগ্লোবিনের লৌহ একটি খুবই প্রয়োজনীয় জিনিষ। শরীর থেকে এ সব নিয়তই মল-মূত্র প্রভৃতির সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং খাদ্য থেকে সেটা পূরণ হয়। শরীরে এদের পরিমাণ সাধারণতঃ সব সময়েই একই রকম থাকে—তারতম্য খুবই কম।

পেটেন্ট ওষুধওয়ালাদের ঢাক পেটানর দৌলতে ভিটামিনের নাম শোনেন নি, এমন লোক বোধ হয় শিক্ষিতদের মধ্যেও কম। যাঁরা ভিটামিন আবিষ্কার করেন, তাঁরা এর নাম দেন accessory food factor, বাংলায় তার নামকরণ হয় "খাদ্যপ্রাণ।" এই রকম অভিধানের দরুণ লোকের ধারণা হয়েছে এই যে, যাকে "খাদ্য" বলে তার "প্রাণ" দিয়ে দিয়েছে। অনেকের ধারণা হয়ে গেছে, খাদ্য একটা যা তা হলে কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু প্রাণপণে ভিটামিন খাও, আর সে কাজটায় সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে বোতল বোতল বটীকৃত ভিটামিন বাজার থেকে পয়সা দিয়ে এনে খাওয়া। ইলেকট্রিক্ আলো জ্বালাতে হলে যেমন বাল্‌ব্ আর ইলেকট্রিসিটি দুইই দরকার, তেমনই খাদ্য কার্য্যকরী হতে হলে খাদ্য এবং ভিটামিন দুইই প্রয়োজন। কেবল বাল্‌ব্ কিংবা কেবল ইলেকট্রিসিটি হলে যেমন আলো জ্বলে না, তেমনই কেবল খাদ্য কিংবা কেবল খাদ্যপ্রাণ খেলেই দেহ রক্ষা হয় না। দুইই থাকা চাই এবং উপযুক্ত পরিমাণে থাকা চাই। ১৬ ভোল্টের বাল্বে যদি ২২০ ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি দেওয়া যায়, তা হলে আলো হয় না, কারণ বাল্ব পুড়ে যায়, কিংবা যদি ২২০ ভোল্টের বাল্বে ১৬ ভোল্ট কারেন্ট দেওয়া হয়, তা হলে যেমন আলোর জোর হয় না, ঠিক তেমনই প্রয়োজনের বেশী কিংবা কম ভিটামিন খাদ্যে থাকলে ইষ্ট না হয়ে অনিষ্ট হয়। মুস্কিল হয়েছে আমরা সভ্য হয়ে। টিনের কিংবা বোতলের খাবার না হলে আমাদের মন ভরে না।

নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি—অনেকবার দেখেছি ৫।৬ মাসের ছেলেমেয়েদের চোখে এক রকম রোগ হচ্ছে, রোগটার ইংরাজী নাম কেরাটোম্যালেশিয়া (kerato-malacia)। এ রোগ হয় সাধারণতঃ ভিটামিন 'A' এর অভাব হলে। কারণ জানবার জন্য যখনই রুগীকে কি খেতে দেওয়া হয়, জিজ্ঞাসা করেছি, উত্তর সব সময় একই ধরণের পেয়েছি—"আজ্ঞে, ছেলেটার মোটে মা'র দুধ হজম হয় না, তাই তাকে সুজী সেদ্ধ করে আর টিনের বার্লি সেদ্ধ করে খেতে দি।" শুনলে মনে হয় গরীব বলে গোরু কিংবা ছাগলের দুধ খেতে পায় না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জেনেছি, বাড়ীতে গোরু কিংবা ছাগল দুইই

আছে। বেশীর ভাগ জায়গায় রিকেট কিংবা "পুঁয়ে"-পাওয়া রোগের কারণ হচ্ছে মাতৃদুগ্ধের অভাব, কিংবা সভ্যতার অত্যাচারের দরুণ মাতার স্তন্য দিতে অনিচ্ছা। "সভ্যতার অত্যাচার" কথাটা ব্যবহারের কারণ হচ্ছে অনেক আধুনিকার মতে শিশুকে স্তন্য দেওয়া না কি নিতান্তই সেকেলে।

বাঙ্গালীর মধ্যে যাঁরা খাদ্য এবং ভিটামিন নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করেন, তাঁদের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চাকব্রত রায় মহাশয়ের নাম বোধ হয় সকলেই জানেন। ভিটামিন সম্বন্ধে তাঁর একটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মহাযুদ্ধের সময় এ দেশ থেকে অনেক শুক্‌নো তরকারী চালান যেত সৈন্যদের জন্য। মেডিক্যাল কলেজে তাঁর ওপর হুকুম এল, খাদ্য হিসাবে সেই সব জিনিষের মূল্য যাচাই করবার জন্য। রাসায়নিক পরীক্ষা অনেক রকম হবার পর ভিটামিন সম্বন্ধে এ সবের পরীক্ষা আরম্ভ হল কতকগুলি গিনিপিগের ওপর। গিনিপিগদের খাওয়ান হত এই শুক্‌নো তরকারী আর জল। এর ওপর তাদের দেওয়া হত ১২০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ফোটানো দুধ। খাদ্য সম্বন্ধে কোনও রকম কার্পণ্য করা হত না; কিন্তু দেখা গেল ২২ দিনের পর থেকে একে একে গিনিপিগগুলি মারা যেত লাগল। এদের মধ্যে যখন একটা গিনিপিগ একেবারেই মুমূর্ষু—মারা গেছে বললেও হয়, তার ওপর দয়া হল ল্যাবরেটারীর একটি বেহারার এবং সেটিকে সে চেয়ে নিল। ডাক্তার রায় বলে দিলেন, গিনিপিগটিকে সামান্য কাঁচা ঘাস খাওয়াতে। এই রকম বারকতক কাঁচা তাজা ঘাস খাওয়ানর পর সেই গিনিপিগটি বেঁচে উঠেছিল, আর ৪ দিন পরে সেটির ওজন বেড়েছিল ৩ আউন্স। উড়িষ্যা-নিবাসী সেই বেহারা যে হেতু এ দেশে এসেছে পয়সা উপার্জ্জন করবার জন্যই, সেটিকে সে আবার ল্যাবরেটারীকে উপযুক্ত মূল্যেই বেচেছিল।

টিনের কিংবা বোতলের খাদ্য ব্যবহার না করে আমরা যদি স্বাভাবিক খাদ্য অর্থাৎ শাক-পাতা, মাছ-মাংস, ফল-মূল প্রভৃতি, যেগুলি রান্না করে খেতে হয়, সেইগুলি রান্না করে এবং যেগুলি কাঁচা খাওয়া যায়, সেইগুলি কাঁচা খাই; তা হলে মনে হয় বোতলের ভিটামিন খাবার দরকার আমাদের হতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক ত' বলে খালাস পেলেন এক পোয়া চালের খাদ্য হিসাবে পান্তাভাতেও যা দাম, পোলাওয়েও ত' তাই দাম (কেবল চালেরই খাদ্যমূল্য যদি ধরা হয়), কিন্তু রসনা কি সে কথা মানতে রাজী হয়?

আমরা

—শ্রীসুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

আমরা ধরার বুকে গেয়ে যাব জীবনের জয়,
আমরা রাখিয়া যাব চিরমুক্ত গ্লানিহীন প্রাণ,
আমরা ছড়ায়ে দিব ফেনোচ্ছল সুরা অফুরাণ,
উচ্ছ্বসিত জীবনের প্রাণ-রস স্বচ্ছ মধুময়।
আমরা এগায়ে যাব উল্লসিত জীবন্ত নির্ভয়
কানেতে ধ্বনিবে শুধু কালের সে প্রলয় আহ্বান,
তার সাথে তাল রেখে ভেঙ্গে চুরে যত অপমান,
মোদের চলিতে হবে লয়ে গতি অটুট অক্ষয়।

জ্বালায়ে যৌবন-বহ্নি পূর্ণ কর যত অভিলাষ
পদভরে এ পৃথিবী ভেঙ্গে চুরে হোক রসাতল,
পৌরুষ-নিষ্ঠুর মোরা, সব বাধা হইবে নিষ্ফল,
এগায়ে এগায়ে চল তুলি কণ্ঠে তীব্র কলভাষ,
দুর্নিবার অগ্রগতি প্রাণময় পুলকে উজ্জ্বল—
ফুটিয়া উঠুক চিত্তে যৌবনের প্রলয় উচ্ছ্বাস।

নোয়াখালীর কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

গত সংখ্যায় নোয়াখালী জিলার জীবিকা ও অর্থ-সমস্যার বিষয় লিখিয়াছি। এইবারে কৃষি ও শিল্প-ব্যবসায়ের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বাঙ্গালা দেশের কেন, ভারতবর্ষের আর সকল অঞ্চলের মতই নোয়াখালী সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান। কিন্তু এখানকার স্বাভাবিক অনুকূল অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া যাহাতে উত্তরোত্তর কৃষির উন্নতি সাধিত হইতে পারে, সেই ভাবে কৃষকশ্রেণীর অধিকতর ধনাগমের জন্য কোন কর্ম্মপন্থা এখন এখানে অবলম্বিত নাই। এই জেলায় চাষ ও শস্য উৎপাদন পূর্ব্বাপর প্রায় এক পদ্ধতিতেই চলিয়া আসিলেও, ক্রমশঃই কৃষকের অবস্থায় কেন দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা কেহই অনুসন্ধান করিতেছেন না।

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, নোয়াখালীর মাটিতে ধান্য তো হয়ই, ইহা ছাড়া সুপারী, নারিকেল, পাট প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। মোটামুটি এক একর জমিতে, কলিকাতা কমার্শিয়াল মিউজিয়মের তালিকানুযায়ী হিসাবে দেখা যায়, প্রায় ৭০৲ টাকার ধান্য ফসল উৎপন্ন হয়। কোন জমিতে উহা হইতে কম হয়, আবার কোথাও বা বেশীও হইতে পারে। উক্ত পরিমাণ ভূমিতে প্রায় ১৫০০ হইতে ১৬০০ সংখ্যক সুপারী গাছ, অথবা ৫৫০ হইতে ৬০০ সংখ্যক নারিকেল গাছ লাগানো চলে। সুপারী গড়পরতা প্রতি গাছে কম পক্ষে তিন পণ ধরিয়া হইলেও এক একর ভূমি হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৩০০৲ টাকার ফসল পাওয়া সম্ভব এবং ঐ পরিমাণ ভূমিতে নারিকেল লাগাইলে অন্ততঃ ৪০০৲ টাকা হইতে ৪৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিবিধ ফসলের বিভিন্ন রকম আয়ের তারতম্য আছে।

বর্ত্তমানে যে-ব্যবস্থা দেখা যায়, তাহাতে ধান্য, পাট ও রবিশস্যের জমি ফসল-উপযোগী করিতে এবং উহাতে শস্য উৎপাদন করিতে কৃষকদিগকে অপেক্ষাকৃত বেশী শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। প্রত্যেক বৎসরই নূতন করিয়া ঐ সকল ফসল উৎপাদনের উদ্যোগ, আয়োজন ও ব্যবস্থার দরকার, কিন্তু সুপারী-নারিকেলের বাগানে ঐরূপ নিয়মিত শ্রম ও অর্থব্যয়ের কোন বাঁধা-ধরা কথাই নাই। একবার সার ও মাটি দিয়া বাগান করিতে পারিলে কয়েক বৎসর পর পর বাগানের জন্য কিছু কিছু অর্থ ও অতিরিক্ত শ্রম ব্যয় করিলেই অনেক ফসলের সম্ভাবনা হইতে পারে।

কৃষি বিভাগীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জেলাতে খুব কমই আছেন, তাই সাধারণ কৃষকগণ ঐ দিক হইতে সাহায্য বড় বিশেষ পায় না। পাইলে কি হইত, তাহাও অবশ্য বলা যায় না। এখন যাহা দেখা যায়, তাহাতে সাধারণতঃ কৃষকেরা পিতৃ-পিতামহদের আমলের হাল-বলদ ও লাঙ্গল মৈদল করিয়া পচা মাটি, গোবর ও ছাই আবর্জ্জনা প্রভৃতি গৃহসঞ্চিত সার সহযোগে মামুলি ধরণে জমি তৈয়ার করিয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ কৃষিকর্ম্মে পুরুষানুক্রমে ও হাতে কলমে যতটুকু অভিজ্ঞতা উহারা অর্জ্জন করিয়াছে, উহাকেই তাহারা তাহাদের জীবনের প্রধান সহায় করিয়া চলিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, যে-ব্যবস্থায় পিতামহ-প্রপিতামহদের ভাল ভাবেই চলিত, সেই ব্যবস্থাতে ইহাদের চলিতেছে না কেন?

এই জেলার শতকরা প্রায় ৯৭ জন লোক কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে। কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ মুসলমানদিগের হাতেই রহিয়াছে। হিন্দুদিগের মধ্যেও কয়েক শ্রেণীর লোক স্বহস্তে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব প্রচুর নহে এবং এই কৃষিকার্য্যকেই উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, এমন হিন্দু খুব মুষ্টিমেয়।

কৃষকশ্রেণীর আর্থিক অবস্থা সাধারণতঃ ভাল নহে। যে সকল কৃষকের নিজেদের হাল-বলদ, গৃহস্থালী ও সামান্য কিছু চাষের ভূমি আছে, তাহারা নিজেদের জমি চাষ করিয়া অধিকন্তু অপরের জমিতেও চাষের কাজ করে। কোথাও বা দিন-ঠিকা তাহারা হাল বিক্রয় করে, কোথাও উৎপন্ন ফসলের নির্দ্ধারিত অংশ বা শেয়ারের চুক্তিতে

চাষের কাজ করে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একটা কিছু নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ফসল আদান-প্রদানের চুক্তি থাকে।

এই সকল চাষী বা ফসল-সংগ্রহকারীর সহকারী হিসাবে বহু কৃষি-শ্রমিক কৃষি ও শস্য উৎপাদন সংক্রান্ত কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া থাকে। এই সকল সহকারীদের সকলের হাল-বলদ নাই এবং অনেকেরই নিজেদের চাষের জমিও নাই। যখন যেমন প্রয়োজন, যোগ্যতানুযায়ী শ্রম করিয়া ইহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোক সারাদিন পরিশ্রম করিয়া আট আনা বা দশ আনার বেশী পারিশ্রমিক পায় না। যখন ফসলের সময় চলিয়া যায়, তখন কখনও কখনও তাহাদের পারিশ্রমিকের হার কমিয়া তিন আনা বা চারি আনায় আসিয়া দাঁড়ায়। সেই সময় অনেকে হাতের কাছে সময়মত কাজও পায় না। এই শ্রেণীর কৃষি-শ্রমিকের প্রায় প্রত্যেকের উপার্জ্জিত অর্থের উপর পরিবারের চার পাঁচজন পোষ্য লোকের জীবিকা নির্ভর করে। এই শ্রেণীর প্রায় দশ হাজার শ্রমিক নোয়াখালীতে আছে।

যাহাদের চাষের জমি আছে ও নিজ হাতে যাহারা কৃষিকর্ম্ম করে, তাহারা হাল-বলদ সম্বল করিয়া গতর খাটিয়া প্রায় সমস্ত কাজ সারে। চাষের সময় তাহারা চাষ করে। ফসল বাড়ীতে তুলিলে মায়ে-ঝিয়ে ছেলে-বুড়োয় সকলে মিলিয়া ফসল সংগ্রহ ও গোলাজাত করে। উপস্থিত সময় নগদ অর্থব্যয়ের বড় একটা প্রয়োজন তাহাদের হয় না; কিন্তু যাহারা নিজেদের জমি পরকে দিয়া চাষ করায়, তাহাদের নগদ অর্থব্যয় না করিলে চলে না।

কৃষিকার্য্যে কৃষি-শ্রমিকদিগের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ উপার্জ্জন হয় না বলিয়াই অনেক মুসলমান পরিবারের কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগের মধ্যে নিজেদের গৃহস্থালী ও জমিচাষের উপযোগী লোক বাড়ীতে থাকিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক ক্রমে ক্রমে কাঁচড়াপাড়ায়, খিদিরপুরে ও বিবিধ কল-কারখানায়, রেলে, জাহাজে, নৌকায় সেরাং, ছুয়ানী, মাঝিমাল্লা ও কুলী প্রভৃতির কর্ম্মে অধিকতর অর্থোপার্জ্জনের সন্ধানে চলিয়া যাইতেছে।

নোয়াখালীর মাটিতে ধান্য ছাড়াও প্রচুর সুপারী, নারিকেল, ইক্ষু, লঙ্কা, হোগলাপাতা ও পাটীপাতা (মোস্তাগ) প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ বা বহির্ভারতের সর্ব্বত্র এই সকল সমভাবে জন্মায় না। কোন কোন অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত কম হয়, কোন কোন অঞ্চলের মাটিতে এই সকল ফসল উৎপন্নই হয় না; অথচ সর্ব্বত্রই অল্প-বিস্তর এইগুলির প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। পাটীপাতা হইতে নোয়াখালীতে সাধারণতঃ নিত্যব্যাবহারোপযোগী মোটা কাজের পাটী বা 'চিকনী' ও আসন তৈয়ারী হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ও কারুকার্য্য করা মূল্যবান্ শীতলপাটীও দেখা যায়। হোগলাপাতার চাটাইয়ের ব্যবহার নোয়াখালীতে আছে। এই চাটাই ও পাতা স্থানান্তরে চালান হইয়া থাকে। হোগলাপাতা ও পাটীপাতার চাষ পতিত জমিতেই বেশী হয়। যে সকল স্থান স্যাঁতসেঁতে, অথচ অন্য কোন ফসল যেখানে উৎপন্ন করা খুব কষ্টসাধ্য, সেই সকল ভূমিতে ইহারা ভাল রকমেই উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহার জন্য অতিরিক্ত সার সরবাহেরও প্রয়োজন হয় না।

ইক্ষু হইতে গুড় তৈয়ারী করিবার কাজটি বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে নোয়াখালীতে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী বিস্তার লাভ করিয়াছে। সেইজন্য আখের চাষও উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাতে কৃষকের আর্থিক আয় আপাতভাবে সামান্য ভাল হইয়াছে।

নোয়াখালী হইতে প্রচুর মগী সুপারী (কাঁচা সুপারী) বর্ম্মা অঞ্চলের দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। শোনা যায়, এই সুপারী হইতে খয়ের জাতীয় জিনিষ প্রস্তুত হয়। নোয়াখালীতে খয়ের প্রস্তুতের ব্যাপক কোন আয়োজন নাই। স্থানে স্থানে কেহ কেহ গৃহ-প্রয়োজনের জন্য ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

নারিকেল ও গৃহপ্রস্তুত নারিকেল তৈল গৃহস্থের নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহারোপযোগী ভাবেই গৃহীত হয়। কিন্তু ব্যবসায়-পদ্ধতিতে ইহা হইতে অধিকতর আয়ের জন্য বিবিধ উপসামগ্রী প্রস্তুতের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নারিকেলের শাঁস হইতে তৈল ও বিবিধ উপাদেয় খাদ্য, ছোবা হইতে দড়ি, পা-পোষ ও অপরাপর অসংখ্য রকম ব্যবসায়োপযোগী প্রয়োজনীয় সামগ্রী, নারিকেলের মালা হইতে—বোতাম, আংটি,

চায়ের কাপ, ঘড়ীর চেন, হুকার খোল প্রভৃতি শিল্পসামগ্রী, পাতা হইতে—আসন, ব্যাগ, চাটাই, পাখা ও বিবিধ খেলনা, কাঠি হইতে—ঝাঁটা, ফুলের সাজি ও অন্যান্য জিনিস, তৈয়ারী হইয়া ব্যবসায়ের পথে লাভজনক ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সিংহল, সিঙ্গাপুর ও কোচিন প্রভৃতি নারিকেল-প্রধান অঞ্চলে এই সমস্ত জিনিষের অপব্যয় না হইয়া উহা উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। নোয়াখালীতে নারিকেল হইতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে নিজেদের আবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয় ও মেয়েদের মাথায় মাখিবার প্রয়োজন-উপযোগী তৈল অধিকাংশ হিন্দু ঘরেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবসায়-ক্ষেত্রে গোটা নারিকেল বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোন উপসামগ্রী উহা হইতে বাহির করিয়া চালাইবার সুবন্দোবস্ত নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নোয়াখালীর স্থানীয় অধিবাসীর মধ্যে বিচক্ষণ কৃষি-বিশারদ ও দক্ষ রসায়নজ্ঞ ব্যক্তি কৃষির উন্নয়নের জন্য কিংবা উৎপন্ন কাঁচামাল হইতে ব্যবসায়োপযোগী বিবিধ সামগ্রী ও উপসামগ্রী প্রস্তুতের জন্য জনসাধারণের অধিকতর অর্থাগমের সহায়ক হইয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন এমন কাহাকেও দেখা যায় না। কৃষিবিভাগকে অবলম্বন করিয়া অনেক কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিবিজ্ঞ, রসায়নজ্ঞ, কারীগর ও অর্থের সমবায়ে অধিকতর অর্থাগমের রাস্তা খুলিয়া দিয়াছেন। কোথাও কেহ সেই অর্থকে একস্থানে ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, কোথাও বা হয়ত জন-সাধারণের ধনবৃদ্ধির পথে উহাকে সুগম করিয়া দিবার ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে। কিন্তু যে কারণেই হউক এ দেশে ঐ প্রকার প্রয়াস অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

নোয়াখালীর অধিবাসী শ্রমশিল্পীদিগের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সংখ্যা অনুপাতে যুগী বা বস্ত্রশিল্পী সম্প্রদায়ই বহু বিস্তৃত এবং এই জেলার বস্ত্রশিল্প বেশ উল্লেখ-যোগ্য। ব্যবসায়সংক্রান্ত বহু উত্থান-পতনের সহিত সংগ্রাম করিয়া এই যুগী সম্প্রদায় তাহাদের স্বীয় ব্যবসায়কে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও অনুকূল সুযোগের সহায়তায় তাহারা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির পথেই অগ্রসর হইতেছে।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফেণী নদীর মোহানা সন্নিহিত যুগীদিয়া অঞ্চলে কাপড়ের কুঠি খুলিয়া-ছিলেন। তাহার পরে কিছুকাল মধ্যেই কল্যাণ্দী, লক্ষীপুর, বেগমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও বস্ত্রশিল্পের কারখানা খোলা হয়। এই সকল কারখানায় সাধারণতঃ সূতার মোটা কাপড় (বাপ্তা) তৈয়ারী হইত। তৎকালে প্রথমতঃ মিহি কাপড় দেশে বড় একটা প্রস্তুত হইত না এবং নোয়াখালীর অধিবাসীদের মধ্যে উহার বিশেষ চলন ছিল না। পুকুরের মাছ, তাঁতের মোটা কাপড়, বাগিচার তরি-তরকারী, গাইয়ের দুধ ও মোটা ভাত, ইহাতেই সাধারণ অধিবাসীর সাচ্ছন্দে দিন চলিত। ক্রমে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে নোয়াখালীতে বস্ত্রশিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল। এই উন্নতির কালে গ্রামের যুগীদিগের মধ্যে হাতের তাঁতের প্রসারই বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মিঃ ওয়ালটার (Mr. Walter) তাঁহার বর্ণনাতে বামনী ও সন্দ্বীপ অঞ্চলের তাঁতীদিগের বস্ত্রশিল্পের তৎকালীন প্রভূত উন্নতির কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তখন ঐ সকল দ্বীপে তুলা উৎপন্ন হইত। অবশেষে বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ঐ সকল ফ্যাক্টরী আর টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। একে একে সবগুলিই বন্ধ হইয়া যায়। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পর হইতে নোয়াখালীতে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাপড়ের কারখানা আর দেখা গেল না। কিন্তু কোম্পানীর কারখানা বন্ধ হইয়া গেলেও পল্লীর যুগী-সম্প্রদায় ঘরে ঘরে তাঁত বুনিয়া নিজেদের ব্যবসায়কে উন্নত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দের সরকারী বিবরণীতে দেখা যায়, নোয়াখালীর যুগী-সম্প্রদায় ধুতি, শাড়ী, গামছা ও বিবিধ পল্লী-প্রয়োজনীয় মোটা সূতী-বস্ত্র বয়ন করিয়া বিদেশী বস্ত্রের সঙ্গে কিছুকাল প্রতিযোগিতায় বেশ মর্য্যাদার সহিত টিকিয়াছিল।

তার পরে যখন সস্তা দামের বস্ত্র আসিয়া ক্রমে দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন সাময়িক ভাবে স্থানীয় বস্ত্র-শিল্পের উন্নতি মন্দা পড়িতে লাগিল। কিন্তু শিল্পিগণ হতাশ হইল না। সেই দুঃখের দিনেও তাঁত ধরিয়া থাকিল। কিছুকাল পরে কিন্তু দেখা গেল, তাঁতীর দুঃখের দিন

ধীরে ফিরিতেছে। অধ্যবসায়ের সহায়তায় প্রতিযোগিতায় তাহারা উতরাইয়া উঠিল। আবার তাহাদের কাপড়ের চাহিদা হইতে লাগিল। তখন তাহারা ধুতি-গামছা ছাড়াও বিবিধ রঙীন বস্ত্র ও মশারির কাপড় বয়ন এবং সূতা রঙ করিবার বিবিধ দেশীয় উপায় অবলম্বন করিতে লাগিল। পূর্ব্বে তাহারা কেবল মোটা কাপড়ই বয়ন করিত, তারপর হইতে মিহি বস্ত্র বয়নের দিকেও মন দিল। এই ভাবে নানা রকম লুঙ্গি ও জামশাড়ী প্রভৃতি বয়নে তাহারা দক্ষ হইয়া উঠিল। বাজারে বাজারে দেশী বস্ত্রের বিক্রয় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চৌমুহানী হাটে তখন হাজার হাজার টাকার বস্ত্র ও মশারির সিট বিক্রয় হইত। তখন হইতে আজকালও চৌমুহানীর মশারি বিখ্যাত বলিয়া সাধারণের কাছে আদরণীয় হয়। তার পরে শিক্ষা ও সভ্যতার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন হইতে বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া গেল ও রুচিবিলাসের সঙ্গে সঙ্গে রকমারি সূক্ষ্মবস্ত্রের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, তখন হইতে শিল্পীরা দেশী সূতা ছাড়িয়া মিলের সূতায় কাপড় বুনিতে লাগিল। এই হইতেই শিল্পীদিগের শিল্পধারা অন্য পথ ধরিল। মিলের কাপড়ের সঙ্গে মিলের সূতায় প্রস্তুত তাঁতের কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়া উঠিতে পারিল না। আবার দুর্দ্দিন দেখা দিল।

কালক্রমে বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় তাহাদের শিল্প মারা যাইবার উপক্রম হইল। বহু যুগী সেই সময় বস্ত্রশিল্প ছাড়িয়া হাল-চাষ ধরিয়াছিল, কিন্তু সেই দুর্দ্দিনে যদিও স্বীয় ব্যবসায় শোচনীয় হইয়াছিল, তথাপি তাহারা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সাময়িক অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেও ঘরের তাঁতখানিকে হাতছাড়া করিয়া স্বীয় শিল্পের স্মৃতি মুছিয়া ফেলে নাই।

স্বদেশী যুগের বয়কট আন্দোলনে আবার তাহাদের সুদিন ফিরিয়া আসিল। জন-সাধারণের মধ্যে দেশী বস্ত্রের চাহিদা বাড়িয়া গেল। পুরাণো তাঁতের ধূলা ঝাড়িয়া আবার যুগী-সম্প্রদায় ঘরে ঘরে বস্ত্রবয়নে বসিয়া গেল, পল্লীতে পল্লীতে আবার চরকার গুঞ্জন উঠিল। অবশেষে বিগত অসহযোগ আন্দোলনের সময় যুগীদের ঘরে ঘরে হাতের তাঁতের পাশে ঠক্‌ঠকী-তাঁত আসিয়া দেখা দিল। এই তাঁতের সাহায্যে, পুরাণো হাতের তাঁতের তুলনায় অধিকতর বেশী বস্ত্র উৎপাদিত হইতে লাগিল। যুগীদের বস্ত্র-শিল্প এই হইতে ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিল।

আজকাল সামাজিক, ব্যাবহারিক ও শিক্ষাগত বহু উন্নতি তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘ আছে, সমিতি আছে, সমবায় অর্থ-ভাণ্ডার আছে ও বিবিধ সামাজিক উন্নতিকর অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আছে। সমগ্র বাংলা দেশের যুগী-লোকসংখ্যার অনুপাতে নোয়াখালীর যুগীদিগের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা উল্লেখযোগ্য। এখানে উহাদের লোক-সংখ্যার অনুপাতে কায়স্থশ্রেণীর পরেই ইহাদের স্থান। শ্রেণীগত শ্রমশিল্পী হিসাবে নোয়াখালীতে এই সম্প্রদায়টির বৈশিষ্ট্য ও সংখ্যা-শক্তি নিতান্ত হেয় নহে।

যুগীদের প্রায় সকল পরিবারেই দুই একখানি হাতের তাঁত বা ঠক্‌ঠকী-তাঁত আছে। পরিবারের সকলে মিলিয়া বিভিন্নভাবে এই তাঁতের কাজে সহায়তা করে। ইহা অনেকটা কুটিরশিল্পের মত। পরিবারের লোকেরাই অপরের সহায় না লইয়া দিনরাত খাটিয়া বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম বস্ত্রে লাভ কম, খাটুনি ও সময় বেশী ব্যয় হয় বলিয়া সেইদিকে তাহারা বড় একটা হাত দেয় না। মোটা কাপড়, ময়নামতী ছিটের শাড়ী, জামশাড়ী, লুঙ্গি, গামছা ও মশারির ছিট তৈয়ারী করিয়াই ইহারা অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করে।

নোয়াখালীর মুসলমান মেয়েরা প্রায় সকলেই ময়নামতী শাড়ী ব্যবহার পরে। ইহা ছাড়া নোয়াখালীর বাহিরেও ঐ সকল শাড়ী ও লুঙ্গি চালান হইয়া থাকে। ছোট-বড় প্রায় সকল হাটেই যুগীদের কাপড় বিক্রয়ের জন্য দীর্ঘ সারিবন্ধী দোকান ঘর, চালা বা দোকানের ঠাঁই থাকে। পল্লীর যে সকল হাট খুব ছোট, তাহাতে উপরোক্ত ব্যবস্থা না থাকিলেও দুই চারিজন যুগীকে কাপড় হাতে করিয়া হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। উহারা অনেকে নিজেরাই কাপড়ের গাঁট মাথায় করিয়া, দোকান পাতিবার উপযোগী চট বা আসন, এক একটি লণ্ঠন, হ্যারিকেন বা কেরোসিনের ডিবা সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে

পল্লীর হাটে কাপড় বিক্রয় করিতে যায়। আবার হাট ভাঙ্গিলে উহারা দলে দলে গভীর রাত্রিতে ঘরে ফিরে

যুগী-সম্প্রদায়ের পরেই শ্রম-ব্যবসায়ী হিসাবে একই শ্রেণীভুক্ত আর একটি হিন্দুশাখা নোয়াখালীতে আছে। তাহারা নমঃশূদ্র বা চাঁড়াল। মৎস্য ধরা ও বিক্রয় করা উহাদের উপজীবিকা। উহাদের লোকসংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। নোয়াখালীতে তাহাদের সংখ্যা ৩৫৭১৫। ইহারা যদি ব্যবসায়কে আরও অধিকতর ব্যাপক করিয়া চালানী পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে অধিকতর অর্থাগমের সুবিধা হইতে পারে। নোয়াখালীতে হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রেণীহিসাবে লোক-সংখ্যার অনুপাতে এই নমঃশূদ্রশ্রেণী তৃতীয় পর্য্যায়ের শক্তি। কায়স্থ ও যুগীশ্রেণীর পরেই ইহাদের স্থান।

মৎস্য ধরা ও ব্যবসায়ের জন্য উহারা নানারকম সরঞ্জাম ব্যবহার করে। বেড়ী জাল, চালী, বাঁধ, ধর্ম্ম-জাল, ঝাঁকি জাল, ভেয়াল জাল, জেলে জাল, সুতা জাল, পলো, কোঁচ, টেঙ্গা, বড়শী, ডোঙ্গা, গাছ, সরঙ্গা, বরা, আস্তা, টুয়া, চাই, দোন, সেউত, খারি, উনী ও ভার প্রভৃতি বহুবিধ সরঞ্জাম দ্বারা উহারা মৎস্য শিকার করিয়া থাকে।

যে সকল নমঃশূদ্র শ্রেণীর লোক নদীর সন্নিহিত স্থানে বসবাস করে, তাহারা নদী হইতে বারমাস মৎস্য শিকার করিয়া উপজীবিকা সংগ্রহ করে। নোয়াখালীর নিকটবর্ত্তী মেঘনা নদীতে মৎস্য নিতান্ত অপ্রচুর নহে। সুদিনে ঐ নদীতে প্রচুর ইলিশ, বাটা ও তপসী মাছ পাওয়া যায়।

জেলার সুদূর অভ্যন্তরভাগে যে সকল নমঃশূদ্র বাস করে, তাহারা সাধারণতঃ পল্লী-গৃহস্থদিগের পুকুরে ও নালা, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয়ে মৎস্য শিকার করিয়া বাজারে তাহা বিক্রয় করে। শীতকালের দিকে তাহারা গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের নিকট হইতে ঠিকা-চুক্তি করিয়া পুকুর কিনিয়া লয় ও উহার জল সেঁচিয়া পুকুরের সমস্ত মাছ ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাতে তাহারা পুকুরের প্রচুর শিঙ্গি, মাগুর, কই, খলিশা, শোল প্রভৃতি জাতীয় মাছ পাইয়া থাকে। সেই সকল দীঘি ও পুকুরে রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছের চাষ করা হয়। সেই সকল জলাশয়ের মৎস্য এই রূপে জল সেঁচ করিয়া ধরা হয় না। প্রয়োজন-মত তথায় বেড়ী জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরা হয়।

শীতকালে যে সকল পুকুরের জল সেঁচ হয়, সেই সকল পুকুরের পচা মাটী কাটিয়া গৃহস্বামী কিছুকাল পরে বাগানে ও মাঠে সার হিসাবে ছড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এই মৎস্য-ব্যবসায়ী শ্রেণীর আর একটি শাখা আছে, তাহাদিগকে আদি-কৈবর্ত্ত বা জেলে-কৈবর্ত্ত বলে। ইহারা মৎস্য ধরিবার সরঞ্জামের মধ্যে বিশেষ করিয়া বেড়ী জাল ও নদীতে মাছ ধরিবার উপযোগী কতিপয় জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রধানতঃ তাহাদের ব্যবসায়োপ-যোগী মৎস্য ধরিবার কেন্দ্রস্থল নদী। উহাদের লোকসংখ্যা নোয়াখালীতে ৮৯০৬ জন। সন্দীপ, হাতীয়া ও রামগতী অঞ্চলে এই শ্রেণীর লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করিয়া থাকে। নমঃশূদ্র ও আদি-কৈবর্ত্তের মধ্যে সামাজিক স্তর হিসাবে একটু ইতরবিশেষ আছে। তাহা থাকিলেও উহাদিগকে প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত ব্যবসায়ী বলা চলে।

ইহা ছাড়া এই জেলায় শ্রম-শিল্পী ও শ্রম-ব্যবসায়ী শ্রেণীর হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় শাখা আছে। তাহা-দের মধ্যে ধোপা ২৪৩১৮, নাপিত ২০৩৫৩, সাহা ১৪৩৬৯, বারুই (বরুবারুজী) ১২৭৬৭, কলু ও তেলী ৬৫৫২, কুম্ভকার ৫৫২৪, ভূমালী ৩৪১৯, মেথর ৫৬, কামার ৩২৬৫, পাটনী ২৮৯৩, চামার ২৫৭৩, মুচি ৩৭৪, ফুলমালী (মালাকার) ২৩৯৭, নট ১২৭২, সদগোপ ৭০২, কাপালী ৬৫৪, রাজবংশী ৫০৬, তাঁতী (বসাক তন্তুবায়) ৩২৬, কুর্ম্মী ৭৮, ডোম ৩৩, হাড়ি ২৭, বাগদী ১৪ ও শুঁড়ী ৩।

এতদতিরিক্ত কায়স্থ ৭৫৮৪৬, ব্রাহ্মণ ১৯৩৫৮ ও বৈদ্য ১৭০০ আছে। ইহা ছাড়া ভিক্ষুক, গণিকা ও অপরাপর কতিপয় শ্রেণীর লোকও আছে।

সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়কে উপাসক শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করাতে সরকারী বর্ণনানুযায়ী শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব শ্রেণীতে যথাক্রমে লোকসংখ্যা ২৪০৬৪৮, ১২৫০৪৫ এবং ৬৯৮ করিয়া পড়িয়াছে।* ইহা ছাড়া বৌদ্ধ ৪৭৫ জন ও খৃষ্টান ৭৯৫ জন।

ধোপা সম্প্রদায়ের সাধারণ আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে।

পল্লীগ্রামে মাঝে মাঝে দুই এক ঘর করিয়া ধোপা-পরিবার বাস করে। সাধারণতঃ নিকটে হিন্দু তালুকদার থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে কিছু লাখেরাজ জমি চাকরাণ-স্বত্বে ধোপা-পরিবার জায়গীর স্বরূপ পাইয়া থাকে। অবস্থাপন্ন তালুকদার ও জমিদারগণ এইরূপে কিছু কিছু জমি দিয়া নিজেদের আয়ত্তমধ্যে ধোপা, নাপিত, নট্ট, ভূমালী, শূদ্র, নমঃশূদ্র প্রভৃতি দুই এক ঘর করিয়া রাখিয়া থাকেন। এই ভাবে এই সমস্ত পরিবার পরিবেষ্টিত হইয়া প্রয়োজন মত উহাদের যথাযথ সেবা ও সাহায্যের মধ্যে বাস করাকে তালুকদার জমিদারগণ সামাজিক মর্য্যাদা বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন। এইভাবে সমাজ-বন্ধনের একটা আর্থিক স্বচ্ছলতা ও মনের প্রশান্তির যুগ কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছিল। এখন আর তালুকদারদিগের সকলের এইরূপ নিষ্কর ভূমিদান করিবার মত অবস্থাও নাই, মনের প্রসারতাও নাই। এই সামাজিক সংগঠনের সুযোগ-সুবিধাও দেশের লোক ভুলিতে বসিয়াছে। এই জায়গীরের লোক সকল তৎকালে নিজেদের যথাক্রমে কাপড় কাচিয়া, ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া, উৎসবে পার্ব্বণে বাজনা বাজাইয়া, বাড়ী পরিষ্কার রাখিয়া, মাছের যোগান দিয়া ও পূজাদি কার্য্য সমাপন করিয়া তালুকদারের সাহায্য করিত। তালুকদারও সুখে, দুঃখে, উৎসবে ও অনুষ্ঠানে আপন পরিবারভুক্ত লোকদিগের মতই আশ্রিতদিগের প্রতি যথাযোগ্য স্নেহদানে উপকার করিতেন।

পুরুষানুক্রমে এইভাবে নিষ্কর ভোগস্বত্ব হিসাবে কিছু কিছু জমি এখনও অনেকের আছে। কিন্তু জীবিকার পক্ষে আজকাল উহা প্রায় সকলেরই কাছে অতি সামান্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়াও তাহাদের উপরি আয়ের যথেষ্ট দরকার। তাই প্রত্যেক ধোপাই আশে-পাশের পল্লীবাসী বহু পরিবারের সহিত বাৎসরিক একটা চুক্তি ঠিক করিয়া তাহাদের কাপড় কাচিবার সর্ত্তে নিজের গণ্ডী করিয়া লয়। এই গণ্ডীমধ্যের অধিবাসিগণকে ধোপা ও নাপিতগণ "গাঁইয়া" বলিয়া থাকে। এই "গাঁইয়া" শব্দ গাঁও বা গ্রাম হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ধোপার jurisdiction বা আয়ত্ত-স্থানকে ধোপা তার নিজের 'গাঁও' বলিয়াই মনে করে। প্রতি সপ্তাহে একদিন কিংবা কাহারও সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী পনর দিন অন্তর বা তদধিক দিনের পালাতেও কাপড় কাচিবার দিন ঠিক থাকে। নির্দ্ধারিত সময়ে ধোপা বাড়ী বাড়ী যাইয়া কাপড় আনে ও কাচিয়া যথাসময়ে উহা ফেরৎ দেয়। বৎসরের পরে বা ছয় মাস কিস্তিতে ধোপা চুক্তিমত পারিশ্রমিক আদায় করে। সেই পারিশ্রমিক কোথাও এক টাকা, কোথাও দুই টাকা, কোথাও বা আরও কম হইয়া থাকে। এই টাকা এক একটা গোটা পরিবারের উপর নির্দ্ধারিত হয়। ইহা ছাড়া বিবাহ, অন্নারম্ভ, শ্রাদ্ধ ও অপরাপর বড় বড় আনুষ্ঠানিক উৎসবে সামাজিকভাবে তাহাদের অতিরিক্ত প্রাপ্য বলবৎ থাকে। উপরি-লিখিত এই কয়টি শ্রেণীর লোক জীবিকানির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য এইভাবে শ্রম করিয়া থাকে। কেবল নমঃশূদ্র ও চাঁড়াল শ্রেণীর মধ্যে ঐরূপ কোন "গাঁইয়া" পদ্ধতি দেখা যায় না। পুরোহিত শ্রেণীর আয়ত্তেও ঐরূপ পৃথক্ পৃথক্ গণ্ডী থাকে। গণ্ডীভুক্ত লোকদের "যজমান" বলা হয়। তাঁহারাও পূজা-পার্ব্বণে বাড়ী বাড়ী গিয়া পূজা করেন ও দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। এখন আর যজমানীতে পুরোহিতকুলও পরিবার চালাইতে পারিতেছেন না। তাই অনেককেই উপার্জ্জনের ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এই সুবিন্যস্ত সামাজিক সংগঠনে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহা কোন দেশীয় নেতারই দৃষ্টিতে পড়িতেছে না। দেশীয় নেতারা সকলেই বৈদেশিক সংগঠনকে দেশে আনিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন। এই দেশপ্রেমের মূল্য কি?

দানাপানির প্রয়োজন
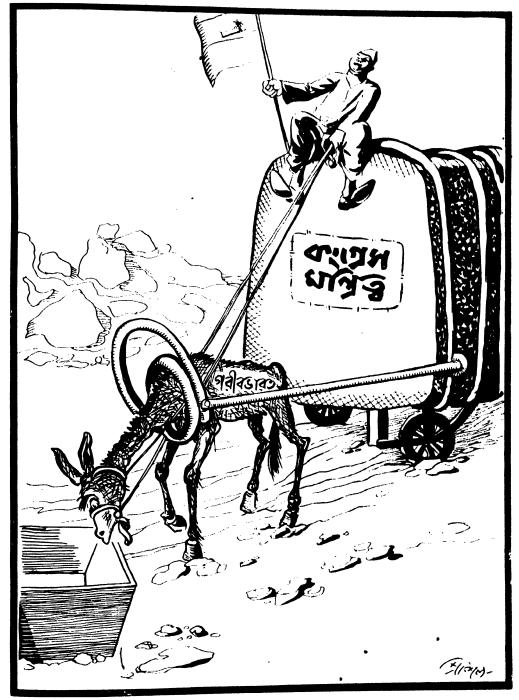
গাড়োয়ান।—টুকাস্, টুকাস—হেট্ হেট্—চল্ চল—মারে যোয়ান্ হেঁইও—
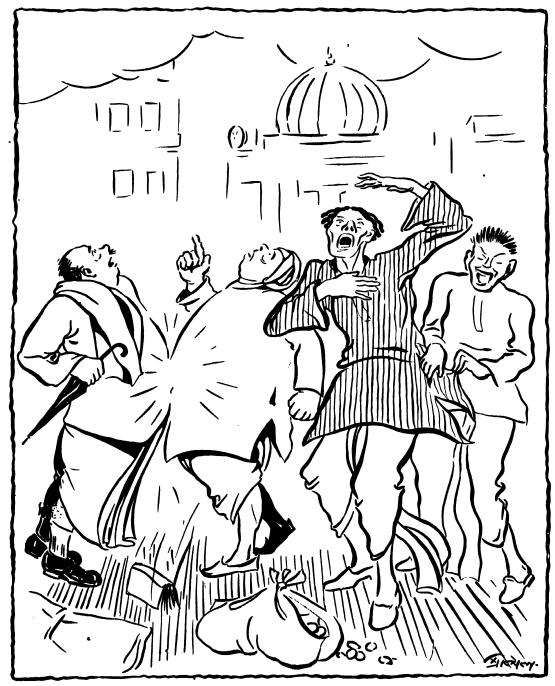
স্বাধীনতা না বোমা

যাঁহারা কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণের ফলে স্বরাজ পাইবার জন্য আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন, ইতিমধ্যে আকাশ হইতে বোমা-বর্ষণের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহাই এই চিত্রের বিষয়বস্তু।

বাঙ্গালার কৃষ্টির প্রগতি না অধোগতি ?

—শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

আমাদের দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচলিত ছিল। ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে। দেশ হিন্দুর; হিন্দুর যাহা সংস্কৃতি, তাহা সংস্কৃতপ্রধানই ত' হইবে। হিন্দুর যাহা কৃষ্টি (culture), তৎসমস্তই ত' সংস্কৃতমূলক না হইয়া পারে না। আমাদের ধর্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি কৃষ্টির উপযোগী যাহা কিছু শিক্ষণীয় বিষয়, সমস্তই সংস্কৃত-ভাষায়, সংস্কৃত-গ্রন্থে লিখিত ও আলোচিত হইয়াছে। কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া, কত কালের পর কাল ধরিয়া, এই দেশের চিন্তার ধারা, বিদ্যার স্রোত, কত কত তীক্ষ্ণ-ধী মনীষিবর্গের প্রভাবে ও প্রচারে, শিক্ষণীয় তাবৎ বস্তু, এই সংস্কৃত ভাষাকে মূল করিয়াই এ দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের রামায়ণ, মহাভারতে,—বিশেষ করিয়া অজগর-সদৃশ বিপুল-কায় মহাভারতে, সরল সংস্কৃত পদ্যে, লোকশিক্ষার উপযোগী করিয়া, কত উপাদেয় শিক্ষণীয় তত্ত্ব ভারতের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল। অপর জাতির, অপর ধর্ম্মের, সংস্রবে পড়িয়াও সে শিক্ষা হিন্দুজাতির অন্তর হইতে অদ্যাপি মুছিয়া যায় নাই। মুসলমান রাজত্বের সময়েও, এই সংস্কৃত-কৃষ্টির কোন ক্ষতিই সম্পাদিত হইতে পারে নাই। রাজকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত কেহ কেহ পারসী ও আরবীর চর্চ্চা করিতেন বটে, কিন্তু দেশ হইতে তদ্দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতের প্রভাব নষ্ট হইতে পারে নাই।

ইংরেজদিগের আগমনের পর হইতে ক্রমেই এই সংস্কৃত-কৃষ্টি মন্দ-প্রভাব হইতে আরম্ভ করিতে লাগিল। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে, প্রধানতঃ তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে ও চেষ্টায়, এ দেশে, সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্ত্তে, ইউরোপীয় বিজ্ঞান—Science—প্রচলনের একান্ত আগ্রহ উপস্থিত হয়। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকটে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার অকিঞ্চিৎকারিতা ঘোষিত হইয়াছিল। রাজা রামমোহন নিজে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, নানা শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল; কিন্তু তথাপি, ভাগ্যদোষে, তিনি যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে আপন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা, আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি, তাঁহার দেশ-ভক্তির আদৌ পরিচায়ক নহে; তাঁহার দূরদর্শিতারও বিজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে না; কেন এ কথা বলিতেছি, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের ফলে, দেশে ইংরাজী-শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হইল। কিছুদিন পরে, কলিকাতা নগরীতে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপিত হইল। সংস্কৃতের দেশে, সংস্কৃত ভাষা—second language-এ পরিণত হইল! ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী সাহিত্য মুখ্যরূপে শিক্ষার বিষয় হইয়া পড়িল। দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, টোলের পরিবর্ত্তে বা পাশাপাশি, ইংরাজী বিদ্যালয় প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। অল্পদিন পরেই ইহার ফল কিরূপ হইয়াছিল, ডি. রোজারিওর শিক্ষাদান-প্রণালী সে কথার সাক্ষ্য দিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা নিজের দেশের ভাষার উপরে, আচার-ব্যবহারের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী যুবক, শিক্ষার বৈগুণ্যে, বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লেখা, কথা বলা, ঘৃণার বস্তু বলিয়া বোধ করিতে শিখিল। ধর্ম্মের ত কথাই নাই। ডি. রোজারিও অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন। তাঁহার প্রভাবে এবং Mill, Compte প্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যয়ন-ফলে, শিক্ষিত সমাজে একটা প্রবল নিরীশ্বরতার প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। ইতিহাস এমন কথাও বলে যে, হিন্দুদিগের বাস-গৃহে শিক্ষিত হিন্দু যুবকেরা গো-হাড় নিক্ষেপ করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। রাজা নিজেও ইহার কুফল কতকটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহারই নিবারণোদ্দেশ্যে তিনি উপনিষদ, বেদান্তাদির অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত যুবকেরা খৃষ্টান না হউক্—এই অভিপ্রায়ে তিনি, "ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে"র আবিষ্কার ও প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইংরাজী-শিক্ষার এই প্রকার প্রাথমিক দেশদ্রোহিতা ও ধর্ম্ম-বিহীনতা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, ইহাই সুখের বিষয়। কিন্তু, তথাপি আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষার দুইটী প্রধান কুফলের উল্লেখ করিব। এই শিক্ষা ধর্ম্মহীন এবং নীতিহীন। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির দৃষ্টি ও চিন্তা এ দিকে পতিত হইয়াছে। কি উপায় অবলম্বন করিলে, ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, অনেকের মনেই এই চিন্তা জাগিয়াছে। আবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় অন্ন-সমস্যার কোন প্রকার সমাধান করিতে পারে নাই, পারিতেছে না;—ইহা এই দুর্দ্দিনে একটা বিষম দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, নানোপাধিভূষিত যুবক-সম্প্রদায়, গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় করিতে পারিতেছে না, ইহার তুল্য নৈরাশ্য-জনক অবস্থা আর কি হইতে পারে?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। আমরা তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন:—

"পাঁচ বৎসর হইতে এ, বি, সি, ডি, ও বি-এল্-এ—ব্লে ইত্যাদি গলাধঃকরণ করিতে করিতে তাহার শিক্ষা-জীবনের সূচনা। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার এই শিক্ষার ধারা পরিণতি লাভ করে এক অন্ধ ডিগ্রীর মোহে। জীবনের এক-তৃতীয়াংশ এই মায়া-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, ২৩।২৪ বৎসর বয়সে বি-এ, এম্-এ, বি-এল্; এম্-এস্, সি, এম্-বি, পি-এইচ্-ডি বা ডি-এস্-সি ইত্যাদির অভীষ্ট তকমা ঝুলাইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য যুবক যখন সংসারে প্রবেশ করে, তখন সে দেখিতে পায় যে, সকল দ্বারই তাহার পক্ষে রুদ্ধ। ডাক্তারীতেও ঐ প্রকার। অপর পক্ষে, ৩০।৪০ টাকা বেতনের একটী কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপন বাহির হইলে, ৫।৬ শত উমেদার। এই অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে নিত্য নিদারুণ সংবাদ পাওয়া যায় যে, যুবকগণ নিরাশায় ডুবিয়া, অহিফেন বা সায়ানাইড-সেবনে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে। রামমোহন, হেয়ার প্রভৃতি মহানুভব কর্ত্তৃক হিন্দু-কলেজ স্থাপিত হওয়ায় যেমন ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হইল, অমনি দলে দলে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী 'চাকুরি'র লোভে দিকে দিকে ছুটিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া অবধি গ্রাজুয়েটের সংখ্যা কল-কারখানার মালের হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অপর দেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর চেষ্টায় শিল্প-বাণিজ্যের কল্যাণে দেশে ধনাগমের পথ বহুধা উন্মুক্ত হইয়াছে; কিন্তু কর্ম্মদোষে বাঙ্গলার শিক্ষিত সম্প্রদায় আজ শত বৎসরেরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তক্মা-লাভের মরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বনাশের পথই আবিষ্কার করিয়া চলিয়াছে।"

আচার্য্য রায়ের এই সকল উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরাজী পড়িয়া বাঙ্গালীরা কেবল যে একমাত্র চাকুরী-জীবী হইয়া পড়িয়াছে তাহা নহে; এই শিক্ষা কোন প্রকারেই 'কার্য্যকরী' হইতে পারে নাই, পারিতেছে না। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এই শিক্ষা কোন প্রকারে আসিতেছে না। দেশে যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় কলকারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলির প্রতিষ্ঠাতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-বাঙ্গালী। যে সকল যুবক বিদেশ হইতে কোন কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহারা তাহা কাজে লাগাইতে পারিতেছে না। ইহারাও চাকুরীর চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। Agriculture (কৃষি) সম্বন্ধে বিলাতে জ্ঞান লাভ করিয়া আসিয়া, কলেজের প্রিন্সিপালী করিতে লাগিয়া গিয়া, সেই অর্জ্জিত বিদ্যাকে নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছেন, ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে! তারপর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষাও নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং দেশের প্রাচীন পদ্ধতির বিরোধী না হইলেও, উহা যে দেশের প্রাচীন কৃষ্টির (culture) কথা বিদ্যার্থীর মনে জাগরূক করিয়া দেয় না, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়-প্রবর্ত্তিত স্কুলগুলিতে শিক্ষার্থী বালক প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পায়, Bernard Smith, Todhunter, Woods প্রভৃতি গ্রন্থকারের রচিত গণিত শিক্ষা হইতেছে। এ দেশে যে হিন্দুদিগের গণিত-গ্রন্থ ছিল, এতদ্দেশেও যে বীজগণিত, লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে গণিতের চর্চ্চা হইত; এদেশের শুল্ভ-শাস্ত্রে যে জ্যামিতির তত্ত্ব রহিয়াছে;—বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয়, বৃত্তের মধ্যে square অথবা squareএর মধ্যে বৃত্তনির্ম্মাণের প্রণালী প্রভৃতির তত্ত্ব যে এদেশেও আলোচিত হইয়াছিল; আমাদের বালকেরা

ঐ সকল গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পায় না। ছোটকাল হইতেই উহাদের মনে এই সংস্কার বদ্ধ-মূল হইয়া যায় যে, গণিত শিখিতে হইলেই, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই, ইউরোপীয় পণ্ডিতের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই। এই প্রকারেই বালকেরা স্বদেশের উপরে অনুরাগ হারাইয়া ফেলে।*

এই বিষয়ে আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। রোণাল্ড্‌সে যে সময়ে বঙ্গদেশের গভর্ণর ছিলেন, তখন তিনি একদিন কলিকাতার কোন ছাত্রনিবাসে গমন করেন। কি উদ্দেশ্য লইয়া ছাত্রেরা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে জিজ্ঞাসার উত্তরে, কেহই তাঁহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যের (aim) কথা বলিতে পারে নাই দেখিয়া, তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ছাত্র-নিবাসের এই গল্পের কথা বলিতে গিয়া তিনি কনভোকেশন-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, দর্শন-শাস্ত্রে বি-এ-পরীক্ষার্থী ছাত্রকে তিনি গৌতম ও শঙ্করের কথা জিজ্ঞাসা করায়, ছাত্রেরা তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, এবং তাঁহারা কোন্ দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই! তিনি ছাত্রদিগের এইরূপ হাস্যকর অনভিজ্ঞতা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এদেশের প্রাচীন স্থাপত্য-বিদ্যা কি প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, অদ্যাপি অজন্তা, বড়বাহুর, ইলোরা প্রভৃতির পর্ব্বত-গাত্র খুদিয়া যে সকল বড়বড় কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভশ্রেণী ও মন্দির ও মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, অজন্তা-গুহায় বর্ণবিন্যাসের যে অদ্ভুত পরিণতি হইয়াছিল—শত শত বৎসরের অযত্নেও যাহা অক্ষত রহিয়াছে;—বজ্রবাত্যা-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাপাতে এবং সর্ব্বোপরি অসভ্য বৈদেশিক সৈন্য-সামন্তের নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য করিয়াও, অদ্যাপি যাহা দর্শকের নয়ন ও চিত্তের চমৎকৃতি-উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে, তাহা এই দেশেরই আবিষ্কার। এই তত্ত্ব, এই সকল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার বিবরণ, জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা, অথবা এইরূপ শিক্ষাপদ্ধতির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখিতে পাই না। কলিকাতার কোন কোন সিনেমায়, টাটার কারখানায় কিরূপে বিস্ময়কর যন্ত্রসাহায্যে লৌহ ও ষ্টীল গলাইয়া, সেই গলিত প্রস্রবণগুলিকে অতি সহজে বড় বড় লম্বা ষ্টীল্-বারে ও ষ্টীল-প্লেটে পরিণত করা হইয়া থাকে,—এইগুলি দর্শকবৃন্দকে দেখাইয়া, উঁহাদের মনে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা জাগাইয়া দেওয়া হইতেছে। এ সকল অত্যন্ত বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। কিন্তু, এদেশের লোক এ প্রকার দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারে নাই, এ কথাও সত্য নহে। কণারকের সূর্য্য-মন্দিরে অদ্যাপি যে সকল ১৪।১৫ হাত দীর্ঘ লৌহ ও পাষাণ-নির্ম্মিত অখণ্ড বরগা প্রভৃতি পড়িয়া আছে, উৎকৃষ্ট যন্ত্র ব্যতীত সেগুলি নির্ম্মিত ও উচ্চে উত্থাপিত হইতে পারে না। এগুলিও হিন্দুদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কম বিস্ময়কর পরিচায়ক নহে। কিন্তু, এই সকল শিক্ষা ও বিদ্যার পুনরুদ্ধারে কোন প্রকার যত্ন ও চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। কয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এই সকল শিক্ষালাভের সুযোগ পায়? অতি সূক্ষ্ম হস্ত নির্ম্মিত কারুকার্য্য-খচিত কাশ্মীরের 'শাল' নির্ম্মাণ প্রণালী; ঢাকার 'মসলিন্'-নামধেয় সূক্ষ্ম বস্ত্র-বয়নের তত্ত্ব—এ গুলি এদেশের প্রাচীন শিল্প-শিক্ষার অত্যদ্ভুত পরিচয় ও আবিষ্কার—যাহা একদিন জগতের বিস্ময় ও লোভ উভয়ই জাগাইয়া দিয়াছিল। এই সকল শিল্প ও কলা, শিক্ষার অভাবে, সহানুভূতি ও যত্নের অভাবে, ক্রমশঃই দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে। শত শত বৎসর বাতাতপে দগ্ধ হইয়া, বাহিরে অযত্নে পড়িয়া থাকিয়াও, অতি বৃহৎ অখণ্ড লৌহ-স্তম্ভে কেন 'মরিচা' ধরে নাই, অদ্যাপি তাহার তত্ত্ব ও কৌশল আবিষ্কৃত হইল না! এ সকল হিন্দুদিগেরই কীর্ত্তি। কিন্তু, কয়জন ছাত্র এ সকলের খবর পর্য্যন্ত জানে? এই সকল তত্ত্ব দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম করায়, শিক্ষার্থী কি প্রকারে আপন দেশের প্রতি, আপনার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি, অনুরাগ ও ভক্তিপ্রবণ হইতে পারে? দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতেছে, ততই আমরা পূর্ব্ব-পুরুষাচরিত আদর্শ ও শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে আমাদের স্কুলে ও কলেজে 'বিজ্ঞান শিক্ষা দাও'—বলিয়া একটা আন্দোলন উঠিয়াছে।

* "In spite of our modern outlook and methodology, the respect for our ancestors has a steadying influence on all our aspirations and movements."

অনেক ছাত্র, 'আর্ট' ছাড়িয়া, 'বিজ্ঞান' পড়িতেও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, ইহাতে এ দেশের কতটা কার্য্যতঃ উপকার হইতেছে? এই কয়েক বৎসরে বিজ্ঞান শিখিবার উপযোগী কয়খানি সুপাঠ্য গ্রন্থ বাঙ্গলায় বা অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে? যে দুই চারিখানা বাহির হইয়াছে, তাহা ত' স্কুলের পাঠ্য পুস্তক মাত্র। সর্ব্ব-সাধারণের তদ্দ্বারা বিজ্ঞান-শিক্ষার পথ কিছুমাত্র সুগম হয় নাই। স্কুল, কলেজের শিক্ষার সহিত দেশের সর্ব্বসাধারণের কোনও সংস্পর্শ জন্মে নাই। আবার, বিজ্ঞান-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকদিগের মধ্যে কয়জন যুবক, এ দেশে কার্য্যকরী যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন? এই যে অগণিত অর্থ 'মোটরকার' কিনিতে অজস্র ব্যয় হইয়া যাইতেছে, কয়জন ছাত্র এ দেশে ঐ সকল যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার সুযোগ পাইতেছে? এ দেশের লোক কয়টা টাইপরাইটার নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে? টাটার লৌহ-কারখানা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হইতেছি সত্য, কিন্তু সে কারখানার ঐ সকল যন্ত্র কি ভারতীয়েরা নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছে? সে বিজ্ঞান পড়িয়া লাভ কি, যে বিজ্ঞান দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিল না; যে বিজ্ঞান শিখিয়াও ভারতের কোন প্রদেশেও কার্য্যকরী যন্ত্রাদি, শিক্ষিত ছাত্রেরা নির্ম্মাণ করিতে পারিল না এবং বিদেশে অর্থ চলিয়া যাওয়ার স্রোত রুদ্ধ হইল না; আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দূর হইল না!

পথে ঘাটে চলিয়া, স্কুল-কলেজে ছাত্রদের সঙ্গে একত্র বসিয়া, বয়ঃস্থা শিক্ষার্থী ছাত্রীবর্গ, অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদ্যাশিক্ষার দিক্ দিয়া ইহার কিছু উপযোগিতা থাকিলেও, ইহা আমাদের দেশের আদর্শের অনুকূল নহে। দেশীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়া আমরা যে বৈদেশিক অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এ কথা সকলকে স্বীকার করিতেই হইবে। যে ভাবে এ দেশে স্ত্রী-পুরুষের কৃষ্টি (culture) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানের এই আচরণ, সেই প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষাচরিত কৃষ্টি ও প্রথার একান্ত বিরোধী। স্ত্রীজাতির মধ্যে এইরূপভাবে শিক্ষা দিবার প্রণালী, মাত্র ১০।১৫ বৎসর হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে সুফল বা কুফল যাহাই হউক না কেন, সে কথা বিবেচনার সময় এখনও আসে নাই। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, এই প্রণালী নূতন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; ইহা আমাদের আদর্শের অনুকূল নহে।

এই কলিকাতা সহরে, সর্ব্বত্র প্রায় দশ-পনর গজ দূরে দূরে রেষ্টুরেণ্ট বা খাবার দোকান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ গুলি এত বাড়িয়া যাইতেছে যে, আমাদের যৌবনকালে, যখন আমরা কলিকাতায় কলেজে পড়িতাম, তখন কদাচিৎ কোথাও, অত্যন্ত দূরে দূরে এই সকল বিপণি দেখা যাইত এবং ছাত্রবর্গ এ গুলিতে আসিয়া, বর্ত্তমানের ন্যায় দলে দলে বসিয়া, আহার করিতেছে, ইহা দেখা যাইত না। এই সকল খাদ্য-প্রতিষ্ঠানের খাদ্য গ্রহণ করিয়া, বর্ত্তমানের ছাত্র-সম্প্রদায় দিন দিন ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইতেছে। এ প্রকার যথেচ্ছ, যেখানে সেখানে, যাহার তাহার হাতে খাদ্যগ্রহণও আমাদের দেশ-প্রচলিত প্রাচীন কৃষ্টি ও আচারেরও আদর্শের বিরোধী। এই প্রকারে যে দিকেই দেখা যায়, সেই দিকেই আদর্শ-বিচ্যুতি চক্ষে পড়ে।

এই আদর্শ-বিচ্যুতির ফলে, আমাদের যে দুঃখ-দুর্গতি বাড়িয়া চলিয়াছে, এ কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কন্যা-বিবাহে এই যে আজকাল ৪০০০।৫০০০৲ টাকা কন্যার পিতাকে দিতে হইতেছে এবং না দিতে পারিলে কন্যা প্রায় অবিবাহিতাই রহিয়া যাইতেছে,--ইহাও আমাদের প্রাচীন আদর্শের বিচ্যুতিরই ফল। এই যে কন্যার আদরের পরিবর্ত্তে টাকার আদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার প্রকৃত কারণ কি? হিন্দুদিগের শাস্ত্রে বিধান ছিল যে, পুত্র পিণ্ডের অধিকারী। পুত্রের হস্তে পিণ্ড না পাইবার সম্ভাবনা দেখিলে, হিন্দুরা আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন। কি প্রকার আতঙ্ক উপস্থিত হইত, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ, কালিদাসের বিশ্ব-বিখ্যাত শকুন্তলা নাটকের একটা শ্লোকের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। রাজা দুষ্মন্ত পত্নী শকুন্তলাকে পরিত্যাগের ফলে, তাঁহার যে পিণ্ডলোপের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল, এই কথা স্মরণ করিয়া খেদ করিয়াছিলেন। সেই কবিতাটী এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন, দুষ্মন্তের মনে কি প্রকার খেদ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল।—

"অস্মৎ-পরং বত যথাশ্রুতি সংহিতানি
কো নঃ কুলে নিবপণানি করিষ্যতীতি।
নূনং প্রসূতি-বিকলেন ময়া প্রসিক্তং
ধৌতাশ্রুসেকমুদকং পিতরঃ পিবন্তি।"

পুত্র-বিহনে পিণ্ডদানের উপায় বিলুপ্ত হইল এবং তাহার ফলে পিতৃ-পুরুষদিগের অধোগতি লাভ হইবে, এই আশঙ্কা ও খেদ দুষ্মন্তের মনে উদিত হইয়া তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল। ধর্ম্মের সঙ্গে এই প্রকারে পুত্রদত্ত পিণ্ডের যোগ করিয়া দিয়া হিন্দুগণ অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এরূপ করাতে, কন্যার আদর বাড়িয়া গিয়াছিল। লোকে পিণ্ডাধিকারী পুত্রোৎপাদনের কামনায়, বিবাহের জন্য কন্যা খুঁজিয়া লইত। কেননা, কন্যা না হইলে বিবাহ হইবে না; বিবাহ না হইলে, পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না; এবং পুত্র না জন্মিলে পিণ্ডদান কে করিবে? যদি পিণ্ডদানের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে ত পিতৃ-পুরুষের অধঃপতন হইবে। ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। এই নির্দ্দেশের বশবর্ত্তী হওয়ায় হিন্দুদিগের গৃহে আজকালের ন্যায়, কন্যার অনাদর হইতে পারিত না। কন্যা গ্রহণ না করিলে, ধর্ম্মহানি হইবে, পিতৃ-পুরুষের অধোগতি হইবে—এই ভয় হিন্দুর মনে জাগরূক ছিল। ইহার ফলে, পিতৃ-গৃহে সকল কন্যারই আদর ও সম্মান স্থায়ী হইতে পারিয়াছিল। বর্ত্তমানে শাস্ত্রীয় এই আদর্শ জাগরূক থাকিলে, আজ কি কন্যা হেয় সামগ্রীরূপে পরিগণিত হইতে পারিত? কন্যার এই অনাদর, আমাদের প্রাচীন আদর্শ-বিচ্যুতিরই ফল! প্রাচীন কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ না থাকাতেই এই দারুণ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ধর্ম্মের বিনিময়ে নহে; আজ অর্থের বিনিময়ে কন্যা বিক্রীত হইতে চলিয়াছে!

এইরূপে, আমরা যে দিক্‌ দিয়াই দেখি না কেন, সকল দিকেই আমরা ক্রমে প্রাচীন আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, তাহার অনুগামী হইতেছি না। কোন জাতি যখন নিজের আদর্শ ছাড়িয়া দিয়া, অপর জাতির আদর্শের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে, তখন সে জাতি জীবন্মৃত হইয়া যায়। তাহার দুঃখ-দুর্গতির আর সীমা থাকে না। এমন কি, তাহার নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে থাকে। চিন্তা-শক্তি পর্য্যন্ত বাধা প্রাপ্ত হয়। তাহার সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হইতে আরম্ভ করে। আমাদেরও সেই দশা উপস্থিত হইতে বেশী বিলম্ব নাই। দেশ আমাদের; নদী আমাদের; আমাদের ভাষা দিয়া তাহার নাম-করণ করিয়াছি। কিন্তু, আজ বৈদেশিক অনুকরণের প্রভাবে, 'গঙ্গা'কে 'গ্যান্‌জেস্‌' বলিতে আরম্ভ করিয়াছি; 'কলিকাতা' না বলিয়া 'ক্যাল্‌কাটা' বলা সুরু করিয়াছি। আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার—সবই সংস্কৃতে। কিন্তু, সেই সংস্কৃতকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে optional subject করিয়া তুলিয়াছি। ইহার ফলে, ম্যাট্রিক হইতে এম্‌-এ পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই সংস্কৃতের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মের আদর্শও মলিন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দিন দিন আমরা ধর্ম্ম-হীন হইয়া পড়িতেছি। ব্রাহ্মণ বালক সন্ধ্যা ছাড়িয়াছে; গায়ত্রী মন্ত্রের উচ্চারণ করাও পরিত্যাগ করিয়াছে। অথচ, গায়ত্রী মন্ত্রের মত, এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তর্গামী, পরমাত্মার চিন্তা ও উপাসনাত্মক মন্ত্র; বাহিরে ও ভিতরে একই চেতন-সত্তার অনন্ত অনুভবাত্মক মন্ত্র; সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থে এক প্রেরয়িতার চিন্তাত্মক মন্ত্র, অপর কোন ভাষায় আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। শিক্ষিত হিন্দু যুবক-মাত্রেরই এই দশা উপস্থিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কিন্তু ইংরাজ জাতি আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল। বিলাতী খৃষ্টান-মাত্রেই নিত্য দুইবেলা আপন গৃহে পরিবারস্থ সকলকে লইয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

ভারতের উপনিষদ্‌গ্রন্থ অতি উপাদেয় ধর্ম্মপুস্তক। ধর্ম্ম-শিক্ষার পক্ষে এরূপ গ্রন্থ জগতে বড়ই দুর্লভ। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে পঠিত হইলে ধর্ম্মহীনতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া অনেক স্থলে স্কুল-পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে বালক ও যুবকদিগের সমূহ উপকারে আসিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে উদাসীন। আজ পর্য্যন্ত এই উপাদেয় গ্রন্থগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনজরে পড়ে নাই; ইহার তুল্য বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে?

আমরা এই প্রকারেই সর্ব্বতোভাবে, দিনে দিনে, জাতীয় আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছি। পরানুকরণচিকীর্ষা সমাজের দেহে প্রবেশ করিয়া সমাজকে ক্ষুণ্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চিন্তার বিষয় ইহাই যে, এ জাতি বাঁচিয়া থাকিবে কিরূপে? জাতীয়তা বিনষ্ট হইতে থাকিলে, পূর্ব্বপুরুষাচরিত আদর্শ ও পন্থার উপরে অনুরাগ হারাইলে, সে জাতির মৃত্যু অতি সন্নিকট। সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়,

তাঁহাদিগের দৃষ্টি এই উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে আকর্ষণ করিতে চাই। আমরা আমাদের চতুর্দ্দশ-পুরুষ-নিষেবিত সভ্যতা ও আদর্শ ও শিক্ষা হারাইয়া কোন্ জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছি? এ জাতি কি পুনরায় উত্থিত হইবে না? বিধাতার ইচ্ছা কিরূপ তাহা বলিতে পারি না, আজ আমরা বঙ্গীয় সমাজ-দেহের ভিতরে যে সকল খল-ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিয়া, আমরা যে আমাদের প্রাচীন কৃষ্টি (culture) হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছি, তাহাই বলিলাম এবং সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলাম। আমরা সংস্কৃত ভাষা পড়ি না; উহাকে second language ও সম্প্রতি optional subject করিয়াছি; এই জন্যই আমরা আমাদের ঘরের খবর রাখি না, এই জন্যই Macauleyর সঙ্গে আমরাও বলিতে আরম্ভ করিয়াছি যে—"A single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia." কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষ সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতিরূপে অগণিত শিক্ষিত মনীষীর সমক্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন:—"বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে একটি অপরূপ সাহিত্য ছিল। তাহা সংস্কৃত সাহিত্য—বাঙ্গালী আর্য্যজাতির সন্তান, তাঁহাদের সাহিত্য। এই অপূর্ব্ব সাহিত্যটি একটী অফুরন্ত ভাণ্ডারের ন্যায়। এই ভাণ্ডার অনন্ত রত্নরাজিতে পূর্ণ।"

প্রাচীন দেশীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুতির কথা বলিতে গিয়া, আর একটা সামাজিক প্রথার কথা মনে জাগিয়া উঠিতেছে। বাঙ্গালাদেশের যাঁহারা সমাজের উন্নতস্তরের অন্তর্ভুক্ত, যাঁহাদিগকে আমরা 'ভদ্রলোক' বলিয়া অভিহিত করি, তাঁহাদের সঙ্গে, সমাজের যাহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের, যাহাদিগকে আজকাল 'ছোটলোক' বলিতে দ্বিধা বোধ করি না, সেই সকল, সমাজের অত্যন্ত উপকারী ব্যক্তি,—যেমন ধোপা, নাপিত, কর্ম্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যক্তি, কি প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ভদ্র গৃহস্থেরা এই সকল লোককে সর্ব্বদাই সমাদরের সহিত ব্যবহার করিতেন। উহারাও তাঁহাদিগকে 'বাবা-ঠাকুর', 'দাদা-ঠাকুর', 'দিদি-ঠাকুরাণী', 'মা' প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতাইয়া ডাকিত। পরস্পরের প্রতি একটা নৈকট্য, একটা ঘনিষ্ঠতা, একটা প্রীতির বন্ধন বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে এই ঘনিষ্ঠতা একেবারে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল, কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা, ঐ সকল নিম্নশ্রেণীভুক্ত লোককে এখন আর সে প্রকার সৌহার্দ্দ্যের চক্ষে দেখেন না। তাহারাও ইহাদের সঙ্গে মিশে না। এই প্রকারে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে, একটা পার্থক্যের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে। এইরূপে এইদিকেও দেশের প্রাচীন আদর্শ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শুধু ইহাই নহে, যে সকল দেশীয় প্রতিভাবান্ যুবক বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া, বিচারক ও ব্যারিষ্টারী প্রভৃতি পদ প্রাপ্ত হইয়া বসিতেছেন, তাঁহারা দেশের সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে একেবারেই মেলা-মেশা করেন না। এই প্রকারে, দেশের লোকের সঙ্গে এই সকল পদস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; উভয়ের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছে। ইহাও প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলনেরই কুফল। এই প্রকারে, দেশের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ, পরস্পরের প্রতি হৃদয়হীনতা, প্রীতি-বন্ধনের অভাব—এই সকল দুরপনেয় দোষ ও অনিষ্ট উপস্থিত হইতেছে। একদিকে যেমন দেশীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগের সহিত সর্ব্বসাধারণের মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে, তদ্রূপই আবার, বিদেশ-প্রত্যাগত উচ্চপদস্থ দেশীয় যুবকদিগের সহিতও, দেশের সর্ব্বসাধারণের মিলনের সম্ভাবনা দূর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। কবির উক্তি—"নিজ বাস-ভূমে পরবাসী হলে"—বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়া উঠিতেছে।

পরিশেষে একটা কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। প্রাচীন আদর্শ হইতে বিচ্যুতি যেমন একটা বিশাল প্রাচীন জাতির কল্যাণকর নহে, অপর দিকে তেমনই জগতে যে সকল নবীন তথ্য, নব নব আবিষ্কার, নূতন বৈজ্ঞানিক সম্পত্তি দিন দিন, নানাদেশের উদীয়মান চিন্তাশীল মনীষিবর্গের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে সুলভ হইয়া উঠিতেছে, একটা প্রাচীন জাতির পক্ষে সেই সকলের গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাকেও বিনিদ্র থাকিতে দিলে চলিবে না। সেগুলির যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া আপন জাতীয় আদর্শকে নব-বলে বলীয়ান্ করিতে পারিলে, তাহার ফলে সেই জাতির উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী না হইয়া পারিবে না। কেবলমাত্র প্রাচীনের প্রতি ঐকান্তিক

নিষ্ঠা; অথচ নবীনের প্রতি অশ্রদ্ধা—এই দুই-ই অহিতকর। এই নবীনকে সযত্নে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই জাপান আজ এমন উন্নত হইয়া উঠিয়াছে যে, বল-মান-দৃপ্ত ইউরোপীয় জাতিগুলি, জাপানকে সম্মান ও ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন আদর্শ-বিচ্যুতি এবং আত্মগতির পূর্ব্ব-গৌরবের প্রতি অশ্রদ্ধা, যেমন জাতির অকল্যাণপ্রদ ও জাতির বৈশিষ্ট্যের মৃত্যুর হেতু, সেইরূপ অপর জাতির নবীন উদ্ভাবনার প্রতি পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ও সেটি মঙ্গলকর তৎপ্রতি বিমুখতা—ইহাও জাতির অবনতি ও মৃত্যুর কারণ। প্রাচীন ও নবীনের সম্মিলিত বলের ন্যায় বল আর কি হইতে পারে?—এই কথাটীও আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া, নবীনের উপরে, আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-প্রদর্শনও হিতকর বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিব। সতীদাহ-প্রথা-নিবারণ অবশ্য সদিচ্ছা-প্রণোদিত। কিন্তু, এই প্রথার অহিতকারিতা-প্রদর্শন ও উহার নিবারণের চেষ্টা—বৈদেশিক ও আত্ম-সমাজের বহির্ভূত রাজশক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া কি নিজ-সমাজের প্রতি বিদ্রোহিতা নহে? যদি অল্প বয়সে কন্যাবিবাহ অনিষ্টজনকই হয়, তবে নিজের সমাজের উপরে তাহার নিবারণের ভার না দিয়া, তজ্জন্য "সরদা বিল্"-নামধেয় রাজশক্তির শরণাপন্ন হওয়া কি সঙ্গত হইয়াছে? এই সকল ব্যবস্থায় প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিজের সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আমাদের নিজের সামাজিক জীবনের উপরে আমাদের আর আস্থা নাই! আমাদের আচার-ব্যবহার, ধর্ম্ম নীতি, সংস্কার-পদ্ধতি,—সব বিষয়েই আমরা অপরের শক্তির উপরে অধিকতর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-পরবশ হইয়া উঠিতেছি। নিজের প্রাচীন আদর্শ ও সমাজের শক্তির উপরে আমরা আমাদের বিশ্বাস হারাইয়াছি। ইহা অত্যন্ত দুঃখের ও নৈরাশ্যের কথা।

পুস্তক ও পত্রিকা

শান্তিপুর পরিচয়—প্রথম ভাগ (মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী)—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল প্রণীত—১।১৪ রূপচাঁদ মুখার্জ্জি লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। এন্টিক্ কাগজে সুন্দরভাবে মুদ্রিত, ১৩ খানি বিশিষ্ট চিত্র-সমন্বিত এবং প্রমাণ-পঞ্জী ও নির্ঘণ্টাদি সমেত ৩৭০ পৃষ্ঠায় (ডবল্ ক্রাউন ১৬ পেজী) সম্পূর্ণ—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

এই গ্রন্থে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংক্ষিপ্তাকারে অভিনব ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাত্মা সম্বন্ধে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—সকলগুলি পাঠ করা সহজ ব্যাপার নহে; সুতরাং এইরূপ একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের কথা মোটা-মুটি ভাবে জানা যাইবে। বড় রামদাস, কাঠিয়া বাবা, তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি আধুনিক যুগের প্রায় সকল মহাপুরুষের কথা প্রতিকৃতি সমেত প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের সহিত সংশ্লিষ্ট শান্তিপুরের বহু ব্যক্তি ও বিষয়ের বিবরণ গ্রন্থের পরিশেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই জন্য গ্রন্থের এই ভাগের নাম "মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী" রাখা হইয়াছে। ভক্ত, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সাধারণ পাঠক এই গ্রন্থপাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। আজকালকার দিনে এই ধরণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সরস গ্রন্থ বিরল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে গ্রন্থকারের অর্থব্যয় ও শ্রম সার্থক হইবে। ম. ব.

মণিদীপ—নছরুল, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, বাঙ্গলাবাজার ঢাকা। মূল্য ॥০ আট আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বাইশটি ছোট গল্প আছে। কিন্তু গল্পমাত্র বলিলে ইহার যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হয় না, রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের লিপিকা জাতীয় রচনা। ইহাকে গল্প ও প্রবন্ধের মাঝামাঝি এক স্তরের রস-রচনা বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালী লেখক গল্প লেখে, প্রবন্ধ লেখে, কিন্তু এই জাতীয় রচনার দিকে তাহার বেশী ঝোঁক নাই—এ পথটা বাঙ্গলা সাহিত্যে উপেক্ষিত; বর্ত্তমান লেখক সেই উপেক্ষিত পথে নিঃসঙ্গ পথিক।

ইহাতে ঘটনার চেয়ে ভাবনারই প্রাধান্য; যে কোন ছোট একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া লেখক নিজের মনের ভাবনাকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ইহা যেন লেখকের মানসিক (ব্যক্তিগত জীবনের নয়) ডায়ারী। অধিকাংশ গল্পেই দেখা যাইবে লেখক অতীত কালের কোন ক্ষুদ্র ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। সেই দীর্ঘশ্বাস সংহত ভাষা ও সংযত অলঙ্কারের মধ্য দিয়া সমীরিত হইয়া রসবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। 'পোষ্টকার্ড' রচনাটি আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে।

লেখক যে পথে চলিয়াছেন, সে পথে পথিক অল্প, দর্শকও বেশী নাই; কিন্তু তাঁহাকে হতাশ হইলে চলিবে না; আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—এ পথ ধরিয়া চলিলে অচিরকালের মধ্যে তিনি প্রশংসামুখর লোকালয়ে গিয়া পৌঁছিবেন। পথের এই নির্জ্জন অংশে উৎসাহিত করিবার জন্য আমরা তাঁহাকে অকুণ্ঠিত প্রশংসার পাথেয় দান করিতেছি।

পঞ্চমী ও অন্যান্য গল্প—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতী-ভবন—কলিকাতা। মূল্য পাঁচ সিকা॥

গ্রন্থখানিতে সাতটি গল্প আছে।

বাংলা সাহিত্যের রাজপথ ছোট গল্প ও লিরিক। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারকে ছাড়িয়া দিলেও আধুনিক লেখকদের মধ্যে এমন সাত আটজন ছোটগল্প-লিখিয়ের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা সত্য সত্যই বাংলা সাহিত্যের গৌরবের স্থল। বিমলাবাবু তাঁহাদেরই সগোত্র।

বিমলাবাবুর ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য যে, তাহা নিতান্তই ছোট এবং একান্ত ভাবে গল্প। ছোট গল্পের ইহার চেয়ে যথার্থতর সংজ্ঞা আর নাই।

অনেকের মতে যে গল্প একাসনে বসিয়া শেষ করা যায়, তাহাই ছোট গল্প। রামমোহন রায়ের কোন জীবনীতে পড়িয়াছি, তিনি একাসনে বসিয়া বাল্মীকির রামায়ণ শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, রামায়ণও ছোট গল্প!

আমার মতে যে গল্প শ্যামবাজারে ট্রামে চাপিয়া এসপ্লানেডে পৌঁছিবার আগে শেষ করা যায়—তাহাই যথার্থ ছোট গল্প। ইহার মস্ত সুবিধা এই যে, মনোযোগী পাঠকের নিকটে কণ্ডাক্টার অনেক সময়ে মাশুল চাহিতে সাহস করে না। (অবিশ্বাসী পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।)

বিমলা বাবুর অধিকাংশ গল্পই এসপ্লানেড পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না—হ্যারিসন রোডের মোড়েই শেষ হইয়া যাইবে—তার পরে চাই কি নামিয়া পুরানো বইয়ের দোকানে বই খানা বিক্রয় করিয়া ফেলা যায়। আমি বিমলা বাবুর অধিকাংশ গল্প ট্রামে বসিয়া পড়িয়াছি। মাশুল বাঁচাইতে পারি নাই, এক একটি গল্পের পরে উল্লাসের অবকাশে ভাড়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু বই খানা বিক্রয় করি নাই; রাখিব স্থির করিয়াছি।

লেখক যে ছোট গল্পের হাত লইয়া জন্মিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রমাণ, তাঁহার গল্পের বিষয়বস্তু এত তুচ্ছ, যে পাকা জহুরী ভিন্ন কারো চোখেই তাহা পড়িত না। শুনিয়াছি বিশালকায় হাতী শুঁড় দিয়া মাটি হইতে সিকি দোয়ানী তুলিতে পারে। (বিমলা বাবু উপমার প্রথম অংশটা মাপ করিবেন, হাতী ও সমালোচক উভয়েই নিরঙ্কুশ।) কিন্তু এই তুচ্ছ, সাধারণ গল্পগুলি লেখকের হাতে পড়িয়া অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট গল্প সাবানের ফেনার বুদ্বুদ—বিষয়বস্তুর ভার ইহাতে যত কম—তত বেশি ইহার সাফল্য।

তাঁহার গল্প ভাল লাগিবার দ্বিতীয় কারণ—লেখকের হাস্যরসজ্ঞান। হাস্যরস বলিলে যথার্থ বলা হয় না—বলিতে হয় স্মিতরস, এ রস এমন যে মন ভিজিয়া ওঠে, হাসিটি ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া একটুখানি মুচকি হাসিতে মিলাইয়া যায়—বাঙালী পাঠক হাসির শব্দটা কানে না শোনা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করে না। বিমলা বাবুর হাস্য-রস কান-চমকাইয়া-তোলা হাসি নয়, মন-ভেজানো হাসি!

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি নয়, হাস্যবিস্মৃত জাতি। কাজেই হাসির এ জাতিভেদ তাহার পক্ষে না জানাই সম্ভব।

তৃতীয় কারণ তাঁহার নারী-চরিত্র, অর্থাৎ অণিমা, পঞ্চমী, কল্যাণী ও দীপ্তির চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলেরই শ্রেষ্ঠ-সৃষ্টি তাঁহাদের নারী-চরিত্র। বাংলা দেশে নারী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে নারী-আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই প্রমীলার রাজ্যে নানা ধরণের নারী আছে, বিমলা বাবুর কৃপায় সেখানকার আদমশুমারিতে আর চারটি সংখ্যা বাড়িল।

এই চারজনকে আমার এত ভাল লাগিয়াছে, তাহার কারণ ইহারা অত্যন্ত সাদাসিদে, সরল, ঘরোয়া ধরণের ব্যক্তি; গৃহের মধ্যেই ইহাদের দেখা মেলে; কোন দিন ইহাদের যে polling booth-এ দেখিব, সে আশা নাই। বিমলা বাবুর গল্পের বিষয়-বস্তুর সরলতার সঙ্গে ইহাদের চরিত্রের সরলতা মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে—সত্য কথা বলিতে কি—এই চরিত্রগুলিই তাঁহার গল্পের বৃন্ত।

চতুর্থ কারণ—বিমলা বাবু গল্প বলিতে বসিয়া নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ও অভিধানতত্ত্ব আওড়াইয়া পদে পদে আমরা যে গ্রাম্য সেই অতি-সত্য কথাটা স্মরণ করাইয়া দেন নাই। পাঠকের আত্মসম্মানের প্রতি তাঁহার মমত্ববোধ আছে।

তাঁহার অন্য গল্পের বইয়ের প্রতীক্ষায় আমরা রহিলাম।

যাঁহারা ছাপা, বাঁধাই দেখিয়া বই কিনিয়া থাকেন, তাঁহাদের বলিতে পারি এ বই ক্রয়যোগ্য, ছাপা, বাঁধাই উত্তম। ভিতরের খবর তাঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

প্র. না. বি.

রসকণিকা—শ্রীবিভাস প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ, প্রণীত। প্রকাশক - শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯নং নলিন সরকার ষ্ট্রীট, "আবাস" কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৬+৪১৩+৪ পৃষ্ঠা। মূল্য—২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে রসসূক্ত বা শুবাবলীর রসধারা, কবি ও কাব্যরস, ব্রজরসের উৎকর্ষ, রসধ্বনি, রসিক সম্প্রদায়, রসসূত্র, মীরার পীড়া, শ্রীশ্রীদোললীলা, হোরি-লীলা, শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃত, রূপ ও গুণ, প্রথম দর্শন, প্রথম

স্পর্শন, লীলাস্মৃতি, শাস্ত্রসমন্বয়, দুঃখবাদ, দর্শনসমন্বয়, কর্ম্মরহস্য, নীলকণ্ঠের নৃত্য, বন্ধুবিরহ, শ্রীকুণ্ডস্মৃতি নামে একুশটি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার এই সকল প্রবন্ধে সরল বাংলা ভাষায় সুগভীর রসতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এরূপ আলোচনা প্রায় নাই বলিলেই চলে। অতি কঠিন বিষয়ও কিরূপ সরলভাবে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে পারা যায়, এই গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার নিপুণ ভাবে তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কাব্যালঙ্কার শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কাব্যরস বিষয়ক প্রগাঢ় আলোচনা ও ভক্তিশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে ভক্তিরস-বিষয়ক দুরূহ তত্ত্বের একত্র সমন্বয় করিয়া ব্যাকরণ ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব বিশ্লেষণে যেরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। 'রসধ্বনি' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকার আনন্দবর্দ্ধনকৃত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থের যেরূপ সরল অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। ধ্বন্যালোকের মত দুরূহ গ্রন্থের মর্ম্ম সরল বাংলা ভাষায় উদ্ধার করা বাহাদুরী বটে। এইরূপ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর ও সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে নিবদ্ধ রসতত্ত্বের আলোচনা ও সামঞ্জস্য বেশ নিপুণ ভাবে গ্রন্থকার করিয়াছেন। ভক্তিরস সম্বন্ধে উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে নিবদ্ধ গভীর আলোচনাগুলির সরল মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া গ্রন্থকার যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বৈষ্ণব ভক্তমাত্রই ভক্তিরসে আপ্লুত হইবেন, একথা জোর করিয়া বলিতে পারি। ভক্ত রসিকেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন। আমরা গ্রন্থকারকে অভিনন্দিত করিতেছি।

গীতাঞ্জলি—শ্রীঅমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসুশীলকুমার মজুমদার, 'দি এম্পোরিয়াম', ১৫৫এ, রসা রোড, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত, ১১৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০ টাকা, এন্টিক কাগজে উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ২৷৷০ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে—প্রার্থনা, দয়া, পাষাণপ্রতিমা, দীনা, অপমান মহিমা, ব্যর্থসাধনম্, অধিকারী, আনন্দময়ঃ, দ্বা সুপর্ণা, মূল্যজ্ঞানম্, হিমালয়ঃ, পরাজয়ঃ, পদ্মা, জন্মভূমিঃ স্বর্গাদপি গরীয়সী, স্পর্শমণিঃ, কবিকথা, প্রয়াণম্, নির্ঝর-প্রবোধঃ, কামঃ (ভস্মীভবনাৎ পূর্ব্বম্), কামঃ (ভস্মীভবনাৎ অনন্তরম্), রাহুপ্রণয়ঃ, বঞ্চিতা, পতিতা, স্মৃতিমন্দিরম্, কচ-দেবযানীসংবাদঃ এই সকল নামে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি প্রসিদ্ধ কবিতার সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার অনুবাদে নিপুণতা দেখাইয়াছেন। বাংলা কবিতার সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করা সহজসাধ্য নহে, কিন্তু গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে ইহা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার নিকট এ কাজ খুবই সহজ বলিয়া মনে হইয়াছে, নতুবা এরূপ সরস, সরল অথচ বিশুদ্ধ ভাষায় মূল বাংলা কবিতার অনুরূপ সংস্কৃত কবিতায় এ কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন না। যাঁহারা বাংলা ভাষা জানেন না, সংস্কৃতজ্ঞ, সেই সব কাব্যরসিক এই গ্রন্থ পাঠ করিলে রবীন্দ্র-কাব্যের রস আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের ছন্দোবন্ধ ও বাগ্‌বিন্যাস কিরূপ হৃদয়গ্রাহী তাহার একটু নমুনা দিতেছি—

'অবনময় নিজো মে নাথ হে পাদমূলে

নিখিলমপি ভিমানং নেত্রবারিপ্রবাহে'। ইত্যাদি, ১ম পৃষ্ঠা।

ইহা যে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ কবিতা 'মম মাথা নত করে' ইত্যাদি কবিতার অনুবাদ তাহা বাঙ্গালী পাঠককে বলিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপ প্রায় সর্ব্বত্র। আমরা এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

বাল্মীকি রামায়ণ—(বঙ্গীয় সংস্করণ) ৩৮শ খণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ৪০-৫৭ সর্গ, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম-এ সম্পাদিত। কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা নং ২, মেট্রোপলিটান্ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস লিমিটেড, ৯০, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত, রয়েল ৮ পেজি ১০৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে বাল্মীকি-রামায়ণের মূল সংস্কৃত শ্লোক, লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সংস্কৃত প্রাচীন টীকা, সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ও স্থানে স্থানে প্রয়োজন অনুসারে টিপ্পনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল পাঠ সঙ্কলন করিবার জন্য গোরেসিয়ো সাহেবের মুদ্রিত গ্রন্থ, সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয় হইতে প্রাপ্ত হস্তলিখিত গ্রন্থ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির হস্তলিখিত গ্রন্থ, ঢাকা মিটফোর্ডের হস্তলিখিত গ্রন্থ ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুস্তকালয়ের ১নং ও ২নং গ্রন্থ, রামায়ণ-ভূষণ টীকা, 'শিরোমণি' টীকা ও 'তিলক' টীকা সমালোচনা করা হইয়াছে। সমীচীন পাঠ মূলে সন্নিবিষ্ট করিয়া নানা পাঠগুলি পাঠান্তররূপে নিম্নে পাদটীকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে পাঠকের পক্ষে বিভিন্ন পাঠ সমালোচনা করিবার সুযোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অনুবাদে ও টিপ্পনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা আদৌ নাই, যাহাতে সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালা পাঠকসাধারণও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাল্মীকির মূল রামায়ণের রস আস্বাদন করিতে পারেন তাহারই চেষ্টা হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন—কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও বাল্মীকির রামায়ণে কতখানি প্রভেদ। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এরূপ গ্রন্থের প্রচার না হওয়া দুঃখের কথা। এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমরা সম্পাদকের কৃতিত্ব ও প্রকাশকের সাধু উদ্দেশ্য এবং যথেষ্ট অর্থ-ব্যয়ের জন্য উভয়কেই আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

তত্ত্বচন্দ্রিকা—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যার্ণব প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমানসরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ৬৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ১২০ পৃষ্ঠা, সোণালী বাঁধাই—মূল্য ১৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার সরল বাঙ্গলা ভাষায় সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ব প্রকৃতি, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, একাদশ ইন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও মন, পঞ্চ মহাভূত—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এবং পুরুষ বা আত্মা এই ২৫টি বিষয় সম্পর্কে পঁচিশটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রত্যেক

প্রবন্ধের শীর্ষে সরল সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ শ্লোকে প্রত্যেক বিষয়ের লক্ষণও দিয়াছেন, তাহাতে বিষয়গুলি মনে রাখিবার সাহায্য করে। গ্রন্থকার যেরূপ ভাবে বিষয়গুলি বুঝাইয়াছেন তাহাতে এই গ্রন্থকে শুধু সাংখ্যদর্শনেরই ব্যুৎপাদক বলা যায় না, সাধারণভাবে দর্শনশাস্ত্রের ব্যুৎপাদকই বলিতে হয়, কারণ এই সকল বিষয় জানা না থাকিলে কোন দর্শনই বুঝা যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আমরা আর দেখি নাই। ইহাতে দার্শনিক পাণ্ডিত্য নাই, অথচ দার্শনিক তত্ত্ব সুন্দর বুঝিতে পারা যায়। বালক, বৃদ্ধ ও যুবক সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন। ইহাকে 'ছেলেদের সাংখ্য' বা 'ছেলেদের দর্শন' বলা যায়। গ্রন্থের একটু নমুনা দেখুন—

'শীতলং মধুরং শুক্রং কিলালং কথ্যতে বুধৈঃ।
শব্দাদিভিস্ত্রিভির্যুক্তো রসস্তস্যাস্তি কারণম্' ॥২॥

"জলের সত্তা আমরা চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই ইন্দ্রিয়চতুষ্টয় দ্বারা অনুভব করিয়া থাকি। জলে গন্ধ নাই, কাজেই নাসিকার নিকট জল সম্পূর্ণ অপরিচিত। পচা জলে যে গন্ধ পাওয়া যায় তাহা জলের গন্ধ নহে। জলের সহিত মিশ্রিত পার্থিব পদার্থের গন্ধ মাত্র। নির্ম্মল জলে কখনই গন্ধ অনুভূত হয় না।......

যে বস্তুর গন্ধ নাই, কোন জীবই তাহার গন্ধ পাইতে পারে না।... মরুভূমির উষ্ণ বায়ুর মধ্যে যখন কোন দিক্ হইতে জলকণাবাহী শীতল বায়ু আসিয়া গায়ে লাগে, তখন অনায়াসেই জল কোন্ দিকে আছে তাহা (উষ্ট্র) বুঝিতে পারে। ত্বগিন্দ্রিয় তখন তাহাকে জলের সত্তা বুঝাইয়া দেয়। নাসিকা এই বিষয়ে চিরকালই উদাসীন থাকে"। ইত্যাদি—১৮—১৯ পৃষ্ঠা।

আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

ন্যায়দর্শনের ইতিহাস—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম-এ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীমানসরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ৪৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, ৪০০ পৃষ্ঠা—মূল্য ২৲ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় ন্যায় দর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি সুচিন্তিত ভূমিকা ও বাংলা ভাষায় লিখিত একটি সুলিখিত পরিশিষ্ট গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে সূত্রকার অক্ষপাদ গোতম, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর, তাৎপর্য্যকার বাচস্পতি মিশ্র, পরিশুদ্ধিকার উদয়ন, মঞ্জরীকার জয়ন্ত, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায় দর্শনের গ্রন্থকার ও তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে গ্রন্থকার পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মত মনগড়া কথা বলেন নাই। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বেদাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কল্পিত মতগুলি খণ্ডন করিয়া প্রাচ্য মত নিপুণতার সহিত সংস্থাপন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দীর্ঘতমা গোতম ন্যায়সূত্রের রচয়িতা, তিনিই অক্ষপাদ নামেও পরিচিত। এই বিষয়টি গ্রন্থকার অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন ও পরিশিষ্টে 'ঋগ্বেদে দীর্ঘতমা'-শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার বিশেষ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দীর্ঘতমা গোতমই ন্যায়দর্শনের বক্তা, অহল্যাপতি গৌতম বা অন্য কেহ নহেন। গ্রন্থে 'ন্যায়সূত্রবিবরণ' নামক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ন্যায়দর্শনের সারমর্ম্ম সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে, 'ন্যায়পরিশিষ্ট' নামক অধ্যায়ে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ সম্পর্কে পরস্পর সামঞ্জস্যমূলক আলোচনা করা হইয়াছে, 'ন্যায় পরিচয়' নামক অধ্যায়ে ন্যায়ভাষ্যাদি গ্রন্থ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা আছে। বাংলা ভাষায় ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে এই গ্রন্থ অভিনব। ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় ন্যায় দর্শনে এরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। আধুনিক ঐতিহাসিকরা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ন্যায়াদি দর্শনকে স্থান দেন না। গ্রন্থকার পরিষ্কার দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। এই বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার বৌদ্ধশাস্ত্র ও বৌদ্ধ দর্শনের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব অস্বীকার করার চাতুরী সুন্দর ধরা পড়ে। দার্শনিক ও ঐতিহাসিক মাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। গ্রন্থকারকে আমরা অভিনন্দিত করি।

কৃষ্টি

বক্তা যখন যে ভাবাপন্ন হইলে তাহার মুখ হইতে বিভিন্ন শব্দ নির্গত হয়, সেই ভাব কি করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহা স্থির করিবার যে-পদ্ধতি ভারতীয় ঋষিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তদনুসারে কৃষ্টি বলিতে বুঝায় সেই কার্য্য অথবা সাধনা, যদ্দ্বারা মনুষ্য-প্রকৃতিতে কি উপায়ে অশান্ত রাজসিকতার সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং অশান্ত রাজসিকত্ব প্রশান্ত করা যায়।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম অধ্যায়

কিছুদিন সাধনার মনের মত হইবার চেষ্টা করিয়া আশালতা দেখিল, কাজটা বড় কঠিন। সাধনার কাছে ফাঁকি চলে না। মানুষটা সহজ, শান্ত ও মমতাময়ী বটে, কিন্তু গোঁজামিলের ব্যাপারে বড় কড়া। খারাপ লোককে খারাপ লোক হিসাবে যদি বা খানিক কাছে ঘেঁষিতে দেন, ভালমানুষ সাজিয়া আপন হইবার চেষ্টা করিলে খারাপ লোক তাঁর কাছে একেবারেই প্রশ্রয় পায় না।

মানুষ বশ করিবার যত উপায় জানা ছিল, তার সবগুলিই আশালতা খাটাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল। কিন্তু দেখা গেল, ফলটা আরও খারাপ হইয়াছে। কোন চেষ্টা না করিলেই বরং ভাল হইত; সাধনার মনের মত হইতে গিয়াই সাধনার কাছে নিজের পরিচয়টা আরও বেশী পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে।

নিজের বোকামিতে আশালতা ক্ষুব্ধ হয়, রাগও করে। রাগটা হয় তার সাধনার উপর। তার প্রত্যেকটি চালাকি ধরিয়া ফেলিবার মত চালাক মানুষ যদি সাধনা হন, এ রকম সাদাসিধে সাধারণ ভালমানুষ সাজিয়া থাকিয়া তার মনে ভুল ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া কি সাধনার উচিত হইয়াছে? সে হইল পুত্রবধূ, একমাত্র ছেলের একমাত্র বৌ, তাকে এ ভাবে ঠকান কি ভাল?

তাকে বিবাহ করার জন্য সাধনার কাছে অনুপম ছেলেমানুষের মত অপরাধী সাজিয়া থাকে দেখিয়াও আশালতার গা জ্বলিয়া যায়। কেন, তাকে বিবাহ করার জন্য সে কি অনুপমের পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছিল? তার বয়স একটু বেশী, চালচলন সাধনার মনের মত নয়, কিন্তু সে জন্য দায়ী কি সে? নিজে দেখিয়া, নিজে পছন্দ করিয়া, নিজে ভালবাসিয়া নিজে প্রস্তাব করিয়া অনুপম তাকে বিবাহ করে নাই?

তা ছাড়া, ধরিতে গেলে সেই তো অনুপমকে অনুগ্রহ করিয়াছে। যেমন অবস্থা বাড়ীর, তেমনই অবস্থা অনুপমের নিজের, জানিয়া শুনিয়া সে যে অনুপমকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল, এটাই কি তার অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় নয়, তার গভীর আত্মত্যাগের পরিচয় নয়, তার অপার্থিব, উদার প্রেমের পরিচয় নয়,—যে প্রেম মানবীকে দেবীতে পরিণত করে?

কিন্তু যতই রাগ হোক, যতই গা জ্বালা করুক, বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার মত লোক আশালতা নয়। সাধনাকে জয় করিবার চেষ্টা সে ছাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু কোন রকম বিরোধ সৃষ্টি করে না। ছেলের কাছিতে সম্মাহত সাধনার সমস্ত উপেক্ষা ও অবহেলা নীরবে সহ্য করিয়া যায়, মনের গোপন কোণে বিদ্বেষ জমাইয়া রাখে।

সাধনার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকৃতির দর্পণে নিজের হীনতা ও সঙ্কীর্ণতা আশালতা বার বার প্রতিবিম্বিত হইতে দেখিতে পায়, কিন্তু সে জন্য সে বিশেষ বিচলিত হয় না। তার সবাপেক্ষা জ্বালা বোধ হয়, দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ, অতি সামান্য ঘটনায় অনুপমের জন্য সাধনার অগাধ বাৎসল্যের অতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ অভিব্যঞ্জনা সে যখন অনুভব করিতে পারে।

মা ছেলেকে ভাল বাসিবে, এই সহজ সত্যটির বিরুদ্ধে আশালতার নালিশ নাই, অনুপমের জন্য সাধনার স্নেহ যখন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়, তখন আশালতার কষ্টও হয় না, সাধনাকে শত্রু বলিয়া মনেও হয় না। কিন্তু সাধনার বাৎসল্যের সেই অভিব্যক্তিগুলি আশালতাকে একটা অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য যন্ত্রণা দেয়, যে অভিব্যক্তিগুলি একমাত্র বাৎসল্যের অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া আর কোন দৃষ্টিতেই ধরা পড়িবার নয়। তখন সাধনাকে আশালতার মনে হয় শত্রু, মনে হয় সাধনা যেন তার ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাকে বঞ্চিত করিয়া তার সর্বাপেক্ষা অমূল্য সম্পদটি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

নিজের মনের এই ব্যাপারটা আশালতা ভাল বুঝিতে পারে না। সে জানে, তার কাছ হইতে অনুপমকে কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা সাধনার নাই, সাধনাকে অনুপম যতই ভয় করুক, সাধনার মনে কষ্ট দিতে অনুপমের যতই আপত্তি থাক, মনের জোর অনুপমের নাই, সাধনার চেয়ে তাই অনুপমের উপর তার জোর অনেক বেশী। বৌ ছেলেকে পর করিয়া ফেলিবে, শাশুড়ীর এই আশঙ্কা যেমন বোঝা যায়, স্বামীর উপর শাশুড়ীর কর্তৃত্ব বেশী বলিয়া বৌ-এর হিংসাটাও তেমনই বোঝা যায়, কিন্তু স্বামীর জন্য শাশুড়ীর স্বাভাবিক বাৎসল্য বৌ-এর মনে আগুন ধরাইয়া দেয় কোন্ যুক্তিতে?

বিশেষতঃ বৌ যখন জানে, যে দিন খুসী স্বামীকে দিয়া সে এই বাৎসল্যের অপমান করাইতে পারে?

নিজের মনের এই দুর্বোধ্য রহস্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া যে কয়েকটা দিন আশালতা নিজের মধ্যেই রহস্যের একটা সমীচীন ব্যাখ্যা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে, সেই কয়েকদিন তাহার চাল-চলনে একটা অপরূপ স্বাভাবিক মাধুর্য্যের সঞ্চার হয়, যাহা সাধনাকে করিয়া দেয় অবাক্ এবং অনুপমকে করিয়া দেয় আরও বেশী মোহাতুর।

কিছুদিনের জন্য আশালতা যেন নতুন মানুষ হইয়া যায়। অনুপমের মনে হয়, ক্রমাগত তাকেই গ্রহণ করিয়া চলিবার প্রক্রিয়াটা বন্ধ করিয়া আশালতা যেন এতদিনে নিজেকে দান করিতে শিখিয়াছে, কেবল তাকেই আদর না করিয়া তার কাছ হইতেও আদর পাওয়ার প্রয়োজনটা একটু বুঝিতে পারিয়াছে।

একটু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি সামান্য।

কিন্তু অনুপমের কাছে তাই যথেষ্ট। আশালতা তার মধ্যে যে মোহ জাগাইয়া দিয়াছিল, আশালতার কাছে সে তার তৃপ্তি পায় না, গভীর অতৃপ্তিতে দিন দিন তাহার মোহ তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠে। আশালতা তাকে স্নেহ করে, সেবা করে, আদর করে, মাঝে মাঝে গভীর ও আন্তরিক আবেগে তাকে অভিভূত করিয়া দেয়, হাসিমুখে তার সমস্ত দাবী মিটাইয়া চলে,—তবু অনুপমের মনে হয়, কিছুই যেন আশালতা তাকে দিতেছে না, সব দিক্ দিয়া তাকে বঞ্চিত করিয়া চলিয়াছে।

কি সে চায় আশালতার কাছে ও কি সে পায় না, কেন একটা মর্ম্মান্তিক অতৃপ্তির যন্ত্রণা ধারাল অস্ত্রের মত মনকে তাহার ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়, অনুপম তাহা বুঝিতে পারে না। সময় সময় তার মনে হয়, আশালতা যেন ঠিক তার বৌ নয়, বৌ-এর মুখোস পরিয়া অন্য একটা সম্পর্ক পাতিবার জন্য আশালতা তার শয্যাপার্শ্বে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে। এ জগতে মানুষের যত আত্মীয়া থাকা সম্ভব, মা-বোন-মাসী-পিসী, আশালতা যেন তাই, তার উপরে সে বান্ধবী, তারও উপরে সে নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ একটা মাংসপিণ্ড। আর কিছুই সে নয়।

গভীর রাত্রি। সহরের আওয়াজ মৃদু হইয়া আসিবার স্তব্ধতা।

আশালতার অতি কোমল, অতি মৃদু মিনতির আজ্ঞায় ঘুম আসিবে না জানিয়াও অনুপম আশালতার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে। বেশী রাত জাগিলে মানুষের শরীর খারাপ হয়।

আশালতা কথা বলে, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করে, নিবিড় মমতায় স্তিমিত চোখে মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু ও অপূর্ব্ব হাসি হাসে। অনুপমও কথা বলে, এক হাতের আঙুল দিয়া অপর হাতের আঙুলগুলিকে বন্দী করিয়া দুটি হাতকেই বুকের কাছে জড়ো করিয়া রাখে, প্রায় অপলক চোখে আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। দেয়ালে লটকানো বিদ্যুৎ আলো হইয়া আশালতার মুখে আসিয়া পড়িতে থাকে অবিরাম, মুখের এক পাশে থাকে মুখের ছায়া, নাকের পাশে থাকে নাকের ছায়া, আধ ঢাকা চোখে থাকে চোখের পাতার ছায়া,—আলো-ছায়ায় আশালতার মুখখানা অতি ভয়াবহ মনে হয়। অনুপম শিহরিয়া উঠে। সে যেন এক কান দিয়া দিয়া আশালতার কথার মৃদু গুঞ্জন শুনিতে পায়, অপর কানটিতে সেই গুঞ্জনের সুর কাটিয়া কাটিয়া কে যেন বলিয়া চলে, এ তরঙ্গ নয়, এ তরঙ্গ নয়।

খানিক পরেই অনুপমকে ঘুমের ভাণ করিতে হইবে। আশালতা যে কথাই বলিয়া চলুক, অনুপম জানে, মনে মনে সে আবৃত্তি করিতেছে 'ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসী ঘুম দিয়ে যা'। ঘুমের ভাণ না করিয়া তার উপায় কি।

জোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া সে চোখ বুজিয়া থাকিবে. খানিক অপেক্ষা করিয়া আশালতা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিবে, 'ঘুমোলে ?'

সে সাড়া দিবে না।

আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আশালতা ঠিক করিয়া সন্তর্পণে তার মাথাটি বালিশে নামাইয়া দিবে। আলো নিবাইয়া অধিকতর সন্তর্পণে পাশে শুইয়া পড়িবে।

অনুপমের মনে হইবে, ষ্টেজের আলো নিভিয়া গেল।

অভিনয় মঞ্চের আলো নেবে এবং জ্বলে, কিন্তু বক্তৃতা-মঞ্চে অনুপমের আনাগোনায় আশালতা যে যবনিকা টানিয়া দিল, তাহা আর উঠিল না। ব্রহ্মানন্দ একদিন অনুপমকে ডাকিতে আসিয়া মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ফিরিয়া গেল, আর কদিন ডাকিতে আসিয়া সে পড়িল আশালতার পাল্লায়।

'আপনাদের ও সব ছ্যাবলামিতে যোগ দেবার সময় আমারও নেই ওঁরও নেই, ব্রহ্মানন্দ বাবু।'

'ছ্যাবলামি! আপনি—আপনি—' বক্তব্যটা শক্ত জিনিষের মত ব্রহ্মানন্দের গলায় আটকাইয়া গেল।

'চা খাবেন ?'

চা না খাইয়াই ব্রহ্মানন্দ বিদায় গ্রহণ করিল এবং কয়েকদিন পরে অনুপমের নামে একখানি বেনামী চিঠি আসিল। চিঠিতে 'দি ষ্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন ফর দি প্রোটেকশন অব এভরিবডিজ্ রাইটস ইনক্লুডিং ষ্টুডেন্টস্'-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক সরসীলাল ভাদুড়ীর নামের সঙ্গে আশালতার নাম জড়াইয়া কয়েকটা কথা লেখা ছিল।

আশালতা বলিল, 'দেখি কার চিঠি ?'

আগাগোড়া চিঠিখানা পড়িয়া সে হাসিয়া ফেলিল।

'উঃ, কি সয়তান ছেলে! সে দিন অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম কি না, তাই শোধ নিচ্ছে। কার হাতের লেখা জান ? ব্রহ্মানন্দের।'

অনুপমের মুখ গম্ভীর হইয়া আছে দেখিয়াও সে নিজের হাল্কা পরিহাসের ভঙ্গী ত্যাগ করিল না, বলিল, 'কিগো, দাঁড়িয়ে রইলে যে ? যাও, খোঁজ নিয়ে এসে গে' ?'

অনুপম বলিল, 'ধেৎ।'

আদর্শের হিসাবে জীবনের মূল্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতেছিল, কিন্তু জীবন যে এত সস্তা হইতে পারে, কিছু-দিন আগেও অনুপমের এ ধারণা ছিল না। তরঙ্গের আত্মহত্যার পর হইতে আদর্শের নামে যে অবাস্তব স্বপ্নের রঙীন প্রতিবিম্বগুলি জীবন হইতে একটির পর একটি মুছিয়া যাইতেছিল, সেগুলির প্রতি অনুপমের মমতা বড় কম [illegible]। কেবল তার নিজের নয়, তার পরিচিত ভাল-মন্দ সকল মানুষের জীবন যে আদর্শের রঙে রঙীন [illegible] কাঁচা কেন যে, বাস্তব জীবনের সামান্য একটু ঘা পাইবামাত্র বক্র উঠিয়া কুশ্রী হইয়া যায়, এত বড় একটা প্রশ্নের জবাব আবিষ্কার করিবার মত মাথা অনুপমের ছিল না, কিন্তু প্রশ্নটা একটা অস্পষ্ট রূপ ধরিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, প্রশ্নটার জবাব কি এই যে, মানুষের জীবনে আজ মর্যাদা শিথিল হইয়া গিয়াছে ?

তারপর একদিন সাধনা বলিলেন, 'অপরাধী সেজে থাকলে তো চলবে না অনু, কিছু করতে হবে। কি করবি ভেবেছিস ?'

অনুপম কি করিবে, সে ভাবনা অনুপমের হইয়া আশালতা আগাগোড়া ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল এবং অনুপমকেও প্রায় সেই ভাবেই ভাবিতে শিখাইয়া আনিয়াছিল। মনে মনে অনুপম জানে, আশালতা যাহা স্থির করিয়াছে, তাই তাকে শেষ পর্য্যন্ত করিতে হইবে, তবু সাধনাকে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলিবার সাহস তাহার হইল

'ভাবছি। এখনো কিছু ঠিক করি নি।'

'ঠিক তুই কোন দিন করতে পারবি না। তোর একটুও মনের জোর নেই অনু।'

বড় শ্রান্ত মনে হয় সাধনাকে, বড় অসহায় মনে হয়। মানুষটার গায়েও যেন এতটুকু জোর নাই, মনেও এতটুকু জোর নাই। জীবন-যুদ্ধে এতদিনে তিনি যেন একেবারে হার মানিয়াছেন,—যুদ্ধের শেষে যখন জয়-গৌরব লাভ করিবার কথা ঠিক তখন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বাঁচিতে বসে তিনি এক রকম তপস্যা করিয়াছেন বৈ কি,—আত্মনির্ভরশীলতার তপস্যা, স্বামীর

ইচ্ছাপালনের তপস্যা, বীরেশ্বরের আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবার প্রলোভন জয় করিবার তপস্যা। এমন ভাবে সাধনা অনুপমের মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন যে মনে হয়, অনুপমের দাম কষিয়া তিনি যেন ব্যাকুল ভাবে নিজের সুদীর্ঘ ও কঠোর ব্রতপালনের সার্থকতা যাচাই করিতেছেন, সবটাই যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, কোন মতেই তাহা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

'তুই যে কি করে এমন হয়ে গেলি অনু!'

অনুযোগের চেয়ে কথাটা আপশোষের মতই শোনায় বেশী। নিজেকেই যেন তিনি উদ্‌ভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এত করলাম তবু ছেলেকে আমি মানুষ করতে পারলাম না কেন? কেন আমার এতদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল?

অনুপমের মন খারাপ হইয়া যায়। কেবল আশালতার জন্যই যে সাধনা হঠাৎ তাহাকে অমানুষ মনে করিতে আরম্ভ করেন নাই, এমন স্পষ্টভাবে অনুপম তা জানে যে, অন্ধভাবে আশালতার পক্ষ সমর্থন করিয়া সাধনার উপর একটু বিরক্ত হইয়া উঠিবার সুযোগটা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারে না। খানিক ইতস্ততঃ করিয়া সে চলিয়া যায় নিজের ঘরে। দেখা যায়, সেখানে ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে আশালতা।

'মা কি বলছিলেন?'

'শিব গড়তে কেন বাঁদর গড়লেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।'

চোখের পলকে আশালতা বুঝিতে পারে, অনুপম রাগ করিয়াছে। কিন্তু কার উপর রাগ করিয়াছে বুঝিতে পারে না।

'মাকে বলেছ বুঝি?'

'না। আমি বলতে পারব না।'

শুনিয়া আশালতা রাগ করে না, শিশুর অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দিবার ভঙ্গীতে মৃদু একটু হাসিয়া বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তুমি। একটুতে মন বিগড়ে যায়।'

সাধনা মনে করেন অপদার্থ, আশালতা মনে করে ছেলেমানুষ। এদের কারও মনে করার সঙ্গে অনুপমের নিজের ধারণা মেলে না। নিজেকে তার মনে হয় একটা রূপ-ধরা ফাঁকি, যার মধ্যে অপদার্থতাও নাই, ছেলেমানুষিও নাই।

বীরেশ্বরের সঙ্গে আশালতার বার চারেক দেখা হইয়াছে। দুবার বীরেশ্বর এ বাড়ীতে আসিয়াছেন, দুবার সকলকে নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। বীরেশ্বরকে যতটুকু চেনা দরকার, চারবার দেখিয়াই আশালতা চিনিয়া ফেলিয়াছে, ও দিক দিয়া তার কোন ভয় নাই। তার ভয় শুধু সাধনাকে। তবে অনুপমের কাছে সাধনার অদ্ভুত মনের জোর ও একগুঁয়েমির কাহিনী শুনিতে শুনিতে সাধনার সম্বন্ধে তার যে রকম ভয় হইয়াছিল, এখন সে ভয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, নিজের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে যে অবস্থায় মানুষ ভাঙ্গিয়া পড়ে, সাধনা সেই অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া সাধনাকে আরও খানিকটা নির্জ্জীব করিয়া আনিতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের বেনামী চিঠির পর আর দেরী করিবার সাহস আশালতার হইল না।

একদিন বিকালের দিকে অনুপমকে সঙ্গে করিয়া সে বেড়াইতে বাহির হইল। বাহির হইল একটু সকাল সকাল, কারণ অনেক কিছু করিবার ছিল। পথে নামিয়া বলিল, 'পথে ঘাটে কোথায় বেড়াব? তার চেয়ে চল আমার দু'একজন বন্ধুর বাড়ী গিয়ে দেখা করে আসি। অনেক দিন দেখা হয় নি, বিয়ের সময়ও নেমন্তন্ন করি নি—নিশ্চয় ভারি ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে।'

'সিনেমায় গেলে হত না?'

'সিনেমায় আর একদিন যাব।'

যে দুটি বাড়ীতে যে দুটি পরিবারের মধ্যে আশালতা অনুপমকে টানিয়া লইয়া গেল, তাদের সঙ্গে আশালতার পরিচয় থাকা সম্ভব, বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। সে সম্পর্ক যে আছে, তারও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। বরং আশালতার মত মেয়েকে একদিন চা-পানের নিমন্ত্রণ করিয়াই যে কৃতার্থ করিয়া দেওয়া যায়, দুটি পরিবারের একজনেরও, এমন কি খানসামা বেয়ারাগুলির পর্য্যন্ত, এই জ্ঞানের কিছুমাত্র অভাব আছে বলিয়া মনে হইল না।

আশালতা নিজেও আজ সাজগোজ করে নাই, অনুপমও করে নাই। নিজের স্বপ্ন জীবনের এই দুটি প্রায় অভিন্ন আবেষ্টনীর মধ্যে নরম আসনে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া মার্জ্জিত কণ্ঠের ভাসা-ভাসা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ভদ্রতার আলাপ শুনিতে শুনিতে অনুপমের মনে হইতে থাকে, সুদৃশ্য অ্যাশ-ট্রে পর্য্যন্ত যেন সস্ত্রীক অনুপমবাবুকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

দু' নম্বর বাড়ীটির গেট পার হইয়া দু' পাশের সম্ভ্রান্ত বাড়ীগুলির মধ্যে পিচ ঢালা পরিষ্কার পথ ধরিয়া দু'জনে ট্রাম-লাইনের দিকে হাঁটিতে লাগিল।

আশালতা অনুপমের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, এক সময় মৃদুস্বরে বলিল, 'গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা বলল,—ঠিক একটি বার! জানে যে আপনার ভদ্রতা করে আমরাও বলব, গাড়ীর দরকার নেই। আর একবার যদি বলত, আমি ঠিক বলে বসতাম, এত করে যখন বলছেন, মেনি থ্যাঙ্কস্।'

অনুপম ঝাঁঝাল স্বরে বলিল, 'হাঁটতে তোমার কষ্ট হচ্ছে?'

'হাঁটতে আবার কি কষ্ট?—মজা করে খানিকক্ষণ দামী গাড়ীতে চড়ে নিতাম!'

'দামী গাড়ীতে চড়লেই মানুষ সুখী হয় না।'

আশালতা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা ঠিক। সুখী হওয়া অ্যাতো কঠিন!'

তারপর আরও খানিকক্ষণ রাশ আলগা দিয়া সওর-তলীর হ্রদের ধারে অনুপমকে একটা পাক ঘুরাইয়া এক সময় আশালতা আবার রাশ টানিয়া ধরিল এবং সন্ধ্যার পরেই অনুপমকে হাজির করিয়া দিল বীরেশ্বরের কাছে।

সমস্ত শুনিয়া বীরেশ্বর বলিলেন, 'এ বুদ্ধি তোকে কে দিল অনু?'

'কেউ বুদ্ধি দেয় নি, নিজের ফিউচার ঠিক করে নেবার বয়স আমার হয়েছে ঠাকুর্দ্দা।'

'কথা শুনে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। তোর বিলেত যাওয়ায় মানে হয়, বৌকে সঙ্গে নিয়ে যাবার তোর কি দরকার?'

এ প্রশ্নের জবাব আশালতা অনুপমকে শিখাইয়া রাখিয়াছিল। মুখ কালো করিয়া সে বলিল, 'কারণ আছে। আপনাকে বলতে পারব না ঠাকুর্দ্দা।'

বীরেশ্বরও মুখ কালো করিয়া বলিলেন, 'আমার টাকায় দু'জনে বিলেত যাবি, আমাকে বলতে পারবি না?'

অনুপম বলিল, 'না।'

বীরেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলেন। তারপর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, ঠিক আমার টাকা নয়। তুই তোর বাবার টাকা দাবী করছিস না, অনু?—রাগ করে আমায় ত্যাগ না করলে অহরেন বাবার মত তোর বাবার জন্যে আমাকে যে টাকাটা খরচ করতে হত সেই টাকাটা, না? আমি না মরলে আমার যা কিছু আছে, তার ভাগ পাবি না জানিস বলে তোর বাপের কাছে যে টাকাটা পাবি, তাই আদায় করতে এসেছিস, কেমন?'

অনুপম ব্যাকুল হইয়া বলিল, 'না ঠাকুর্দ্দা, না। সত্যি তা নয় আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।'

'তোর মার কথাটা ভেবেছিস অনু?'

'মা অবশ্য একটু রাগ করবেন—'

'একটু রাগ নয়, জন্মে জীবনে তোদের মুখ দেখবেন না।'

'কিন্তু মার জন্য আমার ফিউচারটা তো নষ্ট করতে পারি না—'

বীরেশ্বর হঠাৎ রাগিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, 'নিজের মাকে বাদ দিয়ে মানুষের ফিউচার কি রে বাঁদর? মার জন্য একদিন তোর বাবা আমার টাকার লোভ ত্যাগ করেছিল, সেই টাকার লোভে আজ তুই তোর মাকে ত্যাগ করছিস। বৌমা তোকে মানুষ করতে পারেন নি অনু।'

অনুপম তা জানে।

রাগটা কমিতে কিছু সময় লাগিল বীরেশ্বরের। তার পর ঠিক যেন সাধনার মত শ্রান্ত ও অসহায় ভাবে বলিলেন, 'চাইছিস যখন, টাকা আমি দেব অনু। না দিলেই বা বৌমার কি লাভ হবে, যে ভাবেই হোক বৌমাকে তোরা মেরে ফেলবিই।'

বীরেশ্বরের ঘর হইতে বাহির হইয়া অনুপম বারান্দায় একটু দাঁড়াইল। রামলালের ঘর অন্ধকার, এখনও তিনি রেঁস্তোরায় রুগ্ন জীবনের দৈনন্দিন ঔষধের বোতল খালি

ফেরেনী বাড়ী ফেরেন নাই। জহরের ঘরও অন্ধকার। বাড়ীর মেয়েরা কেউ চলাফেরা করিতেছে, কেউ শিশুদের ঘুম পাড়াইতেছে, কেউ নভেল পড়িতেছে। ছেলে-মেয়েরা করিতেছে স্কুল-কলেজের পড়া। সকলের জন্য রান্নাঘরে প্রস্তুত হইতেছে খাদ্য।

বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া সীতা-পিসীমা আশালতাকে চুপি চুপি কি যেন বলিতেছেন। কে জানে তরঙ্গের জীবন-কাহিনী কি না! তরঙ্গ যে ঘরে গলায় দড়ি দিয়াছিল, বারান্দার ঐ প্রান্তেই সেই ঘরে উঠিয়া যাইবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সীতা-পিসীমার কথা শুনিতে শুনিতে আশালতার মাথার আঁচল খুলিয়া পড়িয়াছিল। তরঙ্গের মস্ত চুল তাহার নাই, তবু কি কৌশলে যেন চুলগুলিকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া প্রায় তরঙ্গের মতই মস্ত একটা খোঁপা বাঁধিয়াছে। এতদূরে দাঁড়াইয়া ক্ষীণ আলোকে পাশের দিক হইতে আশালতার মুখখানা দেখিয়া অনুপমের হঠাৎ মনে হয়, তার মুখের একধারে যেন তরঙ্গের মুখের মরণের বিবর্ণ বিসদৃশ মুখোশের একটা টুক্‌রাকে আঁটিয়া দিয়াছে।

আশালতার সঙ্গে বাড়ী ফিরিবার সময় আশালতার মুখ না দেখিবার জন্যই অনুপম জোর করিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া সাধনার মুখের দিকেও অনুপম চাহিতে পারিল না, কিন্তু তাহা অন্য কারণে। ভবিষ্যৎ জীবনকে কি ভাবে গড়িয়া তুলিবে, আশালতার সঙ্গে সে বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করিয়াছে; আজ এইমাত্র আশালতার সেই পরিকল্পনা সফল করিবার সবচেয়ে দরকারী ব্যবস্থাটি সে করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজই তাহার বেশী করিয়া মনে হইতেছে যে, সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনটা এতদিনে সে সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিল! এতদিন ছোট ছোট উদ্দেশ্যহীন কাজ করিয়া দিন কাটাইয়াছে, এইবার আড়ম্বরের সঙ্গে জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যহীন কাজটা আরম্ভ করিবে এবং সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন করিয়া দিবে সাধনার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন। এতদিন অনুপমের মনের কোণে আত্মসান্ত্বনার প্রয়োজনে একটা আশা ছিল। সাধনা তাকে মানুষ করিতে পারে নাই; সে অমানুষ, কিন্তু হয় তো একদিন মানুষ হইতে পারিবে, সন্ধান পাইবে জীবনের উদ্দেশ্যের, খুঁজিয়া পাইবে পথ। তারপর যেদিন সে মানুষ হইতে পারিবে, সেদিন প্রমাণ হইবে, সাধনার জীবনটাও ব্যর্থ হইয়া যায় নাই।

আজ সেই যুক্তিহীন আশাও অনুপমের মনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

সাধনা রোয়াকে বসিয়া ছিলেন। একা। ঠিকা-ঝি কাজ সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। রান্না শেষ করিয়া সাধনা শূন্য-গৃহ আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

'এত রাত হল যে অনু?'

অনুপম কতদূর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে আশালতা তাহা জানিত, তাকে শান্ত হইবার, ভাবিবার সময় না দিয়া আজই সমস্ত ব্যাপারটা চুকাইয়া ফেলিবার জন্য অনুপমের হইয়া সে জবাব দিল, 'ও বাড়ীতে গিয়েছিলাম মা।'

আজ সাধনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা বা সাহস কিছুই অনুপমের ছিল না। ও বাড়ীতে তাহারা কেন গিয়াছিল, সাধনার এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া ও আশালতার দুটি একটি মন্তব্যের জের টানিতে গিয়া সব কথাই সে বলিয়া ফেলিল।

সাধনা মড়ার মত বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরদিন সকালে ছোট একটি বাক্স সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেলেন দেশে। একা।

খানিক পরে সুরু হইল বীরেশ্বর ছাড়া ও বাড়ীর সকলের আবির্ভাব। একটু আভাস পাইয়া সকলে ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে আসিয়াছে। বীরেশ্বরের টাকার ভাগটা অনুপম দাবী করিয়াছে এবং তাহার দাবী মঞ্জুর হইয়াছে শুনিয়া মুখ কালো করিয়া সকলে ফিরিয়া গেলেন। সীতা-পিসীমা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন।

জহর আসিল দুপুরবেলা।

আশালতাই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল, জহরকেও সেই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল। অনুপম একটি কথা বলিল না।

জহর বলিল, 'এক গ্লাস জল দিন তো, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।'

আশালতা বলিল, 'সরবৎ খাবেন? আমি যে সরবৎ তৈরী করি—একেবারে অমৃতের মত!'

আশালতা অমৃতের মত সরবৎ তৈরী করিয়া আনিতে গেল এবং জহর ও অনুপম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল পরস্পরের মুখের দিকে। [সমাপ্ত